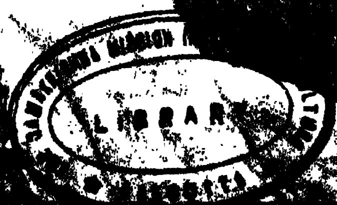


উদ্বোধন

উত্তিষ্ঠত
জাগ্রত
প্রাপ্য
বরান্
নিবোধত





উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়; ৮০তম বর্ষ হইতে **বার্ষিক মূল্য সডাক ১২৲ টাকা, ষাণ্মাষিক ৭৲ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে ৩৩৲ টাকা, এয়ার মেল-এ ১০১৲ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ১.২০ টাকা। নমুনার জন্য ১.২০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সংবাদ দিবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে।

রচনা:—ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা প্রবন্ধ ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌঁছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহকনম্বর পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময়: সকাল ৭৷৹টা হইতে ১১টা; বিকাল ২৷৹টা হইতে ৫টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০০০৩

উদ্বোধন, মাঘ, ১৩৮৪

সূচীপত্র

"ঈশ্বর লাভের জন্য সংসারে থেকে, এক হাতে ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধ'রে থাকবে আর এক হাতে কাজ করবে। যখন কাজ থেকে অবসর হবে, তখন দুই হাতেই ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধ'রে থাকবে, তখন নির্জনে বাস ক'রবে, কেবল তাঁর চিন্তা আর সেবা ক'রবে।"

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

উদ্বোধনের মাধ্যমে

প্রচার হোক

এই বাণী। শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যা



দিব্য বাণী

সূর্যো যথান্ধং হি তমো নিহন্তি
বিষ্ণুর্যথা দুষ্টজনান্ ছিনত্তি।
তথৈব যস্যাখিলনেত্রলোভং
রূপং ত্রিতাপং বিমুখীকরোতি॥
তং দেশিকেন্দ্রং পরমং পবিত্রং
বিশ্বস্য পালং মধুরং যতীন্দ্রম্।
হিতায় নৃণাং নরমূর্তিমন্তং
'বিবেক-আনন্দ'মহং নমামি॥

—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ : বিবেকানন্দপঞ্চকম্ ৪,৫

রবিকর নাশে যথা গভীর আঁধারে,
নারায়ণ বিনাশেন দুর্বৃত্ত জনারে—
সেইরূপ অখিলের নয়নলোভন
রূপ যাঁর দূর করে ত্রিতাপজ্বলন,
আচার্যবরিষ্ঠ যিনি পবিত্রতা-সার—
সুমধুর যতিরাজ পাতা বসুধার,
জীবহিততরে নর-রূপধারী তাঁরে—
বিবেকানন্দেরে আমি নমি বারেবারে।

কথাপ্রসঙ্গে

নববর্ষ

শ্রীভগবানের কৃপায় 'উদ্বোধন' এই মাঘে অশীতিতম বর্ষে পদার্পণ করিল।

উন-আশি বৎসর পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দের—একটি বাংলা সাময়িক পত্রিকা-প্রকাশের—পরিকল্পনাকে রূপায়িত করিবার জন্য তাঁহার অন্যতম গুরুভ্রাতা স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ 'উদ্বোধনে'র প্রকাশনায় ব্রতী হন। তিনিই ইহার প্রথম সম্পাদক। শুধু সম্পাদক নন, প্রবন্ধ-সংগ্রাহক, প্রকাশক ও মুদ্রক বা প্রেসের ব্যবস্থাপক। তখন 'উদ্বোধনে'র নিজস্ব প্রেস ছিল। প্রেসটি প্রথমে ছিল কলিকাতার বড়বাজারে। পরে স্থানান্তরিত হয় শ্যামবাজারে কম্বুলিয়াটোলায়। সম্পাদকীয় দপ্তরও হয় সেখানে। দপ্তর মানে একটি ছোট ঘর, তাহাতে একটি পুরাতন টেবিল, ছোট একটি টুল, যাহা সম্পাদক মহারাজের দেহের তুলনায় অতিরিক্ত ছোট হওয়ায় কোনরকমে বসিতে হয়; মেজেতে একটি মাদুর পাতা এবং কিছু বই ও কাগজপত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

প্রেসের কর্মচারীরা থাকিত বস্তী-অঞ্চলে। কাজের সময়ে তাহাদের নিয়মিত পাওয়া যাইত না। ফলে সম্পাদক মহারাজকে উহাদের বাসস্থান হইতে ডাকিয়া আনিয়া প্রেসের কাজে লাগাইতে হইত। আনাড়ীও ছিল কেহ কেহ—কম্পোজিং-এ, অর্থাৎ অক্ষরসন্নিবেশরূপ মুদ্রণকার্যে। সুতরাং তাহাদের শিক্ষণের দায়িত্বও সম্পাদকেরই! কর্মচারীরা উপস্থিত না হইতে পারিলে সম্পাদককেই মুদ্রণকার্য করিতে হইত। তাহাদের অসুখবিসুখ হইলে সেবাশুশ্রূষা করার দায়িত্বও সম্পাদকেরই!

অধিকন্তু বাড়ি বাড়ি যাইয়া গ্রাহকদের দেয় চাঁদা আদায় করা, পত্রিকাটির আদর্শ ও উদ্দেশ্য সকলকে বুঝাইয়া বলা এবং নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করা তাঁহার দৈনন্দিন কর্ম ছিল। কখন কখন দৈনিক দশ মাইল হাঁটিয়া এই সকল কাজ করিতে হইত—জ্বরগায়ে পর্যন্ত।

ইহার উপর পত্রিকায় মুদ্রণপ্রমাদ দেখিলে স্বামী বিবেকানন্দ সম্পাদক মহারাজকে তিরস্কার করিতেন তীব্র ভাষায়। সম্পাদক মহারাজ স্বামীজীর তিরস্কার নীরবেই সহ্য করিতেন। ঐ বিষয়ে পরেও উচ্চবাচ্য করিতেন না—বড় জোর বলিতেন, 'আজ স্বামীজী আমায় বকেছেন।' একবার স্বামীজীর লিখিত একটি প্রবন্ধে মুদ্রণপ্রমাদ লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী সম্পাদক মহারাজকে বিশেষ ভৎর্সনা করায় তিনি উত্তর দেন, 'কি রকম মুখ্য নিয়ে কাজ করতে হয়, তা তো বুঝতে চাও না!' স্বামীজীর প্রত্যুত্তর: 'ও সব কথা রেখে দে। তোরা যখন কাজ হাতে নিয়েছিস, তখন তাতে গলদ থাকবে কেন? তাদের মানুষ করবার কি চেষ্টা করেছিস? এদেশের লোকই কেবল দোষ ঢাকবার জন্য ওজরের ওপর ওজর তোলে।'

ইহার উপর আর কথা কী থাকিতে পারে! আর 'ক্রোধোঽপি দেবস্য বরেণ তুল্যঃ'—স্বামীজী তো গুরুভাইদের কাছে চিরকালই নেতা ও দেবতা!

এই তো গেল সম্পাদকের কাজের ও উপরন্তু পাওনার বৃত্তান্ত। এখন তাঁহার ব্যক্তিগত কথা। আহারের সংস্থান নাই। 'ভোজনং

যত্রতত্র শয়নং হট্টমন্দিরে'। কারণ, স্বামীজী পত্রিকাটির জন্য যে টাকা দিয়াছিলেন, তাহা হইতে একটি পয়সাও সম্পাদক মহারাজ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে খরচ করিতে পারিবেন না —ইহাই ছিল স্বামীজীর সুস্পষ্ট নির্দেশ। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণভক্তগৃহে ভিক্ষান্ন জুটিল তো ভাল, নতুবা উপবাস! এদিকে অদ্ভুত পরিপাকশক্তি, যাহা কিংবদন্তীবিশেষ। প্রদীপ্ত জঠরানলের লেলিহান শিখা—হবনীয়ের দেখা নাই! আর শয়ন—বিছানাপত্রের বালাই নাই —অফিসঘরের মেজের উপর পাতা মাদুরের উপরই।

এইভাবে চার বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ পত্রিকাটিকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

আমাদের শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সম্পর্কে বিতর্কের প্রচুর অবকাশ আছে। কিন্তু একটি বিষয় সর্ববাদিসম্মতিক্রমে স্বীকৃত—স্বার্থশূন্য তপস্যার দ্বারা শ্রীভগবানের প্রসন্নতা লাভ করা যায়। আমরা মনে করি 'উদ্বোধনে'র উপর শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপাদৃষ্টি সর্বদাই রহিয়াছে, কারণ পত্রিকাটির মূলে আছে লোকহিতে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের অভূতপূর্ব তপশ্চর্যা।

নববর্ষের যাত্রারম্ভে উদ্বোধনের সকল লেখক-লেখিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ী, পরামর্শদাতা ও সংশ্লিষ্ট সকলকেই আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা নিবেদন করি। শ্রীভগবানের নিকট সকলেরই সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য প্রার্থনা জানাই।

'সর্বেঽত্র সুখিনঃ সন্তু সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ্ ভবেৎ॥'

—ইহলোকে সকলেই সুখী হউন, সকলেই নিরাময় হউন, সকলেই মঙ্গলদর্শী হউন, কেহ যেন দুঃখী না হন।

উদ্বোধনের আলোচ্য বিষয়

উদ্বোধনের প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে চতুর্থ বর্ষের চতুর্বিংশতিতম সংখ্যা পর্যন্ত (উদ্বোধন প্রথম হইতে নবম বর্ষ পর্যন্ত পাক্ষিক পত্রিকা ছিল) প্রত্যেকটি সংখ্যার প্রথম প্রচ্ছদের বহির্ভাগে উপরের বাম কোণে পত্রিকাটির পরিচিতিরূপে যে-সকল কথা মুদ্রিত থাকিত, তন্মধ্যে "ধর্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, ভ্রমণ প্রভৃতি" আলোচ্য বিষয় হিসাবে উল্লেখিত থাকিত।

পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক এবং প্রকাশক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ যে স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশক্রমেই উক্ত আলোচ্য বিষয়গুলির উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং করিতেন, ইহাই আমাদের অনুমান, কারণ তিনি স্বামীজীর সহিত পত্রিকাটি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। পত্রিকাটির নামকরণ স্বামীজীই করেন, 'প্রস্তাবনা'ও তিনিই লিখিয়া দেন, সুতরাং আলোচ্য বিষয়গুলি কী হইবে, এই অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে স্বামীজী কোনও অভিমত দেন নাই, ইহা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। তথাপি যদি আমাদের অনুমান প্রমাণরূপে স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলেও এবিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে, বিষয়গুলি স্বামীজীর অনুমোদিত, কারণ প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হইলে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ যখন স্বামীজীর অভিমত জানিতে ইচ্ছুক হইয়া স্বামীজীর শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে স্বামীজীর

নিকট প্রেরণ করেন, তখন স্বামীজী শরচ্চন্দ্রকে বলেন, 'তুই গিয়ে বলিস, আমি তার কাজে খুব খুশী হয়েছি। তাকে আমার স্নেহাশীর্বাদ জানাবি। আর তোরা প্রত্যেকে যতটা পারবি, তাকে সাহায্য করিস। ওতে ঠাকুরের কাজই করা হবে।' কথাগুলি বলিয়াই স্বামীজী স্বামী ব্রহ্মানন্দকে কাছে ডাকিয়া প্রয়োজন হইলে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে পত্রিকাটির জন্য আরও অর্থ দিতে নির্দেশ দেন।

অধিকন্তু ইহাও প্রণিধানযোগ্য যে, উদ্বোধনের চতুর্থ বর্ষের মাঝামাঝি সময়ে স্বামীজীর দেহান্ত হওয়ায় তিনি প্রায় সাড়ে তিন বৎসর পত্রিকাটির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। প্রত্যেকটি সংখ্যাতেই যখন প্রচ্ছদের উপর পূর্বোক্ত আলোচ্য বিষয়গুলির উল্লেখ থাকিত, তখন সেগুলি তাঁহার অনুমোদিত না হইয়াই পারে না।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, স্বামীজী উদ্বোধনের আলোচ্য বিষয় হিসাবে কেবলমাত্র 'ধর্ম'কে নির্দিষ্ট না করিয়া ভ্রমণ, ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনার অবকাশ দিলেন কেন? ইহার উত্তর এই যে, নিদ্রিত ভারতকে জাগাইবার জন্য এবং 'জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন'-এর অধিকারী করিবার জন্য স্বামীজীর যে সামগ্রিক পরিকল্পনা ছিল, উদ্বোধনের প্রকাশনা সেই পরিকল্পনারই একটি খণ্ড প্রকাশ মাত্র। স্বামীজী জানিতেন পরা ও অপরা—এই উভয় বিদ্যার চর্চা ব্যতীত কোনও দেশ কখনও মহান হইতে পারে না—অতীতেও হয় নাই, ভবিষ্যতেও হইবে না।

স্বামীজী তাঁহার বহু বক্তৃতায় ভারতের গৌরবময় অতীতের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। স্বামীজীর সময়ে অবশ্য সুপ্রাচীন সিন্ধু-সভ্যতা আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু বৈদিক সভ্যতা—যাহা পৃথিবীর বহু দেশকে প্রভাবিত করিয়াছিল এবং যাহার প্রাণ-শক্তি নানা বিপর্যয়ের মধ্যেও ভারতকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি ফিরাইয়া প্রেরণালাভ করিতে স্বামীজী আমাদের বারংবার নির্দেশ দিয়াছেন।

সেই বৈদিক সভ্যতায় আমরা পরা ও অপরা—উভয় বিদ্যারই চর্চা দেখি। ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের প্রারম্ভেই আছে, নারদ শিক্ষার্থী হইয়া সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইলে সনৎকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, নারদ কি কি বিষয় শিক্ষা করিয়াছেন এবং বলিলেন, সেই বিষয়গুলি জানিবার পর তিনি নারদকে আরও যাহা শিক্ষণীয় আছে, তাহা উপদেশ করিবেন। তখন নারদ উত্তর দিলেন যে, তিনি ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, গণিত, দৈব উৎপাত-বিষয়ক বিদ্যা, নিধিশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, দেববিদ্যা, শিক্ষাকল্পাদি বেদাঙ্গ, ভূতবিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, জ্যোতিষ, সর্পবিদ্যা ও গন্ধর্বশাস্ত্র—এই সমস্ত বিষয় আয়ত্ত করিয়াছেন। যদিও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি বিদ্যাকে সনাক্ত করা কঠিন—যেমন ভূতবিদ্যার অর্থ পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান অথবা প্রেত-বিদ্যা, তাহা নির্ণীত হয় নাই, নিধিশাস্ত্র কি তাহাও পরিষ্কার নহে—তথাপি কোনও সন্দেহ নাই যে, নারদের অপরা বিদ্যার পরিধি অতিশয় বিস্তৃত ছিল। এই নারদ-সনৎকুমার-সংবাদ যদি একটি আখ্যায়িকা মাত্রও হয়, তাহা হইলেও উল্লেখিত বিদ্যাগুলির অনস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। সেই সুপ্রাচীন কালে বিদ্যাগুলির অস্তিত্ব ছিল বলিয়াই আখ্যায়িকাতে উহাদের উল্লেখ সম্ভব

হইয়াছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

পৌরাণিক যুগেও—অন্তত: উহার প্রথম দিকে—অপরা বিদ্যার যথেষ্ট চর্চা এদেশে হইত। মার্কণ্ডেয় পুরাণ প্রাচীনতম পুরাণগুলির অন্যতম। শ্রীশ্রীচণ্ডী উহারই একটি অংশ। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে, দেবী কর্তৃক অসুরাধিপতি শুম্ভ নিহত হইলে অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ দেবীকে স্তব করিয়া বলিতেছেন, 'বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ / স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।'—অর্থাৎ হে দেবি, সমস্ত বিদ্যা আপনারই অংশ, জগতে কলাবতী সমস্ত নারী আপনারই বিগ্রহ। জনৈক টীকাকারের মতে এখানে চারি বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, ধর্মশাস্ত্র, মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র—এই অষ্টাদশ বিদ্যার এবং গীত, বাদ্য, নৃত্য, নাট্য ইত্যাদি চতুঃষষ্টি (বাহুল্যভয়ে টীকাকার-প্রদত্ত সম্পূর্ণ তালিকাটি উদ্ধৃত করা হইল না।) কলার কথা বলা হইয়াছে।

পরবর্তী কালে ভারতে অবক্ষয়ের যুগের সূত্রপাত হয় এবং পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ এই মহান দেশ অধঃপতিত হইয়া আপন অতীত মহিমা পর্যন্ত বিস্মৃত হয়। সুতরাং ভারতকে যদি স্বীয় লুপ্ত গরিমার পুনরুদ্ধার করিতে হয়—শুধু পুনরুদ্ধার নহে, অতীত গৌরবকেও অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর সমস্ত দেশের সম্মুখে একটি আদর্শ দেশ হিসাবে পরিণত হইতে হয়, নিজের এবং তাহাদের কল্যাণে, তাহা হইলে পরা এবং অপরা—এই উভয় বিদ্যার চর্চা প্রয়োজন।

পরা বিদ্যা তো ভারতবাসীর রক্তেই রহিয়াছে। অপরা বিদ্যার সাহায্যে তমোগুণ পরাভূত করিতে পারিলে উহা আপনিই বিকশিত হইয়া উঠিবে। যদি জীবিকা-নির্বাহের সামর্থ্য না থাকে, আহারের সংস্থান না থাকে, তাহা হইলে ধর্মকর্ম কেন, জাগতিক কোন কাজই করা সম্ভব নহে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা—'খালি পেটে ধর্ম হয় না'—স্বামীজী প্রায়ই বলিতেন। বলিতেন, 'আগে কূর্মাবতারের পূজা চাই—পেট হচ্ছেন সেই কূর্ম। এঁকে আগে ঠাণ্ডা না করলে ধর্মকর্মের কথা কেউ নেবে না।' সুতরাং উদ্বোধনের আলোচ্য বিষয় শুধু ধর্ম হইতে পারে না। ধর্ম ও দর্শনই তো উদ্বোধনের প্রাণ, কিন্তু তাহাকে সঞ্জীবিত রাখিতে হইলে কৃষি শিল্প বিজ্ঞান ইত্যাদির কথা আগে বলিতে হইবে। তাই দেখি, উদ্বোধনের প্রথম বর্ষেই 'অন্নচিন্তা' শীর্ষক একটি সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ ছয়টি সংখ্যায় প্রকাশিত; তৃতীয় বর্ষে 'অর্থ' শীর্ষক একটি ও 'কৃষিব্যাঙ্ক' শীর্ষক (দুইটি সংখ্যায়) আরেকটি প্রবন্ধ; পঞ্চম বর্ষে স্বামী সারদানন্দ লিখিত 'দারিদ্র্য ও অর্থাগম' শীর্ষক একটি অতি মূল্যবান প্রবন্ধ, ইত্যাদি।

কথায় বলে, 'অন্নচিন্তা চমৎকারা কালিদাস হয় বুদ্ধিহারা।' অন্নের সংস্থান হইলে তবেই না বুদ্ধিগত উৎকর্ষলাভের প্রচেষ্টা! তখনই বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মের আলোচনা সম্ভব, তৎপূর্বে নহে। তাই উদ্বোধনের প্রথম বর্ষ হইতেই ধর্ম ও দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানাদি বিষয়েরও আলোচনা দেখা যায়। প্রথম বর্ষ হইতে চতুর্থ বর্ষ পর্যন্ত অর্থাৎ মোটামুটি স্বামীজীর জীবৎকালেই যে-সকল অপরা-বিদ্যা-বিষয়ক সাধারণ বা ধারাবাহিক প্রবন্ধ উদ্বোধনে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'বৈজ্ঞানিক প্রণালী', 'বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ' (২টি সংখ্যায়), 'বৈজ্ঞানিক কার্যকারণবাদ', 'বৈজ্ঞানিক কথা' (২টি সংখ্যায়), 'গ্যালিলিও', 'স্বাস্থ্যবিজ্ঞান' (২টি সংখ্যায়), 'আয়ুর্বেদ ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা', 'স্ত্রীশিক্ষা', 'সমাজ-

সংস্কার', 'সমাজসংস্কার সম্বন্ধে গুটিকতক কথা' এবং সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার সমালোচনা প্রসঙ্গে বাংলা ভাষা সম্বন্ধে উদ্বোধন-সম্পাদকের মননধর্মী বিশ্লেষণাত্মক বিস্তারিত আলোচনা (সাতটি সংখ্যায় প্রকাশিত)। বিভিন্ন বিষয়ের এই আলোচনার ধারা তাহার পরও ৭৫ বৎসর ধরিয়া অব্যাহত ছিল, বর্তমান অশীতিতম বর্ষে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে, কারণ আমরা স্বামীজীর নির্ধারিত পন্থা অবলম্বনেই চলিব।

কেহ কেহ বলেন, স্বামীজী যখন বিজ্ঞানাদি বিষয়ের আলোচনা করিতে বলিয়াছিলেন, তখন এদেশে ঐসকল বিষয়ের বিশেষ চর্চা ছিল না; বর্তমানে যখন ব্যাপকভাবে ঐগুলির চর্চা হইতেছে, তখন উদ্বোধনে কেবলমাত্র ধর্মীয় বিষয়েরই আলোচনা থাকা উচিত। আমরা একথা মানিতে প্রস্তুত নহি। কারণ, অপরা বিদ্যাগুলির পরিধি দিন দিন বিস্তৃততর হইলেও এদেশের কয় জন মানুষ উহাদের আলোচনা করিতেছেন? সমগ্র ভারতের জনগণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের কথা স্বামীজী বারংবার বলিয়া গিয়াছেন। তথাপি দেশের কয় শতাংশ মানুষ আজ অপরা বিদ্যায় শিক্ষিত? সুতরাং অবস্থার পরিবর্তন খুব বেশী হয় নাই। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতেও দারিদ্র্য ও যথার্থ শিক্ষার অভাবের তারতম্য দেখিতে পাই না—'যথা পূর্বং তথা পরম্'। বরং ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্বে বিদ্যার্থীরা স্কুল-কলেজে যে-শিক্ষা পাইত, বর্তমানে তাহারা সেই মানের শিক্ষা পায় না বলিয়াই মনে হয়। পাঠ্যপুস্তকগুলিতে পর্যন্ত অজস্র ভুল থাকে। পাঠ্যক্রমের আকারই বর্ধিত হইয়াছে, কিন্তু লব্ধবিদ্যার মান উন্নততর হয় নাই। সুতরাং উদ্বোধন স্বামীজীর প্রদর্শিত পথই অনুসরণ করিবে। সীমিত পরিসরে যথাসাধ্য এদেশে পরা ও অপরা উভয় বিদ্যার বিস্তারে ব্রতী থাকিবে। স্বামীজীর কথা—'খালি ভটচায্যি-গিরি তিন ভাগ দিলে কি লোকে পছন্দ করে!'

'হরিমীড়ে'-স্তোত্রম্

স্তোত্র-রচয়িতা: আচার্য শংকর; টীকাকার: স্বয়ংপ্রকাশ-যতি

অনুবাদক: স্বামী ধীরেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

টীকা: মাণ্ডূক্যে শ্রূয়তে—'সঃ অয়ম্ আত্মা চতুষ্পাৎ। জাগরিতস্থানঃ বহিষ্প্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গঃ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুক্ বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ। স্বপ্নস্থানঃ অন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গঃ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসঃ দ্বিতীয়ঃ পাদঃ। যত্র সুপ্তঃ ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি, তৎ সুষুপ্তম্। সুষুপ্তস্থানঃ একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘনঃ এব আনন্দময়ঃ হি আনন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞঃ তৃতীয় পাদঃ। [মা. উ. ২-৫] অদৃশ্যম্[১] অব্যবহার্যম্ অগ্রাহ্যম্ অলক্ষণম্ অচিন্ত্যম্ অব্যপদেশ্যম্

১ পাঠান্তর: 'অদৃষ্টম্'।

একাত্ম-প্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবম্ অদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে' [মা. উ. ৭] ইতি। অয়ম্ অর্থঃ। সঃ অয়ম্ ওঙ্কার-প্রতিপাদ্যঃ আত্মা চতুষ্পাৎ, চত্বারঃ পাদাঃ বিশ্বাদিরূপাঃ যস্য সঃ তথা। তত্র প্রথমং পাদং দর্শয়তি— জাগরিতেত্যাদিনা। জাগরিতং জাগরাবস্থানং বিষয়োপলব্ধিস্থানং যস্য সঃ তথা। বহিঃ দেহাৎ বহিঃ বিষয়েষু প্রজ্ঞা যস্য সঃ তথা সপ্তাঙ্গঃ—দ্যৌঃ মূর্ধা, চক্ষুঃ আদিত্যঃ, অগ্নিঃ মুখং, প্রাণঃ বায়ুঃ, দেহমধ্যম্ আকাশঃ, বস্তিঃ সমুদ্রঃ, পৃথিবী এব পাদৌ ইতি সপ্তাঙ্গানি যস্য সঃ তথা। একোনবিংশতিমুখঃ—জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকং কর্মেন্দ্রিয়পঞ্চকং প্রাণপঞ্চকং অন্তঃকরণচতুষ্টয়ম্ ইতি একোনবিংশতি-সংখ্যকানি মুখানি বিষয়োপলব্ধি-দ্বারাণি যস্য সঃ তথা। স্থূলভুক্—স্থূলানি পঞ্চীকৃত-ভূতকার্যাণি ঘটপটাদীনি ভুঙ্‌ক্তে উপলভতে ইতি তথা। বৈশ্বানরঃ—বৈশ্বানর-গ্রহণং ব্যষ্টিসমষ্ট্যভিমানিনোঃ অভেদ-বিবক্ষয়া বিশ্বঃ ইতি অর্থঃ। অয়ং প্রথমঃ পাদঃ। স্বপ্নস্থানঃ—বাসনাময়-ভোগঃ স্থানং যস্য সঃ তথা। অন্তঃ দেহান্তঃ বাসনাময়-প্রপঞ্চ-বিষয়া প্রজ্ঞা যস্য সঃ তথা। প্রবিবিক্তং সূক্ষ্মং বাসনামাত্র-রূপং বিষয়ং ভুঙ্‌ক্তে ইতি তথা। তৈজসঃ—তেজসি লিঙ্গে ভবঃ তদভিমানী ইতি অর্থঃ। সঃ দ্বিতীয়ঃ পাদঃ। সুপ্তঃ পুরুষঃ যত্র যস্যাম্ অবস্থায়াং ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তম্ ইতি সুষুপ্ত্যবস্থা নিরূপিতা। ন কঞ্চন ইতি উক্ত্যা জাগরিতম্ অপি স্বপ্নম্ এব মনুতে শ্রুতিঃ। সুষুপ্তস্থানঃ পুমান্ একীভূতঃ একতাং প্রাপ্তঃ বহুধা-বিভাজক-চক্ষুরাদীনাং তদা লীনত্বাৎ। অতঃ প্রজ্ঞানঘনঃ এব, ন বিপ্রকীর্ণ-প্রজ্ঞানঃ। আনন্দময়ঃ আনন্দপ্রচুরঃ, দুঃখহেতু-লিঙ্গস্য উপরমাৎ। আনন্দম্ স্বরূপানন্দম্ এব ভুঙ্‌ক্তে ইতি তথা। আনন্দভোগে সাধনম্ আহ—চেতোমুখঃ ইতি। চেতঃ চিৎ-প্রতিবিম্ব-সহিতাঽজ্ঞান-বৃত্তিঃ এব মুখম্ আনন্দভোজনে দ্বারম্ যস্য সঃ তথা। প্রাজ্ঞঃ—প্রকর্ষেণ অন্তর্বহিঃ ন জানাতি ইতি তথা। এষঃ তৃতীয়ঃ পাদঃ। অবস্থা-ত্রয়ানুস্যূতং শুদ্ধচৈতন্যম্ এব চতুর্থপাদম্ আহ—অদৃশ্যম্ ইত্যাদিনা। অদৃশ্যং—জ্ঞানেন্দ্রিয়াবিষয়ম্, অব্যবহার্যং—হানাদি-ব্যবহারাগোচরম, অগ্রাহ্যং—কর্মেন্দ্রিয়া-বিষয়ম, অলক্ষণং—লক্ষণং লিঙ্গং তদ্রহিতম্ অনুমানাবিষয়ম্ ইতি অর্থঃ। অচিন্ত্যম্—অন্তঃকরণাগোচরম্, অব্যপদেশ্যং—শব্দাবিষয়ং তৎ-প্রবৃত্তি-নিমিত্তজাত্যাদেঃ অভাবাৎ। কিন্তু একাত্ম-প্রত্যয়-সারম্—একঃ অদ্বিতীয়ঃ আত্মা স্বরূপভূতঃ প্রত্যয়ঃ প্রকাশঃ এব সারঃ বলং স্ব-সদ্ভাবে প্রমাণং যস্য সঃ তথা। প্রপঞ্চোপশমং—প্রপঞ্চ-নিবৃত্তি-রূপম্ আরোপিতভাবস্য অধিষ্ঠানাভিন্নত্বাৎ। শিবম্—আনন্দরূপম্, অদ্বৈতং—দ্বৈতরহিতম্। ব্রহ্ম এব চতুর্থং পাদং মন্যন্তে বিদ্বাংসঃ ইতি। এবম্ অন্যত্র কৈবল্যোপনিষদাদৌ অপি আত্মনঃ অবিদ্যয়া অবস্থাবত্ত্বং স্বতঃ তদ্রহিতত্বং চ শ্রুতং ; তাদৃশং শ্রুতিসিদ্ধং বিষ্ণুম্ ইদানীং স্তৌতি—

(মূলস্তোত্রম্ঃ)

জাগ্রদ্দৃষ্ট্বা স্থূলপদার্থানথ মায়াং
দৃষ্ট্বা স্বপ্নেঽথাপি সুষুপ্তৌ সুখনিদ্রাম্।
ইত্যাত্মানং বীক্ষ্য মুদাস্তে চ তুরীয়ে
তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥১৬॥

জাগ্রৎ ইতি। **জাগ্রৎ** জাগরিতে বর্তমানঃ যঃ **স্থূলপদার্থান্** পঞ্চীকৃত-ভূতকার্য-রূপান্ **দৃষ্ট্বা** অনুভূয়, **অথ** অনন্তরং **স্বপ্নে মায়াং** মিথ্যা-রথ-গজাদি-রূপাং বাসনাময়াং[২] **দৃষ্ট্বা সুষুপ্তৌ সুখনিদ্রাং**—স্বরূপ-সুখাভিব্যঞ্জক-কেবলাজ্ঞানম্ অনুভূয় অবিদ্যাদশায়াম্ **ইতি** এবংপ্রকারম্ **আত্মানং তুরীয়ে** স্থানে সমাধ্যবস্থায়াং স্বরূপেণ কেবলং **বীক্ষ্য মুদা আস্তে**—স্বাত্মানন্দানুভব-জনিত-সন্তোষেণ আস্তে **তম্** ইতি অর্থঃ ॥ ১৬ ॥

টীকানুবাদ: মাণ্ডূক্য উপনিষদে বলা হইয়াছে—"সেই এই আত্মা চতুষ্পাৎ। জাগ্রদবস্থা যাহার স্থান (ভোগক্ষেত্র), বাহ্য বিষয়ে যাহার প্রজ্ঞা (অনুভূতি), সাতটি যাহার অঙ্গ, উনিশটি যাহার মুখ (উপলব্ধিদ্বার), স্থূল বিষয়ভোগী সেই বৈশ্বানরই [আত্মার চারিটি পাদের মধ্যে] প্রথম পাদ। স্বপ্নাবস্থা যাহার স্থান (ভোগক্ষেত্র), আভ্যন্তর বিষয়ে যাহার প্রজ্ঞা (অনুভূতি), সাতটি যাহার অঙ্গ, উনিশটি যাহার মুখ (উপলব্ধিদ্বার), সংস্কার-উপস্থাপিত-বিষয়-ভোগী সেই তৈজসই [আত্মার চারিটি পাদের মধ্যে] দ্বিতীয় পাদ। সুপ্ত ব্যক্তি যে স্থানে (কালে) কোনও ভোগ্য বিষয় কামনা করে না এবং কোন স্বপ্নও দেখে না, তাহাই সুষুপ্তি। সুষুপ্তি যাহার স্থান (সুষুপ্তিতে অবস্থিত), [সমস্ত-বিক্ষেপ-রহিত হওয়ায় পরমাত্মার সহিত] একীভূত, প্রকৃষ্ট-জ্ঞান-স্বরূপ, আনন্দময়, অনায়াসে আনন্দভোগকারী, [স্বীয়] বোধশক্তি যাহার মুখ [-স্বরূপ] (এখানে 'চেতঃ'-শব্দের অর্থ বোধ বা স্বপ্নাদিজ্ঞান; 'মুখ'-শব্দের অর্থ উপায়;—সুতরাং 'চেতোমুখ'-শব্দের অর্থ স্বপ্নাদিজ্ঞানের উপায়স্বরূপ), সেই প্রাজ্ঞই [আত্মার চারিটি পাদের মধ্যে] তৃতীয় পাদ। যিনি অদৃশ্য, অব্যবহার্য, অগ্রাহ্য, অননুমেয়, অচিন্ত্য, অনির্দেশ্য, যিনি কেবল 'আত্মা'—এই প্রতীতির গম্য, প্রপঞ্চের বিরামস্বরূপ, শান্ত, শিব ও অদ্বিতীয়, তাঁহাকেই বিবেকীরা চতুর্থ [পাদ] মনে করেন।"

[পূর্বোক্ত শ্রুতিসমূহের] এই অর্থ:—সেই ওঙ্কার-প্রতিপাদ্য এই আত্মা বিশ্ব আদি চারিটি পাদবিশিষ্ট। তাহাদের মধ্যে 'জাগরিত' ইত্যাদি [মন্ত্রের] দ্বারা প্রথম পাদ প্রদর্শিত হইতেছে। 'জাগরিত' অর্থাৎ জাগ্রদবস্থা, যে অবস্থায় [বাহ্য] বিষয়ের উপলব্ধি হইয়া থাকে। ['বহিঃপ্রজ্ঞ' অর্থাৎ] দেহের বহিঃস্থিত বিষয়সমূহে যাহার প্রজ্ঞা (অনুভব)। 'সপ্তাঙ্গ'—দ্যুলোক মূর্ধা, আদিত্য চক্ষু, অগ্নি মুখ, বায়ু প্রাণ, আকাশ দেহমধ্যভাগ, সমুদ্র মূত্রাশয় এবং পৃথিবী পাদযুগল—এইরূপ সপ্ত অঙ্গবিশিষ্ট যিনি। 'একোনবিংশতিমুখ'

২। 'বাসনাময়ীং' হওয়াই সমীচীন

—জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক, কর্মেন্দ্রিয়পঞ্চক, প্রাণপঞ্চক এবং অন্তঃকরণচতুষ্টয় (মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার) — এই উনিশটি মুখ অর্থাৎ বিষয়োপলব্ধির দ্বার যাহার। 'স্থূলভুক্'—স্থূল অর্থাৎ পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতকার্য ঘটপটাদি যিনি ভোগ অর্থাৎ উপলব্ধি করেন। 'বৈশ্বানর'—ব্যষ্টি ও সমষ্টিতে [এই উভয় শরীরে] অভিমানীর অভেদবিবক্ষাবশতঃ এখানে 'বিশ্ব' এই অর্থে 'বৈশ্বানর' [-শব্দ] গৃহীত হইয়াছে।৩ ইহাই আত্মার প্রথম পাদ। [দ্বিতীয় পাদ বলা হইতেছে—] স্বপ্নস্থান—বাসনাময় (সংস্কার-উপস্থাপিত) [সূক্ষ্মবিষয়ক] ভোগ যাহার। [অন্তঃপ্রজ্ঞ—] দেহাভ্যন্তরে বাসনাময় প্রপঞ্চ-বিষয়ক প্রজ্ঞা (অনুভূতি) যাহার। [প্রবিবিক্তভুক্—] প্রবিবিক্ত অর্থাৎ সূক্ষ্ম, সংস্কারমাত্ররূপ বিষয় যিনি ভোগ করেন। 'তৈজসঃ'—তেজ অর্থাৎ লিঙ্গশরীরে যিনি বিদ্যমান অর্থাৎ লিঙ্গশরীরাভিমানী। ইহাই আত্মার দ্বিতীয় পাদ। [তৃতীয় পাদ বলা হইতেছে—] 'সুপ্ত পুরুষ যে-অবস্থায় কোন কামনা করে না বা স্বপ্ন দেখে না, তাহাই সুষুপ্ত'—ইহার দ্বারা সুষুপ্তি-অবস্থা নিরূপিত হইয়াছে। 'ন কঞ্চন'—এই উক্তির দ্বারা শ্রুতি জাগ্রৎ অবস্থাকেও স্বপ্নই মনে করেন। সুষুপ্ত পুরুষ 'একীভূত'—তখন একতাপ্রাপ্ত, কারণ সুষুপ্তিকালে নানাবিধ বিভাগের হেতু চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহ কারণে বিলীন হইয়া যায়; অতএব তিনি 'প্রজ্ঞানঘন'ই অর্থাৎ তাঁহার জ্ঞান [নানাবিষয়ে] বিক্ষিপ্ত নহে। 'আনন্দময়ঃ'—আনন্দপ্রচুর, কারণ দুঃখহেতু লিঙ্গশরীর [সুষুপ্তাবস্থায়] উপরত (বিলীন) হইয়া যায়। [আনন্দভুক্—] আনন্দ অর্থাৎ স্বরূপানন্দই যিনি ভোগ করেন। আনন্দভোগের সাধন বলিতেছেন—'চেতোমুখঃ'—চেতঃ অর্থাৎ চিৎপ্রতিবিম্বযুক্ত অজ্ঞানবৃত্তিই যাহার মুখ অর্থাৎ আনন্দানুভবের দ্বার। 'প্রাজ্ঞঃ'—যিনি বাহ্য বা আন্তর [কিছুই] বিশেষরূপে জানেন না। ইহাই [আত্মার] তৃতীয় পাদ। জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ে অনুস্যূত শুদ্ধচৈতন্যই [আত্মার] চতুর্থ পাদ, [ইহাই] 'অদৃশ্যম্' ইত্যাদি [পদসমূহের] দ্বারা বলিতেছেন। 'অদৃশ্যম্'—জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবিষয়; 'অব্যবহার্যম্'—ত্যাজ্য প্রভৃতি কোন ব্যবহারের অবিষয়; 'অগ্রাহ্যম্'—কর্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়; 'অলক্ষণম্'—লক্ষণ অর্থাৎ লিঙ্গ বা জ্ঞাপক হেতু, তদ্রহিত, [অতএব] অনুমানের অবিষয়, ইহাই অর্থ। 'অচিন্ত্যম্'—অন্তঃকরণের অগোচর; 'অব্যপদেশ্যম্'—শব্দের অবিষয়, কারণ শব্দপ্রবৃত্তির নিমিত্ত জাতি প্রভৃতির৪ [আত্মাতে] অভাব [আছে]। কিন্তু 'একাত্মপ্রত্যয়সারম্'—এক অদ্বিতীয় আত্মস্বরূপভূত প্রত্যয় অর্থাৎ প্রকাশই সার বা বল, অর্থাৎ নিজের সদ্ভাব-বিষয়ে প্রমাণ যাঁহার। 'প্রপঞ্চোপশমম্' প্রপঞ্চ-নিবৃত্তি-স্বরূপ, যেহেতু আরোপিত বস্তুর অভাব অধিষ্ঠানের

৩ 'বিশ্বানর'-শব্দের অর্থ—সমস্ত নরগণের বিবিধ সুখাদি-সম্পাদনকারী। অথবা সর্বনরস্বরূপ বলিয়াই তিনি বিশ্বানর। এই বিশ্বানরই বৈশ্বানর। ব্যষ্টি এবং সমষ্টির সর্বপ্রকার স্থূলদেহ হইতেই অপৃথক্ বা অভিন্নরূপেই এই বৈশ্বানর নামক আত্মা নির্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং ব্যষ্টিশরীরাভিমানী 'বিশ্ব' পৃথক্‌ভাবে উল্লিখিত হয় নাই।

৪ জাতি, দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়া—এই চারিটিই শব্দপ্রয়োগের হেতু। আত্মাতে ইহাদের কোনটিই নাই। এইজন্য আত্মা শব্দপ্রয়োগের বিষয় হন না।

সহিত অভিন্নই হয়।[৫] 'শিবম্'—আনন্দস্বরূপ ; 'অদ্বৈতম্'—দ্বৈতরহিত। [এই প্রকার] ব্রহ্মকেই ব্রহ্মবিদ্গণ [পূর্বোক্ত] চতুর্থ পাদ মনে করেন।

এইরূপে অন্যত্র কৈবল্য-উপনিষদ্ প্রভৃতিতেও অবিদ্যাবশতঃ আত্মার অবস্থাশালিত্ব এবং বস্তুতঃ তদ্ (অবস্থা-) রাহিত্য বর্ণিত হইয়াছে। বর্তমানে [আচার্য] শ্রুতিপ্রতিপাদিত ঐরূপ বিষ্ণুর স্তুতি করিতেছেন :

[মূলস্তোত্র, শ্লোক ১৬, পৃঃ ৮ দ্রষ্টব্য]।

অন্বয় : জাগ্রৎ [যঃ] স্থূলপদার্থান্ দৃষ্ট্বা, অথ স্বপ্নে মায়াং দৃষ্ট্বা, অথ সুষুপ্তৌ অপি সুখ-নিদ্রাং [দৃষ্ট্বা = অনুভূয়] ইতি তুরীয়ে আত্মানং বীক্ষ্য মুদা আস্তে, তং সংসার-ধ্বান্ত-বিনাশং হরিম্ ঈড়ে ।১৬।

স্তোত্রানুবাদ : [যে আত্মা] জাগ্রদ্-অবস্থাযুক্ত হইয়া স্থূল পদার্থসমূহ দেখেন, অনন্তর স্বপ্নে মায়া [-ময় পদার্থসমূহ] দেখেন এবং তাহার পর সুষুপ্তিতে সুখনিদ্রা অনুভব করেন ;—এইপ্রকার আত্মাকে যিনি তুরীয় অবস্থায় অপরোক্ষরূপে জানিয়া আনন্দে অবস্থান করেন, সংসারের [কারণীভূত অজ্ঞান-] অন্ধকার-বিনাশকারী সেই হরিকে বন্দনা করি। ১৬।

টীকানুবাদ : **জাগ্রৎ** ইত্যাদি। **জাগ্রৎ**—জাগ্রদবস্থায় বর্তমান [থাকিয়া] যিনি পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের কার্যরূপ **স্থূলপদার্থান্**—স্থূলপদার্থসমূহ **দৃষ্ট্বা**—অনুভব করিয়া, **অথ**—তদনন্তর **স্বপ্নে মায়াং**—স্বপ্নকালে [মায়াজনিত] বাসনাময় মিথ্যা রথ-গজাদিরূপ [বস্তুসকল] **দৃষ্ট্বা**—অনুভব করিয়া, **সুষুপ্তৌ**—সুষুপ্তিকালে **সুখনিদ্রাং**—স্বরূপসুখের অভিব্যঞ্জক কেবল অজ্ঞান অনুভব করিয়া [থাকেন], অবিদ্যাদশাতে [অবস্থাত্রয়ে] **ইতি**—এই প্রকার **আত্মানং**—আত্মাকে **তুরীয়ে**—তুরীয় স্থানে অর্থাৎ সমাধি-অবস্থায় কেবল স্বস্বরূপে **বীক্ষ্য মুদা আস্তে**—অপরোক্ষরূপে অনুভব করিয়া আনন্দে অবস্থান করেন অর্থাৎ স্বাত্মানন্দের অনুভব-জনিত সন্তুষ্টির সহিত অবস্থান করেন, **তম্**—তাঁহাকে (সংসারের কারণীভূত অজ্ঞান-অন্ধকার-বিনাশকারী সেই হরিকে) [বন্দনা করি]—ইহাই অর্থ ।১৬।

[ক্রমশঃ]

৫ মিথ্যাজ্ঞানের স্থলে একটি সত্য বস্তুতে কল্পিত অন্য বস্তুর আরোপ হয়। সত্য বস্তুটিকে অধিষ্ঠান বলে। অধিষ্ঠানের অপরোক্ষ জ্ঞান হইলেই আরোপিত বস্তুর অভাব ঘটে। কিন্তু ঐ অভাব অধিষ্ঠান হইতে অতিরিক্ত বস্তু নহে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রজ্জুসর্পজ্ঞানের স্থলে অধিষ্ঠান রজ্জুর অপরোক্ষ জ্ঞান হইলেই কল্পিত সর্পের অভাব হয়, কিন্তু ঐ অভাব রজ্জুর অতিরিক্ত বস্তু নহে। কল্পিত বস্তুর অভাবকে যথার্থ বস্তু অধিষ্ঠানের অপেক্ষা অতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার করিলে কল্পিত প্রপঞ্চের অভাব অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মের অতিরিক্ত হইয়া পড়িবে এবং তাহার ফলে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের হানি হইবে।

কঠোপনিষৎ প্রসঙ্গ

স্বামী ভূতেশানন্দ*

প্রথম অধ্যায় শেষ হয়েছে। নচিকেতা আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলেন। যমরাজ আত্মতত্ত্ব উপদেশ করেছেন। এখন কিজন্য মানুষের আত্মজ্ঞান হয় না—আত্মা সর্বদা আমাদের অন্তরতম হলেও কেন আমরা তাঁকে যথাযথ স্বরূপে উপলব্ধি করি না, প্রতিবন্ধক কি, সেই কথা বলছেন। কেন বলছেন?—না, প্রতিবন্ধক কি, তা জানলে সেই প্রতিবন্ধক দূর করা সহজ হয়। আমরা যদি জানতে পারি ঠিক কোন্‌খানে আটকাচ্ছে, তা হ'লে বাধাটি অপসারণ করা সম্ভব হয়। যতক্ষণ প্রতিবন্ধক থাকে, ততক্ষণ আত্মজ্ঞানের আলোচনায় বিশেষ কোন লাভ হয় না। যেমন সাধারণ ক্ষেত্রে দেখা যায়, আমরা বড় বড় তত্ত্ব আলোচনা করি, কিন্তু সেই তত্ত্ব আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। খালি আমরা বলি বা শুনি, কিন্তু তার দ্বারা কোনভাবে প্রভাবিত হই না। প্রতিবন্ধকরূপী কারণটি যদি জানি, তা হ'লে সেই কারণটি দূর করবার জন্য চেষ্টা হোতে পারে, যাতে তত্ত্বটি আমাদের হৃদয়ে অধিরূঢ় হয়, যাতে আমরা সেই তত্ত্বের দ্বারা সমস্ত জীবনটিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি। এইজন্য আমাদের বাধা কোন্‌খানে তা জানা দরকার। সেই কথাই বলবার জন্য যমরাজ বলছেন:

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ-
স্তস্মাৎ পরাঙ্‌ পশ্যতি নান্তরাত্মন্‌।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্‌
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্‌॥ (২।১।১)

এই শ্লোকটি খুব প্রসিদ্ধ।

স্বতন্ত্র ভগবান, পরমেশ্বর, যিনি অপরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে জন্মগ্রহণ করেন না। অর্থাৎ, যাঁর কোন কারণাধীন উৎপত্তি নেই—স্বয়ং উৎপন্ন হন যিনি। অর্থাৎ নিত্য যিনি। সেই স্বয়ম্ভূ কি করেছেন?—না, 'খানি'—ইন্দ্রিয়সমূহকে 'পরাঞ্চি'—বহির্মুখ ক'রে 'ব্যতৃণৎ'—তাদের হিংসা করেছেন, অর্থাৎ তাদের সর্বনাশ করেছেন। 'খ' মানে আকাশ, অবকাশ। কর্ণেন্দ্রিয়ে যে গহ্বর, যে আকাশ বা অবকাশ রয়েছে তার জন্য 'খ' শব্দটির অর্থ কর্ণেন্দ্রিয়। 'খানি' বলায় অর্থাৎ 'খ' শব্দটি বহুবচনে প্রয়োগ করায় সব ইন্দ্রিয়গুলিকেই বোঝানো হয়েছে। ইন্দ্রিয়গুলিকে স্বয়ম্ভূ 'পরাঞ্চি' ক'রে বহির্মুখ ক'রে সৃষ্টি করেছেন। 'পরাঞ্চি'—পরা অঞ্চতি ইতি পরাচ্‌; বহুবচনে 'পরাঞ্চি' (এখানে দ্বিতীয়া বিভক্তিতে)। যা বাইরের দিকে যায়, তাকে বলে 'পরাচ্‌'। বহির্মুখ আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি—বাইরের দিকে তাদের গতি। সুতরাং, 'পরাঙ্‌ পশ্যতি'—বাইরের জিনিসই জীব দেখে। তার ইন্দ্রিয়গুলি দিয়ে যা কিছু অনুভব করে, সেগুলি সব বাহ্য বস্তু। 'ন অন্তরাত্মন্‌'—অন্তরাত্মাকে নয়। অন্তরাত্মাকে দেখে না—অন্তরাত্মার দিকে ইন্দ্রিয়ের গতি নেই। তাদের গতি হচ্ছে তদ্‌বিপরীত দিকে, বাইরের দিকে। 'বাইরের দিকে'—কথাটি স্পষ্ট বুঝতে হবে আমাদের। অন্তরতম হলেন আত্মা। সেই আত্মার অপেক্ষায় অনাত্ম যত কিছু সবই বাইরের। যা কিছু,—এমন কি মন পর্যন্ত সেই আত্মার বাইরে ব'লে বাইরের দিকে

* রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ (ভাইস্‌-প্রেসিডেন্ট)।

তার গতি। ভিতরে যিনি রয়েছেন, সেই আত্মাকে ছেড়ে বাহ্য বস্তুকেই মানুষ দেখে। 'ন অন্তরাত্মন্'— অন্তরাত্মাকে দেখে না। 'অন্তরাত্মানম্' হওয়া উচিত, কিন্তু বৈদিক সংস্কৃত ব'লে 'অন্তরাত্মন্' বলা হয়েছে।

এখন আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি কোন্‌খানে আমাদের বাধা। আগেই বলেছি, বাধা কোথায় জানলে, তা অপসারণ করবার চেষ্টা আমাদের হোতে পারে। তাই বাধা কোথায় প্রথমেই উল্লেখ ক'রে দিচ্ছেন। কোথায় বাধা? এইখানে বাধা যে, ইন্দ্রিয়গুলি সব বহির্মুখ। বাইরের দিকে তাদের গতি। সেই জন্য জীব অন্তরাত্মাকে দেখে না। অন্তরাত্মা হলেন অন্তরতম। তাঁর থেকে বাহ্য হ'ল অন্তঃকরণ। তার থেকে বাহ্য হ'ল অন্য ইন্দ্রিয়গুলি। তাদের থেকে বাহ্য হ'ল বিষয়গুলি। এই সব গতি হচ্ছে বাইরের দিকে। ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়াভিমুখী, আত্মাভিমুখী নয়। এই আত্মাভিমুখী না হওয়ার জন্য, বাহ্য বস্তুর দিকে তাদের গতি ব'লে, জীব বাহ্য বস্তুকেই দেখে, অন্তরাত্মাকে দেখে না।

অন্তরাত্মাকে দেখবার তা হ'লে উপায় কী? উপায়ের কথা বলছেন: 'কশ্চিৎ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানম্ ঐক্ষৎ'—বিরল কোন ধীর ব্যক্তি, ধীমান বিবেকী ব্যক্তি, অন্তরাত্মাকে দেখে-ছিলেন। 'ঐক্ষৎ' মানে দেখেছিলেন। দেখে-ছিলেন মানে দেখেন, কারণ বেদে কালের নিয়ম নেই—বর্তমান কাল বোঝাতেও অতীতকালের প্রয়োগ হয়। 'কশ্চিৎ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানম্ ঐক্ষৎ' —বিরল কোন বিবেকী ব্যক্তি প্রত্যগাত্মাকে দেখেন। কী ভাবে দেখেন? 'আবৃত্তচক্ষুঃ'—চক্ষুর মোড় ফিরিয়ে, দৃষ্টি ফিরিয়ে, বিষয় থেকে নিবৃত্ত ক'রে আত্মার দিকে প্রবৃত্ত ক'রে। 'চক্ষু' বলতে সব ইন্দ্রিয়ই। উপলক্ষণে 'চক্ষু' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্মুখীনতা থেকে নিবৃত্ত ক'রে তাদের অন্তর্মুখী ক'রে আত্মাভিমুখী করতে হয়। করলে অন্তরাত্মাকে দেখা যায়। লাভ কি তাতে? বলছেন, 'অমৃতত্বম্ ইচ্ছন্'—অমৃতত্বের আকাঙ্ক্ষা ক'রে। অর্থাৎ যদি অমৃতত্ব চাও, যদি অমর হোতে চাও, তা হ'লে তোমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্মুখীনতা থেকে নিবৃত্ত ক'রে অন্তর্মুখীন করো। ইন্দ্রিয়গুলির বহির্মুখীনতা হ'ল কারণ আত্মাকে না জানার। এই হ'ল প্রতিবন্ধক আত্মদর্শনে।

ইন্দ্রিয়গুলির বহির্মুখীনতা দূর হ'লে আত্ম-দর্শন হয়। প্রশ্ন হতে পারে—কী প্রকারে হয়? এর উত্তর হচ্ছে এই যে, ইন্দ্রিয়গুলি বাহ্য বিষয় থেকে নিবৃত্ত হ'লে অন্তঃকরণ শান্ত হয়—তরঙ্গ-রহিত হয়। ইন্দ্রিয়গুলির বহির্মুখী গতিই অন্তঃকরণকে সর্বদা চঞ্চল ক'রে রেখেছে, তাকে সর্বদা তরঙ্গায়িত করছে। তাই ইন্দ্রিয়গুলি বাহ্য বস্তু থেকে নিবৃত্ত হ'লে অন্তঃকরণ শান্ত হয়—তরঙ্গরহিত হয়। তখন আত্মবস্তু স্বতঃ-প্রতীত হন। স্বপ্রকাশ আত্মবস্তুকে প্রকাশ করবার জন্য কোন আলোর দরকার হয় না—ইন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণ তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না। অন্তঃকরণ স্থির হলেই তিনি স্বয়ং প্রকাশিত হন।

একটি উপমা দেওয়া হয়। অন্তঃকরণ যেন একটি হ্রদ। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ—বিষয়গুলি যেন ঢিল। ইন্দ্রিয়গুলি অন্তঃকরণরূপী হ্রদে বিষয়রূপী ঢিল ক্রমাগত ছুঁড়ছে। ফলে অন্তঃ-করণরূপী হ্রদে ক্রমাগত বিষয়াকারা-বৃত্তিরূপী তরঙ্গ উঠছে। হ্রদের তলদেশে যেন আত্মা রয়েছেন। ক্রমাগত তরঙ্গ ওঠায় আত্মাকে দেখা যাচ্ছে না। সুতরাং উপায় কী? এক-মাত্র উপায় হ'ল অন্তঃকরণের এই যে সর্বদা তরঙ্গায়িত অবস্থা, তার থেকে তাকে নিবৃত্ত

করা—অন্তঃকরণের বৃত্তিগুলিকে নিরোধ করা। অন্তঃকরণের বৃত্তিগুলি নিরুদ্ধ হ'লে শান্ত হ্রদে আত্মছবি প্রকাশিত হবে। অন্তঃকরণের বৃত্তিগুলি নিরুদ্ধ করতে হ'লে— হ্রদটি নিস্তরঙ্গ করতে হ'লে, ইন্দ্রিয়গুলির ঢিল ছোঁড়া বন্ধ করতে হবে। মনে রাখতে হবে এগুলি figurative—রূপক মাত্র ; এই ভাবে কল্পনা ক'রে বুঝে নিতে হবে। কারণ, বাস্তবিক অন্তঃকরণ ব'লে একটি হ্রদ নেই। আর বিষয়গুলি ঢিল, পাথর কিছু নয়।

আমরা এখন উপমা বাদ দিয়ে তত্ত্ব কি আবার বোঝবার চেষ্টা করি। আত্মাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না, তার বদলে নানান রকম বিষয়কে দেখছি, অনুভব করছি—যে-বিষয়ের সমষ্টিকে এককথায় বলতে পারি পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিষয়—শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ। এই শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এবং তাদেরই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে সুখ, দুঃখ--আরো হাজারো রকম যে অন্তঃকরণের বৃত্তি, সেই বৃত্তিগুলি আমাদের এত ব্যাপৃত ক'রে রেখেছে, এত আমরা তাদের দ্বারা preoccupied হয়ে রয়েছি যে, সেই বৃত্তিগুলির পারে যে বস্তু তাকে শান্তভাবে দেখবার সামর্থ্য আমাদের নেই। যদি বৃত্তিগুলি শান্ত হয়ে যায়, তা হ'লে এদের পারে যে বস্তুটি আছে, সেই আত্মবস্তুটিকে অনুভব করবো। পারে আছে মানে কী? সর্বব্যাপী আত্মা যে এদের থেকে দূরে আছেন, তা নয়। সর্বব্যাপী আত্মা সর্বত্রই আছেন, কিন্তু তাঁকে আমরা বোধে বোধ করতে পারছি না। কারণ, আমাদের অন্তঃকরণ অন্য বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত হয়ে আছে। আমরা যেমন বলি, 'অন্যত্রমনা অভূবম্ নাশ্রৌষম্ ; অন্যত্রমনা অভূবম্ নাদ্রাক্ষম্'—অর্থাৎ অন্যমনস্ক ছিলুম, (তাই) শুনিনি ; অন্যমনস্ক ছিলুম (তাই) দেখিনি। এই যে মনের অন্যদিকে থাকা, এইটি হচ্ছে আত্মাকে অনুভূতি করবার প্রতিবন্ধক। আত্মাকে অনুভূতি করতে হ'লে মনের এই যে অন্যদিকে গতি, তাকে নিবৃত্ত করতে হবে। আর তা করতে হলে ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় থেকে নিবৃত্ত করতে হবে। তাই ক্রম হচ্ছে এই যে, আগে ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় থেকে নিবৃত্ত করতে হবে। তার পরে অন্তস্তরঙ্গ যেগুলি, সেগুলিকেও শান্ত করতে হবে। তার ফলে স্থির মনে আত্মবস্তুর স্বরূপ অভিব্যক্ত হবে। আগেই বলেছি 'আবৃত্তচক্ষুঃ' হওয়া মানে ইন্দ্রিয়গুলির বহির্মুখীনতা থেকে তাদের নিবৃত্ত করা। আমরা একথা বলছি ন যে, ইন্দ্রিয়গুলিকে আত্মাতে নিবিষ্ট করতে হবে। কারণ, আত্মাতে তাদের প্রয়োগ হোতে পারে না। ইন্দ্রিয়গুলি কখনো আত্মাকে গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু বিষয় থেকে নিবৃত্তি তাদের দরকার। বিষয় থেকে নিবৃত্তি যদি না হয়, তা হ'লে অন্তঃকরণে স্থিরতা আসবে না। অন্তঃকরণ যদি স্থির না হয়, তা হ'লে ব্রহ্মাকারা বৃত্তিও সেখানে উঠবে না এবং ব্রহ্মাকারা বৃত্তি যদি না হয়, তা হ'লে অজ্ঞানের বিনাশ হবে না। সুতরাং, অজ্ঞানের বিনাশের জন্য ব্রহ্মাকারা বৃত্তির দরকার। অর্থাৎ, এককথায় ব্রহ্মকে ধারণা করা দরকার। ব্রহ্মকে ধারণা করতে হ'লে মনের চঞ্চলতার নিবৃত্তি দরকার। মনের চঞ্চলতা নিবৃত্ত করতে হ'লে বিষয়াভিমুখী গতি তার বন্ধ করতে হবে।

এখন এই যে মনের বিষয়াভিমুখী গতি বন্ধ করা, এর উপায় কিন্তু এ নয় যে, ইন্দ্রিয়গুলিকে মেরে ফেলা বা কোন বাহ্য প্রক্রিয়ার দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলির কাজ বন্ধ ক'রে দেওয়া। কানে তুলো দিলুম, চোখ ঠুলি দিয়ে বন্ধ করলুম—এইভাবে যদি শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ বর্জন করতে চেষ্টা করি তা হ'লে কী হবে? গীতায় ভগবান বলেছেন, 'বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ

রসবর্জম্' (২।৫৯)।—বিষয়গুলি গ্রহণ করছেন না, এমন যে ব্যক্তি, তাঁর বিষয়গুলি নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু রসবর্জিত হয়ে অর্থাৎ তাঁর বিষয়রস—বিষয়ের প্রতি আসক্তি, আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা থেকেই যায়। সুতরাং বিষয়ের নিবৃত্তি হ'লেই যে সব হবে, তা নয়। সরষের ভেতরেই ভূত রয়েছে। অন্তঃকরণের ভেতরেই কত রকমের বৃত্তি, কত রকমের তরঙ্গ উঠছে, যে তরঙ্গগুলির তুলনায় বাহ্য বিষয়ের দ্বারা উপস্থাপিত তরঙ্গগুলি কিছুই নয়। অনন্ত প্রবাহ সেখানে চলছে, তার নিরোধের উপায় কী? আমরা যদি ইন্দ্রিয়-গুলিকে মেরেও ফেলি—চোখকে একেবারে কানা করে দিই, কানকে ছেঁদা করে দিই—জানি না সবটা পারবো কি না, জিভকে কেটে ফেলতে পারবো কি না—তারপর ত্বক্-ইন্দ্রিয় সমস্তশরীরব্যাপী, তাকেই বা কী ক'রে বন্ধ করবো!—তবু ক্ষতি ছাড়া লাভ কিছু হবে না। আশ্চর্যের বিষয়, আমাদের মন এমন স্থূল বিষয় গ্রহণে অভ্যস্ত যে, কখনো কখনো সাধকরাও—এরকম শোনা যায়—ইন্দ্রিয়গুলিকে সত্যি সত্যি মেরে ফেলেন। চেষ্টা করেন তার দ্বারা বিষয়ের নিবৃত্তি করতে। তীব্র বৈরাগ্য না থাকলে এরকম হয় না, কিন্তু তাঁদের চিন্তাটা বিপরীত-মুখী। তাঁরা ভাবেন, ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের শত্রুতা করছে; ইন্দ্রিয়গুলির বিনাশ করি। বিনাশ করার কথা শাস্ত্র বলেননি। বলেননি এই জন্য যে, তাদের বিনাশ করলেই যে তারা অন্তর্মুখীন হবে, এমন কোন কথা নেই। এটা সাধনার দ্বারা লভ্য, এই অবস্থাটি। বাহ্য কোন প্রক্রিয়ার দ্বারা বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করলে, সে চেষ্টা কখনো সফল হবে না। কারণ, ঐ যা বলেছেন, রসের নিবৃত্তি হবে না। রস অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা, বাসনা যা অন্তঃকরণে ক্রমাগত তরঙ্গ তুলছে, যা থাকার জন্যই বিষয়গুলি আমাদের শত্রু, যা না থাকলে বিষয় হাজার থাকলেও শত্রুতা করবার মত সামর্থ্য তাদের থাকে না। সুতরাং বাসনার নিবৃত্তি হ'ল সবচেয়ে বড় কথা। কিন্তু আমাদের স্থূল বুদ্ধিতে কখনো কখনো আমরা বাহ্য ইন্দ্রিয়-গুলিকেই নিঃশেষ করবার চেষ্টা করি। ক'রে শরীরটাকে খালি পঙ্গু ক'রে দিই। কিন্তু তার দ্বারা কখনো বস্তুলাভ হয় না, এটি আমাদের মনে রাখা দরকার; শাস্ত্র সেই কথাই বলেছেন। শাস্ত্র ইন্দ্রিয়গুলিকে হত্যা করতে বলেননি। ইন্দ্রিয়গুলিকে 'আবৃত্ত' করতে বলেছেন। বিষয়াভিমুখীনতা থেকে তাদের নিবৃত্ত করতে বলেছেন। যখন নিবৃত্ত করতে পারি না, তখন মনে করি যে, এদের শেষ ক'রে দিই তা হ'লে। এরকম আছেন, যাঁরা নিজেদের একটা গুহার মধ্যে বন্ধ ক'রে রেখে সম্পূর্ণ বাহ্য বিক্রিয়া থেকে বেঁচে গেলুম মনে করেন। কিন্তু তা ক'রেও অন্তরের ভেতরে যে বিক্রিয়া রয়েছে, তা থেকে পরিত্রাণ নেই। একজন সাধকের কথা। তিনি খুঁজছিলেন খুব নির্জন একটা জায়গা, যেখানে কোনরকম বিক্ষেপের কারণ না থাকে। খুঁজে খুঁজে শহরে তো পেলেনই না, গ্রামে গেলেন। সেখানেও পাচ্ছেন না; অরণ্যে গেছেন, অরণ্যেও পাচ্ছেন না। চারিদিকে নানান রকম বিক্ষেপ অরণ্যেও রয়েছে। খুঁজে খুঁজে শেষে একটি গুহা বার করেছেন। সেই গুহার ভেতরে ঢুকে গেছেন; ঢুকে গিয়ে ভাবছেন, 'বাঃ, জায়গাটি বেশ! শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ কিছুই আমাকে ব্যতিব্যস্ত করবে না; নিশ্চিন্ত হলুম।' এই ভেবে সেখানে আসন ক'রে বসে চেষ্টা করছেন ধ্যান করতে। সেই সময় দেখেন গুহার মুখে কতকগুলো পাখী কচ্‌কচ্‌ করছে। 'দূর, এখানেও হ'ল না।'—এই ব'লে বিরক্ত হয়ে তিনি গুহা থেকে বেরিয়েছেন, এমন সময়ে

আর একজন সাধুর সঙ্গে দেখা। সাধুটি বললেন, 'কি ভাই, কোথায় যাচ্ছ?' সাধকটি বললেন, 'আর বলেন কেন! আমি একটা জায়গা খুঁজছি, যেখানে কোন বিক্ষেপ না থাকে। ভাবলুম এই গুহার মধ্যে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে বসবো, এখানেও দেখি পাখী কচ্‌কচ্‌ করছে।' সাধু হেসে বললেন, 'ভাই, মনের কচ্‌কচানি থামাও।'

এই মুশকিল আমাদের! সমস্ত ইন্দ্রিয়কে নিবৃত্ত করলেও মনের কচ্‌কচানির নিবৃত্তি হয় না। সে জন্ম জন্ম ধ'রে কত রকমের সংস্কারের পুঁটলি সঞ্চয় ক'রে রেখেছে—অফুরন্ত ভাণ্ডার। সেই ভাণ্ডারে ক্রমাগতই নানান রকমের ফুট উঠছে। তার থেকে নিবৃত্তি নেই, এক মুহূর্তের জন্য শান্তি নেই। সুতরাং, আগেই যা বলা হ'ল, ইন্দ্রিয়গুলিকে মেরে ফেলা বা বাহ্য কোন প্রক্রিয়ার দ্বারা তাদের কাজ বন্ধ করাটা উপায় নয়। উপায় হ'ল 'আবৃত্তচক্ষুঃ' হওয়া। এর অন্তিম তাৎপর্য হ'ল, মনকে আত্মবস্তুতে কেন্দ্রীভূত করতে হবে। আসল কৌশল হচ্ছে এইখানে। এইজন্য ইন্দ্রিয়গুলির বিনাশ করার কথা বলেননি, ইন্দ্রিয়গুলিকে 'আবৃত্ত' করার কথা বলেছেন। এই কথা আমাদের মনে রাখতে হবে।

তারপর বলেছেন, এই রকম ক'রে যদি আমরা মনের বৃত্তিগুলিকে শান্ত করতে পারি, মনকে ধ্যেয় বস্তুতে একাগ্র ক'রে যদি আমরা আত্মসংস্থ হোতে পারি, তাতে লাভ কী হবে। আমরা সব সময়ে লাভক্ষতি হিসেব ক'রে, খতিয়ে দেখে কাজ করি। তাই লাভের কথা বলা দরকার। বলছেন, অমৃতত্ব লাভ হবে। অমৃতত্বের বিপরীত হ'ল মৃতত্ব। সেটা কী রকম?—না, আত্মাকে ভুলে থাকা। আমরা মরে আছি, কারণ আত্মাকে ভুলে আছি। এই যে আমাদের স্বরূপকে ভোলা, তাকে আমাদের মন থেকে বহিষ্কার ক'রে দিয়ে বাহ্য বস্তুকে নিয়ে ব্যাপৃত থাকা—এরই নাম মৃত্যু। আত্মা হলেন অমৃতস্বরূপ। আত্মাতে স্থিতিই হ'ল অমৃতত্ব। আর কিছু অমরত্ব নয়। দেবতাদের অমরত্ব এখানে লক্ষ্য নয়, কারণ তা আসল অমরত্ব নয়। দেবতারা হয়তো দীর্ঘজীবী হন, কিন্তু তাঁরা অমর নন। আমাদের অনুভবগম্য যা কিছু আছে, তার ভেতরে অমর কেউ বা কিছু নেই—এক আত্মা ছাড়া। সুতরাং, আত্ম-স্বরূপকে জানলে, তাতে প্রতিষ্ঠিত হ'লে আর মৃত্যু আমাদের আক্রমণ করতে পারে না। শরীরের যে নাশ, তা মৃত্যু নয়। অথচ মৃত্যু সব জায়গায় ইহলোকে এবং স্বর্গাদি লোকেও, কেননা সব জায়গায় আত্মবিস্মৃতি রয়েছে। আর আত্মার সম্বন্ধে সর্বদা অবহিত থাকা, আত্মাতে স্থিত হয়ে থাকা, এরই নাম অমরত্ব।

সুতরাং, এই অমৃতত্বকে যদি আমরা ইচ্ছা করি, তা হ'লে, আগে যে প্রণালীর কথা বলা হ'ল, তা অবলম্বন করতে হবে। ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় থেকে প্রত্যাহৃত ক'রে, বিষয়াভিমুখীনতা থেকে মনকে নিবৃত্ত ক'রে তাকে আত্মাতে কেন্দ্রীভূত করতে চেষ্টা করতে হবে। অন্তঃকরণে—আমরা আগেই যা বলেছি—ব্রহ্মাকারা বৃত্তি উঠছে না, কারণ, হাজারো রকমের অন্য বৃত্তি তাকে চঞ্চল ক'রে রেখেছে। সেই সমস্ত চঞ্চলতা দূর করতে পারলে তবে ব্রহ্মাকারা বৃত্তি হওয়া সম্ভব এবং সেই ব্রহ্মাকারা বৃত্তির দ্বারাই অজ্ঞানের সমূলে বিনাশ হয়; হওয়ার ফলে বিক্ষেপের কারণ আর কিছু থাকে না। আমাদের মনে রাখতে হবে, বিক্ষেপের কারণটি নাশ করতে হবে। সুষুপ্তিতে আমাদের বিক্ষেপ থাকে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা সে অবস্থায় আত্মসংস্থ হোতে পারি না। কারণ, সেখানে

বিক্ষেপ না থাকলেও বিক্ষেপের কারণ রয়ে যাচ্ছে। বিক্ষেপের বীজ সেখানে নষ্ট হচ্ছে না। এই বিক্ষেপের বীজ দূর হবে কখন?—যখন অজ্ঞানের নিবৃত্তি হবে। অজ্ঞানের নিবৃত্তি হবে কী ক'রে?—জ্ঞানের দ্বারা। জ্ঞান বলতে এখানে— অদ্বৈতবেদান্তীরা বলেন— ব্রহ্মাকারা বৃত্তি। ব্রহ্মাকারা বৃত্তিটি উৎপন্ন হ'লে তার দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হবে—অজ্ঞান এবং তৎকার্য যা কিছু, সবেরই নিবৃত্তি হয়ে যাবে। অজ্ঞান বিনষ্ট হলে তখন যা থাকে তা-ই থাকে অর্থাৎ, এক আত্মাই থাকেন; যিনি সর্বদাই রয়েছেন।

আত্মার স্বরূপকে বোঝাবার জন্য উপনিষদ্ *'প্রত্যগাত্মা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ঐ যে 'পরাঞ্চি' শব্দটির অর্থ করতে 'পরা' শব্দের উল্লেখ* করেছি, তার বিপরীত হ'ল—'প্রতি'। 'প্রতি অঞ্চতি ইতি প্রত্যক্'—এখানে অঞ্চতি মানে 'জানাতি' অর্থাৎ জানেন। যা বাইরের দিকে যায় অর্থাৎ অনাত্ম বস্তুতে—বিষয়ের দিকে যায়, তা পরাচ্। আর যিনি ভিতরের বস্তুকে —আত্মাকে অর্থাৎ নিজেকেই জানেন তিনি প্রত্যক্। প্রত্যক্ এমন যে আত্মা, তা-ই প্রত্যগাত্মা। স্বপ্রকাশ নিত্য বস্তু তিনি। 'পরাচ্' আর 'প্রত্যক্' দুটি পরস্পর বিপরীত শব্দ। ইন্দ্রিয়গুলি 'পরাঞ্চি', আত্মা 'প্রত্যক্'। ভাষ্যকার শংকর বলেছেন, 'প্রত্যক্' অর্থাৎ ভিতরের বস্তুতেই 'আত্মা' শব্দটি 'রূঢ়' অর্থাৎ প্রসিদ্ধ, অন্য বস্তুতে নয়। তিনি আরও বলেছেন, যে 'আত্মা' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থও 'প্রত্যক্'। এই ব'লে যে-শ্লোকটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তার উল্লেখ আমরা আগে অন্যত্র করেছি। শ্লোকটি হ'ল:

যচ্চাপ্নোতি যদাদত্তে যচ্চাত্তি বিষয়ানিহ।
যচ্চাস্য সন্ততো ভাবস্তস্মাদাত্মেতি কীর্ত্যতে॥

এটি খুব প্রসিদ্ধ শ্লোক। একসঙ্গে 'আত্মা' শব্দের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা এতে দেওয়া হয়েছে। 'যৎ আপ্নোতি'—'ব্যাপ্নোতি'—যা ব্যেপে থাকে, 'যৎ আদত্তে'—যা আদান করে, গ্রহণ করে অর্থাৎ সমস্ত বস্তুকে নিজেতে উপসংহার করে, 'যৎ অত্তি বিষয়ান্ ইহ'—যা এই দেহে বা ইহজগতে বিষয়সমূহকে ভোগ করে, 'যচ্চাস্য সন্ততো ভাবঃ'— আর যার 'ভাব' অর্থাৎ সত্তা 'সন্তত' অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন, তাকে 'আত্মা' বলে। 'আত্মা' মানে 'আমি'। 'আমি' কী রকম? না, আমি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, আমি নিজেতে সকলের উপসংহারক, আমি কর্তা-ভোক্তা-রূপে বিষয় ভোগ করি, আমি অবিচ্ছিন্ন সত্তা। [*এখানে 'আপ্', 'আ'-পূর্বক 'দা', 'অদ্' ও 'অত্'—এই চারটি ধাতুর প্রত্যেকটির* উত্তর 'মন্' প্রত্যয় ক'রে 'আত্মন্' শব্দটির ব্যুৎপত্তি চার রকমে দেখানো হয়েছে ঐ চারটি অর্থে। প্রথম তিনটি ধাতুর স্পষ্ট উল্লেখ শ্লোকটিতে আছে। চতুর্থ ধাতুটির স্প. উল্লেখ নেই—অর্থ থেকে বুঝে নিতে হবে। অততি- যা সর্বদা গমন করে বা যার প্রাপ্তি সর্বদা]।

আর অন্যভাবে যখন আত্মাকে বুঝি, তখন কোন একটা সম্বন্ধ সৃষ্টি ক'রে তার দ্বারা আত্মাকে বুঝি, যেমন এই শরীরকে আত্মা বলা হয়। আত্মধর্ম শরীরে আরোপিত হচ্ছে। তাই এই শরীরটাকে চেতন মনে করছি। এই কারণে শরীরটাকে 'আত্মা' বলে। ইন্দ্রিয়-গুলিকেও 'আত্মা' বলে, ঐ একই কারণে। আত্মস্বরূপের এই বিভিন্ন প্রকারের যে ভ্রান্ত অনুভূতি আমাদের হচ্ছে, সব অনুভূতিরই পেছনে কিন্তু এই তত্ত্ব অনুস্যূত রয়েছে যে, আত্মা হচ্ছেন 'অনুচ্ছিত্তিধর্মা' অর্থাৎ যার বিনাশ নেই, যা অবিনাশী সত্তা। তাকেই 'প্রত্যগাত্মা' বলে। 'প্রত্যগাত্মা' শব্দটি কখনো দেহেন্দ্রিয়াদির

অর্থে প্রযুক্ত হয় না। তাই ভাষ্যকার বলেছেন, 'ব্যুৎপত্তিপক্ষে অপি তত্রৈব আত্মশব্দঃ বর্ততে'—ব্যুৎপত্তিগত অর্থেও 'আত্মা' শব্দটি 'প্রত্যক্' অর্থই প্রতিপাদন করে।

এই আত্মাকে জানতে হ'লে 'আবৃত্তচক্ষুঃ' হোতে হবে, এই কথা বললেন। তা যদি না হই, তা হ'লে কি হবে, সেই কথাই এখন বলছেন :

পরাচঃ কামাননুযন্তি বালা-
স্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে॥

(২।১।২)

'বালাঃ'—যারা বালকবুদ্ধি, নির্বোধ, যারা বোঝে না, যারা অবিবেকী, যাদের বিবেকের শক্তি নেই, তারা কী করে? 'পরাচঃ কামান্ অনুযন্তি'। 'পরাচঃ'—বাহ্য, 'কামান্'—বিষয়-সমূহ, 'অনুযন্তি'—অনুসরণ করে। অনু পশ্চাৎ যন্তি, গচ্ছন্তি—বিষয়ের পেছনে পেচনে তারা ছোটে। তারা কোথায় গিয়ে পৌছায়? 'তে যন্তি মৃত্যোঃ বিততস্য পাশম্'—তারা মৃত্যুর যে পাশ, যে বন্ধন, যা বিতত অর্থাৎ বিস্তৃত হয়ে রয়েছে, তার ভেতরে গিয়ে পড়ে। সুন্দরভাবে এখানে বলছেন, বিষয়ের পশ্চাদ্ধাবন করলে, কামনার বশবর্তী হয়ে বিষয়ের পেছনে পেছনে লে, বিষয়ের দ্বারা প্রেরিত হয়ে চললে ফল কী হয়। মৃত্যু তার চারদিকে যেন জাল ছড়িয়ে রেখেছে, সেই জালের মধ্যে গিয়ে পড়তে হয়। আমরা যখন বিষয়ের অনুসরণ ক'রে চলি, তখন ভেবেও দেখি না যে, আমরা মৃত্যুর অনুসরণ করছি। অথচ হচ্ছে তাই। পুকুরে চার ফেলে ছিপ দিয়ে অথবা জাল দিয়ে মাছ ধরে। মাছগুলো চারের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে জড়ো হয়, তারা জানে না যে, মৃত্যু সেখানে রয়েছে। তারা মৃত্যুর মুখে ছুটছে না জেনে। মনে করছে কি আনন্দ, কেমন গন্ধ, কত কি খাদ্য ওখানে আছে। এই ভেবে ছুটছে সেখানে। কিন্তু পরিণাম কী হচ্ছে?—জালেতে আবদ্ধ হয়ে তারা মৃত্যুগ্রস্ত হচ্ছে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই কথা বুঝে বিষয়ের অনুসরণ থেকে নিবৃত্ত হবেন।

অবিবেকীদের কথা বললেন। এখন বিবেকীদের কথা বলছেন : 'অথ ধীরাঃ অধ্রুবেষু ধ্রুবম্ অমৃতত্বং বিদিত্বা ইহ ন প্রার্থয়ন্তে'। 'অথ'—এইহেতু, 'ধীরাঃ'—বিবেকীরা, 'অধ্রুবেষু'—অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে, 'ধ্রুবং অমৃতত্বং বিদিত্বা'—প্রত্যগাত্মস্বরূপে অবস্থানরূপ অমৃতত্বই যে ধ্রুব অর্থাৎ নিত্য, একথা জেনে 'ইহ ন প্রার্থয়ন্তে'—এই সংসারে কিছুই প্রার্থনা করেন না, আকাঙ্ক্ষা করেন না।

আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করছি কি ক'রে জাগতিক সুখকে চিরকাল ধরে রাখবো। ভুলে যাচ্ছি যে, এই করতে গিয়ে আমরা মৃত্যুর পাশের মধ্যে, তার জালের মধ্যে নিজেরা আবদ্ধ হচ্ছি। জালে গিয়ে পড়ছি, মৃত্যু যেখানে অবধারিত। শব্দ-স্পর্শাদি যে সুখ, সেই সুখকে নিত্য ব'লে মনে ক'রে তার পেছনে ছুটছি। ছুটে মৃত্যুগ্রস্ত হচ্ছি। তাই শ্রুতি আমাদের এইভাবে সাবধান করছেন : 'যেও না, ও পথে যেও না; ও পথে যদি যাও, মৃত্যু তোমার অবধারিত।' কিন্তু আমাদের কানে সেই শব্দ পৌছচ্ছে না। অথবা শুনেও সেটা বিশ্বাস করছি না; বলছি, 'ওরকম ব'লে থাকে। আমরা তো দেখতে পাচ্ছি সাক্ষাৎ সুখ এখানে। এ আমরা কেন ছাড়বো? মৃত্যু তো আছেই। যতক্ষণ পারি, ভোগ ক'রে নিই।' কিন্তু বিচার ক'রে দেখলে জাগতিক সুখের অনিত্যতা স্পষ্ট

প্রতীত হয়। জিজ্ঞেস করলে অনেকেই বলবেন, হ্যাঁ, বিষয়সুখ অনিত্য। অনিত্য যদি, তা হ'লে ছুটছি কেন তার পেছনে? সদুত্তর কিছু নেই। ছোটা স্বভাব। স্বভাব কথাটার মানে আগেই বলেছেন যে, ইন্দ্রিয়দের বহির্মুখ ক'রে ভগবান যেন হিংসা করেছেন। 'প্রসাদ বলে মন দিয়েছে মনেরে আঁখি ঠারি।' যে মন আমরা পেয়েছি, তার স্বভাব হ'ল এরকম—সে বাহ্য বস্তুর দিকেই ছোটে, অন্তরাত্মার দিকে ছোটে না। সুতরাং, তাকে দোষ দিলে হবে না। সে বেচারী কী করবে? বেচারীর কী দোষ আছে?—বলছেন রামপ্রসাদ। যে ভাবেই হোক, যে কারণেই হোক, ভগবান আমাদের হিংসা করুন, আর আমরাই আমাদের হিংসা করি, যাই হোক, অবস্থা হ'ল এই যে, আমরা বিষয়াভিমুখী গতিকে বন্ধ করতে পারছি না। বন্ধ না করার জন্য বা চেষ্টাও না করার জন্য আমরা যেন সবেগে ছুটে গিয়ে মৃত্যুর কবলে পড়ছি। গীতায় ভগবান বিশ্বরূপ দেখাচ্ছেন, অর্জুন দেখছেন কি ক'রে সর্বপ্রাণী সেই কালরূপী ভগবানের মুখগহ্বরে প্রবেশ করছে। সেই কালের গ্রাসে সকলে ছুটে গিয়ে পড়ছে। নিষ্কৃতি নেই। ছুটছি আমরা সকলেই সেই এক দিকে, মৃত্যুর দিকে। এর চেয়ে বাস্তবমুখী বর্ণনা আর হোতে পারে না। সমস্ত জগৎটা ধ্বংসের দিকে ছুটে চলেছে। ভগবান বুদ্ধ এক জায়গায় বলছেন, সমস্ত জ্বলছে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড জ্বলছে। চারিদিকে আগুন। সে কী বর্ণনা! ভাবলে স্তম্ভিত হোতে হয়—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চারিদিকে জ্বলছে। জ্বলন্ত সব! কোন জায়গায় আগুনের নিবৃত্তি নেই। ধ্বংস চারিদিকে! সেই ধ্বংসময় বিশ্বে আমরা মনে করছি যে, আমরা বেশ আছি। ঠাকুর বলছেন, 'মাছগুলো জাল মুখে ক'রে পুকুরের পাঁকের ভিতরে গিয়ে চুপ ক'রে মুখ গুঁজ্ড়ে শুয়ে থাকে—মনে করে, আর কোন ভয় নেই, আমরা বেশ আছি।' অধিকাংশ মানুষেরই এই রকম ভ্রান্ত ধারণা বা বিপরীত বুদ্ধি। এই যে মৃত্যুগ্রস্ত হয়ে থাকা বা মৃত্যুর দিকে ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়া—এটি হচ্ছে বহির্মুখী গতির নামান্তর মাত্র। সুতরাং বিপরীত ক্রমে মৃত্যু থেকে বাঁচতে হ'লে মুখ ফেরাতে হবে, গতি পরিবর্তন করতে হবে, অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়গুলির মোড় ফেরাতে হবে, দৃষ্টি বদলাতে হবে—এক কথায় 'আবৃত্তচক্ষুঃ' হতে হবে। বিষয়ের দিকে না ছুটে, যা থেকে সমস্ত বিষয়ের উৎপত্তি, যাতে সমস্ত বিষয়ের লয়, যা একমাত্র ধ্রুব সত্য, সেই প্রত্যগাত্মার দিকে, আমাদের অন্তরতম আত্মার দিকে ফিরতে হবে। কবির ভাষায় 'ফিরে চল আপন ঘরে'। সেই 'আপন ঘরে' ফিরে যেতে হবে। সেই 'আপন ঘরে' ফেরবার জন্য দৃষ্টিকে পরিবর্তিত করা, গতিকে বদলানো, মোড় ফেরানো—এ ছাড়া আর অন্য কোন উপায় নেই। এ ছাড়া যতই আমরা চেষ্টা করি না কেন মৃত্যুর হাত এড়িয়ে চলবার জন্য, সব চেষ্টাই ব্যর্থ হবে। স্বেচ্ছায় আমরা মৃত্যুকে বরণ করছি, স্বেচ্ছায় তার কবলে পড়ছি আর মুখে হা হুতাশ করছি—বলছি বাঁচতে চাই! বাঁচতে চাই আমরা ঠিকই, কিন্তু ও পথটা তো বাঁচার নয়। যে পথ দিয়ে আমরা চলেছি, যে পথের অনুসরণ করছি, সে পথ তো বাঁচবার পথ নয়। সে পথ তো মৃত্যুর পথ, শাস্ত্র বলে দিচ্ছেন। কারণ আত্মাকে জানাই হচ্ছে জীবন, আত্মাকে ভোলাই হ'ল মৃত্যু। আমরা আত্মাকে ভুলে রয়েছি, কারণ সর্বদা অন্য বিষয়ে ব্যাপৃত হয়ে রয়েছি, সুতরাং মৃত্যুগ্রস্ত হয়ে রয়েছি। এ থেকে বাঁচবার উপায় বিপরীতমুখী চেষ্টা; এখন বিষয়ের দিকে যাচ্ছি, গতি ফিরিয়ে নিয়ে আত্মার দিকে যাওয়া,

বাহ্য বস্তু ছেড়ে অন্তরে প্রবেশ করা। এই অন্তরে প্রবেশ করার চেষ্টার ফলে, অন্তর্মুখীনতার ফলে একের পর এক দরজা অতিক্রম ক'রে যখন আমরা একেবারে অন্তরের মণিকোঠায় পৌছাব, তখন দেখবো যে সেখানেই চিরশান্তি, সেখানেই অমৃতত্ব।*

* ৫ই অক্টোবর, ১৯৭৫, রবিবার প্রাতে কাঁকুড়গাছি শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যানে কঠোপনিষদ্-ব্যাখ্যা। শ্রীসমীরকুমার রায় কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত। সংক্ষেপিত আকারে মুদ্রিত।—সঃ

দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়

ডক্টর রমা চৌধুরী*

(সপ্তম পর্যায়)

বিষ্ণুস্বামীর 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ'

বিষ্ণুস্বামী দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়ের অন্যতম সম্প্রদায়-প্রবর্তক-রূপে খ্যাত, যদিও তাঁর পুণ্য জীবন ও রচনা সম্বন্ধে আমরা এখনও প্রায় কিছুই জানি না। তা হ'লেও, তাঁকে এই সম্মান আমাদের দিতেই হয় কয়েকটি কারণে।

প্রথমতঃ, পদ্মপুরাণের একটি শ্লোকে বিষ্ণুস্বামীকে একটি স্বতন্ত্র ও বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সুবিখ্যাত শ্লোকটি অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদি-বেদান্ত-দর্শনের প্রখ্যাত প্রপঞ্চক বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁর সুপ্রসিদ্ধ সটীক ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য 'গোবিন্দ-ভাষ্যে'র উপক্রমণিকার টীকায় এবং 'প্রমেয়-রত্নাবলী'তে (১।৫-৬) উদ্ধৃত করেছেন। যথা:

'তথা চোক্তং পদ্মপুরাণে—
সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥
রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্যং চতুর্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥'

অর্থাৎ পদ্মপুরাণে এরূপ উক্ত হয়েছে যে, সম্প্রদায়বিহীন যে সব মন্ত্র, সেগুলি বিফল। সেজন্য কলিযুগে চারজন সম্প্রদায়-কর্তার উদ্ভব হবে। এরূপে ভুবনপাবন চারটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়—শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক সম্প্রদায়—কলিযুগে উৎকলদেশে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ থেকে আবির্ভূত হবে। শ্রী (লক্ষ্মী) রামানুজকে, ব্রহ্মা মধ্বাচার্যকে, রুদ্র শ্রীবিষ্ণুস্বামীকে এবং চতুঃসন, অর্থাৎ সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার নিম্বার্ককে সম্প্রদায়-প্রবর্তক ও প্রধান প্রপঞ্চকরূপে স্বীকার করেছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীনিবাসাচার্য-বিরচিত সুবিখ্যাত 'সকলাচার্য-মত-সংগ্রহঃ' নামক দর্শনশাস্ত্র-প্রপঞ্চনাগ্রন্থে বিষ্ণুস্বামী, নিম্বার্ক ও মধ্বের মতবাদের স্বতন্ত্র উল্লেখ আছে।

তৃতীয়তঃ, মধ্বাচার্য-বিরচিত বিখ্যাততর 'সর্বদর্শন-সংগ্রহঃ' নামক দর্শনশাস্ত্র-প্রপঞ্চনা-গ্রন্থে 'রসেশ্বর-দর্শন' বিষয়ক বিবরণের মধ্যে বিষ্ণুস্বামীর মতবাদেরও কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়।

* প্রাক্তন উপাচার্যা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

চতুর্থতঃ, শ্রীধরস্বামী বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবত-টীকা 'ভাবার্থ-দীপিকায়' (১।৭।৬) 'সর্বজ্ঞ' নামক ভাষ্যকার অথবা 'সর্বজ্ঞভাষ্যকারী' বিষ্ণুস্বামীর মতবাদের উল্লেখ আছে।

পঞ্চমতঃ, শ্রীধরস্বামী বিরচিত বিষ্ণুপুরাণ-টীকা 'আত্ম-প্রকাশে'ও (১।১২।৭০) 'সর্বজ্ঞ-সূক্তিকারী' বিষ্ণুস্বামীর উল্লেখ আছে।

এই উভয় টীকা থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিষ্ণুস্বামী 'সর্বজ্ঞ' অথবা 'সর্বজ্ঞসূক্তি' নামক ব্রহ্মসূত্রভাষ্য রচনা করেছিলেন।

শ্রীযদুনাথজীর নামে আরোপিত 'শ্রীবল্লভ-দিগ্বিজয়' নামক গ্রন্থে বিষ্ণুস্বামী ও তাঁর সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে।

সপ্তমতঃ, নাভাদাস-বিরচিত হিন্দী গ্রন্থ 'ভক্তমালে'ও সমভাবে বিষ্ণুস্বামী ও তাঁর সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে।

অষ্টমতঃ, রামানন্দি-সম্প্রদায়ের 'রামপটল' নামক গ্রন্থে নিম্বার্ক, মধ্ব ও বিষ্ণুস্বামীর মতবাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণী আছে।

এতগুলি প্রমাণ থাকায় বিষ্ণুস্বামীকে দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত একটি সম্প্রদায়ের প্রবর্তকরূপে গ্রহণ না করা নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত নয়। এ কথা অবশ্য-স্বীকার্য যে, অন্যান্য ক্ষেত্রে সম্প্রদায়-প্রবর্তক পুণ্যশ্লোক আচার্যবৃন্দের জীবনের বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা না থাকলেও তাঁদের অন্ততঃ দু'একটি গ্রন্থেরও বিষয় আমাদের জানা আছে, যার ভিত্তিতে আমরা তাঁদের দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চয় ক'রে কিছু জানতে পারি। কিন্তু বিষ্ণুস্বামীর ক্ষেত্রে অন্যদের অতি স্বল্প ও সংক্ষিপ্ত বিবরণী থেকেই তাঁর দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে যা পারি, যেটুকু পারি, তা-ই আমাদের সংগ্রহ ক'রে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

সেইদিক থেকে, শ্রীনিবাসাচার্য-বিরচিত 'সকলাচার্য-মতসংগ্রহঃ'ই আমাদের প্রধান ভরসা, যদিও এই গ্রন্থে যা বিবরণী দেওয়া আছে, তা-ও অতি সংক্ষিপ্ত ও দুর্বোধ্য।

এস্থলে 'অথ শ্রীবিষ্ণুস্বামি-শুদ্ধাদ্বৈতমতম্। তথাহি'—এরূপ ব'লেই গ্রন্থটি আরম্ভ করা হয়েছে; এবং প্রারম্ভেই বিষ্ণুস্বামীর মতবাদ-রূপে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করা হয়েছে:

'বিশেষৈঃ প্রাকৃতৈঃ শূন্যমপ্রাকৃতবিশেষবৎ।
অশেষোপনিষদ্বেদ্যং পরব্রহ্মাস্তু তে মুদে॥'

সম্ভবতঃ এই শ্লোকটি বিষ্ণুস্বামীর স্বরচিত।

এস্থলে পরব্রহ্মের সর্বজনবিদিত ও সর্বজন-সমাদৃত প্রধান লক্ষণদ্বয়ের উল্লেখ করা হয়েছে—প্রথমতঃ, তিনি সকল বিশেষ প্রাকৃত গুণবর্জিত, নঙর্থক দিক থেকে, এবং সকল বিশেষ অপ্রাকৃত গুণমণ্ডিত, সদর্থক দিক থেকে। দ্বিতীয়তঃ, তিনি সকল উপনিষদ থেকেই জ্ঞাত হন।

'প্রাকৃত গুণ' হ'ল জড়-প্রকৃতির গুণ বা ধর্ম। যথা, ষড়্‌বিকারভাজনতা। এই সুবিখ্যাত ষড়্‌বিকার হ'ল—জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিকার বা পরিণাম, জরা ও মরণ। পার্থিব সকল বস্তু বা জীবই এরূপ ষড়্‌বিকারের সম্পূর্ণ অধীন—তাদের আছে স্বভাবতঃই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়। 'সৃষ্টি'র পরে অবশ্য প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই তাদের আছে অল্পস্থায়ী অনিত্য 'স্থিতি'; এবং এই স্বল্প স্থিতিকালে তাদের হয় 'বৃদ্ধি' এবং নানারূপ 'বিকার' অর্থাৎ পরিবর্তন। তারপরে তাদের আসে 'ক্ষয়' অথবা 'জরা'; এবং পরিশেষে হয় 'মরণ'।

এই ত তাদের অতি অল্পকালীন তথাকথিত 'স্থিতি'। কিন্তু বলাই বাহুল্য যে, নিত্যসত্য ব্রহ্ম এরূপ 'ষড়্‌বিকারভাজন' নন কোনোদিক থেকেই। সেজন্য তাঁর প্রাকৃত-পার্থিব গুণগ্রাম কিছুই নেই। কেবল নিজস্ব অনন্ত, অচিন্ত্য, অপ্রাকৃত, অপার্থিব গুণই আছে। যথা—

সচ্চিদানন্দময়তা, জ্ঞানস্বরূপতা, নিত্যশুদ্ধতা, নিত্যবুদ্ধতা, নিত্যতৃপ্ততা, নিত্যমুক্ততা প্রভৃতি।

এই দিক থেকে বিষ্ণুস্বামীর মতবাদ রামানুজ-নিম্বার্কাদির মতবাদেরই সমতুল।

ব্রহ্মের পরেই আসে জীব-জগতের কথা। ব্রহ্ম ত আছেন তাঁর নিষ্পাপ মহিমায় তাঁর নির্মল ব্রহ্মলোকে আসীন চিরকাল, তাঁর স্বীয় দিব্য-ব্রহ্মানন্দে বিভোর হয়ে। অতিশয় আনন্দের কথা নিশ্চয়ই। কিন্তু তা হ'লে জীবজগতের কি হবে? জীবজগৎও রয়েছে সকলের দৃষ্টিগোচর হয়ে, আন্তস্তকাল স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল হয়ে। তাদের দার্শনিক ব্যাখ্যা কি?

ব্যাখ্যা ত সেই একটিই—ত্রিতত্ত্ববাদিগণের একমাত্র, সুবিখ্যাত ব্যাখ্যা—জীব-জগৎ ব্রহ্ম-কার্য; ব্রহ্ম জীবজগৎস্রষ্টা কারণ। বিষ্ণু-স্বামীও সেই একই কথা এই প্রসঙ্গে বলেছেন—নূতন কোনো কিছু নয়। অন্যান্য জগৎ-সত্যত্ব-বাদী বৈদান্তিকগণের সঙ্গে সুর মিলিয়ে তিনিও বলেছেন যে, পরমেশ্বর সত্য সত্যই সৃষ্টি করেছেন; এবং ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় নন, সক্রিয়—সৃষ্টি এবং মুক্তি তাঁর প্রধান দুটি কর্ম।

এস্থলেও সেই চিরপুরাতন প্রশ্নই পুনরায় ফিরে আসছে—নিত্যতৃপ্ত, নিত্যমুক্ত, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যশুদ্ধ ব্রহ্ম কেন সৃষ্টি করবেন? কারণ, 'সৃষ্টি' ত একটি ইচ্ছাপ্রণোদিত বিচারবুদ্ধি-প্রসূত কার্য; এবং এরূপ কার্য করা হয় কোনো একটি লক্ষ্যলাভের জন্য, কোনো একটি অভাব দূর করবার জন্য, কোনো একটি অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির জন্য, কোন একটি অতৃপ্ত কামনার তৃপ্তির জন্য, কোনো একটি অপূর্ণ ইচ্ছার পূর্তির জন্য। কিন্তু বলাই বাহুল্য যে, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ সর্বশক্তিমান ব্রহ্মের ক্ষেত্রে এই সব প্রশ্ন উঠতেই পারে না কোনোদিনও। তা হ'লে তাঁর জগৎসৃষ্টির পশ্চাতে আছে কোন্ উদ্দেশ্য?

উত্তরে বিষ্ণুস্বামী দুটি সুন্দর শ্রুতির উল্লেখ করেছেন। প্রথম শ্রুতিটি হ'ল:

'আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ। সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ সোঽহমস্মীত্যগ্রে ব্যাহরত্ততোঽহংনামাভবৎ।'

'সোঽবিভেত্তস্মাদেকাকী বিভেতি স হায়মীক্ষাং চক্রে যন্মদন্যন্নাস্তি কস্মান্নু বিভেমীতি তত এবাস্য ভয়ং বীয়ায় কস্মাদ্ধ্যভেষ্যদ্ দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি।'

'স বৈ নেব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। ... স ইমমেবাত্মানং দ্বেধা-পাতয়ত্ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং তস্মাদিদ-মর্ধবৃগলমিব স্ব ইতি হ স্মাহ যাজ্ঞবল্ক্যস্তস্মাদয়মা-কাশঃ স্ত্রিয়া পূর্যত এব।'

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ, ১।৪।১-৩)

অর্থাৎ—"এই পরিদৃশ্যমান জগৎ পূর্বে পুরুষরূপী আত্মারূপে বিরাজমান ছিল। সেই আত্মা চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে নিজেকে ব্যতীত আর অন্য কিছুই দেখতে পেলেন না। সেজন্য তিনি প্রথমেই বললেন—'আমি আছি।' এরূপে, তাঁর 'অহম্' ('আমি') নাম হ'ল।"

"তিনি ভীত হলেন। সেজন্য লোকে একাকী থাকলে ভীত হয়। তিনি আলোচনা করলেন—'যখন আমি ভিন্ন অন্য কোনো বস্তু এস্থলে নেই, তখন কেন আমি ভীত হব?' তখন তাঁর ভয় চলে গেল—কারণ, তিনি কেন ভয় করবেন? দ্বিতীয় বস্তু থেকেই ত ভয় হয়।"

"তথাপি তিনি আনন্দলাভও করলেন না। এই কারণে, কেহ একাকী আনন্দলাভ করতে পারেন না। তিনি দ্বিতীয় একজনকে লাভ করতে ইচ্ছা করলেন।...তিনি নিজেকে দু' ভাগে বিভক্ত করলেন। এরূপে পতি ও পত্নীর উদ্ভব হ'ল। সেজন্য, যাজ্ঞবল্ক্য বলেছিলেন,—

'প্রত্যেকে একটি অর্ধাংশের ন্যায়।' সুতরাং পতির জীবনের শূন্য স্থান পত্নীর দ্বারাই পূর্ণ হয়।"

দ্বিতীয় শ্রুতিটি হ'ল :

'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।...তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি।'

(ছান্দোগ্যোপনিষদ, ৬।২।১-২)

অর্থাৎ "হে সোম্য (প্রিয়দর্শন)! এই জগৎ অগ্রে কেবল এক ও অদ্বিতীয় সদ্রূপেই বিদ্যমান ছিল। ...তিনি (সেই সৎ) আলোচনা করলেন—'আমি বহু হবো', আমি জন্মগ্রহণ করবো।"

এই দুটি শ্রুতিতে সমগ্র বেদান্তদর্শনের সৃষ্টি-তত্ত্বের মূল রহস্য অতি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করা হয়েছে। এস্থলে প্রথমতঃ বলা হয়েছে 'ভীতি'র কথা; তারপরে, 'প্রীতি'র কথা। 'ভীতি' উদ্ভূত হয় বাইরের কোনো একজন দ্বিতীয় ব্যক্তি থেকে। অপর পক্ষে, দ্বিতীয়-বিহীন অবস্থা বা একাকিত্বও নিরানন্দের কারণ। তা'হলে উপায়? দ্বিতীয়ও থাকবে না অথচ দ্বিতীয়বিহীনত্বও চাই না। সেক্ষেত্রে একমাত্র উপায় হ'ল এই যে, দ্বিতীয়ও থাকবে, কিন্তু বাইরের ভীতিজনক দ্বিতীয় নয়—ভেতরের প্রীতিজনক দ্বিতীয়। অর্থাৎ, সেই তথাকথিত দ্বিতীয়, নিজেরই সমান অংশ। সেজন্য জীব-জগৎও এই ভাবে ব্রহ্মের প্রীতির পাত্র, লীলা-সঙ্গী, আনন্দের ভাগীদার। কোনো অভাবপূরণের প্রশ্নই এ স্থলে নেই— যেহেতু, অন্যান্য জগৎসত্যত্ববাদী বৈদান্তিকগণের ন্যায় বিষ্ণুস্বামীও সানন্দে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন যে, ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মের 'লীলা' বা খেলাই মাত্র, যার মাধ্যমে তিনি তাঁর পরিপূর্ণ আনন্দকে প্রকাশ করছেন; এবং সকলেই জানেন যে, কোনো অভাব না থাকলে, তবেই আনন্দের উদ্ভব হতে পারে। সেজন্য পরমানন্দময় ব্রহ্মের সৃষ্টিরূপ কর্মটি সাধারণ কর্মের ন্যায় অভাবপ্রসূত নয়, বরং ঠিক তার বিপরীত—তাঁর আনন্দরসঘন স্বভাবপ্রসূত।

নূতন কথা কিছু নয়—কারণ, প্রত্যেক বেদান্তমতবাদেই আমরা বারংবার এই একই কথা পাচ্ছি—সেই আনন্দেরই কথা কেবল।

আগেই বলেছি, বিষ্ণুস্বামী আমাদের নিকট একটি নামই মাত্র—কারণ, তাঁর মতবাদ সম্বন্ধে আমরা সাক্ষাৎভাবে কোনো কিছুই জানি না; তাঁর মতবাদ সম্বন্ধে সামান্য কিছুও জানতে হ'লে আমাদের সম্পূর্ণরূপেই নির্ভর করতে হয় অপরের অতি সংক্ষিপ্ত অসম্পূর্ণ বিবরণের উপরই কেবল। তবে তাঁরও যে মূল বক্তব্য ছিল সেই একই—সেই একই আনন্দ-তত্ত্ববিষয়ক— সেটুকু মাত্র জেনেও আমরা পরম উপকৃত ও উদ্বুদ্ধ হই নিশ্চয়ই, যেহেতু সমগ্র বেদান্তের আনন্দস্বরূপত্ব বিষয়ে হই আমরা নিঃসন্দিগ্ধ--এই ত একটি মূলীভূত সুদৃঢ় মিলনসূত্র দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়ের মধ্যে। অন্য শত দিকে রয়েছে তাদের মধ্যে শত প্রভেদ —কতই না অকারণ সময় ও শক্তি ক্ষয় হয়েছে এই সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যুক্তি-বিচার, আলোচনা-প্রপঞ্চনা তর্কাতর্কি, ন্যায়ের 'কচকচি'র জন্য। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে, সর্বত্রই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে কেবল সেই একটিই সার্বজনীন মূলতত্ত্ব —সমগ্র বেদান্তদর্শনের প্রাণসম সেই আনন্দ-তত্ত্ব। কী পরম সৌভাগ্য আমাদের!

এরূপে আমরা প্রথমে পেলাম বিষ্ণুস্বামীর মতানুযায়ী সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু তত্ত্ব। তার পরেই প্রশ্ন উঠে—এরূপ সৃষ্টির প্রণালী কি? এস্থলেও বিষ্ণুস্বামী আরেকটি শ্রুতি-বাক্যের সাহায্য নিয়েছেন :

'স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেত্তথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা

বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।' (বৃহদারণ্যকোপনিষদ, ২।১।২০) অর্থাৎ 'যেরূপ উর্ণনাভ (মাকড়সা) নিজ শরীরস্থ সূত্র দ্বারা উর্ধ্বে গমন করে, যেরূপ অগ্নির স্ফুলিঙ্গ চতুর্দিকে নির্গত হয়, সেরূপ এই আত্মা থেকে সকল প্রাণ (বা ইন্দ্রিয়), সকল লোক, সকল দেবতা, সকল ভূত নির্গত হয়।'

এক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে, বিষ্ণুস্বামী দুটি প্রধান উদাহরণ দিয়েছেন সৃষ্টিপ্রণালীর ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে :

(১) উর্ণনাভ—কারণ ; তন্তু—কার্য।

(২) অগ্নি— কারণ ; স্ফুলিঙ্গ— কার্য।

এই দুটি উদাহরণ একটু নূতন ধরনের, যেহেতু এস্থলে সাধারণ কারণ-কার্য-সম্বন্ধের স্থলে অংশি-অংশ-সম্বন্ধের কথাই সমধিক মনে জাগে। বস্তুতঃ কারণ-কার্য এবং অংশি-অংশ —এই দুটি সম্বন্ধ এক নয়। কারণ-কার্য-সম্বন্ধ সুপ্রসিদ্ধ পরিণামবাদের অঙ্গীভূত। এস্থলে কারণ থেকে কার্যটিকে কি ক'রে আমরা পাই? আমরা পাই তখনই, যখন কারণটি স্বয়ং কার্যে পরিণত ও রূপান্তরিত হয়ে যায়। যথা, উপাদান-কারণ মৃৎপিণ্ড, যন্ত্রাদিসমন্বিত ও ঘটোৎপাদক-শক্তি-সহায় নিমিত্ত-কারণ কুম্ভকারের সাহায্যে একটি সুন্দর মৃন্ময় ঘটে পরিণত, রূপান্তরিত, রূপায়িত বা লীলায়িত হয়। সেজন্য এস্থলে কারণ মৃৎপিণ্ড এবং কার্য মৃন্ময় ঘট স্বভাবতঃই স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন, যেহেতু উভয়েই মৃত্তিকাস্বরূপ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ ক্ষেত্রে এ-কথা নিশ্চয় বলা চলে না যে, কারণ ও কার্য মিলে একটি অবিচ্ছেদ্য সমগ্র সত্তা বা organic whole, যেহেতু কার্য মৃন্ময় ঘটটি কারণ মৃৎপিণ্ডের বহির্ভূত, এবং উভয়ের মধ্যে অংশি-অংশ-সম্বন্ধ একেবারেই নেই।

অপর পক্ষে, অংশি-অংশ-সম্বন্ধের মধ্যে কারণ-কার্য-সম্বন্ধের ন্যায় উপাদান- ও নিমিত্ত-কারণের প্রভেদ নেই ; যেহেতু বাইরের কোনো নিমিত্ত-কারণের সাহায্য ব্যতীতই অগ্নি থেকে স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। সুতরাং যেভাবে মৃৎপিণ্ড মৃন্ময় ঘটে পরিণত হয়, ঠিক সেই ভাবেই অগ্নি স্ফুলিঙ্গে পরিণত হয় না। বস্তুতঃ পূর্বোক্ত 'পরিণামে'র অবকাশ এস্থলে একেবারেই নেই। যেমন, প্রথমে কেবল মৃৎপিণ্ডই আছে, পরে তার থেকে উপযুক্ত নিমিত্ত-কারণের সাহায্যে মৃন্ময় ঘটের উৎপত্তি হয়। কিন্তু অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ক্ষেত্রে এরূপ ভাবটি নেই কোনো ক্রমেই, যেহেতু অগ্নি থেকে স্বতঃই এবং প্রথম থেকেই স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়—অংশীর মধ্যে অংশ ত চিরকালই আছে ; পূর্ববর্তী অংশীর পরবর্তী পরিণাম অংশ—একথা ত এস্থলে একেবারেই বলা চলে না।

পুনরায়, উর্ণনাভ-তন্তুর ক্ষেত্রেও প্রথমে অবশ্য কেবল উর্ণনাভই আছে, পরে তার থেকে তন্তু নির্গত হয়—তা হলেও, যেভাবে মৃৎপিণ্ড মৃন্ময় ঘটে পরিণত হয়, উর্ণনাভ ত সেইভাবে তন্তুতে পরিণত হয় না একেবারেই।

পরিশেষে, অংশি-অংশ-সমন্বয়ে একটি সমগ্র সত্তা, একটি অবিচ্ছেদ্য, সমন্বিত, সমগ্র সত্তা আমরা পাই—যেস্থলে অংশী অংশ থেকে, এবং অংশ অংশী ও অন্যান্য অংশ থেকে সম্পূর্ণরূপেই অবিচ্ছেদ্য।

অতএব কারণ-কার্যে অংশি-অংশের অবিচ্ছেদ্য সমন্বিত সমগ্র সত্তার ভাবটি নেই ; এবং অংশি-অংশেও কারণ-কার্যের উপাদান-কারণ ও নিমিত্ত-কারণ সহযোগে পরিণামের ভাবটিও নেই।

আমরা দেখেছি যে 'সকলাচার্য-মত-সংগ্রহ'-কারের মতে বিষ্ণুস্বামী মৃৎপিণ্ড-মৃন্ময় ঘটের,

বা কারণ-কার্যের প্রধানতঃ পরিণামমূলক উদাহরণ না নিয়ে, অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের বা অংশি-অংশের প্রধানতঃ সমন্বিত অবিচ্ছেদ্য সমগ্র সত্তা-মূলক উদাহরণই গ্রহণ করেছেন। সাধারণতঃ ত্রিতত্ত্ববাদি-বেদান্তে কারণ-কার্য-সম্বন্ধ যতটা গুরুত্ব পেয়েছে, অংশি-অংশ-সম্বন্ধ ততটা নয় হয়ত এইটিই হ'ল বিষ্ণুস্বামীর বিশেষত্ব।

সাধারণভাবে, জীব-জগৎ-সৃষ্টির প্রণালীর এরূপ উল্লেখ ক'রে বিষ্ণুস্বামী আরেকটু বিশদ ক'রে সে বিষয়ে বলেছেন—যেহেতু তা নিতান্তই প্রয়োজন। বস্তুতঃ কারণ-কার্য ও অংশি-অংশ সম্বন্ধের মধ্যে সাদৃশ্য হ'ল এই যে, উভয় ক্ষেত্রেই কারণ ও কার্য, এবং অংশী ও অংশ সমস্বরূপ—যথা, কারণ মৃৎপিণ্ড ও কার্য মৃন্ময় ঘট উভয়ই মৃত্তিকাস্বরূপ; অংশী অগ্নি ও অংশ স্ফুলিঙ্গ উভয়ই অগ্নিস্বরূপ। কিন্তু এক্ষেত্রে, অসুবিধা হ'ল এই যে, কারণ বা অংশী ব্রহ্ম সর্ববাদি-সম্মতিক্রমে সচ্চিদানন্দস্বরূপ। কিন্তু জীব ত কেবল সৎ- ও চিৎ-স্বরূপ, তাতে আনন্দ নেই; জগৎ ত কেবল সৎস্বরূপ, তাতে চিৎ ও আনন্দ নেই। তা হ'লে? তা হ'লে, এই কথাই বলতে হয় যে, সৃষ্টিকালে ব্রহ্ম নিজের চিৎ ও আনন্দ অংশকে আবৃত ক'রে জগৎ; এবং আনন্দ অংশকে আবৃত ক'রে জীবের সৃষ্টি করেন। তাঁর এরূপ স্বরূপাবরণে ব্রহ্ম কেন স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত হন—তার কোনো উত্তর অবশ্য বিষ্ণুস্বামী আমাদের দেননি। তা সত্ত্বেও বল্লভ-বেদান্তের ন্যায় এস্থলেও আমরা বলতে পারি যে, সার্বজনীন সুমধুর লীলাবাদের মূল তত্ত্বানুসারে হয়ত এর ব্যাখ্যা করা যায়। এই অভিনব মতানুসারে, লীলাকারী—স্বয়ং ব্রহ্ম; লীলাসঙ্গী—জীব; লীলাক্ষেত্র—জগৎ। কি প্রকারের এই লীলা? এই লীলা হ'ল, যাকে চলিত ভাষায় বলা হয় 'লুকোচুরি খেলা'। এরূপে প্রথমে লীলাময় ব্রহ্ম লীলাভরে নিজের স্বরূপকে আবৃত ক'রে ফেলেন এবং সেইভাবে জীবের নিকট থেকে নিজেকে লুকিয়ে ফেলেন। এরই নাম 'বদ্ধাবস্থা'। তারপরে জীব তাঁকে ব্যাকুল হয়ে অন্বেষণ করতে থাকে নানাবিধ উপায়ে। এরই নাম 'সাধনাবস্থা'। পরিশেষে জীবের প্রচেষ্টা সার্থক হয় এবং তিনি ব্রহ্মকে খুঁজে পান এবং তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। এরই নাম 'মোক্ষাবস্থা'। এস্থলে এরূপ 'আবরণ'কে অবশ্য সত্য বলেই গ্রহণ করতে হয়, নিত্যপ্রকাশশীল ব্রহ্মের সাময়িক স্বরূপাবরণ—লীলাভরে হ'লেও—যেরূপেই সম্ভবপর হোক্ না কেন। অন্যথায় এই 'আবরণ' মায়িক হ'লে, শঙ্কর প্রভৃতির অদ্বৈত-মতবাদ ত এসেই পড়বে। সেজন্য বিষ্ণুস্বামীকে দুটি সিদ্ধান্ত এক্ষেত্রে নিতেই হয়েছে, স্বীয় মতানুসারে—(১) ব্রহ্ম নিজেকে সম্পূর্ণতঃ অথবা অংশতঃ সত্যসত্যই আবৃত করেন সাময়িক ভাবে, জীব-জগৎ-সৃষ্টিকালে। (২) এই আবরণ সম্পাদিত হয় তাঁর নিজেরই অনন্ত-অচিন্ত্য-শক্তি দ্বারা, মায়া দ্বারা কদাপি নয়।

সেজন্যই, বল্লভের ন্যায় বিষ্ণুস্বামীর মত-বাদের যোগ্য নাম 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ'। অর্থাৎ তিনিও বল্লভের ন্যায়ই অদ্বৈত ব্রহ্মকে রাখবার প্রচেষ্টা করেছেন অশুদ্ধ মায়ার সাহায্য ব্যতিরেকেই। অবশ্য এ বিষয়ে আমরা আর কিছুই জানি না, যেহেতু 'সকলাচার্য-মত-সংগ্রহঃ' নামক গ্রন্থে, যা পূর্বেই বলা হ'ল, অতি সংক্ষিপ্ত, অসম্পূর্ণ ও দুর্বোধ্য বিবরণীই মাত্র আছে বিষ্ণুস্বামীর মতবাদ সম্বন্ধে।

[ক্রমশঃ]

ভস্মাঙ্গরাগ

শ্রীশিবশম্ভু সরকার*

তোমারি বাঁশরী যেই পশে কানে
মন বলে—যাই, যাই—
পাথরে দেয়ালে যত ঘের আছে
খাড়া তারে রাখা দায় !

ডেকে ডেকে বাজে বাঁশি ;
ঘর টানে ভালবাসি'
বাঁধন তো রাশি রাশি
কেমনে সে ছাড়া পায় !

চারিদিকে নাচে ঘূর্ণি
কলরব চলে চূর্ণি'
ঘেরে কুয়াশার ঊর্ণি
বাঁশি বুঝি ডুবে যায় !

সহসা উঠিলে ডাকি
বাঁশি হোল—শিঙা একি
ভাঙে ঘর—ছেঁড়ে রাখী
পথ আসে আঙিনায় !

সফল জীবন, নিষ্ফল মন
ভস্ম মেখেছে তাই !

---

* প্রধান অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চারুচন্দ্র কলেজ (নৈশবিভাগ), কলিকাতা। কবিতা ও প্রবন্ধাদি রচনার মাধ্যমে বাংলাসাহিত্যসেবী।

জয়তু বিবেকানন্দ

[স্বামীজীর কয়েকটি চিত্র দর্শনে]

শ্রীশেফালিকা দেবী

বাহু-আবদ্ধ বিশাল বক্ষ আয়ত নয়নে বিজলী ঝলে,
গৈরিক রঙা উষ্ণীষ শিরে হেরি ভয় যায় পলকে চলে।
দুর্বল হৃদি লভয়ে প্রেরণা নাশে অবসাদ তন্দ্রাচয়,
ঘনীভূত তেজ মূরতি ধরিল জয়তু বিবেকানন্দ জয়।

করতলে শোভে দীর্ঘ দণ্ড উন্নত ঋজু দৃপ্ত কায়,
চরৈবেতির মন্ত্র ধ্বনিছে কম্বুকণ্ঠে ডাকিছে আয়।
গেরুয়া বসন ঘেরিয়া অঙ্গ হেরিলে সকল জড়তা ক্ষয়,
জমাট শকতি ধরিলা মূরতি জয়তু বিবেকানন্দ জয়।

করতলে করি' কপোল লগ্ন কোন্ সে চিন্তা হৃদয়ে ভায় ?
কেমনে জাগিবে ভারত আবার ঘুম কি তাহার ভাঙ্গিবে হায় !
ধর্ম ও জ্ঞান লভিবে কেমনে কিসে যাবে তার দুঃখচয়,
স্বদেশ-প্রেমের মূর্ত প্রতিমা জয়তু বিবেকানন্দ জয়।

কুঞ্চিত কেশ ঘিরি গ্রীবাদেশ কুণ্ডলীকৃত ললাট 'পরে,
কারুমণ্ডিত আসনে বসিয়া রাজ-অধিরাজ মূর্তি ধরে।
শিখালে মানবে কেমনে কর্ম করিলে জীবের মুক্তি হয়,
কামনাবিহীন কর্মী কঠোর জয়তু বিবেকানন্দ জয়।

নিমীলিত আঁখি সমাধি-মগন যেন যোগিরাজ অচলশিরে,
অমিয়প্রবাহ বহে শতধারে কমনীয় বর ও তনু ঘিরে।
হেরিয়া অথির মন হয় থির শতচিন্তার নিমেষে লয়,
মনোবৃত্তির নিরোধস্বরূপ জয়তু বিবেকানন্দ জয়।

প্রেমে ঢলঢল বিকচ বয়ান স্নিগ্ধনয়নে করুণা ঝরে,
যা ছিল তোমার দিয়াছো সপিয়া গুরু-পদতলে উজাড় করে।
আসিলে মরতে শিখাতে মানবে কেমনে ভকতি লভিতে হয়,
মহাভাবে ভরা প্রেমময় তনু জয়তু বিবেকানন্দ জয়।

মুণ্ডিতশির পদ্ম-আসনে বোধময় গুরু জ্ঞানদাতা,
অজ্ঞান মায়া নাশে দৃক্‌পাতে সংসার-তাপ-দুঃখ-ত্রাতা
অভীঃ অভীঃ বাণী ধ্বনিছে কণ্ঠে দাঁড়াও ত্যজিয়া সকল ভয়,
মূর্ত জ্ঞানের দেব-বিগ্রহ জয়তু বিবেকানন্দ জয়।

স্বামীজীর প্রতি

শ্রীকাশীনাথ প্রামানিক

ধর্ম করি মর্ম নাহি বুঝি,
কামনার অর্ঘ্যদানে পূজি
মুক্তি ভুলি বন্ধনেরে খুঁজি,
প্রাণ ত্যজি প্রণমি পাষাণে ;
স্বার্থ সেবি, ভুলি আত্মদানে।

শূন্য কুম্ভ, জলসত্র খুলি,
কাজে নেই মুখে বড় বুলি,
অন্ধকারে অন্ধ হয়ে চলি
তবু আলো দেখাবার আশা,
তত্ত্ব আজ কেবল তামাশা!

কোথা প্রেম ? প্রেমের বেসাতি,
'দাও নাও' বণিকের নীতি ;
মুখে হাসি অন্তরে গরল,
আত্মীয়ের ছদ্মবেশী ছল!

শুধু বাঁচা, আনন্দ কোথায় ?
দিন আসে দিন চলে যায় ;
পলে পলে মৃত্যুর সাধনা—
নেই হেথা অমৃতের কণা!

উপদেশ ঝুড়ি ঝুড়ি
শ্রোতার আসন দেখি ফাঁকা,
মঞ্চে মঞ্চে কপট কথক
সততা-মুখোশে মুখ ঢাকা।

'মান-হুঁস' আছে কার বল ?
ছুটি সবে প্রবৃত্তি-তাড়ায় ;
নাম-যশ-নীতি-মূল্যবোধ
টাকা দিয়ে সব কেনা যায়।

আজকে কোথায় তুমি ?
বল আজ কার কথা শুনি ?
কোথা সেই জ্বলন্ত জীবন ?
আছে শুধু কাগজের বাণী!

এ নিবিড় তিমির বিদারি'
হে দিশারী, দীপ্ত তব প্রাণ
প্রাণে প্রাণে হোক সঞ্চারিত,
দিক পুনঃ পথের সন্ধান!

পরিত্রাতা

শ্রীগঙ্গানন্দ দাস

যেদিন হেরিনু আমি রবি-কর প্রথম অম্বরে,
সেদিন ছিলে না তুমি স্থূলদেহে ধরণীর 'পরে।
শুধু বাণী তব চিরন্তনী—
প্রাচী-প্রতীচীতে ছিল অবিরাম তারি প্রতিধ্বনি!
না—না, শুধু প্রতিধ্বনি নয়
নিজে তুমি অশরীরী বাণীরূপে ছিলে বিশ্বময়।
আছ আজো—আর
রবে চিরকাল প্রতিশ্রুতি পালিতে তোমার।

'অম্বাস্তোত্র' 'শিবস্তোত্র' রচেছিলে সুরভারতীতে,
প্রথম প্রণয় মম তারি সনে নীরব নিভৃতে;
'নাচুক তাহাতে শ্যামা', 'গাই গীত শুনাতে তোমায়'
নব অনুরাগভরে সংগোপনে রেখেছি হিয়ায়—
শুনেছি তোমার কথা স্বজনের মুখে
অস্ফুট ভাবনা কত জাগিয়াছে ভাষাহীন বুকে।

তারপর একদিন
দুঃখের দহন-মাঝে মনে হ'ল: তুমি পরিত্রাতা—
অনন্তকরুণাময়ী স্নেহময়ী মাতা;
হতে যদি পারি আজ তোমার চরণলীন
সব ব্যথা দূরে যাবে, সদানন্দে রবো নিশিদিন।

কৈশোরের সেই ভাব
সেই যে মহান্ লাভ
জীবনের সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে অবিরত
ধ্রুবতারকার মতো
পথের দিশারী হোক!—পরিত্রাতা! চরণে প্রণত
দাস তব মিনতি জানায় শত শত।

বিবেকানন্দ-সাহিত্যে হাস্যরস

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ*

[পূর্বানুবৃত্তি]

'উদ্বোধনে' প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের একটি মাত্র সমালোচনা—'রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি'। ম্যাক্সমূলরের বিখ্যাত রামকৃষ্ণজীবনীর এই সমালোচনায়ও স্বামীজীর স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গ-নৈপুণ্য যথাস্থানে নির্মমভাবে আত্মপ্রকাশ করে তাঁর নিজস্ব যুক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বিরুদ্ধবাদীদের সমালোচনাকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। প্রতিপক্ষকে এমন ক্ষমাহীন আক্রমণের প্রত্যাঘাত স্বাভাবিক। একদিকে গোঁড়া হিন্দুসমাজ আর একদিকে আধুনিকমনা ব্রাহ্মসমাজ—এ দুইদলেই স্বামীজীর বিরুদ্ধতা যে তীব্রভাবে দেখা দিয়েছিল, তার অন্যতম কারণ আমরা এজাতীয় সমালোচনার ভাষা লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারি।

ব্রাহ্মনেতাদের রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে আপত্তির একটি সূত্র তাঁর নিষ্কাম দাম্পত্যজীবন; আর একটি সূত্র সমাজের দৃষ্টিতে হীন ও পতিতদের সম্বন্ধে তাঁর অতি উদারতা। বেশ্যা, মাতাল, সেকালের অভিনেতা অভিনেত্রীর দল,—কেউ তাঁর করুণা থেকে বঞ্চিত হয় নি। ব্রাহ্মসমাজ যে সুরুচি ও সুনীতির আদর্শ নিয়ে শিক্ষিত সমাজকে গড়ে তুলতে চাইছিলেন, তার পক্ষে এজাতীয় লোকদের সামাজিক মর্যাদা দেওয়া কঠিন ছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু মানুষের বহিরঙ্গ জীবনই তার সর্বস্ব পরিচয় নয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব মানুষের সেই অন্তরবাসী সত্তাটিকে যথার্থ অনুভব করতে পারতেন বলেই সাধারণের দৃষ্টিতে হীন পতিত অনেককেই তিনি অসাধারণ আধ্যাত্মিকস্তরে উন্নীত করতে পেরেছিলেন। এই সব কথা মনে রেখেই স্বামীজীর সমালোচনা—

"অপর অভিযোগ এই যে, তিনি বেশ্যা-দিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন না। ইহাতে অধ্যাপকের উত্তর বড়ই মধুর; তিনি বলেন, শুধু রামকৃষ্ণ নহেন, অন্যান্য ধর্মপ্রবর্তকেরাও এ অপরাধে অপরাধী। ...আরও অভিযোগ, মদ্য-পানের উপরও তাঁহার তাদৃশ ঘৃণা ছিল না। হরি! হরি! 'একটু মদ খেয়েছে বলে সে লোকটার ছায়াও স্পর্শ করা হবে না'—এই না অর্থ? দারুণ অভিযোগই বটে! মাতাল, বেশ্যা, চোর, দুষ্টদের মহাপুরুষ কেন দূর দূর করিয়া তাড়াইতেন না, আর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ছাঁদি ভাষায় সানাইয়ের পোঁ-র সুরে কেন কথা কহিতেন না! আবার সকলের উপর বড় অভিযোগ...আজন্ম স্ত্রী-সঙ্গ কেন করিলেন না!!

"আক্ষেপকারীদের এই অপূর্ব পবিত্রতা এবং সদাচারের আদর্শে জীবন গড়িতে না পারিলেই ভারত রসাতলে যাইবে! যাক রসাতলে, যদি ঐ প্রকার নীতিসহায়ে উঠিতে হয়!"[১]

উদ্ধৃত এই মন্তব্যের শেষ পঙ্‌ক্তিটি তিক্ততার বশে হাস্যরসের সীমা ছাড়িয়ে গেছে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু তার আগে অবধি বহিরঙ্গ সদাচারের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে স্বামীজীর বিদ্রূপমিশ্রিত মন্তব্যগুলি তথাকথিত সমা-

* এম. এ., ডি. লিট্. । অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড, চতুর্থ সং, পৃঃ ১৩-১৪

লোচকদের যুক্তির অন্তঃসারশূন্যতা পদে পদে ফুটিয়ে তুলেছে। অথচ প্রথম জীবনে নরেন্দ্রনাথ সহ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের বেশ কয়েকজনই ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ॥4974

নীতিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তিতে আধ্যাত্মিকতার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু নিছক নীতিবাগীশ হওয়াই আধ্যাত্মিকতা নয়। এদেশের শুচিবাইগ্রস্ত হিন্দুমহিলারা এ বিষয়ে যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছিলেন ব্রাহ্মসমাজের নীতির ধ্বজাধারীরা। জীবনের যে গভীরে আলোক-পাত হলে নিমেষে সব অন্ধকার দূরে চলে যায় সে আলোর কথা এঁদের ধারণায় আসে নি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতো পরম আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসেই গিরিশচন্দ্র, কালীপদ, সুরেনবাবু, বিনোদিনী প্রমুখ নানাজনের অন্তর্লোকে সে আলোর পাবনপ্রভাব আজ ইতিহাসে সুপরিচিত ঘটনা। সাধারণ দৃষ্টিতে হীন ও পতিতদের প্রতি হিন্দুসমাজের নির্মম অবজ্ঞার ঊর্ধ্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের করুণা ও দিব্য-প্রেমের অভিষেক সেদিন কী অসাধ্য সাধন করেছিল, আজ দিনে দিনে তার মর্ম আমাদের কাছে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে।

নীতিবোধের দিক থেকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতো শুচিতাসম্পন্ন ও প্রখর অন্তর্দৃষ্টিপরায়ণ ব্যক্তিত্বও সেকালে আর দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। নীতিহীনের স্পর্শমাত্র তাঁর অসহ্য ছিল। অথচ যে মানুষ 'ভাবের ঘরে চুরি' না করে আপন দুর্বলতা ও অপূর্ণতা নিয়ে তাঁর কাছে এসেছে তাকে তিনি সব দিক থেকে আশ্রয় দিয়ে পরম সত্যের পথিক করে তুলেছেন। সুতরাং তাঁর শেষজীবনে সমাজের সর্বস্তরের মানুষই তাঁর কাছে এসে আনন্দলোকের অমৃত-সংবাদ পেয়ে গেছে। মানবকল্যাণের এই মহত্তর আদর্শের তুলনায় গণ্ডীবদ্ধ নীতিবাগীশদের আচরণ বিবেকানন্দের কাছে একান্ত পরিহাস-যোগ্যই মনে হয়েছে। ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ আধ্যাত্মিক সাধনা ও উপলব্ধিবিহীন আচার্যদের প্রার্থনা ও ভাষণ তাঁর কাছে –'ছাঁদি ভাষায় সানাইয়ের পোঁ-র সুরে কথা'। শ্রীরামকৃষ্ণদেব অথবা যীশুখৃষ্ট অথবা বুদ্ধদেব—যাঁদের সমুদ্রবৎ হৃদয় সর্বমানবের আশ্রয়স্বরূপ—তাঁরাই বিবেকানন্দের নমস্য। এ উদারতাকে যাঁরা অপরাধ বলে মনে করেন, তাঁদের বুদ্ধি ও বোধ-গত সঙ্কীর্ণতার উপরে রাগ করেই স্বামীজীর মন্তব্য, 'যাক রসাতলে'। যদি ঐজাতীয় নীতি-বোধের নামাবলীই জাতির একমাত্র উদ্ধারের পন্থা হয়, তাহলেই জাতির অধঃপতন। প্রেম, করুণা ও সহানুভূতি ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা জাতির মানস-সমুন্নতি অসম্ভব। অথচ দেখা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই উদারতাকে ব্রাহ্মসমাজের কেশব-অনুচর প্রতাপ মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী অথবা সেকালের হিন্দুধর্মপ্রবক্তা শশধর তর্কচূড়ামণি ('সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণবিষয়ক পত্রটি স্মরণীয়)—এঁরা সকলেই ভুল বুঝে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনাদর্শের এই অন্তর্গূঢ় উদারতা ও করুণাকে ম্যাক্সমূলর যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে স্বামীজীর শ্রদ্ধাভাজন। অপরপক্ষে ব্রাহ্ম সমালোচকদের সঙ্কীর্ণতা সম্বন্ধে স্বামীজীর মন্তব্য—'যদি ঐপ্রকার নীতিসহায়ে' দেশের উন্নতি করতে হয়, তার চেয়ে মানুষকে ভালোবেসে আপন করে রসাতলে যাওয়াও ভালো।

মন মুখ যাদের এক নয়, তাদের প্রতি গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতো স্বামীজীও তীব্রতম আঘাতে সমুদ্যত। বরং এ বিষয়ে গুরুর চেয়ে শিষ্যের ভূমিকা প্রখরতর। 'সাহিত্যকল্পদ্রুম' (১২৯৮)-পত্রিকায় স্বামীজী একদা 'ঈশা-

অনুসরণ' নামে 'ইমিটেশন অফ ক্রাইস্ট' বইটির অনুবাদ শুরু করেছিলেন। স্বামীজীর মতে দাস্যভক্তির অপূর্ব উদাহরণ এ গ্রন্থটির যথার্থ ত্যাগ বৈরাগ্যের আদর্শের সঙ্গে সেকালে ধর্মপ্রচারক পাদরীদের আচার-আচরণের পার্থক্য কী ধরনের, সে সম্বন্ধে ওই অনুবাদের সূচনা-অংশের মন্তব্যটি স্মরণীয়—"এখন আমরা খ্রীষ্টিয়ান রাজার প্রজা। রাজ-অনুগ্রহে বহুবিধ-নামধারী স্বদেশী বিদেশী খ্রীষ্টিয়ান দেখিলাম। দেখিতেছি যে মিশনরী মহাপুরুষেরা 'অদ্য যাহা আছে খাও, কল্যকার জন্য ভাবিও না' প্রচার করিয়া আসিয়াই আগামী দশ বৎসরের হিসাব এবং সঞ্চয়ে ব্যস্ত —দেখিতেছি, 'যাঁহার মাথা রাখিবার স্থান নাই' তাঁহার শিষ্যেরা—তাঁহার প্রচারকেরা বিলাসে মণ্ডিত হইয়া, বিবাহের বরটি সাজিয়া, এক পয়সার মা-বাপ হইয়া ঈশার জ্বলন্ত ত্যাগ, অদ্ভুত নিঃস্বার্থতা প্রচার করিতে ব্যস্ত কিন্তু প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ান দেখিতেছি না।" [২]

'খ্রীষ্টিয়ান' আদর্শের মানদণ্ডটি এখানে সর্বদেশের ও সর্বকালের সাধকসমাজের মানদণ্ড। স্বামীজী অবশ্য বিশেষভাবে সেকালের প্রোটেস্টাণ্ট পাদরীদের কথা মনে রেখেই একথা বলেছিলেন। ক্যাথলিকদের সম্বন্ধে তুলনামূলক-ভাবে স্বামীজীর শ্রদ্ধাবোধ অনেক বেশী। তবু, সামগ্রিকভাবে খ্রীষ্টান পাদরীদের প্রচারধর্ম ও বাস্তব জীবনসাধনার দুস্তর পার্থক্য উদ্ধৃত অংশটিতে ব্যঙ্গে বিদ্রূপে উঁচুদরের জীবন-সমালোচনায় পরিণত। উচ্চতম আদর্শের পাশাপাশি আচরণগত তুচ্ছতা কত হাস্যকর হয়ে ওঠে তার উদাহরণরূপে আগের মুহূর্তে উচ্চতম ত্যাগের কথা; পরমুহূর্তেই সঞ্চয় ও সুযোগ-সুবিধার প্রতি সন্ধানী দৃষ্টির অসঙ্গতি স্বামীজী পাদরীদের বেশভূষার আড়ম্বর ('বিবাহের বরটি') এবং অর্থ-গৃধ্নুতা ('এক পয়সার মা-বাপ') প্রভৃতি চলতি ভাষায় বা উপমায় বিচিত্র বৈপরীত্যস্থাপনের মাধ্যমে স্পষ্ট করে তুলেছেন। মহত্ত্বের মুখোশের অন্তরালে এই একান্ত তুচ্ছতার উদ্‌ঘাটন সত্যিকার হাস্যরসিকের শিল্পকর্ম। তবু ব্যঙ্গবিদ্রূপেই স্বামীজীর বক্তব্য সীমাবদ্ধ থাকে না বলে তাঁর গুরুতর বিষয়বস্তুর অন্তরালে হাস্য-রসিক প্রতিভার স্ফুরণ অনেক সময়ই পাঠকের চোখ এড়িয়ে যায়।

'উদ্বোধন'-পত্রিকায় 'প্রস্তাবনা'-লেখাটি পরবর্তী কালে 'ভাব্‌বার কথা' গ্রন্থে 'বর্তমান সমস্যা' নামে সংকলিত। যুগসমস্যার পটভূমিকায় স্বামীজী 'উদ্বোধনে'র বিশেষভূমিকার কথা অসামান্য দক্ষতায় এ প্রবন্ধে প্রকাশ করেছেন। এমন একটি গুরুতর বিষয়গম্ভীর রচনার মধ্যেও স্বামীজীর ব্যঙ্গবিদ্রূপের সহজাত কৃতিত্ব কীভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভারতবর্ষে সত্ত্বগুণাশ্রিত সাধক মহাপুরুষেরাই সর্বজনমান্য। কিন্তু এজাতীয় সাধক সব সমাজেই বিরল, ভারতবর্ষেও অতি অল্পসংখ্যক মানুষের মধ্যে এজাতীয় গুণের সমাবেশ। কিন্তু সমাজে এজাতীয় আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধার কথা জেনে অনেক মানুষই বাইরে ত্যাগী সেজে সমাজের প্রণাম কুড়াতে এগিয়ে আসেন। জীবনবোধের এই অসঙ্গতিকে স্বামীজী তাঁর মন্দ্রকণ্ঠে বিদ্রূপ-মিশ্রিত ভর্ৎসনায় এইভাবে ধ্বনিত করেছেন—"দেখিতেছ না যে, সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে ডুবিয়া গেল। যেথায় মহাজড়বুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে; যেথায়

২ তদেব : পৃঃ ১৬-১৭

জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজের অকর্মণ্যতার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে; যেথায় ক্রূরকর্মী তপস্যাদির ভান করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম করিয়া তুলে; যেথায় নিজের সামর্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই—কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষনিক্ষেপ; বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তক-কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্বিত-চর্বণে এবং সর্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নামকীর্তনে—সে দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে, তাহার কি প্রমাণান্তর চাই?"[৩]

এ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের উদ্দেশ্য কোনো ব্যক্তি-বিশেষ নয়,—সমস্ত ভারতবাসী। আবার ঠিক এই কথাগুলি বিশেষভাবে আজকের বাঙালী-সমাজের উদ্দেশেও সমান প্রযোজ্য। বহুযুগের উদ্যমহীনতায় অভ্যস্ত ভারতীয়দের জীবন ও চিন্তার অসঙ্গতিকে নির্মম অঙ্গুলিসংকেতে চিহ্নিত করে স্বামীজী আমাদের ভ্রান্ত আত্ম-তৃপ্তিকে আঘাত করে জাগাতে চেয়েছিলেন। একদা এ আঘাত, এই ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ আমাদের বিদ্রোহী ও বিপ্লবীদের চিন্তাধারাকে অনেক পরিমাণে সঞ্জীবিত করে দেশে নবযুগের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু লক্ষণীয় এই, বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসেও আমাদের মৌলিকতাহীন বিদ্যাচর্চা এবং উদ্যমহীন পূর্বপুরুষের গৌরব-কীর্তন প্রায় একই ধরনের মানসিকতার সৃষ্টি করেছে। এই তমোগুণের অন্ধকার থেকে জাতীয় চিত্তের পুনরুদ্বোধনে স্বামীজীর চৈতন্য-সঞ্চারী ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ আজও সমান প্রয়োজনীয়।

সর্ববিষয়ে পূর্বপুরুষদের দোহাই দিয়ে যারা ইহজীবনে কাল কাটাতে চায়, তাদের উদ্দেশে স্বামীজীর নিগূঢ় ব্যঙ্গ দেখা দিয়েছে 'জ্ঞানার্জন' প্রবন্ধটিতে। স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তায় এ প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর উজ্জ্বল উদাহরণ। আমরা এ প্রবন্ধে জ্ঞানচর্চা সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্যের একটি অংশ গ্রহণ করে তাঁর ব্যঙ্গ-নৈপুণ্যের দিকটি লক্ষ্য করবো।

স্বামীজীর সমকালে হিন্দুয়ানি বা বিশেষ করে ব্রাহ্মণমাহাত্ম্য প্রচারের বিশেষ ঝোঁক দেখা দিয়েছিল। এই ব্রাহ্মণমাহাত্ম্য প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে স্মরণীয় জ্ঞানচর্চায় ব্রাহ্মণদের চিরকালীন একাধিপত্যের ধারণা। এই ধারণা যাঁদের, তাঁদের সম্বন্ধে স্বামীজী কতো মৃদু ব্যঙ্গে এঁদের দম্ভ ও অহংকারের অসারতা ফুটিয়ে তুলেছেন, তা তাঁর ভাষাভঙ্গী থেকেই বিচার্য।- "একদল আছেন, যাঁহাদের বিশ্বাস—প্রাচীন মহাপুরুষদিগের অভিপ্রায় পূর্বপুরুষপরম্পরাগত পথে তাঁহারাই প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সকল বিষয়ের জ্ঞানের একটি নির্দিষ্ট ভাণ্ডার অনন্ত কাল হইতে আছে, ঐ খাজানা পূর্বপুরুষদিগের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। তাঁহারা উত্তরাধিকারী, জগতের পূজ্য।"[৪] এক্ষেত্রে পূর্বপুরুষেরা জ্ঞানী ছিলেন এই অধিকারেই একালের উত্তরাধিকারীদেরও সমান জ্ঞানী হওয়ার দাবী করে বসার ভঙ্গীটুকু দেখার মতো। অবশ্য পৃথিবীতে খুব কম জাতিই এ ধরনের পূর্বপুরুষ দেখাতে পারেন। যাঁরা পারেন না তাঁদের সম্বন্ধে কি বক্তব্য? স্বামীজীর ভাষায় —"...তাঁহাদের উপায়?—কিছুই নাই।"[৫] সুতরাং জগতের আর সব জাতের লোকেদের একমাত্র কর্তব্য ব্রাহ্মণচরণসেবা। স্বামীজী অবশ্য এদেরও উদ্ধারের উপায় দেখিয়েছেন—কোনো কোনো "সদাশয়" ব্যক্তির বিধান—"আমাদের পদলেহন কর, সেই সুকৃতিফলে আমাদের বংশে জন্মগ্রহণ করিবে।"[৬] অর্থাৎ এ জন্মে না হলেও

৩ তদেব: পৃঃ ৩৩ ৪, ৫, ৬ তদেব: পৃঃ ৩৯

অন্য জন্মে ব্রাহ্মণ হতে হবে, তবে জ্ঞান, তবে মুক্তি!

কিন্তু যে সব আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা ব্রাহ্মণদের জানা ছিল বলে মনে হয় না, তার বেলায়? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার উত্তর স্বামীজীর ভাষায়—"পূর্বপুরুষেরা জানিতেন বই কি! তবে লোপ হইয়া গিয়াছে, এই শ্লোক দেখ—।"৭ ওই "জানিতেন বই কি" অবধিই একালের পণ্ডিতদের তৃপ্তি, নূতন কোনো জ্ঞানচর্চার বা আবিষ্কারের চেষ্টা না করে আমাদের ব্রাহ্মণ্য-শাসিত প্রাচীন বিদ্যা এভাবে চর্বিতচর্বণের আলস্যেই মগ্ন।

প্রবন্ধটির শেষদিকে স্বামীজী পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ বা বিচারহীন গুরুবাদ—এ দুয়েরই সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়ে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে আমাদের স্বাভাবিক ভ্রান্তির প্রতি অম্লমধুর ব্যঙ্গ নিক্ষেপ করেছেন "…বোধ হয়, প্রেমের উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া ভক্তেরা মহাজনদিগের অভিপ্রায়—তাঁহাদের পূজার সমক্ষে বলিদান করেন…।"৮ এই মন্তব্যটির নিগূঢ় অন্তর্দৃষ্টি সজাগ পাঠকের কাছে পরম বিস্ময়রূপে প্রতিভাত হবে। অনেক সময়েই দেখা যায় মহাপুরুষদের বাণী বা আচরণের যথার্থ মর্মোদ্ধার না করতে পেরে ভক্তেরা বিপরীত কোনো ভাবাদর্শকেই বড়ো করে তোলেন। ফলে দেবতার সামনেই তাঁর প্রিয় আদর্শের বলি হয়ে যায়, তথাকথিত ভক্তের দ্বারাই মহাপুরুষের চরম অবমাননা ঘটে। মহাপুরুষের জীবনাদর্শ অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের হাতেই সবচেয়ে বেশী লাঞ্ছিত হয়।

বাংলা গদ্যভঙ্গিমায় স্বামীজী সাধু ও চলতি দু' জাতীয় ভাষাতেই সমান দক্ষতা দেখিয়েছেন। হাস্যরসের ক্ষেত্রেও এ দু' ভাষায়ই তাঁর সৃষ্টি-ক্ষমতার সুচারু প্রকাশ। তবে সাধু ভাষায় তাঁর হাস্যরস স্বভাবতঃই রচনাগাম্ভীর্যের আড়ালে আপাতপ্রচ্ছন্ন। মনোযোগী পাঠক না হলে তাঁর বক্তব্যের অন্তর্লীন ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, কৌতুক পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। আবার সজাগ পাঠকের কাছে এজাতীয় রসসৃষ্টির ক্ষমতা বিশেষ শক্তির পরিচায়ক। 'ভাব্‌বার কথা'র প্রবন্ধগুলি অবলম্বনে আমরা স্বামীজীর সাহিত্যে হাস্যরসের নৈপুণ্য লক্ষ্য করেছি, এবারে সাধু ভাষায় তাঁর অমর রচনা 'বর্তমান ভারত' নিবন্ধটি আলোচনার জন্য গ্রহণ করা যাক।

বাস্তবিক, ইতিহাস-দর্শনের এই বেদান্তসূত্র-প্রতিম গ্রন্থটির মধ্যে কোথাও হাস্যরসের অবকাশ আছে, এ কথা মনে করা কঠিন। কিন্তু ইতিহাস তো জীবনেরই সৃষ্টি। আনন্দময় বিবেকানন্দ ভারত ও বিশ্বের ইতিহাসধারার অন্তরালেই সময়, জীবন ও আদর্শের নানা বিচিত্র সংঘাতে যে হাস্যকর অসংগতিগুলি অনুভব করেছেন, নির্মল অথচ নির্মম কৌতুকের সঙ্গে তা পাঠকের দৃষ্টিগোচর করেছেন।

'বর্তমান ভারতে'র সূচনায় দিকে পুরোহিত-শক্তির প্রাধান্যকালে রাজশক্তির প্রসঙ্গে স্বামীজী দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ্যশক্তি-পরিচালিত রাজশক্তি আদর্শের দিক থেকে দৈব-আশ্রিত ঋষিদের মতামতের উপরে নির্ভরশীল। ঋষি-মুনিদের লেখা গ্রন্থাদি তাঁদের রাজ্য-পরিচালনার নির্দেশক। কিন্তু ওসব নির্দেশ কার্যকালে কতটুকু মানা হতো, সন্দেহের

৭, ৮ তদেব : পৃঃ ৩৯-৪০

বিষয়। অধিকাংশ রাজাই পুরোহিত ছাড়া অন্যান্য প্রজাদের উপর স্বেচ্ছাচারী শোষক মাত্র।

প্রসঙ্গটি স্বামীজীর ভাষায়—"পুস্তকাবদ্ধ নিয়ম ও তাহার কার্যপরিণতি, এ দুয়ের মধ্যে দূর—অনেক। একজন রামচন্দ্র শত শত অগ্নি-বর্ণের পরে জন্মগ্রহণ করেন! চণ্ডাশোকত্ব অনেক রাজাই আজন্ম দেখাইয়া যান, ধর্মাশোকত্ব—অতি অল্পসংখ্যক। আকবরের ন্যায় প্রজা-রক্ষকের সংখ্যা আরঙ্গজীবের ন্যায় প্রজা-ভক্ষকের অপেক্ষা অনেক অল্প।"[৯]

গুরুগম্ভীর ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের অন্তরালে স্বামীজী রাজা-রাজড়াদের মতিগতি সম্বন্ধে সাধারণভাবে যে মন্তব্য করেছেন, তা একদিকে যেমন সত্য, আর একদিকে তেমনি বাস্তব ঘটনা উপলক্ষে নিদারুণ ব্যঙ্গ। দু'চারজন রাজা বা সম্রাটের মহানুভবতার উদাহরণের দ্বারা অধিকাংশ রাজা-রাজড়ার অনাচার অত্যাচার ঢাকা দেওয়া যায় না।

এই মন্তব্যের পরেই রাজ-শাসিত দেশ প্রসঙ্গে স্বামীজী গণচেতনার দিক থেকে একটি মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু সে প্রশ্নটিও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাস্যরসের ভিয়েনে চাপিয়ে পাঠকের কাছে পরিবেশিত। রাজা—তিনি যত বড়ো বা যত ভালোই হোন না কেন, প্রজাদের ক্রমে স্বাবলম্বী করে তুলতে পারলেই তাঁর যথার্থ কৃতিত্ব। যে রাজার আমলে প্রজার কোনো বক্তব্য বা স্বাধীনতাই থাকে না, তাঁর দ্বারা প্রজার রক্ষা বা পালন হচ্ছে বলে আপাতত মনে হলেও, আসলে অতিরিক্ত রাজশক্তির উপর নির্ভরশীল প্রজার অধঃপতনই হ'তে থাকে। বিষয়টি কি কেবল প্রাচীন ভারতপ্রসঙ্গেই স্বামীজীর মনে এসেছিল?

এমনও হ'তে পারে যে, ইংরেজশাসনের মহিমা নিয়ে বিদেশী ও এদেশীদের অনেকেই যখন মোহগ্রস্ত, তখন স্বামীজী হয়তো মনে করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে, প্রজার স্বাধীন আত্মোন্নতি যে শাসনের দ্বারা হয় না, সে শাসন আসলে প্রজার মনুষ্যত্বহীনতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রসঙ্গটি স্বামীজী যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন, তার রাজনৈতিক তাৎপর্য বিশ্ব-ইতিহাসের সর্বকালেই সমান প্রযোজ্য।

"হউন যুধিষ্ঠির বা রামচন্দ্র বা ধর্মাশোক বা আকবর, পরে যাহার মুখে সর্বদা অন্ন তুলিয়া দেয়, তাহার ক্রমে নিজের অন্ন উঠাইয়া খাইবার শক্তি লোপ পায়। সর্ববিষয়ে অপরে যাহাকে রক্ষা করে, তাহার আত্মরক্ষা-শক্তির স্ফূর্তি কখনও হয় না। সর্বদাই শিশুর ন্যায় পালিত হইলে অতি বলিষ্ঠ যুবাও দীর্ঘকায় শিশু হইয়া যায়।"[১০]

সাধারণভাবে সর্ববিষয়ে সরকারের কাছে উদ্বাহু ও প্রত্যাশী আমাদের নাগরিকদের দিকে তাকালে স্বামীজীর সাবধানবাণী আজও আমাদের জাতীয় পুনরুজ্জীবনের দিক থেকে সমান গুরুত্বপূর্ণ—"ঐ 'পালিত' 'রক্ষিত'ই দীর্ঘস্থায়ী হইলে সর্বনাশের মূল।"[১১] স্বায়ত্ত-শাসনের স্বনির্ভরতা থেকে যে প্রভুর দল সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করেন, তাঁরা সমগ্র দেশে ও সমাজে একদল চির নাবালক সৃষ্টি করেন, শেষ অবধি যাদের বুদ্ধিহীনতায় সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বনাশ ঘটে থাকে। সুতরাং "দীর্ঘকায় শিশু" তৈরী করা সম্বন্ধে রাষ্ট্র-পরিচালকদের সব সময়ই সচেতন থাকতে হবে।

ভারতে মুসলমান-শাসন সম্বন্ধে স্বামীজী

৯ তদেব: পৃঃ ২২৩

১০, ১১ তদেব: পৃঃ ২২৩-২২৪

নানা দিক থেকেই প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেছেন। পুরোহিতদের প্রাধান্য লুপ্ত হয়ে মুসলমান রাজাদের সময়ে প্রাচীন ভারতের মৌর্য, গুপ্তদের গৌরবময় যুগ অনেক পরিমাণে ফিরে এসেছিল। সেই সঙ্গে মুসলমান রাজশক্তির 'কাফের'-বিদ্বেষের সত্যটিও স্বামীজী মনে করিয়ে দিয়েছেন। বিষয়টি মৃদু ব্যঙ্গে এইভাবে প্রকাশিত—"য়াহুদী বা ঈশাহী মুসলমানের নিকট সম্যক্ ঘৃণ্য নহে, তাহারা অল্পবিশ্বাসী মাত্র ; কিন্তু কাফের মূর্তিপূজাকারী হিন্দু এ জীবনে বলিদান ও অন্তে অনন্ত নরকের ... সেই কাফেরের ধর্মগুরুদিগকে—পুরোহিতবর্গকে—দয়া করিয়া কোনও প্রকারে জীবনধারণ করিতে আজ্ঞামাত্র মুসলমান রাজা দিতে পারেন, তাহাও কখন কখন ; নতুবা রাজার ধর্মানুরাগ একটু বৃদ্ধি হইলেই কাফের হত্যারূপ মহাযজ্ঞের আয়োজন!"[১২] বিনীত ভাষণের মৃদুভঙ্গিমা অত্যাচারী শাসকশক্তির নিষ্ঠুরতাকেও এখানে হাস্যরসের স্মিত আলোকে উদ্ভাসিত করেছে।

স্বামীজীর ইতিহাসদৃষ্টিতে ইংরেজের ভারত-বিজয় মূলতঃ বৈশ্যশক্তির ভারতবিজয়। ভারতে ইংরেজের রাজত্বের সময় থেকেই বিশ্ব-ইতিহাসে বৈশ্যযুগের সূচনা। "...এই বৈশ্য-শক্তির অভ্যুত্থানরূপ মহাতরঙ্গের শীর্ষস্থ শুভ্র ফেনরাশির মধ্যে ইংলণ্ডের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত।"[১৩]

ইংরেজমহিমার ঐ সাড়ম্বর ঘোষণার আড়ালে কি স্বামীজীর সদাসজাগ ব্যঙ্গদৃষ্টির প্রকাশ রয়েছে? তরঙ্গের শীর্ষটি যত উঁচু হয়, ততই তার পতনের সম্ভাবনা। বৈশ্যযুগের উত্থানের মধ্যেই তার পতনসম্ভাবনা তো স্বামীজী তাঁর ইতিহাসদৃষ্টিতে নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করেছেন!

ইংরেজের ভারতবিজয় খ্রীষ্টধর্মের ভারত-বিজয় নয়, পাঠান-মোগলের ভারত-সাম্রাজ্য-স্থাপনও নয়। স্বামীজীর দৃষ্টিতে তথাকথিত ধর্মপ্রচার, রাজশক্তির আড়ম্বর, ইংরেজের আত্মগৌরবঘোষণা এ সব কিছুর আড়ালে রয়েছে বৈশ্যশক্তির সর্বস্ব-শোষণকারী ভূমিকা। "...এ সকলের পশ্চাতে বাস্তব ইংলণ্ড বিদ্যমান। সে ইংলণ্ডের ধ্বজা—কলের চিমনি, বাহিনী—পণ্যপোত, যুদ্ধক্ষেত্র—জগতের পণ্যবীথিকা, এবং সম্রাজ্ঞী—স্বয়ং সুবর্ণাঙ্গী শ্রী।"[১৪]

ব্যবসাবাণিজ্যের উদ্দেশে যারা এদেশে এসেছিল, একদিকে ভারতের সহজলভ্য কাঁচামাল, আর একদিকে বিজ্ঞানসৃষ্ট কল-কারখানার উন্নতির দ্বারা একদিন তাদের বাণিজ্যতরী জগতের শেয়ার-বাজার দখল করে দুনিয়ার সোনার ভাণ্ডারটি নিজেদের করায়ত্ত করেছিল। রাজনীতি ও অর্থনীতির এই যুগল সম্মেলনকে স্বামীজী ইংরেজ রাজ-মহিমার স্বরূপ-বিশ্লেষণে আপাতস্তবের ভাষায় অনবদ্য রসসৃষ্টির কৌশলে প্রকাশ করেছেন। ইংরেজের আসল ধ্বজা তার কলকারখানার উন্নতি (চিমনি), তার আসল সৈন্যবাহিনী তার বাণিজ্য-জাহাজগুলি, জগতের শেয়ারের বাজার হস্তগত করাতেই তাদের আসল বিজয়ক্ষেত্র, আর রাণী ভিক্টোরিয়া বাইরে রাণী হলেও, কোনো রাজা বা রাণী নয়, ইংলণ্ডের আসল রাজশক্তি তার সোনার ভাণ্ডার ('স্বয়ং সুবর্ণাঙ্গী')। এত সংক্ষেপে অর্থগূঢ় নাটকীয় সংলাপে স্বামীজী ইংরেজরাজত্বের স্বরূপ-বিশ্লেষণ করেছেন যে, প্রতিটি শব্দ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে এ

১২ তদেব : পৃঃ ২২৬-২২৭

১৩, ১৪ তদেব : পৃঃ ২৩১

বাক্যটির যথার্থ রস উপভোগ করা সম্ভব। কিন্তু একবার অর্থবোধ হলে বিশ্লেষণকারী ভাষা ব্যবহারের নিপুণতম চাতুরী বিদগ্ধ পাঠকের সহর্ষ সাধুবাদে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। স্বামীজীর ভাষায় "ওলাবাটা মুখ" ইংরেজ এ বিশ্লেষণ লক্ষ্য করলে মর্মে জ্বলে যেত, সন্দেহ নেই।

বৈশ্যশক্তির ঐতিহাসিক অভ্যুদয়কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে স্বামীজী তাঁর সাধু ভাষার অন্তর্নিহিত হাস্যরস-সৃজনে যে বিশেষ সার্থকতা অর্জন করেছেন, তার আর একটি উদাহরণ ইতিহাসের পর্ব-পর্বান্তরের বর্ণনায় এভাবে প্রকাশিত—

"ব্রাহ্মণ বলিলেন, বিদ্যা সকল বলের বল, 'আমি সেই বিদ্যা-উপজীবী, সমাজ আমার শাসনে চলিবে'—দিন কতক তাহাই হইল। ক্ষত্রিয় বলিলেন, 'আমার অস্ত্রবল না থাকিলে, বিদ্যাবল-সহিত কোথায় লোপ পাইয়া যাও, আমিই শ্রেষ্ঠ।' কোষমধ্যে অসি-ঝনৎকার হইল, সমাজ অবনতমস্তকে [উহা] গ্রহণ করিল। বিদ্যার উপাসকও সর্বাগ্রে রাজোপাসকে পরিণত হইলেন! বৈশ্য বলিতেছেন, "উন্মাদ! 'অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং' তোমরা যাঁহাকে বল, তিনিই এই মুদ্রারূপী অনন্ত-শক্তিমান আমার হস্তে। দেখ, ইহার কৃপায় আমিও সর্বশক্তিমান। হে ব্রাহ্মণ, তোমার তপ, জপ, বিদ্যাবুদ্ধি—ইঁহারই প্রসাদে আমি এখনই ক্রয় করিব। হে মহারাজ, তোমার অস্ত্রশস্ত্র, তেজবীর্য—ইঁহার কৃপায় আমার অভিমতসিদ্ধির জন্য প্রযুক্ত হইবে। এই যে অতিবিস্তৃত, অত্যুন্নত কারখানাসকল দেখিতেছ, ইহারা আমার মধু-ক্রম। ঐ দেখ, অসংখ্য মক্ষিকারূপী শূদ্রবর্গ তাহাতে অনবরত মধু সঞ্চয় করিতেছে, কিন্তু সে মধু পান করিবে কে?—আমি। যথাকালে আমি পশ্চাদ্দেশ হইতে সমস্ত মধু নিষ্পীড়ন করিয়া লইতেছি।" "১৫

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নবযুগের পট-পরিবর্তনকে স্বামীজী অপূর্ব কৌশলে অভিনব ব্যঞ্জনামণ্ডিত করেছেন। বৈশ্যের অভ্যুদয় তার আপাতবিজয়, নির্মম শোষণ ও সর্বগ্রাসী পরিকল্পনার ভয়াবহতাসহ এ মন্তব্যে যেন কৌতুকনাট্যের নায়কোচিত ভূমিকায় উপস্থাপিত। রাজশক্তির অবসানে বৈশ্যশক্তির অভ্যুদয়ে অর্থই জগতের কেন্দ্রশক্তিরূপে স্বীকৃত। বিদ্যা, বুদ্ধি, অস্ত্র, শক্তি, বীরত্ব, মনুষ্যত্ব এ সব কিছুই যখন অর্থশক্তির দাসত্ব স্বীকার করতে চলেছে, সেই সময়েই বিবেকানন্দগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ অর্থ বা কাঞ্চন বা টাকার সঙ্গে সব সম্বন্ধ অস্বীকার করে এক ঈশ্বরকেই মানবজীবনের চরম ও পরম সার্থকতারূপে ঘোষণা করলেন। তাঁর সেই অমৃত হাসিটি হয়তো বৈশ্যযুগের সব ঔদ্ধত্যের নীরব প্রত্যুত্তর! [ক্রমশঃ]

---

১৫ তদেব: পৃঃ ২৩৯

দাগা বোলানর নোতুন নজির

স্বামী সুমেধানন্দ

আলাপ-আলোচনার মধ্যে স্পষ্টবাদী গুরু-ভাই অদ্ভুতানন্দ স্বামী শুনিয়ে দিয়েছিলেন, "তুমি আর নোতুন কি করেছ? শঙ্করাচার্য বুদ্ধদেব প্রভৃতি যা করে গেছেন তার ওপর মাত্র দাগা বুলিয়েছ।" নিরহঙ্কার অমায়িক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ প্রতিবাদ না করে পূর্ব পূর্ব আচার্যদের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে বললেন, "ঠিক বলেছিস প্লেটো, শুধু দাগা বুলিয়েছি।" যুগাচার্য মেনে নিলেন তিনি নোতুন কিছুই করেন নি, দাগা বুলিয়েছেন মাত্র। স্বামীজী ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান সন্ন্যাসী। নীতিশাস্ত্রই যখন বলছেন "বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্", অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের জলন্ত প্রতিফলন যাঁর নিজের জীবনে, "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" বাক্যের যিনি জীবন্ত উদাহরণ, তিনি যে বিনয়ী হবেন তাতে আর সন্দেহ কোথায়? তাই তো লজ্জা না করে সঙ্কোচ না করে বিশ্ববিজয়ী 'বিলাত প্রত্যাগত' বিবেকানন্দ সকলের সামনেই দ্বিধাহীন হয়ে বলতে পারলেন, "পণ্ডিতানাম্ দাসোঽহম্, ক্ষন্তব্যমেতৎ স্খলনম্।" যুগনায়ক যুগপ্রবর্তক বীরেশ্বর ক্ষমা চাচ্ছেন 'ব্যাকরণচচ্চড়ি' (ব্যাকরণ-সর্বস্ব?) পণ্ডিতদের কাছে 'অস্তি'র জায়গায় ভুল করে 'স্বস্তি' উচ্চারণ হয়ে গেছে বলে, বয়োজ্যেষ্ঠ পণ্ডিতমশাই যেখানে স্বীকার করেছিলেন, "স্বামীজী শাস্ত্রের গূঢ়ার্থদ্রষ্টা, মীমাংসা করিতে অদ্বিতীয়।"

কিন্তু মানুষটি কি কেবল দাগা বুলিয়েই চলে গিয়েছিলেন, না দেশের ওপরে, দশের ওপরে, দুনিয়ার ওপরে এমন একটি দাগ ধরিয়ে দিয়েছিলেন যেটিকে জীবন গড়ার বা চরিত্র গড়ার ছাঁচ বলা যায়? উনচল্লিশ বছরের জীবন-প্রবাহ এমন একটি ঝড় বইয়ে দিল যার বেগ দেশে-বিদেশে ইস্কুলে-কলেজে আপিসে-আদালতে কলে-কারখানায় দোকানে-বাজারে লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে দিনে-রাতে সচেতনতায়-অবচেতনতায় সদাসর্বদা কেন্দ্রীভূত হয়েছে হচ্ছে হবে। 'দাগা বোলান' কথাটিকে যদি আক্ষরিক অর্থেও গ্রহণ করা যায় তা'হলেও দেখি দাগা কেবল স্বামীজীই বোলান নি, বুলিয়েছেন পূর্ব-সূরী সকলেই। "অহং ব্রহ্মাস্মি" "তত্ত্বমসি" শব্দের ব্যবহার মাত্রেই যে বস্তুটিকে নির্দেশ করলে সমস্যা মিটে যায়, তাকেই বিস্তার করে বোঝানর জন্য জনক-যাজ্ঞবল্ক্য যম-নচিকেতা আরুণি-শ্বেতকেতু যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী প্রভৃতির বহুবিধ আখ্যান ও উপক্রমণিকার অবতারণা করা হয়েছে। উপনিষদেরই "নায়মাত্মা বল-হীনেন লভ্যঃ", "ন তদশ্নাতি কিঞ্চন ন তদশ্নাতি কশ্চন", "অহম্ রুদ্রায় ধনুরাতনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ" কথাগুলিকে যেন নোতুন ঢঙে নোতুন ভাষায় উপদেশ দিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শোকমগ্ন অর্জুনের হাতে গাণ্ডীবটি তুলে দেওয়ার জন্য। তাই গীতাভাষ্যের উপক্রমণিকায় ভাষ্যকার বলেছেন, "বৈদিকম্ হি ধর্মদ্বয়ম্ অর্জুনায় শোকমোহমহোদধৌ নিমগ্নায়ো-পদিদেশ।" তাই আবার দেখি "শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ/ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ" বলা সত্ত্বেও আচার্য শঙ্কর জীবনপাত করে গেছেন সেই একই তত্ত্বের ব্যাখ্যার জন্য অদ্বৈতমতের দাগা বুলিয়ে, [illegible] প্রকরণ-

গ্রন্থ ও অন্যান্য রচনাদি। আচার্যের পরেও তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যেরা টীকা-বার্তিকাদির রচনায় দাগা বোলানরই পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। রামানুজ, মধ্ব প্রভৃতি অন্যান্য আচার্য এবং তাঁদের অনুগামিগণও একই বৈদিক শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকল্পে আপন মতের আপন ভাবের আপন ঢঙের দাগা বুলিয়েছেন।

উনবিংশ বিংশ শতাব্দীর ক্রান্তিলগ্নে 'জড়-বিজ্ঞানকৌরবরণে' পার্থপ্রতিম বিবেকানন্দের দাগা বোলানর ঢঙটিও ছিল আপন স্বাতন্ত্র্যে মহিমান্বিত। তিনি মানুষকে কেবলমাত্র একত্বের এবং সমত্বের উপদেশই দেন নি, দিয়েছিলেন ডিমনস্ট্রেশনও—আহিরীটোলার ফেরীঘাটের পথে চানাচুর চিবিয়ে, হেদোর কাছে রাস্তায় ব্রহ্মবান্ধবের গলা জড়িয়ে দেশসেবার আর্তি প্রকাশ করে, বেলুড় মঠে সাঁওতাল কুলিদের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসা করে ও তাদের খাইয়ে, পণ্ডিচেরীর প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতের প্রতিবাদে আপন আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করে। এমন অনেক হীরে মুক্তো দিয়েই গাঁথা স্বামীজীর জীবনের ঘটনামালা। শিকাগোর মহাসম্মেলনে যিনি পৃথিবীর সেরা সেরা বাগ্মীদের খ্যাতি ম্লান করে দিয়েছিলেন তিনিই আবার শোকমগ্ন হয়েছিলেন পামার সাহেবের বাড়ীতে পরিপাটী বিছানার বাহারের সঙ্গে নিজের দেশের দীনদুঃখী মানুষের অসচ্ছলতার তুলনা করে। যিনি ইউরোপ আমেরিকা চষে বেড়িয়েছিলেন দোর্দণ্ড প্রতাপে, তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন অধ্যাপক রাইট, দার্শনিক ইঙ্গারসোল, বিজ্ঞানী টেসলা, শিল্পী কালভে, ধনকুবের রকফেলার, মনীষী ম্যাক্সমূলার ও পণ্ডিত ডয়সনকে তিনিই আবার ভারতে ফিরে বনে গেলেন পুরোদস্তুর ভিখারী সন্ন্যাসী, দাগা বুলিয়ে চললেন ভারতের সামাজিক রীতি-নীতি ও সন্ন্যাসাশ্রমের খুঁটিনাটির ওপরে। লাটু মহারাজেরই কথায় পাই "বিলেত থেকে ফিরে আসবার পরই দেখলুম স্বামীজী সাহেবী পোশাক ছেড়ে সেই দু'টাকা দামের চাদর আর আড়াই টাকা দামের জুতো পরতে লাগলো। এতো যে মানসম্ভ্রম সব ছুঁড়ে ফেলে দিলো।" অখণ্ডের ঘর থেকে নেমে আসা নরঋষি, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্দৃষ্টিতে কেশব সেনের তুলনায় আঠার গুণ শক্তিমান অবহেলিত মানুষের প্রতি সম্মান দেখাতে আমেরিকার হোটেলে নিজের নিগ্রো পরিচিতির বিরোধিতা করতে বিমুখ যে ব্যক্তি তিনি যে মানসম্ভ্রম ছুঁড়ে ফেলে দেবেন সে আর বেশী কথা কি!

মানসম্ভ্রম ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পুরোদস্তুর সন্ন্যাসী বা ভারতীয় বনে যাওয়ার পেছনেও রয়েছে শিক্ষাগুরু বিবেকানন্দের আচার-প্রদর্শন। বিদেশী চালচলনের ছটায় মোহগ্রস্ত জাতিকে পরাধীনতার গ্লানিমুক্ত হয়ে চিরন্তন ঐতিহ্যের ওপরে দাগা বোলানর শিক্ষা দেওয়াই তো ছিল তাঁর একটা মস্ত ব্রত। বিলেতী বিদ্যার ফলে উনবিংশ শতাব্দীর ভারত মনে করেছিল দেশের অধঃপতনের জন্য দায়ী তার অতীতের ধর্ম, আর উদ্ধারের একমাত্র উপায় পশ্চিমী শিক্ষার প্রবর্তন। এই ভুলটি ভেঙে দিয়ে দেশ ও জাতিকে তার সনাতন ধারায় দাগা বোলানর জন্য স্বামীজী পথনির্দেশ করে দিলেন "অতীতের ছাঁচেই ভবিষ্যৎকে গড়তে হবে। এই অতীতই ভবিষ্যৎ হবে। আমাদের পূর্বপুরুষদের রীতি-নীতিগুলো মন্দ ছিল বলে যে ভারতের অবনতি হয়েছে, তা নয়। অবনতির কারণ হল, ঐ রীতিনীতিগুলোর যে ন্যায়সঙ্গত পরিণতি হওয়া প্রয়োজন ছিল সেটি হতে দেওয়া হয় নি।" বিবেকানন্দের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল ভারতের অবনতির জন্য দায়ী হচ্ছে "ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের

উচ্চাভিলাষপূর্ণ অভিসন্ধি-সাধনের যুদ্ধ।" দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথী স্বামীজী দেখেছিলেন যে, সাধারণের ওপরে, দরিদ্রের ওপরে "প্রভুত্ব করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা" ছিল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় উভয়েরই। কিন্তু শেষপর্যন্ত ক্ষত্রিয়ের জয়লাভে জ্ঞানের জয় হল, কর্মকাণ্ডের প্রাধান্য আর রইল না। তাই তো গীতার শিক্ষা হল "ধর্ম দর্শন ও উদারতার সারস্বরূপ।" স্বামীজী আরও এগিয়ে গিয়ে বলে দিলেন ধর্ম কেবলমাত্র দর্শনের মধ্যে বাঁধা থাকলে চলবে না। ধর্মকে প্রয়োগ করতে হবে, প্রতিফলিত করতে হবে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে। "পুস্তকে মহাসাম্যবাদ" আর "কার্যে মহাভেদবুদ্ধি" দিয়ে যে জগতের কল্যাণ হয় না সেটি স্বামীজী ভাল করে বলে দিলেন। নিঃশ্রেয়সের সঙ্গে সঙ্গেই অভ্যুদয়ের গুরুত্বও অপরিসীম। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন "খালি পেটে ধর্ম হয় না।" মানুষের পেট ভরানর ব্যবস্থা করার দায়ও তো তিনি নরেনের ওপরেই দিয়ে গিয়েছিলেন। সেইজন্তই তো দেখি সর্বত্যাগী ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসী চিন্তা করছেন দেশের শিল্প-সম্ভাবনা রপ্তানিবাণিজ্য ও কারিগরির উন্নতির কথা। টীকা ব্যাখ্যার টানাটানির অবকাশ না রেখে সোজা কথায় বলে দিলেন "এক্ষণে উপায়—শিক্ষার প্রচার। প্রথম আত্মবিদ্যা—ঐ কথা বললেই যে জটাজুট, দণ্ড, কমণ্ডলু ও গিরিগুহা মনে আসে, আমার মন্তব্য তা নয়। তবে কি? যে জ্ঞানে ভববন্ধন হ'তে মুক্তি পর্যন্ত পাওয়া যায়, তাতে আর সামান্ত বৈষয়িক উন্নতি হয় না? অবশ্যই হয়।"

বৈষয়িক উন্নতি বা অভ্যুদয়ের পথনির্দেশ করেছিলেন বলে কিন্তু পরমার্থ বা নিঃশ্রেয়সের প্রতি স্বামীজী উদাসীন ছিলেন না। এখানেও তিনি জ্ঞান বা সমাধির উপদেশমাত্রই দেননি, সাধন করে দেখিয়েও দিয়েছিলেন। দাগা খোলানর কথাটি যিনি তুলেছিলেন তিনিই বলেছিলেন, "হামার তো একবার ইচ্ছা হলো বিবেকানন্দ ভায়ের মতো বড় হবো। উঠে পড়ে লাগলুম, বাকী দেখলুম কি জান? যতই কাছে যাই, ততই সে আরও এগুতে থাকে।" সরল মানুষ লাটু মহারাজ সাধনজীবনে আগ্রহী ছিলেন। তাই কিছুদিন ধরে প্রতিযোগিতা চালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বামীজীর সঙ্গে বরাবর হতে না পেরে বলেছিলেন "হামনে চেষ্টা করলে কি হবে?…হামনে তো সাধনপথে ডবল জোরে যেতে পারবে না, আর বিবেকানন্দ ভাই তো চলতে চলতে থেমে যাবে না, তবে আর আমাদের মধ্যে বরাব্বর হোবে কি করে?" তর্কবিচারে বা জ্ঞানচর্চায় স্বামীজীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেবে শাস্ত্রজ্ঞ সন্ন্যাসী অভেদানন্দ স্বামীর অভিজ্ঞতাও অনেকটা অনুরূপ।

স্বামীজীর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া বা প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া যেমন দুরূহ তেমনি দুঃসাধ্য হল তাঁর ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা ও অবদানের মূল্যায়ন করা। দাগা বুলিয়েছেন বটে কিন্তু তার স্টাইল ছিল আলাদা। যেমন সব খেলোয়াড়ই একই পদ্ধতিতেই খেলে বটে কিন্তু মারের কায়দা প্রত্যেকের নিজস্ব। খেলোয়াড়ের রাজা বিবেকানন্দের চরিত্রের মূল্যায়ন করা যে কত কঠিন কাজ তা জানতেন অধ্যাত্ম জগতের সেরা সেরা দিক্‌পাল তাঁর গুরুভায়েরা। তাই ও ব্যাপারে কেউ বেশী উৎসাহ দেখান নি; যেমন নিরুৎসাহ দেখিয়েছিলেন স্বামীজী নিজেই শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী লেখার ব্যাপারে। স্বামীজীর দেহান্ত হলে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ বলেছিলেন, চোখের সামনে থেকে পাহাড়টা সরে গেল। শ্রীশ্রীহরিমহারাজের ধারণায় স্বামীজী ছিলেন অন্য স্তরের মানুষ, যদিও

অন্যান্যদের সঙ্গে তাদেরই মত হয়ে মিশতেন। বেদান্তাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত স্বামী অভেদানন্দ নিউ ইয়র্কের এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, স্বামীজীর সঙ্গে দীর্ঘদিন বসবাসের সুযোগে তিনি মানুষটিকে দেখেছিলেন দিনে রাতে ভাল করে। তাই দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, মানুষ হিসাবে স্বামীজীর চরিত্র ছিল পবিত্র এবং বেদাগ। দার্শনিক হিসাবে তিনি ছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সকলের সেরা তো বটেই, তদুপরি বেদান্তশাস্ত্রের সকল শাখার জীবন্ত উদাহরণ-স্বরূপ। মূল্য জানতেন গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ আর জানতেন যাঁকে নিয়ে কথা তিনি নিজে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলে গিয়েছিলেন, যেদিন নিজেকে জানতে পারবে সেদিন আর শরীর রাখবে না। কিন্তু তার আগে কাজ করিয়ে নেবার দরকার ছিল। প্রয়োজন ছিল দাগা বোলানর বিশেষ স্টাইলটি দেখিয়ে দেবার। গুরু শিষ্যকে বলেছিলেন "তোর জন্য আমি এতদিন দুঃখ করলুম। তুই এদের জন্য একটু দুঃখ কর।" গুরুর ইচ্ছায় অনেক দুঃখ স্বীকার করেছিলেন সন্ন্যাসীর রাজা বিবেকানন্দ। জগতের দুঃখ তাঁর বুকে বেজেছিল। তাই দুঃখিত বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "দেখ রাজা, বুকের ভেতরটা ফেটে যাচ্ছে।" শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছায় আর কালীর শক্তিতে দাগা বোলানর বিশেষ কাজটি শেষ করেই নরেন্দ্র তাঁর 'ইন্দ্রত্ব' বিষয়ে সচেতন হয়ে বললেন, এই বিবেকানন্দকে বুঝতে হলে আর একটা বিবেকানন্দের দরকার। কিন্তু কথাটি বলেছিলেন আপন মনে—স্বগতোক্তি করে। দশজনকে জুটিয়ে প্রবন্ধ ছাপিয়ে প্রচারের মাধ্যম নির্ধারণ করে নিজেকে জাহির করতে চান নি। ভগবানেরই ইচ্ছায় কথাটি শুনে ফেলেছিলেন প্রেমানন্দজী সমকালীন ও উত্তর-কালীন লেখক, দার্শনিক ও সমালোচকদের বিবেকানন্দ-সমাধানে সাবধান করে দিতে। তাই স্বামীজীর দাগা বোলান বা দাগা দেওয়াকে সঙ্কোচের সঙ্গে ও সাবধানে পর্যালোচনা করা দরকার। [ক্রমশঃ]

সমালোচনা

ব্রহ্মসূত্রমালা: পুষ্পদেবী সরস্বতী। লেখিকা কর্তৃক ১, ডঃ শ্যামাদাস রো, কলকাতা ৭০০০১৯ হইতে প্রকাশিত। আচার্য সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা-সংবলিত। (১৯৭৬), পৃষ্ঠা ২৩৩, মূল্য দশ টাকা।

সংস্কৃতসাহিত্যের মণিভাণ্ডার থেকে সম্পদ আহরণ ক'রে বাংলা গদ্যসাহিত্যে রামমোহন রায় তাঁর বেদান্তগ্রন্থ-প্রকাশের দ্বারা আমাদের মননসাহিত্যের শুভ সূচনা করেছিলেন। বাংলায় বেদান্তসূত্র বা ব্রহ্মসূত্রের সেই প্রথম সর্বজনের উদ্দেশে আত্মপ্রকাশ। বাংলার নবজাগরণে বেদান্তের পূর্বাপর ওতপ্রোত প্রভাবকে অবলম্বন ক'রে নানামুখী চিন্তাধারার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। আজও তার সপক্ষে বা বিপক্ষে নানা জনের নানা মত। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ যেমন মনে করতেন যে, আজ আর গঙ্গাকে তার উৎসমূলে ফিরিয়ে নিয়ে অন্য খাতে বহানো সম্ভব নয়, তেমনি বলা চলে, বেদান্তের যুগ-যুগান্তস্থায়ী ভাবধারাকে অস্বীকার ক'রে ভারত-ইতিহাসের কোনো ব্যাখ্যা সম্ভব নয়।

সংস্কৃতভাষার শ্রেষ্ঠ ভাবসম্পদকে বাংলায় রূপায়িত করার জীবনব্রত যাঁরা গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে পুষ্পদেবীর নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ব্রহ্মসূত্রের আচার্য শঙ্কর ও আচার্য রামানুজ-কৃত ব্যাখ্যাকে মিলিয়ে নিয়ে তিনি পদ্যছন্দে এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার উদাহরণ

স্থাপন করেছেন। বিষয়বস্তুর গভীরতা ও জটিলতাকে পরিহার না ক'রেও যতদূর সম্ভব সহজ সরল ভাবপ্রকাশে তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য।

তবে এ-জাতীয় অনুবাদে পদ্যছন্দ অনেক সময় কৃত্রিম ও কষ্টকৃত হয়ে ওঠে। আলোচ্য গ্রন্থেও এমন উদাহরণের অভাব নেই। সমগ্র গ্রন্থটি পড়তে পড়তে স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় সরল গদ্যে লেখিকার সুমার্জিত ভাষায় লেখা হলে হয়তো বক্তব্যপ্রকাশ আরো স্বচ্ছ হতে পারতো। কিন্তু যুগ যুগ ধরে আমাদের দেশে সর্বজনের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে পদ্যছন্দের যে প্রচলন রয়েছে, তার মূল্যও অস্বীকার করা যায় না। সেদিক থেকে সার্থকতা উচ্চতর কবিত্বশক্তিসাপেক্ষ।

লেখিকার আজীবন তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও ভাব-রূপায়ণে কৃতিত্বের অন্যতম দিক্‌নির্দেশকরূপে 'ব্রহ্মসূত্রমালা' পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, একথা নিশ্চিত। মূলের অনুসরণে ভাবব্যাখ্যায় লেখিকার কৃতিত্বের একটি উদাহরণ—

জন্মাদ্যস্য যতঃ (ব্রহ্মসূত্র ১।১।২)—এই বিখ্যাত সূত্রটির পর্যায়ক্রমে শঙ্কর ও রামানুজের ভাষ্য অবলম্বনে পুষ্পদেবীকৃত কাব্যরূপ :

এই জগতের যাতে জন্ম স্থিতি লয়,
সেই কথা স্মরণেতে সদা যেন রয়।
যাঁহা হতে সৃষ্টি হয় সকল প্রাণীর,
যাঁর দ্বারা রয় বেঁচে জানো তাঁরে স্থির।
মৃত্যুর পরেও সবে যাঁর কাছে যায়,
সেই ব্রহ্মে করো মন নিয়োজিত তায়।

শ্রুতি-অনুকূল যত কিছু কথা
ভ্রান্তি তাহাতে নাই
মহাজনদের পথ ধরি চলো
ঋষি-নির্দেশ তাই।
জ্ঞান দিয়ে তাঁরে জানিবারে চাই
হায় সে অধরাজন!
মেধা সেইখানে মানে পরাভব
ধ্যান-আরাধ্য ধন।
কৃপা করি যবে সেই কৃপাময়
হাত ধরে লয়ে যায়।
ব্রহ্মস্বরূপে ব্রহ্মরে পেয়ে
সে হয় ব্রহ্মময়।

('ব্রহ্মসূত্রমালা', পৃঃ ৪)

এমন একটি গ্রন্থের প্রকাশনায় সহায়তা করে ভারত-সরকারের শিক্ষামন্ত্রক যথার্থ গুণ-গ্রাহিতার পরিচয় দিয়েছেন। ছাপা বাঁধাই গ্রন্থসজ্জা সবই প্রশংসনীয়। আমরা এ-গ্রন্থের বহুল প্রচার প্রার্থনা করি। আমাদের শাস্ত্রীয় আলোচনার ঐতিহ্য লেখিকার দ্বারা আরো সমৃদ্ধ হবে—এই আমাদের আন্তরিক আশা।

ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণকার্য

ভারত: ঘূর্ণিবাত্যা-ত্রাণ: মাদ্রাজ মিশন কেন্দ্রের মাধ্যমে তামিলনাড়ুর ২০টি গ্রামে প্রাথমিক ত্রাণকার্যের জন্য ডিসেম্বর ১৯৭৭ পর্যন্ত ৫০,০০০ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। এখন দুইটি গ্রামে পুনর্বাসনের কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে—প্রায় ২ লাখ টাকা ব্যয়ে ৫৭টি গৃহ নির্মিত হইবে। রাজামহেন্দ্রী কেন্দ্রের মাধ্যমে অন্ধ্রপ্রদেশের ১০০০ পরিবারের ৩,৩০০ ব্যক্তির সম্পূর্ণ জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য তৈল লঙ্কা তেঁতুল শাকসব্জী বাসনকোসন বিছানাপত্র কম্বল ও লণ্ঠন বিতরণ করা হইয়াছে। পুনর্বাসন-কার্যক্রম গৃহীত হইতেছে। বর্তমান পরিকল্পনা অনুসারে গৃহনির্মাণের জন্য প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

বাংলাদেশ: বাগেরহাট দিনাজপুর নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা কেন্দ্রের মাধ্যমে রোগীদের চিকিৎসা অব্যাহত আছে। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রের মাধ্যমে দুগ্ধবিতরণও অব্যাহত আছে।

কার্যবিবরণী

বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ১৯৭৬-৭৭ সালের কার্যবিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইল:

হাসপাতালের অন্তর্বিভাগে বর্তমানে ১২১টি শয্যা রহিয়াছে। এবছরে মোট ৫,৩৮৬ জন রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ৪,৮৪৭ জন সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করে। ৩০১ জনকে চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ১৪৩ জন মারা যায় এবং বছরের শেষে ৯৫ জন চিকিৎসাধীন থাকিয়া যায়। মোট অস্ত্রোপচারের সংখ্যা ২,৬৬৩। দিনে গড়ে ১০২টি শয্যা ভর্তি ছিল।

শেঠ মানেকলাল চিনাই ক্যানসার বিভাগে মোট ৮টি শয্যা আছে। অন্তর্বিভাগে ৮০ জন ও বহির্বিভাগে ৮৯ জন রোগী চিকিৎসিত হন।

বহির্বিভাগে এবছর মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ৩,১০,০০৩, নূতন ৫৮,৫৩৭। চক্ষু ও সাধারণ বিভাগে মোট অস্ত্রোপচারের সংখ্যা ১,৩২২। বহির্বিভাগের রোগীর সংখ্যা দৈনিক গড়ে ৮৪৯।

রক্তমলমূত্রাদি পরীক্ষার সংখ্যা ৩১,৪৪৪; ৪,৪৪০টি এক্স্‌রে ফটো তোলা হয়। ফিজিও-থেরাপি বিভাগে ইনফ্রা-রেড রশ্মি ইত্যাদি দেওয়ার সংখ্যা ৫৪৫।

নন্দবাবা চক্ষু বিভাগের অন্তর্বিভাগে ৭২৪ ও বহির্বিভাগে ৮,৭১৬ জন রোগী চিকিৎসিত হন এবং উভয় বিভাগে মোট ১,৩১৬টি অস্ত্রোপচার করা হয়। বৃন্দাবন হইতে ৩৮ কিঃ মিঃ দূরে কোশী-কালানে পাক্ষিক চক্ষু-চিকিৎসা ক্লিনিকে গড়ে ১৩০ জন গ্রামবাসী চিকিৎসিত হয়।

হোমিওপ্যাথি বিভাগে মোট চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ২৭,৬০৪, তন্মধ্যে নূতনের সংখ্যা ৫,২৫৬।

চিকিৎসা ছাড়াও দুইজন দুঃস্থ ব্যক্তিকে অর্থসাহায্য, ৩২৪ জন দরিদ্র ছাত্রকে পাঠ্যপুস্তক খাতা পেন্সিল, বিদ্যালয়ের বেতনাদি দান করা হয়। দরিদ্রদের কম্বল ও হরিজনদের অর্থ-সাহায্যও দেওয়া হয়। এই সব হিতকর কার্যে মোট ৩,৬২৮'২৫ টাকা খরচ হয়। সেবাশ্রমের আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক নহে। মোট ঋণের পরিমাণ ১,৭১,৬১৮'৯৮ টাকা। এই ঋণ পরিশোধ ও বিভিন্ন হিতকর কার্যের পরিকল্পনা

রূপায়ণে সহৃদয় জনসাধারণের নিকট মোট ১১,৮৯,৬১৮'৯৭ টাকার অর্থসাহায্যের আবেদন করা হইয়াছে।

কানপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৭৬-৭৭ সালের কার্যবিবরণী নিম্নরূপ :

ধর্ম ও সংস্কৃতি : আশ্রমে নিত্য শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, প্রার্থনাদি এবং প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় কীর্তন ও ধর্মালোচনা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি এবং শ্রীশ্রীকালীপূজা যথাযোগ্য অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে পালিত হয়। শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবুদ্ধ আচার্য শংকর যীশুখৃষ্ট ও শ্রীচৈতন্যের জন্মতিথি এবং শিবরাত্রিও যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়

শিক্ষা : গ্রন্থাগারে মোট পুস্তকের সংখ্যা ছিল ৪৯৩০। ১০৯৮ বার পুস্তকগুলি পাঠার্থে সরবরাহ করা হয়। পাঠকগণের দৈনিক উপস্থিতির গড় ৯২। পাঠাগারে ৮টি সংবাদ-পত্র, ৬৮টি সাময়িক পত্রিকা ও কিছুসংখ্যক সংবাদলিপি ছিল। শিশুদের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগের কাজও সুষ্ঠুভাবে চলে।

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গড়ে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৬৮৯। উত্তরপ্রদেশ বোর্ডের পরীক্ষায় ১২১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৭১ জন ১ম বিভাগে, ৪৪ জন ২য় বিভাগে, ২ জন ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। ৬ জন স্টার এবং ৮৭ জন ডিস্টিংসন পায়। একজন ছাত্র ৮ম স্থান অধিকার করে। আলোচ্য বৎসর লইয়া ক্রমান্বয়ে ১০ বার বিদ্যালয়টি দক্ষতামূলক সরকারী অনুদানের যোগ্য বিবেচিত হয়। লক্ষ্ণৌয়ে মন্ত্রিপর্যায়ের এক অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়টি সরকারী প্রশংসাপত্র ও সম্মানসূচক ফলক লাভ করে। বিদ্যালয়ে ১৭১ জন ছাত্র বিনা বেতনে এবং ৪৭ জন ছাত্র অর্ধবেতনে পড়িবার সুযোগ পায়। এতদ্ব্যতীত ১৫০টি ছাত্র বিভিন্ন বৃত্তি লাভ করে। পাঠ্যসূচী অনুসারে সাধারণ শিক্ষাপ্রদান ছাড়াও ছাত্রগণের সুসমঞ্জস ব্যক্তিত্ববিকাশের উপযোগী বিভিন্ন কার্যসূচীও গ্রহণ করা হয়।—যথা, স্বাস্থ্যচর্চা, জনসেবা, স্কাউটিং, আহত ও রুগ্নদের সেবা-শিক্ষা (St. John Ambulance), শিক্ষামূলক ভ্রমণ, সামাজিক সৌজন্যবোধ, নীতি-ও বিনয়-শিক্ষা, গো-সেবা প্রভৃতি। বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে ৭০১৩ খানি পুস্তক ছিল। ২৩২৪ খানি পুস্তক ছাত্র ও শিক্ষকগণকে পড়িতে দেওয়া হয়।

চিকিৎসা : দাতব্য চিকিৎসালয়ে মোট ১,৮২,৫৩৮ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। সাধারণ অস্ত্রোপচারের সংখ্যা ছিল ৮৫, সূচি-প্রয়োগের সংখ্যা ৪২,০৬৭, পরীক্ষাগারে পরীক্ষার সংখ্যা ৫০২, রঞ্জনরশ্মিবিভাগে পরীক্ষার সংখ্যা ৫৫১।

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মজয়ন্তী

উদ্বোধন কার্যালয়ে (শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে)

গত ১লা জানুআরি ১৯৭৮, রবিবার শ্রীশ্রীমায়ের ১২৫তম জন্মতিথি-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্বামী সারদানন্দ মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের বাসস্থান ও উদ্বোধন কার্যালয়ের জন্য এই বাটীটি নির্মাণ করিয়াছিলেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে এই বাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ পদার্পণ ঘটে। সেই সময় হইতেই ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুলাই তাঁহার দেহত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত কলিকাতায় আসিলে শ্রীশ্রীমা এই বাটীতেই থাকিতেন।

যে ঘরটিতে তিনি থাকিতেন, সেটি ঠাকুর-ঘরও ছিল ; সেই ঘরেই স্থূলদেহ ত্যাগের পর শ্রীশ্রীমাও পূজিতা হইয়া আসিতেছেন ; উৎসবের দিন এখানে তাঁহার চরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের জন্য ভোর হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত প্রায় ১৫ হাজার ভক্তের সমাগম হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে পূজা হোম ভজন প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি সম্পন্ন হয়। নূতন বাড়ীর 'সারদানন্দ হল'-এ সকাল হইতে 'ইচ্ছাময়ী কালীকীর্তন সম্প্রদায়' কর্তৃক কালীকীর্তন, স্বামী অমলানন্দ কর্তৃক 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ ও আলোচনা, রহড়া বালক আশ্রমের ছাত্রগণ কর্তৃক বাউল গান এবং সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ হইতে রাত্রি ৮-৩০ মিঃ পর্যন্ত 'রসরঙ্গ' কর্তৃক শ্রীশ্রীমায়ের লীলাগীতি পরিবেশিত হয়।

দেহত্যাগ

দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, **স্বামী জীবশিবানন্দ** (সুবোধ মহারাজ) গত ২১শে ডিসেম্বর ১৯৭৭, সকাল ৮-৪০ মিনিটে ৭০ বৎসর বয়সে বারাণসী সেবাশ্রমে দেহত্যাগ করিয়াছেন। হৃৎপিণ্ডের কোন অংশে রক্ত-সরবরাহ হঠাৎ বন্ধ হওয়ায় তাঁহার দেহান্ত হয়।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯২৭ সালে তিনি মহীশূর কেন্দ্রে যোগদান করেন এবং ১৯৩৯ সালে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা প্রাপ্ত হন। মহীশূর ব্যতীত পোনাম্পেট বাঙ্গালোর মাদ্রাজ নটরমপল্লী দিল্লী কনখল বৃন্দাবন বেলুড়মঠ লক্ষ্ণৌ শিলং মায়াবতী চণ্ডীগড় ও ভুবনেশ্বর কেন্দ্রেরও তিনি কর্মী ছিলেন। আসাম পাটনা ও আগরতলায় ত্রাণকার্যেও অংশগ্রহণ করেন। হৃষীকেশ ও উত্তরকাশীতে অনেক বৎসর তপস্যা করেন। গত দেড় বৎসর যাবৎ তিনি বারাণসী অদ্বৈত আশ্রমে অবসর-জীবন যাপন করিতেছিলেন। অনাড়ম্বর ও তপঃকৃচ্ছ্র জীবনের জন্য এই সুগায়ক সন্ন্যাসী সকলের প্রিয় ছিলেন।

তাঁহার দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক!

বিবিধ সংবাদ

নিউ আলিপুরে মাতৃমন্দির

নিউ আলিপুর শ্রীসারদা আশ্রমে নবনির্মিত মাতৃমন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে গত ২৩শে ডিসেম্বর (১৯৭৭) হইতে তিনদিনব্যাপী উৎসব ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। ২৩শে প্রাতে আশ্রমভবন হইতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি শোভাযাত্রাসহকারে নবনির্মিত মাতৃ-মন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী উক্ত প্রতিকৃতিত্রয় নূতন মন্দিরে স্থাপন করেন এবং মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। পরে সভামণ্ডপে বক্তৃতাদি হয়। শ্রীমতী অরুন্ধতী রায়চৌধুরী কর্তৃক মঙ্গলাচরণের পর স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ভাষণ দেন। তিনি বলেন:

সমবেত সন্ন্যাসিবৃন্দ ও ভক্তবৃন্দ, আজ অতি শুভদিন। আপনাদের প্রচেষ্টায় নতুন মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীকে আমাদের সংঘের পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহারাজ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী প্রতিষ্ঠিত করলেন।

মহারাজ আদেশ করেছেন ব'লে দুচার কথা বলছি। আমাদের বৃন্দাবন আশ্রমে মন্দিরপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বীরেশ্বরানন্দজী কয়েকটি সুন্দর কথা বলেছিলেন। তারই দু-একটি দিয়ে আমি আরম্ভ করছি। যাঁকে আমরা ভগবান বলি, স্বরূপতঃ তিনি নির্গুণ নিরাকার—মন-বুদ্ধির অতীত। আর, আমাদের সকলেরই স্বরূপ তিনি। তাঁকে সচ্চিদানন্দ বলা হয়েছে

—সৎস্বরূপ, চিরকাল তিনি আছেন, কোন কালে তাঁর বিনাশ নেই—অমর সত্তা; চিৎস্বরূপ —চৈতন্ত সত্তা; এবং আনন্দস্বরূপ—আনন্দময় সত্তা। সেই সত্তা থেকেই বিশ্বের সব কিছু হয়েছে। বেদান্ত যাঁকে ব্রহ্ম বলেছেন, তন্ত্র তাঁকেই নির্গুণা মা বলেছেন। যিনি নির্গুণ, তিনিই সগুণ। যাঁকে সগুণ ঈশ্বর বলি, মাকালী বলি, নারায়ণ বলি,—তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা হয়ে এসেছেন। কমলাকান্তের একটি সুন্দর গান আছে—জানেন আপনারা—'জান না রে মন, পরম কারণ শ্যামা মা শুধু মেয়ে নয়/মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয়।' যিনি 'শ্যামা মা' তিনিই রামরূপে, কৃষ্ণরূপে এসেছিলেন; এযুগে এসেছেন রামকৃষ্ণ ও সারদাদেবী রূপে। মা একদিন ঠাকুরের পদসেবা করতে করতে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আমাকে তোমার কি মনে হয়?' ঠাকুর উত্তরে বলেন, 'যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এই শরীরটার জন্ম দিয়েছেন, এবং ইদানীং নহবতে বাস করছেন; তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। সত্যি সত্যি সর্বদা সাক্ষাৎ আনন্দময়ী ব'লে তোমাকে দেখতে পাই।' মা-ঠাকরুণও তাঁকে মাকালীরূপে দেখতেন। ঠাকুরের শরীর যাবার পরে একবার মাত্র গলাছেড়ে কেঁদে উঠেছিলেন, তার ভাষা হচ্ছে—'মা কালী গো, কি দোষে আমায় ছেড়ে গেলে গো।' আর প্রথম যখন দক্ষিণেশ্বরে আসছিলেন, পথে জ্বর হ'লে, দক্ষিণেশ্বরের মা-কালী যিনি 'কালো কুচকুচে মেয়ে'র রূপে মার কাছে গিয়েছিলেন, তিনিই একবার কাশীপুরে এসেছিলেন, মায়ের কাছে। মা দেখলেন মা-কালী ঘাড় কাত করে রয়েছেন। মা জিজ্ঞাসা করলেন 'মা, তুমি কেন এমন করে আছ?' মাকালী বললেন, 'ওর ঐটের জন্য (ঠাকুরের গলার ঘা দেখিয়ে) আমারও হয়েছে।' মা-কালী নিজেই জানিয়ে গেলেন তিনিই ঠাকুর। তিনিই শ্রীশ্রীমা-ও। আজকে তাঁকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হ'ল। মন্দিরের সার্থকতা সম্বন্ধে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী যে কথা বলেছিলেন—পুরাণেও সে কথা আছে, ভাগবতে; বীরেশ্বরানন্দজী যা বলেছিলেন, আমি সংক্ষেপে তা বলছি। ভগবান স্বরূপতঃ নির্গুণ, নিরাকার; তিনি অসীম। এটা আমরা মনবুদ্ধিতে ধারণা করতে পারি না। অথচ তাই-ই আমাদের স্বরূপ। সেটি উপলব্ধি করাই আমাদের উদ্দেশ্য। —শুদ্ধবোধস্বরূপের উপলব্ধির জন্য অধিকাংশ মানুষের একটা সসীম কিছু দরকার হয়—যা মনবুদ্ধিগ্রাহ্য। সেই জন্যে ভগবান অবতার হয়ে আসেন। সেই জন্যেই বিভিন্ন মূর্তিতেও তাঁকে আরাধনা করা হয়, অসীমকে সসীমরূপে অবলম্বন ক'রে—জীবনের পরমতীর্থের পথে চলার জন্যে। তার পরে তাঁর কৃপায় তিনি তাঁর স্বরূপে নিয়ে যান, দেখিয়ে দেন যে তাঁর সঙ্গে আমরা অভেদ।

আর বলেছিলেন—মন্দিরের সার্থকতা সম্বন্ধে। সেটা হচ্ছে, মানুষ চায় এমন একটা জায়গা যেখানে গেলে তাঁকে মনে পড়ে; যেখানে গেলে তাঁর ভাব মনে জাগে। মন্দিরের সেজন্যে বিশেষ প্রয়োজন আছে। আরও বলেছিলেন, মন্দিরে পটই রাখুন, বা মূর্তিই রাখুন, ভগবান তাতে প্রকাশিত থাকেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী একদিন আমার সামনেই ঠাকুরের ছবি দেখিয়ে বলেছিলেন, 'ভেব না এটি ছবি মাত্র। এর ভেতরে তিনি রয়েছেন। সব দেখছেন, সব শুনছেন।' ভগবানের মূর্তি যে সব গড়া হয়, তার ভেতরে তাঁর প্রকাশ থাকে। সেই সব রূপে তাঁকে ডাকতে হয়। তিনি আমাদের মনোবাঞ্ছা, আমাদের সব প্রয়োজন পূরণ করেন। সেজন্য

বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে মন্দিরের।

এখানের এই সারদা আশ্রমের কর্মীদের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় এখন একটি মন্দির গড়ে উঠেছে, যেখানে আপনারা এসে, আরও অনেকে এসে শান্তি পাবেন, যেখানে এলে মনে ভগবানের ভাব জাগবে। সমস্ত সাধনভজন, যা কিছু আমাদের দেশের ও অন্য দেশের ধর্মে রয়েছে—জপ, ধ্যান, যোগসাধন, মন্দিরে মসজিদে গির্জায় যাওয়া—সবকিছুর একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের যে-মন বাইরে ছড়িয়ে থাকে, বিষয় ভালবাসে ব'লে বিষয়ের চিন্তায় বাইরে ছড়িয়ে থাকে, তাঁর চিন্তা অবলম্বনে সে-মনকে সেখান থেকে ঘুরিয়ে এনে ভগবানে একাগ্র করা, তাঁর দিকে এগিয়ে যাওয়া। আর, প্রয়োজন হচ্ছে এর জন্য সংযম-অভ্যাসও—যা ছাড়া মন ভেতরে একাগ্র হতে চাইবেই না।

আমি শ্রীশ্রীমায়ের কাছে প্রার্থনা করছি, তাঁর কৃপায় আজকে এই যে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হ'ল এটির যেন আপনারা সদ্ব্যবহার করতে পারেন। এখানে মার নিত্য পূজো হবে, বিশেষ দৃষ্টি থাকবে তাঁর।

আমাদের অধিকাংশকে সংসারে থেকেই ভগবানলাভ করতে হবে। মা-ঠাকরুণ এসে-ছিলেন কি ভাবে সেটা করতে হয়, হাতে-নাতে তা দেখিয়ে দিতে। ঠাকুর বলে গেছেন—কি ভাবে সংসারে থেকে ভগবান লাভ করতে হয়। বিবাহ করলেও সংসারের সঙ্গে তাঁর বিন্দুমাত্র সংস্রব ছিল না কখনো। স্বামীজী তাঁর কথা সারা জগতে প্রচার ক'রে গেলেন। ঠাকুরের কথারই ভাষ্য তিনি। স্বামী নির্বেদানন্দ নামে একজন সাধু, মহাপুরুষ মহারাজকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমাদের মঠ মিশনের সাধুদের জন্য যে নিয়মাবলী স্বামীজী ক'রে গেছেন, সে-সব ঠাকুরের কথামত কি না। তার উত্তরে মহাপুরুষ মহারাজ বলেছিলেন—'বাবা, ঠাকুর হচ্ছেন বেদ আর স্বামীজী তার ভাষ্য। এর বেশী আমরা কিছু জানি না।' স্বামীজীর সমস্ত কথাই ঠাকুরের কথার ভাষ্য এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা প্রয়োগের নির্দেশ। তিনি সে-সব প্রচার ক'রে গেছেন, কিন্তু তিনিও সন্ন্যাসী ছিলেন। মা-ঠাকরুণ নিজেকে সংসারে জড়িয়ে রেখেছিলেন—বিশেষ ক'রে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে রাধুর জন্মের পর, রাধু যখন হামাগুড়ি দিতে শিখেছে, তখন থেকে। রাধুর পাগলী মা সুরবালা, একগাদা কাঁথা বগলে ক'রে যাচ্ছিলেন, কাঁদতে কাঁদতে তাঁর পিছু পিছু হামাগুড়ি দিয়ে যাচ্ছিল রাধু। মা রাধুকে কোলে তুলে নিলেন। অতি অশান্তির সংসার যাকে আমরা বলি, তার মধ্যে মা নিজেকে জড়ালেন। বলা যায় তাঁর জীবনের একটি নতুন অধ্যায় শুরু হ'ল। ভাইদের অধিকাংশের চেষ্টা ছিল কি ক'রে দিদির কাছ থেকে দু পয়সা পাওয়া যায়। এই মহা অশান্তির সংসারের ভেতরও সর্বক্ষণ মায়ের মনে শান্তি ছিল -আনন্দের অভাব ছিল না কখনো। মা নিজেই বলেছেন, 'অশান্তি কাকে বলে, জীবনে তা জানলুম না।' আমরা সংসারের দুর্যোগের মধ্যে থেকে শান্তি পাচ্ছি না, ভগবানকে ডাকবো কি ক'রে—এ কথা বলার পথ তিনি রেখে যান নি, হাতে-নাতে ক'রে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। নহবতের ঘরে যখন থাকতেন—একটা খাঁচার মত ঘরে, একজন ভক্ত দেখে বলেছিলেন 'এ তো আমাদের সীতাদেবীর বনবাস গো!' কত অসুবিধা, কত কাজ, তারই মধ্যে দিনে একলক্ষ বার জপ করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভগবানকে প্রথমে মা কালী-রূপে, মাতৃরূপে আরাধনা ক'রে, একজন স্ত্রীলোককে—ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে, তন্ত্রসাধনার

গুরু ক'রে এবং মা-ঠাকরুণকে সাক্ষাৎ জগজ্জননীরূপে পূজো ক'রে ভারতবর্ষের নারী-জাতির যে আদর্শ—মাতৃত্ব—তাকে অতি সম্মান দেখিয়ে, অতি উচ্চস্থান দিয়ে গেছেন; আর মা-ঠাকরুণকে বসিয়ে রেখে গেছেন তার সর্বোচ্চ শিখরে।

আজ শুভদিনে প্রার্থনা করি, মায়ের কৃপায় এই মন্দিরকে অবলম্বন ক'রে আপনারা যেন তাঁর আদর্শে নিজেদের জীবন গঠন করতে পারেন এবং অপরের, নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের, বিশেষ ক'রে ছেলেমেয়েদের মধ্যে তাঁর আদর্শ সঞ্চারিত করতে পারেন।

স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী তাঁহার আশীর্বাদী ভাষণে বলেন :

আমি বেশী কিছু বলতে পারব না—বেশী কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবু কিছু বলছি। শ্রীশ্রীমা ছাঁচ তৈরী ক'রে গিয়েছেন—আদর্শ জীবনের ছাঁচ। সেই ছাঁচে চরিত্র গঠিত করতে হবে মেয়েদের। মায়ের জীবনাদর্শ ভারতবর্ষে—শুধু ভারতবর্ষে কেন, ভারতবর্ষের বাইরেও যত ছড়িয়ে পড়বে ততই মঙ্গল, ব্যক্তির মঙ্গল, দেশের মঙ্গল, সমস্ত জগতের মঙ্গল। এইজন্য সারদা আশ্রম, সারদা সঙ্ঘ—এই সব প্রতিষ্ঠান মায়ের জীবনাদর্শ খুব ভাল ক'রে প্রচার করুক। তার চেয়ে বেশী ভাল কাজ কিছু হ'তে পারে না। বাবুরাম মহারাজ বলেছিলেন, 'রাজরাজেশ্বরী সাধ ক'রে কাঙ্গালিনী সেজে ঘর নিকুচ্ছেন, বাসন ধুচ্ছেন, চাল ঝাড়ছেন, এমনকি ভক্ত সন্তানদের এঁটো পর্যন্ত পরিষ্কার করছেন।' জয়রামবাটীতে থেকে অত কষ্ট করেছেন কিসের জন্য? সংসারের লোকের জন্য—গৃহী ভক্তদের গার্হস্থ্য ধর্ম শেখাবার জন্য। ঠাকুর অনেক উপদেশ দিয়ে গেছেন, কিন্তু তিনি সংসারে থাকেন নি। সেইজন্য গৃহী ভক্তেরা হয়তো বলতে পারেন, 'ঠাকুর তো সংসারে থাকেন নি, সংসারের ঝামেলা কি রকম তা তো জানতেন না—তিনি তো শুধু উপদেশই দিয়ে গেছেন।' তারা যাতে সেটা না বলতে পারে, তাই মা ঠাকুরের কথাগুলি যে ঠিক ঠিক পালন করা যায়—তা নিজে ক'রে দেখিয়ে গেলেন। মা সংসারে ছিলেন, ভাইদের ঘোর সংসারে। সেই অশান্তিপূর্ণ সংসারে থেকেও তিনি ঠাকুরের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রে গিয়েছেন। এতেই বোঝা যাচ্ছে যে, ঠাকুরের উপদেশ পালন করা যায় সংসারে থেকেও—ধর্মলাভ করা যায় সংসারের ভিতরও। এটা মা দেখিয়ে গিয়েছেন। অতএব মাকে আদর্শ ক'রে যাঁরা জীবন যাপন করবেন, তাঁরা নিজেরা তো ধন্য হবেনই, অপরেও যাঁরা তাঁদের সংস্পর্শে আসবেন তাঁরাও ধন্য হয়ে যাবেন। আর ততই ভারতবর্ষের ভিতর বিশেষ ক'রে স্কুল-কলেজের মেয়েদের ভিতর এই আদর্শ ছড়িয়ে পড়বে এবং যারা আমাদের পরে আসবে—যারা ভারতবর্ষের আশা-ভরসা—তারা যদি মায়ের আদর্শ নিতে পারে, তা হ'লে ভারতবর্ষের অশেষ কল্যাণ হবে। শুধু ভারতবর্ষের কেন, সমস্ত জগতেরই অশেষ কল্যাণ হবে। এই আদর্শের জন্য সমস্ত জগৎ আশা ক'রে বসে আছে। আমাদের ভক্ত মেয়েরা যাঁরা ভারতের বাইরে গিয়েছেন, তাঁরা এদেশে ফিরে এসে বলেছেন, বাইরের লোকে ভারতবর্ষের মেয়েরা কিরকম জীবন যাপন করেন—তা জানবার জন্য খুব ব্যস্ত—তারা ভারতবর্ষের নারী-আদর্শের জন্য অপেক্ষা করছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতেরই মেয়েরা যদি পাশ্চাত্য দেশের জড়-বাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়, তা হলে তার চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কী হতে পারে!

আমি একটি কথা সব সময় বলি যে—এখন

মেয়েরা conference করছে, resolution pass করছে—সবই ঠিক। মেয়েদের অনেক handicap আছে—তাদের উন্নতি হওয়া দরকার—স্বামীজী বলে গেছেন এ কথা। কিন্তু কোন্ দিকে যাবে তারা?

জগন্নাথের রথ টানা হচ্ছে—প্রায় সকলেই 'হরিবোল', 'হরিবোল' ব'লে রথ টানছে। রথটা রাস্তার মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে, না খাদে গিয়ে পড়ছে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। রথটাকে মাঝখান দিয়ে চালাতে গেলেই, পিছন দিকে কিছুলোক থাকা দরকার, যারা রথটার গতি ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করবে। ঠিক সেই রকম, মায়ের আদর্শ নিয়ে যে মেয়েরা জীবন যাপন করছে, তাদের এই responsibility—এই দায়িত্ব আছে যে, জগন্নাথের রথ যেন ঠিক জায়গা দিয়ে যায়—সকলেরই রথ টানা যেন সার্থক হয়—মেয়েরা যেন ভুলে না যায় তাদের দায়িত্বের কথা, শ্রীশ্রীমায়ের জীবন সর্বদা সামনে রেখে তারা যেন তাদের নিজেদের জীবনের লক্ষ্য ও তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সর্বদা সজাগ থাকে। শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীপাদপদ্মে এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা। *

শ্রীমতী অরুন্ধতী রায়চৌধুরী সমাপ্তিসঙ্গীত পরিবেশন করেন।

ঐ দিন বেদগান বিশেষ পূজা হোম শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ইত্যাদি হয়। ৫০০ মহিলা ভক্ত বসিয়া প্রসাদ পান এবং প্রায় ১৪০০ ভক্ত নরনারীকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

২৪শে ছাত্রীদিবসে প্রাতে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার পর সভামণ্ডপে ছাত্রীরা শ্রীঅখিল নিয়োগী রচিত 'মায়ের ছেলে' অভিনয় করে। মধ্যাহ্নে ৫০০ দরিদ্রনারায়ণ ও প্রায় ১২০০ ছাত্রী ও মহিলা ভক্ত প্রসাদ পান।

২৫শে প্রাতে সাধারণ সভায় শ্রীমতী অরুন্ধতী রায়চৌধুরী মঙ্গলাচরণ ও ভজন গান করেন। আশ্রমের কার্যবিবরণী পাঠ করেন আশ্রম-সম্পাদিকা শ্রীমতী উষা দেবী। পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে ভাষণ দেন অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত ও সভানেত্রী ডক্টর রমা চৌধুরী। শ্রীশ্রীমায়ের লীলাগীতি পরিবেশন করেন শ্রীমতী নমিতা রায় ও সম্প্রদায়। এইদিন প্রায় ১৫০০ পুরুষ ও মহিলা প্রসাদ পান।

* দুইটি বক্তৃতাই শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত। সংক্ষেপিত আকারে মুদ্রিত।—সঃ

উদ্বোধন, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা [পুনর্মুদ্রণ]

আসামের কথা [পূর্বানুবৃত্তি]

(পৌষ, ১৩৮৪ সংখ্যার শেষ লাইন : ··· এই জন্যই ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা আসাম অঞ্চলে এত অধিক)

চা-বাগিচা দেখিতে পাওয়া যায়। যে প্রদেশের সম্বৎসরের গড়-বারিপাত (average rain-fall) একশত ইঞ্চ বা ততোধিক, এইরূপ দেশই ইহার আবাদের যোগ্য। জঙ্গলময় ও পার্ব্বত্য প্রদেশের বারিপাত স্বভাবতঃই সমধিক। আসামের বারিপাত দেড়শত ইঞ্চেরও অধিক। কিন্তু আর পঞ্চাশৎ বৎসর পরে এত অধিক বারিপাত থাকিবে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে; কেননা যে পরিমাণে প্রতি বৎসরেই নূতন চা-বাগানের সংখ্যা এবং অবস্থিত বাগানের বিস্তৃতি বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে উক্ত কালমধ্যে অধিকাংশ জঙ্গল নিঃশেষিত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। এতদ্ব্যতীত আসাম গবর্ণমেণ্ট যেভাবে জমির বন্দোবস্ত করিবার সঙ্কল্প করিতেছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে বাঙ্গালা, বেহার প্রভৃতি নিকটস্থ প্রদেশের অনেক ভূম্যধিকারী সে দেশে জমি ইজারা লইয়া আবাদ, বসতি করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। ইহাতে গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট লাভবান হইবেন,—দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইবে,—শিক্ষা ও সভ্যতার সূচনা হইবে, কিন্তু চা-করগণ বৃষ্টি-অভাবে তাদৃশ লাভ গণিতে পারিবেন না বলিয়া অনুমান হয়।

আসামের আব-হাওয়ার বিশেষত্ব এই যে, বর্ষাকালে প্রায় প্রতিদিন সারা রাত্রি বৃষ্টি হইয়া থাকে এবং সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে বৃষ্টি ধরিয়া গিয়া সমস্ত দিবস প্রখর রৌদ্র হইয়া থাকে। এ ছাড়া তথায় ভারতের অনেক দেশ অপেক্ষা বর্ষা অধিক দিন স্থায়ী হয়। যাহা হউক, রাত্রিকালে বৃষ্টি, দিবসে রৌদ্র প্রায় সকল আবাদের পক্ষে উপকারী। চা-আবাদে ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। [ক্রমশঃ।]

"কেন মন ধায়"!

(বাবু অমরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী।)

জানি, কায়া সব (ই) ছায়া, জানি ধরা, সব (ই) মায়া,
তথাপি পৃথিবী প্রতি কেন মন ধায়?
জানিয়া না জানি কেন, এ কি হ'ল দায়! ১ ॥

হৃদয়সর্ব্বস্ব যেই, দু'দিনের তরে সেই,
তবু তারি তরে কেন মন সদা ধায়!
মাটির পুতুল যদি মাটি বই নয়॥ ২ ॥

কলঙ্কের ডালি বহি, যাতনা হৃদয়ে সহি,
হৃদয়ের ভার, শুধু হৃদয়ে মিশাই।
বুঝিয়া না বুঝি তবু, কেন সদা ধাই! ৩ ॥

দুঃখ শুধু—সুখ-ঢাকা, সুখ—শুধু দুঃখ-মাখা;
প্রাণের আবেগ শুধু মিশাই অন্তরে।
বুঝিয়া না বুঝি, থাকি কেন কারাগারে? ৪ ॥

গেছে সুখ, গেছে আশা ; ফুরায়েছে ভালবাসা !
বলনা তথাপি কেন রয়েছে জীবন !!
যাতনা সহিতে কিবা হেথা আগমন ? ৫ ॥

সকলি গিয়াছে ছেড়ে, রয়েছে জীবন পড়ে ;
মধু-গন্ধহীন ফুল হয়েছে জীবন,
তবু কেন মন ধায় ? বলনা (এ) কেমন ! ৬ ॥

জান কেহ, বল মোরে, জিজ্ঞাসি হে সকাতরে—
তবু কেন সদা মন তারি তরে ধায় ?
যদি কেহ জেনে থাক বলনা আমায় । ৭ ॥

মহাভাষ্যম্ ।

ভাষ্য-মূল ।—অথ কিমর্থো বর্ণানামুপদেশঃ ।

বৃত্তিসমবায়ার্থঃ উপদেশঃ * ।

বৃত্তিসমবায়ার্থো বর্ণানামুপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ ।

কিমিদং বৃত্তিসমবায়ার্থ ইতি । বৃত্তয়ে সমবায়ো বৃত্তিসমবায়ঃ । বৃত্ত্যর্থো বা সমবায়ো বৃত্তিসমবায়ঃ বৃত্তিপ্রয়োজনো বা সমবায়ো বৃত্তিসমবায়ঃ । কা পুনর্বৃত্তিঃ । শাস্ত্রপ্রবৃত্তিঃ । অথ কঃ সমবায়ঃ । বর্ণানামানুপূর্ব্ব্যেণ সন্নিবেশঃ । অথ ক উপদেশঃ । উচ্চারণম্ । কুত এতৎ । দিশিরুচ্চারণক্রিয়ঃ । উচ্চার্য্য হি শব্দানাহ উপদিষ্টা ইমে বর্ণা ইতি ।

অনুবন্ধকরণার্থশ্চ * ।

অনুবন্ধকরণার্থশ্চ বর্ণানামুপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ । ন অনুবন্ধানাসঙ্ক্ষ্যামীতি । ন হ্যনুপদিশ্য বর্ণান্ অনুবন্ধাঃ শক্যাঃ আসঙ্‌ক্তুম্ । স এষ বর্ণানামুপদেশঃ বৃত্তিসমবায়ার্থশ্চানুবন্ধকরণার্থশ্চ । বৃত্তিসমবায়শ্চানুবন্ধকরণঞ্চ প্রত্যাহারার্থম্ । প্রত্যাহারো বৃত্ত্যর্থঃ ।

ইষ্টবুদ্ধ্যর্থশ্চ * ।

ইষ্টবুদ্ধ্যর্থশ্চ বর্ণানামুপদেশঃ ইষ্টান্ বর্ণান্ ভোৎস্যত ইতি । ন হ্যনুপদিশ্য বর্ণান্ ইষ্টা বর্ণাঃ শক্যা বিজ্ঞাতুম্ ।

বঙ্গানুবাদ ।—বর্ণের উপদেশ করা হয় কি নিমিত্ত ? বৃত্তিসমবায়ের নিমিত্ত বর্ণসকলের উপদেশ করা উচিত । বৃত্তিসমবায়ার্থ এই কথাটীর অর্থ কি ? বৃত্তির নিমিত্ত সমবায় বৃত্তি-সমবায় বা বৃত্ত্যর্থ সমবায় বৃত্তিসমবায় অথবা বৃত্তিপ্রয়োজন সমবায় বৃত্তিসমবায় । বৃত্তি কাহাকে কহে ? শাস্ত্রপ্রবৃত্তিকে বৃত্তি কহে, সমবায় কাহাকে কহে ? আনুপূর্ব্ব্যক্রমে বর্ণসকলের সন্নিবেশকে এস্থলে সমবায় কহে । উপদেশ কাহাকে কহে ? উচ্চারণকে উপদেশ কহে । উচ্চারণকে উপদেশ কহে কেন ? দিশ্ ধাতুর অর্থ উচ্চারণ করা, বর্ণসকলকে উচ্চারণ করিয়া লোকে বলে, এই বর্ণসকল উপদিষ্ট হইল ।

(৮০তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৫০)

অনুবন্ধ করণের নিমিত্তও বর্ণসকলের উপদেশ করা উচিত। বর্ণসকলকে উপদেশ না করিলে অনুবন্ধ নির্ণয় করা যায় না। সেই এই বর্ণসকলের উপদেশ বৃত্তিসমবায়ের নিমিত্ত এবং অনুবন্ধকরণের নিমিত্ত। বৃত্তিসমবায় এবং অনুবন্ধকরণ প্রত্যাহারের নিমিত্ত; প্রত্যাহার বৃত্তির নিমিত্ত।

ইষ্ট বর্ণসকলকে বুঝিবার নিমিত্তও বর্ণসকলের উপদেশ হয়, বর্ণসকলকে উপদেশ না করিলে ইষ্ট বর্ণসকলকে জানিতে পারা যায় না।

ভাষ্য-মূল।—ইষ্টবুদ্ধ্যর্থশ্চেতি চেদুদাত্তানুদাত্তস্বরিতানুনাসিকদীর্ঘপ্লুতানামপ্যুপদেশঃ *।

ইষ্টবুদ্ধ্যর্থশ্চেতি চেৎ উদাত্তানুদাত্তস্বরিতানুনাসিকদীর্ঘপ্লুতানামপ্যুপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ।

এবংগুণা অপি হি বর্ণা ইষ্যন্তে। আকৃত্যুপদেশাৎ সিদ্ধম্ *। অবর্ণাকৃতিরুপদিষ্টা সর্ব্বমবর্ণকুলং গ্রহীষ্যতি। তথেবর্ণাকৃতিস্তথোবর্ণাকৃতিঃ।

বঙ্গানুবাদ।—যদি ইষ্টবোধের নিমিত্তই বর্ণসকলকে উপদেশ করা হয়, তাহা হইলে উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, অনুনাসিক, দীর্ঘ এবং প্লুত সকলেরও উপদেশ করা উচিত। এইরূপ গুণসম্পন্ন বর্ণসকলও অর্থাৎ উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, অনুনাসিক, দীর্ঘ এবং প্লুতেরও প্রয়োজন। কিন্তু আকৃতির উপদেশেই তাহা সিদ্ধ হইয়াছে, অবর্ণের আকৃতিই উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাতেই যত প্রকার অবর্ণ আছে, সকলই গৃহীত হইবে। তদ্রূপ ইবর্ণের আকৃতি উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা দ্বারায় সকল প্রকার ইবর্ণই গৃহীত হইবে, উবর্ণের আকৃতি উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে সকল উবর্ণই গৃহীত হইবে অর্থাৎ (পাণিনীয় মতে স্বরবর্ণ নয়টী, এই স্বরবর্ণসকল প্রথমতঃ হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত (১) ভেদে তিন প্রকার। এই তিন প্রকারের প্রত্যেকটী আবার উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত (২) ভেদে তিন প্রকার। এই নয় প্রকারের স্বরবর্ণের প্রত্যেকটী আবার অনুনাসিক ও নিরনুনাসিক (৩) ভেদে দুই প্রকার। পাণিনীয় মতে ঌকারের দীর্ঘ নাই, অতএব ঌকারের ভেদ দ্বাদশ প্রকার। এ ঐ ও ঔ ইহাদের হ্রস্ব নাই, অতএব ইহাদেরও ভেদ দ্বাদশ প্রকার।

ভাষ্য-মূল।—আকৃত্যুপদেশাৎ সিদ্ধমিতি চেৎ সংবৃতাদীনাং প্রতিষেধঃ *।

আকৃত্যুপদেশাৎ সিদ্ধমিতি চেৎ সংবৃতাদীনাং প্রতিষেধো বক্তব্যঃ।

(১) একমাত্রাবিশিষ্ট স্বরকে হ্রস্ব স্বর, দুমাত্রাবিশিষ্ট স্বরকে দীর্ঘ স্বর এবং তিনমাত্রাবিশিষ্ট স্বরকে প্লুত স্বর কহে। যথা "একমাত্রো ভবেদ্ হ্রস্বঃ দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে। ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধমাত্রকম্" ॥

(২) উচ্চৈরুদাত্তঃ। উচ্চারণস্থানের উর্দ্ধভাগে নিষ্পন্ন স্বরকে উদাত্ত স্বর কহে; নীচৈরনুদাত্তঃ। উচ্চারণস্থানের অধোভাবে নিষ্পন্ন স্বরকে অনুদাত্ত স্বর কহে এবং সমাহারঃ স্বরিতঃ। উদাত্ত ও অনুদাত্ত এই দুইএর মধ্যবর্ত্তী স্বরকে স্বরিত স্বর কহে।

(৩) মুখনাসিকাবচনোঽনুনাসিকঃ। মুখের সহিত নাসিকা দ্বারা উচ্চার্য্যমাণ বর্ণকে আনুনাসিক কহে। বর্ণসকল নাসিকার সাহায্য ব্যতিরেকে কেবল মুখ দ্বারাও উচ্চারিত হয়, তাহারা নিরনুনাসিক।

(মাঘ, ১৩০৪, পৃঃ ৫১)

বঙ্গানুবাদ।—যদি আকৃতির উপদেশ করিলেই বর্ণসকলের উপদেশ সিদ্ধ হয়, তবে সংবৃত প্রভৃতির প্রতিষেধ বলা উচিত।

ভাষ্য-মূল।—কে পুনঃ সংবৃতাদয়ঃ? সংবৃতঃ, কলঃ, ধ্মাতঃ, এণীকৃতঃ, অম্বূকৃতঃ, অর্দ্ধকঃ, গ্রস্তঃ, নিরস্তঃ, প্রগীতঃ, উপগীতঃ, ক্ষ্বিণ্ণঃ, রোমশ ইতি।

বঙ্গানুবাদ।—সংবৃত প্রভৃতি কি? সংবৃত (১), কল (২), ধ্মাত (৩), এণীকৃত (৪), অম্বূকৃত (৫), অর্দ্ধক (৬), গ্রস্ত (৭), নিরস্ত (৮), প্রগীত (৯), উপগীত (১০), ক্ষ্বিণ্ণ (১১) এবং রোমশ (১২)।

ভাষ্য-মূল।– অপর আহ—

গ্রস্তং নিরস্তমবিলম্বিতং নির্হত-
মম্বূকৃতং ধ্মাতমথো বিকম্পিতম্।
সন্দষ্টমেণীকৃতমর্দ্ধকং দ্রুতং
বিকীর্ণমেতাঃ স্বরদোষভাবনাঃ॥

ইতি। অতোঽন্যে ব্যঞ্জনদোষাঃ।

বঙ্গানুবাদ।—অপর কেহ বলেন,—

---

(১) "অ" এই বর্ণটিই সংবৃত। একার প্রভৃতিকে সংবৃত উচ্চারণ করিলে তাহা দোষ। অকারের সংবৃত উচ্চারণ দোষ নহে।

(২) কাকলী নামে প্রসিদ্ধ নিজ উচ্চারণস্থান ভিন্ন অপর স্থান হইতে উচ্চারিত স্বরকে কল কহে।

(৩) অধিক শ্বাসের প্রয়োগ দ্বারা হ্রস্বস্বরও যে দীর্ঘ স্বরের ন্যায় লক্ষিত হয়, তাহাকে ধ্মাত কহে।

(৪) যে স্থলে বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না অর্থাৎ ওকার উচ্চারিত হইল বা উকার উচ্চারিত হইল এই বিষয়ে সন্দেহ থাকে তাহাকে এণীকৃত কহে।

(৫) যাহা ব্যক্ত হইলেও সম্পূর্ণরূপে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয় না, তাহাকে অম্বূকৃত কহে।

(৬) যাহা দীর্ঘ হইলেও হ্রস্বের ন্যায় উচ্চারিত হয় তাহাকে অর্দ্ধক কহে।

(৭) জিহ্বামূলে সংযমিত স্বরকে বা অব্যক্ত স্বরকে গ্রস্ত কহে।

(৮) নিষ্ঠুর অর্থাৎ কর্কশ স্বরকে নিরস্ত কহে।

(৯) সামবেদের স্বরের ন্যায় উচ্চারিত স্বরকে প্রগীত কহে।

(১০) সমীপস্থিত বর্ণের স্বর গীত হইলে তাহার অনুরক্ত স্বরকে উপগীত কহে।

(১১) কম্পিত স্বরের ন্যায় স্বরকে ক্ষ্বিণ্ণ কহে।

(১২) গম্ভীর স্বরকে রোমশ কহে।

(৮০তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৫২)

গ্রস্ত, নিরস্ত, অবিলম্বিত (১), নির্হত (২), অম্বূকৃত, ধ্মাত, বিকম্পিত, সন্দষ্ট (৩), এণীকৃত, অৰ্দ্ধক, দ্রুত এবং বিকীর্ণ (৪) ইহারাই স্বরের দোষ। এতদ্ভিন্ন ব্যঞ্জনের দোষও আছে।

ভাষ্য-মূল।—নৈষ দোষঃ। গর্গাদিবিদাদিপাঠাৎ সংবৃতাদীনাং নিবৃত্তির্ভবিষ্যতি। অস্ত্যন্যদ্ গর্গাদিবিদাদিপাঠে প্রয়োজনং, কিম্, সমুদায়ানাং সাধুত্বং যথা স্যাদিতি।

বঙ্গানুবাদ।—ইহা দোষ নহে। গর্গাদিবিদাদি পাঠ হইতেই সংবৃতপ্রভৃতির নিবৃত্তি হইবে। গর্গাদিবিদাদি পাঠ করাতে এতদ্ভিন্ন অপর প্রয়োজনও উক্ত আছে। কি? যাহাতে সমুদায়েরই সাধুত্ব হয়।

ভাষ্য-মূল।—এবং তর্হ্যষ্টাদশধাভিন্নাং নিবৃত্তকলাদিকামবর্ণস্য প্রত্যাপত্তিং বক্ষ্যামি। সা তর্হি বক্তব্যা। লিঙ্গার্থা তু প্রত্যাপত্তিঃ *। লিঙ্গার্থা সা তর্হি ভবতি। তৎ তর্হি বক্তব্যম্। যদ্যপ্যেতদুচ্যতে। অথবৈতর্হি অনেকমনুবন্ধশতং নোচ্চার্য্যমিৎসংজ্ঞা চ ন বক্তব্যা লোপশ্চ ন বক্তব্যঃ। যদনুবন্ধৈঃ ক্রিয়তে তৎকলাদিভিঃ করিষ্যতে। সিধ্যত্যেবম্ অপাণিনীয়ং তু ভবতি। যথান্যাসমেবাস্তু।

বঙ্গানুবাদ।—এইরূপ তবে অষ্টাদশবিভাগে বিভক্ত, কলপ্রভৃতিরহিত অবর্ণের সমাধান বলিব। তবে তাহা অর্থাৎ অবর্ণের প্রত্যাপত্তি বলিব। প্রত্যাপত্তি লিঙ্গার্থ। তবে তাহা অর্থাৎ প্রত্যাপত্তি লিঙ্গার্থ হইবে। তবে তাহা বলা উচিত। যদ্যপি ইহা বলা হয়। অথবা এই কারণে এত বহুতর অনুবন্ধ উচ্চারণ করিবার আবশ্যক নাই। ইৎ সংজ্ঞাও বলিবার আবশ্যক নাই। লোপও বলিবার আবশ্যক নাই। অনুবন্ধ যাহা করে, কল প্রভৃতিও তাহা করিবে অর্থাৎ অনুবন্ধের দ্বারা যে কার্য্য সাধিত হয়, কল প্রভৃতি দ্বারাও তাহা সাধিত হইবে। এইরূপে সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু তাহা অপাণিনীয় অর্থাৎ ভগবান পাণিনির মতানুযায়ী নহে। অতএব, যাহা আছে, তাহাই থাকুক।

ভাষ্য-মূল।—ননু চোক্তমাকৃত্যুপদেশাৎ সিদ্ধমিতিচেৎ সংবৃতাদীনাং প্রতিষেধ ইতি। পরিহৃতমেতৎ—গর্গাদিবিদাদিপাঠাৎ সংবৃতাদীনাং নিবৃত্তির্ভবিষ্যতি ইতি। ননু চ অন্যৎ গর্গাদিবিদাদিপাঠে প্রয়োজনমুক্তম্। কিম্। সমুদায়ানাং সাধুত্বং যথা স্যাদিতি। এবং তর্হ্যুভয়মনেন ক্রিয়তে পাঠশ্চৈব বিশেষ্যতে কলাদয়শ্চ নিবর্ত্ত্যন্তে।

বঙ্গানুবাদ।—পূর্ব্বে তো ইহা বলা হইয়াছে "যদি বল, আকৃতির উপদেশ করিলে সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সংবৃত প্রভৃতির প্রতিষেধ করা উচিত।" তাহা পরিহার করা হইয়াছে (যথা) —"গর্গাদিবিদাদির পাঠ হইতেই সংবৃত প্রভৃতির নিবৃত্তি হইবে। গর্গাদিবিদাদি পাঠ করাতে এতদ্ভিন্ন অপর প্রয়োজনও উক্ত আছে। কি? যাহাতে সমুদায়েরই সাধুত্ব হয়।" এইরূপ

(১) যাহা অপর বর্ণের সহিত মিশ্রিত হয় না, তাহাকে অবিলম্বিত কহে।

(২) রুক্ষ বা কর্কশ স্বরকে নির্হত কহে।

(৩) বৃদ্ধিপ্রাপ্তের ন্যায় স্বরকে সন্দষ্ট কহে।

(৪) অপরবর্ণে গতিশীল স্বরকে বিকীর্ণ কহে। কেহ কেহ বলেন, যাহা এক হইয়াও অনেকে প্রকাশ পায়, তাহাকে বিকীর্ণ কহে।

(মাঘ, ১৩০৩, পৃঃ ৫৩)

তবে ইহার দ্বারা উভয়ই সাধিত হয়। পাঠেরও বিশেষ অর্থাৎ প্রভেদ করা হয় এবং ফল প্রভৃতিও নিবৃত্ত হয়।

ভাষ্য-মূল।—কথং পুনরেকেন যত্নেনোভয়ং লভ্যম্। লভ্যমিত্যাহ। দ্বিগতা অপি হেতবো ভবন্তি। তদ্ যথা,—আম্রাশ্চ সিক্তা পিতরশ্চ প্রীণীতা ইতি। তথা বাক্যানি দ্বিষ্ঠানি ভবন্তি। শ্বেতো ধাবতি অলম্বুসানাং যাতেতি।

বঙ্গানুবাদ। একপ্রকার যত্নে কি প্রকারে উভয় লাভ করিতে পারা যায়? লাভ করিতে পারা যায়, ইহা উক্ত আছে। হেতুসকল দ্বিগামীও হয়; যেমন, আম্রবৃক্ষও সেচন করা হইতেছে এবং পিতৃলোকের তর্পণও সাধিত হইতেছে। (এই বাক্যে আম্রবৃক্ষের সিঞ্চন এবং পিতৃলোকের তর্পণ এই উভয় হেতুই সাধিত হইতেছে।) তদ্রূপ, বাক্যসকলও দ্বিগামী হয়। (যেমন)—অলম্বুস দেশে গমনাকাঙ্ক্ষী শ্বেতনামক ব্যক্তি দৌড়াইতেছে। (এই বাক্যে শ্বেত-নামক ব্যক্তির অলম্বুস দেশে গমন এবং দৌড়ান এই উভয় ক্রিয়াই সাধিত হইতেছে।)

ভাষ্য-মূল।—অথবা ইদং তাবদয়ং প্রষ্টব্যঃ কেমে সংবৃতাদয়ঃ শ্রূয়েরন্নিতি। আগমেষু, আগমাঃ শুদ্ধাঃ পঠ্যন্তে। বিকারেষু, তর্হি বিকারাঃ শুদ্ধাঃ পঠ্যন্তে। প্রত্যয়েষু, তর্হি প্রত্যয়াঃ শুদ্ধাঃ পঠ্যন্তে। ধাতুষু, তর্হি ধাতবোঽপি শুদ্ধাঃ পঠ্যন্তে। প্রাতিপদিকেষু, তর্হি প্রাতিপদিকান্যপি শুদ্ধানি পঠ্যন্তে। যানি তর্হ্যগ্রহণানি প্রাতিপদিকানি। এতেষামপি স্বরবর্ণানুপূর্ব্বীজ্ঞানার্থ উপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ। শশঃ ষষ ইতি মা ভূৎ। পলাশঃ পলাষ ইতি মা ভূৎ। মঞ্চকো মঞ্জক ইতি মা ভূৎ।

"আগমাশ্চ বিকারাশ্চ প্রত্যয়াঃ সহ ধাতুভিঃ।
উচ্চার্য্যন্তে ততস্তেষু নেমে প্রাপ্তা কলাদয়ঃ॥"

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবৎপতঞ্জলিবিরচিতে মহাভাষ্যে প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমপাদে প্রথমমাহ্নিকম্॥

বঙ্গানুবাদ।—অথবা ইহা এইপ্রকার হইল। কিন্তু, ইহা জিজ্ঞাস্য যে, এই সংবৃত প্রভৃতি কোন্ স্থলে শ্রুত হয়? যদি বল, আগমে (১)? তাহা হইলে আগমসকল শুদ্ধ পঠিত হয়। যদি বল, বিকারে (২)? তাহা হইলে বিকারসকল শুদ্ধ পঠিত হয়। যদি বল, প্রত্যয়ে (৩)? তাহা হইলে প্রত্যয়সকল শুদ্ধ পঠিত হয়। যদি বল, ধাতুতে (৪)? তাহা হইলে ধাতুসকলও শুদ্ধ পঠিত হয়। যদি বল, প্রাতিপদিকে (৫)? তাহা হইলে প্রাতিপদিকসকলও শুদ্ধ পঠিত

(১) কোন বর্ণের উপস্থিতি হওয়াকে আগম কহে। যেমন, "অগচ্ছৎ" এই স্থলে পূর্ব্বের অকারটিকে আগম কহে।

(২) কোন বর্ণের বিকৃতি-প্রাপ্তি হওয়াকে বিকার কহে। যেমন,—অন্ত + অন্ত এই দুই পদের সন্ধি করিলে "অন্তোঽন্ত" এইরূপ প্রয়োগ নিষ্পন্ন হয়। এই স্থলে অকার বিকৃত হইয়া ওকার হওয়াকেই বর্ণবিকার কহে।

(৩) মূলভাগের পর যাহা থাকে, তাহাকে প্রত্যয় কহে।

(৪) ক্রিয়াবাচী ভূ, স্থা, গম্ প্রভৃতিকে ধাতু কহে।

(৫) ধাতু, প্রত্যয় ও প্রত্যয়ান্ত ভিন্ন অর্থবিশিষ্ট শব্দ স্বরূপকে প্রাতিপদিক কহে এবং কৃৎ প্রত্যয়ান্ত ও সমাসনিষ্পন্ন শব্দকেও প্রাতিপদিক কহে।

(৮০তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৫৪)

হয়। তবে যে সকল অগ্রহণ প্রাতিপদিক আছে, ইহাদিগেরও স্বর ও বর্ণের আনুপূর্ব্বীজ্ঞানের নিমিত্ত অর্থাৎ পৌর্ব্বাপর্য্যানুসারে জ্ঞানের নিমিত্ত উপদেশ করা উচিত। "শশ" এই প্রকার উচ্চারণ করিতে "ষষ" এই প্রকার উচ্চারিত না হয়। "পলাশ" এই প্রকার উচ্চারণ করিতে "পলাষ" এই প্রকার উচ্চারিত না হয়। "মঞ্চক" এই প্রকার উচ্চারণ করিতে "মঞ্জক" এই প্রকার উচ্চারিত না হয়।

আগম, বিকার এবং ধাতুর সহিত প্রত্যয় অর্থাৎ ধাতু ও প্রত্যয় উচ্চারিত হয়। সেই হেতু উক্ত কল প্রভৃতির প্রাপ্তি হয় না।

শ্রীমদ্ ভগবান পতঞ্জলি মুনির বিরচিত মহাভাষ্যে প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পাদে প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত হইল।

প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমপাদে

দ্বিতীয়মাহ্নিকম্।

ভাষ্য-মূল।— অইউণ্। ১। (১)

অকারস্য বিবৃতোপদেশ আকারগ্রহণার্থঃ * ।

অকারস্য বিবৃতোপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ। কিং প্রয়োজনম্। আকারগ্রহণার্থঃ। অকারঃ সবর্ণগ্রহণেনাকারমপি যথা গৃহ্ণীয়াৎ। কিং চ কারণং ন গৃহ্ণীয়াৎ। বিবারভেদাৎ। কিমুচ্যতে বিবারভেদাদিতি ন পুনঃ কালভেদাদপি। যথৈব হ্যয়ং বিবারভিন্ন এবং কালভিন্নোঽপি।

বঙ্গানুবাদ।—"অইউণ্।" এই মাহেশ্বর সূত্রে অকারের বিবৃত উপদেশ করা উচিত। কি নিমিত্ত? আকারগ্রহণের নিমিত্ত। যাহাতে অকার সবর্ণের দ্বারা আকারকেও গ্রহণ করিতে পারে, তন্নিমিত্ত। কি কারণেই বা গ্রহণ না করিবে? বিবারভেদ বশতঃ (অর্থাৎ অকারের প্রযত্ন সংবার, আকারের প্রযত্ন বিবার; অতএব অকার এবং আকার এই উভয়ের প্রযত্নের পার্থক্য আছে এই নিমিত্ত বিবারের উপদেশ না করিলে অকার কোনপ্রকারেই আকারকে সবর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারে না।) কি বলিবেন? কেবল বিবারের ভেদ বশতই অকার সবর্ণরূপে আকারকে গ্রহণ করিতে পারে না, না, কালভেদেও অকার আকারকে সবর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারে না (অকার উচ্চারণ করিতে যত সময়ের আবশ্যক আকার উচ্চারণ করিতে তাহার দ্বিগুণ সময়ের আবশ্যক হয়। অতএব কেবল মাত্র বিবারভেদ বশতই

(১) অইউণ্। ১। ঋ৯ক্। ২। এওঙ্। ৩। ঐঔচ্। ৪। হযবরট্। ৫। লণ্। ৬। ঞমঙণনম্। ৭। ঝভঞ্। ৮। ঘঢধষ্। ৯। জবগডদশ্। ১০। খফছঠথচটতব্। ১১। কপয্। ১২। শষসর্। ১৩। হল্ ১৪। এই চৌদ্দটি সূত্রকে মহর্ষি পাণিনি মহেশ্বরের ঢক্কা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। এই নিমিত্তই বৈয়াকরণ সিদ্ধান্তকৌমুদীকার বলিয়াছেন "এতানি মাহেশ্বরসূত্রাণি অনাদিসংজ্ঞার্থানি।"

যে অকার সবর্ণরূপে আকারকে গ্রহণ করিতে পারে না তাহা বলিতে পারেন না, কিন্তু কালভেদেও আকারকে সবর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারে না)। অকার যেমন বিবার এই প্রযত্ন দ্বারা পার্থক্যবিশিষ্ট, তদ্রূপ উচ্চারণের সময় দ্বারাও পার্থক্যবিশিষ্ট (অর্থাৎ যেমন প্রযত্নও পৃথক তদ্রূপ উচ্চারণের স[illegible] পৃথক্)।

ভাষ্য-মূল। সত্যমেবমেতৎ। বক্ষ্যতি তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণমিত্যত্রাস্যগ্রহণস্য প্রয়োজনম্। আস্যে যেষাং তুল্যোদেশঃ প্রযত্নশ্চ তে সবর্ণসংজ্ঞা ভবন্তীতি। বাহ্যশ্চপুনরাস্যাৎ কালঃ। তেন স্যাদেব কালভিন্নস্য গ্রহণং ন পুনর্বিবারভিন্নস্য।

বঙ্গানুবাদ।—হাঁ ইহা সত্যই বটে। কিন্তু "তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্।" এই সূত্রে আস্য গ্রহণের প্রয়োজন বলিবেন। আস্যে অর্থাৎ মুখে যাহাদিগের দেশ অর্থাৎ উচ্চারণস্থান এবং প্রযত্ন তুল্য তাহারাই সবর্ণ হয়। কাল আস্য হইতে বহির্দেশে। অতএব উচ্চারণকাল পৃথক্ হইলেও তাহা সবর্ণরূপে গৃহীত হয়, কিন্তু বিবার দ্বারা পৃথক্ হইলে অর্থাৎ পৃথক্ প্রযত্ন হইলে তাহা সবর্ণরূপে গৃহীত হয় না।

ভাষ্য-মূল।—কিং পুনরিদং বিবৃতস্যোপদিশ্যমানস্য প্রয়োজনমন্বাখ্যায়তে আহোস্বিৎ সংবৃতস্যোপদিশ্যমানস্য প্রয়োজনমন্বাখ্যায়তে। কথং জ্ঞায়তে। "অ অ" ইত্যকারস্য বিবৃতস্য সংবৃততাপ্রত্যাপত্তিং শাস্তি। নৈতদস্তি জ্ঞাপকম্। অস্তি হ্যন্যদেতস্য বচনে প্রয়োজনম্। কিম্। অতিখট্টঃ অতিমাল ইত্যত্রান্তর্য্যতো বিবৃতস্য বিবৃতঃ প্রাপ্নোতি। সংবৃতঃ স্যাদিত্যেবমর্থা প্রত্যাপত্তিঃ। নৈতদস্তি। নৈব লোকে ন চ বেদেঽকারো বিবৃতোঽস্তি। কস্তর্হি। সংবৃতঃ। যোঽস্তি স ভবিষ্যতি। তদেতৎ প্রত্যাপত্তিবচনং জ্ঞাপকমেব ভবিষ্যতি বিবৃতস্যোপদিশ্যমানস্য প্রয়োজনমন্বাখ্যায়ত ইতি।

বঙ্গানুবাদ।—ইহাতে কি বিবৃত উপদেশ করা হইতেছে—তাহারই প্রয়োজন বলা হইতেছে অথবা সংবৃত উপদেশ করা হইতেছে—তাহারই বিবৃত উপদেশও বলা হইতেছে? বিবৃত উপদেশ করা হইতেছে তাহারই প্রয়োজন বলা হইতেছে। কি প্রকারে জানিতেছেন? যে হেতু ইহা "অ অ" এই সূত্রে বিবৃত অকারের সংবৃতবোধকত্ব উপদেশ করিতেছেন। ইহা জ্ঞাপক নহে। ইহা বলাতে অপর প্রয়োজনও আছে। কি? "অতিখট্ট" "অতিমাল" এই সকল স্থলে আন্তর্য্যানুসারে অর্থাৎ সবর্ণতানুসারে বিবৃতের বিবৃতত্ব প্রাপ্তি হয়, তাহা সংবৃত হইবে এই প্রকার প্রত্যাপত্তি (অর্থাৎ বোধকত্ব) উপস্থিত হয়। ইহা কোথাও নাই, লৌকিক প্রয়োগে অথবা বৈদিক প্রয়োগে অকার বিবৃত নাই (অর্থাৎ কি বৈদিক প্রয়োগ এবং কি লৌকিক প্রয়োগ ইহার কোথাও অকার বিবৃত দেখিতে পাওয়া যায় না, অকার সর্বত্রই সংবৃত।) তবে অকার কি প্রকার আছে? সংবৃত। যাহা আছে তাহাই হইবে। অতএব এই প্রত্যাপত্তিবচন অর্থাৎ বোধকতাবাক্য ইহারই জ্ঞাপক হইবে, যে বিবৃত উপদেশ করা হইতেছে, তাহারই প্রয়োজন কথিত হইতেছে।

(৮০তম, বর্ষ, ১ম সংখ্যা পৃঃ ৫৬)



উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

অন্যান্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা — স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য ১৩'০০, ২য় ভাগ পৃঃ ৫২৪, মূল্য ৮'০০

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—(ছাপা নাই)

ভারতে শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ। মূল্য ৩'০০

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৯১, মূল্য ৫'০০

স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ। পৃঃ ৩১০, মূল্য ৪'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ। (ছাপা নাই)

গোপালের মা — স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৪৪, মূল্য ১'৫০

শ্রীশ্রীরামানুজ-চরিত—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। (ছাপা নাই)।

আচার্য শঙ্কর—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৪৬. মূল্য ৬'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র—মূল্য ৭'৮০

শিবানন্দ-বাণী— স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত। ১ম ভাগ (ছাপা নাই) ; ২য় ভাগ-২'৫০

মহাপুরুষজীর পত্রাবলী— (ছাপা নাই)

সৎকথা — স্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত। (ছাপা নাই)

অদ্ভুতানন্দ-প্রসঙ্গ — স্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত। (ছাপা নাই)

স্মৃতি-কথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ। মূল্য ৪'০০

দিব্যপ্রসঙ্গে — স্বামী দিব্যাত্মানন্দ। (ছাপা নাই)

স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী— (ছাপা নাই)

আরতি-স্তব—মূল্য ০'৭০

পুণ্যস্মৃতি—স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ। পৃঃ ১১৬; মূল্য ৩'০০

মহাভারতের গল্প—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ পৃঃ ১২৮ ; সাধারণ ২'৫০, বোর্ড বাঁধাই ৩'০০ ৬ষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য সংক্ষেপিত "স্কুলপাঠ্য" সংস্করণ—পৃঃ ৭২ ; মূল্য ২'০০

শঙ্কর-চরিত — শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। সংস্করণ (৭ম) মূল্য ২'৫০

দশাবতার-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য পৃঃ ১০৮, মূল্য ২'৫০

সাধক রামপ্রসাদ —স্বামী বামদেবানন্দ। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৫'২০

সাধু নাগ মহাশয়—শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। পৃঃ ১৪৪, মূল্য ৩'৫০

ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী তেজসানন্দ। পৃঃ ১২৪, মূল্য ১'৫০

শিব ও বুদ্ধ—ভগিনী নিবেদিতা। পৃঃ ৬৩, মূল্য ০'৬৫

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ— (ছাপা নাই)

পত্রমালা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২ মূল্য ৪'০০

গীতাতত্ত্ব—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৭৬, মূল্য ৫'০০

লাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৪২০, মূল্য ১০'০০

পরমার্থ-প্রসঙ্গ — স্বামী বিরজানন্দ। পৃঃ ১৩৭, মূল্য ৪'০০

ভগবানলাভের পথ—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। (যন্ত্রস্থ)

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী — স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৩২, মূল্য ০'৬০

বিবিধ-প্রসঙ্গ—(ছাপা নাই)

কৈলাস ও মানসতীর্থ—স্বামী অপূর্বানন্দ। (ছাপা নাই)

তিব্বতের পথে হিমালয়ে—স্বামী অখণ্ডানন্দ। পৃঃ ১৮১, মূল্য ২'২৫

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-সঞ্চয়ন— পৃঃ ৩১৬, মূল্য ৭'৫০

PRINTED BY -

৮০।৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত।

সম্পাদক—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ : সংযুক্ত সম্পাদক—স্বামী ধ্যানানন্দ

বার্ষিক মূল্য ১২·০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১·২০ টাকা

উদ্বোধন

উত্তিষ্ঠত
জাগ্রত
প্রাপ্য
বরান্
নিবোধত



উদ্বোধন, ফাল্গুন, ১৩৮৪

সূচীপত্র

"ঈশ্বর লাভের জন্য সংসারে থেকে, এক হাতে ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধ'রে থাকবে আর এক হাতে কাজ করবে। যখন কাজ থেকে অবসর হবে, তখন দুই হাতেই ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধ'রে থাকবে, তখন নির্জনে বাস ক'রবে, কেবল তাঁর চিন্তা আর সেবা ক'রবে।"

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

উদ্বোধনের মাধ্যমে
প্রচার হোক
এই বাণী। শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়



দিব্য বাণী

সল্লোকা বিষয়বিরাগিণো যদর্থং
সন্ত্যক্তঃ সুখনিবহো বুধৈশ্চ বাল্যাৎ।
যল্লব্ধুং কঠিনতপো হি চর্যতে জ্ঞৈ-
র্লিপ্সন্তে ত্রিদশগণাঃ সদা পদং যৎ॥

যস্মান্নাস্তি ভগবতো হি কিঞ্চিদূর্ধ্বং
সুপ্রাপ্যশ্চ ন খলু কস্যচিদ্ যতোঽন্যঃ।
সোঽসাবেব পরমহংস-রামকৃষ্ণঃ
সর্বজ্ঞঃ সকলমনোমতঃ প্রশান্তঃ॥

—স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ : শ্রীরামকৃষ্ণাবতারস্তোত্রম্, ১, ২

সজ্জন (গৃহস্থগণ) যাঁর তরে বিষয়-বিরাগী,
আশৈশব সুখরাশি ত্যজে বুধগণ যাঁর লাগি,
জ্ঞানিগণ আচরেন সুকঠোর তপ যাঁর তরে,
দেবগণ সততই যেই পদ অভিলাষ করে,
যেই পরমেশ হতে বড় কেহ নন
যিনি সবচেয়ে সহজেই লভ্য হন—
সকলের মনোমত প্রশান্ত পরমহংস তিনি
রামকৃষ্ণ সর্ববিৎ (—নররূপে অবতীর্ণ যিনি)।

কথাপ্রসঙ্গে

'জগদম্বার বালক'

স্বামী সারদানন্দজী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গের একাধিক স্থলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে 'জগদম্বার বালক' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বাস্তবিক বালকভাবই যে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন-সঙ্গীতের মূল সুর, তাহা আমরা লীলাপ্রসঙ্গ ও কথামৃত পাঠ করিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারি। এই গ্রন্থদ্বয়ে বিবৃত ও উদ্ধৃত শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জীবনের বহু ঘটনা ও উক্তি এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে অকাট্য প্রমাণ। ঘটনা ও উক্তিগুলি অনেকেরই সুবিদিত। তথাপি সেগুলি চির নূতন। যতই আলোচনা করা যায়, ততই মঙ্গল। এইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে আমরা এ-বিষয়ে কিছু আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনকালে তাঁহার খুল্লতাতপুত্র, বয়োজ্যেষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত রামতারক চট্টোপাধ্যায় বা হলধারী দক্ষিণেশ্বরে প্রথমে কালীমন্দিরে ও পরে রাধাগোবিন্দজীর মন্দিরে পূজাকার্যে ব্রতী হন। কালীমূর্তি তামসী বলিয়া ধারণা হওয়ায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবকে বলেন, তামসী মূর্তির উপাসনায় আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে পারে না, সুতরাং কালীর আরাধনা নিরর্থক। শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যথিত হৃদয়ে কালীমন্দিরে যাইয়া সজল নয়নে হলধারীর কথা জগদম্বাকে নিবেদন করিলে জগদম্বা তাঁহাকে নিজ স্বরূপ জানাইয়া দিলেন। জগদম্বার বালক মায়ের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া সোল্লাসে হলধারীর নিকট ছুটিয়া যাইয়া একেবারে তাঁহার স্কন্ধে চাপিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, 'তুই মাকে তামসী বলিস! মা কি তামসী? মা যে সব—ত্রিগুণময়ী, আবার শুদ্ধ-সত্ত্বগুণময়ী।' শ্রীশ্রীঠাকুরের ভিতর জগদম্বার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া হলধারী ফুলচন্দনাদি লইয়া তাঁহার পাদপদ্মে ভক্তিভরে অঞ্জলি প্রদান করিলেন।

কিন্তু পাণ্ডিত্যাভিমানী হলধারী শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হইলেই এই ঐশ্বরিক প্রকাশের কথা বিস্মৃত হইতেন। একদা তিনি শাস্ত্রসহায়ে ঈশ্বরকে ভাবাভাবের অতীত বলিয়া নির্দেশ করিয়া ঠাকুরকে বিষম চিন্তায় ফেলিয়াছিলেন। ঠাকুর ভাবিলেন, ভাবাবেশে তিনি যে-সকল ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করিয়াছেন, সে-সবই হয়তো ভুল এবং বালকের ন্যায় অভিমানে কাঁদিতে কাঁদিতে জগন্মাতাকে বলিলেন, 'মা, নিরক্ষর মুখ্যু ব'লে আমাকে কি এমনি ক'রে ফাঁকি দিতে হয়!' জগদম্বার কৃপায় তিনি ঐ-সময়ে সৌম্যমূর্তি এক দিব্যপুরুষকে দর্শন করেন। তিনি ঠাকুরকে গম্ভীর স্বরে তিনবার বলেন, 'ওরে তুই ভাবমুখে থাক।'

আর একবার হলধারীর কথায় ঠাকুরের মনে অনুরূপ সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় জগদম্বা একটি স্ত্রীলোকের বেশে আবির্ভূতা হইয়া ঐ একই নির্দেশ তাঁহাকে দিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বালকভাবে ছিলেন বলিয়া সহজেই পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তিতর্কের দ্বারা বিচলিত ও উদ্বিগ্ন হইতেন। হলধারী-সম্পর্কিত এই সকল ঘটনার বহু বৎসর পরেও, আমরা দেখি, কিশোর নরেন্দ্রনাথের কথায় তিনি বারংবার বিষম চিন্তান্বিত। 'মা দেখিয়েছেন', 'মা আমাকে দিয়ে বলিয়েছেন'—এই ধরনের কথার প্রতিবাদে সত্যনিষ্ঠ নরেন্দ্রনাথের শাণিত যুক্তি-তর্ক শুনিয়া তাঁহার সরল মন অভিভূত হইয়াছে

এবং মীমাংসার জন্য তিনি জগদম্বাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জগদম্বার আশ্বাসবাণী শুনিয়া তবেই নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

নিজের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গভীর ভালবাসা লক্ষ্য করিয়া একবার নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বলেন যে, হরিণের চিন্তা করিতে করিতে মৃত্যু হওয়ায় পুরাণোক্ত ভরতরাজাকে হরিণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল, এ-কথা স্মরণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সতর্ক হওয়া উচিত। বালকের ন্যায় সরল ঠাকুর দারুণ বিমর্ষ হইয়া জগদম্বাকে নরেন্দ্রের সাবধানবাণী নিবেদন করিতে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে সহাস্যে ফিরিয়া আসিয়া নরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "যা শালা, আমি তোর কথা শুনবো না; মা বললেন, 'তুই ওকে সাক্ষাৎ নারায়ণ ব'লে জানিস, তাই ভালবাসিস, যেদিন ওর ভেতরে নারায়ণকে না দেখতে পাবি, সেদিন ওর মুখ দেখতেও পারবি না।' "

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব সমবেত ভক্তদের বুঝাইয়া দিতেছিলেন যে, ভক্তের স্বভাব চাতক পাখীর মতো হয়। চাতক পাখী যেমন তৃষ্ণানিবারণের জন্য একমাত্র মেঘের উপরই নির্ভর করে, ভক্তও তেমনই প্রাণের পিপাসা মিটাইবার জন্য একমাত্র ভগবানের উপরই নির্ভর করে। নরেন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করিয়া বলেন, তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন যে, চাতক অন্যান্য পাখীর মতোই তৃষ্ণানিবারণ করে। বালকস্বভাব শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভাবিলেন, তাঁহার এতকালের ধারণাটি যখন মিথ্যা হইল, তখন অন্য ধারণাগুলিও মিথ্যা হইতে পারে। এই ভাবিয়া তিনি বিশেষ বিষণ্ন হইলেন। কয়েক দিন পরেই নরেন্দ্রনাথ একদিন ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ঐ দেখুন মশায়, চাতক গঙ্গায় জল খাচ্ছে।' ঠাকুর ব্যস্ত হইয়া আসিয়া দেখিলেন যে, একটি চামচিকা জলপান করিতেছে এবং নরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, 'ওরে শালা, তুই চামচিকাকে চাতক মনে ক'রে আমাকে এতটা ভাবিয়েছিস! তোর সব কথায় আর বিশ্বাস করবো না।'

কোনও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, বিশেষতঃ পণ্ডিত, ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিবেন শুনিলেই বালকস্বভাব ঠাকুর ভয় পাইতেন। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ঠাকুরকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে আসিতেছেন শুনিয়া ঠাকুর তাঁহার যুবক ভক্তদের অনেককে বলিলেন যে, পণ্ডিতজী যখন আসিবেন, তখন তাহারা যেন উপস্থিত থাকে। স্বামী সারদানন্দজী লিখিয়াছেন, 'আহা, সে ছেলেমানুষের মতো ভয়ের কথা অপরকে বুঝানোও দুষ্কর।' ঠাকুরের মনের ভাব বিশ্লেষণ করিয়া তিনি আরও লিখিয়াছেন, 'বালক যেমন কোনও অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিলে ভয়ে লজ্জায় জড়সড় হয়, আবার একটু পরিচয় হইলে সেই ব্যক্তিরই কাঁধে পিঠে চড়িয়া চুল টানিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে নানারূপ মিষ্ট অত্যাচার করে—ঠাকুরের এই ভাবটিও তদ্রূপ।' আমাদের মনে রাখিতে হইবে শশধর-পণ্ডিত যখন ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসেন, তখন ঠাকুরের বয়স আটচল্লিশ পার হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, ঠাকুর ঐদিনের কথা পরদিবস নিজেই বিস্তারিত বলিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীমুখের কথা: "মুখ্যু-শুখ্যু মানুষ, পণ্ডিত দেখা করতে আসবে শুনে বড় ভয় হ'ল। এই তো দেখছো, পরনের কাপড়েরই হুঁশ থাকে না, কি বলতে কি বলবো ভেবে একেবারে জড়সড় হলুম। মাকে বললুম, দেখিস মা, আমি তো তোকে ছাড়া শাস্তর মাস্তর কিছুই জানি না, দেখিস।'

পণ্ডিত যখন এসে বসলো, তখনও ভয় রয়েছে—চুপ ক'রে বসে তার দিকেই দেখছি, তার কথাই শুনছি, এমন সময়ে দেখছি কি—যেন তার ভেতরটা মা দেখিয়ে দিচ্ছে ··· তারপরেই সড় সড় ক'রে একটা মাথার দিকে উঠে গেল আর ভয়-ডর সব কোথা চলে গেল! একেবারে বিভ্‌ভুল হয়ে গেলুম! মুখ উঁচু হয়ে গিয়ে তার ভেতর থেকে যেন একটা কথার ফোয়ারা বেরুতে লাগলো —এমনটা বোধ হতে লাগলো! যত বেরুচ্ছে, তত ভেতর থেকে যেন কে ঠেলে ঠেলে যোগান দিচ্ছে!··· কিন্তু কি সব বলেছি, তা কিছুই জানি না! যখন হুঁশ হ'ল, তখন দেখছি কি যে, সে কাঁদছে, একেবারে ভিজে গেছে!"

কেশবচন্দ্র সেন যেদিন খবর পাঠান যে, পাদ্রি কুক সাহেবকে লইয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসিতেছেন এবং ঠাকুরকে লইয়া জাহাজে করিয়া গঙ্গায় বেড়াইতে যাইবেন, সেদিনের প্রসঙ্গে ঠাকুর নিজেই বলিয়াছিলেন: "ভয়ে কেবলই ঝাউতলার দিকে (শৌচে) যাচ্ছি! তারপর যখন তারা এলো আর জাহাজে উঠলুম, তখন ··· কত কি বলেছিলুম! পরে এরা (ভক্তেরা) সব বললে, 'খুব উপদেশ দিয়েছিলেন।' আমি কিন্তু বাপু কিছুই জানিনি।"

এই সকল ক্ষেত্রে জগদম্বা নিজেই 'রাশ ঠেলে' দিতেন, তাই ঠাকুরকে আর ভাবিয়া-চিন্তিয়া কথা বলিতে হইত না। একবার স্থির হইয়াছিল, ঠাকুর রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়ী যাইবেন। সেদিন সেখানে কেশব সেন ও আরও অনেকে আসিবেন। ঠাকুর ঠিক করিয়াছিলেন, গোটাকতক কথা বলিবেন। রাধাবাজারে ফটো তোলাইতে লইয়া যাওয়ায় সে-সকল কথা বিস্মৃত হইলেন। তখন বলিলেন, 'মা, তুই বলবি। আমি আর কি বলবো!' পরবর্তী কালে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'আমার স্বভাব এই—আমার মা সব জানে। রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়ী তিনি কথা কবেন। সেই কথাই কথা। সরস্বতীর জ্ঞানের একটি কিরণে এক হাজার পণ্ডিত থ হয়ে যায়!'

দৃষ্টান্ত আর বাড়াইব না, কারণ পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিবার আশঙ্কা আছে। এখন আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের কয়েকটি উক্তি স্মরণ করিতেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, 'গুরু, কর্তা আর বাবা —এই তিন কথায় আমার গায়ে কাঁটা বেঁধে।' ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেন, "আমি তাঁর ছেলে, চিরকাল বালক, আমি আবার 'বাবা' কি!", 'ঈশ্বরই কর্তা, আমি অকর্তা, তিনি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র', "গুরু এক সচ্চিদানন্দ, তিনিই শিক্ষা দিবেন। আমার সন্তানভাব। যদি কেউ আমায় গুরু বলে, আমি বলি, 'দূর শালা, গুরু কি রে? এক সচ্চিদানন্দ বই আর গুরু নেই।'" ঐ একই কারণে অর্থাৎ তিনি জগদম্বার বালক বলিয়া বারংবার বলিয়াছেন, 'আমার আশীর্বাদ করতে নেই।'

তাঁহার যত কিছু অভাব-অভিযোগ সবই জগদম্বার নিকট, কোনও মানুষের নিকট নহে। অসুখ হইলে তিনি অধীর হইতেন। সে-কথা ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন, 'কেন আমি অসুখ হ'লে অধৈর্য হই! আমায় বালকের স্বভাবে রেখেছে। বালকের সব নির্ভর মার উপর।'

"হাত যখন ভেঙ্গে গেল, মাকে বললুম, 'মা, বড় লাগছে।' তখন দেখিয়ে দিলে গাড়ী আর তার ইঞ্জিনীয়ার। গাড়ীর একটা-আধটা ইস্ক্রু আলগা হয়ে গেছে। ইঞ্জিনীয়ার যেরূপ চালাচ্ছে, গাড়ী সেইরূপ চলছে। নিজের কোন ক্ষমতা নেই।"

একবার যখন খুব পেটের অসুখ, ভাগিনেয় ও সেবক হৃদয় নীরোগ হইবার জন্য জগদম্বার

নিকট প্রার্থনা জানাইতে বলিয়াছিলেন। সেই ঘটনা সম্পর্কে ঠাকুরের উক্তি : "আমার রোগের জন্য বলতে লজ্জা হ'ল। বললুম, 'মা, সুসাইটিতে মানুষের হাড় দেখেছিলাম, তার দিয়ে জুড়ে জুড়ে মানুষের আকৃতি, মা! ঐ রকম ক'রে শরীর একটু [ঠিক] ক'রে দাও, তা হ'লে তোমার নামগুণকীর্তন করবো।"

মা অবশ্য কখনও শুনিতেন, কখনও শুনিতেন না! শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্তি : 'বলেছিলাম, তোর জ্ঞানী ও ভক্তের সঙ্গ করবো, তাই একটু শক্তি দে, যাতে হাঁটতে পারি—এখানে ওখানে যেতে পারি। তা হাঁটবার শক্তি দিলে না কিন্তু!'

যিনি সত্যসংকল্প, অণিমাদি ঐশ্বর্য যাঁহার স্বভাবসিদ্ধ, তিনি চাহিয়াও হাঁটিবার শক্তি পাইলেন না—খুবই আশ্চর্য ব্যাপার! ইহারই নাম নরলীলা। নরলীলায় সব নরবৎ হইয়া থাকে। বালকের অবস্থা—সবই ঠিক ঠিক বালকের ন্যায়। বালকের প্রার্থনায় আঁট থাকে কতটুকু! বাহিরে দেখিতে আঁট—বস্তুত: তাহার কোন বিষয়েই আঁট থাকে না। সত্য-সংকল্পত্বাদি যাঁহাদের সাধনলব্ধ ঐশ্বর্য, সেই জীবকোটি পরমহংসগণেরও কোনই বাসনা থাকে না, অবতারপুরুষদের তো 'কা কথা'! শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেই 'শ্রীম'কে বলিতেছেন—'বাসনা গেলেই এই অবস্থা!' বলিয়াই তৎক্ষণাৎ জগন্মাতার সহিত কথা বলিতেছেন—'মা, পূজা উঠিয়েছ;—সব বাসনা যেন যায় না! পরম-হংস তো বালক—বালকের মা চাই না? তাই তুমি মা, আমি ছেলে। মার ছেলে মাকে ছেড়ে কেমন ক'রে থাকে!'

এই ধরনের বহু উক্তি আমরা কথামৃত ও লীলাপ্রসঙ্গে পাই।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বালকভাবের বিস্তারিত বিবরণ লীলাপ্রসঙ্গের বিভিন্ন খণ্ডে স্বামী সারদানন্দজী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যান্য পার্ষদগণেরও উক্তিতে বা পত্রে তাঁহার বালকভাবের উল্লেখ দেখা যায়। স্বামী তুরীয়ানন্দজীর একটি পত্রে আছে যে, তিনি একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে যাইয়া দেখিলেন, বেদান্তের একজন বড় পণ্ডিত আসিয়াছেন; ঠাকুর তাঁহাকে বেদান্ত শুনাইতে বলিলে পণ্ডিত অতি শ্রদ্ধার সহিত প্রায় এক ঘণ্টা বেদান্ত ব্যাখ্যা করেন; সকলেই আশ্চর্য হন, ঠাকুরও খুব প্রীত হন; ঠাকুর তাঁহার প্রশংসা করিয়া পরে কিন্তু বলেন, "আমার কিন্তু বাপু অত শত ভাল লাগে না। আমার মা আছেন আর আমি আছি। তোমাদের ও বড় বড় জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা, ধ্যান-ধ্যেয়-ধ্যাতা ইত্যাদি ত্রিপুটি প্রভৃতি খুব ভাল। আমার হচ্ছে কিন্তু 'মা আর আমি'—আর কিছু নেই!" তুরীয়ানন্দজী লিখিয়াছেন, "এই ক'টি কথা এমনি ক'রে বললেন যে, 'মা আর আমি' যেন সকলের হৃদয়ে অন্তত: সেই সময়ের জন্য বিশেষভাবে বদ্ধমূল হয়ে গেল, যেন বেদান্ত-সিদ্ধান্ত সমস্ত ফিকে বোধ হ'ল। বেদান্তের ঐ সব ত্রিপুটির চেয়ে যেন ঠাকুরের 'মা আর আমি' অতি সহজ সরল ও মনোজ্ঞ বলিয়া মনে হইল। সেই অবধি বুঝিলাম 'মা আর আমি' ইহাই অবলম্বনীয়।"

এক ব্যক্তি স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর নিকট জানিতে চান প্রথম দর্শনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তাঁহার কিরূপ মনে হইয়াছিল। উত্তরে মহারাজ বলেন, 'ঠিক যেন একটি শিশু। শিশুর চেয়েও সরল ও পবিত্র। তিনি এ জগতের কিছু জানতেন না। জগজ্জননীর চিন্তা ব্যতীত তাঁর অন্য কোন চিন্তা ছিল না।'

যুবক গঙ্গাধরকে (ভাবী স্বামী অখণ্ডানন্দ) শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন 'প্রার্থনা কেমন ক'রে করতে হয়, জানিস?' বলিয়াই ছোট ছেলের মতো হাত-পা ছুঁড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন, 'মা, আমায় জ্ঞান দে, ভক্তি দে। আমি যে কিছু চাইনে মা! আমি যে তোকে ছাড়া আর থাকতে পারছিনে মা!' তাঁহার পরিহিত বস্ত্র খসিয়া পড়িয়াছিল। অশ্রুধারে বুক ভাসিয়া যাইতেছিল—তিনি গভীর সমাধিমগ্ন হন। তাঁহার সেই মূর্তি দেখিয়া গঙ্গাধরের মনে হইয়াছিল ঠিক যেন একটি বালক।

স্বামী শিবানন্দজীর কথায় আছে, 'ঠাকুরের সে কি ভাব! পাঁচ বছরের ছেলের মতো ··· মেয়েদেরও কখনও ভাববিপর্যয় হ'ত না।'

বালকভাবই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন-সঙ্গীতের মূল সুর হইলেও, 'আগন্তুক' বা অপ্রধান সুর অনেক আছে। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, দক্ষিণেশ্বরে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবকে দর্শন করিতে যাইলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব মা দুর্গার বাহন সিংহ দেখিতে চিড়িয়াখানায় যাইবার বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং সেই-দিনই তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া চিড়িয়াখানায় লইয়া যাইতে বলেন। শিবনাথবাবুর সেদিন অন্য কাজ থাকায় স্থির হয় যে, তিনি মেট্রো-পলিটান ইনস্টিটিউশন অবধি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে লইয়া যাইবেন এবং সেখান হইতে নরেন্দ্রনাথ—যিনি তখন ঐ স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন—তাঁহার সঙ্গী হইবেন। ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণদেব পীড়াপীড়ি করিয়া শিবনাথবাবুর বামদিকে বসেন এবং নিজ চাদরটি মাথায় টানিয়া দেন। নবোঢ়া বধূর ন্যায় এইরূপ আচরণ করিতে দেখিয়া শিবনাথবাবু উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন, 'দেখছো না, আমি এখন স্ত্রীলোক—প্রণয়ীর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছি!' বস্তুতঃ তাঁহার হাবভাব সম্পূর্ণ রমণীজনোচিত হইয়াছিল এবং তাঁহার মুখমণ্ডল এক অত্যাশ্চর্য আধ্যাত্মিক জ্যোতিতে ভরিয়া গিয়াছিল। বাহ্যচেতনা সম্পূর্ণ হারাইবার পূর্বে তিনি বলিতে থাকেন, 'মা, আদরিণী মা আমার! আমাকে বেহুঁশ করিসনি মা! আমি সিংহ দেখতে চিড়িয়া-খানায় যাচ্ছি, গাড়ী থেকে পড়ে না যাই মা! যেন ঠিক থাকি—চিড়িয়াখানা অবধি যেন যেতে পারি মা!' কথাগুলি বলিতে বলিতে তিনি সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানরহিত হইয়া পড়েন। কিছুক্ষণ পরে বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বালকবৎ কথাবার্তা শুরু করেন এবং গাড়ী স্কুলের নিকট পৌঁছিলে নরেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া পাঠানো হয়।

শিবনাথবাবুর বর্ণিত উপরি-উক্ত ঘটনাটি শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের একটি বিরল বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে। তিনি শ্রীমতীর ভাব, সখীভাব, কৌশল্যার ভাব, হনুমানের ভাব ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবে সাধনা করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেকটি ভাবেই সিদ্ধিলাভ করিয়া সমস্ত ভাবের সমন্বয় করিয়াছিলেন। এইজন্যই উত্তরকালে তাঁহার ভিতর বিভিন্ন ভাবাবস্থা দেখা যাইত। তাঁহার শিষ্য মহাত্মা রামচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন, কোন এক দোলপূর্ণিমার দিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব কীর্তন করিতেছিলেন—'সব সখীগণ তোরা সাক্ষী থাক, আজ ফাগ-রণে তুমি হার কি আমি হারি!' তিনি শ্রীমতীর ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া ঐ গানটি গাহিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে দৌড়াইয়া গিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জনীর দ্বারা যেন শ্রীকৃষ্ণের বক্ষোদেশ স্পর্শ করিতেছিলেন। সেই অপূর্ব

দৃশ্য দেখিয়া রামবাবুর মনে হইয়াছিল, রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ভাব জগতে আর কিছুই নাই।

বহু বিচিত্র আধ্যাত্মিক ভাবের অভিনব মিলনভূমি শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবন। 'ভাব-রাজ্যের তিনি মূর্তিমান রাজা'—তাঁহার 'ভাবের ইতি নাই'। তাঁহার সাধ ছিল তিনি 'শুঁটকো সাধু' হইবেন না—হইবেন 'ভক্তের রাজা'। জগদম্বা তাঁহার সে-সাধ পূর্ণ করিয়াছিলেন। সানাই-এর উপমা দিয়া তিনি নিজেই বলিতেন, "সানাইতে একজন পোঁ ধরে, আরেক জন নানা সুরের লহরী তুলে কত রাগরাগিণী আলাপ করে। আমারও ঐ ভাব। আমার সাত ফোকর থাকতে শুধু কেন পোঁ করবো—কেন শুধু 'সোঽহং' 'সোঽহং' করবো! আমি সাত ফোকরে নানা রাগরাগিণী বাজাবো। শুধু 'ব্রহ্ম', 'ব্রহ্ম' কেন করবো! শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য, মধুর সব ভাবে তাঁকে ডাকবো—আনন্দ করবো, বিলাস করবো।"

তাই বালকভাব তাঁহার প্রধান ভাব হইলেও অন্য ভাবগুলিকে আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। তিনি নিজে 'একঘেয়ে' ছিলেন না এবং অপরকেও বলিতেন, 'একঘেয়ে হোস নি।' ইহার অর্থ এই নয় যে, আমরা সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণ হইব এবং তাঁহার ন্যায় বহু ভাবে সচ্চিদানন্দ-বস্তুকে আস্বাদন করিতে পারিব—অর্থ শুধু এই যে, আমরা আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ ভাবে নিষ্ঠা বজায় রাখিয়া তাবৎ ঈশ্বরীয় ভাবের প্রতি যথোচিত উদারতা, শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইব না।

'হরিমীড়ে'-স্তোত্রম্

স্তোত্র-রচয়িতা: আচার্য শংকর; টীকাকার: স্বয়ংপ্রকাশ-যতি

অনুবাদক: স্বামী ধীরেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

টীকা: ননু অবস্থা-ত্রয়-বিশিষ্টঃ সুখী দুঃখী চ আত্মা প্রতিদেহং ভিন্নঃ এব প্রকাশতে; —তস্য একত্বে সুখিত্ব-দুঃখিত্বাদি-বৈচিত্র্যানুপপত্তেঃ, দেবদত্তস্য যজ্ঞদত্ত-দুঃখাদ্যনুসন্ধান-প্রসঙ্গাৎ চ, কথম্ অদ্বিতীয়ানন্দ-রূপেণ বেদান্তবেদ্যতা ইতি আশঙ্ক্য তস্য সর্বদেহেষু বস্তুতঃ একত্বে অপি অবচ্ছেদকোপাধিতঃ অনির্বচনীয়-ভেদস্য অঙ্গীকারাৎ—এক-শরীরাবচ্ছিন্নাত্মনি পাদে মে বেদনা শিরসি মে সুখম্ ইতি অনুভবানুরোধেন তৎ-তদ্-অবয়বাবচ্ছেদেন সুখ-দুঃখ-বৈচিত্র্যবৎ একস্মিন্ অপি তৎ-তচ্ছরীরাবচ্ছিন্নে তদুপপত্তিঃ; দেহভেদেন জন্মান্তরীয়-সুখাদ্যননুসন্ধানবৎ দেবদত্তস্য যজ্ঞদত্ত-সুখাদ্যননুসন্ধানোপপত্তেঃ চ ইতি আহ—

(মূলস্তোত্রম্ :)

পশ্যন্ শুদ্ধোঽপ্যক্ষর একো গুণভেদান্
নানাকারান্ স্ফাটিকবদ্ ভাতি বিচিত্রঃ।

ভিন্নশ্ছিন্নশ্চায়মজঃ কর্মফলৈর্ব-
স্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥১৭॥ (১)*

পশ্যন্ ইতি। **যঃ** স্বতঃ **শুদ্ধঃ** সুখদুঃখাদি-সম্বন্ধ-শূন্যঃ ; **অক্ষয়ঃ** নাশরহিতঃ ব্যাপকঃ বা ; **অজঃ** জনিরহিতঃ ; একঃ অদ্বিতীয়ঃ **অপি গুণভেদাৎ** সত্ত্ব-রজস্তমঃ-পরিণাম-ভেদাৎ **নানাকারান্** সুর-নর-তির্যগাদ্যাকার-ভেদান্ **পশ্যন্** ; তত্র তাদাত্ম্যা-ধ্যাসাৎ **কর্মফলৈঃ** সুখদুঃখৈঃ **বিচিত্রঃ** নানারূপঃ ; **ভিন্নঃ** অনেকঃ পরিচ্ছিন্নঃ **চ ভাতি স্ফাটিকবৎ** ; যথা স্ফাটিকশিলা রক্তকাদ্যুপাধিভেদাৎ বিচিত্রা অনেকা চ ভাতি তথা ইতি অর্থঃ। **অয়ং ছিন্নঃ,** দেহান্তরে অজ্ঞায়মানঃ চ ভবতি। (২)

তথা চ শ্রুতিঃ—'এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥' [ব্রহ্মবিন্দু উ. ১২]। ভূতঃ পরমার্থঃ, আত্মা ভূতে ভূতে দেহে দেহে, একধা স্বেন রূপেণ, বহুধা উপাধ্যাহিত-রূপেণ ইতি অর্থঃ। (৩)

সূত্রকারঃ অপি 'অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ' [ব্র. সূ. ২।৩।৪৯] ইতি সূত্রেণ,—অসন্ততেঃ উপাধি-পরিচ্ছেদাৎ অব্যতিকরঃ জীবানাং সুখদুঃখাদ্যসাংকর্যম্ ইতি স্বমতে সুখদুঃখাদি-বৈচিত্র্যম্ উপপাদ্য, 'অদৃষ্টানিয়মাৎ' [ব্র. সূ. ২।৩।৫১] ইত্যাদি-সূত্রত্রয়েণ সর্বগত-বাস্তবানেকাত্মবাদি-মতে সর্বেষু শরীরেষু অপি সর্বেষাম্ আত্মনাং সন্নিধানাৎ সর্বসন্নিধৌ উৎপদ্যমানাদৃষ্টস্য সাধারণ্যাৎ সুখদুঃখাদি-সাংকর্যম্ আপাদয়ামাস। (৪)

ততঃ আত্মৈকত্বে দোষাভাবাৎ তস্মাৎ অদ্বয়ানন্দরূপেণ বেদান্তবেদ্যতা উপপদ্যতে ইতি ভাবঃ ॥১৭॥ (৫)

টীকানুবাদ : শঙ্কা : আত্মা অবস্থাত্রয়বিশিষ্ট এবং সুখী দুঃখী—[এইরূপেই] প্রতিদেহে ভিন্ন ভিন্ন ভাবেই প্রকাশিত হন ; তাঁহার (আত্মার) একত্ব হইলে সুখিত্ব-দুঃখিত্বাদি-রূপ বৈচিত্র্য অনুপপন্ন হয় বলিয়া, এবং দেবদত্তের[ও] যজ্ঞদত্তের দুঃখাদির অনুভবের প্রসঙ্গ হয় বলিয়া (যজ্ঞদত্তের সুখদুঃখে দেবদত্তেরও সুখদুঃখের প্রাপ্তি হয় বলিয়া) [আত্মা] অদ্বিতীয় আনন্দরূপে বেদান্তের বেদ্য কেমন করিয়া হইবেন—এই আশঙ্কা করিয়া [তাহার উত্তরে বলিতেছেন—] সর্বদেহে তাঁহার (আত্মার) বস্তুতঃ একত্ব হইলেও অবচ্ছেদক (ব্যাবর্তক) উপাধিবশতঃ অনির্বচনীয় ভেদের অঙ্গীকার করা হয় বলিয়া [দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হইতেছে —] এক শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মাতেই 'আমার পায়ে বেদনা, মস্তকে সুখ'—এইরূপ অনুভব হয় বলিয়া সেই সেই অবয়ব-অবচ্ছেদে (অবয়বভেদে) সুখ এবং দুঃখের বৈচিত্র্যের ন্যায় এক আত্মাতেই সেই

* এই মাস হইতে টীকাটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত করা হইতেছে এবং অনুচ্ছেদগুলির শেষে (১), (২) ইত্যাদি সংখ্যা দেওয়া হইতেছে। অনুবাদে পূর্ব হইতেই আমরা অনুচ্ছেদগুলি দেখাইয়া আসিতেছি, এখন সেগুলিতেও (১), (২) ইত্যাদি সংখ্যা দেওয়া হইতেছে।

সেই শরীরনামক অবচ্ছেদভেদে তাহার (সুখদুঃখাদি-বৈচিত্র্যের) উপপত্তি হয় ; [১] দেহভেদবশতঃ একই আত্মার জন্মান্তরীয় সুখদুঃখাদির যেমন অনুভব হয় না, তেমনিই দেবদত্তের[ও] যজ্ঞদত্তের সুখদুঃখাদির অনুভব হইবে না—ইহাও যুক্তিযুক্ত বলিয়া [আচার্য] বলিতেছেন : [মূলস্তোত্র, শ্লোক ১৭, পৃঃ ৬৩-৬৪ দ্রষ্টব্য]।

অন্বয় : শুদ্ধঃ অক্ষরঃ অজঃ একঃ অপি গুণভেদাৎ নানাকারান্ পশ্যন্ যঃ কর্মফলৈঃ স্ফাটিকবৎ বিচিত্রঃ ভিন্নঃ ভাতি, অয়ং ছিন্নঃ চ [ভাতি], তং সংসার-ধ্বান্ত-বিনাশং হরিম্ ঈড়ে। ১৭।

স্তোত্রানুবাদ : [স্বভাবতঃ] শুদ্ধ, অবিনাশী, জন্মরহিত, এক (অদ্বিতীয়) হইয়াও [সত্ত্বাদি-] গুণভেদবশতঃ [দেবমনুষ্যাদি] নানা আকারসমূহ দর্শনকারী যিনি (আত্মা) কর্মফলসমূহের দ্বারা স্ফটিকের ন্যায় বিচিত্র, ভিন্ন ভিন্ন এবং খণ্ড খণ্ড রূপে প্রকাশিত হন, সংসারের [কারণীভূত অজ্ঞান-] অন্ধকার-বিনাশকারী সেই হরিকে বন্দনা করি। ১৭। (১)

টীকানুবাদ : **পশ্যন্** ইত্যাদি। যঃ—যিনি, স্বভাবতঃ **শুদ্ধঃ**—সুখদুঃখাদি-সম্বন্ধ-রহিত, **অক্ষরঃ**—নাশরহিত অথবা ব্যাপক, **অজঃ**—জন্মরহিত, একঃ **অপি**—অদ্বিতীয় হইয়াও **গুণভেদাৎ** -সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের পরিণামভেদবশতঃ **নানাকারান্**—দেবতা, সরীসৃপ পক্ষী আদি নানা আকার (দেহ)-ভেদসমূহ **পশ্যন্**—দর্শন করেন ; সেখানে (সেই সেই শরীরে) তাদাত্ম্য-অধ্যাসবশতঃ (শরীর এবং নিজেকে অভিন্ন মনে করিয়া) সুখ দুঃখ প্রভৃতি **কর্মফলৈঃ**—কর্মফলসমূহের দ্বারা বিচিত্রঃ—বহুরূপ ; **ভিন্নঃ চ স্ফাটিকবৎ ভাতি**—অনেক ও পরিচ্ছিন্নরূপে স্ফটিকের ন্যায় প্রতীয়মান হন ; রক্তিমাদি উপাধিভেদে স্ফটিকশিলা [এক হইয়াও] যেমন বিচিত্র এবং অনেক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ [আত্মা এক হইয়াও বিচিত্র এবং অনেক বলিয়া প্রতীয়মান হন]—ইহাই অর্থ। **অয়ং ছিন্নঃ**—ইনি (এই আত্মা) ছিন্ন (খণ্ডিত)—দেহান্তরে অজ্ঞায়মান হন (জন্মান্তরীণ দেহে পূর্বজন্মের শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মাই বিদ্যমান থাকিলেও উভয় দেহে অবস্থিত একই আত্মা বলিয়া প্রতীয়মান হন না)। [এইরূপ যে আত্মা সংসারের কারণীভূত-অজ্ঞান-অন্ধকার-বিনাশকারী, সেই আত্মাকে (হরিকে) বন্দনা করি।] (২)

[একই আত্মা উপাধিভেদে বহুরূপে প্রতীত হন—] এই বিষয়ে শ্রুতি [-প্রমাণ] : 'একই ভূতাত্মা সর্বভূতে অবস্থিত। [তিনি] জলচন্দ্রের ন্যায় এক- ও বহু-প্রকারে প্রতিভাত হন।' [শ্রুতিবর্ণিত] ভূত [-শব্দটির অর্থ]—পারমার্থিক। [ইহা 'আত্মা'র বিশেষণ]।

১ শরীর এক হইলেও অঙ্গভেদে যেমন সুখ দুঃখ প্রভৃতি একই সময়ে অনুভূত হয়, তেমনই আত্মা এক হইলেও শরীরভেদে সুখদুঃখাদির বৈচিত্র্য অনুভূত হইতে পারে। আত্মা প্রকৃতপক্ষে এক অদ্বিতীয় হইলেও বিভিন্ন শরীরনামক উপাধির ভেদ স্বীকৃত হওয়ায় একই সময়ে কোন শরীরে সুখ এবং কোন শরীরে দুঃখ অনুভব করিবার কোন বাধা নাই। সুতরাং আত্মা এক অদ্বিতীয় হইলেও শরীরভেদে সুখদুঃখাদির বৈচিত্র্য অযৌক্তিক নহে।

'ভূতে ভূতে' অর্থাৎ দেহে দেহে ; 'একধা' অর্থাৎ স্বীয় রূপে, 'বহুধা' অর্থাৎ উপাধিযুক্তরূপে ২—ইহাই অর্থ। (৩)

সূত্রকারও 'অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ'৩, এই সূত্রের দ্বারা—'অসন্ততেঃ' অর্থাৎ উপাধি-পরিচ্ছেদবশতঃ, 'অব্যতিকরঃ' অর্থাৎ জীবগণের সুখদুঃখানুভবের সাংকর্য (মিশ্রণ) হয় না, এইভাবে নিজমতে সুখদুঃখাদির বৈচিত্র্য উপপাদন করিয়া [পুনরায়] 'অদৃষ্টানিয়মাৎ'৪ ইত্যাদি তিনটি সূত্রের দ্বারা 'সর্বগত বাস্তব আত্মা বহু', এই মতে [যে দোষ দেখাইয়াছেন, তাহা এই—] সর্বগত বলিয়া সর্বশরীরে সকল আত্মারই সান্নিধ্য থাকায় উক্ত সকল আত্মার সান্নিধ্যে উৎপন্ন [ধর্মাধর্মরূপ] অদৃষ্ট সকলের পক্ষেই সমান হওয়ায় সুখদুঃখাদির সাংকর্য বা মিশ্রণ [-প্রাপ্তিরূপ দোষ] অবশ্যই হইবে—ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। (৪)

সুতরাং আত্মার একত্বে দোষাভাববশতঃ অদ্বিতীয় আনন্দরূপে [আত্মার] বেদান্ত-বেদ্যতা উপপন্ন হয়—ইহাই তাৎপর্য। ১৭। (৫) [ক্রমশঃ]

২ বিভিন্ন আধারস্থিত জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র আধারের অনুরূপভাবে যেমন ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তেমনই বিভিন্ন দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধির ভেদ অনুসারে অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত আত্মাও ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া অনুভূত হন। চন্দ্র এক হওয়ায় আধারভেদে তাহার ভেদ যেমন অযথার্থ, তেমনই আত্মা এক হওয়ায় উপাধিভেদে আত্মার ভেদ অবাস্তব। বিভিন্ন প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের মধ্যেও উজ্জ্বলতা-স্বরূপ যেমন এক বলিয়াই অনুভূত হয়, তেমনই উপাধিভেদে আত্মা ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হইলেও সৎ- এবং চিৎ-স্বরূপের দ্বারা আত্মার একত্বই অনুভূত হয়।

৩ সূত্রার্থঃ সকল শরীরে কর্তা-রূপে প্রতীয়মান চেতন আত্মা এক হইলে একের কর্মফল অপরের ভোগ্য হইতে পারে, এই আশঙ্কা পরিহারের জন্য সূত্রকার বলিয়াছেন— যেহেতু পরিচ্ছিন্ন অন্তঃকরণ প্রভৃতি উপাধিবিশিষ্ট জীবই কর্তা, সেইহেতু একই জীবের পরিচ্ছিন্ন বিভিন্ন শরীরের সহিত সম্বন্ধ নাই। সুতরাং উক্ত দোষ হয় না।

৪ সূত্রার্থঃ সাংখ্যমতে 'অদৃষ্ট' প্রধানের পরিণাম অন্তঃকরণে থাকে। সুতরাং প্রধানেই 'অদৃষ্ট' আছে। সেই প্রধান সকল আত্মার প্রতি সাধারণ হওয়ায় অদৃষ্টের কোনও নিয়ম থাকিবে না। অর্থাৎ এই অদৃষ্ট এই আত্মার—এইরূপ ব্যবস্থা সম্ভব হইবে না। তাহার ফলে অদৃষ্টজন্য সুখদুঃখাদি-ফলভোগেরও 'অনিয়ম' অর্থাৎ অব্যবস্থা হইবে। ন্যায়বৈশেষিক মতে অদৃষ্ট আত্মাতে থাকে। আত্মা ব্যাপক। সুতরাং মনের সহিত সকল আত্মার সংযোগ সমান হওয়ায় অদৃষ্টজন্য ফলভোগের ব্যবস্থা সম্ভব হইবে না। (কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা উপার্জিত ধর্মাধর্মকে 'অদৃষ্ট' বলে)।

নিবেদিতা ও তাঁর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

স্বামী ভূতেশানন্দ*

নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত এই সভায় ভগিনী নিবেদিতার সম্বন্ধে বিভিন্ন দিক দিয়ে আজ সুবিস্তৃত আলোচনা হ'ল, যে আলোচনা নিঃসন্দেহে বক্তাদের অতি সুন্দর অবদানে সমৃদ্ধ।

নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়টি যেন নিবেদিতার একটি মূর্ত প্রতীক। ভারতের জন্য নিবেদিতার যে সেবা নানাক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই, তার ভেতরে শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে পুষ্ট এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত তাঁর এই বালিকা বিদ্যালয়টি। আয়তন দিয়ে আমরা এর মূল্যায়ন করতে পারি না। আয়তনে এটি ক্ষুদ্র। কিন্তু নিবেদিতার প্রাণস্পর্শী সেবা থেকে এর জন্ম ও পুষ্টি এবং তাঁরই সেবাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর পরবর্তীরা এই প্রতিষ্ঠানটি চালিয়ে যাচ্ছেন।

একটি প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন করতে হ'লে দুটি বিষয় ভাবতে হয়—একটি তার স্থায়িত্ব এবং দ্বিতীয়টি তার আদর্শের প্রতি সংচালকদের আনুগত্য। এই প্রতিষ্ঠানটি যাঁরা চালাচ্ছেন, আমরা মনে করি, এখন পর্যন্ত তাঁরা নিবেদিতার মহান আদর্শের অনুসরণ ক'রে চলেছেন সুষ্ঠুভাবে, নিষ্ঠার সঙ্গে এবং এই যে দীর্ঘ পঁচাত্তর বছর এই প্রতিষ্ঠানটি শুধু বেঁচে নেই, ক্রমবর্ধমানরূপে দেখা দিচ্ছে, তাতে বোঝা যায় এর ভেতরে যথেষ্ট প্রাণশক্তি রয়েছে। সেই প্রাণশক্তির উৎসরূপে আমরা পাই নিবেদিতাকে, যাঁর সম্বন্ধে আজ এখানে বিশিষ্ট বক্তারা সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন। যেভাবে এই প্রতিষ্ঠানটির জন্ম, যেভাবে এটি প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছে, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যান্য পার্ষদদের যে অমোঘ আশীর্বাদ পেয়ে এটি গ'ড়ে উঠেছে, তাতে মনে হয় এটি সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হবে। আর যাঁরা এর সেবা ক'রে যাচ্ছেন, তাঁদের ভেতরে সেবার মহান আদর্শ অক্ষুণ্ণ থাকবে, আশা করা যায়।

এক ধারায় কোনকিছু গ'ড়ে ওঠে না, বাধাবিঘ্নের বন্ধুর পথ ধ'রে প্রতিষ্ঠানটি ক্রমশঃ তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে সুদীর্ঘ পঁচাত্তর বছর ধ'রে। এই লক্ষ্য সম্বন্ধে সকল বক্তাই অল্পবিস্তর বলেছেন অতি সুন্দরভাবে। লক্ষ্যটি কী? কেবল একটি স্কুল চালানো নয় —প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা থেকে আরম্ভ ক'রে সকলেই একথা জোর দিয়ে বলেছেন। এটা একটি স্কুলমাত্র নয় এটা একটি আদর্শের প্রতীক, যে আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দ থেকে অথবা আরো যদি এগিয়ে যাই তো তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে প্রাপ্ত। তিনিই স্বামীজীকে সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছিলেন আর স্বামীজী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাদর্শের অনন্য রূপকার।

স্বামীজী দেখলেন, ভারতকে তুলতে হ'লে শিক্ষাই হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম, যার দ্বারা ভারতকে তার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে। তিনি শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ

* রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ (ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট)।

সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এই নিদ্রিত দেশকে জাগাতে হ'লে, এই অধঃপতিত জাতিকে তুলতে হ'লে, প্রথম দৃষ্টি দিতে হবে অধস্তন সমাজের দিকে এবং তার প্রধান উপকরণ হবে শিক্ষা। এই জনশিক্ষার কথা স্বামীজী বহুবার সবিস্তারে আলোচনা করেছেন, যা তাঁর গ্রন্থাবলীতে সন্নিবেশিত রয়েছে।

বিশেষ ক'রে স্বামীজী চেয়েছিলেন এদেশের নারীজাতির উন্নতি। তিনি বলেছিলেন, কোন দেশকে উন্নত করতে হ'লে নারীজাতিকে উন্নত না করলে হবে না। তিনি দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন—একটি পাখি এক ডানায় উড়তে পারে না, দুটি পাখনা তার সমভাবে পুষ্ট এবং সবল হওয়া চাই। তবে পাখি উড়তে পারে। ঠিক সেই রকম সমাজের অগ্রগতির জন্যে পুরুষ ও নারী উভয়েরই সমবেত চেষ্টা ছাড়া সমাজ এগোতে পারে না। স্বামীজী আরও বলেছেন, সমাজের ভিত্তি হচ্ছে নারীজাতি। সমাজের স্থায়িত্ব, সমাজের দৃঢ়তা নারী-নির্ভর। তাই নারীজাতিকে উন্নত করবার উপায় স্বামীজী খুব খুঁজছিলেন। ব্যাকুল হয়ে খুঁজছিলেন, ইতিমধ্যে আবিষ্কার করলেন নিবেদিতাকে। নিবেদিতার ভেতরে তিনি দেখলেন—অফুরন্ত শক্তি, অফুরন্ত উদ্যম, কিন্তু সেই শক্তি আত্মপ্রকাশ করবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

স্বামীজী নিবেদিতার অবরুদ্ধ শক্তির দ্বার উন্মুক্ত করবার চেষ্টা করলেন। তাঁর চেষ্টা কখনো বিফল হয় না, তিনি সফল হলেন। নিবেদিতার অনিরুদ্ধ শক্তিকে কাজে লাগাতে স্বামীজীকে কিন্তু দীর্ঘকাল চেষ্টা করতে হয়েছিল। নিবেদিতা সহজে স্বামীজীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন নি। দীর্ঘকাল তিনি সংগ্রাম করেছেন তাঁর গুরুর সঙ্গে এবং তাঁর গুরুও সেই সংগ্রামে তাঁকে কখনো নিরুৎসাহ করেন নি। স্বামীজী বলেছিলেন, 'আমি দীর্ঘ ছ বছর ধ'রে আমার গুরুদেবের সঙ্গে লড়াই করেছি, ফলে আমার পথের খুঁটিনাটি আমার নখদর্পণে। তাই তুমি দুঃখ করো না যে, তোমাকে বোঝাবার জন্যে কাউকে বিলক্ষণ কষ্ট পেতে হয়েছে।'

নিবেদিতা ক্রমশঃ উৎসাহিত হয়ে স্বামীজীকে জানালেন, তিনি ভারতের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে চান। স্বামীজী তাতে খুশী হলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেন :

> দেখ, তুমি ভারতবর্ষে এসে দেখবে, চারিদিকে কেবল দুঃখ, কুসংস্কার, দাসত্ব —যা তোমার ধারণার অতীত। এদেশে এলে তুমি নিজেকে অসংখ্য অর্ধ-উলঙ্গ নরনারীতে পরিবেষ্টিত দেখতে পাবে। এসব সত্ত্বেও যদি তুমি কাজে নাবতে চাও, তবে অবশ্য তোমাকে শতবার স্বাগত জানাচ্ছি। কাজে ঝাঁপ দেবার আগে বেশ ক'রে ভেবে দেখো। কাজে যদি বিফল হও কিংবা কখনও বিরক্তি আসে, তবে আমার দিক থেকে নিশ্চয় জেনো যে, আমাকে আমরণ তোমার পাশেই পাবে—তা তুমি ভারতবর্ষের জন্যে কাজ করো আর নাই করো, বেদান্ত ত্যাগ করো বা ধরেই থাকো।

স্বামীজীর এই অভয় বাণী পেয়ে নিবেদিতা ভারতে এলেন। তারপরও স্বামীজীর কঠিন শিক্ষা দীর্ঘকাল ধ'রে চললো, সে সম্বন্ধে আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বলেছেন। কখনো অতি কঠোর, কখনো বা অতি কোমল, স্নেহপরায়ণ হয়ে ধীরে ধীরে স্বামীজী তাঁর মানসকন্যাকে পালন করছিলেন। তারপর যখন দেখলেন যে, নিবেদিতা যোগ্য যন্ত্ররূপে তৈরী হয়েছেন, তখন

স্বামীজী তাঁকে জানালেন: 'কাজের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই নেই—এখন আর কী নির্দেশ দেবো? - তুমি স্বাধীন, তুমি নিজেই পছন্দ করো, তোমার নিজের কাজ…।' নিবেদিতা যে সেই স্বাধীনতার অপপ্রয়োগ করেন নি, তা আমরা তাঁর পরবর্তী কার্যধারা থেকে বেশ বুঝতে পারি।

নিবেদিতা কখনো ভাবতেন না যে, তিনি উচ্চবংশের—উচ্চ শিক্ষিত একটি অভিমানী জাতি থেকে এসেছেন। যাঁরা এদেশের শাসক, যাঁরা আধিপত্য ক'রে গর্ববোধ করতেন, নিবেদিতা তাঁদের দলের ছিলেন না। স্বামীজীর কৃপায় তিনি এই ভারতকে ভালবাসতে শিখে-ছিলেন এবং সেই ভালবাসা এমন যে তিনি ভারতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। ভারতবর্ষকে তাঁর মাতৃভূমি ব'লে তিনি মনে করতেন। ভারতবর্ষের কল্যাণ তাঁর নিজের কল্যাণ ব'লে মনে করতেন। ভারতের ঐতিহ্যে তিনি গর্ববোধ করতেন। এ-কথার সুন্দর পরিচয় আমরা পাই তাঁর জীবনের বহু ঘটনায়।

সাধারণ বিষয় নিয়ে নিবেদিতা ক্লাশে পড়াচ্ছেন। একদিন একটি বালিকা বলছে 'লাইন'। 'লাইন' এই ইংরেজী শব্দটি শুনে নিবেদিতার অভিমানে আঘাত লাগল—ভারতীয় অভিমানে। তিনি বললেন, 'বাংলায় কী বলে?' বলতে পারছে না কোন মেয়ে। শেষকালে একটি মেয়ে ব'লছে, 'রেখা'। নিবেদিতার তখন কী আনন্দ! তিনি 'রেখা' 'রেখা' 'রেখা' ব'লে যেন মন্ত্র জপ করছেন। ভারতের জাতীয়তা-বর্জিত যে শিক্ষা, সে শিক্ষা নিবেদিতা দিতে চান নি। স্বামীজী চেয়েছিলেন জাতিকে আত্মপ্রতিষ্ঠিত করতে, জাতিকে নিজের অস্তিত্বে বিশ্বাসী করতে। চেয়েছিলেন, জাতি যেন নিজের মহত্ত্ব বিস্মৃত না হয়, পরানুকরণের মোহ থেকে যেন মুক্ত হয়। নিবেদিতা তাঁর ছাত্রীদের ভেতরে গোড়া থেকে সেই চেষ্টা আপ্রাণ করেছেন। স্বামীজীর কথা—শিক্ষা ঐ পাশ্চাত্য ঢং-এ সবাইকে তৈরী করা নয়—নিবেদিতা কখনো ভোলেন নি এবং যেখানে তিনি দেখতেন, পাশ্চাত্যের অনুকরণের স্পৃহা, সেখানে তিনি অত্যন্ত বেদনাবোধ করতেন। ভারতের যে অতীত গৌরব তিনি স্বামীজীর দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শিখেছিলেন, সেই গৌরবকে যাতে পুনরুজ্জীবিত করা যায়, যাতে ভারতের নরনারী সেই গৌরবকে স্মরণ ক'রে নিজেরা গর্ববোধ করতে পারে এবং নিজেদের আবার সেই মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করে, তার জন্যে নিবেদিতার সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হয়েছে। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি সেই আদর্শের প্রতীক—একথা আমাদের ভুললে চলবে না। প্রাচীন শিক্ষার পুনরুজ্জীবন মানে এ নয় যে, আমাদের সারাদিন পুজো-পাঠে মগ্ন থাকতে হবে। সে-কথা নিবেদিতা বলেন নি। তিনি বলেছেন, বর্তমানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রাচীন আদর্শকে দৃঢ়ভাবে ধ'রে থাকতে হবে, যে-কথা আমরা স্বামীজীর শিক্ষাদর্শের ভেতরে বারবার দেখতে পাই।

আসল কথা, তাঁর গুরুর কথারই পুনরাবৃত্তি করেছেন নিবেদিতা তাঁর নিজস্ব শৈলীতে। এ-কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। বক্তারা বলেছেন নিবেদিতার প্রচারিত আদর্শে সেবা, শিক্ষা এবং মুক্তি, এই তিনটির একটি সুন্দর সামঞ্জস্য ছিল। বাস্তবিকই এই তিনটিকে পৃথক্ ক'রে দেখা স্বামীজীর অভিপ্রেত ছিল না। স্বামীজীর শিক্ষাদর্শের মূল কথা এই ছিল যে, মানুষকে তার পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে হবে। সুতরাং শিক্ষার সঙ্গে সেবার সামঞ্জস্য আছে, মুক্তি-কামনারও সামঞ্জস্য আছে। নিবেদিতা

তাঁর প্রতিষ্ঠানের ভেতর দিয়ে, তথা তাঁর গ্রন্থাদির ভেতর দিয়ে এই তত্ত্বই সকলকে বলেছেন। স্বামীজীর আদর্শের বিশদ ব্যাখ্যা আমরা পাই নিবেদিতার গ্রন্থে, তাঁর জীবনে, তাঁর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে।

নিবেদিতার বিশাল ব্যক্তিত্ব কোন একটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমিত নয়, একথা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব বিশেষ ক'রে ফুটে উঠেছে—যদি আমরা তলিয়ে দেখি, তা হ'লে দেখবো—ছোট্ট এই বালিকা বিদ্যালয়টিতে। ছোট্ট এই জন্যে বলছি যে, যদিও এটি একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়রূপে সুনাম অর্জন করেছে, তা হ'লেও—আগেও বলেছি এবং এখনও বলছি এইটুকু এর আসল পরিচয় নয়। এর আসল পরিচয় রয়েছে স্বামীজীর দেওয়া আদর্শে। যে আদর্শের ভেতর দিয়ে স্বামীজী জাতিকে তুলতে চেয়েছিলেন, নারীজাতির সেবা করতে চেয়েছিলেন, সেই আদর্শের রূপায়ণ আমরা দেখতে পাই এই প্রতিষ্ঠানটিতে। আগেই বলা হয়েছে যে, শ্রীশ্রীমাকে দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধন করানো হ'ল কারণ, মাকেই নারীজাতির আদর্শরূপে স্বামীজী উপস্থাপিত করেছিলেন নিবেদিতার কাছে; নিবেদিতাও সেই আদর্শকে কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করেছিলেন। তাই মায়ের কাছে এসেছেন বারে বারে। অনেক ছোটখাটো সমস্যা নিয়েও তিনি আসতেন, এসে মায়ের কাছ থেকে প্রেরণা পেতেন। আশ্চর্য ব্যাপার! নিবেদিতার মত মহাবিদুষী মায়ের কাছে যখন আসতেন, ছোট্ট খুকিটির মতোই মায়ের পায়ের কাছে বসতেন। মা-ও তাঁকে পরমাদরে পরম স্নেহে গ্রহণ করেছিলেন। নিবেদিতা মায়ের কাছ থেকে অনেক শিক্ষা পেয়েছিলেন। সে-কথা নিবেদিতা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বহু জায়গায় স্বীকার করেছেন।

আসল কথা—শিক্ষা মানে শুধু লেখাপড়া শেখা নয়। স্বামীজী তা মনে করেন নি, নিবেদিতাও তা মনে করতেন না। শিক্ষা সম্বন্ধে নিবেদিতার বিশেষ জ্ঞান ছিল, স্বামীজীর কাছে শিক্ষা পেয়ে তিনি সেই জ্ঞানকে আরো বাড়িয়েছিলেন এবং তার ফলে এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটিকে তিনি একটি সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত ক'রে একটি বিশেষ লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। সে লক্ষ্য হ'ল—প্রত্যেক নারীকে সমাজের কল্যাণের জন্য তাঁর যা দেবার আছে, তা দিতে সমর্থ হতে হবে। আমরা জানি নিবেদিতার উদ্দেশ্য ছিল—মেয়েরা এই আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিতা হয়ে যখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে, তখন ঘরে ঘরে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। স্বামীজীর সেই আশাও বৃথা যাবে না। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা আগেই উল্লেখ করেছেন যে, স্বামীজীর কোন বাণী নিষ্ফল হয়নি। এ-ক্ষেত্রেও হবে না।

নিবেদিতার মহৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে না। এই প্রতিষ্ঠানটি দিন দিন উন্নতি করবে। দিন দিন বেড়ে সমাজে তার ভাব প্রসারিত করবে, কারণ এর পেছনে রয়েছে অমোঘ আশীর্বাদ—শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের। সুতরাং এই ছোট্ট প্রতিষ্ঠানটিকে আমরা যেন উপেক্ষার দৃষ্টিতে না দেখি, আমরা যেন এর অন্তর্নিহিত মহত্ত্বকে অনুধাবন করি এবং আমাদের সাধ্যমতো এই প্রতিষ্ঠানটিকে তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে যথাসম্ভব সাহায্য করি। তবেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শের প্রতি আমাদের আনুগত্য প্রকাশ পাবে। আর যাঁরা এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত করছেন, তাঁদের কাছে

আশা করবো, তাঁরা যেন স্বামীজীর ও নিবেদিতার দেওয়া আদর্শ সর্বদা অক্ষুণ্ণ রাখেন, তাঁরা যেন লক্ষ্য স্থির রেখে এগিয়ে চলেন। তবেই তাঁদের অগ্রগতি অপ্রতিহত হবে এবং এই প্রতিষ্ঠানটি ছোট হলেও এর দ্বারা দেশের মহৎ কল্যাণ হবে - এ-বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের চরণে প্রার্থনা জানাই, শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ থেকে উদ্ভূত, তাঁর আশীর্বাদধন্য এই প্রতিষ্ঠানটির যেন দিন দিন অগ্রগতি হয়—জাতির কল্যাণে যাঁদের অবদান যথেষ্ট, এই প্রতিষ্ঠানের সেই পরিচালিকাদের কল্যাণপ্রচেষ্টা যেন সার্থক হয়।*

* নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উপলক্ষে গত ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৭৭, কলিকাতা মহাজাতি সদনে আয়োজিত সভায় সভাপতির অভিভাষণ। শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত।—সঃ

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী

স্বামী গম্ভীরানন্দ*

আপনারা শুনেছেন, শেষ বক্তৃতায় স্বামী বন্দনানন্দ বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন বিশ্ব-নেতা। কথাটা আমরা আর একভাবে বিচার ক'রে দেখতে পারি। গীতাতে শ্রীভগবান বলেছেন, 'ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।' স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রণামমন্ত্র রচনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'স্থাপকায় চ ধর্মস্য।'

ধর্ম তিনি কীভাবে স্থাপন করলেন?

মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দজীর কাছে আমরা শুনেছি: ঠাকুর যখন অবতীর্ণ হয়েছিলেন তখন বিশ্বের যে কুণ্ডলিনী—ব্রহ্মকুণ্ডলিনী, তাঁকে জাগিয়ে তিনি এসেছিলেন।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কুণ্ডলিনী-শক্তি আছে। তাঁকে জাগাতে হয় সিদ্ধিলাভের জন্য। সমস্ত জগৎকে আলোড়িত করতে হ'লে সমগ্র বিশ্বের কুণ্ডলিনী-শক্তিকে—ব্রহ্ম-কুণ্ডলিনীকে জাগাতে হয়। তার প্রমাণ আপনারা পেয়েছেন বক্তাদের কাছে—শিকাগো থেকে যিনি এসেছেন (স্বামী ভাষ্যানন্দ), যিনি এসেছেন প্যারিস থেকে (স্বামী ঋতজানন্দ), স্বামী বন্দনানন্দও কিছুকাল ছিলেন, আমেরিকাতে—এঁরা সবাই দেখে এসেছেন কেমন ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। কেন ছড়িয়ে পড়ছে? তিনি চেয়েছিলেন ব'লে, ভগবান স্বয়ং চেয়েছিলেন ব'লে।

আমরা আমাদের নিজেদের বুদ্ধি দিয়ে তাঁর কীর্তিকলাপকে, তাঁর লীলাখেলাকে পরিমাপ করতে পারি না। আমরা শুধু সেগুলির অনুধ্যান করতে পারি, নিজেদের অনুভূতি জাগাবার জন্য, নিজেদের মনকে পরিষ্কার করবার জন্য, নিজেদের সাধনজীবন আরও পূর্ণতর করবার জন্য।

সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রসঙ্গে শ্রীমা সারদাদেবী বলেছিলেন, ঠাকুর যে সমন্বয়ভাব প্রচার করবার মতলবে সব ধর্মমত সাধন করেছিলেন, তা নয় তিনি সর্বদা ভগবদ্‌ভাবেই বিভোর থাকতেন।

* রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কর্মসচিব।

বাস্তবিকই আমরা যেভাবে বুদ্ধিকে অবলম্বন ক'রে, একটা 'প্রোগ্রাম' মাথা থেকে তৈরী ক'রে, ছ'কে নিয়ে, কাগজে লিখে কাজে নাবি, ঠাকুর সেভাবে কখনও কিছু করেন নি। জগন্মাতা তাঁকে যেভাবে চালিয়েছেন তিনি সেইভাবে চলেছেন, সেইভাবেই তিনি জগতে ধর্মপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

কীভাবে করেছিলেন?

নিজে বোঝবার জন্য বলছি—ঠাকুরকে বুঝে ফেলেছি এই ধৃষ্টতা দিয়ে নয়। নিজে বুঝতে চাইছি, ঠাকুর কীভাবে ধর্মপ্রতিষ্ঠা করলেন।

প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনি মৌলিক কতকগুলো কথার ওপরে জোর দিলেন। আচার-বিচারের দিকে তিনি তেমন দৃষ্টি দেন নি। বরং দু'এক জায়গায় তিনি বাধাই দিয়েছিলেন। ঈশান মুখুজ্যে মশাই কোশাকুশী নিয়ে সন্ধ্যাবন্দনাদি করছিলেন, ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন: 'সন্ধ্যাদি কতদিন? যতদিন না তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি হয়।' আর একদিন তাঁকে বলেছিলেন: 'ডুব দাও। ওপর ওপর ভাসলে বা সাঁতার দিলে কি রত্ন পাওয়া যায়? ডুব দিতে হয়।' তিনি চেয়েছিলেন ব্যাকুলতা। ঈশান ভাটপাড়ায় গঙ্গাতীরে আটচালা বেঁধে পুরশ্চরণ করবেন শুনে ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন: 'ধ্যান করবে মনে, কোণে, বনে।' তিনি তো বলেননি, 'তুমি হিমালয়ে চলে যাও।' নিজের মনের ভেতরে চলে যেতে হবে—আর কোথাও যেতে হবে না। ঘরের কোণে ব'সে, বা যদি কেউ পারে কখনও হয়তো বনেই বা গেল, একটু আলাদা হয়ে সেখানে গিয়ে ভগবানের চিন্তা করল। কিন্তু ভগবানের চিন্তাটি চাই। মানুষের জীবন যে ভগবান লাভের জন্য, এই প্রধান কথাটিকে জাগিয়ে রাখতে হবে জীবনের প্রতি মুহূর্তে। এই যে দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হল—নৌকো জলে ভাসবে, কিন্তু নৌকোর ভেতরে যদি জল ঢুকে যায় তা হ'লে সর্বনাশ। কাঁঠাল ভাঙতে গেলে হাতে তেল মেখে নিতে হয়, তা হ'লে কাঁঠালের আঠা আর হাতে লাগে না। ঠাকুর তাই চেয়েছিলেন, আগে ভগবানকে ভাল ক'রে বুঝে নিয়ে, সদাসর্বদা তাঁর প্রতি বিশ্বাস জাগিয়ে, যে যেমন ভাবে থাকুক না কেন তাতে আপত্তি নেই, তাঁকে ডেকে যেতে হবে সরল ভাবে। যোগীন মহারাজ তাঁর সমস্যা নিয়ে ঠাকুরের কাছে এসেছিলেন, কি ক'রে কাম জয় হয়। তিনি ভেবেছিলেন ঠাকুর হয়তো কোন-একটা আসন-টাসন বা প্রাণায়ামের কোন ক্রিয়া তাঁকে শিখিয়ে দেবেন। ঠাকুর কিন্তু বললেন: 'খুব হরিনাম করবি, তা হলেই যাবে।' যোগীন মহারাজ ভাবলেন, ঠাকুর কোন ক্রিয়া-ট্রিয়া জানেন না কি না, তাই যা হয় একটা ব'লে দিলেন। পরে কিন্তু একমনে খুব হরিনাম ক'রে দেখলেন, ঠাকুরের কথাই সত্য।

আদত কথা হচ্ছে মনের আগ্রহ। ঠাকুর গঙ্গার ধারে পড়ে মুখ ঘসড়াচ্ছেন আর বলছেন: 'মা, আর একটা দিন চলে গেল, তুই দেখা দিলি নি।' এই যে ব্যাকুলতা এই হচ্ছে আদত জিনিস। এইটি চাই। সাধন চাই, তবে সিদ্ধি হবে।

তখনকার যুগে এবং বর্তমান যুগেও কথা চলেছে ক্রমবিকাশের। সাধারণ উপাদান থেকে ক্রমে ক্রমে উন্নতি হয়ে হয়ে মানুষের স্তর পর্যন্ত ক্রমবিকাশ হয়েছে। এর পরে আমাদের আরও উন্নতি হবে। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, ক্রমবিকাশের এই মানুষের স্তরেও—এই উন্নত অবস্থায়ও যদি আমরা নিজেদের মনের ভেতরে ডুবুরী নামাই দেখতে পাবো সেখানে কত সব

আবর্জনা স্তূপীকৃত হয়ে আছে। কিন্তু ঠাকুর কী বললেন? তিনি বললেন: 'তোমরা সব, নারায়ণ। আমি দেখতে পাচ্ছি সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মময়।' ভুলে গেছি তাঁকে আমরা, আবৃত ক'রে রেখেছি আপন স্বরূপকে। যে-ধারায় বিজ্ঞান চলছিল, যে-ধারণা বিজ্ঞানীরা আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল এবং এখনও ঢুকে আছে, তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ঠাকুর বললেন: 'না, যে নিজেকে পাপী পাপী সর্বদা মনে করে সে পাপীই হয়ে যায়। অভিনয়ে পর্যন্ত যদি দুর্জনের পার্ট নেওয়া যায় এবং সেরকম আচরণ করা হয় তা হ'লে মনের ওপর খানিকটা ছাপ প'ড়ে যায়।' সুতরাং সারা জীবনটাকে ভগবানময় ক'রে রাখতে হবে। আমরা কখনও যেন মনে না করি যে, আমরা চিরকালের জন্য পতিত হয়ে গেছি, আমাদের কোন কালে উন্নতি হবে না। বরং মনে করতে হবে যে, জীবই শিব। শিবই জীবরূপে আমাদের কাছে এসেছেন, নারায়ণ আমাদের কাছে এসেছেন। আমার ভেতরেও সেই নারায়ণই রয়েছেন। তিনি ক্রমে প্রকাশিত হচ্ছেন। কতগুলো জড়বস্তু ক্রমবিকাশ লাভ ক'রে মানুষে পরিণত হচ্ছে, এমন নয়। মানুষের ভেতরে যে ব্রহ্ম রয়েছেন তিনি নিজে প্রকাশিত হচ্ছেন বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন দিকে। মথুরবাবুও ঠাকুরকে বিজ্ঞানের কথা বলেছিলেন —নিয়মানুযায়ী সমস্ত জগৎ চলে, সব কিছু নিয়মানুবর্তী। ঠাকুর কিন্তু মথুরবাবুকে বুঝিয়ে দিলেন, দেখিয়ে দিলেন যে, জগতে সব কিছুই ভগবানের ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

পুরানো কথা ছিল—'নারীরা নরকের দ্বার।' বর্তমান যুগে সে কথা আর নেই। নারীরা আমাদের মা। তাঁরা আমাদের সম্মানভাজন। তাঁরা আমাদের পথ দেখাবেন। সব সমাজেই চিরকাল তাঁরা ধর্ম রক্ষা ক'রে চলেছেন। ঠাকুর সেটি দেখিয়ে গেলেন। দেখিয়ে গেলেন, সকল নারীর ভেতর জগদম্বার বিশেষ প্রকাশ সাক্ষাৎ উপলব্ধি ক'রে এবং অপরকেও নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ক'রে।

মৌলিক কথাগুলো সহজ সরল ভাষায় সকলের সামনে স্থাপন ক'রেই তিনি ধর্ম-সংস্থাপন করলেন। তাঁর কথাগুলি প'ড়ে পাশ্চাত্য দেশে পর্যন্ত সকলে চমৎকৃত হয়ে যায়। মানুষের মুখ দিয়ে এমন কথা বেরুতে পারে! সত্যি বলতে কি, তিনি তো আর মানুষ ছিলেন না! তিনি স্বয়ং ভগবান।

ব্রাহ্ম সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখুন। ঠাকুর সেখানে যাচ্ছেন, সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। তাঁদের মাথায় তখন ঢুকে ছিল নৈতিকতা—'সত্য কথা বলিবে', 'সৎ ব্যবহার করিবে' ইত্যাদি। এই সব নীতির মধ্যে তাঁরা ধর্মকে এঁটে রেখেছিলেন। আর কি চাচ্ছিলেন তাঁরা?—সমাজ-সংস্কার। তাঁদের ভেতরে ঠাকুর নিয়ে এলেন একটা ব্যাকুলতা। তাঁদের সঙ্গে নাচলেন, গাইলেন। তাঁদের ভেতরে একটা দিব্য উন্মাদনা এনে দিলেন। গ্রন্থাদি রচনার দ্বারা ঠাকুরের অবদানকে তাঁরা অস্বীকার করলেও নববিধান সমাজের মধ্যে মাতৃভাবের উপাসনাকে ঠাকুরই ঢুকিয়ে-ছিলেন। এই সত্য এখন পুনর্বার আবিষ্কৃত হয়েছে। শঙ্করীপ্রসাদ বসু মহাশয়ের গবেষণা আমি সেদিন শুনছিলুম। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি নিজেরাই বলেছিলেন যে, ঠাকুরের ভাবের দ্বারা তাঁদের সমাজ প্রভাবিত হয়েছিল। ঠাকুরের ভাব অবলম্বন ক'রে ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল তাঁর বহু গান রচনা করেছিলেন।

যে-ধর্ম অনুষ্ঠানাদি অথবা সমাজ-সংস্কার অথবা নৈতিকতার ভিতরে আবদ্ধ ছিল তার মধ্যে ঠাকুর নিয়ে এলেন একটা নতুন

অন্তঃপ্রেরণা, একটা উদ্দীপনা, একটা আবেগ। ভগবানকে চাই-ই চাই। তাঁকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না। যেমন ক'রেই হোক্ ভগবানকে আমায় পেতেই হবে।

এখানেই শেষ নয়। শম্ভুবাবু এসে বললেন: আমার কিছু টাকা আছে। ভাবছি স্কুল, হাসপাতাল, রাস্তা ইত্যাদি ক'রে দেবো। ঠাকুর তাঁকে শুধরে দিয়ে বললেন: 'দেখো, ভগবান যদি আজ তোমার সামনে হাজির হন, তাঁর কাছে কি কতকগুলো হাসপাতাল, স্কুল ইত্যাদি চাইবে, না তাঁর পাদপদ্মে ভাবভক্তি চাইবে?' প্রত্যেক কথা, প্রতিটি আচরণকে তিনি শুদ্ধ ক'রে দিচ্ছেন, সিদ্ধির অভিমুখে পরিচালিত ক'রে দিচ্ছেন। কোন ব্যক্তি-বিশেষেরই নয়, সমস্ত মানবসমাজের, গোটা বিশ্বের চিন্তাকে তিনি পরিচালিত ক'রে দিয়েছেন মূল কেন্দ্রের দিকে—যাকে বাদ দিয়ে জগৎ দাঁড়াতে পারে না, যাকে নিয়ে মাত্র জগতের সত্তা, যাকে নিয়ে মাত্র জগৎ এগুতে পারে। কোন্ দিকে যাবো? বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা নতুন আবিষ্কার করলুম, যন্ত্রপাতি পেলুম। কিন্তু কিসের জন্য? কোথায় যাচ্ছে সমাজ? ঠাকুর দেখিয়ে দিলেন ভগবান হচ্ছেন আমাদের লক্ষ্য। তাঁরই দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি এবং তাঁরই দিকে আমাদের সকলকে এগিয়ে যেতে হবে।

ধর্ম তিনি সংস্থাপন করলেন। ধর্মের সঙ্গে আজেবাজে যে সব জিনিস এসে জুটেছিল, দল-বাঁধাকে যেখানে ধর্ম বলে গ্রহণ করা হয়েছিল, সেগুলিকে তিনি ত্যাগ করতে বলেছিলেন। তিনি বললেন: 'গেঁড়ে ডোবাতে দল বাঁধে।' অপরেরা বোলতো 'পরমহংসের দল'। তাই তিনি উত্তর দিলেন। তিনি দল করতে চান নি। বলতেন, 'ফুল ফুটলে ভ্রমর আপনি এসে জোটে।' বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল অধর সেনের বাড়িতে। বঙ্কিমবাবু চপলতা ক'রে কতকগুলো আজেবাজে কথা বলায় ঠাকুর তাঁকে ব'লে দিলেন: 'মূলো খেলে মূলোর ঢেকুর ওঠে।' ঠাকুর নিজেই বিদ্যাসাগর মশায়ের কাছে গেলেন। তাঁকে বললেন: 'তুমি তো খুব নরম, তোমার অত দয়া! তুমি যে সব কর্ম করছো, এ সব সৎকর্ম। অন্তরে সোনা আছে, এখনও খবর পাও নি। একটু মাটি চাপা আছে। যদি একবার সন্ধান পাও, অন্য কাজ কমে যাবে।'

সংসারে আমাদের থাকতে হয়, থাকতে হবেও। এর মধ্যে থেকেও কেমন ক'রে ভগবানকে লাভ করতে পারা যায়, তারই পথ তিনি দেখিয়ে দিয়ে গেলেন। যে সব ভুল যুক্তি-তর্ক আমাদের মধ্যে এসেছিল—টাকাকড়ি না হ'লে জগতের উন্নতি হয় না, মানবসমাজের পরিবর্তনের মূলে রয়েছে অর্থনীতি—পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের এইসব মতের বিরুদ্ধে ঠাকুর সব ত্যাগ ক'রে দেখালেন যে, ত্যাগের দ্বারাই ভগবানকে লাভ করা যায়, এবং তখনই ঠিক ঠিক জগতের কল্যাণ করা যায়। টাকাকড়ি ছুঁতে না পারলেও তাঁর মুখ দিয়ে 'যত মত তত পথ,' 'ভগবানলাভই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য', 'নারী জগজ্জননীর মূর্তি', 'ভগবানই এই সব হয়েছেন', 'জীব তো সচ্চিদানন্দ', 'ঈশ্বর সাকার, নিরাকার আবার সাকার-নিরাকারেরও পার' ইত্যাদি এমন কতকগুলো কথা বেরিয়ে এলো, যা সকলকে চমক লাগিয়ে দিল। শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছিলেন, ঠাকুর ভগবানকে ভেবে ভেবে বেহেড হয়ে গেছেন। ঠাকুরের কথা: 'বিষয় চিন্তা ক'রে মানুষ বেহেড হয়—না, ঈশ্বরচিন্তা ক'রে বেহেড হয়? চৈতন্যকে চিন্তা করলে কি অচৈতন্য হয়?' কথামৃতে এই সব অমূল্য কথা

রয়েছে। তার প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি পঙ্‌ক্তি কত তাৎপর্যপূর্ণ, কত উদ্দীপনাময়, জীবনকে পরিপূর্ণ ক'রে দেবার কত শক্তি তার মধ্যে রয়েছে। যাঁর শ্রীমুখ দিয়ে এইসব জ্ঞানের কথা বেরিয়েছে, তিনি বেহেড, না বেহেড আমরা!

কৃষ্ণদাস পাল মশাইকে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'জীবনের উদ্দেশ্য কি?' পাল মশাই উত্তর দেন, 'আমার মতে জগতের উপকার করা, জগতের দুঃখ দূর করা।' ঠাকুর বললেন, 'তুমি জগতের দুঃখ দূর করবে! জগৎ কি এতটুকু? বর্ষাকালে গঙ্গায় কাঁকড়া হয় জান? এরকম অসংখ্য জগৎ আছে। এই জগতের পতি যিনি, তিনি সকলের খবর নিচ্ছেন। তাঁকে আগে জানা—এই জীবনের উদ্দেশ্য। তারপর যা হয় কোরো।'

ঠাকুর দেখিয়ে গেলেন কেবলমাত্র বিজ্ঞানকে অবলম্বন ক'রে, অর্থনীতিকে অবলম্বন ক'রে অথবা সমাজ-সংস্কারকে অবলম্বন ক'রে জগৎ চলে না। জগৎ চলে ভগবানকে অবলম্বন ক'রে। জগতের উন্নতি হয় ভগবানে প্রতিষ্ঠিত হ'লে। বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন ভাবে তাঁরই প্রকাশ। ধর্মের যে সব মূল তত্ত্বগুলি তিনি দেখিয়েছিলেন, তাদেরই কয়েকটিমাত্র আমি ইঙ্গিত হিসাবে বলেছি। ব্রহ্মবুদ্ধি অবলম্বন ক'রে মানুষে মানুষে একটা ঘনিষ্ঠ প্রেমের সম্বন্ধ তিনি স্থাপন ক'রে গেলেন। সমাজ এগোয় ভালবাসাকে, প্রেমকে অবলম্বন ক'রে—যে প্রেম ঈশ্বরের স্বরূপ। এই যে আমরা একজায়গায় বসে দু'টো ভাল কথা আজ চিন্তা করছি, এরই দ্বারা সমাজের অগ্রগতি হয়। আর যাঁরা বিভিন্নভাবে রাজনীতি ইত্যাদি করছেন, তাতে উন্নতি হয় বটে কিন্তু সেটা স্থায়ী হ'তে পারে না। মানুষের মন যদি সংস্কৃত না হয় তা'হলে শুধু রাজনীতি বা অর্থনীতির দ্বারা কী হবে?

ঠাকুর তাই দেখিয়ে গেছেন মানুষ হওয়া দরকার, আর মানুষ হবার মূলে রয়েছে ভগবানলাভ। জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানলাভ। এর বিরুদ্ধে যা কিছু দাঁড়াবে তাকেই অস্বীকার করতে হবে। সর্বদা ভগবানকে অবলম্বন ক'রেই আমাদের দাঁড়াতে হবে। আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলুম, পথ খুঁজে পাচ্ছিলুম না। তাই পথের সন্ধান দিতে ঠাকুর এসেছিলেন। কথামৃত ইত্যাদি বার বার প'ড়ে আমরা যেন সেই সন্ধান গ্রহণ করতে পারি, অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারি, এই আমার প্রার্থনা।

* ২০শে ফেব্রুআরি ১৯৭৭, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় সভাপতির অভিভাষণ। শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত। সংক্ষেপিত আকারে মুদ্রিত।—সঃ

জাদুকর

শ্রীদিলীপকুমার রায়

বাঁশি ডাকে : আয় আয় আয়,
আয় ওরে নীল যমুনায়।
মোহন মধুর সে··· নয় তো সুদূর সে···
অন্তরে রাজে শ্যামরায়।
চল্ গিয়ে পড়ি তার পায়॥

সে যে জাদুকর বঁধু,
কাঁটায়ও ঝরায় মধু,
জ্যোৎস্না সে সন্ধ্যায়··· নির্ঝ'র পিপাসায়···
আঁধারে তপন সে··· ব্যথায় স্বপন সে···
ফুটে ওঠে প্রেমে প্রতিমায়।
চল্ গিয়ে পড়ি তার পায়॥

প্রাণের চেয়েও প্রিয়,
চিরসাথী, বরণীয়,
শিহরে নয়নে সে ·· উছলে গগনে সে···
পরাজয়ে সে বিজয়··· শঙ্কায় বরাভয়···
সবখানে আছে সে ধরায়।
চল্ গিয়ে পড়ি তার পায়॥

উষায় সে হাসিফুল,
নিশায় তারা দোদুল,
বিরহে মিলন সে··· মরণে জীবন সে···
কালোয় আলোর সাথে মিলায় সে দিনে রাতে,
বাঁশি তার বাজে যমুনায়।
চল্ গিয়ে পড়ি তার পায়॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চোখ দু'টি

বনফুল

আশ্চর্য চোখ।
পদ্ম-পলাশ নয়ন নয়
খঞ্জন-গঞ্জন আঁখিও নয়।
অতি সাধারণ চোখ।
কিন্তু সে চোখের দৃষ্টি কি অপরূপ!
চোখের কোণে কি সহাস্য প্রশ্ন,
তা যেন বলছে—
এখনও তোরা মেতে আছিস?
এখনও ভুল ভাঙে নি?
কি কাণ্ড!
সে প্রশ্নকে কিন্তু প্রচ্ছন্ন করে' রেখেছে
অসীম করুণা

অনন্ত আশ্বাস!
তা যেন বলছে
হবে, হবে
ঠিক পারবি।
চেষ্টা কর, ঠিক পারবি।
তোকে পারতেই হবে।

নিষ্পলক নয়নের
নিঃশব্দ বাণী
নিরন্তর বলে যাচ্ছে
পারবি, পারবি, ঠিক পারবি
তোকে পারতেই হবে।

স্থান দাও প্রভু শ্রীচরণতলে

শ্রীসুকুমার সরকার

স্থান দাও প্রভু শ্রীচরণতলে।
মন্দিরদ্বার রুদ্ধ রেখো না—
রেখো না বাহিরে ফেলে।
প্রাণেতে গভীর দহন-জ্বালা
শুকাইয়া গেছে পূজারি মালা
আর কতদিন, দীন হীন মোরে—
রাখিবে বাহিরে ঠেলে!
বিফল হবে কি ধূপদীপজ্বালা
সযতনে গাঁথা কুসুমের মালা
ধূলি-ধূসরিত দেহখানি মোর
লুটাইবে ভূমিতলে!
স্থান দাও প্রভু শ্রীচরণতলে।

কেঁদে কেঁদে মোর গেল নিশিদিন
আজিও কি প্রভু, শোধে নাই ঋণ
দহনের আছে আরো কতদিন
পথ কত বাকী, দাও দাও ব'লে।
স্থান দাও প্রভু শ্রীচরণতলে।

দিশাহারা মোরে পথের প্রান্তে
দেহ দরশন, এপথভ্রান্তে
হে রামকৃষ্ণ, চিত্তে অভয়
কৃপাবারি দাও ঢেলে।
স্থান দাও প্রভু শ্রীচরণতলে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-বন্দনা

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

কামারপুকুর জয়রামবাটী মাটির মহিমা পূর্ণ করি
এলেন দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ দেবী সারদারে স্বয়ং বরি।
মৃন্ময় হল চিন্ময় পিতা, চিন্ময়ী দেবী হলেন মাতা
ত্রিতাপতপ্ত সন্তানে হেরি পিতা ও মাতার সহিল না তা।

জন্ম কর্ম দিব্য যাহার সে লীলার কথা বুঝিবে কেবা
ধর্মসমন্বয়ের শিক্ষা জীবশিববাদে জীবের সেবা।
অবতারদেহ ধরিয়া দেবতা যোগমায়াবাসে রহেন ঢাকা
এবার জননী সারদাযোগিনী শারদ শশীর জ্যোছনা রাকা।

তিমিরে তিমিরহারিণী জননী ভবতারিণীর কান্তি ধরি
এলোকেশপাশে সংশয় নাশে তাঁহারি প্রতিমা মরি গো মরি!
যশোদার মত রানী রাসমণি সে দেব-দুলালে নন্দব্রজে
পালন করিয়া লালন করিয়া পূত হইলেন সে পদরজে।

জননী সারদামণিরে জগজ্জননী জানিয়া প্রণাম করি
মাতৃপূজার পরাকাষ্ঠার প্রতীক মানবী মূরতি ধরি।
কাচে কাঞ্চনে অভেদ বিধান মানে অপমানে সমান জ্ঞান।
শ্রীরামকৃষ্ণ সরল ভাষায় কত উপদেশ করেন দান।

সরল ধর্মজীবন যাপন গৃহস্থালীর সেবায় রত
পরিচারিকার চাকুরীর মত, ধনী মালিকের সেবার মত।
এক ঈশ্বর নানা দর্শনে নানা পরকলা পরিয়া দেখি
অরূপ সরূপ দেখেছি সেরূপ কিরূপে বুঝাই কেমনে লেখি।

'যত মত তত পথ'-নির্ধার তর্কবিচার বিফল বৃথা
বাক্যের বুলি ফোটে না যেথায় কথায় বলিতে পারিবে কি তা?
ভারত-সাধনা-সাগর মন্থি মথিতোত্থিত নবনীসার
গার্হপত্য-যজ্ঞ করিলে ঢালি হুতবহে হবির ধার।

'সোঽহং'বাদীরে বলিলে বিনয়ে 'অহং' তোমার শোধন কর
আগে 'দাসোঽহং' বলিয়া বৎস ! জগৎপ্রভুর চরণ ধর।
শিব-শিবানীর বক্ষের ক্ষীর-সাগরে গভীরে করিয়া স্নান
রাজার পুত্র তুমি যুবরাজ পরে রাজাসনে পাবেই স্থান।

একটি তৃণের তত্ত্ব জানো না, জ্ঞানের মিছে না বড়াই কর।
ভক্তিদেবীর পদাঙ্ক ধরি অন্তঃপুরে প্রবেশ কর।
ব্রহ্মসাগরে ভাসিবে ডুবিবে যেন ভাসমান তুষারগিরি।
নুনের পুতুল কভু মিশে যাবে কভু আপনারে পাইবে ফিরি।

বিপথে কুপথে অতিঘুর পথে পতিত পথিকে দেখাতে পথ
আসিলে দয়াল আপনি বাহিয়া বৈতরণীর তরণ রথ।
সবার হৃদয়ে নিভৃত নিলয়ে দোঁহে সমাসীন হইয়া রহ।
শ্রীরামকৃষ্ণ জননী সারদা বিশ্বজনের প্রণাম লহ।

সইতে যেন পারি

শ্রীশান্তশীল দাশ

নিত্য তুমি আঘাত হানো,
সইতে আমি পারি না যে ;
বোঝ না কি কী বেদনা
আমার কোমল বক্ষে বাজে !
আকুল হ'য়ে আমি কাঁদি,
কান্না হ'ল জীবনসাথী ;
নিঠুর তুমি, কী অকরুণ,
নেই মমতা তোমার মাঝে ?

দয়াল তুমি—সবাই বলে,
এই কি তোমার দয়ালপনা ?
দুঃখ দিয়ে আনন্দ পাও,
পাইনে তোমার কৃপার কণা।
দাও, তবে দাও দুঃখই দাও,
যত খুশি পাষাণ চাপাও ;
সইতে যেন পারি—কেবল
এ-প্রার্থনা তোমার কাছে।

আধুনিক মানুষের উদ্দেশে শ্রীরামকৃষ্ণ

ডক্টর অণিমা সেনগুপ্ত *

ভগবদ্‌গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতারের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে বলেছেন :

'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥'

অর্থাৎ যখনই জগতে ধর্মের গ্লানি হয়, অধর্মের উত্থান হয়, তখনই ঐশী শক্তির অবতরণ হয় মর্ত্যের মায়ামঞ্চে। আর্তভক্তের উদ্ধার, দুষ্কৃতের বিনাশ এবং ধর্মের পুনঃস্থাপনাই হয় অবতারের আবির্ভাবের মূল উদ্দেশ্য। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ বাস্তবিক কোন্ সময়ে সংঘটিত হয়েছিল এবং ভগবদ্‌গীতা সেই সময়েই রচিত হয়েছিল কিনা তা আজও পণ্ডিতগণ সুনিশ্চিতরূপে নির্ধারিত করতে পারেন নি। সে যুগের প্রকৃত ইতিহাস বিশ্বের দরবারে আজও অনুদ্‌ঘাটিত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার কোমল পলিমাটিতে ঐশীশক্তির যে লোকোত্তর আবির্ভাব সমস্ত ভারত দর্শন করেছিল, তার পরিপূর্ণ ইতিহাস বর্তমান কাল সগৌরবে বহন করছে। বাংলার ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দী এক বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মধ্যযুগীয় কৃষ্ণা রাত্রির নিবিড় অন্ধকার ঐ শতাব্দীর উদীয়মান জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর অপরিমেয় আলোকপাতেই দূরীভূত হয়েছিল এবং এই ভাস্বর জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর পুরোভাগেই ছিলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। সে যুগ ছিল বাঙ্গালীর জীবনের এক মহাসংকটের যুগ। একদিকে হিন্দুধর্মের গ্লানিপূর্ণ বিকৃত ব্যাখ্যা, অন্যদিকে খৃষ্টধর্মের বিশেষ প্রচার। এই দুইটি মতধারার সংঘর্ষে 'ইয়ং বেঙ্গল' তখন দিগ্‌-ভ্রষ্ট, পথভ্রষ্ট। এই দুর্যোগের সময় মানবধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যই ধরাধামে শ্রীশ্রীঠাকুর অবতরণ করলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নরলীলা আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁর প্রাণস্পন্দন অতি নিবিড়ভাবে যুক্ত হ'য়ে গিয়েছিল কালীরূপিণী আদ্যাশক্তির সঙ্গে। কালীমায়ের রূপহীন জ্ঞানাতীত স্বরূপ ঠাকুরের ভাবদৃষ্টিতে পরিস্ফুট হয়েছিল স্নেহময়ী জননীর মূর্তিতে। সেজন্য শিশুর কাছে মাতৃবক্ষের মতোই জগতের নিগূঢ় তত্ত্ব তাঁর একান্ত পরিচিত ছিল। তিনি ছিলেন পরিপূর্ণতার প্রতীক। সংসারী মানুষকে সেজন্য তিনি শোনাতে চেয়েছিলেন নিষ্কাম কর্মের বাণী এবং অমেয় প্রেমের বাণী। এই বাণী শাশ্বত; পূর্ণের মর্মকোষ হ'তে উত্থিত এই বাণী অমৃতলোকেরই বার্তাবহনকারী। সেজন্য এই বাণী সকল যুগের সকল মানুষের জীবনপথের উপযুক্ত দিশারী। শ্রীশ্রীঠাকুর মানুষকে সর্বদা পরিপূর্ণতার কামনা করতে উপদেশ দিয়েছেন, কারণ পরিপূর্ণতার উপলব্ধি দ্বারাই মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী হয়। সংসার তুচ্ছ নয়, সংসারীর জীবনও তুচ্ছ নয়, যদি তাকে ঠিকভাবে গড়ে তোলা যায়। যদি সংসারযাত্রাকে এক শুভ আকর্ষণে বেঁধে রাখা যায়, যদি সংসারজীবনের কেন্দ্রে ঈশ্বরচৈতন্য

* এম. এ., পিএইচ ডি., বিদ্যাবিশারদ, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধান।

ভাস্বর জ্যোতিতে দেদীপ্যমান থাকে, তবে এই সংসারবেদীতেই মুক্তির আলোকরেখা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সংসারী মানুষকে জনক রাজার উদাহরণ দিয়ে বলতেন :

'জনক রাজা মহাতেজা তার বা
কিসের ছিল ত্রুটি।
সে যে এদিক ওদিক দুদিক রেখে
খেয়েছিল দুধের বাটি।'

সংসারী ভক্তদের তিনি বলেছেন : 'সত্যি বলছি, তোমরা সংসার করছো এতে দোষ নাই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে। তা না হ'লে হবে না। এক হাতে কর্ম করো, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধ'রে থাকো।'

বিবেকবৈরাগ্য :

শ্রীশ্রীঠাকুর বিবেকবৈরাগ্য লাভ ক'রে সংসারেচ্ছুক মানবকে সংসারে প্রবেশ করতে বলেছেন। বিবেক অর্থাৎ সৎ-অসৎ, নিত্য-অনিত্যের বিচার। নিত্যকে যদি প্রত্যক্ষ করা যায়, অশুভকে এবং মিথ্যাকে যদি চিনে নেওয়া যায়, তবে মন আর সংসারের প্রতি আসক্ত হয় না। সংসার আর তখন বন্ধন নয়। তখন সংসারেরই কেন্দ্রস্থলে উদ্ভাসিত হয় অপরিমেয় চৈতন্যজ্যোতি, যার কল্যাণরশ্মির বিচ্ছুরণে সংসারীর সমস্ত জীবনই মঙ্গলময় হয়ে ওঠে। নির্মল শুভ্র অন্তঃকরণের সঙ্গে বাইরের জগতের আর কোন দ্বন্দ্ব, কোন সংঘাত থাকে না। ভেদ তখন মিলনে রূপান্তরিত হয়; 'আমি'-বোধ পরিণত হয় 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'-বোধে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তখন একাকার। সেই শুভসময়ে নিঃস্বার্থ করুণা, প্রত্যাশাহীন প্রেম এবং নিরহংকার ক্ষমার অনুভূতিতে সংসারী মানুষও পরিপূর্ণতার আস্বাদনলাভে সমর্থ হয়। রাম-প্রসাদের গানে আছে 'বিবেকহলদি'র কথা। ঠাকুর সেই গান গাইতেন আর ব্যাখ্যা ক'রে বলতেন : 'সংসারসমুদ্রে কামক্রোধাদি কুমীর আছে। হলুদ গায়ে মেখে জলে নামলে কুমীরের ভয় থাকে না। বিবেকবৈরাগ্য হলুদ।' তাঁরই অমৃতময় কণ্ঠে পুনরায় ধ্বনিত হয়েছে : 'সংসার-ধর্ম ; তাতে দোষ নাই। কিন্তু ঈশ্বরের পাদ-পদ্মে মন রেখে কামনাশূন্য হয়ে কাজ করবে।' স্বার্থসুখের কামনাকে ত্যাগ ক'রে সংসারধর্ম করার শিক্ষাই বাস্তবিক মনুষ্যত্বলাভের শিক্ষা এবং এই শিক্ষা গ্রহণ ক'রে সংসারে প্রবেশ করলে সংসার এবং তপোবনে কোন ভেদ থাকে না। বর্তমান যুগেও মানুষকে মনুষ্যত্বলাভের পথে পরিচালিত করতে এবং জগতের সম্পদ বিশুদ্ধভাবে ভোগ ক'রে দিব্যতেজ সঞ্চয় করতে কেবল শ্রীশ্রীঠাকুর-বর্ণিত ধর্মের সংসারযাত্রাই সহায়ক হ'তে পারে

ধর্মের সংসার :

ধর্মের সংসারে সর্বপ্রথম বিসর্জন দিতে হয় স্বার্থবুদ্ধিকে। কারণ আত্মকেন্দ্রিকতায় সুখ হয় না, সুখ নিহিত আছে আত্মত্যাগে। ভোগ-প্রবৃত্তি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি এবং অতি বলশালী প্রবৃত্তি। সেজন্য জীবনের প্রারম্ভেই এই প্রবৃত্তিকে আত্মকেন্দ্র হ'তে বিচ্যুত ক'রে পরকল্যাণব্রতে নিযুক্ত করতে হবে। ভোগ-প্রবৃত্তি যখন কেবল নিজের দেহ-মনকে আশ্রয় ক'রে, অথবা নিজের গণ্ডীবদ্ধ ক্ষুদ্র পরিবারকে আশ্রয় ক'রে জেগে ওঠে এবং তাতেই সীমিত হয়ে যায়, তখনই মানুষ হয় স্বার্থপর এবং সংকীর্ণমনা। স্বার্থপরতার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগে আবদ্ধ হয়ে আছে কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা ইত্যাদি দুষ্ট প্রবৃত্তির দল। সেজন্য স্বার্থপরতা মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে বয়ে আনে কেবল সর্বনাশা পরিণতি। যোগক্ষেমের আশা এক নিমেষে তলিয়ে যায় কোন্ অন্ধকার অতল গহ্বরে!

শ্রীশ্রীঠাকুর এই আত্মকেন্দ্রিক বাসনার পায়ে শিকল পরানোর জন্যই ঈশ্বরচৈতন্যকে সংসারজীবনের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত করতে বলেছেন। পরম চৈতন্যের দ্বারা চলমান সংসারের সমস্ত সম্পদ উদ্ভাসিত হয়েছে ব'লে অনুভব করতে মানবকে উপদেশ দিয়েছেন। তা হ'লেই সংসারীর ভোগ হবে ত্যাগবিদ্ধ। গৃধ্নুতা সর্বপ্রকারে পরিত্যাগ করলেই সংসার হয়ে উঠবে 'ধর্মের সংসার'। এরূপ সংসার, ঠাকুরের মতে, অনিত্য নয়। তিনি বলেছেন: 'যতক্ষণ ঈশ্বরকে না পাওয়া যায়, ততক্ষণ নেতি নেতি ক'রে ত্যাগ করতে হয়। তাঁকে যারা পেয়েছে, তারা জানে যে তিনিই সব হয়েছেন।...তাঁকে জেনে সংসার করলে অনিত্য নয়।'

উপনিষদেও অখণ্ড চৈতন্যকে বিশ্বাতীত এবং বিশ্বানুগ—দুই রূপেই বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বিশ্বের অতীত আবার বিশ্বেই পরিব্যাপ্ত। একদিকে তিনি নেতি নেতি, অন্যদিকে তিনি ইতি ইতি।

'একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুর্ণশ্চ॥'

—অদ্বিতীয় জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা সকল প্রাণীতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত; তিনি সর্বব্যাপী, সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা, সকল কর্মের নিয়ামক, সর্বভূতের নিবাসস্থান, সর্বসাক্ষী, চৈতন্যাভিব্যক্তির কারণ এবং নিগুর্ণ, নিরুপাধিকও।

বস্তুবিশ্ব ঐ বিরাট বিস্ফারিত চৈতন্যের প্রাণস্পন্দনে স্পন্দিত। এইরূপ অনুভব হৃদয়ে জাগ্রত ক'রে জগৎ-ভোগে প্রবৃত্ত হ'লে, ভোগ সুন্দর হয়, সুসমঞ্জস হয়, শুদ্ধ হয়। সেই শুভ-লগ্নেই মানুষ বলতে পারে—

'মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।'

শ্রীশ্রীঠাকুরও সকল যুগের সকল মানুষকে এই মহান সাধনায় দীক্ষিত হ'তে বলেছেন। অখণ্ড-চৈতন্যই যে বিশ্ব হ'য়ে রয়েছেন! তিনি নীরূপ কেবল নন, বিশ্বরূপও। 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্।' তিনি যে বিশ্বসংসাররূপে বিরাজ করছেন!

কামিনীকাঞ্চনত্যাগ:

কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করার জন্যও শ্রীশ্রীঠাকুর বার বার ভক্তদের উপদেশ দিয়েছেন।* কিন্তু ঠাকুরের উপদেশের অর্থ এই নয় যে, ঈশ্বর-প্রাপ্তির মানসে কর্মপ্রবৃত্তি, সংসারধর্ম ইত্যাদি ত্যাগ ক'রে সকল মানুষ সন্ন্যাস নিয়ে বনে গমন করবে। সংসারে থেকেও কাঞ্চন ত্যাগ করার সাধনা করা সম্ভব; কেবল সম্ভবই নয়, 'ধর্মের সংসারে' একান্ত আবশ্যক। কাঞ্চন অর্থাৎ অর্থ যদি কেহ স্পর্শ না করে, তবে সংসারযাত্রা অথবা লোকযাত্রা কেমন ক'রে চলবে? কাঞ্চন-ত্যাগের প্রকৃত অর্থ হ'ল কাঞ্চনের প্রতি অজ্ঞানলব্ধ আসক্তিপূর্ণ দৃষ্টিটি ত্যাগ করা—অর্থ-গৃধ্নুতা ত্যাগ করা, সঞ্চয়তৃষ্ণাকে নষ্ট করা। যদি একবার অর্থসঞ্চয়তৃষ্ণা মনকে অধিকার ক'রে বসে, তবে মানুষ কেবল একটি অর্থসঞ্চয়ের 'মেসিন' হয়ে ওঠে। সঞ্চয়ই তখন প্রধান—সকল প্রকার নৈতিক মূল্যবোধ তখন তুচ্ছ হয়ে যায়। তখন অর্থপিপাসু মানুষের মনে হয় জগতের সকল আর্থিক সম্পদ কেবল তারই হস্ত-গত হবার জন্য সৃষ্ট হয়েছে এবং 'যেন তেন

* শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন পুরুষভক্তদের উপদেশ দিতেন, তখন বলিতেন, 'কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগ'; স্ত্রীভক্তদের উপদেশ দিবার সময়ে 'পুরুষকাঞ্চনত্যাগ' শব্দ ব্যবহার করিতেন। দ্রষ্টব্য—উদ্বোধন ৭৮।৫৫ পৃঃ।—সঃ

প্রকারেণ' অর্থ তাঁকে চূড়ান্তভাবে লাভ করতে হবে, কারণ এই সঞ্চয়েই যেন তার জীবনের সার্থকতা নিহিত রয়েছে। এরূপ দৃষ্টি হ'ল অজ্ঞানীর দৃষ্টি। এরূপ মনোভাব নিয়ে কাঞ্চন স্পর্শ করলে জলস্থিত কুমীরের মতোই কাঞ্চন সংসারী জীবকে ধ্বংস করে। সেজন্য সংসারী ভক্তদের ঠাকুর যখন কাঞ্চন ত্যাগ করার উপদেশ প্রদান করেছেন, তখন তিনি অশুদ্ধ কর্ম ও অশুদ্ধ ভোগতৃষ্ণাকে ত্যাগ করতে বলেছেন, বলেছেন সংসারী মানুষ যেন ঈশ্বরচৈতন্যে সিক্ত হয়ে কর্ম এবং ভোগকে শুদ্ধ ক'রে নেয়।

কামিনীত্যাগের উপদেশ দিয়ে কামিনীকে তিনি তুচ্ছ করেন নি; বরং অতি উচ্চস্থান প্রদান করেছেন। তিনি নারীকে কেবল জৈব-ভোগের উপকরণরূপে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন; কারণ নারী আদ্যাশক্তিরই অভিব্যক্তি। তার প্রতি অশুদ্ধ কামপূর্ণ এবং আসক্তিপূর্ণ মনোভাব পোষণ করলে তাকে ক্ষুদ্র ক'রে দেখা হয়, হীন ক'রে দেখা হয়। নারীকে কেবল ভোগের সামগ্রীরূপে দেখা হ'ল পাপদৃষ্টি। স্নেহময়ী মাতৃমূর্তিতে দর্শন করা হ'ল শুদ্ধ দৃষ্টি। বিদ্যুৎশক্তিকে যদি তার যথার্থরূপে দর্শন ক'রে ব্যবহার করতে চেষ্টা করা হয়, তবেই এই শক্তি কল্যাণপ্রদ হয়। কিন্তু ভ্রান্ত জ্ঞান নিয়ে বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহার করলে, তা প্রাণ-নাশকই হয়ে ওঠে। স্ত্রীরূপিণী মহাশক্তির স্বভাবও ওইরূপ। স্বরূপে সাধনা করলে মোক্ষদায়িনী, কিন্তু ভোগদৃষ্টিতে বন্ধনকারিণী। সেজন্য শ্রীশ্রীঠাকুর সংসারী ভক্তদের বার বার বলেছেন কামিনীকাঞ্চনের প্রতি আসক্তি অর্থাৎ পাপদৃষ্টি ত্যাগ করতে। অনাসক্ত এবং অহংকারবর্জিত নিষ্কাম, শুদ্ধ প্রেমভাব নিয়ে সংসারে প্রবেশ করলে পতনের ভয় থাকে না।

*

অনাসক্তি ও ভারতীয় সাধনা:

অনাসক্ত হৃদয়, শুদ্ধ দৃষ্টি এবং নির্লোভ মন নিয়ে সংসারপ্রবেশের সাধনা ভারতের চিরন্তন সাধনা—ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অন্যতম লক্ষ্য। সেজন্য ব্রহ্ম-চর্যাশ্রমে উপনীত বিদ্যার্থীর জীবন আচার্য কঠোর নিয়মে আবদ্ধ ক'রে দিতেন। নিয়মানুবর্তিতা ছিল শিষ্যের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য। সংসারী মানুষের স্বধর্ম হ'ল মানুষের কল্যাণ-সাধন; এবং এর জন্য সর্বাগ্রে তাকে মনুষ্যত্বলাভের সাধনা করতে হবে—আপনাকে পূর্ণ মানবত্বের মহিমায় মণ্ডিত করতে হবে। আপনার প্রবৃত্তিকে দমন করতে হবে, আচরণ সংযত করতে হবে এবং ইচ্ছাবৃত্তিকে পরিমিত করতে হবে, শুদ্ধ করতে হবে। অন্তঃকরণকে দূষিত ভাবনা হ'তে মুক্ত রাখতে হবে এবং বিশুদ্ধ মন দ্বারা সত্যকে উপলব্ধি করতে হবে। তবেই হবে জ্ঞানসাধনার উপযুক্ত উদ্‌যাপন। তবেই ভগবানের যে মঙ্গল ইচ্ছা জীবজগতের সর্বত্র অভিব্যক্ত হচ্ছে, সেই শুভ ইচ্ছার সঙ্গে জ্ঞানী মানুষের অনাসক্ত শুদ্ধ ইচ্ছার পরিপূর্ণ ঐক্য স্থাপিত হবে এবং জগতের কল্যাণসাধনই তখন হবে তাঁর যাবতীয় কর্মের একমাত্র লক্ষ্য। সেজন্য অনাসক্ত বিশুদ্ধতায় হৃদয় পূর্ণ করা ছিল গুরুগৃহবাসী ব্রহ্মচারীর জীবনের প্রধান এবং পরম লক্ষ্য। গৃহস্থ-জীবনের দায়িত্ব পরিপূর্ণরূপে বহন ক'রে নিজের এবং সমাজের শ্রীবৃদ্ধিসাধন কেবল সংযত অনাসক্ত মন দ্বারাই সম্ভবপর হয়।

তৃষ্ণা, আসক্তি ও লোভ মানুষকে বিষয়ে আবদ্ধ ক'রে ক্ষুদ্র করে এবং স্বতন্ত্র করে। ফলে সমস্ত জগৎ তার কাছে খণ্ড খণ্ড প্রতীয়মান হয়—জগতের অখণ্ডতা উপলব্ধির পথ অবরুদ্ধ হয়। সংকীর্ণ পরিধিতে, সংকীর্ণ মন নিয়ে মানুষ তার জীবনের সকল ক্ষেত্রে সংকীর্ণতার বীজই বপন করতে আরম্ভ করে। শ্রীশ্রীঠাকুরের

ভাষায়—সে তখন কেবল বিষয়রূপ মূলো খেয়ে মূলোরই ঢেকুর তোলে। কিন্তু এই আসক্তির বন্ধন হ'তে যদি মুক্ত হওয়া যায় তবে আর মানুষে মানুষে ভেদবোধ থাকে না। কোন মানুষই আর নিরর্থকরূপে অকেজোরূপে বা হীনরূপে অনুভূত হয় না। তখন সকলের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরচৈতন্য প্রত্যক্ষ হয়। আসক্তিহীন ত্যাগী মানুষই অনুভব করে—

'তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে
কেহ নহে নহে দূর।'

তখন আর আমার পুত্র, আমার কন্যা, আমার দেশ, আমার জাত—এইরূপ সংকীর্ণ ভাবনা মনকে দূষিত করে না। ভূমার মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ তখন নিঃশেষে তলিয়ে যায়। প্রকৃত মনুষ্যত্বপ্রাপ্তির এই একমাত্র পথ এবং এই উন্নত ঐক্যবোধেই মানবজীবনের পরিপূর্ণতা। খণ্ডকে অখণ্ডের সূত্রে আবদ্ধ না ক'রে কেবল খণ্ডরূপে পৃথক্‌রূপে প্রত্যক্ষ করলে জগতে শান্তিস্থাপন কখনও সম্ভবপর হবে না। পাশ্চাত্য জগতের ঈশ্বরকেন্দ্রচ্যুত বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদ আজও তো নিখিল মানবের শুভ বুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে নি। তৃতীয় মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা আজও মানুষকে উদ্বিগ্ন এবং শঙ্কিত ক'রে রেখেছে। আজও চারিদিকে ভয়াবহ রক্তক্ষরণ এবং দুর্গতের হাহাকার। মনে হয়, মানবসভ্যতা যেন এক মহাধ্বংসের সীমায় এসে উপনীত হয়েছে। এই সংকটের মুহূর্তে শ্রীশ্রীঠাকুর দ্বারা প্রদর্শিত যথার্থ মনুষ্যত্বের সাধনমার্গই আধুনিক মানুষের উপযুক্ত রক্ষাকবচ। 'দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ।' দেবতা হয়ে দেবতার পূজা করাই হ'ল ভারতীয় সাধনা। অখণ্ডচৈতন্যজ্যোতিতে জীবন আলোকিত ক'রে জীবরূপী শিবের সেবা করতে হবে। ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক, সমাজসেবী, শিক্ষক সকলকেই আসক্তিহীন হৃদয় নিয়ে নর-নারায়ণের সেবায় অগ্রসর হ'তে হবে। নিজেকে এবং অপরকে ঈশ্বরের মধ্যে লাভ করাই মনুষ্য-জীবনের পরম প্রাপ্তি। তা হ'লেই কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি বিকারের স্পর্শ হ'তে মুক্ত হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভবপর হয়। নির্মল মনুষ্য নিজের অন্তরে প্রসন্নতা লাভ ক'রে জগতে সেই প্রসন্নতার আলোক বিকীর্ণ করতে সক্ষম হয় এবং জগতে শান্তিস্থাপনও তখন সম্ভবপর হয়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্ম-তিথির শুভ লগ্নে আজ আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা—আধুনিক মানুষ যেন কেবল বাস্তবের স্বার্থসুখ এবং সাংসারিক প্রয়োজন মাত্র নিয়ে ব্যস্ত থেকে সংকীর্ণমনা ও স্বার্থপর হয়ে না ওঠে; সে যেন নিখিল বিশ্বের মধ্যে আনন্দের বা চৈতন্যের ছবিখানি দেখতে পায়; শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রদর্শিত ঈশ্বরকেন্দ্রিক নির্লোভ নিঃস্বার্থ সংসারজীবনে সে যেন বিনয়ে নম্র, করুণায় স্নিগ্ধ, ত্যাগে মহীয়ান ও প্রেমে পূর্ণ হয়ে উঠতে সমর্থ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ঃ বিনোদিনী ঃ বঙ্গরঙ্গমঞ্চ

শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়*

ইংরেজি ১৮৮৪ সালের ২১ সেপ্টেম্বর বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন।

বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটারে তখন গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা' নাটক অভিনীত হচ্ছে। নাটকটির খ্যাতি শহরে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এবং তা শহর কলকাতার গণ্ডি ছাড়িয়ে সারা বাংলাদেশে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। বৈষ্ণবপণ্ডিতদের মুখেও নাটকের প্রশংসা। একদিন 'চৈতন্যলীলা' প্রসঙ্গ উঠল শ্রীরামকৃষ্ণসকাশে (১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪ : কথামৃত, ৪র্থ ভাগ)। তখনো গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে তিনি বিশেষ কিছু জানেন না —তাঁদের কোন ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও গড়ে ওঠেনি। নাটকের প্রশংসা শুনেই শ্রীরামকৃষ্ণ স-শিষ্য নাটক দেখতে এলেন সেদিন স্টার থিয়েটারে।

গিরিশচন্দ্র তখন বাইরের কম্পাউণ্ডে পায়চারি করছিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণের একজন ভক্ত (মহেন্দ্র মুখোপাধ্যায়) গিরিশের কাছে এসে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনবার্তা জানিয়ে জানতে চাইলেন কোন দর্শনী লাগবে কি না! গিরিশচন্দ্র সামান্যক্ষণ চিন্তা ক'রে জবাব দিলেন "ওঁর টিকিট লাগবে না কিন্তু সঙ্গে যাঁরা আছেন তাঁদের লাগবে।" তারপর সাধারণ সৌজন্যবশত এগিয়ে এসেছেন—একজন ভক্ত তাঁর পরিচয় শ্রীরামকৃষ্ণকে জানাবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণই প্রথম নমস্কার জানালেন। গিরিশচন্দ্র তাঁকে প্রতিনমস্কার জানানোর পর কিছুক্ষণ চলল নমস্কার ও প্রতিনমস্কার। অবশেষে গিরিশচন্দ্রই পরাজয় স্বীকার ক'রে নিয়ে তাঁকে 'বক্সে' বসিয়ে একজন পাখা-ওয়ালা নিযুক্ত ক'রে বাড়ি ফিরে গেলেন। সেদিন গিরিশের শরীর ভাল ছিল না—অভিনয় চলার সময় এবং তার পরবর্তী ঘটনার সময় তিনি অনুপস্থিত।

এক সময় অভিনয় শেষ হল। ভাবাবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ অফিসঘরে এসে বসলেন। চৈতন্যের ভূমিকাভিনেত্রী বিনোদিনী দাসী লিখেছেন :

"অভিনয়কার্য শেষ হইলে আমি শ্রীচরণ দর্শন জন্য যখন অফিসঘরে তাঁহার চরণ-সমীপে উপস্থিত হইতাম, তিনি প্রসন্ন বদনে উঠিয়া নাচিতে নাচিতে বলিতেন 'হরি গুরু গুরু হরি', বল মা 'হরি গুরু গুরু হরি', তাহারপর উভয় হস্ত আমার মাথার উপর দিয়া আমার পাপ-দেহকে পবিত্র করিয়া বলিতেন যে, 'মা, তোমার চৈতন্য হউক।' তাঁর সেই সুন্দর প্রসন্ন ক্ষমাময় মূর্তি আমার ন্যায় অধম জনের প্রতি কি করুণাময় দৃষ্টি! পাতকীতারণ পতিতপাবন যেন আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমায় অভয় দিয়াছিলেন!" (আমার কথা ও অন্যান্য রচনা : বিনোদিনী দাসী, ১৩৭৬ সং, পৃঃ ৪৭)

ঘটনাটি বহুকথিত ও অনেকের কাছেই পরিচিত। রামকৃষ্ণবিষয়ে আগ্রহীরা এ বিষয়ে আরও তথ্য জানার জন্য স্বতই উৎসুক—সেই ঔৎসুক্য নিয়ে সন্ধান শুরু ক'রে উপস্থিত হয়েছিলাম শ্রীকৃষ্ণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (নাটুবাবু)-এর কাছে। প্রবীণ ব্যবহারজীবী নাটুবাবু আইনসংক্রান্ত ব্যাপারে বিনোদিনীর সংস্পর্শে এসেছিলেন। বিনোদিনীই তাঁকে সেদিনের ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ জানিয়েছিলেন। তিনি

* কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান।

বলেছিলেন, অভিনয় চলার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েন এবং তাঁকে স্টেজে নিয়ে যাবার জন্য ভক্তদের বারবার বলতে থাকেন। এই অবস্থায় থিয়েটার শেষ হল। বিনোদিনী ওঁর জন্যে অফিসঘরে অপেক্ষা করছিলেন।—শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে প্রবেশ করেই ভাবাবিষ্ট অবস্থায় শ্রীগৌরাঙ্গবেশী বিনোদিনীর পায়ের ওপর পড়েন। (লেখক কর্তৃক গৃহীত জবানবন্দী)

স্বামী অভেদানন্দ (তখন কালী) সেদিন স্টার থিয়েটারে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে ছিলেন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ অভেদানন্দের কাছে শুনেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ বিনোদিনীর পাদস্পর্শ করার আগেই ভক্তরা তাঁকে ধরে ফেলেন। (স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের জবানবন্দী)

গিরিশবাবু স্পষ্টভাবে না বললেও "অনেক সাধুব্যক্তি ভাবাবেশে তাহার (বিনোদিনীর) পদধূলি লইতে অগ্রসর"[১] হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

সেদিনের এই ঘটনা এবং আশীর্বাদলাভ বিনোদিনীর জীবনে কি বৈপ্লবিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তা আমরা বিনোদিনীর কথা থেকেই জানতে পারি:

"আমি মহাপ্রভুর দয়ায় কত ভক্তিভাজন সুধীগণের কৃপার পাত্রী হইয়াছিলাম। এই চৈতন্যলীলার অভিনয়ে—শুধু চৈতন্যলীলার অভিনয়ে নহে আমার জীবনের মধ্যে চৈতন্যলীলার অভিনয় আমার সকল অপেক্ষা শ্লাঘার বিষয় এই যে আমি পতিতপাবন ৺পরমহংসদেব রামকৃষ্ণ মহাশয়ের দয়া পাইয়াছিলাম।……

জগৎ যদি আমায় ঘৃণার চক্ষে দেখেন, তাতেও আমি ক্ষতিবিবেচনা করি না। কেননা আমি জানি যে পরমারাধ্য প্রেমপূজনীয় ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আমায় কৃপা করিয়াছিলেন! তাঁর সেই পীযূষপূরিত আশাময়ী বাণী—'হরি গুরু গুরু হরি' আজও আমায় আশ্বাস দিতেছে। যখন অসহনীয় হৃদয়ভারে অবসন্ন হইয়া পড়ি, তখনই যেন সেই ক্ষমাময় প্রসন্নমূর্তি আমার হৃদয়ে উদয় হইয়া বলেন যে 'বল—হরি গুরু গুরু হরি।' এই চৈতন্যলীলা দেখার পর তিনি কতবার থিয়েটারে আসিয়াছেন, মনে নাই। তবে 'বক্ষে' যেন তাঁর সেই প্রসন্ন প্রফুল্লময় মূর্তি আমি বহুবার দর্শন করিয়াছি

বিনোদিনীর রামকৃষ্ণ-সংস্পর্শে আসার আরও কিছু তথ্য আমরা পেতে পারি কথামৃত ও অন্যান্য গ্রন্থ থেকে। শ্রীরামকৃষ্ণ স্টার থিয়েটারে থিয়েটার দেখতে এসেছেন মোট পাঁচবার:

নাটক	বিনোদিনীর ভূমিকা
(১) চৈতন্যলীলা	'চৈতন্যে'র
(২) প্রহ্লাদচরিত্র	'প্রহ্লাদে'র
(৩) বৃষকেতু	'পদ্মাবতী'র
(৪) নিমাইসন্ন্যাস	'নিমাই'য়ের
(৫) দক্ষযজ্ঞ	'সতী'র

প্রথম তিনটি অভিনয় দর্শনের কথা 'কথামৃতে' আছে—এবং 'প্রহ্লাদচরিত্র' ও 'বৃষকেতু'র অভিনয়ের পর গিরিশের নির্দেশেই অভিনেতা-অভিনেত্রীরা শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করে।

'নিমাইসন্ন্যাস' নাটক দেখার কথা অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গিরিশচন্দ্র' গ্রন্থে পাওয়া যায়। তবে সেদিন সম্ভবত শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশের

পুরুষ অংশে নারী অভিনেত্রী: গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

দুর্ব্যবহারে অভিনয় শেষ হওয়ার পূর্বেই চলে গিয়েছিলেন।

'দক্ষযজ্ঞ' নাটক দেখার কথা জানতে পারা যায় লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা এবং বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত' গ্রন্থে। লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা-অনুসারে 'দক্ষযজ্ঞ' নাটক শেষ হবার আগেই শ্রীরামকৃষ্ণ থিয়েটার পরিত্যাগ করেন।

এ ছাড়া 'বৃষকেতু'র সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল বিবাহবিভ্রাট—বিনোদিনীর বিলাসিনী কারফরমার অভিনয়ও শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেছিলেন।

অক্ষয়কুমার সেন তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'তে একদিনের অভিনয়ের পরের ঘটনা উল্লেখ করেছেন :

একদিন মঞ্চমধ্যে প্রভুর গমন।
নিরখিয়া শ্রীগিরিশ পুলকিত মন॥
পতিতপাবন প্রভু পতিত-ভরসা।
পতিত-উদ্ধার-কাজে মঞ্চমাঝে আসা॥
পাকা ষোলআনা জ্ঞান গিরিশের মনে।
সেই হেতু রঙ্গালয়ে রহে যে যেখানে॥
কি লম্পট কি কপট হীন হেয় মন।
বেশ্যা বারাঙ্গনাজাতি অভিনেত্রীগণ॥
আবাহন সকলেই বারে বারে করে।
পদরেণু ঠাকুরের শিরে ধরিবারে॥
অভিনেতা পুরুষেরা আসিয়া তথায়।
অভয়-চরণরেণু ধরিল মাথায়॥
গিরিশের আশ্বাস-বচনে পেয়ে বল।
উপনীত অবশেষে বারাঙ্গনাদল॥
গণনায় ষোলজনা যুবতী প্রখরা।
বসনে ভূষণে সজ্জা মুনিমনোহরা॥
দেখিয়া শ্রীপ্রভুদেব ভাবেভরা চিত।
ধরিলা মোহন কণ্ঠে শ্যামা-গুণগীত॥
মধুর প্রভুর স্বর পিকপাখী জিনি।
শ্রবণে মোহিতচিত যতেক রমণী॥
তার মধ্যে একজন বিনোদিনী নাম
মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়ে ধরায় অজ্ঞান॥
প্রসারিত ঠাকুরের শ্রীচরণতলে।
দিব্যভাব সমুদিত অন্তর-অঞ্চলে॥

ঘটনাটির অন্যত্র কোথাও উল্লেখ দেখি না—এমন কি বিনোদিনীও তাঁর স্মৃতিকথায় এ বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেন নি।

রোগশয্যায় শায়িত শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বিনোদিনীর শেষ সাক্ষাৎ অত্যন্ত নাটকীয়। অসুস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ তখন শ্যামপুকুরে। ভক্তগণ বাইরের লোকের, বিশেষ ক'রে স্ত্রীলোকদের দর্শন ও যাতায়াত সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছেন। দর্শনব্যাকুল অভিনেত্রী বিনোদিনীর অভিনয় ও রূপসজ্জার বিস্ময়কর নিদর্শন, তিনি ইউরোপীয় ভদ্রলোকের ছদ্মবেশে ভক্তদের বিমূঢ় করে উপস্থিত হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-সকাশে। বিনোদিনী লিখেছেন :

"আর একদিন যখন তিনি অসুস্থ হইয়া শ্যামপুকুরের বাটীতে বাস করিতেছিলেন, আমি শ্রীচরণ দর্শন করিতে যাই তখনও সেই রোগক্লান্ত প্রসন্ন বদনে আমায় বলিলেন 'আয় মা বোস', আহা কি স্নেহপূর্ণ ভাব! এ নরকের কীটকে যেন ক্ষমার জন্য সতত আগুয়ান।" (আমার কথা : বিনোদিনী দাসী ; পৃ: ৪৭)

একটু বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন অক্ষয়কুমার সেন :

"সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে" বিনোদিনী "যুবকের পরিচ্ছদে" হাজির হন এবং তারপর

অনেকের সঙ্গে দেখা পথের মাঝারে।
কেহই চিনিতে নাহি পারিল তাহারে॥
কিন্তু শ্রীগোচরে যেই মুহূর্তেকে আসা।
চিনিয়া শ্রীপ্রভু তারে করিল জিজ্ঞাসা॥
কি রে তুই হেথা হেন বেশে কি কারণ।
উত্তরে কহিলা প্রভু মাত্র দরশন॥

তারপর প্রণামাদি ও আশীর্বাদ লাভান্তে প্রস্থান।

স্বামী সারদানন্দের (লীলাপ্রসঙ্গ) বিবরণ প্রত্যক্ষদর্শীর—সুতরাং একটু বিস্তৃতভাবেই দেখা যেতে পারে:

"...একদিন এক রঙ্গ উপস্থিত হইল। গিরিশচন্দ্র-পরিচালিত নাট্যশালায় ধর্মমূলক নাটকবিশেষের অভিনয় দর্শন করিতে ঠাকুর একদিবস দক্ষিণেশ্বরে থাকিবার কালে গমন করিয়াছিলেন এবং নাটকের প্রধান ভূমিকা যে অভিনেত্রী গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার অভিনয়-দক্ষতার প্রশংসা করিয়াছিলেন। অভিনয়ান্তে ঐ দিন উক্ত অভিনেত্রী ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের পাদ-বন্দনা করিবার সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইয়াছিল।...ঠাকুরের নিদারুণ পীড়ার কথা শুনিয়া সে এখন তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং শ্রীযুত কালীপদ ঘোষের সহিত পরিচিত থাকায় বিশেষ অনুনয়বিনয়-পূর্বক ঐ বিষয়ের জন্য তাঁহার শরণাপন্ন হইল। ... গোপনে পরামর্শ স্থির করিয়া একদিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি (কালীপদ ঘোষ) তাহাকে পুরুষের ন্যায় 'হ্যাট-কোটে' সজ্জিত করিয়া শ্যামপুকুরের বাসায় উপস্থিত হইলেন এবং নিজ বন্ধু বলিয়া আমাদের নিকটে পরিচয় প্রদানপূর্বক ঠাকুরের সমীপে লইয়া যাইয়া তাহার যথার্থ পরিচয় প্রদান করিলেন। ঠাকুরের ঘরে তখন আমরা কেহই ছিলাম না, সুতরাং ঐরূপ করিবার পথে তাঁহাকে কোন বাধাই পাইতে হইল না। আমাদিগের চক্ষে ধূলি দিবার জন্যই অভিনেত্রী ঐরূপ বেশে আসিয়াছে জানিয়া রঙ্গপ্রিয় ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন এবং তাহার সাহস ও দক্ষতার প্রশংসাপূর্বক তাহার ভক্তিশ্রদ্ধা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর ঈশ্বরে বিশ্বাসবতী ও তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া থাকিবার জন্য তাহাকে দুই-চারিটি তত্ত্বকথা বলিয়া অল্পক্ষণ পরে বিদায় দিলেন। সেও অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে তাঁহার শ্রীচরণে মস্তক স্পর্শপূর্বক কালীপদের সহিত চলিয়া যাইল। ঠাকুরের নিকট হইতে আমরা পরে একথা জানিতে পারিলাম এবং আমরা প্রতারিত হওয়ায় তিনি হাস্যপরিহাস ও আনন্দ করিতেছেন দেখিয়া কালীপদের উপরে বিশেষ ক্রোধ করিতে পারিলাম না।"

২

বিনোদিনীর স্বল্পপরিসর সাফল্যউজ্জ্বল অভিনেত্রীজীবন চমকপ্রদ হলেও তাঁর ব্যক্তি-জীবনের মতই ট্র্যাজিক। তাঁর সাফল্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস ছড়িয়ে আছে গিরিশচন্দ্রের রচনায়—সেকালের সাময়িকপত্রের সমালোচনায়। বিস্তৃতভাবে সে আলোচনার সুযোগ এখানে নেই, শুধু তাঁহার অভিনয়-প্রতিভা সম্পর্কে গিরিশচন্দ্রের কিছু অভিমত উল্লেখ করব:

"তাহার (বিনোদিনীর) সর্বতোমুখী প্রতিভার নিকট আমি সম্পূর্ণ ঋণী, একথা মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য। আমার 'চৈতন্য-লীলা' 'বুদ্ধদেব' 'নলদময়ন্তী' প্রভৃতি নাটক যে সর্বসাধারণের নিকট আশাতীত আদর লাভ করিয়াছিল, তাহার আংশিক কারণ, আমার প্রত্যেক নাটকে শ্রীমতী বিনোদিনীর প্রধান ভূমিকাগ্রহণ ও সেই সেই চরিত্রের চরমোৎকর্ষ-সাধন! অভিনয় করিতে করিতে সে তন্ময় হইয়া যাইত, আপন অস্তিত্ব ভুলিয়া এমন একটি অনির্বচনীয় পবিত্রভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিত, সে সময় অভিনয়—অভিনয় বলিয়া মনে হইত না, যেন সত্য ঘটনা বলিয়াই অনুভূত হইত। বাস্তবিক সে ছবি এখনও আমার চক্ষের উপর প্রতিফলিত রহিয়াছে।... সে যে সুনাম—যে সুযশ—যে সুখ্যাতি—যে

আদর—যে আপ্যায়ন সর্ব সাধারণের নিকট প্রভূত পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়াছিল, আদর্শ অভিনেত্রী বলিয়া সকল অভিনেত্রীর জিহ্বায় আজ পর্যন্ত যাহার নাম উচ্চারিত হয়···বঙ্গরঙ্গভূমির সে যে একটি স্তম্ভস্বরূপ ছিল এবং সে স্তম্ভচ্যুত হইয়া দেশীয় রঙ্গমঞ্চ যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত, এ কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।" (কেমন করিয়া বড় অভিনেত্রী হইতে হয় : গিরিশচন্দ্র ঘোষ।)

মাত্র ২৩ বছর বয়সে তিনি থিয়েটার পরিত্যাগ ক'রে চলে যান—গিরিশচন্দ্র যাঁকে বলেছেন 'আদর্শ অভিনেত্রী'। তাঁর অকস্মাৎ থিয়েটার ছেড়ে দেবার কারণ কি? — নাট্য-ইতিহাসের গবেষকদের কাছে এ একটা কৌতূহলজনক সমস্যা। নানা কারণ দেখান হয়েছে, তার মধ্যে একটি যে শ্রীরামকৃষ্ণসংস্রব তা প্রগতিশীল গোষ্ঠীও অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। বিনোদিনীর আত্মস্মৃতি—'আমার কথা'র ভূমিকায় শ্রীসৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীনির্মাল্য আচার্য লিখেছেন :

"'চৈতন্যলীলা'র দ্বিতীয় খণ্ডের অভিনয়-প্রস্তুতি থেকেই তাঁর মানসিক পরিবর্তন তীব্র আকার গ্রহণ করেছিল। ১৮৮৬-তে রামকৃষ্ণদেব পরলোকগমন করেন। এই বছরই বিনোদিনীর থিয়েটার-ত্যাগ। এ-দুই ঘটনার যোগসূত্র থাকাও বিচিত্র নয়।" (ভূমিকা, পৃঃ ৷৶৹)

বিনোদিনী তাঁর থিয়েটার-ত্যাগের কারণ সম্পর্কে লিখেছেন :

"কিন্তু পরিশেষে নানারূপ মনভঙ্গ দ্বারা থিয়েটারে কার্য করা দুরূহ হইয়া উঠিল। যাঁহারা একসঙ্গে কার্য করিবারকালীন সমসাময়িক স্নেহময় ভ্রাতা বন্ধু আত্মীয় সখা ও সঙ্গী ছিলেন, তাঁহারা ধনবান উন্নতিশীল অধ্যক্ষ হইলেন। বোধহয় সেই কারণে অথবা আমারই অপরাধে দোষ হইতে লাগিল। কাজেই আমার থিয়েটার হইতে অবসর লইতে হইল।"

শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাব ও বিনোদিনীর থিয়েটারত্যাগের মধ্যে প্রত্যক্ষ কোনো যোগ থাকলে গিরিশচন্দ্রের দৃষ্টি অবশ্যই এড়াত না—সম্ভবত তিনি খুশীই হতেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র বলেছেন "দৈবদুর্বিপাকবশতঃ" বিনোদিনীর "বহুবৎসর যাবৎ কোনও রঙ্গালয়ের সহিত" সম্বন্ধ নেই।

শ্রীমতী প্রতিভা খান্না অভিনেত্রী তারাসুন্দরীর কন্যা। তারাসুন্দরী ও বিনোদিনী একই বাড়িতে দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন। প্রতিভাদেবী বিনোদিনীকে মাতামহী রূপেই দেখেছেন, তাঁর জীবনের অনেক খুঁটিনাটি ঘটনার কথা তিনি জানেন। উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক মধুর এবং ঘনিষ্ঠ ছিল। কোনো ধর্মীয় কারণে বিনোদিনী থিয়েটার ত্যাগ করেছিলেন বলে শ্রীমতী খান্না জানেন না। (লেখক কর্তৃক সংগৃহীত বিবৃতি)

পরবর্তী জীবনে বিনোদিনী প্রথম এমন একজন সহৃদয় পুরুষের সাহচর্য পেয়েছিলেন যিনি তাঁকে নারীর মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন—যা তিনি আজীবন যাচ্ঞা ক'রে এসেছেন। তাই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় তিনি উচ্ছ্বসিত ('আমার কথা'র মধ্যে সেই প্রেম ও শ্রদ্ধার নিদর্শন পাওয়া যাবে)।

শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাবের সঙ্গে বিনোদিনীর থিয়েটার-পরিত্যাগের কোনও প্রত্যক্ষ যোগ থাক বা না-থাক, বিনোদিনীর পরবর্তী জীবন যে কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল তা' জানার সুযোগ আমরা পাচ্ছি অনেকের সাক্ষ্য থেকে।

কোহিনূর থিয়েটারের একদিনের একটি ঘটনা।—হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত সেখানে উপস্থিত কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রীর বিবৃতি ও

তিনকড়ি দাসীর জীবনবৃত্তান্ত অবলম্বনে সেদিনের কথোপকথনের একটি লিপিচিত্র এঁকেছেন তাঁর 'ভক্ত ভৈরব গিরিশচন্দ্র' পুস্তকে। নানা বিষয়ের মধ্যে গিরিশচন্দ্র তখন রামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গেতেই অভিনেতা-অভিনেত্রীর মন নিবদ্ধ করতে চেষ্টা করতেন। সেদিন কথাপ্রসঙ্গে তারাসুন্দরী বলেছেন:

"তবু আমরা যে ভাবে জীবন কাটিয়েছি, আমাদের আর উদ্ধার নাই।

গিরিশ—এমন কথা বলো না তারা। তোমার বিনিমাসীর কথা শোন নাই? ঠাকুর চৈতন্যের ভূমিকায় মুগ্ধ হয়ে ওরে আশীর্বাদ করেছিলেন—মা তোর চৈতন্য হোক।

অবিনাশ—বিনোদিনী এখন গোপালের সেবায় তৎপর আছেন।

গিরিশ—তোমরা সকলেই মনে রাখবে তিনি দীননাথ, তিনি কাকেও বিমুখ করবেন না।"

তারাসুন্দরী-কন্যা প্রতিভা থাম্না বিনোদিনীর কাছে বহুবার শুনেছেন রামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ, আশীর্বাদ-কাহিনী; দেখেছেন তাঁর পূজা-পদ্ধতি। শ্রীমতী থাম্না বললেন, "থিয়েটারে তিনি যে আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন, বলতেন সেদিনের ঘটনা। তাঁর নিজের বাড়ির তিন তলায় ঠাকুরঘর করেন, সেখানে প্রতিষ্ঠা করেন রাধাকৃষ্ণ-মূর্তি—গোপাল ও শালগ্রামশিলা। রাধাকৃষ্ণের পূজা করতে আসতেন পুরোহিত। সেই ঠাকুরঘর বাদেও বিনোদিনীর নিজস্ব একটি ছোট ঘর ছিল—তাঁর নিজস্ব পূজাগৃহ। সেখানে ছিল শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের পট। এখানে পূজা করতেন তিনি নিজে। গীতাপাঠ করতেন, আহ্নিক করতেন—শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা করতেন ফুল-চন্দনাদি দিয়ে।" (বিবৃতি—শঙ্করীপ্রসাদ বসু অনুলিখিত)

১৩১৭, ভাদ্র, নাট্যমন্দির পত্রিকায় গিরিশ-চন্দ্রের 'কেমন করিয়া বড় অভিনেত্রী হইতে হয়' রচনাটির মধ্যে বিনোদিনীর একখানি পত্রের উল্লেখ আছে। সেই পত্রে গিরিশচন্দ্রের কাছে তিনি লিখেছিলেন:

"সংসারের পান্থশালা হইতে বিদায় লইবার সময় নিকটবর্তী হইয়া আসিল। রুগ্ন, আশাশূন্য দিনযামিনী একভাবেই যাইতেছে; কোনরূপ উৎসাহ নাই, নিরাশার জড়তায় আচ্ছন্ন হইয়া অপরিবর্তিত স্রোত চলিতেছে। আপনি আমাকে বার বার বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর বিনা কারণে জীবের সৃষ্টি করেন না, সকলেই ঈশ্বরের কার্য করিতে সংসারে আসে, সকলেই তাঁহার কার্য করে, আবার কার্য শেষ হইলেই দেহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। আপনার এই কথাগুলি কতবার আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু আমার জীবন দিয়া আমি তো বুঝিতে পারিলাম না, যে আমার দ্বারা ঈশ্বরের কি কার্য হইয়াছে, আমি কি কার্য করিয়াছি এবং কি কার্য করিতেছি? আজীবন যাহা করিলাম ইহাই কি আমার কার্য? কার্যের কি অবসান হইল না?"

জীবনের গূঢ় রহস্য জানার এই প্রবল আগ্রহ থেকে আমরা বিনোদিনীর মঞ্চোত্তর-জীবনের চিন্তাধারার একটি সঙ্কেত পাই। গিরিশচন্দ্রের কাছেই তিনি গিয়ে দাঁড়িয়েছেন গভীর জিজ্ঞাসা নিয়ে কারণ বিনোদিনীর কাছে গিরিশচন্দ্রই রামকৃষ্ণ-ভাবধারার ব্যাখ্যাকার। উভয়ের মধ্যে 'বার বার' আলোচনার কথা বিনোদিনী উল্লেখ করেছেন—এর মধ্যে তাঁর 'চৈতন্য'-উন্মেষের পরিচয় পরিস্ফুট।

দীর্ঘ ৭৮ বৎসর জীবিত ছিলেন বিনোদিনী। এই সুদীর্ঘ কালে বহু আঘাত এসেছে। যে সহৃদয় পুরুষের সান্নিধ্যে তিনি নিজ জীবনের গ্লানি ভুলতে পেরেছিলেন, তাঁর মৃত্যু

বিনোদিনীর প্রাণে এনেছে অশেষ শূন্যতা। একটি মাত্র কন্যা, যাকে পেয়ে তিনি অধীর আনন্দে মাতৃ-হৃদয়কে উৎসারিত ক'রে বলেছিলেন :

"শত কোটি নমি আমি শ্রীহরির পায়।
তাঁহার কৃপার বলে
তোমারে পেয়েছি কোলে,
দয়া করে দীর্ঘজীবী করুন তোমায়।
করজোড়ে নমে দাসী, এই ভিক্ষা চায়॥"

(আমার কথা ও অন্যান্য রচনা, পৃঃ ১২৯)

সে কন্যাও অকালে তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে। চারিদিকের এই শূন্যতার মধ্যে তিনি শান্তির আশ্রয় খুঁজে ফিরছেন। শেষ বয়সে তাঁকে দৈনিক সন্ধ্যায় দেখা যেত বেদান্ত মঠে, স্বামী অভেদানন্দের কাছে। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ দেখেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের পটের সামনে আকুল হয়ে কাঁদছেন অতীত যুগের শ্রেষ্ঠ মঞ্চকন্যা বিনোদিনী।

৩

বিনোদিনীর জীবন বঙ্গরঙ্গমঞ্চের জন্যই উৎসর্গীকৃত। তাঁর জীবনের সার্থকতা শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের যোগস্থাপনায়। সে সার্থকতা হয়ত বিনোদিনীর কাছে পরিস্ফুট হয় নি। কিন্তু তাঁর উত্তরকালের শিল্পীর কাছে স্বীকৃতি পেয়েছে।

গিরিশচন্দ্র বলেছেন "ঐ চৈতন্যলীলাই আমার সব—ও থেকেই আমি গুরুকৃপা লাভ করলুম।"[২]

গিরিশচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনের দিকে তাকালে দেখা যাবে 'চৈতন্যলীলা' নাটক দেখতে আসার আগে শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি দেখেছেন দু'বার—তাতে তাঁর সম্পর্কে গিরিশের মনে কোনো স্পষ্ট সুদৃঢ় বিশ্বাস গড়ে ওঠেনি বরং একটা সংশয়ের মধ্যে তিনি মনে করেছেন "হয় ইনি ভণ্ডশ্রেষ্ঠ, না হয় সাধুত্তম।" 'চৈতন্যলীলা' দেখতে আসার দিনও তাঁর মনের কোনো পরিবর্তন ঘটেছে বলে মনে হয় না। সাধারণ সৌজন্যবশত তিনি তাঁকে বক্সে একটু স্থান ক'রে দিয়েছেন, একজন পাখা-ওয়ালার ব্যবস্থা করেছেন এবং নিজে বাড়ি ফিরে গেছেন অভিনয় সুরু হবার পরেই।

বিস্ময় জেগেছে পরদিন, যখন তিনি পূর্বদিনের ঘটনাবৃত্তান্ত জেনেছেন। প্রচলিত অর্থে 'সাধু' বা 'গুরু' বলতে গিরিশের মনে যে ধারণা ছিল তাতে প্রথম আঘাত লেগেছিল পূর্বদিন সন্ধ্যায়—যখন শ্রীরামকৃষ্ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গিরিশকে নমস্কার জানিয়েছিলেন। তারপর গিরিশের অনুপস্থিতিতে 'চৈতন্যলীলা'র পর চৈতন্যদানলীলার যে নাটক অভিনীত হয়ে গেছে তার বর্ণনা শুনে তিনি স্বভাবতই বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছেন। গিরিশচন্দ্র যে কালে, যে সমাজে বাস করতেন সে সমাজে থিয়েটারের পতিতা অভিনেত্রী—শুধু অভিনেত্রী কেন 'বারাঙ্গনা সহচরী'—অভিনেতারাও ছিলেন অচ্ছুৎ। জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা থিয়েটারের নামে নাসিকা কুঞ্চিত করতেন। সেই থিয়েটারে শ্রীরামকৃষ্ণ এলেন এবং সর্বজনঘৃণিত এক বারাঙ্গনাকে শিল্পী বলে, নারী বলে পূর্ণ মর্যাদা দান করলেন। অভিনেতা গিরিশের কাছে এ ঘটনা অভাবনীয়। এই ঘটনাই তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে টেনে নিয়ে গেছে।

গিরিশ-সমসাময়িক কালে অথবা তার পরে ঘটনাটি কতখানি গুরুত্ব পেয়েছিল তা আমরা দেখতে পারি সেকাল এবং একালের মঞ্চসেবীদের চিন্তা থেকে। রসরাজ অমৃতলাল লিখেছেন

২ যোগোদ্যানে শ্রীরামচন্দ্র : বিজয়নাথ মজুমদার। তত্ত্বমঞ্জরী, ভাদ্র ১৩২৩

"সেই প্রথম যখন দীনা অভিনেত্রী রঙ্গমঞ্চে শ্রীচৈতন্যের বেশে নদীয়ার ঈশ্বরাবতারের লীলা অভিনয় করিয়াছে তখন আমাদিগের হীন রঙ্গালয়কে বৈকুণ্ঠে উন্নত করিয়া দক্ষিণেশ্বরে প্রকটিত ঈশ্বরের অন্ত অবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সেই অভিনয় বসিয়া দেখিয়াছেন; আমরা ধন্য হইয়াছি, দর্শক ধন্য হইয়াছেন, বসুমতী ধন্যা হইয়াছেন !!!

আমাদিগের চৈতন্যলীলার অভিনয় সেই ঐশিক নয়নপাতে পুণ্যময় পবিত্র তীর্থে পরিণত হইয়াছে !!! এখন চৈতন্যলীলার অভিনয় দর্শন আর কেবল আমোদ উপভোগ নয়, হৃদয়ের শিক্ষা নয়, সঙ্কীর্তন শ্রবণের আনন্দ নয়—এখন তীর্থদর্শন।" ('রূপ ও রঙ্গ', ১৮ আশ্বিন ১৩৩১)

আর এক নট-নাট্যকার অপরেশ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

"সাধারণত লোকের বিশ্বাস, বিশেষ থিয়েটারের প্রথম যুগে অনেকেরই ধারণা ছিল যে, যাহারা থিয়েটার করে তাহারা 'পারিয়া', তাহারা একঘরে; কারণ—গিরিশচন্দ্রই বলিয়াছিলেন 'বারাঙ্গনা সহচরী, কে কোথায় রাখে তার মান?' কিন্তু ঐ মান রাখিয়াছিলেন, আর কেহ নহেন, কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী-সন্ন্যাসী! তিনি এই বাঙ্গালাদেশের কোন পতিতা অভিনেত্রীর মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন 'তোমার চৈতন্য হোক।'" ('রূপ ও রঙ্গ', ১৮ মাঘ ১৩৩১)

তারপর বহু বছর চলে গেছে। অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে আমাদের পুরাতন বিশ্বাসগুলো জীর্ণ হয়ে গেছে। যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নবযুগের চিন্তাধারায় পুরাতন ঐতিহ্য সম্পর্কে মানুষের শ্রদ্ধা শিথিল হয়েছে—অতীতের প্রতি অপরিসীম অবজ্ঞা প্রদর্শনের মধ্যেই যেন আমরা খুঁজে পেয়েছি আধুনিকতাকে কিন্তু রঙ্গমঞ্চে যুগোপযোগী চিন্তার আস্ফালন সত্ত্বেও বিনোদিনী বিস্মৃত হন নি—আর বিনোদিনীর প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ এখনো সমান শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণ করা হয়ে থাকে। বিনোদিনীর জীবন নিয়ে যে ক'খানি নাটক অভিনীত হয়েছে—পেশাদারী মঞ্চে, যাত্রায়, প্রগতিশীল নাট্যগোষ্ঠীতে—সর্বত্রই এই ঘটনাটিকে সমধিক গুরুত্ব দিয়েই দেখানো হয়েছে। আর বঙ্গরঙ্গমঞ্চের ক্ষেত্রে এই ঘটনা যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে তা একালের পরিচালক-শিল্পীদের কাছ থেকেই শুনতে পাবো। প্রগতিশীল পরিচালক-অভিনেতা জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় বললেন :

"আজ যে সমাজ থেকে অভিনেত্রীরা আসছে সেদিন তা আসত না—তাই রক্ষণশীলদের কাছে তারা ছিল ঘৃণিত। শ্রীরামকৃষ্ণ নটী বিনোদিনীকে মানুষের মর্যাদা দিয়ে বাঁচিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের পরই এই ঘৃণার ভাব অনেক কমে আসে।"

(লেখক কর্তৃক গৃহীত জবানবন্দী)

প্রতিভাময়ী শিল্পী (সম্প্রতি লোকান্তরিতা) মলিনা দেবী বললেন :

"তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) স্টেজে পদধূলি দিয়েছিলেন এবং এক শিল্পীকে আশীর্বাদ করেছিলেন। কিন্তু এ আশীর্বাদকে আমি সেই একজন শিল্পীকে আশীর্বাদ বলে মনে করি না—সেই একের মধ্যে দিয়ে তিনি যেন বহুকেই আশীর্বাদ করে গেছেন 'তোমরা শান্তি পাও।'"

(লেখক কর্তৃক গৃহীত জবানবন্দী)

এ কালের আর এক প্রখ্যাত অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন :

"রামকৃষ্ণের মত প্রভাবশালী মহাপুরুষের নাটক দেখতে আসার মধ্যেই নাট্যসমাজকে

স্বীকৃতি দেওয়া। এবং এটাকে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি বলা যায়। আমাদেরই এক পূর্বসূরী অভিনেত্রী নটী বিনোদিনীকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে হাত তুলে যে আশীর্বাদ করেছিলেন সে আশীর্বাদ শুধু নটী বিনোদিনীকেই নয়, সে আশীর্বাদ নটী বিনোদিনীর মধ্যে দিয়ে অতীত, বর্তমান ও অনাগত ভবিষ্যতের সকল অভিনয়-শিল্পীর প্রতি আশীর্বাদ।"

(লেখক কর্তৃক সংগৃহীত লিখিত-বিবৃতি)

বিনোদিনী শক্তিশালী অভিনেত্রী—হয়ত তাঁর চেয়ে অধিকতর অভিনয়-শক্তির অধিকার অন্য কেউ পেতে পারেন, কিন্তু বিনোদিনী অনতিক্রমণীয়া—তাঁকে অবলম্বন ক'রেই বাংলা থিয়েটার পেয়েছিল বঙ্গের মঞ্চ-দেবতাকে।*

* এই প্রবন্ধটি আমার আসন্নপ্রকাশ গবেষণাগ্রন্থ 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চে'র অংশ-বিশেষ। 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চ' সম্পর্কে গত কয়েক বছর ধরে উপাদান সংগ্রহ করেছি প্রধানত: (১) গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রপত্রিকা থেকে এবং (২) রঙ্গজগতের সঙ্গে নানাভাবে সংশ্লিষ্ট ও অন্যান্য তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিজ্ঞতা থেকে। এই প্রবন্ধে আকর-নির্দেশ হিসাবে গ্রন্থের ক্ষেত্রে নাম, লেখকের নাম ইত্যাদি এবং সংগৃহীত অভিজ্ঞতাগুলির ক্ষেত্রে (১) লিখিত বিবৃতি (২) অন্যের অনুলিখিত বিবৃতি এবং (৩) আধুনিক গবেষণারীতি হিসাবে সর্বত্র-স্বীকৃত টেপ-রেকর্ডিং (জবানবন্দী)-এর উল্লেখ করেছি।—লেখক।

সমালোচনা

মহাবতরণ — শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা : লেখক ও প্রকাশক : শ্রীলাবণ্যকুমার চক্রবর্তী, জ্ঞানদা সাহিত্য প্রতিষ্ঠান, ১৩ নিউটন এ্যাভিনিউ, দুর্গাপুর-৫, বর্ধমান। (১৩৮০), পৃষ্ঠা ৩৭, মূল্য দুই টাকা।

শ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য প্রবীণ ভক্ত শ্রীলাবণ্যকুমার চক্রবর্তী এই কবিতা-পুস্তিকায় শ্রীভগবানের শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতরণের অমৃতকথা ভক্তিরসাপ্লুত ভাষায় বর্ণনা করেছেন। অবতারের লীলাকথা বলতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে অচ্ছেদ্যসূত্রে গাঁথা শক্তিস্বরূপা শ্রীমা সারদাদেবীর আবির্ভাব-মাহাত্ম্যও এখানে বর্ণিত হয়েছে। এবং যুগাবতারের ভাবগঙ্গার ভগীরথ স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যান্য পার্ষদবর্গের কথাও অপরিহার্যরূপেই এখানে স্থান পেয়েছে। আমরা যে যুগে বাস করছি, তাকে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সমীক্ষায় রামকৃষ্ণ-যুগ বলা যায়। আজ শতসহস্র কণ্ঠে, ভাবে ও ভঙ্গীতে সপার্ষদ শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাগান উচ্চারিত হচ্ছে। বর্তমান লেখকের ভাষায়—

অপূর্ব জীবনবেদ প্রভুর মাতার—
আজি গীত শতমুখে উঠিছে ঝঙ্কার।
সহস্র গাইবে গীতি লীলাগাথা তাঁর,—
তবুও কি ফুরাইবে? অপার! অপার!!

গ্রন্থকারের একান্ত ভক্তির অর্ঘ্য এই পুস্তিকাখানি পাঠককে অনাবিল আনন্দদানে সমর্থ হবে বলে আমরা আশা করি। অবশ্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই পুস্তিকায় উল্লেখিত কয়েকটি ঘটনা লীলাপ্রসঙ্গ, কথামৃত প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে নেই। ভূমিকায় এ-সব ঘটনার আকর-নির্দেশ করলে ভাল হ'ত।

বেশ কিছু বানান ও ছাপার ভুলও চোখে

পড়ে। পুস্তিকাটির দু টাকা দামও একটু বেশী মনে হয়। কিন্তু নিষ্ঠাবান ভক্ত পাঠকদের কাছে এসব গৌণ ব্যাপার; যে ভাবভক্তি পুস্তিকাটির উপজীব্য, তা তাঁদের উদ্দীপিত করবে, সন্দেহ নেই।

শ্রীসুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত

শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ স্মরণে: শ্রীঅবনী-কুমার রায়। প্রকাশক: শ্রীঅসীম রায়, ৭১।১, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯। (১৩৮৩), পৃষ্ঠা ২+৩৩, মূল্য এক টাকা।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের বন্দনায় রচিত ৩২টি ক্ষুদ্র কবিতাগুচ্ছ-সমন্বিত এই পুস্তিকাটি একটি ভক্ত-হৃদয়ের অর্ঘ্যনিবেদন বলা যেতে পারে। ভূমিকা-লেখক ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর আমাদের জানাচ্ছেন যে, লেখক বর্তমানে বানপ্রস্থাশ্রমে থেকে সর্বদাই ঈশ্বরীয় আলোচনা ও শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মরণমননে দিনাতিপাত করেন এবং এই পুস্তিকাটি লেখকের ইষ্টস্মরণেরই বহিঃপ্রকাশ। এর অনেকগুলি কবিতাই গীতি-ধর্মী। সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখলে হয়তো এই কবিতা-গুলিকে খুব উঁচুদরের সাহিত্য আখ্যা দেওয়া যায় না, কিন্তু সমভাবনার ভাবুকের কাছে এগুলির যথেষ্ট মূল্য আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী ভক্তিরসের রসিকদের কাছে কবিতা বা গানগুলি নিঃসন্দেহে সমাদরলাভ করবে। ছাপা সুন্দর ঝরঝরে। কাগজ ভাল। পুস্তিকাটির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীসুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত

মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ: লেখক ও প্রকাশক: স্বামী সদাশিবানন্দ, রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম, বারাসত, ২৪ পরগণা। (১৩৮৩), পৃষ্ঠা ১৩৮, মূল্য তিন টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদগণের অন্যতম স্বামী শিবানন্দ তাঁর প্রায় আশী বৎসরের সুদীর্ঘ আয়ুকালে একদিকে যেমন সাধনা ও সিদ্ধিতে এবং স্বীয় গুরুর স্মরণ-মননে নিজের জীবনকে অপূর্ব সুন্দর ও মহিমময় ক'রে তুলেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি ভারতের দিকে দিকে ভক্ত-চিত্তে শান্তি ও অমৃত বিতরণ করেছেন। বহু অধ্যাত্মপিপাসু মানুষ তাঁর আশ্রিত হয়ে ধন্য হয়েছেন এবং তাঁদের অনেকে আজও সেই মহান গুরুর অভয় চরণ স্মরণ ক'রে দিনাতিপাত করছেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ক্রমপ্রসারের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অসামান্য। তাঁর আশ্চর্য ত্যাগশক্তির পরিচয় পেয়ে স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত চমৎকৃত হয়ে একদা তাঁকে 'মহাপুরুষ' আখ্যা দিয়েছিলেন এবং সেই থেকে আজও তিনি 'মহাপুরুষ মহারাজ' নামে সুপরিচিত।

এই জীবনীটি রচনা করতে গিয়ে লেখক উপাদান সংগ্রহ করেছেন মূলতঃ স্বামী গম্ভীরানন্দের 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা' (১ম ভাগ), স্বামী অপূর্বানন্দের মহাপুরুষ শিবানন্দ' ও 'শিবানন্দ-বাণী' এবং মহেন্দ্রনাথ দত্তের রচনা থেকে। এই নির্ভরযোগ্য পুস্তকগুলিকে অবলম্বন করাতে তথ্যবিকৃতি দেখা দেয়নি। গ্রন্থটিতে স্বামী শিবানন্দের জীবনের ঘটনাবলী একের পর এক বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে, যদিও তাঁর অপূর্ব কথোপকথন ও বাণী এ গ্রন্থে খুব বেশী সংযোজিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেনি। তাঁর সহজ সরল ও আন্তরিক রচনার পরিচয় পেতে হলে পাঠককে তাঁর পত্রাবলী পাঠ করতে হবে, এই গ্রন্থের মাত্র দু-পৃষ্ঠার একটি পরিশিষ্টে যার সামান্য কিছু নমুনা লেখক তুলে ধরেছেন।

স্বামী শিবানন্দের অনুরক্ত ভক্তদের ইচ্ছায় ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বারাসতে তাঁর জন্মস্থানে একটি মন্দির ও আশ্রম স্থাপিত হয়েছে। এই পুস্তকটির বিক্রয়-লব্ধ আয় তত্রত্য ঠাকুরসেবায়

ব্যয়িত হবে। নিঃসন্দেহে এটি একটি শুভ উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য পূরণে এবং স্বামী শিবানন্দজীর অপূর্ব জীবন সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য যাঁরা এই পুস্তকটি সংগ্রহ করবেন তাঁরা যুগপৎ একটি প্রতিষ্ঠানের এবং নিজেদের মঙ্গল সাধন করবেন। বর্তমান মহার্ঘের দিনে পুস্তকটির মূল্যও খুব ন্যায্য এবং সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখা হয়েছে।

শ্রীসুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত

বর্তমান সমাজে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা: স্বামী সিদ্ধানন্দ সরস্বতী। প্রকাশক: নটবর ব্রহ্মচারী, নিগমানন্দ সারস্বত আশ্রম, নিগমনগর, কোচবিহার। (১৩৮২), ১৬+৮, মূল্য পঞ্চাশ পয়সা।

স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতীর তথ্যমূলক সংক্ষিপ্ত ভূমিকা-সংবলিত এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি-সংযোগে ধর্মের ব্যাখ্যা করিয়া এবং ধর্মানুশীলনের তাৎপর্য, আদর্শ সমাজ গঠনের পটভূমিকায় সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া লেখক বর্তমানে সমাজে ধর্মের প্রয়োজনীয়তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রচেষ্টা শুভ এবং উদ্যম প্রশংসনীয়। পুস্তিকাটির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীশিবপ্রসাদ সিংহ



রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সাধারণ সভা ও পরিচালক-মণ্ডলীর প্রতিবেদন

গত ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৭৭ রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর সভাপতিত্বে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে রামকৃষ্ণ মিশনের ৬৮ তম বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। বিগত বৎসরের অধিবেশনের বিবৃতি পাঠ, মিশনের পরিচালক-মণ্ডলীর ১৯৭৬-৭৭ সালের প্রতিবেদন পাঠ, ১৯৭৬-৭৭ সালের হিসাব ও হিসাব-পরীক্ষকদের প্রতিবেদন পাঠ, ১৯৭৭-৭৮ সালের হিসাব-পরীক্ষকদের নিয়োগ এবং নূতন সদস্যদের নামের তালিকা পাঠ করা হয়। সভায় পঠিত মিশনের পরিচালক-মণ্ডলীর প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

কেন্দ্রসমূহ ও কার্যাবলী

১৯৭৭-এর মার্চে মিশনের মোট শাখাকেন্দ্র ছিল ৭৫—বাংলাদেশে ৭টি, ব্রহ্মদেশ ফ্রান্স ফিজি সিঙ্গাপুর শ্রীলংকা ও মরিশাসে একটি করিয়া এবং ৬২টি ভারতে (বেলুড় প্রধান কেন্দ্র বাদে)। (স্মরণীয় যে, ভারত ও ভারতেতর দেশগুলিতে বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের ৬৪টি পৃথক্ কেন্দ্র আছে।)

মিশনের কার্যাবলী মোটামুটি পাঁচটি ধারায় শ্রেণীভুক্ত করা যায়: (১) ত্রাণ ও পুনর্বাসন (২) চিকিৎসা (৩) শিক্ষা (৪) সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবপ্রচার এবং (৫) গ্রামে ও উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে সেবাকার্য।

(১) ত্রাণ ও পুনর্বাসন : বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের সহযোগিতায় মিশন ভারতে যে ত্রাণকার্য পরিচালনা করিয়াছে, তাহার উল্লেখ নীচে করা হইল। ইহাতে মোট খরচ হইয়াছে ১২,২৬, ৫১৪ টাকা এবং উপকৃত হইয়াছেন ১৮,৭১৫ পরিবারের ১,৭৮,৮২৪ নরনারী।

(ক) বন্যাত্রাণ—শিলচরে শিলচর সেবাশ্রম; করিমগঞ্জে করিমগঞ্জ সেবাসমিতি; ত্রিপুরার ধর্মনগর কৈলাশহর ও কমলপুরে মিশনের প্রধান কার্যালয়, বেলুড়; পশ্চিম দিনাজপুরের ইটাহারে রহড়া বালকাশ্রম; পাটনায় পাটনা আশ্রম এবং বরোদায় রাজকোট মঠ কেন্দ্র।

(খ) ঘূর্ণিবাত্যাত্রাণ—দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমায় নরেন্দ্রপুর ও মনসাদ্বীপ আশ্রম; ভবনগরে রাজকোট মঠ কেন্দ্র।

(গ) চিকিৎসামূলক ত্রাণকার্য—এলাহাবাদ পূর্ণকুম্ভ মেলায় এলাহাবাদ সেবাশ্রম; করিমগঞ্জ ও শিলচরে কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠানের সাহায্যে করিমগঞ্জ ও শিলচর আশ্রম; এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর মেলায় সেবাপ্রতিষ্ঠান ও মনসাদ্বীপ আশ্রম।

পুনর্বাসন—মিশনের প্রধান কার্যালয় কর্তৃক পাটনা জেলার মানের ব্লকে গত বৎসরে আরব্ধ ২২৫টি পাকা বাড়ীর নির্মাণকার্য আলোচ্য বর্ষে সমাপ্ত হয় এবং ত্রিপুরার পানিসাগরে ৪০টি পাকা বাড়ী তৈরীর কাজ আরম্ভ করা হয়।

বাংলাদেশে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ অব্যাহত থাকে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ বাগেরহাট দিনাজপুর বরিশাল এবং শ্রীহট্ট কেন্দ্রের মাধ্যমে। ১,৩৩,৮৫০ পরিবারভুক্ত ৫,৩৪,৬০০ লোক ইহার দ্বারা উপকৃত হয়। ইহাতে মোট খরচ হয় ২,৬২,৬৬০ টাকা। অধিকন্তু অভাবগ্রস্তদের মধ্যে ৩৮,১৮,৪৫০ টাকা দামের নানারকম জিনিসপত্র বিতরিত হয়।

উল্লেখ্য যে, গরীবরা বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের মাধ্যমে নগদ টাকা ও অন্যবিধ সাহায্যও পায়। মিশনের প্রধান কার্যালয়ও ১:৬টি পরিবার ও

২০৮ জন ছাত্রকে নিয়মিত এবং ১১১টি পরিবার ও ৮৪ জন ছাত্রকে সাময়িক সাহায্য করে—ইহাতে মোট ৪২,১০৪ টাকা খরচ হয়। কিছু পোশাক-পরিচ্ছদ, গরম চাদর, কম্বল, ধুতি এবং শাড়িও বিতরিত হয়।

(২) চিকিৎসা: ভারতে মিশনের বহু শাখাকেন্দ্র অনেকগুলি অন্তর্বিভাগীয় হাসপাতাল ও বহির্বিভাগীয় ডিসপেনসারি পরিচালিত করে জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে রোগীদের সেবার জন্য। আলোচ্য বৎসরে ৮টি হাসপাতালে রোগীর শয্যাসংখ্যা ছিল ১,৩১০ এবং ৩১,১৪০ জন রোগী চিকিৎসিত হন। ৬০টি ডিসপেনসারির মাধ্যমে ৩৬,৫০,৬৭৬ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। রাঁচি স্যানাটোরিয়াম ও নতুন দিল্লীর টি. বি. ক্লিনিকে যক্ষ্মারোগীদের চিকিৎসা করা হয়। কলিকাতার সেবাপ্রতিষ্ঠান অন্যান্য বিভাগ ছাড়াও একটি নার্সিং ও ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষণ বিদ্যালয় যথাপূর্ব পরিচালনা করে। বিদ্যালয়টিতে 'সাহায্যকারী' ও 'সাধারণ'—এই দুই শাখাতে মোট শিক্ষার্থিনীর সংখ্যা ছিল ২১৪। অধিকন্তু স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ও ডিপ্লোমার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত একটি ইন্‌স্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস পরিচালনা করে। উহাতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৫।

(মঠকেন্দ্রগুলির ৫টি হাসপাতালের ৩২১টি শয্যায় ১১,৩৮৩ এবং ১৭টি ডিসপেনসারিতে ৫,৬৮,০৭৭ জন রোগী চিকিৎসিত হন ইহা ছাড়া ৩০ জন নার্স শিক্ষাপ্রাপ্ত হন।)

(৩) শিক্ষা: আলোচ্য বৎসরে মিশন পরিচালনা করিয়াছে ৫টি ডিগ্রী কলেজ, ২টি বি. এড্. কলেজ, ১টি স্নাতকোত্তর বেসিক শিক্ষণ কলেজ, ৪টি জুনিয়র বেসিক শিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ১টি বেসিক শিক্ষণ বিদ্যালয়, ১টি শারীর শিক্ষা কলেজ, ১টি গ্রামীণ উচ্চতর শিক্ষা কলেজ, ১টি কৃষি বিদ্যালয়, ৪টি পলিটেকনিক, ৮টি জুনিয়র কারিগরী ও শিল্প বিদ্যালয়, ৮৩টি বিদ্যার্থী ভবন, ছাত্রাবাস ও অনাথাশ্রম, ১টি চতুষ্পাঠী, ৩৬টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৩৬টি অন্যান্য পর্যায়ের বিদ্যালয়, ৪৪টি বয়স্কদের শিক্ষাকেন্দ্র বা কমিউনিটি সেন্টার, ১টি অন্ধ-বালক বিদ্যালয়, ২টি বাণিজ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ১টি ভাষাশিক্ষা বিদ্যালয়, ১টি বিশ্বধর্ম বিদ্যালয়, এবং ১১টি অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান। এই সব প্রতিষ্ঠানে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৭৮,৮২০। ইহাদের মধ্যে ৫৬,৮৬২ জন ছাত্র এবং ২১,৯৫৮ জন ছাত্রী।

(মঠকেন্দ্রগুলির পরিচালিত ২৫টি বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাসে মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৬,৬৭১)।

(৪) সাংস্কৃতিক ও অধ্যাত্মিক ভাবপ্রচার: এই বিভাগে বহুসংখ্যক গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, বক্তৃতা ও আলোচনা-সভা, ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক ছায়াচিত্র-প্রদর্শন, নৈমিত্তিক প্রদর্শনী, নিয়মিত ক্লাস এবং সর্বজনীন উৎসব অনুষ্ঠানাদির উল্লেখ করা যায়। কলিকাতার ইনস্টিটিউট অব কালচার এবং বিভিন্ন শাখা-কেন্দ্রের গ্রন্থ-প্রকাশন বিভাগগুলিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

(মঠকেন্দ্রগুলিও বড় বড় প্রকাশন-কেন্দ্র এবং মন্দির ও প্রার্থনাভবন পরিচালনা করে এবং বক্তৃতার ব্যবস্থা করে)।

(৫) গ্রামে এবং উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে সেবাকার্য: সীমিত অর্থবল ও লোকবল লইয়া মিশন দরিদ্র ও অনগ্রসর লোকদের এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উপজাতিদের মধ্যে সেবার কাজ করে। লক্ষ লক্ষ গরীব ও অনুন্নত মানুষ মিশন-পরিচালিত হাসপাতাল ও ডিসপেনসারি এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির সেবায়

উপকৃত হইয়াছে। মিশনের ত্রাণকার্যও ইহাদেরই জন্ম।

এই বিভাগের কাজের প্রসঙ্গে আরো বলা যায়, বেশ কয়েকটি বড় বড় কেন্দ্র গ্রামাঞ্চলে ও উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে অবস্থিত। ১৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়; ৫০টি উচ্চবেসিক, নিম্ন বেসিক, উচ্চ প্রাথমিক ও মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়; ৪৫টি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়; ৪২টি বয়স্কদের সাক্ষরতা ও কমিউনিটি সেণ্টার; ২২টি দাতব্য ঔষধালয়; বহু গ্রন্থাগার, যাহাদের মধ্যে ৩টি ভ্রাম্যমাণ; ১৩৬টি দুগ্ধ-বিতরণ কেন্দ্র; ১১টি চলচ্চিত্র ইউনিট, ৬টি কারিগরী শিক্ষণ কেন্দ্র; ১টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান-শিক্ষণ কেন্দ্র প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলে ও অনগ্রসর এলাকাগুলিতে রহিয়াছে। ইহা ছাড়া ৬টি ভ্রাম্যমাণ ডিসপেনসারির মাধ্যমে ১,০৪,৪১৪ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। নরেন্দ্রপুরে গ্রামপর্যায়ে কর্মি-শিক্ষণ কেন্দ্র এবং রাঁচীতে দিব্যায়ন উপজাতীয় ও গ্রামের যুবকদের কৃষি দুগ্ধাগার হাঁস-মুরগী-পালন ইত্যাদি বিষয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষণ দিয়াছে। চেরাপুঞ্জি আলঙ ও নরোত্তম নগরে অবস্থিত কেন্দ্রগুলি নিজ নিজ অঞ্চলে শিক্ষা ও চিকিৎসার কাজে স্থানীয় উপজাতিদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে। শিলচর সেবাশ্রম কুকী মিজো ও অন্যান্য উপ-জাতিদের মধ্যে নানা প্রকারের কল্যাণমূলক কাজ করিয়াছে।

বিদেশে প্রচার

শ্রীলঙ্কা সিঙ্গাপুর ফিজি মরিশাস এবং ফ্রান্সে অবস্থিত কেন্দ্রগুলি আধ্যাত্মিক ভাবপ্রচারের সহিত শিক্ষা-ও সংস্কৃতি-মূলক কাজও করিয়াছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ইংলণ্ড আরজেন্টিনা এবং সুইজারল্যাণ্ডে অবস্থিত ১৫টি মঠকেন্দ্র বক্তৃতা আলোচনা ও গ্রন্থ-প্রকাশনের মাধ্যমে প্রচার-কাজ করিতেছে।

বাংলাদেশে অবস্থিত মঠ ও মিশনের ১০টি শাখাকেন্দ্র গ্রন্থাগার ছাত্রনিবাস বিদ্যালয় এবং দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনা ছাড়াও ত্রাণ-কার্যে নিযুক্ত আছে।

সংযোজন ও সম্প্রসারণ

মরিশাস কেন্দ্রে একটি নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির উৎসর্গীকৃত হয়। বেলঘরিয়া বিদ্যার্থী আশ্রমে একটি অতিথি-ভবনের উদ্বোধন করা হয়। বেলুড় মঠের ডিসপেনসারিতে সংযোজিত ভবনটির নীচের তলা ডিসপেনসারির কাজে ব্যবহৃত হইতেছে এবং উপরের তলার নির্মাণ-কার্য চলিতেছে। বোম্বেতে একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার-ভবনের ও মাদ্রাজে ত্যাগরাজনগরে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপিত হয়। কলিকাতায় সেবাপ্রতিষ্ঠানের হাসপাতাল-ভবনের উত্তর দিকের ব্লকের সঙ্গে সংযুক্ত একটি পঞ্চতল ভবন নির্মিত হয় এবং পূর্বদিকের ব্লকের সপ্তম তলের নির্মাণকার্য আরম্ভ করা হয়। শেষোক্ত তলটিতে ইন্‌টেন্‌সিভ কেয়ার ইউনিট (Intensive Care Unit) স্থাপিত হইবে।

(কাপাডি মঠকেন্দ্রে একটি নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণমন্দির উৎসর্গীকৃত হয়।)।

পরিবর্তন

আলোচ্য বর্ষে শ্রীলংকা সরকার কলম্বো কেন্দ্রের উপশাখাকেন্দ্র কাটারাগামা মঠম্ অধিগ্রহণ করেন। ব্রহ্মদেশের সরকারের নীতি অনুসারে রেঙ্গুন মিশন সমিতি 'রামকৃষ্ণ টেম্পল ট্রাস্ট' নামে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

বেলুড় মঠে গত ১৭ই পৌষ ১৩৮৪, ১লা জানুআরি ১৯৭৮, রবিবার শ্রীমা সারদাদেবীর ১২৫তম আবির্ভাবতিথি-উৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলারতি বেদপাঠ ভজন বিশেষ পূজা হোম প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। পূজার পর প্রায় ৩০,০০০ ভক্ত নরনারী খিচুড়ি-প্রসাদ পান। পূর্বাহ্ণে 'দীনসংঘ' কর্তৃক কালী-কীর্তন ও 'মায়ের খেলা' কর্তৃক সারদা-লীলাগীতি পরিবেশিত হয়। অপরাহ্ণে মঠ-প্রাঙ্গণে আয়োজিত ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী আত্মস্থানন্দ, শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার ও সভাপতি স্বামী বন্দনানন্দ। সারাদিন প্রায় এক লক্ষ নরনারীর সমাবেশ হয়।

বেলুড় মঠে গত ১৭ই মাঘ ১৩৮৪, ৩১শে জানুআরি ১৯৭৮, মঙ্গলবার, পুণ্য কৃষ্ণাসপ্তমী তিথিতে পূজ্যপাদ আচার্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের ১১৬তম জন্মতিথি মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। মঙ্গলারতি বেদপাঠ ভজন বিশেষ পূজা শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ কঠোপনিষৎপাঠ কালীকীর্তন ও ধর্মসভা উৎসবের অঙ্গ ছিল। মধ্যাহ্নে প্রায় ২০ হাজার নরনারীকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

অপরাহ্ণে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় অধ্যাপক শ্রীহরিপদ ভারতী (বাংলায়), ডক্টর আর. কে দাশগুপ্ত (ইংরেজীতে), এবং সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ (বাংলায়) সুচিন্তিত ভাষণের মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এলাহাবাদ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে গত ২৪শে নভেম্বর ১৯৭৭, শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের ১১১তম জন্মতিথি উপলক্ষে প্রত্যুষ হইতে প্রায় মধ্যাহ্ন পর্যন্ত ধ্যান মঙ্গলারতি বিশেষ পূজা ভজন হোম ভোগ ও আরাত্রিক হয়। পরে আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী বীতভয়ানন্দ হিন্দীতে পূজ্যপাদ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং 'বিজ্ঞানানন্দ বালক সংঘে'র বালকেরা বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের জীবন অবলম্বনে রচিত একটি একাঙ্ক নাটিকা অভিনয় করে। শেষে ভক্তগণ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন ও বসিয়া প্রসাদ পান।

উদ্বোধন কার্যালয়ে (শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে) গত ৩০শে পৌষ ১৩৮৪, ইং ১৪ই জানুআরি ১৯৭৮, শনিবার শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজীর শুভ জন্মতিথি মঙ্গলারতি পূজা হোম শ্রীশ্রীচণ্ডীপারায়ণ জীবনী-আলোচনা ও ভজনকীর্তনাদির মাধ্যমে পালিত হয়। পূর্বাহ্ণে স্বামী চিৎসুখানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ পাঠ ও আলোচনা করেন। মধ্যাহ্নে প্রায় ২৫০ জন সাধু ও ভক্ত বসিয়া প্রসাদ পান। সমগ্র দিনে প্রায় ৩,০০০ দর্শনার্থীকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যারতির পর উদ্বোধন কার্যালয়ের নূতন ভবনে সারদানন্দ হলে প্রায় চারিশত ভক্তের সমাবেশে শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশা-নন্দজী পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের স্মৃতিচারণ করেন।

দেহত্যাগ

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বাগবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ, 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদক এবং 'উদ্বোধন' কার্যালয়ের ব্যবস্থাপক **স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দজী** (নন্দী মহারাজ) গত ৩০শে জানুআরি ১৯৭৮, অপরাহ্ণ ২টার সময় ৬২ বৎসর বয়সে কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করিয়াছেন। হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হওয়ায় গত ২১শে জানুআরি রাত্রে তাঁহাকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসার ফলে তাঁহার অবস্থার উন্নতি হইলেও হৃৎপিণ্ডের কোন অংশে রক্তসরবরাহ হঠাৎ বন্ধ হওয়ায় তাঁহার দেহাবসান হয়।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯৪০ সালে সংঘের শাখা-কেন্দ্র গৌরীপুরে (দমদম) কলিকাতা স্টুডেন্টস হোমে তিনি যোগদান করেন এবং ১৯৪৯ সালে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা প্রাপ্ত হন।

তিনি কলিকাতা স্টুডেন্টস হোমের বিভিন্ন বিভাগে প্রায় ২৫ বৎসর কর্ম করেন। উক্ত হোমের অধ্যক্ষ, আদর্শ শিক্ষাগুরু স্বামী নির্বেদানন্দজীর দীর্ঘকালীন ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিবার দুর্লভ সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল, যাহার ফলে তাঁহার জীবন অতি সুন্দররূপে গঠিত হইয়া যায়। ১৯৬৫ সালের জানুআরিতে তিনি 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদক হন এবং আ-দেহান্ত পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭৩ সালের জুন মাসে তিনি বাগবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া শেষ পর্যন্ত ঐ পদেই অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯৬০ সালে তিনি বালেশ্বরে বন্যাত্রাণকার্য পরিচালনা করেন।

রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের বিদ্যামন্দির, জনশিক্ষামন্দির, শিল্প বিদ্যালয়; রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠ, বেলঘরিয়া; বিবেকানন্দ ইনষ্টিটিউশন, হাওড়া; বিবেকানন্দ সোসাইটি, কলিকাতা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তিনি সভাপতি বা সহসভাপতি ছিলেন।

তিনি লোকপ্রিয় বক্তা ছিলেন এবং সুদীর্ঘ-কাল নানাস্থানে বহু সভাসমিতিতে ও বেতারে অসংখ্য ভাষণ দিয়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার বহুল প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্য-প্রতিভাও ছিল তাঁহার অসামান্য। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির নাম: শিশুদের রামকৃষ্ণ, শিশুদের মা সারদাদেবী, শিশুদের বিবেকানন্দ, মহাভারতের গল্প, গল্পে বেদান্ত, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ (অনুবাদ), জননী সারদাদেবী (অনুবাদ), স্বামী বিজ্ঞানানন্দ—জীবন ও বাণী এবং স্বামী নির্বেদানন্দ—জীবনী ও রচনাদি সংগ্রহ। বিজ্ঞান প্রযুক্তিবিদ্যা চিত্রকলা স্থাপত্য ইত্যাদি বহু ও বিচিত্র ক্ষেত্রে তাঁহার নানামুখী আগ্রহ ও বৈদগ্ধ্য প্রসারিত ছিল।

বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি উচ্চ রক্তচাপাদি রোগে ভুগিতেছিলেন। গত দুর্গাপূজার সময়ে তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া সেবাপ্রতিষ্ঠানে প্রায় কুড়ি দিন চিকিৎসাধীন ছিলেন। তাঁহার শেষ কয়েক মাসের, বিশেষতঃ শেষ কয়েক দিনের, কার্যাবলী পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি তাঁহার দেহান্তের পূর্বাভাস পাইয়াছিলেন। এইজন্য 'শিশুদের মা সারদাদেবী' গ্রন্থটি দুই-তিন মাসের মধ্যেই শেষ করেন এবং ১লা জানুআরি ১৯৭৮-এ মায়ের জন্মদিনে উহা প্রকাশিত করিতে পারিয়া শিশুদের রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ পর্যায়টি পূর্ণাঙ্গ হওয়ায় তিনি গভীর পরিতৃপ্তি লাভ করেন। ইহার অব্যবহিত পূর্বে স্বামী নির্বেদানন্দের 'Sri Ramakrishna and Spiritual Renaissance' গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ অতি সত্বর প্রকাশ করিয়া তাঁহার শিক্ষাগুরুর নির্দেশ এবং নিজের বহু কালের সংকল্প বাস্তবায়িত করেন। বস্তুতঃ ভগ্নস্বাস্থ্য সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের মহান আদর্শের প্রেরণায় প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেন। তাঁহার শেষ রচনা— নিজ মন্ত্রগুরুর স্মৃতিকথা—দেহত্যাগের মাত্র কয়েক দিন পূর্বে তিনি উদ্বোধনে প্রকাশার্থ ন্যস্ত করিয়া যান। সুলেখক ও সুবক্তারূপেই শুধু নয়, সরল সুমধুর ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি ছোট-বড় সকলেরই প্রিয় ছিলেন।

তাঁহার দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণচরণে চিরশান্তি লাভ করুক!

বিবিধ সংবাদ

নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী

বাগবাজার (কলিকাতা) রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুলের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উৎসব বিগত ২২শে ডিসেম্বর (১৯৭৭) হইতে ২৭শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ্য। ভগিনী নিবেদিতা ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে ভারতে আগমন করেন এবং যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় ভারতীয় আদর্শে একটি বালিকা বিদ্যালয় খুলিবার উদ্যোগ করেন বাগবাজার পল্লীতে। তদনুযায়ী ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর রবিবার বোসপাড়া লেনের একটি ভাড়া বাড়ীতে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন শ্রীমা সারদাদেবী। এই শুভানুষ্ঠান স্বামীজী, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হইয়াছিল। ১৪ই ডিসেম্বর নিবেদিতা তাঁহার দিনলিপিতে লিখিয়াছেন, "School begins"। কিন্তু একাধিক কারণে ইহা পরীক্ষামূলক ছিল এবং পাঁচ-ছয় মাসের মধ্যে স্কুলটি বন্ধ করিয়া নিবেদিতা স্বামীজীর সহিত পাশ্চাত্যে গমন করেন স্কুলটির পরিচালনার জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে। তথাপি শ্রীশ্রীমায়ের দ্বারা স্কুলের এই উদ্বোধন নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। সেই কারণে ১৩ই নভেম্বরের দিনটিকে স্মরণ করিয়া রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী এবং বেলুড় মঠের অন্যতম ট্রাস্টী ও রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালক-মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য, সঙ্ঘের প্রাচীন সন্ন্যাসী স্বামী অভয়ানন্দজী বিদ্যালয়ে শুভাগমন করেন ১৯৭৭-এর ১৩ই নভেম্বর। তাঁহাদের উপস্থিতিতে ও শুভাশীর্বাদে এই বিশেষ দিনটির অনন্ত তাৎপর্য সেদিন বিদ্যালয়ে সমাগত সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী তাঁহার আশীর্বাদী ভাষণে বলেন :

বুঝতেই পাচ্ছ আমার গলার অবস্থা কি, তাই দু-একটি কথা ছাড়া বেশী কিছু বলবো না। শঙ্করী বসু তোমাদের ব'লে দিয়েছেন ভাল ভাল সব কথা। নিবেদিতা যখন বিলাতে স্বামীজীর বক্তৃতা শুনে স্বামীজীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তখনই তাঁর খুব একটা নাম ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে, আর সমাজেও তাঁর প্রতিপত্তি ছিল। স্বামীজীর বক্তৃতা শুনে তিনি প্রেরণা পেলেন, তাঁর বাসনা হলো যে, ভারতবর্ষে এসে ভারতবর্ষের সেবা করবেন। কিন্তু ওদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর খ্যাতি থাকলেও ভারতবর্ষে এসে কাজ করবার মতো শিক্ষা তাঁর ছিল না। তিনি পাশ্চাত্যের শিক্ষা পেয়েছেন, তাঁর ভাব, তাঁর চিন্তাধারা, তাঁর দৃষ্টিকোণ—সব আলাদা, ভারতবর্ষের আদর্শ থেকে পৃথক্। স্বামীজী দেখলেন, নিবেদিতাকে যদি ভারতবর্ষের সেবা করতে হয়, প্রথমেই তাঁকে ভারতবর্ষীয় হতে হবে। পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষাদীক্ষায় যা কিছু অভারতীয় সংস্কার সে সমস্ত ধুয়ে মুছে ভারতবর্ষের মেয়েদের সঙ্গে এক হয়ে ভারতবর্ষের আদর্শে ভাবিত হতে হবে। এইজন্যে স্বামীজী প্রথমে তাঁকে ভারতবর্ষীয় করেছিলেন। এই transformation নিবেদিতার পক্ষে বড় কষ্টকর হয়েছিল, কিন্তু গুরুকৃপায় তিনি এ অসাধ্য সাধন করেছিলেন। তারপর স্বামীজী তাঁর উপরে ভারতবর্ষের মেয়েদের

শিক্ষার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।

সে-যুগে ভারতবর্ষে যে ইংরেজ শাসকরা ছিলেন, নিবেদিতা তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না, কারণ তাঁরা ভারতবর্ষের যা-কিছু ভাল জিনিস, তা ঠিক ভাবে পাশ্চাত্যে উপস্থাপিত করতেন না। তার উপরে আবার খৃষ্টান মিশনারীরা আরও কিছু রঙ চড়িয়ে প্রচার করতেন। তাঁরা পাশ্চাত্য দেশে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটা কিম্ভূতকিমাকার ধারণার সৃষ্টি করেছিলেন। এই অবস্থায় সে-যুগে নিবেদিতা পাশ্চাত্য দেশে প্রচার করলেন যে, ভারতবর্ষের আদর্শ খুব বড় আর সমস্ত জগতে তার দরকার আছে। এই নিয়ে তর্কবিতর্ক খুব করেছেন তিনি খৃষ্টান মিশনারীদের সঙ্গে।

এই রকম একটি সেবিকা পেয়ে ভারতবর্ষের কত লোক যে উপকৃত হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। নিবেদিতার সে-সেবা তারা কখন ভুলতে পারে না।

স্বামীজী বলেছিলেন, মাকে কেন্দ্র ক'রে আবার ভারতে গার্গী মৈত্রেয়ীর মতো মেয়েরা সব জন্ম নেবে। নিবেদিতা মায়ের সঙ্গে থাকাতে অনেক সময় মাকে দেখবার, মায়ের কথা শুনবার তাঁর সুযোগ হয়েছিল। মা-ও তাঁকে খুব ভালবাসতেন। তাই নিবেদিতা স্বামীজীর ঐ উক্তির তাৎপর্য বুঝেছিলেন—শ্রীশ্রীমাকে তিনি আদর্শ নারীরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

এখনই কিছুক্ষণ আগে আমরা শুনেছি যে, মা এখানে পূজা ক'রে আশীর্বাদ করেছিলেন যে, এখান থেকে আদর্শমেয়েরা বেরুবে। আদর্শমেয়ে মানে কি? এই যে মেয়েদের সব কনফারেন্স হচ্ছে আর সেগুলির মাধ্যমে যে সমস্ত আদর্শ প্রচারিত হচ্ছে, সেই রকম আদর্শে বিশ্বাসী মেয়ে, না আর কিছু? আদর্শনারীর মূর্ত বিগ্রহ যদি মেয়েদের সামনে না থাকে, মেয়েরা কি ক'রে জীবন গঠন করতে পারবে বা অন্য মেয়েদের শিক্ষা দিতে পারবে? মা হচ্ছেন সেই আদর্শ সুতরাং এখানে যারা শিক্ষার্থিনী হবে, তারা মাকে আদর্শ করবে আর শিক্ষয়িত্রী বা সন্ন্যাসিনী যাঁরা আছেন, তাঁরা মেয়েদের সেই আদর্শে মানুষ করবার চেষ্টা তো করছেনই, কিন্তু বাড়ীতে যদি সে রকম পরিবেশ না থাকে, তা হ'লে শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে পারে না। এখানে যা শিখলো, বাড়ী গিয়ে তা ভুলে গেল, তা হ'লে লাভ কিছু হলো না। তাই বাড়ীর পরিবেশ ঠিক হওয়া চাই। যাতে আদর্শনারী ভারতবর্ষে জন্মাতে পারে, তার জন্য চেষ্টা করতে হবে অভিভাবকদের।

অবশ্যই মায়ের আশীর্বাদ আছে। সে আশীর্বাদ ফলবেই। যেমন ব্যাঙ্কে রাখা টাকা। পূর্বপুরুষরা ব্যাঙ্কে টাকা রেখে গিয়েছেন. সে-টাকা আমাদের প্রাপ্য বটে; তবে তা আমাদের পেতে হ'লে, ব্যাঙ্কের চেক কাটতে হ'লে আগে succession certificate নিতে হবে। Succession certificate নেওয়ার জন্য court-এ যেতে হবে, solicitor-এর কাছে যেতে হবে। অনেক কষ্ট ক'রে যখন succession certificate পাওয়া গেল, তখন ব্যাঙ্কের টাকাটা আমরা পাবো। মা আশীর্বাদ ক'রে গেছেন, কিন্তু সেই আশীর্বাদের ফল পেতে হ'লে আমাদের অনেক সাধনা করতে হবে। 'মা আশীর্বাদ ক'রে গেছেন' শুধু বললে হবে না, সেই আশীর্বাদ যাতে আমাদের জীবনে প্রতিফলিত হতে পারে, তার জন্যে যা কিছু সাধনা, শুধু ছাত্রীদেরই নয়, যাঁরা ছাত্রীদের মানুষ করছেন, তাঁদেরও ঠিক ঠিক করতে হবে। তবেই আমরা শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর মায়ের যে আশীর্বাদ তার ফল পেতে পারবো। তা না হ'লে দেরী হবে।

আগেই বলেছি, শিক্ষা শুধু স্কুলেই নয়,

বাড়ীতেও দরকার। স্কুল ও বাড়ী—দুটি মিলিয়ে শিক্ষাক্ষেত্র, সেভাবে যদি সমস্ত সুযোগ থাকে ঠিক ঠিক, তবেই প্রকৃত মানুষ হওয়া সম্ভব। আশা করি তোমরা যারা এখানকার শিক্ষয়িত্রী, সন্ন্যাসিনী ও ভক্ত তারা মায়ের আদর্শ অনুসারে জীবনযাপন ক'রে সেই আদর্শ যাতে ছেলেমেয়েদের সামনে ধরতে পারো, তার চেষ্টা করবে। আর মেয়েদের অভিভাবকদের আমি বলবো, আপনারা বাপ-মায়েরা বাড়ীর পরিবেশ যেন শিক্ষার অনুকূল করেন। আপনাদেরও যেন সুবিধা হয় আর ছেলে-মেয়েদেরও যেন সুবিধা হয়। এই রকম যদি না হয়, তা হ'লে ভারতবর্ষের উন্নতি ব্যাহত হবে।

শিক্ষার প্রথম কথা হলো : ভারতবর্ষের যে-আদর্শ সে-আদর্শের প্রতীক হওয়া, true representative of this great country হওয়া, যাকে দেখেই লোকে বলবে 'ভারতবাসী', তা যদি না হয়, শুধু একটু লেখাপড়া শিখলুম, সে-লেখাপড়ায় লাভ কি! আকাশ থেকে বন্দুক ছুঁড়লুম, চাঁদে গেলুম—এ সবেতে কিছু লাভ হবে না। সেই কারণে ভারতবর্ষের আদর্শ ছেলেমেয়েরা যাতে ঠিক ঠিক পায়, সেদিকে নজর রাখতে হবে - এটাই ছিল স্বামীজীর ইচ্ছা। আজ আমরা দেখতেই পাচ্ছি চারিদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-গুলিতে কি রকম বিশৃঙ্খলা। এর কারণ—কোন আদর্শ নেই সামনে। আদর্শ যদি ঠিক থাকতো তা হ'লে এ রকম হতো না। এখন অবশ্য আমাদের সামনে রয়েছে যাকে বলে uphill task. তা uphill task হ'লেও চেষ্টা না ক'রে তো ছাড়া যাবে না! কাজটি যতই কঠিন হোক, করতেই হবে। তা না হ'লে ভারতবর্ষের উন্নতি হবে না। এইজন্য আমাদের ভেতরে যাঁরা স্কুল-কলেজ চালাচ্ছেন, তাঁদের একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে, future generation গড়ে তোলার দায়িত্ব। যাতে ঠিক ঠিক আদর্শ অনুসরণ ক'রে জীবন গঠন ক'রে ছেলেমেয়েরা মানুষ হয়ে উঠতে পারে, তার জন্য তাদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা ক'রে দেওয়া—এ দায়িত্ব শিক্ষক-শিক্ষিকা ও বাপ-মা—সবারই।

আমি আবার সবাইকে মনে করিয়ে দেব মার আশীর্বাদ। সেই আশীর্বাদ একদিন ফলবেই ফলবে। এখন তা আমরা সামান্য দেখতে পাচ্ছি—অন্যান্য স্কুলের তুলনায় এখানকার মেয়েরা কি রকম, তার একটা আভাস পাচ্ছি, কিন্তু মার আশীর্বাদ যখন পূর্ণ হবে, তখনই দেখতে পাবো যে, নিবেদিতা স্কুল থেকে যারা বেরুবে, তারা ভারতবর্ষের ঠিক ঠিক আদর্শ নারী হবে। এই ব'লে মার চরণে প্রণাম জানিয়ে আমি শেষ করছি।*

এইভাবে বিদ্যালয়ের আসন্ন প্ল্যাটিনাম উৎসবের সূচনা হয়।

২২শে ডিসেম্বরের পুণ্য ব্রাহ্মমুহূর্তে সারদা মন্দিরে (বিদ্যালয়ের আশ্রম-বিভাগে) শ্রীশ্রীঠাকুরঘরে মঙ্গলারতি করেন শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণা। মঙ্গলারতির পর তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের পদপ্রান্তে নিবেদন করেন 'নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় পত্রিকা : প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী সংখ্যা'। সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমবাসিনী সন্ন্যাসিনী ও ব্রহ্মচারিণীদের

* নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক অনুলিখিত। এই সংক্ষিপ্ত সুন্দর সাবলীল ভাষণটি আমরা অনেক দেরীতে পাই—বর্তমান সংখ্যার কয়েক ফর্মা তখন ছাপা হইয়া গিয়াছে। এই জন্য ইহা গোড়ার দিকে প্রবন্ধাকারে স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত করা সম্ভব হয় নাই।—সঃ

কণ্ঠে উদ্গীত হয় স্তব-স্তুতি ও বন্দনাগান। ভোরের আকাশে-বাতাসে মূর্ছিত হয় আনন্দ-ধ্বনি—আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় বিদ্যালয়ের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উৎসব।

সকাল সাতটায় তিনতলায় ঠাকুরঘরে আরম্ভ হয় যথাবিহিত ষোড়শ-উপচারে পূজা, নীচে বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে একই সময়ে ছাত্রীদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় সুপ্রভাতের প্রথম মন্ত্র—'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'। পত্রে-পুষ্পে-মাল্যে সমগ্র বিদ্যালয়ভবনটি হয় সুশোভিত, সুবাসিত—হোমগন্ধে সুরভিত। কিশোরী ও শিশুকন্যাদের সমবেত কণ্ঠের স্তব-স্তোত্র, গীতা-আবৃত্তি ও সঙ্গীতে মুখরিত এই বিদ্যামন্দিরে সম্মিলিত সুধীজনের হৃদয়ে তখন বারংবার এই অনুভূতি জাগিয়াছিল: ভূলোক, দ্যুলোক সকলই মধুময়।

সকাল ৯টায় বিদ্যালয়ভবনের প্রবেশপথে সকলের দৃষ্টি-আকর্ষণকারী ভগিনী নিবেদিতার অপূর্ব ও জীবন্ত প্রতিকৃতির সম্মুখে মঙ্গলদীপ প্রজ্বালিত করেন অধ্যক্ষা মোক্ষপ্রাণাজী। প্রাথমিক বিভাগ, মাধ্যমিক বিভাগ ও শিল্প বিভাগের প্রায় সহস্রাধিক ছাত্রী এবং আমন্ত্রিত অভিভাবিকাগণ ও বন্ধুবর্গ সকলেই শান্ত ও উৎসুক চিত্তে এই দিব্য দৃশ্যটি উপভোগ করেন। সারদা মঠের অঙ্গস্বরূপ দিল্লী, মাদ্রাজ ও ত্রিচুর কেন্দ্রের এবং কলিকাতাস্থ শাখাকেন্দ্রগুলির বহু সন্ন্যাসিনী এই উপলক্ষে বিদ্যালয়ে মিলিত হন। অতঃপর মোক্ষপ্রাণাজী বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে মঞ্চে উপস্থিত হইলে বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে প্রবীণা শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা আশা পাল তাঁহাকে বরণ করেন। বরণের পর বিদ্যালয়ের সকল বিভাগের শিক্ষয়িত্রী ও কর্মীদের মোক্ষপ্রাণাজী উপহার প্রদান করেন এবং একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণে ছাত্রীদের উদ্দেশে বলেন: "এই সেই ভূমি, যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণশক্তি শ্রীসারদা—সরস্বতী স্বয়ং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। নিত্য স্মরণীয় তাঁর আশীর্বাণী—'এই বিদ্যালয়ের উপর জগন্মাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হউক, এখানে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা আদর্শ কন্যা হউক।' এখানকার শিক্ষয়িত্রীদের স্নেহচ্ছায়ায় ও কল্যাণধারায় লালিত ও স্নাত হয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজীর শিক্ষা গ্রহণ কর। তোমাদের ভবিষ্যৎ জয়যুক্ত হোক। তোমাদের আদর্শ শ্রীশ্রীমা। উদ্দেশ্য মনুষ্যত্ব-লাভ। লক্ষ্য দেশ ও জাতির উন্নতি সাধন।" ভাষণের পর ভগিনী নিবেদিতার প্রিয় বজ্র-চিহ্নিত ও 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ' বাণী-সংবলিত সুদৃশ্য কাগজের বাক্সে সমবেত সমস্ত ছাত্রী ও অতিথিদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বিকাল চারটায় সভা। নিবেদিতা লেনের সম্মুখে সুন্দর তোরণ। বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে তিল-ধারণের স্থান নাই। একতলা, দোতলা—সর্বত্র অতিথি। তিনতলার বারান্দায় ও হিমশীতল ছাদে শান্ত সংযত ছাত্রীবৃন্দ। চারিদিকে নির্বাক্ শ্রোতৃমণ্ডলী। বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে পবিত্র বেদ-গানের পর সুললিত কণ্ঠে উদ্বোধনী সঙ্গীত—'জননী তোমার প্রসন্ন আঁখিপাত' পরিবেশন করেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী ব্রহ্মচারিণী সুমিত্রা। উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে নিবেদিতার ইংরাজী রচনাংশের ও তাহার বাংলা অনুবাদের আন্তর্বিদ্যালয় আবৃত্তি-প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানের অধিকারিণী বিবি বসু (বাংলা অংশ—নিবেদিতা বিদ্যালয়, ৫ম শ্রেণী) ও অনুরাধা ব্যানার্জী (ইংরাজী অংশ—কমলা গার্লস স্কুল, ৯ম শ্রেণী) আবৃত্তি করে। আবৃত্তি- ও অঙ্কন-প্রতিযোগিতায় বিজয়িনী ছাত্রীরা পুরস্কৃত হয় ও যোগদানকারী অন্য সকলকে স্মারক উপহার

দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী মধুমিতা সেনগুপ্ত স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বলে বিদ্যালয়ই তাহাকে পরিপূর্ণ জীবনের প্রেরণা দিয়াছে।

ইহার পর বক্তারা ভাষণ দেন। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষয়িত্রী অধুনা সারদা মঠের সন্ন্যাসিনী প্রব্রাজিকা অমৃতপ্রাণা নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়া বলেন: 'এই বিদ্যালয়টি শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ-পূত। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হ'ল আত্মিক শক্তির উদ্বোধন এবং এই বিদ্যালয়টি সেই উদ্দেশ্য-সাধনেই ব্রতী। শিক্ষাদান এখানে জীবিকা নয়, সেবারূপে গণ্য।'

পরবর্তী বক্তা অধ্যাপক হরিপদ ভারতী স্বামীজীর ঐতিহাসিক চেতনার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন: 'সনাতনধর্মের মর্মকথা প্রচারের ঐতিহাসিক গুরুদায়িত্ব মহাকাল অর্পণ করেছিলেন স্বামীজীর উপর। স্বামীজীই ছিলেন সেই দায়িত্ব পালনের যোগ্যতম অধিকারী।' নারী-শিক্ষার প্রসঙ্গে স্বামীজীর মন্তব্য উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন: 'স্ত্রীশিক্ষা ভিন্ন, মাতৃজাতির জাগরণ ভিন্ন, সমগ্র জাতির জাগরণ অসম্ভব। নারীর জন্য চাই সেই শিক্ষা, যা প্রাচীন ভারতের শিক্ষাদর্শ ও আধুনিক শিক্ষাদর্শের সমন্বয়ে গঠিত। এই বৈপ্লবিক শিক্ষাদানে অগ্রণী হন ভগিনী নিবেদিতা।'

সর্বশেষে সভানেত্রী প্রাক্তন শিক্ষয়িত্রী সম্প্রতি মাদ্রাজ সারদা মঠের সন্ন্যাসিনী প্রব্রাজিকা নির্ভয়প্রাণা এই দিনটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া বলেন: "ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন দৈবীসম্পদে বিভূষিতা। দৈবীসম্পদ আমাদের মুক্তিপথে অগ্রসর করে, যে-মুক্তি সকল বিদ্যার চরম লক্ষ্য—'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে'। অভীঃ বা ভয়শূন্যতাই শ্রেষ্ঠ দৈবী সম্পদ। আমরা যেন ভগিনী নিবেদিতার মতো 'অভীঃ' মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তাঁর আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখতে পারি। ঈশ্বরলাভের জন্য সংসার ত্যাগ ক'রে সকলকে সন্ন্যাসগ্রহণ করতে হবে—একথা আমরা কখনও বলি না। অতএব যে যেখানে আছেন, সেখান থেকেই যেন পূর্ণতা লাভে প্রয়াসী হন। চাই—নচিকেতার মত শ্রদ্ধা ও আত্মবিশ্বাস।"

বক্তৃতার শেষে 'যো কুছ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়'—স্বামীজীর এই প্রিয় সঙ্গীতটি পরিবেশন করেন রামকৃষ্ণ সারদা মিশন দিল্লী শাখাকেন্দ্রের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী প্রব্রাজিকা বিবেকপ্রাণা। সমাপ্তি-সঙ্গীতের পর বিদ্যালয়ের সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

২৩শে ডিসেম্বর ও ২৫শে ডিসেম্বর 'রঙ্গনা' হলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিভাগের ছাত্রীদের দ্বারা অভিনীত হয় নৃত্যনাট্য 'কৃষ্ণলীলা' ও যোগেশ চৌধুরী রচিত 'সীতা'। অভিনয়ে ছাত্রীদের অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়া দর্শকবৃন্দ মুগ্ধ হন।

২৪শে ডিসেম্বর ছিল প্রাক্তন ছাত্রী দিবস। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন ত্রিচুর সারদা মঠের প্রেসিডেণ্ট প্রব্রাজিকা ধীরাপ্রাণা, যিনি মিশন পরিচালিত স্থানীয় বিদ্যালয়ের সঙ্গে সুদীর্ঘকাল যুক্ত। শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি স্বামীজী এবং নিবেদিতার ধারণা ও মতামত ব্যক্ত করেন। অনীতা গুপ্তা, ভারতী দত্ত, গীতা কুণ্ডু—এই তিনজন প্রাক্তন ছাত্রী, যথাক্রমে নিবেদিতা, রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তার উপর আলোকপাত করেন এবং প্রাক্তন ছাত্রী রত্না বসু এই বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভানেত্রী প্রাক্তন

ছাত্রী ও অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা জ্যোতির্ময়ী বসু সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত 'সারদামন্দির' নামে ছাত্রীনিবাসে যেভাবে 'আশ্রম-জীবন' যাপন করিয়াছিলেন, স্মৃতিচারণের মাধ্যমে তাহা জীবন্ত করিয়া তোলেন। পরিশেষে উদ্ধৃতিপাঠ ও সঙ্গীত-সহযোগে গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়। সকাল ৮॥০ হইতে বেলা ১১॥০ পর্যন্ত এই অনুষ্ঠানটি চলে।

সান্ধ্য অনুষ্ঠানে সভানেত্রীত্ব করেন প্রাক্তন শিক্ষিকা সুষমা চক্রবর্তী। শিল্পবিভাগের প্রাক্তন ছাত্রীরা (বর্তমানে যাঁহারা শিল্পবিভাগের শিক্ষয়িত্রী) অভিনয় করেন 'কমলাকান্তের জবানবন্দী'। অন্যান্য প্রাক্তন ছাত্রীদের দ্বারা রাজশেখর বসু রচিত 'চিকিৎসা সঙ্কট' এবং রবীন্দ্রনাথের 'সাগরিকা' অবলম্বনে নৃত্যনাট্য অভিনীত হয়। সঙ্গীতাংশে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন প্রীতিদেবী ও গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অনীতা গুপ্তার নিপুণ পরিচালনায় প্রাক্তন ছাত্রী দিবসটি সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

২৬শে ডিসেম্বর মহাজাতিসদনে একটি মহতী জনসভা আয়োজিত হয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। মঙ্গলাচরণ ও সভাপতি-বরণের পর রবীন্দ্রসঙ্গীত-বিশারদ শ্রীমতী ঋতু গুহঠাকুরতার উদ্বোধনী সঙ্গীতে একটি ভাব গম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ শ্রীঅম্লান দত্ত ও জাতীয় গ্রন্থাগারের অধিকর্তা শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত। ইহা ব্যতীত শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের সাধারণ সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা বাংলায় ও দিল্লী শাখাকেন্দ্রের সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা ইংরাজীতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিক আন্দোলনে ভগিনী নিবেদিতার ভূমিকা দুইটি বিভিন্ন দিক হইতে আলোচনা করেন। আত্মপ্রাণার ভাষণের বিষয়টি ছিল—The Great Disciple of the Great Master. মহান আচার্যের বাণীকে রূপায়িত করার জন্যই সুযোগ্য শিষ্যা-রূপে নিবেদিতার সার্থক আত্মদান। ভারতীয় আদর্শের সঙ্গে ভগিনী নিজেকে এমনভাবে এক ও অভিন্ন করিয়াছিলেন যে, যদি আমরা তাঁহাকে যথার্থ 'ভারতকন্যা'-রূপে গৌরবের সঙ্গে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করি তবে আমরাও কোনরূপে নিজেদের সত্যকার ভারত-কন্যা বলিয়া দাবী করিতে পারি না।

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা বলেন, শুধু বাংলা, ইংরাজী ও অঙ্ক শিখাইবার উদ্দেশ্যে একটি সাধারণ স্কুল খুলিবার জন্য স্বামীজী নিবেদিতাকে ভারতবর্ষে লইয়া আসেন নাই। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনের জন্যই স্বামীজী গঙ্গার দুই তীরে দুই মঠ স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। স্বামীজীর জীবিতকালেই গঙ্গার পশ্চিম কূলে বেলুড়মঠ স্থাপিত হইলেও দেশ ও সমাজ প্রস্তুত না থাকায় স্ত্রী-মঠের পরিকল্পনা রূপায়িত হয় নাই। কিন্তু ঐদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তিনি নিবেদিতাকে দিয়া বাগবাজার পল্লীতে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করান যাহার উদ্বোধন করেন শ্রীশ্রীমা এবং যে বিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাবধারার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পূর্ণ মিলন ঘটিবে। স্বামীজীর স্ত্রী-মঠের পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হয় ১৯৫৪ সালে শ্রীমার জন্মশতবার্ষিকী বৎসরে যেদিন গঙ্গার পূর্ব কূলে সারদা মঠ স্থাপিত হয়। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে স্কুলের প্রথম রেজিস্টারে নিবেদিতার স্বহস্তে লিখিত পারুল নামে যে

ছাত্রীটির উল্লেখ দেখা যায়, তিনিই সারদা মঠের প্রথম অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা। তিনি শ্রীমার অন্তরঙ্গমণ্ডলীর অন্যতম ও শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে 'সরলাদেবী' বলিয়া সুপরিচিত ও সমাদৃত। স্ত্রী-মঠ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের একটি মহান আদর্শ বাস্তবায়িত হয়। এখন ছাত্রীদের মনে ভারত-চেতনাকে জাগ্রত করাই বিদ্যালয়ের প্রধান ভূমিকা যাহাতে তাহারা শ্রীমার আশীর্বাদকে সফল করিয়া ভারতের আদর্শ কন্যারূপে পরিগণিত হইতে পারে।

অম্লান দত্ত তাঁহার ভাষণে নিবেদিতার বৈপ্লবিক ভূমিকা এবং শিক্ষা ও সেবার সার্থকতম রূপটি অভিব্যক্ত করেন। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত নিবেদিতার ভারত-চেতনার কথা আলোচনা করেন। তাঁহার Web of Indian Life ও Footfalls of Indian History হইতে সুনির্বাচিত অংশগুলির উদ্ধৃতিসহযোগে আলোচনাকে হৃদয়গ্রাহী করেন।

পরিশেষে ভূতেশানন্দজী মহারাজ বলেন—পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে যে লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া বিদ্যালয় যাত্রা শুরু করিয়াছিল আজ তাহার সম্প্রসারণ ও সমৃদ্ধি দেখিয়া মনে হয় অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে বিদ্যালয়ের কর্মী-বৃন্দ সেই লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতেছে। (সম্পূর্ণ ভাষণটি এই সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে—পৃঃ ৬৭ দ্রষ্টব্য)। এই দিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন কলিকাতার বহু বিশিষ্ট নাগরিক, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী-বৃন্দ ও পরম পূজনীয় স্বামী অভয়ানন্দজী মহারাজ যিনি নিবেদিতার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। নিবেদিতার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের উদ্দেশ্যেই এই সভায় সকলের আগমন। অতঃপর বিদ্যালয়ের সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা শ্রোতাদের সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

২৭শে ডিসেম্বর সকাল ৮টায় ছাত্রীরা একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা পরিচালনা করে। নিবেদিতার স্মৃতিপূত বলরাম মন্দির, বোসপাড়া লেন, কাঁটাপুকুর লেন ও বৃন্দাবন বসাক লেন, উদ্বোধন লেন ও শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী পরিক্রমা করিয়া ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে পুনর্মিলিত হয়।

এই জয়ন্তী উপলক্ষে ছাত্রীদের হাতে-আঁকা ছবির একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় এবং তাহাদের হাতে-আঁকা ছবি ও লেখা পোষ্টারের সাহায্যে বিদ্যালয়ের ইতিহাস সংক্ষেপে উপস্থাপিত করা হয়।

নববারাকপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির

নববারাকপুর সংস্কৃতি পরিষদের নব-নির্মিত দ্বিতলগৃহে 'শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির' উদ্বোধন উপলক্ষে গত ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৭৭, সারাদিন-ব্যাপী এক ভাবগম্ভীর উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ভোর হইতে স্তব, প্রার্থনা, ভজন, গীতাপাঠ ও শ্রীশ্রীমায়ের কথা পাঠের পর বেলা ৮টার সময় বিরাট শোভাযাত্রাসহকারে সকলে পরিষদ্-প্রাঙ্গণে সমবেত হন। তৎপরে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মন্দিরের উদ্বোধন এবং শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের পট প্রতিষ্ঠিত করেন এবং জনসভায় মন্দির প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি প্রার্থনা করেন যাহাতে সকলেই ঠাকুরের ভাবগ্রহণে সমর্থ হন এবং মন্দিরটি একটি আধ্যাত্মিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। তৎপরে স্বামী পূজানন্দ বিশেষ পূজা ও হোমাদি করেন। বেলা ১০টায় স্বামী প্রেমরূপানন্দ 'বিবেকানন্দ দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয়' উদ্বোধন করেন। পূজান্তে প্রায় ৫০০ ভক্ত খিচুড়ি প্রসাদ পান।

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠের পর ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সৌখ্যানন্দ, স্বামী কপিলানন্দ ও শ্রীচন্দ্রশেখর চৌধুরী। সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী কপিলানন্দ, স্থানীয় সারদা সংঘের সভ্যাগণ ও আরো অনেকে।

পরলোকে

অবিভক্ত বঙ্গদেশের ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগনার বড়লিয়া গ্রামের **মনীষী রঞ্জন নন্দী** গত ২৭শে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৮৪, ভদ্রেশ্বর সারদাপল্লীস্থ নিজ ভবনে ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি সস্ত্রীক পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন কলিকাতা বাগবাজারস্থিত শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে। ভক্তিমান মনীষীবাবু সাধু-ভক্তদের সেবায় এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও জনহিতকর কার্যাদিতে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বাংলা ১৩৫০ সালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের স্বামী হরিহরানন্দ, স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ ও স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দের অনুপ্রেরণায় তিনি তাঁহার বড়লিয়া গ্রামের বাড়ীতে সেবাকার্যে ব্রতী ছিলেন।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রাচীন ভক্ত শ্রীশ্রীসারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য **হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়** গত ৬ জানুআরি, ১৯৭৮, রাত্রি ৯'৪০ মিনিটে ভদ্রেশ্বরের সারদাপল্লীতে জপের আসনে বসিয়া শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। হেমন্তকুমারের জন্ম ১৯০৩ সালে। তিনি ১৯১৯ সালে কলিকাতা হইতে হাঁটিয়া জয়রামবাটী গিয়া শ্রীশ্রীমায়ের নিকট দীক্ষালাভ করেন। হেমন্তবাবুর জন্মস্থান ঢাকা জেলার পাঁচগাঁ গ্রামে, কিন্তু শৈশবেই তিনি কলমায় আসিয়া সেখানকার রামকৃষ্ণ আশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিনোদেশ্বর দাশগুপ্তের আশ্রয়ে ও শিক্ষকতায় বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। মধ্যজীবনে কর্মব্যপদেশে নানাস্থানে কাটাইয়া প্রৌঢ়বয়সে দীর্ঘকাল কলমা রামকৃষ্ণ সেবাসমিতির একনিষ্ঠ কর্মী-রূপে জনহিতকর কর্মে অতিবাহিত করেন। আবাল্য ব্রহ্মচারী এই মানুষটি চিরজীবন সাধুসন্ন্যাসীদের সেবক ও সখা ছিলেন। দেশবিভাগের পরে হেমন্তকুমার সারদাপল্লীতে মাতৃপ্রসঙ্গেই দিনাতিপাত করিতেন।

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য, ঢাকা বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামের প্রসিদ্ধ দত্ত পরিবারের **ডাঃ অমৃতলাল দত্ত** গত ৩০শে জানুআরি (১৯৭৮) ৭৮ বৎসর বয়সে দেরাদুনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের কতিপয় অন্তরঙ্গ পার্ষদবৃন্দের দুর্লভ সঙ্গ লাভে ধন্য হন। ঢাকা মিটফোর্ড কলেজ ও কলিকাতা ক্যাম্পবেল কলেজের তিনি কৃতী ছাত্র ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও পূজ্যপাদ স্বামীজীর আদর্শের অনুপ্রেরণায় তিনি আজীবন শিবজ্ঞানে জীবসেবায় ব্রতী ছিলেন। প্রথম জীবনে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত রেঙ্গুন সেবাশ্রমের তিনি বিচক্ষণ চিকিৎসক ছিলেন (১৯২৩-৪২)। লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক হিসাবে তিনি রেঙ্গুনে খ্যাতি অর্জন করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তিনি দেরাদুনে সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার চিকিৎসক নিযুক্ত হন এবং একজন সুচিকিৎসকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রাচীন ও নবীন সন্ন্যাসিবৃন্দের সহিত তাঁহার মধুর সম্বন্ধ ছিল। গত ৩৫ বৎসর যাবৎ স্থানীয় কিষণপুর আশ্রমের সর্ববিধ অনুষ্ঠানের সহিত তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত ছিলেন।

ইঁহাদের দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক!

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

অন্যান্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা — স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য ১৩'০০, ২য় ভাগ পৃঃ ৫২৪, মূল্য ৮'০০

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—(ছাপা নাই)

ভারতে শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ ; মূল্য ৩'০০

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৯১, মূল্য ৫'০০

স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ। পৃঃ ৩১০, মূল্য ৪'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ। (ছাপা নাই)

গোপালের মা — স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৪৪, মূল্য ১'৫০

শ্রীশ্রীরামানুজ-চরিত—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। (ছাপা নাই)।

আচার্য শঙ্কর—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৪৬. মূল্য ৬'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র—মূল্য ৭'৮০

শিবানন্দ-বাণী— স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত। ১ম ভাগ (ছাপা নাই) ; ২য় ভাগ-২'৫০

মহাপুরুষজীর পত্রাবলী— (ছাপা নাই)

সৎকথা — স্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত। (ছাপা নাই).

অদ্ভুতানন্দ-প্রসঙ্গ — স্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত। (ছাপা নাই)

স্মৃতি-কথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ। মূল্য ৪'০০

দিব্যপ্রসঙ্গে — স্বামী দিব্যাত্মানন্দ। (ছাপা নাই)

স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী— (ছাপা নাই)

আরতি-স্তব—মূল্য ০'৭০

পুণ্যস্মৃতি—স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ। পৃঃ ১১৬; মূল্য ৩'০০

মহাভারতের গল্প—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ পৃঃ ১২৮ ; সাধারণ ২'৫০, বোর্ড বাঁধাই ৩' ৬ষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য সংক্ষেপিত "স্কুলপাঠ্য" সংস্করণ—পৃঃ ৭২ ; মূল্য ২'০০

শঙ্কর-চরিত — শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। সংস্করণ (৭ম) মূল্য ২ ৫০

দশাবতার-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য পৃঃ ১০৮, মূল্য ২'৫০

সাধক রামপ্রসাদ —স্বামী বামদেবানন্দ। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৫'২০

সাধু নাগ মহাশয়—শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। পৃঃ ১৫৫. মূল্য ৩'৫০

ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী তেজসানন্দ। পৃঃ ১২৪, মূল্য ১'৫০

শিব ও বুদ্ধ—ভগিনী নিবেদিতা। পৃঃ ৬৩, মূল্য ০'৬৫

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ— (ছাপা নাই)

পত্রমালা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২ মূল্য ৪'৭০

গীতাতত্ত্ব—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৭৬, মূল্য ৫'০০

লাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৪২০, মূল্য ১০'০০

পরমার্থ-প্রসঙ্গ — স্বামী বিরজানন্দ। পৃঃ ১৩৭, মূল্য ৪'০০

ভগবানলাভের পথ—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। মূল্য ১'০০

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী — স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৩২, মূল্য ০'৬০

বিবিধ-প্রসঙ্গ—(ছাপা নাই)

কৈলাস ও মানসতীর্থ—স্বামী অপূর্বানন্দ। (ছাপা নাই)

তিব্বতের পথে হিমালয়ে—স্বামী অখণ্ডানন্দ। পৃঃ ১৮১, মূল্য ২'২৫

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-সঞ্চয়ন— পৃঃ ৩১৬, মূল্য ৭'০০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

বেদান্তের আলোকে খৃষ্টের শৈলোপদেশ—স্বামী প্রভবানন্দ। মূল্য সাধারণ ৪'০০,

অতীতের স্মৃতি—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। পৃঃ ৪৬৪ মূল্য ১০'০০

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ১৪২, মূল্য ৩'৩০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। পাঁচশতাধিক সঙ্গীত। মূল্য ৬'০০

ঠাকুরের নরেন, নরেনের ঠাকুর—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ২৯, মূল্য ১'২০

'উদ্বোধন' ১ম বর্ষ (পুনর্মুদ্রণ)। (যন্ত্রস্থ)

সংস্কৃত

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত।
১ম ভাগ পৃঃ ৪৫৪, মূল্য ১১'০০
২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৭'৫০
৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মূল্য ৭'৫০

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত, স্বামী জগদানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪৯৫, মূল্য ৭'৮০

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৬'৪০

স্তবকুসুমাঞ্জলি—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪০৮, মূল্য ৭'০০

বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা—স্বামী ধীরেশানন্দ-সংকলিত। (ছাপা নাই)

বৈরাগ্যশতকম্—স্বামী ধীরেশানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ১'৫০

যোগবাসিষ্ঠসারঃ—স্বামী ধীরেশানন্দ। (ছাপা নাই)

বিবেকচূড়ামণি—স্বামী বেদান্তানন্দ সম্পাদিত। (ছাপা নাই)

নারদীয় ভক্তিসূত্র—স্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ১৬৩, মূল্য সাধারণ ৫'০০, শোভন ৭'৫০

বেদান্তদর্শন—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য : ১ম অধ্যায় (চারখণ্ডে) ১৭'০০; ২য় অঃ ১৩'০০ ; ৩য় অঃ ১৩'০০ ; ৪র্থ অঃ ৯'০০

গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা—স্বামী রঘুবরানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য ১'৮০

শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজাপদ্ধতি— পৃঃ ৬৪, মূল্য ১'৫০

সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৫৮১, মূল্য ৩'০০

অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—সুরেশ দত্ত। মূল্য ৫'০০

পরমহংসদেব—স্বামী প্রেমেশানন্দ। পৃঃ ২৪, মূল্য ০'৫০

জননী সারদাদেবী—স্বামী নির্বেদানন্দ। (অনুবাদক : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। মূল্য ২'৮০

শ্রীশ্রীমা সারদা—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৯০, মূল্য ২'০০

গল্পে বেদান্ত—স্বামী বিশ্বশ্রয়ানন্দ পৃঃ ১২৮ ; মূল্য সাধারণ ২'৫০, বোর্ড বাঁধাই ৩'০০

বীরবাণী—স্বামী বিবেকানন্দ। পৃঃ ১১৪ মূল্য ২'০০ (যন্ত্রস্থ)

ছোটদের বিবেকানন্দ—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৬২, মূল্য ০'৫০

বিবেকানন্দের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। পৃঃ ১৫৪, মূল্য ৩'২৫

প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩

Udbodhan—Phone : 55-2447 FEBRUARY 1978 Regd. No. WB/NC-19

COVER PRINTED BY—

৮৭।৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্ট্রীগণের পক্ষে স্বামী বন্দনানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত।

সম্পাদক—স্বামী আত্মস্থানন্দ : সংযুক্ত সম্পাদক—স্বামী ধ্যানানন্দ

বার্ষিক মূল্য ১২·০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১·২০ টাকা

উদ্বোধন

নিবোধত

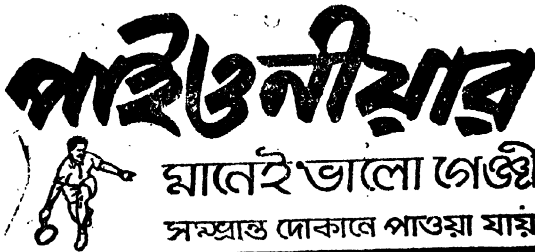




RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE
LIBRARY
CALCUTTA

উদ্বোধন, চৈত্র, ১৩৮৪

সূচীপত্র



পাইওনীয়ার
মানেই ভালো গেঞ্জী
সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়

আমি কি আর উপদেশ দেব! ঠাকুরের কথা সব বইয়ে বেরিয়ে গেছে। তাঁর একটা কথা ধারণা করে যদি চলতে পার তো সব হয়ে যাবে।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

উদ্বোধনের মাধ্যমে

প্রচার হোক

শ্রেষ্ঠ বাণী । শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়



দিব্য বাণী

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥

—বাসুদেব সার্বভৌম : শ্রীচৈতন্যস্তুতিঃ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে কৃপাপারাবার
আপনার (অতি প্রিয়) ভক্তিযোগ আর
বৈরাগ্য ও ব্রহ্মবিদ্যা জীবে শিখাইতে
অবতীর্ণ হইলেন (প্রেম বিলাইতে)
পুরুষপ্রবর যিনি এক পুরাতন
তাঁর শ্রীচরণে আমি লইনু শরণ।

আপনার (অতি প্রিয়) ভক্তিযোগ যাহা
কালবশে ছিল লুপ্ত, প্রকাশিতে তাহা
অবতীর্ণ হইলেন (আনন্দ-নিলয়)—
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামে যাঁর পরিচয়
তাঁর পাদপদ্মে মোর মানসভ্রমর
প্রগাঢ়ভাবেতে লীন হোক নিরন্তর।

কথাপ্রসঙ্গে

ইষ্টনিষ্ঠা ও শ্রীচৈতন্যদেব

তন্ত্রাদি শাস্ত্রে আমরা অনেক মন্ত্রের এবং মন্ত্রের প্রতিপাদ্য দেবতার ধ্যানের উল্লেখ দেখিতে পাই। সেই সকল মন্ত্র ও ধ্যান সিদ্ধিপ্রদ হয় না, যদি না সেগুলি গুরুপরম্পরা-ক্রমে পাওয়া যায়। বস্তুত: পরম্পরাগত গুরুই সাধকের ইষ্টমন্ত্র ও ইষ্টধ্যান নিরূপিত করিয়া দিতে সমর্থ। সমর্থ গুরুর নিকট দীক্ষিত হইবার পর সাধকের গুরুপ্রদত্ত ইষ্টমন্ত্রে ও গুরু-নির্ধারিত ইষ্টরূপে নিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন। ইষ্টনিষ্ঠা ব্যতীত কোনও কালে সিদ্ধিলাভের আশা নাই। এই ইষ্টনিষ্ঠা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিনিচয় স্মরণীয়:

> 'সব মতকে নমস্কার করবে, তবে একটি আছে নিষ্ঠাভক্তি। সবাইকে প্রণাম করবে বটে, কিন্তু একটির উপর প্রাণঢালা ভালবাসার নাম নিষ্ঠা।'
>
> 'যাদের উদার ভাব, তারা সব দেবতাকে মানে—কৃষ্ণ, কালী, শিব, রাম ইত্যাদি···কিন্তু নিষ্ঠাভক্তি একটি আছে।'
>
> 'রামরূপ বই আর কোনও রূপ হনুমানের ভাল লাগতো না।' 'হনুমানের নিষ্ঠাভক্তি। দ্বাপর যুগে দ্বারকায় যখন আসেন, কৃষ্ণ রুক্মিণীকে বললেন, হনুমান রামরূপ না দেখলে সন্তুষ্ট হবে না। তাই রামরূপ ধরে বসলেন।' "ঠাকুর রুক্মিণীকে বললেন, 'তুমি সীতা হয়ে বসো, তা না হ'লে হনুমানের কাছে রক্ষা নাই।' "
>
> "গোপীদের এমন নিষ্ঠা যে, বৃন্দাবনের মোহন চূড়া, পীত ধড়া পরা রাখালকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু ভাল-বাসবে না। মথুরায় যখন রাজবেশ, পাগড়ী মাথায় কৃষ্ণকে দর্শন করলে, তখন তারা ঘোমটা দিলে। আর বললে, 'ইনি আবার কে? এঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে আমরা কি দ্বিচারিণী হবো!' "
>
> "গোপীদের ইচ্ছা হয়েছিল ভগবানের ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করে। কৃষ্ণ তাদের যমুনায় ডুব দিতে বললেন। ডুব দেওয়াও যা অমনি বৈকুণ্ঠে সবাই উপস্থিত;—ভগবানের সেই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ রূপ দর্শন হ'ল, কিন্তু ভাল লাগলো না। তখন কৃষ্ণকে তারা বললে, 'আমাদের গোপালকে দর্শন, গোপালের সেবা এই যেন থাকে, আর আমরা কিছুই চাই না।' "

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ন্যায় শ্রীচৈতন্যদেবও ইষ্ট-নিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। সনাতন গোস্বামী যখন বৃন্দাবন হইতে পুরীতে আসিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত মিলিত হন, তখন শ্রীচৈতন্যদেব সনাতনকে সনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপমের—ইষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্রের নাম জপ করিতে করিতে—বঙ্গদেশে দেহত্যাগের সংবাদ জানাইয়া তাঁহার অতুলনীয় রামভক্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। কনিষ্ঠ সহোদরের দেহান্তের সংবাদে সনাতনের মনে পূর্বস্মৃতি জাগ্রত হইল। তিনি স্মৃতিচারণা করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবকে বলিলেন যে, একসময়ে তিনি ও তাঁহার অনুজ শ্রীরূপ অনুপমের

রামভক্তি দেখিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্ম বলিয়াছিলেন, তাঁহারা তিন ভাই সকলেই শ্রীকৃষ্ণ-নিষ্ঠ হইলে সব দিক দিয়া ভাল হইবে। বড় ভাইদের অনুরোধে বাধ্য হইয়া অনুপম শ্রীকৃষ্ণভজনে স্বীকৃত হইলেও আশৈশব যে ইষ্টনাম ও ইষ্টধ্যানে তিনি পরম অনুরাগী ছিলেন, হৃদয় হইতে তাহা বিসর্জন দিতে পারিলেন না। সারারাত্রি কাঁদিয়া কাটাইয়া পরদিন প্রভাত হইতে না হইতেই দাদাদের নিকট আসিয়া বলিলেন :

রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ন না যায়।
ছাড়িবারে মন হৈলে প্রাণ ফাটি যায়॥

তখন সনাতন ও শ্রীরূপ উভয়ে অনুপমকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার ইষ্টনিষ্ঠার অকুণ্ঠ প্রশংসা করিলেন। সনাতনের মুখে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া শ্রীচৈতন্তদেব যাহা বলিলেন, তাহা কবিরাজ গোস্বামী এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন :

গোসাঞি কহেন 'এইমত মুরারি গুপ্ত।
পূর্বে আমি পরীক্ষিল তারে এইমত॥
সেই ভক্ত ধন্য যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য যে না ছাড়ে নিজজন॥
দুর্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য স্থানে।
সেই ঠাকুর ধন্য তারে চুলে ধরি আনে॥'

উপরি-উক্ত পয়ারে উল্লেখিত মুরারি গুপ্তের ঘটনাটি এইরূপ :

> শ্রীচৈতন্যদেব একসময়ে রামভক্ত মুরারি গুপ্তের ইষ্টনিষ্ঠা পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণমাধুর্যের প্রশংসা করিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিতে বলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি থাকায় মুরারি স্বীকার করিলেন যে, তিনি কৃষ্ণোপাসনা আরম্ভ করিবেন। কিন্তু গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া ইষ্টদেব শ্রীরাম-চন্দ্রকে পরিত্যাগ করিতে হইবে ভাবিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাটাইলেন এবং প্রত্যূষে শ্রীচৈতন্যদেবের সমীপে আসিয়া বলিলেন যে, তিনি শ্রীরামচন্দ্রের চরণ ছাড়িতে পারিবেন না; কিন্তু ইহাতে শ্রীচৈতন্য-দেবের আদেশ লঙ্ঘিত হওয়ায় তিনি প্রার্থনা করেন যে, শ্রীচৈতন্যদেবের সম্মুখেই যেন তাঁহার মৃত্যু হয়।
>
> মুরারি গুপ্তের কথা শুনিয়া শ্রীচৈতন্যদেব অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন :
>
> সাধু সাধু গুপ্ত তোমার সুদৃঢ় ভজন।
> আমার বচনে তোমার না টলিল মন॥
> এইমত সেবকের প্রীতি চাহি প্রভু পায়।
> প্রভু ছাড়াইলে পদ ছাড়ন না যায়॥

শ্রীচৈতন্যদেবের এই সকল কথা হইতে আমরা ইষ্টনিষ্ঠা সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব স্পষ্ট অনুধাবন করিতে পারি। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের বহু স্থলে আপাতদৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্য-দেবের আগ্রাসী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার দাক্ষিণাত্যভ্রমণ প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন :

তার্কিক মীমাংসক মায়াবাদিগণ।
সাংখ্য পাতঞ্জল স্মৃতি পুরাণ আগম॥
নিজ নিজ শাস্ত্রে সবে উদ্গোগ প্রচণ্ড।
সর্বমত দূষি প্রভু করে খণ্ড খণ্ড॥
সর্বত্র স্থাপয়ে প্রভু বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে।
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহ না পারে খণ্ডিতে॥
হারি হারি প্রভুমতে করেন প্রবেশ।
এইমত বৈষ্ণব প্রভু কৈল সর্বদেশ॥

এই প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী আরও লিখিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্তদেব জনৈক বৌদ্ধাচার্য ও তাঁহার শিষ্যগণকে কৃষ্ণভক্তে পরিণত করিয়া-

ছিলেন। অধিকন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র শ্রীরঙ্গমে উক্ত সম্প্রদায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক শ্রীবেঙ্কট ভট্টকেও শ্রীচৈতন্যদেব রাধা-কৃষ্ণতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন। চারিমাস শ্রীচৈতন্যদেবের দুর্লভ সঙ্গ লাভ করিয়া নানা কথোপকথনের শেষে শ্রীবেঙ্কট ভট্ট শ্রীচৈতন্য-দেবকে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন :

কৃপা-করি কহিলে মোরে কৃষ্ণের মহিমা।
যাঁর রূপগুণৈশ্বর্যের কেহ না পায় সীমা॥
এবে সে জানিল কৃষ্ণভক্তি সর্বোপরি।
কৃতার্থ করিলে প্রভু মোরে কৃপা করি॥

দাক্ষিণাত্যের ন্যায় উত্তরভারতেও তীর্থ-ভ্রমণকালে শ্রীচৈতন্যদেব বহু লোককে বৈষ্ণব করেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন :

পূর্বে যৈছে দক্ষিণ যাইতে লোক নিস্তারিলা।
পশ্চিমদেশ তৈছে সব বৈষ্ণব করিলা॥

এমন কি দশজন অশ্বারোহী পাঠানদের অন্যতম একজন 'পরমগম্ভীর পীর'কে যুক্তিতর্কের দ্বারা পরাজিত করিয়া তাহাদের সকলকেই কৃষ্ণভক্তে পরিণত করিয়াছিলেন —

তা সবারে কৃপা করি প্রভু তো চলিলা।
সেই তো পাঠান সব বৈরাগী হইলা॥

আর কাশীর প্রকাশানন্দ সরস্বতীর বৃত্তান্ত তো অতি প্রসিদ্ধ! কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব আচার্য শংকরের মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া প্রকাশানন্দ সরস্বতী ও তাঁহার বহু সহস্র শিষ্যকে কৃষ্ণভক্তে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে বলিয়া-ছিলেন :

নিরন্তর করো কৃষ্ণনামসংকীর্তন।
হেলায় মুক্তি হবে, পাবে প্রেমধন॥

এবং প্রকাশানন্দ সরস্বতী বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবনবাসী বৈরাগী হইয়াছিলেন।

একদিকে শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্বোক্ত ইষ্টনিষ্ঠা-বিষয়ক প্রশস্তি, অন্যদিকে সকলকে যেন জোর করিয়া কৃষ্ণভক্ত করিবার প্রচেষ্টা, এই উভয় আচরণের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়?—এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠিতে পারে। ইহার সমাধান করিতে হইলে 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র গভীরে প্রবেশ করিতে হইবে—ভাসা-ভাসা পাঠে কোনও মীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভব নহে। মনোনিবেশপূর্বক গ্রন্থটি পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, শ্রীচৈতন্যদেব কাহাকেও জোর-জবরদস্তি করিয়া কৃষ্ণ-উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য করেন নাই। কবিরাজ গোস্বামীর ভাষা—'বৈষ্ণবী-কৃত্য সন্ন্যাসি-মুখান্ কাশীনিবাসিনঃ...' (কাশী-নিবাসী অবৈষ্ণব প্রধান সন্ন্যাসীদের বৈষ্ণব করিয়া...) এবং এই ধরনের বহু কথা বিশ্লেষণী দৃষ্টিসহায়েই বুঝিতে হইবে। তখনই স্পষ্ট উপলব্ধ হইবে যে, শ্রীচৈতন্যদেবের দিব্য দেহকান্তি, জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল, অদ্ভুত বিনয় এবং অলৌকিক ভাবাবেশ দেখিয়া লোকে স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবেই তাঁহার ভাবে ভাবিত হইয়া যাইত। কবিরাজ গোস্বামী এক জায়গায় লিখিয়াছেন :

দক্ষিণদেশের লোক অনেক প্রকার।
কেহ জ্ঞানী কেহ কর্মী পাষণ্ড অপার॥
সেই সব লোক প্রভুর দর্শনপ্রভাবে।
নিজ নিজ মত ছাড়ি হইলা বৈষ্ণবে॥
বৈষ্ণবের মধ্যে রাম-উপাসক সব।
কেহো তত্ত্ববাদী কেহো শ্রীবৈষ্ণব॥
সেই সব বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শনে।
কৃষ্ণ-উপাসক হঞা লয় কৃষ্ণনামে॥

এই পয়ারগুলিতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শনমাত্রেই দাক্ষিণাত্যবাসী রাম-উপাসক, লক্ষ্মীনারায়ণ-উপাসক প্রভৃতি সাধকগণ কৃষ্ণ-উপাসক হইয়া কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে থাকেন। চৈতন্যচরিতামৃতের অন্যান্য

বহু স্থলেই একটু লক্ষ্য করিলে এই ধরনের কথা পাওয়া যায়।

প্রকাশানন্দ সরস্বতীর প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য এই যে, তাঁহার যদি অপরোক্ষ অদ্বৈতানুভূতি থাকিত, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যদেব বেদান্তসিদ্ধান্ত লইয়া তাঁহার সহিত শাস্ত্রবিচার করিতেন না। প্রকাশানন্দ ছিলেন পরোক্ষ জ্ঞানী—মহাপণ্ডিত হইলেও তত্ত্বানুভূতি তাঁহার হয় নাই। ক্রমাগত তর্কবিচার করিয়া তাঁহার হৃদয় শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার হৃদয় কী চাহিতেছে, তাহা তিনি নিজেই জানিতে অক্ষম। আসলে প্রকাশানন্দের ভক্তিসংস্কার জ্ঞানবিচারের দ্বারা আচ্ছন্ন ও অভিভূত ছিল। শ্রীচৈতন্যদেব সূক্ষ্মদৃষ্টিসহায়ে সেই সংস্কারকে প্রত্যক্ষ করিয়া তদনুযায়ী কথাবার্তা শুরু করেন। নতুবা যিনি নিজেকে বহুবার 'মায়াবাদী সন্ন্যাসী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি শংকরোক্ত মায়াবাদের খণ্ডনে উদ্যত হইবেন কেন! দেশ-কাল-ও পাত্র-ভেদেই উপদেশ দেওয়ার বিধি—শ্রীচৈতন্যদেবও তদনুযায়ী উপদেশ দিতেন। সাধারণ গুরুবর্গই যখন কাহারও ভাব নষ্ট করেন না, তাঁহাদের প্রত্যেকটি কাজই যখন লোক-কল্যাণে অনুষ্ঠিত হয়, তখন অবতারপুরুষগণের 'কা কথা'! যুগযুগান্ত ধরিয়া যে-সকল সাধক কৃষ্ণ-উপাসনার জন্য উন্মুখ হইয়াছিলেন, তাঁহাদেরই সুকৃতিকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের অবতরণ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, 'যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী। তিনিই নররূপে শ্রীগৌরাঙ্গ।' শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্ব সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যদর্শনাদির কথাও সুবিদিত। এই পরিপ্রেক্ষিতেই শ্রীচৈতন্যদেবের যাবতীয় কার্যাবলীর তাৎপর্য অনুধাবন করা উচিত। অনেকেই—বিশেষতঃ ঐতিহাসিকগণ—অবশ্য এই পরিপ্রেক্ষিতকে বিচারের মান-দণ্ডরূপে বা উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করেন না, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তিসমূহকে আপ্তবাক্য-রূপ প্রমাণ বলিয়াই আমরা গ্রহণ করিয়া থাকি এবং তদনুসারেই শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী পর্যালোচনা করি। ইষ্টনিষ্ঠা সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীচৈতন্যদেবের মনোভাবে কোনও পার্থক্য আমরা দেখিতে পাই না।

'হরিমীড়ে'-স্তোত্রম্

স্তোত্র-রচয়িতা : আচার্য শংকর ; টীকাকার : স্বয়ংপ্রকাশ-যতি

অনুবাদক : স্বামী ধীরেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

টীকা : 'ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্। একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।' [ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১।১৬৪।৪৬], 'তদেবাগ্নিস্তদ্বায়ুস্তৎ সূর্যস্তদু চন্দ্রমাঃ। তদেব শুক্রমমৃতং তদ্‌ব্রহ্ম তদাপঃ স প্রজাপতিঃ।' [তুলনীয় শ্বে. উ. ৪।২], 'স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্। স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কালোঽগ্নিঃ স চন্দ্রমাঃ।' [কৈবল্য উ. ১৮] ইত্যাদয়ঃ মন্ত্রাঃ ব্রহ্মণঃ এব সকল-দেবতাত্মকতয়া অবস্থানম্ আহুঃ। শুক্রং জ্যোতিষ্মৎ ;

ব্রহ্ম বেদঃ। আপঃ-শব্দেন তদধিষ্ঠাতা বরুণঃ উচ্যতে। প্রাণঃ বায়ুঃ; কালঃ প্রজা-সংহর্তা যমঃ। এতৈঃ মন্ত্রৈঃ সর্বদেবাত্মকত্বেন সিদ্ধং বিষ্ণুং স্তৌতি—

(মূলস্তোত্রম্ঃ)

ব্রহ্মা বিষ্ণুরুদ্রহুতাশৌ রবিচন্দ্রা-
বিন্দ্রো বায়ুর্যজ্ঞ ইতীত্থং পরিকল্প্য।
একং সন্তং যং বহুধাহুর্মতিভেদাৎ
তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৮ ॥ (১)

ব্রহ্মা ইতি। **ব্রহ্মা** অপঞ্চীকৃত-ভূত-ব্যতিরিক্ত-সকল-স্রষ্টা হিরণ্যগর্ভঃ **বিষ্ণুঃ** সত্ত্বসাধনকঃ সকল-জগৎ-পালকঃ পরমেশ্বরঃ। **রুদ্রঃ** সত্ত্বোপাধিকঃ তমঃ-সাধনকঃ জগৎ-সংহর্তা পরমেশ্বরঃ। তস্য তম-উপাধিকত্বে জীবত্বারোপাৎ জীবত্বস্য বহু-শ্রুতি-স্মৃতীতিহাস-পুরাণ-বিরুদ্ধত্বেন তদ্বাদিনঃ পাখণ্ড-শিরোমণিত্বাপত্তেঃ। 'সত্ত্বং দেবা হরাদয়ঃ' ইতি বসিষ্ঠবচনাৎ। 'ইত্যাদিষ্টঃ স গুরুণা ভগবান্ নীললোহিতঃ। সত্ত্বাকৃতিস্বভাবত্বাৎ সসর্জাত্মসমাঃ প্রজাঃ॥' ইতি ভাগবত-বচনাৎ চ। কুত্রচিৎ শ্রূয়মাণ-তমঃ-সম্বন্ধস্য কার্যার্থত্বেন অপি উপপত্তেঃ। (২)

যজ্ঞঃ ইতি ভগবতঃ বিষ্ণোঃ মূর্ত্যন্তরম্। মতিভেদাৎ বুদ্ধিবৈচিত্র্যাৎ; মতিভেদাঃ ইতি পাঠে ভিদ্যন্তে ইতি ভেদাঃ ভিন্নমতয়ঃ ইতি অর্থঃ ॥ ১৮ ॥ (৩)

টীকানুবাদ : '[সেই আদিত্যকে পণ্ডিতগণ] ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি বলেন। তিনি (সেই আদিত্য) দিব্য, সুন্দর [দিন- ও রাত্রি-রূপ] পক্ষবিশিষ্ট এবং গমনশীল। [আদিত্যরূপী সেই] এই সৎস্বরূপকেই মেধাবিগণ অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা (বায়ু) [প্রভৃতি] বহুরূপে বর্ণনা করেন।'[১]; 'তিনিই (এক ব্রহ্মই) অগ্নি, তিনিই বায়ু, তিনিই সূর্য, তিনিই চন্দ্রমা, তিনিই শুদ্ধ অমৃতস্বরূপ, তিনিই ব্রহ্ম (বেদ), তিনিই জল (বরুণ) এবং তিনিই প্রজাপতি।'; 'তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই শিব, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই অক্ষর (অব্যয়), স্বরাট্ (স্বপ্রকাশ) পরব্রহ্ম। তিনিই বিষ্ণু, তিনিই প্রাণ, তিনিই কাল ও অগ্নি এবং তিনিই চন্দ্রমা।' ইত্যাদি মন্ত্রসমূহ [এক] ব্রহ্মেরই সকল দেবতারূপে অবস্থান বলিতেছেন। [মন্ত্রোক্ত] 'শুক্র'-এর অর্থ জ্যোতির্ময়; 'ব্রহ্ম'-এর অর্থ বেদ; 'আপঃ'-শব্দের দ্বারা তদধিষ্ঠাতা বরুণ উক্ত হইয়াছেন; 'প্রাণ'-এর অর্থ বায়ু এবং 'কাল'-এর অর্থ প্রাণিসংহারকারী যম। এই মন্ত্রসমূহের দ্বারা সর্বদেবতারূপে প্রতিপাদিত বিষ্ণুকে [আচার্য] স্তুতি করিতেছেন : [মূলস্তোত্র, শ্লোক ১৮, উপরে দ্রষ্টব্য]।

১ ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১৬৪ সূক্তের অন্তর্গত এই মন্ত্রের দেবতা আদিত্য। সুতরাং এই মন্ত্রে আদিত্যকেই স্তব করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকাশশীল আদিত্যকে পরমাত্মরূপেই সায়ণভাষ্যে বলা হইয়াছে। উক্ত মন্ত্রের সায়ণভাষ্য দ্রষ্টব্য।

অন্বয়ঃ যম্ একং সন্তং মতিভেদাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ রুদ্র-হুতাশৌ রবি-চন্দ্রৌ ইন্দ্রঃ বায়ুঃ যজ্ঞঃ ইতি ইত্থং পরিকল্প্য বহুধা আহুঃ, তং সংসার-ধ্বান্ত-বিনাশং হরিম্ ঈড়ে।১৮।

স্তোত্রানুবাদঃ যে এক সদ্বস্তুকে [লোকে] বুদ্ধিবৈচিত্র্যবশতঃ ব্রহ্মা (হিরণ্যগর্ভ), বিষ্ণু, রুদ্র, অগ্নি, রবি, চন্দ্র, ইন্দ্র, বায়ু, যজ্ঞ ইত্যাদি রূপে পরিকল্পনা করিয়া বিবিধ প্রকারে বর্ণনা করে, সংসারের [কারণীভূত অজ্ঞান-] অন্ধকার-বিনাশকারী সেই হরিকে বন্দনা করি।১৮।(১)

টীকানুবাদঃ **ব্রহ্মা** ইত্যাদি। **ব্রহ্মা**—অপঞ্চীকৃত ভূত (পঞ্চ তন্মাত্রা) ভিন্ন অপর সকল পদার্থের সৃষ্টিকর্তা হিরণ্যগর্ভ।২ **বিষ্ণুঃ**—সত্ত্বগুণসহায় সকল জগতের পালক পরমেশ্বর। **রুদ্রঃ**—সত্ত্ব [-গুণ]- উপাধিবিশিষ্ট তমোগুণসহায় জগতের সংহারকর্তা পরমেশ্বর। [তমঃ-সহায় রুদ্রকে সত্ত্বোপাধিক বলা হইল কেন, তাহার কারণ বলা হইতেছে—] তাঁহার (রুদ্রের) তমোগুণই উপাধি হইলে জীবত্বের আরোপ হয় ; কিন্তু তাহাতে রুদ্রের জীবত্ব বহু শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণের [মত-] বিরুদ্ধ হওয়ায় ঐরূপ বর্ণনাকারীর পাষণ্ড-শিরোমণিত্বের [প্রসঙ্গরূপ] আপত্তি৩ হয়। 'সত্ত্বং দেবা হরাদয়ঃ' অর্থাৎ হর বা রুদ্রাদি দেবতা সত্ত্বগুণোপাধিবিশিষ্ট—বসিষ্ঠবচন হইতে [ও] ইহা প্রমাণিত হয়। [এই বিষয়ে] ভাগবতেরও বচন রহিয়াছে—

২ অদ্বৈতবেদান্তমতে পরমেশ্বর অনাদি অনির্বাচ্য মায়াসহায়ে নামরূপাত্মক বিচিত্র জগৎ সঙ্কল্পপূর্বক সৃষ্টি করেন। সৃষ্টির প্রথমে আকাশের উৎপত্তি, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। ইহারা প্রত্যেকেই অতি সূক্ষ্ম অবস্থায় উৎপন্ন হয়। এই অবস্থাকেই অপঞ্চীকৃত তন্মাত্রা বলে। অপঞ্চীকৃত পঞ্চ ভূতের পরিণামী উপাদান-কারণ ত্রিগুণাত্মিকা মায়া বা অবিদ্যা। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটিকেই ত্রিগুণ বলা হয়। সত্ত্বপ্রধান অপঞ্চীকৃত পঞ্চ ভূত হইতে যথাক্রমে শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, রসনা ও ঘ্রাণ—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়। এক একটি ভূত এক একটি ইন্দ্রিয়ের জনক। অপঞ্চীকৃত পঞ্চ ভূত সত্ত্বপ্রধান অবস্থায় মিলিত হইয়া বুদ্ধি, অহংকার, মন এবং চিত্ত এই সমুদায়াত্মক অন্তঃকরণের সৃষ্টি করে। রজঃপ্রধান অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে যথাক্রমে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ—এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়। রজঃপ্রধান অপঞ্চীকৃত পঞ্চ ভূত সম্মিলিতভাবে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান—এই পঞ্চ বায়ুর সৃষ্টি করে। তমঃপ্রধান অপঞ্চীকৃত পঞ্চ ভূতের পঞ্চীকরণ-প্রক্রিয়ার দ্বারা স্থূল পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি হয়। অপঞ্চীকৃত পঞ্চ ভূত—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ বায়ু, মন এবং বুদ্ধির সম্মিলিত রূপ লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্মশরীর সৃষ্টি করে। এই লিঙ্গশরীরের সমষ্টিগত অবস্থাই হিরণ্যগর্ভ নামে অভিহিত। সুতরাং পরমেশ্বর অপঞ্চীকৃত পঞ্চ ভূত এবং হিরণ্যগর্ভের সাক্ষাৎ সৃষ্টিকর্তা। পঞ্চীকৃত ভূতভৌতিক সৃষ্টির সাক্ষাৎ কর্তা হিরণ্যগর্ভ।

৩ রুদ্র ঈশ্বররূপে স্বীকৃত। ঈশ্বর কেবল তমঃপ্রধান নহেন। ব্যষ্টি অজ্ঞান তমঃ-প্রধান বলিয়া অজ্ঞান-উপহিত-চৈতন্য জীব অজ্ঞ হয়। ঈশ্বর অজ্ঞ হইতে পারেন না। এইজন্য রুদ্রকে সত্ত্বোপাধিক বলা হইল—কেবল তমঃপ্রধান বলা হইল না।

'ভগবান নীললোহিত (যাঁহার কণ্ঠ নীল ও জটা লোহিত বা পিঙ্গলবর্ণ) অর্থাৎ শিব গুরু কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া আত্মসম প্রজাবর্গ সৃষ্টি করিলেন, কারণ তিনি সত্ত্ব-আকৃতি (স্বরূপ)-স্বভাব।' কোথাও কোথাও তাঁহার যে তমোগুণ-সম্বন্ধ শুনা যায়, [তাহা] কার্য-সম্পাদনের জন্যই [ইহাই] যুক্তিসিদ্ধ। (২)

যজ্ঞঃ—ইহা ভগবান বিষ্ণুরই মূর্তিবিশেষ।[৪] **মতিভেদাৎ**—বুদ্ধিবৈচিত্র্যবশতঃ; **মতিভেদাঃ**—এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিলে, যাহা ভিন্ন হয় তাহাই ভেদ, [এইরূপ ব্যুৎপত্তিবশতঃ] '**মতিভেদাঃ**' শব্দের অর্থ বিভিন্নপ্রকার-বুদ্ধিবিশিষ্ট [ব্যক্তিগণ]।১৮। (৩) [ক্রমশঃ]

৪ 'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ', 'যজ্ঞো বিষ্ণুঃ প্রজাপতিঃ', 'ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বিষ্ণুঃ' ইত্যাদি উক্তি স্মরণীয়।

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজীর স্মৃতিকথা*

স্বামী ভূতেশানন্দ

এই হলে এর আগে একবার আমাকে স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের সম্বন্ধে বলবার জন্যে বাধ্য করা হয়েছিল। আমি যে 'বাধ্য করা **হয়েছিল**' বলছি, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য; আমি সহজে রাজী হইনি। কারণ নিজের মনে যথেষ্ট সংকোচ ছিল, বিশেষতঃ এই বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলতে। কারণ তাঁর সম্বন্ধে বলবার জন্যে মনে কিছু প্রস্তুতি দেখতে পাই না। এই জন্যে অস্বস্তি বোধ হয়। এর আগে কি বলেছিলাম দেখতে ঔৎসুক্য হ'ল, পুরানো উদ্বোধনখানা খুলে দেখলুম,—উদ্বোধনে একবার আমার কথাগুলি অনুলিখিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল।[১] দেখে অস্বস্তি আরো বেড়ে গেল। সেবারেও অস্বস্তির মধ্যে কথা বলতে আরম্ভ করেছিলুম—এবারে বেশী ক'রে অস্বস্তি বোধ করছি, কারণ ব্যক্তিগত যে সব স্মৃতি, তার ভাণ্ডার অফুরন্ত হয় না। যেগুলি বলবার মতো হয়েছিল, খুব সুসংবদ্ধ না হ'লেও, সেগুলি সেদিন মোটামুটি বলা হয়ে গেছে। কাজেই আবার কিছু বলতে গেলে, আগে যা বলা হয়ে গেছে, অনেকক্ষেত্রে তার পুনরাবৃত্তি হবে। অস্বস্তির তাও একটা কারণ।

কিন্তু ইচ্ছে করলেও অনেক সময় রেহাই পাওয়া যায় না। কাজেই যেমন সেবারেও বাধ্য হয়ে এসেছিলুম, এবারেও বাধ্য হয়ে এসেছি। আমার অসামর্থ্য যথাসম্ভব জানিয়েছি, কিন্তু আমার কোন কথাই, কোন ওজরই মঞ্জুর হয় নি। আপনারা হয়তো ভাবছেন, আমি বিনয় ক'রে বলছি কিন্তু তা নয় —একেবারে অন্তরের কথা। অস্বস্তি একেবারে অন্তর থেকে বোধ হচ্ছে, তবুও বলতে হবে। এর চেয়ে 'ভক্ত-মালিকা' থেকে তাঁর জীবন-চরিত পড়া হ'লে অনেক জিনিস তা থেকে পাওয়া যেত।

* ১৪ই জানুআরি ১৯৭৮, শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজীর আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে বাগবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের 'সারদানন্দ হলে' প্রদত্ত ভাষণ। শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত।—সঃ

১ চৈত্র, ১৩৮১ (৭৭তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা) পৃঃ ১১৭-১২৬।—সঃ

আর ব্যক্তিগত কথাগুলি শুনতে সাময়িক-ভাবে হয়তো ভাল লাগে, কিন্তু যিনি বলবেন, তাঁর পক্ষে বলা মুশকিল। খুঁজে খুঁজে বার করতে হয়। নানা ঘটনা ও উক্তির সঙ্গে সব মিশে আছে। সেই পাঁচমিশেলী স্মৃতির মধ্যে থেকে খুঁজে বার করতে হয়, যা সকলের কাছে প্রকাশ করা চলে। আমার কাছে যে জিনিসের বিশেষ মূল্য আছে, অপরের কাছে তার সে-মূল্য থাকবে না। আমি নিজে যেভাবে তাঁকে দেখেছি, সেটা আমার ব্যক্তিগত সম্বন্ধ থেকে দেখা। অপরে যেভাবে তাঁকে ত্যাখে তার সঙ্গে আমার দেখার মিল থাকবে না। তবু বলতে হবে। মহামুশকিল। যাই হোক, কাগজে যখন নাম ছাপা হয়ে গেছে, তখন উপায় নেই। যা মনে আসে, বলতে হবে। আপনারা যথাসম্ভব —ঠাকুরের ভাষায়—'ল্যাজা মুড়ো বাদ দিয়ে' নেবেন। সত্যি কথা বলতে কি— কোন্‌টা বলবার মতো হবে আর কোন্‌টা বলবার মতো নয়, তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না।

এটা অন্তরের কথা বলছি, কারণ তাঁর সঙ্গে যখন তিনি মেশার সুযোগ দিয়েছিলেন, তখন সেই সুযোগের যে সদ্ব্যবহার করতে পেরেছি, তা মনে হয় না। আসতুম। ভাল লাগতো আসতে। কাছে বোসে থাকতুম— ভাল লাগত বোলে। প্রশ্ন বিশেষ করিনি—আর যে-সব প্রশ্ন আলোচিত হতো, সে-সবও যে তখন খুব মন দিয়ে শুনেছি, তাও বলতে পারি না। যা শুনেছি, তাও যে বুঝেছি, তাও নয়। ঐ উপনিষদের ভাষায়—

'শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।'
(কঠ উ. ১।২।৭)

—অনেকে শুনতে পর্যন্ত পায় না, আবার অনেকে শুনেও বুঝতে পারে না। আমাদের ঠিক সেই অবস্থা—'বহবঃ', সেই বহুর মধ্যে পড়ে যাই, যারা শুনেও বুঝতে পারে না। দু'চারজন ভাগ্যবান যাঁরা শুনেছেন ও বুঝেছেন তাঁদের দলে পড়ি না। সংকোচ সেই জন্যে বেশী ক'রে। এসেছি, কাছে বসেছি, শুনেছি কথা-বার্তা, তার বেশী চোখ চেয়ে দেখেছি। ভাল লাগতো—একটা আপনার বোধ, মনে জেগে উঠতো, তাই চেয়ে থাকতুম। কি বলেছেন, হয়তো কানে গেছে, কিন্তু তা তলিয়ে বুঝবার অবকাশ সে-সময় হয়নি—বুদ্ধিও হয়নি। আজও যদি সেদিন ফিরে আসে—এখন যে তা ভাল ক'রে বুঝতে পারবো, তা নয়; কারণ হচ্ছে, তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব—যে ব্যক্তিত্বের কাছে আমরা একেবারে নগণ্যমাত্র। কাজেই সেখানে আমাদের বুঝবার চেষ্টাও থাকতো না। আর আমার মনে হয় এখনও থাকবে না। তবু আমার কাছ থেকে আপনারা শুনতে চান, তাঁর কথা। কিন্তু কী শোনাবো?

তাঁর ছবিটি আমি যেভাবে দেখি, আপনা-দের সামনে কি সেভাবে তুলে ধরতে পারবো? পারবো না। কারণ, তা আমার একান্ত ব্যক্তি-গত জিনিস। সুতরাং আমাকে সভাসীন করায় আমার নিজের দুর্ভোগ ছাড়া আপনাদের বিশেষ কিছু লাভ হবে না। যখন আসতুম, তখন বয়স কম ছিল—মঠ-মিশনের সঙ্গে পরিচয় সবে শুরু হয়েছে। তাঁর কাছে আসি। বসে থাকি। কথাবার্তা দু'চারটা শুনি। কখনো চোখ চেয়ে থাকি, কখনো বা যেমন মন্দিরে ব'সে ধ্যান করে, সেইরকম চোখ বুজে ধ্যান করি। আর তিনি, কখনো কখনো বলেন— 'ধ্যান করতে হয় তো, ঠাকুরঘরে গিয়ে কর না!' স্বাভাবিক! তখন ও-সব বুঝতুম না। চোখ বুজে আছি, চোখ চেয়ে দেখছি, কথা শুনছি—এই যথেষ্ট! বুঝবার কোন চেষ্টা নেই।

তবে দেখেছি যে, তাঁর কথাগুলি যাতে আমাদের বুদ্ধিগম্য হয়, যাতে আমরা আমাদের জীবনের উপযোগী পাথেয় সংগ্রহ করতে পারি, তার জন্যে তাঁর চেষ্টা ছিল— সে-চেষ্টার বিরাম ছিল না কোনদিন।

এর আগের বারে বলেছি—দেখলুম সেদিন প'ড়ে—অনেক সময় তিনি চুপ ক'রে ব'সে থাকতেন,—ঠাকুরের ভাষায়, 'অচল অটল সুমেরুবৎ'। 'অচল অটল' পাহাড়ের মত ব'সে থাকতেন, আর তাঁর চারপাশে যদিও অল্প-পরিসর ঘর (তখন মনে হতো প্রকাণ্ড ঘর, এখন দেখছি কত ছোট উদ্বোধনের ঐ ঘরটি!) তারই ভেতরটা ভর্তি হয়ে থাকত লোকে।

তিনি ব'সে আছেন—'অচল অটল সুমেরুবৎ' আর চারপাশের লোকেরা যাঁর যা দুঃখের কাহিনী ব'লে যাচ্ছেন। তিনি শুনছেন। তখন আমরা ছেলেমানুষ। তখন মনে জগতের কালোর দিকটা বেশী ক'রে পড়তো না, আলোর দিকটাই বেশী ক'রে পড়তো। দুঃখের কথা সেই জন্যে ভাল লাগতো না, মনে হ'ত—এখানে এসেছি আমরা মহারাজের কাছে—(আমরা মহারাজ বলেই তখন বলতুম, যদিও মঠ-মিশনে শুধু মহারাজ বলতে রাজামহারাজকে—স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকেই বোঝায়) তাঁকে দেখবার জন্যে, তাঁর কথা শোনবার জন্যে—দুঃখের কথা শুনতে নয়। তাই যখন শুনতুম গৃহস্থরা—তাঁদের মধ্যে অনেকেই বৃদ্ধ—তাঁদের সব সাংসারিক অভিজ্ঞতার কথা, সংসারের দুঃখকষ্টের কথা বলছেন, তখন আমাদের মনে বিরক্তির উদ্রেক হ'ত। ভাবতুম—এই সব কথা বলায় আমাদের সময় নষ্ট হচ্ছে, আমরা তো তাঁর কথা শুনতে এসেছি, যাতে ধর্মজীবনে আমাদের লাভ হয়। কিন্তু তাঁর কাছে দুঃখ নিবেদন করায় লোকেদের যে কষ্টের লাঘব হয় এবং সেই জন্যেই যে তিনি তাঁদের দুঃখকষ্টের কথা মৌন সহানুভূতির সঙ্গে শোনেন—একথা তখন বেশী বুঝতুম না।

আমার কথাগুলি আগের কথার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে—আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু উপায় নেই। যেগুলি মনে আসছে, সেগুলিই বলছি।

তিনি আমাদের মনের ভাব বুঝে আমাদের সন্তুষ্ট করবার জন্যে কাউকে দিয়ে কিছু সৎ-প্রসঙ্গ তোলাতেন। তখন সেই সম্বন্ধে কথা-বার্তা হ'ত। নানা কথা উঠতো, কিছু কিছু মনে আছে, অধিকাংশই মনে নেই।

একদিনের ঘটনা বিশেষ ক'রে মনে আছে। কথাবার্তার ভেতরে একজন আগন্তুক এসেছেন। তিনি কথায় কথায় বললেন—'সাধুসঙ্গ করতে এসেছি।' মহারাজ বললেন, 'সাধুসঙ্গ! বাপু দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর থাকতেন, সেখানের পূজারীরা বা দক্ষিণেশ্বরের প্রতিবেশীরা ঠাকুরের সঙ্গ বহু বছর ধরে করেছে, কালীবাড়ীর কর্মচারীরা দিন রাত সঙ্গ ক'রেছে, বছরের পর বছর সঙ্গ করেছে—তাদের জীবনে যে কিছু পরিবর্তন হয়েছে তা তো দেখা যায় না। তা হ'লে সাধুসঙ্গের ফল কি হ'ল? কাজেই সাধুসঙ্গ মানে সাধুর কাছে আসামাত্র নয়। সাধুর সান্নিধ্যে এলেই সাধুসঙ্গ হয় না। ভাব হচ্ছে এই, মনের যোগ থাকা দরকার, কেবল কাছে থাকলে হয় না—এই একটি কথা মহারাজ বললেন। আর একটি কথা বললেন ঐ ভদ্র-লোককে। প্রসঙ্গক্রমে ভদ্রলোকটি বললেন, তিনি সংসার ত্যাগ করতে চান। মহারাজ বললেন, 'তুমি তো বাপু সংসার ত্যাগ করবে, আমি তো এখনও পারিনি!' তারপর বললেন, 'দেখো না, কতগুলি জড়িয়েছি!' শীতকাল তখন, ওঁর বাতের শরীর ছিল, কাজেই কাপড়-চোপড় ব্যবহার করতে হ'ত বেশী। বললেন, 'দেখ না, কতগুলি জড়িয়েছি!' তারপর বললেন,

'এক সময় ছিল যখন এক কাপড়ে ভারত পরিভ্রমণ করেছি'—ব'লেই সংশোধন ক'রে বললেন—'উত্তর ভারত'। 'কিন্তু এখন? আজ এখন, এতগুলি জড়িয়ে রাখতে হয়েছে।—সংসার ছাড়তে পারলুম কোথায়?' ভদ্রলোক কতখানি বুঝলেন জানি না, এখন মনে হয় যে, সংসার মানে দেহটার সঙ্গে সম্বন্ধ। যতক্ষণ দেহটার সঙ্গে সম্বন্ধ, দেহের প্রতি 'আমি-আমার'-বোধ, ততক্ষণ সংসার। সুতরাং সংসার ছেড়ে যাওয়া মানে বাড়ী থেকে চলে যাওয়া বা আত্মীয়দের কাছ থেকে দূরে থাকা নয়। সংসার বাড়ী বা আত্মীয়স্বজন মাত্র নয়—সংসার দেহটাও। দেহের প্রতি 'আমি-আমার'-বুদ্ধিটা তাই মানুষকে সংসারে বেঁধে রাখে। এই কথাটি তিনি সংক্ষেপে বললেন। তার আর বিস্তার ক'রে আলোচনা যে হ'ল, তা নয়। এই রকম টুকরো টুকরো কথা মাঝে মাঝে উঠতো। সেগুলি—তখন যদি বুদ্ধি থাকতো—টুকে রেখে দিতুম—সম্বল ক'রে। তা হ'লে বলবার জন্যে এখন ভাবতে হ'ত না, বলবার মতো অনেক জিনিস পাওয়া যেতো। তা তো করিনি! নির্বোধ বালক, মনে হয়েছে, এঁদের কথা লিখে রাখবো কি!—যখন ইচ্ছা শোনা যাবে তো! তা যে যায় না, ঐ সব কথা যে দুর্লভ হয়ে যাবে, সে কথা তখন ভাবিনি। ভাবনা মনে ওঠেনি, মনে হয়েছে এইরকম দিন চিরকাল থাকবে। কাজেই দেবার মতো, পরিবেশন করবার মতো কিছু সম্বল ক'রে রাখিনি।

তবে তাঁর ব্যবহার, তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব, তখনকার দিনে আমাদের কিশোর মনে পড়েছিল এবং আমাদের অন্তরকে অন্তত: কতকটা প্রভাবিত করেছে। তবে তা এখন ব্যাখ্যা ক'রে বলবার মত সামর্থ্য আমাদের নেই। তবু বলি আজ যে সন্ন্যাসজীবন লাভ হয়েছে, সে শ্রীশ্রীঠাকুরেরই কৃপায় এবং সেই কৃপা এসেছে তাঁদের মাধ্যমে—তাঁর পার্ষদদের, বিশেষ ক'রে, স্বামী সারদানন্দ মহারাজের মাধ্যমে। ঠাকুরের সাক্ষাৎ পার্ষদদের আরো অনেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্ক হয়েছে, কিন্তু এঁর সঙ্গে একটা বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল—যার কারণ আপনাদের আগেই ব'লে দিয়েছেন স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। কাজেই সেই বিশেষ সম্বন্ধের জন্যে তাঁর প্রভাব হয়তো একটু বেশী। তবে সেই কৃপার অনুভূতি হয়তো জীবনে আরও বেশী ক'রে হ'তে পারতো।

এর আগে যা বলেছিলুম ব্রহ্মচর্য নেওয়া সম্বন্ধে, তা উদ্বোধনে বেরিয়েছিল। যখন আমার ইচ্ছা হ'লো ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করবো, এসে তাঁর কাছে নিবেদন করলুম। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সম্মতি জানিয়ে বললেন, 'ব্রহ্মচর্য তো আমি দিই না; মহাপুরুষ মহারাজ মঠে আছেন, তিনি দেন, তাঁর কাছে বলতে হয়, মঠে যা, গিয়ে তাঁকে বল।' এই ব'লে তাঁর কাছে পাঠালেন।

ব্রহ্মচর্যব্রতের সংকল্পের কথা তাঁকেই জানিয়েছি—তিনিই ব্যবস্থা করবেন। করেছেনও তিনি। এইভাবে সন্ন্যাসজীবনের সূত্রপাত। এবং সেই আদর্শ সামনে ছিল ব'লে, যতই অযোগ্য হই, সেই অযোগ্যতার কথা বিচার না ক'রেই পড়েছে আমাদের উপর তাঁর কৃপা,—তাঁর মাধ্যমে ঠাকুরেরই কৃপা। এই কৃপার কথা কি বাইরে বলবার মতো যে বলবো! বলবার কিছু নেই, নিজের অনুভবের জিনিস, নিজের অন্তরের জিনিস, নিজের অন্তরে রাখবার জিনিস। ইচ্ছা থাকলেও বাইরে সাজিয়ে-গুছিয়ে বলা যায় না। এই জন্যে কিছু বলতে চাই না। বার বার বলেছি, আমাকে ছেড়ে দিন।

গতবারে যা বলেছি, পড়ে মনে হয়েছে—বাঃ! মোটামুটি বেশ তো গুছিয়ে বলেছি। এবার কিন্তু সব অগোছালো হয়ে যাচ্ছে। অগোছালো হয়ে যাচ্ছে এই জন্যে যে, যা বলবার তা তো বলেই দিয়েছি, নতুন ক'রে আর কী বলবো! সম্বন্ধ যা, ঘটনা যা—বলবার মতো—অল্পবিস্তর বলা হয়ে গেছে। তবু আজ বিশেষ দিনে তাঁকে স্মরণ করবার জন্যে, আপনারা এসেছেন, হয়তো উৎসবেও যোগ দিয়েছেন, আজকের স্মৃতিচারণ শুনতে সভাতেও যোগ দিয়েছেন। আপনারা স্মরণ করুন তাঁকে—যেমন আমি স্মরণ করি উদ্বোধনের ঐ ছোট ঘরটিতে তিনি ব'সে আছেন।

তিনি ছিলেন ধীর স্থির গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। ফলে অনেক সময়ে আমাদের অনেকে তাঁর কাছে এগুতে সংকোচ, সম্ভ্রম বোধ করতো। কিন্তু যখন তাঁর কতকটা ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসবার সাহস বা সুযোগ হয়েছে, তখন দেখেছি সেখানে ভয়ের কিছু নেই। কোন দোষ করলেও সেখানে ভয়ের কোন স্থান নেই—আছে অজস্র ক্ষমা, সে-ক্ষমার তুলনা হয় না। একটি ঘটনার কথা বলি। তখন আমি মঠে আছি—বেলুড় মঠে। একজন সাধু এমন এক গর্হিত কাজ করেছেন যে, প্রাচীন সাধুরা এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তখনই তাঁকে মঠ থেকে বের ক'রে দেওয়া উচিত। তখন মহাপুরুষ মহারাজ মঠের অধ্যক্ষ। তিনি অনুপস্থিত। সুতরাং একজন সাধু সেই সাধুটিকে নিয়ে উদ্বোধনে এলেন, মহারাজের কাছে বলতে—'এই ব্যক্তি এই গর্হিত আচরণ করেছে, সুতরাং একে মঠ থেকে বহিষ্কার করা হোক, এই আমাদের সিদ্ধান্ত। আপনি অনুমতি দিন।' মহারাজ কী বললেন? বললেন--'সত্য বলছ, ঠিক কথা—সাধুর পক্ষে এই গর্হিত আচরণ নিতান্ত অশোভন এবং এই গর্হিত কাজ এর জীবনে এই প্রথম নয়, তাও জানি। তবু আমার অনুরোধ তোমরা একে আরও একবার সুযোগ দাও।' মহারাজ মঠের সম্পাদক। তাঁর কথাই সিদ্ধান্ত—চরম সিদ্ধান্ত। তবু তিনি বলছেন, 'আমার অনুরোধ'—'আমার অনুরোধ তোমরা একে আরও একবার সুযোগ দাও।' আশ্চর্য ব্যাপার!

আমাদের তখন অল্প বয়স। প্রকৃতির মধ্যে ঔদ্ধত্য আছে। মানুষের যে দুর্বলতা, তার প্রতি সহানুভূতির দৃষ্টি নেই। আমরা উত্তেজিত হয়ে ভাবছিলুম, সাধুটিকে বিদায় ক'রে দেওয়া হোক, কিন্তু মহারাজের মনে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিক্রিয়া! 'আমার অনুরোধ তোমরা একে আরও একবার সুযোগ দাও।' 'একবার' বললেন বটে, কিন্তু তাঁর কাছে 'একবার' 'প্রত্যেকবার' হবে। কোন দুর্বলতা এমন নয়, কোন আচরণই এমন গর্হিত নয়, যা তাঁর ক্ষমার অযোগ্য। এ আমরা দেখেছি। বার বার দেখেছি, তাই বলি যে, এমন মানুষকে কেউ ভয় করে! যিনি মানুষের সমস্ত অপরাধকে ক্ষমা করেন, তাঁর কাছে ভয় কিসের! কাজেই আর কোন ভয় থাকতো না। সম্ভ্রম একটু যে ছিল না, তা নয়। ছিল। কিন্তু জানতুম, তাঁর কাছে ভয়ের কোন স্থান নেই।

এর আগের বারেও বলেছি, কতকগুলি পাগল তাঁর আশ্রয়ে ছিল। সকলেই তাদের অবজ্ঞার চোখে দেখতো। কিন্তু তারা মহারাজের স্নেহ থেকে কখনো বঞ্চিত হ'ত না। আগের বারে বলেছি—একটি বুড়ী এই পাগলদের অন্যতম। মহারাজ দেখছেন যে, সে ক'দিন ধ'রে খাচ্ছে না। বলছেন, 'ওরে, বুড়ী ক'দিন ধ'রে খাচ্ছে না, ওর বুঝি বাই চড়েছে—ওকে একটু ওষুধ এনে দে।'

কত রকমের পাগল সব! পাগলামিতে আবার যাকে বলে, 'There is a method in madness'—তা'ও আছে! একজন মাথায় পাগড়ী বেঁধে লাঠি হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতো, বলতো, 'মহারাজের দরোয়ান'। এক এক জন এক এক রকম। এই তো গেল উন্মাদদের কথা। অর্ধোন্মাদও কম ছিল না। কেউ ছিল দাম্ভিক, কেউ ছিল বিদ্যার অভিমানী, কেউ ছিল অন্যরকমের। কতকগুলি এমন ছিল, যাদের আচরণ অপরের কাছে অসহনীয় ছিল। তারা যখন অনুযোগ করতো, 'আপনি এই সব লোককে স্থান দিয়েছেন, এদের এখানে থাকবার যোগ্যতা আছে?' তিনি বলতেন, 'হ্যাঁ বাপু জানি, জানি এদের এখানে স্থান না দিলে আর কোথাও স্থান হবে না। তাই তো এদের রেখেছি। আমি যদি না রাখি, এরা কোথায় যাবে!' তাঁর কাছে তাদের স্থান ঠিক আছে। কোন সংশয় নেই, কোন আশঙ্কা নেই যে, তারা তাঁর আশ্রয় হারাবে। এইজন্যে মধ্যে মধ্যে অনুযোগ শুনতে হয়েছে, তবু তাঁর স্নেহ কখনো কুণ্ঠিত হয়নি। সকলের উপর অফুরন্ত ভালবাসা—তাদের দোষ জেনেও। দোষ-গুণ বিচার ক'রে তিনি স্নেহ করতেন না—মায়ের সম্বন্ধে ঐ যেমন বলা হয়েছে, 'অহেতুনা নো দয়সে সদোষান্'—হাজার দোষে দোষী হলেও তুমি বিনা কারণে আমাদের উপর দয়া করো—মায়ের প্রতিনিধি মহারাজের সম্বন্ধেও সেকথা বলা যায়। মহারাজ সকলের প্রতি অহেতুক স্নেহপরায়ণ ছিলেন। সে-স্নেহ অবারিত—সর্বত্র অবিরত বর্ষিত হ'ত। কেউ তা থেকে বঞ্চিত হ'ত না। ভাল-মন্দ সবাই সমভাবে তার ভাগ পেতো। এটি দেখার জিনিস। যারা দেখেছে, যে-কেউ দেখেছে, অভিভূত হয়েছে। কখনো কখনো বিরক্তও হয়েছে। আমাদেরও মনে হয়েছে, মহারাজ কি ক'রে সকলকে, আমাদের দৃষ্টিতে যাকে বলে প্রশ্রয় দেওয়া, সেই প্রশ্রয় দেন। কিন্তু মহারাজ ভাবতেন, 'আমি যদি এদের না রাখি, এরা কোথায় যাবে।' তিনি জানতেন, তাদের আর অন্য কোথাও জায়গা নেই। কাজেই তিনি মায়ের মত ক্ষমাশীল ও স্নেহশীল হয়ে চিরকাল তাদের লালন করেছেন! আমরা মঠে ঠাট্টা ক'রে, পরিহাসছলে বলতুম—'উদ্বোধন পাগলের আড্ডা।' কিন্তু সেই পাগলদের যিনি আশ্রয় দিয়েছেন, লালনপালন করেছেন, তিনি যে কত বড় নীলকণ্ঠ, তা কি আমরা তখন বুঝেছি, না বোঝবার চেষ্টা করেছি!

কত রকমের আক্রোশ, কত রকমের অপমান তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে, এই সব পোষ্যদেরই কাছ থেকে। একবার একজনের কাছে তিনি হিসেব চেয়েছেন। তিনি বললেন, 'আপনি হিসেবের কি বোঝেন?' মহারাজ বেশী কিছু বললেন না। শুধু বললেন, 'ওরে, অতোটা ভাল নয়।' খুব শান্তভাবে বললেন, রাগ ক'রে নয়—'ওরে অতোটা ভাল নয়।' তাঁর কাছে সমস্ত অপরাধ ক্ষমার যোগ্য হ'লেও অপরের কাছে তো হবে না! ফলে তারই হানি হবে, অকল্যাণ হবে, এই ভেবে বললেন, 'ওরে অতোটা ভাল নয়'।

গুণ এতটুকুও দেখলে তাকে অনেকগুণ বাড়িয়ে দেখা এবং দোষ খুব বড় হ'লেও তুচ্ছ ক'রে দেখা—এইটি ছিল তাঁর মহান হৃদয়ের বৈশিষ্ট্য। এই মহান হৃদয় যদি না থাকতো, তা হ'লে ঠাকুরের এই সঙ্ঘ যেভাবে বিকাশ লাভ করেছে, তা কি করতো? এই জন্যে ঠাকুর যোগ্য ব্যক্তির উপর এত গুরুভার দিয়েছিলেন। কথায় আছে, ঠাকুর একবার শরৎ মহারাজের কোলে বসেছিলেন। তারপর বলেছিলেন—

'দেখলুম ও কতটা ভার সইতে পারবে।' ভার তিনি প্রচুর সইতে পারতেন। চিরকাল ভার সয়েছেন শেষ পর্যন্ত। কখনো বিরক্তি নেই, ওজর আপত্তি নেই। ঠাকুর ভার দিয়েছেন, সুতরাং সে-ভার বহন করতেই হবে। এবং এখন ইতিহাস বলবে কতটা যোগ্যতার সঙ্গে তিনি সে-ভার বহন করেছিলেন। যোগ্য হস্তে সঙ্ঘের পরিচালনার ভার ছিল, তাই না আমরা তাঁর আশ্রয়ে আসতে পেরেছি। যদি দোষ-গুণ বিচার ক'রে আমাদের স্থান দেওয়া না দেওয়ার প্রশ্নের নিষ্পত্তি হত, তা হ'লে আমরা কোথায় থাকতুম! আমরা কেউ একেবারে শুদ্ধ নিষ্পাপ নির্দোষ হয়ে আসিনি। এসেছি দোষগুণযুক্ত-রূপে। এবং তিনি আমাদের মনের সমস্ত আবর্জনা, সমস্ত মলিনতা নিজ হাতে মুছে দিতে সদাই তৎপর ছিলেন। তা না হ'লে আমাদের কি গতি হ'ত! তাঁর কৃপায় তাঁর পদাশ্রয়ে থেকে আমরা এবং আমাদের মতো অসংখ্য লোক বেঁচে গেছে, জীবনে একটা অবলম্বন পেয়েছে, এ জিনিস কি আর ভাষা দিয়ে, ঘটনা দিয়ে বুঝিয়ে বলা যায়! অনুভবের বস্তু! অন্তরের অন্তরে আস্বাদন করার জিনিস! জীবনে-জীবনে এর প্রতিষ্ঠা! প্রাণে-প্রাণে এর অনুভূতি! যা খুব গভীর, তা ভাষায় বলা মুশকিল।

একজনের ঘটনা বলছি। মহারাজ তাঁর খুব প্রশংসা করেছেন, তাঁর সাধনের প্রশংসা করেছেন, তাঁর বৈরাগ্যের প্রশংসা করেছেন, কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁর জীবনে তাঁর পদস্খলন, তাঁর অধোগতি দেখে কেউ কেউ বলতেন, 'এত প্রশংসা পেলে তবু এরকম হলো!' এখন বুঝি প্রশংসা কেবল সে-ব্যক্তির বর্তমান দেখে নয়, তাঁর অতীতকে দেখে, তাঁর ভবিষ্যৎকে দেখে। কারণ আমরাই তো পরে দেখলুম, সেই ব্যক্তির চোখ দিয়ে অনুতাপের অশ্রুধারা ঝরেছে। তাতেই কি তাঁর সব দোষ ধুয়ে যায়নি! সেই দেখেই কি মহারাজ তাঁর প্রশংসা করেননি—তাঁকে স্থান দেননি!

আমরা খুব ভুল করি, মানুষকে তার এক মুহূর্তের জীবন দেখে বিচার ক'রে। আমরা তো বুঝি না দূরদৃষ্টি দিয়ে তাকে দেখতে হ'বে, তার বর্তমান, তার অতীত, তার ভবিষ্যৎ—সবটাই—দেখতে হবে। কাজেই আমরা ভুল করি। আমাদের সিদ্ধান্তে ভুল হয়। মহাপুরুষদের দৃষ্টি এই রকম সীমিত নয়, কেবলই বর্তমানে নিবদ্ধ নয়—তাঁরা অতীত দেখেন, বর্তমান দেখেন, ভবিষ্যৎ-ও দেখেন। যার ভিতরে বিরাট সম্ভাবনা দেখতে পান, তার প্রশংসা করেন। আমরা অনেক সময় ভাবি, অমুক ব্যক্তি মহারাজের আশীর্বাদ পেয়েছেন, কিন্তু কই তার ফল তো দেখা যাচ্ছে না। এর কারণ আমরা খুব অল্পতে ধৈর্য হারাই। তাঁর আশীর্বাদ অমোঘ। সে-আশীর্বাদ যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের জীবন নিষ্ফল হবে না, এ আমাদের বিশ্বাস, তবে সে-আশীর্বাদ অনুভব করবার মত সময় কবে আসবে, তা অবশ্য কেউ বলতে পারে না। কারু কাছে আগে, কারু কাছে পরে, তাতে কি আসে যায়! স্পর্শমণি ছুঁলে লোহা সোনা হয়—তার আকার যাই হোক না কেন। হোক না তার তলোয়ারের আকার, সে সোনা হবেই। তেমনি যাঁরা তাঁর পদপ্রান্তে এসেছেন, যাঁরা তাঁর আশীর্বাদ জীবনে লাভ করেছেন, সে-আশীর্বাদ কথনো বৃথা হবে না সে-আশীর্বাদ অমোঘ।

আর যাঁরা তাঁর পদপ্রান্তে এসে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করার তেমন সুযোগ পাননি, তাঁরাও যদি এখন তাঁর পূত চরিত্রের কথা স্মরণ করেন, তাঁর মহান ব্যক্তিত্বের অনুধ্যান করেন,

তাঁদের সেই চেষ্টাও নিষ্ফল হবে না। কারণ, অবতার আর অবতারের পার্ষদদের জীবন ভিন্ন নয়—একই বস্তু। যেমন ঠাকুর বলতেন, 'কলমির দল'। সবটা নিয়ে কলমির দল। অবতার আসেন তাঁর পার্ষদদের নিয়ে, পার্ষদরা থাকেন অবতারের সঙ্গে নিত্যসংবদ্ধ হয়ে। কাজেই মহারাজের আশীর্বাদ ঠাকুরেরই আশীর্বাদ ব'লে মনে রাখতে হবে। তাঁর কৃপা ঠাকুরেরই কৃপা। যেমন বাইবেলে আছে, 'He who has seen the son, has seen the Father'—যিনি সন্তানকে দেখেছেন, তিনি পিতাকেও দেখেছেন। যারা এই সব শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের দেখেছেন, তাঁদের কৃপা লাভ করেছেন, তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণেরই কৃপা লাভ করেছেন—তাঁদের মাধ্যমে সেই এক শ্রীরামকৃষ্ণেরই কৃপা সর্বত্র বর্ষিত হচ্ছে।

স্বামী শিবানন্দজীকে একজন ভক্ত জিজ্ঞেস করেছিলেন, "মহারাজের (ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে সবাই 'মহারাজ' বলতেন) কাছেই দীক্ষা নেব, না মায়ের কাছে নেব ?" সঙ্গে সঙ্গে মহাপুরুষ মহারাজের স্বভাবসুলভ সরল উত্তর: 'একই কথা—দু-নল দিয়ে একই গঙ্গার জল আসছে।' শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদরা যেন এক একটি নল, এক একটি মাধ্যম। তার ভেতর দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণেরই কৃপা বর্ষিত হচ্ছে আমরা বুঝি আর না বুঝি, যাঁরা এই কৃপা পেয়েছেন, তা অবশ্যই সার্থক হবে তাঁদের জীবনে। আমরা এখন না বুঝলেও ভবিষ্যতে বুঝবো। মায়ের একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। একজন জিজ্ঞেস করছেন—'মা, আমরা তো বুঝতে পারছি না, জীবনে এগুচ্ছি কি না।' তিনি মায়ের পদ-প্রান্তে এসেছেন, কিন্তু বুঝতে পারছেন না, ধর্মজীবনে অগ্রগতি হচ্ছে, কি হচ্ছে না। মা গ্রামের মেয়ে, লেখাপড়া-জানা মেয়ে নন। বাক্‌চাতুর্য তাঁর নেই। তিনি বললেন, 'বাছা, তুমি যদি ঘুমিয়ে থাক, আর খাটসুদ্ধ যদি কেউ এগিয়ে নিয়ে যায়, তুমি কি টের পাও ?' কাজেই আমরা বুঝতে পারি আর না পারি--তাঁর কৃপায় জীবনে আধ্যাত্মিক উন্নতি হবেই—হচ্ছেই। চোখ থাকলে আমরা এখনই তা বোধ করতে পারতুম।

তাঁর কৃপা অমোঘ। এই বিশ্বাস সর্বদা ধ'রে রাখতে হয় যে, তাঁর কৃপায় তাঁর পদপ্রান্তে, যা আমাদের জীবনের লক্ষ্য, আমরা পৌছতে পারবো। শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা যাঁরা সাক্ষাৎ ভাবে পেয়েছেন আর যাঁরা পেয়েছেন তাঁর পার্ষদদের মাধ্যমে তাঁরা সকলেই ধন্য হবেন, তাঁদের সকলেরই জীবন সার্থক হবে। এই ভরসা নিয়ে ব'সে আছি এবং প্রার্থনা করি, এই জীবনে তা অনুভবের গোচর হোক, তাঁর কৃপায়। এই জীবনে সে-অনুভূতি জীবনকে সার্থক ক'রে দিক, এবং অন্তে তাঁর শ্রীচরণে আমাদের এই আধ্যাত্মিক পথযাত্রার পরিসমাপ্তি হোক।

'কর্মপর হওয়া ভাল। কিন্তু তা কতকগুলি শর্তের উপর নির্ভরশীল। স্বাস্থ্য ভাল হওয়া দরকার আর সহকর্মীদের সঙ্গে মিলেমিশে চলতেও পারা চাই। ধর, তোমার একটি অঙ্গ যদি নষ্ট হয়, তখন কাজ করা খুবই কঠিন হবে। সুতরাং পড়াশুনার অভ্যাসও রাখতে বলছি। কিন্তু তাও যথেষ্ট নয়। মনে কর কেউ অন্ধ হয়ে গেল। সেজন্য ধ্যানের অভ্যাসও রাখা ভাল। যখন কাজ বা পড়াশুনা করা সম্ভব হবে না, তখন ধ্যান করতে পারবে।'

—স্বামী সারদানন্দ

বিজ্ঞানী ও ভক্ত

শ্রীদিলীপকুমার রায়

বিজ্ঞানবিৎ বলে হাল্কা হেসে :
"তোমরা সাধু ভিক্ষে ক'রে খাও,
জানি না এক অনামীর উদ্দেশে
উধাও হ'য়ে কী সম্বল পাও।
কী সব ধন দিয়ে ভরো হায় তোমাদের ঝুলি
পাই না ভেবে—প্রমাণ বিনা সবই ফাঁকা বুলি।"

ভক্ত বলে করজোড়ে হেসে :
"এমন কথা বলে ? যা পেয়েছি
প্রাপ্তিই তার প্রমাণ। ভালোবেসে
যে তাঁকে পায়, গায় : তাঁকে জেনেছি,
তাই বুক আমার দিলেন ভ'রে ঠাকুর সুরে তাঁর,
যেই পাতি কান শুনি তাঁরি মুরলীঝঙ্কার।

"যে শোনে সে সুর সে কি চায় আর
প্রমাণ শোনার ? কেউ কি দেখার পরে
সন্দেহকে পোষে মর্মে তার ?
রূপ দেখে যে, সুর শোনে অন্তরে
তার মনপ্রাণ চায় কি প্রমাণ আর কিছু সন্ধানে ?
যে দেখে নি শোনে নি সেই সংশয়কে মানে।"

বিজ্ঞানবিৎ বলে : "রাখো রাখো
এসব ভুয়ো সেন্টিমেণ্টালিটি।
সোনার-হরিণ-মায়া—জাগো জাগো
জ্ঞানে কর্মে উদ্যমে, লক্ষ্মীটি !
দেখ দেশের দুর্দশা—আর স্বপ্নবিলাস নয়।
বিজ্ঞান-বল-প্রতিভাতেই হবে দিগ্বিজয়।"

ভক্ত বলে সবিনয়ে : "ঠাকুর !
সবাই কি সব পারে ? দিগ্বিজয়
করতে পারে সে-ই—যে পায় গুরুর
চাপরাস, সে-ই বীর নেই যার ভয়।
নই আমরা বীর, গুরুকে তাই তো প্রণাম ক'রে
চাই পারাতে ভবসিন্ধু তাঁর দীক্ষার জোরে।"

বিজ্ঞানবিৎ ব্যঙ্গ হেসে বলে :
"এই তামসিক দীক্ষায়ই হায় হায়
ডুবল এ-দেশ ! শুধু চোখের জলে
নিয়তির বিধান কি কাটা যায় ?
চল্ আগে বিজ্ঞানবিমানে—নয় আর গুরুবাদ,
বিজ্ঞানই আজ যুগাবতার—তুঙ্গ অপ্রমাদ।
"বলি শোনো : নিউটন বৈজ্ঞানিক
বাগানে তাঁর ছিলেন একা ব'সে
(সবাই তাঁকে মানত জ্ঞানের মানিক)
হঠাৎ একটি আপেল পড়ল খ'সে
সাম্‌নের এক গাছ থেকে টুপ্ ক'রে—অমনি তাঁর
মন জপ্‌ল : পেতেই হবে এ-হেঁয়ালির পার,
"না জানলে নয়—এ-আপেলটি কেন
আকাশপানে না লাফিয়ে উঠে
মূর্ছা গেল নিচুদিকে—যেন
গাছকে প্রণাম করতে ভূঁয়ে লুটে ?
একটা কোনো টানে ও যে নামল এ নিশ্চয় :
পেতেই হবে আমাকে সে-টানের পরিচয়।
"ভাবো সাধু একবারটি ভাবো :
পড়লে আপেল আমরা শুধু ভাবি
একটি কথা—ফলটি কখন খাবো,
নিউটন খুঁজলেন—কোথায় এর চাবি
এ-হেঁয়ালির—এ-টান কিসের, এল এ কোত্থেকে...
ভাবতে ভাবতে মাধ্যাকর্ষণ আলোর সূত্র জেগে

উঠল জ্ঞানীর মনে—প্রণাম তাঁকে
বিন্দুবুকে সিন্ধুর ওঙ্কার
শোনেন যিনি ধ্যানের অনুরাগে,
কণার মধ্যে করেন আবিষ্কার
বিশ্ববিধান, নন কি তিনি মহান্ নরোত্তম—
গতির বুকে দেখেন যিনি অলঙ্ঘ্য নিয়ম ?"

বলে ভক্ত : "প্রণাম একশোবার।
এ-অশান্ত বিশ্বে নিয়ম-বাণী
করেছিলেন যে-পণ্ডিত প্রচার
কে না তাঁকে মানবে মহামানী ?
বিজ্ঞানও যে বিধাতার এক বিভূতি মহান্
কে না স্বীকার করবে ? বিনা জ্ঞান কি জাগে প্রাণ ?

"বিজ্ঞানেরি প্রসাদ পেয়ে জীব
ধন্য হ'ল কতদিকে আজ!
অন্ধকারে জ্বালল আশার দীপ,
সর্বহারাও পরল মাথায় তাজ!
বিজ্ঞানী ক্লান্তকে আরাম, ভ্রান্তকে সন্ধান
দিয়েছে তথ্যের যত—তার কোথায় পরিমাণ ?

"কিন্তু দেবের দূত তো একটি নয় ঃ
কাব্য শিল্প স্থাপত্য দর্শন
গায় সেই একই প্রজাপতির জয়
করে তাঁরই কীর্তির বন্দন।
এ-অফুরান স্তব শোনে নি যে—নেই কান তার,
ধূলায়ও যায় শোনা তাঁরি আনন্দঝঙ্কার।

"তাই শুধু বিজ্ঞানের জ্যোতিই নয়,
সন্তরাও তাঁকে বেসে ভালো
তাঁরি ধ্যানে তাঁর পেয়ে আশ্রয়
জ্বালেন প্রাণে তাঁরি বাঁশির আলো।
এই আলো যে অন্তরে তার জানে চিরন্তন
বাইরেও সে শোনে তাঁরি মুরলীমূর্ছন।"

হাসে বৈজ্ঞানিক : "এ বালভাষ,
বাঁশির আলো…ধুলায় কীর্তন…
শুধু কথার ফুলঝুরি-উচ্ছ্বাস
এক অনামীর কল্পনা-জল্পন।
নেই যিনি হায় মানি তাঁকে কেমন ক'রে বলো ?
তোমরা অন্ধ ভাববিলাসী, তাই নিজেকে ছলো।
"এ-সংসারে যেদিকে চাই—পাই
দেখা শুধু দুঃখ ব্যথার রোজ,
চিন্তাই সব চেয়ে বড়, ভাই,
ভেবে কে পায় দুঃখহারীর খোঁজ ?
মগজই নিয়ন্তা প্রাণের, জানতে যদি হয়
যুক্তিপথেই মিলবে মুক্তি—অন্য পথে নয়।"

"কী বলি হায় ?" বলেন ভক্ত হেসে,
"এই ছাড়া যে আমরা অন্ধ না,
যাত্রাও করি না নিরুদ্দেশে
নেই-যে তারি করতে বন্দনা।
রোগশোকতাপ দারুণ অগ্নিপরীক্ষা—এও মানি :
বলব কেবল—জয় করা যায় ব্যথাও তাঁকে জানি'।
"ছেড়েছিলেন ঘর গুরু আমার
ব্রজরাজের মোহন বাঁশির ডাকে
তাঁর চরণে শরণ চেয়ে তাঁর
পেলেন কৃপা ঘরছাড়া বৈরাগে
যার প্রসাদে অহঙ্কারের মায়ার হ'লে লয়
গাইলেন আনন্দে গুরু : জয় শ্যামলের জয়।
"একদা এক জ্ঞানীর দ্বারে গিয়ে
যেই পেতেছেন হাত—সে মহাবলী
দণ্ড হাতে উঠলেন গর্জিয়ে :
'দূর হ অকর্মণ্য। চোখের জলই
ভাঙিয়ে যে খায় ভিক্ষা ক'রে, নেই লজ্জা তোর ?
আমরা মহান বিজ্ঞানী, তুই ভণ্ড, জুয়াচোর।'

"ঘুরিয়ে দণ্ড তিনি চণ্ড বলে
করলেন ঘোর আঘাত তাঁর মাথায়
গুরু গেলেন মূর্ছা ধরাতলে,
ভিড় ঠেলে এক গৃহিণী ত্বরায়
মূর্ছিত সন্তকে নিয়ে গিয়ে নিজের ঘরে
রাখলেন শয্যায় সাদরে। মূর্ছা ভাঙার পরে
"চোখ মেলতেই গুরু, প্রণাম ক'রে
তাঁর মুখে দুধ ঢেলে সতী তাঁকে
করলেন এই প্রশ্ন কোমল স্বরে :
'জানেন সেবা করছে কে আপনাকে ?'
'জানি জানি মা', বললেন গুরু স্নিগ্ধ হেসে,
'মেরেছিল যে সেই সেবা করছে ভালোবেসে।' "

"শুনুন বলি," বলেন বৈজ্ঞানিক
"রাগে যে জ্ঞান হারায় নয় স্বাধীন,
আসল বিজ্ঞানের পথের পথিক
বিজ্ঞানী নির্লিপ্ত, উদাসীন
স্বভাবে সহিষ্ণু—করেন কেবল আহরণ
গতির খবর জ্ঞানের আলোয়, করি' বিশ্লেষণ।"

বলেন ভক্ত : "আপনারা জীবনে
জ্ঞানেরি চান খবর মহাবলী
এ-ও তো তাঁর ইচ্ছারি বরণে
(তিনি চালান বলেই আমরা চলি)
তাই জগতের গতির মাঝে করলেন আবিষ্কার—
বাঁধা সবাই তাঁর নিয়মে: যিনি মনের পার।
"সাবাস! নিয়ম করলেন আবিষ্কার
যার লাগামে বাঁধা সবাই ধায়,
শক্তি মেনে হাঁকলেন : নেই আর
শক্তিনায়ক বিধবা ধরায়।
আছে কেবল রথ আগুনের, নেই সারথি আর
আছে অন্ধ জ্যোতির ঘোড়া—নেই ঘোড়সোয়ার।

"চলেন কেবল গণক মনের বনে,
মন ডিঙিয়ে চলতে পারেন না যে,
বিশ্লেষণের প্রবুদ্ধ গর্জনে
করেন চ্যালেঞ্জ : 'মন ছাড়া কে আছে
দিতে দিশা করতে সৃজন, ভাবতে প্রতিপদে :
সফলসাধন কেমন ক'রে হব চিন্তা-ব্রতে।'

"আমরা চলি অন্য পথে—সে-ও
তাঁর আদেশেই, তাই তাঁর বিধানে
রোগশোকতাপ পুলক আঘাত স্নেহ
সব কিছুরি মধ্যে খুঁজি প্রাণে
নিয়ম রেখে সব আগে সেই প্রেমল নিয়ন্তাকে
সাড়া যিনি দেন জীবনে সরল প্রেমের ডাকে।

"যাঁর ডাকে হয় কালো আলো পলে
হয় মীরা রাজরাণী ভিখারিণী,
নিশার বুকেও উষার আশিস ঝলে
জীবনকেও মরণ দিয়ে কিনি,
যুগ যুগান্ত যে শ্রীকান্ত প্রেমের ইন্দ্রজালে
সাধেন রূপান্তর চেতনার থেকে অন্তরালে।

"এ নয় কথার কথা কি কল্পনা
ডাক শোনে যে ঘরছাড়া বাঁশির
তার কাছে ঘর হয় মনে জল্পনা—
কেবল মায়ার ক্ষণায়ু মঞ্জীর :
যে সুখে প্রাণ সুখ পেত তার বাঁশি শোনার আগে
হয় মনে হায় ব্যঙ্গ হাসি তৃষার্ত বৈরাগে।

"বৈরাগীরা গায় না ব্যথার জয়,
আনন্দবিকাশের এজাহারে
এ-সত্যের মিলবে পরিচয়
প্রতি পাতায় প্রাণেরি ঝঙ্কারে :
'গভীর সুখের পরে হাল্কা বিলাস আসে যেই,
দেখি শুধু মুখের মুখোষ, চোখের চাউনি নেই।'

"তাই তো যুগে যুগে শ্রান্তিহীন
ঢেউয়ের মতন আসে বাঁশির সুর:
'নয় নয় সে অচিন্ত্য অচিন
তার প্রসাদেই মরুও হয় মধুর,
ফুলের বাগান গানের কোকিল প্রেমের মোহন কায়া
তার আলোতেই ভুবন আলো সে বিনা সব মায়া।' "

আসে রথ, তব আবাহনে

অধ্যাপক শ্রীশিবশম্ভু সরকার

তোমারে স্মরণ করি পুণ্য-স্তব্ধ ব্যথাতুর মনে—
অতীতের কত কথা পল্লবিত মুগ্ধ গুঞ্জরণে—
ভেসে আসে স্মৃতির চয়নে। ভাবি তাই ক্ষণে ক্ষণে
যত কথা শুনেছি শ্রবণে—ধরে তবু রাখি নাই মনে—
ওই তারা আসে ফিরে ফিরে! কভু বিদ্যুৎ-চমকে
হারানো আলাপচারী কথা কয় প্রীতির পুলকে!
তোমার বিনম্র ভাষা—অন্তরের শুভ কামনায়
কাছে টানে আত্মজনে—দেবাশিস মাধুরী মাখায়!

সাধুর আশ্রয় শুধু নয়—ও-আশ্রম দেবতাসংসদ।
অ-জ্যোতিরে জ্যোতি হানে—চলেছে অচল কত রথ।
প্রাণময় বেদমন্ত্রে ক্ষুদ্র যেথা হোয়েছে মহৎ—
তুমি তারি বহ্নি-স্পর্শী আদর্শের ফলিত শপথ!
গুরুর করুণা-দীপে প্রজ্বলিত প্রশান্ত জীবনে—
রামকৃষ্ণ-প্রেম ক্ষরে—আসে রথ, তব আবাহনে।

দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়

ডক্টর রমা চৌধুরী

(সপ্তম পর্যায়)

বিষ্ণুস্বামীর 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ'

[পূর্বানুবৃত্তি]

বিষ্ণুস্বামীর মতবাদ সম্বন্ধে যৎসামান্ত উল্লেখ আমরা পেয়েছি আরেকটি স্থানে, অর্থাৎ, শুদ্ধা-দ্বৈতবাদী আচার্য শ্রীধরস্বামী বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতটীকা 'ভাবার্থদীপিকা'তে, যথা—

'তদনেন শ্লোকত্রয়েণ শ্রীভাগবতার্থঃ সংক্ষেপেণ প্রদর্শিতঃ। এতদুক্তং ভবতি—বিদ্যাশক্ত্যা মায়ানিয়ন্তা নিত্যাবির্ভূত-পরমানন্দস্বরূপঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তীশ্বরঃ তন্মায়য়া সম্মোহিতস্তিরোভূতস্বরূপ-স্তদ্‌বিপরীতধর্মা জীবঃ তস্য চেশ্বরস্য ভক্ত্যা লব্ধজ্ঞানেন মোক্ষঃ ইতি।

'তদুক্তং বিষ্ণুস্বামিনা—

'হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥

তথা—

স ঈশো যদ্‌বশে মায়া স জীবো যস্তয়ার্দিতঃ।
স্বাবির্ভূতপরানন্দঃ স্বাবির্ভূতসুখদুঃখভূঃ॥
স্বাদৃগুত্থবিপর্যাস-ভবভেদজভীশুচঃ।
যন্মায়য়া জুষন্নাস্তে তমিমং নৃহরিং নুমঃ॥'

(ভাবার্থদীপিকা, ১।৭।৬)

অর্থাৎ 'এই তিনটি শ্লোকে শ্রীভাগবতের অন্ত-র্নিহিত অর্থ সংক্ষেপে প্রদর্শিত হচ্ছে। এস্থলে, এই কথাই বলা হচ্ছে যে, ঈশ্বর বিদ্যাশক্তির দ্বারা মায়ানিয়ন্তা, নিত্যাবির্ভূত-পরমানন্দস্বরূপ, সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান। সেই মায়ার দ্বারা সম্মোহিত জীব তিরোহিত-স্বরূপ এবং ঈশ্বরের বিপরীত ধর্মবিশিষ্ট। ঈশ্বরভক্তির দ্বারা লব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে মোক্ষলাভ হয়।

'এই প্রসঙ্গে শ্রীবিষ্ণুস্বামী বলছেন—

'হ্লাদিনীশক্তিবিশিষ্ট পূর্ণজ্ঞানাধার
সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরম ঈশ্বর।
অবিদ্যায় সমাচ্ছন্ন (শোকমোহগ্রস্ত)
জীবগণ বহুতর ক্লেশের আকর।
ভগবান নিজগুণে মায়াবশকারী,
জীবগণ নিজদোষে মায়াপরাজিত।
ভগবান স্বাবির্ভূত-পরম-আনন্দ,
জীবগণ স্বাবির্ভূত-সুখদুঃখজিত।
স্বরূপের অজ্ঞানেতে হয় বিপর্যয়—
'আমি' ও 'আমার' জ্ঞান দেহাদিতে হয়।
তা থেকে অশেষ দুঃখ আর হয় ভয়—
এইসব ভয়-শোক ভোগে জীবচয়।
যাঁহার মায়ায় মুগ্ধ জীবের এ গতি,
মোরা সবে করি সেই নৃহরির স্তুতি।'

এই বিবরণী থেকে বিষ্ণুস্বামীর মতবাদ সম্বন্ধে এই তথ্যই জানা যায় যে, তাঁর উপাস্য দেবতা ছিলেন নৃহরি বা নৃসিংহ, যাঁকে তিনি 'ব্রহ্ম'রূপে গ্রহণ করেছিলেন। নৃহরি হ্লাদিনী ও সংবিৎ শক্তির দ্বারা আপ্লুত ব'লে সৎ-চিৎ-ও আনন্দ-স্বরূপ ঈশ্বর। জীব ঠিক তাঁর বিপরীত, কারণ জীব স্বীয় অবিদ্যা দ্বারা আবৃত ব'লে সমস্ত দুঃখক্লেশাধার। এরূপে ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে মূলীভূত প্রভেদ হ'ল এই যে, ঈশ্বর মায়াকে বশীভূত ক'রে হয়েছেন মায়াধীশ; জীব মায়ার দ্বারা বশীভূত হয়ে হয়েছে মায়াধীন। সেজন্যই জীব 'স্বাদৃগুত্থবিপর্যাস-ভবভেদজভীশুচঃ জুষন্‌ আস্তে'—যার সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন স্বয়ং শ্রীজীবগোস্বামী তাঁর 'ক্রমসন্দর্ভে' এইভাবে :

'তত্র স্বাদৃগুত্থেতি—স্বাদৃক্ স্বাজ্ঞানং তেনোত্থিতঃ যো বিপর্যাসঃ স্বরূপান্যথাজ্ঞানং তদ্ভবো যো ভেদঃ, ভিন্নে দেহদাবহংমমতারূপঃ, তস্মাজ্জাতা যা ভীঃ শুচশ্চ তা জুষমাণ আস্তে ইত্যর্থঃ।' (১।৭।৬)। অর্থাৎ, জীবের নিজের যে অজ্ঞান, তা থেকে উত্থিত যে 'বিপর্যাস' বা স্বরূপের অন্যথাজ্ঞান, তা থেকে উদ্ভূত যে 'ভেদ', অথবা আত্মা থেকে ভিন্ন দেহাদিতে অহং-মমত্ববোধ, তা থেকে জাত যে 'ভয়' ও 'শোক'—তাদের সেবা করেই অর্থাৎ এই পঞ্চক্লেশের ভাগী হয়েই জীব বর্তমান থাকে। এ সবই শ্রীভগবান শ্রীনৃসিংহের মায়ার দ্বারা ঘটে থাকে।

শ্রীধরস্বামী 'ভাবার্থদীপিকা'র অন্যত্রও বিষ্ণুস্বামিপ্রোক্ত 'পঞ্চক্লেশে'র কথা বলেছেন। যথা, "শ্রীবিষ্ণুস্বামিপ্রোক্তা বা অজ্ঞান-বিপর্যাস-*ভেদ-ভয়-শোকাঃ। তদুক্তং প্রথমটীকায়াম্*—'স্বাদৃগুত্থবিপর্যাস ইত্যাদি।'" (৩।১২।১-২) অর্থাৎ, 'বিষ্ণুস্বামিপ্রোক্ত পঞ্চক্লেশ হ'ল—অজ্ঞান, বিপর্যাস, ভেদ, ভয় ও শোক। এই কথাই পূর্বেও বলা হয়েছে।'

'অজ্ঞান' বা 'অবিদ্যা' বেদান্ত তথা ভারতীয় দর্শনের একটি মূলীভূত-তত্ত্ব। বিশেষ ক'রে, অদ্বৈতবেদান্তে এর স্থান কেন্দ্রীভূত, ব্রহ্মেরই পরে। একটি বস্তুকে অপর একটি বস্তু ব'লে জানাই 'অজ্ঞান' বা 'অবিদ্যা'। 'বিপর্যাস' এরই সমতুল অর্থাৎ অন্যথা জ্ঞান—শুক্তিতে মুক্তা, রজ্জুতে সর্প, দেহে আত্মা জ্ঞান। অবিদ্যার সঙ্গে এর প্রভেদ এই যে, 'অবিদ্যা' সার্বজনীন, '*বিপর্যাস*' ব্যক্তিগত। '*ভেদ*' ভিন্ন বস্তুতে ভিন্ন ধর্মারোপ—দেহে 'অহং-মমত্ব' আরোপ, যে-ক্ষেত্রে 'আত্মা'ই কেবল আমার আপন—'দেহ' নয়। '*ভয়*' ও '*শোকে*'র কথা সকলেই জানেন। আমাদের একমাত্র নিজস্ব ধন 'আত্মা' ভয়-শোক-রহিত—কে কাকে ভয় করবেন! সবই ত সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা; কে কার জন্য শোক করবেন!—আত্মার ত বিনাশ নেই।

শ্রীধরস্বামী শ্রীবিষ্ণুপুরাণের 'আত্মপ্রকাশ' নামক টীকায় বিষ্ণুস্বামি-লিখিত 'সর্বজ্ঞসূক্তি' নামক ভাষ্যের উল্লেখ ক'রে ঈশ্বর- ও জীব-বিষয়ক উপরে উদ্ধৃত শ্লোকটি উদ্ধার করেছেন—

'তদুক্তং সর্বজ্ঞসূক্তৌ—

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।

স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশ-নিকরাকরঃ॥

ইতি' (১০।৮৭।২১)

এই গ্রন্থের অন্যত্রও বলা আছে—"শ্রুতিশ্চ মুক্তেরপ্যাধিক্যং ভক্তের্দর্শয়তি। যথাহ—'যং সর্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ' ইতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ সর্বজ্ঞভাষ্যকৃদ্ভিঃ—'মুক্তা অপি *লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভজন্তে*' ইতি।" (২।৫।১৬)। অর্থাৎ—"শ্রুতিও মুক্তি অপেক্ষা ভক্তির আধিক্য প্রদর্শন করেছেন। যেমন বলা হয়েছে (অথর্ববেদীয় নৃসিংহপূর্বতাপনী উপনিষদে ২।৪তে)—'যাকে সকল দেবতা, মুমুক্ষু ও ব্রহ্মবাদিগণও নমস্কার করেন'। (সমগ্র মন্ত্রটি হ'ল এরূপ: 'অথ কস্মাদুচ্যতে নমামীতি যস্মাৎ যং সর্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ। প্র নূনং ব্রহ্মণস্পতির্মন্ত্রং বদত্যুক্থ্যং যস্মিন্নিন্দ্রো বরুণো মিত্রো অর্যমা দেবা ওকাংসি চক্রিরে তস্মাদুচ্যতে নমামীতি।') এটিকে সর্বজ্ঞ-ভাষ্যকার এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—'মুক্তগণও লীলাভরে বা স্বেচ্ছায় ও আনন্দে বিগ্রহ বা দেহ ধারণ ক'রে ভজনা করেন।'"

এই উদ্ধৃতি থেকে আমরা জানতে পারি যে, বিষ্ণুস্বামীর মতে মুক্তপুরুষগণও সংখ্যায় বহু; তাঁদেরও আছে *নিত্য-দিব্য-সিদ্ধদেহ*; তাঁরাও করেন নিত্য ভজন; শ্রীনৃহরিরও রয়েছে নিত্য-দিব্য-সিদ্ধদেহ; মুক্তি অপেক্ষা ভক্তি শ্রেয়ঃ;

যে কারণে মুক্তিলাভের পরও মুক্তজীবগণ ভক্তি, ভজনা, উপাসনা প্রভৃতি ত্যাগ করেন না।

প্রখ্যাত সায়ণমাধব বা মাধবাচার্য-বিরচিত 'সর্বদর্শনসংগ্রহে' ও 'রসেশ্বর-দর্শনে' বিষ্ণুস্বামীর মতবাদ দু'এক পঙ্‌ক্তিতে মাত্র উল্লিখিত হয়েছে। যথা—'বিষ্ণুস্বামিমতানুসারিভিঃ নৃপঞ্চাস্যশরীরস্য নিত্যত্বোপাদানাৎ। তদুক্তং সাকারসিদ্ধৌ—

সচ্চিন্নিত্যনিজাচিন্ত্যপূর্ণানন্দৈকবিগ্রহম্।
নৃপঞ্চাস্যমহং বন্দে বিষ্ণুস্বামিসম্মতম্॥'

অর্থাৎ "বিষ্ণুস্বামিমতানুসারিগণের মতবাদানুসারে নৃহরির শরীর নিত্য (অর্থাৎ তাঁর দেহ ও দেহীতে ভেদ নেই)। 'সাকার-সিদ্ধি'তেও বলা হয়েছে—

যিনি সৎ-চিৎ-নিত্যস্বরূপ,
যিনি পূর্ণানন্দবিগ্রহ
নিজ অচিন্ত্য-শক্তিগুণে,
বিষ্ণুস্বামিসম্মত সেই নৃহরিকে
বন্দনা করি আমি প্রতিক্ষণে।"

'রসেশ্বর-দর্শন' একটি অভিনব মতবাদ, যেহেতু এতে জীবন্মুক্তগণের দেহও যে নিত্য ও দিব্য, তা প্রতিপাদিত করবার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে যে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবিশিষ্ট অবয়বযুক্ত দেহও নিশ্চয়ই নিত্য হতে পারে, যেমন নৃসিংহের দেহ।

বিষ্ণুস্বামীও জীবন্মুক্তিবাদী ও দেহের নিত্যত্ববাদী ছিলেন—এ কথা অবশ্য বলা যায় না এর থেকে। কারণ, তিনি ছিলেন আদ্যোপান্ত ভক্তিবাদী এবং নামে অদ্বৈতবাদী হ'লেও প্রকৃতকল্পে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। আমরা সর্বত্রই দেখেছি যে, ভক্তিবাদী এবং দ্বৈতবাদিগণ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ সাধারণতঃ বিদেহমুক্তিবাদী হন। বিষ্ণুস্বামীও যে তাই ছিলেন, তা সুনিশ্চিত। অতএব, এস্থলে তাঁর মতবাদের যেটুকু উল্লেখ করা হয়েছে, সেটুকু থেকে কেবল এই কথাই জানা যায় যে, তাঁর মতে শ্রীনৃহরিরূপী পরব্রহ্মের বা শ্রীভগবানের দিব্যবিগ্রহ বা দেহও সচ্চিদানন্দস্বরূপ, তাঁর আত্মার ন্যায়। সুতরাং তিনি বা তাঁর আত্মা, এবং তাঁর দিব্য দেহ এক ও অভিন্ন—যা বহু বৈষ্ণব-সম্প্রদায়েরই মতবাদ। 'রসেশ্বর-দর্শনে' বিষ্ণুস্বামীর পদাঙ্কানুযায়ী গর্ভশ্রীকান্ত মিশ্রেরও উল্লেখ আছে, যিনি বিষ্ণুস্বামীর শিক্ষানুযায়ী শ্রীনৃহরির সচ্চিদানন্দস্বরূপ দিব্য দেহের কথা প্রমাণিত করবার প্রচেষ্টা করেছিলেন। যথা—'সদাদিনী বিশেষণানি গর্ভশ্রীকান্তমিশ্রৈঃ বিষ্ণুস্বামিচরণপরিণতান্তঃকরণৈঃ প্রতিপাদিতানি।' ('সর্বদর্শনসংগ্রহে' রসেশ্বর-দর্শন, ২৬)। অর্থাৎ "'সৎ' প্রভৃতি বিশেষণসমূহ বিষ্ণুস্বামীর শ্রীচরণাশ্রয়জনিত-পরিণত-বুদ্ধিসম্পন্ন গর্ভশ্রীকান্তমিশ্র প্রতিপাদিত করেছিলেন।" অর্থাৎ, বিষ্ণুস্বামীর মতবাদ অনুসরণ ক'রে গর্ভশ্রীকান্তও ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ-রূপে প্রমাণিত করেছিলেন।

'প্রভু-বিষ্ণুস্বামী নিজধর্মস্থাপনায় নিজাম্নায়-বিজ্ঞবরান্ বিল্বমঙ্গলং গর্ভশ্রীকান্তমিশ্রৌ সর্ব-বোধি-পণ্ডিতং সোমগীর্যাদীন্ যতীন্ নরহর্যাদীন্ নরসিংহভক্তান্ বিধায় বৈকুণ্ঠমবাপ।' ('শ্রীবল্লভদিগ্বিজয়ঃ', ২য় অবচ্ছেদ—শ্রীযদুনাথজীর নামে আরোপিত)। মর্মার্থ এই যে, প্রভু-বিষ্ণুস্বামী নিজধর্মস্থাপনের জন্য নরসিংহ-ভক্ত, শাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিতশ্রেষ্ঠগণকে গর্ভশ্রীমিশ্রের পরিচালনায় ন্যস্ত ক'রে বৈকুণ্ঠলাভ করেছিলেন।

বিষ্ণুস্বামী বেদান্ত-সম্প্রদায়-প্রবর্তক দশ জনের মধ্যে একজন, অথচ কি খণ্ডিত, অসংলগ্ন, অসম্পূর্ণ ভাবেই না তাঁর কথা জেনে আমাদের তৃপ্ত থাকতে হয়। বিশেষ ক'রে আমাদের কৌতূহল হয় তাঁর ও বল্লভের মধ্যে ভেদাভেদ

জানতে। বিষ্ণুস্বামী ও বল্লভের মতবাদের একই নাম—'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ'—অথচ প্রভেদ নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে, যার জন্য উভয়কে দুটি বিভিন্ন বেদান্ত-সম্প্রদায়ের প্রবর্তকরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। উপরে সে কথা বলা হয়েছে। আরেকটি উদাহরণ—শ্রীনাভাদাসজীর হিন্দী গ্রন্থ 'ভক্তমাল' থেকে—

'চৌবীস প্রথম হরি বপু ধরে, ত্যোং চতুর্ব্যূহ কলিযুগ প্রকট। শ্রীরামানুজ উদার সুধানিধি অবনি কল্পতরু। বিষ্ণুস্বামি বোহিতথ সিন্ধু সংসার পারকর। মধ্বাচারজ মেঘ ভক্তি সর উসর ভরিয়া। নিম্বাদিত্য আদিত্য কুহর অজ্ঞান জু হরিয়া। জনম করম ভাগবত ধরম সম্প্রদায় থাপী অঘট। চৌবীস প্রথম হরি বপু ধরে, ত্যোং চতুর্ব্যূহ কলিযুগ প্রকট।

'রমা পদ্ধতি রামানুজ। বিষ্ণুস্বামী ত্রিপুরারি। নিম্বাদিত্য সনকাদিনা। মধুকর মুখচারি।' (ভক্তমাল পৃঃ ৩২৭) অর্থাৎ 'শ্রীহরি প্রথমে চব্বিশ জন অবতাররূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হন তাঁদের মধ্যে কলিযুগে চার জন আচার্য আবির্ভূত হন, যাঁরা চারটি সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। সেই চারটি সম্প্রদায় হল—(১) রামানুজের শ্রীসম্প্রদায় (২) নিম্বার্কের শ্রীসনকাদি-সম্প্রদায় (৩) বিষ্ণুস্বামীর শ্রীশিব-সম্প্রদায় এবং (৪) মধ্বাচার্যের শ্রীব্রহ্মা-সম্প্রদায়।

'শ্রীরামানুজ উদারচরিত্র, সুধানিধি সংসার-কল্পতরু। শ্রীবিষ্ণুস্বামী সংসার-সাগরপার-কারিণী তরণী। শ্রীমধ্বাচার্য জীবের শুষ্কহৃদয়ে ভক্তিবারি-বর্ষণকারী মেঘ।

'ভাগবত জন্ম, ভাগবত ধর্ম, ভাগবত কর্ম-সম্বন্ধীয় এই চারটি সম্প্রদায় এইভাবে স্থাপিত হয়।

'শ্রীরামানুজের পদ্ধতি বা মার্গ শ্রীলক্ষ্মী-নির্দিষ্ট; শ্রীবিষ্ণুস্বামীর শ্রীশিবনির্দিষ্ট; শ্রীনিম্বার্কের শ্রীসনকাদি-নির্দিষ্ট; শ্রীমধ্বাচার্যের শ্রীব্রহ্মা-নির্দিষ্ট।'

এরূপে, আমরা দেখলাম যে, বিষ্ণুস্বামী শৈব, বল্লভ বৈষ্ণব।

নিঃসন্দেহে বিষ্ণুস্বামী বল্লভের পূর্ববর্তী, যেহেতু বল্লভ নিজেই বিষ্ণুস্বামীর মতবাদ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন, অবশ্য সপ্রশংসভাবে নয়, অবমাননাকর ভাবেই—'ত্রিবিধো ভক্তিযোগঃ উক্তঃ। তে চ সাম্প্রতং বিষ্ণুস্বাম্যনুসারিণঃ তত্ত্ববাদিনঃ রামানুজাশ্চেতি তমোরজঃসত্ত্বৈর্ভিন্নাঃ অস্মৎপ্রতিপাদিতশ্চ নৈর্গুণ্যঃ।' (শ্রীমদ্-ভাগবতের 'সুবোধিনী' টীকা ৩।৩২।৩৭)

অর্থাৎ 'ত্রিবিধ ভক্তিযোগের কথা বলা হয়েছে। তা হ'ল, সম্প্রতি এই: বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের তামসী ভক্তি; তত্ত্ববাদিগণ অথবা মধ্ব-সম্প্রদায়ের রাজসী ভক্তি, এবং রামানুজ-সম্প্রদায়ের সাত্ত্বিকী ভক্তি। অপর পক্ষে আমাদের প্রতিপাদিত ভক্তি নির্গুণা।'

আমাদের হয়ত এটি আশ্চর্যজনক ব'লে মনে হতে পারে যে, একই নামধারী বেদান্ত-সম্প্রদায়ের একজন অপরজনকে এইভাবে 'তামসী-ভক্তি'র প্রবর্তকরূপে কেন নিন্দাবাদ করছেন। কিন্তু এটি খুব অস্বাভাবিক নয়। কারণ, দুটি মতবাদ যদি বিশেষ সাদৃশ্যপূর্ণ হয়, তা হ'লে একটিকে বিশেষভাবেই নিকৃষ্ট ব'লে প্রতিপন্ন করতে না পারলে, অন্যটির মহিমা খ্যাপন করতে পারা যায় না। হয়ত সে জন্যই বল্লভ বিষ্ণুস্বামীর মতবাদকে এইভাবে অবহেলা করেছেন। রামানুজের বৈষ্ণব 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' ও শ্রীকণ্ঠের শৈব 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' যেমন সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য বাদ দিলে বহুলাংশে একই ধরনের মতবাদ, হয়ত বল্লভের বৈষ্ণব 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ' ও বিষ্ণুস্বামীর শৈব 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ'ও বহুলাংশে এক ও অভিন্ন—যেটুকু আমরা জানতে পেরেছি বিষ্ণুস্বামীর সম্বন্ধে, তাতে এই কথাই ত মনে হওয়া আশ্চর্য-

জনক নয়। যা হোক, কিছুই স্থির ক'রে বলা যায় না এক্ষেত্রে।

সর্বজনবন্দ্য বেদান্ত-দর্শনের বিকচকুসুমবনে অসংখ্য পুষ্প রঙে জগৎ আলোকিত ক'রে, গন্ধে জগৎ আমোদিত ক'রে, মধুতে জগৎ আলোড়িত ক'রে বিরাজ করছে সকলের বিশেষ গৌরবের পাত্ররূপে। তাদের মধ্যে দশটি সুন্দরতম সরসতম ফুল্লতম শতদলের স্ব স্ব স্বতন্ত্র সৌন্দর্যে মাধুর্যে ঐশ্বর্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চিরদিন উদ্‌ভাসিত উদ্দীপিত উদ্‌বুদ্ধ হয়ে থাকবে, নিঃসন্দেহে। কারণ, প্রত্যেকেরই রয়েছে স্ব স্ব স্বতন্ত্র বিশেষ বিশেষ দান। সেজন্য তাদের মধ্যে একটিমাত্র পুষ্পও যদি এইভাবে আমাদের নিকট তার রঙ বিকীর্ণ না করে, গন্ধ বিস্তৃত না করে, মধু বিগলিত না করে, তা হ'লে তা হবে আমাদেরই পরম ও চরম দুর্ভাগ্য। সেজন্য, বিষ্ণুস্বামী ও তাঁর সম্প্রদায় সম্বন্ধে যদি আমরা হই পরিপূর্ণ অজ্ঞ, তা হ'লে তা হবে আমাদের সকলেরই পক্ষে বিশেষ দুঃখের বিষয়।

জীবনদর্শন

ডক্টর শিবপদ চক্রবর্তী*

আজকাল প্রায়ই 'অমুকের জীবনদর্শন', 'তমুকের জীবনদর্শন' ইত্যাদি কথা শোনা যায়, যদিও এই বাক্যাংশগুলির অর্থ খুব স্পষ্ট নয়। তবে 'জীবনদর্শন' বলতে কোন ব্যক্তির চরিত্র, আচরণবিধি বা জীবনরীতি বোঝা অসম্ভব। কথাটি যদিও ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়—যথা, স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শন, রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ইত্যাদি,—তবুও 'জীবনদর্শন' কোন ব্যক্তিবিশেষের ব্যবহারিক জীবন অর্থে প্রযুক্ত হতে পারে না। কথাটি আমি যেভাবে বুঝতে চাই, তা বলবার চেষ্টা করছি।

প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে, আমি যে অর্থে জীবনদর্শনকে বুঝতে চাই, সে অর্থে প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষেরই একটি নিজস্ব জীবন-দর্শন থাকতে পারে। কেবলমাত্র গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, রোমাঁ রোলাঁ প্রভৃতি মনীষীদেরই জীবনদর্শন থাকবে এমন কোন কথা নেই। অবজ্ঞাত, অখ্যাত মানুষের জীবন-দর্শন হয়তো কখনো স্পষ্টভাবে প্রচারিত হয় না —এই পর্যন্ত।

যে জগতে ও সামাজিক পরিবেশে আমরা বাস করি, সেই সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির সম্পর্কে একটা মোটামুটি সাধারণ ধারণা ক'রে নিয়ে, যে মানুষ ঐ ধারণা অনুযায়ী নিজের আচরণ-ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করেন, সেই মানুষের 'জীবন-দর্শন' ঐ সামগ্রিক ধারণার মধ্যেই নিহিত ব'লে মনে হয়। এই 'দর্শন' নিছক জ্ঞানাত্মক মননশীলতা নয়; এই চিন্তন বা ধারণানুযায়ী কোন মানুষের ব্যবহারিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। অর্থাৎ জীবনদর্শন একপ্রকার ব্যবহারিক জ্ঞান বা মনন—অথচ, নিছক ব্যবহার বা আচরণ নয়। 'আমি ঘর সাজাতে জানি', 'চুল বাঁধতে জানি', 'দাবা খেলতে জানি' প্রভৃতি বাক্যে 'জানি' কথাটির অর্থ ব্যবহারিক। 'আমি জানি যে পৃথিবী

* এম. এ., ডি. লিট্‌.। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান।

গোলাকার', 'আমি জানি যে কামারপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমি', 'আমি জানি যে ৭+৫ =১২' প্রভৃতি বাক্যে 'জানি' কথাটির অর্থ কেবলমাত্র জ্ঞানাত্মক। ব্যবহারিক জ্ঞান শুধু কৌতূহলকে চরিতার্থ ক'রেই শেষ হয় না—জীবনকে সুগঠিত ও সার্থক ক'রে তুলতে তার প্রয়োগ হয়।

মানুষ কেবলমাত্র সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায় কার্যসম্পাদন করে না। যেহেতু সে চিন্তাশীল প্রাণী, সেহেতু সে তার পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ ক'রে, বিচার-বিবেচনা ক'রে কর্মে প্রবৃত্ত হয়। অবশ্য জন্ম থেকেই মানুষ জগৎকে জানতে শেখে না; ধীরে ধীরে তার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হয়। কিন্তু যখন থেকেই সে জানতে বা বুঝতে শেখে, তখন থেকেই সে তার জ্ঞানবুদ্ধিমতো নিজের জীবনকে সংগঠিত করতে থাকে। এইটাই মানুষের স্বভাব।

যদিও সাক্ষাৎভাবে আমার সীমিত প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ, আমার আত্মীয় বন্ধুবান্ধব আর কাম্য ও ত্যাজ্য পদার্থের ধারণাগুলিই আমার দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করে, তবু আমার সামগ্রিক জীবনের রূপটি ফুটে ওঠে বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে আমার সামগ্রিক ধারণার আলোকে। ঐ সামগ্রিক ধারণাটিই আমার 'জীবনদর্শন'। কথাটি হয়তো একটু অস্পষ্ট থেকে গেলো আর একে করামলকবৎ স্পষ্ট করাও দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবু দু-একটি উদাহরণ হয়তো কথাটা কিছুটা স্বচ্ছ করতে পারবে।

স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিতে এক অনাদ্যন্ত চৈতন্যের উদ্‌ভাস অনুভব করতেন—যে বিশ্বচৈতন্য বিশ্বের সকল বস্তুতে কম বা বেশী মাত্রায় প্রকাশমান। স্থূল জড়বস্তু, প্রাণ, মন প্রভৃতি প্রকৃতির বিভিন্ন পর্যায়ে ঐ বিশ্বচেতনা (যার নাম 'ঐশীচেতনা' দিতে আপত্তি নেই) বেশী বেশী মাত্রায় প্রকাশিত আর মানুষের মনেও, সাধারণ ও মহামানব ভেদে, ঐ উদ্‌ভাস কমবেশী বর্তমান ব'লে স্বামীজী উপলব্ধি করতেন। বিশ্বসম্পর্কে এই অনুভূতিই তাঁর জীবনদর্শনের মর্মকথা, আর এই অনুভূতিরই এক পরিনিষ্ঠিত প্রতিফলন হলো বিবেকানন্দের দিব্যজীবন। যে উচ্চ মনন, সাধারণের জন্যে যে কল্যাণচিন্তা ও নিঃস্বার্থ ভালবাসা, যে বৈরাগ্য ও ত্যাগের পরাকাষ্ঠার মধ্য দিয়ে এই মহাজীবন অতিবাহিত হয়েছে তার সম্যক্ অনুধাবনে ঐ জীবনদর্শনের মূল কথাটি বোধগম্য হতে পারে। আবার অন্য কোন মানুষ হয়তো জড়জগৎ ও ইহলোককেই প্রকৃত সদ্‌বস্তু ভেবে জান্তব সুখস্বাচ্ছন্দ্যকেই প্রধান পুরুষার্থ মনে করেন, আর ঐ জড়বাদী জীবনদর্শন একান্তই ভিন্ন রকমের আচরণ-বিধিতে প্রতিফলিত হয়। অধিকাংশ সাধারণ-মানুষের জীবনদর্শন এই দ্বিতীয় প্রকারের ব'লে, জড়বাদী ইহলোকসর্বস্ব জীবনাদর্শকে 'লোকায়ত' জীবনদর্শন বলা হয়।

অবশ্য উপরে যতোটা পরিষ্কার ক'রে আমি বিশ্বপ্রকৃতির সম্পর্কে দু রকমের ধারণার পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি, সকলের মধ্যেই যে জীবন-দর্শন অতোটা স্পষ্ট, বিবিক্ত ও সচেতনভাবে ক্রিয়াশীল হবে, এমন কথা নেই। অধিকাংশ মানুষ সচেতনভাবে চিন্তাশীল হতে চায় না, কেননা সঙ্গতিপূর্ণ চিন্তা করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, রোমাঁ রোলাঁ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা নিজেদের জীবনাদর্শকে বক্তৃতায়, প্রবন্ধে, স্বরচিত গ্রন্থে, কথোপকথনে সচেতনভাবে প্রতিফলিত করেছেন এবং নিজেদের ব্যবহারিক জীবনে তাঁদের মননধারা রূপায়িত করেছেন। তবু

সচেতনভাবে কোন জীবনদর্শন অনুসরণ না করলেও অধিকাংশ মানুষের জীবন কোন না কোন অব্যক্ত জীবনদর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। কোন সহৃদয়, চিন্তাশীল ব্যক্তি যদি এই শেষোক্ত মানুষগুলির জীবনধারা পর্যালোচনা করেন, তা হ'লে অব্যক্ত জীবনদর্শনকে সনাক্ত করতে পারেন। অতএব ব্যক্ত ও অব্যক্তভেদে জীবনদর্শন দুই শ্রেণীর হ'তে পারে।

অন্যদিক থেকে জীবনদর্শন সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় হ'তে পারে। অধিকাংশ মানুষের জীবনদর্শন নিষ্ক্রিয়। সঠিক সঙ্গতিপূর্ণ মননশীলতা সুকঠিন ব'লে আমরা, অধিকাংশ মানুষেরা, আমাদের জীবনদর্শন রচনার ভার অন্যের ওপরে ছেড়ে দি। পিতামাতা, জাতীয় নেতা, সমাজপতি, শিক্ষক, গুরু ইত্যাদি যে জীবনদর্শনের সঙ্গে আমাদের পরিচিত করিয়ে দেন তাকেই আমরা নিষ্ক্রিয়ভাবে আমাদের জীবনে গ্রহণ ক'রে থাকি। জীবনদর্শনের 'নিষ্ক্রিয়তা' মানে এই নয় যে, এই জীবনদর্শন মানুষের জীবনে কার্যকর হয় না ; এখানে নিষ্ক্রিয়তা মানে হলো আমরা এটা 'গ্রহণ' করি, সক্রিয়ভাবে রচনা করি না। বেতার, দূরদর্শন, সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র প্রভৃতি প্রচারযন্ত্র সরকারের অভিলষিত কোন জীবনদর্শন অধিকাংশ নাগরিকের মনে প্রোথিত ক'রে দেয়। সাধারণ মানুষ ঐ প্রচারিত জীবনদর্শনের গুণাগুণ পরীক্ষা না ক'রেই তার দ্বারা প্রভাবিত জীবন যাপনে বাধ্য হয়। দুইজন ইউরোপীয় মনীষী, কার্ল মার্কস ও সিগমুণ্ড ফ্রয়েড, তাঁদের সুচিন্তিত জীবনদর্শন দিয়ে বর্তমান শতকে পৃথিবীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মানুষকে প্রভাবিত করেছেন। অধিকাংশ মানুষ তাঁদের কথা নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করেছে ব'লে মনে হয়। অপরপক্ষে কোন কোন মনীষী সক্রিয়ভাবে কোন এক বিশেষ জীবনদর্শন বিচারমুখে রচনা করেন। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ বা মার্কসের জীবনদর্শন তাঁদের মননে উৎপত্তির দিক থেকে সক্রিয়। তেমনি ভগবান বুদ্ধের জীবনদর্শন উৎপত্তিমুখে যদিও সক্রিয়, প্রচারিত হবার পর অধিকাংশ শিষ্য-প্রশিষ্যের নিজেদের দিক থেকে তা নিষ্ক্রিয়।

'ব্যক্ত-অব্যক্ত', 'সক্রিয়-নিষ্ক্রিয়' ভেদে জীবনদর্শনের শ্রেণীভেদ করা গেলেও, মনে রাখা দরকার যে এদের একটি অপরটির অভাব নির্দেশ করে না। অর্থাৎ কোন এক ব্যক্তির মননে কোন এক জীবনদর্শন খানিকটা ব্যক্ত খানিকটা অব্যক্ত থাকতে পারে। এভাবে বোধ হয় বুঝতে পারা যায় যে, কেন প্রত্যেক মানুষের জীবনদর্শন ভিন্ন ভিন্ন হ'তে পারে। ভাববাদী, জড়বাদী, প্রয়োগবাদী, সাম্যবাদী, অধ্যাত্ম-বাদী, প্রত্যক্ষবাদী প্রভৃতি প্রত্যেক ধারার জীবনদর্শন ভিন্ন ভিন্ন মানবগোষ্ঠী সাধারণভাবে অনুসরণ করলেও, একই জীবনদর্শন খুঁটিনাটিতে সক্রিয়-নিষ্ক্রিতায় ভিন্ন ভিন্ন মানুষে ভিন্ন ভিন্ন হ'তে পারে। সেক্ষপীয়রের 'As You Like It' নাটকের Touchstone নামে এক বিদূষক-চরিত্র আছে। ঐ বিদূষক এক মেষপালককে জিজ্ঞাসা করছে, 'Hast thou any philosophy in thee, shepherd ?' এখানে 'philosophy' অর্থে কোন সুচিন্তিত ন্যায় বা বেদান্তের মতো দর্শনপ্রস্থানকে বুঝলে চলে না ; এখানে ব্যক্তির জীবনদর্শনকে বুঝতে হয়। এই অর্থে প্রত্যেক মানুষের জীবনদর্শন থাকে—তা ব্যক্তই হোক বা অব্যক্তই হোক, ভালই হোক বা মন্দই হোক।

উপসংহারে আর একটি কথা নিবেদন করব। কোন কোন মানুষ মুখে এক কল্যাণকর জীবন-দর্শন প্রচার ক'রেও, নিজের আচারণবিধিতে অন্য কোন আদর্শ অনুসরণ ক'রে থাকে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ একে "ভাবের ঘরে চুরি" করার পাপ ব'লে নির্দেশ করেছেন। আমি এই প্রবঞ্চকদের সম্পর্কে কিছু বলতে চাই নে। তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের চারিত্রিক দুর্বলতা, দুর্ভাগ্যবশতঃ, আমাদের অনেককেই, পরিবেশ ও পরিস্থিতির চাপে পড়ে, আপোষরফা ক'রে চলতে বাধ্য করে এবং এই কারণে, ইচ্ছে থাকলেও, আমরা নিজ জীবন-দর্শনকে জীবনে সম্পূর্ণ রূপায়িত ক'রে উঠতে পারি নে। এ সব ক্ষেত্রে মানুষ দুঃখ এবং অনুশোচনার তুষানলে দগ্ধ হয়। কজন আর সেই সিংহকল্প দৃঢ়চেতা বিবেকানন্দ হতে পারেন? মহামানবেরা কিন্তু কোন আপোষ করেন না—সমস্ত বাধাবিঘ্নের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে এঁরা নিজ নিজ জীবনদর্শনকে রূপায়িত করার আনন্দে ভরপুর থাকেন।

বিবেকানন্দ-সাহিত্যে হাস্যরস

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

[পূর্বানুবৃত্তি]

ব্যক্তি, সমাজ, দেশ, পৃথিবী, ইতিহাস—এ সব কিছুকে অবলম্বন করেই হাস্যরসের উপাদান জগতে ছড়িয়ে আছে। মানসপরিমণ্ডলের বিস্তারে যিনি যতো বড়ো, তাঁর কাছে এ জীবন তত অর্থবহ। জীবনের সেই গভীর অর্থে সুখ বা দুঃখ দুই-ই আছে। কিন্তু যিনি সুখদুঃখের পারে, তাঁর পক্ষেই এ জগৎ আনন্দময়।

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে স্বামীজী যখন ভারত ও বিশ্বের পটপরিবর্তন লক্ষ্য করে চলেছেন, তখন তাঁর এক একটি মন্তব্যে যেমন বিশ্লেষণী-শক্তির সন্ধানী আলোকনিক্ষেপে অতীত ও বর্তমানের ঘটনারাজির অন্তর্নিহিত সত্য আত্ম-প্রকাশ করে, তেমনই দীপ্তবুদ্ধির বিকীর্ণ বিভায় সে ঘটনাবলীর অন্তর্লীন হাস্যকরতাও পাঠকের বোধশক্তিকে সমুজ্জ্বল আনন্দে পরিপূর্ণ করে। রাজতন্ত্রের পরিবর্তে বণিকতন্ত্রের আবির্ভাব-ইতিহাসকে স্বামীজী যখন সংক্ষেপে এইভাবে বর্ণনা করেন—"প্রজাসমষ্টির শক্তিকেন্দ্ররূপ রাজা অতি শীঘ্রই ভুলিয়া যান যে, তাঁহাতে শক্তিসঞ্চয় কেবল 'সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুং'। বেণ রাজার ন্যায় তিনি সর্ব-দেবত্বের আরোপ আপনাতে করিয়া অপর পুরুষে কেবল হীন মনুষ্যত্ব-মাত্র দেখেন! সু হউক বা কু হউক, তাঁহার ইচ্ছার ব্যাঘাতেই মহাপাপ। পালনের স্থানে কাজেই পীড়ন আসিয়া পড়ে—রক্ষণের স্থানে ভক্ষণ।"[১]—তখন স্বেচ্ছাতন্ত্রের বিকাশকাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে আপাত-গম্ভীর ভাষাভঙ্গীর পাশাপাশি তথাকথিত রাজা বা নেতা-জাতীয় ব্যক্তিদের নিজেদের সম্বন্ধে অতিশয়িত কল্পনার মূঢ়তাও সমান ব্যঙ্গে ধ্বনিত। স্বামীজীর ব্যঙ্গবিদ্রূপে সিদ্ধ কথনভঙ্গী ইতিহাসের পটপরিবর্তনকে পাঠকের অন্তরে নিগূঢ় হাস্যে গভীরতর ব্যঞ্জনায় স্থায়ী ভাবে অঙ্কিত করে।

রাজার কাজ প্রজাপালন। কিন্তু দুনিয়ার

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড, চতুর্থ সং, 'বর্তমান ভারত': পৃঃ ২৩৮-৩৯

বেশীর ভাগ রাজারাই নিজেদের পোষণ নিয়ে এত ব্যস্ত যে, প্রজার কথা ভাবার সময় তাঁদের অতি অল্পই মেলে। ভাগবতের গল্পে যেমন বেণ রাজা নিজেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের চেয়ে বড়ো মনে করতেন, আমাদের এ যুগের (রাজার বদলে) দলপতিরাও তেমনি নিজেদের মহিমায় এত মুগ্ধ থাকেন যে, অন্যের চোখে এর ফলে তাঁরা কতটা হাস্যকর হয়ে ওঠেন, সেকথা ভাবতেই পারেন না। এ-জাতীয় লোকেদের আত্মগরিমা নিজের ইচ্ছা ছাড়া আর কারু ইচ্ছার দাম দেয় না। পালন ও পীড়ন, রক্ষণ ও ভক্ষণ—এ দুয়ের পার্থক্য ঘুচে যায়।

সমাজের এমন অবস্থায় ইতিহাসের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম—বিপ্লব। কিন্তু সব দেশেই যে বিপ্লব সমান সার্থক অথবা সম্ভব, তা নয়। অত্যাচারীর অন্যায় শক্তিকে—"যদি সমাজ নির্বীর্য হয়, নীরবে সহ্য করে…।",[২] এমন জাতি বা সমাজের পক্ষে দাসত্বই বিধান। কিন্তু যেখানে সমাজশক্তি সচেতন সেখানে—"শীঘ্রই অতি প্রবল প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার আস্ফালনে ছত্র, দণ্ড, চামরাদি অতি দূরে বিক্ষিপ্ত ও সিংহাসনাদি চিত্রশালিকারক্ষিত প্রাচীন দ্রব্যবিশেষের ন্যায় হইয়া পড়ে।"[৩] অতি সংক্ষেপে এখানে রাজন্যশক্তির বিলোপ এবং মিউজিয়ম বা চিত্রশালিকায় স্থানপ্রাপ্তির বর্ণনাটি একই সঙ্গে হাস্য ও করুণরসের সম্মেলন। এককালে যে সিংহাসন দোর্দণ্ড রাজপ্রতাপের প্রতীক, আর এককালে তা সর্ব-ক্ষমতাহীন অতীতবস্তুরূপে কৌতূহল মেটানোর সামগ্রী মাত্র। সব প্রতাপের শেষ অর্থহীনতা! বলা বাহুল্য, ফরাসী বিপ্লবকে উপলক্ষ্য করেই স্বামীজীর এ মন্তব্য।

ইংরেজ-রাজত্ব-প্রসঙ্গে স্বামীজীর ভবিষ্যৎদৃষ্টি 'বর্তমান ভারতে'র কয়েকটি স্থানে ভাষাগত গাম্ভীর্যে আত্মগোপন করে আছে। তার মধ্যে কোনো কোনোটিতে তাঁর হাস্যরসিক সত্তাও এক ঝিলিক বিদ্যুতের মতো খেলে যায়। যেমন ধরুন—"ইংরেজ-সাধারণের মনে ক্রমশঃ এক ধারণা উপস্থিত হইতেছে যে, ভারত-সাম্রাজ্য তাহাদের অধিকারচ্যুত হইলে ইংরেজ-জাতির সর্বনাশ উপস্থিত হইবে। অতএব 'যেন তেন প্রকারেণ' ভারতে ইংলণ্ডাধিকার প্রবল রাখিতে হইবে। এই অধিকার-রক্ষার প্রধান উপায় ভারতবাসীর বক্ষে ইংরেজজাতির 'গৌরব' সদা জাগরূক রাখা।"[৪]

যাঁরা পরাধীনযুগের ভারতবর্ষে বাস করার মর্মপীড়া অনুভব করেন নি, তাঁদের পক্ষে স্বামীজীর এ মন্তব্যের অর্থগ্রহণ করা কঠিন। কেমন করে শিক্ষাদীক্ষা, সুযোগসুবিধা, আয়-ব্যয় প্রভৃতি প্রতিদিনের জীবনযাপনের দ্বারা একটি জাতিকে হীন থেকে হীনতর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সে বিষয়ে ইংরেজ-মস্তিষ্ক অসাধারণ দক্ষতা লাভ করেছিল—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র 'তলোয়ার-কর'-চরিত্রটি অনুধাবন করলে এ যুগের তরুণেরা পরাধীনতার আত্মগ্লানি কিছুটা অনুধাবন করতে পারবেন। এ সব সত্ত্বেও অবশ্য একালে এমন একদল প্রবীণের দেখা মেলে যাঁরা ব্রিটিশ-যুগের গুণগরিমায় আত্মহারা। শিকলবাঁধা প্রাণীর অনেকদিনের অভ্যাসে শিকলপরাকেই

২, ৩ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : ৪র্থ সং : 'বর্তমান ভারত' : পৃঃ ২৩৮-৩৯

৪ তদেব : পৃঃ ২৪৫

জীবনের চরম সার্থকতা মনে করা, আশ্চর্য নয়। কিন্তু স্বামীজীর অন্তরে ইংরেজের আত্মগৌরব-ঘোষণার প্রয়াসে "যুগপৎ হাস্য ও করুণরসের উদয়"[৫] হয়েছিল। কারণ যথার্থ গৌরব কেউ কেড়ে নিতে পারে না। আরোপিত অভিমানই প্রতি মুহূর্তে লাঘবের ভয়ে কম্পমান।

স্বামীজী মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, ইংরেজেরা যে সব জাতীয় গুণের দ্বারা ভারত-সাম্রাজ্য অধিকার করেছিল, সে সব গুণ যতদিন থাকবে, "ততদিন তাঁহাদের সিংহাসন অচল।...কিন্তু যদি ঐ সকল গুণপ্রবাহের বেগ মন্দীকৃত হয়, বৃথা গৌরবঘোষণে কি সাম্রাজ্য শাসিত হইবে?"[৬] ইংরেজশাসনের আসন্ন সঙ্কট স্বামীজীর এই প্রশ্নেই উত্থাপিত। ওই অহঙ্কৃত শাসনব্যবস্থা ভারতের সাধারণ মানুষ প্রজামণ্ডলী কখনই চিরকাল মেনে নেবে না। কিন্তু সব সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতালোভীদেরই ধারণা যে, নিজেদের মহিমা নানাভাবে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করলেই তাদের 'তখত্ তাজ অচল রাজধানী।'

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে চোখ ফিরিয়ে ইতিহাসের শাসন উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু জগতের ইতিহাসে দেখা যায়, কোনো শাসক-শ্রেণীই নিজের আসন্ন অবসান কল্পনা করতে পারে নি। স্বামীজীর দৃষ্টিতে—"মায়ার এমনিই বিচিত্র খেলা।"[৭] সব রাষ্ট্রশক্তির মূলে জনমনের সমর্থন। সেটি হারালে সব যুগের সব শাসক-শ্রেণীরই বিদায় আসন্ন।[৮] কিন্তু আত্মগৌরবের মায়ায় আচ্ছন্নদৃষ্টি শাসকেরা কোনোকালেই সে কথা বুঝতে চায় না বা পারে না। বেদান্তবাদী বিবেকানন্দ ইতিহাসের অন্তরালে মায়ার এই মোহিনীমূর্তিকে সন্ন্যাসীর নিরপেক্ষতায় লক্ষ্য করে মৃদু হাস্যে মানবভাগ্যের বৈচিত্র্যের কথা ভেবেছেন। জগৎরহস্যের অন্তরালে যে চির-হাস্যের উপাদান সঞ্চিত হয়ে আছে, সেকথা বুঝতে ঐতিহাসিককে বৈদান্তিক হতে হয়।

শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক অনায়াসে নিজেকেই হাস্যরসের উপাদান করে তোলেন। প্রচেষ্টাটি দুঃসাহসিক। অল্পবুদ্ধি শ্রোতার দল এ-জাতীয় হাস্যরসের নিরপেক্ষ অন্তর্দৃষ্টির কথা না বুঝে যা সূক্ষ্মবুদ্ধির হাসির উপাদান তাকেই উপহাসের বিষয় করে তুলতে পারে। বঙ্কিমের 'কমলাকান্ত'কে কেবলমাত্র আফিঙখোর বলে মনে করার লোকই জগতে বেশী। 'কমলাকান্ত'কে তারিফ করতে হ'লে জীবনদৃষ্টির যে গভীরতার প্রয়োজন, সংসারের চলতিপথের পথিকদের মধ্যে অতি অল্পই সে দৃষ্টি মেলে।

স্বামীজীর রচনায় নিজেকে নিয়ে হাস্যরস-

৫, ৬ তদেব: পৃ: ২৪৫ ৭ তদেব: পৃ: ২৪২

৮ স্বামীজীর ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণী—"সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক, বা বাহুবলের দ্বারা, বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার—প্রজাপুঞ্জ। যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে তাহা দুর্বল। ...একণে বৈশ্যকুল আপনার স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছে; অতএব প্রজার সহায়তা অনাবশ্যক জ্ঞানে আপনাদিগকে প্রজাপুঞ্জ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন করিতেছে; এই স্থানে এ শক্তিরও মৃত্যুবীজ উপ্ত হইতেছে।"

'বর্তমান ভারতে'র পাঠকেরা জানেন বৈশ্যশক্তি বলতে স্বামীজী সর্বপ্রথমে ইংরেজ শাসনকেই বুঝিয়েছেন।

সৃষ্টির উদাহরণ অনেক জায়গায়ই পাওয়া যায়। কারণ যে বলিষ্ঠ মনোভঙ্গী ও উদারতা থাকলে মানুষ অন্যকে নিয়ে সহৃদয় আনন্দ-কৌতুকে মগ্ন হতে পারে, সেই মনোভঙ্গীই নিজের প্রতি প্রযুক্ত হয়ে উচ্চতম মার্গের হাস্যরস সৃষ্টি করে। 'বর্তমান ভারতে' সে-জাতীয় হাস্যরসের একটি উদাহরণ—"কোনও অল্পবুদ্ধি বালক শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের সমক্ষে সর্বদাই শাস্ত্রের নিন্দা করিত। একদা সে গীতার অত্যন্ত প্রশংসা করে। তাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, 'বুঝি কোনও ইংরেজ পণ্ডিত গীতার প্রশংসা করিয়াছে, তাহাতে এও প্রশংসা করিল।' "[৯] (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ : দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ : পৃঃ ২২১-২২ : ১৩৬৩ সালে প্রকাশিত সংস্করণ দ্রষ্টব্য)

সেকালের 'ইয়ং বেঙ্গল'— নব্যবঙ্গ – যারা ভারতীয় ভাবধারা থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রাচীন শাস্ত্র, সমাজ, রীতিনীতি সব কিছুর বিরুদ্ধতা করাই একমাত্র কর্তব্য বলে মনে করতো, তরুণ নরেন্দ্রনাথ একদা তাদের দলে ছিলেন। তারপর কখন নিঃশব্দে ভারতাত্মার অনুপ্রবেশ এই তরুণ তর্কপরায়ণ বিদ্রোহীদের অন্তরে ঘটেছে বলা কঠিন। ডিরোজিওর যুগের তরুণ বঙ্গ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের যুগের তরুণ বঙ্গ অবধি এই অন্তরঙ্গ পরিবর্তনের ইতিহাস। ইংরেজ পণ্ডিত বা পাশ্চাত্য মনীষার অনুকরণ তখন জাতীয় ইতিহাসের স্বীকরণে পরিণত হয়েছে। নরেন্দ্রনাথের পক্ষে তার মূল কারণ নিশ্চয় শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং। কিন্তু একদা তরুণ বয়সের চপল বিতর্কপরায়ণতাকে স্বামীজী নিজেই কীভাবে উপস্থাপিত করেছেন এবং স্নিগ্ধ হাস্যরসের আধার করে তুলেছেন, তাও এখানে লক্ষণীয়।

আর এক দিক থেকে পাঠককে স্বামীজী মনে করিয়ে দিয়েছেন—"ইহাই প্রবল বিভীষিকা।"[১০] সর্ববিষয়ে পাশ্চাত্যের এই অন্ধ অনুকরণ উনবিংশ শতাব্দীর মতো এই বিংশ শতাব্দীতেও কম বিভীষিকা নয়। ইতিহাসের বিশ্লেষণে স্বামীজী এ-জাতীয় মনোভাবের মূল কারণটি নির্মম ব্যঙ্গে প্রকটিত করেছেন।

শক্তিমানের দ্বারা পরিচালিত হওয়া মানব-স্বভাব। ইংরেজ বা পাশ্চাত্য সভ্যতা বলবান বলেই দুর্বলমনোভাবাপন্ন ভারতবাসীদের এই অন্ধ অনুকরণস্পৃহা। এযে শুধু এদেশের মানুষদের স্বভাব, তা নয়, দুনিয়া জুড়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল জাতের মানুষদের এই মনোভাব। অনেকটা ধনী আত্মীয়ের পরিচয়ে দরিদ্রের গৌরব অর্জনের চেষ্টার মতো। উচ্চবর্ণের, উচ্চশিক্ষার ও উচ্চবিত্তের অহংকারে যে ভারতবাসীরা দরিদ্র জনগণের সঙ্গে যথাসম্ভব দূরত্ব রক্ষা করে চলে, তাদের স্বামীজী ইতিহাসের এই সত্যটি তীব্র ব্যঙ্গের ভর্ৎসনায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—"বলবানের দিকে সকলে যায়; গৌরবান্বিতের গৌরবচ্ছটা নিজের গাত্রে কোন প্রকারে একটুও লাগে—দুর্বলমাত্রেরই এই ইচ্ছা। যখন ভারত-বাসীকে ইউরোপী বেশ-ভূষা-মণ্ডিত দেখি, তখন মনে হয়, বুঝি ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদের স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত!!"[১১] এই মন্তব্যের বিস্তারেই 'বর্তমান ভারতে'র শেষ অনুচ্ছেদে স্বামীজীর স্বদেশপ্রীতির দীপ্ত বহ্নিমন্ত্র—"হে ভারত! ভুলিও না…!"[১২]

বহু যুগের যবনিকা পার হয়ে, মিথ্যা অহংকারে ও আত্মকলহে সমাচ্ছন্ন ভারতবর্ষের উদ্দেশে তাঁর নির্দেশ—"বল—মূর্খ ভারতবাসী,

৯, ১০ তদেব : পৃঃ ২৪৭ ১১, ১২ তদেব : পৃঃ ২৪৮-৪৯

দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই…।"[১৩]

গণশক্তির সঙ্গে এই ঐক্যবোধ যে ভবিষ্যৎ ভারতের পক্ষে একান্ত কাম্য, একথা নিশ্চিত জেনেই তথাকথিত কুলগৌরবের অহঙ্কারে মত্ত উচ্চবর্ণদের চিন্তাধারার অসারতা স্বামীজী চরম ব্যঙ্গের ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন—"চতুর্দশশত বর্ষ যাবৎ *হিন্দুরক্তে পরিপালিত* পার্সী এক্ষণে আর 'নেটিভ' নহেন। জাতিহীন ব্রাহ্মণস্মন্যের ব্রহ্মণ্য-গৌরবের নিকটে মহারথী কুলীন ব্রাহ্মণেরও বংশমর্যাদা বিলীন হইয়া যায়। আর পাশ্চাত্যেরা এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, ঐ যে কটিতটমাত্র-আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ, মূর্খ, নীচজাতি, উহারা অনার্য জাতি!! উহারা আর আমাদের নহে!!!

'পরিব্রাজক'-গ্রন্থে স্বামীজী উচ্চবর্ণদের শূন্যে বিলীন হয়ে যেতে বলেছেন! কারণ, জাতি-ভেদের মিথ্যা অহঙ্কারে পরিপুষ্ট এই উচ্চবর্ণের দল এ দেশের সাধারণ মানুষের প্রগতির পক্ষে চিরকাল অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজেদের উচ্চস্তরের মানুষ ভেবে অহমিকার ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, সমগ্র দেশ যে শূদ্রদের ঘৃণা করতো, যুগে যুগে বিদেশীদের পদদলিত হয়ে সেই দেশের সব শ্রেণীর মানুষই শূদ্রস্তরে নেমে গিয়েছে। ইংরেজ আমলের ভারতবর্ষপ্রসঙ্গে স্বামীজীর বক্তব্য—"ভারতের ব্রহ্মণ্য এক্ষণে অধ্যাপক গৌরাঙ্গে,[১৫] ক্ষত্রিয়ত্ব রাজচক্রবর্তী ইংরেজে, বৈশ্যত্বও ইংরেজের অস্থিমজ্জায়; ভারতবাসীর কেবল ভারবাহী পশুত্ব, কেবল শূদ্রত্ব।"[১৬]

চিন্তায়, চেষ্টায়, কর্মে, বাক্যে, মননে, স্বপ্নে যারা কেবল পরের অনুকরণরত, তারা কেউই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বলে দাবী করতে পারে না, আসলে তারা পরের আজ্ঞাবাহী শূদ্রমাত্র। সেইজন্যই যে পার্সীরা ভারতবর্ষে বহুকাল থেকেই বাস করে আসছে ধনে মানে বিদ্যায় উন্নতির জন্য সেই পার্সীরা ইংরেজের কাছে সম্মান পেত, তাদের 'নেটিভ' বলে ধিক্কার দেওয়া হতো না। 'নেটিভ' বা দেশবাসী (আসলে এই পরাধীন দেশের অধিবাসী) বলে নিন্দিত হতো জাতিগৌরবের অহঙ্কারে মত্ত হিন্দু-সমাজ এবং অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠী। পার্সী, ইংরেজ বা য়ুরোপীয়—এদের সম্মান আমাদের অতি উচ্চকুলের ব্রাহ্মণদের চেয়ে তখন অনেক বেশী। আসলে নিজেকে বড়ো বলে অহংকার যারা করে, নিজের অগোচরেই তারা আরো শক্তিমানদের পদলেহন করে নিজের মনুষ্যত্ব খর্ব করতে থাকে। জাতির অহংকারে মত্ত ভারতবাসী ইংরেজ প্রভুদের পদতলে বিক্রীত দাসে পরিণত হয়েছিল। আর এই ইংরেজরাই ভারতবর্ষের নব ইতিহাস রচনা করে আর্য-অনার্য-ভেদের গল্পকথা সৃষ্টি করেছিল। তথা-কথিত উচ্চবর্ণেরা আর্য, আর নিম্নবর্ণেরা অনার্য—এ কাহিনীর কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তিই নেই। তবু রামায়ণকাহিনীকে আর্যদের অনার্যবিজয়, অথবা দেবাসুরের কাহিনীকে আর্য-অনার্য-সংঘাতরূপে দাঁড় করানোর অপচেষ্টা য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা বরাবর করে আসছেন এবং আমাদের ভারতীয় পণ্ডিতেরা নির্বিচারে সেই সব অপতত্ত্ব স্বীকার করে

১৩, ১৪ তদেব: পৃ: ২৪৮-৪৯

১৫ ব্রহ্মণ্য বা ব্রাহ্মণের বৈশিষ্ট্য—অধ্যয়ন অধ্যাপনা ইত্যাদি। শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরা তখন অধিকাংশই বিদেশী ইউরোপীয় বা গৌর-অঙ্গ।

১৬ তদেব: পৃ: ২৪০

নিয়ে ভারতবাসীকে বহুধাবিভক্ত করার সব চেষ্টাই করে যাচ্ছেন। এর ফলে ভারত-পাকিস্থানের মতো উত্তরভারত দক্ষিণভারতের বিভেদ দেখা দেওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। স্বামীজী কিন্তু আর্যদের ভারতবিজয় অথবা দাক্ষিণাত্যবিজয়—এই সব গল্পকথার কোনোটিই স্বীকার করেন নি।[১৭] দাক্ষিণাত্যের সভ্যতা সম্বন্ধে স্বামীজীর অতি উচ্চ ধারণা। 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে 'দক্ষিণী সভ্যতা' অংশটি এবং 'আর্য ও তামিল' নামে প্রবন্ধটি এ বিষয়ে বিশেষ দ্রষ্টব্য। (বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ ও ৫ম খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

যে বিদেশী পণ্ডিতের দল আর্য-অনার্য-সংঘাতের গল্প তৈরী করেছিল, তাদের ধারণা য়ুরোপের মতো ভারতবর্ষেও সংঘাতের মধ্য দিয়েই সভ্যতার সৃষ্টি। একদল আর একদলকে উৎখাত না করে কোনো রাষ্ট্র বা সভ্যতা গড়ে ওঠে না। স্বামীজীর মতে ভারতবর্ষে বর্ণবিভাগের সৃষ্টির উদ্দেশ্য আপাত অনুন্নতদের ধীরে ধীরে উন্নত করে তোলা। অন্যকে নাশ করে নয়, আপন করে নিয়ে তার সঙ্গে ঐক্যস্থাপন। তাই ভারতের ইতিহাসে প্রাচীনতম গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়েরা আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আজও এদেশে রয়ে গেছে। তুলনায় ইয়োরোপীয়েরা আদিম জাতিদের প্রায় সমূলে উৎখাত করেছে। "ইউরোপের উদ্দেশ্য—সকলকে নাশ ক'রে আমরা বেঁচে থাকবো। আর্যদের উদ্দেশ্য—সকলকে আমাদের সমান ক'রব, আমাদের চেয়ে বড় ক'রব।" (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য)।[১৮]

সুতরাং বিদেশীর শেখানো বিদ্যায় ভারতের আর্য হিসাবে নিজেদের আত্মগৌরবে যাঁরা অপেক্ষাকৃত অনুন্নত শ্রেণীদের অবজ্ঞা করতে শিখেছেন তাঁদের উদ্দেশে 'বর্তমান ভারতে' স্বামীজীর কঠোর মন্তব্য—"আর পাশ্চাত্যেরা এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, ঐ যে কটিতটমাত্র-

১৭ প্রসঙ্গত 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' থেকে স্বামীজীর মন্তব্য—"ঐ যে ইউরোপী পণ্ডিত বলেছেন, আর্যেরা কোথা হ'তে উড়ে এসে ভারতের 'বুনো'দের মেরে-কেটে জমি ছিনিয়ে নিয়ে বাস করলেন—ও-সব আহাম্মকের কথা। আমাদের পণ্ডিতরাও দেখছি সে গোঁয়ে গোঁ—আবার ঐ সব বিরূপ মিথ্যা ছেলেপুলেদের শেখানো হচ্ছে। এ অতি অন্যায়। ...কোন্ বেদে, কোন্ সূক্তে, কোথায় দেখছ, আর্যরা কোন বিদেশ থেকে এদেশে এসেছে? কোথায় পাচ্ছ যে, তাঁরা বুনোদের মেরে কেটে ফেলেছেন?...

"রামায়ণ কিনা আর্যদের দক্ষিণী বুনো-বিজয়!! বটে—রামচন্দ্র আর্য রাজা, সুসভ্য; লড়ছেন কার সঙ্গে?—লঙ্কার রাবণ রাজার সঙ্গে। সে রাবণ, রামায়ণ পড়ে দেখ, ছিলেন রামচন্দ্রের দেশের চেয়ে সভ্যতায় বড় বই কম নয়। লঙ্কার সভ্যতা অযোধ্যার চেয়ে বেশী ছিল বরং, কম তো নয়ই। তারপর বানরাদি দক্ষিণী লোক বিজিত হল কোথায়? তারা হ'ল সব শ্রীরামচন্দ্রের বন্ধু মিত্র। কোন্ গুহকের, কোন্ বালির রাজ্য রামচন্দ্র ছিনিয়ে নিলেন—তা বলো না?" (বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ২০৯-১০)

একালের ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিকেরা এ প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

১৮ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ২১১

আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ, মূর্খ, নীচজাতি, উহারা অনার্যজাতি !! উহারা আর আমাদের নহে !!!"[১১]

উদ্ধৃত মন্তব্যের প্রথম বাক্যের শেষে দুটি এবং দ্বিতীয় বাক্যের শেষে তিনটি বিস্ময়বোধক চিহ্নে স্বামীজীর ক্রমবর্ধমান ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, বিস্ময়, বিরক্তি। এ অপশিক্ষার প্রভাব শুধু ভারতের ক্ষেত্রেই নয়, জার্মানীর বিশুদ্ধ আর্যরক্তের ধারণার ক্ষেত্রেও কী বিষময় প্রভাব বিস্তার করেছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসে এবং ইহুদী-নিধনের ব্যাপকতায় তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ। ভারতের ইতিহাসে অহেতুক জাতি বা গোষ্ঠীসংঘাতের এই প্রয়াসের দ্বারা বিভেদ-কামী ইংরেজ সরকারেরই লাভবান হবার সম্ভাবনা ছিল। আজকের ভারতেও যখন এ-জাতীয় ধারণার ফলে সংঘাত বাধে, তখন অন্ধ বিদেশী অনুকরণের বিচারহীন মূঢ়তা সবচেয়ে হাস্যকর বলে প্রতিপন্ন হয়। [ক্রমশঃ]

দাগা বোলানর নোতুন নজির

স্বামী সুমেধানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

বিভিন্ন আপাতবিরোধী বিবদমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সুষ্ঠু সামঞ্জস্য বিধান করে বেদান্তের তথা হিন্দুধর্মের সামগ্রিক ও সনাতন রূপটি বিদেশের ও স্বদেশের মানুষের কাছে তুলে ধরেছিলেন স্বামীজী, শ্রীরামকৃষ্ণের "নরেন শিক্ষে দিবে" কথাটির সত্যতা প্রমাণ করে। বৈদিক সত্যের ওপরেই দাগা বোলান হলেও নরেনের শিক্ষাপদ্ধতিতে নোতুন কিছুও ছিল। বিবেকানন্দ-কন্যা নিবেদিতা নির্দেশ করে দিয়েছিলেন তাঁর গুরুর শিক্ষাপ্রণালীর বিশেষত্ব। নিবেদিতার দৃষ্টিতে স্বামীজী ছিলেন "অতীত ও ভবিষ্যতের মিলনক্ষেত্র"; তাঁর বাণী হল "বহু এবং এক—যদি যথার্থই এক সত্তা হয়, তাহলে শুধুমাত্র সকল উপাসনা-পদ্ধতিই নয়, সমভাবে সকল কর্মপদ্ধতি, সকল প্রকার প্রচেষ্টা, সকল প্রকার সৃষ্টি-কর্মই সত্যোপলব্ধির পন্থা।" অতীত ও ভবিষ্যতের মিলনকারী বেদান্তভিত্তিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য স্বামীজী কিন্তু কাগজ-কলম নিয়ে বা টোল-পাঠশালা খুলে দুরূহ শ্লোকসমূহের চুলচেরা বিচারে ভাষ্য ব্যাখ্যা টীকা টিপ্পনীর অবতারণা করেন নি। আলাপ আলোচনা করেছিলেন, বক্তৃতা দিয়েছিলেন, চিঠিপত্র ও প্রবন্ধাদি লিখেছিলেন সহজ বাংলায় (জীবন্ত বাংলাও বলা চলে) অথবা বোধগম্য ইংরেজীতে সাধারণ মানুষের আয়ত্তাধীন করে। মানুষকে আহ্বান করেছিলেন "লুপ্তপন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয়" না করে "সদ্যোনির্মিত বিশাল ও সন্নিকট পথে" এগিয়ে চলতে, যে-পথ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের দ্যুতিতে আলোকিত, যে-পথে সাকার ও নিরাকার, ব্রহ্ম ও শক্তি, জ্ঞান ও ভক্তি সমভাবে আদৃত। ধর্মের নামে যেখানে অনাচার, ধর্মের প্রমাণে যেখানে পাঁজিপুঁথির দোহাই দেওয়া, ধর্মের তাড়নায় যেখানে মানুষের অন্তরাত্মা অপমানিত সেখানেই বেদান্তকেশরী

১১ ঐ, পৃঃ ২৪৯

বিবেকানন্দের গর্জন "তোমরা শূন্যে বিলীন হও।" ব্যঙ্গ করে বিদ্রূপ করে যুক্তিবিচারের চাবুক মেরে ধর্মের ভান ও শাস্ত্রের ভ্রমকে অপনোদন করেছেন সংগ্রামী সন্ন্যাসী। স্বামীজীর ধর্মে ভানের স্থান নেই, মিথ্যার আশ্রয় নেই, আছে 'মন মুখ এক করা'র উদাহরণ ও প্রচেষ্টা। তাই তো ক্লান্তিকে অস্বীকার করে উল্টো পথ হেঁটে গিয়েছিলেন ভাঙীর কাছে তামাক খেতে, দিতে চেয়েছিলেন নিজের শরীরটিকে ক্ষুধার্ত পশুর আহার্য হিসেবে উৎসর্গ করে। ব্রহ্মবুদ্ধির এর থেকে বড় উদাহরণ বা নিদর্শন আছে কিনা জানি না। শাস্ত্রে বলেছে "জীবঃ শিবঃ শিবো জীবঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ"; তবে কেন "ক্রোর টাকা খরচ করে কাশী বৃন্দাবনের ঠাকুর ঘরের দরজা খুলছে আর পড়ছে। এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন. তো এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন, তো এই ঠাকুর আঁটকুড়ির বেটাদের গুষ্টির পিণ্ডি করছেন; এদিকে জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন বিনা, বিদ্যা বিনা মরে যাচ্ছে!" শাস্ত্রে যখন ভক্তির লক্ষণ নির্দেশ করা হয়েছে "অনির্বচনীয়ম্ প্রেমস্বরূপম্··· গুণরহিতম্ কামনারহিতম্" বলে তখন কেন সেই ভক্তির বিজ্ঞাপন দেবার জন্য সর্বাঙ্গে ছাপ দেওয়ার ধুম যা দেখে মাতাল চিতাবাঘ ঠাওরায়, কেনই বা তিলকের বহর দেখে চিতাবাঘ গাছে চড়ে! ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শ্লেষের মধ্য দিয়ে স্বামীজী বলতে চেয়েছিলেন ধর্মের ঢঙ ও বৃথা আড়ম্বরের নিষ্প্রয়োজনীয়তা। জীবনে দেখিয়েছিলেনও তাই-ই। তখনকার দিনে মাদ্রাজের মত জায়গায় রাখাঢাকা না করে ধূমপান, ত্রিবান্দ্রামে বাঙালী বন্ধু মন্মথবাবুর বাড়ীতে মৎস্যাহারের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা স্বামীজীর ঋজু ও দৃঢ় চরিত্রের পরিচয় দেয় যেখানে ঢঙ ও ভানের প্রবেশ নিষেধ।

সকলেরই জানা আছে, নরেন্দ্রনাথ ছিলেন আবাল্য ধ্যানসিদ্ধ। জন্মাবধি তিনি ঘুমানোর আগেই নিজেকে হারিয়ে ফেলতেন আলোক-রশ্মির মধ্যে। কাশীপুরের বাগানে যুবক নরেন্দ্রনাথ নির্বিকল্প সমাধিলাভে পাঞ্চভৌতিক শরীর থেকে নিজেকে পৃথক্ করে দেখেছিলেন। এরও আগে হেদোর রেলিঙে মাথা ঠুকে পরখ করেছিলেন কঠিন জড়বস্তুর চৈতন্য-সত্তা। এক কথায় বলতে গেলে আবহমান কাল ধরে এই বিশ্বচরাচরে যে সচ্চিদানন্দ ব্যাপ্ত রয়েছেন, অদ্বৈত-সাধকের যিনি বহুবাঞ্ছিত, সেই সচ্চিদানন্দ জিনিসটি ছিল নরেন্দ্রনাথ বা বিবেকানন্দের কাছে সহজ সাবলীল 'করামলকবৎ'। তাই তো আমেরিকার মত ভোগমুখী দেশে হাজার কর্মব্যস্ততার মধ্যেও নিজের ব্রহ্মভাবে নিজে মগ্ন থাকতেন। সহস্রদ্বীপোদ্যানে সেন্ট লরেন্স নদীর পাড়ে, নিউ হ্যাম্পশায়ারের বাগানে হ্রদতীরে নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে যাওয়া যেন খুবই সহজ ছিল ঐ লোকটির পক্ষে। বেলুড় মঠের উঠানে আমগাছের নীচে ক্যাম্পখাটে বসে কথাবার্তার মধ্য দিয়ে সমবেত সাধুভক্তদের মন-বুদ্ধিতে ব্রহ্মভাবের উন্মেষ করে দিয়েছিলেন। এই মানুষটিই আবার দেখিয়েছিলেন ভক্তির পরাকাষ্ঠা আলোয়ারে, তাড়িঘাটে, রাধাকুণ্ডে, বলরামভবনে ও বেলুড় মঠে। দ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈতের মধ্যে সুষ্ঠু সামঞ্জস্য বিধান কেবলমাত্র কথায় ও লেখায় নয়, জীবনেও পরিস্ফুট ও প্রদর্শন করে প্রমাণ রেখে গিয়েছিলেন তাঁর আচার্যচরিত্রের। মায়াবতীর অদ্বৈতপীঠে নিজের গুরু 'অবতারবরিষ্ঠ' শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি-পূজা পছন্দ করেন নি বটে কিন্তু সেটিকে নির্মমভাবে নিষেধ করে প্রবর্তকদের প্রাণে ব্যথাও দিতে চান নি। "কোমলে কঠোরে মেশান মাটী"ই ছিল স্বামীজীর চরিত্রের উপাদান। যে যে-অবস্থায় আছে তাকে সেখান

থেকে এগিয়ে দেওয়াই ছিল স্বামীজীর চেষ্টা। স্বামীজীর কথা হল "দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত, শৈবসিদ্ধান্ত, বৈষ্ণব, শাক্ত, এমন কি বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি যে-কোন" সম্প্রদায়েরই "একবাক্য যে জীবাত্মাতেই অনন্ত শক্তি নিহিত আছে।"

মানুষের অন্তর্নিহিত অনন্ত শক্তি ও সম্ভাবনাকে উদ্বোধিত করতে শুধুমাত্র "মহাপ্রাণ ওঠো জাগো" বলে আহ্বান করে বা উপদেশ দিয়েই স্বামীজী ক্ষান্ত ছিলেন না। ভরসা দিয়েছিলেন, আশ্বাস দিয়েছিলেন, অভয় দিয়েছিলেন *"আমি আমরণ তোমার পাশে আছি, তা তুমি কাজ কর বা না কর, বেদান্ত রাখ বা না রাখ।"* কতদিকে কতভাবে সাহায্য করেছেন অভ্যুদয়-মার্গ ও নিঃশ্রেয়স-মার্গের পথিকদের। শুধু পথিকদের কেন বলি, যারা যাত্রাবিমুখ তাদেরও। যারা অলস তাদের মধ্যে চাঞ্চল্য এনে দিয়েছেন, যারা অবলম্বনহীন তাদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, যারা ভারাক্রান্ত তাদের বোঝা লাঘব করেছেন—"তোমাদের সব বোঝা আমার ওপর ফেলে দিয়ে আপন মনে চলতে থাক।" তাই তো হরি মহারাজ বলেছিলেন যে, স্বামীজীর বাণী শোয়া লোককে দাঁড় করিয়ে দেয়, দাঁড়ান লোককে চলমান করে আর চলছে এমন লোককে বেগবান করে তোলে। যারা বিরোধিতা করেছে, স্বামীজী তাদের ক্ষমা করেছেন, করুণাবোধ করেছেন তাদের দীনতায় ও নিবু্দ্ধিতায়। সাধনজীবনে যারা হোঁচট খেয়েছে বা পেছিয়ে পড়েছে তাদের জন্য দিয়েছেন আশার আলো, শুনিয়েছেন উৎসাহের কথা—"ভালোর দিকে যাবার পথটি সবচেয়ে দুর্গম ও বন্ধুর। এটাই আশ্চর্যের কথা যে, এত লোক সফল হয়; অনেকে যে পড়ে যায় তাতে অবাক্ হবার কিছু নেই। সহস্র পদস্খলনের মধ্য দিয়েই চরিত্র গড়ে তুলতে হবে।" এই যে দরদ দিয়ে কথা বলা, মনের সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তুলে দেওয়া—এটি লাটু মহারাজের মতো আপনভোলা মানুষেরও দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। বিদেশ থেকে ফিরে কলকাতার নাগরিক সংবর্ধনার উত্তরে স্বামীজী যে-বক্তৃতা করেন সেটি শুনে লাটু মহারাজ বলেছিলেন, "দেখতে পেলুম স্বামীজীর ফায়ার করবার শক্তি বেড়ে গেছে। তাঁর কথা শুনতে শুনতে লোকগুলোর দিল্ যে বেড়ে যাচ্ছে তা বেশ বুঝতে পারলুম।" পণ্ডিতের মুখে উপনিষদ্-ব্যাখ্যা শুনে আপন অনুভূতির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে যে-সাধক মন্তব্য করতে পারেন "ঠিক বলেছ", তিনি তো 'আধ্যাত্মিক রাজ্যের নেপোলিয়নে'র 'জড়-বিজ্ঞান-কৌরব-রণে'র ফায়ারিং রহস্য ধরে ফেলবেনই। কিন্তু এই ফায়ারিং যাদের ওপরে হয়েছিল তাদের অবস্থা কেমন হল? ফায়ারিং-এর আঘাত যাদের মনে লেগেছিল তাদের পরিণতি কি হল? আহত মানুষগুলি অর্থাৎ বিবেকানন্দের বিবেকবর্ষী বাণী শ্রবণে সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তিবৃন্দ সামলে রাখতে পারেন নি ত্যাগের দুর্দমনীয় বাসনা ও জীবনের শ্রেষ্ঠতম কর্তব্যবোধকে। উপনিষদের কথা "ত্যাগেনৈকেঽমৃতত্বমানশুঃ" স্বামীজীর মুখে জীবন্ত হয়ে দেখা দিল। স্বামীজী নির্দেশ করলেন 'ত্যাগেনৈকেন'—একমাত্র ত্যাগের দ্বারা লভ্য সেই সত্য। আলাসিঙ্গা গুডউইন্ মার্গারেট ম্যাকলাউড কৃষ্টীন অজয়হরি হরিপদ সুধীর কালীকৃষ্ণ ও সুরজ রাওকে দিয়ে তালিকার শুরু মাত্র। শেষ যে কবে হবে ও কোথায় হবে কেউ তা বলে দিতে পারেন বলে মনে হয় না। "আগামী পঞ্চাশ বছরের জন্য জননী জন্মভূমি তোমার একমাত্র আরাধ্য দেবতা" বাণীটি শত সহস্র যুবকের প্রাণে আগুন জেলে দিয়েছিল, যার পরিণাম "মুক্তির মন্দির-সোপান-

তলে কত প্রাণ হল বলিদান"-এর মধ্য দিয়ে ১৯৪৭-এর স্বাধীনতালাভ। বিদেশী মনীষী রমাঁ রলাঁও অনুভব করেছিলেন যে, সময়ের দীর্ঘ ব্যবধান ভেদ করে বেঠোভেনের সঙ্গীতের মত মিষ্ট সেই কণ্ঠস্বর তাঁর হৃদয়ের গভীরে সুরের ঝঙ্কার তুলছে। ফায়ারিং বা সুরমূর্ছনা যেখানে যেমন দরকার সেখানে তেমন করে স্বামীজী কাজ করে গেছেন, যাচ্ছেন ও যাবেন। কেবলমাত্র দাগা বুলিয়ে ক্ষান্ত হবার মানুষ তিনি তো নন। সকলকে জোর করে টেনে এনে দাগে তিনি ফেলবেনই। বাধা দেওয়ার মত সামর্থ্য যে কারও নেই তা তিনি নিজেই বলে দিয়েছিলেন। অভিনয় শেষ করার আগে রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায়ের প্রাক্‌কালে, গ্রীন-রুমের দরজার চাবি হাতে নিয়ে নায়ক শুনিয়ে দিয়ে গেছেন—"শরীরটাকে ছেঁড়া কাঁথার মত ফেলে দেবো বটে, কিন্তু প্রতিটি মানুষের ব্রহ্মানুভূতি না হওয়া পর্যন্ত প্রেরণা যোগান থেকে আমি বিরত হবো না।"

দাগা বোলান, দাগ দেওয়া আর মানুষের মনগুলোকে সেই দাগে দাগে ঘষে দেওয়ার এ এক নোতুন নজির।

সমালোচনা

বেদান্তকামধেনুঃ (দশশ্লোকী): ভগবান শ্রীনিম্বার্কাচার্য। ব্রজবিদেহী মহন্ত ও চতুঃসম্প্রদায়ের শ্রীমহন্ত শ্রী১০৮ স্বামী ধনঞ্জয়-দাসজী কাঠিয়াবাবা তর্ক-তর্ক-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক প্রণীত অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ও তত্ত্বদীপিকা নামক টীকাসহ। (১৯৭৩), পৃষ্ঠা ১৬+২৯৮, মূল্য ৭·৫০ টাকা।

ভারতদর্শনসার বেদান্ত-দর্শনের সৃজনী-শক্তি অথবা 'নব-নবোন্মেষশালিনী প্রতিভা'র কথা সর্বজনবিদিত সত্য। একটিমাত্র মূল বেদান্ত-দর্শনকে আশ্রয় ক'রে দশটি প্রধান বেদান্ত-সম্প্রদায় তাদের স্ব স্ব বহু শাখাপ্রশাখা-সমেত যে ভাবে বর্দ্ধিত হয়ে ভারতের তথা জগতের দর্শন-শাস্ত্রকে সুসজ্জিত সুসমৃদ্ধ ও সুবিস্তৃত করেছে, তা সত্যই বিস্ময়কর এবং আনন্দজনক। এই সকল বেদান্ত-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাজ্ঞশ্রেষ্ঠ ও ভক্তপ্রবর নিম্বার্কাচার্যের 'স্বাভাবিক-দ্বৈতাদ্বৈত-বাদ' একটি বিশিষ্ট ও প্রকৃষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে। বেদান্ত-দর্শনের প্রধানতম সমস্যা হ'ল 'অদ্বৈত' এবং 'দ্বৈত' অর্থাৎ ব্রহ্ম অথবা ঈশ্বর, এবং চিৎ ও অচিৎ অথবা জীব ও জগতের মধ্যে সম্বন্ধ-নির্ণয়। এই দিক থেকে এক দিকে রয়েছেন চরমপন্থী অদ্বৈতবাদী শঙ্কর; অন্য দিকে রয়েছেন আরেক চরমপন্থী দ্বৈতবাদী মধ্ব; এবং মধ্যে রয়েছেন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতা-দ্বৈতবাদী রামানুজ প্রমুখ বহু শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। কিন্তু কেউ 'দ্বৈত' এবং 'অদ্বৈত'কে সমান মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি, একমাত্র নিম্বার্ক ছাড়া। সত্যই সমন্বয়বাদী আচার্য নিম্বার্ক যেরূপ সুনিপুণ যুক্তিসঙ্গতভাবে 'দ্বৈত' ও 'অদ্বৈত', ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ডকে রক্ষা করেছেন; ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ—এই ত্রিতত্ত্বের স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য, স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য, স্ব স্ব স্বরূপ-গুণ-শক্তি, স্ব স্ব মহিমা-গরিমা-মধুরিমা সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ রেখেও পরস্পরকে পরস্পরের সঙ্গে সমন্বিত করেছেন, সেরূপ জগতের দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসেই বিরল এবং সেজন্য বিশেষ প্রশংসার্হ।

অথচ দুঃখের বিষয় এই যে, আজ পর্যন্ত শঙ্কর ও রামানুজের ন্যায় নিম্বার্কের নাম সেরূপ সুবিদিত নয়; এবং ভারত তথা জগতের দর্শন-

শাস্ত্রে তাঁর এই অতুলনীয় দানও যথেষ্ট সমাদৃত নয়। সেই দিক থেকে বর্তমান গ্রন্থটি বিশেষ মূল্যবান। 'বেদান্তকামধেনুঃ (দশশ্লোকী)' নিম্বার্ক-দর্শন-সম্বন্ধীয় মাত্র দশটি শ্লোকের সমাহার। কিন্তু তাদেরই মাধ্যমে স্বভাবতঃ স্বল্পভাষী নিম্বার্কাচার্য তাঁর অপূর্ব মতবাদের মূল তত্ত্বগুলি অতি সুন্দরভাবে প্রকাশিত করেছেন সগৌরবে। সেজন্যই নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের অতি প্রিয় এই গ্রন্থটি 'বেদান্তকামধেনুঃ' এই সুমধুর নাম-শোভিত।

শ্রীমৎ স্বামীজী মহারাজের বঙ্গানুবাদ মূলানুগ এবং সুবোধ্য ও সুপাঠ্য। সেজন্য, এই অতি মনোরম অনুবাদ-গ্রন্থটি দার্শনিক ও সাধারণ জন, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী, গবেষক ও সাধারণ কৌতূহলী ও জ্ঞানপিপাসুর পক্ষে সমান উপযুক্ত। অনুবাদের পূর্বে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যে অন্বয়টি সংযোজিত করা হয়েছে, তা-ও সকলের পক্ষেই বিশেষ সাহায্যকারী।

সর্বাপেক্ষা প্রশংসার্হ শ্রীমৎ স্বামীজী মহারাজ কর্তৃক বিরচিত সার্থকনামা 'তত্ত্বদীপিকা' নামক টীকাটি। বস্তুতঃ নামে 'টীকা' হ'লেও, এটি সাধারণ টীকামাত্রই নয়—বরং একে অনায়াসেই বলা চলে নিম্বার্ক-বেদান্তসম্বন্ধীয় একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ। কারণ, এতে নিম্বার্ক-বেদান্তের 'স্বাভাবিক-দ্বৈতাদ্বৈতবাদ' অতি যুক্তিসঙ্গত এবং শাস্ত্রসম্মতভাবে প্রপঞ্চিত করা হয়েছে। নাতিবিস্তৃত এই টীকাটি পাঠ করলেই নিম্বার্ক-বেদান্ত-দর্শনের মূল তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার ধারণা করা যায়। সেই দিক থেকে এই অভিনব টীকাটি নিশ্চয়ই বিশেষ আদরণীয়।

এই জ্ঞানগর্ভ টীকাটির ভাষাও লক্ষণীয়। দুরূহ দার্শনিক-তত্ত্ব-প্রকাশক হয়েও, তা যথেষ্ট সুবোধ্য সুললিত ও সুমধুর।

আমাদের সকলের পরমপ্রিয় বিশ্ববন্দ্য আচার্য নিম্বার্কের মর্মোত্থ ভাব-ভাবনার মূর্ত প্রতীক এই গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেণীর পাঠক-চিত্ত জয় করবে। তার জয়যাত্রা অব্যাহত হোক!

ডক্টর রমা চৌধুরী

সোনা রূপা নয়: শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী। প্রকাশক: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০১২ (১৩৮১), পৃষ্ঠা ৪৮০, মূল্য কুড়ি টাকা।

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবীর সুদীর্ঘ সারস্বত সাধনার নিষ্কর্ষ 'সোনা রূপা নয়' অবশ্যই অন্য ধাতুতে গড়া। সে উপাদানের নাম প্রজ্ঞা এবং অসীম মানবপ্রীতির এই আলোকিত মন্দির নির্মাণের রীতি অকৃত্রিম সরলতা। ১৩২৭ থেকে ১৩৭৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রায় পঞ্চাশ বছরের সাহিত্যকৃতির ফলশ্রুতি পঞ্চাশটি ছোট গল্পের এক পরম সুন্দর সম্ভার এই গ্রন্থখানি। গল্পগুলির পটভূমি শুধু বাঙলা নয়, রাজস্থান, পাঞ্জাব, বিহার, দিল্লি, কাশী, পুরী ইত্যাদি; পাত্রপাত্রী কেবল বাঙালী নয়, ভারতের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের নানা মাপের ও ধাপের মানুষ। লেখিকা তাঁর সূক্ষ্ম স্বচ্ছ বহুব্যাপী দৃষ্টির শুচিস্নিগ্ধ আলোয় উদ্ভাসিত করেছেন তাদের বিচিত্র চলচ্ছবি।

মৃদুস্বর গল্পগুলির মূল সুর বিষাদের। এই বিষাদকে লেখিকা স্বাদিষ্ঠ করেছেন চিরায়ত সাহিত্যের রসে জারিত করে। চমকপ্রদ ঘটনার ঘনঘটা নেই, অবাক্-করা পরিণতি নেই, নেই তত্ত্বের ভার বা প্রকরণের বাহার। আছে বহু জীবন্ত নরনারী, বিশেষত নারী, এবং তাদের একালের ছিন্নতার ফাঁকে ফাঁকে দেখা চিরকালের রহস্য। সব জুড়ে আছে একটি শান্ত পরিচ্ছন্ন পরিমণ্ডল যা হাল আমলের বাঙলা লেখায় প্রায় নিশ্চিহ্ন। আর আছে, সর্বোপরি,

গল্প বলার অসামান্য নৈপুণ্য ও ভাষার লাবণ্য।

প্রত্যেকটি গল্পই এমন এক মননশীল মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ যার উষ্ণতা আছে কিন্তু উত্তাপ নেই। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখ দাবি করে: 'সেই ছেলেটা', 'পঞ্চাশোধ্বে', 'ময়ুর-সিংহাসন', 'একানড়ে' এবং 'শেঠানীজী'। গল্পগুলির বিন্যাস রচনাকাল-অনুক্রমিক নয়। বিষয়, ভাব বা ঘটনাস্থলের পারম্পর্য অনুসারেও সেগুলি সাজানো হয়নি। অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে বোলেও বোধ হয় না। এ যেন random harvest. কিন্তু what a harvest! (নিয়মের শিকল ভাঙা আশ্চর্য ফসল!)

এমন মহৎ সাহিত্যকে পুরস্কৃত করার কাজ পড়ুয়ার হাতে ও মহাকালের আদালতেই হয়তো ছেড়ে দেওয়া উচিত। তবু নগদ বিদায়ের প্রচলিত প্রথাপদ্ধতি চলেছে ও চলবে। সম্প্রতি রবীন্দ্র পুরস্কার নিয়ে তুমুল ঝড় উঠেছিল। 'সোনা রূপা নয়' এই বহুবিতর্কিত পুরস্কারটি পেয়ে একথা প্রমাণিত করেছে যে যথার্থ যোগ্যতা তর্কাতীত স্বীকৃতি অর্জন করতে পারে।

পরশুরাম, তারাশঙ্কর, সজনীকান্ত প্রমুখ সাহিত্যের দিক্‌পালরা যে লেখিকার প্রশংসায় পঞ্চমুখ তাঁর লেখা শতাধিক গল্পের মধ্যে থেকে বাছাই-করা এই সংকলনটি সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত বলা বাহুল্য। বইটির সম্পাদক ও প্রকাশক একটি পুণ্যকর্ম সুসম্পন্ন করেছেন। তবে এর ফলে রসবেত্তা পাঠক-পাঠিকার প্রাপ্তির প্রত্যাশা আরো বেড়েই যাবে। লেখিকার পূর্বমুদ্রিত অধুনাবিস্মৃতপ্রায় গ্রন্থরাজি এবং ভাবময় কাব্যধারা যা 'উদ্বোধন'-আদি পত্রিকায় আজও প্রবহমান—বস্তুত তাঁর রচনাসমগ্র—সযত্নে সন্ধান সংগ্রহ করে, ভালো করে সাজিয়ে গুছিয়ে গ্রন্থাবলী-আকারে বের করা একটা মস্ত বড় জরুরী কাজ। আনন্দের কথা, তাঁর 'রচনাবলীর কিছু অংশ' সম্প্রতি একত্রে 'রচনাবলী' নাম দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

বকলম

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণকার্য

ভারত : ঘূর্ণিবাত্যা-ত্রাণ : অন্ধ্রপ্রদেশের ৯টি গ্রামে, ৯১৯টি পরিবারের ১২,৯০৪ ব্যক্তির মধ্যে ৪,০০০ কেজি চাল, ১,৩২৯ কেজি ডাল, ১,৬৪৬ কেজি তেঁতুল, ৮২০ কেজি লংকা, ১৯½ বস্তা লবণ, ২,৬৫৫ কেজি পেঁয়াজ, ২,৮০৫ কেজি আলু, ৩,৬১৯ বাক্স দিয়াশলাই, ৬ ব্যারেল কেরোসিন, ৫ ব্যারেল বাদাম তৈল, ২,০৯১টি জামা, ৪,৯৯৪ মিটার জামার কাপড়, ৬৩৫টি বোনা পোশাক এবং ১৯,০০০ পুরান কাপড়-চোপড় বিতরণ করা হয়। অন্ধ্রের ৮টি গ্রামে ১,০০০টি গৃহ ও তামিলনাড়ুর ২টি গ্রামে ৫৭টি গৃহ, প্রতিটি গৃহ ৫,০০০ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মিত হইতেছে।

বাংলাদেশ : বাগেরহাট দিনাজপুর ও ঢাকা কেন্দ্রের মাধ্যমে রোগীদের চিকিৎসা অব্যাহত আছে। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রের মাধ্যমে দুগ্ধবিতরণও অব্যাহত আছে।

কার্যবিবরণী

বোম্বাই রামকৃষ্ণ আশ্রম ও রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৭৬-৭৭ সনের প্রকাশিত কার্য-বিবরণীর সারসংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

আশ্রম কার্যাবলী :

আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক : আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরে নিত্য পূজা, প্রার্থনা এবং বেদ ও গীতা পাঠ হয়। প্রতি একাদশীতে রাম-নাম-সংকীর্তন হয়। প্রতি শনিবার হিন্দীতে ও প্রতি রবিবার ইংরেজীতে ধর্মবিষয়ক আলোচনা-সভা হয়। আশ্রমের সাধুগণ শহরের মধ্যে এবং বাহিরেও বিভিন্ন স্থানে গিয়া ধর্মালোচনা ও বক্তৃতাদি করেন। গণেশ দুর্গা কালী শিব এবং লক্ষ্মীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধ শংকরাচার্য ও যীশুখ্রীষ্টের জন্মোৎসবও অনুষ্ঠিত হয়।

আশ্রম কর্তৃক প্রতি বৎসর বোম্বাই শহর ও শহরতলীর সমস্ত বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীদের জন্য মারাঠী গুজরাতী হিন্দী ও ইংরেজীতে আবৃত্তি-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। জানুআরি ১৯৭৭-এ অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় ১,৩৭৯ জন বিদ্যার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ৩৫টি বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থিগণ ১১৬টি পুরস্কার পায়।

মিশন কার্যাবলী :

শিক্ষা : কলেজের ছাত্রদের জন্য পরিচালিত একটি ছাত্রাবাসে আলোচ্য বর্ষে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫৬। নিঃশুল্ক পাঠাগার ও শিবানন্দ গ্রন্থাগারে দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে মোট ২২,৫৬৬টি পুস্তক, ৮৬টি দৈনিক ও অন্যান্য সাময়িক পত্র-পত্রিকা ছিল। আলোচ্য বর্ষে ১৬,৯১১টি গ্রন্থ গৃহে পাঠের জন্য দেওয়া হয়। সংলগ্ন নিঃশুল্ক পাঠাগারও বহু বিদ্যার্থী প্রত্যহ ব্যবহার করে।

চিকিৎসা : বহির্বিভাগীয় দাতব্য চিকিৎসালয় ও অন্তর্বিভাগীয় হাসপাতালে আলোচ্য বর্ষে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ১,৮১,৭৫০।

জনহিতকর কার্য : আলোচ্য বর্ষে গুজরাটে বন্যাত্রাণ ও ঘূর্ণিবাত্যাত্রাণকার্যে এবং আসামে বন্যাত্রাণকার্যে মিশন কর্তৃক সংগৃহীত প্রচুর অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহৃত হয়।

আদিবাসী-কল্যাণ : বোম্বাই শহর হইতে ৭০ কিলোমিটার দূরে একটি আদিবাসী পল্লীতে মিশন পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা বিভাগের দ্বারা ১৪,৭৭০ জন আদিবাসীর চিকিৎসা করা হয়। আদিবাসীদের মধ্যে ঔষধ, ভিটামিন, প্রোটিন খাদ্য, বিস্কুট ও পোশাকাদি বিতরণ করা হয়।

নূতন দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৭৬-৭৭-এর প্রকাশিত কার্যবিবরণীর সারসংক্ষেপ নিম্নে দেওয়া হইল :

ধর্ম ও সংস্কৃতি : আশ্রমে নিয়মিত পূজা, ধ্যান, ভজন ; 'রামচরিত-মানস', 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত', 'ভগবদ্গীতা' প্রভৃতি গ্রন্থপাঠ ও আলোচনা করা হয়। এতদ্ব্যতীত আশ্রমের সাধু ও আমন্ত্রিত বক্তাগণ ধর্ম, দর্শন ও শাস্ত্র-গ্রন্থাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। দিল্লী শহরের ভিতরে ও বাহিরেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণক্রমে আশ্রমের সাধুরা নিয়মিত ও নৈমিত্তিক শাস্ত্রালাপ ও বক্তৃতাদি করেন।

শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধদেব, শংকরাচার্য, গুরু নানক, সন্ত তুলসীদাস প্রমুখ মহাপুরুষগণের জন্মতিথি পূজা, পাঠ, ভজন ও বক্তৃতাদির মাধ্যমে পালিত হয়।

শ্রীশ্রীসারদাদেবীর ১২৪তম এবং শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের ১৪২তম জন্মতিথি উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, পাঠ, ভজন ও বক্তৃতাদি হয়। স্বামী বিবেকানন্দের ১১৫তম জন্মোৎসবে আয়োজিত বক্তৃতা ও আবৃত্তি-প্রতিযোগিতায় স্কুল-কলেজের ২,৭৪৬ ছাত্র-ছাত্রী অংশ গ্রহণ করে। বিজয়ীদের মোট ৪,৩২৫ টাকা মূল্যের ৩৫১টি পুরস্কার দেওয়া হয়।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ আলোচ্য বর্ষে দুই বার আশ্রমে শুভাগমন করেন। বহু ভক্ত ও দর্শনার্থী তাঁহার নিকট হইতে সাক্ষাৎভাবে প্রেরণা ও উপদেশ লাভ করেন।

দাতব্য চিকিৎসা : আশ্রম-পরিচালিত যক্ষ্মা চিকিৎসাকেন্দ্রের অন্তঃ ও বহির্বিভাগের মোট ২,৬১৯ জন রোগীকে বিনামূল্যে দামী ঔষধ দেওয়া হয়। এ ছাড়া অন্তর্বিভাগের রোগীদের বিনামূল্যে দুধ ও জলখাবার দেওয়া হয়। বহির্বিভাগের রোগীর সংখ্যা ছিল ১৬,৯০৮, তন্মধ্যে ২,৫১৭ জন নূতন। আঞ্চলিক যক্ষ্মা সমিতির একটি গৃহ-চিকিৎসা ইউনিট আশ্রমের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া কাজ করে। ২৩৩ জন অন্তর্বিভাগের রোগীকে পর্যবেক্ষণ ওয়ার্ডে রাখিয়া চিকিৎসা করা হয়। হোমিও-প্যাথি চিকিৎসা বিভাগে ৭২,০৮৫ রোগী চিকিৎসিত হয়, তন্মধ্যে ৫,৪৩২ জন নূতন।

পুস্তকাগার ও পাঠাগার : পুস্তকের সংখ্যা ছিল ২৮,৪৫৯। ১৩,১২৪ খানি বই পড়িবার জন্য দেওয়া হয়। ১৫টি সংবাদপত্র ও ১১৫টি সাময়িক পত্র ছিল। গড়ে দৈনিক উপস্থিতি ৪০৯। শিশুদের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগও ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পরিচালিত গ্রন্থাগারে ২৬৮ জন ছাত্র ও ২৪৯ জন ছাত্রী সদস্য ছিল। বর্ষশেষে পুস্তকের সংখ্যা ছিল ৪,৯৬৪। গড়পড়তা দৈনিক উপস্থিতি ১০৭।

সারদা মন্দির : সারদা মন্দির ৬ হইতে ১৪ বৎসরের শিশুদের সংস্কৃতি ও নীতি-শিক্ষার সাপ্তাহিক বিদ্যালয়। সারদা মহিলা সমিতির সভ্যাগণের সহায়তায় ইহা পরিচালিত। উপস্থিতির গড় ৩৫। ভজন গল্প প্রভৃতির মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষা দেওয়া হয়। আলোচ্য বর্ষে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ

স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ ইহার বার্ষিক উৎসবে উপস্থিত থাকিয়া শিশুদের আশীর্বাদ করেন।

আর্থিক-সহায়তা: দরিদ্র নরনারী ও দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি বাবদ আশ্রম মোট ৯,৩২২·৯১ টাকা ব্যয় করে।

রায়পুর রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ আশ্রমের ১৯৭৪,এপ্রিল হইতে ১৯৭৭, মার্চ পর্যন্ত তিন বৎসরের প্রকাশিত কার্যবিবরণীর সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ:

ধর্ম ও সংস্কৃতি: শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ, ২রা ফেব্রুআরি ১৯৭৬, একটি নূতন শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির উৎসর্গ করেন। মন্দিরে নিত্য-নিয়মিত সেবা-পূজা, ধ্যান-ভজন ও প্রার্থনা হয়। মহান শিক্ষা-গুরুদের জন্মদিবস প্রকাশ্যভাবে উদ্‌যাপিত হয়। প্রতি রবিবার ধর্মালোচনায় ও একাদশীতে রামনামসংকীর্তনে প্রচুর জন-সমাবেশ হয়। আশ্রমের সাধুগণ আমন্ত্রণক্রমে বিভিন্ন স্থানে ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান ও আলোচনা করেন।

বিবেকানন্দ ধর্মার্থ ঔষধালয়: এলোপ্যাথি বিভাগে ১৩টি উপবিভাগ কার্যরত আছে। ইহাতে নিঃশুল্ক চিকিৎসিত রোগীর মোট সংখ্যা যথাক্রমে—

১৯৭৪-৭৫—৩৫,৮৬২, নূতন রোগী—১০,৩৯৬
১৯৭৫-৭৬—৩৮,৩২১, „ —১২,৫০৬
১৯৭৬-৭৭—৪২,২৭৪, „ —১৪,৬৩৫

হোমিওপ্যাথি বিভাগে নিঃশুল্ক চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা যথাক্রমে—

১৯৭৪-৭৫—২৫,৭৫৬, নূতন রোগী—৩,৭৭৬
১৯৭৫-৭৬—২৫,২১৬ „ —৪,০৯১
১৯৭৬-৭৭—২৩,৬৪৯ „ —৪,২৯১

গ্রন্থাগার ও পাঠাগার: বিবেকানন্দ স্মৃতি গ্রন্থালয়ে পুস্তকের সংখ্যা ছিল ২১,০০০। নির্গমিত পুস্তকের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৮,৬২২, ৩২,৭১৮ এবং ৩০,০২৩। সদস্য-সংখ্যা এক হাজারের উপর। পাঠাগারে ১৪টি দৈনিক পত্র ও ১২৫টি সাময়িক পত্র ছিল। পাঠকসংখ্যা দৈনিক গড়ে ২০০।

বিবেকানন্দ বিদ্যার্থী ভবন: বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের মোট ২০টি ছাত্র এখানে ছিল। বিদ্যার্থীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য যত্ন লওয়া হয়

ত্রাণকার্য: আলোচ্য তিন বছরে ছত্তিসগড়ে ব্যাপক ত্রাণকার্য করা হয়। তিনটি নিঃশুল্ক ভোজন-কেন্দ্রে প্রত্যহ ২,৩০০ অক্ষম ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হয়। ৩,২০০ জন সমর্থ ব্যক্তিকে রুটী ও আধা-মজুরীর পরিবর্তে পুকুর-খনন-কার্যে নিযুক্ত করা হয়। ৯টি পুকুর খুঁড়িয়া ৮৬০ একর জমিতে সেচের সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়। শীতের শস্যক্ষেত্র সিঞ্চনের জন্য মহানদীতে গতি-পরিবর্তনের এক প্রকল্প গৃহীত হয়। নিঃসহায় কৃষকদিগকে গমের ও ধানের বীজ দেওয়া হয়। ১০,০০০-এর অধিক পুরান ধুতি, শাড়ি, লেপ, কম্বল প্রভৃতি ইহাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। দীপালিতে শিশুদিগের মধ্যে নূতন পোশাকও বিতরিত হয়। হরিজন ও আদিবাসীদের ৩৭টি গ্রামে একটি করিয়া পানীয় জলের পাকা কূপ খনন করা হয়। এই সমস্ত ত্রাণকার্যে ১৪২টি গ্রামের ১,৬৪,৯০০ ব্যক্তি উপকৃত হয়। মোট ব্যয় হয় ৫,৬৩,৯৭১ টাকা।

প্রকাশন ও গ্রন্থ-বিক্রয়: শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবপ্রচারে হিন্দীপত্রিকা 'বিবেক-জ্যোতি'র প্রকাশন অব্যাহত আছে। বিভিন্ন ভাষায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য ও চিত্রাদি আশ্রমে পাওয়া যায়

পরিশেষে আশ্রম কর্তৃপক্ষ মন্দির, দাতব্য চিকিৎসালয়, গ্রন্থাগার প্রভৃতির স্থায়িত্বের জন্য স্থায়ী কোষ নির্মাণে উদার আর্থিক সহযোগের আবেদন করিয়াছেন।

উৎসব

ফরিদপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে বিগত ৩১শে জানুআরি স্বামী বিবেকানন্দের ১১৬তম জন্মতিথি ভাবগম্ভীর পরিবেশে স্থানীয় ভক্তগণের উদ্যোগে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ঐ দিন ঊষাকালে শিল্পিগণ মোটরবাসে মাইকযোগে সারা শহর পরিভ্রমণ করিয়া "স্বামীজীসংগীত" মধুরভাবে পরিবেশন করেন। আশ্রমে মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভোগ-নিবেদন ও প্রসাদ-বিতরণ হয়।

অপরাহ্নে আশ্রম-প্রাঙ্গণে কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি রায়বাহাদুর বিনোদলাল ভদ্র ও সহসভাপতি শ্রীসুধীর চক্রবর্তী স্বামীজীর জীবনদর্শন আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় সুকুমার ইতি রেখা ও শ্রীকরুণাময় অধিকারী স্বামীজীগীতি ও শ্যামাসংগীত পরিবেশন করেন।

উপস্থিত সর্বশ্রেণীর নরনারী হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। উৎসব কমিটির আহ্বায়ক শ্রীঅধীর পোদ্দার, সভ্য শ্রীচিত্তরঞ্জন কর, শ্রীকল্যাণ ধর ও শ্রীমিহির রায় অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপনে সর্বপ্রকারে কর্মতৎপর ছিলেন।

দেহত্যাগ

গভীর দুঃখের বিষয়, **স্বামী ভাস্বরানন্দ** (বুদ্ধ মহারাজ) গত ১৯শে মাঘ, রাত্রি ২-৫০ মিনিটে ৭৮ বৎসর বয়সে বারাণসী সেবাশ্রমে দেহত্যাগ করিয়াছেন। শ্বাস- ও হৃদ্‌-যন্ত্রের ক্রমবর্ধমান বৈকল্য, রক্তে ইউরিয়া-বৃদ্ধি ও মস্তিষ্কাংশের ক্ষয়জনিত অসুখ তাঁহার দেহত্যাগের কারণ।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯২০ সালে বেলুড় মঠে যোগদান করেন এবং ১৯২৭ সালে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা প্রাপ্ত হন।

বেলুড় মঠে দুই বৎসর সংঘসেবা করিয়া ১৯২২ সালে তিনি কুয়ালা লামপুরে যান এবং সেখানে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত বেদান্ত-প্রচারে নিরত থাকেন। ঐ সময়ে বক্তৃতা ও আলোচনাদি ছাড়াও 'ভয়েস্ অফ ট্রুথ' নামক পত্রিকাটিকে চালু রাখিবার জন্য তিনি প্রবন্ধাদি লিখিতেন। ১৯২৭-১৯৩১ বরিশালে, ১৯৩২-১৯৪৭ সিঙ্গাপুরে, ১৯৪৮ সালে কুরুক্ষেত্রে (ত্রাণকার্যে), ১৯৪৮-১৯৬৯ বারাণসীতে (সেবাশ্রমের অধ্যক্ষতায়) তাঁহার কর্মজীবন অতিবাহিত হয়। ১৯৬১ সালে তিনি রামকৃষ্ণ মঠের অন্যতম ট্রাস্টী ও রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালক-মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন। শেষ কয়েক বৎসর তিনি বারাণসী সেবাশ্রমেই অবসর-জীবন যাপন করিয়াছিলেন।

সরল মধুর ও অমায়িক স্বভাবের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

তাঁহার দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক!

বিবিধ সংবাদ

ফুসফুসে ক্যানসারের সম্ভাবনা

পৃথিবীর যে সব দেশে ফুসফুসে ক্যানসার-ঘটিত মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশী, ইংলণ্ড ও ওয়েলস তাহাদের অন্যতম। ১৯৭২ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা গিয়াছে যে, ইংলণ্ড ও ওয়েলসে বিশবৎসর বয়সোধ্বর্ জনসাধারণের মধ্যে শতকরা আটজনের ফুসফুসে ক্যানসার হইয়া মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু যদি কেবলমাত্র অধিক পরিমাণে সিগারেট ধূমপান-কারীদের মধ্যে হিসাব করা হয়, তাহা হইলে মৃত্যুর হার দাঁড়ায় শতকরা পচিশ। হিসাবটি ইংলণ্ড-ওয়েলসের হইলেও, অন্যান্য দেশও ওইরূপ অবস্থার দিকে অগ্রসর হইতেছে।

উল্লেখযোগ্য যে, ফুসফুসে ক্যানসার সৃষ্টি হওয়ার একটি কারণ পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া দূষিত হওয়া। ইহা ছাড়া, যে সকল পেশায় ধূলিমিশ্রিত আবহাওয়ায় কাজ করিতে হয়, সেই সকল পেশায় এই রোগ হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা। কিন্তু সিগারেট ধূমপানের সঙ্গে ফুসফুসে ক্যানসার হওয়ার যে শুধু সম্বন্ধ আছে তাহা নয়, সিগারেট ধূমপান বৃদ্ধি পাইলে ওই রোগের হারও বৃদ্ধি পায়।

মোট কথা ইচ্ছা থাকিলে এই রোগকে প্রতিরোধ করা সম্ভব। কিন্তু মুশকিল হইতেছে যে, ধূমপান একটি নেশা এবং ইহা ত্যাগের ইচ্ছা কাহারও মনে জাগরূক করা অতি কঠিন। যাহা হউক, ধূমপানের কুফল সম্বন্ধে জনসাধারণের সচেতনতা বাড়িতেছে এবং যে সকল রোগ নিবারণ করা সম্ভব, ফুসফুসের ক্যানসার হয়তো তাহারই একটি বলিয়া গণ্য হইবে।

[WHO Chronicle, August 1977, p 336]

উৎসব

ধুবড়ী শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম কর্তৃক আয়োজিত ধর্মসভায় বিগত ১৭ই নভেম্বর (১৯৭৭) হইতে ২০শে নভেম্বরের মধ্যে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ 'বদ্ধ ও মুক্ত জীব', 'শ্রীরামকৃষ্ণ' এবং 'শ্রীমা সারদাদেবী' সম্বন্ধে তিন দিন সন্ধ্যায় তিনটি ভাষণ দেন। প্রত্যেকটি ভাষণ শুনিতে সহস্রাধিক লোকের সমাগম হয়।

পাখানজোর (মধ্যপ্রদেশ) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের বিবেকানন্দ হলে বিগত ৭ই ডিসেম্বর ১৯৭৭, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ বেদান্তসম্বন্ধে আলোচনা করেন। স্বামী আত্মানন্দও ধর্মসম্বন্ধে আলোচনা করেন। ৮ই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজা ও গীতাপাঠ হয়। অপরাহ্ণে ধর্মসভায় ভূতেশানন্দজী মহারাজ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' ব্যাখ্যা করেন এবং আত্মানন্দজী শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ভাষণ দেন। ৯ই ভূতেশানন্দজী মহারাজ 'রামকৃষ্ণ শিশুবিদ্যাপীঠ', 'নিবেদিতা পান্থনিবাস' ও 'শ্রীমা পাঠাগার'-এর উদ্বোধন করেন। রাত্রে বিবেকানন্দ হলে 'দক্ষিণেশ্বরের মন্দির'-নামক নাটক অভিনীত হয়।

খুলনা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে বিগত ১লা জানুআরি (১৯৭৮) পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীসারদাদেবীর ১২৫তম শুভ আবির্ভাব-তিথি মঙ্গলারাত্রিক, ষোড়শোপচারে পূজা, ভোগ-নিবেদন, হোম ইত্যাদির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। সারাদিন ভক্তগায়কগণ শ্রীশ্রীমাতৃ-ভজনাদি সঙ্গীত পরি-বেশন করেন। প্রায় ৩৫০ জন ভক্ত খিচুড়ী-

মিষ্টান্নাদি প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় আরাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীমায়ের পূত জীবনী ও বাণী অবলম্বনে লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন সংঘ-সদস্য শ্রীঅনাদি শঙ্কর মুখার্জী এবং শ্রীশ্রীমায়ের কথা আলোচনা ও লিখিত ভাষণ পাঠ করেন শ্রীমতী দীপ্তি মুখার্জী।

পূর্ণিয়া বিবেকানন্দ পল্লীতে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব পালিত হয়। প্রতি-বৎসরের ন্যায় ঐ পল্লীর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩১শে জানুআরি ১৯৭৮, স্বামীজীর জন্মতিথিতে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে এবং ছাত্রছাত্রীগণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পরে ১৯শে ফেব্রুআরি এক সুসজ্জিত মণ্ডপে স্বামীজীর জন্মোৎসব-সভায় পৌরোহিত্য করেন বিহাররাজ্য শিক্ষাবিভাগের সংসদীয় সচিব শ্রীচন্দ্রশেখর ঝা। শ্রীমতী স্বপ্না দে এবং শ্রীস্বপন কুমার রায় কর্তৃক পরিচালিত এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অঞ্জনা প্রান্তিকা পরিণীতা রুবী অর্পিতা শিপ্রা রত্না সমীর অমরেন্দ্র প্রমুখ উক্ত বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীবৃন্দ অংশ গ্রহণ করে। শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বিহাররাজ্যের ভূতপূর্ব মন্ত্রী শ্রীকমল-দেব নারায়ণ সিন্‌হা সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

আগরতলা বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডল স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ৬ই ফেব্রুআরি হইতে ১৩ই ফেব্রুআরি পর্যন্ত স্বামীজীর জীবনের উপর আঁকা বিভিন্ন ছবির মাধ্যমে স্থানীয় সরকারী যাদুঘরে এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে। ১২ই ফেব্রুআরি ৮ কিলোমিটার দূরবর্তী উপজাতি এলাকায় সারাদিনব্যাপী পূজা-র্চনার মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। উপজাতি ভাইবোনেরা ভজন-কীর্তন ও খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করে। ১৪ই 'পাগল-ঠাকুর' ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়।

খিদিরপুর 'সুরবিতানে' গত ১লা জানুআরি সকালে 'শ্রীশ্রীসারদামাতা-বন্দনা' শীর্ষক এক ভক্তিমূলক আবির্ভাব-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন এবং 'অনন্তকরুণাময়ী বিশ্বমাতা মা সারদা' বিষয়ে ভাষণ দেন। অনুষ্ঠানে মাতৃসংগীত পরিবেশিত হয় এবং শিশুদের মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়।

বারাসত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের ১২২তম জন্মতিথি উপলক্ষে গত ২১শে পৌষ হইতে ২৪শে পৌষ চারিদিবসব্যাপী আনন্দোৎসব বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

২১শে প্রাতে ভজন শাস্ত্রপাঠ বিশেষ পূজা ও হোম অনুষ্ঠিত হয়। বারাসত সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের হলঘরে সুরক্ষিত মহাপুরুষ মহা-রাজের (এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন বিদ্যার্থী) প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং সমবেত শিক্ষক ছাত্র ও ভক্ত নরনারীগণের উদ্দেশে সময়োপ-যোগী বক্তৃতা করেন স্বামী তীর্থানন্দ ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীপরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। আশ্রম-প্রাঙ্গণে শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত কর্তৃক স্বামী শিবানন্দ মহারাজের পুণ্যকথা ও ধর্মো-পদেশ সম্বন্ধে উদ্বোধনী ভাষণের পর রামায়ণ-গান পরিবেশন করেন শ্রীকালীপদ দেবনাথ। মধ্যাহ্নে ভক্ত নরনারীগণ অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে রামকৃষ্ণ মিশন রহড়া বালকা-শ্রমের ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক শ্রীশ্রীরামনামসংকীর্তন ও ভজনগান এবং শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ধর্মসঙ্গীত হয়। বৈকালীন ধর্মসভায় স্বামী জিতাত্মানন্দ ও সভাপতি স্বামী তীর্থানন্দ মহা-

পূজ্যজীর জীবন ও বাণীর বিভিন্ন দিক অবলম্বনে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষাল ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

২২শে অপরাহ্নে গৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ের শ্রীনারায়ণ দাস ও শ্রীসুকুমার গোলদারের পরিচালনায় নিমাইসন্ন্যাস পালাকীর্তন হয়। পরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী পরদেবানন্দ। সন্ধ্যায় শ্রীশঙ্করনাথ ঘোষাল সঙ্গীতের আসর পরিচালনা করেন। ২৩শে অপরাহ্নে শ্রীনলিনীকিশোর ঘোষ কর্তৃক ভজন-সঙ্গীত ও শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (ভারত সরকারের সৌজন্যে) কর্তৃক পদাবলীকীর্তন পরিবেশিত হয়। সন্ধ্যায় শ্রীকেদারনাথ মুখোপাধ্যায় 'কলঙ্কভঞ্জন' পাঁচালী কীর্তন করেন।

২৪শে পূর্বাহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীসারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী শিবানন্দের চারি-খানি বৃহদায়তন সুসজ্জিত প্রতিকৃতি চারিটি সিংহাসনে স্থাপন করিয়া অগণিত ভক্ত নরনারী ও বালক-বালিকার এক বিরাট শোভাযাত্রা আশ্রম হইতে বাহির হইয়া ভজনসঙ্গীত ও সংকীর্তন গাহিতে গাহিতে বারাসত শহরের প্রধান রাস্তাগুলি আড়াই ঘণ্টা পরিক্রমান্তে আশ্রমে পুনঃপ্রবেশ করে। শোভাযাত্রায় অংশ-গ্রহণ করেন পতাকাহস্তে ও ব্যাণ্ডপার্টিসহ মিলন সংঘ (কলিকাতা), অগ্রদূত সংঘ—সব পেয়েছির আসর, সত্যভারতী বাণীনিকেতন (নবপল্লী, বারাসত), দোহারিয়া রামকৃষ্ণ ভজনসংঘ এবং রামকৃষ্ণ পাঠচক্রের (কলিকাতা) সদস্য ও কর্মিবৃন্দ। পরে বাউল গান করেন শ্রীনারায়ণ সাহা। মধ্যাহ্নে সমবেত নরনারী সকলেই প্রসাদ গ্রহণ করেন অপরাহ্নে শ্রীধ্রুব চৌধুরীর শ্রীরামকৃষ্ণলীলাগীতি ও শ্রীভূপেন চক্রবর্তীর শ্রীসারদালীলাগীতি পরিবেশিত হয়। সন্ধ্যায় ও রাত্রে শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী বিষয়ক ভক্তিমূলক সঙ্গীতানুষ্ঠান শ্রোতৃগণের মনোরঞ্জন করে।

মন্দিরের প্রবেশপথে চিত্রশিল্পী শ্রীরামপ্রসাদ তালুকদার, শ্রীতন্ময় রায়চৌধুরী ও শ্রীতমাল লোধ কর্তৃক অঙ্কিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম হইতে মানবলীলা-সংবরণ পর্যন্ত জীবনের প্রধান প্রসঙ্গ-গুলির সুশোভন চিত্রাবলী দর্শকদের শ্রদ্ধান্বিত মনোযোগ আকর্ষণ করে।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীর মন্ত্রশিষ্যা **শ্রীমতী বিল্বদলবাসিনী সরকার** গত ১৩ই জানুআরি ১৯৭০, ৭৬ বৎসর বয়সে সিঁথিস্থিত নিজ ভবনে সজ্ঞানে ইষ্টনাম স্মরণ ও শ্রবণপূর্বক এবং শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও নিজ গুরুদেবের প্রতিকৃতি দর্শন-প্রণাম ইত্যাদি করিয়া পরলোকগমন করেন। হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় তাঁহার দেহান্ত হয়। সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত নিজেই গীতাপাঠ করেন এবং রাত্রি ১২টা পর্যন্ত সজ্ঞানে স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা-চলাফেরা করেন। তিনি সারাজীবন সংসারের সকল কর্মের মধ্যেও নিত্য পূজাপাঠ ধ্যানজপ ইত্যাদি নিয়মিত করিতেন এবং আত্মীয়স্বজনের প্রতি সকল কর্তব্য নিষ্ঠার সহিত পালন ও সাধুসেবা করিতে ভালবাসিতেন

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **পারুলবালা ঘোষ** গত ২৬শে জানুআরি ১৯৭৮, বেলা ১.২০ মিনিটে কলিকাতায় নিজ বাসভবনে ৭৭ বৎসর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারে শ্রীমা সারদা-দেবীর প্রদত্ত ও সুদীর্ঘকাল সযত্নে সংরক্ষিত একটি শাড়ির দ্বারা তাঁহার মরদেহ ভূষিত করিয়া শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয় এবং শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়।

ইঁহাদের দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক!

উদ্বোধন।

২য় বর্ষ।]   ১লা ফাল্গুন। (১৩০৬ সাল)   [৩য় সংখ্যা।]

পরমহংসদেবের উপদেশ।

১। নিজে সাধু হ'লে তবে সাধুকে চিন্তে পারে। যেমন সুতোর কাজ যে করে, সে সুতো দেখ্‌লেই কোন্ নম্বরের সুতো, কি দর, ঠিক বলে দিতে পারে।

২। একটী সাধু একদিন এক গাছতলায় বোসে সমস্ত রাত ঈশ্বরচিন্তা কর্‌তে কর্‌তে সমাধিস্থ হয়ে পড়ে আছেন। ভোর রাত্রে একজন চোর তাঁকে দেখ্‌তে পেয়ে আপ্‌নাআপ্‌নি ব'লতে লাগ্‌লো "সমস্ত রাত্তির চুরির চেষ্টা ক'রে এখন গাছতলায় প'ড়ে বেশ ঘুমুচ্ছে, এখনি পুলিষ আস্‌বে আর ধরে নিয়ে যাবে—আমি এইবেলা পালাই।" একজন মাতাল সেই রাস্তায় যেতে যেতে দেখে ব'ল্‌লে "এ দেখ্‌চি সমস্ত রাত্তির মদ্ টদ্ টেনে নেশায় বেহুঁস হ'য়ে পড়ে আছে —আমি আর পড়্‌ছি না বাবা।" শেষে একজন ভগবদ্ভক্ত—সে দেখে চিন্‌লে যে, ইনি একজন মহাসাধু "ঈশ্বরপ্রেমে সমাধিতে বাহ্যজ্ঞানহারা হয়ে পড়ে আছেন" এই ব'লে তাঁর পদধূলি নিয়ে তাঁর পদসেবা কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লে।

৩। সাধু সন্ন্যাসীরা সাপের জাত। সাপ যেমন নিজের জন্য কখন গর্ত্ত খুঁড়ে বাস করে না, ইঁদুরের গর্ত্তে থাকে, একটা গর্ত্ত ভাঙ্গলে আর একটায় গিয়ে ঢোকে, সেইরকম সাধুরা নিজের জন্য ঘর বাঁধে না, পরের ঘরে আজ এ বাড়ি কাল সে বাড়ি ক'রে দিন কাটায়।

৪। গরুর পালে যদি অন্য কোন জন্তু এসে ঢোকে, তাহ'লে সব গরুগুলো তা'কে গুঁতিয়ে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু গরু এলে তার সঙ্গে গা চাটাচাটী করে। সেইরকম যখন ভক্তের সঙ্গে ভক্তের দেখা হয়, তখন তারা উভয়ে ধর্ম্মকথা কহে, বড় আনন্দ করে, আর হঠাৎ সে সঙ্গ ত্যাগ ক'র্‌তে ইচ্ছা করে না; কিন্তু বিজাতীয় লোক এলে তার সঙ্গে মেশামিশি করে না।

৫। যে সকল লোক নিজে কখনও ধর্ম্মচর্চ্চা করে নাই, অন্যকেও ধ্যান পূজা কর্‌তে দেখ্‌লে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকদের নিন্দা করে, সাধন অবস্থায় কখনও এরূপ লোকদের সঙ্গ কর্‌বে না। তাদের কাছ থেকে একেবারে দূরে থাকিবে।

বিলাতযাত্রীর পত্র।

(স্বামী বিবেকানন্দ প্রেরিত।)

[১ম বর্ষ, ২৩শ সংখ্যার পর]

সুয়েজ খাল।

এ সুয়েজ খাল খাতস্থাপত্যের এক অদ্ভুত নিদর্শন। ফর্ডিনেণ্ড লেসেপ্স নামক এক ফরাসী স্থপতি এই খাল খনন করেন। ভূমধ্যসাগর আর লোহিত সাগরের সংযোগ হয়ে, ইয়ুরোপ আর ভারতবর্ষের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের অত্যন্ত সুবিধা হয়েছে। মানবজাতির

      (চৈত্র, ১৩৮৪, পৃঃ ১৫৭)

[পুনর্মুদ্রণ]

(ভারতের বাণিজ্যই সকল জাতির উন্নতির কারণ।)

উন্নতির বর্ত্তমান অবস্থার জন্য যত গুলি কারণ প্রাচীনকাল থেকে কায করছে, তার মধ্যে বোধ-হয়,ভারতের বাণিজ্য সর্ব্বপ্রধান। অনাদি কাল হতে, উর্ব্বরতায় আর বাণিজ্য শিল্পে, ভারতের মত দেশ কি আর আছে? দুনিয়ায় যত সুতি কাপড়, তুলা, পাট, নীল, লাক্ষা, চাল, হীরে, মতি ইত্যাদির ব্যবহার ১০০ বৎসর আগে পর্য্যন্ত ছিল, তা সমস্তই ভারতবর্ষ হতে যেত। তা ছাড়া উৎকৃষ্ট রেশমি পশ্‌মীনা কিংখব ইত্যাদি এদেশের মত কোথাও হত না। আবার লবঙ্গ এলাচ মরিচ জায়ফল জয়িত্রি প্রভৃতি নানাবিধ মসলার স্থান ভারতবর্ষ। কাজেই অতি প্রাচীনকাল হতেই যে দেশ যখন সভ্য হত, তখনই ঐ সকল জিনিসের জন্য ভারতের উপর নির্ভর। এই বাণিজ্য

(ভারতের পথ।)

দুটী প্রধান ধারায় চল্‌তো: একটি ডাঙ্গা পথে আফগানি ইরানি দেশ হয়ে, আর একটি জলপথে —রেডসি হয়ে। সিকন্দর সা ইরান-বিজয়ের পর নিয়ার্কুস্ নামক সেনাপতিকে জলপথে সিন্ধু-নদের মুখ হয়ে সমুদ্র পার হয়ে লোহিত সমুদ্র দিয়ে রাস্তা দেখ্‌তে পাঠান। বাবিল ইরাণ গ্রীস রোম প্রভৃতি প্রাচীন দেশের ঐশ্বর্য্য যে কত পরিমাণে ভারতের বাণিজ্যের উপর নির্ভর করত, তা অনেকে জানে না। রোমধ্বংসের পর মুসলমানি বোগ্দাদ ও ইতালীয় ভিনিস ও জেনোয়া, ভারতীয় বাণিজ্যের প্রধান পাশ্চাত্য কেন্দ্র হয়েছিল। যখন তুর্কেরা রোমসাম্রাজ্য দখল ক'রে ইতালীয়দের ভারত-বাণিজ্যের রাস্তা বন্ধ করে দিলে, তখন জেনোয়ানিবাসী কলম্বুস (ক্রিষ্টো-ফোরো কলম্বো) আটলান্টিক পার হয়ে ভারতে আস্‌বার তনন্ রাস্তা বার কর্‌বার চেষ্টা করেন, ফল—আমেরিকা মহাদ্বীপের আবিক্রিয়া। আমেরিকায় পৌঁছেও কলম্বুসের ভ্রম যায় নি যে, এ—ভারতবর্ষ নয়। সেই জন্যই আমেরিকার আদিম নিবাসীরা এখনও ইণ্ডিয়ান নামে অভিহিত। বেদে সিন্ধু নদের সিন্ধু ইন্দু দুই নামই পাওয়া যায়, ইরাণীরা হিন্দু, গ্রীকরা ইণ্ডুস্ করে তুল্‌লে, তাই থেকে ইণ্ডিয়া-ইণ্ডিয়ান। মুসলমানি ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে হিন্দু দাঁড়াল—কালা (খারাপ), যেমন এখন—নেটিভ্।

এদিকে পোর্ত্তুগীসরা ভারতের নূতন পথ, আফ্রিকা বেড়ে, আবিষ্কার কর্‌লে। ভারতের লক্ষ্মী পোর্ত্তুগালের উপর সদয়া হলেন; পরে ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ। ইংরেজের ঘরে, ভারতের বাণিজ্য রাজস্ব সমস্তই; তাই ইংরেজ এখন সকলের উপর বড় জাত। তবে এখন আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ভারতের জিনিষপত্র অনেক স্থলে ভারত অপেক্ষাও উত্তম উৎপন্ন হচ্চে, তাই ভারতের আর তত কদর নাই। একথা ইউরোপীরা স্বীকার কর্ত্তে চায় না। ভারত—নেটিভ্‌পূর্ণ, ভারত যে তাঁদের ধন সভ্যতার প্রধান সহায় ও সম্বল, সে কথা মান্‌তে চায় না, বুঝতেও চায় না। আমরাও বোঝাতে কি ছাড়্‌বো? ভেবে দেখো কথাটা কি। ঐ যারা

(ভারতের ছোটজাত।)

চাষা ভূষা তাঁতি জোলা ভারতের নগণ্য মনুষ্য, বিজাতিবিজিত স্বজাতিনিন্দিত ছোটজাত, তারাই আবহমান কাল নীরবে কাজ করে যাচ্চে, তাদের পরিশ্রমফলও তারা পাচ্ছে না। কিন্তু ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক নিয়মে দুনিয়াময় কত পরিবর্ত্তন হয়ে যাচ্ছে। দেশ সভ্যতা প্রাধান্য ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে। হে ভারতের শ্রমজীবি, তোমার নীরব অনবরত নিন্দিত পরিশ্রমের ফল-

(৮০তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ১৫৮)

স্বরূপ বাবিল, ইরান্, আলকসন্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভিনিস, জেনোয়া, বোগদাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পোর্ত্তুগাল, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য্য; আর তুমি? —কে ভাবে একথা। স্বামিজী, তোমাদের পিতৃপুরুষ দুখানা দর্শন লিখেছেন, দশখানা কাব্য বানিয়েছেন, দশটা মন্দির করেছেন - তোমাদের ডাকের চোটে গগন ফাট্‌ছে, আর যাদের রুধিরস্রাবে মনুষ্যজাতির যা কিছু উন্নতি, তাদের গুণগান কে করে? লোকজয়ী ধর্ম্মবীর রণবীর কাব্যবীর সকলের চোখের উপর সকলের পূজ্য, কিন্তু কেউ যেখানে দেখে না, কেউ যেখানে একটা বাহবা দেয় না, যেখানে সকলে ঘৃণা করে, সেখানে বাস করে অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি, নির্ভীক কার্য্যকারিতা,—যে আমাদের গরীবের ঘর দুয়ারে দিন রাত মুখ বুজে কর্ত্তব্য করে যাচ্ছে, তাতে কি বীরত্ব নাই? বড় কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়। ১০ হাজার লোকের বাহবার সামনে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয়, কিন্তু অতিক্ষুদ্র কার্য্যে সকলের অজান্তেও যিনি সেই নিঃস্বার্থতা কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য। সে তোমরা,—ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবী। তোমাদের প্রণাম করি।

(সুয়েজ খালের ইতিহাস।)

এ সুয়েজ খালও অতি প্রাচীন জিনিস্। প্রাচীন মিসরের ফেরো বাদসাহের সময় কতকগুলি লবণাম্বু জলা, খাতের দ্বারা সংযুক্ত করে উভয় সমুদ্রস্পর্শী এক খাত তৈয়ার হয়। মিসরে রোমরাজ্যের শাসনকালেও মধ্যে মধ্যে ঐ খাত মুক্ত রাখ্‌বার চেষ্টা হয়। পরে মুসলমান সেনাপতি অমরু, মিসর বিজয় করে ঐ খাতের বালুকা উদ্ধার ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বদলে একপ্রকার নূতন করে তোলেন।

তারপর বড় কেউ কিছু করেন নি। তুরস্ক সুলতানের প্রতিনিধি মিসর খেদিব ইস্মায়েল ফরাসীদের পরামর্শে, অধিকাংশ ফরাসী অর্থে এই খাত খনন করান। এ খালের

(সুয়েজে জাহাজ যাতায়াতের বন্দোবস্ত।)

মুস্কিল হচ্চে যে, মরুভূমির মধ্য দিয়ে যাবার দরুন পুনঃ পুনঃ বালিতে ভরে যায়। এই খাতের মধ্যে বড় বাণিজ্যজাহাজ একখানি একবারে যেতে পারে। শুনেছি যে, অতি বৃহৎ রণতরী বা বাণিজ্যজাহাজ একেবারেই যেতে পারে না। এখন, একখানি জাহাজ যাচ্ছে আর একখানি আস্‌ছে, এ দুয়ের মধ্যে সংঘাত উপস্থিত হতে পারে। এইজন্য সমস্ত খালটী কতকগুলি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক ভাগের দুই দিকে হয় দুটী জলা বা খাল প্রশস্ত করে দেওয়া। ভূমধ্যসাগরমুখে প্রধান আফিস, আর প্রত্যেক বিভাগেই রেল ষ্টেসনের মত ষ্টেসন। সেই প্রধান আফিসে জাহাজটী খালে প্রবেশ করবামাত্রই ক্রমাগত তারে খবর যেতে থাকে। কখানি আস্‌ছে কখানি যাচ্ছে এবং প্রতি মুহূর্ত্তে তারা কে কোথায়, তা খবর যাচ্ছে এবং একটী নক্সার উপর চিহ্নিত হচ্ছে। একখানির সাম্‌নে যদি আর একখানি আসে এইজন্য এক ষ্টেসনের হুকুম না পেলে আর এক ষ্টেসন পর্য্যন্ত জাহাজ যেতে পায় না।

এই সুয়েজখাল ফরাসীদের হাতে। যদিও খালকোম্পানীর অধিকাংশ শেয়ার এখন ইংরাজদের, তথাপিও সমস্ত কার্য ফরাসীরা করে। এটী রাজনৈতিক মীমাংসা।

(চৈত্র, ১৩০৬, পৃঃ ১৫৯)

(ভূমধ্যসাগর।)

এবার ভূমধ্যসাগর। ভারতবর্ষের বাইরে এমন স্মৃতিপূর্ণ স্থান আর নাই। এসিয়া, আফ্রিকা, প্রাচীন সভ্যতার অবশেষ। একজাতীয় রীতি নীতি খাওয়া দাওয়া শেষ হল, আর এক প্রকার আকৃতি প্রকৃতি আহার বিহার পরিচ্ছদ আচার ব্যবহার আরম্ভ হল—ইউরোপ এলো। সুধু তাই নয়, নানা বর্ণ জাতি সভ্যতা বিদ্যা ও আচারের বহু শতাব্দীব্যাপী যে মহা সংমিশ্রণের ফলস্বরূপ এই আধুনিক সভ্যতা, সে সংমিশ্রণের মহাকেন্দ্র এই খানে। যে ধর্ম্ম যে বিদ্যা যে সভ্যতা যে মহাবীর্য্য আজ ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হয়েছে, এই ভূমধ্য সাগরের চতুঃপার্শ্বই তার জন্মভূমি। এই দক্ষিণে, ভাস্কর্য্যবিদ্যার আকর—বহুধনধান্যপ্রসূ অতি প্রাচীন মিসর; পূর্ব্বে ফিনিসিয়ান্, ফিলিষ্টিন্, য়াহুদী, মহাবল বাবিল, আসীর ও ইরাণী সভ্যতার প্রাচীন রঙ্গভূমি আসিয়া মাইনর। উত্তরে—সর্ব্বাশ্চর্য্যময় গ্রীকজাতির প্রাচীন লীলাক্ষেত্র।

(জগতের প্রাচীন কাহিনী।)

স্বামিজী, দেশ নদী পাহাড় সমুদ্রের কথা ত অনেক শুন্‌লে, এখন প্রাচীন কাহিনী কিছু শোন। এ প্রাচীন কাহিনী বড় অদ্ভুত। গল্প নয়—সত্য, মানবজাতির যথার্থ ইতিহাস। এই সকল প্রাচীন দেশ কালসাগরে প্রায় লয় হয়েছিল। যা কিছু লোকে জান্‌তো, তা প্রায় প্রাচীন যবন ঐতিহাসিকের অদ্ভুত গল্পপূর্ণ প্রবন্ধ অথবা বাইবল নামক য়াহুদী পুরাণের অত্যদ্ভুত বর্ণনা মাত্র। এখন পুরাণো পাথর, বাড়ী, ঘর, টালিতে লেখা পুঁথি, আর ভাষাবিশ্লেষ, শত মুখে গল্প করছে। এ গল্প এখন সবে আরম্ভ হয়েছে, এখনই কত আশ্চর্য্য কথা বেরিয়ে পড়েছে, পরে কি বেরুবে কে জানে? দেশদেশান্তরের মহা মহা পণ্ডিত দিনরাত এক টুক্‌রো শিলালেখ বা ভাঙ্গা বাসন বা একটা বাড়ি বা একখানা টালি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন আর সেকালের লুপ্ত বার্ত্তা বার করছেন।

যখন মুসলমান নেতা ওস্‌মান্ কনষ্টান্টিনোপল দখল করলে, সমস্ত পূর্ব্ব-ইউরোপে ইসলামের ধ্বজা সগর্ব্বে উড়্‌তে লাগ্‌ল, তখন প্রাচীন গ্রীকদিগের যে সকল পুস্তক বিদ্যাবুদ্ধি তাদের নির্বীর্য্য বংশধরেদের কাছে লুকান ছিল, তা পশ্চিম ইয়ুরোপে পলায়মান গ্রীকদের সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়্‌ল। গ্রীকরা রোমের বহু কাল পদানত হয়েও বিদ্যাবুদ্ধিতে রোমকদের গুরু ছিল। এমন কি, গ্রীকরা কৃশ্চান হওয়ায় এবং গ্রীক ভাষায় কৃশ্চানদের ধর্ম্মগ্রন্থ লিখিত হওয়ায় সমগ্র রোমক সাম্রাজ্যে কৃশ্চান ধর্ম্মের বিজয় হয়। কিন্তু প্রাচীন গ্রীক, যাদের আমরা যবন বলি, যারা ইউরোপী সভ্যতার আদ্‌গুরু, তাদের সভ্যতার চরম উত্থান কৃশ্চানদের অনেক পূর্ব্বে। কৃশ্চান হয়ে পর্য্যন্ত তাদের বিদ্যাবুদ্ধি সমস্ত লোপ পেয়ে গেল, কিন্তু যেমন হিন্দুদের ঘরে পূর্ব্বপুরুষদের বিদ্যা বুদ্ধি কিছু কিছু রক্ষিত আছে, তেম্‌নি কৃশ্চান গ্রীকদের কাছে ছিল। সেই সকল পুস্তক চারিদিকে ছড়িয়ে পড়্‌ল। তাতেই ইংরাজ জার্ম্মান ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি জাতির মধ্যে প্রথম সভ্যতার উন্মেষ। গ্রীক ভাষা গ্রীক বিদ্যা শেখ্‌বার একটা ধূম পড়ে গেল। প্রথমে যা কিছু ঐ সকল পুস্তকে ছিল, তা হাড়শুদ্ধ গেলা হল। তারপর যখন নিজেদের বুদ্ধি মার্জ্জিত হয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল এবং ক্রমে ক্রমে পদার্থবিদ্যার অভ্যুত্থান হতে লাগ্‌লো, তখন ঐ সকল গ্রন্থের সময়, প্রণেতা, বিষয়, যাথাতথ্য ইত্যাদির গবেষণা চল্‌তে

(৮০তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ১৬০)

লাগ্‌লো। কৃশ্চান্‌দের ধর্ম্মগ্রন্থগুলি ছাড়া প্রাচীন অকৃশ্চান্‌ গ্রীকদের সমস্ত গ্রন্থের উপর মতামত প্রকাশ কর্ত্তে ত আর কোনও বাধা ছিল না, কাজেই বাহ্য এবং আভ্যন্তর সমালোচনার এক বিদ্যা বেরিয়ে পড়্‌লো। [ক্রমশঃ]

বিবেক বৈরাগ্য।

(স্বামী শুদ্ধানন্দ।)

সৌন্দর্য্য দর্শনে কাহার না চক্ষু ধাবিত হয়? মনোহর বাদিত্রশ্রবণে কাহার না চিত্ত উন্মাদপ্রায় হয়? সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া ত্বগিন্দ্রিয়ের সার্থকতা করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? সুগন্ধ চন্দনাদির আঘ্রাণে কাহার না বাসনা হয়? সুস্বাদু ভোজ্য পেয়াদি দ্বারা রসনার তৃপ্তি করিতে কে না মনে মনে দৃঢ় বাসনা করে? এই সকল ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য পদার্থ যাহার প্রচুর পরিমাণে থাকে, তাহাকেই সাধারণে ভাগ্যবান, সুকৃতিসম্পন্ন বা যোগভ্রষ্ট বলিয়া বিবেচনা করে। পক্ষান্তরে দরিদ্র—জীর্ণকন্থা যাহার অঙ্গের আভরণ, কদন্নই যাহার ওদন, পর্ণকুটীর যাহার আরামের একমাত্র স্থান, সে ব্যক্তি সমাজে হতভাগ্য, নরাধম ও ঘৃণিত বলিয়া বিবেচিত হয়। স্থূলদৃষ্টি মানব ইহা অপেক্ষা আর কি বুঝিবে? সুতরাং তাহার যাবতীয় চেষ্টা, যাবতীয় উদ্যম কেবল নিজের দারিদ্র্যমোচনে ও সুখসম্পদের বৃদ্ধিতে ব্যয়িত হয়। দরিদ্র ভাবে 'দশ টাকা হইলে আমি পরমসুখে থাকিব'। আবার যাহার কিছু সংস্থান আছে সে তদপেক্ষা অধিক সুখসম্পদবৃদ্ধির চেষ্টা করে। বাস্তবিক দেখিতে গেলে সমুদয় জগৎকে উন্মত্তভাবে আত্মদুঃখমোচনে ও সুখবৃদ্ধিতে যত্নবান দেখা যায়।

ভগবান রামকৃষ্ণদেব সাধনাকালে জগৎকে বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, জগৎ অর্থে 'কামিনী ও কাঞ্চন'। এই দুই শব্দ দ্বারা তিনি বাস্তবিক কি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, ইহা যদি আমরা অনুধাবনের চেষ্টা করি, তবে দেখিব যে, এই দুই শব্দ দ্বারা মানুষের সুখবাঞ্ছা লক্ষিত হইয়াছে। পুরুষের পক্ষে কামিনী সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়সুখের আকরস্বরূপ, পক্ষান্তরে কামিনীর পক্ষে পুরুষও তদ্রূপ। আর কাঞ্চন অর্থে স্বর্ণ অথবা মুদ্রা আপাততঃ লক্ষিত হইলেও মুদ্রালভ্য ভোগরাশিই বাস্তবিক লক্ষিত হইয়াছে। বাস্তবিক মুদ্রা কি? মুদ্রার বিনিময়ে আমরা অপর্য্যাপ্ত ভোগ্য পদার্থ পাইতে পারি বলিয়াই মুদ্রার আদর। অর্থনীতিবিৎ পণ্ডিতদিগের অনুমান, পূর্ব্বে মানুষ এক পদার্থের বিনিময়ে আর এক পদার্থ লইত, কিন্তু তাহাতে নানাবিধ অসুবিধা হওয়াতে অবশেষে মুদ্রা প্রচলিত হইল। অতএব 'কামিনী কাঞ্চন' শব্দের দ্বারা মানবের অপরিমেয় ভোগবাসনা লক্ষিত হইয়াছে, বুঝা গেল।

এই তত্ত্বের আর এক দিক হইতে পর্য্যালোচনা করা যাউক। দেখা যাউক, জগতে আছে কি? জগৎ কি পদার্থ লইয়া গঠিত? এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, জগৎ কেবল সুখের জন্য, ইহাতে যাহা কিছু আপাততঃ দুঃখময় বলিয়া প্রতীত হইতেছে, তাহাও পরিণামে সুখের জন্য—ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য। আবার অপর সম্প্রদায়ের নিকট কেবল 'দুঃখ' 'দুঃখ' 'দুঃখ' এই শব্দ নিরন্তর শুনিয়া

(চৈত্র, ১৩০৬, পৃঃ ১৩১)

হতাশ্বাসে প্রাণ শুকাইয়া যাইবার উপক্রম হয়। দুঃখ ব্যতীত জগতে কিছুই নাই। আপাততঃ যাহা সুখ বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা কেবল দুঃখের গুপ্ত চিত্র মাত্র। সুখ বলিয়া কোন বস্তু নাই। তাহা ভ্রম বা স্বপ্নসদৃশ—দুঃখই সংসারে একমাত্র সত্যপদার্থ।

এক্ষণে কথা এই, আমরা কাহার কথা শুনিব? আমরা যদি উভয় পক্ষেরই কথা শুনিয়া নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখি, তাহা হইলে বোধ হইবে যে, এই উভয় সিদ্ধান্তই সত্য। আর এই সঙ্গে সঙ্গে আর একটী অপূর্ব্ব জ্ঞান আমাদের হৃদয়ে উদিত হইবে যে, সুখ দুঃখ বাস্তবিক পৃথক পদার্থ নহে, উহারা পরস্পর পরস্পরকে অপেক্ষা করে—একটী আর একটী ব্যতীত থাকিতে পারে না। একটী সহজ উদাহরণ দ্বারা এ তত্ত্বটী অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবে। একজন পথিক যদি নানাবিধ প্রয়োজনীয় সামগ্রী লইয়া পথ চলিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে যখন সে কোন পথ-মধ্যবর্ত্তী পান্থশালায় উপস্থিত হয়, তখন তাহার আরাম হয় বটে, কিন্তু তাহাকে বোঝা বহিবার কষ্ট সহ্য করিতে হইবেই হইবে। যদি বলা যায়, সে যদি একটি মুটে সংগ্রহ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার ভারবহনজনিত ক্লেশ হইবে না, কিন্তু মুটে অর্থসাপেক্ষ, অর্থ উপার্জ্জন-সাপেক্ষ। যদিও প্রতিগ্রহ যাচ্ঞা বা চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা অর্থসংগ্রহ হয়, তথাপি এই সকল বৃত্তি সমাজে ঘৃণিত ও নিন্দনীয়। এই সকল বৃত্তিতে অনেক অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়। পরিশ্রম দ্বারা উপার্জ্জনে এই সকল ততদূর হয় না বটে, কিন্তু তাহাতে যথেষ্ট ক্লেশ আছে। এই উদাহরণে আমরা বেশ বুঝিলাম, দুঃখ যেন সুখের পশ্চাতে ছায়ার ন্যায় অনুগামী। বাহিরের লোক ধনীকে দেখিয়া সুখী মনে করিতে পারে, কিন্তু ধনী জানেন, তিনি কতদূর সুখী। অনেকে মনে করিতে পারেন, এ সকল কথা কবি-কল্পনা মাত্র, শুনিতে মনোরম, কিন্তু কার্য্য-কালে এ সকল কথার কোন সারবত্তা নাই। আমরা ইঁহাদের কথা একেবারে অস্বীকার করিতে পারি না, আমাদের বলিবার উদ্দেশ্যও নহে যে, সকলে অর্থোপার্জ্জন পরিত্যাগ করিয়া দারিদ্র্যব্রতে দীক্ষিত হউন। সকলকে সত্যতত্ত্ব বিচারে অনুরোধ করি। আমরা চাই যে, কৃত্রিমতা ছাড়িয়া আমরা অকৃত্রিমতার অনুসন্ধান করি।

সংসারে কৃত্রিমতা কোথায় নাই? সংসারের কোন্ বস্তু না আপাত চাকচিক্যশালী? কোন্ বস্তু না আপন স্বভাব গোপন করিয়া দর্শকের ভ্রান্তি উৎপাদনে চেষ্টা করিতেছে? একটী গোলাপ ফুল দেখিয়া কবির মন মুগ্ধ হইল। তিনি তাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া নিজে মুগ্ধ হইয়া অপরকে মুগ্ধ করিবার জন্য কতকগুলি লালিত্যময় শ্রবণমনোহর বচনবিন্যাস করিলেন। লোকে মুগ্ধ হইল। জগৎ ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল। কবির জয় উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হইল। কিন্তু ভাই, একটু শান্ত হইয়া ভাব দেখি, তুমি যাহাতে মুগ্ধ হইলে, সেটী কি? তাহা কি তুমি জানিয়াছ? তুমি ভীত হইতেছ যে, বিশ্লেষণ পূর্ব্বক বিচার করিলে উহার সৌন্দর্য্য থাকিবে না, তাই তুমি বিশ্লেষণের উপর খড়্গহস্ত। ইহাতেও কি তোমাকে কৃত্রিমতাপ্রিয় বলিব না?

সমুদয় জগৎ কৃত্রিমতায় আবদ্ধ। পেঁয়াজের খোসা ছাড়াইয়া পেঁয়াজ কি পদার্থ, তাহা জানিতে কেহ চাহে না। পেঁয়াজ পেঁয়াজ করিয়াই লোকে ব্যস্ত। এক্ষণে, বিচারশীল ও ভাবুক উভয়েই উভয়কে আকাশকুসুমের অন্বেষী বলিয়া উপহাস করিতে পারেন। আমরা কাহার পথ অনুসরণ করিব?

(৮০তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ১৩২)

ভাবুকের ভাবকে আমরা নিন্দা করি না। তিনি তাঁহার ভাবরাজ্যে আনন্দে বিচরণ করুন। কিন্তু তাঁহার যদি কখন ভাবের নেশা ছোটে, যদি কখন যে ছবি তাঁহার মোহ উৎপাদন করিয়াছে, তাহার অপর ভাগ দৈবাৎ তাঁহার নেত্রগোচরে পতিত হয়, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, তিনি বিল্বমঙ্গলের ন্যায় উন্মত্ত চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিবেন, 'তুমি দেবী না রাক্ষসী', তুমি সুন্দরী কি কুৎসিতা? তুমি কি? হে সংসার, হে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, তুমি সুন্দর কি কুৎসিত? হে প্রকৃতি দেবি, তুমি হাস্যময়ী কি বিষাদময়ী?

এইরূপ ভাবে যদি কখন কাহারও হৃদয় বিভোর হয়, তখন বোধ হয় তাঁহার চণ্ডীর সেই অপূর্ব্ব গীত ভাল লাগিবে ও অর্থপূর্ণ বোধ হইবে।*

এস তবে ভাই, এস একবার দেখি আমি কে? জগৎ কি? কস্মাৎ কোঽহম্ কথং কিমপি চ ভবান্ কোঽয়মত্রঃ প্রপঞ্চঃ? একবার বিচারদৃষ্টি উন্মীলন কর, একবার মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া দেখ, সত্য বস্তু কি আছে?

এ কি? আর যে কোন বস্তু দেখিতে পাইতেছি না! আর যে কোন পদার্থকেই তাহার পূর্ব্বস্বরূপে দেখিতেছি না। সকলই যে পরমাণুপুঞ্জে পরিণত হইল। পরমাণুপুঞ্জ এক মহা আকর্ষণে পরস্পর সংযুক্ত দেখিতেছি। কোন পদার্থকেই অপর পদার্থ হইতে পৃথক্ দেখিতেছি না। ক্রমশঃ সকলই লয় হইয়া যে এক পরম চেতন পদার্থ বলিয়া বোধ হইতেছে; আর সকলই যে নামরূপের ক্রীড়া। পিতা—তুমি পিতা নহ, এক বুদ্বুদ মাত্র। মাতা—তুমি মাতা নহ, বন্ধু—তুমি বন্ধু নহ, পাপী—তুমি পাপী নহ, সাধু—তুমিও সাধু নহ। শুধু তাহা নহে, আমিও আমি নহি। সবই জলবুদ্বুদ—এক অনন্ত সত্য বস্তু, আর সবই নামরূপ, সবই কৃত্রিম, সবই ছায়া।

মানুষের যখন এই জ্ঞান কিয়ৎ পরিমাণেও উদয় হয়, যখন মানুষ সেই পরম স্থির শান্ত মহা সমুদ্রের চকিতের মতও দর্শন পায়, তখন যে তাহার প্রবৃত্তি, আচার ব্যবহার, প্রকৃতি সকলই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, ইহা কি আর বলিতে হইবে? সে তখন এক স্বতন্ত্র মানুষ হইয়া যায়, সে তখন নবজীবন লাভ করে।

যখন মানুষের এই অবস্থা লাভ হয়, তখন সে সুখ দুঃখের প্রকৃত রহস্য বুঝিতে পারে—তখন সে বুঝিতে পারে যে, জীবন কেবল দুঃখ পরিহার করিয়া সুখলাভের জন্য মত্ত চেষ্টার জন্য নহে। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করাই তখন তাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যরূপে পরিণত হয়।

এরূপ অবস্থাপন্ন লোক যদি ধনী হয়, তবে ধনবৃদ্ধি, ধনরক্ষণ আদির জন্য তাহার যে বিজাতীয় আগ্রহ বা উদ্বেগ ছিল, তাহা একেবারে চলিয়া যায়। তখন সে রাজর্ষি জনকের মত বলিতে পারে, সমুদয় মিথিলানগরী ভস্মসাৎ হইলেও আমার তাহাতে কিছুমাত্র উদ্বেগ হয় না। আর যদি সে দরিদ্র হয়, তবে তাহার দরিদ্রতা মোচনের জন্য ভয়ানক অশান্তি,

* অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমো নমঃ।
পুনঃ,—যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
আবার,—যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী

(চৈত্র, ১৩০৪, পৃঃ ১৬৩)

ধনীকে দেখিয়া ঈর্ষ্যা ইত্যাদি দোষ অন্তর্হিত হইয়া যায়। সে সন্তোষের বিমল ছায়ায় উপবেশন করিয়া আরাম অনুভব করে।

এরূপ অবস্থা লাভ হইলে জগৎকে আর সত্য বলিতে বড় প্রবৃত্তি হয় না। সাধারণ লোকের ধারণা—সুখ দুঃখ ভয়ানক সত্য পদার্থ। এই কারণেই তাহারা সুখ দুঃখে এত অভিভূত হয়। কিন্তু সুখদুঃখের রহস্যবিৎ ব্যক্তি ঐ গুলিকে যেন খেলাস্বরূপ দেখিয়া থাকে। যে ব্যক্তি সংসারটাকে খেলা বলিয়া জানে, সে আর কেন তাহাতে আসক্ত হইবে? কেন দুঃখে অভিভূত হইবে—সুখে আত্মবিস্মৃত হইবে? সে যেন একটা খোঁটা পাইয়াছে—সেই খোঁটাটিই ধরিয়া আছে বলিয়া কোন তরঙ্গ আর তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, ইহা কি কেবল আকাশকুসুমমাত্র, কোন কার্য্যকর নহে? কেবল সুখে দুঃখে অভিভূত হওয়াই একমাত্র কার্য্যকর ব্যাপার? বাস্তবিক সুখ দুঃখ ছাড়া জগতে আছে কি? জন্মমৃত্যু, আলো ও ছায়ার ন্যায় পরস্পর এক সূত্রে জড়িত। আর কে না উন্মত্তবৎ হইয়া আপাত সুখের জন্য ধাবিত হইতেছে? স্থির বিচারবুদ্ধি কোথায়? এই জীবন-সংগ্রামের ভিতর কয়জন অর্জ্জুন আছেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণকে সারথি করিতে পারিয়াছেন? বাস্তবিক আমরা যাহা বলি বা যাহা করি না কেন, এই সুখবাঞ্ছা আমাদের অস্থিতে অস্থিতে মজ্জায় মজ্জায় জড়িত হইয়া রহিয়াছে। কেহ না হয়, অতি কষ্টে ভোগের বাসনা ত্যাগ করিলেন, অমনি কোথা হইতে মানের ইচ্ছা আসিয়া হৃদয়কে অধিকার করিল। অনেক বড় বড় লোকও এই মানের প্রলোভন হইতে অব্যাহতি পান নাই। কিন্তু মানের পশ্চাতে উহার ছায়া 'অপমান' রহিয়াছে। যাঁহারা ভগবানের সাক্ষাৎ অবতার বলিয়া জগতে পূজিত ও সম্মানিত, তাঁহারা পর্য্যন্ত সর্ব্ববাদি-সম্মত মান পান নাই। তবে তোমার আমার মানের প্রয়াসে কি ফল হইবে?

কামনা মানুষের অন্তরে অন্তরে এতদূর জড়িত যে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। নিষ্কাম হইবার চেষ্টা করিতে গেলেও কোথা হইতে যেন কে বলিয়া দেয় যে, নিষ্কাম হইলে তোমাকে সকলে পূজা করিবে। তুমি জগৎ-মান্য হইবে।

কোন ব্যক্তি গুরুর নিকট শুনিয়াছিল যে, সর্ব্বত্যাগ করিলে সবই পাওয়া যায়। সে ব্যক্তি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াও যখন দেখিল, কিছুই পাইলাম না, তখন সে গুরুর নিকট যাইয়া বলিল, গুরো, আমি ত সর্ব্বত্যাগ করিলাম, কই, কিছু ত পাইলাম না। গুরু বলিলেন, বাবা, সর্ব্বত্যাগ তোমার কই হইল—তোমার যে সব পাইবার আশা এখনও রহিয়াছে!

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা এমন বলিতেছি না যে, অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করা বৃথা। একথা বলা একরূপ উন্মত্ত প্রলাপ মাত্র। তবে এক্ষণে কথা এই, অর্থোপার্জ্জন কর ও বৈরাগ্য অবলম্বন কর, এই দুই বাক্যের সামঞ্জস্য কোথায়? এই দুইটী আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় আপাততঃ পরস্পর বিরোধী বাক্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এস্থলে একটী প্রাচীন বাক্য স্মরণ করিলেই সমুদয় বিবাদ মিটিয়া যায়। বাক্যটী এই—'অধিকার-ভেদ'। তোমার পক্ষে যাহা উপযুক্ত, তাহা আমার পক্ষে নহে; আমার পক্ষে যাহা, তাহা তোমার পক্ষে নহে। রোগীর পথ্যের একরূপ ব্যবস্থা—সুস্থশরীরীর অন্য রূপ। দুগ্ধপোষ্য বালকের পক্ষে যে ব্যবস্থা, তাহা যুবক বা বৃদ্ধের পক্ষে নহে। অবস্থাভেদে ব্যবস্থাভেদ—দেশকালপাত্রভেদে

Statement about ownership and other particulars of

UDBODHAN

FORM IV

According to Rule 8 of the Registration of Newspapers (Central) Rules 1956

(1) Place of Publication	..	1, Udbodhan Lane, Baghbazar Calcutta-700003.
(2) Periodicity of its Publication	..	Monthly.
(3) Printer's Name	.	Swami Vandanananda
Nationality	.	Indian
Address	.	1, Udbodhan Lane, Calcutta-700003.
(4) Publisher's Name	.	Swami Vandanananda
Nationality	.	Indian
Address	.	1, Udbodhan Lane, Calcutta-700003.
(5) Editor's Name	.	Swami Atmasthananda
Nationality	.	Indian
Address	.	1, Udbodhan Lane, Calcutta-700003.
(6) Name & Address of individuals who own the Newspaper	.	Trustees of the Ramakrishna Math, Belur Math, Howrah, West Bengal.

I, Swami Vandanananda, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. SWAMI VANDANANANDA
Signature of Publisher.

Date: 9.3.1978.

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ — স্বামী সারদানন্দ। দুই ভাগ, রেক্সিন-বাঁধাই : মূল্য ১ম ভাগ ১৯'০০। ২য় ভাগ ১৭'০০

সাধারণ ১ম খণ্ড ৩'৫০; ২য় খণ্ড ৭'৮০; ৩য় খণ্ড ৫'২০; ৪র্থ খণ্ড ৭'০০; ৫ম খণ্ড ৭'৫০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন। সুললিত কবিতায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী। মূল্য ২৬'০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ-সংকলিত। মূল্য ১'৬০; কাপড়ে বাঁধাই ১৮০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা— শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন। মূল্য ৩'৫০

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। মূল্য ২'৫০

শ্রীরামকৃষ্ণচরিত — শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী। (ছাপা নাই)

শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ—স্বামী নির্বেদানন্দ (অনুবাদ : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। পৃঃ ২৯৭; সাধারণ ৬'০০; হাফ-রেক্সিন। বোর্ড বাঁধাই. শোভন ৭'০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী—স্বামী তেজসানন্দ। পৃঃ ২০৮, মূল্য ৫'০০

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা—স্বামী অপূর্বানন্দ। (ছাপা নাই)

পরমহংসদেব—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু। (ছাপা নাই)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ৬৬, মূল্য ০'৭০

শিশুদের রামকৃষ্ণ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৪০, মূল্য ৩.০০

-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীমায়ের কথা—শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সন্তানগণের ডায়েরী হইতে। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। মূল্য ১ম ভাগ ৭'০০, ২য় ভাগ ৬'৫০

মাতৃ-সান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ। পৃঃ ২৫৬। মূল্য ৬'০০ টাকা

শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের বিস্তারিত জীবনীগ্রন্থ। পৃঃ ৬৪২, মূল্য—১৭'০০

শিশুদের মা সারদাদেবী, (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৪০, মূল্য ৩'০০

স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয়

যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত স্বামীজীর প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। তিন খণ্ডে প্রকাশিত। মূল্য ১ম খণ্ড ১৬'০০; ২য় ও ৩য় প্রতি খণ্ড ৮'০০

স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীপ্রমথনাথ বসু। ১ম ভাগ (ছাপা নাই), ২য় ভাগ—মূল্য ৪'২৫

স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১০৩, মূল্য ২'৫০

স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। ছেলেদের উপযোগী। পৃঃ ৬৪, মূল্য ০'৭০

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—(দুই খণ্ড একত্রে) শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। স্বামীজীর সহিত লেখকের কথোপকথন। পৃঃ ২৫৮, মূল্য ৭'০০

স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতা। (অনুবাদ : স্বামী মাধবানন্দ)। মূল্য ৮'০০

স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে—ভগিনী নিবেদিতা (বঙ্গানুবাদ)। পৃঃ ১২৪, মূল ১'২৫

শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। ৩য় সং, মূল্য ২'৫০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

অন্যান্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা — স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য ১৩'০০, ২য় ভাগ পৃঃ ৫২৪, মূল্য ৮'০০

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—(ছাপা নাই)

ভারতে শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ। মূল্য ৩'০০

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৯১, মূল্য ৫'০০

স্বামী অখণ্ডানন্দ— স্বামী অন্নদানন্দ। পৃঃ ৩১০, মূল্য ৪'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ। (ছাপা নাই)

গোপালের মা — স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৪৪, মূল্য ১'৫০

শ্রীশ্রীরামানুজ-চরিত—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। (ছাপা নাই)।

আচার্য শঙ্কর—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৪৬. মূল্য ৬'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র—মূল্য ৭'৮০

শিবানন্দ-বাণী— স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত। ১ম ভাগ (ছাপা নাই) ; ২য় ভাগ-২'৭০

মহাপুরুষজীর পত্রাবলী— (ছাপা নাই)

সৎকথা — স্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত। (ছাপা নাই)

অদ্ভুতানন্দ-প্রসঙ্গ — স্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত। (ছাপা নাই)

স্মৃতি-কথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ। মূল্য ৪'০০

দিব্যপ্রসঙ্গে — স্বামী দিব্যাত্মানন্দ। (ছাপা নাই)

স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী— (ছাপা নাই)

আরতি-স্তব—মূল্য ০'৭০

পুণ্যস্মৃতি—স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ। পৃঃ ১১৬; মূল্য ৩'০০

মহাভারতের গল্প—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ পৃঃ ১২৮ ; সাধারণ ২'৫০, বোর্ড বাঁধাই ৩'০০ ৬ষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য সংক্ষেপিত "স্কুলপাঠ্য" সংস্করণ—পৃঃ ৭২ ; মূল্য ২'০০

শঙ্কর-চরিত — শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। সংস্করণ (৭ম) মূল্য ২ ৫০

দশাবতার-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য পৃঃ ১০৮, মূল্য ২'৫০

সাধক রামপ্রসাদ —স্বামী বামদেবানন্দ। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৫'২০

সাধু নাগ মহাশয়—শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। পৃঃ ১৭৪, মূল্য ৩'৫০

ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী তেজসানন্দ। পৃঃ ১২৪, মূল্য ১'৫০

শিব ও বুদ্ধ—ভগিনী নিবেদিতা। পৃঃ ৬৩, মূল্য ০'৬৫

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ— (ছাপা নাই)

পত্রমালা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২ মূল্য ৪'০০

গীতাতত্ত্ব—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৭৬, মূল্য ৫'০০

লাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৪২০, মূল্য ১০'০০

পরমার্থ-প্রসঙ্গ — স্বামী বিরজানন্দ। পৃঃ ১৩৭, মূল্য ৪'০০

জগন্নাথদেবের পথ—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। মূল্য ১'০০

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী — স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৩২, মূল্য ০'৬০

বিবিধ-প্রসঙ্গ—(ছাপা নাই)

কৈলাস ও মানসতীর্থ—স্বামী অপূর্বানন্দ। (ছাপা নাই)

তিব্বতের পথে হিমালয়ে—স্বামী অখণ্ডানন্দ। পৃঃ ১৮১, মূল্য ২'২৫

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-সঞ্চয়ন— পৃঃ ৩১৬, মূল্য ৭'০০

COVER PRINTED BY:-

৮০।৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী বন্দনানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত।

সম্পাদক—স্বামী আত্মস্থানন্দ : সংযুক্ত সম্পাদক—স্বামী ধ্যানানন্দ

উদ্বোধন

উত্তিষ্ঠত
জাগ্রত
প্রাপ্য
বরান্
নিবোধত



উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়; ৮০তম বর্ষ হইতে **বার্ষিক মূল্য সডাক ১২৲ টাকা, ষাণ্মাষিক ৭৲ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে ৩৩৲ টাকা, এয়ার মেল-এ ১০১৲ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ১.২০ টাকা। নমুনার জন্য ১.২০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সাত দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে; তাহার পরে চাহিলে পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হইবে না।

রচনা ঃ—ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা প্রবন্ধ ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহকনম্বর পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময়ঃ সকাল ৭৷৷০টা হইতে ১১টা; বিকাল ৩টা হইতে ৫৷০টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০০০৩

উদ্বোধন, বৈশাখ, ১৩৮৫

সূচীপত্র

আমি কি আর উপদেশ দেব। ঠাকুরের কথা সব বইয়ে বেরিয়ে গেছে। তাঁর একটা কথা ধারণা করে যদি চলতে পার তো সব হয়ে যাবে।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

উদ্বোধনের মাধ্যমে
প্রচার হোক
শ্রেষ্ঠ বাণী। শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়



দিব্য বাণী

অজং শাশ্বতং কারণং কারণানাং
  শিবং কেবলং ভাসকং ভাসকানাম্।
তুরীয়ং তমঃপারমাদ্যন্তহীনং
  প্রপদ্যে পরং পাবনং দ্বৈতহীনম্॥

—শংকরাচার্য: বেদসারশিবস্তোত্রম্, ৭

জনমরহিত যিনি নিত্য বর্তমান
সর্ববিধ কারণের একক নিদান
মঙ্গলস্বরূপ আর বিমুক্তিস্বরূপ
(নির্বিশেষ নিরাকার চিদানন্দরূপ)
সকল জ্যোতির জ্যোতি—পারে তমিস্রার
জাগরণ স্বপ্ন আর সুষুপ্তির পার
আদি-অন্ত-হীন যিনি পরম পাবন
সে অদ্বৈত স্বরূপের লইনু শরণ।



কথাপ্রসঙ্গে

শংকরাচার্যের দৃষ্টিতে লোকব্যবহার

ভাগবতে আছে, শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন :

তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥

অর্থাৎ ততদিনই কর্মসমূহ করণীয়, যতদিন পর্যন্ত না বৈরাগ্য উপস্থিত হয় অথবা শ্রীভগবানের কথাশ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। তাৎপর্য এই যে, বৈরাগ্য বা শ্রদ্ধার উদয় না হওয়া পর্যন্ত শাস্ত্রীয় বা লৌকিক কর্ম—যাহা লোকব্যবহারের মাধ্যমেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে—ত্যাগ করা উচিত নহে।

নারদভক্তিসূত্রেও বলা হইয়াছে : 'ন তদসিদ্ধৌ লোকব্যবহারঃ হেয়ঃ, কিন্তু ফলত্যাগঃ তৎসাধনং চ কার্যম্ এব।' অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত না শ্রীভগবানে আত্মনিবেদন সম্পূর্ণ হয়, ততদিন পর্যন্ত লোকব্যবহার ত্যাগ করা উচিত নহে; কেবল কর্মের ফলত্যাগ ও উহার সাধনা বিধেয়।

এই সকল কথার ফলিতার্থ এই যে, প্রাথমিক অবস্থায় সাধকের পক্ষে লোকব্যবহার পরিত্যাজ্য না হইলেও, যেমন যেমন তাঁহার শ্রীভগবানে অনুরাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তেমন তেমন ধীরে ধীরে লোকব্যবহার কমাইতে হয়। লোক-ব্যবহারের আড়ম্বরে বিড়ম্বিত চিত্তকে শ্রীভগবানে সমাহিত করা অসম্ভব।

এই বিষয়ে শংকরাচার্যের অভিমত :

> লোকব্যবহার যতদূর সম্ভব ত্যাগ করিয়া ভগবদ্‌ভজনে নিরত থাকা অতি উত্তম কথা—ইহা 'সম্মার্গস্থ' হওয়ার কথা, 'পথে আসা'র কথা। কিন্তু ইহাই শেষ কথা নহে। যাহারা বুদ্ধিমান্দ্যহেতু নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব ধারণা করিতে পারে না, তাহাদের পক্ষে ঐভাবে লোকব্যবহার হইতে দূরে থাকিয়া ভগবদ্‌ভজনে ব্যাপৃত থাকা নির্গুণ-ব্রহ্মতত্ত্বোপলব্ধির পরোক্ষভাবে সহায়ক। একমাত্র যিনি আছেন, তিনিই নাই—লোকে এইরূপই মনে করে। ইহা অপেক্ষা বিচিত্র ব্যাপার আর কী হইতে পারে! কিন্তু এই অদ্ভুত ব্যাপার তো প্রত্যক্ষসিদ্ধ! নিঃসন্দেহে বুদ্ধির অল্পত্বই ইহার কারণ। বিশালবুদ্ধি হইতে হইলে সম্মার্গ অবলম্বন করিতে হইবে। ব্রহ্মপুরে—ব্রহ্মোপলব্ধির স্থানভূত এই শরীরে—হৃদয়পুণ্ডরীকে সগুণ ব্রহ্মের ধ্যান করিতে হইবে।

শাংকর-দর্শনে 'লোকব্যবহার' কথাটি খুব ব্যাপক। লোকব্যবহার হইতে দূরে থাকাও লোকব্যবহারেরই অন্তর্গত। ভগবদ্‌ভজনও লোকব্যবহার। সুতরাং লোকব্যবহার হইতে সরিয়া থাকা লোকব্যবহার ত্যাগ করার মোক্ষম উপায় নহে। লোকব্যবহার যখন মিথ্যাভূত হইয়া যায়, তখনই উহা সর্বথা পরিত্যক্ত হয়, তৎপূর্বে নহে। 'আমি জ্ঞাতা', 'আমি কর্তা', 'আমি ভোক্তা' ইত্যাদি বুদ্ধিকে ভিত্তি করিয়াই যাবতীয় লোকব্যবহার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু এই বুদ্ধি অবিদ্যাপ্রসূত। প্রকৃতপক্ষে আমি জ্ঞানস্বরূপ, অকর্তা, অভোক্তা। আমি যখন জ্ঞাতা নই, তখন জ্ঞেয় কীভাবে থাকিতে পারে! আমি যখন অকর্তা, তখন উপাসনা-ক্রিয়ারই বা কর্তা কীভাবে

হইতে পারি! আমি যখন অভোক্তা, তখন সচ্চিদানন্দ-সম্ভোগের প্রশ্নই বা কীভাবে উঠিতে পারে!

প্রশ্ন হইতে পারে, তাহা হইলে আমরা কি ভগবদ্‌ভজন করিব না? ইহার উত্তর পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। ভগবদ্‌ভজন আমাদের বিশালবুদ্ধি করিয়া নির্গুণ-ব্রহ্মতত্ত্বকে উপলব্ধি করিতে সাহায্য করে। আমাদের কি নির্বিশেষ-ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া গিয়াছে যে, আমরা ভগবদ্‌ভজনে বিরত থাকিব? শংকরাচার্যের কথা: 'ন হি অয়ং সর্বপ্রমাণপ্রসিদ্ধঃ লোকব্যবহারঃ, অন্যৎ তত্ত্বম্ অনধিগম্য, শক্যতে অপহ্নোতুম্, অপবাদাভাবে উৎসর্গপ্রসিদ্ধেঃ।' অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি সমস্ত প্রমাণের দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে সিদ্ধ যে লোকব্যবহার, তাহার—যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্য একটি তত্ত্ব উপলব্ধ হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত—অপলাপ করা যায় না, কারণ বিশেষ বিধির অভাবে সামান্য বিধিই বলবৎ থাকে।

স্বীকার করি, শংকরাচার্যের উক্তিটি ভাবান্তরিত হইলেও সহজবোধ্য হয় নাই। ভাব বুঝা যায় এবং নিজের পক্ষে তাহা পর্যাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু ভাবকে ভাষায় রূপ দেওয়া কঠিন কাজ। বিশেষতঃ যেখানে বাচস্পতি মিশ্র, আনন্দগিরি প্রমুখ প্রখ্যাত পণ্ডিতগণ ব্যাখ্যাকার, সেখানে সংকোচ স্বাভাবিক। তথাপি অক্ষম ভাষাতুলিকায় একটি ব্যাখ্যাপট রচনা করিবার প্রয়াস করা যাইতে পারে। *দোষগুণ পণ্ডিতসম্প্রদায়ক্রমে লব্ধবিদ্য ব্যক্তিগণ* বিচার করিবেন।

শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে, কোন প্রাণীকেই হিংসা করিবে না। ইহা 'সামান্য' অর্থাৎ সাধারণ নিয়ম। শাস্ত্রেই আবার বলা হইয়াছে যে, যজ্ঞের জন্য পশু সংগ্রহ করিবে। ইহা বিশেষ নিয়ম বা পূর্বোক্ত সাধারণ বিধির 'অপবাদ' বা ব্যতিক্রম। যতক্ষণ পর্যন্ত না এই বিশেষ নিয়মটির প্রসঙ্গ উঠিতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্বোক্ত সাধারণ বিধিই বলবৎ থাকে। ঠিক সেইরূপ যতক্ষণ 'আলো-আঁধারি'তে একটি রজ্জুকে আমরা সর্প বলিয়া মনে করি, ততক্ষণ সর্পটি আমাদের নিকট সত্য, কারণ সর্পজনিত ভীতি পর্যন্ত আমাদের থাকে। স্পষ্ট আলোকে রজ্জুরূপ 'অন্য তত্ত্ব' উপলব্ধ হইলে সর্পটি বাধিত অর্থাৎ মিথ্যা হইয়া যায়। অনুরূপভাবে স্বপ্নাবস্থা আমাদের নিকট সত্য, যতক্ষণ পর্যন্ত না উহা জাগ্রৎ-অবস্থার দ্বারা বাধিত হয়। এই ধরনের বিচারের দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে, লোকব্যবহারাত্মক জাগ্রৎ-অবস্থাও অন্য কোনও একটি অবস্থা আবিষ্কৃত হইলে বাধিত হইতে পারে। শুধু যে তাত্ত্বিক বিচারের দ্বারা এই অবস্থা অনুমিত হয়, তাহা নহে। উহা জ্ঞানিগণের অনুভবসিদ্ধও বটে। সুষুপ্তি-অবস্থারও অতীত ঐ অবস্থাকেই তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ অবস্থা বলে। উহারই অপর নাম আত্মা বা ব্রহ্ম। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ আত্মতত্ত্ব অধিগত হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত লোকব্যবহার মিথ্যা নহে।

যদিও শংকরাচার্য কোন একটি বিশেষ মতবাদের খণ্ডনপ্রসঙ্গে আলোচিত উক্তিটি করিয়াছেন, তথাপি উহাতে সর্বমতবাদ-নিরপেক্ষ একটি তত্ত্ব নিহিত আছে। এইজন্য আমরা তত্ত্বটিরই ব্যাখ্যা করিয়াছি, প্রসঙ্গের উল্লেখ করি নাই।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ব্যাপক অর্থে 'লোক-ব্যবহার' উপাসনাকেও কুক্ষিগত করে। শংকরাচার্য 'লোকব্যবহার'-এর বিশেষণরূপে 'সর্বপ্রমাণপ্রসিদ্ধ' কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। প্রশ্ন এই: উপাসনা যদি লোকব্যবহারের

অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি ? অর্থাৎ উপাসনা যে করিতে হইবে, এ বিষয়ে প্রমাণ কি ? ঈশ্বর যে আছেন, তাহাই তো প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ নহে। যুক্তি-তর্কের দ্বারা কেহই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত করিতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বরের উপাসনাও সিদ্ধ হয় না। শংকরাচার্য বলেন, ঈশ্বর যে আছেন এবং তাঁহার উপাসনা যে আমাদের অবশ্য করণীয়—এ বিষয়ে বেদই প্রমাণ। উপনিষদেই আছে, 'তজ্জলান্ ইতি শান্ত উপাসীত' অর্থাৎ যিনি এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, সংযত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিবে। উপনিষদেই আবার ব্রহ্মতত্ত্বকে 'অব্যবহার্যম্'—সমস্ত লোকব্যবহারের অতীত বলা হইয়াছে। অব্যবহার্য বলিয়াই সেই নির্ভেদ ব্রহ্মতত্ত্ব 'বিজ্ঞেয়'—করণীয় নহে। নির্ভেদ ব্রহ্মতত্ত্বকে শুধু অপরোক্ষরূপে জানিতে হয়। পক্ষান্তরে উপাসনা করণীয়—জ্ঞেয়মাত্র নহে। উপাসনাদি করার ফলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে, যখন সেই ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎভাবে জানা যায়, তখনই 'লোকব্যবহার'—উহার ব্যাপকতম অর্থেও—মিথ্যা হইয়া যায়। উপাস্য-উপাসক-উপাসনা-রহিত এক অদ্বিতীয় সত্তা মাত্র বিদ্যমান থাকে। বস্তুতঃ সর্বদাই সেই এক অদ্বিতীয় পারমার্থিক সত্তাই আছে। জাগ্রৎ-অবস্থা, জাগ্রৎকালীন রজ্জুসর্পাদি ভ্রম, স্বপ্নাবস্থা ইত্যাদি সবই অ-পারমার্থিক। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই পারমার্থিক সত্তা আবিষ্কৃত বা অনাবৃত হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত যাবতীয় লোকব্যবহার সত্য—সাধারণ লোকব্যবহার এবং ভগবদ্‌ভজন-রূপ লোকব্যবহারও।

'হরিমীড়ে'-স্তোত্রম্

স্তোত্র-রচয়িতা : আচার্য শংকর ; টীকাকার : স্বয়ংপ্রকাশ-যতি

অনুবাদক : স্বামী ধীরেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

টীকা : তৈত্তিরীয়কোপনিষৎ এবং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তি—প্রথমং 'ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্' [তৈ. উ. ২।১।৩] ইতি সংহিতাদ্যুপাসনাদিভিঃ একাগ্রচিত্তম্ অধিকারিণং প্রতি ব্রহ্মবিদ্যাং সবিষয়াং সফলাং সূত্রয়ামাস। 'ব্রহ্ম' ইতি বিষয়নির্দেশঃ। 'বিদ্' ইতি অনেন বিদ্যা নির্দিশ্যতে। 'পরম্ আপ্নোতি' ইতি বিদ্যাফলং নির্দিশ্যতে ইতি বিভাগঃ। (১)

তদনন্তরং সূত্রস্য অর্থং সংক্ষেপতঃ—'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম, যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্, সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা' ইতি [তৈ. উ. ২।১।৩] অস্যাঃ ঋচঃ উদাহরণেন ব্যাচকার। 'সত্যম্' ইত্যাদি সূত্রস্থ-ব্রহ্ম-পদ-ব্যাখ্যানং, 'যো বেদ' ইত্যাদি 'বিৎ'-পদ-ব্যাখ্যানং, 'সোঽশ্নুতে' ইত্যাদি 'আপ্নোতি পরম্' ইতি পদদ্বয়-ব্যাখ্যানম্ ইতি বিভাগঃ। (২)

ঋচঃ অয়ম্ অর্থঃ—সত্যং কালত্রয়-বাধাভাবোপলক্ষিতং, জ্ঞানং স্বপ্রকাশম্, অনন্তম্ অন্তঃ পরিচ্ছেদঃ দেশকালবস্তুকৃতঃ তৎ-ত্রিবিধ-পরিচ্ছেদাভাবোপলক্ষিতম্ ; 'ব্রহ্ম' ইতি লক্ষ্যনির্দেশঃ। সত্যাদি-পদত্রয়-লক্ষণং—গুহায়াং বুদ্ধৌ, যৎ কারণত্বেন বর্ততে পরমং ব্যোম অব্যাকৃতাকাশং তত্র, নিহিতং প্রতিবিম্বতয়া অবস্থিতং, যৎ চৈতন্যং তদ্ ব্রহ্মত্বেন যো বেদ স সর্বান্ কামান্ সার্বভৌমাদি-হিরণ্যগর্ভান্তান্ সহ যুগপৎ অশ্নুতে ভুঙ্ক্তে। কেন প্রকারেণ? বিপশ্চিতা সর্বজ্ঞেন, ব্রহ্মণা সর্বজ্ঞরূপেণ ন উপাধি-পরিচ্ছিন্ন-রূপেণ। ব্রহ্মানন্দে স্বল্পানন্দানাম্ অন্তর্ভাবাৎ সার্বভৌমাদি-হিরণ্যগর্ভান্ত-ভোগানাং ব্রহ্মবিৎ-স্বরূপভূতত্বাৎ চৈতন্যভাস্যত্বাৎ চ ব্রহ্মবিদঃ যুগপৎ সর্বভোক্তৃত্বম্ ইতি অর্থঃ। (৩)

অনন্তরং ব্রহ্মণঃ সূত্র-ব্যাখ্যান-রূপয়া ঋচা উদীরিতানন্ত্য-সিদ্ধয়ে আকাশাদেঃ ব্রহ্মণঃ এব উৎপত্তিং কথয়ামাস। ততঃ 'যো বেদ' ইত্যাদ্যুক্তং ব্রহ্মণঃ স্বরূপং প্রবক্তুং 'স বা* এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ' [২।১।৩] ইত্যারভ্য দেহাদি-পঞ্চ-কোশাত্মোপদেশ-ক্রমেণ 'ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা' [২।৫] ইতি পুনঃ বিস্তরেণ প্রতিপাদয়াম্বভূব। (৪

ততঃ ব্রহ্মণঃ নামরূপাতীতস্য প্রত্যক্ষাদ্যবিষয়ত্বেন অসত্ত্ব-শঙ্কায়াং 'সোঽকাময়ত' [২।৬] ইতি কাময়িতৃত্বেন স্বর্গকামী ইব, 'স তপোঽতপ্যত' [২।৬] ইতি আলোচকত্বেন মন্ত্রিবৎ, 'ইদং সর্বম্ অসৃজত' [২।৬] ইতি স্রষ্টৃত্বেন কুলালবৎ, 'তদেবানুপ্রাবিশৎ' [২।৬] ইতি প্রবেষ্টৃত্বেন সর্পাদিবৎ চ সত্ত্বম্ উপপাদ্য পুনঃ চ 'কো হ্যেবান্যাৎ' [২।৭] ইত্যাদিনা সর্বপ্রাণিনাং জীবনহেতুত্বেন 'যদা হ্যেবৈষঃ' [২।৭] ইত্যাদিনা বিদ্বদবিদ্বদ্ভয়াভয়হেতুত্বেন চ তৎ এব সত্ত্বং দৃঢ়ীচকার। (৫)

অনন্তরং চ 'সৈষানন্দস্য' [২।৮।১] ইত্যাদিনা আনন্দ-মীমাংসাম্ আরভ্য সার্বভৌমাদি-হিরণ্যগর্ভান্তানাম্ আনন্দানাম্ উত্তরোত্তর-শতগুণোৎকর্ষ-প্রদর্শন-পূর্বকং ব্রহ্মবিদুষঃ 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন' [২।৯] ইতি বাঙ্মনসোঽগোচর-নিরতিশয়-ব্রহ্মানন্দাপ্তিং নিরতিশয়ানর্থ-নিবৃত্তিং চ প্রতিপাদ্য পুনঃ 'এতং হ বাব' [২।৯] ইত্যাদিনা অনর্থনিবৃত্তিং প্রপঞ্চ্য নিরতিশয়ানন্দ-ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞানে সাধনাকাঙ্ক্ষায়াং 'ভৃগু বৈ বারুণিঃ' [৩।১] ইত্যাদিনা ভৃগু-বরুণ-সংবাদম্ উপক্রম্য 'যতো বা' [৩।১] ইত্যাদিনা ব্রহ্মণঃ তটস্থলক্ষণ-কথনপূর্বকং প্রিয়ায় পুত্রায় বরুণেন পিত্রা উপদিষ্টং তপআখ্যং পুনঃপুনর্বিচারম্ এব ব্রহ্মাপরোক্ষায় মুখ্যং সাধনম উপদিশ্য ব্রহ্মবিদঃ তৃপ্তিগানং চ

* বৈ+এষঃ—বা এষঃ। 'বৈ' অর্থাৎ প্রসিদ্ধ।

অন্তে প্রদর্শ্য উপররাম তৈত্তিরীয়োপনিষৎ। ইত্থংতয়া মাতৃবৎ সর্ব-প্রাণি-হিতৈষিণ্যা প্রতিপাদিতং বিষ্ণুং স্তৌতি দ্বাভ্যাং—(৬)।

টীকানুবাদ : তৈত্তিরীয় উপনিষৎ এইরূপে ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিয়াছেন—প্রথমে কর্ম-কাণ্ডাদি-বিহিত উপাসনাদির দ্বারা একাগ্রচিত্ত অধিকারীর প্রতি 'ব্রহ্মবিৎ পরব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন' [সূত্রস্থানীয়] এই বাক্যের দ্বারা বিষয় ও ফলের সহিত ব্রহ্মবিদ্যার সূচনা করিয়াছেন। [উক্ত সূত্রের মধ্যে] ব্রহ্ম'—ইহা বিষয়ের নির্দেশ; 'বিৎ'—এই পদের দ্বারা বিদ্যা নির্দিষ্ট হইয়াছে; 'পরম্ আপ্নোতি' ইহার দ্বারা বিদ্যাফল নির্দিষ্ট হইয়াছে;—ইহাই [সম্পূর্ণ সূত্রটির] বিভাগ। (১)

তদনন্তর [শ্রুতি ঐ] সূত্রের অর্থ সংক্ষেপে—'ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান অনন্তস্বরূপ; ব্রহ্মকে হৃদয়স্থ পরমাকাশে [বুদ্ধিরূপ] গুহার মধ্যে অবস্থিতরূপে যিনি দর্শন করেন, তিনি সর্বজ্ঞ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যুগপৎ সকল কাম্য বস্তু উপভোগ করেন।'—এই ঋক্ মন্ত্রের উদ্ধৃতির দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। [পূর্বোক্ত] সূত্রস্থিত 'ব্রহ্ম'-পদের ব্যাখ্যা 'সত্যম্' ইত্যাদি ('জ্ঞানম্', 'অনন্তম্')। 'যো বেদ' ইত্যাদি 'বিৎ'-পদের ব্যাখ্যান। 'সোঽশ্নুতে' ইত্যাদি 'আপ্নোতি পরম্'—এই পদদ্বয়ের ব্যাখ্যান। এইরূপ বিভাগ বুঝিতে হইবে। (২)

ঋক্ মন্ত্রের অর্থ এই : 'সত্যং'—কালত্রয়ে অবাধিতভাবে উপলক্ষিত, 'জ্ঞানং'—স্বয়ং-প্রকাশ, 'অনন্তং'—অন্ত অর্থাৎ দেশ- কাল- ও বস্তু-কৃত পরিচ্ছেদ (সীমা অর্থাৎ অবধি), সেই ত্রিবিধ পরিচ্ছেদের অভাবদ্বারা উপলক্ষিত; 'ব্রহ্ম'—ইহা লক্ষ্য [বস্তুর] নির্দেশ। 'গুহায়াং'—[গুহারূপ][১] বুদ্ধিতে; ['পরমে ব্যোমন্'—][২] পরম ব্যোম অর্থাৎ অব্যাকৃত আকাশ, যাহা [সকলের] কারণরূপে বর্তমান, তাহাতে;[৩] 'নিহিতং'—প্রতিবিম্বরূপে অবস্থিত; যে চৈতন্য, সত্যাদি-পদত্রয়-লক্ষ্য[৪] সেই চৈতন্যকেই ব্রহ্মরূপে 'যো বেদ'—যিনি জানেন, 'স সর্বান্ কামান্'—

১ আবরণার্থক গুহ্ ধাতু হইতে 'গুহা'-পদটি নিষ্পন্ন। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা—এই পদার্থত্রয় বুদ্ধিতে নিগূঢ় থাকে, এইজন্য বুদ্ধিকেই 'গুহা' বলা হইয়াছে।

২ টীকাকার ঋক্ মন্ত্রটির 'পরমে ব্যোমন্'—এই পদদ্বয়ের উল্লেখ না করিয়া একেবারেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যদিও তিনি অন্য পদগুলির প্রত্যেকটির উল্লেখ করিয়াছেন।

৩ 'তাহাতে' অর্থাৎ সেই অব্যাকৃত আকাশে। কিন্তু অব্যাকৃত আকাশকে [সকলের] কারণ বলা হইয়াছে। সুতরাং বুদ্ধিরও কারণ অব্যাকৃত আকাশ। কারণে কার্য বিদ্যমান। অতএব অব্যাকৃত আকাশেই বুদ্ধি বিদ্যমান। সেই বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য—ইহাই তাৎপর্য।

৪ টীকাতে 'সত্যাদি-পদত্রয়-লক্ষণং'-পদটি বাক্যের আদিতে থাকিলেও অনুবাদে অনেক পরে আনিতে হইয়াছে। বস্তুতঃ টীকাতে দূরান্বয় আছে। সরলান্বয় এইরূপ হইবে : গুহায়াং বুদ্ধৌ, [পরমে ব্যোমন্] পরং ব্যোম অব্যাকৃতাকাশং যৎ [সর্ব-] কারণত্বেন বর্ততে তত্র, নিহিতং প্রতিবিম্বতয়া অবস্থিতং যৎ চৈতন্যং, সত্যাদি-পদত্রয়-লক্ষণং তৎ যো ব্রহ্মত্বেন বেদ, স সর্বান্ কামান্ ইত্যাদি।

তিনি সার্বভৌম হইতে হিরণ্যগর্ভ পর্যন্ত সকল ভোগ্যসমূহ 'সহ'—যুগপৎ অর্থাৎ একই কালে 'অশ্নুতে'—ভোগ করেন। কি প্রকারে [ভোগ করেন]? [তাহা বলিতেছেন—] 'বিপশ্চিতা'—সর্বজ্ঞের সহিত; 'ব্রহ্মণা'—সর্বজ্ঞরূপে, উপাধি-পরিচ্ছিন্নরূপে নহে। [তাৎপর্য বলিতেছেন -] ক্ষুদ্র আনন্দসমূহ ব্রহ্মানন্দের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া সার্বভৌম হইতে আরম্ভ করিয়া হিরণ্যগর্ভ পর্যন্ত ভোগসমূহ ব্রহ্মবিদের স্বরূপভূত হওয়ায় এবং ঐ সকল চৈতন্যদ্বারাই অবভাসিত হওয়ায় ব্রহ্মবিদের যুগপৎ অর্থাৎ একই কালে সর্বভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হয়, ইহাই অর্থ। (৩

অনন্তর ব্রহ্মের সূত্রের[৫] ব্যাখ্যানরূপ ঋক্ মন্ত্রের দ্বারা কথিত [ব্রহ্মের] আনন্ত্য-[৬] সিদ্ধির জন্য [শ্রুতি] ব্রহ্ম হইতেই আকাশাদির উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার পর 'যো বেদ' ইত্যাদি [মন্ত্র-] কথিত ব্রহ্মের স্বরূপ বলিবার জন্য [শ্রুতি]—'সেই প্রসিদ্ধ এই পুরুষ (শরীর) অন্নরসের বিকার' ইহা হইতে আরম্ভ করিয়া দেহাদি-পঞ্চকোশে ক্রমিক আত্মোপদেশ করিয়া 'ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠাবিধায়ক (অবস্থিতি-কারণ) পুচ্ছ' এই পর্যন্ত [বাক্যসহায়ে ব্রহ্মের স্বরূপই] পুনরায় বিস্তৃতভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন। (৪)

তাহার পর নামরূপাতীত ব্রহ্ম প্রত্যক্ষাদির (প্রমাণের) অবিষয় বলিয়া [তাঁহার] অসত্তার আশঙ্কায় [ঐ আশঙ্কা দূর করিবার জন্য শ্রুতি] 'তিনি কামনা করিলেন' এই বাক্যে স্বর্গকামীর ন্যায় তাঁহার কাময়িতৃত্ব, 'তিনি [জ্ঞানাত্মক] তপঃ অনুষ্ঠান করিলেন' এই বাক্যে মন্ত্রীদের ন্যায় তাঁহার বিচারকর্তৃত্ব, 'তিনি এই সমস্ত সৃষ্টি করিলেন' এই বাক্যে কুম্ভকারের ন্যায় তাঁহার সৃষ্টিকর্তৃত্ব এবং 'তিনি তাহাতে (সৃষ্ট শরীরসমূহে) প্রবেশ করিলেন' এই বাক্যে সর্পাদির ন্যায় তাঁহার প্রবেশকর্তৃত্ব বর্ণনা করিয়া [তাঁহার অর্থাৎ ব্রহ্মের] সত্তা উপপাদন করিয়া পুনরায় 'কে জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইত?' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা [ব্রহ্মকেই] সর্বপ্রাণীর জীবনহেতুরূপে এবং 'যখনই ইনি [এই ব্রহ্মে অল্পমাত্রও ভেদদর্শন করেন, তখনই তাঁহার ভয় হয়]' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বিদ্বান ও অবিদ্বানের অভয় ও ভয়ের হেতুরূপে সেই সত্তাই (ব্রহ্মের সত্তাই) দৃঢ় [রূপে প্রতিষ্ঠিত] করিয়াছেন। (৫)

অনন্তর '[ব্রহ্মস্বরূপ] আনন্দের সুপ্রসিদ্ধ মীমাংসা' ইত্যাদি [বাক্যের] দ্বারা আনন্দের বিচার আরম্ভ করিয়া সার্বভৌমাদি-হিরণ্যগর্ভ-পর্যন্ত আনন্দসমূহের উত্তরোত্তর শতগুণ উৎকর্ষ প্রদর্শনপূর্বক 'মনের (বুদ্ধির) সহিত [বস্তুবোধক] বাক্যসমূহ যাঁহাকে (যে ব্রহ্মকে) না পাইয়া (প্রকাশ করিতে অক্ষম হইয়া) যাঁহা হইতে (যে ব্রহ্ম হইতে) প্রতিনিবৃত্ত হয়, আনন্দস্বরূপ [সেই] ব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞাতা কোন কিছু হইতে ভীত হন না' ইহার (এই বাক্যের) দ্বারা তৈত্তিরীয় উপনিষৎ [ব্রহ্মবিদের] বাক্যমনের অগোচর, নিরতিশয় ব্রহ্মানন্দের প্রাপ্তি ও নিরতিশয় অনর্থের নিবৃত্তি প্রতিপাদন করিয়া পুনরায় 'কেবল এই-

---

৫ 'ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্' এই শ্রুতিই ব্রহ্মের সূত্র। টীকার প্রারম্ভেই ইহা বলা হইয়াছে।

৬ উপাদান-কারণ নিজের কার্য হইতে অধিক ব্যাপক হয়। সুতরাং লোকপ্রসিদ্ধ ব্যাপক আকাশেরও উপাদান-কারণ ব্রহ্ম সর্বাপেক্ষা ব্যাপক—ইহাই 'আনন্ত্য'-শব্দের তাৎপর্য।

প্রকার আনীকেই [—আমি কেন সৎকর্ম করি নাই, কেন অসৎকর্ম করিয়াছিলাম—এইরূপ অনুতাপ সন্তপ্ত করে না]' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বিস্তৃতভাবে অনর্থনিবৃত্তির বর্ণনা করিয়া; নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞানের সাধন কি তাহা জানাইবার আকাঙ্ক্ষায় 'বরুণের পুত্র ভৃগু…'ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ভৃগু-বরুণ-সংবাদ উপক্রম করিয়া; 'যাঁহা হইতে সর্বপ্রাণী জাত হয়··' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ নির্ধারণপূর্বক পিতা বরুণকর্তৃক প্রিয় পুত্রকে উপদিষ্ট তপস্যানামক বারংবার বিচারকেই ব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞানের মুখ্য সাধনরূপে নির্ণয় করিয়া সর্বশেষে ব্রহ্মবিদের তৃপ্তিসূচক গান (বাণী) প্রদর্শন করিয়া উপরত হইয়াছেন (উপসংহার করিয়াছেন)। মাতার ন্যায় সর্বপ্রাণিহিতৈষিণী [শ্রুতি] কর্তৃক এইভাবে প্রতিপাদিত বিষ্ণুকে [আচার্য] দুইটি শ্লোকে স্তুতি করিতেছেন—(৬) [ক্রমশঃ]

নতুন পথের দিশারী শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী গম্ভীরানন্দ*

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন,—'সত্যই হচ্ছে কলির তপস্যা।' আমায় একটু মাপ করতে হবে আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা ঠিক কথামৃতের ভাষায় বা লীলাপ্রসঙ্গের ভাষায় উদ্ধৃত করতে পারবো না, কিন্তু আমি আশা করি তাতে ভাবের কোন রকমের বিকৃতি ঘটবে না। তুলসীদাসের দোঁহা উদ্ধার করেও শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন:

সত্যবচন অধীনতা পরস্ত্রী মাতৃসমান।
ইনসে হরি ন মিলে তো তুলসী ঝুট জবান॥

আপনারা যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী অধ্যয়ন করেছেন, তাঁরা জানেন, তিনি জগন্মাতাকে সব সমর্পণ করেছিলেন—মান যশ ধন ইত্যাদি যা কিছু মানবের ভোগ্য বস্তু। ধর্ম-অধর্ম জ্ঞান-অজ্ঞান সব কিছু মার চরণে অর্পণ করেছিলেন। কিন্তু সত্যকে তিনি অর্পণ করতে পারেননি। তা যদি করতেন, তা হ'লে তাঁর অর্পণ পর্যন্ত মিথ্যা হয়ে যেত। সত্যেতে তিনি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। শুধু সত্য কথা বলাতে নয়—সত্য ব্যবহারেও।

আপনারা জানেন, দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীর সন্নিকটে ছিল শম্ভু মল্লিক মশায়ের বাগান-বাড়ী। সেখানে তিনি মাঝে মাঝে যেতেন বেড়াতে। শম্ভু মল্লিককে তিনি বলতেন, তাঁর অন্যতম রসদ্দার। তাঁর পেটের অসুখ ছিল। সুতরাং শম্ভুবাবু তাঁকে বলেছিলেন, তাঁর কাছ থেকে একটুকু আফিং নিতে। আফিং-এ পেটের অসুখ সারে। তখনকার দিনে ডাক্তার কবিরাজ এত তো ছিল না। ঐ রকমই চিকিৎসা হতো। তা কথাবার্তায় দুজনেই আফিং-এর কথা ভুলে গেলেন। শম্ভুবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পথে এসে ঠাকুরের ঐ কথা মনে পড়ায় আবার শম্ভুবাবুর বাগানবাড়ীতে গেলেন। তখন শম্ভুবাবু বাড়ীর ভিতরে চলে গিয়েছেন। কাজেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কর্মচারীর কাছ থেকে আফিং নিলেন। কালীবাড়ীতে ফিরছেন, কিন্তু পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। যেমন এগুতে যাচ্ছেন কে যেন পা টেনে নর্দমার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ভাবলেন, একি হ'ল? অথচ

* রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কর্মসচিব।

ফিরে যখন তাকাচ্ছেন তখন শম্ভুবাবুর বাড়ির পথ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন। এমনি ক'রে বার কয়েক চেষ্টার পরে ভাবলেন, 'আমার একটা মিথ্যা আচরণ করা হয়েছে। শম্ভু বলেছিল, তার কাছ থেকে নিতে। তা তো নিইনি। আমি নিয়েছি কর্মচারীর কাছ থেকে। সুতরাং চোখে পথ দেখতে পাচ্ছি না—মা ফিরে যেতে দিচ্ছেন না। ফিরলেন শম্ভুবাবুর বাড়ির দিকে। তখন ঘর বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কর্মচারীও নেই। কাজেই জানলা দিয়ে আফিং-এর মোড়কটা ঘরের ভেতরে ফেলে দিয়ে বললেন, 'এই তোমাদের আফিং রইল গো।' ব'লে যখন ফিরলেন দক্ষিণেশ্বরের দিকে, তখন পথ সুন্দর পরিষ্কার হয়ে গেছে। বেশ চলে গেলেন। এই ছিল তাঁর সত্যের উপর আঁট। এই ছিল তাঁর সত্য আচরণ। আর এরই সঙ্গে বিজড়িত ছিল তাঁর সত্য অনুভূতি। তারই ফলে তাঁর জীবন এবং বাণী এমন মহত্বপূর্ণ ও সত্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

বসে আছেন। সামনে কেশবচন্দ্র সেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি ব্রাহ্মনেতারা। নরেন্দ্রনাথও আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের দিকে তাকাচ্ছেন ভাবস্থ হয়ে। একবার কেশবচন্দ্রকে দেখলেন, বিজয়কৃষ্ণকে দেখলেন, তারপর নরেন্দ্রকে দেখলেন। সভাভঙ্গে বললেন, 'যে গুণ অবলম্বনে কেশবচন্দ্র খ্যাতি লাভ করেছেন, জগতে পরিচিত হয়েছেন, তেমন আঠারটি গুণ রয়েছে নরেন্দ্রের ভেতরে।' বললেন, 'কেশব আর বিজয়ের ভেতরে প্রদীপ মাত্র জ্বলছে কিন্তু নরেন্দ্রের ভেতরে জ্ঞানসূর্য উদয় হয়ে, তার সমস্ত মায়ামোহ দূর করে দিয়েছে।' নরেন্দ্র বললেন, 'করেন কি মশায়, কি বলছেন আপনি? কোথায় কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আর কোথায় আমার মতো একটা স্কুলের ছোঁড়া! আমাকে আপনি এমন ভাবে প্রশংসা করছেন—লোকে যে আপনাকে উন্মাদ বলবে।' মুচকি হেসে (ঠাকুর) বললেন, 'তা কি করবো রে, আমি কি বলছি? মা যে আমায় দেখিয়ে দিচ্ছে, মা যে আমাকে বলাচ্ছে।' তিনি নিজে তো কিছু করেননি। মা তাঁর ভেতর দিয়ে কাজ করছিলেন। মা তাঁকে দেখিয়ে দিচ্ছেন, তাই তাঁর এতো সাহস—এতো বিশ্বাসের সঙ্গে তিনি কথা বলতে পারছেন।

আবার নরেন্দ্রনাথ তাঁকে বললেন অন্য এক সময়ে, 'মশায়, আপনি এতো নরেন নরেন ভাবেন কেন? আপনি ভরতরাজার কথা জানেন তো, হরিণ হরিণ ভেবে দেহত্যাগ করেছিলেন ব'লে পরজন্মে তাঁকে হরিণ হতে হয়েছিল। তা আপনি যদি নরেন নরেন করতে থাকেন তো আপনারও সেই গতি হবে।'

ঠাকুর নরেনকে ভালবাসেন, তিনি অনুভূতিতে দেখেছেন, নরেন সপ্তর্ষির একজন, পৃথিবীতে নেমে এসেছেন তাঁর বার্তাবহরূপে, তাঁর বার্তাকে রূপ-প্রদানের জন্যে। সেই নরেন যখন এমন কথা বলছে, তার কথা তো ভুল হতে পারে না। তা হ'লে মা কি আমাকে ভুল দেখালেন। মা, যাঁর ওপর আমি সর্বপ্রকারে নির্ভর করে আছি, তিনি কি আমাকে বেতালে চলতে দিলেন। গেলেন মা কালীর কাছে কালীমন্দিরে। ফিরে এসে বললেন নরেনকে, 'দূর শালা, মা আমায় ব'লে দিয়েছেন, আমি তোর ভেতরে নারায়ণকে দেখি, তাই তোকে ভালবাসি। যেদিন তোর ভেতরে নারায়ণকে দেখতে না পাবো, সেদিন তোর মুখ দেখতে পারবো না।'

এই ছিল তাঁর অনুভূতি। এই অনুভূতিকে অবলম্বন ক'রে তাঁর সত্যনিষ্ঠা, তাঁর সত্য আচরণ রূপ পরিগ্রহ করেছিল তাঁর জীবনে ও

বাণীতে।

বর্তমান যুগের জন্যে তিনি রেখে গেছেন এক নতুন বার্তা, একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, একটা নতুন পথে চলবার ইশারা। কেমন করে? পূর্ববর্তী বক্তাদের বক্তৃতার ভেতরে তার খানিকটা আভাস পেয়েছেন। কথাটা হচ্ছে এই: বেদান্ততে বলা হ'লো 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'। তখনকার দিনে হরিবাবু পরবর্তী যুগে স্বামী তুরীয়ানন্দ—অনেকদিন আসেননি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। এটা আছে কথামৃতের চতুর্থ ভাগের শেষের দিকে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের রথের সময় যখন শ্রীরামকৃষ্ণ বলরাম মন্দিরে ছিলেন, তখনকার কথা। অনেকদিন পরে হরিবাবু যখন এলেন, ঠাকুর বললেন, "কিগো তুমি যে আসো না। তুমি বুঝি খুব বেদান্ত চর্চা করছো। তা তোমার বেদান্তে কী আছে?—'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'—এই তো? কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত 'আমি'-বুদ্ধি আছে ততক্ষণ পর্যন্ত লীলা মানতে হবে। জীব জগৎ সবই আছে।" আর বললেন কি? 'যতক্ষণ মনেতে বিচার চলছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তো তুমি সংসারের বাইরে যাওনি। সংসারের মানুষ নিয়ে, সংসারের কথাবার্তা নিয়ে, সংসারের ভাবধারা নিয়ে, এই নিয়ে তো বিচার চলছে? তা হ'লে তুমি জগৎ ছেড়ে গেলে কোথায়?'

নির্বিকল্প সমাধিতে উঠলেন, আবার নেমে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এসে বললেন, ছাদে উঠছি সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে -একটি ক'রে একটি ধাপ বেয়ে 'নেতি' 'নেতি'— এটা নয়, এটা নয় ক'রে। উপরে যখন উঠলুম তখন কি দেখলুম? না, উপরের ছাদ যে জিনিস দিয়ে তৈরী, নীচের সিঁড়িও সেই জিনিসেই তৈরী। তা হ'লে নীচের সিঁড়িটাকে বাদ দিয়ে শুধু কথায় ভুলে গিয়ে, বিচারেতে ডুবে গিয়ে, কেউ যদি সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে ভাবে আমি ছাদে পৌঁছে গেছি, আর ছাদে পৌঁছে গেছি ভেবে দৌড়তে থাকে আর নৃত্য করতে থাকে, তার ফলটা কি হবে? পড়ে গিয়ে হাত পা ভাঙবে। আমাদের তেমনি যেন একটা অবস্থা দাঁড়িয়েছিল। এই যে জগৎ-সংসার আমরা দেখতে পাচ্ছি, বেদান্ত অবলম্বন ক'রে আমরা জানলাম যে, 'জগৎ-সংসার মিথ্যা'। হ'ল মিথ্যা? নির্বিকল্প সমাধি থেকে নেমে এসে আমাকে খেতে হয়, দশজনের সঙ্গে কথা বলতে হয়। ঠাকুর বললেন, ভগবান 'আমি' একটু রেখে দেন। কেন? না, লোকহিতের জন্যে। এই 'লোকহিতের' কথা আপনারা আগে শুনেছেন। লোকহিতের জন্যে, আর কি? না, ভগবানের রসাস্বাদের জন্যে। আনন্দ-সম্ভোগের জন্যে। তাঁর লীলা সম্ভোগ করবার জন্যে। এ 'আমি'টুকু রেখে দিয়েছেন জগৎ রয়ে গেছে ব'লে। বলছেন, কাঁটা বিঁধছে, রক্ত ঝরছে, লাগছে অথচ বলছে —জগৎ নেই!

সাধু একজন এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। তাঁর একটা দুর্নাম রটেছিল। ঠাকুর তাঁকে বললেন, 'স্বামীজী, এসব কথা কি শুনছি?' স্বামীজী উত্তর দিলেন, জগৎ তিন কালমেঁ হ্যায় নহীঁ। জগৎ যখন মিথ্যা, এটাও মিথ্যা!

ঠাকুর কি বলেছিলেন? 'মুতে দি তোমার অমন বেদান্তে।' অমন বেদান্ত, বেদান্তই নয়। ও কথার কথা মাত্র। পাঁজিতে পড়লে—এক আড়া কি দশ আড়া জল হবে এ বছর। পাঁজি নিংড়োলে এক ফোঁটা জলও তো পড়বে! এক ফোঁটাই পড়! তাও পড়ে না! কথার কথা নয় এগুলো। এগুলো হচ্ছে অনুভূতির ব্যাপার। তাঁকে সত্য সত্যই জানতে হবে। জানবার পর যখন আমি জগতে নেমে এলাম, তখন কি আমি তাকে পদাঘাত করবো মিথ্যা বলে?

অথবা তার সঙ্গে একটা সম্প্রীতির ভাব স্থাপন করবো? তাকে ভালবাসবো? তাকে আপনার করে নেবো? ঠাকুর দেখলেন—সব যেন মোমের তৈরী, একই বিজ্ঞান বা একই ব্রহ্মবস্তুর দ্বারা সমস্ত জগৎ যেন ব্যাপ্ত হয়ে আছে। শুধু ব্যাপ্ত হয়ে নয়—সব তৈরী হয়েছে, প্রস্তুত হয়েছে সেই বস্তু দিয়ে। এটা matter নয়, সামান্য জড় বস্তু নয়। চৈতন্যই এই সমস্ত রূপ ধারণ করেছে। বলছেন—যেমন বালিসের খোলটা থাকে, তেমনি দেখলুম মা বিভিন্ন খোলের মধ্যে দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে

কথায় কথা নয়। আপনারা জানেন, তোতাপুরী এসেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। কঠিন বেদান্তী তিনি। জগৎকে—'তিন কালমেঁ হ্যায় নহী' ব'লে জানেন। আছেন দীর্ঘ কাল। হয়েছে কঠিন আমাশয়। তাঁর মনে হ'ল, শরীর রেখে কি হবে? গঙ্গায় শরীর বিসর্জন দিতে গেলেন। কিন্তু এমনি মহামায়ার মায়া—গঙ্গা সেদিন শুকিয়ে গেল। যত তিনি এগিয়ে যান, ডুববার মতো জল আর তিনি পান না। পরপারের গাছগুলো সব সামনে এসে পড়লো। অবাক্ হয়ে ভাবলেন, 'ইয়ে ক্যা দৈবী মায়া হ্যায়।' ফিরলেন তিনি ভক্তির ভাব নিয়ে। ঠাকুরকে তিনি হাসিঠাট্টা করতেন—ঠাকুর হাততালি দিয়ে ভগবানের নাম করছেন আর তিনি বলছেন, 'কেঁও রোটী ঠোকতে হো।' পশ্চিম দেশেতে দু হাতের চাপে রুটী তৈরী ক'রে থাকে, তাই বললেন, কেঁও রোটী ঠোকতে হো। ঠাকুর বললেন, 'দূর শালা, আমি ভগবানের নাম করছি, আর তুমি কিনা বলছো আমি রুটি ঠুকছি!' সেই তোতাপুরী সেদিন ভোরবেলায় দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে গেলেন, মার সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। তাঁর মন প্রাণ ভ'রে উঠলো। তার কয়েক দিন পরেই ঠাকুরকে বললেন, 'এখন আমি তোমার কাছ থেকে বিদায় নেব।' কারণ তাঁর দৃষ্টির তখন সম্পূর্ণতা ঘটেছে—সমস্ত জগৎকে এক নতুন দৃষ্টিতে দর্শন করা, যা বললেন ডক্টর রাঘবাচার একটু আগে।

মানুষকে তিনি মানুষভাবে দেখেননি। দেখেছিলেন নারায়ণরূপেতে। সমস্ত জগৎকে তিনি দেখেছিলেন ভগবানের বিকাশরূপে। শুধু দেখা নয়। ঠিক সেইরূপ আচরণও করেছিলেন। আপনারা জানেন, তথাকথিত অস্পৃশ্য, যাকে বলে মেথর—তার' পায়খানা তিনি জল দিয়ে পরিষ্কার ক'রে নিজের চুল দিয়ে—চুল তখন লম্বা হয়েছে, জটার মত পাকিয়ে গিয়েছে অযত্নে -তাই দিয়ে পরিষ্কার ক'রে দিয়েছিলেন। ভিখারীরা যেখানে খায়, সেই খানে গিয়ে তাদের এঁটো পাতা পরিষ্কার করেছিলেন। শুধু পরিষ্কার করা নয়। তাদের এঁটো মুখে দিয়েছিলেন।

এঁরা বলেন কিনা জগতের উদ্‌বর্তন হবে—ক্রমবিকাশ হবে; সেটা হবে সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে, আর যোগ্যতমের হবে উদ্‌বর্তন। শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে বললেন, 'না, প্রেমের দ্বারাই হবে জগতের উদ্‌বর্তন। প্রেমকে অবলম্বন ক'রে জগৎ যাবে এগিয়ে।'

ধর্মে সমাজব্যবস্থা কি প্রকারে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে, ধর্মে সমাজব্যবস্থা কি প্রকারে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে যেতে পারে, তারই একটা সুন্দর পথ খুঁজে বের ক'রে দিয়ে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না। কোন কথা তিনি সামাজিক দৃষ্টিতে বলেননি। কিন্তু সমাজের ভেতরে তিনি নড়াচড়া করেছেন। তারই ভেতরে তিনি চলাফেরা করেছেন। সুতরাং দুচারটি কথা সমাজ-সংস্কারের রূপধারণ ক'রে বেরিয়ে পড়ে

তাঁর মুখ দিয়ে। যেমন ধরুন, কেউ হয় তো গিয়ে প্রশ্ন করলেন, জাতিভেদ কি ক'রে যেতে পারে? উত্তর দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ—'একমাত্র ভক্তির দ্বারা। ভক্তের জাতি নেই।' প্রাচীন-কালে বৈষ্ণব আচার্যেরাও ও-কথা ব'লে গেছেন। তবে তাঁরা বলে গেছেন একভাবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন অন্যভাবে—অদ্বৈত-বেদান্তভাব অবলম্বন ক'রে। তিনি সকলকে নারায়ণভাবে দেখতে পেতেন। এই শুনেছেন গিরিশ ঘোষের কথা। আরও দৃষ্টান্ত নিন। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন ঘোড়ার গাড়ীতে। দেখতে পেলেন শুঁড়ীর দোকানে মাতালরা বেশ আনন্দ করছে। দেখে বললেন, 'খুব আনন্দ হচ্ছে, বাঃ বাঃ বেশ আনন্দ করো।' তিনি সেখানে মদ খাওয়া তো দেখলেন না। দেখলেন সেখানে ভগবানের আনন্দ স্ফূর্ত হয়ে উঠেছে মানুষের ভেতর দিয়ে।

দেখলেন রোয়াকে ব'সে একটি মহিলা, মানুষের মন গলানোর জন্যে আলবোলাতে তামাক খাচ্ছে, আর এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে। বললেন, মা, তোর ইচ্ছা হয়েছে এভাবে থাকতে। এও তোর রূপ বটে।

এই হ'ল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী—সব জায়গায়, শুধু গিরিশ ঘোষের বেলায় নয়।

সমস্ত কথায় সমস্ত আচরণে তিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এবং যেটা সত্য ব'লে অনুভব করেছেন, নিজের জীবনে বিকাশ করেছেন, অপরকেও সেই কথাই ব'লে গিয়েছেন। ঐ যে বলা হ'ল তিনি দেওঘরে দরিদ্রদের সেবা করেছেন, সেখানে নারায়ণবুদ্ধি দিয়ে সেবা করেছিলেন, অন্য বুদ্ধি দিয়ে নয়। ঐ যে তিনি রাণাঘাটে মথুরবাবুর জমিদারীতে গিয়ে বললেন—'এদের মাপ ক'রে দাও খাজনা', সেটা নারায়ণবুদ্ধিতে করেছিলেন। সমাজ-সেবার প্রয়োজন ছিল না, সেই ভাব তাঁর মধ্যে ছিল না। তা হ'লে দেখতে পাচ্ছেন যে, ধর্মকে অবলম্বন ক'রেও আমরা একটা সমতার দৃষ্টিতে অবস্থান করতে পারি এবং ধর্মকে অবলম্বন ক'রেও আমরা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, আরও উচ্চতর, উচ্চতম দিকে। শ্রীরাম-কৃষ্ণের জীবনে এর একটা সুন্দর ইঙ্গিত আমরা পেয়েছি—তাঁর জীবনের প্রতি আচরণের ভেতরে, তাঁর প্রতি কথার ভেতরে।

লোকে বলে, ধর্ম ধর্ম ক'রে সমস্ত সমাজ অধঃপাতে গেল। ধর্ম ধর্ম ক'রে সমাজ যদি অধঃপাতে যাবে, তা হ'লে প্রাচীন ভারত কি ক'রে বড় হয়েছিল? ধর্মকে ছেড়ে? না পাশ্চাত্য জগৎ ধর্মটাকে ছেড়ে দিয়েছে এখনও? অথবা অন্য কোন জাতি? মুসলমানরা কি ধর্মকে ছেড়ে দিয়ে বড় হয়েছিল? শক, হুন, পাঠান, মোগল যে লাফিয়ে পড়েছিল ভারতের ওপর, তারা ধর্মের জন্যে এসেছিল, না টাকা-কড়ির জন্যে? টাকাকড়ি ছিল ব'লেই এসেছিল। ধর্ম তো ভারত ছাড়েনি, অথচ সে অর্থ প্রচুর লাভ করেছিল, উন্নত হয়েছিল, যা দেখে হিউএন-সাং প্রভৃতি মুগ্ধ হয়েছিল। সুতরাং ধর্মকে বাদ দিয়ে বড় হ'তে হবে এমন কথা শ্রীরামকৃষ্ণ মানতেন না, মানতে পারেন না। আমরাও তা মানতে পারি না। বরং আমরা বলবো ধর্মকে ছেড়ে দিয়ে যারা এগুতে চায় তারা পশুজীবন থেকে দূরে নয়। তারা মারা-মারি কাটাকাটি ক'রে একটা সমতা আনতে চেষ্টা করতে পারে। সে সমতা দীর্ঘস্থায়ী হয় না, হ'তে পারে না। কিন্তু যারা ধর্মকে অবলম্বন ক'রে থাকবে, যারা অপরের সেবায় নিযুক্ত হবে, তাদের প্রচেষ্টা ঠিক স্থায়ী হবে। শ্রীরামকৃষ্ণও সেই পথেরই ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছেন। সত্যকে অবলম্বন করতে হবে শুধু কথার কথা হিসাবে নয়, জীবনের একটা

বাস্তব জিনিস হিসাবে এবং জীবনে তা রূপায়িত করতে হবে। শুধু ব্যক্তির জীবনে নয়, সমস্ত সমাজজীবনে, সমস্ত মানবজাতির জীবনে। মানুষ থেকে মানুষ বস্তুত: পৃথক্ নয়। পাপী ব'লে কেউ নেই। ওই রঙ্গ-চঙ্গ কিছু নয়। সব মানুষ নারায়ণ। সেই নারায়ণদৃষ্টিতে তাদের দেখতে হবে। আজ না পারি কাল পারবো। কিন্তু একবার পথ হলো এই। এই দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

আজ পারলুম না ব'লে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বৃথা হয়ে যেতে পারে না। তাঁর কথা সত্য ব'লে বিচারেতে যখন পেয়েছি, অনুভূতিতে যখন জানছি যে এ-ই পথ, তখন পারি বা না পারি, এটাই হবে আমাদের সাধনা। এবং এই পথেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

নমস্কার।*

* ১০ই মার্চ ১৯৭৮, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় সভাপতির অভিভাষণ। শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত।—সঃ

হিততম কি ?

শিবপুরী

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ' পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় পরমহংসদেব বলিতেছেন—"ভগবান কল্পতরু। কল্পতরুর নিকট বসে যে যা কিছু প্রার্থনা করে, তাই তার লাভ হয়।...ঈশ্বর সাধন করতে গিয়ে বিষয়, ধন, জন অথবা মানযশ ইত্যাদির কামনা করলে তা কিছু কিছু লাভ হয় বটে কিন্তু শেষে ব্যাঘ্রেরও ভয় থাকে। অর্থাৎ রোগ, শোক, তাপ, মান, অপমান ও বিষয়নাশরূপ ব্যাঘ্র স্বাভাবিক ব্যাঘ্র হতেও লক্ষগুণে যন্ত্রণাদায়ক।" তিনি গল্প করে বলেছিলেন যে কল্পতরুর নীচে বসে পথশ্রান্ত এক ব্যক্তি সুকোমল শয্যা, পদসেবার জন্য সুন্দরী স্ত্রী, উত্তম খাদ্য প্রভৃতি প্রার্থনা করে পর পর সবই পাইল বটে কিন্তু যদি একটি ব্যাঘ্র এসে আক্রমণ করে—এই চিন্তা করায় অবশেষে একটি ব্যাঘ্রও আসিয়া তাহাকে উদরসাৎ করিল।

গল্পটি কৌতুকাবহ ও বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। মানুষ অনেক কিছুই ভগবানের কাছে চায়। পুত্রকামনায় সে ভগবানের কাছে অতি কাতরে একটি পুত্রের জন্য প্রার্থনা করে। পুত্র হয়তো পায় কিন্তু সে পুত্র হয়তো কয়েক বৎসর পর মাতাপিতাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া মৃত্যু-কবলিত হয় অথবা দুরাচারী লম্পট হইয়া তাহাদের অশেষ মনস্তাপের কারণ হয়। লোকে ধন চাহিয়া ধন হয়তো পায় কিন্তু পরে সেই ধনের জন্যই দস্যুহস্তে প্রাণ হারায় বা পুত্রপত্নী বা আত্মীয়স্বজনবর্গের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য অশেষ সন্তাপগ্রস্ত হয়। মানযশের বেলায়ও তদ্রূপ। যে আজ লোকসমাজে মান্যগণ্য হইয়া যশের চরম শিখরে আরূঢ় কাল সে জনসাধারণ কর্তৃক নিন্দিত, ধিক্কৃত, অবহেলিত ও পরিত্যক্ত।

আসল কথাটা এই যে, ভগবানের নিকট যথার্থ কি চাহিতে হইবে বা চাওয়া উচিত সেটিই মানুষ জানে না। মানুষের দৃষ্টি অতি

সীমিত, কেবল বর্তমানেই সীমাবদ্ধ। সে কি চাহিতে কি চাহিয়া বসে, তাহার কিছু ঠিক নাই। ভক্ত কিন্তু ভগবানের নিকট 'এটা-সেটা' প্রার্থনা না করিয়া এই প্রার্থনাই করেন—"হে ভগবান! আমি তো জানি না পরিণামে কিসে আমার কল্যাণ হইবে। যাহাতে আমার কল্যাণ হয় তাহাই তুমি করিও, তাহাই দিও। একমাত্র তুমিই জান কিসের দ্বারা ও কোন উপায়ে আমার কল্যাণ হইবে, সেরূপ বিধানই তুমি করিও। শিশু যেমন মায়ের মুখপানে চাহিয়া থাকে আমিও তদ্রূপ তোমার শ্রীমুখপানেই একান্ত নির্ভরতার সহিত চাহিয়া থাকিব।" অতঃপর সাধক সদুপায়ে অর্জিত যথালব্ধ অন্নবস্ত্রেই সন্তুষ্ট থাকেন এবং শরীরধারণ করিলে অবশ্যম্ভাবী যে রোগ শোক দারিদ্র্য বিত্তহানি পুত্রহানি মানহানি প্রভৃতি জনিত দুঃখ তাহাতেও তিনি শ্রীভগবানের মঙ্গলময় হস্তের স্পর্শই অনুভব করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। তিনি মনে করেন যে শ্রীভগবান এই সকল দুঃখের ভিতর দিয়াই তাহাকে পরম কল্যাণের পথে লইয়া চলিয়াছেন। কিসে কল্যাণ হইবে তাহা যখন জীব জানে না, তখন মোহ-বশে 'এটা-সেটা' চাহিয়া তাহা লইয়া বিব্রত হওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে। ভগবান কল্যাণময়, অতএব যাহা আমার কল্যাণপ্রদ তাহাই তিনি দিবেন। শুভ অথবা আপাতদৃষ্টিতে অশুভ যাহাই হউক না কেন, সকলই তাঁহারই কল্যাণময় হস্তের বিধান ইহা জানিয়া সাধক নিশ্চিন্ত থাকেন।

'কৌষিতকী' উপনিষদে পূর্বোক্ত বিষয়ে একটি সুন্দর আখ্যায়িকা দেখিতে পাওয়া যায়। দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দন স্বীয় পৌরুষবলে স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রসমীপে উপস্থিত হইলে ইন্দ্র কৃপাবিষ্ট হইয়া প্রতর্দনকে বলিলেন—'হে প্রতর্দন! আমি তোমাকে একটি বর দিব। তুমি যথা-ভিলষিত বর প্রার্থনা কর।' প্রতর্দন কি চাহিবেন কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতে-ছিলেন না। নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ দেবতাদের কাছে আসিয়া কি চাহিতে কি চাহিয়া বসিবেন ও শেষটায় ভস্মাসুরের ন্যায় একটা ফ্যাসাদে পড়িবেন! ভস্মাসুর শিবের নিকট বর চাহিয়া-ছিলেন যে, তিনি কাহারও মাথায় হাত দিলেই সে ভস্ম হইয়া যাইবে। আশুতোষ শিব বলিয়াছিলেন—'তথাস্তু'। তখন বরের সত্যতা পরীক্ষা করিবার জন্য সে অসুর শিবের মাথাতেই হাত দিতে উদ্যত হইলে শিব বেগতিক দেখিয়া পলায়ন করিলেন। অসুরও শিবের পশ্চাদ্ধাবন করিল। পথিমধ্যে পরমছলী বিষ্ণু অসুরকে বলিলেন, 'তুমি বৃথাই শিবের কথায় বিশ্বাস করিয়া প্রতারিত হইয়াছ। শিবের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কেন হয়রান হইতেছ? তুমি তোমার নিজের মাথাতেই হাত দিয়া দেখ না?' অসুর তাহাই করিল ও বরের অমোঘ প্রভাবে অচিরেই ভস্মীভূত হইল। এইজন্য তাহার নাম হইল 'ভস্মাসুর'।

প্রতর্দন অত নির্বুদ্ধি ছিলেন না। দেবরাজ ইন্দ্রকে তিনি বলিলেন—"প্রভু! আমি তো জানি না কিসে আমার কল্যাণ হইবে। মানুষের পক্ষে পরমকল্যাণপ্রদ যাহা—**'হিততম'** যাহা—তাহাই আপনি স্বয়ং নির্ণয় করিয়া আমাকে দিন।" এবার ইন্দ্র পড়িলেন বিষম পরীক্ষায়। এতকাল ভক্তগণ ধন জন স্ত্রী পুত্র মান যশ যে যাহা চাহিয়াছে তাহাই দিয়াছেন। কিন্তু এ ব্যক্তি তো সেরূপ নহে। ইন্দ্র ভাবিলেন, এই ব্যক্তি যখন বিচারের ভার তাঁহার উপরই ন্যস্ত করিয়াছে, তখন পরম হিত **'হিততম'** বলিয়া যে বস্তু তিনি নিজে বিশ্বাস করেন ও জানেন তাহাই উহাকে দিতে হইবে। ইন্দ্র বরদানে

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তাই তিনি সত্য হইতে বিচলিত হইলেন না।

ইন্দ্র বিচার করিয়া দেখিলেন যে, মনুষ্যগণ ইহলোক ও পরলোকের ভোগজনিত সুখকেই 'হিত' বলিয়া মনে করে। মর্ত্যজগতের 'হিত' বা সুখ হইতেও অধিক স্বর্গীয় সুখের প্রত্যাশীই সকলে। কিন্তু সকলের দৃষ্টিতে 'হিত' হইলেও বস্তুতঃ উহা বিনাশী ও পরিণামে দুঃখপ্রদ বলিয়া যথার্থ 'হিত' বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ঐ সুখও নানা শুভকর্ম ও যাগযজ্ঞাদির প্রভূত অনুষ্ঠানায়াসসাধ্য। সুতরাং উহাও দুঃখরূপ বলিয়া ঐ সুখে বিরত হওয়াই 'হিততর'। প্রত্যুত বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্যই 'হিততর'। নিত্যানন্দানুভূতিপ্রদ আত্মজ্ঞানই এই সংসারে একমাত্র **'হিততম'** বস্তু। সুতরাং আমার প্রতিজ্ঞার সত্যতারক্ষার জন্য আমি প্রতর্দনকে আত্মজ্ঞান লাভের জন্যই উপদেশ দিব, এইরূপ স্থির করিয়া ইন্দ্র বলিলেন—'হে প্রতর্দন! তুমি **আমাকে জান**।'

উপদেশটি অতি সংক্ষিপ্ত ও সূত্রাকার। ইহার অর্থ কি তাহাই বিবেচ্য। 'আমাকে' এই শব্দদ্বারা ইন্দ্র কি নিজের শরীরকে বুঝাইলেন? 'আমি' শব্দ লোকে শরীরের প্রতিও প্রয়োগ করিয়া থাকে। আবার যখন লোকে বলে 'আমার শরীর' তখন শরীর হইতে ভিন্ন এই শরীরের স্বামী যিনি তাঁহাকেও লক্ষ্য করিয়া থাকে। সহস্রনয়নবিশিষ্ট ইন্দ্রশরীর তো প্রতর্দন পূর্বেই দেখিয়াছেন ও জানেন। কিন্তু ঐ শরীরের স্বামীকে তিনি দেখেন নাই। স্বামিপ্রেরিত শরীরের ব্যবহারদর্শনে সেই স্বামীকে অনুমান সহায়ে জানিয়াছেন মাত্র। সুতরাং ইন্দ্রপ্রোক্ত 'আমাকে' এই শব্দটির বিবক্ষিত কোন বিশেষ অর্থ আছে, ইহাই প্রতর্দন বুঝিলেন। ইন্দ্রশরীরের জ্ঞান দ্বারা তাঁহার কোন লাভই এ পর্যন্ত হয় নাই, সুতরাং ঐ শরীরাধিপতি আত্মাকেই নিশ্চয় ইন্দ্র জানিতে বলিয়াছেন—ইহাই প্রতর্দন নির্ণয় করিলেন। কিন্তু আত্মা তো কোন লৌকিক পদার্থ নহে। অলৌকিক আত্মাই যদি জ্ঞেয় হন, তবে সেই জ্ঞানের ফল কি?—এ প্রশ্নের উত্তরে ইন্দ্র বলিলেন: "সর্বদুঃখাভাবরূপ পরমানন্দস্বরূপ মোক্ষপ্রাপ্তিই আত্মজ্ঞানের ফল। ইহাই **'হিততম'** বস্তু। আমার সহস্রাক্ষবিশিষ্ট এই স্থূল দেহ নানা রোগাদিজনিত দুঃখের আগার! সূক্ষ্মদেহও পুণ্যপাপকৃতভয়সন্ত্রস্ত। ত্বষ্টার পুত্র দেবপুরোহিত ত্বাষ্ট্র বিশ্বরূপকে স্বামিদ্রোহিতার অপরাধে আমি বধ করিয়াছিলাম। ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপভয় আমার হইলেও উহা চিদাত্মস্বরূপ আমাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। অহংকারই ব্রহ্মহত্যার কর্তা, চিদাত্মা আমি কখনই নহি, এই সুদৃঢ় আত্মজ্ঞানবলে আমি সর্বপাপ দুঃখ ও ভয় নির্মুক্ত। আরও দেখ আমি বহু বহির্মুখী দুরাচার বেদান্তবিজ্ঞানবিহীন সংন্যাসীকে বধ করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে আমার একটি রোমেরও কোন ক্ষতি হয় নাই। ইহা আমার মহিমা নহে, ইহা আত্মজ্ঞানেরই মহিমা। অপর কেহ যদি আমার ন্যায় আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে তাহা হইলে জ্ঞানের এরূপ ফল সেও প্রাপ্ত হইবে। কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা যে কোন পাপই কেহ করুক না কেন আত্মজ্ঞানের অপূর্ব মহিমায় তাহার মোক্ষ কখনও ব্যাহত হইবে না। পাপানুষ্ঠানদ্বারাও জ্ঞানীর মুখের স্বাভাবিক প্রসন্নতা অক্ষুণ্ণ থাকে। মোক্ষ তাহার করতলগত, অবশ্যম্ভাবী।"

প্রতর্দন: অজ্ঞানীদের শরীরেও তো চিদাত্মা সদা দেহমনকৃত পুণ্যপাপ হইতে নির্মুক্ত। তত্ত্ববিদ্ ও অজ্ঞানীর তাহা হইলে পার্থক্য কোথায়?

ইন্দ্র: শোন। অহংকারকৃত পাপাদি অজ্ঞানী চিদাত্মাতে আরোপ করিয়া থাকে। সেজন্য তাহার মুখেও গ্লানির চিহ্ন দেখা যায় এবং নরকেও তাহার গতি থাকে। তত্ত্ববিদের কিন্তু আত্মজ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞান নষ্ট হইয়া যাওয়াতে জন্মবীজ কর্ম দগ্ধ হইয়া যায় বলিয়া তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না। আর তিনি ইহা নিশ্চিতরূপে জানিয়া সদা আনন্দমগ্ন থাকেন। দগ্ধবীজ হইতে যেমন পুনরঙ্কুরোদ্গম হয় না, জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ কর্মও তদ্রূপ পুনর্জন্ম প্রদান করিতে পারে না।

প্রতর্দন: তাহা হইলে সাধারণ সাধকদের ন্যায় জ্ঞানীরাও নিয়মপূর্বক দুরাচার হইতে সর্বদা বিরত থাকিতে চেষ্টা করেন কেন?

ইন্দ্র: যদিও পাপানুষ্ঠানে জ্ঞানীর পারলৌকিক কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু ঐহিক হানি তাহার হয় অপরিমিত। এইজন্যই জ্ঞানী পাপানুষ্ঠান হইতে সদা বিরত থাকেন। প্রথমতঃ দেখ, শিষ্টজনেরা পাপাচারী জ্ঞানীর সঙ্গ ত্যাগ করেন। জগতে সৎসঙ্গ হইতে বঞ্চিত হওয়া অপেক্ষা নরকযন্ত্রণাভোগ আর কি হইতে পারে? দ্বিতীয়তঃ তাঁহার পাপাচরণ দেখিয়া লোকে তাঁহার নিন্দা অবশ্যই করিবে এবং ঐ নিন্দাজনিত পাপে তাহাদেরও (নিন্দাকারীদেরও) নরকপ্রাপ্তি ঘটিবে। তৃতীয়তঃ উক্ত জ্ঞানীর ভক্ত, স্তাবক এবং অপর ভোগাসক্ত কর্মিগণও তাঁহার সঙ্গগুণে তদনুরূপ গর্হিত আচরণে প্রবৃত্ত হইবে। ইহাতে সমাজে সর্বত্র দুরাচার প্রবিষ্ট হইয়া বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে। এই ত্রিবিধ দোষ পরিহার করিবার জন্যই জ্ঞানিগণ কোন পাপকর্মে প্রবৃত্ত হন না। হে প্রতর্দন! আরও দেখ, বহু জন্মের পূর্বসঞ্চিত পুণ্যকর্মের ফলেই পরমসৌভাগ্যবশে কাহারও তত্ত্বজ্ঞানলাভ ঘটিয়া থাকে। সেই পুণ্যকর্মানুষ্ঠানের সংস্কারবলে জ্ঞানী অভ্যাসবশে সর্বদা পুণ্যানুষ্ঠানই করেন, তাঁহার দ্বারা কোন পাপানুষ্ঠান সম্ভবই নহে। বহু বলা বাহুল্য—তত্ত্ববিদের পারলৌকিক কোন ভয়ই নাই। যাঁহার পরলোকভয় এবং মৃত্যুভয় নাই এরূপ তত্ত্ববিদ্ ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি দেবগণকেও কৃপার চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

'আমাকে জান' এই উপদেশদ্বারা প্রতর্দনকে ইন্দ্র আত্মজ্ঞানের অভিমুখী করাইলেন। কিন্তু এই আত্মজ্ঞানলাভের উপায় কি? আত্মা তো বাক্যমনের অতীত। তাঁহার বাচক কোন শব্দই নাই। জাতি, গুণ, ক্রিয়া, সম্বন্ধ বা রূঢ়িসহায়ে লোকে বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। আত্মাতে জাতিগুণাদি কিছুই নাই বলিয়া কোন শব্দের দ্বারাই তাঁহাকে নির্দেশ করা যাইতে পারে না। সুতরাং উপলক্ষক কোন উপাধির সহায়তা বিনা আত্মনির্দেশ অসম্ভব। সমস্ত উপাধির মধ্যে প্রাণবায়ু ও বুদ্ধিই আত্মার অতীব সমীপ। তাই তদবলম্বনেই ইন্দ্র প্রতর্দনকে পুনরায় উপদেশ দিলেন—

'আমিই প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্মা।'

প্রাণশব্দ সর্বক্রিয়ার হেতু বায়ুরূপে প্রসিদ্ধ। প্রজ্ঞাশব্দও সর্বজ্ঞানের হেতু বুদ্ধিকেই বুঝাইয়া থাকে। ক্রিয়া ও জ্ঞানশক্তিরূপী প্রাণ ও প্রজ্ঞা লিঙ্গদেহান্তর্গত। সেই লিঙ্গদেহের অধিষ্ঠানরূপী আত্মা প্রাণ ও প্রজ্ঞা দ্বারা উপলক্ষিত হন। সাক্ষাৎ কোন শব্দসহায়ে আত্মবোধনের কোন উপায়ই নাই, তাই 'শাখাচন্দ্রদর্শন ন্যায়ে' প্রাণ ও প্রজ্ঞা শব্দদ্বারা আত্মা লক্ষিত হইয়া জ্ঞেয় হন মাত্র।

অতএব ইন্দ্র বলিলেন—"হে প্রতর্দন! দেহেন্দ্রিয়াদি পদার্থ যাঁহার সান্নিধ্যবশতঃ প্রাণ ও বুদ্ধিপ্রভাবে সর্বক্রিয়া ও জ্ঞানে ব্যাপৃত হয় তাঁহাকেই তুমি আত্মা অর্থাৎ আপন স্বরূপ

বলিয়া জান। যাঁহার সান্নিধ্যে দেহাদি জড়বস্তু চেতনের স্থায়, আত্মার স্থায় প্রতীয়মান হয়, তাঁহাকেই তুমি তোমার আত্মা বলিয়া জান। এই প্রকারে উপলক্ষিত বস্তু যদি ধারণা করিতে না পার তবে গুণসংযুক্ত ঐ উপাধিদ্বয়সহ আত্মার উপাসনা কর। প্রাণের গুণ আয়ু ও অমৃতত্ব। প্রাণোপাসনায় তুমি ইহলোকে দীর্ঘায়ু ও পরলোকে অমৃতত্ব অর্থাৎ সুদীর্ঘ স্বর্গভোগ লাভ করিবে। প্রজ্ঞার গুণ সত্যসংকল্পতা। উপাসনার বলে তাহাও তুমি লাভ করিতে পারিবে। আর যদি ঐরূপ সকাম উপাসনা না করিয়া নিষ্কামভাবে উপাসনা কর, তবে 'সোপানারোহণ স্থায়' ক্রমে শুদ্ধচিত্ত হইয়া ক্রমে তুমি তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হইবে।

"উপাসনার প্রভাবে একাগ্রতা লাভ করিয়া প্রাণ ও প্রজ্ঞা এই উপাধি দুইটির বিষয়ে যথাযথ বিচার করিবে। সর্ব কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের প্রবৃত্তি বুদ্ধি ও প্রাণবায়ুর প্রেরণাবশেই ক্রমশঃ হইয়া থাকে। সর্ব বিচিত্র ব্যবহারের যিনি প্রকাশক তিনিই চিদাত্মা। তিনি সর্বপ্রকাশ্যবস্তু হইতে পৃথক্। জীবনধারণের হেতু বলিয়া সর্বেন্দ্রিয়াপেক্ষা প্রাণই শ্রেষ্ঠ। সেই জন্যই অন্ত ইন্দ্রিয়গণকে উপেক্ষা করিয়া আত্মবোধনের নিমিত্ত প্রাণকেই আত্মার উপাধিরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। যদি শঙ্কা কর যে, সুষুপ্তিকালে তো প্রাণ দেহকে ব্যবহারে নিয়োগ করিতে পারে না, জাগ্রতেই তাহা কেবল করিয়া থাকে; সুতরাং প্রজ্ঞা বা বুদ্ধিই ব্যবহারের প্রেরয়িত্রী। দেখাও যায়—যে সুষুপ্তশরীর চারজন লোক সর্বসামর্থ্যদ্বারা বহন করিয়া থাকে উহাই জাগ্রতে 'আমি' এই অভিমানবশতঃ তাহার নিজের নিকট তুলার স্থায় হাল্কা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। —ইহার উত্তরে বলিব, হাঁ কথাটি ঠিকই। এই জন্যই প্রজ্ঞাকেও আত্মার উপাধি বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) ও প্রাণ মিলিত হইয়া আত্মার একটি উপাধিই হইয়া থাকে, কারণ জীবদ্দশায় ও মৃত্যুকালেও উভয়ের সহাবস্থান লক্ষিত হয়। উপাসনাবলে চিত্ত একাগ্র হইলে সাক্ষী চিদাত্মাকে বুদ্ধি জানিতে সমর্থ হয়।

"একাদশ ইন্দ্রিয় ও তাহাদের সর্ববিষয় এবং সর্বজগৎ সুষুপ্তিকালে প্রাণোপাধিক আত্মাতে বিলীন হয়। কেবল ব্যষ্টিশরীরের ইন্দ্রিয়গুলিই লয় হয়, বাহিরের বিষয়গুলি যেমন তেমনই থাকে, তাহা বিলীন হয় না—একথাও বলিতে পার না, কারণ প্রাতীতিক এই জগতের স্বকীয় অস্তিত্বের কোন প্রমাণই নাই। ইহাই তাহার লয়। সুষুপ্তিকালেও বাহিরে জগৎ আছে একথা বলিবে কে? যে বলিবে সেই তো নাই। সে তো প্রাণোপাধিক আত্মাসহ এক হইয়া গিয়াছে। জগতের নিজস্ব কোন সত্তা নাই অথচ উহা প্রতীত হইতেছে। যাহা বস্তুতঃ নাই অথচ দেখা যায় উহাই প্রাতীতিক অর্থাৎ কেবল একটা সত্তাবিহীন প্রতীতিমাত্র—মিথ্যা।

"জগৎ প্রাতীতিক অর্থাৎ কেবল প্রতীতিকালমাত্রস্থায়ী—ইহাই সর্ববেদান্তের সিদ্ধান্ত। সুতরাং সুষুপ্তিতে জগৎ বিলীন হইয়া জাগ্রতে পুনরায় উৎপন্ন হয়। যদি বল, সুষুপ্ত ব্যক্তির নিকট তাহার প্রাণের প্রতীতিও তো হয় না?—তাহার উত্তরে বলিব যে ঐ প্রাণোক্তিও অপরের দৃষ্টিকে অবলম্বন করিয়াই বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ এখানে প্রাণ শব্দদ্বারা এক আত্মাই উপলক্ষিত হইয়া থাকেন। প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে নির্গত বিস্ফুলিঙ্গসমূহের স্থায় জাগ্রতে ঐ আত্মা হইতেই পুনরায় দেহ, ইন্দ্রিয়াদি, ইন্দ্রিয়াভিমানী দেবতাসকল এবং বিষয়সমূহ উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মানুভবী মহাত্মাগণ এই *'দৃষ্টিসৃষ্টি'* প্রক্রিয়ারই বিশেষ সমাদর করিয়া থাকেন, কারণ এই রীতিতে বিচার করিলে শীঘ্রই তত্ত্বজ্ঞানের

উদয় হয় এবং স্বপ্নের ন্যায় এই দৃশ্যসংসার সূর্যোদয়ে তিমিরের ন্যায় নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়।

"লয় এবং উৎপত্তিকালে যেরূপ সর্বজগৎ প্রাণে অবস্থিত, স্থিতিকালেও তদ্রূপ উহা প্রজ্ঞাতে অবস্থিত। অতএব আত্মাববোধনের জন্য প্রাণ ও প্রজ্ঞাকেই আত্মার মুখ্য উপাধিরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাদের সহায়েই বিবেকী প্রথম জীবাত্মার বিচার করিবেন। আনখাগ্রদেহব্যাপী অহংকারই বিম্বস্বরূপ চিতের প্রতিবিম্বসহ মিলিত হইয়া কর্তা ভোক্তা জীবরূপে প্রতীয়মান হইতেছে ও ইন্দ্রিয়গণসহায়ে যাবতীয় ব্যবহারে ব্যাপৃত হইতেছে। চিৎপ্রতিবিম্বসহ মিলিত এই অহংকাররূপ প্রাণধারী চেতন জীবাত্মাকে পরমানন্দস্বরূপ শুদ্ধচৈতন্য হইতে পৃথক্ বলিয়া জানিবে। সেই শুদ্ধচৈতন্যই ব্রহ্ম। চক্রনাভিতে শলাকাসমূহের ন্যায় সমগ্র জীবজগৎ এই ব্রহ্মেই আশ্রিত। শুদ্ধচৈতন্য সদা জরামরণপাপপুণ্যাদি বর্জিত। পুণ্যবলে তিনি দেবতাও হন না বা পাপবশে তিনি পশুও হন না। এই শুদ্ধ চিতের প্রতিবিম্ববিশিষ্ট পূর্বোক্ত অহংকারই পাপপুণ্যবান্ হইয়া থাকে। সেই পাপপুণ্য এবং দেহস্থ জরা-মৃত্যু আদি অজ্ঞানী আপন স্বরূপে আরোপ করিয়া নিজেকে দেবাদিদেহভাগী বলিয়া মনে করিয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা ঐ আরোপ বাধিত হইলে তাহার সর্বকর্ম পুনঃ অঙ্কুরোৎপাদনে অসমর্থ দগ্ধবীজের ন্যায় আর পুনর্জন্মের কারণ হয় না। তখন অখণ্ড একরস সচ্চিদানন্দস্বরূপ এক ব্রহ্মই আপন মহিমাতে নিত্য প্রকাশিত থাকেন।

"হে প্রতর্দন! ইহাই তোমার যথার্থ স্বরূপ। ইহাই তোমার প্রার্থিত '**হিততম**' বস্তু। প্রতিজ্ঞাপালনার্থ এই দুর্লভ বস্তুর সন্ধানই আজ আমি তোমাকে দিলাম। ইহাই নিঃসন্দিগ্ধরূপে অপরোক্ষ অনুভব করিয়া তুমি সর্বদুঃখাতীত পরমানন্দস্বরূপে অবস্থান কর। এই জগতে ইহা হইতে '**হিততম**', কল্যাণপ্রদ বস্তু আর কিছুই নাই।"

দেবরাজ ইন্দ্রের কৃপায় প্রার্থিত '**হিততম**' বস্তুর জ্ঞান লাভ করিয়া প্রতর্দন অচিরেই কৃতকৃত্য হইলেন।*

* স্বামী বিদ্যারণ্যের ব্যাখ্যা অবলম্বনে লিখিত।

'যাহা মানুষের সাংসারিক অবস্থার উন্নতিসাধন করে না, তাহার সুখবৃদ্ধি করে না, তাহা অপেক্ষা যাহাতে তাহার অধিকতর সুখ, তাহার অধিকতর লাভ—অধিকতর হিত হয়, তাহাই সুখের আদর্শ।···সুখ হয় দেহে, না হয় মনে বা আত্মায় অবস্থিত। পশুদের এবং পশুপ্রায় অনুন্নত মনুষ্যগণের সকল সুখ দেহে। একটা ক্ষুধার্ত কুকুর বা ব্যাঘ্র যেরূপ তৃপ্তির সহিত আহার করে, কোন মানুষ তাহা পারে না। সুতরাং কুকুর ও ব্যাঘ্রের সুখের আদর্শ সম্পূর্ণরূপে দেহগত। মানুষের ভিতর আমরা একটা উচ্চস্তরের চিন্তাজাত সুখ দেখিয়া থাকি··· মানুষ জ্ঞানালোচনায় সুখী হয়। সর্বোচ্চ স্তরের সুখ জ্ঞানীর—তিনি আত্মানন্দে বিভোর থাকেন। আত্মাই তাঁহার সুখের একমাত্র উপকরণ। অতএব দার্শনিকের পক্ষে এই আত্মজ্ঞানই পরম লাভ বা হিত, কারণ ইহাতেই তিনি পরম সুখ পাইয়া থাকেন।'

—স্বামী বিবেকানন্দ

আনন্দস্বরূপ

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

খুঁজিতেছ আনন্দকে? পথ কোথা তার!
আলো আছে বিশ্বভরা। আশা আছে চিত্তভরা।
চারিদিকে আহা! তবু দেখ অন্ধকার।
পশ্চিম দক্ষিণ পূর্ব উত্তর ঈশান
অগ্নি বায়ু নৈঋর্তের সব দিশা করেছ সন্ধান।
কোথা পথ আছে? কোথা রথ আকাশের বাটে?
অথবা ভূতলে পর্বতে সাগরে?
নিরানন্দ সঙ্গীহীন সঙ্গহীন জগতের হাটে
চলেছ পথিক!
দুর্গম সুগম পথ দিশাহীন দিক!
ঊর্ধ্বে আদি-অন্তহীন রবি শশী তারাদল
জ্বলে অনির্বাণ।—
আকাশ অপার।
কবিঋষিমুনিগণ হেরে বিশ্বে আনন্দ-পাথার।

কে দেখেছে? কে বলেছে—কে শুনেছে তাঁহাদের অপূর্ব আহ্বান?
কোথা তিনি অরূপ-স্বরূপ-বিশ্বরূপ
চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন!
ভাবে আর্ত মূঢ় নরনারী কোথা সেই আনন্দ-ভুবন!

মন চল যাই মায়ের বাড়ী

শ্রীশেফালিকা দেবী

দিবসের কাজ হল সমাপন রাঙা আলো জ্বলে সৌধশিরে,
পূরব গগনে আঁধার ঘনায় বিহগ কুলায়ে চলেছে ফিরে।
অস্ত রবির রক্তিম রাগে প্রতীচীর ভালে সিঁদুর পরা,
ছায়ার আঁচলে গুণ্ঠন টানা, ললাটে জ্বলিছে সন্ধ্যাতারা।
ঘরে ঘরে বাজে মধুর শঙ্খ, দেহলিতে দেয় গঙ্গাবারি,
সময় হয়েছে সব ছেড়ে দিয়ে মন চল যাই মায়ের বাড়ী।

শীতল গঙ্গা-শীকরে সিক্ত ধেয়ে আসে মৃদু স্নিগ্ধ বায়,
তুলসীর মূলে বধূ দীপ জ্বালে বাতাসে ধূপের বাস ছড়ায়।

আঁধার গগনে হীরক কুচির সমান ফুটিয়া উঠিছে তারা,
আকাশে বাতাসে কে ডাকিছে "আয়" বুকের মাঝারে জাগায় সাড়া।
হ'ল না যে কাজ, রাখ তুলে আজ সকল ভাবনা দাও গো ছাড়ি,
এসেছে লগন শান্তির ক্ষণ, মন চল যাই মায়ের বাড়ী।

দিন চলে গেল কত কি যে কাজে না স্মরিনু তোমা বারেক তরে,
কত উদ্বেগ ভাবনা শঙ্কা লয়েছে আমার চিত্ত হরে।
দিবা অবসানে পড়িল মা মনে তোমার করুণাভরা ও আঁখি
তনয়ের লাগি আছ পথ চাহি, বল আর আমি কেমনে থাকি!
আসে আহ্বান—"আয়রে ছেলেরা" সুধামাখা স্বর ত্রিতাপহারী,
স্নেহভরা কোল পাতি ডাকে মাতা, মন চল যাই মায়ের বাড়ী।

কোন্ সে প্রভাতে প্রণমি চরণে গিয়েছিনু মাগো দিনের কাজে,
ক্লান্ত চরণ, তনু প্রাণ মন, ফিরে এনু এবে শ্রান্ত সাঁঝে।
কত সংঘাত কত কোলাহল কত লেনা-দেনা হিসাব কষা,
করম-চক্রে বাঁধিয়া আপনা ঘুরিনু তিলেক নাহিক বসা।
সারাদিন ধরি বহিনু কতই শির'পরে বোঝা হালকা ভারী,
পশিল শ্রবণে যবে আহ্বান সব ফেলে এনু মায়ের বাড়ী।

পর্যঙ্কের উপরে জননী সুখে সমাসীন স্মিত বয়ান,
ভকতের দল নীরবে বসিয়া শান্তি-পীযূষ করিছে পান।
স্নিগ্ধ আলোক কুসুম-সুবাস ধূপের সুরভি সকল মিশি,
কোন্ স্বরগের দুয়ার খুলেছে সুধারসে ভাসে সকল দিশি।
দিবসের দাব-দহনে তপ্ত হৃদি'পরে ঝরে স্নিগ্ধ বারি,
তাপিত পরাণ নিমেষে জুড়ায় বস মন হেথা মায়ের বাড়ী।

এনু তোর কোলে, নে মা বুকে তুলে, বুলায়ে অঙ্গে কোমল পাণি,
মুছায়ে বেদনা জুড়ায়ে যাতনা ঘুচায়ে মনের যতেক গ্লানি।
তাপিত ললাট রাখিগো জননী তোমার শীতল চরণ'পরে,
দুখ জ্বালা তাপ পলকে মিলায় সুধারসে যায় হৃদয় ভরে।
নিখিল বিশ্ব ভুলি হের মন মার রূপ হৃদিশীতলকারী,
সুধাসরোবরে গাহন করিতে দিনশেষে এস মায়ের বাড়ী।

তোমায় ভালবাসতে পারি কই ?

শ্রীমতী মানসী বরাট

নির্বাসনায় তোমার কৃপা
যাচতে পারি কই ?
(আমার) হাতের তলায় মায়ার সুতো ;
দুহাত তুলে নাচতে পারি কই ?
(আছি) মত্ত মোহে অহঙ্কারে
কি ছাই নিয়ে এ সংসারে
কোন্‌টা অসার কোন্‌টা বা সার
বাছতে পারি কই ?

পার কর, পার কর বলে—
নিত্য তোমায় ডাকি ;
(তবু) নামতে জলে একটি হাতে
বসন ধরে রাখি।
নীরন্ধ্র সেই নির্ভরতা
বল প্রভু পাই হে কোথা ?
সর্বব্যাপী জেনেও কাছে
আসতে পারি কই ?

দুঃখভরা নিশাশেষে
আশার প্রদীপ জ্বেলে
ভালোবাসো বলেই প্রভু
প্রভাত হয়ে এলে।
নাই গো আমার কোনো দ্বিধাই
তোমার প্রেমের অবধি নাই
তবু আমার হৃদয়খানি ঢেলে
তেমনি করে, তোমায় ভালোবাসতে পারি কই ?

দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়

ডক্টর রমা চৌধুরী

(অষ্টম পর্যায়)

শ্রীকণ্ঠের 'বিশিষ্টশিবাদ্বৈতবাদ'

[পূর্বানুবৃত্তি]

রামানুজ নিম্বার্ক মধ্ব বল্লভ বিষ্ণুস্বামী ও বলদেব—দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়ের মধ্যে এঁদের ছটি মতবাদই বৈষ্ণব-বেদান্ত-সম্প্রদায়ভুক্ত। অবশিষ্ট চারটি বেদান্ত-সম্প্রদায়ের মধ্যে শঙ্কর ও ভাস্কর তাঁদের বেদান্ত-দর্শনকে কোনো সাম্প্রদায়িক রঙে রঞ্জিত করেননি বিন্দুমাত্র। সেজন্য তাঁদের মতবাদ কেবলই 'ব্রহ্মবাদ'—অন্য কোনো সাম্প্রদায়িক দেবতার নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় একেবারেই। অবশিষ্ট দুটি মতবাদই কেবল শৈব-বেদান্ত-সম্প্রদায়ভুক্ত। সে দুটি হ'ল শ্রীকণ্ঠের 'বিশিষ্টশিবাদ্বৈতবাদ' এবং শ্রীপতির 'বিশেষাদ্বৈতবাদ'। পুনরায় এই দুটির মধ্যে শ্রীকণ্ঠের 'বিশিষ্টশিবাদ্বৈতবাদ'ই প্রসিদ্ধতর এবং শৈব-বেদান্ত-দর্শনের শিরোমণি। সেজন্য শৈবাচার্য প্রাজ্ঞশ্রেষ্ঠ ভক্তপ্রবর শ্রীকণ্ঠ যুগে যুগে শৈব-বেদান্ত-দর্শনের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ও প্রপঞ্চক-রূপে বন্দিত হয়েছেন সর্বত্র।

অন্যান্য জ্ঞানি-গুণি-ভক্ত-সাধকপ্রমুখ শ্রেষ্ঠ-জনদের ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যবশতঃ যেরূপ প্রায়ই ঘটে, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। শ্রীকণ্ঠেরও পুণ্যজীবন ধন্যরচনা ও অনন্য কার্যাবলী সম্বন্ধে প্রায় কিছুই আমরা জানি না। তাঁর রচিত কেবল একটিমাত্র গ্রন্থেরই বিষয় কেবল আমাদের জানা আছে—অর্থাৎ তাঁর 'বেদান্তসূত্র-ভাষ্য'—যাকে কোনো বিশেষ নাম না দিয়ে কেবলমাত্র 'ব্রহ্ম-মীমাংসা-ভাষ্য' ব'লেই তিনি উল্লেখ করেছেন প্রত্যেক পাদের শেষে। অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রায়ই ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের বিশেষ বিশেষ নামকরণ করা হয়েছে। যেমন রামানুজ নিম্বার্ক বল্লভ শ্রীপতি বলদেব প্রভৃতির ভাষ্যের নাম যথাক্রমে শ্রীভাষ্য বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ অণুভাষ্য শ্রীকরভাষ্য গোবিন্দভাষ্য প্রভৃতি।

অন্যান্য বৈদান্তিকের ন্যায় শ্রীকণ্ঠ ব্রহ্মকেই সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্বরূপে গ্রহণ করেছেন এবং সাম্প্রদায়িক দিক থেকে তাঁকে 'শিব' নামে অভিহিত করেছেন। এক্ষেত্রে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, শ্রীকণ্ঠ তাঁর ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের প্রারম্ভেই ব্রহ্মকে 'অহম্' পদার্থরূপে উল্লেখ করেছেন—

'নমোঽহং-পদার্থায় লোকানাং সিদ্ধিহেতবে।
সচ্চিদানন্দরূপায় শিবায় পরমাত্মনে॥' (১)

—'অহং-পদার্থ লোকসিদ্ধিহেতু সচ্চিদানন্দ-রূপ পরমাত্মা শিবকে প্রণাম।'

সাধারণতঃ বেদান্ত-দর্শনে 'অহম্' শব্দটি সঙ্কীর্ণ অহঙ্কার অথবা 'অহং-মম' ভাবসংবলিত জীবাত্মার নির্দেশক এবং সেই দিক থেকে প্রকৃত 'আত্মা'র বিপরীতস্বরূপ-রূপেই গৃহীত হয়। কিন্তু শ্রীকণ্ঠ এস্থলে ব্রহ্মের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ অপাঙ্‌ক্তেয় এই শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন এই দেখাতে যে, ব্রহ্ম অদ্বৈতমতসম্মত নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্ব নন; উপরন্তু তিনি 'পুরুষোত্তম'—সর্বগুণ-শক্তিবিশিষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ 'পুরুষ'; অর্থাৎ তিনি 'Impersonal Absolute' নন, 'Personal God'.

সাম্প্রদায়িক দিক থেকে শ্রীকণ্ঠ শিবরূপী ব্রহ্মের অসংখ্য নামের মধ্যে প্রধান 'অষ্ট নামে'র উল্লেখ করেছেন—যথা, ভব শর্ব ঈশান পশুপতি রুদ্র উগ্র ভীম ও মহাদেব। কিন্তু এইগুলি কেবল অর্থহীন নামমাত্রই নয়; বরং প্রত্যেকটির মাধ্যমেই আমরা ব্রহ্মের অনন্ত-অচিন্ত্য স্বরূপ গুণ শক্তি কর্ম প্রভৃতির সুস্পষ্ট আভাস পাই। যথা, সর্বত্র ও সর্বদা বিরাজমান ব'লে তিনি 'ভব'। সর্ববস্তুর সংহারকর্তা ব'লে তিনি 'শর্ব'। অনন্ত-পরমৈশ্বর্যবান ব'লে তিনি 'ঈশান'। সর্বজীবের শাসক ব'লে তিনি 'পশুপতি'। সংসার-ক্লেশদূরকারক ব'লে তিনি 'রুদ্র'। অপরাজেয় ও সর্বশক্তিমান ব'লে তিনি 'উগ্র'। সকল জীবের নিয়ামকরূপে ভীতিজনক ব'লে তিনি 'ভীম'। মহত্তম দেব ব'লে তিনি 'মহাদেব'।

এরূপে, রামানুজনিম্বার্কাদির ন্যায় শ্রীকণ্ঠের মতেও ব্রহ্ম নির্বিশেষ নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় নন; উপরন্তু সবিশেষ সগুণ ও সক্রিয়। একদিকে তিনি সমস্ত হেয়গুণবর্জিত ('নিরস্ত-সমস্ত-দোষ-কলঙ্কম্'); অন্য দিকে তিনি সমস্ত উপাদেয়গুণ-বিশিষ্ট ('নিরতিশয়-মঙ্গলাধারম্')। সেজন্য তিনি 'উভয়লিঙ্গম্'; অথবা দ্বিরূপধারী—সকল মন্দগুণের অভাবহেতু 'নির্গুণ' এবং সকল সদ্‌গুণের আকরহেতু 'সগুণ'।

ব্রহ্মের যেরূপ আটটি প্রধান 'নাম' সেরূপ ছ'টি প্রধান 'গুণ' অসংখ্য গুণের মধ্যে। যথা, সর্বজ্ঞত্ব নিত্যতৃপ্তত্ব অনাদিবোধত্ব স্বতন্ত্রত্ব অলুপ্তশক্তিমত্ত্ব ও অনন্তশক্তিমত্ত্ব। এগুলি ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন; এবং এদের মাধ্যমে 'শিব'রূপী ব্রহ্মের শাশ্বত গুণাবলী সম্বন্ধে সহজেই একটি সুন্দর পরিপূর্ণ ধারণা করা যায়। এদের মধ্যে দুটি, অর্থাৎ 'সর্বজ্ঞত্ব' ও 'অনাদিবোধত্ব' জ্ঞানবিষয়ক এবং এই কথাই সূচিত করছে যে, ব্রহ্ম সর্বদাই সব কিছুই জানেন; দুটি অর্থাৎ 'অলুপ্তশক্তিমত্ত্ব' ও 'অনন্তশক্তিমত্ত্ব' কর্মবিষয়ক এবং এই কথাই সুপরিস্ফুট করছে যে, ব্রহ্ম সর্বদাই সব কিছুই করতে পারেন; একটি অর্থাৎ 'স্বতন্ত্রত্ব' স্বনির্ভরতাবিষয়ক এবং এই কথাই সুব্যক্ত করছে যে, তাঁর কোনো সৃষ্টিকর্তা ও শাসনকর্তা নেই; অবশিষ্ট একটি অর্থাৎ 'নিত্যতৃপ্তত্ব' আনন্দবিষয়ক এবং এই কথাই সুপ্রকাশিত করছে যে, তিনি জরা-মরণ-ক্লেশ-ক্লেদ-পাপ-তাপাতীত শাশ্বতভাবে।

বেদান্তদর্শনে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের দুটি রূপের উল্লেখ পাওয়া যায়—তাঁর গুরু-গম্ভীর-কঠোর 'ভীষণ' রূপ এবং তাঁর স্নিগ্ধ-সুন্দর-কোমল 'মধুর' রূপ। রামানুজ মধ্ব ও ভাস্কর ব্রহ্মের ভীষণ রূপ, এবং নিম্বার্ক বল্লভ ও বলদেব তাঁর মধুর রূপের উপরই বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এস্থলে শ্রীকণ্ঠও রামানুজাদির পন্থাই অবলম্বন ক'রে ব্রহ্মকে সর্বব্যাপী সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান সর্বশাসক প্রভৃতি রূপেই কঠোর ও ভীষণ অর্থেই বিশেষভাবে গ্রহণ করেছেন সম্প্রদায়।

ব্রহ্মের যেরূপ আটটি প্রধান নাম এবং ছটি প্রধান গুণ, সেরূপ তাঁর পাঁচটি প্রধান কর্ম—যথা, জন্ম-স্থিতি-প্রলয়-তিরোভাব (বন্ধ)-অনুগ্রহ (মোক্ষ)-সম্পাদন। এ সম্বন্ধেও ব্যাখ্যা ক'রে বলবার কিছুই নেই।

আমরা জানি যে, অনন্ত-অচিন্ত্য-স্বরূপ-গুণ-শক্তিসম্পন্ন ব্রহ্ম একদিকে যেরূপ মনের দ্বারা অচিন্তনীয়, অন্যদিকে ঠিক সেরূপ বাক্যের দ্বারাও অবর্ণনীয়—অর্থাৎ মন দ্বারা তাঁকে চিন্তা বা ধারণা করা যায় না এবং বাক্য দ্বারাও তাঁকে বর্ণনা বা প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু তা হ'লে কি তিনি চিরকালই আমাদের নিকট অজ্ঞাতই থেকে যাবেন? নিশ্চয়ই নয়। কারণ, তাঁকে আমরা জানতে পারি মন বা চিত্ত দিয়ে নয়,

একমাত্র আত্মা দিয়ে, আত্মোপলব্ধি দিয়ে।

সেজন্যই উপনিষদে অতি সুন্দরভাবে বলা হয়েছে যে—

'যতো বাচো নিবর্তন্তে
অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্
ন বিভেতি কদাচন॥'
(তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ২।৪)

'যাঁর থেকে না পেয়ে বাক্য
ফিরে আসে মনের সহ।
সেই ব্রহ্মের আনন্দ জেনে
জ্ঞানী হন নির্ভীক অহরহ॥'

অর্থাৎ, যিনি স্বীয় আত্মার মধ্যে পরমানন্দ-রসঘন পরব্রহ্মকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করেন, তিনি পৃথিবীর সকল জীবকেই, সকল বস্তুকেই সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের মূর্ত প্রতিচ্ছবি-রূপে দর্শন করেন সানন্দে। সেজন্য, তখন তাঁর ত কেউ শত্রু নন, যাঁকে তাঁর ঘৃণা বা ভয় করতে হবে। অতএব তখন তাঁর 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'—'বিশ্বভুবন আপন জন' ব'লে তিনি সম্পূর্ণরূপেই নির্ভীক।

এই কারণে, অচিন্তনীয় অবর্ণনীয় পরব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ হ'ল—যা আমরা উপরের রীতি অনুসারে উপলব্ধি করতে পারি—এই যে, তিনি 'সচ্চিদানন্দস্বরূপ'—সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ—যে অপূর্ব বর্ণনাটি সর্ববেদান্তসম্প্রদায়ই সানন্দে সাগ্রহে সশ্রদ্ধায় সভক্তিতে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন।

ব্রহ্মের অন্যান্য প্রধান লক্ষণের মধ্যে আছে—পরমকরুণাময়ত্ব মুক্তপ্রাপ্যত্ব সর্বফল-দাতৃত্ব শান্তত্ব প্রভৃতি—যা সকল বেদান্তদর্শনেই প্রকটিত হয়েছে মধুরতম মহিমায়

এক্ষেত্রে শ্রীকণ্ঠের একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। সেটি হ'ল এই যে, তিনি তাঁর ছুটি বিশেষ প্রিয় এবং তাঁর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে বারংবার উদ্ধৃত মন্ত্রের সাহায্যে ব্রহ্মের কয়েকটি প্রধান লক্ষণের কথা বিশেষভাবে বলেছেন। প্রথম মন্ত্রটি এরূপ :

'এতত্ত্বতো ভবতি। আকাশশরীরং ব্রহ্ম। সত্যাত্ম প্রাণারামং মন-আনন্দম্। শান্তিসমৃদ্ধ-মমৃতম্। ইতি প্রাচীনযোগ্যোপাস্স্ব।'
(তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ১।৬।২)

ব্রহ্মের এই ছটি লক্ষণের কথা শ্রীকণ্ঠ অতি সমাদরের সঙ্গে, অতি আনন্দের সঙ্গে, অতি ভক্তির সঙ্গে, অতি বিশ্বাসের সঙ্গে, অতি দৃঢ়তার সঙ্গে বারংবার ঘোষণা করেছেন। জানি না কেন, সাধারণে অজ্ঞাত-অখ্যাত এই মন্ত্রটি তাঁর এতদূর প্রিয় ছিল। এই ছটি লক্ষণ হ'ল—

(১) ব্রহ্ম 'আকাশশরীরম্'—আকাশই তাঁর স্বরূপ, অথবা তিনি 'চিদম্বরম্'। এ বিষয়ে সংক্ষেপে বলা হচ্ছে পরে।

(২) ব্রহ্ম 'সত্যাত্ম'—সত্যই তাঁর আত্মস্বরূপ অর্থাৎ তিনি নিত্যসত্য নিত্যপূর্ণ নিত্যমুক্ত নিত্যশুদ্ধ নিত্যবুদ্ধ প্রভৃতি।

(৩) ব্রহ্ম 'প্রাণারামম্' অর্থাৎ তাঁর 'প্রাণ' বা শক্তি হ'ল 'আরাম' অথবা সুখশান্তিস্বরূপ। এক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক দিক থেকে বলা চলে যে, পরব্রহ্মের শক্তি 'উমা'—সেজন্য 'শিব-শক্তি' পরস্পরের আনন্দে আকুল।

(৪) ব্রহ্ম 'মন-আনন্দম্' অথবা তিনি অনন্ত-অসীম-আনন্দ-সাগর।

(৫) ব্রহ্ম 'শান্তিসমৃদ্ধম্' অথবা শান্তি-স্বরূপ।

(৬) ব্রহ্ম 'অমৃতম্' বা জন্মমৃত্যুহীন।

সাম্প্রদায়িক দিক থেকে ব্যাখ্যার সুবিধা ব্যতীত এই ছটি বিশেষণের কিছু বিশেষ তাৎপর্য আছে ব'লে মনে হয় না।

শ্রীকণ্ঠের প্রিয় এবং তাঁর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পূর্ববৎ বারংবার উদ্ধৃত দ্বিতীয় মন্ত্রটি হ'ল এই—

'ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণ-পিঙ্গলম্
উর্ধ্বরেতং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপায় বৈ নমঃ।'
(মহানারায়ণোপনিষদ্ ১।২।১)

এস্থলে ব্রহ্মের আটটি প্রধান লক্ষণের কথা বলা হয়েছে, প্রধানতঃ সাম্প্রদায়িক দিক থেকেই। যথা—

(১) ব্রহ্ম 'ঋতম্' অথবা সার্বজনীন সুশৃঙ্খল সুসমন্বিত একক অনন্ত সত্তা—যাঁর মধ্যে সমস্ত তথাকথিত পরস্পরবিরোধের হয় শাশ্বত অবসান; যাঁর অংশীভূত অসংখ্য গুণ ও শক্তি পরস্পর-বিভিন্ন হয়েও পরস্পরবিরুদ্ধ নয়। যাঁরই জন্য পৃথিবীতে সব কিছুই ঘটছে একটি সার্বজনীন সাধারণ নিয়মানুসারে সুশৃঙ্খলভাবে।

(২) ব্রহ্ম 'সত্যম্'—অথবা সত্যস্বরূপ।

(৩) ব্রহ্ম 'পরম্'—অথবা সর্বশ্রেষ্ঠ।

(৪) ব্রহ্ম 'পুরুষম্'—অথবা নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্ম নন, পুরুষোত্তম শিব।

(৫) ব্রহ্ম 'কৃষ্ণ-পিঙ্গলম্'—এটি শিবের সাম্প্রদায়িক চিহ্ন।

(৬) ব্রহ্ম 'উর্ধ্বরেতম্'—এটি শিবের আরেকটি সাম্প্রদায়িক লক্ষণ।

(৭) ব্রহ্ম 'বিরূপাক্ষম্'—অথবা ত্রিনয়ন-বিশিষ্ট—এটি শিবের আরেকটি সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য।

(৮) ব্রহ্ম 'বিশ্বরূপম্'—অথবা পরিণাম-বাদানুসারে সমগ্র বিশ্বই তাঁর প্রতিমূর্তি।

অন্যান্য বৈদান্তিকের ন্যায়, বলেছেন যে, ব্রহ্ম জগল্লীন ও জগৎবহির্ভূত—উভয়ই সমভাবে। কিন্তু জগল্লীন হয়েও, পদ্মপত্রে জলের ন্যায়, তিনি সংসারপঙ্কলিপ্ত নন মুহূর্তের
।

শ্রীকণ্ঠের মতে, অনন্ত-অচিন্ত্যশক্তি-বিশিষ্ট পরব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ শক্তির নাম 'পরাশক্তি' অথবা 'পরাপ্রকৃতি'। এই 'পরাপ্রকৃতি' অবশ্য ত্রিগুণাত্মিকা সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ-সংবলিতা। জড়-জগতের মূলীভূতা কারণ ব্রহ্মের অচিৎ শক্তি 'প্রকৃতি' নন। এই 'পরাপ্রকৃতি' কেবলমাত্র সত্ত্বগুণাত্মিকা; এবং পরব্রহ্মের স্বরূপ-গুণ-শক্তিরূপা।

এই প্রসঙ্গে শ্রীকণ্ঠ তাঁর সম্প্রদায়ের মূলীভূত তত্ত্ব 'শিব-শক্তি'-বাদ বিশদভাবে প্রপঞ্চিত করেছেন। শক্তি ব্যতীত শিব শবই মাত্র; এবং শিবের আটটি পুণ্য নাম, ছটি পুণ্য গুণ এবং পাঁচটি পুণ্য কর্ম শক্তি ব্যতীত সম্ভবপরই নয় একেবারেই।

সাম্প্রদায়িক দিক থেকে, শ্রীকণ্ঠ এই পরাশক্তি অথবা পরাপ্রকৃতিকে গ্রহণ করেছেন 'চিদম্বর' অথবা 'দহরাকাশ'রূপে। 'চিদম্বরের' আক্ষরিক অর্থ হ'ল: জীবের হৃৎপদ্মের অন্তঃস্থিত আকাশ; এবং এটিই হ'ল দহরাকাশ, অথবা ক্ষুদ্র আকাশ। পরব্রহ্মকে যখন এই ভাবে দহরাকাশ-রূপে ধ্যান করা হয়, তখন তাকে বলা হয় 'দহর-বিদ্যা'—এবং শ্রীকণ্ঠের শৈব সম্প্রদায়ে 'দহরবিদ্যা' একটি কেন্দ্রীভূত পরমাদরণীয় বিদ্যা। এই কারণেই ব্রহ্মকে বলা হয় 'আকাশশরীর' যা পূর্বেই বলা হ'ল।

এরূপে সাম্প্রদায়িক দিক থেকে শ্রীকণ্ঠের মতে পরব্রহ্মের পরাশক্তিই হলেন পরাপ্রকৃতি; পরাপ্রকৃতিই হলেন চিদম্বর, চিদম্বরই হলেন দহরাকাশ, পরিশেষে দহরাকাশই হলেন 'উমা'; এবং উমাই হলেন 'মায়া'। এইভাবে, শ্রীকণ্ঠ-বেদান্তে পরাশক্তি, পরাপ্রকৃতি, চিদম্বর, দহরাকাশ, উমা ও মায়া– সবই সমার্থক। উমা ব্রহ্ম বা শিবের সঙ্গে স্বরূপতঃ ও গুণতঃ এক ও অভিন্ন হ'লেও, তাঁর থেকে ভিন্নও সমভাবে। বস্তুতঃ শিব-শক্তিবাদমতে, একদিকে শিবশক্তি

উমার দ্বারা শক্তিমান শিব বা পরব্রহ্ম 'শবলীকৃত' অথবা 'শবলিতরূপ' হন, 'কৃষ্ণ-পিঙ্গলশরীর' হন। অর্থাৎ, সবিশেষ অথবা স্বগত ভেদবান হন; এবং উমাই তাঁর মধ্যে সৃষ্টি করেন বৈচিত্র্য, রং, রস, সৌন্দর্য, মাধুর্য, ঐশ্বর্য, অমৃত, আনন্দ; উমাই তাঁর স্বরূপের কেন্দ্র ও সারস্বরূপ; উমাই তাঁর সৌরভ, রস, সুধা, মধু, অমৃত; এক কথায়, উমাই তাঁর প্রাণশক্তি, তাঁর স্থিতিকারণ, তাঁর জীবনৌষধ। এই দিক থেকে পরব্রহ্ম শক্তি বা উমার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। কিন্তু অপর দিক থেকে শক্তি বা উমা স্বয়ং পরব্রহ্মের উপরও সমান নির্ভরশীলা, যেহেতু তিনি শিবের অন্তর্ভুক্ত অংশ, গুণ ও শক্তি। এইভাবে, একাধারে পরস্পর পরস্পরের কারণ ও কার্য হ'য়ে, একাধারে পরস্পর পরস্পরের থেকে স্বতন্ত্র (স্বাধীন) ও পরতন্ত্র (পরাধীন) হ'য়ে, পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে ভিন্ন ও অভিন্ন হ'য়ে, শিব ও শক্তি, ব্রহ্ম ও উমা প্রেমভরে লীলা ক'রে চলেছেন অহরহ এবং জীব-জগৎ-সংবলিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এই দিব্যপ্রেম ও দৈবী লীলারই মূর্ত প্রকাশ; এবং পরিশেষে, শিব-শক্তির সম্মিলিত পরস্পর-জাত অনন্ত, অসীম, অতুল, অপরূপ, অত্যাশ্চর্য দিব্যানন্দের রসঘন, মধুময়, সুধাসার, অমৃত-মধুর পূর্ণ রূপ।

উপরে শিব ও শক্তির মধ্যে যে অদ্ভুত সম্বন্ধের কথা বলা হ'ল, তাতে মনে হওয়া আশ্চর্য নয় যে, এ একটি অসম্ভব দুর্বোধ্য প্রহেলিকা, একটি স্ববিরোধদোষদুষ্ট ব্যাপার—বা ইংরাজীতে যাকে বলা হয় 'Paradox'— কারণ শক্তি উমা কি ক'রে শিবের স্বরূপ-গুণ-শক্তির স্রষ্টী হ'য়েও, নিজেই শিবকর্তৃক সৃষ্টা হবেন; কি ক'রে তাঁরই উপর নির্ভরশীলা হ'য়েও, পুনরায় তাঁকেই ক'রে রাখবেন নিজের উপরই সম্পূর্ণরূপেই নির্ভরশীল; কি ক'রে তাঁর সঙ্গে অভিন্না হ'য়েও, তাঁর থেকে ভিন্নাই থাকবেন শেষ পর্যন্ত? সাধারণ যুক্তির মাধ্যমে এই কঠিন আপাতবিরুদ্ধ অথচ শাশ্বত সত্য ব্যাপারটির মীমাংসা সম্ভবপর নয়। সেজন্যই এস্থলে উপস্থাপিত করা হয়েছে ভারতবর্ষের প্রাণপ্রতিম 'মায়াবাদ' এবং উমাকে সাদরে সানন্দে সশ্রদ্ধায় গ্রহণ করা হয়েছে 'মায়া'রূপে— শঙ্কর-বেদান্তের 'অশুদ্ধা ত্রিগুণাত্মিকা মায়া' ব'লে নয়, 'শুদ্ধা সত্ত্বগুণাত্মিকা মায়া' ব'লেই কেবলমাত্র।

বলাই বাহুল্য যে, বৈষ্ণব ও শৈব বেদান্তের এই 'মায়াবাদ' অদ্বৈত বেদান্তের 'মায়াবাদ' থেকে সম্পূর্ণ ই ভিন্ন এবং বিপরীতও তৎসঙ্গে ও তদুপরি। পূর্বোক্ত 'মায়াবাদ' স্বভাবতঃই ওতপ্রোতভাবেই দ্বিত্বমূলক—ব্রহ্ম ও তাঁর মহাশক্তিরূপিণী উমার মধ্যে দ্বৈতসম্বন্ধীয় ব্যাপারমূলক। কি সেই মহাব্যাপার? সেই মহাব্যাপার হ'ল 'প্রেম' ও 'লীলা'—যাদের নাম-গন্ধমাত্র শাঙ্করীয় অদ্বৈতবেদান্তে মহাপাপ।

বস্তুতঃ, অতুল-প্রজ্ঞাধনি সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন বৃহদারণ্যকোপনিষদেও একটি মূলীভূত আপাতদৃষ্ট স্ববিরোধের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। তার মূল হ'ল নিম্নলিখিত আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধদোষদুষ্ট দুটি সুবিখ্যাত মন্ত্র:

(১) 'আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ সোঽহমস্মীত্যগ্রে ব্যাহরত্ততোঽহংনামাঽভবৎ।'

'সোঽবিভেত্তস্মাদেকাকী বিভেতি স হায়ং মীক্ষাং চক্রে যন্মদন্যন্নাস্তি কস্মান্নু বিভেমীতি তত এবাস্য ভয়ং বীয়ায় কস্মাদ্ধ্যভেষ্যদ্ দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি।' (১।৪।১-২)

(২) 'স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাঽপাতয়ত্ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং

তস্মাদিদমর্ধবৃগলমিব স্ব ইতি হ স্মাহ যাজ্ঞবল্ক্য-স্তস্মাদয়মাকাশঃ স্ত্রিয়া পূর্যত এব।' (১।৪।৩)।

অর্থাৎ—

(১) "এই (পরিদৃশ্যমান জগৎ) পূর্বে পুরুষরূপী আত্মারূপে বর্তমান ছিল। সেই আত্মা চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে আপনাকে ব্যতীত আর অন্য কিছুই দেখলেন না। সেজন্য তিনি প্রথমেই বল্লেন—'আমি আছি।' এরূপে 'অহম্' ('আমি')—এই নাম হ'ল।"

"তিনি ভীত হয়েছিলেন। সেজন্য লোকে একাকী থাকলে ভীত হয়। তখন তিনি আলোচনা করলেন, 'আমি কেন ভীত হব?' এতেই তাঁর ভয় চলে গেল, কারণ তিনি কেন ভয় করবেন? দ্বিতীয় বস্তু থেকেই ত ভয় হয়।"

(২) "কিন্তু তিনি আনন্দলাভ করলেন না। সেজন্য কেহ একাকী থেকে আনন্দলাভ করেন না। তিনি দ্বিতীয় (এক ব্যক্তিকে লাভ করতে) ইচ্ছা করলেন। তিনি নিজেকে দুই ভাগে বিভক্ত করলেন। এরূপে পতি ও পত্নীর উদ্ভব হ'ল। সেজন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলেছিলেন, 'প্রত্যেকে নিজে অর্ধাংশের ন্যায়।' সেজন্য এই শূন্যস্থান স্ত্রীর দ্বারাই পূর্ণ হয়।"

এস্থলে দুটি পাশাপাশি পর পর মন্ত্রে যেন মনে হয় ঠিক বিপরীত কথাই বলা হচ্ছে। প্রথমে বলা হচ্ছে যে—একাকী থাকলেই আনন্দ। কিন্তু পরক্ষণেই বলা হচ্ছে যে—একাকী থাকলেই নিরানন্দ। তা হ'লে? বস্তুতঃ—এই শাস্ত্রবাক্যও যেন হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে একটি প্রকাণ্ড প্রহেলিকা, হেঁয়ালি ধাঁধাঁ, সমাধানবিহীন সমস্যা বা 'Paradox', আবার বলি—

তা হ'লে?

হ'লে একটিমাত্র উপায়ই আছে—'প্রেমবাদ-লীলাবাদ'। প্রকৃতকল্পে ভয় হয় কখন? যখন দ্বিতীয় একজন হন বাইরের জন। তখনই ত তাঁর থেকে ভয় হতে পারে—অথচ সঙ্গিবিহীন একাকী জীবনও ত আনন্দ-বিহীন। সেজন্য, এক্ষেত্রে একটিমাত্র উপায়ই হ'ল সেই 'দ্বিতীয়কে'—যিনি নঙর্থক দিক থেকে ভয়ের কারণ নন এবং সদর্থক দিক থেকে আনন্দেরই কারণ- তাঁকে নিজের মধ্যেই লাভ করা। সেজন্যই, পরমপ্রেমময় পরমলীলাময় পরমানন্দময় পরমদেবতা প্রেমভরে লীলাভরে আনন্দভরে নিজেকে যেন দু'ভাগে ভাগ ক'রে, নিজের সঙ্গেই নিজেই লীলা বা খেলা করছেন অহরহ। সেই দু'ভাগের এক ভাগ হলেন সর্বশক্তিমান শিব (শৈবমতে) বা শ্রীকৃষ্ণ (বৈষ্ণবমতে); অন্য ভাগ হলেন তাঁরই পরাশক্তি উমা (শৈবমতে) বা রাধা (বৈষ্ণব মতে)।

বস্তুতঃ, ব্রহ্মের মূলীভূত স্বভাব বা স্বরূপই হ'ল এই যে—তিনি কেবল সর্বজ্ঞই নন, সর্বশক্তিমানই নন, সর্বব্যাপীই নন, সর্বধারকই নন, সর্বশাসকই নন—কিন্তু তার চেয়েও অনেক বড় কথা, গৌরবের কথা, আনন্দের কথা এই যে, তিনি তদুপরি প্রেম-সর্বস্ব, লীলাধুরন্ধর, আনন্দরসঘন। পুনরায়, প্রেম স্বভাবতঃই দ্বিত্বভিত্তিক, লীলাও তাই, আনন্দও তাই—কারণ দু'জন না থাকলে প্রেম হয় না, লীলা বা খেলা হয় না, আনন্দ হয় না। সর্বব্যাপী শ্রীভগবান সেই প্রেমপাত্র, সেই লীলা-সঙ্গী, সেই আনন্দভাগীকে পাবেন কোথায়? পাবেন কেবল নিজের মধ্যেই—সর্বব্যাপী পর-ব্রহ্মের আর কি উপায়? তাঁর নিজের মধ্যে ত রয়েছে অসংখ্য অণু জীব—যাঁদের সকলকেই তিনি নির্বিচারে পক্ষপাতশূন্য হ'য়ে ভালবাসেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তাঁর নিজের পরিপূর্ণ প্রেমের একটি তুল্যমূল্য সমগোত্রীয় পরিপূর্ণ প্রেমপাত্র

বা প্রেমপাত্রী প্রয়োজন? কে তিনি? তিনিই ত শিবের দ্বিতীয় আত্মা বা স্বরূপ উমা; এবং বৈষ্ণবের সমপর্যায়ভুক্তা সমসম্মানাস্পদ রাধা।

এইভাবে শিব 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৬।২।১) হলেও, শূন্যগর্ভ এক নন—পূর্ণগর্ভ এক, যাঁর মধ্যে অসংখ্য গুণ ও শক্তি বিরাজমান হ'য়ে তাঁর স্বরূপকে বৈচিত্র্যে সৌন্দর্যে মাধুর্যে ঐশ্বর্যে আনন্দে আলোকে অমৃতে—এক কথায় পূর্ণতায়—ভরে তুলেছে। এবং তাদেরই মধ্যে তাঁর পরিপূর্ণ দ্বিতীয় স্বরূপ 'হ্লাদিনী শক্তি' বা পরাশক্তি রয়েছেন—যিনি তাঁর সমান অংশ অথচ খণ্ডিত নন, অর্ধেক নন, —পরিপূর্ণ, সমান।

এই ত হ'ল অপরূপ 'Spiritualistic Mathematics' অথবা আধ্যাত্মিক অঙ্কশাস্ত্র। সাধারণ জাগতিক অঙ্কশাস্ত্রানুসারে, পূর্ণ থেকে পূর্ণই নিয়ে নিলে, শূন্যই ত কেবলমাত্র থাকে অবশিষ্ট—১০০ থেকে ১০০ই নিয়ে নিলে ০ ছাড়া আর রইল কি? কিন্তু অসাধারণ আধ্যাত্মিক অঙ্কশাস্ত্রানুসারে, পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিয়ে নিলেও ঠিক সেই পূর্বের পূর্ণই থেকে যায় অনায়াসে। এই অপূর্ব তত্ত্বটিই সুব্যক্ত ক'রে, জ্ঞানসাগর বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হচ্ছে—

'ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥'

(৫।১।১)

'ঐ (অথবা অব্যক্ত অদৃশ্য ব্রহ্ম) পূর্ণ; এই (অথবা ব্যক্ত দৃশ্য ব্রহ্মও) পূর্ণ; পূর্ণ থেকে পূর্ণই উৎপন্ন হন। পূর্ণের পূর্ণকে গ্রহণ করলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে।'

কি রমণীয়-রসঘন-রোমাঞ্চকর এই মহাভাব! কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে কি অসম্ভব! পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের সত্যদ্রষ্টা ব্রহ্মবাদী ঋষিরা কি সত্যই এই পরম-চরম-সত্য উপলব্ধি করেছিলেন? না, এ কেবল পণ্ডিতের বৃথা গর্ব; কবির শূন্য কল্পনা; স্বপ্নবিলাসীর অলীক স্বপ্ন? নিশ্চয়ই নয়। পৃথিবীতেই দৃষ্টান্ত নেই? সূর্যের সুবর্ণ আলোককে, চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাকে, বায়ুর শীতল প্রবাহকে, পুষ্পের সুমধুর সৌরভকে, বিহগের মঞ্জু কূজনকে, ভ্রমরের কলগুঞ্জনকে কি ভাগ করা যায়, পৃথক্ করা যায়, ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা যায়? নিশ্চয়ই নয়। তা হ'লে সকল সৌন্দর্য-মাধুর্য-ঐশ্বর্য-নির্ঝর শ্রীভগবানই বা খণ্ডিত হবেন কেন, কর্তিত হবেন কেন, ক্ষয়িত হবেন কেন, নিঃশেষিত হবেন কেন, কমে যাবেন কেন? নিজেকে সম্পূর্ণ দান ক'রেও, তিনি ত একবিন্দুও কমে যাচ্ছেন না—এটি কি এতই অচিন্তনীয় অবিশ্বাস্য ব্যাপার? নিশ্চয়ই নয়। ঈশ্বরকৃপাধন্য শ্রীকণ্ঠ এই অপূর্ব বার্তাই প্রচার করেছেন সগৌরবে এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও তা স্বীকার করে নিয়েছে তুল্য গৌরবে।

[ক্রমশঃ]

বিদ্যাসাগর

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

মহৎ চরিত্রের দর্পণে একটি জাতি আপন সার্থকতার প্রতিবিম্ব দেখতে পায়। বিদ্যাসাগর আমাদের জাতীয় অন্তঃকরণের মূর্ত প্রতীক, যেখানে জ্ঞান ও প্রেম, কর্ম ও ত্যাগ, সেবা ও সাহস একত্রে বিকশিত। ব্যক্তিগতভাবে হয়তো আমাদের চরিত্রে এ গুণগুলির এত সমুন্নত বিকাশ একসঙ্গে চোখে পড়ে না। কিন্তু পিতৃকুল ও মাতৃকুলের যে পরিচয় বিদ্যাসাগর তাঁর অমর অথচ অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে রেখে গেছেন, তাতেই প্রমাণিত হয়, তাঁর আবির্ভাব এদেশে মনুষ্যত্ব-সাধনার ঐতিহ্যবাহী। জনসংখ্যা গণনা করে কোনো জাতির উৎকর্ষ নিরূপণ কতটা করা যায়, সন্দেহের বিষয়। যে দেশে বিদ্যাসাগরের মতো একটি ব্যক্তিত্বও দেখা দেন, সে দেশে আরো অনেক বিদ্যাসাগরের সম্ভাবনা সমাজে অন্তর্লীন। আর রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ অবধি কতো উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করা চলে যে, এ দেশের মাটিতে, জলে, হাওয়ায় শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বের অজস্র উপাদান রয়েছে। আমাদের এযুগের মন শুধু কৃষিকাজটি ভুলে গেছে।

সংস্কৃত কলেজের যে কয়জন কৃতবিদ্য সেকালে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর চরিত্র-স্বাতন্ত্র্যের জন্য একাই এই বিশেষণটিকে সম্পূর্ণ অধিকার করেছেন সত্য, তবু বিদ্যাসাগরের প্রতিভার অন্যতম প্রধান পরিচয় যে তাঁর অসামান্য বিদ্যাবত্তা, সেকথা তাঁর স্মরণবার্ষিকীতে আমরা যেন সর্বাগ্রে মনে রাখি। বিদ্যার অধিকার ও বিদ্যার বিস্তার—এই দুই ক্ষেত্রেই তাঁর সাগরবৎ কূলপ্লাবী প্রতিভা। পরবর্তী কালে বিপুল কর্মস্রোতে আবদ্ধ হয়ে কখনো কখনো তিনি এই জন্যই কেঁদেছেন যে, মনের মতো পড়াশুনোর অবসর পেলেন না! কী দুশ্চর তপস্যায় তাঁর ছাত্রজীবন অতিবাহিত, কী অসামান্য মেধায় তাঁর অধ্যাপকমণ্ডলী চমৎকৃত, আবার সর্বজনের সেবায় সেই জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেওয়ার জন্য তাঁর কতোখানি ব্যাকুলতা! বাস্তবিক, গ্রন্থকীট বিদ্যাজীবী হয়ে বিশেষ পাণ্ডিত্যের উর্ণাজালে তিনি অনায়াসে স্বতন্ত্র থাকতে পারতেন, কিন্তু বিদ্যাদানের উদার আহ্বানে শিক্ষাজগতের সর্বস্তরে প্রবাহিত হতে গিয়েই তাঁর আরও বিদ্যালাভে বাধা। যে স্রষ্টা ও শিল্পীর দৃষ্টি ও লেখনী সহজাত কবচকুণ্ডলের মতো তিনি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন, তারও সীমাবদ্ধতা মূলতঃ অনুবাদে অনুসরণে ও পাঠ্য পুস্তক রচনায়। তবু এরই মধ্যে সংস্কৃতকে তিনি প্রাকৃতজনের করামলকবৎ এবং বাংলা ভাষাকে শিল্পশ্যামল নীলাঞ্জন ছায়ায় সুশোভিত রেখে ভবিষ্যৎ বাংলা গদ্যের রাজপথটি উন্মুক্ত করে গেছেন। বাংলার নবজাগরণে এ এক নিঃশব্দ বিপ্লব।

বিদ্যাসাগর ঈশ্বরকে মানতেন কি মানতেন না—এবিষয়ে তর্ক কোনোদিন ফুরাবে না। কিন্তু তিনি মানুষকে মানতেন—মানুষের সব ব্যথা ও বঞ্চনায় সমদুঃখভাগী ছিলেন—এবিষয়ে দ্বিমত নেই। বাস্তবিক, বিদ্যাসাগরের চোখের জলই প্রমাণ করেছে, অমন করে সব স্তরের সব মানুষের বেদনায় ব্যাকুল কান্নার অন্তরালে কী অজেয় পৌরুষ নিহিত থাকা সম্ভব। বয়োবৃদ্ধ

শিক্ষাগুরুর বালিকাবধূকে দেখে তার আসন্ন বৈধব্যকল্পনায় বিদ্যাসাগরের উচ্চকণ্ঠের ক্রন্দন অথবা তাঁরই অধীন কলেজের অধ্যাপক সহকর্মীর মায়ের এককালের দারিদ্র্যদুঃখের কথা জেনে চোখের জল ফেলা অথবা দীন দুঃখী আতুর বিধবা যে কারু দুর্দশায় দরবিগলিত অশ্রু—এ সব কিছুতেই, মহাকবি মধুসূদনের উপমায়, বাঙালী মায়ের চিরন্তন স্নেহময়তার কথা মনে পড়ায় 'heart of a Bengali mother'![১]

কিন্তু সাধারণ মায়েদের নিরুপায় অশ্রু নয়, বেদনাকে কর্মে ও সংগ্রামে রূপায়িত করার দৈনন্দিন সাধনা ও আমরণ সক্রিয়তা বিদ্যাসাগরকে এক মহত্তম প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিল। তাঁর সেই মনুষ্যত্ব, হৃদয়বত্তা ও নির্ভয় সমুন্নত সত্তা জীবৎকালেই প্রবাদে পরিণত হয়ে কলকাতা-দর্শনার্থীমাত্রেরই পক্ষে তাঁকেও অবশ্য দ্রষ্টব্য করে তুলেছিল। অথচ সাধু-সন্ন্যাসীর অতীন্দ্রিয় আলৌকিকতা থেকে স্বভাবতঃই তিনি দূরের জগতে বাস করতেন। তাঁকে ঘিরে থাকতো মানুষের হাসি-কান্না সুখদুঃখ। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড়ো উদ্দেশ্য ছিলো পৃথিবীকে মানুষের সবচেয়ে বেশী কল্যাণের উপযোগী করে তোলা।

প্রশ্ন থাকে, মানুষের যথার্থ কল্যাণ বলতে কী বোঝায়? বিভিন্ন স্তরের মানসিকতার পক্ষে এ প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন। অন্নবস্ত্রের সমাধানেই যদি মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হতো, তবে যতো দুঃসাধ্যই হোক, এ সমস্যার সমাধানেই মানুষের পরিতৃপ্তি সম্ভব ছিল। কিন্তু দেহধারী মানবমাত্রেরই আছে মন এবং মনেরও অতীত আত্মা। বিদ্যাসাগর-সন্দর্শনে এসে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিদ্যাসাগরের সত্ত্বগুণাশ্রিত দয়ার বিশেষ প্রশংসা করে বলেছিলেন, "জগতের উপকার মানুষে করে না, তিনিই করছেন; যিনি চন্দ্রসূর্য করেছেন, যিনি মা বাপের ভিতর স্নেহ, যিনি মহতের ভিতর দয়া, যিনি সাধু ভক্তের ভিতর ভক্তি দিয়েছেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণের বক্তব্য—বিদ্যাসাগরের "অন্তরে সোনা চাপা আছে।" অর্থাৎ মানবকল্যাণের পরিপূর্ণ সার্থকতা আত্মোপলব্ধির আলোকে। বিদ্যাসাগরের বহিরঙ্গ কর্ম সেই উপলব্ধিকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে। বিদ্যাসাগর সেই আত্মিক সার্থকতা সম্বন্ধে কোনো সংশয়াতীত ধারণায় উপস্থিত হতে পারেননি। ফলে সমকালীন ধর্মান্দোলনের তুমুল আবহাওয়ার মধ্যেও তিনি আপন পদ্ধতিতে মানবসেবাব্রতে নিবিষ্ট। এমনকি কাশীতে গিয়েও পিতামাতার সেবা ছেড়ে ৺বিশ্বনাথ-দর্শনে তাঁর কোনো আগ্রহ জাগেনি। তাঁর অসামান্য মাতৃভক্তিও মানবিকতারই পরম বিকাশ। আজকের দিনের বিচ্ছিন্ন সমাজ- ও পরিবার-চেতনায় তাঁর জনক-জননীর প্রতি অনুরাগের উদাহরণটি আর এক স্মরণীয় ও অনুকরণীয় আদর্শ। বিদেশ থেকে আমদানীকরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আজ যখন আমাদের হৃদয়বৃত্তিই উন্মূল করতে উদ্যত, তখন বিদ্যাসাগরের ভালোবাসার আদর্শেই আমরা ঘর ও বাহিরকে ঐক্যসূত্রে বেঁধে নিতে পারি। বিদ্যাসাগরের অপার করুণা ও বিবেকানন্দের 'জীবে প্রেম' একই মানবকল্যাণের বিভিন্ন স্তর। সেদিক থেকে ঈশ্বর সম্বন্ধে আপাতনিরুৎসুক বিদ্যাসাগর সর্বজীবের অন্তরবাসী ঈশ্বরের খুবই কাছাকাছি।

জাতীয় জাগরণের দিক থেকে বিদ্যাসাগরের

১ 'বাঙালী মায়ের হৃদয়।'

সমাজ-সংস্কার আন্দোলন বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সন্দেহ নেই। বাল্যবিবাহ, বিধবা-বিবাহ, বহুবিবাহ—বিভিন্ন দিক থেকে এদেশের অসহায় নারীসমাজের লাঞ্ছনা তাঁর প্রচেষ্টায় একদিকে দেশবাসীর ও অন্যদিকে তদানীন্তন সরকারী কর্তাদের বিশেষভাবে সচেতন করেছিল। কিন্তু চটিজুতা ও ধুতিচাদর থেকে আরম্ভ করে চিন্তায়, আচরণে, প্রতিবাদে, স্বাধীনচিত্ততায় তাঁর স্বাতন্ত্র্য সেকালে কায়েমী স্বার্থের পক্ষপাতীদের পক্ষে রীতিমতো ভীতিপ্রদ ছিল। তাঁর সেই ঋজু মৌলিক স্বাতন্ত্র্যই দেশী ও বিদেশী সব মানুষের কাছে তাঁকে একই সঙ্গে নমস্য ও পরমাত্মীয় করে তুলেছে। আমাদের স্বদেশী আন্দোলনে বিদ্যাসাগরের সবচেয়ে বড়ো দান - তাঁর চরিত্রবল।

অটল মনুষ্যত্ব, বিপুল আবেগ, নিপুণ কর্ম-কুশলতা ও নিয়ত সংগ্রামশীলতা এ সবের মিশ্রণে সেদিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালী আজ যতদিন যাচ্ছে ততই আমাদের দৃষ্টিতে উচ্চ থেকে উচ্চতর মহিমার আকাশ স্পর্শ করে চলেছেন। তিনি আমাদের সদ্য অতীতের পরম গৌরব, আবার দূর ও দূরতম ভবিষ্যতের চিরন্তন দিশারী।*

* বিদ্যাসাগর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আকাশবাণীর কলিকাতা কেন্দ্র থেকে বিগত ২৯.৯.৭৭ তারিখে প্রচারিত এই বক্তৃতাটি আকাশবাণীর সৌজন্যে প্রকাশিত।

রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র'

শ্রীহরিপদ দাস

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের প্রতিক্ষেত্রে জয়যাত্রার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। সে স্বাক্ষর কেবল সচেতন সাহিত্যকর্মে নয়, অর্ধমনস্ক বা অন্যমনস্ক সৃষ্টিতেও আমরা প্রত্যক্ষ করি। আর এদিক থেকে ছিন্নপত্রাবলী বাংলাসাহিত্যে নিজস্বমূল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। এই পত্রগুচ্ছ স্বাদ-বৈচিত্র্যে, গদ্য-সৌন্দর্যে কবিমানসের অন্তরঙ্গ সত্য পরিচয় প্রকাশে মূল্যবান। পত্ররচনায় রবীন্দ্রনাথ যে অসামান্য শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়েছেন তাই যথেষ্ট নয়, এর মধ্যে একটি অসাধারণ মনের অন্তরঙ্গ পরিচয় ফুটে উঠেছে।

চিঠিপত্র যখন সাহিত্যের পদবী পেয়ে যায় তখন বুঝতে হয় তার মধ্যে সাহিত্যের কতকগুলি মৌলিকগুণ প্রকাশ হয়ে পড়েছে। ডায়েরি ব্যক্তি-বিকাশের সারসংকলন, জীবনের ভাল-মন্দ-লাগার প্রতিচ্ছবি মাত্র; চিঠিপত্রে সেই সারাংশই নানা সম্পর্কের মধ্য দিয়ে, নানা বর্ণনা ও ঘটনার মিশাল দিয়ে, নানা ব্যক্তি-সম্পর্কের মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রকাশিত হয়। ডায়েরি অনেকটা সংহত শিল্প, তার আঁট-সাঁট ভাবটাই বড়, চিঠিপত্র তুলনায় শিথিল শিল্প। আলগা ভাবটাই তার স্বভাব, তার গুণ। ডায়েরিতে মানুষ কিছুটা স্বেচ্ছায় আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু চিঠিপত্রে নানা ঘটনা ও বর্ণনার উপলক্ষে, তর্ক ও চিন্তার ধাক্কায়, নানা জনের প্রতি মনোভাব প্রকাশের মধ্য দিয়ে মানুষ নিজেকে ধরা দিয়ে ফেলে। সে দিক থেকে ছিন্নপত্র ডায়েরি ও চিঠিপত্রের কিছু লক্ষণে অম্বিত হয়েও এখানে তাঁর জীবন-সমীক্ষা,

মানুষের রুচি ও মানস-প্রবণতার সূত্রনির্ণয়, সাধারণ মানব-প্রকৃতির স্বরূপ নির্ণয় ও উপলব্ধি যেরূপ স্বচ্ছন্দ মনন ও মনোজ্ঞ সুকুমার অনুভূতির সূত্রে বিধৃত—তা তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির অন্য কোন বিভাগে নেই। এই পত্রাবলীর মধ্যে আমরা মানুষ রবীন্দ্রনাথ এবং কবি রবীন্দ্রনাথকে একই সঙ্গে আবিষ্কার করি। কবিরূপে তিনি যে কল্পলোক সৃষ্টি করতে অভিলাষী, তাঁর ব্যক্তিসত্তা জীবন হতে একান্তভাবে তারই উপকরণ-সংগ্রহে নিবিষ্ট।

গদ্যরচনার নিদর্শনরূপে ছিন্ন পত্রাবলীর কাল-পরিধি দশ বৎসর বিস্তৃত—১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর থেকে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর পর্যন্ত। ছিন্নপত্রাবলীর পত্রসংখ্যা মোট ২৫২টি। সমসাময়িক রচনা 'গল্পগুচ্ছ', 'সোনার তরী' 'চিত্রা', 'চৈতালী'র বহু কবিতা ও গল্পের উৎস, উপাদান ও পটভূমি ছিন্নপত্রাবলী; এবং রবীন্দ্রনাথের কবি-পরিচয়ের মধ্যে তাঁর যে ব্যক্তিসত্তাটি সম্পূর্ণ চাপা না পড়লেও অন্ততঃ অর্ধ-অবগুণ্ঠিত থাকে, সেই অন্তরালবর্তী দিকটিই তাঁর পত্রাবলীর মধ্যে আশ্চর্যভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। কবিমানসের এই অন্তরঙ্গ প্রকাশেই এর মূল্য। জীবনস্মৃতিতে যা অনুদ্ঘাটিত তা ছিন্নপত্রাবলীতে উদ্ঘাটিত হয়েছে। পঁচিশ থেকে চৌত্রিশ বৎসর বয়সের রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ পরিচয়টি এখানে ছড়িয়ে আছে। কাব্যে যা অসম্পূর্ণ, আভাসে ইঙ্গিতে ব্যক্ত, তা এখানে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত।

ছিন্নপত্রাবলীতে এক অসাধারণ আত্ম-সন্ধানী, প্রকৃতিপ্রেমী রবীন্দ্রনাথের পরিচয় পেলাম আমরা। তাই ছিন্নপত্রাবলীর দুটি মূল সুর—কবির আত্মজিজ্ঞাসা ও নিসর্গজিজ্ঞাসা। কবিমানসপরিচয় এখানে প্রকট। এ প্রসঙ্গে তিনি ৮০ নং পত্রে বলেছেন—

'সাধনাই লিখি আর জমিদারি দেখি, যেমনি কবিতা লিখতে আরম্ভ করি, অমনি আমার চিরকালের যথার্থ আপনার মধ্যে প্রবেশ করি—আমি বেশ বুঝতে পারি এই আমার স্থান। জীবনে জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচরণ করা যায়, কিন্তু কবিতায় কখনও মিথ্যা কথা বলিনে—সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান।'—একটি পত্রে নয় ছিন্নপত্রাবলীর বহুবিধ স্থান এই আত্মস্বীকৃতির আলোকে উজ্জ্বল হয়ে আছে। রবীন্দ্রমানসের মর্মকোষের পরিচয় এখানে উদ্ঘাটিত হয়েছে।

ছিন্নপত্রাবলী মর্তমমতা ও জীবনপ্রীতির বিশিষ্ট দলিল। ছিন্নপত্রাবলী পড়লে মনে হয়, পদ্মা এবং মানবসংসার এক দিকে, অপর দিকে বিশ্বলোক; এক দিকে নির্বিশেষ সৌন্দর্যসাধনা অপরদিকে সবিশেষ মর্তমমতা—এ দুইয়ের মধ্যে যোগসাধন করেছে। তাই রবীন্দ্রনাথের বিষাদ রোম্যান্টিক বিষাদ, তাঁর বৈরাগ্য ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির বৈরাগ্য। 'গল্পগুচ্ছে' ধ্বনিত হয়েছে 'মানবতার করুণ গীতধ্বনি', তরুণ যৌবনের উদাসী বাউল কবির বিষাদ—যা 'সোনার তরী', 'চিত্রা'র মর্মমূলে বর্তমান—তার মূল সুগভীর প্রকৃতিপ্রীতি। ছিন্নপত্রাবলীর ১৪, ১৮, ২৭, ৩৫, ৫৭, ৬৬, ১৫২ সংখ্যক পত্রগুচ্ছ এর পরিচয় বহন করে। তাঁর প্রকৃতিপ্রীতির অপর দিকে সংসারপ্রীতি, সংসার-বিরাগ নয়। পল্লীমানুষের কিছুটা প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সঙ্গে মানবস্বভাবের বৈশিষ্ট্যের, তাঁর রুচি ও মানসপ্রক্রিয়ার একটি সূক্ষ্ম ও অন্তরঙ্গ তত্ত্বসংকেত মেশানো আছে। রবীন্দ্রনাথের মনন ও পর্যবেক্ষণ যে মানবমনের এত নিগূঢ় অলি-গলি ও আনাচ-কানাচ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত

ছিল, যা প্রশস্ত রাজপথ থেকে দূরস্থিত নিভৃতচারী মেঠো পথেরও সন্ধান রাখত তা তাঁর পত্রাবলী পাঠ না করলে জানা যায় না। নিজের জীবন-বোধের প্রেরণায় মানবজীবনের কতকগুলি প্রবণতার আবিষ্কার ও উপস্থাপনা, ব্যক্তিগত অনুভবের সাধারণীকরণ এই ভাবনাগুলিকে মনস্তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক কাঠিন্য হতে রক্ষা করে মননক্রিয়ার মধ্যে ইন্দ্রিয়চেতনার প্রত্যক্ষতা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এই খণ্ড চিন্তাগুলি যেন ইন্দ্রিয়স্পন্দনের অব্যবহিতরূপে সন্নিহিত মননের রাজ্যে অজ্ঞাতসারে চলে গেছে।

নিসর্গ-সৌন্দর্য উপভোগের মাধ্যমে কবির মনে যে প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর একাত্মতার একটি স্থির অধ্যাত্ম-প্রত্যয় ক্রমশ পরিণতি লাভ করেছে, তার নিদর্শন পত্রাবলীর বহু মন্তব্যের মধ্যে বিকীর্ণ রয়েছে। এখানেই তাঁর কাব্যের সঙ্গে পত্রসাহিত্যের গভীর সংযোগ; পত্র তাঁর কাব্যের ভাষ্যরূপে প্রতিভাত হয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে তিনি যে একদিন দেহ-মনে একটি অবিভক্ত সত্তার অংশ ছিলেন, তাঁর চারিদিকে প্রসারিত তৃণ বৃক্ষ নদী সমুদ্র প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর প্রাণরস যে নিগূঢ়ভাবে তাঁর মানসিক চেতনায় সঞ্চারিত হয়ে তাঁকে নিখিল বিশ্বের সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য আত্মীয়তাবন্ধনে একীভূত করেছে, এই জন্মান্তরীণ আত্মীয়তার স্মৃতি তখনও যে তাঁর অনুভূতিতে সক্রিয়, এই বোধটি যে সাময়িক প্রেরণাজাত কাব্যোচ্ছ্বাসমাত্র নয়, পরন্তু কবিচেতনার একটি বহু-উপলব্ধ সমগ্র-অস্তিত্ব-প্লাবী মানসপ্রত্যয়, তা এই পত্রাবলী হতে আমরা জানতে পারি।

পত্রাবলীর মধ্যে সংগীত ও সাহিত্য সম্বন্ধে প্রগাঢ় অন্তর্দৃষ্টিময় খণ্ড খণ্ড মন্তব্যের সমাবেশ হয়েছে। এগুলি ঠিক উদ্দেশ্যমূলক সমালোচনার পর্যায়ভুক্ত নয়। এগুলি যেন কবিমনের পুলকিত চেতনা হতে উৎসারিত তাঁর অকপট আত্ম-উদ্ঘাটনের অঙ্গীভূত। কবির অন্তশ্চিন্তা-নিবিষ্ট মনের সৌন্দর্যরস-সম্ভোগের অতর্কিত অনায়াসলীলা যেন এদের মধ্যে মূর্ত হয়েছে। ভৈরবী, টোড়ি, রামকেলি মিশিয়ে একটি নতুন রাগিণী-সৃষ্টি কবির মনোজগতে এক অভাবনীয় রূপান্তর ঘটিয়েছে (১২২ নং পত্র)। সংগীতের সৃষ্ট জগৎ কি মায়াজগৎ; না বাস্তবজগতের অন্তরাত্মা-উদ্ঘাটন? এই প্রশ্ন কবিমনকে মথিত করেছে ও সংগীত যে জগতের অনির্বচনীয়-তার ঘোষণা করে এই সত্য তাঁর অন্তরে জাগিয়েছে (২১১ নং পত্র)। প্রকৃতির সঙ্গে গানের নিকট সম্বন্ধ কবিচিত্তে প্রতিভাত—রামকেলি রাগিণী আলাপের সময় সমস্ত প্রকৃতি যেন মুগ্ধা হরিণীর ন্যায় কবি-আত্মাকে লেহন করতে থাকে—বর্ষার অন্তরে যে চিরপুরাতন অথচ চিরনতুন বেদনা তা গানের সুরে প্রকাশিত।

কবির নিজ সাহিত্যসাধনা সম্বন্ধে অনেক স্বরূপনির্দেশক আলোচনা পাওয়া যায়। তাঁর নানা আর্টপ্রকরণ সম্বন্ধে কৌতূহল ও চলচিত্ততা শেষ পর্যন্ত প্রবন্ধ, ছোটগল্প, গান, চিত্রকলা প্রভৃতি নানামুখী আকর্ষণের মধ্যে কবিতাকেই চূড়ান্ত স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্তে কবিমনের একটি দিক উদ্ঘাটিত হয়েছে ৯৪, ১০৯, ১১০ ইত্যাদি সংখ্যক পত্রে।

পত্রাবলীর সর্বাপেক্ষা অভিনব বার্তা হল জীবনের লঘু, খুঁটিনাটি, হাস্যোদ্দীপক দিকগুলির প্রতি রবীন্দ্রনাথের সরস অভিনিবেশ। কবি জীবনের স্থূল, অমার্জিত কৌতুকোচ্ছল অংশ-গুলির প্রতি উদাসীন ও তার তত্ত্ব ও সৌন্দর্যময় বিকাশগুলির প্রতিই তাঁর আকর্ষণ—এইরূপ ধারণাই তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত। কিন্তু তাঁর চিঠিগুলি হতে তাঁর কৌতুকপ্রবণতার, তাঁর

প্রকৃত জীবনরসাসক্তির বিস্ময়কর পরিচয় মেলে ১, ৪, ৫০ নং ইত্যাদি পত্রে।

ছিন্নপত্রাবলীর শ্রেষ্ঠত্ব এইখানে যে, কবির মনোজীবনের অভিলাষ, কাব্যসাধনা ও প্রেরণার কথা এতে প্রকাশিত হয়েছে। যে রোম্যান্টিক বিষাদ ও বৈরাগ্য এ পর্বের রবীন্দ্রসাহিত্যকে আশ্রয় করেছিল, তা যে অমূলক নয়, পদ্মাবাসী কবির জীবনে তা যে বাস্তব অপেক্ষা সত্য, উদাস বিষণ্ণ অবনতমুখী সন্ধ্যার চিত্রে তার সমর্থন পাই। সন্ধ্যার ব্যাকুল হৃৎ-স্পন্দন কবির হৃদয়-স্পন্দনের সঙ্গে মিলে গেছে। ছিন্নপত্রাবলীতে সন্ধ্যার বর্ণনা বারবারই এসেছে। সর্বত্রই এক সুর—দিগন্তের শেষ প্রান্তে 'নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা'—তার যাত্রাপথে কোথাও আশ্বাস নেই, অসীম কারুণ্যে গভীর বিষাদে ছেয়ে আছে সে পথ। কবির স্বীকৃতি ছিন্নপত্রাবলীতে পাই —'আর কতবার বলব—এই নদীর উপরে, মাঠের উপরে, গ্রামের উপরে, সন্ধেটা কী চমৎকার, কী প্রকাণ্ড, কী প্রশান্ত, কী অগাধ। সে কেবল স্তব্ধ হয়ে অনুভব করা যায়, কিন্তু ব্যক্ত করতে গেলেই চঞ্চল হয়ে উঠতে হয়।' (২নং পত্র)।

এই অবনতমুখী সন্ধ্যার বর্ণনায় কবিলেখনী কখনও ক্লান্ত হয়নি। আমাদের মনে হয় সন্ধ্যার সঙ্গে কবি এই পর্বে মনোজীবনের সাধর্ম্য অনুভব করেছিলেন। মনোজীবনের মুক্তি কবি পেয়েছিলেন সন্ধ্যার অভিসারে। ছিন্নপত্রের ১৫২ নং পত্রে এই সত্যটি অপরূপ সৌন্দর্যে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে—

> 'কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী —আর তারই মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা, মনে হয় যেন একটি সোনার চেলিপরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেছে—ধীরে ধীরে কত শত সহস্র গ্রাম, নদী প্রান্তর পর্বত নগর বনের উপর দিয়ে যুগযুগান্তর কাল সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলকে একাকিনী ম্লাননেত্রে মৌনমুখে শ্রান্তপদে প্রদক্ষিণ করে আসছে। তার বর যদি কোথাও নেই তবে তাকে এমন সোনার বিবাহবেশে কে সাজিয়ে দিলে! কোন অন্তহীন পশ্চিমের দিকে তার পিতৃগৃহ।'

এখানে যে নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যযাত্রার কথা বলা হয়েছে, 'সোনার তরী' 'চিত্রা'য় তারই কাব্যরূপ পাই। ছিন্নপত্রাবলী তাই রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাষ্য এবং জীবনভাষ্য, সাধারণ গদ্যসংকলন নয়, কবিমানসের অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভের চাবিকাঠি।

তন্তু

ডক্টর শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়*

তন্তু বস্ত্রশিল্পের প্রধান উপকরণ। সভ্যতার আদি হইতেই ইহার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষে মহেন্‌জোদারোতে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে তুলার বস্ত্র ও চীনে সাড়ে চার হাজার বৎসর পূর্বে রেশমবস্ত্র ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ইয়োরোপে অবশ্য পশমের ব্যবহারকাল মাত্র এক হাজার বৎসর। সভ্যতার উন্নতির সহিত বিভিন্ন তন্তুর

* এম. এসসি., পিএচ্. ডি., এফ. টি. আই. (ম্যানচেস্টার)। অবসরপ্রাপ্ত অধিকর্তা, পাটশিল্প গবেষণাগার; বর্তমানে, ইমেরিটাস্ সায়েন্টিস্ট (আই. সি. এ. আর)।

আবিষ্কারও হইতেছে। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত শীত ও গ্রীষ্মের তারতম্য অনুযায়ী পশুর লোম, উদ্ভিদজাত আঁশ প্রভৃতি প্রকৃতিজাত বস্তুর মধ্যেই এই অন্বেষণ সীমাবদ্ধ ছিল। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বহু দেশ বস্ত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবার চেষ্টায় সে গণ্ডি ছাড়াইয়া কৃত্রিম উপায়ে প্রয়োজনানুরূপ নূতন নূতন তন্তু গঠন করিতে লাগিল। ত্রিশের দশক হইতে, বিশেষতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরই কৃত্রিম তন্তু বহুলাংশে প্রসার লাভ করিয়াছে।

সাধারণ গুণ : তন্তুসমষ্টিকে পাক দিয়া সুতা প্রস্তুত অথবা পরস্পর সংলগ্ন রাখিয়া কাগজ বা কাগজের ন্যায় বয়নবিহীন বস্ত্র (non-woven fabric) করিতে হইলে তন্তুর সূক্ষ্ম অথচ দীর্ঘ ও নমনীয় অথচ যথেষ্ট শক্তিবিশিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এই গুণগুলি থাকিলে যে-কোন তন্তু তন্তুপদবাচ্য হইতে পারে। এমন কি কাঁচ ও লৌহতন্তুও বর্তমানে প্রচলিত।

ব্যবহার অনুসারে তন্তুর বিভিন্ন গুণ থাকা প্রয়োজন। জামার কাপড়ের তন্তু শরীরের বা বাতাসের জলীয় ভাগ শোষণ করিবে, শীতবস্ত্রের তন্তু কোঁকড়ানো থাকিয়া বায়ুচলাচলের বাধা সৃষ্টি করিবে, যে তন্তুতে বহিরাবরণের কাপড় অথবা রজ্জু প্রস্তুত হইবে তাহার আবার শোষণক্ষমতা অবাঞ্ছনীয়, কিন্তু যথেষ্ট শক্তির প্রয়োজন।

আণবিক পর্যায়ে আকৃতি : তন্তুতে এই সকল গুণ সমাবেশের কারণ নির্ণয় করিতে যাইয়া বৈজ্ঞানিকগণ জানিয়াছেন যে তন্তুমাত্রেই আণবিক পর্যায়ে এমন কতকগুলি অণুর দ্বারা গঠিত যাহাদের অংশগুলি পরস্পর দীর্ঘ শৃঙ্খলের আকারে সংবদ্ধ। এই দীর্ঘ অণুগুলি সাধারণতঃ পাশাপাশি থাকে। আবার দৈর্ঘ্যের দিকে কয়েকটি অণুর প্রান্তদেশ অপর কয়েকটির প্রান্তের সহিত সংবদ্ধ হইয়া তন্তুদৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি করে। এইরূপে সাজানো অণুগুলি আবার স্থানে স্থানে সমান্তরালরূপে পরস্পর অতি নিকটবর্তী হইয়া আণবিক শক্তির দ্বারা আবদ্ধ হয়। এরূপ স্থানগুলি স্ফটিকধর্মী ও প্রায় নিশ্ছিদ্র। ইহাদের আধিক্যে তন্তুর শক্তি বৃদ্ধি হয়। বাকী স্থানগুলিতে যথেষ্ট ছিদ্র থাকে ও জল তৈল রঞ্জক পদার্থ প্রভৃতি প্রবেশ করিতে পারে। তন্তুভেদে গঠনপ্রণালী ও আয়তনের পরিবর্তনে স্ফটিকধর্মী স্থানগুলির গুণের পার্থক্য হয়।

শ্রেণীবিভাগ : যাবতীয় তন্তুকে প্রধানতঃ প্রকৃতিজাত ও কৃত্রিম এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

প্রকৃতিজাত তন্তুগুলি আবার তিন ভাগে বিভক্ত :

(১) প্রাণীজ : যথা, পশম রেশম মোহেয়ার (mohair), কাশ্মীর।

(২) উদ্ভিজ্জ : যথা, তুলা (বীজ হইতে উৎপন্ন) ; র‍্যামি (ramie), তিসি পাট মেস্তা শণ (বল্কল হইতে উৎপন্ন) ; নারিকেল ছোবড়া (coir fibre) (ফল হইতে উৎপন্ন) ; সিসল (sisal), মেনিলা হেম্প (manila hemp) (পাতা হইতে উৎপন্ন),—এগুলিকে সাধারণতঃ কঠিন তন্তু (hard fibre) বলে।

(৩) খনিজ : যথা, এ্যাস্‌বেস্টস (asbestos)।

ইহাদের সকলের ক্ষেত্রে প্রকৃতিই দীর্ঘ অণু সৃষ্টি করিয়া তাহাদের সমষ্টিকে তন্তুর আকার দিয়াছে। মানুষ তাহাদের পরিষ্কার করিয়া কাজে লাগায় মাত্র।

কৃত্রিম তন্তুশ্রেণী দুই ভাগে বিভক্ত :

(১) রূপান্তরিত (regenerated) : যথা, রেয়ন (rayon) বা আর্ট সিল্ক (art silk)।

(২) যৌগিক (synthetic) : যথা,

নাইলন (nylon), টেরিলিন (Terylene)।

রেয়নের ক্ষেত্রে নূতন অণু সৃষ্টি করা হয় না। কৃত্রিম উপায়ে উহাদের সমষ্টিগত তন্তু-আকারকে পরিবর্তিত করা হয়। যৌগিক তন্তুর ক্ষেত্রে কিন্তু অঙ্গার (carbon), নাইট্রোজেন (nitrogen), হাইড্রোজেন (hydrogen), অক্সিজেন (oxygen) প্রভৃতি পরমাণুযুক্ত পদার্থ হইতে নূতন দীর্ঘ অণু সৃষ্টি করিয়া তাহাতে তন্তুর রূপ দেওয়া হয়।

ব্যবহার অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করিতে হইলে কাপড় কাগজ বুরুশ গদি প্রভৃতি বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনের উপযোগী তন্তুগুলি এক এক স্তরে ভাগ করা যাইতে পারে।

রাসায়নিক উপাদান : প্রাণীজ তন্তু প্রাণী-শরীরের প্রোটিন (protein) হইতে গঠিত হয়। কতকগুলি অ্যামিনো অ্যাসিড্ (amino-acid) অণু পরস্পর গ্রথিত হইয়া পলিপেপ্‌টাইড্ (poly-peptide) নামক দীর্ঘ অণুর সৃষ্টি করে। পশমের প্রোটিনের নাম কেরাটিন্ (keratin), সিল্কের প্রোটিনের নাম ফাইব্রোইন্ (fibroin)। প্রথমটিতে আবার ১৯।২০টি অ্যামিনো অ্যাসিড থাকিতে পারে, দ্বিতীয়টিতে থাকে মাত্র ৬ প্রকার।

উদ্ভিজ্জ তন্তুর মূল উপাদান হইল শ্বেতসার হইতে উদ্ভূত সেলুলোজ (cellulose)। কতক-গুলি গ্লুকোজ (glucose) অণু পরস্পর গ্রথিত হইয়া একটি দীর্ঘ সেলুলোজ অণু সৃষ্টি করে। তুলা ও র‍্যামি তন্তুর শতকরা প্রায় ৯০-৯৫ ভাগই সেলুলোজ। পাট শণ ফ্লাক্স সিসল প্রভৃতি তন্তুতে লিগ্‌নিন (lignin) নামক পদার্থটি শতকরা প্রায় ৫-১৫ ভাগ থাকে, সেই অনুপাতে সেলুলোজ কিছু কম থাকে।

তুলা হইতে উৎপন্ন রেয়ন তন্তুর মধ্যে (১) ভিস্‌কোস রেয়ন (viscose rayon), ফাইব্রো (Fibro), ডুরাফিল (Durafil), টেনাস্‌কো (Tenasco) প্রভৃতি সোডা সেলুলোজ (soda-cellulose) ও কার্বন ডাইসালফাইডের (carbon disulphide) মিশ্রণে উদ্ভূত সেলুলোজ জ্যান্থেট (cellulose xanthate) হইতে প্রস্তুত হয়, (২) কিউপ্রামোনিয়াম্ রেয়ন (cuprammonium rayon) কিউপ্রামোনিয়াম সেলুলোজের দ্রব হইতে এবং (৩) সেলা (Cella), ডাইসেল (Dicel), ট্রাইসেল (Tricel) প্রভৃতি অ্যাসিটেট রেয়ন (acetate rayon) সেলুলোজ অ্যাসিটেট হইতে প্রস্তুত হয়।

রূপান্তরিত প্রোটিন তন্তুর মধ্যে (১) আর্ডিল (Ardil), প্রস্তুত হয় সয়াবিন্ (soya bean) হইতে, (২) ভাইকারা (Vicara) ভুট্টা হইতে, (৩) ফাইব্রোলেন (Fibrolane) ও অ্যারাল্যাক (Aralac) দুধের ছানা (casein) হইতে ও (৪) রূপান্তরিত কেরাটিন তন্তু পুরাতন পশমের দ্রব হইতে।

যৌগিক তন্তুর মধ্যে (১) নাইলনকে (nylon) বলে পলিএমাইড্ (poly-amide) তন্তু। ইহা অ্যাডিপিক (Adipic) অ্যাসিড ও হেক্সামিথাইল ডাইঅ্যামিন (hexamethyl di-amine)-এর রাসায়নিক সংযোগে উদ্ভূত হয়। জার্মানীতে ইহার নাম পারলন (perlon)। (২) ইংলণ্ডে প্রস্তুত টেরেলিন (Terylene) ও আমেরিকায় প্রস্তুত ডাক্রন (Dacron) পলিএষ্টার (poly-ester) জাতীয় তন্তু; ইহা পলি-ইথিলিন টেরেথলেট (poly ethylene terephthalate) অণুশৃঙ্খলের দ্বারা গঠিত এবং ইথিলিন গ্লাইকল (ethylene glycol) ও টেরেথলিক অ্যাসিডের সংযোগে উদ্ভূত হয়। (৩) ভিনিয়ন (Vinyon), তন্তু পলিভিনাইল ক্লোরাইড (poly-vinyl chloride) ও অ্যাক্রিলোনাইট্রাইল (acrylonitryle)-এর সংযোগে গঠিত হয়। (৪) পলিথিন (polythene

বা কোরলিন (Courlene) এক প্রকার পলি-ইথিলিন তন্তু। (৫) রবারও পলিআইসোপ্রিন (polyisoprene) হইতে গঠিত যৌগিক তন্তু।

বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠানের বিভাগ: কাপড়ের কলে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিভাগ থাকে; যথা, (১) তন্তুগুলি হইতে বিজাতীয় ময়লা পরিষ্কার করিবার যন্ত্রাদি; (২) বহু তন্তুকে সমান্তরাল করিয়া মোটা পাঁজে পরিণত করিবার জন্য কাঁটাযুক্ত বেলুনের মত রোলার (roller) সমষ্টির দ্বারা নির্মিত কার্ডিং মেশিন (carding machine); (৩) পাঁজগুলিকে ক্রমান্বয়ে সূক্ষ্মতর করিবার জন্য ড্রইং ও রোভিং ফ্রেম (drawing and roving frame); (৪) পাক দিয়া সুতা তৈয়ারী করিয়া কাটিমে বা নলিতে (bobbin) জড়াইবার যন্ত্র (spinning frame); (৫) কাপড় তৈয়ারীর তাঁত (weaving frame) ও শেষে পালিশ বা রঙ বা অন্য কোনরূপ গুণারোপ করিবার যন্ত্র (finishing machines)। তন্তু-সমষ্টিকে পরপর এইসকল স্তরের মধ্য দিয়া বস্ত্রাকারে পরিণত করা হয়।

বিশেষ বিবরণ: নিম্নে কতকগুলি বহু-ব্যবহৃত তন্তুর বিশেষ তথ্য দেওয়া হইল:

পশম—প্রায় সর্বপ্রকার পশুর লোম হইতে তন্তু পাওয়া যায়, তবে তাহাদের সূক্ষ্মতা বা ব্যাসের পরিমাপের উপরই তাহাদের ব্যবহারিক উপযোগিতা নির্ভর করে। ১৫ হইতে ৪০ মাইক্রন (১ মাঃ = ১/১০০০০ সেঃ মিঃ) ব্যাসের তন্তুগুলিকে পশম বলা হয়। এরূপ তন্তু সাধারণতঃ মেষলোমেই পাওয়া যায়। সুপরিকল্পিত মেষপালনের দ্বারাই সূক্ষ্ম অথচ লম্বা তন্তু পাওয়া সম্ভব। মেরিনো (merino)-জাতীয় পশম লম্বায় খাট (৫- ২ সেঃ মিঃ) কিন্তু সূক্ষ্ম ও নরম বলিয়া প্রসিদ্ধ। লিঙ্কল্‌ন (Lincoln) অঞ্চলের পশম ২০-২৫ সেঃ মিঃ লম্বা ও চকচকে হয়। অষ্ট্রেলিয়া মেষপালনের জন্য বিখ্যাত; কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে এখানে কোন মেষ ছিল না। ভারত এতদিন তিব্বতী পশমের উপর অংশতঃ নির্ভর করিত। বর্তমানে পাহাড়ী ও অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অঞ্চলে মেষপালনের চেষ্টা চলিতেছে।

তন্তুর কুঞ্চনের জন্যই পশমবস্ত্রে গরম হয়। সূক্ষ্ম তন্তুতে অধিক কুঞ্চন থাকে। পশম-তন্তুর তিনটি স্তর। ভিতরে মেডুলা (medulla) নামে নরম অংশ, তারপর অণুতন্তুসমষ্টিসমন্বিত করটেক্স (cortex), তাহার উপর খোসা (cuticle)। শেষ স্তরটি মাছের আঁশের মতো। ফলে পশম-তন্তু যেদিকে মূল ফেরান সেই দিকেই নড়িতে পারে ও জল ও উত্তাপের তারতম্যে তন্তু-গুলি শীঘ্র জট পাকাইয়া ফেল্টের (felt) আকার ধারণ করে।

পশম-সুতা তৈয়ারীর সময় পাঁজ হইতে নোবল চিরুণীর (Noble comb) সাহায্যে লম্বা তন্তু পৃথক্‌ করিয়া তাহাতে ওরস্টেড (worsted)-জাতীয় বস্ত্র হয়। ছোট তন্তু পশম হইতে উলেন (woollen) অথবা মোটা বস্ত্র হয়।

তুলা – কার্পাস ফলের ভিতরে বীজের গায়ে তুলার জন্ম। ফল বড় হইয়া ফাটিয়া যাইলে তুলা বাহির হইয়া পড়ে। পরে জিনিং মেশিনে (ginning machine) শুষ্ক বীজ হইতে তন্তু পৃথক্‌ করা হয়। তুলার আদি জন্ম ভারতে। ভারতীয় মসলিন এককালে বিখ্যাত ছিল। কিন্তু এখন বিশ্ব-উৎপাদনের একাদশমাংশ মাত্র ভারতে হয়। তাহাও অধিকাংশ খাট তন্তুবিশিষ্ট। সী দ্বীপে (Sea Island) সর্বাপেক্ষা লম্বা (৩-৫ সেঃ মিঃ) তন্তু তুলা হয়। মিশরীয় তুলাও ঐ জাতীয়। আমেরিকান তন্তু প্রায় ২-৩ সেঃ মিঃ লম্বা হয়। সূক্ষ্ম সুতার জন্য লম্বা তন্তুর প্রয়োজন।

গ্রীষ্মকালীন পরিধেয় বস্ত্রের জন্য তুলার

ব্যবহারই বেশী। জগতে যত তন্তু উৎপন্ন হয় তুলার উৎপাদন তাহার অর্ধেক। তুলাতন্তু তিন স্তরে বিভক্ত: বহিস্থ প্রাথমিক স্তর, দ্বিতীয় স্তর ও তৃতীয় তন্তু-মধ্যস্থ শূন্যস্থান। কস্টিক সোডার সংযোগে দ্বিতীয় স্তর স্ফীত হইয়া শূন্যস্থান পূর্ণ হয় ও তন্তু মসৃণ হয়। ইহাকে মারসারাইজেসন (mercerisation) বলে।

পাট, ফ্লাক্স প্রভৃতি—পাট মেস্তা তিসি বা ফ্লাক্স (flax) শণ প্রভৃতি শাকজাতীয় গাছ। ইহারা মাটি হইতে খাড়া ২-৫ মিটার উপরে উঠে। ইহাদের ডালপালা কম। এইসব গাছের ছাল ও কাঠির মধ্যস্থ তন্তুস্তরকে পৃথক্ করিতে হইলে জলে পচান (পাটের ক্ষেত্রে) বা শিশিরে ভিজানো (ফ্লাক্স-এর ক্ষেত্রে) হয়। তন্তুগুলি পরস্পর সংলগ্ন থাকিয়া জালের আকৃতি (meshy structure) লইয়া গাছের সমান লম্বা হয়। যন্ত্রের সাহায্যে ঐ জালকে আঁচড়াইয়া এক একটি পৃথক্ ও খাটো (২০-৩০ সেঃ মিঃ) তন্তুতে পরিণত করা হয়। সমগ্র জগতে উৎপন্ন তন্তুর মধ্যে তুলার পরই পাটের স্থান। এককালে পাট ভারতের একচেটিয়া ফসল ছিল; বর্তমানে ভারতীয় ইউনিয়নে উহার ৪০-৪৫% ও বাংলাদেশে তদনুরূপ পাট উৎপন্ন হয়। পাটে সাধারণতঃ চট বস্তা পর্দা প্রভৃতি, শণে দড়ি ও ফ্লাক্স-এ লিনেন (linen)-জাতীয় পরিধেয় বস্ত্র হয়।

র‍্যামি (ramie): ইহাও একপ্রকার শাক-জাতীয় গাছ হইতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে শুধু জলে পচনের দ্বারাই তন্তু-নিষ্কাশন সম্ভব হয় না, রাসায়নিক দ্রব্যেরও প্রয়োজন হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গ্রীষ্মপ্রধান আর্দ্র স্থানেই ইহা অধিক জন্মায়। ভারতে ইহার কিছু চাষ আরম্ভ হইয়াছে। ইহার তন্তু সাদা ও চকচকে। ইহাতে উৎকৃষ্ট টেঁকসই জামা তৈয়ারী হয়।

হেম্প (hemp): কয়েকটি বিভিন্নজাতীয় তন্তু এই নামে প্রচলিত। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি কঠিন (hard) তন্তু; যথা, সিসল ও ম্যানিলা। সিসল তন্তু একপ্রকার আনারসের মতো গাছের পাতা হইতে আফ্রিকা অঞ্চলে উৎপন্ন হয়, আর ম্যানিলা হয় ফিলিপাইনে কলা-গাছের মতো গাছের পাতা হইতে। ভারতে সামান্য সিসল উৎপন্ন হয়। ইহাদের দ্বারা সমুদ্রে ব্যবহারের উপযুক্ত দড়ি ও কাছি প্রস্তুত হয়।

নরম তন্তু হেম্পের মধ্যে ইটালীয় 'প্রকৃত হেম্প' (true hemp) ও ভারতীয় 'সান্-হেম্প' (sunn-hemp) গাছের ছাল হইতে উৎপন্ন হয়। ইহার ফল হইতে গাঁজা প্রস্তুত হয়। দড়ি বা কাগজ প্রস্তুত করিতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

রেশম (silk): গুটিপোকার লালা বাতাসের সংমিশ্রণে শক্ত হইলে রেশম উৎপন্ন হয়। পোকাশুদ্ধ গুটিগুলিকে গরম বাষ্পে রাখিলে পোকাগুলি মরিয়া যায়, তখন গুটির প্রান্ত ধরিয়া টানিলে একজোড়া তন্তু বাহির হয়। উহা দৈর্ঘ্যে চার হাজার মিটার পর্যন্ত হয়। কয়েকটি লম্বা তন্তু পাকাইয়া সূতা হয়। তসরের জন্য অন্য প্রকার পোকা ব্যবহৃত হয়। জাপান চীন ইটালী ফ্রান্সে যথেষ্ট সিল্ক উৎপন্ন হয়। জগতের উৎপাদনের তুলনায় ভারতের রেশম উৎপাদন মাত্র ২০ ভাগের এক ভাগ। হাল্কা ধরনের শৌখিন বস্ত্রের জন্যই রেশমের ব্যবহার অধিক।

কৃত্রিম তন্তু: রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম তন্তুর উপাদান প্রস্তুত হইলে ঐ উপাদানকে সরু সরু অনেকগুলি ছিদ্রের মধ্য দিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হয়। বহিঃপাত্রে ভিস্‌কোজ (viscose) রেয়নের ক্ষেত্রে সালফিউরিক অ্যাসিড (sulphuric acid), অ্যাসিটেট (acetate) রেয়নের ক্ষেত্রে শুষ্ক হাওয়া এবং

নাইলন, টেরেলিন প্রভৃতির ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা হাওয়ার ব্যবস্থা থাকে। ছিদ্র হইতে সূত্রাকারে বাহির হইলেই উহাতে পাক দেওয়া হয়। কখনও বা উহাদের ৮।১০ সেঃ মিঃ করিয়া কাটিয়া তুলা বা পশম তন্তুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সুতা প্রস্তুত করা হয়। গত ৩০ বৎসরের মধ্যে জগতে কৃত্রিম তন্তুর উৎপাদন প্রায় চারিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতে রেয়নের কারখানা কয়েকটি হইয়াছে। নাইলন উৎপাদনের ব্যবস্থাও হইয়াছে। নাইলন বা টেরেলিন রেয়ন অপেক্ষা অনেক কম জল গ্রহণ করে, সহজে দাহ্য নয় এবং কীট ইহাদের নষ্ট করে না। সেজন্য এগুলি বহিরাবরণ হিসাবে যথেষ্ট ব্যবহৃত হইতেছে। বিদ্যুৎ-পরিবহনে বাধাদানকারী বলিয়া বিদ্যুৎশিল্পেও ইহাদের চাহিদা আছে।

উৎপাদনের হার :—সমগ্র জগতে ও ভারতে বিভিন্ন তন্তুর ১৯৭০-৭১ সালের উৎপাদনের হার নিয়ে তুলনা করিয়া দেখানো হইয়াছে :

(সংখ্যাগুলি ১০০০ মেট্রিক টনে)

তন্তু	সমগ্র জগতে	ভারতে
পশম (wool)	১৫৯০	২২
তুলা (cotton)	১১৮০০	৮২০
রেয়ন (rayon)	৩৪০০	১২০
অন্যান্য কৃত্রিম তন্তু	৪৯০০	১৬
সিল্ক (silk)	৪০	২
ফ্লাক্স (flax)	৬৫০	—
হেম্প (hemp)	২৭০	৫০
পাট (jute)	৩৫০০	১৪৬০
সিসল (sisal)	৬০০	অতি অল্প

সমালোচনা

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড : চৈতন্যযুগ : ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক : মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০১২। (১৯৭১), পৃষ্ঠা ৭৮১+১৫, মূল্য কুড়ি টাকা।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচ্য গ্রন্থখানি ধীরভাবে পাঠ করে এর এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়েছে, যা পূর্ববর্তী এই শ্রেণীর কোনো গ্রন্থে লক্ষ্য করিনি। তাই সেই সব অভিনব বৈশিষ্ট্যগুলির দিকেই বিশেষ করে আমরা অঙ্গুলিসংকেত করতে চাই।

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস জাতীয় গ্রন্থ প্রচুর রচিত হয়েছে এবং আজও তার ধারা অব্যাহত আছে। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়নে লেখকের কাছে যা আমাদের প্রধান দাবী, তা অনেকেই কিন্তু পূরণ করেন না। মুদ্রিত গ্রন্থ বা অপরের গ্রন্থে বিবৃত বক্তব্য বা উদ্ধৃত অংশের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করেই এই ধরনের অধিকাংশ গ্রন্থই রচিত হয়। পুরাতন জীর্ণ দুর্বোধ্য পুঁথি পাঠের অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা অনেকেরই নেই। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থ রচনায় এই সহজ পথটি গ্রহণ করেননি। বিপুল পরিশ্রম, অসীম ধৈর্য ও গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি মূল পুঁথিগুলি পাঠ করেছেন, পুঁথি-পরিচয় দিয়েছেন এবং তাঁর আলোচনাকে প্রামাণিক করতে চেয়েছেন। এদিক থেকে তাঁর পূর্বসূরী মাত্র তিনজন প্রসিদ্ধ সাহিত্য-ঐতিহাসিকেরই নাম করা যায়—পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন ও ডঃ সুকুমার সেন।

২। পূর্ববর্তী সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের

পরবর্তী কালে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থগুলি রচিত। সেইজন্য আরও বহু তথ্যাদি ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে ছোট বড় অনেক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ, আলোচনা বা গ্রন্থাদি দেখবার ও পড়বার তাঁর সুযোগ ঘটেছে। এই সব দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ প্রবন্ধাদির সঙ্গে তাঁর পরিচয় কিরূপ ঘনিষ্ঠ গ্রন্থমধ্যেই তার প্রমাণ আছে। এঁদের মত উল্লেখ করে কোথাও নির্বিচারে তা তিনি গ্রহণ করেননি। যে পরিকল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে তিনি গ্রন্থটি রচনা করেছেন, তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ যুক্তিভিত্তিক বক্তব্যকে তিনি বিচার করেই গ্রহণ করেছেন। পূর্ববর্তী ও সমকালীন পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতামত ও আলোচনা তাঁর গ্রন্থ থেকে আমরা যতখানি পাচ্ছি এবং তাঁদের বক্তব্যের মূল্যায়ন তাঁর কাছ থেকে যা পাচ্ছি পূর্ববর্তী কোনো গ্রন্থেই তা মেলে না। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলির সন তারিখ নির্ণয়ে নানাজনের বক্তব্য উদ্ধার করলেও তিনি 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান' গ্রন্থের বিখ্যাত লেখক ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের সিদ্ধান্তকে বহুস্থলেই মেনে নিয়েছেন। এর থেকে এমন কথা বলা চলে না যে ডঃ মজুমদারের বৈষ্ণব-সাহিত্য সম্পর্কে সমস্ত বক্তব্যের তিনি অন্ধ সমর্থক। চণ্ডীদাস-সমস্যা আলোচনায় তিনি ডঃ মজুমদারের একটি অভিমত কিছুতেই গ্রহণযোগ্য মনে করতে পারেননি। বড়ু চণ্ডীদাসকে ডঃ মজুমদার উত্তর চৈতন্যযুগের কবি বলে যে যুক্তি দেখিয়েছেন, তা উদ্ধার করে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন—"ডঃ মজুমদার যে যুক্তিবলে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে চৈতন্যযুগের কাব্য বলিতেছেন, তাহা অতিশয় দুর্বল ও কাল্পনিক। ইহাকে যুক্তি না বলিয়া ডঃ মজুমদারের এক প্রকার অদ্ভুত বিশ্বাস বলা যাইতে পারে।" ডঃ সুশীল কুমার দের বহু মন্তব্য তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করলেও প্রয়োজনস্থলে তাঁকেও সমালোচনা করেছেন। গোবিন্দদাসের কড়চা সম্পর্কে ডঃ দের মন্তব্যে তিনি 'স্ব-বিরোধ' লক্ষ্য করেছেন।

৩। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনার একটি বড় বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি প্রচলিত গ্রন্থ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামতকে সর্বদা খণ্ডনের জন্য আগ্রহী নন। যেখানে সেই সব বক্তব্য অপক্ষপাত যুক্তিপূর্ণ ও সারগর্ভ তিনি তার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত। দীর্ঘবিচারের পর নানাজনের একই বিষয় সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী মতগুলির মধ্য থেকে তিনি গ্রহণযোগ্য মতের দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। দু'একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবি মাণিক দত্তের ভণিতায় দুখানি মাত্র পুঁথি পাওয়া গেছে। আভ্যন্তরীণ প্রমাণের দ্বারা ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত করেছেন যে এ কাব্য খুব প্রাচীন নয় এবং প্রাপ্ত পুঁথি কোন্ মাণিক দত্তের তা সন্দেহের স্থল। এই মত ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে ডঃ সুকুমার সেনের অনুরূপ সংশয়াত্মক বক্তব্য পাদটীকায় উদ্ধৃত করেছেন। আবার গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলীতে পূর্বতন প্রাকৃত প্রেমকবিতাই উজ্জ্বল রসের মন্ত্রে পরিশুদ্ধ হয়ে একাধারে আদি ও ভক্তিরসের সমন্বয়ী রূপ ধারণ করেছে বলে যখন তিনি সিদ্ধান্ত করছেন তখন ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ' গ্রন্থের একটি উক্তি উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন—'একথা অতিশয় যুক্তিযুক্ত।'

৪। কোনো যুগের সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করতে গেলে সেই যুগের রাষ্ট্রনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে বাদ দেওয়া চলে না। বাঙালীর যে একটা স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত

সাংস্কৃতিক জীবন আছে, আর্য-অনার্যের নানা সংমিশ্রণে গঠিত জাতির একটা বিশিষ্ট সমাজধর্ম আছে এবং সেই সঙ্গে যে রাষ্ট্রনৈতিক ইতিবৃত্তের বিশাল সংঘটনের ছায়াতলে জাতির জীবনের ধারা বয়ে এসেছে, তা ভালভাবে না জানলে তার সাহিত্যকে ভালভাবে বোঝা যাবে না। সাহিত্যসৃষ্টির অন্তর্নিহিত প্রেরণা ও ঐতিহ্যকে জানতে গেলেই অনিবার্যভাবেই এসে পড়বে ইতিহাস সমাজ ও সংস্কৃতির কথা। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন এই পরিচয় তাঁর গ্রন্থে দিয়েছেন, ডঃ সুকুমার সেনও গ্রন্থরচনায় এ-বিষয়ে অবহিত ছিলেন। কিন্তু ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়টিকে যতখানি গুরুত্ব দিয়ে এর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, তা আর কেউ করেননি। চৈতন্য-যুগের সাহিত্য-পরিচয় উপলক্ষে তিনি 'ইতিহাসের সংকেত, সমাজ ও সংস্কৃতি' এই তিনটি অংশে বিভক্ত করে নিয়ে বিষয়টির দীর্ঘ ৬০ পৃষ্ঠা ব্যাপী আলোচনা গ্রন্থের শুরুতেই করেছেন। এই আলোচনার কৈফিয়ৎস্বরূপ তিনি জানিয়েছেন—"সাহিত্যের অন্তরালে যেমন একটা জাতির আধিমানসিক সত্তা লুকাইয়া থাকে, তেমনি অনেকগুলি বাস্তব ও ভৌম কারণও অন্তর্নিহিত থাকে। তাহাই ইতিহাস —জনজীবন ও সভ্যতার নানা উপকরণ। তাই আমরা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের রূপ রীতি ও ভাবাদর্শকে তৎকালীন দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিব।" কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তবে এই সম্পর্কে আমাদের আরও কৌতূহল ও জিজ্ঞাসাই জাগ্রত করে তাঁর ঐ আলোচনা। আমরা তাই দাবী করি, পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থকার শুধুই চৈতন্যভাগবত ও মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল নামক বিখ্যাত গ্রন্থে ধৃত সমাজ-সংস্কৃতির পরিচয়ই নয় —এ যুগের অন্যান্য মঙ্গলকাব্যগুলিতে ও বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যেও প্রতিফলিত পরিচয়কে আরও একটু বিশদ আকারে আমাদের জানাবেন। যদি এতে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কা প্রকাশককে বিব্রত করে, তাহলে ইতিহাসের সংকেত অংশকে কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে। মোট কথা সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় আরও বিস্তৃত হোক্—এই আমাদের দাবী।

৫। চৈতন্যযুগ বা ষোড়শ শতককে এতখানি বিস্তৃত পরিসরে সাহিত্যের ইতিহাস-গ্রন্থে স্থান দেওয়া এর পূর্বে হয়নি। ইংরেজী সাহিত্যে 'কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইংলিস লিটারেচার' গ্রন্থে শতক ধরে ধরে বিভিন্ন লেখক সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তি-বিশেষের চেষ্টায় এই ধরনের কাজ বিস্ময়কর। ইউরোপীয় রেনেসাঁশের সঙ্গে চৈতন্য-অভ্যুদয়ে বাঙালীর জাগরণের কোথায় মিল আর কোথায় অমিল—এ প্রশ্ন অনেকেরই। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থের শুরুতেই এ প্রশ্নের চমৎকার মীমাংসা করেছেন। যখনই পুঁথি-নির্ভর কোনো গ্রন্থের বা পুঁথির আলোচনা তিনি করেছেন, তখনই 'পুঁথি-পরিচয়' বিশদ আকারেই দেওয়া হয়েছে।

৬। গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট' অংশও সম্পূর্ণ অভিনব। বর্তমানে কোনো যুগের বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়-সাধনেই আমরা সন্তুষ্ট থাকতে পারি না। একই কালের দেশ-বিদেশে সৃষ্ট সাহিত্যের মূলে কোন্ কোন্ প্রেরণা সক্রিয় এবং সে সব সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের সাহিত্যের জন্ম-মূলের প্রেরণাগত কোনো ঐক্য আছে কিনা তা জানতে ইচ্ছা করে। এই কৌতূহল নিবৃত্তির প্রয়োজনে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচ্য গ্রন্থের পরিশিষ্টে ষোড়শ শতকের ইংরেজী সাহিত্য, ফরাসী সাহিত্য,

জার্মান সাহিত্য ও ইতালীয় সাহিত্যের পরিচয় যেমন দিয়েছেন, তেমনি হিন্দী সাহিত্য, গুজরাটী সাহিত্য, মারাঠী সাহিত্য, ওড়িয়া সাহিত্য ও অসমীয়া সাহিত্যেরও কিছু আলোচনা করেছেন।

৭। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ববর্তী কালে রচিত সাহিত্যের ইতিহাস-শ্রেণীর গ্রন্থগুলিতে একাধারে সার্থক ও আদর্শ সাহিত্য-ঐতিহাসিকের সকল দুর্লভ গুণের একত্র সমাবেশ দেখা যায়নি। কিন্তু ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচ্য গ্রন্থটিতে এই ত্রুটি চোখে পড়ে না। বিপুলায়তন হওয়া সত্ত্বেও তা পাঠে ক্লান্তিকর নয়। সবচেয়ে বড় কথা তাঁর গ্রন্থের অপরূপ ব্যক্তিত্বমণ্ডিত কবিত্বময় এক আভিজাত্যপূর্ণ ভাষা আমাদের তন্ময় করে রাখে।

আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস-রচনার দুরূহ কর্মে তিনি ব্যাপৃত আছেন। এখনও আধুনিক পর্বের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার কাজ অসমাপ্ত আছে। তাঁর এই অসম্পূর্ণ কাজকে দিনের আলোকে শীঘ্রই দেখার জন্যে আমরা আগ্রহের সঙ্গেই প্রতীক্ষা করব।

ডক্টর দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাশালা রজত জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ (১৯৫৩-১৯৭৮)। প্রকাশক : অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাশালা, যাদবগিরি, মহীশূর-৫৭০০০২। (১৯৭৮), পৃ ৯২, মূল্য কুড়ি টাকা।

স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারার অনুসরণে শিক্ষাক্ষেত্রে মহীশূর শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাশালার নিঃস্বার্থ কল্যাণপ্রসূ সেবার ২৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে স্মারক গ্রন্থটি প্রকাশিত। ইংরেজী ও কানাড়ায় মোট ২০টি মূল্যবান প্রবন্ধে স্মারক গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থের প্রারম্ভেই রহিয়াছে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজের আশীর্বচন। তৎপরে সংক্ষেপে সন্নিবেশিত হইয়াছে বিদ্যাশালার প্রতিষ্ঠাতা স্বামী শান্তবানন্দজীর প্রেরণাপ্রদ কার্যেতিহাস। প্রবন্ধগুলির আলোচ্য বিষয় শিক্ষাতত্ত্ব, শিক্ষার প্রাচীন ও নবীন আদর্শের যুগপৎ রূপায়ণ, বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি ও প্রশাসনের দোষত্রুটি ও বাস্তব সমস্যার প্রতিকার ইত্যাদি। একটি প্রবন্ধে রহিয়াছে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা-সম্পর্কিত বাণীর বিচার-বিশ্লেষণ। অন্য কয়েকটি প্রবন্ধে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশনের দান, সাধারণ স্কুল (Public School) ও রামকৃষ্ণ বিদ্যাশালার তুলনা, রামকৃষ্ণ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (Ramakrishna Institute of Moral and Spiritual Education) ক্রমবিকাশ প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

প্রবন্ধকারদের মধ্যে আছেন সুবিখ্যাত শিক্ষাবিৎ, কবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিক, চিকিৎসক, বড় বড় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ও বর্তমান অধ্যক্ষ, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী, অধ্যাপক, রামকৃষ্ণ মিশনের অভিজ্ঞ সন্ন্যাসী প্রমুখ কৃতী কৃতবিদ্য ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ। শিক্ষাবিষয়ে তাঁহাদের আলোচনা ও অভিজ্ঞতা-প্রসূত অভিমত নিঃসন্দেহে মূল্যবান ও সময়োপযোগী।

বিদ্যাশালার বহুমুখী কর্ম, অতীত ও বর্তমানের কর্মী, কর্মরত ছাত্র ও সম্মানিত অতিথিগণের অনেকগুলি সুন্দর আলোকচিত্র গ্রন্থটির অতিরিক্ত আকর্ষণ। মুদ্রণ ও অঙ্গ-সৌষ্ঠব প্রশংসনীয়। কাগজ বেশ পুরু ও মজবুত। গ্রন্থটি যেমন শিক্ষাবিষয়ে ভাবুকদের চিন্তার খোরাক যোগাইবে তেমনি কর্মনিরত শিক্ষা-

ব্রতীদের কর্মের কৌশল বা নীতিপ্রয়োগপদ্ধতিও শিক্ষা দিবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

প্রাপ্তিস্বীকার

ভগবান শ্রীবুদ্ধদেব ও সারনাথ : লেখক ৺গুরুদাস গুপ্ত। প্রকাশক : স্বামী রঘুবরানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বারাণসী-১।

Sri Ramakrishna Mission Boys' School Souvenir, 1977. T. Nagar, Madras-600017.

Ramakrishna Math Project Souvenir, 1977. Hyderabad-500029. Published by Swami Ranganathananda.

Jingkyrsiew (Awakening Ramakrishna Mission High School, 1977, Cherrapunjee, Meghalaya. Published by Swami Gokulananda.

Rahara Home (News for 1976). Published by Swami Ramananda, Rahara, 24 Parganas.

বিদ্যামন্দির পত্রিকা, ১৩৮৪। প্রকাশক : স্বামী স্মরণানন্দ, সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ।

রশ্মি, ১৯৭৭। প্রকাশক : স্বামী তীর্থানন্দ, সম্পাদক, বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম উচ্চ বিদ্যালয়।

Sarada. Annual Souvenir, 1977. Published by Swami Smaranananda, Secretary, Ramakrishna Mission Saradapith, Belur Math.

স্মরণিকা, ৯১৮। শ্রীরামকৃষ্ণ নিরঞ্জনানন্দ আশ্রম, রাজারহাট-বিষ্ণুপুর, ২৪ পরগণা।

Sri Ramakrishna Seva Samity Golden Jubilee Souvenir. Published by Asitankar Sinha and Radhashyam Paul, Dibrugarh, Assam.

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণকার্য

ভারতে : অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে গত নভেম্বর মাসে বিধ্বংসী ঘূর্ণিবাত্যায় সর্বস্বান্ত ৫৩টি গ্রামের ৩,৭৩৯ পরিবারের প্রায় তের হাজার লোকের মধ্যে মোট ২,৬৭,৫৪০ টাকার খাদ্য, বস্ত্র, বাসনপত্র ইত্যাদি বিতরণ করিবার পরে রামকৃষ্ণ মিশন বর্তমানে অন্ধ্রপ্রদেশের ৮টি গ্রামে পঞ্চাশ লাখ টাকায় এক হাজার এবং তামিলনাড়ুর দুইটি গ্রামে তিন লাখ টাকায় ৫৭টি ঝড়-প্রতিরোধক পাকা বাড়ি তৈয়ারির কাজ আরম্ভ করিয়াছে।

ইতিমধ্যে দণ্ডকারণ্য হইতে আকস্মিকভাবে দলে দলে উদ্বাস্তুদের আগমনে উদ্ভূত ভয়াবহ পরিস্থিতির মোকাবিলায় রামকৃষ্ণ মিশন আপাততঃ খড়গপুর ও হাওড়া স্টেশনে দুর্দশাগ্রস্ত উদ্বাস্তুদের মধ্যে চিঁড়া-গুড়, পাতিলেবু, গুঁড়া দুধ, বিস্কুট, 'লাইফবয়' সাবান ইত্যাদি বিতরণ করিতেছে।

বাংলাদেশে : বাগেরহাট দিনাজপুর নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা কেন্দ্রের মাধ্যমে রোগীদের চিকিৎসা, এবং নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা কেন্দ্রের মাধ্যমে দুগ্ধবিতরণ অব্যাহত আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

বেলুড় মঠে গত ১০ই মার্চ ১৯৭৮, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪৩তম জন্মতিথি মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। মঙ্গলারতি বেদপাঠ

উষাকীর্তন শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ পাঠ কালীকীর্তন শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা হোম ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৩০,০০০ ভক্ত হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ পান। অপরাহ্নে মঠ-প্রাঙ্গণে আয়োজিত ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী সম্পর্কে ভাষণ দেন ডঃ প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, ডঃ এস. এস. রাঘবাচার এবং সভাপতি স্বামী গম্ভীরানন্দ।

১৯শে মার্চ সারাদিনব্যাপী সাধারণ উৎসবে প্রায় ৬৫,০০০ ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ পান এবং বহু দর্শনার্থীর সমাগম হয়।

দিনাজপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১০ই, ১১ই ও ১২ই মার্চ ১৯৭৮, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪৩তম জন্মতিথি-উৎসব পালিত হয়।

১০ই প্রত্যূষে মঙ্গলারতি বেদপাঠ ও ভজনাদি হয়; তৎপরে বিশেষ পূজা, হোম, দরিদ্রনারায়ণসেবা, কথামৃতপাঠ ও লীলাগীতি প্রভৃতি সারাদিন ধরিয়া চলে। প্রায় চার হাজার নরনারী বসিয়া প্রসাদ পান।

১১ই বৈকালে ধর্মসভায় ভাষণ দেন অধ্যাপক শান্তিনারায়ণ চক্রবর্তী, জনাব এন. এইচ. চৌধুরী, জনাব জহুরুল ইসলাম, শ্রীবিমল চন্দ্র বসু ও সভাপতি জনাব মাহমুদ মোকাররম হোসেন। তৎপরে সভাপতি সাহেব স্কুল ও কলেজ বিভাগের রচনা-প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন। সভার পর বিবেকানন্দ-লীলা-গীতি পরিবেশন করেন শ্রীমতী মীনা ভট্টাচার্য ও ও শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ভট্টাচার্য।

১২ই বৈকালীন ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমা সারদা-দেবী সম্পর্কে ভাষণ দেন কুমারী সন্ধ্যা ভট্টাচার্য, কুমারী মীনা ভট্টাচার্য, অধ্যাপিকা আখিয়া আফলাতুন নাহার, জনাবা সৈয়দা জাহানারা, কুমারী রত্না কুণ্ডু, শ্রীবিমল চন্দ্র বসু ও সভানেত্রী জনাবা রোকাইয়া খাতুন। তৎপরে সভানেত্রী স্কুলের ছাত্রছাত্রী বিভাগের আবৃত্তি-প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন।

সৈয়দা জাহানারা তাঁহার ভাষণে বলেন: শ্রীমা আমাদের গৌরব; তিনি আমাদের মত পোশাক পরে, আমাদের ভাষায় কথা বলে, আমাদের মত জীবনযাপন করে আমাদের আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ করে দিয়েছেন যে আমরাও মহৎ হতে পারি। তাঁর পুণ্যজীবন অনুধ্যান ও অনুসরণ করার চেষ্টা আমাদের করতে হবে। তাঁর মত বিশ্বব্যাপক মাতৃত্ব আমাদের আনতে হবে। তবেই দেশের কল্যাণ।

অধ্যাপিকা আখিয়া নাহার ও সভানেত্রী উভয়েই নারীজীবনে শ্রীমায়ের জীবনাদর্শ অবলম্বন করার আহ্বান জানান। সভার পর মায়ের লীলাগীতি পরিবেশন করেন শ্রীমতী মীনা ভট্টাচার্য, রত্না কুণ্ডু প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ।

তমলুক রামকৃষ্ণ আশ্রম ও মিশন সেবাকেন্দ্রে গত ১০ই, ১১ই ও ১২ই মার্চ ১৯৭৮, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪৩তম জন্মোৎসব ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়।

১০ই মঙ্গলারতি, বেদগান, উষাকীর্তন, বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভজন, কথামৃত লীলাপ্রসঙ্গ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি পাঠ করা হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি সহ একটি শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে। দ্বিপ্রহরে প্রায় চারি হাজার ব্যক্তি বসিয়া প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী বিশুদ্ধাত্মানন্দ। পরে রামকৃষ্ণ-লীলাগীতি পরিবেশন করেন শ্রীভূপেন চক্রবর্তী।

১১ই সন্ধ্যায় ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অজজানন্দ ও শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়। পরে রামায়ণগান করেন শ্রীঅরুণ বিশ্বাস।

১২ই অপরাহ্নে আশ্রম বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কারবিতরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী শিবময়ানন্দ ও স্বামী অজজানন্দ। রামকৃষ্ণলীলাগীতি পরিবেশন করেন শ্রীলক্ষ্মীকান্ত রায় ও সহশিল্পীবৃন্দ।

মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১০ই হইতে ১৩ই মার্চ ১৯৭৮, ভাবগম্ভীর পরিবেশে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪৩তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

১০ই প্রত্যূষে বেদপাঠ ভজনসঙ্গীতাদির পর শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতিসহ একটি শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে। পরে বিশেষ পূজা পাঠ ও হোমাদি হয়। পূজান্তে শ্রীপাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। মধ্যাহ্নে প্রায় পাঁচ হাজার ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণ বসিয়া প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী শিবময়ানন্দ।

১১ই বিদ্যাভবনের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণী সভায় স্বামী শিবময়ানন্দ স্বামীজীর জীবন ও চিন্তা বিষয়ে ভাষণ দেন। পরে সভাপতি শ্রীশিবপ্রসাদ সমাদ্দার পুরস্কার বিতরণ করেন।

১২ই আশ্রমে আয়োজিত সভায় ভাষণ দেন স্বামী অমলানন্দ ও সভাপতি শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী। ১৩ই যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করেন রঞ্জনকুমার।

কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১০ই হইতে ১৫ই মার্চ ১৯৭৮, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-মহোৎসব পালিত হয়।

১০ই মঙ্গলারতি বেদপাঠ গীতা শ্রীশ্রীচণ্ডী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি ও শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ পাঠ, বিশেষ পূজা হোম ও ভজনাদি হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় ৪ শত দরিদ্র-নারায়ণ বসিয়া এবং প্রায় ৪ হাজার ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ পান।

১১ই অপরাহ্নে ভজন ও রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের বিজ্ঞান-প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়।

১২ই অপরাহ্নে সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীসুনির্মল ভট্টাচার্য এবং ধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ভাষণ দেন শ্রীজগদীশ ঝা ও স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ।

১৩ই পূর্বাহ্নে ভজন হয় এবং অপরাহ্নে ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে ভাষণ দেন শ্রীভরত প্রসাদ শর্মা এবং শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী সম্বন্ধে আলোচনা করেন স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ।

১১ই, ১২ই ও ১৩ই সন্ধ্যায় রামায়ণগান করেন শ্রীনিখিল চট্টোপাধ্যায়।

১৪ই অপরাহ্নে বিদ্যামন্দিরের পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

চেরাপুঞ্জি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১০ই মার্চ ১৯৭৮, মঙ্গলারতি বেদপাঠ, বিভিন্ন উপজাতীয় ভাষায় ভজন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। খাসিয়া ভাষায় কথামৃত পাঠ করেন কুমারী লুসি এবং ভাষণ দেন শ্রীফিলোল সিং। খাসিয়া, গারো, মিন্টেং, হাজং, বোলাই প্রভৃতি বহু উপজাতীয় ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করেন।

১৮ই মার্চ সাধারণ উৎসব হয়। প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি লইয়া একটি বিরাট মিছিল শহর পরিক্রমা করে। নাগা, খাসিয়া, গারো, মিজো, ত্রিপুরী আদিবাসী, অরুণাচলের আদিবাসী, রাংখল, মিন্টেং, চাক্‌মা, হাজং, বোলাই, মিকির, রিয়াং প্রভৃতি বিভিন্ন উপজাতীয় লোকেরা নিজস্ব পোশাক, অস্ত্র ও বাদ্যভাণ্ড সহ মিছিলে যোগদান করেন। মধ্যাহ্নে জনসভায় ভাষণ দেন শ্রীরণজিৎ নাগ, চেরাপুঞ্জির রাজা শ্রীমোসিং সিয়েম, শ্রীফিলোল

সিং ও স্বামী গোকুলানন্দ। সকলেই বসিয়া প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় লীলাগীতি পরিবেশন করেন শ্রীধ্রুব চৌধুরী ও সহশিল্পীবৃন্দ।

রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১২ই, ১৩ই ও ১৪ই মার্চ ১৯৭৮, ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব পালিত হয়।

১২ই ব্রাহ্মমুহূর্ত হইতে মঙ্গলারতি, বেদপাঠ, ভজন, শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ গ্রামপরিক্রমা, পূজা, হোম এবং কথামৃত ও লীলাপ্রসঙ্গ প্রভৃতি পাঠ হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় ছয় হাজার নরনারী বসিয়া প্রসাদ পান। বৈকালে ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ ও স্বামী মিত্রানন্দ। সভাপতি ছিলেন স্বামী স্বাহুভবানন্দ। রাত্রে নতুনগ্রামের যুবকরা যাত্রাভিনয় করে।

১৩ই অপরাহ্নে অমর কানন রামকৃষ্ণ আশ্রমে স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। রাত্রে রামপুর মাঁজমুড়া গ্রামের যুবকরা যাত্রাভিনয় করে।

তিন দিন সন্ধ্যায় কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশনের আনুকূল্যে 'কংস', 'সতী বেহুলা' ও 'ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ' ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়।

দেহত্যাগ

গভীর দুঃখের সহিত আমরা দুইজন সন্ন্যাসীর দেহত্যাগ-সংবাদ জানাইতেছি :

স্বামী শুদ্ধবোধানন্দ (পোন্নাপ্পন মহারাজ) গত ২৫শে মার্চ ১৯৭৮, অপরাহ্ণ ৫-১৫ মিনিটে ৬৫ বৎসর বয়সে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। ঐ দিনেই বেলা ২-৩০ মিনিটে ইনস্টিটিউট অব কালচার হইতে তিনি সেবাপ্রতিষ্ঠানে প্রেরিত হন। পাকস্থলী ও অন্ত্রের প্রদাহাদি রোগসহ হৃদ্‌যন্ত্রের অংশবিশেষে রক্তচলাচল ব্যাহত হওয়ায় তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯৩৫ সালে তিনি ত্রিচুড় আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৪৪ সালে তাঁহার গুরুর নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা প্রাপ্ত হন। তিনি কিয়ৎকাল বেলুড় মঠে কর্মী ছিলেন এবং চেরাপুঞ্জি, কিশেনপুর ও তিরুভেল্লা কেন্দ্রের অধ্যক্ষরূপে কাজ করেন। চেরাপুঞ্জিতে দুইদশকব্যাপী তাঁহার অবস্থানকালে আশ্রমের দ্রুত প্রসার ঘটে। ১৯৬৯ হইতে তিনি ত্রিচুড়ে অবসর যাপন করিতেছিলেন। অকৃত্রিম ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

স্বামী বিশ্ববেদানন্দ (বিমল মহারাজ) গত ২৭শে মার্চ ১৯৭৮, বেলা ১১-১৮ মিনিটে ৭২ বৎসর বয়সে সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। কর্কটরোগাক্রান্ত দক্ষিণ মূত্রগ্রন্থিতে অস্ত্রোপচারের পর শ্বাস ও হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া ব্যাহত হওয়ায় তাঁহার দেহান্ত হয়। তিনি বিগত কয়েকমাস যাবৎ অসুস্থ ছিলেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ১৯৩৫ সালে বেলুড় মঠে যোগদান করেন। ১৯৪৫ সালে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের নিকট তিনি সন্ন্যাসদীক্ষা প্রাপ্ত হন। তিনি কাটিহার, পাটনা, বেলুড় মঠ, এলাহাবাদ, নূতন দিল্লী, বৃন্দাবন, বাঁকুড়া, এবং রায়পুর কেন্দ্রে কর্মী এবং ক্ষেত্রী কেন্দ্রে ১৯৬৫ হইতে ১৯৬৯ পর্যন্ত অধ্যক্ষ ছিলেন। কৃচ্ছ্রসাধন ও সাদাসিধা জীবনযাত্রার জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

ইঁহাদের দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক!

বিবিধ সংবাদ

উৎসব

কল্যাণী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘের নবনির্মিত গৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজ গত ১৫ই জানুআরি, ১৯৭৮। ভাবগম্ভীর পরিবেশে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন এবং অপর প্রকোষ্ঠে স্থাপিত গ্রন্থাগার ও দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয় পরিদর্শন করেন।

অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত জনসভায় অধ্যাপক গৌরাঙ্গ চৌধুরী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘের ইতিহাস ও কার্যবিবরণী পাঠ করেন। অতঃপর সভাপতি স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র জীবন ও তুলনাহীন ত্যাগের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন।

নব ব্যারাকপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদে গত ৫ই ফেব্রুআরি ১৯৭৮, শ্রীশ্রীসারদাদেবীর ১২৫তম আবির্ভাব-উৎসব মঙ্গলারতি স্তব প্রার্থনা ভজন, শ্রীশ্রীমায়ের কথা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রভৃতি গ্রন্থপাঠ ইত্যাদির মাধ্যমে পালিত হয়। সন্ধ্যায় স্বামী যোগস্থানন্দের সভাপতিত্বে একটি ধর্মসভা হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী নির্লিপ্তানন্দ।

আসানসোল মহীশিলা কলোনী সারদাসঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব গত ৫ই ফেব্রুআরি ১৯৭৮, মঙ্গলারতি প্রভাতফেরী বিশেষ পূজা শ্রীশ্রীমা ঠাকুর ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা গীতা ও চণ্ডী পাঠ অখণ্ড নামসংকীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় আটশত নরনারী প্রসাদ পান। অপরাহ্নে জনসভায় সঙ্ঘের সম্পাদিকা শ্রীমতী আভা চক্রবর্তী বার্ষিক কার্যবিবরণী পাঠ করেন এবং সভানেত্রী শ্রীমতী নীহারবালা বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের কথা আলোচনা করেন। জননী সারদা সম্বন্ধে একটি কথিকাও পরিবেশিত হয়।

রাজারহাট বিষ্ণুপুর (২৪ পঃ) শ্রীরামকৃষ্ণ নিরঞ্জনানন্দ আশ্রমের নিরঞ্জনধামে গত ৫ই মার্চ ১৯৭৮, শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দ মহারাজের ১১৫তম জন্মতিথি তীর্থ-পরিক্রমা, পূজা, হোম, কীর্তন, ঈশ্বরপ্রসঙ্গ, নারায়ণসেবা, প্রসাদবিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে পালিত হয়। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় ভাষণ দেন অধ্যাপক ডক্টর গৌরমোহন মুখোপাধ্যায় ও সভাপতি স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ। সভান্তে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সৌজন্যে 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়। 'স্মরণিকা'-নামে একটি স্মারক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়।

আমতলী (ত্রিপুরা) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ১০ই, ১১ই ও ১২ই মার্চ ১৯৭৮, ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪৩তম আবির্ভাব-উৎসব পালিত হয়।

১০ই প্রত্যূষে মঙ্গলারতি ও পরে চণ্ডীপাঠ ও ষোড়শোপচারে পূজা, অপরাহ্নে কথামৃতপাঠ, সন্ধ্যায় আরাত্রিক ভজন ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও প্রবচন আলোচনার পর একটি ধর্মমূলক

ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়। ১১ই প্রত্যূষে মঙ্গলারতি ভজন ও তৎপরে উপনিষৎ পাঠ হয়; সন্ধ্যায় আরাত্রিক কথামৃতপাঠ ভজন এবং স্বামীজীর জীবন ও উপদেশ অনুধ্যান ও তৎপরে রামায়ণ-গান হয়। ১২ই মঙ্গলারতি ভজন শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতিসহ সঙ্গীত ও নগরপরিক্রমা যোড়শোপচারে পূজা হোম গীতাপাঠ ও কীর্তন হয়। পূজান্তে চারিসহস্রাধিক লোক খিচুড়ি প্রসাদ পান। অপরাহ্নে সাধারণ সভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে ভাষণ দেন শ্রীমতী অপরাজিতা রায়, শ্রীতেজেন্দ্রমোহন আচার্য ও শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত। সভাপতি ছিলেন শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত। সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি ও কথামৃত পাঠ হয়।

কোনাবন (পঃ ত্রিপুরা) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে গত ১০ই হইতে ১২ই মার্চ ১৯৭৮, ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪৩তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

১০ই মঙ্গলারতি, ভজন, কীর্তন, প্রভাত-ফেরী, বিশেষ পূজা, হোম ভোগরাগাদি হয়। সন্ধ্যারতির পর শ্রীশ্রীঠাকুরসম্বন্ধীয় ছায়াচিত্র-প্রদর্শন ও বক্তৃতা হয়। ১১ই সাধারণ সভা, ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা, শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী বিষয়ক গান, আবৃত্তি, প্রবন্ধপাঠ, তৎপরে পুরস্কারবিতরণ হয়। ১২ই কীর্তন ও প্রসাদবিতরণ হয়। প্রায় আড়াই হাজার ব্যক্তি প্রসাদ পান।

ধামরাজ *রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটিতে* গত ১০ই মার্চ ১৯৭৮, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪৩তম আবির্ভাব-তিথি বিশেষ পূজা হোম চণ্ডীপাঠ ইত্যাদির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। বহু দরিদ্রনারায়ণ ও ভক্ত বসিয়া প্রসাদ পান। পরবর্তী দুই দিনের ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ভাষণ দেন স্বামী নির্জরানন্দ, স্বামী উমানন্দ, স্বামী ভর্গানন্দ ও ডক্টর রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

পরলোকে

মেদিনীপুর জেলার ছেনেগড় গ্রামের **লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহ** গত ৬ই আগষ্ট ১৯৭৭, সকাল ৭-১০ মিনিটে নিজ বাসভবনে ৯৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। ১৯০৭ সালে জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট তিনি দীক্ষালাভ করেন।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য **মহিম চন্দ্র দত্ত** গত ১৯শে মার্চ ১৯৭৮, রাত্রি ১১-১৫ মিনিটে মেদিনীপুরস্থ নিজ বাসভবনে ৮৮ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে শ্রীশ্রীমাকে স্মরণ করিতে করিতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯১২ সালে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের নিকট দীক্ষালাভ করেন। তিনি সত্যনিষ্ঠ এবং আজীবন নিয়মিত জপধ্যানপরায়ণ ছিলেন। মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সহিত তাঁহার নিবিড় সংযোগ ছিল।

ইঁহাদের দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক!

ভিন্নভিন্নরূপ ব্যবস্থা আবশ্যক হইয়া থাকে।

এক্ষণে বুঝিতে হইবে, বৈরাগ্যভাব বা তৎপ্রসূত বিচার একটি মানসিক ব্যাপারবিশেষ। মনে মনে যথার্থ এইরূপ বিচার যতক্ষণ না প্রকৃতরূপে উদিত হয়, ততক্ষণ বাহ্য বৈরাগ্য অবলম্বন কষ্টের কারণ মাত্র। আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, এই বিচারবুদ্ধি সকলের অন্তঃকরণে উদিত হইলে অতি শুভফল উৎপাদন করে ও ইহাই আমাদের বিবেচনায় সকল সমাজের একমাত্র আদর্শ হওয়া উচিত; কিন্তু কিরূপে এই ভাব প্রকৃতরূপে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, তাহা স্বতন্ত্র কথা। সকলেই জানেন, কুরুক্ষেত্র-সমরে অর্জ্জুন যুদ্ধে অনিচ্ছাপ্রকাশ করিলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নানাবিধ উপদেশের দ্বারা পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত করেন। সেই সকল উপদেশ এক্ষণে 'গীতা' নামে সর্ব্বত্র পরম সমাদরে পূজিত হইয়া থাকে। যুধিষ্ঠিরেরও একসময়ে এইরূপ বৈরাগ্যোদয় হওয়াতে তাঁহার ভ্রাতৃগণ, বেদব্যাস ও শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত নানাবিধ উপদেশ দিয়াও তাঁহাকে রাজ্য করিতে প্রবৃত্ত করিতে না পারিলে পরিশেষে শরশয্যাশায়ী পরমযোগী ভীষ্ম তাঁহাকে নানাবিধ উপদেশ দিয়া পরিশেষে রাজ্যশাসনে সম্মত করেন। এইসকল এবং এতত্তুল্য সহস্র সহস্র উদাহরণ ও আমাদের দৃষ্টিগোচর সহস্র সহস্র ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিলে আমরা পূর্ব্বোক্ত সন্দেহের মীমাংসায় উপনীত হইতে পারি।

সাংখ্যদর্শন পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ নামক তিনটী দ্রব্যে জগৎ নির্ম্মিত। এই তিনটী পদার্থ নির্গুণ পুরুষকে গুণ অর্থাৎ রজ্জুর ন্যায় আবদ্ধ করে বলিয়া ইহাদিগকে গুণ বলে। কি জড়-জগতে, কি পশু-জগতে, কি মনুষ্য-জগতে সর্ব্বত্রই অল্পাধিক পরিমাণে এই তিনটী গুণের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের মধ্যে কেহ তমোগুণপ্রধান, কেহ বা রজোগুণপ্রধান, কেহ বা সত্ত্বগুণপ্রধান। তমঃপ্রধান ব্যক্তিতে আলস্য, মোহ, নিদ্রা প্রভৃতি অধিক পরিমাণে, রজোগুণী ব্যক্তিতে কার্য্যপ্রবৃত্তি, লোভ ইত্যাদি অধিক পরিমাণে ও সত্ত্বগুণী ব্যক্তিতে শম, দম, বিবেক, বৈরাগ্য ইত্যাদি গুণ অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। তমোগুণী ব্যক্তি রজোগুণ দ্বারা তমোগুণের অপনোদন করিয়া পরে সত্ত্বগুণের দ্বারা রজোগুণকে জয় করিবেন, তৎপরে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি ও নির্গুণ পুরুষের পার্থক্যবিচার দ্বারা আপনাকে নির্গুণরূপে জানিতে পারিলেই কৈবল্য বা মুক্তিলাভ করিবেন। ইহাই মুক্তিলাভের ক্রম বা সোপান।

এই তত্ত্বটী আরও পরিষ্কাররূপে বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। ইহার মধ্যে সাধারণের বুঝিবার ভুল হয় এইটুকু যে, তাঁহারা তমোগুণ ও সত্ত্বগুণে তাদৃশ পার্থক্য করিতে পারেন না, ইহার কারণ উহারা বাহিরে দেখিতে একই প্রকার। তমোগুণী ব্যক্তি জড়ের ন্যায় উদ্যমহীন হয়, পরিবারের ভরণ-পোষণ পর্য্যন্ত করিতে বা নিজ অবস্থার উন্নতি করিতে তাদৃশ যত্ন করে না; সত্ত্বগুণী ব্যক্তিও তদ্রূপ। তবে পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য এই—তমোগুণী ব্যক্তির অভাব অনন্ত। সে সেই অভাব পূর্ণ করিবার ক্ষমতা নাই বলিয়াই নিরুদ্যম হয়। সত্ত্বগুণী ব্যক্তির অন্তরে সর্ব্বদা শীতলতা বিরাজমান, তাঁহার অভাব নাই বলিলেই হয়। একজন আমাকে প্রহার করিল। করিবামাত্র আমার মনে মনে ইচ্ছা হইল, আমি তাহার উপযুক্ত শাস্তিবিধান করি। কিন্তু শারীরিক দুর্ব্বলতাবশতঃ তাহা পারিলাম না। অপরে ভাবিল, আমি বড় সাধু পুরুষ,

(বৈশাখ, ১৩৮৫, পৃঃ ২১৩)

[পুনর্মুদ্রণ]

কিন্তু আমি নিজে মনে মনে বুঝিতেছি, আমি কতদূর সাধু। সত্ত্বগুণী ব্যক্তির তাহা নহে, প্রহারিত হইলেও তাঁহার মনে কোন উদ্বেগ হয় না, প্রতিশোধের শক্তি থাকিতেও তিনি ক্ষমা করেন।

এক্ষণে আমরা বুঝিলাম যে, যদিও আমাদের চরম লক্ষ্য—বিবেক ও বৈরাগ্য, তথাপি সকলের পক্ষে উহা লাভের উপায় এক নহে। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, আমরা কে কিরূপে কার্য্য করিব, তাহা স্থির করিবার উপায় কি, তাহা হইলে এইমাত্র বলা যাইতে পারে, ইহার উপায় আত্মপরীক্ষার দ্বারা জ্ঞাত অন্তর্য্যামীর প্রেরণা অথবা সদ্‌গুরুর উপদেশ মতে কার্য্য করা।

আজকাল সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য আশ্রম লইয়া নানা স্থানে নানাবিধ তর্কবিতর্ক শুনা গিয়া থাকে। অনেকে বিবাহ করিয়া সন্তানোৎপাদনাদিকে ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহারা আপনারাও সেই মতানুসারে চলেন ও অপর সাধারণকে তদনুসারে চলিতে উপদেশ দেন। আবার কাহারও কাহারও নিকট কামিনী-কাঞ্চনের হেয়ত্ব ও ইহাদিগকে ত্যাগ করিতে না পারিলে কিছুই হইবে না, শুনিতে পাওয়া যায়।

আমরা জানি, ভগবান রামকৃষ্ণদেব কতকগুলি ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে স্পষ্ট নিষেধ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে অনুমতি করিয়াছেন। আবার অনেককে বলিতেন, বিবাহ করিয়া সংসার কর। এ রহস্যের মীমাংসা কি? যদি সকলে সন্ন্যাসী বা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারী হয়, তবে ১০০ বৎসরের মধ্যে মানবসমাজ একেবারে ধ্বংস হইবে; সৃষ্টিকর্ত্তার ইহা কি কখন অভিপ্রেত হইতে পারে? আমরা এ সম্বন্ধে গুরুকৃপায় এইটুকু বুঝিতে পারিয়াছি যে, সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রায় যাহাই হউক, কিন্তু বিবেকবৈরাগ্য ও তল্লাভের প্রকৃষ্ট উপায় নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য মনুষ্যসমাজের, শুধু তাহা নহে, সমগ্র জগতের পূর্ণ আদর্শ। আমাদের ঈশ্বরকে আমরা শুদ্ধমপাপবিদ্ধং বলিয়া জানি এবং তাঁহার সন্তানেরাও সর্ব্বাংশে তাঁহার মত শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ হউক, ইহাও তাঁহার অভিপ্রায়; ইহাই আমাদের, শুধু আমাদের নহে, সর্ব্বদেশের অবতার, সিদ্ধপুরুষ ও মহাপুরুষগণের মত। তবে এই আদর্শে পঁহুছিতে গেলে তাহার অনেক সোপান আছে। এক্ষণে ইহা আদর্শমাত্র; কার্যে পরিণত কখন হইবে কি না, তাহাতেও বিশেষ সন্দেহ। তবে একটী মহৎ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সেই দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইবার চেষ্টা করা ব্যতীতও মানবের উপায়ান্তর নাই। আমাদের বোধ হয়, বিবাহক্রিয়া পশু অবস্থা হইতে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যে আরোহণ করিবার একটি সোপানমাত্র। এই হিসাবে ইহাকে ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু যদি কেহ বিবাহের পবিত্রতা ঘোষণা করিতে গিয়া পূর্ণব্রহ্মচর্য্যকে তাহার প্রকৃত পদ প্রদান করিতে অস্বীকৃত হয়, তাহাকে কি বলা যাইবে?

এই অধিকারভেদবাদের দ্বারা সাধনসম্বন্ধীয় অনেক জটিল প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে আর ইহা হিন্দুধর্ম্মের একটি বিশেষত্ব। হিন্দুধর্ম্মে সামান্য ষষ্ঠী মাকালের পূজা হইতে নিগু' ব্রহ্মজ্ঞান পর্য্যন্ত রহিয়াছে। মানুষ অধিকার অনুসারে ইহার কোন না কোনটি অবলম্ব' করিয়া মুক্তির পরম সহায় বিবেক বৈরাগ্য লাভ করিতে পারে।

(৮০তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ২১৪

বিবেক বৈরাগ্য কি, তাহা পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে, বিবেক বৈরাগ্যে অধিকার কাহার, তাহারও কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত করা গেল, এক্ষণে তল্লাভের উপায়সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিয়া আমরা প্রবন্ধ শেষ করিব।

(১) ভোগ—Experience.

(২) বিচার।

(৩) ভক্তি দ্বারা ব্রহ্মানন্দ ভোগ।

(৪) সাধন বা অভ্যাসযোগ।

ভগবান রামকৃষ্ণদেবকে বিবেক বৈরাগ্যলাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কাহাকেও কাহাকেও বলিতেন, "কিছুদিন আমড়ার অম্বল খেয়ে আয়" অর্থাৎ বিষয়ভোগ কর্। কাহাকেও বলিতেন, এই দেহটা হাড় চামড়া মাস, ইহার ভিতরে মলমূত্র প্রভৃতি রহিয়াছে, এই সকল ভাবিলে ক্রমশঃ বিবেকোদয় হয়। আবার কাহাকেও বা বলিতেন, সচ্চিদানন্দকে যে সম্ভোগ করে, তাহার আর কি সামান্য বিষয়রস ভাল লাগে? কাহাকেও বা কোন বিশেষ সাধন অভ্যাসে দৃঢ়নিষ্ঠ হইয়া ভগবৎকৃপা প্রতীক্ষায় থাকিতে বলিতেন।

(১) আমরা দেখিতে পাই, এমন অনেক লোক আছে, যাহারা শত শত শাস্ত্র শ্রবণ করুক, শত শত সাধুর সহিত বাস করুক, কিছুতেই তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করে না। তাহাদের জন্য সময়ের প্রতীক্ষা করা উচিত। এক সময়ে যাহা অতি কঠিন বোধ হয়, অপর সময়ে তাহা অতি সহজ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যেমন বীজ বপন করিবার জন্য এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষা করিতে হয়, অনেকের পক্ষে এইরূপ সময়ের প্রতীক্ষা করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। তাহারা ভোগ ব্যতীত আর কিছু বুঝিতে পারে না—তাহাদের পক্ষে কিঞ্চিৎ বিচার পূর্ব্বক ভোগ করা আবশ্যক। ভোগে কি আছে, উহাতে সুখ কতটুকু, দুঃখই বা কতটুকু, এ সকল একবার মর্ম্মে মর্ম্মে বোধ না করিলে তাহাদের পক্ষে বৈরাগ্য লাভ বড় কঠিন হইয়া উঠে। জগতে এইরূপ প্রকৃতিই অধিকাংশ। অধিকাংশের জন্য, তাহারা যাহাতে উপযুক্তরূপ ভোগ করিতে পারে, তাহারই ব্যবস্থা হওয়া উচিত। আমাদের দেশ হইতে যোগ ও ভোগ উভয়ই একরূপ অন্তর্হিত হইয়াছে, যৎকিঞ্চিৎ যাহা আছে, তাহা যোগ ও অধিকাংশ যোগের ভান। ভোগ নাই বলিলেই হয়। এক্ষণে ইউরোপ আমেরিকা ভোগবিষয়ে ভয়ানক প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। তাহাদের ভোগের তুলনায় আমাদের দেশের মহাধনী পর্য্যন্ত অতি দরিদ্র বলিলেও বলা যায়। সুতরাং সাধারণের জন্য প্রথম ভোগের ব্যবস্থা না হইলে তাহারা কখন যোগের এক বিন্দুও আস্বাদ করিতে পারিবে না। সেই জন্য আমাদের দেশে সাধারণের জন্য কিছু কর্ম্ম-প্রবৃত্তির প্রয়োজন হইয়াছে। এক্ষণে লোকে যাহাতে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারে, যাহাতে অন্নের সংস্থান বর্দ্ধিত হইয়া ভবিষ্যৎ দুর্ভিক্ষাদির সম্ভাবনা কমিয়া যায়, যাহাতে উপযুক্ত স্বাস্থ্যবিদ্যার আবির্ভাব হইয়া মহামারী প্রভৃতির কারণ নির্ণয় ও তন্নাশের উপায় উদ্ভাবিত হয়, যাহাতে বাণিজ্য ও শিল্পের চর্চ্চা বর্দ্ধিত হইয়া দেশে লক্ষ্মী শ্রীর পুনরাবির্ভাব হয়, দেশের নেতৃগণের ও সমাজপতিগণের তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর্ত্তব্য। নতুবা সাধারণের পক্ষে বৈরাগ্য অর্থহীন শব্দবিশেষ, বিবেক উন্মত্তপ্রলাপসদৃশ। সংসার-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে

(বৈশাখ, ১৩৮৫, পৃঃ ২১৫)

পারিলে তবে সংসারত্যাগের কথা মুখে আনা সাধারণের শোভা পাইতে পারে।

(২) কিন্তু কতকগুলি ব্যক্তি আছেন,—তাঁহারা জন্মান্তরীণসুকৃতিসম্পন্ন। তাঁহাদের পক্ষে এই মহা দুর্গম, পিচ্ছিল, প্রতিক্ষণে পতনের সম্ভাবনাযুক্ত, বিভীষিকাপ্রদ পথের অনুসরণ করিবার আবশ্যক নাই। তাঁহারা একরূপ বুঝিয়াছেন, বিষয় কিছুই নহে, কিন্তু মন হইতে বিষয়-বাসনা যাইতেছে না। তাঁহাদের পক্ষে ভগবান এই শেষোক্ত তিনটি ব্যবস্থার অন্যতম ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে উপদেশ করিয়াছেন। যদি তুমি জ্ঞানপ্রধান প্রকৃতির লোক হও, যদি তোমার বিশ্লেষণে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকে, তবে ক্রমাগত খাইতে শুইতে বসিতে অহর্নিশি জগৎকে ও আপনাকে তন্নতন্নরূপে বিচার কর। এই বিচারসাগরে আপনাকে ডুবাইয়া দাও। জগতের কিছুই অমিশ্র নহে। সুবিশাল সূর্য্যমণ্ডল হইতে সামান্য কীটাণু পর্য্যন্ত সকল পদার্থ বা সকল প্রাণীই মিশ্র। এই মিশ্রণকে ভঙ্গ করিতে হইবে। এই মিশ্রণের অন্তরালে কি এক অনির্ব্বচনীয় অমিশ্র পবিত্র পদার্থ রহিয়াছে, তাহারই অন্বেষণ করিতে হইবে। মানুষ মিশ্রণেই আসক্ত হয়, মিশ্রণ ভঙ্গ করিয়া ফেলিলে আসক্তির কোন হেতু থাকে না। যতই মিশ্রণ ভঙ্গ হয়, ততই আসক্তির হেতু চলিয়া যাইতে আরম্ভ হয়, পরিশেষে উহা একেবারে অন্তর্হিত হয়। কোথায় আসক্তির উদ্দীপক, কামনার নিবাসভূমি রমণী, আর কোথায় কীটদষ্ট, পর্য্যুষিত, ধূলিধূসরিত সেই শবের ব্যবচ্ছিন্ন অবস্থা! কামী লোক এই শেষোক্ত চিত্রের দিকে অধিকক্ষণ চাহিয়া থাকিতে পারে না, বা চাহে না। সে সেই বিধাতার অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ বা মিশ্রণ-কৌশলে নির্ম্মিত পুত্তলিকাকেই নিরীক্ষণ করিতে ব্যগ্র হয়; ইহাকেই মোহ বলে। বিচারপরায়ণ পুরুষের এ মোহ অসম্ভব, কারণ তিনি বস্তুর অভ্যন্তরে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া তাহার গুপ্ততম রহস্য পর্য্যন্ত অবগত হন। অবিচারক পুরুষের জ্ঞান একদেশী, কিন্তু বিচারপরায়ণ পুরুষের জ্ঞান তাঁহার জ্ঞানের বিষয়ের সর্ব্বাংশকে ব্যাপিয়া থাকে। এইরূপে বিচার ক্রমশঃ অগ্রবর্ত্তী হইলে দেখা যায়, সমুদয় প্রকৃতিই সত্ত্ব রজঃ তমঃ পদার্থত্রয়ের মিশ্রণ। উহাদের অতীত পুরুষই যথার্থ সত্য বস্তু। ক্রমশঃ এই সত্ত্ব রজঃ তমঃ পদার্থত্রয়ও নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া সেই অনন্তপুরুষে বিলীন হইয়া যায়। ইহাই বিবেক-বৈরাগ্যের শেষ সীমা।

(৩) যাহাদের অন্তর স্বভাবতঃ ভাবপ্রিয়, তাহাদের পূর্ব্বোক্তপথকে আপাততঃ কিছু শুষ্ক বলিয়া বোধ হইতে পারে, সেইজন্য তাহারা উহা ততদূর ভালবাসে না। তাহারা চাহে কিছু অনুভব করিতে, কোন বস্তুতে মন প্রাণ সমর্পণ করিতে, কোন বস্তুর সৌন্দর্য্যে বিভোর হইতে, তাহাতে পাগল হইতে। কিন্তু তাহারা কাহাকে অবলম্বন করিয়া উন্মাদ হইবে? —আমরা নাটকাদিতে উন্মত্ত প্রেমিকদিগের কথা পাঠ করিয়া থাকি। সাধারণতঃ, এই প্রেম পুরুষ স্ত্রী লইয়া সঙ্ঘটিত হয়। এই প্রেমের এতদূর প্রভাব যে, মানুষকে হাসায়, কাঁদায়, নাচায়, গাওয়ায়, পাগল করে, প্রিয় বস্তুকে সর্ব্বত্র নিরীক্ষণ করায়, আহার নিদ্রা ত্যাগ করায়—সংক্ষেপতঃ মনকে তাহার একরূপ ভয়ঙ্কর অবস্থায় পরিণত করিয়া তোলে, তাহা যিনি ভুক্তভোগী তিনিই জানেন। ভগবান সচ্চিদানন্দে এই প্রেম ন্যস্ত করিতে হইবে। তিনি সকল সৌন্দর্য্যের মূল প্রস্রবণ, তাঁহা হইতে সকল আনন্দ, সকল ভালবাসা,

সকল ভাব উৎপন্ন হইয়াছে। "রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।" ফুলের সুগন্ধ, মলয়ানিলের সুখস্পর্শ, চন্দ্রের স্নিগ্ধকোমল কিরণ—সমুদয় রমণীয় সুন্দর পদার্থই সেই পরম সুন্দর দেবতার অঙ্গের কিরণমাত্র। সেই পরম সুন্দর দেবতাকে ভাল বাসিবে না? তাঁহাকে ভাল বাসিয়া হৃদয়ের ভালবাসা চরিতার্থ করিবে না? না, তাহা কি কেহ কখন পারে? সেই সৌন্দর্য্যে একবার আত্মহারা হইলে সমুদয় জগতে সেই পরম সুন্দররূপের ছটা দেখিয়া মন মুগ্ধ হইবে। এস ভাই, তবে সেই রূপসাগরে ঝাঁপ দিই। জাতি কুল মান ভুলিয়া তাঁহাতে ডুবিয়া ডুবিয়া তলাইয়া যাই। এস ভাই, সেই সচ্চিদানন্দসুন্দরের সুন্দর-রূপে মুগ্ধ হই। তখন কি আর অন্যরূপ ভাল লাগিবে? "সেরূপ যে দেখেছে, সে মজেছে, অন্যরূপ লাগে না ভালো।"

(৪) অনেকের পক্ষে কোন একটী অভ্যাস বিবেকবৈরাগ্যলাভের বিশেষ সহায় হইয়া থাকে। যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয়, যাঁহার যাহা ভাল লাগে, এমন একটি সাধনপ্রণালী লইয়া অথবা ভগবানের কোন একটি নাম লইয়া তোমার হৃদয়ে যতটুকু ভক্তি বা একাগ্রতা আছে, সমুদয় প্রয়োগ করিয়া সাধন করিতে থাক।

"শামুকের মত হও। প্রবাদ আছে যে, শামুক স্বাতিনক্ষত্রের একবিন্দু জল প্রাপ্তির আশায় পথ চাহিয়া থাকে। যখন এক বিন্দু এই জল পতিত হয় তখন জলের নীচে গভীর জলে চলিয়া গিয়া তাহা হইতে মুক্তা প্রস্তুত করিতে থাকে। তদ্রূপ হে সাধক, তুমি গুরুপ্রদত্ত মন্ত্ররূপ একবিন্দু জল লইয়া একবারে সাধনার অগাধ জলে নামিয়া যাও।"

"যতক্ষণ না সরকারি হাওয়া পাওয়া যায়, ততক্ষণ পাখার হাওয়া করিতে থাক। যতক্ষণ না মা তোমাকে আসিয়া হাত ধরেন, ততক্ষণ প্রাণপণে মায়ের হাত ধরিবার চেষ্টা কর। ক্রমশঃ ঈশ্বরকৃপায় বৈরাগ্য লাভ হইবে।"

এইরূপ ও অন্যান্য বিবিধ উপায়ে মানব বিবেক বৈরাগ্য লাভ করে ও পরিশেষে চরমাবস্থা মুক্তি লাভ করিয়া সর্ব্বপ্রকার সুখ দুঃখের শান্তিস্বরূপ নির্ব্বাণ লাভ করে।

ভারত-সঙ্গীত-সমাজ।

গত বসন্তপঞ্চমী-দিবসে ভারত-সঙ্গীত-সমাজে (১৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা) সারস্বত সম্মিলনের এক বিমল আনন্দস্রোত বহিয়াছিল। কলিকাতার অনেক গুণশালী সাহিত্যানুরাগী উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গীত-সমাজের সভ্যগণ, সকলকেই যার পর নাই আদর আপ্যায়ন করিয়াছিলেন। নানাবিধ কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত হইয়াছিল। পরিশেষে উক্ত সমাজের শিক্ষিত সভ্যগণ "গোড়ায় গলদ" নামক একখানি পুস্তিকা অতি স্বাভাবিকভাবে অভিনয় করেন। একটী ছোট খাট বঙ্গীয় সাহিত্যিক প্রদর্শনীও ছিল; নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল :—

ক। ১৪ রকম মহাভারত-পুঁথি—বিশ্বকোষ-কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রেরিত। প্রণেতাগণের নাম যথা :—

(১) কাশীরাম দাস (৯০৫ সাল); (২) তৎপুত্র নন্দরাম দাস (১১৬২);

(বৈশাখ, ১৩০৫, পৃঃ ২১৭)

(৩) তজ্জামাতা নিত্যানন্দ ঘোষ (১১৫১) ; (৪) কৃষ্ণানন্দ বসু (১০৯৯) ; (৫) গঙ্গাদাস সেন ; (৬) অভিরাম ; (৭) দ্বৈপায়ন দাস ; (৮) কবীন্দ্র পরমেশ্বর (পরাগলী) ; (৯) শ্রীকরনন্দী (ছুটি খাঁ) ; (১০) কবিচন্দ্র ; (১১) সারণ দাস ; (১২) সঞ্জয় কবীন্দ্র ; (১৩) রামচন্দ্র খাঁ ; (১৪) বিজয় পণ্ডিত।

খ। অন্যান্য পুঁথি—ঐ স্থান হইতে প্রেরিত : (১) কবিচন্দ্রের কৃষ্ণমঙ্গল (বিষ্ণুপুরের রাজকুমার চন্দ্র সিংহের লিখিত) ; (২) শ্রীগোপাল-সহস্রনাম ; (৩) নাগরী অক্ষরে সিদ্ধরতিকারিকা (সনাতন গোস্বামী) ; (৪) (নাগরী ও বাঙ্গলা) গোবিন্দলীলামৃত ; (৫) রসভক্তিচন্দ্রিকা।

গ। সাহিত্যপরিষদ্‌কার্য্যালয় হইতে পুঁথি।—(১) কবিকঙ্কণ চণ্ডী (১৭০৬ শক) ; (২) ঐ চণ্ডিকামঙ্গল ; (৩) রামনারায়ণের দুর্গামঙ্গল ; (৪) সঞ্জয় কবীন্দ্রের মহাভারত (১২২৩ সাল) ; (৫) রামাভিষেক। মুদ্রিত পুস্তক :—(১) কবিকঙ্কন চণ্ডী (১৮১৫) ; (২) Descriptive Catalogue of Bengali books by Rev. G. Long.

ঘ। মেট্‌কাফ হল হইতে :—(১) প্রতাপাদিত্যচরিত (৺রাম রাম বসু প্রণীত, ১৮০১, শ্রীরামপুর) ; (২) লিপিমালা (ঐ, ১৮০২, ঐ) ; (৩) বত্রিশ সিংহাসন (গদ্য, ১৮০২, ঐ) ; (৪) কাশীরাম দাসের মহাভারত (আদিপর্ব্ব, ১৮০২, ঐ) ; (৫) ভদ্রার্জ্জুন নাটক (১৭৭৪ শক)।

ঙ। শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয় হইতে :—আত্মতত্ত্বকৌমুদী (প্রবোধচন্দ্রোদয়ের অনুবাদ, ১২২৯) ; (২) ভূগোল ও জ্যোতিষ (১২৩৪) ; (৩) প্রাচীন ইতিহাস (১২৩৭) ; (৪) শব্দকল্পতরঙ্গিণী (১২৪৫) ; (৫) শিশুসেবধি (১২৪৭) ; (৬) প্রশ্নোত্তর-কৌমুদী (১২৫২) ; (৭) বিদ্যাকল্পদ্রুম (১২৫৬) ; (৮) গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১২৬১) ; (৯) বাঙ্গালার ইতিহাস (মার্সমান) ; (১০) দিগ্দর্শন (প্রথম মাসিকপত্র, শ্রীরামপুর)।

চ। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্রসমাজপতি-প্রেরিত পুঁথি :—(১) কৃষিপদ্ধতি (সংস্কৃত, পরাশরকৃত)।

ছ। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি প্রেরিত :—(১) সমাচারদর্পণ (প্রথম খণ্ড, ১৮১৮) ; (২) ৺রাজা রামমোহন রায়ের স্বাক্ষর (১০৪ বৎসর পূর্ব্বের)।

জ। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী কর্ত্তৃক প্রেরিত পুঁথি :—(১) গঙ্গারাম দত্তের উদ্বাহরণ (১৬৯৪ শক) ; (২) নরোত্তম দাসের প্রেমবিলাস।

মুদ্রিত পুস্তক :—(১) রামেশ্বরের শিবায়ন (১২৬০ সাল) ; (২) ভূমিপরিমাণবিদ্যা (১২৪৮) ; (৩) ৺রামমোহন রায়ের ব্যাকরণ (১৮৪০) ; (৪) ঐ, শ্যামাচরণ শর্ম্মা (১৮৫২) ; (৫) ঐ, ব্রজকিশোর গুপ্তের (১৮৫৫) ; (৬) সংস্কৃত সুলেমানী উপদেশ (১৮৫৭)।

ঝ। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত (বাগবাজার) প্রেরিত :—(১) কৃত্তিবাসী রামায়ণ (উত্তরকাণ্ড, ১৮০৩, শ্রীরামপুর) ; (২) মহারাজকৃষ্ণচন্দ্রের জীবনী (১৮১১, লন্ডন) ; (৩) বত্রিশ সিংহাসন (পদ্য, ১৮১২) ; (৪) পথ্যপ্রদান (রাজা রামমোহন রায়ের, —১৭৭০ শক) ; রোমিও জুলিয়েট (১২৫৫ সাল, গুরুদাস হাজরা) ; (৬) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (১২৫৮ সাল, প্রথম মুদ্রিত চৈতন্যচরিতামৃত) ; (৭) মালতীমাধব নাটক (১৭৮০ শক,

৺কালীপ্রসন্ন সিংহ) ; (৮) রাজাবলী (তৃতীয় সংস্করণ, ৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার) ; (৯) ১০০১ শকের শ্যামল বর্ম্মরাজা প্রদত্ত তাম্রশাসনের অনুলিপি।

ঞ।—শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রেরিত :—(১) প্রজ্ঞা পারমিতা (বৌদ্ধ গ্রন্থ) ; (২) মাদলা পঞ্জী (তালপাতায় লিখিত)।

ট। প্রভৃতি, প্রভৃতি।

পরোপকারের দৃষ্টান্ত।

দিন কতকের কথা হইল, কোন কার্য্য উপলক্ষে জনৈক ভদ্রসন্তানকে, পল্লীগ্রাম হইতে সস্ত্রীক, কলিকাতায় আসিতে হয়। নিজ পিতৃস্বসার বাটীতে উঠেন। আসিয়াই রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় তাঁহার স্ত্রী ভীষণ বিসূচিকা-রোগাক্রান্তা হন। পিসীমা তৎক্ষণাৎ বাটী হইতে বহির্ভূত করিয়া দেন। ভদ্রলোকটী কি করেন; সঙ্গে পাল্কী ক'রে স্ত্রীকে লইয়া সেইরাত্রে দুই একটী নিকট-আত্মীয় কুটুম্বের বাটী অন্বেষণ করিয়া তথায় আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। নানা-প্রকারের কপট কারণ দেখাইয়া, কেহই সে বিপন্ন নিরাশ্রয় দুইটীকে স্থান দিলেন না। অবশেষে, দূরসম্পর্কীয়া এক ভগিনীর বাটীতে আশ্রয় পাইলেন। রাত্রি ১২টা। রোগ তখন ক্রমশঃ সাংঘাতিক হইয়া আসিয়াছে।

ভগিনীটীর বাটী—শ্যামবাজারস্থ ট্রাম আস্তাবোলের সম্মুখে অপর ফুটপাথে এক ছোট-গলির ভিতর। পুরুষের মধ্যে সে বাটীতে,—দুইটী ভাই, আর বড় ভাইয়ের একটী ছোট পুত্র; স্ত্রীলোকের মধ্যে,—বৃদ্ধমাতা, দুই ভাইয়ের স্ত্রী এবং বড়ভাইয়ের একটী ছোট কন্যা। বড় ভাইটী চাকরি করেন বটে, কিন্তু অতি গরিব। বাড়ীটি খুব ছোট; দুটি ভাইয়ের দুটিমাত্র ঘর। মহা বিপদগ্রস্ত দেখিয়া ছোট ভাইটি অভ্যাগতদ্বয়কে নিজের ঘরখানি সেইরাত্রে কোনও রকমে ছাড়িয়া দিলেন; ইনিই বিপন্ন অভ্যাগত ভদ্রলোকটির ভগ্নীপতি। স্থান দিয়াই, তৎক্ষণাৎ সেই রাত্রে তাঁহাদিগের জন্য ডাক্তার বৈদ্যপ্রভৃতির বাটীতে ছুটিতে লাগিলেন। পাঠক মহাশয়, এক্ষণে, ধৈর্য্য ধরিবেন; পরে যে সকল ঘটনা উল্লেখ করিব তাহাতে বিচলিত হইবেন না।

শেষ রাত্রিতে, বড় ভাই, বড় ভাইএর স্ত্রী ও বড়ভাইএর কন্যা, তিনজনে একসঙ্গে ঐ রোগে আক্রান্ত হন। বেলা আড়াইটার সময় কন্যাটির আয়ুরবসান হইল। ভ্রাতৃকন্যাকে দাহ করিয়া আসিয়াই দেখেন বড় বধূটিও গত হইয়াছেন। বড় বধূর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিয়া আসিয়া দেখেন আবার, বড় ভাই মৃত্যুমুখে পতিত। বাটীতে একমাত্র বড় ভাই যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিতেন; ছোট ভাইএর কর্ম্ম তখন ছিল না। উপর্য্যুপরি তিনটির প্রাণবিয়োগ হইল। বাটীর কর্ত্তা, যিনি বড় ভাই, তাঁহারও মৃত্যু হইল; তত্রাচ সেই বিপন্ন স্বামী ও স্ত্রীটি যাঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়াই এই সকল বিপদ ঘটিল, তাঁহাদিগের প্রতি, সে বাড়ীর লোক কেহই অসন্তোষের চিহ্ন কোনওরূপ দেখান নাই।

অভ্যাগত স্ত্রীলোকটির ক্রমশঃ জীবনলাভের আশা হইল। কিন্তু এ ধারে, ইঁহাদিগের যে পরোপকারের পুরস্কার শেষ হইল তাহা নহে। ইতিমধ্যে বড়ভাইএর পুত্রটিকে, বালকের মাতুলগণ আসিয়া তাঁহাদিগের বাটীতে, সরাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। বাটীতে অবশিষ্ট রহিলেন

(বৈশাখ, ১৩৮৫, পৃঃ ২১৯)

—বৃদ্ধমাতা, সেই ছোট ভাই ও তাঁহার স্ত্রী। গত বৎসরে বৃদ্ধ মাতার সাঙ্ঘাতিক হইয়াছিল, জীবনের আশা ছিল না; খাট পর্য্যন্তও আনা হইয়াছিল, গঙ্গাযাত্রা করান হইবে এমন সময়ে পুনর্জ্জীবিত হওয়াতে খাট ফিরাইয়া দেওয়া হয়।

যাহা হউক, ছোট ভাই সংসারের একমাত্র-আশ্রয়-জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে শ্মশানে লইয়া যাইলেন। এদিকে ছোটবধূ পুত্রশোকগ্রস্ত বৃদ্ধা শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে সান্ত্বনা করিতে করিতে নিজে রোগাক্রান্ত হইয়া দুই চারি ঘণ্টার মধ্যেই গতাসু হইলেন। একটি প্রতিবাসী আসিয়া সেই বৃদ্ধা শাশুড়ীকে নিজের বাটীতে লইয়া যাইয়া বিশেষ সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। ছোট ভাই শ্মশান হইতে বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন ভীষণ ব্যাপার—স্ত্রী মৃতা হইয়া ভূতলে পড়িয়া আছেন!—কখনই বা ব্যারাম হইল, কখনই বা মারা গেল!! তিন দিন ধরিয়া দিবা-রাত্র শ্মশান আর ঘর করিতেছেন, বাড়ীই একপ্রকার শ্মশান হইয়া গিয়াছে। বীরপুরুষ তখনও পরোপকার পরম ব্রত হইতে বিচলিত হন নাই। শোকাগ্নিতে হৃদয়সাগর শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল বটে—আর চক্ষু দিয়া জল পড়িত না বটে, কিন্তু তাঁর সে হৃদয়প্রশস্ততার কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই, বরং শতগুণে আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। নিজের যাহাই হউক, বিপন্ন আশ্রিতদ্বয়ের তত্ত্বাবধান তখনও লইতে কোনও মতে ত্রুটি করেন নাই। স্ত্রীলোকটীর রক্ষা পাইবার কিছু আশা হওয়াতেই তাঁহার স্বামী তাঁহাকে লইয়া স্বদেশে গমন করিলেন। এধারে ছোট ভাইটী পত্নীর মুখাগ্নি করিতে চলিলেন। শূন্য মনে প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন, বাটী শূন্য, চতুর্দ্দিক শূন্য, হৃদয় শূন্য। গাঢ় অন্ধকারময় বাটীতে একাকী। রাত্রি প্রভাত হইল। প্রতিবাসীর বাটীতে বৃদ্ধা মাতাকে দেখিতে যাইবেন এমন সময়ে নিজেই সেই কালরূপিরোগমুখে পতিত হইলেন। বোধ হয় তখন তাঁহার কার্য্য শেষ হইয়াছিল। আর তাঁহার জীবনের আবশ্যক ছিল না। হাঁসপাতালে যাইয়া একদিবস পরে তিনি ভবলীলা সাঙ্গ করিলেন!

চার পাঁচ দিনের মধ্যে একটী বাটীতে এতগুলি লোক বিসূচিকায় গত হইলেন; আশ্চর্য্য, পার্শ্বস্থ আর কোনও বাড়ীতে সে সংক্রামক রোগের সঞ্চার হয় নাই। রোগটী মহাকালবেশে যেন সেই বাটীর জন্যই আসিয়াছিল। যাহা বর্ণিত হইল—গল্প বা রঞ্জিত নহে; সমস্ত সত্য ঘটনা।

এক্ষণে, পাঠক মহাশয়, প্রধান দুই রকম চরিত্রের কথা শুনিলেন; একজন মৃত্যুর ভয়ে বা স্বজনের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায়, বিপন্ন ব্যক্তিকে আশ্রয় দিলেন না; আর একজন অনায়াসে নিজের প্রায় যাবতীয় পরিবারবর্গের প্রাণবিনিময়সত্ত্বেও একটী লোকের উপকার করিতে পশ্চাৎপদ হইলেন না। বলুন দেখি—দুইটির মধ্যে কোন্‌টী ন্যায় বা নীতি-সঙ্গত কার্য্য করিয়াছেন। কাহারও কাহারও মতে হয়ত প্রথম ব্যক্তিটিই ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু, যাঁহারা স্বাভাবিক পরহিতকারী, পরহিতকর্ম্মই যাঁহাদিগের পরমব্রত, পরহিতের নিকট ধন ও জীবন প্রভৃতি যথাসর্ব্বস্ব যাঁহাদিগের অতি তুচ্ছ বোধ হয়, তাঁহারা উল্লিখিত দ্বিতীয় ব্যক্তির কার্য্যকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। এক শ্রেণীর লোক হয়ত এসকল ঘটনা শুনিলে ঈশ্বরে দোষারোপ করিবেন। আর একশ্রেণীর ব্যক্তি বোধ হয় 'ঈশ্বরের পরীক্ষা' প্রভৃতি বাক্য বলিয়া ঈশ্বরের মাহাত্ম্য মজ্জায় মজ্জায় অনুভব করিবেন, এবং হৃদয়কে আরও অধিকতর প্রশস্ত করিয়া পরহিতকল্পে আরও দৃঢ়তর কটিবদ্ধ হইয়া, নিজ উন্নতিপথে ধাবমান হইবেন।

(৮০তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ২২০)

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

[উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১০% কমিশনে পাইবেন]

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ)

রেক্সিন বাঁধাই শোভন সংস্করণ : প্রতি খণ্ড—১৪৲ টাকা : পুরা সেট ১৩৫৲ টাকা
বোর্ড বাঁধাই সুলভ সংস্করণ : প্রতি খণ্ড ১০৲ টাকা

প্রথম খণ্ড— ভূমিকা : আমাদের স্বামীজী ও তাঁহার বাণী—নিবেদিতা, চিকাগো বক্তৃতা, কর্মযোগ, কর্মযোগ-প্রসঙ্গ, সরল রাজযোগ, রাজযোগ, পাতঞ্জল যোগসূত্র

দ্বিতীয় খণ্ড— জ্ঞানযোগ, জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদান্ত

তৃতীয় খণ্ড— ধর্মবিজ্ঞান, ধর্মসমীক্ষা, ধর্ম, দর্শন ও সাধনা, বেদান্তের আলোকে, যোগ ও মনোবিজ্ঞান

চতুর্থ খণ্ড— ভক্তিযোগ, পরাভক্তি, ভক্তিরহস্য, দেববাণী, ভক্তিপ্রসঙ্গে

পঞ্চম খণ্ড— ভারতে বিবেকানন্দ, ভারত-প্রসঙ্গ

ষষ্ঠ খণ্ড— ভাববার কথা, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, বীরবাণী, পত্রাবলী

সপ্তম খণ্ড— পত্রাবলী, কবিতা (অনুবাদ)

অষ্টম খণ্ড— পত্রাবলী, মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ, গীতা-প্রসঙ্গ

নবম খণ্ড— স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে, স্বামীজীর কথা, কথোপকথন

দশম খণ্ড— আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট, প্রবন্ধ (সংক্ষিপ্তলিপি-অবলম্বনে), বিবিধ, উক্তি-সঞ্চয়ন

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

কর্মযোগ— পৃঃ ১৪১, মূল্য ৪·০০
ভক্তিযোগ— পৃঃ ৯৬, মূল্য ২·৮০
ভক্তি-রহস্য— (ছাপা নই)
জ্ঞানযোগ— পৃঃ ২৯০, মূল্য ৮·৫০
রাজযোগ— পৃঃ ২১৪, মূল্য ৫·৬০
সন্ন্যাসীর গীতি— পৃঃ ২৩, মূল্য ০·৬৫
ঈশদূত যীশুখৃষ্ট— পৃঃ ২৯, মূল্য ০·৮০
সরল রাজযোগ— পৃঃ ৩৬, মূল্য ০·৫০
পত্রাবলী—প্রথমার্ধ— পৃঃ ৪০২, মূল্য ১০·০০
শেষার্ধ— পৃঃ ৪২৪, মূল্য ১০·৫০
রেক্সিন বাঁধাই (সমগ্র পত্র একত্রে, নির্দেশিকাদি সহ)—মূল্য ২৭·০০
ভারতীয় নারী— পৃঃ ৯৩, মূল্য ২·৪০
পওহারী বাবা— পৃঃ ১৮, মূল্য ০·৫০
স্বামীজীর আহ্বান— পৃঃ ৮০, মূল্য ০·৮০
ধর্ম-সমীক্ষা— পৃঃ ১৩০, মূল্য ২·৫০
বেদান্তের আলোকে (ছাপা নাই)

ভারতে বিবেকানন্দ—পৃঃ ৪২৪, মূল্য ১০·০০
দেববাণী— (ছাপা নাই)
শিক্ষাপ্রসঙ্গ— পৃঃ ২৬৮, মূল্য ৪·০০
কথোপকথন— পৃঃ ১৩৫, মূল্য ১·২৫
মদীয় আচার্যদেব— পৃঃ ৬২, মূল্য ০·৭৫
জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে— পৃঃ ১৪৩, মূল্য ২·০০
চিকাগো বক্তৃতা— পৃঃ ৫২, মূল্য ১·৫০
মহাপুরুষপ্রসঙ্গ— পৃঃ ১৩৪, মূল্য ৩·০০
হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত— (ছাপা নাই)

(স্বামীজীর মৌলিক [বাংলা] রচনা)

পরিব্রাজক— পৃঃ ১৩২, মূল্য ৩·০০
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য— পৃঃ ১৩৬, মূল্য ২·২৫
বর্তমান ভারত— পৃঃ ৪০, মূল্য ১·৭০
ভাববার কথা— পৃঃ ৯২, মূল্য ১·২০
বাণী-সঞ্চয়ন— পৃঃ ৩১৬, মূল্য ৭·০০
ধর্মবিজ্ঞান— পৃঃ ১২০, মূল্য ২·০০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০০০৩

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ — স্বামী সারদানন্দ। দুই ভাগ, রেক্সিন-বাঁধাই : মূল্য ১ম ভাগ ১৯·০০। ২য় ভাগ ১৭·০০
সাধারণ ১ম খণ্ড ৩·৫০; ২য় খণ্ড ৭·৮০; ৩য় খণ্ড ৫·২০; ৪র্থ খণ্ড ৭·০০; ৫ম খণ্ড ৭·৫০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন। সুললিত কবিতায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী। মূল্য ২৬·০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ-সংকলিত। মূল্য ১·৬০; কাপড়ে বাঁধাই ১·৮০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা— শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন। মূল্য ৩·৫০

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। মূল্য ২·৫০

শ্রীরামকৃষ্ণচরিত — শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী। (ছাপা নাই)

শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ—স্বামী নির্বেদানন্দ (অনুবাদ : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। পৃঃ ২৯৬; সাধারণ ৬·০০; হাফ-রেক্সিন। বোর্ড বাঁধাই. শোভন ৭·০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী—স্বামী তেজসানন্দ। পৃঃ ২০৮, মূল্য ৫·০০

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা—স্বামী অপূর্বানন্দ। (ছাপা নাই)

পরমহংসদেব—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু। (ছাপা নাই)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। (ছাপা নাই)

শিশুদের রামকৃষ্ণ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৪০, মূল্য ৩.০০

শ্রীশ্রীমা-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীমায়ের কথা—শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সন্তানগণের ডায়েরী হইতে। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। মূল্য ১ম ভাগ ৭·০০, ২য় ভাগ (ছাপা নাই)

মাতৃ-সান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ। পৃঃ ২৫৬। মূল্য ৬·০০ টাকা

শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের বিস্তারিত জীবনীগ্রন্থ। পৃঃ ৬৪২, মূল্য—১৭·০০

শিশুদের মা সারদাদেবী, (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৪০, মূল্য ৩·০০

স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয়

যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত স্বামীজীর প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। তিন খণ্ডে প্রকাশিত। মূল্য ১ম খণ্ড ১৬·০০; ২য় ও ৩য় প্রতি খণ্ড ৮·০০

স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীপ্রমথনাথ বসু। ১ম ভাগ (ছাপা নাই), ২য় ভাগ—মূল্য ৪·২৫

স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১৩৬, মূল্য ২·৫০

স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। ছেলেদের উপযোগী। পৃঃ ৬৪, মূল্য ০·৭০

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—(দুই খণ্ড একত্রে) শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। স্বামীজীর সহিত লেখকের কথোপকথন। পৃঃ ২৫৮, মূল্য ৭·০০

স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতা। (অনুবাদ : স্বামী মাধবানন্দ)। মূল্য ৮·০০

স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে—ভগিনী নিবেদিতা (বঙ্গানুবাদ)। পৃঃ ১২৪, মূল ১·২৫

শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। ৩য় সং, মূল্য ২·৫০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

বেদান্তের আলোকে খৃষ্টের শৈলোপদেশ—স্বামী প্রভবানন্দ। মূল্য সাধারণ ৪'০০,

অতীতের স্মৃতি—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। পৃঃ ৪৬৪ মূল্য ১০'০০

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ১৪২, মূল্য ৩'৭০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। পাঁচশতাধিক সঙ্গীত। মূল্য ৬'০০

ঠাকুরের নরেন, নরেনের ঠাকুর—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ২৯, মূল্য ১'২০

সংস্কৃত

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত।

১ম ভাগ পৃঃ ৪৫৪, মূল্য ১১'০০
২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৭'৫০
৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মূল্য ৭'৫০

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত, স্বামী জগদানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪৯৫, মূল্য ৭'৮০

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৬'৪০

স্তবকুসুমাঞ্জলি—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪০৮, মূল্য ৭'০০

বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা—স্বামী ধীরেশানন্দ-সংকলিত। (ছাপা নাই)

বৈরাগ্যশতকম্—স্বামী ধীরেশানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ১'৫০

যোগবাসিষ্ঠসারঃ—স্বামী ধীরেশানন্দ। (ছাপা নাই)

বিবেকচূড়ামণি—স্বামী বেদান্তানন্দ-সম্পাদিত। (ছাপা নাই)

নারদীয় ভক্তিসূত্র—স্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ১৬৩, মূল্য সাধারণ ৫'০০, শোভন ৭'৫০

বেদান্তদর্শন—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য : ১ম অধ্যায় (চারখণ্ডে) ১৭'০০ ; ২য় অঃ ১৩'০০ ; ৩য় অঃ ১৩'০০ ; ৪র্থ অঃ ৯'০০

গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা—স্বামী রঘুবরানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য ১'৮০

শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজাপদ্ধতি—
পৃঃ ৬৪, মূল্য ১'৫০

সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-অনূদিত। (ছাপা নাই)

অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—সুরেশ দত্ত। মূল্য ৫'০০

পরমহংসদেব—স্বামী প্রেমেশানন্দ। পৃঃ ২৪, মূল্য ০'৫০

জননী সারদাদেবী—স্বামী নির্বেদানন্দ। (অনুবাদক : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। মূল্য ২'৮০

শ্রীশ্রীমা সারদা—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৯০, মূল্য ২'০০

গল্পে বেদান্ত—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ পৃঃ ১২৮ ; মূল্য সাধারণ ২'৫০, বোর্ড বাঁধাই ৩'০০

বীরবাণী—স্বামী বিবেকানন্দ। পৃঃ ১১৪ ; মূল্য ২'০০ (যন্ত্রস্থ)

ছোটদের বিবেকানন্দ—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৭২, মূল্য ০'৫০

বিবেকানন্দের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। পৃঃ ১৫৪, মূল্য ৩'২৫

প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩

Udbodhan—Phone : 55-2447 APRIL 1978 Regd. No. WB/NC-19

COVER PRINTED BY:—

৮০।৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্ট্রীগণের পক্ষে স্বামী বন্দনানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত।

সম্পাদক—স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ : সংযুক্ত সম্পাদক—স্বামী ধ্যানানন্দ

বাৰ্ষিক মূল্য ১২·০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১·২০ টাকা

উদ্বোধন

উত্তিষ্ঠত
জাগ্রত
প্রাপ্য
বরান্
নিবোধত



উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়; ৮০তম বর্ষ হইতে **বার্ষিক মূল্য সডাক ১২৲ টাকা, ষাণ্মাষিক ৭৲ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে ৩৩৲ টাকা, এয়ার মেল-এ ১০১৲ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ১.২০ টাকা। নমুনার জন্য ১.২০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সাত দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে; তাহার পরে চাহিলে পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হইবে না।

রচনা :—ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা প্রবন্ধ ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌঁছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহকনম্বর পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময়: সকাল ৭৷৷০টা হইতে ১১টা; বিকাল ৩টা হইতে ৫।০টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০০০৩

উদ্বোধন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৫

সূচীপত্র

আমি কি আর উপদেশ দেব! ঠাকুরের কথা সব বইয়ে বেরিয়ে গেছে। তাঁর একটা কথা ধারণা করে যদি চলতে পার তো সব হয়ে যাবে।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

উদ্বোধনের মাধ্যমে
প্রচার হোক
শ্রেষ্ঠ বাণী । শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়



দিব্য বাণী

উপনীতবয়ো চ দানিসি
    সম্পয়াতো'সি যমস্‌স সন্তিকে।
বাসো'পি চ তে নত্থি অন্তরা
    পাথেয্যম্পি চ তে ন বিজ্জতি॥

সো করোহি দীপমত্তনো
    খিপ্পং বায়াম পণ্ডিতো ভব।
নিদ্ধন্তমলো অনঙ্গণো
    ন পুন জাতিজরং উপেহিসি॥

—ধম্মপদ : মলবগ্‌গো, ৩, ৪

এখন তোমার হয়েছে বয়স, মৃত্যু নিয়েছে পিছু
পথের মাঝারে নাহি আশ্রয়, পাথেয় না আছে কিছু।
নিজ আশ্রয় করো প্রতিষ্ঠা, শীঘ্র যত্ন করো
হও বিদ্বান্ (হও মহীয়ান্, জ্ঞানের প্রদীপ ধরো ।
হ'লে নির্মল কল্মষহীন, পুনরায় এই ভবে
হবে না জন্ম জরা ব্যাধি তব (আনন্দে সদা রবে)।

কথাপ্রসঙ্গে

ভগবান বুদ্ধ

এবার জ্যৈষ্ঠ মাসের ৭ তারিখে ভগবান বুদ্ধের জন্মতিথি। তিথি অনুযায়ী বৈশাখী পূর্ণিমা এই পুণ্যদিন। এই দিন ত্রিধন্য—এই দিনেই ভগবানের জন্ম, বোধিলাভ এবং মহাপরিনির্বাণ।

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই দুই শ্রেণীর শক্তিমান পুরুষ পৃথিবীর জীবনকে আলোড়িত করিয়াছেন। এক শ্রেণীর পুরুষ আলেকজাণ্ডার, চেঙ্গিজ খাঁ, তৈমুরলঙ্গ, নাদির শাহ, নেপোলিয়ান, হিটলার প্রভৃতি। ইঁহারা স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া শক্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভের প্রলোভনে পৃথিবীর বুকের উপর রক্তের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন; হত্যা, নারীর অমর্যাদা, শিশুর প্রতি দানবিক অত্যাচার করিয়া ইঁহারা মানবতাকে কলঙ্কিত করিয়াছেন এবং সংসারের ভিতর নারকীয় বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছেন। অথচ ইঁহাদের জন্মকর্মই ইতিহাসের প্রধান অনুজীব্য। ঐতিহাসিকগণ ইঁহাদের অনেককে 'মহান্' (Great) আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। মানবের মূল্যবোধের ইহা দুঃখজনক নিদর্শন।

অপর দিকে অন্য শ্রেণীর মহামানব—বুদ্ধ, খৃষ্ট, শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি। ইঁহাদের অভিগমন-পথে শান্তির প্রবাহ, শ্রীমুখনিঃস্যন্দিনী বাণী-প্রবাহিণীতে অমৃতের আশ্বাস, আঁখির করুণানির্ঝরে ইন্দ্রিয়ানুগ জীবনের উর্ধ্বলোকে উত্তরণের আহ্বান। ইঁহারাই ইতিহাসপুরুষ, ইঁহারাই যথার্থ 'মহতো মহীয়ান্'—যদিও ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুরূপে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ইঁহাদের জীবনালোচনা স্বল্লায়ত।

ঐতিহাসিক যুগে যে-সকল মহামানব মনুষ্যজীবনে রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শের মরজীবনকে অতিক্রম করিয়া অমৃতলোকের দিশারী হইবার জন্য ব্যষ্টিগত এবং সমষ্টিগত জীবন-চেতনাকে নিজেদের জীবনের ভাস্বর অধ্যাত্মালোকে পথনির্দেশ করিয়াছেন, ভগবান বুদ্ধ তাঁহাদেরই অন্যতম। ভগবান বুদ্ধ যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে যুগে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের অর্থহীন অনুষ্ঠান এবং বিধি-নিষেধের বন্ধন জীবনকে দুঃসহ এবং দুর্ভর করিয়া তুলিয়াছিল। উপনিষদের শিক্ষা ছিল রহস্যবিদ্যা—জনসাধারণের নিকট তাহা ছিল অপ্রাপ্য। সাধারণ মানুষের জীবন ছিল দুঃখময় এবং অজ্ঞানাবৃত।

ভগবান এই দুঃখের অভিসংঘাতেই নূতন অভীপ্সায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইয়াছিলেন। আড়ারকালাম এবং রামপুত্র উদ্দকের নিকট যোগাদি শিক্ষা করিয়াও সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেন না। উরুবেলার অরণ্যে কৃচ্ছ্রসাধনে কয়েক বৎসর অতিবাহিত— তাহাতেও সমস্যার সমাধান হইল না। শেষে গয়া শহরের অনতিদূরে একটি অশ্বত্থবৃক্ষমূলে ধ্যানমগ্ন হইলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন জ্ঞানলাভ না করিয়া 'নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে'—এই আসন হইতে শরীরকে সরাইয়া লইব না। সহসা মাহেন্দ্রক্ষণে সমস্ত মনকে উদ্ভাসিত করিয়া বোধির প্রকাশ হইল—শাক্যবংশের সিদ্ধার্থ

বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন। তদবধি ঐ বৃক্ষটি 'বোধিদ্রুম' এবং উক্ত স্থানটি 'বোধগয়া' নামে খ্যাত।

কি আনন্দ, কি আনন্দ! দুঃখ বিদূরিত, অজ্ঞান পর্যুদস্ত, 'অচ্চুতং ঠানং' প্রাপ্ত। সিদ্ধির আনন্দে তিনি একুশদিনব্যাপী সাধনস্থলে 'চংক্রমণ' পাদচারণা করিলেন। পুনরায় ধ্যানের গভীরতায় ডুবিয়া যাইবার পূর্বে তাঁহার মনে জগতের আর্তক্রন্দন ভাসিয়া আসিল: সংসার জ্বলিতেছে, হে মহান্ তোমার কি নিজের মুক্তিতে মগ্ন থাকা উচিত? পরিত্যাগ কর নিজের নির্বাণবাসনা। যে অমৃতস্পর্শ তাঁহাকে অভিষিঞ্চিত করিয়াছে তাহারই স্পর্শে সমগ্র জগৎ সঞ্জীবিত হউক—এই ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইল। সহম্পতি ব্রহ্মাও তাঁহাকে ব্রহ্মলোক হইতে আসিয়া অনুরোধ জানাইলেন।

উরুবেলা হইতে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া তিনি মৃগদাবে (সারনাথে) উপস্থিত হইলেন। এইখানেই তিনি ধর্মচক্র প্রবর্তন করিলেন পাঁচটি পূর্ব শিষ্যকে তিনি জ্ঞানালোক প্রদান করিলেন আর্য সত্যচতুষ্টয়ের ব্যাখ্যানের দ্বারা।

এই আর্যসত্য সম্বন্ধে তিনি অভিজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন নিজের জীবনের অধ্যাত্মানুভূতির মধ্যে। তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন (১) জীবনে দুঃখ আছে, (২) এই দুঃখ হেতুমৎ—অর্থাৎ দুঃখের কারণ আছে, (৩) এই দুঃখের নিরোধ সম্ভব, (৪) দুঃখনিরোধের উপায় আছে।

এই উপায়কে বলা হইয়াছে আষ্টাঙ্গিক মার্গ:

(১) সম্যক্ দৃষ্টি—দুঃখের উৎপত্তি হইতে দুঃখ-নিরোধের উপায় সম্বন্ধে স্বচ্ছ সচেতনতাই সম্যক্ দৃষ্টি। (২) সম্যক্ সঙ্কল্প—নিষ্কামতা অবিদ্বেষ এবং অহিংসায় সঙ্কল্পবান্ হওয়া। (৩) সম্যক্ বাক্—অসত্যাদি ভাষণ হইতে বিরত থাকা। (৪) সম্যক্ কর্মান্ত—জীবহনন, পরিগ্রহ ও কাম-ভোগে বিরতি। (৫) সম্যক্ আজীব—ন্যায়পথে থাকিয়া জীবিকা উপার্জন করা। (৬) সম্যক্ ব্যায়াম—পাপাদি পরিহারের চেষ্টা, অকুশলতা পরিত্যাগ করা, কুশল ধর্মের অনুশীলন এবং তাহাদের পূর্ণতালাভের চেষ্টা। (৭) সম্যক্ স্মৃতি—সর্ববিষয়ে স্মৃতিকে সচেতন রাখা। (৮) সম্যক্ সমাধি—ধ্যানের দ্বারা দুঃখসুখের রহিত অবস্থায় স্থিতি।

সুদীর্ঘ ৪৫ বৎসর এই ধর্মদেশনার দ্বারা ভগবান বহু ভাগ্যবান ব্যক্তিকে নির্বাণের পথে পরিচালিত করেন। ভিক্ষুসংঘ স্থাপন করিয়া এই ধর্মচক্র যাহাতে বহু যুগ ধরিয়া আবর্তিত হয় তাহার ব্যবস্থা করেন। কালক্রমে পরি-নির্বাণের সময় উপস্থিত হইল। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আনন্দ ও অন্যান্য ভিক্ষুকে উপদেশ ও নির্দেশ দান করিতে থাকেন। সুভদ্র নামক এক ব্যক্তিকে এই সময়েই উপসম্পদা প্রদান করেন। আনন্দ ক্রন্দন করিতে থাকিলে তাঁহাকে বলেন 'ক্রন্দন করিও না—যাহা যৌগিক তাহারই বিশ্লেষ আছে।' বলিলেন 'আত্মদীপো ভব।'—নিজেই নিজের দীপ হও। বলিলেন 'নিষ্ঠার সহিত নিজের নির্বাণের চেষ্টা কর।' বুদ্ধ দীর্ঘ ৮০ বৎসর বয়সে পরিনির্বাণ লাভ করিলেন এইখানেই ইতিহাসের পরিসমাপ্তি নয়

ধর্মচক্রের আবর্তন চলিতে থাকিল। এই মহান্ ধর্মের প্রচারে ভারতের সমাজদেহের বিবর্তন ঘটিল। মেগাস্থিনিস তাঁহার বিবরণীতে লিখিয়াছেন—'ভারতে কেহ মিথ্যা বলে না, কোন নারী অসতী নয়।' নৈতিকতায় প্রতিষ্ঠিত যে ধর্ম বুদ্ধ প্রবর্তিত করিয়াছিলেন,

তাহার ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল।

তাহার পরে 'দেবানামপি পিয়দশী' ধর্মাশোকের সময় বুদ্ধপ্রবেদিত ধর্ম এশিয়ার বহু স্থানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ইহাই বৌদ্ধধর্মের স্বর্ণযুগ। ধীরে ধীরে মায়ার জগতের সমস্ত বস্তুর ন্যায় বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয় আরম্ভ হয়। সেই অবক্ষয়িত অবস্থায় তান্ত্রিকতার অভ্যুদয় বৌদ্ধধর্মের এক কলঙ্কময় অধ্যায়। কিন্তু সে কথা এখানে আলোচ্য নয়। এখানে এই কথাই স্মরণীয় যে, ভারতধর্মের সর্বোচ্চ যে তত্ত্ব তাহাকে গুহাহিত অবস্থা হইতে বাহির করিয়া ভগবান জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের লভ্য বস্তুরূপে প্রচার করিয়া সমাজকে নূতন এক উন্নতির স্তরে উত্তীর্ণ করিয়াছিলেন। রক্তপাত, শ্রেণীসংগ্রাম প্রভৃতি হিংসাস্তৃত পথে না গিয়াও কেমনভাবে নৈতিকতার ভিত্তিতে নবীন সমাজ গঠন করা যায় তাহার নির্দেশিকা তাঁহার ধর্মদেশনায় আমরা পাই।

পরের যুগে মানবমনের ভক্তির প্রাবল্যে তাঁহার মূর্তি নির্মিত ও পূজিত হইয়াছে। এবিষয়ে তাঁহার নির্দেশ ছিল না। তিনি বলিয়াছিলেন 'বুদ্ধ একটি ব্যক্তি নন—বুদ্ধ একটি অবস্থা।' সেই অবস্থালাভের জন্য তিনি মানবের মগ্নচৈতন্যকে ডাক দিয়াছেন, বলিয়াছেন 'আত্মদীপো ভব'।

'হরিমীড়ে'-স্তোত্রম্

স্তোত্র-রচয়িতা : আচার্য শংকর ; টীকাকার : স্বয়ংপ্রকাশ-যতি

অনুবাদক : স্বামী ধীরেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

[**মূলস্তোত্রম্ :**]

সত্যং জ্ঞানং শুদ্ধমনন্তং ব্যতিরিক্তং
শান্তং গূঢ়ং নিষ্কলমানন্দমনন্যম্।
ইত্যাহাদৌ যং বরুণোঽসৌ ভৃগবেঽজং
তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৯ ॥ (১)

সত্যম্ ইতি। **সত্যম্** অবাধ্যম্। **জ্ঞানং** জড়বিরোধি। **শুদ্ধং** মলাসংস্পৃষ্টম্। **অনন্তং** ত্রিবিধপরিচ্ছেদশূন্যম্। **ব্যতিরিক্তং** কোশপঞ্চক-ভিন্ন-তৎসাক্ষিণম্। **শান্তং** নিরস্ত-সমস্তোপপ্লবম্। অত্র শ্রুতিঃ—'যদা হি এব এষঃ এতস্মিন্ অদৃশ্যে অনাত্ম্যে অনিরুক্তে অনিলয়নে অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে' [তৈ. উ. ২।৭] ইতি। অস্য চ অয়ম্ অর্থঃ—যদা এব যস্মিন্ এব কালে এষঃ সাধকঃ এতস্মিন্ নিত্যাপরোক্ষে অদৃশ্যে দৃশ্যপ্রপঞ্চরহিতে, তৎপদলক্ষ্যে ইতি অর্থঃ ; অনাত্ম্যে স্থূলদেহরহিতে ; [অনিরুক্তে—] নিরুক্তিঃ লিঙ্গং, তদ্রহিতে ; অনিলয়নে—নিলীয়ন্তে প্রপঞ্চদেহলিঙ্গানি অস্মিন্ ইতি নিলয়নম্ অজ্ঞানং, তদ্রহিতে, ত্বংপদলক্ষ্যে ইতি অর্থঃ ; প্রত্যগভিন্নে ব্রহ্মণি ইতি

পদচতুষ্টয়ার্থঃ। তস্মিন্ অভয়ং ভয়রহিতং যথা ভবতি তথা; প্রতিষ্ঠাং স্থিতিং, বিন্দতে লভতে। উক্তরূপং ব্রহ্ম আত্মতয়া জানাতি ইতি অর্থঃ। 'অথ সঃ অভয়ং গতঃ ভবতি' [তৈ. উ. ২।৭]—অথ অনন্তরম্ এব উক্ত-বেদনানন্তর-কালে এব, স ব্রহ্মবিৎ, অভয়ং জনন-মরণ-প্রবাহ-নিমিত্ত-ভীতি-রাহিত্যং, গতঃ প্রাপ্তঃ ভবতি।' (২)

গূঢ়ম্ অনবগ্রাহ্যম্—বাঙ্‌মনসাগোচরম্[২] ইতি অর্থঃ। 'যতো বাচঃ' [তৈ. উ. ২।৯] ইতি শ্রুতেঃ। **নিষ্কলম্** নিরবয়বম্। **আনন্দম্** পরমপ্রেমাস্পদম্। **অনন্তম্** শ্রোত্রিয়স্বরূপম্। অত্র শ্রুতিঃ—'সঃ যঃ চ অয়ং পুরুষে যঃ চ অসৌ আদিত্যে সঃ একঃ' [তৈ. উ. ৩।১০।৪] ইতি। পুরুষে কার্যকরণসংঘাতে, অয়ম্ অপরোক্ষতয়া অনুভূয়মানঃ যঃ চিদ্ধাতুঃ সাক্ষিতয়া বর্ততে; যঃ চ আদিত্যে অন্তর্যামিতয়া অসৌ পরোক্ষত্বেন ভাসমানঃ বর্ততে; সঃ উভয়ত্র বর্তমানঃ চিদ্ধাতুঃ একঃ এব, ন ভিন্নঃ ইতি অর্থঃ। **ইতি** এবম্ **আদৌ** আনন্দবল্ল্যাং প্রতিপাদিতং **যং** বিষ্ণুম্ **অজং** জন্মরহিতম্ **অসৌ বরুণঃ ভৃগবে** ভৃগুনামকায় মহর্ষয়ে পুত্রায় **আহ** উক্তবান্ 'যতো বা' [তৈ. উ. ৩।১] ইত্যাদিনা, **তম্** ইতি অর্থঃ ॥ ১৯ ॥ (৩)

কথং ভৃগুঃ বেদ ইতি আকাঙ্ক্ষায়াম্ তদ্‌বেদন-প্রকারম্ আহ—

[মূলস্তোত্রম্ :]

কোশানেতান্ পঞ্চ রসাদীনতিহায়
ব্রহ্মাস্মীতি স্বাত্মনি নিশ্চিত্য দৃশিস্থঃ।
পিত্রাদিষ্টো বেদ ভৃগুর্যং যজুরন্তে
তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২০ ॥ (৪)

কোশান্ ইতি। **রসাদীন্** অন্নরস-বিকাররূপ-স্থূলদেহাদীন্ **পঞ্চ কোশান্ অতিহায়** অনাত্মত্বেন বিহায়; পঞ্চকোশস্বরূপং তু প্রত্যক্-তত্ত্ববিবেকে [পঞ্চদশী, ১] বিদ্যারণ্য-গুরুভিঃ প্রদর্শিতম্—'স্যাৎ পঞ্চীকৃতভূতোত্থো দেহঃ স্থূলোঽন্নসংজ্ঞকঃ। লিঙ্গে তু রাজসৈঃ প্রাণৈঃ প্রাণঃ কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহ ॥ সাত্ত্বিকৈ র্ধীন্দ্রিয়ৈঃ সাকং বিমর্শাত্মা মনোময়ঃ। তৈরেব সাকং বিজ্ঞানময়ো ধীর্নিশ্চয়াত্মিকা ॥ কারণে সত্ত্বমানন্দময়ো মোদাদিবৃত্তিভিঃ।' [পঞ্চদশী, ১।৩৪—৩৬] ইতি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং সংশয়-নিশ্চয়োভয়-হেতুত্বেন মনোময়ে বিজ্ঞানময়ে চ সম্বন্ধঃ। (৫)

দৃশিস্থঃ কার্যকারণসংঘাতে সাক্ষিত্বেন যৎ চৈতন্যং তদ্রূপেণ স্থিতঃ সন্; **স্বাত্মনি** এব স্বস্বরূপে এব, 'আনন্দঃ ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ' [তৈ. উ. ৩।৬] ইত্যাদিনা

---

১ স্তোত্রের অন্তর্গত 'শান্তং'-পদটির শ্রুতিসহায়ে সুদীর্ঘ ব্যাখ্যা টীকাকার এইখানে শেষ করিয়াছেন।

২ 'বাঙ্‌মনসোরগোচরম্' হওয়াই সমীচীন।

'যতো বা' [তৈ. উ. ৩।১] ইত্যাদি-লক্ষণ-যোজন-পূর্বকং **সর্বপ্রতিষ্ঠাভূতং ব্রহ্ম নিশ্চিত্য, পিত্রা [আদিষ্টঃ] শিষ্টঃ** ভৃগুঃ **যজুরন্তে** তৈত্তিরীয়োপনিষদি **ব্রহ্ম অস্মি ইতি যং বেদ তম্** ইতি অর্থঃ ॥ ২০ ॥ (৬)

[মূলস্তোত্র, শ্লোক ১৯, পৃঃ ২২৪ দ্রষ্টব্য]

অন্বয়ঃ সত্যং জ্ঞানং শুদ্ধং অনন্তং ব্যতিরিক্তং শান্তং গূঢ়ং নিষ্কলম্ আনন্দং অনন্যম্ ইতি আদৌ অসৌ বরুণঃ যম্ অজং ভৃগবে আহ, তং সংসার-ধ্বান্ত-বিনাশং হরিম্ ঈড়ে। ১৯।

স্তোত্রানুবাদঃ সত্য, জ্ঞান, শুদ্ধ, অনন্ত, [পঞ্চকোশ-] ব্যতিরিক্ত, শান্ত, গূঢ় (দুর্জ্ঞেয়), নিরবয়ব, আনন্দস্বরূপ, ভেদশূন্য ৩—এই প্রকারে অগ্রে (ভৃগুবল্লীর পূর্বে ব্রহ্মানন্দ-বল্লীতে) [উল্লিখিত] যে অজকে (জন্মরহিত ব্রহ্মকে) সেই (প্রসিদ্ধ) বরুণ [পুত্র] ভৃগুকে বলিয়াছিলেন (উপদেশ দিয়াছিলেন), সংসারের [কারণীভূত অজ্ঞান-] অন্ধকার-বিনাশ-কারী সেই হরিকে বন্দনা করি। ১৯। (১)

টীকানুবাদঃ **সত্যম্** ইত্যাদি। **সত্যং**—[কালত্রয়ে] বাধরহিত; **জ্ঞানং**—জড়বিরোধী; **শুদ্ধং**—মলসংস্পর্শরহিত; **অনন্তং**—[দেশ-কাল-বস্তু-কৃত] ত্রিবিধ-পরিচ্ছেদ (সীমা)-শূন্য; **ব্যতিরিক্তং**—পঞ্চকোশ হইতে ভিন্ন, তাহাদের সাক্ষিস্বরূপ; **শান্তং**—সর্ব [পাপাদি-]উপদ্রবরহিত—এই বিষয়ে শ্রুতি[-প্রমাণ]: 'যখন এই সাধক এই অদৃশ্য অনাত্ম্য অনিরুক্ত অনিলয়ন প্রত্যগভিন্ন ব্রহ্মে সম্পূর্ণ ভয়রহিত হইয়া স্থিতিলাভ করেন…।' ইহার (এই শ্রুতির) এই অর্থঃ যখনই (যে কালে) এই সাধক এই নিত্য-অপরোক্ষ, অদৃশ্য—দৃশ্যপ্রপঞ্চরহিত অর্থাৎ তৎপদলক্ষ্য, অনাত্ম্য অর্থাৎ স্থূলদেহরহিত, অনিরুক্ত—নিরুক্তি অর্থাৎ লিঙ্গ, জ্ঞাপক চিহ্ন—তদ্রহিত, অনিলয়ন—প্রপঞ্চ, দেহ, লিঙ্গ প্রভৃতি ইহাতেই লীন হয়—ইহাই 'নিলয়ন' [শব্দের অর্থ] অর্থাৎ অজ্ঞান—তদ্রহিত (অজ্ঞানরহিত) অর্থাৎ ত্বংপদলক্ষ্য; প্রত্যগভিন্ন ব্রহ্মই [পূর্বোক্ত] পদচতুষ্টয়ের (অদৃশ্য, অনাত্ম্য, অনিরুক্ত, অনিলয়ন—এই চারিটি পদের) অর্থ; তাঁহাতে (সেই প্রত্যগভিন্ন ব্রহ্মে) ভয়রহিতরূপে স্থিতিলাভ করেন [সেই কালে তাঁহার সমস্ত ভয়ের নিবৃত্তি হয়] অর্থাৎ উক্তরূপ ব্রহ্মকে আত্মরূপে জানেন; 'অনন্তর তিনি অভয় প্রাপ্ত হন'—অথ অর্থাৎ অনন্তরই অর্থাৎ উক্ত জ্ঞানের অব্যবহিত-কালেই সেই ব্রহ্মবিৎ অভয় অর্থাৎ জন্মমরণপ্রবাহনিমিত্ত-ভয়রাহিত্য প্রাপ্ত হন। (২)

গূঢ়ং—গ্রহণের অবিষয় অর্থাৎ বাক্যমনের অগোচর। এই বিষয়ে শ্রুতি [প্রমাণ]: 'যাঁহা হইতে [মন সহ] বাণী [প্রত্যাবৃত্ত হয়]।' **নিষ্কলং**—নিরবয়ব; **আনন্দং**—পরম-

৩ 'অনন্য' শব্দের বেদান্তসম্মত প্রসিদ্ধ অর্থই এখানে লিখিত হইল। 'তদনন্যত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ' [ব্রহ্মসূত্র, ২।১।১৪], ভামতীটীকা দ্রষ্টব্য। বর্তমান টীকাকার 'অনন্য' শব্দের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা টীকানুবাদে প্রদর্শিত হইবে। সমস্ত স্তোত্রানুবাদেই আমরা সর্বত্র মূল শব্দের প্রসিদ্ধ এবং সরল অর্থ ই গ্রহণ করিতেছি।

প্রেমাস্পদ ; **অনন্তং**—শ্রোত্রিয়গণের স্বরূপ[4] ; এই বিষয়ে শ্রুতি [প্রমাণ] : **'এই যিনি পুরুষে এবং ঐ যিনি আদিত্যে [উভয়ত্র] তিনি এক।'** [শ্রুতির অর্থ—] পুরুষে অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়সংঘাতে, এই অর্থাৎ অপরোক্ষরূপে অনুভূয়মান, যে চিৎপদার্থ সাক্ষিরূপে বিদ্যমান এবং আদিত্যে অর্থাৎ অন্তর্যামিরূপে ঐ অর্থাৎ পরোক্ষভাবে যিনি প্রকাশিত, তিনি উভয়ত্র (পুরুষে ও আদিত্যে) বিদ্যমান একই চিৎপদার্থ, ভিন্ন নহেন, ইহাই অর্থ। **ইতি**—এই প্রকারে, **আদৌ**—ব্রহ্মানন্দবল্লীতে প্রতিপাদিত, **যং**—যে, **অজং**—জন্মরহিত, বিষ্ণুকে **অসৌ বরুণঃ**—সেই (শ্রুত্যুক্ত) [ঋষি) বরুণ, **ভৃগবে**— [নিজ-] পুত্র ভৃগুনামক মহর্ষিকে, **আহ**—'যাহা হইতে…' ইত্যাদি [বাক্য-] দ্বারা উপদেশ করিয়াছিলেন, **তং**—তাঁহাকে (সংসারের কারণীভূত অজ্ঞান-অন্ধকার-বিনাশকারী হরিকে) [বন্দনা করি]—ইহাই অর্থ। ১৯। (৩)

ভৃগু কিভাবে জানিয়াছিলেন (তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন) ?—এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁহার (ভৃগুর) জানিবার পদ্ধতি [আচার্য] বলিতেছেন : [মূলস্তোত্র, শ্লোক ২০, পৃঃ ২২৫ দ্রষ্টব্য]।

অন্বয় : যজুরন্তে পিত্রা আদিষ্টঃ ভৃগুঃ রসাদীন্ এতান্ পঞ্চ কোশান্ অতিহায় দৃশিস্থঃ স্বাত্মনি নিশ্চিত্য ব্রহ্ম অস্মি ইতি যং বেদ, তং সংসার-ধ্বান্ত-বিনাশং হরিম্ ঈড়ে। ২০।

স্তোত্রানুবাদ : যজুর শেষে (তৈত্তিরীয় উপনিষদে [উক্ত]) পিতা কর্তৃক আদিষ্ট [হইয়া] ভৃগু [অন্ন-] রসাদির বিকারভূত এই পঞ্চ কোশ পরিত্যাগপূর্বক চৈতন্যরূপে অবস্থিত হইয়া [ব্রহ্মকে] নিজের আত্মাতে [অপরোক্ষরূপে] নিশ্চয় করিয়া 'আমিই ব্রহ্ম'—এইরূপে যাঁহাকে জানিয়াছিলেন, সংসারের [কারণীভূত অজ্ঞান-] অন্ধকার-বিনাশকারী সেই হরিকে বন্দনা করি। ২০। (৪)

টীকানুবাদ : **কোশান্** ইত্যাদি। **রসাদীন্**—অন্নরসের বিকাররূপ স্থূলদেহাদি পঞ্চকোশকে **অতিহায়**—অনাত্মা-জ্ঞানে পরিত্যাগপূর্বক ; আচার্য বিদ্যারণ্যস্বামী [পঞ্চদশীর অন্তর্গত] 'প্রত্যক্তত্ত্ববিবেক' নামক প্রকরণে পঞ্চকোশের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা—"পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন স্থূলদেহই 'অন্নময় কোশ' নামে অভিহিত। লিঙ্গশরীরের অন্তর্গত—রজোগুণোৎপন্ন পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের সহিত পঞ্চপ্রাণ 'প্রাণময় কোশ' নামে প্রসিদ্ধ। [লিঙ্গশরীরের অন্তর্গত—] সত্ত্বগুণোৎপন্ন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত সংকল্প-বিকল্পাত্মক মনই 'মনোময় কোশ' নামে কথিত। ঐ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়াই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি 'বিজ্ঞানময় কোশ' নামে অভিহিত হয়। কারণশরীরের অন্তর্গত—মোদাদি (মোদ, প্রমোদ প্রভৃতি) বৃত্তির সহিত সত্ত্বগুণ 'আনন্দময় কোশ' নামে অভিহিত।" সংশয় ও নিশ্চয়—এই উভয়ের (উভয় প্রকার জ্ঞানের) কারণ বলিয়াই জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের মনোময় ও

৪ টীকাকার 'অনন্ত' শব্দের অর্থ করিয়াছেন, 'শ্রোত্রিয়স্বরূপ'। কিন্তু এইরূপ অর্থগ্রহণের তাৎপর্য পরিস্ফুট নহে। *এইজন্য মূল শ্লোকের অনুবাদে আমরা 'অনন্ত' শব্দের ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্রের কৃত অর্থ (ভেদশূন্য) গ্রহণ করিয়াছি।*

বিজ্ঞানময়—এই উভয় কোশের সহিত সম্বন্ধং [বিদ্যমান] ।(৫)

হৃদিস্থঃ—দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতে সাক্ষিরূপ যে চৈতন্য, তৎস্বরূপে স্থিত হইয়া ; **স্বাত্মনি**—স্বস্বরূপেই ;—'আনন্দরূপ ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন' ইত্যাদি [বাক্যের] দ্বারা 'যাহা হইতে [এই অখিল ভূতবর্গ উৎপন্ন হয়]' ইত্যাদি [ব্রহ্মের তটস্থ-] লক্ষণ যোজনাপূর্বক সর্বাধার ব্রহ্মকে **নিশ্চিত্য**—অপরোক্ষরূপে জানিয়া পিত্রা—পিতা কর্তৃক [আদিষ্টঃ—] উপদিষ্ট **ভৃগুঃ**—[মহর্ষি] ভৃগু **যজুরন্তে**—তৈত্তিরীয়োপনিষদে **ব্রহ্ম অস্মি ইতি**—'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপে **যং**—যাঁহাকে **বেদ**—জানিয়াছিলেন, **তং**—তাঁহাকে (সংসারের কারণীভূত অজ্ঞান-অন্ধকার-বিনাশকারী সেই হরিকে) [আমি বন্দনা করি-] ইহাই অর্থ ।২০। (৬) [ক্রমশঃ]

৫ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন—ইহারাই সংশয়াত্মক জ্ঞানের কারণ। সুতরাং ইহারাই মনোময় কোশ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বুদ্ধি—ইহারাই নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের কারণ। সুতরাং ইহারাই বিজ্ঞানময় কোশ।

শ্রীশ্রীমায়ের অপ্রকাশিত পত্র*

[প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত]

জয়রামবাটী

১৩২৪।৫ই চৈত্র

শ্রীশ্রীগুরুদেব

আশীঃপর সমাচার—

বাবাজীবন, তোমার বোধ হয় জানা আছে যে, আমাদের বাড়ীর জন্য ৪ চারি টাকা চৌকিদারী টেক্স ধার্য্য আছে। ইহা অত্যন্ত বেশী বোধ হওয়ায় গতকল্য একখানা পত্রসহ শ্রীমান গোপেশকে শ্রীযুক্ত শম্ভুবাবুর নিকট পাঠাইয়াছিলাম, পত্রে লিখিয়াছিলাম, এই বাড়ীটি দেবোত্তর করিয়া দেওয়ায় আমার সহিত তাহার বিশেষ সম্পর্ক নাই। আমি এখানের স্থায়ী অধিবাসী নই। বাড়ীর কিছুমাত্র আয় নাই। যে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী সেবক থাকিবে, তাহার ভরণপোষণ এই সংসার হইতে চলিবে না। এমতাবস্থায় স্থায়ী এই গুরুভার বহন করা অসম্ভব। আমার নিজের ও ভক্তেরা যখন যাহা দেয়, ভগবান-ইচ্ছায় তাহাতে কোন রকম চলিয়া যায় মাত্র। সংসারে কিছুমাত্র আয় নাই ইত্যাদি।

শম্ভুবাবু তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, তিনি এবিষয়ে পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছিলেন, ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট একখানা দরখাস্ত করিবার জন্য। এ সম্বন্ধে তুমি কিছু করিয়াছ কিনা জানি না। আশা করি পত্রপাঠ মনোযোগী হইবে, এবং যাহা ভাল মনে কর তাহা করিবে। শম্ভু রায় বলিয়া দিয়াছেন, দরখাস্তে যেন উল্লেখ থাকে যে ইহা একটি Religious Institution—আয় কিছুমাত্র নাই। সহৃদয় জনগণের প্রদত্ত সাহায্যে পরিচালিত হইতেছে। এখানকার কুশল সমাচার সহ আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে।

আশীঃ তোমার **মাতাঠাকুরাণী**

---

* শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রকাশিত।—সঃ

সর্বাত্মক কল্যাণের পথ*

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

বিবেকানন্দ বক্তৃতা হল ও স্বামী শিবানন্দ গ্রন্থাগার জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত বোলে আমি সানন্দে ঘোষণা করছি। এতো স্বল্প সময়ের মধ্যে এ দুটির নির্মাণকাজ সমাপনের জন্য ব্যবস্থাপকদের সাদর অভিনন্দন জানাই।

এ সব গ্রন্থাগার আমাদের কাজের-আমাদের সাংস্কৃতিক কাজের—অঙ্গ। সারা ভারতে এগুলি আমাদের বিভিন্ন কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীমায়ের বাণী তথা ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু জনসাধারণের চাহিদা মেটাতে এগুলি সব সময়েই সক্রিয়।

আজকাল আমরা অনেক 'বাদ' পাচ্ছি। পাচ্ছি সমাজতন্ত্রবাদ সাম্যবাদ এবং আরো অনেক কিছু 'বাদ'। স্বামীজী স্বয়ং লিখেছেন: 'আমি একজন সমাজতন্ত্রী, তার কারণ এই নয় যে, আমি মনে করি সমাজতন্ত্র একটি নিখুঁত পদ্ধতি—কারণ শুধু এই যে, নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।' সেই দিক থেকে এদেশে সমাজতান্ত্রিক মনোভাবের তিনি প্রশংসা করতেন ও তাকে স্বাগত জানাতেন। অবশ্য, সে সময়ে এটা তেমন জোরালো ছিল না। তখন সবেমাত্র শুরু। তাহলেও তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, একদিন সারা পৃথিবীতে এটা একটা প্রবল আন্দোলন হয়ে উঠবে। সমাজতন্ত্রবাদকে 'কানা মামা' তিনি কেন বলেছিলেন? কারণ আধুনিক যুগের এইসব মতবাদ—সমাজতন্ত্রবাদ সাম্যবাদ ইত্যাদি—সবই পাশ্চাত্যের জড়বাদী সভ্যতার শাখাপ্রশাখা। তারা কাজ করে শুধু শারীরিক স্তরে—অর্থনীতিক ক্ষেত্রে, তার বাইরে নয়। কিন্তু মানুষ বেঁচে থাকে শুধু শারীরিক স্তরে নয়, বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক স্তরেও। এই দুই স্তরে মানুষের অস্তিত্ব সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু স্বামীজী বলেছিলেন যে, উচ্চবর্ণের মানুষরা জনসাধারণকে শুধু যে শোষণ করেছেন এবং তাঁদের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন দেশের সম্পদের তাঁদের ন্যায্য লভ্যাংশ থেকে বঞ্চিত করেছেন তাই নয়, দেশের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য থেকেও তাঁদের বঞ্চিত করেছেন। জনসাধারণকে এই সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের শরিক করা হয়নি, যদিও এদেশের সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার বাণী দেশের বাইরে জাতিসমূহের মধ্যে প্রচার করা হয়েছিল। স্বামীজী চেয়েছিলেন যে, আমাদের পূর্বপুরুষগণ কর্তৃক আবিষ্কৃত সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ—উচ্চনীচ, ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, উপজাতীয় কিংবা নগরবাসী—সংক্ষেপে বলতে গেলে, সামাজিক পদমর্যাদানির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের কাছে, দেশের প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেওয়া হোক। ভারতীয় সংস্কৃতি ও দর্শনের এই বাণী এবং উপনিষদের ধর্মকে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। তিনি চেয়েছিলেন দেশটাকে আধ্যাত্মিক ভাবে প্লাবিত করতে,

* ১০ই ফেব্রুআরি ১৯৭৮ তারিখে বোম্বে রামকৃষ্ণ আশ্রমে বিবেকানন্দ হল ও স্বামী শিবানন্দ গ্রন্থাগারের উৎসর্গীকরণ অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষের ইংরেজী আশীর্ভাষণের 'বকলম'-কৃত অনুবাদ। —সঃ

যাতে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে আমাদের পূর্বপুরুষদের উদ্ভাবিত ধর্মীয় সত্যগুলি প্রত্যেকে মনের মধ্যে গ্রহণ করতে পারেন। তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিলেন যে, তা যদি হয় তাহলে এই মহান আদর্শে ও নতুন শক্তিতে জাতিকে অনুপ্রাণিত করা যাবে, এবং দেশের ... বিন করা ও দেশকে সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধির এক অতি উচ্চস্তরে উন্নীত করা সম্ভব হবে। সেই 'বাদ'কে আপনারা বিবেকানন্দ-বাদ, বেদান্ত-বাদ বা যা খুশি বলতে পারেন; এই মতবাদের কারবার গোটা মানুষটাকে নিয়ে—যার অস্তিত্ব শারীরিক বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক—এ তিন স্তরেই বিধৃত। তাই তিনি অনুভব করেছিলেন যে, সমাজতন্ত্রবাদ একটি আংশিক প্রতিকার মাত্র।

এদেশে স্বামীজীর ভাবধারা বাস্তবায়িত করতে আমরা সচেষ্ট। অনগ্রসর এলাকায়, গ্রামবাসীদের মধ্যে, উপজাতীয় অঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর ভাবধারা ছড়িয়ে দিতে আমরা চেষ্টা করছি। আনন্দের কথা, এইসব অনগ্রসর অঞ্চলের অধিবাসীরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে এই ভাবে ভাবিত হচ্ছেন। মনে হয় তাঁরা এইসব সত্যের জন্য ব্যাকুল। এ ধরনের কাজ যদি আমরা আরও ব্যাপক-ভাবে করতে পারি উপজাতীয় অঞ্চলের বহু সমস্যার সমাধান হবে। 'কথামৃত'—আপনারা যাকে বলেন 'বচনামৃত'—তার কিছু কিছু নির্বাচিত অংশ এবং স্বামীজীর একখানি সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করে উপজাতীয়দের মধ্যে প্রচার করা হয়েছিল। উপজাতীয় অঞ্চলের সেইসব মানুষজন এবিষয়ে এতোই অনুরাগী হয়ে ওঠেন যে, সেরকম আরো অনেক বই চাইতে থাকেন। একটি উপজাতি অঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলী-সংবলিত একটি পুস্তিকা স্থানীয় ভাষায় প্রকাশিত হয় এবং সেটি সেই অঞ্চলে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। শ্রীঅরুণ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা গান—বোধ হয় 'রামকৃষ্ণশরণম্ রামকৃষ্ণশরণম্'— আজকাল এইসব উপজাতীয় এলাকায় গাওয়া হয়। আপনারা এই উপজাতীয় এলাকায় গেলে দেখতে পাবেন লোকেরা এই গান গাইছেন ও নাচছেন। এ থেকে বোঝা যায় এ বাণী কীভাবে তাঁরা গ্রহণ করছেন। ত্রুটি যদি কিছু থাকে তা আমাদের: আমরা এ বাণী তাঁদের কাছে নিয়ে যাইনি।

রামকৃষ্ণ মিশন অবশ্যই স্বামীজীর বাণী কাজে পরিণত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে।

সত্য কথা বলতে কি, আমরা যা করছি—শহর অঞ্চলেই হোক বা উপজাতীয় অঞ্চলেই হোক— সারা জাতির প্রয়োজনের তুলনায় তা অতি সামান্য। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী দেশের সর্বত্র বিকীর্ণ হওয়া প্রয়োজন, যাতে করে দেশের যুবসমাজ এখন যেমন রাজনৈতিক মিছিল ইত্যাদি নিরর্থক কাজে তাঁদের সময় ও শক্তির অপচয় করছেন, তা না করে জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারেন। সেভাবে করলে এখন যেভাবে দেশের কাজ তাঁরা করছেন তার চেয়ে অনেক বড় কাজ তাঁরা করতে পারবেন। তাই আমরা স্বামীজীর বাণীপ্রচারের ওপর জোর দিই এবং তার ফলে দেশের সকল জায়গায় আমাদের কেন্দ্রগুলির সঙ্গে গ্রন্থাগার সংযুক্ত থাকে। যদিও এই সকল গ্রন্থাগার খুব ছোট, তাহলেও জনসাধারণ যাঁরা আসেন ও এই সকল গ্রন্থাগারের সদ্ব্যবহার করেন তাঁরা কিছু প্রেরণা পান। আমি কামনা করি: রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীমায়ের

কথা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুক, যাতে অনেক মানুষ, অনেক সংঘ, অনেক সমিতি এগিয়ে এসে স্বামীজীর প্রদর্শিত প্রণালীতে দেশের অভ্যুত্থানের জন্য ব্রতী হন। তাই আমার বক্তব্য এই যে, সমাজসেবার চেয়ে দেশের সর্বত্র এই বাণীপ্রচারের ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী দেশের সকল জায়গায় ছড়িয়ে দিতে হবে এবং সে কাজ এইসব হাসপাতাল বিদ্যালয় ইত্যাদির চেয়ে বেশি দরকারী। আমি বলছি না যে, এগুলো অনাবশ্যক। কিন্তু যদি সে বাণী প্রচারিত হয় এবং জনসাধারণ তা অনুসরণ করেন তাহলে রামকৃষ্ণ মিশন যা করতে সমর্থ তার চেয়ে শতগুণ বা সহস্রগুণ বেশি কাজ হবে। সেইদিক থেকে আমি বলছি যে, সমাজসেবার চেয়ে ঐ বাণী অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী আত্মস্থানন্দ*

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্য জীবন, সাধনা ও সিদ্ধির কথা ভাবলে স্মরণ হয় 'তমসঃ পরস্তাৎ' জ্যোতির্ময় মহান পুরুষের গুণানুকীর্তনে উন্মুখ ব্যাসদেবের মঙ্গলাচরণ 'ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।' সমগ্র শ্রুতির সিদ্ধান্ত সত্যই ভগবান, সত্যই চিন্ময়, সত্যই আনন্দ, সত্যই পরমার্থ, পরম ধাম।

দেবমানব শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যস্বরূপ। জগন্মাতাকে তিনি ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ, যশ-অপযশ ইত্যাদি দেহ-মনের সব-কিছু অর্পণ করেও দিতে পারেননি সত্যকে। সত্যনিষ্ঠার সবচেয়ে বড় আদর্শ কী হতে পারে তা তিনি তাঁর মহাজীবনে ও বহু প্রবচনে তুলে ধরেছেন। কখনও তাঁর কথায়, আচারে বা ব্যবহারে সত্যকে ব্যাহত দেখা যায় না। তিনি ছিলেন একান্ত সত্যনিষ্ঠ। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, 'যার সত্যনিষ্ঠা আছে সে সত্যের ভগবানকে পায়; মা তার কথা কখনও মিথ্যা হতে দেয় না।' তিনি বলেছেন, 'যারা বিষয়-কর্ম করে—অফিসের কাজ কি ব্যবসা—তাদেরও সত্যতে থাকা উচিত। সত্য কথা কলির তপস্যা।' 'সত্যে আঁট থাকলে ঈশ্বর-লাভ হয়' ইত্যাদি। সত্যনিষ্ঠার কতই না দৃষ্টান্ত তাঁর জীবনে দেখা যায়! যেদিন সেখানে যাব বলেছেন সেদিন ঠিক সেখানে উপস্থিত হয়েছেন; যার কাছ থেকে যে জিনিসটা নেবেন বলেছেন তার কাছ থেকে ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে তা নিতে পারেননি। যেদিন বলেছেন ও জিনিসটা খাব না বা ও কাজটা আর করব না সেদিন থেকে আর তা খেতে বা করতে পারেননি। নামে 'ধনী' কিন্তু গরিব কামারণী—তাকে 'ভিক্ষে মা' করবেন বোলে কথা দিয়েছিলেন, তাই উপনয়নের সময় প্রবল বাধা সত্ত্বেও তিনি সে সত্য রক্ষা করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স ন বছর। তখনই এমনি সত্যে আঁট! আর এমনি সমদর্শিতা ও উদারতা! ছোট-বড়

* রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহসম্পাদক।

জাত, ধনী-নির্ধন—এসব ভেদবুদ্ধি তাঁর ধারে-কাছে ঘেঁসতে পারত না। মেথরদের পায়খানা তিনি নিজের হাতে পরিষ্কার করেছিলেন, নিজের চুল দিয়ে সেখানকার মেঝে মুছে দিতেন।

এই উদারতা থেকেই ঠাকুর বলতেন, 'গেঁড়ে ডোবাতেই দল বাঁধে, যেমন হিঞ্চের দল, কলমির দল ; কিন্তু স্রোতের জলে দল বাঁধে না। গোঁড়ামিতেই দল পাকায়। উদার বুদ্ধি দল বাঁধে না।' নিবেদিতার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'Never a word of condemnation for any !' অর্থাৎ কোন কিছুর নিন্দা তিনি কখনও করতেন না। নিন্দা করবেন কী করে? অধ্যাত্মজগতের উৎকৃষ্ট ভাবাদর্শ-গুলি একসঙ্গে গেঁথে সমন্বয়ের সেরা মালাখানি তিনি নিজের গলায় পরেছেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বলেছেন, 'এই যে ইনি (পরমহংসদেব) যা বলেন তা অত অন্তরে লাগে কেন? এঁর সব ধর্ম দেখা আছে—হিঁদু মুসলমান খৃষ্টান শাক্ত বৈষ্ণব এসব ইনি নিজে করে দেখেছেন। মধুকর নানা ফুলে বসে মধু সঞ্চয় করলে তবেই চাকটি বেশ হয়।' এইসব ধর্ম 'আপনি আচরি' একই সত্যে পৌছে তিনি বললেন: ধর্ম এক, নাম ভিন্ন হলেও যে পথ দিয়েই যাও সেই একই লক্ষ্যে পৌঁছবে; গৃহী-সন্ন্যাসী, স্ত্রী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই সেই লক্ষ্যে পৌছবার অধিকারী। শ্রীরামকৃষ্ণের এই সমন্বয়-ভাবটি রবীন্দ্রনাথ চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন দুটি ছত্রে:

'বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা,
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।'

ধর্মসাধনার দুশ্চর বিভিন্ন ও বিচিত্র পথে চূড়ান্ত সত্যের উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সেই উপ-লব্ধির কথা—অধ্যাত্মজীবনের সেই গভীরতম অভিজ্ঞতার কথা—তিনি শুনিয়ে গেছেন, 'যত মত তত পথ' এই যুগবাণীতে। মহামিলনের সুরে বাঁধা বোলেই তাঁর জীবন ও বাণী সকল দেশের সকল জাতিধর্মের মানুষের মনকে এমন করে টানে! তাছাড়া, তিনি তো পরের মুখে ঝাল খেয়ে উপদেশ দেননি, বা এমন উপদেশ দেননি নিজের বেলায় যা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেননি। বরং, তিনি যেমন বলতেন, তিনি নিজে ষোল টাং করেছেন, কেউ যদি এক টাংও করে তাহলেই যথেষ্ট।

তিনি যুগাচার্য হয়েছেন সর্বস্ব ত্যাগ করে। স্বামীজী ঠাকুরকে বলেছেন, 'ত্যাগীশ্বর'। কয়েকটা টাকা ও কিছু মাটি একসঙ্গে হাতে নিয়ে 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' বলতে বলতে দুই-ই তিনি গঙ্গায় বিসর্জন দেন—এ কথা সবাই জানেন। কিন্তু সবাই যা জানলেও হয়তো সব সময় মনে রাখেন না তা হলো এই যে ভগবানলাভের পথে প্রতিকূল সব-কিছুই তিনি দেহে-মনে সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছিলেন। তবেই তিনি হতে পেরেছিলেন 'সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন', অর্থাৎ ঢিল পাথর সোনা—যাঁর চক্ষে সব সমান। ব্যক্তিগত সেবার জন্য লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারীর ভেট, সেই যুগের দশ হাজার টাকা, কী অনায়াসে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন! শুধু তাই নয়, সামান্য সঞ্চয়ও তাঁর পক্ষে কেমন অসম্ভব ছিল! ঠাকুরের লীলাসঙ্গিনী শ্রীশ্রীমা সারদা-দেবীর কথাতেই বোধ হয় তা সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মা বলেছেন: "তাঁর ত্যাগই ছিল ঐশ্বর্য। একদিন খেয়ে নবতের ঘরে গেছেন। দুটি যোয়ান মৌরি খেতে দিলুম,

আর দুটি কাগজে মুড়ে হাতে দিলুম, বললুম, 'নিয়ে যাও'। তিনি নবতের ঘর থেকে ঘরে যাচ্ছেন। কিন্তু ঘরে না গিয়ে সোজা দক্ষিণদিকের নবতের কাছের গঙ্গার ধারের পোস্তায় চলে গেছেন—পথ দেখতে পাননি, হুঁশও নেই। বলছেন, 'মা ডুবি? মা ডুবি?' হৃদয় ধরে তুলে নিয়ে এল। আর একটু হলেই গঙ্গায় পড়ে যেতেন। হাতে দুটি যোয়ান দিয়েছিলুম কিনা। তাই পথ দেখতে পাননি। তাঁর যে ষোল আনা ত্যাগ।" আছে কোথাও এমন ত্যাগের নিদর্শন!

এইভাবে ত্যাগিশ্রেষ্ঠ হয়েই তিনি হলেন অধ্যাত্মসম্রাট। ভগবানের চিন্তা করতে করতে সাধকের যখন এমন অবস্থা হয় যখন নিজের সামান্যতম দেহবোধ পর্যন্ত থাকে না তখন তাকে বলে সমাধি। এ এক আশ্চর্য অবস্থা যা অধ্যাত্মজগতে অতিশয় বাঞ্ছিত কিন্তু অতীব বিরল। শ্রীরামকৃষ্ণের মন ঈশ্বরের ভাবে এমনি ভরপুর থাকত যে মুহুর্মুহুঃ তাঁর সমাধি হতো। চল্লিশ বছর ধরে কঠোরতম তপস্যার ফলে গুরু তোতাপুরীজী যে অবস্থা উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলেন, শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণ একদিনেই তা আয়ত্ত করেন। শ্রীশ্রীভবতারিণীর সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে তারপর তিনি 'ভাবমুখে' অবস্থান করতেন। সে এক অপূর্ব অবস্থা—যেন নিত্য ও লীলার সংযোগস্থল, অলৌকিক ও লৌকিক ভূমির সেতুরূপ মিলন-কেন্দ্র, অতীন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের যুগপৎ দ্রষ্টা, সাক্ষিভাবে অবস্থিতি। দেবমানব শ্রীরামকৃষ্ণ মরধামে যেন টেনে এনেছিলেন অমৃতত্বের ছোঁয়া। মানব-হৃদয়ের সমস্ত সুষমা ও মাধুর্য প্রস্ফুটিত হয়েছিল তাঁর অতুলনীয় আধ্যাত্মিক জীবনগতির মাঝে, তাঁর মানবিক সমবেদনা, সহানুভূতি, অনুকম্পা ও অফুরন্ত প্রেম ও কল্যাণাকাঙ্ক্ষায়। জগজ্জননীর সঙ্গে সদা-সর্বদা স্বাভাবিক শরণাগত শিশুর সরল ব্যবহার, বিস্তৃত গূঢ় তন্ত্রোপাসনা, সর্বভাবে ভক্তিসাধন, রামলালার সঙ্গে খেলা, অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠা—সমাধির শিখরে, আবার স্বীয় সহধর্মিণীকে ষোড়শোপচারে পূজা করে যে শ্রীরামকৃষ্ণ বিংশ শতাব্দীর জিজ্ঞাসুর সকল সংশয় দূর করেছিলেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়—'যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ', যাঁকে বিবেকানন্দ 'অবতারবরিষ্ঠ' বোলে ঘোষণা করেছিলেন সেই শ্রীরামকৃষ্ণকেই আমরা দেখি কারও আত্মীয়বিয়োগের ব্যথায় শোকবিহ্বল হতে, নিরন্ন পীড়িতের দুঃখে তীর্থযাত্রাকে তুচ্ছ করতে, শ্রীশ্রীমাকে শুধু শিক্ষাদানেই নয় তাঁর জন্য গহনাও গড়িয়ে দিতে, নিত্যসমাধিস্থিতি-অভিলাষী নরেন্দ্রনাথকে 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' আত্মসমর্পণে উদ্দীপিত করতে; কলকাতার দাসত্ব, জড়তা ও যান্ত্রিকতামূলক তমোবিভ্রান্ত নরনারীর অভ্যুদয়ের জন্য ব্যগ্র হতে, সাধন-লব্ধ গহন ও অমোঘ অধ্যাত্মবিদ্যা বিশ্বের জন্য বিলিয়ে দিতে ব্যস্ত, মানবজাতির সম্বিৎ ও আধ্যাত্মিক চেতনাকে পুনরায় উদ্বুদ্ধ করতে সতত তৎপর—সত্যই অভূতপূর্ব, অশ্রুতপূর্ব, অদৃষ্টপূর্ব আধ্যাত্মিক সম্রাট শ্রীরামকৃষ্ণ। সম্পূর্ণ ঐশ্বর্যহীন, সদা ঈশ্বরময় হয়েও নিত্যানন্দমূর্তি এই দেবমানব মানুষের হাসিকান্না, ভাঙ্গাগড়া, আশাআকাঙ্ক্ষা, নিত্যনৈমিত্তিক সবটার মধ্যেই ধরা দিচ্ছেন কিন্তু সুর কাটেনি, তাল ভাঙ্গেনি; সবই মনোরম, সরসতায় ভরা। যুগযুগান্তের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব যে সত্য, বাস্তব এবং একমাত্র কাম্য ও মানবজীবন চরিতার্থতার সাধন তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ শ্রীরামকৃষ্ণজীবন। খাদ না হলে গড়ন হয় না, তাই ঐ উচ্চ

অবস্থায় তাঁর পক্ষে প্রচার সম্ভব ছিল না। সেই মহৎ উদ্দেশ্য সফল করতে তাই নামিয়ে এনেছিলেন সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষিকে।

আধ্যাত্মিক জীবনের উত্তুঙ্গ শিখরে আরূঢ় ছিলেন বোলে কিন্তু ঠাকুর জীবনের ব্যবহারিক দিকটাকে উপেক্ষা করতেন না। পরাবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে অপরাবিদ্যারও যে তিনি যথাযোগ্য মর্যাদা দিতেন তা বোঝা যায় 'যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি,' 'যে একটি বিদ্যাতে নিপুণ তার পক্ষে ঈশ্বরলাভ সহজ' ইত্যাদি তাঁর কথায় এবং বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদন প্রমুখ সমকালীন গুণী-জ্ঞানীদের সঙ্গে তাঁর সাগ্রহ সাক্ষাৎকারে। তাঁর স্পষ্ট স্বামীজীও তাই চাইতেন, এ যুগের মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে কার্যকুশলতার মিলন ঘটুক। ঠাকুর নিজে বাহ্যদশায় পুরোদস্তর—শুধু কর্মতৎপর নন—কর্মপটু ছিলেন। অগোছালো এলোমেলো ভাব তিনি একটুও পছন্দ করতেন না। তাঁর ঘরে জিনিসপত্তর সব সাজানো গোছানো থাকত, প্রত্যেকটি ছোটখাট জিনিসের প্রতিও তাঁর দৃষ্টি থাকত। একবার 'কথামৃত'-কার মহেন্দ্র-নাথ গুপ্ত পশ্চিমের বারান্দায় বসে কিছু জলযোগ করে তাড়াতাড়ি ঘরে এসেছেন ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর তক্ষুণি বললেন, 'জলের ঘটিটা আনলে না?' মাষ্টারমশায় অপ্রস্তুত। আর একদিন পঞ্চবটীতলায় পাঠ হচ্ছিল। পাঠের পর সবাই চলে এসেছেন। ঠাকুর সবার শেষে ঘরে এসে হাসতে হাসতে বললেন, 'তোমাদের কারোরই মনে নেই ছাতাটা আনার কথা!'

'অনন্তভাবময় ঠাকুরকে তোরা তোদের গণ্ডিতে বুঝি আবদ্ধ করে রাখতে চাস্? আমি এ গণ্ডি ভেঙ্গে তাঁর ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব।'—এ কথা বলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর জনাকয়েক ভক্তভাইকে। সত্যিসত্যিই, বিশ্বমাঝে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন ঠাকুরের ভাবকে। আসলে, ঠাকুর তাঁর নরেন্দ্রকে অবলম্বন করেই যুগধর্ম প্রচার করেছেন ও করছেন। স্বামীজী এ আপ্ত আশ্বাস দিয়েছেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে বিশ্বব্যাপী আধ্যাত্মিক নবোন্মেষ ও বিশ্বমৈত্রীর নবযুগের অভ্যুদয় হয়েছে, আর যত দিন যাবে ততই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব যুগের পরম প্রয়োজন মেটাতে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে।

পাকা ডুবুরির মতো স্বামীজী রামকৃষ্ণ-মহাসমুদ্র থেকে অমেয় ঐশ্বর্য আহরণ করে গোটা মানবজাতিকে উপহার দিয়ে গেছেন, প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাতের মতো জগৎটাকে প্লাবিত করেছেন গুরুর বাণীতে। শ্রীরামকৃষ্ণ যেন বেদ, স্বামীজী তার ভাষ্য।

এই পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মরণে তাই কবি সুন্দর গেয়েছেন—

'সীমাকে বীচ অসীম দেশকা
কোন্ অতিথি আয়া রে!'

ঠাকুর নিজেই নিজেকে 'অচিন গাছ' বলে বর্ণনা করেছেন। মহাকবি গিরিশচন্দ্র নতজানু হয়ে করজোড়ে বলেছিলেন, 'ব্যাস বাল্মীকি যাঁর কথা বলে অন্ত করতে পারেননি আমি তাঁর সম্বন্ধে বেশী আর কি বলতে পারি।' অন্যে পরে কা কথা! তাই বলি: সত্যস্বরূপ, প্রেমমূর্তি, ত্যাগিশ্রেষ্ঠ, অধ্যাত্ম-সম্রাট, সর্বধর্মসমন্বয়কারী পরমভাগবত আনন্দ-ঘন অশেষকল্যাণময় শ্রীরামকৃষ্ণকথা শ্রবণ-মঙ্গল।

আজ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পুণ্য আবির্ভাবতিথিতে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম

জানাই ও প্রার্থনা করি যেন পৃথিবীর সকল মানুষ তাঁর অসীম কৃপায় শান্তি ও আনন্দ লাভ করে।

'রামকৃষ্ণমহং বন্দে পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽপি যোঽবতীর্ণো যুগে যুগে ॥'*

* শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে আকাশবাণীর কলিকাতা কেন্দ্র হইতে গত ১০.৩.৭৮ তারিখে সম্প্রচারিত এই বক্তৃতাটি আকাশবাণীর সৌজন্যে প্রকাশিত।

দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়

ডক্টর রমা চৌধুরী

(অষ্টম পর্যায়)

শ্রীকণ্ঠের 'বিশিষ্টশিবাদ্বৈতবাদ'

[

পূর্বে ব্রহ্মের পঞ্চকর্মের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। একমাত্র ব্রহ্মই যে জীব-জগৎ-সংবলিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অভিন্ন নিমিত্ত ও উপাদান কারণ —এই মূলীভূত তত্ত্বটি বেদান্ত-দর্শনে সর্বত্রই সগৌরবে স্বীকৃত। এমন কি, অদ্বৈত-বেদান্ত-মতবাদেও, ব্যাবহারিক দিক থেকে ঈশ্বরকে জীব-জগতের অভিন্ন নিমিত্ত ও উপাদান কারণরূপে এবং তাঁকে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের একমাত্র কারণরূপে সানন্দে গ্রহণ করা হয়েছে।

এস্থলে একটি মূলীভূত সমস্যার উদ্ভব হয় স্বতঃই। সেটি হ'ল এই যে, সর্ববাদিসম্মতি-ক্রমে ব্রহ্ম নির্বিকার—সকল প্রকার বিকার অথবা পরিবর্তন-পরিণামবিহীন। সেক্ষেত্রে তিনি কিরূপে জীব-জগতে পরিবর্তিত-পরিণত হ'তে পারেন?

স্বীকার করতেই হয় যে, এটি একটি গুরুতর সুকঠিন প্রশ্ন জগৎসত্যত্ববাদী বৈদান্তিকদের সম্মুখে। কারণ, একদিকে ব্রহ্ম নির্বিকার অথবা পরিণামহীন; অন্যদিকে তিনি জীব-জগৎ-স্রষ্টারূপে পরিণামশীল—তা কি ক'রে হয়? সেজন্য এই আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধদোষদুষ্ট তত্ত্বের একমাত্র সম্ভাব্য ব্যাখ্যারূপে, এই কথাই তাঁদের বলতে হয় যে, ব্রহ্মের সৃষ্টিপ্রমুখ কর্ম একটি বিশেষ শ্রেণীর কর্ম, যার পূর্বে কোনোরূপ অতৃপ্ত কামনা নেই, পরেও নেই কোনোরূপ আপ্রাণ প্রচেষ্টা—কিন্তু এ হ'ল প্রকৃতকল্পে ব্রহ্মের 'স্বরূপ', যা কর্মরূপে প্রকটিত হয়। যেমন, সূর্য তার রশ্মিবিকিরণ করছে, বায়ু দিকে বিদিকে প্রবাহিত হচ্ছে, নদী ধাবিত হচ্ছে, পুষ্প গন্ধবিতরণ করছে,—এগুলি কি তাদের 'স্বরূপ', না 'ক্রিয়া'? বলা কঠিন। কারণ, এই সব ক্ষেত্রে 'স্বরূপ' ও 'ক্রিয়া' যেন এক ও অভিন্ন। এই কারণে, এই সকল 'ক্রিয়া'র দ্বারা সেই সকল বস্তুর স্বরূপের কোনোদিন পরিবর্তন হয় না। একই ভাবে ব্রহ্মের 'পঞ্চকৃত্যে'র দ্বারা ব্রহ্মের মধ্যেও কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় না, অথচ জীব-

জগৎ তাঁর স্বরূপের সাক্ষাৎ প্রকাশরূপে তাঁরই ন্যায় নিত্যসত্য। কেবলমাত্র এই ভাবেই ব্রহ্মের নির্বিকারত্ব ও জীব-জগতের সত্যত্ব রক্ষা করা যায়। অতএব বলতে হয় যে, ব্রহ্মের স্বরূপ দ্বিবিধ—static বা নিষ্ক্রিয়; এবং dynamic বা সক্রিয়। প্রথমটির উদাহরণ হ'ল—সচ্চিদানন্দরূপত্ব নিত্যশুদ্ধত্ব নিত্যবুদ্ধত্ব নিত্যমুক্তত্ব নিত্যপূর্ণত্ব পরমকরুণাময়ত্ব প্রভৃতি। দ্বিতীয়টির উদাহরণ হ'ল—জগৎস্রষ্টৃত্ব-পালয়িতৃত্ব-হর্তৃত্ব, মোক্ষদাতৃত্ব প্রভৃতি। বস্তুতঃ কেবল এই অর্থেই ব্রহ্মকে 'সক্রিয়' বলা চলে। কিন্তু সাধারণ কর্মের ক্ষেত্রে যা বলা চলে, এক্ষেত্রে তা একেবারেই বলা চলে না, অর্থাৎ ব্রহ্ম নূতন কিছু করছেন, নূতন কোনো রূপ ধারণ করছেন, নূতন কোনো কিছুতে পরিণত হচ্ছেন, নূতন কোনো কার্য সৃষ্টি করছেন, নূতন লক্ষ্যে উপনীত হচ্ছেন, এবং তজ্জন্য বিশেষ বিশেষ উপায়াদি অবলম্বন করছেন, ইত্যাদি কথা একেবারেই বলা চলে না। বস্তুতঃ সর্ববাদিসম্মত বৈদান্তিক মতে, ব্রহ্ম নিত্যপূর্ণ—সেজন্য, তাঁর ক্ষেত্রে আর নূতন কিছুই হতেই পারে না—না নূতন স্বরূপ, না নূতন গুণ, না নূতন শক্তি, না নূতন আলোক, না নূতন অমৃত, না নূতন আনন্দ, না নূতন সৌন্দর্য, না নূতন মাধুর্য, না নূতন ঐশ্বর্য—এক কথায়, না নূতন কিছুই। সেজন্য সৃষ্টিরহস্য হ'ল এই যে, সৃষ্টি নির্বিকার ব্রহ্মের স্বরূপ-প্রকাশ; লয় তাঁর স্বরূপ-বিলয়। বন্ধ তাঁর স্বরূপাবরণ, মোক্ষ তাঁর স্বরূপাবরণ-উত্তোলন। এ ছাড়া, আর কি-ই বা বলা যায় এক্ষেত্রে?

কিন্তু, হায়, সমস্যার ত সমাধান হ'লই না এরূপে; উপরন্তু আরো যেন ঘনীভূত হ'ল—যেহেতু যদি এরূপ প্রকাশ-বিলয়, আবরণ-আবরণাভাব, আবির্ভাব-তিরোভাব ব্রহ্মের সত্য বা প্রকৃত অবস্থা হয়, তা হ'লে তিনি যে সবিকার, পরিবর্তনভাগী, পরিণামশীল—এই দুঃখজনক সিদ্ধান্ত ত অপরিহার্য হয়েই পড়ে—কারণ প্রকাশের অবস্থা ও বিলয়ের অবস্থা নিশ্চয়ই এক নয়। কিন্তু অন্য পক্ষে, যদি এরূপ প্রকাশ-বিলয়াদি সত্য না হয়, তা হ'লে ত অদ্বৈতবেদান্ত-মতবাদই—মায়া-মিথ্যাবাদই এসে পড়ে তুল্য অনিবার্যভাবে। তা হ'লে উপায়?

উপায় ত কিছুই নেই যুক্তির দিক থেকে। আছে কেবল শ্রুতিই ভরসা—যার ফলেই আমাদের শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নিতে হয়েছে 'অচিন্ত্যভেদাভেদের' নির্বাক নিরাপদ ছায়াতলে। অর্থাৎ একদিকে সৃষ্টি নিশ্চয়ই আছে, তাকে ত কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যায় না অন্য দিকে তাকে ত কোনোক্রমেই ব্যাখ্যাও করা যায় না। সুতরাং তা 'অচিন্ত্য', 'অবাঙ্‌মানসগোচর'— বাক্যমনের অতীত, যুক্তি-বিচারের অতীত, ন্যায়-শাস্ত্র দর্শন-শাস্ত্রের অতীত। কত পুঙ্খানুপুঙ্খ যুক্তি-বিচার, কত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা-প্রপঞ্চনা, কত কঠিনাতিকঠিন তত্ত্ব-মতাবলী—তাদের সম্মিলিত, আপ্রাণ প্রচেষ্টার এই ত ফল! জগৎসত্যত্ববাদিগণের এই ত শোচনীয় পরিণাম! অথবা সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁরা 'যেন তেন প্রকারেণ' তাঁদের সুবিখ্যাত 'আনন্দতত্ত্ব' ও 'লীলাবাদে'র মাধ্যমে ব্যাখ্যা দিতে পেরেছেন। কিন্তু সৃষ্টির প্রণালী সম্বন্ধে এমন কি সেরূপও ব্যাখ্যা দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি শেষ পর্যন্ত। কিন্তু শেষ পর্যন্তই, তাতে কি আসে যায়? ব্রহ্ম আছেন, জীবও আছেন, জগৎও আছে—এই প্রত্যক্ষলব্ধ সার্বজনীন সত্যটি ত তাতে মিথ্যা হয়ে যাবে না—যেহেতু, বলাই বাহুল্য যে 'সত্য' 'তর্কে'রও

বহু ঊর্ধ্বে—যুক্তিরও বহু উচ্চে।

প্রকৃতকল্পে, এমন কি, জগতের শ্রেষ্ঠ সাহসী, আত্মবিশ্বাসী, সাম্য-ঐক্যপূজারী অদ্বৈতবেদান্ত-দর্শনকেও ত একপদ অগ্রে থেমে যেতে হয়েছে শেষ লক্ষ্য থেকে—'একমেবাদ্বিতীয়মে'র (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৬।২।১) পরিপূর্ণ স্থাপনা থেকে—যেহেতু এক্ষেত্রেও শেষ পর্যন্ত 'মায়া' ত থেকেই গেল, ব্রহ্মের মধ্যে না হ'লেও, ব্রহ্মের পাশাপাশি না হ'লেও পূর্ববৎ 'যেন তেন প্রকারেণ'—ঠিক কোথায়, তা নিয়ে অসংখ্য-অজস্র, আপাত-দৃষ্টিতে ব্যর্থ-নিরাশ যুক্তি-বিচার, ভাবনা-চিন্তা, আলোচনা-প্রপঞ্চনাদি চলেছে আজও অব্যাহত গতিতে।

অতএব 'মা ভৈষীঃ'! ব্রহ্ম বা ঈশ্বর আছেনই—তাঁকে অস্বীকার করবেন কে? পুনরায়, জীব-জগৎকেও বা অস্বীকার করবেন কে? বস্তুতঃ পারমার্থিক বা অপারমার্থিক, যেদিক দিক থেকেই হোক না কেন, তিনিও আছেন, আমরাও আছি, ঠিক কি ক'রে, তা দর্শন-ন্যায়-শাস্ত্রের বাঁধাধরা কাঠামোতে উপস্থাপিত করতে না পারলেও সর্বদা সর্বত্র সেই 'ত্রি-তত্ত্বে'র মহিমা গরিমা মধুরিমা অক্ষুণ্ণই থাকবে শাশ্বতকাল নিশ্চয়ই।

অন্যান্য ভক্তিবাদী এবং দ্বৈতাদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণের ন্যায় শ্রীকণ্ঠও ব্রহ্মের অপার্থিব দিব্যদেহ, তাঁর অপার্থিব দিব্যধাম, তাঁর অপার্থিব দিব্যদেহধারী মুক্তজীবরূপী লীলা-সহচরদের কথা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে আমরা দেখি যেন আমাদের নিজেদেরই পূর্ণতর উচ্চতর শুদ্ধতর সুন্দরতর সুখিতর রূপ—সেই বৃহৎ বৃহৎ রম্য-হর্ম্য, নবদূর্বাদলশ্যাম সুবিস্তৃত প্রান্তর, বনোপবন, প্রমোদোদ্যান, ফলপুষ্প, নদনদী, পাহাড়পর্বত, বেশভূষা, প্রসাধন-অলঙ্কারাদি, ভোজ্য-পানীয়-প্রমুখ সর্বসুখভোগের উপকরণাদির প্রাচুর্য। একে বলা হয় 'Anthropomorphism' অথবা ব্রহ্ম বা ঈশ্বরে 'মানবিক-ভাবারোপ'। অবশ্য অদ্বৈত-বেদান্তমতে এই তত্ত্বটি একেবারেই অসত্য, মিথ্যা, হাস্যোদ্রেককর। কারণ, জীব যদি থাকেনই, তিনি থাকবেন চিরকাল ব্রহ্ম থেকে পরিমাণগত (Quantitative) এবং গুণগত (Qualitative) দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেক্ষেত্রে জীবের পৃথিবীর অট্টালিকাদি, বনোপবনাদি, ভোগোপকরণাদি ব্রহ্মলোকে টেনে নেওয়া কি চরম নির্বুদ্ধিতা নয়? নিশ্চয়ই না—উত্তর দেবেন প্রাজ্ঞশ্রেষ্ঠ ভক্তপ্রবর অসংখ্য জনেরা—নিশ্চয়ই না—যেহেতু জীবের মধ্যেও ত সেই একই পরব্রহ্ম বিরাজিত। সেজন্য নির্ভয়ে বলা চলে যে, জীব ঈশ্বর সম্বন্ধে যা ভাবেন, ঈশ্বর নিজের সম্বন্ধেও ঠিক সেই একই কথা ভাবেন—জীবেশ্বরের মধ্যে এই সত্তাগত স্বরূপগত সাম্য ঐক্য সমতা সমন্বয়ই ত ভক্তি-বাদী ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদী বেদান্তদর্শনের প্রাণের কথা—যে মতানুসারে ঈশ্বর জীবের আত্মারূপ নির্মল দর্পণে নিত্য-প্রতিফলিত; এবং সেজন্য জীব ঈশ্বর সম্বন্ধে যা ধারণা করেন, তা সত্য-সত্যই সত্য ধারণা, এবং একেই বলা হয়েছে 'Objective Anthropomorphism' অর্থাৎ 'ঈশ্বরে বাস্তব মানবিক-ভাবারোপ', এবং এটি পড়ে সত্য জ্ঞানোপলব্ধির পর্যায়ে। অন্যপক্ষে 'Subjective Anthropomorphism' বা 'ঈশ্বরে অবাস্তব মানবিক-ভাবারোপ'ই কেবল সত্য জ্ঞান নয়, শূন্যগর্ভ আবেগোচ্ছ্বাস; অলীক কল্পনা, 'স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু' মাত্র; এবং এটিই হ'ল অনিষ্টজনক, যেহেতু এক্ষেত্রে জীবের আত্মারূপ দর্পণটি নির্মল নয় ব'লে

সেখানে ব্রহ্মের স্বরূপ যথার্থভাবে প্রতিফলিত হ'তে পারে না। এই কারণে, শুদ্ধ সাধকের শুদ্ধ আত্মা শ্রীভগবান সম্বন্ধে যা ভাবেন, তার মূল্য অনেক, দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকেও।

সেজন্য শ্রীকণ্ঠও নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে নির্দ্বিধায় পরব্রহ্মকেও শ্রেষ্ঠপুরুষ, পুরুষোত্তমরূপে অর্চনা ক'রে ধন্যাতিধন্য হয়েছেন।

সুবিখ্যাত 'ত্রিতত্ত্বে'র প্রথম তত্ত্ব 'ব্রহ্ম' সম্বন্ধে শ্রীকণ্ঠ-বেদান্তের মতবাদ সম্বন্ধে পূর্বে কিছু বলা হয়েছে। এরূপ 'ত্রিতত্ত্বে'র দ্বিতীয় তত্ত্ব 'চিৎ' বা জীব সম্বন্ধে শ্রীকণ্ঠের মতবাদ অন্যান্য জগৎ-সত্যত্ববাদী, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, একেশ্বরবাদী, ভক্তিবাদী বৈদান্তিকের সমতুল। তাঁর মতেও, জীব নিত্য, জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা, কর্তা, ভোক্তা; পরিমাণে অণু; এবং সংখ্যায় বহু; এবং এরূপ জ্ঞাতৃত্ব-কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-অণুত্ব-বহুত্ব ঔপাধিক বা মিথ্যা নয়, স্বাভাবিক বা সত্য; এবং সেজন্য মুক্তজীবও জ্ঞাতা-কর্তা-ভোক্তা-বহু।—অবশ্য অণু নয়, বিভু (নিম্নে দেখুন)

'ত্রিতত্ত্বে'র তৃতীয় তত্ত্ব 'অচিৎ' বা জগৎ সম্বন্ধেও শ্রীকণ্ঠ-বেদান্তে নূতন কথা কিছু নেই।

তারপর আসছে সৃষ্টিতত্ত্বে সমতুল আরেকটি দুর্বোধ্য তত্ত্ব—সম্বন্ধতত্ত্ব 'এক' ও 'বহু'—ব্রহ্ম ও জীব এবং জগতের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ কি? এই বিষয়ে শ্রীকণ্ঠের মতবাদ বহুলাংশে রামানুজের মতবাদের সমতুল; এবং সেজন্য শ্রীকণ্ঠ-বেদান্তের সর্বজনবিদিত সর্বজনসমাদৃত নামটিও রামানুজ-বেদান্তের নামেরই ন্যায়— 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ'—কেবল সাম্প্রদায়িক দিক থেকে, একে বলা হয় 'বিশিষ্টশিবাদ্বৈতবাদ'।

প্রথমতঃ এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে, ব্রহ্ম জীব-জগৎ থেকে ভিন্ন—যেহেতু ব্রহ্ম স্বভাবতঃই সকল পূর্ণতা-পবিত্রতা-কল্যাণ-ঘনতা-আনন্দময়তা-অমৃতরসমধুরতার একীভূত আধার যা জীব-জগৎ নয়। জীব জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা হ'লেও, ব্রহ্মের ন্যায় সর্বজ্ঞ প্রভৃতি নন; সক্রিয় হ'লেও, ব্রহ্মের ন্যায় সর্বশক্তিমান প্রভৃতি নন; অংশযুক্ত অংশী হলেও, ব্রহ্মের ন্যায় নির্বিকার প্রভৃতি নন। জগৎও জড়-ময়, অশুদ্ধ-অপূর্ণ, আলোক-আনন্দ-অমৃতবিহীন। অতএব সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম এবং পাপ-তাপ-ক্লেশ-ক্লেদ-রোগ-ভোগ-দুঃখ-দুর্গতি প্রভৃতির আধার জীব-জগৎ নিশ্চয় পরস্পর-ভিন্ন।

পুনরায়, পরব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডের শাসক ও পরিচালক; স্রষ্টা, পালনকর্তা ও ধ্বংসকর্তা; জীবের উপাস্য দেবতা; স্বতন্ত্র, সর্বশক্তিমান প্রভৃতি। বলাই বাহুল্য, বদ্ধজীব এ সবেরই সম্পূর্ণ বিপরীত। এমন কি, মুক্তজীবও সর্বশক্তিমান নন, যেহেতু তাঁর ব্রহ্মতুল্য অন্যান্য সকল গুণ ও শক্তি থাকলেও, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ হবার শক্তি তাঁর একেবারেই নেই (নিম্নে দেখুন)। অতএব স্বীকার করতেই হয় যে, কেবল বদ্ধজীব কেন, এমন কি, স্বয়ং মুক্তজীবও ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন। সেক্ষেত্রে জগৎ যে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন হবে, তা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু এ ত হ'ল ব্রহ্ম ও জীব-জগতের সম্বন্ধের একটি দিকই মাত্র। অন্য আরেকটি তুল্যমূল্য দিকও আছে—তা হ'ল তাঁদের মধ্যে অভেদ-সম্বন্ধের দিক। প্রথম দিকটিকে যেমন অস্বীকার করা যায় না, দ্বিতীয় দিকটিকেও ত ঠিক তাই। তার কারণ হ'ল এই যে, সর্ববাদিসম্মতিক্রমে, ব্রহ্ম পরম কারণ, এবং জীব-জগৎ তাঁর সৃষ্ট কার্য; এবং এ কথা অনস্বীকার্য যে, কারণ ও কার্য স্বরূপতঃ এক

ও অভিন্ন হতে বাধ্য। এ কথা অতি সহজ-গম্য; এবং পূর্বে বহুবার বলাও হয়েছে, অতি সাধারণ দৃষ্টান্তের সাহায্যে। যেমন, কারণ-স্বরূপ একটি মৃৎপিণ্ড থেকে কার্যস্বরূপ মৃন্ময় ঘটের উদ্ভব হয়, এবং তার পদ্ধতি হ'ল এই যে, কারণস্বরূপ মৃৎপিণ্ডই কার্যস্বরূপ মৃন্ময় ঘটে পরিণত বা রূপান্তরিত হয়; এবং সেজন্য স্বভাবতঃই কারণ মৃৎপিণ্ড মৃত্তিকাস্বরূপ ব'লে কার্য মৃন্ময় ঘটও মৃত্তিকাস্বরূপ হতে বাধ্য, যেহেতু কারণ মৃৎপিণ্ড থেকে স্বুবর্ণ-রৌপ্য-লৌহ— বা অন্য কোনো প্রকারের ঘট পাওয়া যায় না একেবারেই; কেবল মৃন্ময় ঘটই পাওয়া যায়। একই ভাবে ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্ম থেকে ব্রহ্মস্বরূপ জীব-জগৎই কেবল উদ্ভূত হতে পারে, অন্যস্বরূপ কিছু নিশ্চয়ই নয়। অতএব স্বীকার করতেই হয় যে, কারণ ব্রহ্ম, এবং কার্য জীব-জগৎ স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন।

পুনরায়, ব্রহ্ম জীবজগৎকে পরিব্যাপ্ত ক'রে রেখেছেন সম্পূর্ণভাবেই; এবং এই তত্ত্বটিও ত উপরের কার্য-কারণ-তত্ত্ব থেকেই প্রমাণিত হয়। কারণ, উপরে বলা হয়েছে যে, কারণ-স্বরূপ ব্রহ্ম স্বয়ং কার্যস্বরূপ জীব-জগতে পরিণত হন। সেক্ষেত্রে স্বয়ং ব্রহ্মই ত জীব-জগতের সর্বত্রই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই সগৌরবে সানন্দে সাদরে সাগ্রহে সানুগ্রহে বিরাজমান। সেক্ষেত্রে ব্রহ্ম ও জীব-জগৎ এক ও অভিন্ন হ'তেও ত বাধ্য, যেহেতু ব্রহ্ম জীব-জগৎকে পরিব্যাপ্ত ক'রে থাকবেন, জীব-জগতের মধ্যে লীন বা নিহিত হয়ে থাকবেন, অথচ জীব-জগৎ থেকে ভিন্নস্বরূপ হবেন, তা-ই বা হতে পারে কি ক'রে? যেমন এক জলপূর্ণ পাত্রের ওপর তেল ঢেলে দিলে, তা জলের সঙ্গে মিশে যায় না, বরং জলের ওপর স্বতন্ত্রভাবে ভাসতে থাকে। এস্থলে জল ও তেলের মধ্যে সহাবস্থিতি থাকলেও অভিন্নতা নেই, যেহেতু এস্থলে একই পাত্রে জল ও তেল উভয়ই রয়েছে একত্রে, অথচ স্বতন্ত্রভাবেই রয়েছে। অপর পক্ষে সেই জলপূর্ণ পাত্রটির ওপর দুধ ঢেলে দিলে, তা জলের সঙ্গে মিশে যায় একেবারে, তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না; এবং যদিও প্রকৃতকল্পে জল ও দুধ সর্বদাই দুটি ভিন্ন বস্তু, পরস্পর ভিন্ন বস্তু, তা হ'লেও এক্ষেত্রে তাদের আর আলাদা করা যায় না। সেজন্য এক্ষেত্রে জল ও দুধের মধ্যে সহাবস্থিতি এমনভাবে ঘটছে যে, জল ও দুধের মধ্যে আর প্রভেদ করা যাচ্ছে না। অর্থাৎ দুধ জলকে এমন ভাবে পরিব্যাপ্ত ক'রে ফেলেছে যে, দুধ ও জল এক হয়ে যাচ্ছে, অভিন্ন হয়ে যাচ্ছে অনিবার্যভাবেই। এক্ষেত্রে অবশ্য দুধ জলে পরিণত হয়ে কারণরূপে তাকে সৃষ্টি করছে না—তাতেই দুধ ও জল এক ও অভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। ব্রহ্ম ও জীব-জগতের ক্ষেত্রে ত তার চেয়েও অনেক বড় জিনিস ঘটছে, তার চেয়েও অনেক বেশী জিনিস ঘটছে—যেহেতু সেস্থলে একদিক থেকে ব্রহ্ম কারণরূপে জীব-জগতে সত্যসত্যই পরিণত রূপান্তরিত লীলায়িত হয়ে জীব-জগৎ সৃষ্টি করছেন কার্য-রূপে। পুনরায়, অন্য দিক থেকে, ব্রহ্ম ব্যাপকরূপে জীব-জগৎকে ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্তও ক'রে আছেন ব্যাপ্যরূপে। সুতরাং যতই আশ্চর্যজনক মনে হোক না কেন, যতই অসম্ভব মনে হোক না কেন— এই তত্ত্বটি মেনে নিতে হয়ই যে, ব্রহ্ম ও জীব-জগৎ স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন।

এরূপে, আমাদের একই সঙ্গে ব্রহ্ম ও জীব-জগতের মধ্যে 'ভেদ' ও 'অভেদ' উভয়ই স্বীকার ক'রে নিতে হয় সমভাবে। কিন্তু তা হ'লে কি একথাও একই সঙ্গে স্বীকার

ক'রে নিতে হয় যে, 'ভেদ' ও 'অভেদ' উভয়ই সমসত্য, সমমূলীভূত, সম-অত্যাবশ্যক ? শ্রীকণ্ঠ এর উত্তরে সজোরে বলছেন—না, তা নয় একেবারেই। বস্তুতঃ তিনি নিম্নলিখিত তিনটি মতবাদকে সমান অযৌক্তিক ও অগ্রহণীয় বলে মনে করেন :

(১) অত্যন্ত-ভেদ-বাদ অথবা দ্বৈতবাদ। এই মতানুসারে ব্রহ্ম ও জীব-জগৎ ঘট ও পটের ন্যায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু এই মতবাদ সম্পূর্ণরূপেই অযৌক্তিক, যেহেতু কারণ ও কার্যের মধ্যে এরূপ অত্যন্ত-ভেদ থাকতে পারে না, যেহেতু একথা অনস্বীকার্য যে, কারণ ও কার্য স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন, যখন স্বয়ং কারণই কার্যে পরিণত হয়ে কার্যটিকে সৃষ্টি করছে।

(২) অত্যন্ত-অভেদ-বাদ বা অদ্বৈতবাদ। এই মতানুসারে কারণ ও কার্য স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন সম্পূর্ণরূপেই ; যেমন, রজ্জু-সর্প-ভ্রম-কালে রজ্জু ও সর্প সম্পূর্ণরূপেই এক ও অভিন্ন অর্থাৎ কেবল রজ্জুই আছে প্রকৃতকল্পে, সর্প নেই—সর্প মিথ্যাই মাত্র। কিন্তু এই মতবাদও পূর্ববৎ সম্পূর্ণরূপেই অযৌক্তিক, যেহেতু প্রথমতঃ, এই মতানুসারে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জীব-জগৎ মিথ্যা মায়াই মাত্র। কিন্তু পূর্বেই যা বলা হয়েছে, সেই যুক্তি অনুসারে, ব্রহ্ম ও জীব-জগৎ সমসত্য, সমনিত্য হ'তে বাধ্য, যেহেতু জীব-জগৎ ব্রহ্মেরই সাক্ষাৎ পরিণাম, মূর্ত রূপ, লীলায়িত বিকাশ।

(৩) ভেদাভেদবাদ। এই মতানুসারে ব্রহ্ম ও জীব-জগতের মধ্যে ভেদ ও অভেদ উভয়ই আছে ; কেবল তাই নয়, ভেদ ও অভেদ সমসত্য।

কিন্তু তথাকথিত সমন্বয়মূলক মতবাদও পূর্ব দু'টি মতবাদের ন্যায় সম্পূর্ণরূপেই অযৌক্তিক—যেহেতু 'ভেদ' ও 'অভেদ' স্বভাবতঃই পরস্পরবিরোধী, তাদের সহাবস্থান অসম্ভব।

তা হ'লে উপায় ? এই তিনটি ব্যতীত বিকল্প আর কোথায় ? সেজন্য এই তিনটি মতবাদকেই যদি অযৌক্তিক ব'লে অগ্রাহ্য করা যায়, তা হ'লে ব্রহ্ম ও জীব-জগতের প্রকৃত সম্বন্ধ কি ?

বলছেন, রামানুজেরই সঙ্গে সুর মিলিয়ে যে, ব্রহ্ম ও জীব-জগতের সম্বন্ধ একটি বিশেষ প্রকারের, একটি অভিনব ধরনের যা নিজস্ব মহিমায় সমুজ্জ্বল এবং যা অন্যত্র কোথাও বলা হয়নি। কি সেই অত্যাশ্চর্য, নূতন প্রকারের সম্বন্ধ ? তা হ'ল আত্মা ও দেহ, দ্রব্য ও গুণ, কারণ ও কার্যের মধ্যে প্রকৃত শাশ্বত সম্বন্ধ। এক অর্থে, এক দিক থেকে আত্মা ও দেহ, দ্রব্য ও গুণ, কারণ ও কার্য অভিন্ন—যেহেতু আত্মা ও দেহ, দ্রব্য ও গুণ, কারণ ও কার্য একটি অচ্ছেদ্য অঙ্গাঙ্গি-সম্বন্ধে আবদ্ধ ; এবং একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটিকে চিন্তাই করা যায় না। যেমন সাংসারিক দিক থেকে আত্মা থাকলেই তার আধারস্বরূপ দেহও আছে ; এবং দেহ থাকলেই তার আশ্রয়স্বরূপ আত্মাও আছে। একই ভাবে দ্রব্য থাকলে তার প্রকাশরূপ গুণ থাকবেই থাকবে ; এবং গুণ থাকলে তার আধারস্বরূপ দ্রব্যও থাকবেই থাকবে। একই ভাবে কারণ থাকলেই তার সৃজ্য কার্য থাকবেই থাকবে ; এবং কার্য থাকলেই তার স্রষ্টৃরূপ কারণও থাকবেই থাকবে।

একই ভাবে আত্মা ও দেহ, দ্রব্য ও গুণ এবং কারণ ও কার্যের ন্যায় ব্রহ্ম ও জীব-জগৎ অবিচ্ছেদ্য অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধে আবদ্ধ এবং জীব-জগৎ

ব্যতীত ব্রহ্মকে এবং ব্রহ্ম ব্যতীত জীব-জগৎকে ভাবাই যায় না। জীব-জগৎ ব্রহ্মের স্বগত-ভেদ বা অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং সেজন্য ব্রহ্ম আছেন ব'লে তাঁর স্বগতভেদ বা অবিচ্ছেদ্য অংশ জীব-জগৎও তাঁরই সঙ্গে সমানে আছেন।

এরূপে এস্থলে 'অভেদে'র অর্থ 'একত্ব' নয়—'অনন্যত্ব' অথবা—'স্বভাবজ-পরস্পরা-শ্রয়িত্বম্'। যদি বস্তুদ্বয়ের একটিকে অপরটি ভিন্ন চিন্তামাত্র করা না যায়, তা হ'লে তাদের নিশ্চয়ই বলতে হবে 'অনন্য' বা 'অভিন্ন'—অর্থাৎ একটিকে অপরটি থেকে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র বা পৃথক্ করা যায় না একেবারেই। যথা, আত্মা ও দেহ যে 'এক', তা ত কেউই বলবেন না—আত্মা অজড়, দেহ জড় ইত্যাদি কতই না ভেদ তাদের মধ্যে। অথচ তারা 'অভিন্ন' নিশ্চয়, এই অর্থেই যে তারা 'অনন্য' অর্থাৎ তাদের একটিকে অপরটি থেকে 'ভিন্ন' করাই যায় না কোনোদিনও, কোনোক্রমেই, কোনোদিক থেকেই।

অন্যদিকে তাদের উভয়ের মধ্যে যে ভেদও আছে, তা ত সর্বজনবিদিত সত্য। বিশেষ জোরের সঙ্গেই শ্রীকণ্ঠ বলছেন এই প্রসঙ্গে: "কার্যকারণয়োরনন্যত্বেঽপি কার্যভূতাৎ চিদচিৎ-প্রপঞ্চাৎ কারণমত্রাধিকমেব। তথা ভেদনি-র্দেশাৎ। অতো বিশ্বাদধিকমেব শিবাপর-নামধেয়ং ব্রহ্ম। ন বয়ং ব্রহ্মপ্রপঞ্চয়োরত্যন্তমেব ভেদবাদিনঃ ঘটপটয়োরিব; ন বা অত্যন্তা-ভেদবাদিনঃ শুক্তিরজতয়োরিব। ন চ ভেদা-ভেদবাদিনঃ, বস্তুবিরোধাৎ। কিন্তু শরীর-শরীরিণোরিব গুণগুণিনোরিব চ বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদিনঃ। প্রপঞ্চব্রহ্মণোরনন্যত্বং নাম মৃদ্ঘট-য়োরিব গুণগুণিনোরিব চ কার্যকারণত্বেন বিশেষণ-বিশেষ্যত্বেন চ বিনাভাবরহিতত্বম্। যেন বিনা যন্ন জ্ঞায়তে তৎ তেন বিশিষ্টম্। তত্ত্বং[১] চ তস্য স্বভাব এব। অতঃ সর্বথা প্রপঞ্চাবিনাভূতং ব্রহ্ম। তস্মাদনন্যদিত্যুচ্যতে। ভেদশ্চ স্বাভাবিকঃ। ততশ্চ বিশ্বস্মাদধিকমেব পরংব্রহ্ম॥" (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ২।১।২২) অর্থাৎ 'অধিকন্তু ভেদ-নির্দেশাৎ' (ব্রহ্মসূত্র ২।১।২২)—এই সুবিখ্যাত সূত্রের ভাষ্য বা ব্যাখ্যায় শ্রীকণ্ঠ পরিষ্কারভাবে বলছেন: "কার্য এবং কারণ অনন্য হ'লেও কার্যস্বরূপ চিদচিৎবিশিষ্ট প্রপঞ্চ থেকে কারণস্বরূপ ব্রহ্ম 'অধিক' নিশ্চয়ই। সেজন্যই তাদের মধ্যে ভেদও আছে নিশ্চয়ই। অতএব শিবনামধারী ব্রহ্ম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে 'অধিক' নিশ্চয়ই। আমরা একথা বলি না যে, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ড ঘট ও পটের ন্যায় পরস্পর অত্যন্তভিন্ন। পুনরায়, আমরা এ কথাও বলি না যে, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ড শুক্তি ও রজতের ন্যায় পরস্পর অত্যন্ত-অভিন্ন। পুনরায়, আমরা একথাও বলি না যে, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ভেদ ও অভেদ দুই-ই রয়েছে। কারণ তা'ত বিরোধদোষদুষ্ট হবে। কিন্তু আমরা অত্যন্ত-ভেদবাদী, অত্যন্ত-অভেদবাদী, ভেদাভেদবাদী—কিছুই নই—আমরা কেবল 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী'। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ড 'অনন্য', যেমন আত্মা ও দেহ, দ্রব্য ও গুণ, বিশেষ্য ও বিশেষণ 'অনন্য', যেহেতু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই একটি বিনা অন্যটি থাকতেই পারে না ('বিনাভাবরহিতত্বম্')। যা (গুণ) ছাড়া যা (দ্রব্য) জানাই যায় না তা (দ্রব্য) তার (গুণের) দ্বারাই বিশিষ্ট। তাই (দ্রব্য) হ'ল তার (গুণের) স্বরূপ। অতএব ব্রহ্ম সর্বপ্রকারেই ব্রহ্মাণ্ড থেকে অভিন্ন। সেজন্যই বলা হয়েছে যে, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ড অনন্য। উভয়ের মধ্যে ভেদও স্বভাবগত। অতএব, ব্রহ্ম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে 'অধিক'।" [ক্রমশঃ]

১ তত্ত্বম্=তৎ+ত্ব। অর্থাৎ 'তৎ'-এর ভাব। 'তস্য ভাবস্ত্বতলৌ'—পাণিনি

দুই বিন্দু জল

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

দু ফোঁটা চোখের জল
গঙ্গোত্রী নির্ঝর সম স্বচ্ছ সুনির্মল।
জগতের অপার বিস্ময়
বুকে তার মোহ শোক করুণা প্রেমের অগাধ সঞ্চয়
অশ্রুময় মৌন পরিচয়!
শুকায় না, ফুরায় না, অন্তরের নির্মল নির্ঝর—
জীবনেত্রে নামে ঝর ঝর।
মূঢ় জীব করে অন্বেষণ কোথা উৎস তার!
অস্থি মাংস শোণিতে লোহিত
ক্ষুদ্র জীবতনু মাঝে কোথা রয় সঙ্গোপন
শুভ্র সেই প্রস্রবণ।
নয়নের কোণে আসি করে টলটল
বিন্দু বিন্দু মন্দাকিনী জল।

সেই একদা ক্রৌঞ্চীর
ক্রন্দন ধ্বনিল আদি শ্লোকে কণ্ঠে বাল্মীকির
সেই অশ্রু তার হল আদি মসি কবি-লেখনীর!

সত্যম্ সুন্দরম্

ডক্টর গোপেশচন্দ্র দত্ত

আমার ঈশ্বর তুমি, আমার অন্তরলোকে এসে
ফুটাও আনন্দরূপ: হৃদয়ের গভীরে তাকাই
দেখি তুমি এক আছ, আর যেন কিছু কোথা নাই,
আমাকে জড়িয়ে ধর একান্তে গভীর ভালবেসে।
তোমাকে অন্তরে নিয়ে আনন্দের গভীর আবেশে
একান্তে নিজেকে খুঁজি, নিজের সত্তাকে যদি পাই;
পৃথিবীর কাছ থেকে পাওয়া ক্লান্তি ব'য়ে নিয়ে যাই
চেতনার গূঢ়তায়, দেখি তুমি সেথা আছ হেসে।

তুমিই প্রাণের শক্তি, আলোকের তপস্যার বাণী,
তুমিই পরম কথা, জীবনের প্রমূর্ত আশ্বাস ;
সৃষ্টিকে বুঝতে গিয়ে বুঝি শুধু তোমাকেই আমি,
তিমিরান্ধ পথে যেতে আলোকের জাগাও বিশ্বাস।
অন্তরের সাথী হয়ে জীবনেরে কর তো উজ্জ্বল,
তোমারি মাধুর্য নিয়ে প্রাণ হোক পুণ্য শতদল।

পায়ে পায়ে হাজার হাজার বছর গিয়েছে সরে

স্বামী সোমেশ্বরানন্দ

কোথায়, কোথায় যাও ?—ডেকে বলে নদী মাঠ ঘাট
এক-আকাশ নীল তারা চেয়ে থাকে নীরব বিস্ময়ে,
কোথা যাও ?—প্রশ্ন নিয়ে বালুচর কাছিমের ডিম
রামধনু রং নিয়ে অবেলার উদাসী বাতাস
ডেকে বলে—পায়ে পায়ে আজ তুমি চলেছ কোথায় ?

অথচ চলেছি আমি সিন্ধুযুগ হরপ্পা হয়ে
বাবিলন বিদিশা আর বেথলেহেম মিশর-মরুভূমি,
হাজার বছর যায় সরে সরে পৃথিবীর বুকে
পায়ে পায়ে পেরিয়েছি সভ্যতার যুগ-যুগান্তর।
সরস্বতী নদীতীরে আর্যেরা বলেছিল—কোথা যাও তুমি ?
পিরামিড মাথা তুলে : পথিকের ঠিকানা কোথায় ?
হে পথিক, হে পথিক, কোথায় চলেছ একা-একা—
ক্রুশ বুকে চেপে ধরে নীলচোখ তপস্বিনী-দল
সৈন্যবাহিনী নিয়ে গ্রীসের সে উদ্ধত যুবক
নিঘুম মাছের চোখ স্থির হয়ে লক্ষ্য রেখেছিল
পায়ে পায়ে হাজার হাজার বছর গিয়েছে সরে।

সূর্য হারায় কোথা ? কোথা যায় নক্ষত্র-আকাশ ?
বলো আজ সূর্য তারা সপ্তর্ষি মানব-সভ্যতা
কোন্ ডাক শুনে চলে এইসব নদী পৃথিবীর,
সাদা ডানা বক যত হিমালয় পার হয়ে যায়
কমলা রংয়ের রোদ পার হয় অসীম শূন্যতা,
বাউল কোথায় যায় ? কোথা যায় লক্ষ মুসাফির ?

কোন্ ডাক শুনে
ঈগল আকাশে ওড়ে, মাছেদের দল
পার হয়ে চলে যায় অতলান্ত আরব সাগর ?
কোথা যায় নচিকেতা বুকেতে আগুন নিয়ে একা
গৌতম অন্ধকারে একা-একা কোথা গিয়েছিল
অতীশ দীপংকর ফা-হিয়েন হিউয়েন-সাং
পাহাড় পেরিয়ে যান অগস্ত্য ঋষির কুমার,
হেমলক্ এক হাতে অন্য হাতে অনন্ত জীবন
সক্রেটিসেরা যায় সূর্যকে লক্ষ্য করে শুধু।

ইদানীং পৃথিবীর হরেক মানুষ
নিজস্ব দ্বীপ গড়ে তিন হাত শরীরের মাপে,
এখন মায়েরা সব শিশুমুখে চুমু খেয়ে ভাবে
ছোট সোনা পার হবে এ অসীম সাগরের ঢেউ,
এখন নবীন ভাবে নবীনার হাতে রেখে হাত
পার হয়ে চলে যাবে আ-দিগন্ত অসীম আকাশ,
প্রবীণেরা চায় শুধু জানা-শোনা চেনা কিছু মুখ
নিজের বাড়ির রাস্তা, সূর্য-ছায়া পথ দিয়ে ঘেরা,
তারপর একদিন মানুষের মৃত্যু হলে হেথা—
রাতের আঁধারে দেখি, নাম ছিল আদমশুমারে।

হে কবি মন্ত্রহীন, সূর্যশিশু তুমি চিরকাল,
দ্বীপ ছেড়ে উঠে এসো সূর্যকে লক্ষ্য করে শুধু
বুকেতে তারার দল নীহারিকা সূর্যের আলো—
পথ চলো সীমাহীন মহাকাশ মাইলস্তম্ভ ভেঙে
হাত ধরো পথিকের, আলোকযাত্রী ধাবমান
চলেছে চলেছে ঐ ছলছল জীবনের নদী
সময়-সাগর ছেড়ে পার হয়ে মহা-ইতিহাস
পটভূমি পার হয়ে ডাক দেয় অজানা পথিক।

তুমি-ময়

শ্রীমতী বিভা সরকার

মৃন্ময় এ আধারে চিন্ময়ের—
পরম পরশ পেতে মন চায় !
হে অধরা, চির অপ্রকাশ
আমার সমস্ত সত্তা তোমারেই চায় !
জ্যোতির্ময় তোমার পরশে
আমার এ প্রাণপদ্ম প্রস্ফুটিত কর !
অন্ধকার হইতে আলোয়
আমায় অমৃতময়, উজ্জীবিত কর !
যে লাবণ্যে বিশ্বের অণু পরমাণু পূর্ণ
আমার নিকটে তাই প্রকাশিত কর।
আনন্দময় হ'ক, মধুময় হ'ক মোর কাছে
তোমারি পরম দান মোর এ জীবন।
হে অনন্য, তোমারি সত্তা যে আমি
এ পরম সত্যে পূর্ণ কর সব অপূরণ।
তুমি আছ, তাই মোর তনু মন ধন
বিশ্বভুবন আনন্দময় মধুময়।
এই পরম বিশ্বাসে আমায় অটল কর
নদী যেমন সমুদ্রে আমিও যে হতে চাই তুমি-ময় !

ঈশ্বরের রূপ ঃ যত মত তত পথ

শ্রীশ্যামল বরণ সাহা

ঈশ্বরের রূপ আমি দেখেছি—
সংসারের আয়নায় ;
পারদের মত সত্যমাখা
কাঁচের আয়নায় চোখ মেলে দেখে
নিই—তোমার রূপ !

ভালবাসি তোমার
সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব,
তাই আমার বিশ্বাসের পথের
প্রতি বাঁকে বাঁকে দেখি
লেখা আছে :
'যত মত তত পথ'।

শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র

ডক্টর জলধিকুমার সরকার*

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উনবিংশ শতাব্দীর দুই দিকপাল, যাঁদের পাণ্ডিত্য ও ভাস্বর প্রতিভা বাংলা তথা ভারতবর্ষকে গৌরবান্বিত করেছে। ঈশ্বরচন্দ্রের বিদ্যানুরাগ, মাতৃভক্তি, সেবাধর্ম, শিক্ষাবিস্তারপ্রয়াস, অজেয় পৌরুষ, পোশাক-পরিচ্ছদে সারল্য এবং আত্মবিশ্বাস যুগযুগ ধরে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করবে। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা সাহিত্যসৃষ্টি ও তার মাধ্যমে দেশের সামাজিক ও নৈতিক সমস্যাগুলিকে তুলে ধরা, এবং দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা-আন্দোলনকে প্রকৃষ্ট রূপ দেওয়া অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই দুই মনীষীর বিরাটত্ব অথবা তাঁদের অবদানকে ভিত্তি করে পরস্পরের মধ্যে তুলনা করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, হয়তো সম্ভবও নয়। উভয়ের সঙ্গেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎকার হয়েছিল এবং সেই সাক্ষাৎকারের ঘটনা বিশদভাবে কথামৃতে বর্ণিত আছে। সাক্ষাৎকারের দিন ছাড়া অন্যদিনেও শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই দুই সাক্ষাৎকারের কথা খণ্ড খণ্ড ভাবে উল্লেখ করেছিলেন। এই সব হতে বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মনোভাবের খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। সেই আভাসকে ফুটিয়ে তোলাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এখানে তাঁদের আমরা দেখব শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে, যাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, যাঁর দৃষ্টি অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত পৌঁছায়, যাঁর কাছে ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান ও ঈশ্বরকে না জানার নাম অজ্ঞান, যাঁর মতে বিবেকবৈরাগ্যহীন পাণ্ডিত্য শকুনির উপরে উঠে ভাগাড়ের দিকে নজর দেওয়ার সামিল এবং যাঁর মতে শূকরের মাংস খেয়েও যদি ঈশ্বরের উপর টান থাকে, তো সে লোক ধন্য, আর হবিষ্য ক'রে যদি কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকে, তাহ'লে তাকে ধিক্! যে দিব্য দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যুবক নরেন্দ্রনাথের মধ্যে সহস্র সূর্যের দীপ্তি দেখেছিলেন, যে দৃষ্টির সাহায্যে রাখাল, ভবনাথ, বাবুরাম, শরৎ, শশী প্রভৃতি বালক বা যুবককে দেখবামাত্র বিরাট শক্তির আধার ব'লে চিনে নিয়েছিলেন, সেই দৃষ্টিতে দুই মনীষী—বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র কিরূপ প্রতিভাত হয়েছিলেন, তা জানার কৌতূহল খুবই স্বাভাবিক।

শ্রীরামকৃষ্ণ (১৮৩৬-১৮৮৬) বিদ্যাসাগর মহাশয় (১৮২০-১৮৯১)-কে দেখতে গিয়েছিলেন ৫ই আগস্ট, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে। তিনি নিজে থেকেই বিদ্যাসাগরকে দেখতে চেয়েছিলেন, কারণ বিদ্যাসাগরের দয়ার কথা তিনি বাল্যকাল থেকেই শুনে আসছিলেন। তা ছাড়া মাস্টার মশাই বিদ্যাসাগরের স্কুলে অধ্যাপনা করেন, এটিও শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্যাসাগরকে দেখবার আকাঙ্ক্ষার একটি কারণ। সাধারণতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে থেকে দেখতে গিয়েছেন তাঁদের, যাঁরা ঈশ্বরচিন্তা করেন, যেমন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র প্রভৃতি। তবে তিনি গীতার—'যাকে গণে মানে, তার

* কলিকাতা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ভাইরলজি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান। বর্তমানে ওই বিভাগে ইমেরিটাস সায়েন্টিষ্ট। এফ. এন. এ.।

ভিতর ঈশ্বরের শক্তি আছে' এই কথা প্রায়ই বলতেন এবং সেই হিসাবে বিদ্যাসাগরও ঐশ্বরিকশক্তিসম্পন্ন। 'পুঁথি'র' মতে—

সত্ত্বগুণী জনে তাঁর করুণা বিস্তর।
তাই আজি যান প্রভু পণ্ডিতের ঘর॥

বিদ্যাসাগর শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে খুব বেশী ওয়াকিবহাল ছিলেন না, কারণ তিনি তাঁর আসার কথা শুনে মাস্টার মশাইকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কিরকম পরমহংস? তিনি কি গেরুয়া পরে থাকেন?'

কথাবার্তার প্রারম্ভেই বিদ্যাসাগর রামকৃষ্ণদেবকে জলযোগ করালেন। তারপর যে তিন-চার ঘণ্টা কথাবার্তা চলেছিল, তা ছিল হাস্যকৌতুকে ভরা, সরস ও সাবলীল। কথাবার্তার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বলেন, 'তোমার দয়া, তোমার বিদ্যা আছে অন্তের চেয়ে,' 'আজ সাগরে এসে মিশলাম। তুমি ত অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর!' 'তুমি ক্ষীরসমুদ্র!' 'তোমার কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম,' 'তুমি বিদ্যাদান, অন্নদান করছো, এও ভাল', 'সিদ্ধ তো তুমি আছই', '(তোমার) অন্তরে সোনা আছে, এখনও খবর পাওনি। একটু মাটি চাপা আছে', ইত্যাদি। দেখতে পাই, বিদ্যাসাগরকে গান শোনাবার সময়ে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়েছেন, আর বিদ্যাসাগর নিস্তব্ধ হয়ে একদৃষ্টে দেখছেন। আরও দেখি, ফিরবার প্রাক্কালে ঠাকুর মূলমন্ত্র জপছেন, হয়তো মহাত্মা বিদ্যাসাগরের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য জগন্মাতার কাছে প্রার্থনা করছেন। অন্যদিকে আমরা লক্ষ্য করি বিদ্যাসাগর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা যেন বেশ উপভোগ করছেন। 'ব্রহ্ম যে কি আজ পর্যন্ত কেউ মুখে বলতে পারেনি', 'একটি জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট হয়নি, সে জিনিসটি ব্রহ্ম'—এই কথা শুনে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, 'বা! এটি তো বেশ কথা! আজ একটি নূতন কথা শিখলাম।' বিদ্যাসাগরকে দেখি, নিজহাতে ঘর থেকে মিঠাই এনে রামকৃষ্ণদেবকে খাইয়েছেন, সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় ঠাকুরকে বাতি-হাতে পথ দেখিয়ে আগে আগে যাচ্ছেন, গাড়ীতে উঠার সময় ঠাকুরকে প্রণাম করছেন।

কথামৃতে লক্ষ্য করা যায়—রামকৃষ্ণদেব অনেক সময় একই কথা বা গল্প বারে বারে বলছেন বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ব্যক্তিকে। বারে বারে বলার উদ্দেশ্য, যাতে লোকের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে, এবং সেই প্রয়োজনীয় কথাগুলিই বারে বারে বলতেন, যেগুলি সম্বন্ধে অনেকের ভুল ধারণা আছে। বিদ্যাসাগর প্রশ্ন করেছিলেন, 'তিনি কি কারুকে বেশী শক্তি, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন?' তার উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'তিনি বিভুরূপে সর্বভূতে আছেন, পিঁপড়েতে পর্যন্ত। কিন্তু শক্তিবিশেষ।...তা না হ'লে তোমাকেই বা সবাই মানে কেন? তোমার কি শিং বেরিয়েছে দুটো?' বিদ্যাসাগরকে আগে 'বিদ্যার সাগর' বললেও এই প্রসঙ্গ উল্লেখ ক'রে পরে অন্যান্য ভক্তদের বলেছিলেন, 'বিদ্যাসাগরের এক কথায় তাকে চিনেছি, বুদ্ধির কত দৌড়।...এত বিদ্যা, এত নাম, কিন্তু এমন কাঁচা কথা বলে ফেললে।...কি জানো... ঈশ্বরকে না জানলে ক্রমশঃ ভিতরের চুনোপুঁটি বেরিয়ে পড়ে।' বিদ্যাসাগরের মতো পণ্ডিত

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি, ৫ম সংস্করণ, পৃঃ ৩৬০

ব্যক্তিরও এরূপ ভুল ধারণা থাকতে পারে, এটা বুঝাবার জন্যই হয়তো শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখা যায়, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এই কথা কেশবের বাড়ীতে কেশবকে বলছেন এবং দক্ষিণেশ্বরে ভক্তদের বলছেন, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে সিঁথির ব্রাহ্মসভায় সদরওয়ালাকে বলছেন এবং দক্ষিণেশ্বরে শশধর পণ্ডিতকে বলছেন। সকলের কাছেই তিনি বিদ্যাসাগরের কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ বক্তব্যটির অন্তর্নিহিত সত্যকে বুঝানো ছাড়াও বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনকে মনে হয়। গুরুত্ব দিয়েছিলেন। 'ব্রহ্ম কি, কেউ মুখে বলতে পারেনি, তাই উচ্ছিষ্ট হয়নি'—এই কথাটিরও উল্লেখ করেছিলেন ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে ভক্তদের কাছে। তার সঙ্গে এও বলেছিলেন, 'বিদ্যাসাগর শুনে ভারী খুশী।' বিদ্যাসাগরের এইরূপ সারগ্রাহিতায় শ্রীরামকৃষ্ণ যে খুশী হয়েছিলেন, এ কথা বুঝা যায়।

এইবার বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-১৮৯৪) কথায় আসা যাক। তাঁর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হয়েছিল বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের দুই বৎসর পরে, ১৮৮৪ সালের ৬ই ডিসেম্বর। এক্ষেত্রে রামকৃষ্ণদেব যে নিজে থেকে সাক্ষাৎকার করতে চেয়েছিলেন তা নয়। তাঁর আগমন উপলক্ষে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট অধরলাল সেন তাঁর বন্ধু কয়েকজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, এবং তাঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রও ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বঙ্কিমচন্দ্রের কথা আগে শুনেছিলেন কি না জানা যায় না, তবে বঙ্কিমবাবু নিশ্চয় অধরের কাছে ঠাকুরের সম্বন্ধে শুনেছিলেন এবং ঠাকুরকে দেখতে চেয়েছিলেন। কারণ অধর বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় প্রদানকালে বলেছিলেন, 'ইনি পনাকে দেখতে এসেছেন।' মনে হয় সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উচ্চ ধারণা তো ছিলই না, বরং দাম্ভিকতামিশ্রিত একটা তাচ্ছিল্যের ভাব ছিল। পুঁথিংতে এ বিষয়ে খোলাখুলি লেখা আছে—

শ্রীপ্রভুর বেশভূষা-সজ্জা নিরীক্ষণে।
প্রথমে অবজ্ঞা-ভাব বঙ্কিমের মনে॥
ধন-মান-বিদ্যামদে হয় যে রকম।
অহঙ্কারে ধরাবোধ সবার মতন॥

কথাবার্তার শুরুতেই শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'বঙ্কিম! তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা গো!' উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্রকে বলতে শুনি 'আর মশাই! জুতোর চোটে। সাহেবের জুতোর চোটে।' রামকৃষ্ণদেবের প্রশ্ন: 'আচ্ছা, আপনি কি বলো, মানুষের কর্তব্য কি?' বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তর: 'আজ্ঞে, তা যদি বলেন, তা হ'লে আহার নিদ্রা ও মৈথুন।' গুরুর মাধ্যমে অভীষ্ট লাভ হওয়ার কথায় বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, 'কে? গুরু! তিনি আপনি ভাল আম খেয়ে আমায় খারাপ আম দেন!'

যে শ্রদ্ধা থাকলে মহাপুরুষের সান্নিধ্যে মানুষ বাগ্‌যত হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের এই সব উক্তিতে সেই শ্রদ্ধার অভাব দেখা যায়।

স্বভাবসিদ্ধ স্পষ্ট কথায় রামকৃষ্ণদেবের বেশী সময় লাগেনি বঙ্কিমচন্দ্রের তাচ্ছিল্যভাব ভাঙ্গতে। তাই তাঁকে বলতে শুনি, 'তুমি তো বড় ছ্যাচ্‌ড়া!' 'তুমি তো পণ্ডিত, ন্যায় পড়োনি?' 'তুমি যা রাতদিন কর, তাই তোমার মুখে বেরুচ্ছে', 'কামিনীকাঞ্চনের ভেতর রাতদিন রয়েছ, আর ঐ কথাই মুখ

২ তদেব, পৃঃ ৪৪৮

দিয়ে বেরুচ্ছে।' বঙ্কিমচন্দ্রের বাসস্থানের কাছেও ভক্ত লোক আছে এ কথা শুনে রামকৃষ্ণদেবের উত্তর: 'কি রকম সব ভক্ত সেখানে? যারা গোপাল গোপাল, কেশব কেশব বলেছিল, তাদের মতো কি?' এই ব'লে 'কেশব' 'গোপাল' 'হরি' এই নাম নিয়ে যারা খদ্দের ঠকাতো, সেই ভণ্ডদের গল্পটি বলেছিলেন

আলোচনার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক ভুল ধারণা প্রকাশ পেয়েছিল। ঈশ্বরকে জানতে হলে 'আগে পড়াশুনা করে জানতে হয়'-'এর উত্তরে রামকৃষ্ণদেব বঙ্কিমচন্দ্রকে বিশদ-ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, আগে ঈশ্বর-লাভ, তারপর অন্য কথা।

কথামৃতের অন্যত্র যেখানে বঙ্কিমের বিষয়ে ঠাকুরের উল্লেখ পাওয়া যায়, সেখানে বঙ্কিম সম্বন্ধে যে তাঁর উচ্চ ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল, তার আভাস পাওয়া যায় না। কাপ্তেনকে তিনি বলেছিলেন 'বঙ্কিম কৃষ্ণ মানে, শ্রীমতী মানে না। আবার বলে নাকি কামাদি দরকার।' অসুস্থ অবস্থায় শ্যামপুকুরের বাড়ীতেও ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে 'বঙ্কিম তোমাদের একজন পণ্ডিত'—এই বলে আরম্ভ করে বঙ্কিমের জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উত্তর 'আহার নিদ্রা আর মৈথুন' এবং বঙ্কিমের বাসস্থানের নিকটবর্তী ভক্তদের সম্বন্ধে 'গোপাল গোপাল কেশব কেশব' গল্পের উপমা দেওয়ার ঘটনা বলেছিলেন। বঙ্কিমের ধর্মবিষয়ে মতামত সম্বন্ধে রামকৃষ্ণদেবের অভিমত পাওয়া যায়, ঠাকুরের 'দেবী চৌধুরাণী' পাঠ শুনার সময়। এই পাঠ শুনেছিলেন ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর, অর্থাৎ বঙ্কিমের সঙ্গে দেখা হওয়ার তিন সপ্তাহ পরে। মনে হয় অধরের কাছে 'অনেক বইটই লিখেছেন' শুনে এবং হয়তো মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে 'দেবী চৌধুরাণী' সম্বন্ধে আলোচনা হওয়ায় তিনি পুস্তকটির সম্বন্ধে উৎসুক হন। তাই মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ামাত্র জিজ্ঞাসা করেন, 'বইখানি কি এনেছ?' উপন্যাসটির পাঠ শুনতে শুনতে যেখানে যেখানে গীতোক্ত ভাবধারা লেখার ভিতরে পেয়েছেন, সেখানেই প্রশংসা করেছেন, কিন্তু বিরূপভাব প্রকাশ করেছেন অনেক জায়গায়। ভবানী ঠাকুর দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন শুনে বললেন, 'ও তো রাজার কর্তব্য।' অর্থাৎ আচার্যের নয়। প্রফুল্লকে গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মের উপদেশ দেবার আগে ভবানী ঠাকুর তাঁর বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করলেন—ব্যাকরণ, সাহিত্য, দর্শন পড়া হ'ল। শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'না পড়লে শুনলে জ্ঞান হয় না। যে লিখেছে, এ সব লোকের এই মত। এরা ভাবে, আগে লেখাপড়া, তারপর ঈশ্বর।' নিষ্কাম কর্মে দীক্ষিত হওয়ার সময়ে যখন প্রফুল্ল সমস্ত অর্জিত অর্থ শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করতে চাইলেন তখন ভবানী ঠাকুর শরীররক্ষার জন্য তাঁকে প্রয়োজনীয় অর্থ রাখতে বললেন। শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, যে ভগবানকে চায় সে একেবারে ঝাঁপ দেয়—তার এরকম হিসেবী বুদ্ধি থাকে না। এই প্রসঙ্গে প্রফুল্লের কিছু কেশবিন্যাস, কিছু ভোগবিলাসের প্রয়োজনীয়-তার কথা বলতে গিয়ে ভবানী ঠাকুর যখন 'কিছু দোকানদারী চাই' কথাটি বললেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'যেমন আকর, তেমনি কথাও বেরোয়! রাতদিন বিষয়চিন্তা, লোকের সঙ্গে কপটতা এসব ক'রে ক'রে কথাগুলোও এই রকম হয়ে যায়। মুলো খেলে মুলোর ঢেকুর বেরোয়।' দেবী চৌধুরাণী যখন সখীদের বলছেন, 'ঈশ্বর মানস-প্রত্যক্ষের বিষয়', তখন শ্রীরামকৃষ্ণ সংশোধন ক'রে

দিলেন, 'সে এ মনের নয়। সে শুদ্ধ মনের। ...বিষয়াসক্তি একটুও থাকলে হয় না। মন যখন শুদ্ধ হয়, শুদ্ধ মনও বলতে পার, শুদ্ধ আত্মাও বলতে পার।' ফলতঃ ঈশ্বর ও ধর্ম সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের যে সব মত 'দেবী চৌধুরাণী' পুস্তকে প্রকাশ পেয়েছে, শ্রীরামকৃষ্ণ সেগুলির গলদ দেখিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য সর্বত্র নয়। লেখায় উদ্ধৃত গীতার কথা ছাড়াও অন্য অংশেরও তিনি প্রশংসা করেছেন। দেবী চৌধুরাণী যখন স্বামীকে বলছেন, 'তুমি আমার দেবতা। আমি অন্য দেবতার অর্চনা করিতে শিখিতেছিলাম,—শিখিতে পারি নাই।' তখন শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে মন্তব্য করেছিলেন, 'এর নাম পতিব্রতার ধর্ম। এও আছে।...প্রতিমায় ঈশ্বরের পূজা হয়, আর জীয়ন্ত মানুষে কি হয় না?'

ঈশ্বর সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মাস্টার মশায়কে বলেছিলেন, 'তাঁকে তো জানবার উপায় নেই। এখন কর্তব্য কি? আমার মতে কর্তব্য আমাদের নিজের এরূপ হওয়া উচিত যে, সকলে যদি সেরূপ হয়, পৃথিবী স্বর্গ হ'য়ে পড়বে। প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত যাতে জগতের মঙ্গল হয়।' তিনি সারাজীবন উচ্চ মানবতার আদর্শ সামনে রেখেছিলেন। কিন্তু তিনি যে গলায় উপবীত ধারণ করতেন, পত্রের শিরোনামায় 'শ্রীশ্রীহরিশরণম্' লিখতেন, তা ছিল তখনকার দিনের 'প্রথাগত ব্যাপার'।[৩]

বিদ্যাসাগরের সাত্ত্বিক কর্মানুষ্ঠানের প্রশংসা করলেও শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার কিছু দিন পরে মাস্টার মশাইকে বলেছিলেন, 'ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের সব প্রস্তুত, কেবল চাপা রয়েছে। কতকগুলি সৎকাজ করছে; কিন্তু অন্তরে কি আছে জানে না। অন্তরে সোনা চাপা রয়েছে।' তাঁর স্কুল করা, সংসার করা, এই সব সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'এ সব রজোগুণে হয়। বিদ্যাসাগরের দয়া রজোগুণের সত্ত্ব।' এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত তুলে ধরা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বিদ্যাসাগর মাস্টার মশাইকে একবার বলেছিলেন যে, তিনি ঈশ্বরের বিষয় কিছু বুঝেন না, সেইজন্য ঈশ্বরের কথা কাউকে বলেন না। এ কথা শুনে স্বামীজী বলেছিলেন, 'যে এটা বোঝে না, সে দয়া পরোপকার বুঝলে কেমন করে? স্কুল বুঝলে কেমন করে? স্কুল করে ছেলেদের বিদ্যা শিখাতে হবে, আর সংসারে প্রবেশ ক'রে বিয়ে ক'রে ছেলেমেয়ের বাপ হওয়া ঠিক, এটাই বা বুঝলে কেমন করে?' অবশ্য স্বামীজী যে বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না, তা নয়। নিবেদিতার কাছে তিনি মত প্রকাশ করেছিলেন, 'উত্তর ভারতে আমার বয়সের এমন একজন লোকও নাই, যাহার উপর তাঁহার প্রভাব না পড়িয়াছে।'[৪] কিন্তু যিনি ঈশ্বরকে জেনেছেন, তিনি অন্য স্তরের মানুষ। তাই স্বামীজী মাস্টার মশাইকে বলেছিলেন, 'যে একটা ঠিক বোঝে, সে সব বোঝে।' তাই শুনে মাস্টার মশাইয়ের মনে পড়লো ঠাকুরের কথা—'যে ঈশ্বরকে জেনেছে, সে সব বোঝে।' বস্তুতঃ বিদ্যাসাগর ওই 'একটা' (ঈশ্বর) বুঝতে চেষ্টা না করার জন্যই তাঁর অন্তরের 'চাপা সোনা'র সন্ধান পাননি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শেষ জীবনে 'একটা'-না-জানা

৩ বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ, ৩য় খণ্ড, ভূমিকা, পৃঃ ৩৬
৪ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ৩য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ১১৮

বিদ্যাসাগর অখণ্ড মানবতাগুণের অধিকারী হয়েও 'আপন পরিবারে সুখী হতে পারেন নাই। ক্লান্ত, পীড়িত, মানুষের প্রতারণায় দগ্ধবিদগ্ধ বিদ্যাসাগর শেষ পর্যন্ত শান্তি পেতেন একমাত্র কার্মাটারে,—সাঁওতালদের সাহচর্যে'।[৫]

ভগবদ্বিশ্বাস বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বাস বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবারগত অভ্যাস। সন্ন্যাসীর প্রতি তাঁর বিশ্বাস পিতৃসূত্রে লব্ধ এবং আমরণ পোষিত। তা ছাড়া মেসমেরিজম, যোগবল, ঝাড়াঝোড়া, মন্ত্রপড়া, তারকেশ্বরের মানত প্রভৃতি পরিবার-পরিবেশগত অলোকিকতায় বিশ্বাসও তাঁর ছিল।'[৬] কিন্তু এরূপ থাকা সত্ত্বেও এবং কৃষ্ণচরিত্র, গীতাব্যাখ্যা প্রভৃতি বহু ধর্মগ্রন্থের রচয়িতা হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর অনেক মূল ধারণায় ভুল দেখিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বঙ্কিমবাবুও মনে হয় সে সব ভুল শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে আলোচনার সময় অন্ততঃ তখনকার জন্য মেনে নিয়েছিলেন। কথাবার্তার মধ্যে একবার তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহজ সরল কথায় গভীর তত্ত্বকথা বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা দেখে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'মহাশয়, আপনি প্রচার করেন না কেন?' যখন কীর্তন শুনতে শুনতে ঠাকুর দণ্ডায়মান অবস্থায় সমাধিস্থ হ'লেন, বঙ্কিমচন্দ্র ব্যস্ত হয়ে ভিড় ঠেলে কাছে গিয়ে একদৃষ্টে দেখছেন, কারণ তিনি সমাধি কখনও দেখেননি। কথোপকথনের শেষের দিকে বঙ্কিম যখন জিজ্ঞাসা করছেন, 'মহাশয়, ভক্তি কেমন ক'রে হয়?' তখন মনে হয় তাঁর তাচ্ছিল্যভাব কেটে গেছে। বিদায়কালে তিনি ঠাকুরকে প্রণাম করলেন, তাঁর বাড়ীতে 'পায়ের ধুলো' দেবার জন্য 'প্রার্থনা' জানালেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র—এই দুই মনীষীর লেখায় বা তাঁদের উত্তরজীবনে বিশেষ ভাবে কোন রেখাপাত করেছিল বলে জানা নেই। তবে উল্লেখযোগ্য, রামকৃষ্ণদেব বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কয়েকদিন পরে মাস্টার মশাইকে বলেছিলেন, 'আরও দু-একবার ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে দেখার প্রয়োজন', কিন্তু সে দেখা আর হয়ে উঠেনি।[৮] বিদ্যাসাগরও তাঁকে বলেছিলেন যে, একদিন দক্ষিণেশ্বরে আসবেন, কিন্তু তাঁরও আসা হয় নি, এবং এই নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারের কাছে মৃদু অভিযোগও করেছিলেন। বঙ্কিমবাবু যখন বিদায় নেবার সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁর বাড়ীতে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সোজাসুজি সম্মতি না দিয়ে বলেছিলেন, 'তা বেশ তো, ঈশ্বরের ইচ্ছা।' কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় বঙ্কিমচন্দ্রের আশা পূর্ণ হয়নি, যদিও কিছুদিন পরে শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্র ও মাস্টার মশাইকে বঙ্কিমবাবুর সান্‌কীভাঙ্গার বাসায় পাঠিয়েছিলেন। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁদের অনেক কথা হয়। ঠাকুরকে আবার দর্শন করতে আসার ইচ্ছা বঙ্কিম প্রকাশ করেন, কিন্তু 'কার্যগতিকে' তাঁর আর আসা হয়ে উঠেনি।

৫ বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ, ৩য় খণ্ড, ভূমিকা, পৃঃ ৩১

৬ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ, ১ম খণ্ড, ১ম অংশ ; ভূমিকা, পৃঃ ৭

জীবনরহস্যের নবদিগন্ত

ডক্টর ধ্রুব মাজ্জিত*

হরগোবিন্দ খোরানা, মার্শাল নিরেনবার্গ ও রবার্ট হোলি ১৯৬৮ সালে শারীরবিদ্যা ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে বিস্ময়কর অবদান রাখার জন্য সম্মিলিতভাবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বর্তমান শতাব্দীতে যে সকল মূলগত তত্ত্ব বিজ্ঞানের বিচিত্র আবিষ্কারের তালিকায় গ্রথিত হয়েছে, তাদের মধ্যে মৌলিকতায়, গুরুত্বে এবং সুদূরপ্রসারী গভীরতায় এঁদের আবিষ্কারটি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী হয়েছে। যদিও এঁরা তিনজনই মার্কিন নাগরিক তবুও হরগোবিন্দ খোরানার জন্ম এবং শিক্ষালাভ ভারতবর্ষেই হয়েছিল। ভারতবর্ষের নাগরিক হিসাবে আমরা এজন্য অবশ্যই গর্ববোধ করতে পারি। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা জীবন-রহস্য সমাধানে ব্রতী কয়েকজন অতি বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর বৈজ্ঞানিক অবদান নিয়ে আলোচনা করবো আর বিশেষভাবে আলোচনা করবো আর্থার হোলি, মার্শাল নিরেনবার্গ ও ম্যাসাচুসেটস্ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির 'আলফ্রেড পি. সোলন অধ্যাপক' ডাঃ খোরানার কাজ ও তাঁদের কাজের সুদূর-প্রসারী সম্ভাবনা সম্পর্কে। প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু আধুনিক এবং সেই সঙ্গে যথেষ্ট জটিল। সুতরাং আমাদের আলোচনা শুরু করতে হবে বেশ কিছু আগে থেকে। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিজ্ঞানের এই অত্যাশ্চর্য দিকটির মৌলিকতার প্রতি অনেকের দৃষ্টি পড়ল ঠিকই, কিন্তু এর আরম্ভের ইতিহাস তার অনেক আগের এবং সে ইতিহাস হ'ল অনেক প্রতিভাধর রসায়ন-বিদ, জীববিজ্ঞানী, চিকিৎসক ও পদার্থ-বিজ্ঞানীর ক্লান্তিকর কর্মযজ্ঞের রোজনামচার ইতিহাস, অনেক হতাশা আর নিদ্রাহীন রাত্রির বর্ণনাতীত কষ্টকর অনুভূতির সকরুণ ইতিহাস। বস্তুত এক একটি কালজয়ী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যেন এক একটি বিশাল সমুদ্রগামী জাহাজ যার অনেকখানিই থাকে জলের তলায় অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টির অগোচরে।

যাই হোক আমরা আবার পূর্ব কথায় ফিরে আসি—খোরানার পূর্বসূরী বিজ্ঞানীদের কাজের ধারার সঙ্গে মিলিয়ে খোরানা প্রমুখ বিজ্ঞানীদের কাজটিকে দেখলে 'জিন' (gene) সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য বুঝতে হয়তো আমাদের অসুবিধা হবে না। আমরা জানি, যে কোন জীবদেহ একটি বা একাধিক কোষের সমন্বয়ে গড়ে উঠে। বহুকোষী জীবের সবকিছুই নির্ভর করে তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোষগুলির সুনিয়ন্ত্রিত কর্মধারার উপর। জীব বলতে অবশ্যই প্রাণী এবং উদ্ভিদ উভয় শ্রেণীর কথাই বলা হচ্ছে। অসংখ্য জীবকোষ দ্বারা গঠিত জীবের কার্যাবলী—যথা, তার বৃদ্ধি, পুষ্টি, প্রজনন, বংশানুক্রমিতা

* পদার্থবিজ্ঞানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএচ. ডি.। স্পেকট্রোস্কপি সম্পর্কে লেখকের উচ্চতর গবেষণা দেশে বিদেশে উচ্চ-প্রশংসিত। বর্তমানে ইনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'ফরেনসিক সায়েন্স পরীক্ষাগারে' পদার্থবিজ্ঞানী হিসাবে কর্মরত।

ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত হচ্ছে জীবকোষে অবস্থিত জিন অর্থাৎ 'বংশগতি নিয়ামক' কণিকার সাহায্যে। এই শতাব্দীর পঞ্চম দশকে ওসওয়াল্ড এভারি, জর্জ বিডল, এডওয়ার্ড টেটাম এবং জসুয়া লেডারবার্গের[১] গবেষণার ফলে এটা সংশয়াতীত ভাবে প্রমাণিত হয় যে, ঐ জিন বা বংশগতি নিয়ামকটি যাতে সুপ্ত অবস্থায় নিহিত থাকে সেটি হল জীবকোষে অবস্থিত একটি অম্লধর্মী যৌগিক পদার্থবিশেষ। অম্লধর্মী এই যৌগিক পদার্থটির নাম ডি-অক্সিরাইবোনিউক্লিক এ্যাসিড বা সংক্ষেপে D.N.A. (Deoxyribonucleic Acid)। এই এ্যাসিডটি জীবকোষের কেন্দ্রে অর্থাৎ নিউক্লিয়াসে থাকে বলে নামটি রাখা হয়েছে নিউক্লিক এ্যাসিড। যে কোন বহুকোষী জীবের জন্মের শুরুতে একটিমাত্র ডিম্বাণু (Ovum) এবং একটিমাত্র শুক্রাণুর (Spermatozoon) মিলনে যে জীবকোষটির সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় জাইগোট (Zygote)। এই জাইগোটটিকে প্রকৃতপক্ষে বলা যেতে পারে মাতৃজিন এবং পিতৃজিনের সার্থক মিলন অথবা আধুনিক বিজ্ঞানের ব্যাখ্যানুযায়ী ঐ জাইগোট হল D.N.A.-র সার্থক মিলনের ফলে সৃষ্ট একটি নতুন কোষ। নতুন সৃষ্ট এই জীবকোষটির মধ্যে নিহিত জিনসমষ্টি বা D.N.A. নির্ধারণ করবে ঐ কোষটির এককোষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ভবিষ্যতের বহু বহু কোষী একটি পূর্ণাঙ্গ জীবে উত্তরণ এবং ঐ পূর্ণাঙ্গ জীবটির আকৃতি, প্রকৃতি সহ অন্যান্য যাবতীয় জৈবিক বৈশিষ্ট্যসমূহ—যেগুলিকে আমরা সাধারণতঃ মাতাপিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত গুণাবলী অথবা বৈশিষ্ট্য বলে মনে করে থাকি। D.N.A. এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি অর্থাৎ জীবনসৃষ্টির রহস্যটি সযত্নে এবং নিঃশব্দে সমাধা করে আসছে যুগ যুগ ধরে—সৃষ্টির প্রথম দিবস হ'তে। ভাবতে অবাক লাগে এই জলজ্যান্ত সত্যটি এতকাল যাবৎ মানুষের অজানা রইল কেমন করে? অবশ্য এর উত্তর নিশ্চয়ই এটা নয় যে, বিজ্ঞানীরা এতদিন অমনোযোগী ছিলেন অথবা তখনও তাঁরা ঠিক এতটা ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন না। আসলে এ ধরনের বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানলাভের জন্য প্রাথমিক তথ্য যতখানি বিজ্ঞানীদের ভাণ্ডারে মজুত থাকা প্রয়োজন ছিল, হয়তো ততখানি তথ্য সেখানে ছিল না। সুতরাং চেষ্টা চললেও সফল হতে এতদিন অপেক্ষা করতে হলো বিজ্ঞানকে। যাই হোক জিন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে 'পরিবেশের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা থেকেই যে বিজ্ঞানের জন্ম'—এই মিতকথনটির সার্থকতা প্রমাণিত হল নতুন করে আরেকবার।

D.N.A.-র এই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা সম্পর্কে আলোকপাত দেরিতে হলেও এটির অস্তিত্ব কিন্তু আবিষ্কৃত হয়েছিল প্রায় একশ বছর আগে। প্রখ্যাত ইংরাজ বিজ্ঞানী আবে মেনডেল ১৮৬৬ সালে জিন সম্পর্কে সর্বপ্রথম তাঁর ধারণা প্রকাশ করেন। সে সময় তিনি ৩২ রকমের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর হলুদ এবং সবুজ বর্ণের মটরশুটি (peas) নিয়ে তাঁর বহুবিদিত

১ ওসওয়াল্ড এভারি, জর্জ বিডল, এডওয়ার্ড টেটাম এবং জসুয়া লেডারবার্গ সম্মিলিতভাবে ১৯৫৮ সালে শারীরবিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাঁদের গবেষণার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল—'ব্যাক্টিরিয়ার জেনেটিক পুনর্গঠন এবং জিনের উপাদান বিশ্লেষণ'। প্রসঙ্গতঃ এই চারজনই হলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী।

পরীক্ষাগুলি একে একে সমাধা করছিলেন এবং জীবদেহে জিন-জাতীয় একটি বিশেষ ধরনের রাসায়নিক যৌগের অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন। তাঁর ভাষায় সেটি ছিল একটি 'একক উৎপাদক' (Unit factor) অর্থাৎ জীবনসৃষ্টির ইঁট ; যে ইঁটগুলি দিয়ে আমাদের সামনের বর্ণময় পৃথিবীতে জীবনসৃষ্টির সুরম্য সৌধটি প্রকৃতি-দেবী নির্মাণ করেছেন। মেনডেল কথিত 'একক উৎপাদক' বস্তুটিই প্রকৃতপক্ষে বংশ-পরম্পরায় ক্রিয়াশীল থেকে সৃষ্ট জীবটির আকৃতি, প্রকৃতি ইত্যাদি জৈবিক গুণাবলীর সমতা বজায় রাখে। যদিও তিনি 'একক উৎপাদকের' কোন রকম রাসায়নিক ব্যাখ্যা দিয়ে যেতে পারেননি তবু তাঁর আবিষ্কৃত তথ্য নিয়ে বিশ্বজোড়া ভাবনাচিন্তার সূত্রপাত হয়েছিল সেই তখন হতেই। মেনডেলের গবেষণা-প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার মাত্র তিন বছর পর (১৮৬৯ সালে) সুইস জীব-রসায়নবিদ ফ্রেডরিক মিশার নিউক্লিক এ্যাসিডকে জীবদেহ হতে পৃথক্ করে দেখাতে সক্ষম হন। তিনি দেখলেন শুষ্ক শুক্রবীজের মোট ওজনের শতকরা পঞ্চাশ ভাগই হ'ল এই নিউক্লিক অ্যাসিড। সুতরাং এটা নিশ্চয়ই আশা করা যেতে পারে যে, কোষগঠনে এই নব-আবিষ্কৃত এ্যাসিডের অবদানও নিশ্চয়ই আছে এবং সে অবদান হয়তো শতকরা পঞ্চাশ ভাগই, যেহেতু শুক্রবীজের মোট ওজনে এটিকে পঞ্চাশ ভাগ হিসেবেই পাওয়া যাচ্ছে। যাই হোক মেনডেল এবং মিশারের বলা 'একক উৎপাদক' ব্যাপারটিকেই পরবর্তী কালে বলা হ'ল জিন। মিশার আরও এক ধাপ এগিয়ে বললেন, প্রতিটি জীবকোষের কেন্দ্রকের (Nucleus) ক্রোমোজমের[২] (Chromosomes) মধ্যে জিনগুলি নিহিত থাকে। আরও বলা হ'ল কোষের ক্রোমোজম নামক বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে গঠিত হয়েছে নিউক্লিক এ্যাসিড এবং প্রোটিন দ্বারা। এই ধরনের না-জানা বিস্ময়কর অনেক নতুন নতুন তথ্য আসতে শুরু করলো বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের গবেষণাগারগুলি হতে। আর সেই সঙ্গে শুরু হ'ল বিশ্ব জুড়ে নবীন প্রবীণ বিজ্ঞানীদের আরেক দফা বিরামহীন গবেষণার পালা। জার্মানীর গটিন্‌গেনে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রখ্যাত পদার্থবিদ ম্যাক্স ডেলব্রুক এ সময়ে এক দীর্ঘ-মেয়াদী গবেষণার সূত্রপাত করেন এবং 'মলিকুলার বাইওলজি' নামে একটি নতুন বিজ্ঞানশাখার পত্তন করে যেতে সক্ষম হন। তিনি এবং আরও অনেক বিজ্ঞানী বললেন, ক্রোমোজম যেহেতু সৃষ্ট হয়ে থাকে নিউক্লিক এ্যাসিড এবং কতকগুলি প্রোটিনের সাহায্যে, শুধু তাই নয় জিনের অস্তিত্ব যখন আবার খুঁজে পাওয়া গেল জীবকোষের কেন্দ্রে থাকা ক্রোমোজমের মধ্যে, তখন আমরা এক কাজ

২ জীবকোষের নিউক্লিয়াসের মধ্যের ঘন অংশটিকে বলা হয় নিউক্লিওলাস (Neucleolus)। নিউক্লিওলাসের চারপাশে যে জালিকা-কার (network) সূক্ষ্ম সূতার ন্যায় পদার্থটি ছড়িয়ে থাকে তাকে ক্রোমোজম বলে। ক্রোমোজমের কার্য অনুযায়ী ক্রোমোজমকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে ; (i) অটোজম (Autosome) ও (ii) যৌন-ক্রোমোজম (Sex-chromosome)। অটোজম জীবদেহের দৈহিক চরিত্রাবলী গঠিত করে এবং যৌন-ক্রোমোজম নির্ধারণ ক'রে থাকে জীবের যৌন-চরিত্রসমূহ। মোট ২৩টি যুগ্ম (pair) ক্রোমোজম জীবকোষে থাকে। তার মধ্যে ২২টি যুগ্মই হল অটোজম এবং মাত্র ১টি যুগ্ম হল যৌন-ক্রমোজম।

করি না কেন! জিন যে কি বস্তু তা বুঝবার জন্য আমরা বরং নিউক্লিক এ্যাসিড আর ঐ প্রোটিনগুলি সম্পর্কে আরও ভালো করে জানবার চেষ্টা করি। জিনের খবর হয়তো ওরাই বলতে পারবে। অর্থাৎ নিউক্লিক এ্যাসিড বা প্রোটিনই প্রকৃতপক্ষে হদিস দেবে জিনের। এদের মধ্যে যেহেতু প্রোটিনের রাসায়নিক গঠন এবং চরিত্র বিজ্ঞানীদের কাছে অনেকদিন হতেই বেশ ঘোরালো ব'লে মনে হয়েছে, তাই স্বভাবতই প্রথমেই তাঁদের নজর গেল প্রোটিনের দিকে। জিন বস্তুটি যে কি তা জানবার জন্য প্রোটিনকে নিয়েই পড়লেন তাঁরা। প্রোটিনের প্রতি বিজ্ঞানীদের এই মনোযোগের ফলশ্রুতি হিসাবে প্রায় পরবর্তী চল্লিশ বছর চললো বিজ্ঞানীদের প্রোটিনকে জানার সে এক প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। চেষ্টা বিফল হ'ল না। তাঁদের বুদ্ধিদীপ্ত গবেষণার ফলে জানা গেল এতদিনের না-জানা অনেক রকম জটিল জটিল সব প্রশ্নের উত্তর, হ'ল অনেক রহস্যময় সমস্যার সমাধান। এদিকে নিউক্লিক এ্যাসিডকে নিয়ে নাড়াচাড়া করার ব্যাপারেও বিজ্ঞানীরা যে পিছ-পা ছিলেন তা কিন্তু নয়, সেটিকে নিয়েও বহু জটিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছিলেন তাঁরা। আমেরিকার রকফেলার ইনস্টিটিউটের প্রখ্যাত তিনজন গবেষক বিজ্ঞানী কলিন মেকলিওড, ম্যাকলিন ম্যাকার্টি ও ওসওয়ার্ড এভারি ১৯৪৪ সালে পরীক্ষামূলকভাবে দেখাতে সক্ষম হন যে, ডি-অক্সিরাইবো-নিউক্লিক এ্যাসিড বা D.N.A.-ই হ'ল সেই বস্তু, যেটি জিনের যাবতীয় ধর্মসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সুতরাং অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই এবার বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি গেল D.N.A.-র উপর। D.N.A.-র আণবিক গঠন কেমন হবে তাই নিয়ে চললো নানা জল্পনা-কল্পনা। এই শতাব্দীর চল্লিশের দশকে এরউইন সাগার্ফ, হার্সি চেস, মার্থা চেস প্রমুখ বিজ্ঞানীরা এটা বুঝেছিলেন যে D.N.A. হ'ল একটি অতিকায় অণু। অতিকায় অণু—কথাটিতে অবশ্য ঠিক স্পষ্ট ক'রে বলা হয় না D.N.A.-র প্রকৃত গঠনটি কতটা বড়। প্রকৃতপক্ষে D.N.A. হ'ল হাজার হাজারটি ছোট ছোট বিভিন্ন ধরনের একক অণু দ্বারা গঠিত একটি অণু—আরও ভালোভাবে বলতে গেলে বলা উচিত লক্ষ লক্ষ পরমাণুর সাহায্যে এই অতিকায় অণু-দানবটির (Macromolecule) দেহ তৈরী হয়েছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একক অণুগুলিকে বলা হয় নিউক্লিওটাইড (Nucleotide)। প্রতিটি নিউক্লিওটাইড অণুতে থাকে একটি জৈব ক্ষারক (Organic base), একটি পাঁচ-কার্বন-যুক্ত শর্করা (এই শর্করাটির নামই হ'ল—Deoxyribose) এবং একটি ফসফরিক এ্যাসিড অণু। ফসফরিক এ্যাসিডের কাজ হল পাশাপাশি থাকা দু'টি নিউক্লিও-টাইডের শর্করাকে রাসায়নিক বন্ধনে আবদ্ধ রাখা। এই ভাবে অনেকগুলি (অনেকগুলি না বলে অসংখ্য বলাই ঠিক হবে।) নিউ-ক্লিওটাইডকে পর পর জুড়ে থেকে একটি D.N.A. অণু-দানবের সৃষ্টি হয়। D.N.A.-তে চার রকমের জৈব ক্ষারক থাকে, সেগুলি হল অ্যাডেনিন (A), থাইমিন (T), গুয়েনিন (G) এবং সাইটোসিন (C)। এই ক্ষারকগুলির বিশেষত্ব হ'ল এই যে, অ্যাডেনিন সর্বদা থাইমিনের সঙ্গে (অর্থাৎ A সব সময়ে T-র সঙ্গে) এবং গুয়েনিন সর্বদা সাইটোসিনের সঙ্গে (অর্থাৎ G সব সময়ে C-র সঙ্গে) হাইড্রোজেন বন্ধন (Hydrogen bonding) দ্বারা আবদ্ধ হতে পারে। D.N.A. নিয়ে গবেষণা করার

সময় বিজ্ঞানীরা আরও লক্ষ্য করেছেন যে, ক্ষারকগুলি সুনির্দিষ্টভাবে হাইড্রোজেন বন্ধনে আবদ্ধ থাকার ফলে সেখানে অ্যাডেনিন-থাইমিন (অর্থাৎ **A-T** যুগল) এবং গুয়েনিন-সাইটোসিন (অর্থাৎ G-C যুগল) যুগলের মধ্যে সর্বদা A-র পরিমাণ T-র সমান এবং G-র পরিমাণ C-র সমান থাকে। ভাবতে অবাক লাগে লক্ষ লক্ষ পরমাণু দ্বারা সৃষ্ট এই বিশালকায় অণুটির মধ্যেও কি আশ্চর্য সুন্দর একটি গাণিতিক সাম্য ও সামঞ্জস্য বিদ্যমান। সৃষ্টির সব কিছুই যে আশ্চর্য এক গাণিতিক সূত্রে গ্রথিত তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

D.N.A. যে একটি অণু-দানব কেবলমাত্র এই তথ্যটুকুই এতদিন জানা ছিল বিজ্ঞানীদের, যদিও তার আণবিক গঠন সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন প্রায় সম্পূর্ণই অন্ধকারে। এই সময় (সময়টা হ'ল ১৯৫১ সাল) জেমস ডেওডে ওয়াটসন এবং তাঁর চেয়ে বয়সে দশ বছরের বড় সহকর্মী বন্ধু ফ্রান্সিস ক্রিক ব্যস্ত ছিলেন কেম্ব্রিজের ক্যাভেনডিস ল্যাবরেটরিতে D.N.A.-র আণবিক গঠন-বৈচিত্র্য সম্পর্কে আলোকপাত করার ব্যাপারে। প্রতিভাদীপ্ত তরুণ মার্কিন বিজ্ঞানী ওয়াটসন এবং সদানন্দ ক্রিকের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে অবশেষে সেই দুরূহ গবেষণা-কার্যটি সম্পূর্ণ হ'ল একদিন। D.N.A.-র আণবিক গঠন এবং তার সম্পর্কে অন্যান্য নানান তথ্য তাঁরা উপহার দিলেন বিজ্ঞানকে। ঐ একই সময়ে মরিস উইলকিনস্ নামক অপর এক প্রতিভাধর ব্রিটিশ বিজ্ঞানী লণ্ডনের কিংস হসপিটালে তাঁর সুযোগ্য সহকর্মী শ্রীমতী রোজালিন ফ্র্যাংকলিনের সহায়তায় D.N.A.-কে এক্স-রশ্মির সাহায্যে বিশ্লেষণ করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। D.N.A.-র আণবিক গঠন-বৈচিত্র্য সম্পর্কে এবং জীবদেহে বংশগতির (heredity) রহস্য সম্পর্কে আলোকপাতের জন্য ১৯৬২ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে ওয়াটসন, ক্রিক[৩] এবং উইলকিনস্‌কে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। তাঁরা যৌথভাবে D. N. A.-র যে মডেলটির প্রস্তাব করেন, তাকে এক কথায় যুগান্তকারী বলা যেতে পারে। তাঁদের সে মডেলটির নাম দেওয়া হয়েছে 'দ্বি-শৃঙ্খল কুণ্ডলী' (Double helix) মডেল। বস্তুত এই মডেলটি একটি ত্রি-মাত্রিক (Three dimensional) মডেল এবং এখানে D.N.A.-র প্রধান দুটি শৃঙ্খল তৈরী হয়েছে শর্করা-ফসফেট-শর্করা-ফসফেট এই বন্ধন দিয়ে। আর ঘোরানো সিঁড়ির মত একের উপরে আরেকটি জড়ানো এইভাবে শৃঙ্খল দুটি আড়াআড়ি ভাবে পরপর A-T (অ্যাডেনিন-থাইমিন) অথবা G-C (গুয়েনিন-সাইটোসিন) ক্ষারক-যুগ্ম দিয়ে যুক্ত থাকে। D.N.A.-অণুর একটি শৃঙ্খল অপর শৃঙ্খলটির ঠিক অনু-পূরক প্রতিলিপি বা যেন একটি যথাযথ দর্পণ-প্রতিবিম্ব।

৩ ক্রিক—চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেও বস্তুত তিনি একজন প্রতিভাধর পদার্থবিজ্ঞানী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 'রেডার' (Radar) যন্ত্রের আবিষ্কারকগণের মধ্যে তিনি একজন। 'ওয়াটসন-ক্রিক D. N. A. মডেল'—এই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সত্যটির আবিষ্কার সম্পর্কে ওয়াটসন পরবর্তী কালে বলেছিলেন, 'এই আবিষ্কারটির সময় পদার্থবিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞান হাত ধরাধরি ক'রে চলেছে। এই চলায় অধ্যাপক ক্রিক আমাকে পদার্থবিদ্যা ব্যাপারটি বুঝিয়েছেন এবং আমি তাঁকে সাহায্য করেছি জীববিজ্ঞান ব্যাপারটি কেমন তা বুঝতে।'

বস্তুত একটি জীবকোষ বা সম্পূর্ণ জীবটির যাবতীয় কার্য D. N. A-র দ্বারাই নির্ধারিত হয়ে থাকে। সেটা কি ভাবে হয় এখন তাই দেখা যাক্। D.N.A. কিন্তু কখনই প্রত্যক্ষভাবে নিজে ঐ কাজগুলি করে না। জীবদেহের জৈবিক বিক্রিয়াগুলি সংঘটিত হয় কতকগুলি বিশেষ বিশেষ জৈব অনুঘটক (catalyst) বা এনজাইমের (enzyme) সহায়তায়। এই এনজাইমগুলিই হল জীবকোষের খাদ্যপ্রাণ বা প্রোটিন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সব শ্রেণীর প্রোটিনগুলিই অতিকায় অণু (অবশ্য অণু-দানব D.N A-র তুলনায় এগুলি নিতান্তই ছোটখাটো) এবং মোট কুড়িটি এ্যামিনো-এ্যাসিডের[৪] সাহায্যে খাদ্যপ্রাণ বা প্রোটিনগুলি গঠিত হয়ে থাকে।

এই কুড়িটি এ্যামিনো-এ্যাসিডের সজ্জাক্রমের (sequence) পরিবর্তনের ফলেই সৃষ্টি হয় ভিন্ন ভিন্ন প্রোটিনের। কিন্তু কে করবে এগুলির সজ্জাক্রমকে সুনির্দিষ্ট ভাবে নিয়ন্ত্রণ? এর উত্তর হ'ল—D.N.A.। D.N.A.-ই সর্বদা ঠিক করবে দেহের কোষে কখন কোথায় কোন্ এ্যামিনো-অ্যাসিডটিকে অথবা কোন্ এনজাইমটিকে ঠিক কতটা পরিমাণে তৈরী করতে হবে; কতটা পরিমাণে সেগুলি জীবকোষে ক্রিয়াশীল হবে এবং তাদের সজ্জাক্রমই বা কি রকম হবে ইত্যাদি সব কিছুই। জীবদেহের অসংখ্য কোষে নিরবচ্ছিন্নভাবে যে ঐকতান বা অর্কেষ্ট্রা বেজে চলেছে D.N.A.-হ'ল তার সৃজনকুশলী সঙ্গীত-পরিচালক বা ব্যাণ্ড-মাস্টার এবং এনজাইম, প্রোটিন, এ্যামিনো-এ্যাসিডগুলি হ'ল এক একজন কুশলী যন্ত্রী।

সুতরাং এটা জানা গেল যে, এনজাইম ও এ্যামিনো-এ্যাসিডের সজ্জাক্রম নির্ধারিত হয় D. N.A দ্বারা। কথাটিকে অন্যভাবে বললে দাঁড়ায় D.N.A -তে সুপ্ত জিনের মধ্যেই এগুলির নিজ নিজ স্থান নির্ধারণের গোপন রাসায়নিক সঙ্কেতটি নিহিত থাকে। জিনের এই গোপন এবং সাঙ্কেতিক ভাষাকেই বলা হয় জেনেটিক কোড (Genetic code), যে গোপন ও সাঙ্কেতিক লিপির পাঠোদ্ধার করা বিজ্ঞানীদের পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছিল না বলেই বিজ্ঞানকে জীবন-সৃষ্টির রহস্য উন্মোচন করতে এতদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হ'ল। আজ বলতে বাধা নেই যে, জিনের ভাষা-জনিত সমস্যা দুরীভূত হয়েছে (আশ্চর্য শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানেও language problem!)।

একটি বিশুদ্ধীকৃত প্রোটিনের মধ্যে এ্যামিনো-এ্যাসিডগুলির সজ্জাক্রম রাসায়নিক উপায়ে বের করবার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৯৬২ সালে। সর্বপ্রথম ইনসুলিন (Insulin) নামক হর্মোন প্রোটিনের এই সজ্জাক্রমের আবিষ্কারের জন্য ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ফ্রেডারিক ম্যাঙ্গারকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। এছাড়া মার্কিন রাসায়নিক লাইনোস পাউলিংকে প্রোটিনের মধ্যে এ্যামিনো-এ্যাসিডগুলির দ্বি-মাত্রিক (Two dimensional) সংগঠন আবিষ্কারের জন্য এবং তার অল্প কয়েক বছর বাদেই বৃটিশ বিজ্ঞানীদ্বয় জন কেনড্রু ও ম্যাক্স পেরুৎস্ প্রোটিনের ত্রি-মাত্রিক (Three dimensional) সংগঠন

৪ প্রোটিন-সৃষ্টিকারী গ্লাইসিন, লাইসিন, লিউসিন, সেরিন প্রভৃতি কুড়িটি এ্যামিনো-এ্যাসিডের পরিমাণ এবং সেগুলির পরপর সজ্জাক্রমের উপর ঐ প্রোটিনের ধর্ম ও কার্যকারিতা নির্ভর করে। সুতরাং এটা দেখা যাচ্ছে যে ভিন্ন ভিন্ন প্রোটিন সৃষ্টি করতে হ'লে ঐ কুড়িটি এ্যামিনো-এ্যাসিডের পরিমাণ এবং সজ্জাক্রমের পরিবর্তন হওয়া অতি অবশ্যই প্রয়োজন।

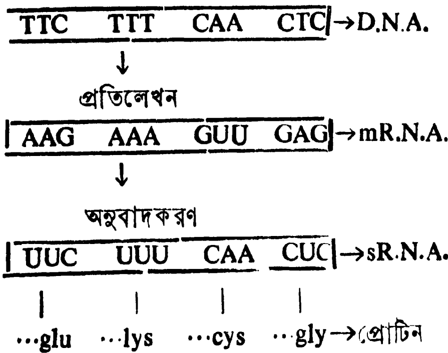
আবিষ্কার করে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

এরপর ১৯৬৫ সালে জীবকোষ থেকে প্রয়োজনীয় এনজাইম ও অন্যান্য কণিকাসমূহ নিয়ে পরীক্ষানলে (Test tube) প্রোটিন সংশ্লেষণের (Synthesis) কৌশল আয়ত্তের চেষ্টা শুরু করেন পল জামেসনিক, ম্যাহেলন হোগল্যাণ্ড প্রমুখ মার্কিন বিজ্ঞানীগণ। এঁদের কাজের ফলে জানা যায় পরীক্ষানলে প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন হ'ল রাইবোজম কণিকা (Ribosome), এ্যামিনো-এ্যাসিড, এনজাইম এবং এক ধরনের ছোট ছোট নিউক্লিক এ্যাসিড, যেগুলি সুপ্ত থাকে জীবকোষের কণিকাবিহীন অংশে। শেষের কণিকাগুলির নাম দ্রবণীয় R.N.A. বা sRNA (soluble Ribonucleic Acid)। এই R.N.A. অণুগুলিও অনেকটা D.N.A.-র গোত্রীয় অণু, যদিও আকারে এরা হয় অনেক ছোট। D.N.A. অণু যেখানে সৃষ্টি হয় কয়েক হাজার নিউক্লিওটাইড জুড়ে, সেখানে মাত্র আশিটির মত নিউক্লিওটাইড জুড়ে সৃষ্টি হয় R.N.A. অণুর দেহটি। R.N A.-তে আছে ডি-অক্সিরাইবোজের পরিবর্তে রাইবোজ ও ক্ষারক থাইমিনের (T) বদলে ইউরাসিল (U)। অবশ্য ইউরাসিলের হাইড্রোজেন-বন্ধনী-ধর্ম থাইমিনের মতই থাকবে অর্থাৎ U. কেবলমাত্র A-র (অ্যাডেনিনের) সঙ্গেই আবদ্ধ হতে পারে।

আমেরিকার আর্থার কর্নবার্গ D.N.A.-র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিউক্লিওটাইডগুলির এক একটিকে ছাঁচের সাহায্যে তৈরীর অনুরূপ পদ্ধতিতে তৈরী করে নিয়ে কৃত্রিম উপায়ে পরীক্ষানলে D.N.A. অণুকে সৃষ্টি করতে সক্ষম হন এবং সেভেরো ওচোয়া ঐ একই সময়ে আবিষ্কার করলেন পলিনিউক্লিওটাইড ফসফরিলেজ, যা R.N.A.-র উপাদান নিউক্লিওটাইডগুলিকে জুড়ে দিয়ে কৃত্রিম উপায়ে R.N.A. অণু তৈরী করতে পারে। অর্থাৎ D.N A. এবং R.N.A. অণুতে থাকা নিউক্লিওটাইডগুলিকে 'ছাঁচের' সাহায্যে তৈরী ক'রে নিয়ে অবশেষে কৃত্রিম উপায়ে গবেষণাগারে সৃষ্টি করা সম্ভব হ'ল D.N.A. এবং R.N.A. অণু দুটিকে। এই মূল্যবান কাজের জন্য সেভেরো ওচোয়া ও আর্থার কর্নবার্গকে যুগ্মভাবে ১৯৫৯ সালে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

তখন পর্যন্ত কিন্তু D.N.A. থেকে প্রোটিনে সেই কুড়িটি এ্যামিনো-এ্যাসিডের সজ্জাক্রম নির্ধারণ-বার্তা কি ক'রে আসছে, তা জানা যায়নি। অবশেষে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি গেল R.N.A.-র প্রতি, তাঁরা R.N.A.কে কাজে নামালেন মধ্যস্থতা করার ব্যাপারে; যার নাম দেওয়া হল বার্তাবহ R.N.A. বা mR.N.A. (messenger R.N.A.)। এই বার্তাবহ R.N.A. D.N.A.-র ছাঁচ হতে 'বেস পেয়ারিং' (Base pairing) নামক এক বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে কতকগুলি রাসায়নিক সঙ্কেত নিয়ে আসবে রাইবোজোম কণিকায়। এই mR.N.A.-র তিনটি তিনটি নিউক্লিওটাইডের সজ্জাক্রমই নির্ধারণ ও নির্বাচন করবে প্রোটিনের মধ্যে এক একটি এ্যামিনো-এ্যাসিডের দাঁড়াবার জায়গা অর্থাৎ তাদের সঠিক পর্যায়ক্রম; এদের বলা হয় 'ত্রয়ী কোড' (Triplet Code)। এ্যামিনো-এ্যাসিডগুলি mR.N.A. হতে প্রোটিনে সরাসরি না এসে আসবে sR.N A.-র কাঁধে ভর ক'রে। তখন সেগুলি যে সংকেত বা কোডগুলিকে বহন ক'রে নিয়ে আসে, তাদের বলা হয় 'বিপরীত ত্রয়ী কোড' (Triplet anticode)। অর্থাৎ mR.N A.-তে সাজানো থাকবে পরপর ত্রয়ী কোড (যেমন AAG, AAA, GUU,

GAG) এবং sR.N.A.তে থাকবে বিপরীত ত্রয়ী কোড (যেমন UUC, UUU, CAA, CUC)। এখন প্রতিসংকেতগুলি সংকেতের জায়গায় দাঁড়ালেই রাসায়নিক বার্তার নির্ভুল পাঠোদ্ধার হয়ে যাবে। D.N.A. থেকে mR.N A.-তে সংকেত গ্রহণের প্রথম ধাপটির নাম 'প্রতিলেখন' (Transcription) এবং mR.N.A. থেকে sR.N.A.-র মাধ্যমে প্রোটিনে এ্যামিনো-এ্যাসিডের স্থান নিরূপণ করবে যে দ্বিতীয় ধাপটি, তার নাম 'অনুবাদকরণ' (Translation)। ১নং চিত্রে ব্যাপারটিকে দেখানো হয়েছে।



চিত্র ১

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি গবেষণাগারে ১৯৬১ সালে জিনের বার্তা পাঠানোর প্রথম ধাপটি অর্থাৎ প্রতিলেখনের কার্য সমাধাকারী mR.N.A. পলিমারেজ আবিষ্কৃত হ'ল, যা D. N. A. থেকে অনুরূপ বার্তা নিয়ে বার্তাবহ R. N. A. তৈরী করতে পারে। ব্যাপারটি আরও বিশদভাবে পরীক্ষা করতে নেমে আমেরিকায় ন্যাশন্যাল হার্ট ইনিস্টিটিউটের মার্শাল নিরেনবার্গ দেখলেন রাইবোজোম ও sR. N. A. ছাড়াও বার্তাবহ R. N A. (বা mR.N.A.) না হ'লে কোন মতেই এ্যামিনো-এ্যাসিডগুলিকে জুড়ে প্রোটিন তৈরীর কাজটি সমাধা করা সম্ভব হচ্ছে না। তিনিও পরীক্ষানলে প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণের সঙ্গে শুধু ইউরাসিল নিউক্লিওটাইড (U) নিয়ে গঠিত অতিকায় পলি ইউরাসিল (Poly-Urasil বস্তুটি হ'ল R.N.A.-র মত একটি বৃহৎ অণু যার মধ্যে পর পর…UUU …নিউক্লিওটাইডগুলি সাজানো থাকে।) দিয়ে দেখতে পেলেন যে, এক্ষেত্রে মাত্র একটি এ্যামিনো-এ্যাসিড ফিনাইল-অ্যালানিন পর পর জুড়ে প্রোটিনের মত একটি বস্তু সৃষ্টি হয়, যার নাম পলি ফিনাইল অ্যালানিন। এর আগে অনেক রকম অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ থেকে ধারণা করা হয়েছিল, এ্যামিনো-এ্যাসিডের কোড হবে তিনটি ক'রে নিউক্লিওটাইড দ্বারা গঠিত। কিন্তু নিরেনবার্গই দিলেন প্রথম সংকেতটির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা—অর্থাৎ বললেন UUU ত্রয়ীই হচ্ছে ফিনাইল অ্যালানিনের সংকেত। মার্শাল নিরেনবার্গের এই আবিষ্কারটি একটি অনন্যসাধারণ আবিষ্কার। ১৯৬১ সালের অগস্ট মাসে মস্কোতে অনুষ্ঠিত পঞ্চম আন্তর্জাতিক প্রাণ-রসায়ন-বিজ্ঞান কংগ্রেসে নিরেনবার্গ যখন তাঁর এই বুদ্ধিদীপ্ত গবেষণার বার্তাটি ঘোষণা করলেন তখনই বিশ্বের জীববিজ্ঞানীরা বুঝলেন জেনেটিক কোড বা জিনের গোপন সংকেত বুঝবার ব্যাপারে এক নবযুগের সৃষ্টি করলেন এই তরুণ বিজ্ঞানীটি। রাতারাতি জগদ্বিখ্যাত হয়ে উঠলেন সেদিনের সেই অল্পখ্যাত বিজ্ঞানী—মার্শাল নিরেনবার্গ।

এর পরের ইতিহাস অতি দ্রুত। সেভেরো ওচোয়া আবিষ্কৃত এনজাইম পলি নিউক্লিওটাইড ফসফরিলেজের সহায়তায় R.N.A.-র চারটি নিউক্লিওটাইডের এক বা তার বেশীর সমন্বয়ে অনেক কৃত্রিম R N.A. তৈরী হ'ল এবং

ওচোয়া ও নিরেনবার্গ গবেষণাগারে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সেগুলি দিয়ে প্রোটিন সংশ্লেষণ ক'রে প্রায় প্রত্যেকটি এ্যামিনো-এ্যাসিডের ত্রয়ীর সন্ধান পেলেন। আশ্চর্য তখনও পর্যন্ত কিন্তু ঐ ত্রয়ীগুলিতে নিউক্লিওটাইডের সজ্জাক্রম জানবার কোন প্রচলিত পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়নি। যেমন AUU ত্রয়ী যে লিউসিন নামক এ্যামিনো-এ্যাসিডটির কোড তা জানা গেলেও এরা কি ভাবে যে সাজানো থাকে (AUU বা UAU নাকি UUA ?) তা কিন্তু তখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

আমি আগেই বলেছি mR N.A.-র কোডের ঠিক বিপরীত সঙ্কেত বা কোড থাকবে sR.N.A.-তে, যা শেষ পর্যায়ে এসে এ্যামিনো-এ্যাসিডের স্থান যথাযথভাবে নির্ণয় করবে। কিন্তু কোন প্রাকৃতিক R.NA.-র নিউক্লিওটাইড সজ্জাক্রম বের করবার কোন উপায় বিজ্ঞানীদের এতদিন জানা না থাকায় স্বভাবতই এর কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণও তাঁদের হাতে ছিল না। এই সময় আমেরিকার কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রবার্ট হোলি টানা প্রায় আট বছর যাবৎ (১৯৫৬-১৯৬৪) এক গবেষণাপর্ব সমাধা করছিলেন, একটি sR.N.A.-র নিউক্লিওটাইডের সজ্জাক্রমকে পুরোপুরি জানার ব্যাপারে। তাঁর গবেষণার জন্য একটি sR.N.A.-কে আলাদা করার প্রয়োজন হয়, তাই sR.N.A. আলাদা করবার জন্য তিনি 'বিপরীতমুখী স্রোতে দ্রবণ নিষ্কাশন পদ্ধতির' (Counter current extraction) সাহায্যে অ্যালানিন নামক এ্যামিনো-এ্যাসিডের বাহক sR.N.A. প্রস্তুত করতে সমর্থ হন। পরে আবার তিনি সেটিকে ভেঙ্গে sR.N.A.-র সজ্জাক্রম নির্ভুলভাবে নির্ণয় করেন। পূর্বেই বলেছি তাঁর এই কাজ ছিল দীর্ঘমেয়াদী এবং অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রমের ফসলস্বরূপ। ১৯৬৫ সালে তিনি 'Science' পত্রিকায় একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধের আকারে বিশ্ববাসীকে জানালেন যে, এই প্রথম একটি প্রাকৃতিক নিউক্লিক এ্যাসিডের সজ্জাক্রম জানা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়েছে।[৫] হোলির প্রদর্শিত পথ অবলম্বন ক'রে বিজ্ঞানীরা পরবর্তী কালে আরও অনেকগুলি sR.N.A.-র সজ্জাক্রম জেনে ফেলেছেন।

বিজ্ঞানের এই অতি বিচিত্র শাখায় এরপর পাদপ্রদীপের সামনে যিনি এলেন, তিনি হলেন ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা। তিনিই করলেন জেনেটিক কোডের পুরোপুরি এবং নির্ভুল পাঠোদ্ধার। এর আগে এ ব্যাপারে যা কিছু হয়েছিল সবই ছিল কাটা কাটা, অসমাপ্ত।

৫ বিজ্ঞানী রবার্ট হোলি প্রচারবিমুখ, সদা প্রফুল্ল এবং বিজ্ঞানের এক নীরব কর্মী-রূপে তাঁর ছাত্র ও সহকর্মী মহলে অত্যন্ত সমাদৃত। প্রাকৃতিক নিউক্লিক এ্যাসিডের সজ্জাক্রম যখন তিনি আবিষ্কার করেন, তখন তিনি এত অল্পখ্যাত ছিলেন যে, ১৯৬৫ সালের এপ্রিলে আটলান্টিক সিটিতে অনুষ্ঠিত মার্কিন জীববিজ্ঞান সমিতিগুলির বার্ষিক সভায় নিউক্লিক এ্যাসিড সম্পর্কীয় বিশেষ আলোচনাচক্রে আমন্ত্রিত বক্তা হিসাবে তাঁর নামই ছিল না। কিন্তু বিজ্ঞানীরা হোলির গবেষণার অপরিসীম গুরুত্বটি উপলব্ধি ক'রে তাড়াতাড়ি সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে হোলিকে বিশেষ বক্তারূপে ঐ সভায় ভাষণ দিতে অনুরোধ জানান। স্বল্পভাষী, নিরীহ, আড়ম্বরহীন এই ভদ্রলোকটি যে এর মাত্র তিন বছর বাদে বিশ্বের একজন প্রথম সারির বিজ্ঞানীরূপে চিহ্নিত হবেন এবং নোবেল পুরস্কার পাবেন, তখন তা কে জানতো ?

জেনেটিক কোডের পূর্ণাঙ্গ একটি চিত্র এতদিন বাদে পাওয়া গেল খোরানা-প্রদত্ত তত্ত্বটি হ'তে। নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী বৃটিশ বিজ্ঞানী স্যার আলেকজাণ্ডার টডের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত খোরানা কয়েক বছর কানাডার বৃটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটিয়ে পাকাপাকিভাবে এখন উইস্‌কনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের এনজাইম রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অন্যতম ডিরেক্টর ও সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত। অধ্যাপক খোরানাই প্রথম অল্পসংখ্যক কয়েকটি নিউক্লিওটাইডে জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে সেগুলিকে জুড়ে দিতে সক্ষম হন। তাছাড়া তো তাঁর অফুরন্ত চেষ্টা চলছিলই ইচ্ছামতো নির্দিষ্ট সজ্জাক্রমের বড় বড় কৃত্রিম বার্তাবহ R.N.A. তৈরী করার ব্যাপারে। সেই চেষ্টার ফলশ্রুতি হিসাবে জৈব রাসায়নিক সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে তিনি পুনরাবৃত্ত সজ্জাক্রমের (Repeating sequence) ছোট ছোট এমন কতকগুলি D.N.A. তৈরী করতে সক্ষম হলেন, যাতে দশটি থেকে ষোলটি নিউক্লিও-টাইড যুগ্ম আছে। পরে তিনি এনজাইম D.N.A. পলিমারেজের সাহায্যে ঐ ছোট ছোট D.N.A.-র ছাঁচে বড় বড় D.N.A.-অণু গঠন করতে সক্ষম হন, যার মধ্যে আগের পুনরাবৃত্ত সজ্জাক্রম যথাযথ ভাবে বিদ্যমান। এখন ঐ বড় বড় D.N.A.-র অণুগুলিকে ছাঁচ হিসাবে ব্যবহার ক'রে এনজাইম R.N.A. পলিমারেজের সাহায্যে কৃত্রিম বার্তাবহ R.N.A. (mR.N.A.) তৈরী করা গেল, যার মধ্যে আগে হ'তে জানা পুনরাবৃত্ত সজ্জাক্রমগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিদ্যমান থাকে। গবেষণার শেষ পর্যায়ে পৌঁছে অধ্যাপক খোরানা উপলব্ধি করলেন, পরীক্ষাগারে প্রোটিন সৃষ্টি ক'রে সেগুলির মধ্যে এ্যামিনো-এ্যাসিডের সজ্জাক্রম বিশ্লেষণ করতে পারলেই R.N.A.-র কোন্ সজ্জাক্রমের নির্দেশে কোন্ এ্যামিনো-এ্যাসিড কোথায় স্থান নিয়েছে, তা জানা সম্ভব হবে। উদাহরণ হিসাবে ধরা যাক একটি পুনরাবৃত্ত দ্বি-নিউক্লিওটাইড (অর্থাৎ···UC) সজ্জাক্রমে যুক্ত R.N.A. অণু যেটির প্রোটিন···UCU CUC দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। R.N.A. অণুতে UCU এবং CUC মাত্র এই দুটি সম্ভাব্য সজ্জা-ক্রম পুনরাবৃত্ত থাকতে পারে। পরে পরীক্ষার সাহায্যে দেখা গেল, এই R.N.A. দিয়ে সংশ্লেষিত প্রোটিনে শুধুমাত্র সেরিন (ser) এবং লিউসিন (leu) এই দুটি এ্যামিনো-এ্যাসিড পর পর বিদ্যমান থাকে। পুনরাবৃত্ত দ্বি-নিউক্লিওটাইড R.N.A. দিয়ে দুটি এ্যামিনো-এ্যাসিড যুক্ত প্রোটিনের সংশ্লেষণ কিভাবে ঘটে তা ২নং চিত্রে দেখানো হ'ল।

1	2	1	2
UCU	CUC	UCU	CUC
	↓		
ser	leu	ser	leu

চিত্র ২

সুতরাং খোরানার গবেষণার ফলে এতদিনে নির্ভুলভাবে জানা গেল সেরিন ও লিউসিনের সঙ্কেতের সজ্জাক্রম কিভাবে R.N.A. অণুতে সুনির্দিষ্টভাবে পরপর সাজানো থাকে। ১৯৬৫ সালে মার্কিন বিজ্ঞানীদের ফেডারেশন মিটিং-এর আলোচনাচক্রে এবং তার দুবছর পরে টোকিওতে অনুষ্ঠিত সপ্তম আন্তর্জাতিক বায়োকেমিস্ট্রি কংগ্রেসে তাঁর বিশেষ বক্তৃতায় তিনি ঘোষণা করলেন যে, জিনের কোড সম্পূর্ণরূপে জানার চেষ্টায় তিনি সফলকাম হয়েছেন। চারটি-নিউক্লিওটাইড সংবলিত বিভিন্ন কৃত্রিম বার্তাবহ R.N.A.-র সাহায্যে পূর্ব ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী সব ক'টি এ্যামিনো-

এ্যাসিডের সব ক'টি গোপন কোডের পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হ'ল। আর সেই সঙ্গে অবসান হ'ল বিজ্ঞানীদের দীর্ঘদিনের হতাশার। জিন কিভাবে এতদিন যাবৎ এক দুর্বোধ্য ভাষায় তার কার্য সমাধা ক'রে আসছিল, তার নিভুর্ল পাঠোদ্ধার করলেন সম্মিলিত ভাবে খোরানা, নিরেনবার্গ ও হোলি (অবশেষে তা হ'লে বিজ্ঞানের ভাষা-সমস্যা মিটল!)। এরই স্বীকৃতি হ'ল তাঁদের ১৯৬৮ সালের নোবেল পুরস্কার।

এবার খোরানার দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজটি প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালে। এ পর্যায়ে তিনি কৃত্রিম উপায়ে রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে জিন-সৃষ্টি ও সেই কৃত্রিম জিনগুলিকে জীবকোষে পুনঃ-স্থাপনে (implantation) সক্ষম হন। তিনি ইষ্ট কোষ (Yeast cell) হতে কৃত্রিম উপায়ে জিন উৎপাদনে সফল হন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেগুলিকে তিনি প্রথমবার ইষ্ট জীবকোষে পুনঃস্থাপন করার কাজে ব্যর্থ হন। পরে ১৯৭৩ সালে তিনি এবং তাঁর সুযোগ্য সহ-কর্মীবৃন্দ* এসক্যারিসিয়া কোলাই (E. Coli) নামক ব্যাকটিরিয়া হতে কৃত্রিম উপায়ে জিন সৃষ্টি করেন এবং সেই ব্যাকটিরিয়ার জীবকোষে ঐ জিনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেবারও তাঁর জিন পুনঃস্থাপন-পর্বটি ব্যর্থ হয় একটি অদ্ভুত কারণে। ব্যর্থ হওয়ার কারণটি হ'ল ঐ জিনের গোপন কার্যাবলী শুরু এবং শেষ হওয়ার সঠিক পর্যায়ক্রম নির্ণয়ে তাঁদের ত্রুটি ছিল। অবশেষে খোরানা ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ রসায়নাগারে সৃষ্ট কোলাই ব্যাকটিরিয়ামের (E. Coli) জিনগুলিকে অতিক্ষুদ্র 'জীবপরমাণু'—ভাইরাসের দেহে পুনঃস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন আজ হতে মাত্র বছর দুই আগে। অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে পুনঃস্থাপিত জিনগুলি ভাইরাস জীবকোষে আশ্চর্য তৎপর-তার সঙ্গে ক্রিয়াশীল হচ্ছে। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, খোরানার এই বিস্ময়কর আবিষ্কারের ফলাফল সুদূরপ্রসারী। অতি উৎসাহীদের কেউ কেউ আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন —তাঁর প্রথম পর্যায়ের অর্থাৎ ১৯৬৮ সালের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত আবিষ্কারের চেয়েও খোরানার এবারের আবিষ্কার অনেক উচ্চ-মানের এবং সেই সঙ্গে গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত। একথা ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে যে বংশানুক্রমিতার বীজ-কণিকা জিনকে খোরানা এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দ গবেষণাগারে আর পাঁচটা রাসায়নিক যৌগের মত কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। এই দুঃসাধ্য কার্যটি সমাধা করার ফলে এসব ভাবনাচিন্তারও সূত্রপাত হয়েছে যে, ক্যানসার সহ নানান দুরারোগ্য অসুখ নিরাময় এবং মানবশিশুর জন্মকালীন অনেক দোষত্রুটিকে কাটিয়ে উঠে সুস্থ সবল স্বাভাবিক সন্তান যাতে ভূমিষ্ঠ হতে পারে সে ব্যাপারেও নতুন আলোর সন্ধান দেবে এই জিন পুনঃস্থাপন-প্রণালী। পিতামাতার শারীরিক ত্রুটিগুলি যাতে তাঁদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ উত্তরাধিকারসূত্রে না পান সেজন্যও খোরানার উদ্ভাবিত কৃত্রিম জিন পুনঃস্থাপন-বিজ্ঞানটি যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক।

* দ্বিতীয় পর্যায়ের গবেষণায় অধ্যাপক হরগোবিন্দ খোরানার দলে দুজন ভারতীয় বিজ্ঞানী আছেন। তাঁদের নাম ডঃ উত্তমরাজ ভাণ্ডারী ও ডঃ বালাগ্‌জী। ডঃ হাথ ফ্রিজ হলেন অধ্যাপক খোরানার প্রধানতম সহযোগী।

এই নবতম বিজ্ঞানশাখাটির নাম দেওয়া হয়েছে জেনেটিক সার্জারি। ক্যানসার নিরাময়ের ক্ষেত্রে আধুনিক শল্যবিদ্‌গণ এই জেনেটিক সার্জারির উপর যথেষ্ট আস্থাবান। এ পদ্ধতির সাহায্যে তাঁরা তাঁদের পছন্দমত (বা রোগীর দেহে পুনঃস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয়) জিনগুলিকে জীবদেহের প্রয়োজনীয় কোষে সংযোজন করতে পারবেন। তা ছাড়াও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার সাহায্যে মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা সম্ভব হবে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ, শস্যবীজ, নতুন নতুন ফলমূল, যেগুলিকে আমরা ইতি-পূর্বে কোনদিনও দেখিনি। শস্যদানায় নাইট্রোজেনের সাম্য বজায় রাখার কাজটি এ পদ্ধতিতে করা যাবে অতি সহজেই। এছাড়া নতুন নতুন চরিত্রের জীবজন্তু সৃষ্টি করা যাবে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতির সাহায্যে। মার্শাল নিরেনবার্গের মতে আগামী পঁচিশ বছরের মধ্যেই জেনেটিক সার্জারি এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার সাহায্যে চিকিৎসকগণ কৃত্রিম বা স্বাভাবিক জিনের প্রয়োগের সাহায্যে মানুষের অশেষ কল্যাণ-সাধনে সক্ষম হবেন। তখন পিতামাতার রক্তচাপ, রক্তে শর্করার ভাগ বেশী (ডায়াবিটিস) ইত্যাদি বংশানুক্রমিক অসুখগুলি যাতে নবজাতকের জীবন ভবিষ্যতে বিষময় করে না তুলতে পারে, সেজন্য প্রয়োজনমতো জিন-গুলিকে কৃত্রিম উপায়ে মানবদেহে পুনঃস্থাপিত ক'রে অথবা দেহ হতে অপ্রয়োজনীয় জিনগুলিকে সরিয়ে নিয়ে দেহে নতুন সুস্থ জিন সংযোজন করতে পারা যাবে। তার ফলে হয়ত এমন দিনও আসবে, যেদিন সমাজ-জীবনের প্রয়োজনে বিজ্ঞানীরা তাঁদের ইচ্ছামতো একজন রবীন্দ্রনাথ অথবা একজন আইনষ্টাইন সৃষ্টি ক'রে নিতে পারবেন।

তবে এটা ঠিকই যে, জিন সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা যা কিছু পেয়েছেন তার সবটাই যে মঙ্গলময় তা নয়, এরও একটা অন্ধকার দিক আছে। সে অন্ধকার দিকটি হ'ল জীবদেহে জিনের অপপ্রয়োগের ফলে সৃষ্টি হতে পারে অনেক রকম নাম ও চরিত্র না-জানা দুরারোগ্য ব্যাধির। যে সব এ্যান্টি-বায়োটিক ঔষধগুলি এতদিন যাবৎ মানুষের দেহে ব্যাকটিরিয়া-জাত অসুখসমূহ নিরা-ময়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুফল দেখিয়েছে, জিনের অপপ্রয়োগের ফলে তখন এ্যান্টিবায়োটিক ঔষধগুলির মানবদেহের উপর আর কোন প্রভাব থাকবে না। এর কারণ হ'ল জিন পুনঃস্থাপনের পর ব্যাকটিরিয়াগুলি হয়ে পড়বে অপ্রতিরোধ্য এবং অপরাজেয়। জিনের কুপ্রয়োগের ফলে সৃষ্টি হতে পারে শারীরিক ও মানসিক দিক হতে অপূর্ণ অসুস্থ মানব-শিশুর। ইচ্ছা করলে এই বিজ্ঞানকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার ক'রে দৈহিক বিকলাঙ্গ আর হিটলারি মনোভাবসম্পন্ন শিশুতে আগামী বিশ্বকে ভরিয়ে তুলে জীবন্ত এক নরককে নামিয়ে আনতে পারেন ধরার ধূলিতে সেইসব কাণ্ডজ্ঞানহীন ও নীতিবিসর্জন-দেওয়া রাজনীতিবিদ্‌গণ। অবশ্য বর্তমান চিত্র ঠিক এতখানি হতাশাপ্রদ নয়, কারণ ইষ্ট, কোলাই ব্যাক্টিরিয়াম এবং ভাইরাসের ক্ষেত্রে জিন পুনঃস্থাপন প্রক্রিয়া সফল হ'লেও মানবদেহে জিন পুনঃস্থাপন-ব্যাপারটি কারিগরি দিক হতে সত্যিই অতি জটিল। কারণ এককোষীদের তুলনায় মনুষ্য-জিনের গঠন ও তার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি অত্যন্ত জটিল। যাই হোক এর অনেকটাই এখনও তত্ত্বের

পর্যায়ে থাকলেও একথাও ঠিক যে অবশেষে জীবন-সৃষ্টি-রহস্যের জগদ্দল পাথরটি নড়েছে এবং কিছুটা পথ সে গড়িয়েছে। বিজ্ঞানের সদা চঞ্চল পদক্ষেপের সঙ্গে তালে তালে পা ফেলে চলতে পারা এবং তার গৌরবজনক পথপরিক্রমায় সঙ্গী হতে পারা ভাগ্যের কথা। তাই মুক্ত চিত্তে স্বীকার করা যেতে পারে যে, জীবন-রহস্য সমাধানের পথিকৃৎগণ, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জিন-বিদ্যাবিশারদগণ সেই বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী।

সমালোচনা

স্বামীজীর জীবনকথা : শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক : জন-প্রকাশনা, ২ ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্ট্রীট, কোন্নগর। (১৯৭৮), পৃঃ ২০৩, মূল্য সাত টাকা (সাধারণ), আট টাকা (শোভন)।

শুরুতেই লেখক জানিয়েছেন : ‘প্রায় বিশ বছর পরে এই বইখানির নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। এই ষষ্ঠ সংস্করণে কিছু পরিমার্জনের কাজ করা হল। আগেকার সংস্করণের পাঠে কয়েকটি তথ্যগত ভুল ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ পরম শ্রদ্ধেয় মাধবানন্দ মহারাজ…ওই ভুলগুলি দাগ দিয়ে দেখিয়ে বলেছিলেন, পরের সংস্করণে এগুলো সংশোধন করে দিও। এতদিনে তাঁর সে আদেশ পালন করার সুযোগ হল।’ এই মুখবন্ধের পরে তথ্যের দোষদর্শী অতি বড়ো দুর্মুখেরও মুখ বন্ধ হবার কথা।

তবে ‘স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ণাঙ্গ জীবনী’ বোলে লেখক বইখানির যে অতিরিক্ত শিরোনামা দিয়েছেন তা বিভ্রান্তিকর। এ প্রসঙ্গে সেই চারজন অন্ধের গল্প মনে পড়ে যাঁরা মাতঙ্গের দেহের এক একটি অঙ্গকে পূর্ণাঙ্গ বোলে ধরে নিয়েছিলেন। লেশমাত্র অঙ্গচ্ছেদন করলে তা আর পূর্ণাঙ্গ থাকে না; অবশ্য পূর্ণ ব্রহ্মের কথা আলাদা। স্বামীজীর মহাজীবনের বিভিন্ন দিক ও নির্দিষ্ট স্থানকাল নিয়ে লেখা শ্রীমতী লুই বার্ক ও শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসুর বিশাল গবেষণাগ্রন্থগুলির কথা বাদ দিলেও, স্বামী গম্ভীরানন্দ যেখানে তিন খণ্ডে মোট ১৪১৬ পৃষ্ঠায় এই ভূমাপুরুষের জীবনী লিখেছেন সেখানে ২০৩ পৃষ্ঠার এই চটি বইখনিকে তাঁর পূর্ণাবয়ব জীবনী—পুরাতন বা, লেখকের দাবিমতো, অধুনাতন—কোন অর্থেই বলা চলে না। পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিতে জীবনের সকল তাৎপর্যপূর্ণ তথ্যের সংস্থাপন ও বিচার-বিশ্লেষণ প্রত্যাশিত। প্রয়োজনমতো তথ্যের ‘নির্বাচন’ অর্থাৎ গ্রহণ-বর্জন লেখক যে করেছেন তা তিনি নিজেই জানিয়েছেন। এবং এই আলোচনার সূত্রে তাঁর আদর্শ জীবনীকার হিসাবে তিনি নাম করেছেন লিটন স্ট্রেচির, যদিও বিষয়বস্তুকে মুখরোচক বা উত্তেজক করতে স্ট্রেচির মতো বিখ্যাত ব্যক্তিদের কাদার পায়ের গুপ্ত রহস্য উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা তিনি করেননি, এই যা রক্ষা। তাঁর উদ্দেশ্যও অবশ্য তিনি বলেছেন ‘উদ্‌ঘাটন’ — ‘মহাপুরুষের অন্তর্সত্তার (?) বৈশিষ্ট্য ও বিকাশের ধারাকে উদ্‌ঘাটন করা’; এবং এও বলেছেন যে ‘এর জন্য প্রয়োজন সৃজনধর্মী সাহিত্যশিল্পের’। কিন্তু মনে হয় স্বামীজীর জীবন সহস্র সূর্যের মতন দেদীপ্যমান, যা উদ্‌ঘাটনের অপেক্ষা রাখে না এবং তাঁর জীবন ও প্রবচন ব্যাখানের জন্যে প্রয়োজন

যতোটা ঐতিহাসিক দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক চেতনার, ততোটা সাহিত্যশিল্পের নয়। তবে পাঠোপযোগী হতে হলে, না বললেও চলে, অন্যান্য রচনার মতো ইতিহাস ও জীবনীতেও কিছু সাহিত্যিক প্রসাদগুণ থাকা চাই।

আলোচ্য বইখানির প্রধান আকর্ষণ এর সাহিত্যরস, যে রসের মূল উৎস স্পষ্টত 'লিপিকা'র আগেকার রবীন্দ্রনাথ। পূর্ণাঙ্গ হোক আর নাই হোক, এটি একটি ব্যঞ্জনাময় রেখাচিত্র: কবিত্বময় বর্ণনা ও কিছুটা নাটকীয় উপস্থাপনার জন্যে বইখানি সুস্পষ্ট সুন্দর ছবির মতো জীবন্ত, রমণীয়। ঝরঝরে লেখাটি তর-তর করে পড়ে ফেললে স্বামীজীর এক জ্যোতির্ময় মূর্তি মনের আরশিতে ফুটে ওঠে। সেই অখণ্ড অনির্বচনীয় রূপ বিশ্লেষণ করে লেখক বলেছেন: 'নানা বিপরীত উপাদানে তা গড়ে উঠেছিল, নানা বিপরীত বস্তুর আশ্রয় তাতে মিলত।...জ্ঞানমার্গী এবং ভক্তিপন্থী, অদ্বৈতবাদী এবং সমাজসংস্কারক, কর্মযোগী এবং বৈরাগী, শিল্পী এবং সাংসারিক কার্য-কুশলী, নূতনের বিদ্রোহী নেতা এবং প্রাচীনের মুগ্ধ (?) ভক্ত' (পৃঃ ১৪৯-৫০)। স্বামী বিবেকানন্দের বিরাট বৈচিত্র্যময় ব্যক্তিত্ব এ সবের যোগফলের চেয়ে অনেক বেশি, অনেক বড়ো। একদিকে তিনি অমিতবীর্য অগ্নিচক্ষু সন্ন্যাসী, দিগ্বিজয়ী দার্শনিক, যুগন্ধর ধর্মাচার্য, সম্মোহক বক্তা ও অসামান্য লেখক; অন্যদিকে নিতান্ত সরল কৌতুকোচ্ছল এক অত্যন্ত কাছের মানুষ, যাঁর সঙ্গে আপামর সকলেরই একটা আটপৌরে সম্বন্ধ পাতানো সম্ভব, ফুটবল-পাগল দামাল কিশোরদলও যাঁর উত্তরসাধক। কিন্তু এ সবের অন্তরালে বিরাজমান—ঋষিশ্রেষ্ঠ, ছদ্মবেশী নারায়ণ, যাঁকে সনাক্ত করেন শ্রীরামকৃষ্ণ ও যাঁর সাযুজ্য লভ্য ধ্যানের গভীরে। তাঁর অতল অনন্ত ভাব অনুভব করা এবং অপরের অন্তরে তা সঞ্চারিত করা সহজ কথা নয়। তাইতো তিনি নিজেই এই স্বগতোক্তি করে ফেলেছিলেন, 'যদি আর একটা বিবেকানন্দ থাকত তবে বুঝতে পারত বিবেকানন্দ কি করে গেল!' তাহলেও, জগতের অসীম সৌভাগ্য, বিবেকানন্দের পরমাশ্চর্য জীবনকথা অন্যেরা বলেছেন, বলছেন এবং যতোদিন যাবে—সময়ের বোধক ব্যবধানে—আরো ভালো করে বলবেন। এ পর্যায়ে অধ্যাপক কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সুরচিত সুরভিত জীবনালেখ্য নির্দ্বিধায় অভিনন্দনযোগ্য।

তাঁর কিছু কিছু মন্তব্য কিন্তু মনে হয় আপাতশিথিল এবং কয়েকটি তর্কসাপেক্ষ, যথা: 'নরেন্দ্র নিজের সম্বন্ধে বন্ধু মণিকে গল্প বলছেন' (পৃঃ ৫৩); 'এদেশে ঘরছাড়াদের নিয়ে তিনিই (স্বামীজী) প্রথম ঘর বাঁধার রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছিলেন' (পৃঃ ১১৭); 'গান্ধীজীর চিন্তাধারার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে বিবেকানন্দের প্রভাব পড়েছে, এমন কোন প্রমাণ নেই' (পৃঃ ১৫২); 'ব্যর্থতার অবসাদ শেষ পর্যন্ত তাঁর (বিবেকানন্দের) নিরাসক্ত চিত্তে বেদনা সঞ্চার করতে পারেনি' (পৃঃ ১৭০); 'স্বামীজীর জীবনের গৌরব সম্পূর্ণ-মৌলিক কোন নূতন সত্য আবিষ্কারে নয়' (পৃঃ ১৮১) ইত্যাদি।

লেখকের কোন কোন শব্দপ্রয়োগেও হোঁচট খেতে হয়, যেমন: 'প্রামাণ্য বই' (পৃঃ ছ); 'প্রতিনিধি হবার উদ্দেশে' (পৃঃ ৯৬,১০২); 'উদ্দেশ সাধনের' (পৃঃ ৯৭,১০০-১০১); 'সন্ন্যাসীর লক্ষ' (পৃঃ ১৪২); 'মিশনের লক্ষ' (পৃঃ ১৪৩); 'ভ্রমণের লক্ষ' (পৃঃ ১৫৫); 'নিবেদিতার মেয়ে-বিদ্যালয়' (পৃঃ ১৬৩) ইত্যাদি। তাছাড়া, প্রচ্ছদপটের ওপরে 'স্বামীজি' (ভেতরে সর্বত্র

'স্বামীজী') থেকে আরম্ভ করে ছাপার বেশ কিছু ভুলও চোখে লাগে।

যাই হোক, মোটের ওপর, 'স্বামীজীর জীবনকথা' বিষয়গৌরবে ও রচনাসৌষ্ঠবে এমন একখানি মহার্ঘ ও মনোরম জীবনচিত্র হয়ে উঠেছে যা প্রতি চিন্তাশীল বাঙালী পাঠকের ঘরে ও প্রতি গ্রন্থাগারে শ্রদ্ধাভরে রাখার মতো।

বকলম

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণকার্য

ভারতে: ঘূর্ণিবাত্যাত্রাণ: অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে ঝড়-প্রতিরোধক গৃহনির্মাণের কাজ চলিতেছে। ওড়িশার কেওঁঝর ও কটক জেলায় ঘূর্ণিবাত্যাপীড়িত জনগণের জন্য ত্রাণকার্য আরম্ভ করা হইয়াছে।

উদ্বাস্তু-ত্রাণকার্য: যাঁহারা দণ্ডকারণ্য পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন অথবা সেখানে ফিরিয়া যাইতেছেন তাঁহাদের জন্য গত ১লা এপ্রিল হইতে খড়্গপুর রেল স্টেশনে এবং ৬ই এপ্রিল হইতে হাওড়া রেল স্টেশনে চিড়া, গুড়, গুঁড়া দুধ, বিস্কুট, সাবান ও লেবু দেওয়া হইতেছে।

বাংলাদেশে: বাগেরহাট, দিনাজপুর, নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা কেন্দ্রের মাধ্যমে রোগীদের চিকিৎসা এবং নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা কেন্দ্রের মাধ্যমে দুগ্ধবিতরণ অব্যাহত আছে।

উৎসব

রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমে গত ১০ই, ১২ই ও ১৩ই মার্চ ১৯৭৮, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪৩-তম আবির্ভাব-উৎসব মঙ্গলারতি, বৈদিকমন্ত্র-পাঠ, শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, হোম প্রভৃতির মাধ্যমে পালিত হয়। ১২ই ধর্মসভায় ভাষণ দেন শ্রীহরিপদ ভারতী, শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার ও সভাপতি স্বামী আত্মস্থানন্দ। পরে আশ্রমবালকগণ কর্তৃক 'কর্ণার্জুন' নাটক অভিনীত হয়। ১৩ই শিবপুরের 'শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির' কর্তৃক 'প্রেমের ঠাকুর' যাত্রাভিনয় হয়। উৎসবের অন্যান্য অঙ্গের মধ্যে ছিল কালীকীর্তন, ভক্তিমূলক সংগীত, বাউল ও লোকসংগীত, তরজা ইত্যাদি।

বিবিধ

বিগত ১৩ই জানুআরি হইতে ২৭শে এপ্রিল ১৯৭৮ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী সংঘের বিভিন্ন কেন্দ্রে যে সকল উৎসর্গীকরণ, ভিত্তিস্থাপন প্রভৃতি বিবিধ অনুষ্ঠান করেন, তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে দেওয়া হইল:

(১) আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১৩ই জানুআরি সম্প্রসারিত পূজাকক্ষের উৎসর্গীকরণ।

(২) মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২০শে জানুআরি নবনির্মিত সন্তনিবাসের দ্বারোদ্ঘাটন।

(৩) বোম্বে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১০ই ফেব্রুআরি নবনির্মিত বিবেকানন্দ বক্তৃতা-হল ও শিবানন্দ গ্রন্থাগারের উৎসর্গীকরণ।

(৪) নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১৩ই মার্চ নূতন 'ব্লাইণ্ড বয়েজ একাডেমি'র ভিত্তিস্থাপন।

(৫) নট্টরমপল্লী রামকৃষ্ণ মঠে গত ১২ই এপ্রিল নবনির্মিত মন্দির ও প্রার্থনা-কক্ষের প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব।

(৬) ত্রিচুর রামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২১শে এপ্রিল সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন।

(৭) তিরুভাল্লা রামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৭শে এপ্রিল একটি গ্রন্থাগারের ভিত্তিস্থাপন।

দেহত্যাগ

দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, **স্বামী বিশ্বকর্মানন্দ** (যোগী মহারাজ) গত ৩১শে মার্চ ১৯৭৮, বেলা ১০-৩০ মিনিটে ৮০ বৎসর বয়সে বারাণসী সেবাশ্রমে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গত ৫ই ফেব্রুআরি পুরাতন রক্তচাপবৃদ্ধির চিকিৎসার জন্য তিনি সেবাশ্রম হাসপাতালে ভর্তি হন, কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী রক্তচাপবৃদ্ধির ফলে মূত্রাশয়ের কার্য ব্যাহত হইয়া ইউরিমিয়া হওয়ার ফলে তাঁহার দেহাবসান হয়।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯৪৩ সালে বেলুড় সারদা পীঠে যোগদান করেন এবং ১৯৫০ সালে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা প্রাপ্ত হন। সারদাপীঠের কর্মী হিসাবে তিনি দীর্ঘকাল সংঘের সেবা করেন। ১৯৬৪ সাল হইতে বারাণসী সেবাশ্রমে যথাসাধ্য অল্পস্বল্প কাজ করিতে থাকেন এবং কয়েক বৎসর পরে সম্পূর্ণ অবসর গ্রহণ করেন। তিনি একজন দক্ষ যন্ত্রবিজ্ঞানী ও ঘড়িনির্মাণ-বিশেষজ্ঞ ছিলেন। কঠোর সংযম ও অনাড়ম্বর প্রকৃতির জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র ছিলেন।

তাঁহার দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক!

আবির্ভাব-তিথি ও পূজা-তিথির সূচী

বাংলা ১৩৮৫ সাল, ইংরাজী ১৯৭৮-৭৯ খ্রীঃ

আবির্ভাব-তিথি

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ	আষাঢ় কৃষ্ণা ত্রয়োদশী	১৬ শ্রাবণ	মঙ্গলবার	১ আগষ্ট	১৯৭৮
স্বামী নিরঞ্জনানন্দ	শ্রাবণ পূর্ণিমা	১ ভাদ্র	শুক্রবার	১৮ আগষ্ট	„
	শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী	৮ ভাদ্র	শুক্রবার	২৫ আগষ্ট	„
স্বামী অদ্বৈতানন্দ	শ্রাবণ কৃষ্ণা চতুর্দশী	১৫ ভাদ্র	শুক্রবার	১ সেপ্টেম্বর	„
স্বামী অভেদানন্দ	ভাদ্র কৃষ্ণা নবমী	৮ আশ্বিন	সোমবার	২৫ সেপ্টেম্বর	„
স্বামী অখণ্ডানন্দ	মহালয়া	১৫ আশ্বিন	সোমবার	২ অক্টোবর	„
স্বামী সুবোধানন্দ	কার্তিক শুক্লা দ্বাদশী	২৫ কার্তিক	শনিবার	১১ নভেম্বর	„
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ	কার্তিক শুক্লা চতুর্দশী	২৭ কার্তিক	সোমবার	১৩ নভেম্বর	„
স্বামী প্রেমানন্দ	অগ্রহায়ণ শুক্লা নবমী	২২ অগ্রহায়ণ	শুক্রবার	৮ ডিসেম্বর	„
শ্রীশ্রীমা	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী	৬ পৌষ	শুক্রবার	২২ ডিসেম্বর	„
		৮ পৌষ	রবিবার	২৪ ডিসেম্বর	„
স্বামী শিবানন্দ	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী	১০ পৌষ	মঙ্গলবার	২৬ ডিসেম্বর	„
স্বামী সারদানন্দ	পৌষ শুক্লা ষষ্ঠী	১৮ পৌষ	বুধবার	৩ জানুআরি	১৯৭৯
স্বামী তুরীয়ানন্দ	পৌষ শুক্লা চতুর্দশী	২৭ পৌষ	শুক্রবার	১২ জানুআরি	„
শ্রীশ্রীস্বামীজী	পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী	৬ মাঘ	শনিবার	২০ জানুআরি	„
স্বামী ব্রহ্মানন্দ	মাঘ শুক্লা দ্বিতীয়া	১৫ মাঘ	সোমবার	২৯ জানুআরি	„
স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ	মাঘ শুক্লা চতুর্থী	১৭ মাঘ	বুধবার	৩১ জানুআরি	„
স্বামী অদ্ভুতানন্দ	মাঘ পূর্ণিমা	২৮ মাঘ	রবিবার	১১ ফেব্রুআরি	„
শ্রীশ্রীঠাকুর	ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া	১৫ ফাল্গুন	বুধবার	২৮ ফেব্রুআরি	„
(শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব)		১৯ ফাল্গুন	রবিবার	৪ মার্চ	„
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু	দোল পূর্ণিমা	২৮ ফাল্গুন	মঙ্গলবার	১৩ মার্চ	„
স্বামী যোগানন্দ	ফাল্গুন কৃষ্ণা চতুর্থী	৪ চৈত্র	রবিবার	১৮ মার্চ	„

পূজা-তিথি

১।	কালীপূজা	বৈশাখ অমাবস্যা	২১ জ্যৈষ্ঠ	রবিবার	৪ জুন	১৯৭৮
২।	স্নানযাত্রা	জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা	৫ আষাঢ়	মঙ্গলবার	২০ জুন	
৩।	শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা	আশ্বিন শুক্লা সপ্তমী	২১ আশ্বিন	রবিবার	৮ '	
৪।	শ্রীশ্রীকালীপূজা	দীপান্বিতা অমাবস্যা	১৪ কার্তিক	মঙ্গলবার	৩১ অক্টোবর	"
৫।	শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা	মাঘ শুক্লা পঞ্চমী	১৮ মাঘ	বৃহস্পতিবার	১ ফেব্রুআরি	১৯৭৯
৬।	শ্রীশ্রীশিবরাত্রি	মাঘ কৃষ্ণা চতুর্দশী	১২ ফাল্গুন	রবিবার	২৫ ফেব্রুআরি	"

বিবিধ সংবাদ

বিশ্ব-বাংলা-সম্মেলন

গত ২৩শে ও ২৪শে এপ্রিল ১৯৭৮ নাগপুরে 'বিশ্ব-বাংলা-সম্মেলনে'র প্রথম বার্ষিক উৎসব বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে অনুষ্ঠিত হয়। মূল সভানেত্রী ছিলেন সম্মেলনের সহ-সভানেত্রী ডক্টর রমা চৌধুরী; এবং কথা ও কাব্য, প্রবন্ধ এবং সঙ্গীত শাখার সভানেত্রী ও সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে ডক্টর উমা রায়, শ্রীপুলকেশ দে সরকার ও বাউল গায়ক শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস। প্রবন্ধ পাঠ করেন শ্রীমতী কবিতা সিংহ, শ্রীধীরেন বসু, শ্রীসুহৃদ দত্ত, শ্রীপরিমল মুখোপাধ্যায়, শ্রীঋষিন মিত্র, শ্রীমাণিক মুখোপাধ্যায়, ডঃ যোশী প্রভৃতি। উদ্বোধন করেন শ্রীহরিপদ ভারতী। সম্মেলনের সভাপতি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ক'রে বলেন যে, দেশে বিদেশে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার ও প্রসার এবং বিশ্বসভায় বাংলাকে উপযুক্ত মানমর্যাদা সহকারে স্থাপিত করাই হ'ল এই সম্মেলনের মুখ্য লক্ষ্য; এবং সেজন্য আগামী বৎসরে এই সম্মেলন বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত করবার প্রচেষ্টা করা হবে। যুগ্ম-সাধারণ সচিব শ্রীসন্তোষ মুখোপাধ্যায় সম্মেলনের বিগত বৎসরের কার্যাবলীর বিবরণদান করেন এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ লাহিড়ী সকলকে হার্দিক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। সাধারণ সচিব শ্রীঅনিলভূষণ মজুমদার এবং নাগপুরস্থ বহু জ্ঞানিগুণিকৃতিগণের সাগ্রহ সহায়তায় সম্মেলনটি পরিপূর্ণভাবে সাফল্য-মণ্ডিত হয়; এবং বহু অবাঙালী সভায় সানন্দে যোগদান করেন। মূল সভানেত্রী ডক্টর রমা চৌধুরী তাঁর প্রারম্ভিক ও পারিশেষিক ভাষণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্তর্নিহিত প্রাণ-শক্তি ও সম্পদের উল্লেখ ক'রে বলেন যে, বিশ্বভাষা হবার যোগ্য সকল গুণই এই সুমধুর সুসমৃদ্ধ ভাষায় আছে।

পরলোকে

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বেলুড়ের বিশিষ্ট চিকিৎসক **ডাঃ যতীন্দ্রনাথ বসু** গত ২৫শে এপ্রিল তাঁহার নিজস্ব বাস-ভবনে রাত্রি ১১টায় সজ্ঞানে পরলোকগমন করেন। তিনি কিছুকাল যাবৎ হৃদ্‌রোগে ভুগিতেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৪ বৎসর। তিনি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মিশনের দাতব্য চিকিৎসালয় হওয়ার প্রথম হইতে তিনি উহার সহিত যুক্ত ছিলেন এবং দীর্ঘকাল নানাভাবে ঐ প্রতিষ্ঠানের সেবা করেন। সরল মধুর ও অমায়িক স্বভাবের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

তাঁহার দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক!

সমালোচনা।

আনন্দ-তুফান (শরৎকালে ভক্তের মানসিক দুর্গোৎসব)।—দ্বিতীয় প্রচার। বাবু প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। প্রিয়নাথ বাবুর নাম বোধ হয় অনেকেই জানেন। তিনি একজন ভক্ত। তাঁহার ধর্ম-সম্বন্ধীয় অনেক গ্রন্থ আছে। উপস্থিত গ্রন্থখানিতে গ্রন্থকার দুর্গোৎসবব্যপদেশে ভক্তের ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা ও তল্লব্ধ শান্তির বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। এরূপ গ্রন্থের দ্বারা যে সাধারণের উপকার হয়, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

আমাদের শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপগুলিকে অসার বলিয়া অনেকের ধারণা। কিন্তু যাঁহারাই পূজাপদ্ধতি নিরপেক্ষভাবে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই বলিবেন, এই সমস্ত পদ্ধতির কোন কোন অংশ পরিবর্জ্জনীয় এবং স্থানে স্থানে দুর্ব্বোধ্য বা অবোধ্য হইলেও ইহার অধিকাংশ আমাদের চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তৈকাগ্রতার জন্য অভিপ্রেত এবং বাস্তবিক উহার সম্পাদনে সাহায্যও করে। আর আমাদের পূজাপদ্ধতি কেবল চালকলা নৈবেদ্য ভোগ দেওয়া বা ঘণ্টা নাড়া নহে, তাহা যিনি পূজার মধ্যে ভূতশুদ্ধি, মানসপূজা ইত্যাদির বিধান আছে জানেন, তিনিই স্বীকার করিবেন। তবে আমরা সাধক নই বলিয়াই এই পূজাকে এক তামসিক ব্যাপারে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছি। বস্তুতঃ, সমুদয় পূজাই আমাদের চরম উদ্দেশ্য যে বেদান্তজ্ঞান, তাহাই কার্য্যে পরিণত করিবার প্রণালী মাত্র। এক্ষণে কথা এই, পূজা দ্বারা আমাদের শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের বাস্তবিক সহায়তা লাভ করিতে হইলে কি উপায় অবলম্বন কর্ত্তব্য? আমাদের অনেকে সংস্কৃত-মন্ত্রাবলীর তাৎপর্য্য বুঝি না। আবার পুরোহিতকে প্রতিনিধি করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকি। আমাদের বিবেচনায় এই পূজাদি হইতে প্রকৃত আধ্যাত্মিক উপকার লাভ করিবার কতকগুলি উপায় আছে। সাধারণের ভিতর সংস্কৃত শিক্ষার বহুল প্রচার, অন্ততঃ যাহাতে সাধারণকে মন্ত্রার্থগুলি আগে বুঝাইয়া দিয়া তারপর মন্ত্র পড়ান হয়। অথবা সমুদয় পূজাপদ্ধতি প্রত্যেক দেশীয় ভাষায় অনুবাদিত করিয়া তাহাই পাঠের প্রথা প্রবর্ত্তন। শুধু তাহাই করিলে চলিবে না, কেবলমাত্র পুরোহিতকে বেগার দিলে চলিবে না। পুরোহিত কেবল সহায়ক মাত্র থাকিবেন, যাহাতে কর্ম্মকর্ত্তা স্বয়ং সেই সকল ক্রিয়া করিতে পারেন, তৎপক্ষে কেবল সহায়তা করিবেন। আর যদি কতকগুলি প্রধান প্রধান সাধক-পণ্ডিত মিলিত হইয়া এই পদ্ধতির সংস্কার অর্থাৎ আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করেন, তাহা হইলে ইহাতে যে আরও অধিক উপকার হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বপুরুষদিগের সঞ্চিত জ্ঞান ও ভাবরাশি আপনাদের ব্যবহারোপযোগী করিতে হইলে উহাকে দেশকালোপযোগী করিয়া লইতে হইবে। তাহা না হইলে ঐ সকল পদ্ধতি হয় কেবল পোষাকী থাকিয়া যাইবে, না হয়, কার্য্যতঃ অনেকে উহা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের ব্যবহারোপযোগী নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিবেন।

(জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৫, পৃঃ ২৬৯)

[পুনর্মুদ্রণ]

অনেকে বলিতে পারেন, এই সকল কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব, অন্ততঃ শীঘ্র এরূপ সম্ভব নয়। তাঁহারা হয়ত বলিবেন, পূজাপদ্ধতি যেমন আছে থাকুক, কিছুমাত্র পরিবর্ত্তনের আবশ্যক নাই। সাধারণকে কেবল ভগবানের জন্য ব্যাকুল হইতে শিখাও। পূজাপদ্ধতির সংস্কার আপনা আপনি হইয়া যাইবে। আমরা ইহাও মন্দ বলি না। ভগবান রামকৃষ্ণদেবের সংস্কৃতে কোন জ্ঞান ছিল না, অথচ তাঁহার ভিতরে এরূপ অমানুষী ভক্তি কোথা হইতে আসিল?—এরূপ তন্ময়চিত্ততা কোথা হইতে আসিল? এইরূপে সাধারণে মন্ত্রার্থ বিশেষ না জানিলেও যদি কেবল প্রাণের আগ্রহের সহিত 'ভগবানকে ডাকিতেছি', মনে করিয়া মন্ত্রগুলি কেবল আবৃত্তি করিয়া যায়, তাহা হইলেও উপকার হইতে পারে; এই কথার বিরুদ্ধবাদী বলিতে পারে, এরূপ করিবার ফল কি? মন্ত্র না পড়িয়া শুদ্ধ ব্যাকুলতায়ই ত কার্য্য সাধন হইতে পারে। আমরা বলি, যাঁহার সেই জ্ঞান আছে, তিনি সেইরূপই করুন। কিন্তু যাহার মন্ত্রপাঠের এত আগ্রহ, তাহাকে শুধু মন্ত্র পড়া ছাড়াইয়া লাভ কি? ভগবানে সম্পূর্ণ তন্ময়চিত্ত হইলে তাহার মন্ত্র আপনি ছাড়িয়া যাইবে।

প্রিয়নাথ বাবু দুর্গোৎসবের ছায়ামাত্র অবলম্বন করিয়া প্রাণের ব্যাকুলতার সহিত বোধন, পূজা, বলিদান, আরতি, প্রণাম, বরণ, বিসর্জ্জন. নাম-বিসর্জ্জন, সিদ্ধিপান ও আনন্দলাভ প্রভৃতির বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থটী পদ্যে রচিত; অধিকাংশ আজকালকার ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দে। গ্রন্থে গ্রন্থকর্ত্তার ভক্তি, ব্যাকুলতা, বৈরাগ্য প্রভৃতি দেখিয়া আমরা পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি। আমরা ইহার শেষ চারি ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

পেয়েছ দুর্ল্লভ দেহ 'মনুষ্য' আকার
চাহ ভাই 'আপনার' পানে, 'তুমি' ভিন্ন
নাহি বিশ্বে কিছু আর, মনুষ্যত্ব কর
উপার্জ্জন,—'শেষ দিন সম্মুখে স্মরিয়া।'

ভগবদ্গীতা-শঙ্করভাষ্যানুবাদ

(পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত।)

[গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৫ হইতে ৬৩ সংখ্যক শ্লোক, অন্বয়, মূলের অনুবাদ, ভাষ্য ও ভাষ্যের অনুবাদ।— বর্ত্তমান সম্পাদক]

উদ্বোধন।

২য় বর্ষ।] ১৫ই ফাল্গুন। (১৩০৬ সাল) [৪র্থ সংখ্যা।]

পরমহংসদেবের উপদেশ।

১। ভূত ছাড়বে কেমন করে বল? যে সরষে দিয়ে ভূত ছাড়াবে, তাহারি মধ্যে ভূত ঢুকে বসে আছে; যে মন দিয়ে সাধন ভজন করবে, তাই যদি বিষয়াসক্ত হয়ে পড়ে, তা হলে সাধন ভজন কি করে হবে?

২। জলে নৌকা থাকে ক্ষতি নাই, কিন্তু নৌকার ভিতর যেন জল না ঢোকে, তা হলে ডুবে যাবে। সাধক সংসারে থাকুক ক্ষতি নাই, কিন্তু সাধকের মনের ভিতর যেন সংসার-ভাব না থাকে।

৩। মন মুখ এক করাই হচ্ছে প্রকৃত সাধন। নতুবা মুখে বল্‌ছি, হে ভগবান্! তুমি আমার সর্ব্বস্ব ধন এবং মনে বিষয়কেই সর্ব্বস্ব জেনে বসে রয়েচি। এরূপ লোকের সকল সাধনাই বিফল হয়।

৪। আপনাকে মার্ত্তে হ'লে একটী নরুন্ দিয়া হয়; কিন্তু অপরকে মার্ত্তে গেলে ঢাল তরবারের দরকার হয়। তেমনি লোকশিক্ষা দিতে হলে অনেক শাস্ত্র পড়্‌তে হয় ও অনেক তর্ক যুক্তি করে বোঝাতে হয়; কিন্তু আপনার ধর্ম্মলাভ কেবল একটী কথায় বিশ্বাস কল্লেই হয়।

৫। যে পুকুরে অল্প জল তার যেমন জলপান কর্ত্তে গেলে ওপর থেকে আস্তে আস্তে নেড়ে জল খেতে হয়, বেশী নাড়তে নাই, নাড়্‌লে তার ভেতর হতে ময়লা উঠে জল ঘোলা হয়ে যায়, তেমনি যদি সচ্চিদানন্দ লাভ কর্ত্তে চাও, তা হলে তুমি গুরুবাক্য বিশ্বাস করে ধীরে ধীরে সাধন কর। মিছে কেবল শাস্ত্রবিচার তর্ক করো না, ক্ষুদ্রমন অল্পেতেই গুলিয়ে যায়।

৬। এক বাগানে দু'জন লোক বেড়াতে গেছ্‌লো; তার ভিতর যার বিষয়বুদ্ধি বেশী, সে বাগানে ঢুকেই কটা আঁব গাছ, কোন্ গাছে কত আঁব হয়েছে, বাগানটীর কত দাম হ'তে পারে ইত্যাদি নানা রকম বিচার কর্ত্তে লাগলো। আর একজন বাগানের মালিকের সঙ্গে আলাপ করে গাছতলায় ব'সে একটী করে আঁব পাড়তে লাগলো আর খেতে লাগলো। বল দেখি কে বুদ্ধিমান? আঁব খাও, পেট ভরবে, কেবল পাতা গুণে অত হিসাব কিতাব ক'রে লাভ কি? যাঁরা জ্ঞানাভিমানী তারা শাস্ত্র মীমাংসা তর্কযুক্তি নিয়েই ব্যস্ত থাকেন; বুদ্ধিমান ভক্তেরা ভগবানের কৃপা লাভ ক'রে এ সংসারে পরমানন্দ ভোগ করেন।

বিলাতযাত্রীর পত্র।

(স্বামী বিবেকানন্দ প্রেরিত)

প্রত্নতত্ত্ব।

মনে কর, একখানা পুস্তকে লিখেছে যে, অমুক সময়ে অমুক ঘটনা ঘটেছিল। কেউ দয়া করে একটা পুস্তকে যা হয় লিখেছেন বল্‌লেই কি সেটা সত্য হল? লোকে, বিশেষ, সেকালের, অনেক কথাই কল্পনা থেকে লিখ্‌তো; আবার প্রকৃতি, এমন কি, আমাদের পৃথিবী সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান অল্প ছিল, এই সকল কারণ গ্রন্থোক্ত বিষয়ের সত্যাসত্যের নির্দ্ধারণে বিষম সন্দেহ জন্মাতে লাগ্‌লো। মনে কর, একজন গ্রীক ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, অমুক সময়ে ভারতবর্ষে চন্দ্রগুপ্ত ব'লে একজন রাজা ছিলেন। যদি ভারতবর্ষের গ্রন্থেও ঐ সময়ে ঐ রাজার উল্লেখ দেখা যায়, তা হলে বিষয়টা অনেক প্রমাণ হল বৈকি। যদি চন্দ্রগুপ্তের কতকগুলো টাকা পাওয়া যায় বা তাঁর সময়ের একটা বাড়ি পাওয়া যায়, যাতে তাঁর উল্লেখ আছে, তা হলে আর কোনও গোলই রইল না।

আবার একটা পুস্তকে লেখা আছে যে, একটা ঘটনা সিকন্দর বাদসার সময়ের কিন্তু তার মধ্যে দুএকজন রোমক বাদসার উল্লেখ রয়েছে, এমন ভাবে রয়েছে যে, প্রক্ষিপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। তা হলে সে পুস্তকটি সিকন্দর বাদসার সময়ের নয় বোলে প্রমাণ হল।

অথবা ভাষা :—সময়ে সময়ে সকল ভাষায়ই পরিবর্ত্তন হচ্ছে, আবার এক এক লেখকের এক একটা ঢঙ্ থাকে। যদি একটা পুস্তকের খামকা একটা অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা লেখকের অপরিচিত ঢঙ্গে থাকে, তা হলেই সেটা প্রক্ষিপ্ত বোলে সন্দেহ হবে। এই প্রকার নানাপ্রকারের সন্দেহ সংশয় প্রমাণ প্রয়োগ করে গ্রন্থতত্ত্ব নির্ণয়ের এক বিদ্যা বেরিয়ে পড়্‌লো।

তার উপর আধুনিক বিজ্ঞান দ্রুতপদসঞ্চারে নানা দিক হতে রশ্মিবিকীরণ কর্‌তে লাগলো। ফল :—যে পুস্তকে কোনও অলৌকিক ঘটনা লিখিত আছে, তা একেবারেই অবিশ্বাস্য হয়ে পড়্‌ল।

সকলের উপর মহাতরঙ্গরূপ সংস্কৃত ভাষার ইউরোপে প্রবেশ এবং ভারতবর্ষে, ইউফ্রেটিস্ নদীতটে ও মিসরদেশে প্রাচীন শিলালেখের পুনঃ পঠন আর বহুকাল ভূগর্ভে বা পর্ব্বতপার্শ্বে লুক্কায়িত মন্দিরাদির আবিষ্ক্রিয়া ও তাহাদের যথার্থ ইতিহাসের জ্ঞান।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এ নূতন গবেষণাবিদ্যা বাইবেল বা নিউটেষ্টামেণ্ট গ্রন্থগুলিকে আলাদা রেখেছিল। এখন মার ধোর, জেন্ত পোড়ান ত আর নেই, কেবল সমাজের ভয়; তা উপেক্ষা করে অনেকগুলি পণ্ডিত উক্ত পুস্তকগুলিকেও বেজায় বিশ্লেষ করেছেন। আশা করি, হিন্দু প্রভৃতির ধর্মপুস্তককে ওঁরা যেমন বেপরোয়া হয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করেন, কালে সেইপ্রকার সৎসাহসের সহিত য়াহুদী ও কৃশ্চান পুস্তকাদিকেও কর্‌বেন। একথা বলি কেন, তার একটা উদাহরণ দিই :—মাস্‌পেরো বলে এক মহাপণ্ডিত মিসরপ্রত্নতত্ত্বের

অতি প্রতিষ্ঠ লেখক, ইস্তোয়ার আঁসিএন ওরিআঁতাল বলে মিসর ও বাবিলদিগের এক প্রকাণ্ড ইতিহাস লিখেছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উক্ত গ্রন্থের এক ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিতের ইংরাজিতে তর্জ্জমা পড়ি। এবার **British Museum**এর এক অধ্যক্ষকে কয়েকখানি মিসর ও বাবিল সম্বন্ধী গ্রন্থের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় মাস্‌পেরোর গ্রন্থের কথা উল্লেখ হয়। তাতে আমার কাছে উক্ত গ্রন্থের তর্জ্জমা আছে শুনে তিনি বল্লেন যে, ওতে হবে না, অনুবাদক কিছু গোঁড়া কৃশ্চান; এজন্য যেখানে যেখানে মাস্‌পেরোর অনুসন্ধান খ্রীষ্টধর্ম্মকে আঘাত করে, সে সব গোলমাল করে দেওয়া আছে। মূল ফরাসী ভাষায় গ্রন্থ পড়্‌তে বল্লেন। পড়ে দেখি, তাইত—এ যে বিষম সমস্যা। ধর্ম্মগোঁড়ামিটুকু কেমন জিনিস জানত? —সত্যাসত্য সব তাল পাকিয়ে যায়। সেই অবধি ও সব গবেষণাগ্রন্থের তর্জ্জমার উপর অনেকটা শ্রদ্ধা কমে গেছে।

জাতিবিদ্যা।

আর এক নূতন বিদ্যা জন্মেছে, যার নাম জাতিবিদ্যা অর্থাৎ মানুষকে, রঙ্গ, চুল, চেহারা, মাথার গঠন, ভাষা প্রভৃতি দেখে, শ্রেণীবদ্ধ করা।

জর্ম্মাণরা সর্ব্ববিদ্যায় বিশারদ হলেও সংস্কৃত আর প্রাচীন আসিরীয় বিদ্যায় বিশেষ পটু; বর্গস্ প্রভৃতি জর্ম্মাণ পণ্ডিত ইহার নিদর্শন। ফরাসীরা প্রাচীন মিসরের তত্ত্ব উদ্ধারে বিশেষ সফল: মাস্‌পেরোপ্রমুখ মণ্ডলী ফরাসী। ওলন্দাজেরা য়াহুদী ও প্রাচীন খ্রীষ্টধর্ম্মের বিশ্লেষণে বিশেষ প্রতিষ্ঠ: কূনা প্রভৃতি লেখক জগৎপ্রসিদ্ধ।

ইংরেজরা অনেক বিদ্যার আরম্ভ করে দিয়ে, তারপর সরে পড়ে।

এই সকল পণ্ডিতদের মত কিছু বলি। যদি ভাল না লাগে তাদের সঙ্গে ঝগড়া ঝাঁটি করো, আমায় দোষ দিও না।

হিঁদু, য়াহুদী, প্রাচীন বাবিলি, মিসরী প্রভৃতি প্রাচীন জাতিদের মতে, সমস্ত মানুষ এক আদিম পিতা মাতা হতে অবতীর্ণ হয়েছে। একথা এখন বড় লোকে মান্‌তে চায় না।

কাল কুচ্‌কুচে নাকহীন ঠোঁটপুরু গড়ানে কপাল আর কোঁকড়া চুল কাফ্রী দেখেছো? প্রায় ঐ ঢঙ্গেরই গড়ন তবে আকারে ছোট, চুল অত কোঁকড়া নয়, সাঁওতালি আণ্ডামানি ভিল দেখেছ? প্রথম শ্রেণীর নাম নিগ্রো (Negro) ইহাদের বাসভূমি আফ্রিকা। দ্বিতীয় জাতির নাম নেগ্রিটো (Negrito)—ছোট নিগ্রো; ইহারা প্রাচীনকালে আরবের কতক অংশে, ইউফ্রেটিস্ তটের অংশে, পারস্যের দক্ষিণভাগে, ভারতবর্ষময়, আণ্ডামান প্রভৃতি দ্বীপে, মায় অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত বাস কর্‌ত। আধুনিক সময়ে ভারতের কোন কোন ঝোড় জঙ্গলে, আণ্ডামানে এবং অষ্ট্রেলিয়ায় ইহারা বর্ত্তমান।

লেপ্‌চা ভুটিয়া চীনি প্রভৃতি দেখেছ?—সাদা রঙ্গ বা হল্‌দে, সোজা কাল চুল? কাল চোখ, কিন্তু চোখ কোনাকুনি বসান, দাড়ি গোঁফ অল্প, চেপ্টা মুখ, চোখের নীচের হাড় দুটো ভারি উঁচু।

নেপালি বর্ম্মি সায়ামি মালাই জাপানি দেখেছ? এরা ঐ গড়ন, তবে ছোট আকারে।

(জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৫, পৃঃ ২৭৩)

এ শ্রেণীর দুই জাতির নাম মোগল আর মোগলইড্ (ছোট মোগল)। 'মোগল' জাতি এক্ষণে অধিকাংশ আসিয়া খণ্ড দখল করে বসেছে। এরাই মোগল, কালমুখ, হুন, চীন, তাতার, তুর্ক, মানচু, কিরগিজ প্রভৃতি বিবিধ শাখায় বিভক্ত হয়ে এক চীন ও তিব্বতি সওয়ায় তাঁবু নিয়ে আজ এদেশ কাল ওদেশ করে ভেড়া ছাগল গরু ঘোঁড়া চরিয়ে বেড়ায়, আর বাগে পেলেই পঙ্গপালের মত এসে দুনিয়া ওলট পালট করে দেয়। এদের আর একটি নাম তুরাণি। ইরাণ তুরাণ—সেই তুরাণ।

রঙ্গ কাল কিন্তু সোজা চুল, সোজা নাক, সোজা কাল চোখ; প্রাচীন মিসর প্রাচীন বাবিলোনিয়ায় বাস কর্‌ত এবং অধুনা ভারতময়, বিশেষ, দক্ষিণদেশে বাস করে, ইউরোপেও এক আদ জায়গায় চিহ্ন পাওয়া যায়; এ এক জাতি। ইহাদের পারিভাষিক নাম দ্রাবিড়ি।

সাদা রঙ্গ, সোজা চোখ কিন্তু কাল নাক, রামছাগলের মুখের মত বাঁকা আর ডগা মোটা কপাল গড়ান, ঠোঁট পুরু; যেমন উত্তর আরাবের লোক, বর্ত্তমান য়াহুদী, প্রাচীন বাবিল, আসিরী, ফিনিস্ প্রভৃতি; ইহাদের ভাষাও একপ্রকারের; ইহাদের নাম সেমিটিক্।

আর যারা সংস্কৃতের সদৃশ ভাষা কয়, সোজা নাক মুখ চোখ, রঙ্গ সাদা, চুল কাল বা কটা, চোখ কাল বা নীল, এদের নাম আরিয়ান্।

বর্ত্তমান সমস্ত জাতিই এই সকল জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। ইহাদের মধ্যে যে জাতির ভাগ অধিক যে দেশে, সে দেশের ভাষা ও আকৃতি অধিকাংশই সেই জাতির স্থায়।

উষ্ণদেশ হলেই যে, রঙ্গ কাল হয় এবং শীতল দেশ হলেই যে বর্ণ সাদা হয়, একথা এখনকার অনেকেই মানেন না। কাল এবং সাদার মধ্যে যে বর্ণগুলি, সে গুলি অনেকের মতে, জাতি-মিশ্রণে উৎপন্ন হয়েছে।

মিসর ও প্রাচীন বাবিলের সভ্যতা পণ্ডিতদের মতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এ সকল দেশে খ্রীঃ পূঃ ৬০০০ বৎসর বা ততোধিক সময়ের বাড়ি ঘর দোর পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে জোর চন্দ্রগুপ্তের সময়ের যদি কিছু পাওয়া গিয়ে থাকে, খ্রীঃ পূঃ ৩০০ বৎসর মাত্র। তার পূর্ব্বের বাড়ি ঘর এখনও পাওয়া যায় নাই। তবে তার বহু পূর্ব্বের পুস্তকাদি আছে, যা অন্য কোনও দেশে পাওয়া যায় না। পণ্ডিত বাল গঙ্গাধর তিলক প্রমাণ করেছেন যে, হিঁদুদের "বেদ" অন্ততঃ খ্রীঃ পূঃ পাঁচ হাজার (৫০০০) বৎসর আগে বর্ত্তমান আকারে ছিল।

[ক্রমশঃ।]

রামানুজ চরিত।

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ)

[১ম ভাগ, ১০ম অধ্যায়ের কিয়দংশ—বর্ত্তমান সঃ]

দাক্ষিণাত্যের দেবমন্দির।

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ)

আর্য্যাবর্ত্তনিবাসী যদি কখনও মান্দ্রাজনগরে আসিয়া তথা হইতে বাষ্পীয় শকট-যোগে ৺রামেশ্বর দর্শনে বহির্গত হন, তাহা হইলে দাক্ষিণাত্যের গিরিশিখর-সদৃশ, শিল্পবিদ্যা-দেবীর প্রিয়তমভূষণস্বরূপ, মনোমুগ্ধকারী দেবমন্দিরসমূহের বিশাল সৌন্দর্য্যে তাঁহাকে যুগপৎ বিস্মিত ও পুলকিত হইতে হইবে। যখন মুসলমানগণ পশ্চিমদেশ হইতে তরবারিহস্তে দলে দলে আসিয়া স্বভাবনির্ম্মল শান্তিপ্রিয় ভারতসন্তানগণের শোণিতপাতে, এই ঋষিজননী মাধুর্য্যরসময়ী সর্ব্বকল্যাণশালিনী অসীমশৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ননরদেবপ্রসূতি ভারতমাতার প্রকৃতি-কোমল-হৃদয়কে ব্যথিত করে নাই; যখন পাশ্চাত্য সভ্যতা মাতৃজঠরে বীজাকারে অবস্থান করিতেছিল; যখন বেদবিহিত মার্গই সকলের অনুসরণীয় ছিল; যখন ব্রাহ্মণগণ কেবলমাত্র বংশানুগত-ব্রাহ্মণ্যের অধিকারী না হইয়া সর্ব্বভূতে সমদর্শী ছিলেন এবং এইরূপে ব্রাহ্মণ-নামের সার্থকতা করিয়াছিলেন; যখন শাক্যসিংহ বুদ্ধ তাঁহার কোনও অতি প্রাচীন পূর্ব্ব-পুরুষের অঙ্গে বিলীন ছিলেন; সেই সময় হইতেই, অমরভূমিসদৃশ এই সকল বিশালসুন্দর মন্দির নবপ্রস্ফুটিত কমলকুলের ন্যায়, সকলের নয়নমনের হর্ষবর্দ্ধন করিয়া আসিতেছে।

মন্দিরগুলির রচনাপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিলে এরূপ বোধ হয়, যেন কোনও প্রেমোন্মত্ত সাত্বতপ্রধান আপনার ব্রহ্মলোকসদৃশ পবিত্র হৃদয়রাজ্যকে পরোক্ষভূমি হইতে উৎখাত করিয়া, সকলকে ব্রহ্মানন্দের ভাগী করিবার জন্য বাহিরে বসাইয়া দিয়াছেন। বাস্তবিকই ভবিষ্যতে তত্তৎ দেববিগ্রহ ও দেবমন্দির সন্দর্শন করিয়া কত নরনারী যে ভগবৎ-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া গিয়াছেন, তাহার আর সংখ্যা নাই। মাণিক্য বাচকর, মহামনা নন্দ, তিরুপ্পান আলোয়ার, তিরুমঙ্গই আল্‌ওয়ার, নাথ মুনি, যামুনাচার্য্য, পেরিয়া নম্বি, রামানুজ প্রভৃতি মহাভাগবতগণ, শ্রীশ্রীচিদম্বরস্থ নটরাজন্ ও শ্রীশ্রীরঙ্গনাথ জীউর মন্দিরপ্রান্তে আপনাদের দেবতুল্য পবিত্রজীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আমার ন্যায় ক্ষুদ্রলেখক বর্ণনা-দ্বারা কখনও তাঁহাদের মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্যের একাংশও কাহারও সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতে পারে না। যাঁহার পৃথিবীতে স্বর্গশোভা দেখিবার ইচ্ছা, তাঁহাকে আমার এই নিবেদন, যেন তিনি স্বচক্ষে এই সকল বিশাল মন্দির সন্দর্শন করিয়া পরমানন্দ অনুভব করেন। এক একটী মন্দির যেন এক একটী দেবতার নগর। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেই বোধ হইবে যেন মর্ত্ত্য-ভূমি ছাড়িয়া দেবলোকে উপনীত হইয়াছি। অসংখ্য দাস দাসী প্রত্যেক দেববিগ্রহের সেবায় অহরহ নিযুক্ত আছেন। নানাবিধ মাঙ্গলিক বাদ্যধ্বনি, বেদধ্বনির সহিত সংমিশ্রিত হইয়া এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাব হৃদয়ে আনিয়া দেয়। ভক্তি আপনা আপনি আসিয়া পড়ে। শিল্প-নৈপুণ্যের মনোহর ও নিরন্তর বিকাশ, চিত্তে পরমানন্দ আনিয়া দেয়। দেববিগ্রহবিলম্বিত কুসুমমালিকাগুলি বায়ুসহায়ে চারিদিকে দিব্য সৌরভ বিস্তার করে। সেবকমণ্ডলীর উৎফুল্ল মুখকমলগুলি অবলোকন করিলে দুঃখদগ্ধ হৃদয়েও আনন্দের সঞ্চার হয়। কোথাও কোথাও

(জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৫, পৃঃ ২৭৫)

সমবেতপ্রেমিককণ্ঠোত্থিত ভগবদ্ভক্তিরসপরিপ্লুত মধুর গীতধ্বনি নবাগতের প্রাণমন পুলকিত করিয়া স্বর্গের সোপান দেখাইয়া দেয়।

মন্দিরগুলি প্রায়শঃই পঞ্চ বা সপ্তপ্রাকারবেষ্টিত। সেই সকল সুবিশাল প্রাকারের অভ্যন্তরে বিশ্বশক্তির অদ্বিতীয় কেন্দ্রস্বরূপ শ্রীমদ্ভগবন্মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। যেমন অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়-সংজ্ঞক পঞ্চকোষের মধ্যে বিশ্বভাসক পরমাত্মার অবস্থান অথবা যেমন সপ্তভূমির অপর পারে তাঁহার অধিষ্ঠান,—সেইরূপ পঞ্চ বা সপ্ত-প্রাকারের অভ্যন্তরে শ্রীবিগ্রহের ভক্তহৃদয়মুগ্ধকারী নিত্য বিকাশ, দাক্ষিণাত্যের প্রত্যেক মন্দিরেই নয়নগোচর হইবে।

বর্ত্তমান সভ্যসমাজের চক্ষে এই সকল মন্দির দুর্ভেদ্য দুর্গের ন্যায় প্রতিভাত হইবে। বাস্তবিকই কর্ণাট যুদ্ধের সময় যখন ইংরাজ ও ফরাসিগণ ভারতবর্ষে আধিপত্য লাভের জন্য পরস্পর ঘোর সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময় সুবিপুল ফরাসী সৈন্য শ্রীশ্রীরঙ্গনাথ জীউর মন্দিরস্থ "সহস্র স্তম্ভে" আশ্রয় লইয়াছিল। প্রায় প্রত্যেক মন্দিরেই, এক সহস্র 'অচল অটল সুমেরুবৎ' প্রস্তরস্তম্ভের উপর শ্রীশ্রীভগবানের জন্য যে মহতী সভা নির্ম্মিত রহিয়াছে, তাহারই নাম সহস্রস্তম্ভ। লক্ষাধিক লোক অনায়াসে সেখানে সুখে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পারে। আর্য্যাবর্ত্তে উক্তপ্রকার বিশাল সভাগৃহ আছে কিনা সন্দেহ। কথিত আছে চিদম্বরস্থ নটরাজের মন্দিরে ইংরাজভয়ে দাক্ষিণাত্যের জনৈক নবাব আশ্রয় লইয়াছিলেন। ইংরাজগণ তাহা জানিতে পারিয়া মন্দিরের বহিঃপ্রাকারে গোলাবর্ষণ করিয়াও কিছুই করিতে পারেন নাই। অদ্যাবধি প্রাকারে ও গোপুরদ্বারে গোলার দাগ বর্ত্তমান আছে।

গো শব্দ নানার্থে প্রয়োগ হয়। গোপুর শব্দের অর্থ পৃথিবীপুর ও স্বর্গপুর উভয়ই হইতে পারে। পৃথিবীপুরের ভিতর দিয়া স্বর্গপুরে যাইতে হয়, এই জন্যই মন্দিরের বহির্দ্বার গোপুর নামে খ্যাত। বহির্দ্বারগুলি পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণে থাকিয়া চারিটি গিরি-শিখরের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। পৃথিবীর যাবতীয় জীবজন্তু নরনারী ও তাহাদের কার্য্যকলাপ, ভাবভঙ্গি, ও নানারূপ অবস্থা, দেবতা ও তাঁহাদের লীলা প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয় সুনিপুণ শিল্পী এরূপ দক্ষতার সহিত নির্ম্মিত ও চিত্রিত করিয়াছেন যে, দেখিলে বোধ হয় যেন সাক্ষাৎ বিশ্বকর্ম্মাই এই সকলের নির্ম্মাতা ও রচয়িতা। দুর্ব্বল মনুষ্যের হস্ত হইতে যে এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার বহির্গত হইয়াছে, সহসা এরূপ বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। দ্বিতীয় প্রাকারের গোপুরগুলি বহির্দ্বার অপেক্ষা কিছু উচ্চ। তৃতীয় প্রাকারের গোপুরগুলি দ্বিতীয় প্রাকারের দ্বারাপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ। এইরূপ ক্রমে ক্রমে মন্দিরগুলি নিম্নতর নিম্নতম হইয়া গিয়াছে। প্রাকারগুলিরও আয়তন এবং পরিসর ক্রমে ক্রমে কমিয়া গিয়াছে। শেষে এই বিশাল দেবরাজ্যের কেন্দ্রভূমিতে উপনীত হইলে, স্বর্ণরৌপ্যখচিত নাতিনিম্ননাত্যুন্নত হেমকলসমণ্ডিত বিমান বা গর্ভগৃহ নামক মূল বিগ্রহের পরমরমণীয় মন্দির নয়নগোচর হইবে।

তিন চারিদিন ধরিয়া ক্রমাগত না দেখিলে একটী মন্দির ভাল করিয়া দেখা হয় না। অভ্যন্তরে পাঁচ ছয়টি দীর্ঘ সরোবর আছে। তাহাদেরই পবিত্র সলিলে দেববিগ্রহসমূহের পূজাস্নানাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রত্যেকটিই গঙ্গার ন্যায় পবিত্র বলিয়া সকলের বিশ্বাস।

(১৩০৭ ২য় বর্ষ ৫মসংখ্যা, পৃঃ ২৭৩)

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয়

রামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ — স্বামী সারদানন্দ। দুই ভাগ, রেক্সিন-বাঁধাই : মূল্য ১ম ভাগ ১৯·০০। ২য় ভাগ ১৭·০০

সাধারণ ১ম খণ্ড ৩·৫০ ; ২য় খণ্ড ৭·৮০ ; ৩য় খণ্ড ৫·২০ ; ৪র্থ খণ্ড ৭·০০ ; ৫ম খণ্ড ৭·৫০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন। সুললিত কবিতায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী। মূল্য ২৬·০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ-সংকলিত। মূল্য ১·৬০ ; কাপড়ে বাঁধাই ১·৮০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা—শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন। মূল্য ৩·৫০

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। মূল্য ২·৫০

শ্রীরামকৃষ্ণচরিত—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী। (ছাপা নাই)

শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ—স্বামী নির্বেদানন্দ (অনুবাদ : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। পৃঃ ২৯৬ ; সাধারণ ৬·০০ ; হাফ-রেক্সিন। বোর্ড বাঁধাই, শোভন ৭·০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী—স্বামী তেজসানন্দ। পৃঃ ২০৮, মূল্য ৫·০০

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা—স্বামী অপূর্বানন্দ। (ছাপা নাই)

পরমহংসদেব—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু। (ছাপা নাই)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। (ছাপা নাই)

শিশুদের রামকৃষ্ণ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৪০, মূল্য ৩·০০

শ্রীশ্রীমা-সম্বন্ধীয়

মায়ের কথা—শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সন্তানগণের ডায়েরী হইতে। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। মূল্য ১ম ভাগ ৭·০০, ২য় ভাগ ১০·০০

মাতৃ-সান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ। পৃঃ ২৫৬। মূল্য ৬·০০ টাকা

শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীশ্রীমায়ের বিস্তারিত জীবনীগ্রন্থ। পৃঃ ৬৪২, মূল্য—১৭·০০

শিশুদের মা সারদাদেবী, (সচিত্র)-স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৪০, মূল্য ৩·০০

স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয়

যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত স্বামীজীর প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। তিন খণ্ডে প্রকাশিত। মূল্য ১ম খণ্ড ১৬·০০ ; ২য় ছাপা নাই ; ৩য় খণ্ড ৮·০০

স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীপ্রমথনাথ বসু। ১ম ভাগ (ছাপা নাই), ২য় ভাগ—মূল্য ৪·২৫

স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১৩৬, মূল্য ২·৫০

স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। ছেলেদের উপযোগী। ছাপা নাই

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—(দুই খণ্ড একত্রে) শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। স্বামীজীর সহিত লেখকের কথোপকথন। পৃঃ ২৫৮, মূল্য ৭·০০

স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতা। (অনুবাদ : স্বামী মাধবানন্দ)। মূল্য ৮·০০

স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে—ভগিনী নিবেদিতা (বঙ্গানুবাদ)। পৃঃ ১২৪, মূল্য ১·২৫

শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। ৩য় সং, মূল্য ২·৫০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

অন্যান্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা — স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য ১৩'০০, ২য় ভাগ পৃঃ ৫২৪, মূল্য ৮'০০

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—(ছাপা নাই)

ভারতে শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ। মূল্য ৩'০০

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৯১, মূল্য ৫'০০

স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ। পৃঃ ৩১০, মূল্য ৪'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ। (ছাপা নাই)

গোপালের মা — স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৪৪, মূল্য ১'৫০

শ্রীশ্রীরামানুজ-চরিত—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। (ছাপা নাই)।

আচার্য শঙ্কর—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৪৬, মূল্য ৬'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র—মূল্য ৭'৮০

শিবানন্দ-বাণী— স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত। ১ম ভাগ (ছাপা নাই) ; ২য় ভাগ-২'৫০

মহাপুরুষজীর পত্রাবলী— (ছাপা নাই)

সৎকথা — স্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত। (ছাপা নাই)

অদ্ভুতানন্দ-প্রসঙ্গ — স্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত। (ছাপা নাই)

স্মৃতি-কথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ। মূল্য ৪'০০

দিব্যপ্রসঙ্গে — স্বামী দিব্যাত্মানন্দ। (ছাপা নাই)

স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী— (ছাপা নাই)

আরতি-স্তব—মূল্য ০'৭০

পুণ্যস্মৃতি—স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ। পৃঃ ১১৬, মূল্য ৩'০০

মহাভারতের গল্প—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ পৃঃ ১২৮ ; সাধারণ ২'৫০, বোর্ড বাঁধাই ৩'০০ ৬ষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য সংক্ষেপিত "স্কুলপাঠ্য" সংস্করণ—পৃঃ ৭২ ; মূল্য ২'০০

শঙ্কর-চরিত — শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। সংস্করণ (৭ম) মূল্য ২'৫০

দশাবতার-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য পৃঃ ১০৮, মূল্য ২'৫০

সাধক রামপ্রসাদ —স্বামী বামদেবানন্দ। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৫'২০

সাধু নাগ মহাশয়—শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। পৃঃ ১৪২, মূল্য ৩'০০

ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী তেজসানন্দ। পৃঃ ১২৪, মূল্য ১'৫০

শিব ও বুদ্ধ—ভগিনী নিবেদিতা। পৃঃ ৬৩, মূল্য ০'৬৫

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ— পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৫'০০

পত্রমালা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২ মূল্য ৪'০০

গীতাতত্ত্ব—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৭৬, মূল্য ৫'০০

লাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৪২০, মূল্য ১০'০০

পরমার্থ-প্রসঙ্গ — স্বামী বিরজানন্দ। পৃঃ ১৩৭, মূল্য ৪'০০

ভগবানলাভের পথ—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। মূল্য ১'০০

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী — স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৩২, মূল্য ০'৬০

বিবিধ-প্রসঙ্গ—(ছাপা নাই)

কৈলাস ও মানসতীর্থ—স্বামী অপূর্বানন্দ। (ছাপা নাই)

তিব্বতের পথে হিমালয়ে—স্বামী অখণ্ডানন্দ। (ছাপা নাই)

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-সঞ্চয়ন— পৃঃ ৩১৬, মূল্য ৭'০০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

COVER PRINTED BY:—

৮০।৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্ট্রীগণের পক্ষে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত।

সম্পাদক—স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ : সংযুক্ত সম্পাদক—স্বামী ধ্যানানন্দ

মূল্য ১২'০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১'২০ টাকা

উদ্বোধন

উত্তিষ্ঠত
জাগ্রত
প্রাপ্য
বরান্
নিবোধত





উদ্বোধন, আষাঢ়, ১৩৮৫

সূচীপত্র

আমাদের এখন এমন ধর্ম চাই যাহা আমাদিগকে মানুষ করিতে পারে। আমাদের এমন সব মতবাদ আবশ্যক, যেগুলি আমাদিগকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলে। যাহাতে মানুষ গঠিত হয় এমন সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ শিক্ষার প্রয়োজন।

—স্বামী বিবেকানন্দ

আমি কি আর উপদেশ দেব! ঠাকুরের কথা সব বইয়ে বেরিয়ে গেছে। তাঁর একটা কথা ধারণা করে যদি চলতে পার তো সব হয়ে যাবে।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

উদ্বোধনের মাধ্যমে

প্রচার হোক

এই বাণী ।শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়



দিব্য বাণী

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসঙ্গি মুক্ত্যৈ নির্বিষয়ং মনঃ॥
বিষয়েভ্যঃ সমাহৃত্য বিজ্ঞানাত্মা মনো মুনিঃ।
চিন্তয়েন্মুক্তয়ে তেন ব্রহ্মভূতং পরেশ্বরম্॥
আত্মভাবং নয়ত্যেনং তদ্‌ব্রহ্ম ধ্যায়িনং মুনিম্।
বিকার্যমাত্মনঃ শক্ত্যা লোহমাকর্ষকো যথা॥

—বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৭।২৮-৩০

বন্ধমোক্ষহেতু শুধু মানুষের মন।
(নিত্যমুক্ত আত্মা—তাঁর কোথায় বন্ধন !)
বিষয়ে আসক্ত মন বন্ধন-কারণ
মুক্তির কারণ হয় অনাসক্ত মন।
বিষয়সমূহ হতে আপনার মন
প্রত্যাহৃত করিয়াই জ্ঞানী মুনিজন
মুক্তিহেতু করিবেন পরব্রহ্ম-ধ্যান
('ধ্যানসিদ্ধ যেই জন মুক্তি তাঁর স্থান।')
বিকারার্হ সাধারণ লৌহখণ্ডে যথা
অয়স্কান্তমণি করে অয়স্কান্ত তথা
ধ্যানী সেই মুনিজনে (সাধনার ফলে)
ব্রহ্ম দেন ব্রহ্মভাব নিজশক্তিবলে।

কথাপ্রসঙ্গে

ভগবৎ-কৃপা

মানুষ নানাভাবে জীবনের চরম লক্ষ্যে উপনীত হইয়া থাকে—এইটি বুঝাইবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'সাধনসিদ্ধ', 'কৃপাসিদ্ধ', 'হঠাৎ-সিদ্ধ', 'স্বপ্নসিদ্ধ' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিতেন। কৃপাসিদ্ধদের সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন: 'আর এক থাক আছে কৃপাসিদ্ধ। হঠাৎ তাঁর কৃপা হ'ল—অমনি দর্শন আর জ্ঞানলাভ। যেমন হাজার বছরের অন্ধকার ঘর—আলো নিয়ে গেলে একক্ষণে আলো হয়ে যায়!—একটু একটু করে হয় না।' এই উপমাটি কৃপাসিদ্ধদের প্রসঙ্গে তিনি বহুবার ব্যবহার করিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন এই যে, ভগবৎ-কৃপা শর্তাধীন কিনা। প্রশ্নটি অতি জটিল। স্বামী বিবেকানন্দকে বিভিন্ন সময়ে এই প্রশ্ন করা হইলে তিনি আপাতবিরোধী উত্তর দিয়াছেন, ইহা আমরা 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' গ্রন্থে দেখি। উক্ত গ্রন্থের এক জায়গায় স্বামীজী বলিতেছেন: "কৃপার কোন condition (শর্ত) নেই, কৃপাটা হচ্ছে তাঁর খেয়াল। এই জগৎ-সৃষ্টিটাই তাঁর খেয়াল—'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্।' যিনি খেয়াল ক'রে এমন জগৎ গড়তে-ভাঙতে পারেন, তিনি কি আর কৃপা ক'রে মহাপাপীকেও মুক্তি দিতে পারেন না! তবে যে কারুকে সাধন-ভজন করিয়ে নেন ও কারুকে করান না, সেটাও তাঁর খেয়াল—তাঁর ইচ্ছা।"

উক্ত গ্রন্থেরই আর এক জায়গায় আছে, শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী গিরিশচন্দ্র ঘোষের কথা—'কৃপাপক্ষে কোন নিয়ম নেই, যদি থাকে, তবে তাকে কৃপা বলা যায় না। সেখানে সবই বে-আইনী কারখানা।'—স্বামীজীকে বলিলে স্বামীজী উত্তর দেন: 'তা নয় রে, তা নয়; ঘোষজ যেখানকার কথা বলেছে, সেখানেও আমাদের অজ্ঞাত একটা আইন বা নিয়ম আছেই আছে। বে-আইনী কারখানাটা হচ্ছে শেষ কথা; যেখানে Law of Causation (কার্যকারণ-বিধি) নেই, কাজেই সেখানে কে কাকে কৃপা করবে! সেখানে সেব্য-সেবক, ধ্যাতা-ধ্যেয়, জ্ঞাতা-জ্ঞেয় এক হয়ে যায়—সব সমরস।' এবং স্বামীজী উক্ত শিষ্যকে আরও বলিয়াছিলেন, 'তুই প্রাণপণে চেষ্টা করছিস দেখে তবে তাঁর কৃপা হয়। Struggle (কষ্টায়াস) না ক'রে বসে থাক, দেখবি কখনও কৃপা হবে না।'

এই আপাতবিরোধী উক্তিদ্বয়ের সামঞ্জস্য স্বামীজী নিজেই যথাসম্ভব করিয়াছেন। 'যথা-সম্ভব' বলিবার কারণ এই যে, স্বামীজী স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন, 'এ রহস্য বোঝা কঠিন।' 'কৃপার কি কোন নিয়ম আছে?'—এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "হ্যাঁও বটে, নাও বটে। যারা কায়মনোবাক্যে সর্বদা পবিত্র, যাদের অনুরাগ প্রবল, যারা সদসদ্-বিচারবান্ ও ধ্যানধারণায় রত, তাদের উপরই ভগবানের কৃপা হয়। তবে ভগবান প্রকৃতির সকল নিয়মের বাইরে, কোন নিয়ম-নীতির বশীভূত নন—ঠাকুর যেমন বলতেন, 'তাঁর বালকের স্বভাব'—সেজন্য দেখা যায় কেউ কোটি জন্ম ডেকে ডেকেও তাঁর সাড়া পায় না; আবার যাকে আমরা পাপী তাপী নাস্তিক বলি, তার ভেতরে সহসা চিৎপ্রকাশ হয়ে যায়—তাকে

ভগবান অযাচিত কৃপা ক'রে বসেন। তার আগের জন্মের সুকৃতি ছিল একথা বলতে পারিস ; কিন্তু এ রহস্য বোঝা কঠিন।"

সূচনায় আমরা দেখিলাম, স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত ঈশ্বরের বালকস্বভাবের উল্লেখ করিয়াছেন এবং মহর্ষি বাদরায়ণের 'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্' সূত্রেরও উদ্ধৃতি দিয়াছেন। ইহা খুবই প্রাসঙ্গিক, কারণ ভগবৎ-কৃপার প্রশ্নের সহিত ভগবানের স্বরূপের বা স্বভাবের প্রশ্নটিও অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্বদ্ধ।

'ঈশ্বর বালকস্বভাব'—শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার এই উক্তিটির ব্যাখ্যা নিজেই দিয়াছেন: 'যেমন কোন ছেলে কোঁচড়ে রত্ন লয়ে বসে আছে। কত লোক রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে। অনেকে তার কাছে রত্ন চাচ্ছে। কিন্তু সে কাপড়ে হাত চেপে মুখ ফিরিয়ে বলে, না আমি দেবো না। আবার হয়তো যে চায়নি, চলে যাচ্ছে, পেছনে পেছনে দৌড়ে গিয়ে সেধে তাকে দিয়ে ফেলে!'

'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্'—এই সূত্রটির তাৎপর্য হইল: যদি এইরূপ আশঙ্কা করা হয় যে, ঈশ্বর নিত্যতৃপ্ত বলিয়া তাঁহার কোনই প্রয়োজন না থাকায় তিনি জগৎস্রষ্টা হইতে পারেন না, তাহার উত্তরে বলা হইতেছে যে, লোকে অর্থাৎ জগতে কোন প্রকার প্রয়োজন না থাকিলেও পূর্ণকাম রাজাদি যেরূপ ক্রীড়াদি করেন, ঈশ্বরেরও জগৎ-সৃষ্টি কেবলমাত্র লীলার জন্যই, অন্য কোন প্রয়োজনে নহে। অধিকন্তু রাজা প্রভৃতির লীলাতে যদিই বা কিছু প্রয়োজনের (তৃপ্তি ইত্যাদির) সম্ভাবনা থাকিলেও থাকিতে পারে, নিত্যতৃপ্ত ঈশ্বরের জগৎ-সৃষ্টি লীলা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কৃপাতত্ত্বের আলোচনা করিতে গেলে অনিবার্যভাবেই ঈশ্বরতত্ত্বের প্রসঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হয়। অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ কী? তাঁহার স্বভাব কী?—এই সকল প্রশ্নের আমরা সম্মুখীন হই।

নজরুলের গানে আছে :

'খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে।
প্রলয় সৃষ্টি তব পুতুলখেলা…।'

গানটি ভাবপ্রবণ মনকে 'আনমনা' করে। 'শূন্যে মহা আকাশে' যিনি 'মগ্ন লীলা-বিলাসে', সেই 'উদাসী'র স্বরূপ বা স্বভাব সম্বন্ধে অনন্ত জিজ্ঞাসা জাগায়।

'প্রেমিকে'র গানে আছে :

'সাংখ্য পাতঞ্জল মীমংসায় মীমাংসা কিছুই হ'ল না।
অনন্তরূপিণীর অন্ত বৈশেষিকেতেও মিলে না।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেবও গাহিয়াছেন রামপ্রসাদী গান:

'মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।…
ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন, আগম নিগম তন্ত্রসারে।'

শুধু এই আধুনিক যুগে নয়, সুপ্রাচীন বৈদিক ঋষির কণ্ঠ হইতেও একই ভাবের ঋক্-মন্ত্র উৎসারিত হইয়াছিল। 'একই ভাবের' বলিলে বরং কম বলা হয়—বৈদিক ঋষি প্রশ্ন করিয়াছেন—অপরের কথা কি, স্বয়ং ঈশ্বরও কি জগৎ-সৃষ্টিরূপ স্বমহিমা জানেন? এবং সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, জানিতেও পারেন, না জানিতেও পারেন!

এ যাবৎ আমরা যাহা উপস্থাপিত করিলাম তাহা মূলতঃ তত্ত্বকথা—ঈশ্বরকৃপাতত্ত্বের ও ঈশ্বরস্বরূপতত্ত্বের কথা। কিন্তু আমাদের করণীয় কী?—এ প্রশ্ন তো রহিয়াই গেল! আমরা কি খেয়ালী বালকের বা খামখেয়ালী রাজার খেয়াল-খামখেয়ালের উপর নির্ভর করিয়া

নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিব ? অথবা অনিশ্চিত বৃষ্টির জলের জন্য হাত-পা গুটাইয়া প্রতীক্ষা করিব ? স্মরণীয় যে, বৃষ্টির জলের উপমাটি শ্রীরামকৃষ্ণদেব কৃপাসিদ্ধদের প্রসঙ্গে ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন: 'কেউ কেউ অনেক কষ্টে ক্ষেতে জল ছেঁচে আনে ; আনতে পারলে ফসল হয়। কারু জল ছেঁচতে হ'ল না, বৃষ্টির জলে ভেসে গেল। কষ্ট ক'রে জল আনতে হ'ল না। এই মায়ার হাত থেকে এড়াতে কষ্ট ক'রে সাধন করতে হয়। কৃপা-সিদ্ধের কষ্ট করতে হয় না। সে কিন্তু দু-এক জনা।'

আমরা কি আখেরে ঐ 'দু-এক জনা'র মধ্যে পড়িলেও পড়িতে পারি, এই ভরসায় বসিয়া থাকিতে পারি ?

কখনই নয়।

সুতরাং কাজের কথায় আসা যাক।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, 'কৃপাবাতাস তো বইছেই, তুমি পাল তুলে দাও না!' 'পাল তোলা' অর্থাৎ একটু সাধনভজন করা। তিনি আরও বলিতেন, 'ভগবানের দিকে এক পা এগুলে তিনি দশ পা এগিয়ে আসেন', 'ঈশ্বরকে একগুণ যা দেবে, সহস্রগুণ তাই পাবে', 'ঈশ্বরের নাম করতে অনুরাগ বাড়লে বিকার কাটবেই কাটবে, তাঁর কৃপা হবেই হবে', 'ঈশ্বরকে প্রার্থনা করতে হয়, ঠাকুর কৃপা ক'রে জ্ঞানের আলো তোমার নিজের উপর একবার ধরো, আমি তোমায় দর্শন করি', 'ঈশ্বরের কৃপার উপরে সব নির্ভর করছে, তা ব'লে তাঁকে ডাকতে হবে—চুপ ক'রে থাকলে হবে না', 'সাধনা করতে করতে তাঁর কৃপায় সিদ্ধ হয়। একটু খাটা চাই।' 'ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তাঁর কৃপা হবে, ঈশ্বরলাভ হবে।' ইত্যাদি।

সুতরাং প্রার্থনা করা চাই, নাম করা চাই, ব্যাকুল হওয়া চাই, তবেই আমরা ভগবৎ-কৃপা যাহা সর্বদাই রহিয়াছে, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিব। আমরা যদি নিজেরাই ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া 'অন্ধকার! অন্ধকার!' বলিয়া 'ত্রাহি ত্রাহি' রব তুলি, কে আমাদের পরিত্রাণ করিবে! ভগবানের অজস্র কৃপারশ্মি আমাদের বদ্ধকক্ষের রুদ্ধদ্বারে রুদ্ধগবাক্ষে প্রতিনিয়ত আঘাত করিতেছে—প্রয়োজন শুধু সেগুলি উন্মোচিত করা। আমাদের তরফ হইতে আর কিছু করণীয় নাই।

কৃপাবাতাস ও পালতোলার উপমাটির মতোই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আরেকটি প্রিয় উপমা মনরূপ সূচ ও ঈশ্বররূপ চুম্বক। উপমাটি রামপ্রসাদের একটি গানে আছে, যে গানটি শ্রীরামকৃষ্ণদেব গাহিতেন। অবশ্য উপমাটি অতি প্রাচীন (এই সংখ্যার 'দিব্য বাণী' দ্রষ্টব্য)। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঐ রামপ্রসাদী গানটি গাহিতে গাহিতে সমাধিস্থ হন। গানটির দুইটি কলিতে আছে:

'সে ভাব লাগি পরম যোগী
যোগ করে যুগ-যুগান্তরে।
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন
লোহাকে চুম্বকে ধরে॥'

সমাধিভঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'ভাবের উদয়' ব্যাখ্যা করিলেন: 'ভাব, ভক্তি এর মানে—তাঁকে ভালবাসা।' অর্থাৎ তাঁহাকে ভাল-বাসিতে পারিলে চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে, শ্রীভগবানও তেমনি ভক্তকে আকর্ষণ করেন।

উপমাটি শ্রীরামকৃষ্ণদেব কথামৃতের অন্যত্রও একাধিকবার বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন: 'ছুঁচ কাদা দিয়ে ঢাকা থাকলে আর চুম্বকে টানে না। মাটি-কাদা ধুয়ে ফেললে, তখন

চুম্বকে টানে। মনের ময়লা তেমনি চোখের জলে ধুয়ে যায়।...তখন ঈশ্বররূপ চুম্বক মনরূপ ছুঁচকে টেনে লন। তখন সমাধি হয়, ঈশ্বর-দর্শন হয়।' 'সাধুসঙ্গ আর সর্বদা প্রার্থনা করতে হয়। তাঁর কাছে কাঁদতে হয়। মনের ময়লা-গুলো ধুয়ে গেলে তাঁর দর্শন হয়। মনটি যেন মাটিমাখানো লোহার স্বচ—ঈশ্বর চুম্বক পাথর, মাটি না গেলে চুম্বক পাথরের সঙ্গে যোগ হয় না। কাঁদতে কাঁদতে স্বচের মাটি ধুয়ে যায়; মাটি অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, পাপবুদ্ধি, বিষয়বুদ্ধি।' ইত্যাদি।

বস্তুতঃ কৃপাবাতাস যেমন সর্বদাই বহিতেছে, চৌম্বক-ক্ষেত্রে চুম্বকের আকর্ষণী শক্তিও তেমনি সর্বদাই রহিয়াছে। কিন্তু কার্যতঃ তাহা পরিদৃষ্ট হয় না, কারণ লৌহখণ্ডের উপর মৃত্তিকার গাঢ় আবরণ পড়িয়াছে। সেই আবরণ হইতে লৌহখণ্ডকে মুক্ত করিতে পারিলেই চুম্বকের আকর্ষণী শক্তি প্রকট হয়—লৌহখণ্ডটি একটি ক্ষুদ্র চুম্বকে পরিণত হয়। তখন ঈশ্বররূপী বৃহত্তম চুম্বক উহাকে আকৃষ্ট করিয়া স্বসংলগ্ন করে।

স্বতরাং আগে মনের শুদ্ধি, তবেই কৃপার প্রকাশ এবং ঈশ্বরে যোগ।

স্বামী বিবেকানন্দও চিকাগো ধর্মমহাসভায় পঠিত তাঁহার 'হিন্দুধর্ম' প্রবন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই সকল কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন: 'ঈশ্বরের কৃপা হইলেই এই বন্ধন ঘুচিয়া যাইতে পারে এবং পবিত্র-হৃদয় মানুষের উপরই তাঁহার কৃপা হয়। অতএব পবিত্রতাই তাঁহার কৃপা-লাভের উপায়।'

আমাদের সমস্ত শাস্ত্র ও শাস্ত্রব্যাখ্যাকার-গণের সিদ্ধান্ত এই যে, জ্ঞান বা প্রেম ভগবৎ-কৃপাতেই লাভ করা যায় এবং উহা সাধন-সাপেক্ষ। আচার্য নিম্বার্ক বলিতেছেন:

'কৃপাস্য দৈন্যাদিযুজি প্রজায়তে
যয়া ভবেৎ প্রেমবিশেষলক্ষণা
ভক্তি র্হ্যনন্যাধিপতের্মহাত্মনঃ'

অর্থাৎ যে সাধক দীনতা আদি গুণযুক্ত, তাঁহার প্রতিই শ্রীভগবানের কৃপা হয়—যে কৃপার ফলে সর্বেশ্বর বিশ্বাত্মা শ্রীভগবানে সাধকের প্রেমরূপিণী ভক্তি হয়। (মনে পড়িয়া যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা: উঁচু ঢিপিতে বৃষ্টির জল জমে না। খাল জমিতে জমে; তেমনি ঈশ্বরের কৃপাবারি, যেখানে অহঙ্কার সেখানে জমে না।)

মহাভারতের শান্তিপর্বের টীকায় নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন:

'কর্মভি র্ভগবদ্ভক্তি র্ভক্ত্যেশ্বরকৃপা তয়া।
জ্ঞানং তেন বিমুক্তিশ্চ মোক্ষধর্মার্থসংগ্রহঃ॥'

তাৎপর্য এই যে, নিষ্কাম কর্মের দ্বারা ভগবানে ভক্তি হয়। ভক্তির ফলে ভগবৎ-কৃপা হয়। ভগবৎ-কৃপার ফলে জ্ঞান হয়। জ্ঞান হইলে মোক্ষ হয়। মোক্ষধর্মের ইহাই সারসংগ্রহ।

নিম্বার্ক ও নীলকণ্ঠের কথার মধ্যে তত্ত্বগত পার্থক্য বিশেষ কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। একজন প্রেমের দিক হইতে কথা বলিতেছেন, অপরে জ্ঞানের দিক হইতে। সমন্বয়াবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, পরা ভক্তি ও পরম জ্ঞান একই বস্তু।

ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর লিখিয়াছেন, ভগবৎ-কৃপা জীবের কর্মসাপেক্ষ। কঠোপ-নিষদের ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন, 'সর্বজ্ঞঃ সর্বেশ্বরঃ...কর্মানুরূপং কামান্ কর্মফলানি, স্বানুগ্রহনিমিত্তাংশ্চ কামান্...প্রযচ্ছতি।' ইহার আপাত-প্রতীয়মান অর্থ: সর্বজ্ঞ সর্বেশ্বর জীবগণের কর্মানুরূপ কর্মফল দেন এবং নিজেও অনুগ্রহ করিয়া বাঞ্ছিত ফল দেন। অর্থাৎ

যেন দুই শ্রেণীর ফলের কথা বলা হইতেছে। কিন্তু পণ্ডিতদের মতে এই অর্থ সিদ্ধান্ত-বিরোধী। কারণ ইহাতে ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব-দোষ হয়। ইহা ব্যতীত শঙ্করের উভয় ভাষ্যের মধ্যেও বিরোধ হয়। সুতরাং তাঁহাদের মতে সঙ্গত অর্থ এই যে, ঈশ্বর জীবগণকে তাহাদের কর্মানুসারেই ফল দেন এবং ঐ ফলদানও তাঁহারই অনুগ্রহ। ফলতঃ শাস্ত্রব্যাখ্যাকারগণ কোন অবস্থাতেই ভগবৎ-কৃপাকে জীবের সাধন-নিরপেক্ষ বলেন না।

'হরিমীড়ে'-স্তোত্রম্

স্তোত্র-রচয়িতা : আচার্য শংকর ; টীকাকার : স্বয়ংপ্রকাশ-যতি

অনুবাদক : স্বামী ধীরেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

টীকা : নন্থ নাস্তি জীবাতিরিক্তঃ কশ্চিৎ ঈশ্বরঃ জগৎস্রষ্টা প্রাণিনাং ভয়াভয়হেতুঃ ; 'জগতঃ নিত্যত্বাৎ, সুখদুঃখয়োঃ চ পুণ্যপাপমূলত্বাৎ, বেদান্তানাং চ কর্মশেষভূত-কর্ত্রাদি-স্তাবকত্বেন প্রত্যক্ষাদি-বিরুদ্ধাদ্বিতীয়েশ্বরে প্রমাণত্বাভাবাৎ' ইতি জৈমিনীয়ানাং মতম্ আশঙ্ক্য সর্বস্য জগতঃ সাবয়বত্বাদিনা কার্যত্বেন অনুমিতস্য অধিষ্ঠাতারং পরমেশ্বরং বিনা উৎপত্ত্যনুপপত্তেঃ, জীবানাং চ এতাদৃশ-জগদুৎপাদনে জ্ঞানসামর্থ্যয়োঃ অসম্ভবাৎ, চেতনত্বেন স্বতন্ত্রাণাং চ তেষাং পারবশ্যং বিনা স্বতঃ দুঃখহেতু-কর্মানুষ্ঠানেন তদ্‌ভোগাসম্ভবাৎ, কর্মণাং চ জড়ত্বেন জগৎসর্জনে জীবানাং সুখদুঃখদানে চ স্বতঃ অধিষ্ঠাতারং বিনা অসমর্থত্বাৎ, বেদান্তৈঃ চ প্রাণিকর্মানুরোধেন জগৎস্রষ্টুঃ তৎকর্মফলদাতুঃ চ ঈশ্বরস্য সিদ্ধিপ্রকারস্য পূর্বম্ উক্তত্বাৎ, তৎপর-শ্রুতিবিরোধে প্রত্যক্ষাদেঃ আভাসত্বাৎ, কর্ম-বিরুদ্ধ-প্রতিপাদক-বেদান্তানাং তচ্ছেষাত্মক-স্তাবকানুপপত্তেঃ চ, অস্তি 'কার্যম্ অঙ্কুরাদিকং সকর্তৃকং, কার্যত্বাৎ ঘটবৎ' ইতি কার্য-লিঙ্গাদি-তর্কানুগৃহীত-শ্রুতি-সিদ্ধঃ কশ্চিৎ পরমেশ্বরঃ ইতি অভিপ্রেত্য আহ—

[**মূলস্তোত্রম্ঃ**]

যেনাবিষ্টো যস্য চ শক্ত্যা যদধীনঃ
ক্ষেত্রজ্ঞোঽয়ং কারয়িতা জন্তুষু কর্তুঃ।
কর্তা ভোক্তাত্মাত্র হি চিচ্ছক্ত্যধিরূঢ়-
স্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥২১॥ (১)

যেন ইতি। **ক্ষেত্রজ্ঞঃ যেন** পরমেশ্বরেণ **আবিষ্টঃ** দুষ্করম্ অপি কর্ম কচিৎ করোতি গ্রহাবিষ্টবৎ ; আবেশনির্মুক্তঃ ন শক্নোতি কর্তুং, সঃ অস্তি কশ্চিৎ পরমেশ্বরঃ। অর্জুনাদৌ ঈশ্বরাবেশ-শ্রবণাৎ। **যস্য চ শক্ত্যা** মায়য়া আবিষ্টঃ জ্ঞানস্বরূপঃ অপি মূঢ়ঃ অহং ন জানে কিঞ্চিৎ অজ্ঞঃ অভিমন্যতে, সঃ অস্তি শক্তিমান্ কশ্চিৎ ইতি গম্যতে। অথ শ্রুতিঃ—'অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ' [শ্বে. উ. ৪।৭] ইতি। অনীশয়া আত্মাজ্ঞানাবরণেন ঈশ্বর-ভাবাপ্রতিপত্ত্যা,

মুহ্যমানঃ দেহাদিষু অভিনিবিশমানঃ ; শোচতি, তদ্‌গত-বৈক্লব্যেন বিষীদতি ইতি অর্থঃ। তৎ উক্তং ভগবতা অপি—'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া' [গীতা, ৭।১৪] ইতি। অতএব **ক্ষেত্রজ্ঞঃ অয়ং যদধীনঃ** সর্বব্যাপারেষু বর্ততে, অস্তি সঃ ঈশ্বরঃ। **তম্ভূষু** সর্বভূতেষু, **কর্তুঃ কারয়িতা** ইতি অভ্যুপগন্তব্যম্। তৎ উক্ত সূত্রকারেণ—'পরাৎ তু তৎ শ্রুতেঃ' [ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।৪১] ইতি। পরাৎ ঈশ্বরাৎ নিমিত্তাৎ ক্ষেত্রজ্ঞঃ কর্তা। তৎ শ্রুতেঃ ; — 'এষ হি এব সাধু কর্ম কারয়তি' [কৌ. উ. ৩।৮] ইতি ঈশ্বরস্য প্রয়োজকত্ব-শ্রবণাৎ ইতি। যস্য পরমাত্মনঃ **চিচ্ছক্ত্যধিরূঢ়ঃ** চিৎস্বরূপ-ব্যাপ্তঃ ; **কর্তা ভোক্তা আত্মা** ইতি প্রসিদ্ধঃ অহংকারঃ, **অত্র** কার্যকারণসংঘাতে কৃশাণুব্যাপ্তঃ লোহঃ ইব, **তম্ ঈড়ে** ইতি অর্থঃ ॥২১॥

টীকানুবাদ : শঙ্কা : জীব হইতে ভিন্ন, প্রাণীদিগের ভয় ও অভয়ের হেতু, জগতের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর কেহ নাই ; —কারণ, জগৎ নিত্য, সুখ এবং দুঃখও পুণ্য- এবং পাপ-মূলক, বেদান্তবাক্যসমূহও কর্মের অঙ্গীভূত কর্তা প্রভৃতির প্রশংসাপর বলিয়া প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিরুদ্ধ অদ্বিতীয় ঈশ্বরবিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে না—এইরূপ [পূর্বমীমাংসক] জৈমিনীয় সম্প্রদায়ের মত আশঙ্কা করিয়া [উত্তরে বলা হইতেছে—] অধিষ্ঠাতা পরমেশ্বর ব্যতীত সাবয়বত্ব প্রভৃতি হেতুর দ্বারা কার্যত্বরূপে অনুমিত সমস্ত জগতের উৎপত্তি উপপন্ন হয় না ;[১] জীবগণেরও এইরূপ [বিচিত্র] জগদ্রচনার জ্ঞান ও শক্তি [থাকা] সম্ভব নহে ;[২] [এ-বিষয়ে আরও বক্তব্য এই যে,—] সচেতনত্ব-নিবন্ধন তাহারা (জীবগণ) স্বতন্ত্র[৩] বলিয়া পরবশ্যতা ব্যতীত স্বাভাবিকভাবে দুঃখজনক কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা তাহাদের ক্লেশভোগের সম্ভাবনা নাই ; কর্মসমূহও জড় বলিয়া কোন চেতন অধিষ্ঠাতা (প্রেরক) ব্যতীত জগৎ সৃষ্টি করিতে ও জীবগণকে সুখদুঃখ প্রদান করিতে স্বাভাবিকভাবেই অসমর্থ ;[৪] বেদান্তবাক্যসমূহের দ্বারা

---

১ যাহা সাবয়ব, তাহা কার্য। সুতরাং জগৎ সাবয়ব বলিয়া জগৎও কার্য। যাহা কার্য, তাহা কোন একজন কর্তার দ্বারা নিষ্পাদিত হয়। সুতরাং সাবয়ব জগৎও কার্য বলিয়াই কর্তার দ্বারা নিষ্পাদিত। নির্মীয়মাণ কার্যের উপাদান-বস্তু-বিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞান না থাকিলে কেহ ঐ কার্যের কর্তা হইতে পারে না। এই বিচিত্র জগতের সমস্ত বস্তুর উপাদান-বিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান ও নির্মাণকৌশল যে কর্তার পরিজ্ঞাত, তিনি সর্বজ্ঞ। এইরূপ সর্বজ্ঞকেই পরমেশ্বর বলা হয়। সর্বজ্ঞ পরমেশ্বররূপ কর্তা ব্যতীত এই বিচিত্র জগদ্রূপ কার্য সম্ভব হয় না—ইহাই তাৎপর্য।

২ এ-বিষয়ে বিস্তারিত জানিবার জন্য ব্রহ্মসূত্রের 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' [১।১।২] সূত্রের শাঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৩ অন্যের ইচ্ছার অধীন না হইয়া কাজ করিবার সামর্থ্যকেই স্বাতন্ত্র্য বলে। অচেতন পদার্থসমূহের এইরূপ সামর্থ্য নাই বলিয়াই তাহারা স্বতন্ত্র নহে। চেতন জীবগণের স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও উহা নিরঙ্কুশ নহে। কারণ, জীবগণ ক্ষেত্রবিশেষে নিজেদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও অধিক শক্তিশালী ব্যক্তির ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হইতে বাধ্য হয়। একমাত্র ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্যই নিরঙ্কুশ।

৪ অচেতন বস্তু চেতন প্রযোজক ব্যতীত স্বয়ং কোন কার্য সম্পাদন করিতে পারে না, যেমন অচেতন রথ চেতন সারথি ব্যতীত চলিতে পারে না। সুতরাং অচেতন কর্মসমূহের প্রযোজক চেতন কোন একজন ব্যতীত জগৎ-নির্মাণ বা সুখদুঃখদান করিবার সম্ভাবনা নাই। এইরূপ চেতন প্রযোজক কর্তাই ঈশ্বর নামে প্রসিদ্ধ—ইহাই তাৎপর্য।

[প্রদর্শিত]—প্রাণিগণের কর্মানুসারে জগতের সৃষ্টিকর্তা এবং তাহাদের (প্রাণিগণের) [শুভাশুভ-]কর্মফলদাতা ঈশ্বরের সিদ্ধির পদ্ধতিও [এখানে] পূর্বেই উক্ত হইয়াছে (এই টীকাতেই পূর্বমীমাংসামতের খণ্ডনে এযাবৎ যাহা বলা হইয়াছে) ; ঈশ্বরের জগৎ-কর্তৃত্ব-বোধক শ্রুতির সহিত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিরোধ হওয়ায় প্রত্যক্ষাদিকে [শ্রুতিপ্রমাণ অপেক্ষা দুর্বল বলিয়া] প্রত্যক্ষাদির আভাস (দোষদুষ্ট প্রত্যক্ষাদি) বলিতে হইবে ;[৫] কর্ম-বিরুদ্ধ [বিষয়ের (নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানের)] প্রতিপাদক বেদান্তবাক্যসমূহ কর্মাঙ্গের (কর্মের অঙ্গীভূত দেবতা, মন্ত্র, কর্তা প্রভৃতির) প্রশংসাপর বাক্য মাত্র, ইহাও উপপন্ন হয় না ; [বিশেষতঃ] অঙ্কুরাদি কার্য [পক্ষ], কর্তৃজন্য [সাধ্য], যেহেতু উহা কার্য [হেতু], ঘটবৎ [ঘট প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত]—এইরূপ [যথোপযুক্ত] তর্ক- [অনুকূল যুক্তি-] সমর্থিত কার্যহেতুক কোনও একজন শ্রুতিসিদ্ধ পরমেশ্বর আছেন, এই অভিপ্রায়ে [আচার্য] বলিতেছেন : [মূলশ্লোক, ২১,[৬] পৃঃ ২৮২ দ্রষ্টব্য] ।(১)

অন্বয় : যেন আবিষ্টঃ, যদধীনঃ, যস্য চ শক্ত্যা অয়ং ক্ষেত্রজ্ঞঃ কর্তা, জন্তুষু কর্তুঃ কারয়িতা [চ], চিচ্ছক্ত্যধিরূঢ়ঃ অত্র ভোক্তা আত্মা [চ], তং সংসার-ধ্বান্ত-বিনাশং হরিম্ ঈড়ে ।২১।

স্তোত্রানুবাদ : যাঁহার দ্বারা আবিষ্ট হইয়া যাঁহার অধীন এই ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) যাঁহার শক্তিতে [স্বয়ং] কর্তা এবং প্রাণীদের মধ্যে কর্তার কারয়িতা হয়, [যাঁহার] চিৎ-শক্তিতে অবস্থিত হইয়া [পূর্বোক্ত জীব] এই সংসারে ভোক্তা আত্মা [-রূপে প্রসিদ্ধ] হয়, সংসারের [কারণীভূত অজ্ঞান-] অন্ধকার-বিনাশকারী সেই হরিকে বন্দনা করি । ২১ ।

টীকানুবাদ : **যেন** ইত্যাদি । **ক্ষেত্রজ্ঞঃ**—জীব, যে পরমেশ্বর কর্তৃক **আবিষ্টঃ** —আবিষ্ট হইয়া গ্রহাবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় কখন কখন [অত্যন্ত] দুষ্কর কর্মও করিয়া থাকে ; আবেশমুক্ত হইলে [আর সেই কর্ম] করিতে পারে না—এইরূপ কোন একজন পরমেশ্বর [অবশ্যই] আছেন । [দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা হইতেছে—] অর্জুন প্রভৃতিতে ঈশ্বরের আবেশ

---

৫ জীব নিজেই আসক্তি, বিদ্বেষ প্রভৃতি কারণে বিভিন্ন সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া অভীষ্ট কার্য সম্পাদন করে । সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা জীবকেই কর্তারূপে পাওয়া যায়—ঈশ্বরের কর্তৃত্ব প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ নহে । বিশেষতঃ ঈশ্বরের সর্বময় কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে তিনি ইচ্ছা করিয়া জীবকে শুভ অথবা অশুভ কর্মে নিযুক্ত করেন, ইহাই সিদ্ধ হয় । তাহার ফলে ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব-দোষ ঘটে অর্থাৎ ঈশ্বরেরও অনুরাগ, বিদ্বেষ প্রভৃতি দোষ ঘটে । এই আশঙ্কার উত্তরে ব্রহ্মসূত্রকার বলিয়াছেন, ঈশ্বর শ্রুতিসিদ্ধ বলিয়াই ঈশ্বরের সর্বময়কর্তৃত্ব সর্বথা স্বীকার্য । শ্রুতির সহিত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিরোধ ঘটিলে শ্রুতি-প্রমাণকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ শ্রুতি অপৌরুষেয় বলিয়াই স্বতঃ-সিদ্ধভাবে নির্দোষ প্রমাণ । প্রত্যক্ষাদি লৌকিক প্রমাণ পৌরুষেয় বলিয়া তাহাতে দোষের সম্ভাবনা বিদ্যমান । সুতরাং, উহা শ্রুতি হইতে দুর্বল । ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত । এ-বিষয়ে ব্রহ্মসূত্রের 'পরাৎ তু তচ্ছ্রুতেঃ' [২।৩।৪১] সূত্রের শাঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য ।

৬ টীকার আরম্ভ হইতে এই পর্যন্ত বাক্য একটিই । বাক্যটির কর্তা—'আচার্যঃ' (উহ্য) ; সমাপিকা ক্রিয়া—'আহ' ; অসমাপিকা ক্রিয়া—'আশঙ্ক্য' ও 'অভিপ্রেত্য' ; কর্ম —সম্পূর্ণ ২১-সংখ্যক শ্লোকটি ।

শোনা যায়। **যস্য চ শক্ত্যা**—যাঁহার শক্তির দ্বারা অর্থাৎ মায়ার দ্বারা আবিষ্ট [**জীব স্বভাবতঃ**] **জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও** 'আমি মূঢ়, কিছুই জানি না [অতএব] অজ্ঞ'—ইহা মনে করে, এইরূপ শক্তিমান কোন একজন [পরমেশ্বর] আছেন, ইহা বুঝা যায়। এবিষয়ে শ্রুতি : 'মোহগ্রস্ত [জীব] দৈন্যভাববশতঃ শোক করে।' [ইহার ব্যাখ্যা—] 'অনীশয়া'—আত্মার অজ্ঞানাবরণের ফলে [নিজের স্বরূপতঃ] ঈশ্বরভাবের বোধরাহিত্যই 'অনীশা'—তাহার দ্বারা 'মুহ্যমানঃ'—দেহাদিতে [আত্ম-] অভিনিবেশবশতঃ, 'শোচতি'—শোক করিয়া থাকে অর্থাৎ দেহাদিগত বিকলতাবশতঃ বিষাদগ্রস্ত হয়। ভগবান [কৃষ্ণ]ও এবিষয়ে বলিয়াছেন—'আমার এই গুণময়ী দৈবী মায়া দুরতিক্রমণীয়া।' অতএব **অয়ং ক্ষেত্রজ্ঞঃ**—এই জীব **যদধীনঃ**—যাঁহার অধীন হইয়া সর্বকার্যে প্রবৃত্ত হয়, সেই ঈশ্বর আছেন। **জন্তুষু**—সমস্ত প্রাণীর মধ্যে **কর্তুঃ**—কর্তার [ও] **কারয়িতা**—প্রেরক, [সেই ঈশ্বর] ইহা স্বীকার করিতে হইবে। [ব্রহ্ম-]সূত্রকারও বলিয়াছেন—'পরমেশ্বর হইতেই জীবের কর্তৃত্ব [সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ জীবের স্বাভাবিক কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না], যেহেতু [কর্তৃত্বাদির ঈশ্বরাধীনতা-প্রতিপাদক] শ্রুতি আছে।' 'পরাৎ'—ঈশ্বররূপ নিমিত্তবশতঃই, জীব কর্তা। 'তৎ শ্রুতেঃ'—'ইনিই (ঈশ্বরই) জীবকে শুভ কর্ম করান'—এইরূপ শ্রুতিবাক্যে ঈশ্বরের প্রযোজকত্ব (নিয়ামকত্ব) শ্রুত হয়। যে পরমাত্মার **চিচ্ছক্ত্যধিরূঢ়ঃ**—চৈতন্যস্বরূপ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া **কর্তা ভোক্তা আত্মা**—কর্তা-ভোক্তা-রূপে প্রসিদ্ধ অহংকার **অত্র**—এই দেহেন্দ্রিয়সংঘাতে, অগ্নি-ব্যাপ্ত লৌহখণ্ডের ন্যায় [বর্তমান], **তম্**—তাঁহাকে (সংসারের কারণীভূত অজ্ঞান-অন্ধকার-বিনাশকারী সেই হরিকে) **ঈড়ে**—বন্দনা করি—ইহাই অর্থ। ২১।　　[ক্রমশঃ]

কথামৃত ও কথামৃতকার

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

কথামৃত!

একটি অপূর্ব বস্তু, যার অন্য কোনো অভিধা হয় না। লোকে যাকে সাহিত্য বলেন, কাব্য দর্শন সঙ্গীত জ্ঞানবিজ্ঞান ধর্মকর্ম কথাকাহিনী—কত নামে অভিহিত করেন সাহিত্যের জগৎপ্রাঙ্গণে, 'কথামৃত' সে-জগতের জিনিস নয়—পুঁথিপত্রে রচনা-করা সাধারণ সাহিত্যিক জগতের লীলাখেলা নয়। এর নাম 'কথামৃত' ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

'অমৃত কথা'-ও নয়, 'কথামৃত'!

পরণে একটি সাধারণ লালপাড় ধুতি, একটি হাতকাটা ছোট জামা—হাতে একটি পানের বটুয়া, মুখে পান। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের মা ভবতারিণীর পূজক। সাধারণ ঘরের পূজক ব্রাহ্মণ। 'ব্রাহ্মণ পণ্ডিত' যাকে বলে তাও নন। শুধু ৺মার নিত্য সেবা করেন। ৺মাকে মাতৃভাষায় বাংলা কথায় আহ্বান করে কথা বলেন। রক্তমাংসের দেহময়ী জননীকে ডাকার মত সে ডাক। আর পূজা করতে করতে সমাধিস্থ হয়ে ভাবে ডুবে যান। এক আশ্চর্যদর্শন সাধারণ পূজারী ব্রাহ্মণ-কিশোর! ক্রমে যুবক—প্রৌঢ়! তাঁর মুখের এই অপূর্ব-শ্রুত কথামৃত।

*

আজ লিখতে বসে দেখছি 'কথামৃতে'র কত না টীকাভাষ্য : 'উদ্বোধনে' 'বিশ্ববাণী'তে—ভাষ্য স্বদেশে-বিদেশে নানা পত্র-পত্রিকায়। ঐ ব্রাহ্মণের কাহিনী আর তাঁর কথামৃত কি করে ছড়িয়ে গেছে, নিয়ত ছড়িয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর সর্বত্র, ভাবতে অবাক লাগে!

তাঁরই দেওয়া উপমা—বনের মধ্যে ফুল ফোটে, কেউ জানে না কোন্ গাছের আড়ালে। কিন্তু ভ্রমর টের পায়। মানুষ গন্ধ পায়। সেদিন প্রচার নেই। পাণ্ডিত্য নেই। খ্যাতিও নেই। প্রশ্ন বিচার মীমাংসা নেই। শুধু শোনা। ঐ কথামৃত শোনার জন্য দলে দলে লোক আসে।

আজ ভাবছি, সব প্রথম কে শুনেছিল ঐ কথামৃত! সব আগে কে দেখেছিল ঐ ভাবে-ভোলা ব্রাহ্মণতনয়কে? তারা কী ভেবেছিল তাঁকে? কেন মুগ্ধ হয়েছিল? কী বুঝেছিল সেই অপূর্ব দেবমানবের ঐ মুহুর্মুহুঃ ভাবস্থ—সমাধিস্থ হওয়া আর কথামৃত বলা ভাবমুখে? তারা অবাক হয়ে, মুগ্ধ হয়ে শুনেছে। আবার ঠাকুরের দেওয়া উপমার মতই—আফিংখাওয়ান ময়ূরের মত ফিরে এসেছে—একলা নয়, বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে।

কেমন করে তোতাপুরী এসেই চিনে নিয়েছিলেন! কেমন করে ভৈরবী ব্রাহ্মণী চিনে নিয়েছিলেন!—'বাবা, তোমাকেই আমি খুঁজছি' বলেছিলেন!

আবার ভাবি : এঁরা অথবা রানী রাসমণি, মথুরবাবু, মন্দিরের দর্শক সেবক পূজারীরা অথবা রামচন্দ্র দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ ভক্তগণ—কে আগে তাঁর কথা শুনেছিলেন? অবাক বিস্ময়ে ঐ নরনারায়ণকে দেখেছিলেন—তাঁর কথামৃত শুনেছিলেন, বুঝেছিলেন?

অপার রহস্য। অপার রহস্যময় জীবনের! কিন্তু এমন অঘটন ঐরকম মানুষদের নিয়ে জগতে আরো ঘটেছে। রাম কৃষ্ণ বুদ্ধ ঈশা মুসা মহম্মদ চৈতন্য নানকদের নিয়ে। কেউ মৎস্যজীবী, কেউ রাজপুত্র, কেউ গোপালক, কেউ অশ্বপালক, কেউ বণিকপুত্র—কে আগে তাঁদের চিনেছিলেন? কেমন করে মুগ্ধ হয়েছিলেন? কেউ লিখে রেখে গেছেন গীতায়। কেউ বাইবেলের নিউ টেস্টামেণ্টে। কেউ কোরাণশরীফে। কেউ গ্রন্থসাহেবে। এসব যেমন অঘটন, তেমনি অসীম রহস্যময় ব্যাপার। পণ্ডিতেরা এ যবনিকা ভেদ করতে পারেন না। বলতে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে যান। 'কথামৃতে' কথিত পণ্ডিত পদ্মলোচনের মত। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র রায় রামানন্দের মত। অনুভূতিময় অতল রহস্য!

আশ্চর্য অঘটন ঘটেছে 'কথামৃত' নিয়ে য়ুরোপীয় বিদ্বৎসমাজে। জার্মান মোক্ষমূলার। ফরাসী রোমাঁ রোলাঁ। স্কটীশ চার্চ কলেজের (তখন জেনারেল এ্যাসেম্বলীস ইনস্টিটিউসন) অধ্যক্ষ হেস্টি—প্রথম যিনি নরেন্দ্রনাথকে (ভাবী স্বামী বিবেকানন্দকে) দক্ষিণেশ্বরের সাধুটির কথা বলেন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক টনী যিনি পরবর্তীকালে লণ্ডনে ইণ্ডিয়া হাউসের লাইব্রেরীয়ান ছিলেন, 'A Modern Saint' 'এ যুগের এক সাধু' নামে 'ইম্পিরিয়াল কোয়ার্টারলি রিভিউ' পত্রিকায় জানুআরি ১৮৯৬ সংখ্যায় একটি সুন্দর প্রবন্ধ লেখেন। এই লেখাটি বহু য়ুরোপীয় মনীষীর কৌতূহল ও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, যাঁদের অন্যতম হলেন পণ্ডিত মোক্ষমূলর। তিনিও 'A Real Mahatman' (একজন প্রকৃত মহাত্মা) নামে 'নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি' ১৮৯৬ অগস্ট সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই বিখ্যাত নিবন্ধটিও

বহু ধর্মযাজক ও বিদ্বৎসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অতঃপর ১৮৯৮ সালের নভেম্বর মাসে তাঁরই রচিত 'Ramakrishna: His Life and Sayings' (রামকৃষ্ণ: তাঁর জীবন ও বাণী) গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

এই হ'ল ঠাকুরের পূর্বোক্ত উপমারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ যেন। কামারপুকুরের বনে যে সুগন্ধ ফুলটি ফুটেছিল তারই বিশ্ব-সুরভিত কাহিনী! ১৮৯৩-এ আমেরিকায় বিশ্বধর্ম-সম্মেলন-সভায় স্বামী বিবেকানন্দের বিস্ময়কর আবির্ভাব। এক অভিনব সৌরভে আমেরিকা ও প্রাচ্য-প্রতীচ্য জগতের দিগ্‌বিদিক্ ভরে যেতে লাগল, আজো যার শেষ নেই। সীমা নেই। বিস্ময় কৌতূহল জিজ্ঞাসা প্রশ্নেভরা টীকাভাষ্য চলেছে নানাকণ্ঠে।

এখন আসি 'কথামৃত'কার—বা 'কথামৃত'-লেখকের, 'শ্রীম'র কথায়।

এও একটি আশ্চর্য অসাধারণ কাহিনী বা ঘটনা। ঐ 'শ্রীম' অথবা মাষ্টারমশাই মহেন্দ্র-নাথ গুপ্তের ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুরকে প্রথম দর্শন। 'কথামৃত' শ্রবণ।

মাষ্টারমশাই গিয়েছিলেন বরাহনগরে ভগিনীর বাড়ি। ভাগিনেয় সিদ্ধেশ্বরের কাছে ঠাকুরের কথা প্রথম শোনা। দক্ষিণেশ্বরে আসা। দর্শন। মাত্র চার বছরের ঐ ঘটনা। সান্নিধ্য, সংযোগ-সূত্র-জালে বোনা—'কথামৃত' সঞ্চয়-সংগ্রহ-চিন্তা-লেখা দেখতে দেখতে গ্রাম শহর প্রদেশের সীমা ছাড়িয়ে ভারতব্যাপী, ক্রমে সমগ্র জগতে বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়ল। এখনো পড়ছে। যার পরিধি ও গভীরতার যেন সীমা-পরিসীমা নেই। মাকড়সার জালের মত কোথা হতে সে সুতো বেরিয়ে আসছে আর 'জাল' বোনা হয়ে চলেছে! যা আমাদের মত লোকের কাছে শুধু অসীম বিস্ময়! আর কোনো সংজ্ঞা নেই এই 'বিস্ময়' কথাটি ছাড়া।

'শ্রীম' কে ছিলেন সকলেই জানেন। কিন্তু আমাদের কে ছিলেন সে পরিচয় একটু আজ জানাই—ব্যক্তিগত কথা জানাবার আগ্রহে নয়, শুধু এই আশঙ্কায় যে এ-সব তথ্য আজ পরিবেশিত না হলে, কালে লোপ পেয়ে যাবে।

'শ্রীম'র পত্নী নিকুঞ্জদেবী ছিলেন কেশব-চন্দ্র সেনের জ্ঞাতি-আত্মীয় ঠাকুরচরণ সেনের তৃতীয়া কন্যা। ঠাকুরচরণের প্রথমা কন্যা ক্ষীরোদাদেবী ছিলেন আমার মাতামহী। কাজেই তিনিও এক দিদিমা। কুটুম্ব ও আত্মীয় হওয়ার জন্য যাতায়াত জানাশোনা ও পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা সেকালের জগতে বেশ ছিল বলা বাহুল্য।

এক সময়ে পরে স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯১।৯২ সালে পরিব্রাজক হয়ে ভারতভ্রমণ-সময়ে আবু জয়পুর ক্ষেত্রী প্রভৃতি জায়গায় ভ্রমণকালে আমাদের (রাজস্থানে) জয়পুরের বাড়িতে দু'তিন দিন আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেই সময়ে বাড়িতে কিছু পরিচয় কথা আলাপ। সঙ্গীতও। বাড়ির লোকেরা দর্শন করে, শ্রবণ করে কৃতার্থ ধন্য ও সার্থক হন। তখন কে জানতো তিনি ভবিষ্যৎ বিবেকানন্দ! তিনি শিকাগোর মহাধর্ম-সম্মেলনে এক নিমেষে জগদ্বিখ্যাত হয়ে পড়েন। সেকালের আমাদের বাড়ির গুরুজনরাও তাঁর কোনো কথা বিশেষভাবে সংগ্রহ করে রাখেননি। যদিও দু' একটি পত্রালাপ নাকি হয়েছিল। সেগুলিও আর নেই। [এ প্রসঙ্গ স্বামীজীর শতবার্ষিকী সংখ্যায় একটু নিবেদন করেছিলাম।]

তাঁর সেই আসা ও দেখা সূত্রে আমাদের বাড়িতে 'উদ্বোধন' আসা আরম্ভ হয়েছিল। এবং তাতেই লেখা 'কথামৃত' পড়া। তারপরে সম্পর্কসূত্রে মাতামহীর কলকাতা থেকে প্রেরিত 'কথামৃত' বইগুলি খণ্ডে খণ্ডে পাওয়া। আরো দু'একটি সাধুসঙ্গ হয়। কিষণগড় রাজ্যে দুর্ভিক্ষের সময় তাঁরা সেবা করেন। একজনের নাম—কল্যাণানন্দজী। পিতা পরিচিত হয়ে ধন্য হন।

দীর্ঘকাল পরে নানা বিপর্যয়, নানা সাংসারিক ঘটনার পর কলকাতায় আসা ও থাকা। তখন মাতামহী আমাদের বাড়িতে ও কাছেই আছেন। তিনি তাঁর ভগিনীর বাড়িতে যাওয়া-আসা করেন। একদিন তাঁকে বললাম, "দিদিমা, প্রায়ই তো ঐ দিদিমার ওখানে যাও—একদিন আমাকে নিয়ে চল, আমি 'শ্রীম'-কে দর্শন করে আসি।" তিনি খুশী ও সম্মত হলেন।

সে আজ প্রায় ৫৫।৫৬ বছর আগের সেকাল। তখন মেয়েদের কোথাও যাতায়াতে গাড়ি সঙ্গী অভিভাবকের অনুমতি দরকার হ'ত। সব ঠিকঠাক করে সে যাওয়া। বিকালে শীঘ্র ফিরতে হবে। স্কুল-কলেজ-অফিস-ফেরৎদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

এটি আমার একটি সাক্ষাৎকারের দুঃখজনক নিষ্ফল প্রয়াস। আমার নিজেরও হয়ত ভুল হয়েছিল। ঘোড়ার গাড়ি পেলাম দুপুর-বেলা। গিয়ে দেখি সে বাড়ির নিকুঞ্জ দিদিমা আর তাঁর পুত্রবধূর কোথায় নিমন্ত্রণ আছে সেখানে যাচ্ছেন। এবং 'শ্রীম' আহারান্তে বিশ্রাম করছেন। বাড়িতে অবশ্য তাঁর পুত্র—প্রভাসচন্দ্র গুপ্ত আমার সম্পর্কে মাতুল হতেন—তিনি ও আর তাঁর সন্তান দু'একটি আছেন। গৃহিণীরা বললেন, 'তিনি তিনটার আগে উঠবেন না। তোমরা আজ ফিরে যাও।' আমরা বিচলিত হলাম। বললাম, 'একটু বসে থাকি। এখন তো বেলা ১টা। দু'ঘণ্টা মামার কাছে বসে বসে গল্প করি।' তাঁরা বললেন, 'অতক্ষণ কি বসে থাকা যায়? বাড়ি ফিরে যাও।' ব্যাপারটি দুরূহ মনে হ'ল। আমরা বসে থাকতে রাজী। তাঁরা বসতে দিতে চান না! হতবুদ্ধি ও দুঃখিত বিমনাভাবে ফিরে আসা হ'ল।

পরদিন একখানি 'কথামৃত' 'শ্রীম' আমার নাম লিখে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ধন্য হলাম। আনন্দিত কৃতার্থও হলাম। কিন্তু আশ্চর্য! কি এক কুণ্ঠা সঙ্কোচে আর একদিনও যেতে ভরসা করলাম না। যদি দেখা না হয়। যদি আবার ফিরে আসতে হয়। পরে যদিও বারবার মনে হয়েছে যাওয়া উচিত ছিল। হয়ত এটা একটা আগ্রহের সত্য সত্য পরীক্ষা। হয়ত ঠাকুর এই রকম করে আন্তরিকতার পরীক্ষা গ্রহণ করেন।—কে জানে তা'। যাওয়া হয়নি বিভ্রান্ত মনের দ্বন্দ্বে। কয়েক বছর পরে ৺ফলহারিণী অমাবস্যায় 'শ্রীম' ঠাকুরের চরণে নিবেদিত হলেন।

আবার আসি 'কথামৃতে'র কথায়। চার বছরের সংগ্রহ 'কথামৃত' যে কি জিনিস তা সত্যকারের ভক্তরা আর 'কথামৃত'-লেখকই জানেন। জানতেন। আমার শুধু মনে হয় এই সঞ্চয় সংগ্রহটির মত আর কোন ভক্তিগ্রন্থ বা ভক্তভাষ্য নেই। এর বিশেষত্ব হ'ল তিন চারটি। এটি নীতিগ্রন্থ নয়। নীতিবাক্যের সমষ্টি নয়। এটি কোনো বিধি-নিষেধের আজ্ঞা-অনুজ্ঞা ব্যঞ্জনা করে না। এতে কোনো ধর্ম-অধর্ম পাপ-পুণ্যের স্বর্গ-নরকের প্রলোভন

শাস্তি প্রসাদ পুরস্কার, দণ্ডবিধির তিরস্কার, ব্যবহার-সংহিতা সমাজ গৃহ লোকজীবনের সমস্যা, আচার-আচরণের লৌকিক উপদেশ, শাসন-আদেশ-নির্দেশমূলক কথা—শাস্ত্রবাক্যও নেই। এটি শুধু দেখতে সাধারণ ধরনের বেশবাসপরা এক নরদেবতার মুখের প্রসন্ন প্রশান্ত সরল সরস হাসিতে মধুর, উপমায় অনন্য, কথার আনন্দ ও রসে অভিষিক্ত নির্মল উজ্জ্বল কথামৃত কথা। এক আপন-ভোলা প্রত্যক্ষ-দেখা মানুষের কথা। যার নাম 'কথামৃত' ছাড়া আর কিছুই হতে পারত না। এবং 'কথামৃত' কথাটিও 'কথামৃত'-কারের শ্রীমদ্‌ভাগবত থেকে নেওয়া বা পাওয়া এবং দেশবাসীর এই অমৃতকণিকা মাত্র চার বছরের সম্পদ। 'শ্রীম' যদি আরো যেতেন, যদি আরো আগে দেখা পেতেন, তাঁর কথা শুনতে পেতেন! কত যে আরো পেত বিশ্বজন! 'তপ্তজীবন', সংসার-কলুষ-কল্মষে পীড়িত মানুষ আমরা এই 'শ্রবণমঙ্গল' অমৃতকথা কথামৃত আরো কত পেতাম!

কিন্তু আবার ভাবি তাই বা কেন? যা পেয়েছি তারই কি শেষ আছে? সীমা আছে? তুলনা আছে? যার ব্যঞ্জনা শ্রীমদ্‌ভাগবতের ঐ একটি শ্লোকেই সব ধরা রয়েছে। সাধারণ মানুষ আমাদের কাছে এক কথায় যা 'শ্রবণমঙ্গলম্'। স্মরণমঙ্গলম্, এবং শরণমঙ্গলম্—তাতে যোগ করে দেওয়া হোক!

নিরভিমান নরনারায়ণের কত কথা যে 'কথামৃতে' ধরা আছে। একটির পর একটি পাতা খুলে আজো তাঁর কথা আমরা সাধারণ মানুষ পড়ছি। শুনছি। আর তাঁর ভক্ত সাধু-সন্ন্যাসীরা তার ব্যাখ্যা টীকা ভাষ্যামৃত পরিবেশন করে চলেছেন! এবং এতে আমরা বেদ উপনিষদ পুরাণ ইতিহাস গীতা ভাগবত যেমন পাচ্ছি, অন্য ধর্মের বাইবেল কোরান—লৌকিক ধর্ম অনুষ্ঠান ও তার ব্যাখ্যা এবং সেই সেই ভাবের সাধনা-করা আশ্চর্য অনুভূতির কথাও পাচ্ছি।

আর পাচ্ছি সমসাময়িক জ্ঞানী গুণী ভক্ত সাধক সমাজসংস্কারক লেখক প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক খ্যাত-অখ্যাত নানা ধরনের মানুষদের। ঠাকুরেরও তাঁদের সম্বন্ধে কৌতূহলের শেষ ছিল না যেমন, তেমনি তাঁদেরও আসা যাওয়ার বিরাম ছিল না। তখনো 'শ্রীম'র ঠাকুরের কাছে আসা হয়নি। ঐ নিরভিমান ঠাকুরের মথুরবাবুর সঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে যাওয়া…। কথা, আলাপ, ধর্মপ্রসঙ্গ। বেলঘরিয়ার বাগানে কেশবচন্দ্রের নানা ভক্ত সহ সাধনক্ষেত্রে হৃদয়ের সঙ্গে যাওয়া; ঐ সাধারণ ধরনের মানুষের একটি দুটি কথাতেই কেশবচন্দ্র মুগ্ধ। এক নিমেষেই যেন জহুরীর রত্ন পরীক্ষা হয়ে গেল। ভক্তরাও মোহিত। এই শ্রদ্ধা প্রীতি ভক্তির মধুর সম্পর্ক তাঁর ও কেশবচন্দ্রের মধ্যে আজীবন ছিল।

বিদ্যাসাগরের কাছে যাওয়া—খাল নয়, বিল নয়, সাক্ষাৎ সাগর…। উপমার রাজার মুখের উপমা! লঘু ও গুরু ভাষণে বঙ্কিম-চন্দ্রকেও দেখা গেল অধর সেনের বাড়িতে। শ্রীমধুসূদনকেও দেখে এসেছেন ঠাকুর নির্বাক হয়ে।

আর যেন প্রত্যক্ষ দেখাচ্ছেন 'যত মত তত পথ'। ব্রাহ্মসমাজ, বৈষ্ণবধর্ম-সভাসম্মেলন, কর্তাভজা, নাখোদা মসজিদের 'আ যা মেরে প্যারে' ডাকা-ফকির, ভক্ত দুর্মুখ উগ্র ভৈরব গিরিশচন্দ্র, শ্রীচৈতন্যলীলার বিনোদিনী নটী—এমন কি পথবারনারীকে 'মা' বলে সম্ভাষণ…। ঐ নরদেবতা কাজে ব্যবহারে হাতে-কলমে দেখছেন, দেখাচ্ছেন—সব মানুষই নারায়ণ,

'সব পথই পথ'—সব নদীর গন্তব্যই এক সাগরের অভিমুখে (মহিম্নঃস্তব)। সব ভক্তই—বৈষ্ণবচরণ পদ্মলোচন প্রমুখরা অভিভূত।

'কথামৃতে' প্রত্যক্ষ মানুষের রূপে আচরণে কথায় আলাপে ব্যবহারে—ঐ মূর্তিময় মানুষ-দেবতা ও তাঁর কথামৃত আমাদের 'শ্রবণ-স্মরণ-শরণ-মঙ্গল'-রূপে সব স্তর, শ্রেণীকে একাকার করে অভিভূত করে দিচ্ছেন। 'কথামৃত' বাক্যটিকে অনুবাদ করা যায় কি না, 'পরিভাষিত' হয় কিনা, তা পণ্ডিতেরা ভক্তরা জানেন। আমাদের কাছে 'কথামৃত'-শ্রবণ-স্মরণ যেন প্রসাদের মত, মহাপ্রসাদের মত, হরির লুঠের প্রসাদ-কণিকা পাওয়ার আনন্দ-মহোৎসব।

হাতের মুঠোয় পাওয়া এটি, হাত ভরল কিনা, মনের ক্ষুধা-তৃষ্ণা মিটল কিনা, কেমন আস্বাদ—সে প্রশ্ন, সে সমস্যা কারুর মনে আসে না। 'যত মত তত পথে' পাওয়া-চাওয়ার সব পথ চলেছে। সকলেই পথ পাবেন। পাচ্ছেন। কেউ কারুকে বিপথে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। বাড়ির সব দুয়ারের পথেই সেই যাওয়া, গন্তব্য পাওয়া যাবে। এই হল 'যত মত তত পথ'। 'কথামৃত' সেই মহাপ্রসাদকণিকা। এবং 'কথামৃত'কার বা 'কথামৃত'-লেখক এক আশ্চর্য ভক্তিভাব অনুরাগরসে অভিভূত চিত্তে সেই 'কথামৃত' সঞ্চয় সংগ্রহ করে রাখছিলেন। রেখেছিলেন। কোনো লেখক মুনি-ঋষির মত, মহাকবি সাহিত্যিকের মতই সেই সৃজন সংগ্রহ। অবচেতন মনে সংগ্রহের সঞ্চয়ের এক মহা ইতিহাস। তখন কে জানে তাতে তাঁর খ্যাতি যশ প্রতিষ্ঠা বা ধর্ম-অর্থ-মোক্ষ-লাভ হবে কি না।

কিন্তু অকস্মাৎ সেই 'কথামৃত' গীতা ভাগবতের মত, নানা মহা ধর্মগ্রন্থের মত একটি মহাগ্রন্থ হয়ে গেল চিরকালের ধর্মসাহিত্যে। এবং আত্মগোপনকারী 'শ্রীম' জগদ্বিখ্যাত হয়ে গেলেন। দেখলেন, একবার যো সো করে বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে হয়, আলাপ করতে হয়। তিনিই বলে দেন তাঁর ঐশ্বর্যের কথা, টাকাকড়ি বাগান পুকুরের কথা।

পরিশিষ্টে তখনকার 'ইণ্ডিয়ান নেশনে'র সম্পাদকের 'কথামৃত' ১ম ভাগ পড়ে একটি উক্তি—"এরকম কাজ কোন বাঙালী এবং যতদূর আমরা জানি কোন ভারতবাসীই আগে করেননি। ইতিহাসে একবার মাত্রই এ কাজটি হয়েছে আর তা করেছেন বসওয়েল। কিন্তু সে অমর কৃতি একজন পণ্ডিত ও দয়ালু ব্যক্তির জীবনী মাত্র। আর 'কথামৃত' হল সন্তবাণী-সংগ্রহ।...এর মূল্য অপরিসীম।"

আমরা অবাক বিস্ময়ে দেখছি এক গুরু-শিষ্য-কাব্য। আশ্চর্য বক্তা, কুশলী শ্রোতা। একজন ভাবমুখে কথামৃত বলছেন। অন্যজন অভিভূত চিত্তে শ্রবণ স্মরণ করে চলেছেন।

এ উপমা-অলঙ্কৃত কাব্য নয়। দর্শন নয়। কথাকাহিনী নয়। নীতিবাক্য উপদেশ বিধি-নিষেধ আদেশ-নির্দেশ নয়। সাহিত্যের শাস্ত্রের কোনো সংজ্ঞাই এতে আরোপ করা যায় না।

এ শুধু 'কথামৃত'!

দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়

ডক্টর রমা চৌধুরী

(অষ্টম পর্যায়)

শ্রীকণ্ঠের 'বিশিষ্টশিবাদ্বৈতবাদ'

[পূর্বানুবৃত্তি]

এরূপে শ্রীকণ্ঠের মতে জীব-জগতের সম্বন্ধ হ'ল একটি নূতন অর্থের সম্বন্ধ—যা পূর্বেই বলা হ'ল। কারণ, এটি অভেদবাদ ভেদাভেদবাদ বা ভেদবাদ কোনোটিই নয়। এই নূতন, বিশেষ সম্বন্ধের মাধ্যমে ব্রহ্ম ও জীব-জগৎ স্বভাবতঃ ভিন্ন হয়েও একটি সমগ্র অখণ্ড সত্তা বা 'Concrete organic whole' সৃষ্টি করছেন, যেমন দেহ ও আত্মা স্বভাবতঃ ভিন্ন হয়েও একটি সমগ্র একক ব্যক্তি-সত্তা গঠন করছে, যেহেতু এদের অপর ভিন্ন অস্তিত্বই নেই একেবারেই।

সেজন্য রামানুজের ন্যায় শ্রীকণ্ঠও স্বীয় মতবাদের নাম দিয়েছেন: 'বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ'—অথবা, সাম্প্রদায়িক দিক থেকে 'বিশিষ্টশিবাদ্বৈতবাদ'

'বিশিষ্টশিবাদ্বৈতবাদে'র মূল কথা হ'ল এই যে, ব্রহ্ম ও জীব-জগৎ পরস্পরাশ্রয়িরূপে একটি একক অখণ্ড অবিচ্ছেদ্য সত্তা গঠন করছে—যেক্ষেত্রে ব্রহ্ম আত্মা, জীব-জগৎ দেহ; ব্রহ্ম দ্রব্য, জীব-জগৎ গুণ; ব্রহ্ম কারণ, জীব-জগৎ কার্য। অথচ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উভয়ে উভয়ের থেকে অর্থাৎ ব্রহ্ম জীব-জগৎ থেকে এবং জীব-জগৎ ব্রহ্ম থেকে স্বভাবতঃই ভিন্ন। সেজন্য আমরা পরিশেষে এই অদ্ভুত তত্ত্বটিই পাচ্ছি যে, দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু, স্বভাবতঃ ভিন্ন বস্তু, 'যেন তেন প্রকারেণ' একটি একক অখণ্ড অবিচ্ছেদ্য সত্তা গঠন করছে—এমন ঘনিষ্ঠতম ভাবে যে, একে অন্যকে বাদ দিয়ে থাকতেই পারে না।

সামান্য চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, রামানুজের ন্যায়, শ্রীকণ্ঠের মতবাদও এইদিক থেকে সম্পূর্ণই অযৌক্তিক। প্রথমতঃ, তিনি নিজেও পরিণামবাদী; এবং সেজন্য তাঁর মতেও স্বয়ং ব্রহ্মই জীব-জগতে লীলাভরে আনন্দ-সহকারে পরিণত রূপায়িত হয়েছেন; এবং সেক্ষেত্রে, কারণ ব্রহ্ম ও কার্য জীব-জগৎ স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন হতে বাধ্য। সেজন্য স্বীকার করতেই হয় যে, ব্রহ্ম ও জীব-জগৎ পরস্পর-সম্পূর্ণ-ভিন্ন সত্তা একেবারেই নয়, বরং ঠিক তার বিপরীত। অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা যে মূলীভূত তত্ত্ব অর্থাৎ 'স্বরূপতা', সেই 'স্বরূপে'র দিক থেকেই এই ত্রিতত্ত্ব একতত্ত্বে পর্যবসিত হয়েছে অনিবার্যভাবেই। অর্থাৎ জীব-জগৎও ব্রহ্মে পর্যবসিত হয়েছে, ব্রহ্মস্বরূপ হয়েছে। পরিণামবাদ একবার স্বীকার ক'রে নিলে ব্রহ্ম ও জীব-জগতের এই স্বরূপতঃ অভিন্নত্ব—কোনো বিশেষ অর্থে নয়, সাধারণ সহজ সরল সোজাসুজি খোলাখুলি আক্ষরিক প্রকৃত প্রকৃষ্ট অর্থেই— অবশ্যস্বীকার্য। সেক্ষেত্রে পুনরায় 'ভেদশ্চ স্বাভাবিকঃ' (২।১।২২—উপরে দেখুন।)— তাদের মধ্যে ভেদ স্বাভাবিক বা স্বভাবগত বলা যায় কিরূপে—যেক্ষেত্রে পরিণামবাদমতে অভেদই স্বাভাবিক বা স্বভাবগত বা স্বরূপগত?

দ্বিতীয়তঃ 'অভেদ'কেই বা আক্ষরিক অর্থে না ধ'রে একটি বিশেষ অভিনব নূতন অর্থেই অর্থাৎ 'অচ্ছেদ্যত্ব' অর্থেই ধরা হবে

কেন? উপরে প্রপঞ্চিত 'পরিণামবাদ'মতে ত 'অভেদে'র অর্থ এস্থলে সত্য সত্যই 'অভেদ'ই—সোজাসুজি খোলাখুলি আক্ষরিক অর্থেই 'অভেদ'—যেহেতু, কারণ ও কার্য যে স্বরূপতঃ অভিন্ন, তা ত পূর্বে বহুবার বলা হয়েছে, এবং তা সর্বজনবিদিত সত্য। তা হ'লে কারণ ব্রহ্ম এবং কার্য জীব-জগৎকে স্বরূপতঃ অভিন্ন ব'লে সোজাসুজি না ধ'রে 'অভেদ' শব্দটিকে হঠাৎ 'পরস্পরাশ্রয়িত্ব' বা 'অচ্ছেদ্যত্ব' ব'লে ধরা ত একেবারেই অযৌক্তিক। কারণ ও কার্য নিশ্চয়ই 'পরস্পরাশ্রয়ী' এবং 'অচ্ছেদ্য' বন্ধনে আবদ্ধ; কিন্তু তারও উপরে কথা হ'ল এই যে, তারা স্বরূপতঃ অভিন্ন। সুতরাং কারণ-কার্য-সম্বন্ধের মধ্যে এই প্রকৃত প্রকৃষ্ট মূলীভূত তত্ত্বটিকে বাদ দিয়ে অকারণে অন্য তত্ত্ব আনা কি যুক্তিসঙ্গত? নিশ্চয়ই নয়।

তৃতীয়তঃ, ব্রহ্ম এবং জীব-জগৎ যদি সত্যই এইভাবে স্বভাবভিন্ন হতেন, তা হ'লে তাঁদের সহাবস্থিতি এবং মিলেমিশে একটি একক অখণ্ড অবিচ্ছেদ্য সত্তা গঠনও অসম্ভব হ'ত সম্পূর্ণরূপেই একেবারেই। বস্তুতঃ, দেহ-আত্মার উদাহরণ ব্যতীত অন্যান্য দুটি উদাহরণে কিন্তু 'অভেদত্ব'কে অভেদস্বরূপেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যেমন কারণ ও কার্য স্বরূপতঃ অভিন্ন, গুণতঃ ভিন্ন। একই কথা প্রযোজ্য দ্রব্য-গুণরূপ উদাহরণেরও ক্ষেত্রে। সেক্ষেত্রে কারণ ও কার্য দুটি স্বভাবতঃ ভিন্ন বস্তু হয়েও এরূপ সুদৃঢ় অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ কিরূপে হবে? তদুপরি ব্রহ্ম অংশী, জীব-জগৎ তাঁর অংশস্বরূপ। কিন্তু অংশী ও অংশ ত স্বভাবতঃ স্বরূপতঃ ভিন্ন হতে পারে না। সুতরাং একটি সমগ্র অংশীতে তারই বিরুদ্ধস্বভাব অংশসমূহ থাকবে কিরূপে?

বস্তুতঃ ভেদ ও অভেদকে একত্রে সমন্বিত করার প্রচেষ্টা বিস্তারিতভাবে আরম্ভ হয়েছে সুপ্রসিদ্ধ রামানুজীয় বেদান্ত-দর্শনে; এবং আমরা তখন দেখেছি যে, অত সাহসী কুশলী নির্ভীক বীর রামানুজও ব্যর্থ হয়েছেন তাঁর সাধু সংকল্পকে কার্যে রূপায়িত করতে। সেক্ষেত্রে রামানুজের অপেক্ষা সর্বদিক থেকেই ন্যূনতর শ্রীকণ্ঠও যে এই দিক থেকে ব্যর্থতর হবেন, তা আর আশ্চর্যের বিষয় কি!

মোক্ষের কথা আলোচনাকালে শ্রীকণ্ঠ সানন্দে বলেছেন যে, মোক্ষের অর্থ এই:

প্রথমতঃ 'পাশবিচ্ছেদঃ' এবং 'পশুত্ব-নিবৃত্তিঃ' তারপরে 'শিবত্ব-লাভঃ'। 'পাশ-বিচ্ছেদঃ'-এর অর্থ হ'ল—সংসারপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করা। কারণ, যে যাই বলুক না কেন, এই ক্ষুদ্র-সঙ্কীর্ণ সংসারে আবদ্ধ থাকায় আমরা সেই ভূমা মহানকে স্পর্শ করতে পারছি না। কি দিয়ে আমরা এই শোক-শঙ্কাসঙ্কটসমাচ্ছন্ন সংসারে আবদ্ধ? আমাদের নিজেদেরই অজ্ঞান ও বাসনা-কামনা দিয়ে। এই ভয়াবহ অবস্থায় আমরা আমাদের অন্ত-র্নিহিত মনুষ্যত্ব অথবা দেবত্ব হারিয়ে, 'পশুত্ব' প্রাপ্ত হই, 'পশু' হয়ে যাই। সেজন্য সেই অজ্ঞান ও বাসনাকামনাসৃষ্ট 'পাশ' বা বন্ধন ছিন্ন ক'রে তজ্জনিত 'পশুত্ব'কে ধ্বংস করাই হ'ল মোক্ষের নঙর্থক (নেগেটিভ্) দিক; এবং এর সদর্থক (পসিটিভ্) দিক হ'ল 'শিবত্ব-লাভ'। এই প্রসঙ্গে শ্রীকণ্ঠ বলছেন:

'নিরবধিক-পরমানন্দময়-নিষ্কলঙ্ক-শিবত্ব-প্রাপ্তির্হি মুক্তিঃ। শিবত্বপ্রাপ্তিরাত্মনঃ পশুত্ব-নিবৃত্তিমন্তরেণ ন সম্ভবতি।' (ব্রঃ সূঃ ৪।১।১৩, শ্রীকণ্ঠভাষ্য) অর্থাৎ নিরবধিক পরমানন্দময় নিষ্কলঙ্ক শিবত্বপ্রাপ্তিই হ'ল 'মুক্তি'। কিন্তু জীবের 'পশুত্ব'-এর নিবৃত্তি না হ'লে (সঙ্কীর্ণ অহং-মমত্বের বিনাশ না হ'লে) শিবত্ব-প্রাপ্তি

অসম্ভব।

মুক্তি বা শিবত্ব-প্রাপ্তির অর্থ হ'ল—শিব-সদৃশ হওয়া বা শিবসাম্য লাভ করা—

'শিবত্বং নাম নিখিল-মল-সংস্পর্শ-রহিত-নিরতিশয়-মঙ্গলাস্পদত্বরূপং শিবসদৃশ-স্বভাবত্বম্।' (ঐ, ৪।৪।৯) তাৎপর্য এই যে, মুক্তজীবও শিবের বা ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নতা প্রাপ্ত হন না, কেবলমাত্র সাদৃশ্যই প্রাপ্ত হন। মুক্তি জীবের ক্ষুদ্র অহং-মম-ভাবের বিনাশ নিঃসন্দেহে, কিন্তু প্রকৃত জীবত্ব বা মনুষ্যত্বের বিনাশ নয়,—পরিপূর্ণ বিকাশ। সেজন্য ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন, ব্রহ্মসদৃশ মুক্তজীব তাঁর প্রকৃত স্বরূপ বা জীবত্বের পরিপূর্ণ অবস্থা অনুভব ক'রে, ধন্যাতিধন্য হন—

'পরিপূর্ণম্ অহংভাবং প্রকটম্ অনুভবতি।' বলাই বাহুল্য যে, এই 'অহংভাব' বদ্ধজীবের সঙ্কীর্ণ স্বার্থপর প্রাকৃত অহঙ্কার নয়—কিন্তু অপ্রাকৃত, প্রপঞ্চভাগী বা সার্বজনীন অহঙ্কার।

এরূপ 'ব্রহ্মসাদৃশ্যে'র কথা শ্রীকণ্ঠ বারংবার বলেছেন—

'অতস্তদুপাসনাজন্যং মুক্তিফলরূপমাগন্তুকম্—ইতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে— ব্রহ্মপ্রাপ্তজীবস্য মলতিরোহিতং ব্রহ্মসদৃশগুণং স্বরূপং পূর্বং সদেব মলাবরণাপগমাদাবির্ভবতি… ন কর্মফলবদুৎপদ্যতে।' (৪।৪।১) তাৎপর্য এই যে, যদি বলা হয় যে, মুক্তিলাভ হয় উপাসনার মাধ্যমে—সেজন্য মুক্তি নিত্য নয়, আগন্তুক বা অনিত্য কর্মসৃষ্ট ফলই মাত্র—তা হ'লে আমরা বলব—জীব সর্বদাই ব্রহ্মসদৃশ, ব্রহ্মের তুল্য স্বরূপ ও গুণবিশিষ্ট—এবং তার সেই পূর্বের ব্রহ্মসদৃশ স্বরূপ ও গুণই মলাবরণ অপসারিত হ'লে প্রকটিত হয় মাত্র—নূতন ক'রে কর্মের ফলরূপে সৃষ্ট হয় না।

মুক্তি যে নিত্য—এটিও একটি মূলীভূত বেদান্ত-তত্ত্ব—জীব নিত্যমুক্ত; এবং সেজন্য সাধনাদির মাধ্যমে জীবের সেই নিত্যমুক্তত্ব প্রকটিত হয় মাত্র, নূতন ফলরূপে সৃষ্ট হয় না।

যখন এইভাবে মুক্ত জীব ব্রহ্মসদৃশ হয়ে ব্রহ্মের স্বরূপ ও গুণ লাভ করেন, তখন স্বভাবতঃই তিনি শিবের পূর্বোল্লিখিত (১।১।২) ছয়টি গুণ প্রাপ্ত হন—

'শিবত্বং নাম শিবসদৃশস্বভাবত্বম্। সর্বজ্ঞত্বাদিরিহ শিবস্য স্বভাবঃ। অতোঽস্য মুক্তস্য শিবসদৃশস্য সর্বজ্ঞত্বম্ অনাদিবোধত্বং নিত্যতৃপ্তত্বং স্বতন্ত্রত্বং সর্বশক্তিমত্ত্বম্ অলুপ্তশক্তিকত্বম্ অনন্তশক্তিত্বং চেতি।' (৪।৪।৯) অর্থাৎ শিবসদৃশ মুক্তজীবও শিবেরই ন্যায় সাতটি গুণ প্রাপ্ত হন—সর্বজ্ঞত্ব, অনাদিবোধত্ব, নিত্যতৃপ্তত্ব, স্বতন্ত্রত্ব, সর্বশক্তিমত্ত্ব, অলুপ্তশক্তিকত্ব ও অনন্তশক্তিমত্ত্ব।

এই সূত্রে অবশ্য সাতটি গুণের কথা বলা আছে; কিন্তু ১।১।২ সূত্রে ছয়টি গুণের কথা বলা আছে—'সর্বশক্তিমত্ত্বম্'-এর কথা বলা নেই, এবং অন্যান্য স্থানেও ঠিক তাই (পৃঃ ২৪৬)।

সে যাহোক, ব্রহ্মসদৃশ মুক্তজীব কেবল একটি মাত্র বিষয়ে ব্রহ্ম থেকে ভিন্নই থাকেন—অন্য সববিষয়েই ব্রহ্ম-সমতুল হন। অর্থাৎ তিনি 'অনন্তশক্তিমান' হ'লেও তাঁর ব্রহ্মতুল্য একটি মাত্র শক্তি নেই—অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মের ন্যায় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সম্পাদিত করতে পারেন না—কারণ সেক্ষেত্রে বহু ঈশ্বর-বাদ এসে পড়বে এবং অতগুলি মুক্তজীব সমানে সৃষ্টিস্থিতিলয় ক'রে চললে বিষম গণ্ডগোল ও বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হবে অনিবার্য-ভাবেই। সেজন্য শ্রীকণ্ঠ বলছেন যে, মুক্তজীব ব্রহ্মসদৃশ এই অর্থে যে, তিনি ব্রহ্মের স্বরূপ-গুণ-শক্তিতে (সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-সম্পাদন-শক্তি ব্যতীত অন্য সকল শক্তি) বিভূষিত হয়ে ব্রহ্মের ন্যায়ই

সত্যকাম সত্যসংকল্প হন—সকল বস্তু ভোগ করেন স্ব-ইচ্ছানুসারে—

'মুক্তস্তু ব্রহ্মণা সাম্যং সকলকামভোগ-মাত্রাদেব, ন জগৎস্রষ্ট্যাদিনা। তথা সতি, বহ্বীশ্বরপ্রসঙ্গাৎ।' (৪।৪।২১)

এই প্রসঙ্গে শ্রীকণ্ঠ-বেদান্তের একটি বৈশিষ্ট্য ও অভিনবত্ব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সেটি হ'ল এই—রামানুজ-নিম্বার্কাদি অন্যান্য সকল ত্রিতত্ত্ববাদী বৈদান্তিকের মতে ব্রহ্মসদৃশ মুক্তজীব দু'বিষয়ে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন—যথা, ব্রহ্ম বিভু, মুক্ত-জীব অণু; ব্রহ্ম সৃষ্টিস্থিতিলয়সম্পাদনশক্তি-বিশিষ্ট, মুক্তজীব ঈদৃশশক্তিবিহীন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শ্রীকণ্ঠ একাকীই বলেছেন যে, মুক্তজীব বিভু—

'অতো মুক্তানাং শিবৈকরসানাং ব্যাপকত্ব-মস্ত্যেব।' (৪।৪।১৫)

'অতো মুক্তানাং বিভুত্বমিতি।' (৪।৪।১৫)

এরূপে, শ্রীকণ্ঠের মতে-

(১) মুক্তজীব স্বরূপতঃ ও গুণতঃ ব্রহ্ম বা শিবের সঙ্গে এক ও অভিন্ন

(২) মুক্তজীব সকল কামভোগের দিক থেকেও ব্রহ্ম বা শিবের সঙ্গে এক ও অভিন্ন।

(৩) মুক্তজীব ব্রহ্ম বা শিবের সমতুল দিব্যদেহধারীরূপেও তাঁর সঙ্গে এক ও অভিন্ন। এই দিব্যদেহ বা রূপ হল ত্রিলোচন, নীলকণ্ঠাদিরূপ, এবং মুক্তজীবের শ্রেষ্ঠ গৌরব হ'ল শিবের এই সকল মূর্তি ধারণ করা (৪।৪।২২)।

(৪) মুক্তজীব শিবের বা ব্রহ্মের সকল গুণও প্রাপ্ত হন।

(৫) মুক্তজীব ব্রহ্ম বা শিব থেকে ভিন্ন এই জন্য যে, তাঁর স্রষ্ট্যাদি শক্তি নেই।

(৬) সেজন্যই মুক্তজীব ব্রহ্মসদৃশ. ব্রহ্মের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে এক ও অভিন্ন নন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীকণ্ঠের আরেকটি বিশেষত্ব লক্ষণীয়। সেটি হ'ল এই যে, রামানুজ-নিম্বার্ক প্রমুখ ত্রিতত্ত্ববাদিগণের ন্যায় শ্রীকণ্ঠ কেবলই বিদেহমুক্তিবাদী নন, সেই সঙ্গে, জীবন্মুক্তিবাদীও সমভাবে। ৪।২।১৬ সূত্র-ভাষ্যে শ্রীকণ্ঠ বিদেহমুক্তিবাদের কথা সুস্পষ্ট ভাবে বলেছেন। কিন্তু ৪।৪।১৬ সূত্রভাষ্যে তিনি তুল্য স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, জীবিত অবস্থাতেই মুক্তি সম্ভবপর।

'তস্য জীবত এব মুক্তস্য ব্রহ্মণশ্চ তুল্য এবানন্দঃ।' (৪।৪।১৬) অর্থাৎ জীবিত অবস্থাতেই মুক্তের ব্রহ্মতুল্য আনন্দ লাভ হয়। তাৎপর্য এই যে, প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান লাভ হ'লে বদ্ধজীবের সমস্ত অজ্ঞানাবরণ, বাসনা-কামনা বিদূরিত হয় সত্য। তথাপি প্রারব্ধ কর্মের ফলস্বরূপ যে বর্তমান দেহ, তা'ত থেকেই যায়; এই বর্তমান পৃথিবীতেও তিনি পূর্ববৎ বসবাস করতে থাকেন। সেজন্য এক্ষেত্রে বিদেহমুক্তিই একমাত্র উপায় এবং সেজন্য মৃত্যুর পরে এই বর্তমান দেহ ধ্বংস হয়ে গেলে, তিনি প্রকৃত মুক্তি লাভ করেন।

অপর পক্ষে, যদি তাঁর সাধনা এরূপ অধিক শক্তিশালী ও ফলপ্রসূ হয় যে, সাধকের বা মুমুক্ষুর সমস্ত অজ্ঞান এরূপভাবে সমূলে বিনষ্ট ক'রে দিতে পারে যে, বর্তমান দেহধারী হয়েও বর্তমান জগতে বসবাস ক'রেও তিনি দেহমনের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন না, সংসারের দ্বারা পরিচালিত হন না—তা হ'লে তিনি জীবিত অবস্থাতেই—এই দেহেই, এই সংসারেই তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করেন অনায়াসে।

পরিশেষে একটি প্রশ্ন—মুক্তির সাধন কি? এক্ষেত্রে শ্রীকণ্ঠের মতবাদ অন্যান্য ত্রিতত্ত্ববাদী ও ভক্তিবাদী বৈদান্তিকেরই সমতুল।

শ্রীকণ্ঠের মতেও ধর্মজিজ্ঞাসার পরেই, পূর্বে নয়, ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হয়। ধর্ম বা নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে চিত্তশুদ্ধি হয়, এবং বিশুদ্ধ চিত্তেই জ্ঞান ও ভক্তির উদ্ভব হতে পারে। সেজন্য চিত্তশুদ্ধিই সাধনমার্গের প্রথম সোপান।

কিন্তু কর্ম মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধন নয়, জ্ঞানই মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধন—

'সাক্ষাৎ জ্ঞানফলমেব মোক্ষঃ।' (৩।৪।২৬)।

পুনরায়, জ্ঞান ধ্যানস্বরূপ—

'অত উপাসনারূপ-জ্ঞান-মোক্ষফলং বিধীয়তে।'

শ্রীকণ্ঠের মতে জ্ঞান থেকে ভক্তি, ভক্তি থেকে উপাসনা, উপাসনা থেকে ঈশ্বরপ্রসাদ, ঈশ্বরপ্রসাদ থেকে সাক্ষাৎকার এবং তার থেকে মুক্তি—এই হ'ল মোক্ষপ্রণালী। মুমুক্ষু শ্রবণ-মননের সাহায্যে ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানলাভ ক'রে, নিদিধ্যাসনের মাধ্যমে ব্রহ্মের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন এবং পরিশেষে তাঁর কৃপা লাভ ক'রে তাঁরই দর্শন প্রাপ্ত হয়ে মুক্ত হন।

বিভিন্ন প্রকারের উপাসনা বিভিন্ন ভাবে ফলপ্রসূ হয়। যথা—

(১) স্বরূপোপাসনা বা কারণোপাসনা। এস্থলে মুমুক্ষু শ্রীভগবানের স্বরূপ ধ্যান করেন, তাঁকে স্বীয় আত্মার সঙ্গে অভিন্নরূপে উপাসনা করেন এবং শিবত্ব প্রাপ্ত হন। (৪।১।৩)

(২) এতদ্ব্যতীত উপনিষদসমূহে সুন্দর ভাবে প্রপঞ্চিত পরাবিদ্যাসমূহও ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মুক্তির সাধন।

(৩) পরব্রহ্ম শিবের উপাদানস্বরূপ বিষ্ণুর উপাসকগণ প্রথমে বিষ্ণুকে, তারপরে শিবকে লাভ করেন। (৪।৩।১৫)

(৪) ভোক্তৃ-ভোগ্যোপাসনা বা কার্যোপাসনা বিলম্বে মোক্ষলাভ ও ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন।

(৫) প্রতীকোপাসনা মোক্ষলাভের সাধন নয়। (৪।১।৪)

তাত্ত্বিক দিক থেকে অবশ্য শ্রীকণ্ঠের বেদান্ত-মতবাদ নূতন বিশেষ কিছুই প্রপঞ্চিত করতে পারেনি, কারণ রামানুজের 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের দিক থেকে এবং শ্রীকণ্ঠের 'বিশিষ্টশিবাদ্বৈতবাদ' শৈব সম্প্রদায়ের দিক থেকে প্রায় একই মতবাদ, দু' একটি বিষয় এবং সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য ব্যতীত। তা সত্ত্বেও প্রখ্যাত 'দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়ে'র মধ্যে শ্রীকণ্ঠের 'বিশিষ্ট-শিবাদ্বৈতবাদ' একটি বিশেষ ও স্বতন্ত্র স্থান করে নিয়েছে স্বমহিমা-গরিমা-মধুরিমায়; এবং পূর্বেই যা বলা হয়েছে, তাঁর জীবন-সাধনা ছিল শৈব-বেদান্ত-দর্শনকে বেদান্ত-দর্শনের উদার-উন্মুক্ত ক্ষেত্রে সগৌরবে স্থাপিত করা; এবং তাঁর একটিমাত্র জ্ঞাত গ্রন্থের দ্বারাই তিনি এই দুরূহ কার্য অনায়াসে সুসম্পন্ন করতে পেরেছিলেন সাদরে সানন্দে সশ্রদ্ধায় সুনিপুণভাবে।

বস্তুতঃ শ্রীকণ্ঠ-বেদান্তে আমাদের যা সর্বাপেক্ষা আকৃষ্ট মুগ্ধ তৃপ্ত ও বিস্ময়াম্বিত করে, তা হ'ল তাঁর অনমনীয় সাহস এবং আত্ম-বিশ্বাস। তাঁর পূর্বে ভারতভূমি, বিশেষ ক'রে, ভারতীয় দর্শন, তার মধ্যেও বিশেষ ক'রে বেদান্ত-দর্শনের পুণ্য-যজ্ঞভূমিতে সানন্দে লীলা ক'রে গিয়েছেন কত সহস্র সহস্র পুণ্যশ্লোক ধন্যজীবন অনন্যচরিত্র জ্ঞানিগুণিসাধকভক্ত, তাঁদের অনির্বাণ সুবর্ণালোক চতুর্দিকে বিকীর্ণ ক'রে, তাঁদের অফুরন্ত মধু চতুর্দিকে বর্ষিত ক'রে, তাঁদের অজস্র সৌরভ চতুর্দিকে বিস্তৃত ক'রে। তাঁদের মধ্যেও স্বীয় সার্থক স্থানটি ক'রে নিতে অকুতোভয়ে অগ্রসর হয়ে এসেছেন শৈবাচার্য শ্রীকণ্ঠ—কোনো দ্বিধা না ক'রে, কোনো সন্দেহ না মনে রেখে, কোনো

নৈরাশ্য না হৃদয়ে স্থান দিয়ে। বিশেষ ক'রে, বেদান্ত-দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁর বিপক্ষীয় ও পক্ষীয় ছিলেন দুই বিশ্ববিশ্রুত পুরুষ—শঙ্কর ও রামানুজ, যাঁদের অপূর্ব উপলব্ধি, ধীশক্তি এবং তর্ক-বিচারশক্তির তুলনা আজও জগতে অতি অল্পই আছে। সেজন্য বিপক্ষীয়দের ধ্বংস করা এবং স্বপক্ষীয়দের সঞ্জীবিত করা—এই দুটি পুণ্যকর্মের মধ্যে বিশেষ কিছুই করার ছিল না অবশিষ্ট, যেহেতু দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, অদম্য বীর রামানুজই সব কিছু করণীয় প্রায় ক'রেই রেখেছিলেন তাঁর অনমনীয় দৃঢ় দৃপ্ত লেখনী দিয়ে—পরপক্ষকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তীক্ষ্ণাতি-তীক্ষ্ণ যুক্তির শরে ছিন্নভিন্ন ক'রে এবং স্বপক্ষকে তুল্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে, তুল্য ক্ষিপ্রাতিক্ষিপ্র যুক্তির প্রবল বায়ুতে সঞ্জীবিত ক'রে। তা হ'লে শ্রীকণ্ঠের করবার রইল আর কি? তথাপি স্বশক্তি স্ববৈশিষ্ট্য স্বনূতনত্বে পূর্ণ বিশ্বাসী শ্রীকণ্ঠ জগৎকে নূতন কিছু দান করবেন, এই সুকঠিন সংকল্প ও সুদৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে যেভাবে অসমসাহসে লক্ষ্যপথে অগ্রসর হয়েছিলেন, তা সত্যই অতি বিস্ময়জনক। ফলে আমরা পেয়েছি একটি অভিনব নূতন দর্শন, যা বহুলাংশে রামানুজীয় দর্শনের অনুরূপ হলেও তার ছায়া-মাত্রই নয়, পুনরাবৃত্তিমাত্রই নয়, প্রতিচ্ছবিমাত্রই নয়—কিন্তু সত্যই একটি নব-দান, নব-সম্ভার, নব-সংযোজন।

দর্শন-ধর্ম-নীতিতত্ত্ব—প্রত্যেক দিক থেকেই এই শ্রীকণ্ঠ-বেদান্ত মহীয়ান। তার ভাষার সৌন্দর্য, অনুভূতির মাধুর্য ও ভাবের ঐশ্বর্য সত্যই অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর।

রসিকের কাহিনী

স্বামী চেতনানন্দ

রসিকের কথা শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘান্তর্গত ভক্ত-জন ছাড়া প্রায় সবাই ভুলে গেছে। ভুলে যাবারই কথা। কারণ? কারণ বহু। মানুষের কাছে সে ছিল ঘৃণ্য। সমাজে সে দরিদ্র, অস্পৃশ্য ও অবহেলিত। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলানাট্যে সে স্টেজের বাইরে পার্ট করেছে। স্টেজে ঢুকবার অধিকার তার ছিল না। রসিক দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পথ সাফ করেছে; দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-চত্বরে ঝাড়ু লাগিয়েছে; সে ময়লা সাফ করেছে। লোকচক্ষুর অন্তরালেই সে জীবন কাটিয়েছিল। তাই তাকে না চিনবারই কথা। সেও বড় একটা কাউকে চিনত না। কারণ তার পেশা। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের মেথর। তার মাসিক বেতন নিশ্চয়ই এক টাকার বেশী ছিল না, কারণ যেখানে পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণের মাসিক বেতন ছিল মাত্র পাঁচ টাকা। যাহোক নিঃসন্দেহে সে চিনত একজনকে—'অচিন গাছ'কে।

বোঝা—ভুল বোঝা—না-বোঝা—এসব বোঝা-বুঝির বুচকি রসিককে বইতে হয়নি রসজ্ঞ পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায়। "আমি না ধরা দিলে কি পারিস ধরিতে?" এ বড় সত্যি কথা। শাস্ত্র-জপ-তপ-ধ্যান-ধারণার দ্বারা ভগবানকে ধরতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।

অচিন গাছকে চেনা মুস্কিল। রসিক কিন্তু চিনেছিল। সে চিনেছিল বিদ্যা-বুদ্ধির দ্বারা

নয়, সরলতার দ্বারা। যারা ধার্মিক তারা সরল। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সরলতার প্রতিমূর্তি। তাঁর মুখের দিকে তাকালে বা কথামৃত পাঠ করলে বোঝা যায় তিনি কী অপূর্ব সরল ছিলেন। কোথাও ঘাঁটঘোঁট নেই। পণ্ডিতেরা বুদ্ধির মারপ্যাচে ধর্মটাকে জটিল করে দিয়েছে। আমরাই মিথ্যা, শঠতা, ক্রূরতা, পলিটিকসের ফাঁসে নিজেদের গলা আটকে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছি। নিজেদের বুদ্ধিকে ধিক্কার দিচ্ছি। সা চাতুরী চাতুরী—যে চতুরতা ভগবানকে পাইয়ে দেয় সেই বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ।

"সরল না হলে ঈশ্বরের কৃপা হয় না।" এই কৃপার কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী 'সৎপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে (২য় খণ্ড, পৃঃ ৫০): রামলালদাদার কাছে শুনেছি রসিকের প্রতি ঠাকুরের অহৈতুকী কৃপার কথা। দক্ষিণেশ্বরের বাগানে রসিক নামে একজন মেথর ছিল। ঠাকুরকে সে দেখত প্রত্যহ দূর থেকে। কত লোক তাঁর কাছে আসছে যাচ্ছে। রসিক ভাবত: আমি এমন কী পাপ ক'রে এসেছি যে এত কাছে থাকতেও যেতে পারি না ওঁর কাছে। তাঁর কাছে কত পাপী-তাপী যাচ্ছে; সবাইকে তিনি উদ্ধার করছেন। আর আমার কি দুর্ভাগ্য! তাঁর চরণধূলাও নিতে পারি না—দক্ষিণেশ্বরে বাস ক'রেও। দূর থেকে দেখা যায়, কাছে যেতে পাই না। মনের ভেতর তাই ঝড় বইছে, প্রাণে শান্তি নেই। এইভাবে দু-চার বছর গেল। অবশেষে একদিন শুভ মুহূর্তের উদয় হ'ল। রামলালদাদা দাঁড়িয়ে আছেন। ঠাকুর শৌচে গেছেন, এখনই ফিরবেন। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রসিক ভাবছে: আজ ভাগ্যে যা থাক, আর সহ্য করতে পারছি না। নহবতখানার এদিকে আসতেই তাঁর পা দুখানি জড়িয়ে ধ'রে বললে, "আমার কী হবে?" কথাটা এইভাবে বলতেই ঠাকুর চমকে উঠেছেন। তারপর সমাধি। এমনি করে বহুক্ষণ কেটে গেল। রসিক চোখের জলে পা ধোয়াচ্ছে। প্রাণের ভেতর থেকে তার সমস্ত গ্লানি, সমস্ত জ্বালা ধুয়ে যাচ্ছে। সমাধি থেকে নেমে তার মাথায় হাত দিয়ে ঠাকুর বললেন, "তোর সব হল"।

"সরলের কাছে তিনি খুব সহজ।" দীনহীন কাঙালের বেশে শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা জীবের ঘরে ঘরে। প্রত্যক্ষদর্শী কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্ণনায় রয়েছে: "রসিক (রস্কে হাড়ি) দক্ষিণেশ্বর গ্রামেরই লোক (মেথর) ছিল। ঠাকুরকে তার সঙ্গেও হেসে কথা কইতে শুনেছি—তারই খোলা উঠানে দাঁড়িয়ে। যেন বন্ধুর সঙ্গে কথা হচ্ছে। ঠাকুর হাসতে হাসতে বলতেন, 'থাক্ বুঝেছি, মদটা একটু কম করে খাস।' সে লুটিয়ে পড়ে বলতো, 'কে দেবে ঠাকুর, ভাগ্যে নটবর পাঁজার মা মরেছিল! কাদের মা আর রোজ মরছে? আমি মলে মরবে।'" (উদ্বোধন ৫০ বর্ষ, পৃঃ ৭২)

খ্রীস্টোফার ইশারউডের একটা কথা মনে পড়ছে: "A great guru is first and foremost a great disciple." শ্রীরামকৃষ্ণ তার উজ্জ্বল উদাহরণ। 'যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি।' শ্রীরামকৃষ্ণ ক্রমাগত শিখতেন। হৃদয়দুয়ার তিনি কোনদিন বন্ধ করে রাখেননি। মেথর, মাতাল, সার্কাসের বিবি—সবার কাছ থেকেই তিনি শিক্ষা গ্রহণ করতেন। সেজন্য তাঁর শিক্ষায় একঘেয়েমি নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে রসিকের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এ ইতিহাস এখন লুপ্ত বা লুক্কায়িত

রয়ে গেছে

ধ্যানকালে শ্রীরামকৃষ্ণের মন ছুটে গেছে রসিকের বাড়ী—একথা শুনে পাঠক হয়তো আঁতকে উঠবেন। তবে শুনুন তাঁর আত্মকথা: "সেই চিৎশক্তি, সেই মহামায়া, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হ'য়ে রয়েছেন। আমি ধ্যান করছিলাম; ধ্যান করতে করতে মন চলে গেল রস্‌কের বাড়ী! রস্‌কে ম্যাথর। মনকে বললুম, থাক শালা ঐখানেই থাক। মা দেখিয়ে দিলেন, ওর বাড়ীর লোকজন সব বেড়াচ্ছে, খোল মাত্র, ভিতরে সেই এক কুল-কুণ্ডলিনী, এক ষট্‌চক্র।" (কথামৃত ৫ম, পৃঃ ৯৮)

শ্রীরামকৃষ্ণ ধ্যানযোগে মনকে রসিকের বাড়ীতে পাঠিয়ে ক্ষান্ত হননি। তমিস্রা রজনীতে সশরীরে রসিকের বাড়ীর নোংরা স্থানে শুরু করেছেন এক উগ্র তপস্যা। এ তপস্যার কথা মন্দিরের লোকরা জানত না। জানলে দারুণ হট্টগোল শুরু হ'ত। অবশ্য যিনি অষ্টপাশ (লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাতি, কুল, শীল, শোক ও নিন্দা) ছিন্ন করবার জন্য মরিয়া, তিনি কি আর মানুষের সমালোচনা গ্রাহ্য করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ একে ব্রাহ্মণ, তারপর আবার কালী মন্দিরের পূজারী। "প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থে লিখিত আছে, যদি ব্রাহ্মণ হঠাৎ এরূপ নীচজাতির মুখ দেখে ফেলে, তবে তাকে সারাদিন উপবাসী থেকে এক হাজার গায়ত্রী জপ করতে হবে। এ সকল শাস্ত্রীয় নিষেধবাক্য সত্ত্বেও এই ব্রাহ্মণোত্তম যে-স্থানে বসে নীচজাতিরা আহার করে, সে-স্থান পরিষ্কার করতেন, তাদের ভুক্তাবশেষ ভগবৎ-প্রসাদজ্ঞানে গ্রহণ করতেন। শুধু কি তাই, রাত্রে গোপনে উঠে ময়লা পরিষ্কার করে অস্পৃশ্যদের সঙ্গে নিজের সমত্ব বোধ করবার চেষ্টা করতেন।" (মদীয় আচার্যদেব, বাণী ও রচনা ৮।৩৯৪)

স্বামীজী My Master বক্তৃতায় আরও বলেছেন, "My Master would go to a Pariah and ask to be allowed to clean his house...The Pariah would not permit it; so in the dead of night, when all were sleeping, Ramakrishna would enter the house. He had long hair, and with his hair he would wipe the place, saying, 'Oh, my Mother, make me the servant of the Pariah, make me feel that I am even lower than the Pariah.' " (C. W. IV. 175) অর্থাৎ, আমার প্রভু এক মেথরের কাছে গিয়ে তার বাড়ী পরিষ্কার করবার অনুমতি চাইতেন।... মেথরটি রাজী হতো না; তাই গভীর রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে থাকত তিনি সে বাড়ীতে প্রবেশ করে তাঁর যে দীর্ঘকেশ ছিল তা দিয়ে সেই স্থান মুছে দিতেন; বলতেন, 'মা, আমাকে ঐ মেথরের সেবক করো, আমি যে এমন কি মেথরের চেয়েও নিচু তা আমাকে অনুভব করতে দাও।'

এ পারিয়া ভক্তচূড়ামণি রসিক মেথর।

শ্রীরামকৃষ্ণের এ নর্দমা পরিষ্কার লীলাটির সাক্ষ্য দিয়েছেন আর একজন ব্যক্তি—যিনি ঠাকুরের অতি অন্তরঙ্গ ছিলেন এবং উত্তরকালে তাঁরই স্মৃতিতে বেঁচেছিলেন। ইনি কথা-মৃতকার শ্রীম। তাঁরই উক্তি: "ঠাকুর বলেছিলেন, তিনি নিজের মাথার চুল দিয়ে রস্‌কে মেথরের বাড়ীর নর্দমা পরিষ্কার করেছিলেন। আর কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন, মা, আমি ব্রাহ্মণ এ অভিমান বিনাশ কর।" (শ্রীম-দর্শন ৭।১৬৮ পৃঃ)

যাহোক জাত্যভিমান, ঘৃণাবুদ্ধি মন থেকে সমূলে উৎপাটিত করবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ নিশা অভিযান। স্বামীজী 'মদীয় আচার্যদেব' বক্তৃতায় আরও উল্লেখ করেছেন,'মেথরের প্রতিও যাতে তাঁর ঘৃণাবুদ্ধি না থাকে, এই উদ্দেশ্যে তিনি গভীর রাত্রে উঠে তাদের ঝাড়ু ও অন্যান্য যন্ত্র নিয়ে মন্দিরের নর্দমা, পায়খানা প্রভৃতি নিজ হাতে পরিষ্কার করতেন।' এ ভাবে তিনি দীনতার সাধন শেষ করেন।

প্রত্যক্ষদর্শী 'শ্রীম'র বর্ণনায় রয়েছে : "হঠাৎ একদিন দেখি, দক্ষিণেশ্বরের পথে ঝাড়ু দিচ্ছেন, আর বলছেন, 'মা এই পথ দিয়ে বেড়াবেন।' কথা বলতে বলতে তন্ময়তা।" (উদ্বোধন ৬৭ বর্ষ, ৪৩৫ পৃঃ) 'শ্রীম' আরও বলেছেন : "আমরা চব্বিশ ঘণ্টা watch (পর্যবেক্ষণ) করে দেখেছি এক নিমেষের জন্যও ঈশ্বর থেকে বিচ্যুত হন নাই। নিদ্রার সময়ও নিঃশ্বাসের সঙ্গে অজানাভাবে 'মা মা' বলছেন।...একদিন বসে বসে 'গৌর গৌর' নাম করছেন গুনগুন করে। একজন বললে, আপনি মায়ের নাম করুন,'গৌর গৌর' করছেন কেন? ঠাকুর তক্ষুনি উত্তর করলেন, কি আর করি বাপু বল? তোমরা পাঁচটা নিয়ে আছ—স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, টাকাকড়ি, কিন্তু আমার এই এক অবলম্বন। তাই কখনও গৌর বলি, কখনও মা, কখনও রাম, কৃষ্ণ, কালী, শিব, এই করে সময় কাটাই।" (শ্রীম-দর্শন, ৭।১৭৯, ১৭৮ পৃঃ) এই অহংবিবর্জিত দেবমানব ভক্তদের শপথ করে বলতেন, "মাইরি বলছি, আমার ঈশ্বর বই কিছু ভাল লাগে না।" "কথায় বিশ্বাস কোরো। এখানে ঢং ফং নাই।" এই ঢং ফং নাই বলেই সরল রসিক চিনেছিল সরল শ্রীরামকৃষ্ণকে

রসিকের মহাপ্রয়াণ বিষয়ে কয়েকটা কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। একই ঘটনার বিভিন্ন বর্ণনা দেখে অনেকেই হকচকিয়ে যান। বিস্মিত হবার কিছুই নাই। বাইবেল পড়লে দেখা যায়, খ্রীষ্টের একই কাহিনীকে ম্যাথিউ, মার্ক, জন ও লুক নিজেদের ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। যাহোক আমরা রসিকের দেহত্যাগের বর্ণনাগুলি একে একে লিপিবদ্ধ করছি :

প্রথম বর্ণনা : রসিক পরম ভক্ত। বাড়ীতে তুলসীমঞ্চ ছিল। নীচ জাত বলে সর্বদা লোকজন থেকে দূরে দূরে থাকত। ঠাকুরকে দূর থেকে দেখে প্রাণ ভরাত। ঠাকুর ঝাউতলার দিকে যখন যেতেন, তাঁর পায়ের দাগে দাগে মাথা ঘসে ঘসে অনুসরণ করত। ঠাকুর তাকে এইভাবে মাথা ঘসতে দেখে একদিন তার দিকে তাকালেন। রসিক বললে, "বাবা, আমার কি কিছু হবে না?" ঠাকুর বললেন, "হবে বৈকি। এত ভক্ত এখানে আসে, তুই তাদের কত সেবা করছিস।" ঠাকুরের শরীর যাবার পর রসিক মুসড়ে পড়ল। তার শরীরও ক্রমশঃ ভেঙ্গে যেতে লাগল—আর কাজকর্ম করতে পারে না। মন্দিরের আঙিনায় আর ঝাঁট দিতে আসে না। তার মেয়ে ঝাড়ু দিয়ে যায়। রসিক অসুস্থ। যেদিন শরীর ছাড়বে সেদিন পরিবারের সকলকে ডেকে বলল, "তোরা সকাল সকাল খেয়ে নে. কেউ আমার কাছে আসবি না, যতক্ষণ আমি না ডাকি।" বেলা তখন দশটা, হঠাৎ তার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত। সে বলে উঠল, "বাবা তুমি এসেছ, আমায় ভোলনি তাহলে।"

দ্বিতীয় বর্ণনা : যে কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের আশ্রয় নিয়েছে, তাঁকে ভালবেসেছে, তার মুক্তি অনিবার্য। দক্ষিণেশ্বরের সেই

রসিক মেথরের গল্প শোননি? সে ঠাকুরকে 'বাবা বাবা' বলত। একদিন ঠাকুর ভাবাবস্থায় পঞ্চবটীর দিক থেকে আসছিলেন। তখন রসিক মেথর ঠাকুরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে হাত জোড় করে ঠাকুরের কৃপা ভিক্ষা করে বলেছিল, "বাবা, আমায় কৃপা করলে না? আমার গতি কি হবে?" তখন ঠাকুর বলেছিলেন, "ভয় নেই, তোর হবে; মৃত্যুসময় আমায় দেখতে পাবি।" ঠিক তাই হয়েছিল। মরবার আগে তাকে তুলসীমঞ্চে নিয়ে গিয়েছিল। মৃত্যুর পূর্বেই রসিক বলে উঠল, 'এই যে, বাবা, এসেছ। বাবা এসেছ!' এই বলতে বলতে মারা গেল। (শিবানন্দ বাণী, ২য় ভাগ, ১৩৫ পৃঃ)

তৃতীয় বর্ণনা: তোমরা মার কাছে রয়েছ, কত ভাগ্যবান। দক্ষিণেশ্বরে মা কালীর মন্দিরে রসিক মেথর ঝাড়ুটাড়ু দিত। একদিন ঠাকুরের পায়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বললে, "প্রভু, আমার কি উপায় হবে?" ঠাকুর বললেন, "তুই মার কাজ করছিস, তোর আবার ভয় কি?"...সে নিজের বাড়ীতে তুলসী-কুঞ্জ করে ওখানে বসে ভজন করতো। একদিন দুপুরবেলা স্ত্রীকে বলল, "ছেলেদের ডাক। আমাকে তুলসী-কুঞ্জে নিয়ে শুইয়ে দাও। সে তখন ঠাকুরের নাম করতে করতে সজ্ঞানে শরীর ত্যাগ করল। (শ্রীমকথা, ১ম।২৬৪ পৃঃ, এবং শ্রীম-দর্শন, ৭ম।১৭০ পৃঃ)

যিনি বলতেন, 'আমার আশীর্বাদ করতে নাই', তাঁর আশীর্বাদ যে কী অমোঘ ছিল—তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রসিক।

কেমন ক'রে?

শ্রীশান্তশীল দাশ

কেমন ক'রে ঠাকুর তুমি, পেয়েছিলে শ্যামা-মাকে?
মৃন্ময়ীকে চিন্ময়ী মা করলে তুমি সে-কোন্ ডাকে।
কতই ভাবি সকাল-সাঁঝে,
পাইনে আমি মা-র সাড়া যে;
ডাকার মতো ডাকতে যে গো পারিনে, মা দূরেই থাকে।

শিখিয়ে দেবে ডাকার ভাষা, শিখবো আমি সে-কা'র কাছে?
ঠাকুর, তোমায় স্মরণ করি, এ-মন তোমার শরণ যাচে।
কণ্ঠে আমার দাও সে-ভাষা,
পূরুক আমার মনের আশা;
যাবার আগে সফল ক'রে নিয়ে যাই এ-জীবনটাকে।

গান

স্বামী চণ্ডিকানন্দ

[কাফি সিন্ধু—যৎ বা ঝাঁপতাল]

অনন্ত কাল বাঁচিয়ে রাখ,
এই মিনতি ও রাঙ্গা পায়।
(আমি) আর যেন ভুলি না তোমায়,
মা তোমার মোহিনী মায়ায় ॥
বিষয়-সুখের আশা ক'রে,
আর আমি থাকবো না ম'রে
নিত্য থাক পরাণ ভ'রে,
কোলে ক'রে রাখ আমায় ॥

মানুষের ভগবান

শ্রীমতী জয়ন্তী সেন

করুণায় সহ্য নয়, সব দ্বিধা,
সব বিরোধিতা
গ্রহণ করেছ প্রেমে। ঈশ্বরীয়
সমদৃষ্টি মেলে
দেখেছ পাপের ক্লিষ্ট অবসন্ন
তিক্ত অশ্রুজল—
পুণ্যের সুচির শান্তি। দুই হাতে
পাপী পুণ্যবান
নিয়েছ উদার বক্ষে ;
দুজনের প্রতীক্ষিত প্রাণে
বলে গেছ ভালোবাসি—বলেছ প্রেমের
অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা
একই সত্তা ভক্ত ভগবান।

পূজার পবিত্র লগ্ন বারবার
যে দিল ফিরিয়ে
অন্ধকারে সূর্য যার জ্বলেনি কখনো—
তাকেও ভোল না তুমি, চুম্বকের
তীব্র আকর্ষণে
নদীকে সমুদ্র করো
শর্তহীন আত্মনিবেদনে।

কেবল স্বর্গের তৃপ্তি, দেবের দুর্লভ
আকাঙ্ক্ষিত ধন নও ; তোমার অমল
আলোকিত মুখখানি চিনেছে মানুষ
আর্ত, ভ্রান্ত, দুঃখময়
পথভ্রষ্ট একা,
ভুলের তরঙ্গাঘাতে জর্জরিত,
আনন্দবিচ্যুত।

মানুষের ভগবান বলে তাই
প্রার্থনায় নত
চিরন্তন মানবাত্মা উদ্ভাসিত
তোমার চরণে।

এ নব ডমরু-নিনাদ

স্বামী সুমেধানন্দ

পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে
বলে গেলে বেদান্তের বাণী,
নাহি জানি
ধূলার ধরণী পরে
কে তুমি ভৈরব !

বঞ্চিতের বেদনায় ব্যথী,
অনাথের ক্রন্দনের ধ্বনি
কানে শুনি
হিয়া তব মর্মাহত
কে তুমি মহেশ !

শাস্ত্র-সিন্ধু-মথিত পরাণ
শাস্ত্রের গর্জন নাহি শুনি
এ নব ডমরু-নিনাদ,
ত্যাগ সেবা সর্বশ্রেষ্ঠ গণি ।

অজ্ঞানের অন্ধকার ভেদি
মনে লাগে জ্ঞানের কিরণ
সূর্য তুমি অনাদি কালের
বাধাহীন তোমার গগন ।

ভাস্বর ভাস্কর তুমি
জ্যোতির্ময় স্বরূপ তোমার
বীরেশ্বর শ্রীবিবেকানন্দ
ভেঙে দাও নিদ্রা সবাকার ।

প্রভু তুমি

শ্রীমতী রমা গুপ্ত

সারাদিনের কতই ধুলা
লাগছে আমার গায়ে
দিনের শেষে ঝেড়ে ফেলে
শরণ নিই যে পায়ে ।
তুমিই আমার, আমিই তোমার
তাই তো এত জোর
প্রভু তুমি, প্রিয় তুমি
(আর) কেই বা আছে মোর !

ঝড়ঝাপ্‌টা কতই আসে
নিত্য চলার পথে ।
তোমার কথা ভুলে গিয়ে
চলি নিজের মতে ।
কিন্তু তুমি দোষ ধরো না
যাও যে ভালবেসে ।
জানি আমার তুমিই প্রিয়
(তাই) সবই জানাই এসে ।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী

সংরক্ষণার্থ

আবেদন

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর নিকট 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী' ১নং উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩, পবিত্র তীর্থভূমি হিসাবে বহুপরিচিত। এই পবিত্র গৃহেই শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘাধিষ্ঠাত্রী জগজ্জননী শ্রীসারদামণি দেবী ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার লীলাবসান পর্যন্ত দীর্ঘ একাদশ বর্ষ বাস করিয়া ইহাকে তীর্থে পরিণত করিয়াছেন। এই স্থানেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম লীলাসহচর পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' রচনা করিয়াছিলেন, যে গ্রন্থের উপস্বত্ব সহায়ে তিনি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে এই গৃহটি নির্মাণ করান।

এই কেন্দ্র হইতেই যুগাচার্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত 'উদ্বোধন' পত্রিকা উহার দশম বর্ষ হইতে দীর্ঘ সত্তর বৎসর ধরিয়া প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে।

কিন্তু নানা কারণে এই তীর্থভূমি আজ কালের গ্রাসে জীর্ণপ্রায়। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে নির্মিত এই সুপ্রাচীন গৃহের দেওয়াল, ছাদ এবং কোন কোন স্থানে ভিত্তি পর্যন্ত দুর্বল হইয়া ইহার অস্তিত্বকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে।

সম্প্রতি বহুস্মৃতি-বিজড়িত এই প্রাচীন 'মায়ের বাড়ী' সংরক্ষণের জন্য আমরা বিশিষ্ট স্থপতি ও কুশলী বাস্তুকারদের পরামর্শ লইয়াছি, যাহাতে এই গৃহের মূল কাঠামো ও প্রাচীন আকার বজায় রাখিয়া ইহার মেরামত করা সম্ভব হয়। ইহার জন্য আনুমানিক দুই লক্ষ টাকা প্রয়োজন।

বর্তমানে সংস্কার-কার্যের জন্য অপরিহার্য এই বিপুল অর্থ আমাদের না থাকায় আমরা শ্রীশ্রীমায়ের ভক্তমণ্ডলীর নিকট একান্ত অনুরোধ জানাইতেছি, তাঁহাদের যাঁহার যতটুকু সামর্থ্য তাহা লইয়াই মাতৃপূজায় সাহায্য করুন।

সর্বপ্রকার দান 'প্রেসিডেন্ট, রামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০০০৩' এই ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে। চেকে অর্থ দিলে তাহা 'রামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার' এই নামে লিখিতে হইবে। এই দান সরকারী আয়করমুক্ত।

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ

স্নানযাত্রা — অধ্যক্ষ

২০.৬.৭৮ — রামকৃষ্ণ মঠ ('মায়ের বাড়ী'), বাগবাজার

শ্রীশ্রীগঙ্গাপূজা

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়

ত্রিভুবনতারিণি পতিতপাবনি শঙ্করমৌলি-বিহারিণি মাতর্গঙ্গে, তোমাকে প্রণাম। কত যুগযুগান্ত সাধনার ফলে মর্ত্যলোকে তোমার এ আবির্ভাব। দেবতা গন্ধর্ব ঋষি অপ্সরাদি বন্দিতা তুমি। দেবাদিদেব মহেশ্বরের মস্তকে অধিষ্ঠিতা হয়ে মর্ত্যলোকে তোমার অবতরণ। পর্বত জনপদ নগর—যেখানেই তোমার অমৃত-ধারা প্রবাহিতা সবই পরমপুণ্যতীর্থে পরিণত। তোমার পূতস্পর্শে সমগ্র ভারত আজ বিশ্বের তীর্থ-ভূমি। যাঁর পুণ্যসলিল স্পর্শ-মাত্র মানবের জন্মজন্মান্তরের পাপরাশি বিধৌত হয়, সেই পরমকল্যাণময়ী তোমার মহিমা-বর্ণনা, মাদৃশ সাধনভজনহীনের পক্ষে পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনের ন্যায়। তাই, দশহরার পুণ্য তিথি উপলক্ষে মহাপুরুষকৃত স্তুতি ও বাণী-মালার সংকলনই তোমার পূজার নৈবেদ্য। দীনহীনের এ পূজা তুমি গ্রহণ কর, মা!

যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তরে শিলোঞ্ছবৃত্তির দ্বারা জীবিকানির্বাহকারী ব্রাহ্মণের উপাখ্যান প্রসঙ্গে ভীষ্মদেব কর্তৃক গঙ্গামাহাত্ম্যের বর্ণনা মহাভারতের অনুশাসন-পর্বের ষড়বিংশতি অধ্যায়ে বিশেষভাবে বর্ণিত। গঙ্গামাহাত্ম্যের এমন অপূর্ব বর্ণনা আর কোথাও আছে কিনা জানি না। তবে এ বাণীমালার তুলনা নেই। ভাষা-মাধুর্য ও তত্ত্ব-গৌরবে এ অধ্যায় অতুলনীয়। তারই কিছু শ্লোক ও অন্যান্য মহাপুরুষগণের বাণীমালাই এ পূজার অর্ঘ্য ও পুষ্পাঞ্জলি।

জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত এবং ইহজন্মে ক্রিয়মাণ সকল প্রকার কর্মক্ষয়ের বিধান শাস্ত্রে আছে। ব্রহ্মচর্য বেদপাঠ দান তপস্যা যাগ-যজ্ঞাদি দ্বারা কর্মক্ষয় সম্ভব। কিন্তু যাগ যজ্ঞ দান ইত্যাদিতে প্রয়োজন প্রচুর অর্থ ও দ্রব্য-সামগ্রীর। অনেকেরই সে সামর্থ্য নেই আবার তপস্যাদিতেও বহু সময় ও শক্তির প্রয়োজন। সহজ কিছুই নয়। কিন্তু কৃপাময়ী মা গঙ্গার শরণাপন্ন হও; সবই সহজে সম্ভব হবে।

এ অমৃতধারায় ভক্তিবিনম্র চিত্তে শুধু স্নান কর, জন্মজন্মান্তরের পাপ তোমার বিধৌত হবে—ব্রহ্মচর্য বা তপস্যার ফল এতেই পাবে। যদি না পার, শুধু তীরে বসে মাকে দর্শন কর, তোমার জীবন হবে পূতপবিত্র। তাও যদি না পার, গঙ্গাতীরে বাস কর—কৃচ্ছ্র-সাধনের প্রয়োজন হবে না। মায়ের কৃপায় তোমার জীবনে দেখা দেবে রূপান্তর। এমনি মায়ের করুণা!

তপসা ব্রহ্মচর্যেণ যজ্ঞৈস্ত্যাগেন বা পুনঃ।
গতিং তাং ন লভেজ্জন্তুর্গঙ্গাং সংসেব্য
যাং লভেৎ॥
(২৬।২৭)

—মানুষ গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাপূজা দ্বারা যেরূপ উত্তম গতি লাভ করতে পারে, ব্রহ্মচর্য তপস্যা যজ্ঞ বা দানাদি দ্বারাও সেরূপ গতিলাভ করতে পারে না।

স্নাতানাং শুচিভিস্তোয়ৈর্গাঙ্গেয়ৈঃ
প্রযতাত্মনাম্।
ব্যুষ্টির্ভবতি যা পুংসাং ন সা ক্রতুশতৈ-
রপি॥
(২৬।৩১)

—গঙ্গার পবিত্র জলে স্নান ক'রে যাঁদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়েছে তাঁদের যেরূপ পুণ্যবৃদ্ধি হয়, শত শত যজ্ঞের দ্বারাও সেরূপ হয় না।

তুলা আর অগ্নি। পাপরাশি আর গঙ্গা-বারি। অগ্নির ধর্মই ভস্মীভূত করা। অন্য বস্তু ভস্মীভূত হতে বরং সময় লাগে কিন্তু তুলা অগ্নিস্পর্শমাত্রেই ভস্মীভূত হয়। তেমনি গঙ্গাবারি স্পর্শমাত্রই মনুষ্যের পাপরাশি বিদূরিত হয়। গঙ্গাজলের এমনি পাবনী শক্তি! সমগ্র জগতের পাপরাশি আপন বক্ষে গ্রহণ করার জন্যই মা গঙ্গা দিব্যলোক থেকে এ ধরাধামে আবির্ভূতা হয়েছেন। তবু আমাদের অন্তরের অন্ধকার দূর হয় না—এমনি অবিশ্বাসী মন আমাদের!

অগ্নৌ প্রাপ্তং প্রধূয়তে যথা তূলং দ্বিজোত্তম।
তথা গঙ্গাবগাঢ়স্য সর্বং পাপং প্রধূয়তে ॥
(২৬।৪২)

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, যেরূপ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত তুলারাশি সত্বর ভস্মীভূত হয়, তেমনি গঙ্গাস্নানকারীর পাপ সত্বর নষ্ট হয়।

সারা জীবন যারা পাপকর্ম করেছে, তাদের উপায় কি? এরূপ পাপীকেও কি গঙ্গামাতা কৃপা করেন? তাদের এত পাপও তিনি গ্রহণ করেন?

হাঁ, করেন বই কি! তাই তো তিনি পতিতপাবনী। শেষ বয়সেও যদি ঐ সব দুষ্কর্মকারীরা গঙ্গামায়ের আশ্রয় নেয়, অর্থাৎ গঙ্গাস্নান করে, মা নিশ্চিতই তাদের শুদ্ধ-পবিত্র করেন এবং তারা দেহান্তে উত্তম গতি লাভ করে।

পূর্বে বয়সি কর্মাণি কৃত্বা পাপানি যে নরাঃ
পশ্চাদ্ গঙ্গাং নিষেবন্তে তেঽপি যান্ত্যুত্তমাং
গতিম্ ॥
(২৬।৩০)

পূর্ববয়সে পাপকর্ম করেও যারা শেষ বয়সে গঙ্গামাতার আশ্রয় নেয়, তারাও উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়।

২

অবগাহন-স্নানের শক্তিসামর্থ্য যাদের নেই, কিংবা নদীতটে বাস করার যাদের সঙ্গতি নেই, তাদের কি উপায়? তারা কি চিরতরে মায়ের কৃপা-বঞ্চিত, না তাদেরও দুর্গতিনাশের কোন উপায় আছে?

কেন থাকবে না! কৃপাময়ী অকাতরে কৃপাবিতরণের জন্যই দিব্যধাম থেকে অবতীর্ণা হয়েছেন। তাঁর কৃপাধারার কি অন্ত আছে?—কত ভাবে মায়ের কৃপা মানবের দুর্গতি নাশ করছে—তার কি অন্ত আছে!

তোমার গঙ্গাস্নানের শক্তিসামর্থ্য নেই কিংবা গঙ্গাস্নান তোমার সহ্য হয় না। তাতে কি? তুমি গঙ্গাতীরে বসে মাকে দর্শন কর, সকাল সন্ধ্যায়, যখন সময় হয় গঙ্গাতীরে ভক্তি-বিনম্রচিত্তে বস, তাতেই আরম্ভ হবে তোমার মনঃশুদ্ধি ও দেহশুদ্ধি। ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয়সমূহ তোমার বশে আসবে। গরুড় পাখি দেখলে সাপ যেমন বিষশূন্য হয়, তেমনি গঙ্গাদর্শনে তোমার সকল দুষ্প্রবৃত্তি হীনবল হবে, ইন্দ্রিয়-সংযম সহজসাধ্য হবে, আরম্ভ হবে জীবনের ক্রমিক রূপান্তর। তুমি হবে নূতন মানুষ।

তাও যদি না পার—গঙ্গাতীরে গিয়ে প্রতিদিন বসে থাকা যদি সম্ভব না হয়, তুমি এমন জায়গায় যাও, যেখানে গঙ্গাস্পৃষ্ট বায়ু প্রবাহিত হয়। সেই পরমপাবন পবন-স্পর্শে বিদূরিত হবে তোমার জন্মজন্মান্তরের দুষ্কৃতি; জীবনে শুরু হবে পাবনীশক্তির খেলা।

তাও যদি তোমার সাধ্যাতীত হয়, তুমি গঙ্গামৃত্তিকা নিয়ে যাও। যেখানেই অবস্থান

কর না কেন, গঙ্গামৃত্তিকা মস্তকে ধারণ ক'রে উপবেশন কর, দেখবে দেহ মন স্নিগ্ধ ও শান্ত হচ্ছে। ক্রমে সূর্যোদয়ে যেমন রাত্রির অন্ধকার বিদূরিত হয়, তেমনই গঙ্গামৃত্তিকা-স্পর্শে তোমার পাপান্ধকার বিদূরিত হবে এবং দেহ দিব্যজ্যোতিতে সমুজ্জ্বল হবে। এমনি মায়ের অহৈতুকী করুণা !

নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিতে এই তথ্যই ব্যক্ত হয়েছে।

ভবন্তি নির্বিষাঃ সর্পাঃ যথা তার্ক্ষ্যস্য দর্শনাৎ।
গঙ্গায়া দর্শনাৎ তদ্বৎ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
(২৬।৪৪)

গঙ্গোর্মিভিরথো দিগ্ধঃ পুরুষং পবনো যদা।
স্পৃশতে সোঽস্য পাপ্মানং সদ্য এবাপকর্ষতি ॥
(২৬।৫৬)

জাহ্নবীতীরসম্ভূতাং মৃদং মূর্ধ্না বিভর্তি যঃ।
বিভর্তি রূপং সোঽর্কস্য তমোনাশায় নির্মলম্ ॥
(২৬।৫৫)

৩

দৌহিত্রের পুণ্যফলে রাজা যযাতি স্বর্গে স্থিতিলাভ করেছিলেন। বংশধরগণের পুণ্য-প্রভাবে পরলোকগত পিতৃপুরুষগণ সুখশান্তি বা উত্তম গতি লাভ করেন, একথা হিন্দুশাস্ত্রে উল্লেখিত আছে। বংশধরগণের পুণ্যকর্ম-প্রভাবে পিতৃপুরুষের যেমন উর্ধ্বগতি হয়, তেমনি দুষ্কর্মের ফলে অধোগতিও হয়। বস্তুতঃ পরলোকগত পিতৃপুরুষের সঙ্গে বংশধরগণের একটি যোগসূত্র বিদ্যমান। এজন্যই তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদিকর্ম ধর্মের অঙ্গস্বরূপ।

অনেকে বলেন, পিতার পুণ্যে সন্তানের উন্নতি হয়। একথারও সার্থকতা আছে। প্রত্যেকের কার্যাবলী তার উর্ধ্বতন পিতৃপুরুষ এবং অধস্তন সন্তানসন্ততির উপর প্রভাব বিস্তার করে।

তাই নিম্নশ্লোকে গঙ্গাপূজা ও স্নানে শুদ্ধ ব্যক্তির পুণ্যফলে তাঁর উর্ধ্বতন সাত পুরুষ এবং নিম্নতন সাত পুরুষ উদ্ধার পায়, একথা বলা হয়েছে।

সপ্তাবরান্ সপ্তপরান্ পিতৃংস্তেভ্যশ্চ যে পরে।
পুমাংস্তারয়তে গঙ্গাং বীক্ষ্য স্পৃষ্ট্বাবগাহ্য চ ॥
(২৬।৬২)

৪

তর্পণ হিন্দুদের এক উদার মহৎ অনুষ্ঠান। পুনর্জন্মবাদে আস্থা এর মূল ভিত্তি। মানুষ শুভকর্মফলে যেমন দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি কিংবা আরো উচ্চ অবস্থা লাভ করে, তেমনি অশুভ কর্মফলে পশুপক্ষী কীটপতঙ্গাদি নিম্ন-যোনিতেও জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং সৃষ্টির প্রত্যেক স্তরে মানুষের অসংখ্য আত্মীয়কুটুম্ব বর্তমান।

তাই তর্পণের মন্ত্রে দেবতা যক্ষ নাগ গন্ধর্ব অপ্সরা অসুর সর্প বৃক্ষ পক্ষী কল্যাণার্থে জলদানের ব্যবস্থা আছে। আবার সনক সনন্দন সনাতন মরীচি অত্রি অঙ্গিরাদি ঋষিগণের উদ্দেশেও তর্পণ করা হয়।

প্রতিবৎসর রবিগ্রহ কন্যারাশিস্থ হ'লে পিতৃপক্ষ আরম্ভ হয়। পিতৃপুরুষগণ তখন স্ব স্ব বংশধরের গৃহদ্বারে সমাগত হন এবং মহালয়া উপলক্ষে তর্পণশ্রাদ্ধ পর্যন্ত অপেক্ষা করেন।

গঙ্গাজল দ্বারা তর্পণে অশেষ পুণ্য হয়। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল তিন লোকস্থ প্রাণী গঙ্গা-সলিলতর্পণে সন্তুষ্ট হন। একথাই নিম্নশ্লোকে বলা হয়েছে।

ত্রিষু লোকেষু যে কেচিৎ প্রাণিনঃ সর্ব এব তে।
তর্প্যমাণাঃ পরাং তৃপ্তিং যান্তি গঙ্গাজলৈঃ শুভৈঃ ॥
(২৬।৩৭)

৫

মহাভারতের ঋষি ব্যতীত কত আচার্য সাধক সিদ্ধ ও অবতার কত ভাবে, কত ভাষায় ও ছন্দে শ্রীশ্রীগঙ্গামায়ের মাহাত্ম্য-কীর্তন করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। আমরা তাঁদের মধ্যে মহর্ষি বাল্মীকি, আচার্য শঙ্কর, যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, পরমারাধ্যা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের কতিপয় বাণী আলোচনা করেই গঙ্গাপূজা সমাপন করছি।

মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত 'গঙ্গাষ্টকম্' ছন্দ ভাষা ও ভাবে অনবদ্য। প্রারম্ভেই তিনি লিখেছেন :

মাতঃ শৈলসুতা-সপত্নি বসুধা-
শৃঙ্গার-হারাবলি
স্বর্গারোহণ-বৈজয়ন্তি ভবতীং
ভাগীরথীং প্রার্থয়ে।
ত্বত্তীরে বসতস্ত্বদম্বু পিবত-
স্ত্বদ্বীচিমুৎপ্রেঙ্খত-
স্ত্বন্নাম স্মরতস্ত্বদর্পিতদৃশঃ
স্যান্মে শরীরব্যয়ঃ॥

—পার্বতীর সপত্নী, বসুমতীর বিলাসহার-স্বরূপিণী, স্বর্গারোহণের বৈজয়ন্তী, হে মা! তুমি (ভগীরথকর্তৃক আনীতা) ভাগীরথী, তোমার কাছে এই প্রার্থনা—তোমার তীরে বাস, তোমার জল পান, তোমার তরঙ্গ-নিরীক্ষণ এবং তোমার নাম স্মরণ করতে করতে তোমাতেই নিবদ্ধদৃষ্টি যেন আমার দেহাবসান হয়।

আরেকটি শ্লোকে অনুপ্রাসের মাধুর্য আমাদের মুগ্ধ করে—

পাপাপহারি দুরিতারি তরঙ্গধারি
দূরপ্রচারি গিরিরাজ-গুহাবিদারি।
ঝঙ্কারকারি হরিপাদরজোবিহারি
গাঙ্গ্যং পুনাতু সততং শুভকারি বারি॥

—পাপনাশন দুষ্কর্ম-প্রতিষেধক তরঙ্গান্বিত সুদূরপ্রবাহী হিমালয়-গুহাবিদারী ঝঙ্কারকারী হরিপদের ধূলির মধ্যে প্রবহমাণ শুভকারী গঙ্গাবারি সর্বদা আমাদের পবিত্র করুক।

শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্যকৃত গঙ্গাস্তোত্রও ভাব ভক্তি ও বিশ্বাসের এক অভিনব নৈবেদ্য। প্রতিটি পঙ্‌ক্তি গঙ্গামায়ের মহিমা-সমুজ্জ্বল। আমরা এখানে যৎসামান্য উল্লেখ করছি।

তব জলমমলং যেন নিপীতং
পরমপদং খলু তেন গৃহীতম্।
মাতর্গঙ্গে ত্বয়ি যো ভক্তঃ
কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ॥···
তব কৃপয়া চেৎ স্রোতঃস্নাতঃ
পুনরপি জঠরে সোঽপি ন জাতঃ।
নরকনিবারিণি জাহ্নবি গঙ্গে
কলুষবিনাশিনি মহিমোত্তুঙ্গে॥

—হে মা গঙ্গে, তোমার নির্মল জল যিনি পান করেছেন তিনি নিশ্চিতই পরমপদ প্রাপ্ত হয়েছেন। তোমাতে যাঁর ভক্তি আছে, যমেরও তাঁকে দেখার সামর্থ্য নেই। হে নরকনিবারিণি, জহ্নুসুতে গঙ্গে, হে পাপ-নাশিনি ও মহিমায় সর্বশ্রেষ্ঠ, তোমার কৃপায় যদি কেউ তোমার স্রোতে স্নান করে, তাকে আর জননীজঠরে জন্ম নিতে হয় না।

গঙ্গাতটের মহিমাও কম নয়। গঙ্গাতট বৈকুণ্ঠসদৃশ। গঙ্গাতটে যে বাস করে, সে অবশ্যই বৈকুণ্ঠবাসী।—'তব তটনিকটে যস্য নিবাসঃ/খলু বৈকুণ্ঠে তস্য হি বাসঃ।'

জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে আচার্য শঙ্করের জীবনে। পরম জ্ঞানী হয়েও তিনি ভক্তচূড়ামণি। গঙ্গামায়ের প্রসঙ্গে আচার্যদেবের ভক্তিপ্রস্রবণ স্বতঃ উৎসারিত হয়ে উঠেছে।—

বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ
কিংবা তীরে সরটঃ ক্ষীণঃ।
অথ গব্যূতৌ শ্বপচো দীনো
ন পুন র্দূরে নৃপতিকুলীনঃ॥

—তোমার জলে বরং কচ্ছপ বা মাছ হওয়াও ভাল, কিংবা তোমার তীরে ক্ষীণ টিকটিকি হওয়াও ভাল, অথবা তোমার তীর থেকে দুই ক্রোশের মধ্যে দরিদ্র চণ্ডাল হওয়াও ভাল, কিন্তু তোমা থেকে দূরে কুলীন নৃপতি হওয়াও ভাল নয়।

যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ও শ্রীশ্রীসারদা-মা গঙ্গামাহাত্ম্য সম্পর্কে অনেক মূল্যবান ও তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছেন। সে-সব অমূল্য বাণীমালার কয়েকটি নিম্নে নিবেদিত হ'ল।

'গঙ্গাজল জলের মধ্যে নয়, শ্রীবৃন্দাবনের রজঃ ধুলোর মধ্যে নয়, আর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ অন্নের মধ্যে নয়। এই তিন ব্রহ্মের স্বরূপ।'

এই কথার প্রতিধ্বনি ক'রে তাঁর মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেছেন, 'গঙ্গাবারি ব্রহ্মবারি, অভীষ্টদায়িনী—ইষ্টদর্শনের সহায়ক।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র ঘোষকে বলেছিলেন, 'ছাখো, যদি কেউ মা-গঙ্গার কাছে অকপটে নিজের দুর্বলতার কথা জানায়, তাহলে মা তার সব অপরাধ মার্জনা করেন।'

এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম পার্ষদ স্বামী অদ্ভুতানন্দজী বলেছিলেন, 'গিরিশবাবুর মনে একথাটা কেমন বসে গিছিলো, সেই থেকে তিনি রোজ মা-গঙ্গার কাছে নিজের অপরাধ সব জানাতেন। যেদিন যেতে পারতেন না, সেদিন ঐদিকে (গঙ্গার দিকে) মুখ রেখে সব কথা বলতেন। তাতেই তিনি শুদ্ধ পবিত্র হয়ে গেলেন।'

যাঁদের ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে তাঁরা মুক্ত। মুক্ত-পুরুষের দেহত্যাগের জন্য কালাকাল বা স্থান অস্থানের অপেক্ষা নেই। জ্ঞানী যেখানেই দেহত্যাগ করুন না কেন, মুক্তি তো তাঁর হয়েই রয়েছে। কিন্তু যারা মোহান্ধকারাচ্ছন্ন অজ্ঞান, তারাও যদি গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করে, তাহলে মুক্তি লাভ করে। এমনি গঙ্গামায়ের কৃপা। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'জ্ঞান হলেই মুক্তি। যেখানেই থাকো—ভাগাড়েই মৃত্যু হোক আর গঙ্গাতীরেই মৃত্যু হোক, জ্ঞানীর মুক্তি হবে। তবে অজ্ঞানীর পক্ষে গঙ্গাতীর।'

গঙ্গাস্নানে পাপক্ষয় হয়। এ কথাও শ্রীশ্রীঠাকুর দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন:

'একজন পূর্বজন্মের কর্মের দরুন সাতজন্ম কানা হ'ত। কিন্তু সে গঙ্গাস্নান করলে। গঙ্গাস্নানে মুক্তি হয়। সে ব্যক্তির চক্ষু যেমন কানা সেই রকমই রইলো, কিন্তু আর যে ছ'জন্ম, সেটা হ'ল না।'

গঙ্গাতীর পবিত্র, গঙ্গাতীরে বাস বৈকুণ্ঠ-বাসতুল্য—এ সব কথা অনেক মহাত্মাই বলেছেন। এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নেই, কিন্তু গঙ্গাতট বলতে কতটা স্থান বোঝায়, এ কথা কেউ পরিষ্কার ভাবে বলেছেন কিনা জানা নেই।

শ্রীশ্রীসারদা-মা কিন্তু সুস্পষ্টভাবে গঙ্গাতটের ব্যাখ্যা করেছেন। গঙ্গার উভয় তট থেকে দুই ক্রোশ পর্যন্ত—অর্থাৎ মোট চার ক্রোশ পবিত্র। এই চার ক্রোশেই গঙ্গা-বায়ু প্রবাহিত হয়।

শ্রীশ্রীসারদা-মা বলেছেন:

'চারক্রোশী গঙ্গাতীর। পবিত্র হাওয়া বয়। হাওয়ারূপী নারায়ণ।'

গঙ্গাতীরে বাস করলে পাপক্ষয় হয়। অনেকেই বলেছেন, গঙ্গাতীরে বাস বৈকুণ্ঠ-

বাসের সমতুল্য। কিন্তু মা সারদামণি এ সম্বন্ধে দু'কথায় যা বলেছেন, তার তুলনা নেই। গঙ্গাস্নানেও পাপক্ষয় হয়, একথাও মা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন।

'গঙ্গাতীরে যারা বাস করে, তারা সব দেবতা। দেবতা না হলে কি গঙ্গাতীরে বাস হয়? আর গঙ্গাস্নানে রোজের পাপ রোজ ক্ষয় হয়।'

গঙ্গাজলে কত মৃত পশুপক্ষী ভেসে যায়। অনেক সময় কত অপবিত্র জিনিসও গঙ্গায় ভাসতে দেখা যায়। এতে গঙ্গাজলের পবিত্রতা সম্পর্কে অনেকের মনেই সন্দেহ হতে পারে। সে সন্দেহ দূর করতে শ্রীশ্রীমা বলেছেন, কোন অপবিত্র জিনিসই গঙ্গাজলের পবিত্রতা নষ্ট করতে পারে না।

'গঙ্গায় যে কত অপবিত্র জিনিস ভেসে যায়, তা'তে গঙ্গা কি কখনও অপবিত্র হয়?'

গঙ্গার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন, বলেছেন এবং তাঁর জীবনের ঘটনাতেও তাঁর গঙ্গাপ্রীতি সুপরিস্ফুট। স্থানাভাবে সবগুলির উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তাঁর রচনা থেকে কিছু উদ্ধৃত ক'রে প্রবন্ধটির উপসংহার করছি:

"হিন্দুর সঙ্গে মায়ের একি সম্বন্ধ!—কুসংস্কার কি?—হবে। গঙ্গা গঙ্গা ক'রে জন্ম কাটায়, গঙ্গাজলে মরে, দূরদূরান্তরের লোক গঙ্গাজল নিয়ে যায়, তাম্রপাত্রে যত্ন করে রাখে, পালপার্বণে বিন্দু বিন্দু পান করে। রাজারাজড়ারা ঘড়া পুরে রাখে, কত অর্থব্যয় ক'রে গঙ্গোত্রীর জল রামেশ্বরের উপর নিয়ে গিয়ে চড়ায়; হিন্দু বিদেশে যায়—রেঙ্গুন, জাভা, হংকং, জাঞ্জীবর, মাডাগাস্কার, সুয়েজ, এডেন, মালটা—সঙ্গে গঙ্গাজল, সঙ্গে গীতা। গীতা গঙ্গা হিঁদুর হিঁদুয়ানি। গেল বারে[১] আমিও একটু নিয়ে গিয়েছিলুম—কি জানি! বাগে পেলেই এক আধ বিন্দু পান করতুম। পান করলেই কিন্তু সে পাশ্চাত্য জনস্রোতের মধ্যে, সভ্যতার কল্লোলের মধ্যে, সে কোটি কোটি মানবের উন্মত্তপ্রায় দ্রুতপদসঞ্চারের মধ্যে মন যেন স্থির হয়ে যেত! সে জনস্রোত, সে রজোগুণের আস্ফালন, সে পদে পদে প্রতিদ্বন্দ্বিসংঘর্ষ, সে বিলাসক্ষেত্র, অমরাবতীসম প্যারিস, লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক, বার্লিন, রোম সব লোপ হয়ে যেত, আর শুনতাম—সেই 'হর্ হর্ হর্', দেখতাম—সেই হিমালয়ক্রোড়স্থ বিজন বিপিন, আর কল্লোলিনী সুরতরঙ্গিণী যেন হৃদয়ে মস্তকে শিরায় শিরায় সঞ্চার করছেন, আর গর্জে গর্জে ডাকছেন—'হর্ হর্ হর্!!'"

১ প্রথম বারে স্বামীজী যখন পাশ্চাত্য দেশে যান।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে কালিদাস ও ভবভূতি

শ্রীশংকর ঘোষ

বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর রেনেশাঁসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফল আধুনিক বাংলা সাহিত্য। একদিকে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য, অন্যদিকে পাশ্চাত্য সাহিত্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য-স্রোতে মিলিত হয়ে যে আলোড়ন ও গতি-প্রবাহের সঞ্চার করেছে, তারই ত্রিধারা-সঙ্গমে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জন্ম। যাঁদের অভাবনীয় প্রতিভায় এই আশ্চর্য মিলন সংঘটিত হয়েছে, তাঁদের পুরোভাগে বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র—রবীন্দ্রনাথে তারই পূর্ণতা।

সেদিনের নবজাগ্রত বাংলার মনীষা ও সৃষ্টিকল্পনায় পাশ্চাত্যের যে মহাকবির একক প্রভাব সর্বাধিক, তিনি শেকসপীয়র, আর প্রাচ্যের—রামায়ণ-মহাভারত বাদ দিলে, নিঃসন্দেহে কালিদাস। কালিদাস ভিন্ন অন্য আর যাঁর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়, তিনি ভবভূতি। কবির সৃষ্টি-প্রতিভায় 'প্রভাব' শব্দটি সবিশেষ অর্থপূর্ণ। ইংরাজী 'influence' শব্দে তাকে ব্যাখ্যা বা নিরূপণ করা যায় না। প্রভাব অর্থে প্রকৃষ্ট ভাব; তা পূর্বতনের হলেও মহৎ কবি-কল্পনায় নতুন হয়ে ওঠে। এ যেন Browning-এর 'Abt Vogler'-এর সেই মহান স্রষ্টা-শিল্পীর গীতরাগরচনা, যার তিনটি স্বরের সমবায়ে চতুর্থ স্বর ফোটে না, ফোটে আকাশের নক্ষত্র।

বাংলা সাহিত্যে কালিদাস ও ভবভূতির সঙ্গে আমাদের কালের যে যোগ, রবীন্দ্রনাথ তার স্বর্ণসেতু। পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁর রসজ্ঞতা কালিদাস ও ভবভূতিকে বাংলা সাহিত্যের খুব কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। তাঁর 'শকুন্তলা' (১৮৫৪) এবং 'সীতার বনবাস' (১৮৬০) এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সীতার বনবাসের ভূমিকায় তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন—'এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অধিকাংশ ভবভূতি প্রণীত উত্তরচরিত নাটকের প্রথম অঙ্ক হইতে গৃহীত।' শকুন্তলা, সীতার বনবাস প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত হলেও তা বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনাই। কালিদাস ও ভবভূতির সাহিত্যের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের নিবিড় যোগাযোগের প্রমাণ রয়েছে তাঁরই 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাবে' (১৮৫৩)। 'রঘুবংশ' সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—'সংস্কৃত ভাষায় যত মহাকাব্য আছে, তন্মধ্যে কালিদাস প্রণীত রঘুবংশ সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।'

কালিদাসের 'শকুন্তলা'কে রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় বাংলা নাটকে রূপান্তরিত করেছিলেন বাংলা নাটকের প্রত্যুষ-পর্বে (১৮৬০)। ভবভূতির 'মালতীমাধব'কে বাংলা নাটকে (১৮৬৭) রূপান্তরিত করে-ছিলেন রামনারায়ণ। ভবভূতির 'উত্তররাম-চরিত'-কেও বাংলা নাটকে রূপান্তরিত করেছিলেন রামনারায়ণ এবং সে রচনা 'সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্র' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

মাইকেল মধুসূদন প্রথম দুটি নাটকে; অর্থাৎ 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯) এবং 'পদ্মাবতী' (১৮৬০) তে পাত্রপাত্রীর সংলাপে বহু স্থানে

কালিদাসের সংলাপানুবাদ যোজনা করেছিলেন। শকুন্তলার পতিগৃহ-যাত্রাকালে শকুন্তলার প্রতি মহর্ষি কণ্বের যে আশীর্বচন কালিদাস ব্যবহার করেছেন তাতেই মধুসূদন শর্মিষ্ঠা নাটকের কাহিনীসূত্রের সন্ধান পেয়েছেন। নায়িকার পূর্বরাগ, শচীতীর্থের উল্লেখ প্রভৃতিতে পদ্মাবতী নাটকেও কালিদাসের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। 'মায়াকানন' (১৮৭৪) নাটকে ইন্দুমতী, সুনন্দা প্রভৃতি 'রঘুবংশে'র ইন্দুমতী, সুনন্দার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

কালিদাস ও ভবভূতির সাহিত্য বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। তন্মধ্যে কালিদাসের শকুন্তলা এবং ভবভূতির উত্তরচরিত সমালোচকদের হৃদয় হরণ করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকটি স্মরণীয় সমালোচনামূলক প্রবন্ধ তাই শকুন্তলা ও উত্তরচরিতকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে। বিদ্যাসাগরের 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাবে'র (১৮৫৩) কথা তো আগেই বলেছি। এছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের 'শকুন্তলা মিরন্দা এবং দেসডিমোনা', 'উত্তরচরিত' (বিবিধ প্রবন্ধে প্রকাশিত, ১৮৮৭), চন্দ্রনাথ বসুর 'অভিজ্ঞানশকুন্তলের অর্থ' (১৮৮১) প্রভৃতি প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে শকুন্তলা নাটকটিকে 'নন্দনকাননে'র সহিত তুলনা করেছেন এবং শকুন্তলা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, শকুন্তলা যেন 'চিত্রকরের চিত্র'। উত্তরচরিতের বহু বিষয় যে ভবভূতির 'স্বকপোলকল্পিত' একথা বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করেছেন। কালিদাস ও ভবভূতির তুলনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'মধুরে কালিদাস অদ্বিতীয়—উৎকটে ভবভূতি।'

কালিদাসের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের সশ্রদ্ধ মানসিকতা ফুটে উঠেছে 'পারি প্রদর্শনী'তে প্রদত্ত স্বামীজীর বক্তৃতায়। কালিদাস-সাহিত্যের যে অনুরাগী পাঠক ছিলেন স্বামীজী তার প্রমাণ রয়েছে 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে। এ ছাড়া রামদাস সেন তাঁর 'ঐতিহাসিক চরিত্রে' (১৮৭৪) কালিদাস ও ভবভূতিকে নিয়ে আলোচনা করেছেন। কালিদাস ও ভবভূতির সাহিত্য বিশ্লেষণে উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকটি সাময়িক পত্রিকার ভূমিকাও স্মরণযোগ্য।

'কবিতানিকুঞ্জে তুমি পিককুলপতি'—কালিদাস সম্পর্কে এ প্রশস্তি মধুসূদনের। ভারতীয় কবিগণের মধ্যে মধুসূদন কালিদাসকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির আসন দিয়েছেন। মধুসূদনের কাব্য কবিতাতে তাই কালিদাসের প্রভাব বেশ সক্রিয়। 'তিলোত্তমাসম্ভব' (১৮৬০) কাব্য কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যের আদলে রচিত। রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গের বর্ণনা মধুসূদনের 'মেঘনাদবধে'র (১৮৬১) চতুর্থ সর্গের প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে। 'ব্রজাঙ্গনা'র (১৮৬১) কতকগুলি কবিতা কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ব্রজাঙ্গনার সারিকা পাখীটি স্মরণ করিয়ে দেয় যক্ষপ্রিয়ার সারিকাকেই। 'বীরাঙ্গনা'র (১৮৬২) দুটি পত্র কালিদাসের নাটকের বিষয় নিয়ে রচিত —'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা' এবং 'পুরূরবার প্রতি উর্বশী'। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে কালিদাস, মেঘদূত, উর্বশী, পুরূরবা, শকুন্তলা প্রভৃতি কবিতায় মধুসূদনের উপর কালিদাসের প্রভাবের পরিমাণ সহজেই নির্ণয় করা যায়। 'মেঘনাদবধে'র চতুর্থ সর্গের সূচনায় মাইকেল বলেছেন—

'অমর ! শ্রীভর্তৃহরি ; স্বরী, ভবভূতি
শ্রীকণ্ঠ ; ভারতে খ্যাত বরপুত্র যিনি
ভারতীর, কালিদাস—সুমধুরভাষী…'

বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজী শিক্ষায় পরিপুষ্ট হলেও সংস্কৃত রসসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ যোগাযোগ ছিল। 'কপালকুণ্ডলা'র (১৮৬৬) চরিত্র-নির্মাণে অথবা কাপালিক-চরিত্র পরিকল্পনায় ভবভূতির প্রভাব অবশ্যই পড়েছে। এ ছাড়া কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের কতকগুলি পরিচ্ছেদের সূচনায় ভাবানুষঙ্গে রঘুবংশ, শকুন্তলা, মেঘদূত, কুমারসম্ভব থেকে শ্লোকাবলী উদ্ধৃত করেছেন। 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) উপন্যাসের 'স্তিমিত প্রদীপ' শীর্ষক অংশে নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর গৃহে যে সমস্ত চিত্র অঙ্কিত রয়েছে, তার অধিকাংশেরই (যেমন শকুন্তলার পূর্বরাগ, মহাদেবের চরণে পার্বতী, বিমানপথে সাগরের উপর দিয়ে রাম-সীতার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন) বিষয় গৃহীত হয়েছে কালিদাসেরই রচনা থেকে।

বাংলার গীতিকবিতায় 'ভোরের পাখী' বিহারীলাল চক্রবর্তী। যদিও বিহারীলাল প্রায় সমস্ত সংস্কৃত কবিগণের রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তথাপি বিহারীলালের রচনায় কালিদাস ও ভবভূতির স্থান যেন অনেকখানি। তাঁর 'বঙ্গসুন্দরী'র (১৮৭০) সূচনায় তিনি ভবভূতির শ্লোকের যেমন উদ্ধৃতি দিয়েছেন, ঠিক তেমনি ঐ কাব্যেরই তৃতীয় সর্গের সূচনায় কালিদাস থেকে উদ্ধৃতি দিতে ভোলেননি। 'নিসর্গসন্দর্শনে'র (১৮৭০) অন্তর্গত 'সমুদ্রদর্শন', 'নভোমণ্ডল' প্রভৃতি সর্গের ভাবানুষঙ্গে কালিদাসের কতিপয় শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন বিহারীলাল। একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে 'বন্ধুবিয়োগ' (১৮৭০) কাব্যের প্রায় প্রতিটি সর্গের সূচনায়। কালিদাসের প্রেমের অমরাবতীকে 'প্রেম-প্রবাহিনী' (১৮৭০) কাব্যের চতুর্থ সর্গে বিহারীলাল স্মরণ করেছেন—

'হিমালয়শৃঙ্গে কুবেরের অলকায়
ছড়াছড়ি মণি চুনি রয়েছে যথায়॥'

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিপাহী বিদ্রোহের কিছু পরে ১৮৬০-এ মেঘদূত কাব্যের বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন; যদিও অনুবাদক হিসাবে তাঁর নাম তখনো প্রকাশিত হয়নি। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরও 'মেঘদূতে'র বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬৯-এ 'বিক্রোমোর্বশী' বাংলায় অনুবাদ করেন। কালিদাসের রচনার সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের যোগ যে বহুদিনের তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'আর্যবীণা'র (১৮৮২) শুরুতেই শকুন্তলা থেকে উদ্ধৃতিতে। (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, কালিদাস ও ভবভূতিকে নিয়ে লেখা একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ দ্বিজেন্দ্রলাল রচনা করেন বিংশ শতাব্দীর সূচনায়)। নবীনচন্দ্র দাস 'রঘুবংশ' পদ্যে বঙ্গানুবাদ করেন। সে কাব্যের প্রথম ভাগ ১৮৯১তে এবং দ্বিতীয় ভাগ ১৮৯৭তে প্রকাশিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৯৯তে 'মালতীমাধবে'র বঙ্গানুবাদ করেন।

১৮৫৫ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত যাঁরা বাংলায় কালিদাস ও ভবভূতির রচনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বা তাঁদের রচনা থেকে সরাসরি বাংলায় অনুবাদ করে নাটক রচনা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েক জনের নাট্যগ্রন্থের প্রকাশকাল সমেত একটি কালানুক্রমিক তালিকা নীচে দিলাম (তালিকাটি 'বেঙ্গল লাইব্রেরী'র সংকলিত মুদ্রিত পুস্তকাদির তালিকা থেকে নেয়া):

নন্দকুমার রায়—অভিজ্ঞানশকুন্তলা নাটক (১৮৫৫)

কালীপ্রসন্ন সিংহ—বিক্রমোর্বশী (১৮৫৭) এবং মালতীমাধব (১৮৫৯)

উমেশচন্দ্র মিত্র—সীতার বনবাস নাটক (১৮৬৬)

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মালতীমাধব (১৮৭০)

হরলাল রায়—অশ্রুসংহার নাটক (বেণী-সংহার অবলম্বনে, ১৮৭৪)

কুঞ্জবিহারী বসু—শকুন্তলা (১৮৮৯)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—অভিজ্ঞানশকুন্তলা (১৮৯৯) এবং মালতীমাধব (১৯০০)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনে ও সাহিত্যে, জীবিত ও মৃত বহু ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। জীবনকে যে সর্বতোভাবে গ্রহণ করে, পরের প্রভাবকে সে এড়াতে পারে না। কিন্তু এই সমস্ত প্রভাব রবীন্দ্রসাহিত্যে উপাদান মাত্র। রবীন্দ্রনাথ ভবভূতি এবং বিশেষ করে কালিদাসের রচনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কালিদাস ও ভবভূতির রচনায় প্রাচীন ভারতের মহৎ জীবনযাত্রা, তপোবনের আদর্শ, নরনারীর প্রেম, রাজসন্ন্যাসীর চরিত্র রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য' এই তথ্যের সত্যতা প্রমাণিত করে। রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পর্বের (১৮৯০-১৯০০) বেশ কিছু কবিতাও যে কালিদাস-ভবভূতি-সাহিত্যের প্রেরণাসঞ্জাত, তাও অস্বীকার করার উপায় নেই। ছোট্ট একটি উদ্ধৃতি দিয়ে রচনার ছেদ টানছি—

'এই মত মেঘরূপে ফিরি দেশে দেশে।
হৃদয় ভাসিয়া চলে উত্তরিতে শেষে॥'

সমালোচনা

Education for Life : A Study

প্রকাশক : স্বামী বেদান্তানন্দ, সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পাটনা। (১৯৭৮), পৃঃ ৯৪, মূল্য পাঁচ টাকা।

শিক্ষাবিজ্ঞানে Great Educators সম্বন্ধে আলোচনা একটি আবশ্যিক পাঠ্য। দেখা যায়, পাশ্চাত্য শিক্ষাতাত্ত্বিকরাই এই সব আলোচনায় প্রধান স্থান পান। আমাদের দেশেও যে মহান শিক্ষানায়করা ছিলেন, তাঁদের চিন্তাও অবশ্য ইদানীং পাঠক্রমে যৎকিঞ্চিৎ স্থান পাইতেছে। বিস্তারিত নয়।

আলোচ্য গ্রন্থটিতে সেই বিস্তারিত আলোচনাটি আছে। ভারতীয় শিক্ষাতত্ত্ব ও তাহার প্রয়োগে যাঁহারা পুরোধা তাঁহাদের কথা এখানে আলোচিত হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাসম্বন্ধীয় দর্শন সম্পর্কে লিখিয়াছেন অধ্যাপক অমিয়কুমার মজুমদার এবং উহার কার্যকর প্রয়োগের বিবরণ দিয়াছেন স্বামী বেদান্তানন্দ, স্বামী গোকুলানন্দ, শ্রীবিভুপ্রসাদ বসু ও শ্রী এম্. কে. রামস্বামী। রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষাচিন্তা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন যথাক্রমে ডঃ অরুণা হালদার ও ডঃ সুকুমার বসু। গান্ধীজীর শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন শ্রীকে. অরুণাচলম ও শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষা সম্বন্ধে এই কয়টি আলোচনা আছে : খৃষ্টান শিক্ষাসংস্থা—ফাদার মামুটিল ; ব্রাহ্ম সমাজ—শ্রীদীপেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ; আর্য সমাজ—শ্রী এস্. পি সাক্সেনা ; থিওসফিক্যাল সোসাইটি—শ্রী পি. এন্. চক্রবর্তী। সবশেষে

আধ্যাত্মিক-শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অধ্যাপক বিমলেশ্বর দের রচনা।

একটা কথা, এই রকম আলোচনা, যাঁহারা সেই সেই শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত রহিয়াছেন, এমন লেখকদের দ্বারাই লেখানো উচিত। এই গ্রন্থে অন্ততঃ তিনটি বিষয়ে—রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ ও ব্রাহ্মসমাজ—উহা হয় নাই। দ্বিতীয় কথা, গ্রন্থটি ভারতীয় শিক্ষাধারার উপর একটি মূল্যবান প্রকাশন হওয়া সত্ত্বেও, Souvenir-ধরনের হওয়াতে, আশঙ্কা হয় গ্রন্থ হিসাবে হয়তো সযত্নে রক্ষিত হইবে না।

তবু বলিতে হইবে, বইখানি ভারতীয় শিক্ষানায়কদের ভাবধারার পরিচয়বহ একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশন। ইহা পাঠ করিলে সকলেই—বিশেষতঃ শিক্ষক ও ছাত্রগণ বিশেষ উপকৃত হইবেন, সন্দেহ নাই।

শ্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণবর্ণানুক্রম-কীর্তনম্ : স্বামী বিমলানন্দ। প্রকাশক : অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, মঙ্গলোর। (১৯৭৬), পৃষ্ঠা ৫৬, মূল্য দেড় টাকা।

আলোচ্য পুস্তিকাখানি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাহাত্ম্য-বর্ণনাকারী একটি সমুজ্জ্বল স্তবমালা। অ-কার হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ণানুক্রমে হ-কার পর্যন্ত চল্লিশটি মাত্রিকা আদিতে প্রয়োগ করিয়া ৩৬৫ পঙ্‌ক্তিতে প্রাঞ্জল সংস্কৃত ভাষায় এই স্তোত্রগুলি রচিত। ৩৬৫টি চরণ সংবৎসর-চক্রের ৩৬৫টি অর-স্থানীয়। প্রতিটি চরণের ইংরেজীতে অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। চরণের প্রথম অংশে ভাবগর্ভ সংক্ষিপ্ত শব্দবিন্যাসে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গুণগরিমার এক একটি দিক উদ্ভাসিত হইয়াছে এবং শেষ অংশে 'শ্রীরামকৃষ্ণ' নাম বারবার আবৃত্ত হওয়ায় স্তবপাঠের সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃ জপক্রিয়াও হইয়া যায়। পুস্তিকাটির উদ্দেশ্য শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমাকীর্তন ও তাঁহার শ্রীপদে শ্রদ্ধাঞ্জলি। উহার শেষে ৩০টি শ্লোকে 'শ্রীরামকৃষ্ণাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রম্' সন্নিবেশিত হওয়ায় পুস্তিকাটি অধিকতর সমৃদ্ধ হইয়াছে। স্তোত্রপাঠ, প্রার্থনা, নামকীর্তন—এসকলই সাধনার অঙ্গ। পুস্তিকাটি সাধকগণের অবশ্যই সমাদর লাভ করিবে আশা করি। ইহার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

পঞ্চবটী : শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সংসদের রজত জয়ন্তী স্মরণিকা (১৯৫৩-৭৭)। সম্পাদক : শ্রীসুধীরকুমার কুণ্ডু। প্রকাশক : শ্রীমতী নন্দিতা ভট্টাচার্য, ৩।এ শিবশঙ্কর মল্লিক লেন, শ্যামপুকুর, কলকাতা—৭০০০০৪। (১৯৭৭), পৃঃ ৭৮।

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সংসদের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত এই স্মারক গ্রন্থটিতে আছে স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ ও প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণার আশীর্বাণী; ঠাকুর, মা ও স্বামীজী সম্বন্ধে নানা আলোচনা ও তাঁদের অজস্র সুভাষিত। লেখক-লেখিকাদের মধ্যে আছেন স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, স্বামী দেবানন্দ, স্বামী প্রেমরূপানন্দ, স্বামী তীর্থানন্দ, স্বামী তথাগতানন্দ, স্বামী চিৎসুখানন্দ, প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা, ডক্টর রমা চৌধুরী, অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্তা, অধ্যাপক বিধুভূষণ ভট্টাচার্য ও শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সংসদ ও মন্দিরের বিকাশের বিবরণ দিয়েছেন শ্রীরামকুমার ভট্টাচার্য। অনেকগুলি রচনাই রমণীয়। তার মধ্যে অমিয়বাবুর ছোট্ট লেখাটি মন কেড়ে নেয়। সম্পাদনায় শ্রম ও নিষ্ঠার ছাপ আছে; কিন্তু বেশ কিছু অপরিণত উচ্ছ্বাস, অবান্তর উক্তি ও

ছাপার ভুল গ্রন্থখানির মর্যাদা কতকটা ক্ষুণ্ণ করেছে।

যাই হোক, বিষয়বস্তু যেমন বহুলাংশে হৃদয়গ্রাহী, বইটির ছাপা বাঁধাই কাগজ, বিশেষতঃ প্রচ্ছদপটটি, তেমনি নয়নাভিরাম। ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি এবং দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় মঠ ও পঞ্চবটীর ছবিগুলির জন্যেও বইখানি নিঃসন্দেহে সংগ্রহ ও সংরক্ষণের যোগ্য।

প্রাপ্তিস্বীকার

মহৎ স্মৃতি : স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। (১৩৮৪) পৃঃ ৭৯, মূল্য ৫'০০ টাকা।

স্তুতি : প্রকাশক : স্বামী গৌতমানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন, আলঙ্, অরুণাচল প্রদেশ, মূল্য ৪'৫০ ও ৫'৫০ টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাকথা : শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়, কলকাতা প্রকাশনা। পৃষ্ঠা ২১৫, মূল্য ৮'০০ টাকা।

ছোটদের শ্রীরামকৃষ্ণ : শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়, কলকাতা প্রকাশনা। পৃষ্ঠা ৪৭, মূল্য ১'০০ টাকা।

ছোটদের সারদামণি : শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়, কলকাতা প্রকাশনা। পৃষ্ঠা ৪৭, ১'০০ টাকা।

ছোটদের বিবেকানন্দ : শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়, কলকাতা প্রকাশনা। পৃষ্ঠা ৪৭, মূল্য ১'০০ টাকা।

সন্দীপন : প্রকাশক : স্বামী স্মরণানন্দ, সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণমন্দির, বেলুড়।

ভক্তিগীতিমাল্য : ডাঃ ব্রজদুলাল দে। প্রকাশক : শ্রীজগৎরঞ্জন মজুমদার, সাহিত্য ভারতী প্রকাশনী, ২৮-এ রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীট, কলিকাতা-৩। (১৩৮৪) পৃঃ ৮০, মূল্য ৫'০০ টাকা।

অবতরণ : শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪৩-তম আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের পক্ষে শ্রীঅভিমন্যু দাশ কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা (১৯৭৮)।

সিঁথি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ স্মরণিকা, ১৩৮৪। প্রকাশক : শ্রীস্বপন দাশগুপ্ত, ৭৬বি কালীচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা ৫০।

মুকুন্দমালা : প্রকাশক : শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, (শিবালয়), কর্ণনগর, শ্রীনগর (কাশ্মীর), মূল্য তিন টাকা।

Vivek Jivan : Camp Number 1978. Published by Sri Nabaniharan Mukhopadhyay, Akhil Bharat Vivekananda Yuva Mahamandal

Mind and Mental Therapy: Sri A. K. Mukherji. Published by Sahitya Kalpa, C-6, College Street Market, Calcutta-700007, (1977), pp. 81, Price 5'00.

Sri Ramakrishna Math Souvenir, 1978. Published by the President, Sri Ramakrishna Math, Nattarampalli, North Arcot (Dist), Tamil Nadu.

Ramakrishna Mission Souvenir, 1978, Published by Swami Niramoyananda, Ramakrishna Mission, Bombay 400052.

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণকার্য

ভারতে : ঘূর্ণিবাত্যাত্রাণ: (ক) তামিলনাড়ুর দুইটি গ্রামে ৫৭টি গৃহের নির্মাণকার্য শীঘ্রই সম্পূর্ণ হইবে আশা করা যায়। (খ) অন্ধ্রপ্রদেশের ৮টি গ্রামে ১০০০টি ঝড়-প্রতিরোধক গৃহনির্মাণ-প্রকল্পের নির্মাণকার্য চলিতেছে। পুলিগড্ডায় মিশনের কারখানায় গড়ে দৈনিক ছাদনির্মাণের জন্য ৩৭৪০ খানি সিমেণ্ট-পাটা ও দেওয়ালের জন্য ১২১৮৫ খানি আর. সি. সি. টালি উৎপন্ন হইতেছে। তিনটি গ্রামের ২৮৮ খানি গৃহের নির্মাণকার্য সমাপ্তির বিভিন্ন স্তরে রহিয়াছে। সমাজগৃহের নির্মাণসহ পূর্বোক্ত ৮টি গ্রামে পুনর্বাসন, পরিকল্পনা অনুযায়ী জুন ১৯৭৯-এর মধ্যে সম্পূর্ণ হইবার কথা। (গ) ওড়িশার কেওঁঝর জিলার ১৯৩টি পরিবারের প্রত্যেকটি পরিবারকে পাঁচটি দ্রব্যের এক প্রস্থ বাসন-পত্র দেওয়ার পর ত্রাণকার্য বন্ধ করা হইয়াছে। ইহাতে মোট প্রায় ১০,০০০ টাকা খরচ হইয়াছে।

উদ্বাস্তু-ত্রাণকার্য : দণ্ডকারণ্য-পরিত্যাগীদের জন্য খড়্গপুর রেল-স্টেশনে খাদ্যবিতরণ অব্যাহত আছে, কিন্তু হাওড়া রেল-স্টেশনের কেন্দ্রটি গত ৮ই মে হইতে বন্ধ করা হইয়াছে কারণ উদ্বাস্তুদের আর সেখানে থাকিতে দেওয়া হয় না। (৩১.৫.৭৮)

বাংলাদেশে : বাগেরহাট, ঢাকা, দিনাজপুর ও নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রের মাধ্যমে রোগীদের চিকিৎসা এবং ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রের মাধ্যমে দুগ্ধবিতরণ অব্যাহত আছে।

নূতন মঠকেন্দ্র

বড়িশায় (২৪ পরগণা) রামকৃষ্ণ মঠের জমিতে গত ১০ই মে ১৯৭৮, শ্রীমৎ স্বামী দয়ানন্দজী একটি নিঃশুল্ক বহির্বিভাগীয় চিকিৎসা কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে এখানে সপ্তাহে দুই দিন রোগীদের চিকিৎসা করা হইবে।

সুবর্ণজয়ন্তী

মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ গত ২৬শে এপ্রিল ১৯৭৮ — পঞ্চাশটি দীপবিশিষ্ট একটি ঝাড়-প্রদীপ জ্বালিয়া। ঐ দিন বিকালে তাঁহার সভাপতিত্বে একটি সুবর্ণজয়ন্তী উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং রাত্রে বিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্ররা 'দুর্গাদাস' নাটক মঞ্চস্থ করে। ২৭শে প্রাক্তন ছাত্র দিবসে প্রাক্তন ছাত্র সম্মেলনে কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্র বক্তৃতা করেন। ২৮শে সন্ধ্যায় ছাত্রদের আবৃত্তি, ক্রীড়াকৌশল ও ব্রতচারী নৃত্য প্রদর্শিত হয়। ২৯শে সকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা হয়। বিকালে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি সহ শোভাযাত্রা গ্রাম পরিক্রমা করে। সন্ধ্যায় ধর্মসভাতে বক্তৃতা দেন স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ ও স্বামী জিতাত্মানন্দ। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধিদানন্দ আশ্রমের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। সভান্তে প্রায় দুই হাজার ভক্ত বসিয়া খিচুড়ি প্রসাদ ধারণ করেন। রাত্রে শিক্ষকগণ

কর্তৃক 'প্রবীরার্জুন' যাত্রাভিনয় হয়। ১লা মে কাকদ্বীপ কিশোর সংঘ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ধর্মসভাতে সভাপতিত্ব করেন শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন স্বামী ভৈরবানন্দ ও স্বামী শান্তরূপানন্দ। সভার পূর্বে শহরের বালক-বালিকারা ঠাকুরের প্রতিকৃতি সহ শোভা-যাত্রা লইয়া শহর পরিক্রমা করে। সভান্তে সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের কর্মীরা চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন। ৩রা উত্তর সুরেন্দ্র-গঞ্জ বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরে ঠাকুরের বিশেষ পূজা, ভোগরাগ ও হোম হয়। মধ্যাহ্নে দরিদ্রনারায়ণসেবা হয়। সন্ধ্যায় ধর্মসভাতে সভাপতিত্ব করেন স্বামী ভৈরবানন্দ এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন স্বামী শান্তরূপানন্দ ও শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়। ৪ঠা ছোট রাক্ষসখালিতে ধর্মসভা হয়। ৫ই ব্রজবল্লভপুর হাই স্কুলে উৎসব হয়। সকালে স্থানীয় ১৯টি বিদ্যালয়ের প্রায় দুই হাজার ছাত্রছাত্রী প্রভাতফেরীতে যোগদান করে। তাহাদের এবং আরও অনেক ভক্তকে বসাইয়া খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় ধর্মসভাতে এবং রাত্রে 'নিমাই সন্ন্যাস' যাত্রাগানের আসরে বিপুল জনসমাগম ঘটে। ৬ই সকালে পাথরপ্রতিমা হাই স্কুলে এবং সন্ধ্যায় হরেন্দ্রনগর সবুজ সংসদ প্রাঙ্গণে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসব

পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১০ই হইতে ১৮ই মার্চ ১৯৭৮, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি-উৎসব পালিত হয়। ১০ই মঙ্গলারতি, বেদপাঠ, বিশেষ পূজা ও হোম, প্রসাদবিতরণ এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী আলোচিত হয়। সন্ধ্যায় 'রামকৃষ্ণ-গীতি-আলেখ্য' পরিবেশিত হয়। ১১ই আবৃত্তি- ও বক্তৃতা-প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীহংসকুমার তেওয়ারী। ১২ই জনসভায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে ভাষণ দেন স্বামী শ্রীধরানন্দ ও শ্রীবীরেশ্বর গাঙ্গুলী। ১৩ই স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ভাষণ দেন স্বামী শ্রীধরানন্দ। ১৪ই হইতে ১৭ই রামায়ণগান করেন শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী। ১৮ই ধর্ম সম্বন্ধে ভাষণ দেন বেদবাচস্পতি শ্রীরামানুজ তথাচারিয়ার।

সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বহরমপুরে গত ৩১শে মার্চ এবং ১লা ও ২রা এপ্রিল ১৯৭৮, অপরাহ্নে ধর্মসভার আয়োজন করেন। উক্ত দিবসত্রয়ে স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে ভাষণ দেন স্বামী তীর্থানন্দ, স্বামী উমানন্দ ও শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ। শেষ দিবসে আলোচনায় যোগ দেন ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ। প্রতিদিনই সভাপতি ছিলেন স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ এবং রামায়ণগান করেন শ্রীকানাইলাল হালদার। ২রা মঙ্গলারতি, বেদপাঠ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতপাঠ, বিশেষ পূজা ও হোমাদি হয়।

বালিয়াটী (ঢাকা) রামকৃষ্ণ আশ্রম ও মিশন সেবাশ্রমে গত ২রা এপ্রিল ১৯৭৮, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে মঙ্গলারতি, বেদপাঠ, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, কথামৃত-পাঠ, শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও প্রসাদ-বিতরণ হয়। অপরাহ্নে ধর্মসভায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে ভাষণ দেন স্বামী সর্বেশ্বরানন্দ, শ্রীসুশীলকুমার চক্রবর্তী, জনাব মোঃ আবু বক্স খান, শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র পাণ্ডে, জনাব কে. এম. রাইস উদ্দীন খান, শ্রীসুভাষ দত্ত, মোঃ আরশেদ আলী চৌধুরী, জনাব

এ. জে. এম শহীদুজ্জামান এবং সভাপতি স্বামী অক্ষরানন্দ। সভান্তে শ্রীসুভাষচন্দ্র দত্তের পরিচালনায় সংগীত পরিবেশিত হয়।

ফরিদপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ৮ই হইতে ১০ই এপ্রিল ১৯৭৮, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মমহোৎসব পালিত হয়।

৮ই গুরুস্তব, ভক্তিমূলক সংগীত ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী সম্বন্ধে ভাষণ দেন স্বামী অক্ষরানন্দ, শ্রীবিমলকুমার বসু, জনাব নুরুল ইস্‌লাম, শ্রীসুধীররঞ্জন চক্রবর্তী, শ্রীঅশোক কুমার দাস ও সভাপতি শ্রীবীরেন্দ্রনাথ পাণ্ডে। ৯ই ধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ভাষণ দেন স্বামী পরদেবানন্দ, স্বামী অক্ষরানন্দ, শ্রীবিমল কুমার বসু, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ পাণ্ডে, জনাব লিয়াকৎ হোসেন, জনাব নুরুল ইসলাম, জনাব আবু রসিদ ও সভাপতি শ্রীচিত্তরঞ্জন চাক্‌মা। সভায় প্রবন্ধ পাঠ করে দীপালী সাহা, কবিতা পাঠ করে কিশোর অমিতাভ ও পদ্মাক্ষ এবং সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীসুকুমার কুণ্ডু ও শ্রীসুকুমার বিশ্বাস। স্বামীজী ও রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে রচনায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারী বিদ্যার্থীদের পুরস্কার দেওয়া হয়। ১০ই প্রায় ৪০০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

বিবিধ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী গত ১৭ই এপ্রিল কোয়াম্বাতুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের পলিটেক্‌নিক্ ছাত্রদের জন্য 'বিবেকানন্দ ইল্লম' নামে একটি চারতলা ছাত্রাবাসের উদ্বোধন করেন। (বিলম্বে পাওয়ায় এই সংবাদটি জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় পৃঃ ২৬৬, ২য় স্তম্ভে মুদ্রিত হয় নাই।) ১লা মে হইতে ২২শে মে পর্যন্ত পূজ্যপাদ মহারাজজী সংঘের তিনটি কেন্দ্রে যে সকল অনুষ্ঠান করেন, নিম্নে সেগুলির উল্লেখ করা হইল :

(১) ১লা মে ত্রিবান্দ্রাম রামকৃষ্ণ আশ্রমের নবীকৃত প্রার্থনা-গৃহের উৎসর্গীকরণ।

(২) ১০ই মে ত্যাগরাজনগর রামকৃষ্ণ মিশন বালক বিদ্যালয়সমূহের অন্তর্গত ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয়ের উদ্বোধন।

(৩) ২২শে মে টাকী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে একটি নূতন শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের উৎসর্গীকরণ।

রায়পুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ৫ই ফেব্রুআরি ১৯৭৮, মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল শ্রী এন. এন. ওয়াঞ্চু দাতব্য চিকিৎসালয়ে নূতন সংযোজিত ফিজিও-কাম-ইলেক্ট্রো-থেরাপি বিভাগের উদ্বোধন করেন। খরাত্রাণ প্রকল্প অনুযায়ী ৪৫টি গ্রামে খোদিত ৮টি পুষ্করিণী ও ৩৭টি কূপের উদ্বোধন করেন শ্রীমতী ওয়াঞ্চু।

ত্যাগরাজ নগরে (মাদ্রাজ) গত ৪ঠা মার্চ ১৯৭৮, তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল শ্রীপ্রভুদাস পাটওয়ারি বয়েজ স্কুলস হস্টেলের দোতলায় একটি নবনির্মিত প্রশস্ত শয়নকক্ষের উদ্বোধন করেন।

বোম্বে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২১শে মে ১৯৭৮, মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল শ্রীসাদিক আলি 'শিবানন্দ লাইব্রেরী' ও 'বিবেকানন্দ লেকচার হল'-এর উদ্বোধন করেন।

আলঙ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের একটি ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র 'ইউনেস্কো'র ২৭তম সর্ব-ভারতীয় সাধারণ-জ্ঞান-প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

দেহত্যাগ

গভীর দুঃখের সহিত আমরা তিনজন সন্ন্যাসীর দেহত্যাগ-সংবাদ জানাইতেছি:

স্বামী ত্র্যম্বকানন্দ (শক্তি মহারাজ) গত ১৪ই বৈশাখ রাত্রি একটায় ৮১ বৎসর বয়সে কনখল সেবাশ্রমে বার্ধক্যজনিত নানা অসুখে দেহত্যাগ করেন। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন; ১৯১৭ সালে বেলুড় মঠে যোগদান করেন এবং ১৯২৩ সালে শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা প্রাপ্ত হন। বেলুড় মঠ ব্যতীত উদ্বোধন, বোম্বে, কলম্বো এবং মহীশূর কেন্দ্রে তিনি পূজারী ছিলেন। গত কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি কনখল আশ্রমে অবসরজীবন যাপন করিতেছিলেন। কঠোর ও অনাড়ম্বর জীবনের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

স্বামী ভদ্রেপানন্দ (গিরি মহারাজ) গত ২১শে বৈশাখ বেরিলীতে এক বন্ধুগৃহে ৪৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তিনি কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে বিদায় জানাইতে মায়াবতী হইতে ৩রা মে বেরিলীতে যান এবং ঐ দিনই অসুস্থ হইয়া পড়েন। ক্রমে তাঁহার অবস্থা খারাপ হইতে থাকে এবং ৫ই সন্ধ্যায় হঠাৎ তাঁহার দেহান্ত হয়। মনে হয় তাঁহার অসুখের কারণ প্রথমতঃ সাংঘাতিক রকমের সর্দিগর্মি ও পরে পাকাশয়ের প্রদাহজনিত অন্যান্য জটিলতা।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন; ১৯৫২ সালে ব্যাঙ্গালোর আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৬২ সালে শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা প্রাপ্ত হন। মাদ্রাজ মঠে তিনি কিছুকাল কর্মী ছিলেন। ১৯৭১ হইতে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত তিনি 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন এবং এপ্রিল ১৯৭৭-এ মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হইয়া ঐ পদেই শেষ পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বিদ্বান্ সুবক্তা ও সুলেখক ছিলেন এবং নম্রতা সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার মধুর প্রকৃতি ও অনাড়ম্বর জীবনের জন্য সকলের প্রিয় ছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগে সংঘ একজন দক্ষ ও সম্ভাবনাপূর্ণ সদস্যকে হারাইল।

স্বামী দুর্গাত্মানন্দ (বলরাম মহারাজ) গত ২৭শে বৈশাখ রাত্রি ২-৫০ মিনিটে, ৭১ বৎসর বয়সে বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার দেহত্যাগের কারণ হৃৎপিণ্ডের রক্তসঞ্চালনশক্তির অক্ষমতা। বহুদিন যাবৎ হৃৎপিণ্ডের রক্ত-সরবরাহ কম হইয়া উহার কর্মপদ্ধতি বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় দশ মাস পূর্বে কলিকাতায় তাঁহার হৃৎপিণ্ডের উপর 'পেস মেকার' নামক যন্ত্র বসান হইয়াছিল। পরে তিনি বারাণসীতে প্রত্যাবর্তন করেন। সর্বপ্রকার সম্ভবপর চিকিৎসা সত্ত্বেও তাঁহার দেহাবসান হয়।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন; ১৯২৬ সালে উদ্বোধনে যোগদান করেন এবং ১৯৩৩ সালে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা প্রাপ্ত হন। উদ্বোধন ব্যতীত তিনি কলিকাতা ইন্‌স্টিটিউট্ অব কালচারের কর্মী এবং কালিম্পঙ্ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি পাঞ্জাবের উদ্বাস্তত্রাণ ও পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তত্রাণেও অংশগ্রহণ করেন। মধুর ও অমায়িক প্রকৃতির জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

ইঁহাদের দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক!

বিবিধ সংবাদ

জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসায় আশ্চর্য অগ্রগতি

জলাতঙ্ক (Rabies) একটি ভাইরাস (Virus) বা জীবপরমাণু-ঘটিত রোগ। এই রোগে আক্রান্ত জন্তুজানোয়ারের কামড়ানোর ফলে মানুষের জলাতঙ্করোগ হয়। এই অসুখ হইলে প্রায় সকলকেই মৃত্যুবরণ করিতে হয়। কামড়ানোর অব্যবহিত পরে ১৪টি (১৪ দিন) এই রোগের টিকা (antirabic vaccine) লইলে শতকরা প্রায় ৯৭ জনের জলাতঙ্করোগ হয় না। টিকার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষেধক সিরাম (hyper-immune serum) ইন্‌জেকসন লইলে রোগ-প্রতিরোধের হার শতকরা নিরানব্বই-এর উপর দাঁড়ায়। বর্তমানে এই টিকা তৈয়ারী হয় গবেষণাগারে রোগাক্রান্ত ভেড়ার (আমাদের দেশে), খরগোসের বা ইঁদুরের মস্তিষ্ক হইতে। টিকার মাধ্যমে এই সব জন্তুর মস্তিষ্কের অংশ মানুষের শরীরে প্রবেশ করিয়া কাহারও কাহারও ইন্‌জেকসন-ঘটিত এনকেফালাইটিস্ (encephalitis) নামক সাংঘাতিক রোগের সৃষ্টি করিতে পারে। সেইজন্য বহুদিন হইতে মস্তিষ্ক বাদ দিয়া কি করিয়া কার্যকরী টিকা তৈয়ারী করা যায়, ইহা লইয়া সারা পৃথিবীতে গবেষণা চলিতেছে। সম্প্রতি তেহরানে বিশ্বস্বাস্থ্য গবেষণা সংস্থা (WHO Collaborating Centre for Reference and Research in Rabies, Teheran) একটি নূতন ধরনের টিকা পাগলা কুকুর বা শৃগাল দ্বারা দংশিত ৪৫ জন ব্যক্তির দেহে প্রয়োগ করিয়া দেখাইয়াছে যে নব্বই বৎসর বয়স্ক একজন ছাড়া (যিনি পাঁচমাস পরে অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে হৃদ্‌রোগে মারা যান) আর সকলেই সুস্থ রহিয়াছেন।

মানুষের শরীরের কোষ ল্যাবরেটরিতে 'কালচার' (Tissue culture) করিয়া এবং পরে সেই কোষগুলিকে জলাতঙ্ক রোগের ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত করিয়া এই নূতন টিকা তৈয়ার করা হইয়াছে। এই টিকায় কোন মস্তিষ্কাংশ নাই বলিয়া এন্‌কেফালাইটিস্ হইবার ভয় নাই। উপরোক্ত ৪৫ জন দংশিত ব্যক্তিকে প্রথমে চারটি ও পরে দুইটি ইন্‌জেকসন দেওয়া হইয়াছিল। ইঁহাদের দেহে প্রয়োগ করিবার পূর্বে পরীক্ষামূলকভাবে পশ্চিম জারমানিতে ১০৮ জন সুস্থ ব্যক্তির দেহে এই টিকা দেওয়া হইয়াছিল; তাঁহাদের মধ্যে ৪৪ জনকে পরে পাগলা জন্তু দংশন করা সত্ত্বেও কাহারও জলাতঙ্ক রোগ হয় নাই।

উৎসব

মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা-নিবাসী ভক্তবৃন্দ স্থানীয় শ্রীরামজীর মন্দির-প্রাঙ্গণে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে ২৬শে ও ২৭শে মার্চ ১৯৭৮, অপরাহ্ণে ধর্মসভার আয়োজন করেন। ২৬শে স্বামী বাগীশানন্দ, ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর এবং শ্রীঅমূল্যচরণ গুহ স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীমা সারদাদেবীর জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। ২৭শে স্বামী ভৈরবানন্দ ও শ্রীঅমূল্যচরণ গুহ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনকথা অলোচনা করেন। উভয় দিনই আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী অনাময়ানন্দ সভার কার্য পরিচালনা করেন এবং শ্রীঅহিভূষণ ঠাকুর সভার শেষে শ্রীশ্রীচণ্ডীর গান পরিবেশন করেন।

পাণ্ডু (আসাম) বিবেকানন্দ পাঠচক্রে গত ১০ই মার্চ ১৯৭৮, মঙ্গলারতি, ভজন, পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-তিথি উদ্‌যাপিত হয়। মধ্যাহ্নে প্রসাদবিতরণ ও সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতপাঠ হয়। পরে কালীকীর্তন করেন 'এলোকেশী' কালীকীর্তন সম্প্রদায়। ১৭ই হইতে ১৯শে মার্চ সাধারণ উৎসব পালিত হয়। ১৭ই সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করেন শ্রীমতী আনয়নী দাশ, শ্রীভবানী বড়ুয়া ও স্বামী তীর্থানন্দ। ১৮ই সন্ধ্যায় স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করেন শ্রীসুখদেব সিংহ, শ্রী এ. ডি. সুব্রহ্মনিয়াম, স্বামী তীর্থানন্দ ও স্বামী ইজ্যানন্দ। ১৯শে মঙ্গলারতি ভজন বরগীত পদাবলীকীর্তন (অসমীয়া নামকীর্তন) ও বিশেষ পূজা হয়। প্রায় পাঁচ হাজার ভক্ত বসিয়া প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে ভাষণ দেন শ্রীগোপাল আচার্য, স্বামী দেবদেবানন্দ ও সভাপতি স্বামী তীর্থানন্দ।

গোপালপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১২ই মার্চ ১৯৭৮, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসব মঙ্গলারতি, গীতা শ্রীশ্রীচণ্ডী ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ, শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, হোম প্রভৃতির মাধ্যমে পালিত হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় দুই হাজার ভক্ত প্রসাদ পান। অপরাহ্নে আশ্রম-বালকেরা রামনাম সংকীর্তন করে এবং ধর্মসভায় ভাষণ দেন ব্রহ্মচারী হরেন্দ্রনারায়ণ, শ্রীপ্রাণকুমার মজুমদার, শ্রীজয়দেব সাহা ও সভাপতি স্বামী চিৎসুখানন্দ।

আরারিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ১০ই হইতে ১৫ই মার্চ :৯৭৮, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসব পালিত হয়। ১০ই মঙ্গলারতি উষাকীর্তন বিশেষ পূজা পাঠ হোম প্রসাদবিতরণ ইত্যাদি হয়। বৈকালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ পাঠ ও আরতির পর ভজন-সংগীত হয়। ১১ই অষ্টপ্রহর নাম-সংকীর্তন, ১২ই প্রায় দেড় হাজার দরিদ্র-নারায়ণের সেবা এবং ১৩ই আবৃত্তি ও প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা হয়। ১৪ই ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমায়ের কথা আলোচনা করেন স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ। পরে রামায়ণগান হয়। ১৫ই ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী বিকাশানন্দ। পরে পুরস্কার-বিতরণ ও রামায়ণগান হয়।

ডিব্রুগড় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি গত ১৫ই হইতে ১৯শে মার্চ ১৯৭৮, শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের আবির্ভাব-উৎসব ও তৎসহ সমিতির সুবর্ণ-জয়ন্তী পালন করে। ১৫ই প্রায় এক হাজার ভক্তের একটি শোভাযাত্রা শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর তৈলচিত্র লইয়া নগর-পরিক্রমা করে। স্বামী মহানন্দ উৎসবে প্রতিদিন ধর্মীয় আলোচনা করেন। ১৯শে প্রায় আট হাজার ব্যক্তি প্রসাদ পান এবং সন্ধ্যায় স্বামী প্রমথানন্দ ধর্মসভায় ভাষণ দেন। উৎসবের একটি অঙ্গ ছিল ছোটদের সঙ্গীত, রচনা ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা।

আলিপুরদুয়ার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৮ই হইতে ২০শে মার্চ ১৯৭৮, ভগবান শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের ১৪৩ তম জন্মোৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষে বিভিন্ন দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী বিনয়ানন্দ ও স্বামী বিকাশানন্দ। ১৯শে পূর্বাহ্নে স্বামী লোকে-শ্বরানন্দ নবনির্মিত 'সন্ন্যাসী-আবাসে'র দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। পরে ঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোমান্তে সহস্রাধিক ভক্ত খিচুড়ি

প্রসাদ গ্রহণ করেন। প্রত্যহ সভান্তে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাগীতি' পরিবেশন করেন শ্রীলক্ষ্মীকান্ত রায়।

খগৌল (পাটনা) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে গত ১৯শে মার্চ ১৯৭৮, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪৩তম জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, পূজা, হোম ও কীর্তন হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় ২,০০০ দরিদ্রনারায়ণ ও ভক্ত প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে ভাষণ দেন স্বামী বেদান্তানন্দ, ডঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ, কুমারী শীলা মিশ্র ও সভাপতি শ্রীসুধেন্দুমোহন চট্টোপাধ্যায়।

সিন্দ্রী (ধানবাদ) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ১৯শে মার্চ ১৯৭৮, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষে মঙ্গলারতি বিশেষ পূজা কথামৃতপাঠ প্রসাদ-বিতরণ ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী মিত্রানন্দ স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ স্বামী ভবহরানন্দ এবং ডক্টর চন্দ্রানন ঠাকুর।

দুর্গাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ১৯শে হইতে ২১শে মার্চ ১৯৭৮, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-দিবস নগরপরিক্রমা শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ গীতাপাঠ পূজা হোম ভজন প্রভৃতির মাধ্যমে পালিত হয়। সহস্রাধিক নরনারী বসিয়া প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অজজানন্দ ও সভাপতি শ্রীপি. কে. রায়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীবিমল বসু। ২০শে সন্ধ্যায় ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জীবন ও বাণী আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা অসিতাপ্রাণা ও সভানেত্রী শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য। পরে 'নীলাচলে মহাপ্রভু' ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়। ২১শে সন্ধ্যায় সারদা-লীলাগীতি পরিবেশন করেন উলুবেড়িয়ার 'সুন্দরম্'। উৎসবের একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল চিত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর জীবনালেখ্য-প্রদর্শন।

এন্টালি রামকৃষ্ণ অর্চনালয়ের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে গত ২৫শে মার্চ ১৯৭৮, মঙ্গলারতি ভোগরাগ ও ভজনাদি হয়। সন্ধ্যায় ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ। পরে ভক্তিমূলক সংগীত পরিবেশিত হয়। ২৬শে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমা স্বামীজী ও মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি সহ নগর-পরিক্রমার পর মধ্যাহ্নে প্রায় ১৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী শান্তরূপানন্দ। পরে 'মীরাবাঈ' গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন 'ভক্তিতীর্থ' সম্প্রদায়। ২৯শে বেলুড় জনশিক্ষা মন্দির কর্তৃক 'দাতাকর্ণ' ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়।

হলদিয়া রামকৃষ্ণ সংস্কৃতি কেন্দ্রে গত ২৪শে হইতে ২৬শে মার্চ ১৯৭৮, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। ২৪শে শ্রীমদ্‌ভাগবতপাঠ, ভক্তিমূলক সঙ্গীত ও পালাকীর্তন এবং ২৫শে সারাদিনব্যাপী হরিনাম-সংকীর্তন হয়। ২৬শে মঙ্গলারতি উষাকীর্তন প্রভাতফেরি, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা ও হোম, নরনারায়ণসেবা, কথামৃতপাঠ ও ধর্মসভা হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ স্বামী বিশুদ্ধাত্মানন্দ ও সভাপতি শ্রীপ্রবীরকুমার বিশ্বাস। হলদিয়া ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি হইতে প্রত্যহ বহু লোক উৎসবে যোগদান করেন। হলদিয়ার দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্রাদি বিতরিত হয়।

দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ২৬শে মার্চ ১৯৭৮, চিত্তরঞ্জন বিদ্যালয় ভবনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের

জন্মোৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ঠাকুরের বিশেষ পূজা ভজন লীলাগীতি গীতা ও কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা প্রসাদবিতরণ এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন শ্রীশিবশম্ভু সরকার শ্রীরমেন্দ্রনারায়ণ সরকার ও সভাপতি স্বামী সুহিতানন্দ। একটি স্মারক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়।

নব ব্যারাকপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদে গত ২৬শে ও ২৭শে মার্চ ১৯৭৮, স্বামী বিবেকানন্দের ১১৬তম আবির্ভাব-উৎসব পালিত হয়। ২৬শে মঙ্গলারতি, শোভাযাত্রা-সহ পথপরিক্রমা, শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, ভক্তি-মূলক সংগীত ও প্রসাদ-বিতরণ হয়। অপরাহ্ণে ছাত্র সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন শ্রীনির্মল-কুমার সেন। সন্ধ্যায় স্তবাদির পর ধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ভাষণ দেন স্বামী তীর্থানন্দ, স্বামী রমানন্দ ও সভাপতি স্বামী বন্দনানন্দ। সভান্তে 'শ্রীরামকৃষ্ণগীতি-আলেখ্য' পরিবেশিত হয়। ২৭শে অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ পুঁথি ও স্বামীজীর পত্রাবলী পাঠ করা হয়। সন্ধ্যায় স্তবাদির পর ধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীশ্রীমা ও শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে ভাষণ দেন যথাক্রমে স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ স্বামী শিবময়ানন্দ ও সভাপতি স্বামী পুরুষা-নন্দ। সভান্তে সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী গোপা কাঞ্জিলাল ও শ্রীভূপেন চক্রবর্তী।

কলিকাতা শ্রীসারদা সঙ্ঘে গত ২৯শে মার্চ হইতে ২রা এপ্রিল ১৯৭৮, শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে ১০১ ঘণ্টাব্যাপী অখণ্ড কথামৃতপাঠ এবং প্রতিদিন পূজা ও ভজন হয়। শেষ দিনে দরিদ্রনারায়ণ ও ভক্তগণ বসিয়া প্রসাদ পান।

দিনহাটা *(কোচবিহার)* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে গত ৩০শে, ৩১শে মার্চ ও ১লা এপ্রিল ১৯৭৮, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব বিশেষ পূজা, কথামৃতপাঠ, ভজন ও শোভা-যাত্রার মাধ্যমে পালিত হয়। প্রায় দুই হাজার ভক্ত প্রসাদ পান। স্বামী ঋদ্ধানন্দ কথামৃত পাঠ ও আলোচনা করেন। শ্রীযোগেশচন্দ্র দাস ও কৃশ সাহা বক্তৃতা করেন। রামকৃষ্ণ সংগীত সমাজ (আলিপুরদুয়ার) 'রামকৃষ্ণ লীলাগীতি' পরিবেশন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও চিত্র সংবলিত একটি প্রদর্শনীও উৎসবের অঙ্গ ছিল। উক্ত উৎসবে আবৃত্তি, সংগীত, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার দেওয়া হয়।

দোমড়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১লা ও ২রা এপ্রিল ১৯৭৮, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। ১লা তারকব্রহ্মনাম ও মাথুর গান হয়। ২রা শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা হোম ও প্রসাদ-বিতরণ হয়। অপরাহ্ণে ধর্মসভায় ভাষণ দেন শ্রীদেবরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। সন্ধ্যায় লোকগীতি ও গীতিনাট্য পরিবেশিত হয়।

ইন্দ্রাণী পার্ক (কলিকাতা) শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ পাঠচক্রে গত ৮ই ও ৯ই এপ্রিল ১৯৭৮, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। ৮ই প্রভাতফেরি ও নরনারায়ণসেবা হয়। সন্ধ্যায় ধর্মসভায় ভাষণ দেন ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় রেভারেণ্ড আর আঁতোয়ান ও সভাপতি স্বামী নিরবদ্যানন্দ। 'রামকৃষ্ণলীলা-গীতি'ও পরিবেশিত হয়। ৯ই শ্রীশ্রীসারদা-দেবীর সম্বন্ধে ভাষণ দেন স্বামী শান্তরূপানন্দ। শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও সম্প্রদায় কর্তৃক

সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। শ্রীরমেন্দ্রলাল রায়ের স্বামীজী সম্বন্ধীয় আবৃত্তিও উল্লেখযোগ্য।

পূর্ণিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১১ই হইতে ১৮ই এপ্রিল ১৯৭৮, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব ও শ্রীশ্রীবাসন্তী দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে আয়োজিত ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর সম্বন্ধে ভাষণ দেন স্বামী অনুপমানন্দ স্বামী প্রত্যয়ানন্দ স্বামী বিকাশানন্দ ও শ্রীমহেন্দ্রনাথ শরণ। ১৭ই পূর্বাহ্নে পূজা ও মধ্যাহ্নে প্রায় ৫০০০ দরিদ্রনারায়ণ প্রসাদ পান।

খড়্গপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটিতে ১২ই হইতে ১৬ই এপ্রিল ১৯৭৮, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষে বিভিন্ন দিনে ভজন-কীর্তন 'শ্রীমদ্‌ভাগবত' ও 'রামচরিতমানস' পাঠ ও আলোচনা শোভাযাত্রা শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোম প্রসাদবিতরণ যজ্ঞ ও ধর্মসভা হয়। ধর্মসভাগুলিতে ভাষণ দেন স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ স্বামী বিশোকাত্মানন্দ ডঃ প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত শ্রীঅমিয়-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ রমা চৌধুরী। প্রায় ৩০০০ দরিদ্রনারায়ণের সেবা করা হয়। আলোচনা ও সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন ডঃ বাসন্তী চৌধুরী, সর্বশ্রী বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, পান্নালাল বসু, স্বামী শিবানন্দ গিরি ও শ্রীমতী অনন্তা দেবী।

পশ্চিম রাজাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে গত ১৫ই ও ১৬ই এপ্রিল ১৯৭৮, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসব পালিত হয়। ১৫ই বালিকারা 'শ্রীমা সারদা' নাটিকাটি অভিনয় করে। ১৬ই মঙ্গলারতি, রামনাম-সংকীর্তন, নগর-পরিক্রমা, শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোম, প্রসাদবিতরণ প্রভৃতি হয়। সন্ধ্যায় ধর্মসভায় ভাষণ দেন শ্রীশিবশম্ভু সরকার ও সভাপতি স্বামী চিৎসুখানন্দ। 'নৌমি জগৎ-গুরু-শ্রীরামকৃষ্ণম্' নামে একটি স্মারক গ্রন্থও প্রকাশিত হয়।

পূর্ব সিঁথি (দমদম) শ্রীসারদা রামকৃষ্ণ পাঠচক্রে গত ৭ই মে ১৯৭৮, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসব উপলক্ষে মঙ্গলারতি শোভাযাত্রা-সহকারে নগর-পরিক্রমা কথামৃত-পাঠ ও বিশেষ পূজা হয়। তিন শতাধিক ভক্ত বসিয়া প্রসাদ পান। অপরাহ্নে ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী বিবিক্তানন্দ ও সভাপতি স্বামী হৃদানন্দ।

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সংসদে গত ১লা হইতে ৪ঠা এপ্রিল ১৯৭৮, সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-উৎসব পালিত হয়। ১লা প্রাতে পূজা শ্রীশ্রীচণ্ডী ও গীতা পাঠ, কথামৃত লীলাপ্রসঙ্গ ও শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি পাঠ ও আলোচনা, ভজনাদি ও মধ্যাহ্নে প্রসাদবিতরণ হয়। সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে ভাষণ দেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। পরে রামায়ণগান করেন শ্রীদ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়। ২রা শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে স্বামী মহানন্দ ও ৩রা স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার ভাষণ দেন। ৪ঠা শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা অসিতাপ্রাণা ও ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য। বিভিন্ন দিনে 'মায়ের খেলা' কর্তৃক সারদালীলাগীতি, 'রাধা-দামোদর কীর্তন সমাজ' কর্তৃক লীলাকীর্তন, 'সিদ্ধেশ্বরী কালীকীর্তন সমিতি' কর্তৃক কালীকীর্তন এবং শ্রীসুনীলবরণ ও শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য কর্তৃক রামনাম-সংকীর্তন ও ভজনাদি পরিবেশিত হয়।

ভক্তগণ সেই সকলে অবগাহন ও স্নান করিয়া আপনাদিগকে পবিত্র মনে করেন। জলে কেহ নিষ্ঠীবন বা উচ্ছিষ্টোদক পরিত্যাগ করেন না। স্থলে স্থলে পুষ্পোদ্যানগুলি পুষ্পিত লতা গুল্ম তরুরাজিতে মণ্ডিত হইয়া, এবং চতুর্দ্দিকে সৌরভ বিকীর্ণ করিয়া দেবনগরের সম্যক্ শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। দেবদেব যেন নগরপর্য্যবেক্ষণের ভার স্মিতবিকশিতাননা শান্তিদেবীর হস্তে সমর্পণ করিয়া, নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন। "ভূতলে অতুলশোভা" দেখিতে হইলে, দগ্ধচিত্তকে শান্তিরসাভিষিক্ত করিতে হইলে, পৃথিবীতে থাকিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিতে হইলে, অতীন্দ্রিয় ও বুদ্ধিগ্রাহ্য যোগানন্দের কিঞ্চিৎ আভাস পাইতে হইলে, ভক্তহৃদয়ের পরম পবিত্র উচ্ছ্বাস উপলব্ধি করিতে হইলে, সজ্জনমাত্রেরই এইসকল অমরভূমি দর্শন করা একান্ত বিধেয়।

চিদম্বরস্থ নটরাজের মন্দির অতি বিশাল। ইহার স্বত্বাধিকারী ব্রাহ্মণেরা দীক্ষিতর নামে বিখ্যাত। কথিত আছে, পূর্ব্বে এইসকল দীক্ষিতর এক সহস্র পরিবারে ব্যাপ্ত ছিল এবং ইঁহাদেরই বংশে ভগবান্ নটরাজের আবির্ভাব হয়। অধুনা সেই সহস্র পরিবারের সংখ্যা কিঞ্চিৎ ন্যূন হইয়া গিয়াছে। ইঁহারাই শ্রীশ্রীনটরাজের সেবাকার্য্যে অহরহ নিযুক্ত থাকেন। ইঁহারাই মন্দিরের সর্ব্বতোভাবে স্বত্বাধিকারী। নীচকুলোদ্ভব মহামনা ভক্তশ্রেষ্ঠ নন্দ, এবং মাণিক্য বাচকর্ নামক আর একজন ঈশ্বরপ্রেমিক এই সুবিশাল মন্দিরের দুইটি সমুজ্জ্বল রত্নস্বরূপ। তাঁহারা নটরাজের গুণগান করিয়া সর্ব্বদাই শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করিতেন। প্রেমোন্মত্তহৃদয়ে কত কত সুন্দর কবিতা রচনা করিতেন। সজ্জনগণ তাঁহাদিগকে শ্রীশ্রীনটরাজের সচলমূর্ত্তি বলিয়া বিশ্বাস ও পূজা করিতেন।

দীক্ষিতরগণ চিদম্বরকে এত পবিত্র স্থান বলিয়া মনে করেন যে, তাঁহারা তাহা পরিত্যাগ করিয়া কদাচ অন্যত্র গমন করেন না। সুতরাং তাঁহাদের মানবলীলার আরম্ভ ও পর্য্যবসান উভয়ই সেই পবিত্র ভূমিতে হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীনটরাজ মহাদেবের নৃত্যমূর্ত্তি। কথিত আছে যে, একদা মহেশ্বরী স্বীয় সঙ্গিনীগণ সমভিব্যাহারে এরূপ নৃত্যোন্মত্তা হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের পদভরে ধরিত্রীদেবী সাতিশয় কাতরা হইয়া শ্রীশ্রীসদাশিবের শরণাগতা হয়েন। তিনি অশেষ অনুনয় বিনয় সহকারেও যখন পার্ব্বতীকে নিরস্তা করিতে পারিলেন না, তখন আপনিই এমনি তাণ্ডবোন্মত্ত হইলেন যে, দেবীর নৃত্য তাঁহার নিকট সাতিশয় অকিঞ্চিৎকর বোধ হইল। সুতরাং তিনি লজ্জিতা হইয়া আপনার নৃত্য নিরস্ত করিলেন। মহাদেবও, আপনার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে দেখিয়া, শান্ত হইলেন।

পঞ্চভূত সদাশিবের পঞ্চমূর্ত্তি। কালহস্তী নামক স্থানে তাঁহার বায়ুমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। ত্রিচিনপল্লির নিকট শিবের জলমূর্ত্তি জম্বুকেশর নামে শোভা পাইতেছেন। এই মন্দিরটিও অতিশয় বিশাল। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, এখানে পার্ব্বতীপতি সর্ব্বদাই জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া আছেন। সপ্তপ্রাকারের মধ্যে গর্ভগৃহ। সেই গর্ভগৃহের মধ্যে ভূমিগর্ত্ত হইতে প্রস্রবণমুখ দিয়া অহরহ সলিলরাশি বহির্গত হইয়া ত্রিলোকপতির স্নানকার্য্য সম্পাদন করিতেছে। পূজক সেখানে জলমূর্ত্তির জলের উপরই পূজা করিয়া থাকেন।

(আষাঢ়, ১৩৬৫, পৃঃ ৩২৫)

[পুনর্মুদ্রণ]

কাঞ্চীপুরস্থ একাম্বরেশ্বর মহাদেবের পৃথিবীমূর্ত্তি। তিরুবন্নামলাই নামক স্থানে তাঁহার অগ্নিমূর্ত্তি বা রুদ্রমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। চিদম্বরস্থ বিশাল মন্দিরে তাঁহার আকাশমূর্ত্তির অধিষ্ঠান। যখন ব্রহ্মাণ্ডের সৃজনপালন-কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া জগতের একমাত্র মাতা পার্ব্বতী এবং জগতের একমাত্র পিতা মহেশ্বর স্বানন্দোল্লাসে নৃত্যরসে মগ্ন হয়েন, তখনই প্রলয়কালের আবির্ভাব। এই প্রলয়ের সময় রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দাত্মক ব্রহ্মাণ্ড অদৃশ্য হইয়া যাইলে, কেবল আকাশমাত্র অবশিষ্ট থাকে। সেই আকাশমূর্ত্তিই শ্রীশ্রীনটরাজের প্রকৃত মূর্ত্তি। পূজকেরা সেই অরূপ রূপেরই এখানে পূজা করিয়া থাকেন।

দাক্ষিণাত্যে শ্রীশ্রীশিবমন্দিরেরই সংখ্যা ও প্রাধান্য অধিক। ত্রিচিনপল্লিস্থ তায়মানবরের গিরিমন্দির, মথুরাস্থ মীনাক্ষী সুন্দরেশ্বরের মন্দির, পাম্বানদ্বীপস্থ শ্রীশ্রীরামেশ্বরের বিরাট্ মন্দির পৃথিবীর মধ্যে বাস্তবিকই অতি বিস্ময়কর দৃশ্য। আগামী বারে আমরা এই সকল মন্দিরসম্বন্ধীয় দুএকটি আখ্যায়িকা বর্ণন করিয়া পাঠকগণের তৃপ্তিসাধন করিতে চেষ্টা করিব ইচ্ছা রহিল।

রামকৃষ্ণ-মিশন।

আমেরিকা।

আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দের প্রচারকার্য্য এবং তথায় স্বামিগণের বেদান্তপ্রচারের প্রভাব সম্বন্ধে, একজন শিক্ষিতা আমেরিকান ব্রহ্মচারিণী নিউইয়র্ক হইতে অনেক সংবাদ দিতেছেন :—

(বোষ্টন ক্রিমেশন সভায় স্বামী অভেদানন্দ।)

১৮৯৯ সালের ১লা জুনে স্বামী অভেদানন্দ 'নিউ-ইংলণ্ড ক্রিমেসন সভার' (শবদাহসভার) সাম্বৎসরিক অধিবেশনে (বোষ্টনে) একটী বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন, ঐতিহাসিক সময়ের পূর্ব্ব হইতেই শবদাহপ্রথা ভারতে প্রচলিত; আর ঐ প্রথা, সমাধি দেওয়া অপেক্ষা, সাধারণ স্বাস্থ্যের অধিকতর উপযোগী। ইউনাইটেড ষ্টেটসে এক্ষণে এই প্রথা দ্রুত প্রচলিত হইয়া যাইতেছে। এই রাজ্যে সর্ব্বশুদ্ধ ২৪টি শবদাহস্থান (Crematories) আছে। স্বামীজি বলিলেন, সমাধিস্থান হইতে মৃতশরীরের পুনরুত্থান হয়, গত ২০০০ বৎসরের এই শিক্ষাই শবদাহপ্রথার প্রবল অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে। এক্ষণে এই কুসংস্কার চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইং ১৮৯৯ সালের ৩০শে এপ্রেলের 'এসোসিয়েটেড প্রেস ডেসপ্যাচ' (Associated Press Despatch) নামক পত্রিকা বলেন, লণ্ডনের বিশপ (Bishop) এবং আরও অনেক গণ্যমান্য পুরোহিত (Clergy) চর্চ্চ অফ ইংলণ্ডের প্রার্থনাপুস্তকে (Prayer book) একটি নূতন বিষয় যোগ করিবেন মনে করিতেছেন। শবদাহপ্রথার অতিশয় দ্রুত প্রচলন হেতু অনেকে মনে করিতেছেন, মৃতদেহকে অগ্নিসাৎ করিবার পূর্ব্বে কোন নূতনপ্রকার ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান আবশ্যক। যে সভার হস্তে এই নূতন প্রকার প্রণালী-নির্ণয়ের

ভার অর্পণ করা হইয়াছিল, তাহার কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু সে প্রণালীটি কি, তাহা এখনও জানা যায় নাই।

(স্বাধীন ধর্ম্মসমিতিতে—স্বামী অভেদানন্দ।)

তৎপরদিন স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকার স্বাধীন ধর্ম্মসমিতিতে, (Free Religious Association) উহার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে সহস্র শ্রোতার সমক্ষে এক বক্তৃতা করেন। ইহার প্রথম অধিবেশনে আলোচনার বিষয় ছিল—'অমরত্বের ধারণা' (Conception of Immortality)। কেম্ব্রিজ হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনবিশারদ অধ্যাপক রয়েস সাহেব 'অমরত্বের' পক্ষে দার্শনিক যুক্তিসমূহ বিবৃত করেন। নিউ ইয়র্ক কলম্বিয়া বিদ্যালয়ের অধ্যাপক দর্শনবিশারদ জে. এইচ. হিস্‌লপ Psychical research* এর দিক হইতে এই বিষয়টীর আলোচনা করেন। মিস এ. বি. টমসন অতীন্দ্রিয়বাদীদের (Transcendentalist) দিক হইতে এই বিষয়ের আলোচনা করেন। ডাক্তার লুইস জি. জেন্‌স (Dr Lewis G. Janes) অমরত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পরম্পরা বিবৃত করেন। স্বামী অভেদানন্দ যখন 'অমরত্ব' সম্বন্ধে প্রাচ্যদিগের মত বিবৃত করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সভাস্থ সকলে অতি আগ্রহের সহিত তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলেন।

এই সভার আর একটি অধিবেশন অতিশয় সন্তোষজনক হইয়াছিল। ইহাতে 'বর্ত্তমান চিন্তাপ্রণালীর আলোকে বাইবল' সম্বন্ধে আলোচনা হয়। 'চর্চ্চ'এর উন্নতমনা কৃশ্চান আচার্য্যগণের ভাব সাধারণের বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। রেভরেণ্ড বি. কে. মিল্‌স, যিনি সমুদয় ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সে অনেক দিন ধরিয়া একজন পুনরুদ্ধারবাদী বলিয়া (Revivalist**) বিখ্যাত ছিলেন এবং এক্ষণে যিনি একজন ইউনিটেরিয়ান আচার্য্য হইয়াছেন, বলিলেন—"আজকালকার বাইবল মানুষের পূর্ণ উন্নতির প্রতিবন্ধক, উহা কতকগুলি শ্রেণীর ভিতরে ভয়ানক প্রভেদের সৃষ্টি করিয়াছে। আজকালকার অবিশ্বাসীরাই প্রকৃত বিশ্বাসী। আমরা যখন এই পৃথিবীতেই চারিত্র্যহীনতারূপ নরক স্বীকার করিতেছি, তখন পরলোকে আর একটি নরক আছে, স্বীকার করায় লাভ কি? অপেক্ষাকৃত অধিক রক্ষণশীলসম্প্রদায়ভুক্ত-বক্তাগণের মধ্যে চিকাগোর রেভারেণ্ড জে. এল. জোনস বলিলেন যে, প্রাচীন প্রফেট (Prophet—ভবিষ্যদ্দৃষ্টিবান মহাপুরুষ দিগের উন্নত চিন্তা ও কার্য্য সমুদয়ই ওল্ডটেষ্টামেণ্টের পুরোহিতগণের দ্বারা রক্ষিত হইয়াছে।

(কর্ণেল রবার্ট ইঙ্গারসোল—বিখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী।)

কর্ণেল রবার্ট জি. ইঙ্গারসোল একজন বিখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী (Agnostic); তাঁহার যশ জগদ্ব্যাপী; খুব সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এই সভায় তাঁহার শেষ বক্তৃতায়, সুতরাং, বিশেষ আকর্ষণ আছে। কর্ণেল ইঙ্গারসোলের বিশেষ বিশেষ বিষয়ের মত সম্বন্ধে লোকে

* পাশ্চাত্য প্রদেশে এক সম্প্রদায় আছে; এই সম্প্রদায়ের সভ্যগণ অলৌকিক ও ভৌতিক নানাবিধ ঘটনাবলীর প্রকৃত সত্য ও ব্যাখ্যা নির্ণয়ে যত্নবান। এই সম্প্রদায়কে Psychical Research Society বলে।

** যে সম্প্রদায় বাইবেলস্থ (কৃশ্চান ধর্ম্মপুস্তক) পুরাতন ভাবগুলির পুনরুদ্ধারে বদ্ধপরিকর।

যেরূপ বিবেচনা করুক না কেন, তিনি যে ব্যক্তিগত মতের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন, তাহা চিরকালই লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে। এই সভায়, তিনি 'অজ্ঞানতা, দারিদ্র্য ও পাপে জগৎ যে পরিপূর্ণ হইতেছে' তাহার কুফল বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "বিজ্ঞানের কর্ত্তব্য—স্ত্রীলোককে নিজে নিজের প্রভু হইতে শিখান। বিজ্ঞান, যাহা মানবের একমাত্র পরিত্রাতা, তাহার স্ত্রীলোকের হস্তে এমন শক্তি দেওয়া উচিত, যাহাতে তিনি নিজেই স্থির করিতে পারেন, তিনি জননী হইবেন বা কুমারী থাকিবেন।" তিনি বলিলেন, "ধর্ম্ম কখন মানুষকে সংস্কার করিতে পারে না, কারণ ধর্ম্ম দাসত্ব মাত্র। তাহা অপেক্ষা বরং স্বাধীন থাকা ভাল, ভয়ের দুর্গগুলিকে ভেদ করিয়া আপনার পায়ে আপনি দাঁড়াইয়া মৃদুহাস্যের সহিত ভবিষ্যতের সম্মুখীন হওয়া বরং ভাল। সময়ে সময়ে বরং চিন্তাস্রোতে গা ভাসান দিয়া স্বপ্নরাজ্যের অধিবাসী হওয়া ভাল। এই জীবন, যে সকল বজ্রবন্ধনে আবদ্ধ, সেই সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া আমাদের মস্তিষ্কের অভ্যন্তরস্থ সুন্দর চিত্রশালিকায় ইতস্ততো ভ্রমণ করিয়া, অতীতের মধুর আলিঙ্গনে আপনাকে আপ্যায়িত করিয়া, জীবনের মধুময় প্রভাত কালকে ফিরাইয়া আনিয়া, অতীত মৃত মহাপুরুষদের শান্তিপূর্ণ মুখচ্ছবি নিরীক্ষণ আর ভবিষ্যতের জন্য সুন্দর চিত্রাঙ্কন করা বরং ভাল। সমুদয় দেবতা—তাঁহাদের বর শাপ সব ভুলিয়া নিজের শিরার অভ্যন্তরে জীবনের মধুময় স্রোত অনুভব ও নিজের নির্ভীক হৃদয়ের তালবদ্ধ ধ্বনিরূপ রণসঙ্গীত শ্রবণ করা বরং ভাল। তারপর সেই স্বপ্নরাজ্য হইতে জাগরিত হইয়া সর্ব্বপ্রকার আবশ্যকীয় কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হও, তোমার মনে যে মহা আদর্শ রহিয়াছে, তাহাকে ভাব ও কার্য্যের দ্বারা ধরিতে চেষ্টা কর। কল্পনাকে তাহার পক্ষ বিস্তার করিতে দাও, যাহাতে সে খুব সামান্য বস্তুর ভিতরেও অতি রমণীয় ভাব দেখিতে পায়। শিক্ষিত চক্ষে প্রকৃত সত্যের অন্বেষণ কর। যে সূক্ষ্ম সূত্র দূরবর্ত্তীর সহিত বর্ত্তমানের যোগ সম্পাদন করিতেছে, তাহার আবিষ্কার কর; জ্ঞানের বৃদ্ধি কর; দুর্ব্বলের ভার মোচন কর; মস্তিষ্কের উন্নতি বিধান কর; সত্য-পক্ষের সমর্থন কর; আত্মাকে তাহার উপযুক্ত পদ ও স্থান প্রদান কর।

ইহাই প্রকৃত ধর্ম্ম; ইহাই প্রকৃত উপাসনা।"

(ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক।)

মিসেস ই. ডি. চেস্‌নি বলিলেন, ধর্ম্ম ও শিল্প একই জিনিস; শিল্প যেন ধর্ম্মের খোসা—বাহ্য আবরণ স্বরূপ। আর একজন বক্তা সেই দিনের সান্ধ্য-সমিতিতে ব্যক্ত সমুদয় চিন্তারাশির সারসংগ্রহ করিয়া বলিলেন, আগে লোকে ধার্ম্মিক বলিয়া একটী আর অধার্ম্মিক বলিয়া আর একটী স্বতন্ত্র থাক করিত; এখন আর এ প্রভেদ নাই। প্রত্যেকেরই ভিতরে কিছু না কিছু ধর্ম্ম আছে। অধার্ম্মিক কেহ নাই। বেদান্তবাদীর পক্ষে এই শেষোক্ত বক্তাদের কথার কিছু নূতনত্ব নাই, কিন্তু যাঁহারা আমেরিকার সমাজের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন তাঁহারা ইহাকে সময়ের এক শুভচিহ্ন বলিয়া বুঝিবেন সন্দেহ নাই।

(৮০তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃঃ ৩২৮)

(স্বামী অভেদানন্দ কংকর্ডে।)

৯ই জুন স্বামী অভেদানন্দ চার্ল্স ম্যালয়ের সহিত ওয়ালথাম হইতে কঙ্কর্ডে শকট-যোগে গমন করেন। চার্ল্স ম্যালয়, এমার্সনের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু; এই এমার্সনই প্রথম বৈদান্তিক ভাব আমেরিকার সাহিত্যে প্রবেশ করান। স্বামীজি একদিন ওয়াল্ডেন-পন্‌ড্‌ দর্শন করিতে যান; এখানে এমার্সনের সময়ের একজন দার্শনিক—নাম থোরিয়ান—কয়েক বৎসর প্রাচ্য সাধুর ন্যায় নিজ হস্তনির্ম্মিত কুটীরে বাস করিয়াছিলেন।

(নিউপোর্টে বক্তৃতা—খৃষ্টানের উদারভাব।)

এই শান্তিময় নির্জ্জন স্থান ত্যাগ করিয়া স্বামী রোডদ্বীপস্থ নিউপোর্ট নামক স্থানে গমন করেন। এই স্থান আমেরিকার এক বিখ্যাত গ্রীষ্মাবাস। এখানে ইনি ডাক্তার কেট ষ্ট্যাণ্টনের অতিথিরূপে তিন সপ্তাহ অতিবাহিত করেন। পরে, ইনি 'বিশপ বার্কলির চেয়ার' নামক পর্ব্বতে গমন করিলেন। এইখানেই বার্কলি মনোবাদ (Idealism) সম্বন্ধে তাঁহার বিখ্যাত দর্শন লেখেন। এক পার্শ্বে সমুদ্র, অপর পার্শ্বে উপসাগর, ইহাতে উক্ত স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় মনোহারী ও গম্ভীর-ভাবাত্মক; দেখিয়া চিন্তাশীলের মনে স্বতঃই এই ভাব উদ্দীপিত হয় যে, এই জগৎ এক বিরাট স্বপ্নদ্রষ্টার স্বপ্নরাজ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। ২০শে তারিখে স্বামী নিউপোর্টের ল্যাড্‌ ভিলা নামক প্রাসাদের অভ্যন্তরে এক প্রশস্ত গৃহে "হিন্দুদের ধর্ম্মভাব" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। রেভারেণ্ড ডাক্তার কাটার—একজন ইউনিটেরিয়ান আচার্য্য—তাঁহাকে শ্রোতৃগণের নিকট পরিচিত করিয়া দেন। স্বামীজির দেড় ঘণ্টা বক্তৃতার পরে প্রশ্নোত্তর হইল। দর্শকবৃন্দের অন্তর্গত কন্‌গ্রিগেশনাল* সম্প্রদায়ের এক আচার্য্য, চর্চ্চসমূহে উদার ভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে—ইহার প্রমাণস্বরূপ কথায় কথায় বলিলেন, "কংগ্রিগেশনালিষ্টরা এক্ষণে আর 'অনন্ত শাস্তি ও নরকাগ্নির' মত মানে না।" বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় গোঁড়া-চর্চ্চগুলির ভিতর পর্য্যন্ত কেমন পরিবর্ত্তন হইতেছে,—দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। সভাভঙ্গের পর এই আচার্য্যটী স্বামীজিকে সম্মান ও অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, "আমি জানি না, আমি আপনাকে পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হিন্দু করিয়াছি কিনা, তবে আপনি আমাকে পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল খৃষ্টান করিয়াছেন বুঝিতেছি।" স্বামীজির একটী বিশেষ গুণ এই যে, তিনি কাহারও বিশ্বাস নষ্ট করেন না, বরং শ্রোতার বিশ্বাসকে জ্ঞান ও সত্যের দ্বারা আরো পরিষ্কার ও উজ্জ্বল করিয়া দেন।

২১শে তারিখে স্বামী, মিষ্টার সোয়ানের গৃহে অনেক শ্রোতার সমক্ষে বেদান্ত বিষয়ে আলোচনা করেন। এই শ্রোতারা বেদান্তসম্বন্ধে এই প্রথম শুনিলেন।

(মুসিল্যাণ্ড ও লেকেইট পর্ব্বতে।)

১লা জুলাই স্বামী, হর্শেল সি পার্কার নামক বোষ্টনের আপ্লেলেচিয়ান শৈল সমিতির এক সভ্যের অতিথি হইয়া নিউস্থাম্পসায়ারস্থ শ্বেত-পর্ব্বতে গমন করেন। স্বামীজি ১০ দিন

* খৃষ্টানদের এক সম্প্রদায় বিশেষ। ইহাদের স্থানীয় চর্চ্চগুলিকে, তাহাদের কার্য্যনির্ব্বাহ-বিষয়ে, প্রধান চর্চ্চের মতামতের অপেক্ষা করিতে হয় না।

(আষাঢ়, ১৩৮৫, পৃঃ ৩২৯)

ঐ সভার সভ্যগণের সহিত মুসিল্যাঙ্ক ও লেফেইট নামক পর্ব্বত (সমুদ্র হইতে প্রায় ৫০০০ ফিট উচ্চ) দ্বয়ে পদব্রজে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই পর্ব্বতে একস্থানে অনেকগুলি শৈলখণ্ডের সম্মিলনে এমন এক মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে, যাহা দেখিলে বোধ হয়, এক বৃদ্ধের মুখ। আবার সূর্য্যকিরণ সম্পাতের তারতম্যে ইহা কখনও মৃদুহাস্যযুক্ত কখনও বা বিষাদময় প্রতীয়মান হয়। অনেকে অনুমান করেন, ইহা আমেরিকার প্রাচীন অধিবাসিগণের (রেড ইণ্ডিয়ানদের) দেবতা। কিন্তু বাস্তবিক দেখিলে উহা স্বাভাবিক ভাবেই হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়। স্বামীজি এই সকল দর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

(ক্লার্ক ইউনিভার্সিটিতে।)

৮ই জুলাই স্বামীজি ঐ সমিতিতে "হিন্দুদিগের দর্শন" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন; এই বক্তৃতা সকলের অতিশয় হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছিল। ১২ই জুলাই স্বামীজি মাসাচুসেট্স্ উর্স্টরে ক্লার্ক ইউনিভার্সিটির শিক্ষকগণের জন্য যে গ্রীষ্মবিদ্যালয় আছে, তাহা দেখিতে গিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ডাক্তার ষ্ট্যান্‌লি হল খুব উদার প্রকৃতির লোক; শিশুদের শিক্ষা ও স্কুলের সংস্কার বিষয়ে তাঁহার মত খুব উন্নত ও বিজ্ঞজনোচিত।

এইরূপ লোক ভারতবর্ষে, শুধু ভারতে কেন, সর্ব্বত্রই শিক্ষাসংক্রান্ত মহোপকার সাধন করিতে পারেন। পুরাতন প্রণালীর শিক্ষায় সমুদয় বৃত্তির বিকাশ হওয়া দূরে থাক, বরং যাহা আছে তাহা পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। ভারতের শিক্ষিত লোকগণের উচিত—আমেরিকায় আসিয়া এখানকার উন্নত শিক্ষাপ্রণালী দেখিয়া তাহা স্বদেশে প্রবর্ত্তন করান। স্বামীজি শারীরবিধান, খনিজবিদ্যা, শারীরস্থান, দর্শন, মানবতত্ত্ব (Anthropology) ও প্রাণিবিদ্যা সম্বন্ধে ছেলেদের পড়ার সমুদয় বিষয়, ক্লাসে উপস্থিত থাকিয়া শুনিতে লাগিলেন। এই পড়ানর সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ যন্ত্রাদির সহিত হাতে কলমে সর্ব্বপ্রকারে পরীক্ষা করিয়া সব দেখান হইয়াছিল। এই সমুদয় অধ্যাপকগণ—যাঁহারা সকলেই নিজ নিজ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ—নিজ নিজ মৌলিক অনুসন্ধানের ফল বিবৃত করিলেন। এই বিদ্যালয় ইহার মৌলিক আবিষ্ক্রিয়ার জন্য ও বর্ত্তমান বিজ্ঞান ও দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে অনুসন্ধানের জন্য বিখ্যাত।

এই গ্রীষ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রদের সম্মুখে স্বামীজি ২৩শে জুলাই 'হিন্দুদের দর্শন' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। প্রশস্ত গৃহ সমুদয় পরিপূর্ণ হইয়া যায়—দ্বার পর্য্যন্ত লোক হইয়াছিল। একজন শ্রোতা অন্যান্য মন্তব্যের পর বলিলেন, আমাদের আচার্য্যেরা চর্চ্চে যদি এইরূপ উপদেশ দেন, তবে বড়ই ভাল হয়।

(লিলিডেল—প্রেতবাদীদের সভায়।)

উরষ্টর হইতে স্বামীজি প্রায় ৫০০ মাইল দূরবর্ত্তী নিউইয়র্কের লিলিডেল নামক স্থানে গমন করিলেন। এই প্রদেশের দৃশ্য অতি সুন্দর—ক্রমাগত জঙ্গলপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত-শ্রেণী এবং অপূর্ব্বভাবোদ্দীপক হ্রদসমূহ। লিলিডেল প্রেততত্ত্ববাদীদের গ্রীষ্মাবাস, তাঁহারা স্বামীজিকে 'ভারতের ঋষিগণজ্ঞাত আধ্যাত্মিক সত্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করেন। তিনি সর্ব্বপ্রকার প্রকৃত ভৌতিক ঘটনা যে দর্শনের সাহায্যে ব্যাখ্যাত হইতে

(৮০তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃঃ ৩৩০)

পারে, তাহা অতি হৃদয়গ্রাহী ভাবে বর্ণনা করিলেন। এই বক্তৃতা সকলের অভাবনীয় শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। স্বামীজি আরো বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইতে লাগিলেন। তিনি আর দুইটি বক্তৃতা দিলেন। আত্মা আনয়নকারী মিডিয়মগণ, পরচিত্তবিজ্ঞানকুশলগণ (Thought-readers) এবং অন্যান্য অতিপ্রকৃততত্ত্বান্বেষীগণ তাঁহাদের স্ব স্ব সভায় স্বামীজিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। প্রেততত্ত্ববাদীদের অনেকেই পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাসী। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বলেন, তাঁহারা স্বামীজির বক্তৃতায় যেরূপ শুনিলেন, তাঁহাদের পরলোকবাদি-নেতাগণও ঠিক সেইরূপ পুনর্জ্জন্মতত্ত্ব শিক্ষা দেন। এই সমস্ত বক্তৃতার পরেই প্রশ্নোত্তর হয়। এখানে বেদান্তদর্শনের প্রতি লোকের এতদূর শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হয় যে, লিলিডেলে একটী রীতিমত ছাত্রসমিতি গঠিত হইয়াছে। ইঁহারা বেদান্তের পাঠ ও আলোচনা করেন; কোন বিষয়ে জানিবার ইচ্ছা হইলে, স্বামীজির সহিত চিঠিপত্র লেখালেখি করেন।

(চানটানকোয়ায় আদি-গ্রীষ্মবিদ্যালয়ে।)

লিলিডেল হইতে ১২ই আগষ্ট স্বামীজি চানটানকোয়াতে গমন করিলেন; ইহাই সমুদয় গ্রীষ্মবিদ্যালয়ের জননীস্বরূপ। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে যখন ইহা স্থাপিত হয়, তখন ইহা ঠিক চর্চ্চের মতানুসারেই পরিচালিত হইত, এক্ষণে অপেক্ষাকৃত উদার শিক্ষাপ্রণালী ইহার স্থান অধিকার করিয়াছ—এক্ষণে এখানে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে কেবল একঘেয়ে ভাবেই উহার আলোচনা হয় না। এবার এখানে বৌদ্ধধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা ছিলেন—ডাক্তার জে. এইচ. ব্যারোজ। তিনি প্রেসবিটেরিয়ন* এবং যে সকল মিসনরি, 'হিদেন' (Heathen—উপধর্ম্মাবলম্বী) হিন্দুদের আত্মার উদ্ধারের জন্য ব্যাকুল, তাঁহাদের মতানুযায়ী বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনা করেন।

(গ্রীনএকার।)

তারপর স্বামীজি গ্রীনএকার নামক স্থানে গমন করিলেন; এস্থান চানটানকোয়া হইতে কয়েক সহস্র মাইল দূর। এখানে তিনি ডাক্তার লিউইস জি. জেন্‌স পরিচালিত 'মন্‌শালভাট বিদ্যালয়' নামক নানাদেশীয় ধর্ম্মালোচনার সভায় বক্তৃতা করেন। একটী বৃক্ষের তলে এই বিদ্যালয়ের অধিবেশন হয়। ইহার বিস্তৃত শাখাপ্রশাখার নিম্নে দুইশত লোকের স্থান সঙ্কুলান হয়। যখন ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে গ্রীনএকারে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তখন ইহার নাম রাখা হয় "স্বামী'স পাইন"। সেই সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ এখানে শিক্ষা দিতেন, আর উহাকে বেদান্তের শিক্ষার জন্য উৎসর্গীকৃত করেন। এই পাইনের ছায়ায় কেবল স্বামিগণই শিক্ষাদান করিয়া থাকেন; যে সকল হিন্দুসন্ন্যাসী এই আমেরিকায় আসিয়াছেন, তাঁহাদের পবিত্র স্মৃতির সহিত, কত অতীত শতাব্দীর সাক্ষিস্বরূপ, বৃক্ষ জড়িত। ২৩শে আগষ্ট ১ম বক্তৃতা হয়; বিষয় :—হিন্দুধর্ম্ম প্যান্থিয়িজম্ কিনা? ৩০শে তারিখে

* খৃষ্টানদের এক সম্প্রদায়। ইহারা প্রেস্‌বিটর নামক একজন অধ্যক্ষের অধীনে পরিচালিত বলিয়া ইহাদের নাম প্রেস্‌বিটেরিয়ান।

(আষাঢ়, ১৩৮৫, পৃঃ ৩৩১)

'পুনর্জ্জন্ম' সম্বন্ধে, ইহাও স্বামী'স পাইনের নীচে হয়, এবং ৩১ শে তারিখে এক বৃহৎ শিবিরে 'পাশ্চাত্য প্রদেশে ভারতের আধ্যাত্মিক প্রভাব' বিষয়ে বক্তৃতা হয়।

(মান্দ্রাজী নেটিভ খৃষ্টান—গ্রীনএকারে।)

এই বৎসরের গ্রীষ্মকালে গ্রীনএকারে একজন মান্দ্রাজী—নূতন খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত—আগমন করেন। উদ্দেশ্য,—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে প্যারিয়াদের জন্য একটী কূপখননের নিমিত্ত অর্থভিক্ষা। তিনি নিজেকে একজন রাজবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেন এবং প্যারিয়াদের দুরবস্থা খুব বাড়াইয়া বলেন। হিন্দুরা খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে এইরূপ করিয়া থাকে, এরূপ অনেক দেখা যাইতেছে। সুতরাং ইহাতে কিছু নূতনত্ব নাই। এই সেদিন একজন আপনাকে রাজবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া বোম্বায়ে হাঁসপাতাল খুলিবার জন্য অর্থভিক্ষা করিলেন, আবশ্যকীয় অর্থ পাইলেনও। শেষে এক ফরাসিকে বিবাহ করিলেন, এক্ষণে লণ্ডনে গুপ্তযোগবিদ্যা শিখাইতেছেন। এই সকল নিঃস্বার্থ অথবা স্বার্থপর ব্যক্তিগণের এইরূপ বর্ণনার উদ্দেশ্য বোঝা ভার ; সময়েই সব প্রকাশ হইবে।

(গুরুভাইদের সহিত মিলন।)

গ্রীনএকারে স্বামীজি, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দের আগমনবার্ত্তা জানিতে পারিলেন, আর ক্যাট্‌স্কিল পর্ব্বতে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বিবেকানন্দ স্বামীর নিকট হইতে একটী তার পাইলেন। এত দিনের পরে পরস্পরের সাক্ষাতে যে আনন্দ হইল, তাহা কল্পনায় বেশ বোঝা যায়। দশ দিন ইঁহারা (ইঁহারা যাঁহার অতিথি, তাঁহার জমীদারীস্থ একটী কুটীরে থাকিয়া) পরস্পরে এবং বন্ধুগণের সহিত বিশ্রম্ভালাপে অতিবাহিত করিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ ক্রমশঃ স্বাস্থ্য ও বল লাভ করিতে লাগিলেন ; আশা হইতেছে তিনি ক্রমশঃ তাঁহার পূর্ব্বের সেই অদম্য ওজস্বিতা পুনরায় লাভ করিবেন। স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত যাঁহারই সাক্ষাৎ হইতেছে, তিনিই তাঁহাকে ভালবাসিতেছেন। তাঁহার মৌন ও শান্ত ভাবই, যেখানে তিনি পরিচিত হইতেছেন, সেই খানেই অনেক বন্ধু ও ছাত্র আকর্ষণ করিতেছে।

(নিবেদিতা।)

স্বামী অভেদানন্দ যখন নিউইয়র্কে বেদান্তসভার সভ্যগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তাঁহার সহিত মিস নোবলের (সিষ্টার নিবেদিতার) সাক্ষাৎ হয়। ইনি সেই মাত্র ইংলণ্ড হইতে আসিতেছেন। হিন্দুদিগের এই বন্ধু দ্বারা আমেরিকাস্থ বেদান্তবাদী ও ভারতহিতৈষিগণের সহানুভূতি ভারতরমণীগণের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইবে। এই নিষ্কাম পরোপকার-ব্রতে দীক্ষিতা সিষ্টার নিবেদিতা হিন্দুরমণীগণের যথাসাধ্য উপকার করিতে চেষ্টা পাইতেছেন,—এক রকম কুসংস্কার হইতে আর এক রকম কুসংস্কারে লইয়া গিয়া নয় ; —হিন্দু রমণীর ভিতরে যে সদ্‌গুণ আছে, তাহারই অধিকতর বিকাশে সাহায্য করিয়া এবং তাহাদিগকে নানাপ্রকার লৌকিক বিদ্যার শিক্ষা দিয়া।

(৮০তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃঃ ৩৩২)

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

অন্যান্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা — স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য ১৩'০০, ২য় ভাগ পৃঃ ৫২৪, মূল্য ৮'০০

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—(ছাপা নাই)

ভারতে শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ। মূল্য ৩'০০

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৯১, মূল্য ৫'০০

স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ। পৃঃ ৩১০, মূল্য ৪'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ। (ছাপা নাই)

গোপালের মা — স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৪৪, মূল্য ১'৫০

শ্রীশ্রীরামানুজ-চরিত—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। (ছাপা নাই)।

আচার্য শঙ্কর—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৪৬. মূল্য ৬'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র—মূল্য ৭'৮০

শিবানন্দ-বাণী— স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত। ১ম ভাগ (ছাপা নাই); ২য় ভাগ-২'৫০

মহাপুরুষজীর পত্রাবলী— (ছাপা নাই)

সৎকথা — স্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত। (ছাপা নাই)

অদ্ভুতানন্দ-প্রসঙ্গ — স্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত। (ছাপা নাই)

স্মৃতি-কথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ। মূল্য ৪'০০

দিব্যপ্রসঙ্গে — স্বামী দিব্যাত্মানন্দ। (ছাপা নাই)

স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী— (ছাপা নাই)

আরত্তি-স্তব—মূল্য ০'৭০

পুণ্যস্মৃতি—স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ। পৃঃ ১১৬, মূল্য ৩'০০

মহাভারতের গল্প—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ পৃঃ ১২৮ ; সাধারণ ২'৫০, বোর্ড বাঁধাই ৩'০০ ৬ষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য সংক্ষেপিত "দ্রুতপাঠ্য" সংস্করণ—পৃঃ ৭২ ; মূল্য ২'০০

শঙ্কর-চরিত — শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। সংস্করণ (৭ম) মূল্য ২'৫০

দশাবতার-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য পৃঃ ১০৮, মূল্য ২'৫০

সাধক রামপ্রসাদ —স্বামী বামদেবানন্দ। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৫'২০

সাধু নাগ মহাশয়—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। পৃঃ ১৪৪, মূল্য ৩'২০

ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী তেজসানন্দ। পৃঃ ১২৪, মূল্য ১'৫০

শিব ও বুদ্ধ—ভগিনী নিবেদিতা। পৃঃ ৬৩, মূল্য ০'৬৫

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ— পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৫'০০

পত্রমালা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২ মূল্য ৪'০০

গীতাতত্ত্ব—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৭৬, মূল্য ৫'০০

লাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৪২০, মূল্য ১০'০০

পরমার্থ-প্রসঙ্গ — স্বামী বিরজানন্দ। পৃঃ ১৩৭, মূল্য ৪'০০

ভগবানলাভের পথ—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। মূল্য ১'০০

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী — স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৩২, মূল্য ০'৬০

বিবিধ প্রসঙ্গ—(ছাপা নাই)

কৈলাস ও মানসতীর্থ—স্বামী অপূর্বানন্দ। (ছাপা নাই)

তিব্বতের পথে হিমালয়ে—স্বামী অখণ্ডানন্দ। (ছাপা নাই)

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-সঞ্চয়ন— পৃঃ ৩১৬, মূল্য ৭'০০

বেদান্তের আলোকে খৃষ্টের শৈলোপদেশ—স্বামী প্রভবানন্দ। মূল্য সাধারণ ৪'০০,

অতীতের স্মৃতি—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। পৃঃ ৪৬৪ মূল্য ১০'০০

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ১৪২, মূল্য ৩'৩০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। পাঁচশতাধিক সঙ্গীত। মূল্য ৬'০০

ঠাকুরের নরেন, নরেনের ঠাকুর—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ২৯, মূল্য ১'২০

সংস্কৃত

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত।
১ম ভাগ পৃঃ ৪৪৪, মূল্য ১১'০০
২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ১১'০০
৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মূল্য ১১'০০

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত, স্বামী জগদানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪২৫, মূল্য ৭'৮০

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৬'৪০

স্তবকুসুমাঞ্জলি—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪০৮, মূল্য ৭'০০

বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা—স্বামী ধীরেশানন্দ-সংকলিত। (ছাপা নাই)

বৈরাগ্যশতকম্—স্বামী ধীরেশানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ১৩৪, মূল্য ১'৫০

যোগবাশিষ্ঠসারঃ—স্বামী ধীরেশানন্দ। (ছাপা নাই)

বিবেকচূড়ামণি—স্বামী বেদান্তানন্দ-সম্পাদিত। (ছাপা নাই)

নারদীয় ভক্তিসূত্র—স্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ১৬৩, মূল্য সাধারণ ৫'০০, শোভন ৭'৫০

বেদান্তদর্শন—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য: ১ম অধ্যায় (চারখণ্ডে) ১৭'০০; ২য় অঃ ১৩'০০; ৩য় অঃ ১৩'০০; ৪র্থ অঃ ৯'০০

গুরুতত্ত্ব ও স্বামী রঘুবরানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য ১'৮০

শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজাপদ্ধতি
পৃঃ ৬৪, মূল্য ১'৫০

সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-অনূদিত। (ছাপা নাই)

অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—সুরেশ দত্ত। মূল্য ৫'০০

পরমহংসদেব—স্বামী প্রেমেশানন্দ। পৃঃ ২৪, মূল্য ০'৭৫

জননী সারদাদেবী—স্বামী নির্বেদানন্দ। (অনুবাদক: স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। মূল্য ২'৮০

শ্রীশ্রীমা সারদা—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৯০, মূল্য ২'০০

গল্পে বেদান্ত—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ পৃঃ ১২৮; মূল্য সাধারণ ৩'০০, বোর্ড বাঁধাই ৩'৫০

বীরবাণী—স্বামী বিবেকানন্দ। পৃঃ ১১৪; মূল্য ২'০০ (যন্ত্রস্থ)

ছোটদের বিবেকানন্দ—স্বামী নিরাময়ানন্দ। (ছাপা নাই)

বিবেকানন্দের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। পৃঃ ১৫৪, মূল্য ৩'৫০

উদ্বোধন লেন, কলিকাতা

৮০।৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত।

সম্পাদক—স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ : সংযুক্ত সম্পাদক—স্বামী ধ্যানানন্দ

বার্ষিক মূল্য ১২·০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১·২০ টাকা

উদ্বোধন

উত্তিষ্ঠত
জাগ্রত
প্রাপ্য
বরান্
নিবোধত



উদ্বোধন, শ্রাবণ, ১৩৮৫

সূচীপত্র

আমি কি আর উপদেশ দেব! ঠাকুরের কথা সব বইয়ে বেরিয়ে গেছে। তাঁর একটা কথা ধারণা করে যদি চলতে পার তো সব হয়ে যাবে।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

উদ্বোধনের মাধ্যমে প্রচার হোক এই বাণী। শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়



দিব্য বাণী

ন জীবনাশোঽস্তি হি দেহভেদে
মিথ্যৈতদাহুর্ম্রিয়ত ইত্যবুদ্ধাঃ।
জীবস্তু দেহান্তরিতঃ প্রয়াতি
দশার্ধতৈবাস্য শরীরভেদঃ॥
এবং সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়শ্চরতি সংবৃতঃ।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া তত্ত্বদর্শিভিঃ॥
তং পূর্বাপররাত্রেষু যুঞ্জানঃ সততং বুধঃ।
লঘ্বাহারো বিশুদ্ধাত্মা পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি॥

—মহাভারত, শান্তিপর্ব, ১৮৭।২৭-২৯

দেহনাশে জীব কভু বিনষ্ট না হয়
অজ্ঞানী জনেরা 'জীব মৃত'—মিথ্যা কয়।
দেহের বিনাশে পঞ্চ ভূত লয় পায়
এক দেহ হতে জীব অন্য দেহে যায়।
এইরূপে সর্বভূতে গূঢ়-দরশন
হয়ে মায়াবৃত আত্মা করেন ভ্রমণ।
তীক্ষ্ণ-সূক্ষ্ম-বুদ্ধি-যুক্ত তত্ত্বদর্শিগণ
(অপরোক্ষরূপে) তাঁরে করেন দর্শন।
শুদ্ধচিত্ত তথা তৃপ্ত লঘু ভোজনেতে
রাত্রির প্রথম আর শেষ প্রহরেতে
সদা যুক্ত হয়ে জ্ঞানী করেন দর্শন
নিজ দেহমাঝে আত্মা (নিত্য নিরঞ্জন)।

কথাপ্রসঙ্গে

'আত্মার কেল্লা'

দেবর্ষি নারদ বলিয়াছিলেন, সত্যবান অল্পায়ু—এক বৎসর পূর্ণ হইলেই তাঁহার জীবনান্ত হইবে। সাবিত্রী তাই একটি একটি করিয়া দিন গুনিতেছিলেন এবং যেদিন দেখিলেন চতুর্থ দিবসেই সত্যবানের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইবে, সেদিন ত্রিরাত্র-ব্রত অবলম্বন করিলেন। ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া চতুর্থ দিবস প্রাতে শ্বশুর ও শ্বশ্রূমাতা কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াও আহার করিলেন না; বলিলেন, সূর্যাস্তের পর আহার করিবেন। সত্যবান বনে যাইতেছেন ফলমূলাদি আহরণে। সাবিত্রী শ্বশুর ও শ্বশ্রূমাতার অনুমতি লইয়া সত্যবানের সঙ্গে চলিলেন। বনমধ্যে কাঠ কাটিতে কাটিতে সত্যবান বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়িলে সাবিত্রী ভূমিতে বসিয়া পড়িয়া স্বামীর মস্তক স্বীয় অঙ্কে স্থাপন করিলেন। মুহূর্তের মধ্যেই তিনি দেখিলেন যে, রক্তবস্ত্র-পরিহিত, আদিত্যতুল্য জ্যোতির্ময় এক পুরুষ পাশহস্তে সত্যবানের নিকট আসিয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। সাবিত্রী পতির মস্তক ক্রোড় হইতে ধীরে ধীরে নামাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আর্তস্বরে সেই পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনাকে দেবতা বলিয়া মনে হইতেছে, আপনি কে? এবং কি জন্যই বা এখানে আসিয়াছেন?' সেই পুরুষ যমরাজ বলিয়া নিজের পরিচয় দিলেন এবং বলিলেন যে, সত্যবানের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হওয়ায় তাঁহাকে লইতে আসিয়াছেন। সাবিত্রীর আরেকটি প্রশ্নের উত্তরে যমরাজ বলিলেন, সত্যবান ধর্মপ্রাণ, গুণসাগর ও রূপবান বলিয়া তাঁহার দূতগণের দ্বারা নীত হইবার যোগ্য নহেন, এইজন্য তিনি স্বয়ং সত্যবানকে লইতে আসিয়াছেন।

ততঃ সত্যবতঃ কায়াৎ পাশবদ্ধং বশং গতম্।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমো বলাৎ॥

—তাহার পর যমরাজ সত্যবানের শরীর হইতে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে পাশবদ্ধ করিয়া স্ববশে আনিয়া বলপূর্বক আকর্ষণ করিলেন।

তখন প্রাণ নির্গত হওয়ায় সত্যবানের শ্বাসহীন নিষ্প্রভ দেহ নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিল।

কাহিনীর পরবর্তী অংশ যতই হৃদয়গ্রাহী হউক না কেন, আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সহিত উহার সম্পর্ক না থাকায় এইখানেই ইতি টানিতে হইতেছে।

'অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষম্'—ইহার ব্যাখ্যায় মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন, 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রং হৃদয়াকাশ-প্রতিষ্ঠিতত্বাৎ তৎপ্রমাণং পুর্যষ্টকবেষ্টিতং সূক্ষ্মশরীরবন্তম্।'

'অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ'-এর অর্থ আত্মা। আত্মাকে কেন অঙ্গুষ্ঠমাত্র-পরিমাণ বলা হইল নীলকণ্ঠ উপরি-উদ্ধৃত ব্যাখ্যায় তাহা পরিস্ফুট করিয়াছেন। নীলকণ্ঠ বলিতেছেন, আত্মা হৃদয়াকাশে প্রতিষ্ঠিত; হৃদয়াকাশ অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ; এইজন্যই আত্মাকে 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র' বলা হইয়াছে। যমরাজ কি সত্যবানের কেবলমাত্র আত্মাকেই আকর্ষণ করিলেন?

নীলকণ্ঠ বলিতেছেন—না, অষ্টপুরীবেষ্টিত[১] সূক্ষ্মশরীরযুক্ত আত্মাকে আকর্ষণ করিলেন।

এই ব্যাখ্যায় নীলকণ্ঠ ছান্দোগ্য উপনিষদে অন্তরাকাশ বা হৃদয়াকাশ সম্বন্ধে যে-কথা বলা হইয়াছে, তাহা আক্ষরিকভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডের প্রারম্ভেই আছে: 'যদ্ ইদম্ অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, দহরঃ অস্মিন্ অন্তরাকাশঃ, তস্মিন্ যৎ অন্তঃ, তৎ অন্বেষ্টব্যম্, তৎ বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ ইতি।' অর্থাৎ এই ব্রহ্মপুরে (দেহে) যে ক্ষুদ্র হৃদয়পদ্মরূপ কক্ষ আছে, তাহাতে যে ক্ষুদ্র অন্তরাকাশ আছে, তাহাতে যাহা (আত্মা) আছে, তাহাই অন্বেষণীয়, তাহাই বিশেষ জিজ্ঞাসার বিষয়।

বহু আচার্য এই হৃদয়াকাশকেই পরমাত্মা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু নীলকণ্ঠ বলিতেছেন, হৃদয়াকাশে আত্মা প্রতিষ্ঠিত আছেন, যে-কথা ছান্দোগ্যের পূর্বোক্ত 'তস্মিন্ যৎ অন্তঃ' শব্দত্রয়ে বলা হইয়াছে। এই কারণে আমরা বলিয়াছি, নীলকণ্ঠ এই ছান্দোগ্যশ্রুতি আক্ষরিকভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। আরও একটি কারণ এই যে, এই উপনিষদেরই অন্যত্র এবং অন্যান্য বহু উপনিষদে বলা হইয়াছে যে, হৃদয়েই আত্মা প্রতিষ্ঠিত—'আকাশ' শব্দের উল্লেখ অবশ্য সেই সেই স্থলে নাই।

গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আছে, 'হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্'। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিভাগ দেখান হইয়াছে। এইজন্য রামানুজ প্রমুখ আচার্যগণ উক্ত শ্লোকাংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, আত্মা সকলের হৃদয়েই বিশেষরূপে অবস্থিত (বি+স্থিতম্)। অর্থাৎ হৃদয়ে তিনি নিজ স্বরূপে অবস্থিত; দেহের অন্যত্র স্বধর্মভূত জ্ঞানের দ্বারা অবস্থিত। এবিষয়ে কক্ষস্থ দীপের উপমা দেওয়া যায়। দীপের আলোকরশ্মি কক্ষের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত থাকিলেও দীপটি কক্ষের একটি বিশেষ স্থানেই অবস্থিত থাকে।

'বিষ্ঠিতম্' স্থলে 'ধিষ্ঠিতম্' পাঠও পাওয়া যায়। 'ধিষ্ঠিতম্' অর্থাৎ অধিষ্ঠিত। 'হৃদি সর্বস্য ধিষ্ঠিতম্'—আত্মা সকলের হৃদয়ে অবস্থিত।

কঠোপনিষদের একটি শ্লোকের প্রথম দুই চরণে আছে, 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।' অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত অন্তরাত্মা সর্বজনের হৃদয়ে সর্বদা অবস্থিত আছেন।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও অবিকল এই দুইটি চরণ পাওয়া যায়।

প্রশ্নোপনিষদেও আছে, 'হৃদি হি এষঃ আত্মা'—হৃদয়েই এই আত্মা [অবস্থিত]।

বৃহদারণ্যক উপনিষদেও দেখা যায়, জনকের আত্মা-সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন, 'হৃদি অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ।' অর্থাৎ আত্মা হৃদয়ে অবস্থিত অন্তর্জ্যোতি পুরুষ।

১ অষ্টপুরী: (১) পঞ্চপ্রাণ (২) পঞ্চভূত (৩) পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় (৪) পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (৫) অন্তঃকরণচতুষ্টয় (মন বুদ্ধি চিত্ত ও অহংকার) (৬) অবিদ্যা (৭) কামনা ও (৮) কর্ম (ধর্মাধর্ম)। বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে উপলব্ধ হইবে যে, অষ্টপুরী ও সপ্তদশ-অবয়ববিশিষ্ট সূক্ষ্মশরীরের মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই। একটি অপরটির নামান্তরমাত্র।

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ (অষ্টম অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডে) আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়া বলিতেছেন, 'হৃদয়' শব্দটির মূল অর্থই তো হৃদয়ে আত্মা আছেন!—'সঃ বা এষঃ আত্মা হৃদি, তস্য এতৎ এব নিরুক্তং হৃদি অয়ম্ ইতি।' অর্থাৎ সুপ্রসিদ্ধ এই আত্মা হৃদয়েই অবস্থিত; উহার ('হৃদয়' শব্দের) ইহাই মূল অর্থঃ হৃদি অয়ম্ ইতি—হৃদয়ে ইনি (আত্মা) আছেন। (হৃৎ + অয়ম্ = হৃদয়ম্)।

মহর্ষি বাদরায়ণ উপনিষদ্গুলির সার-সংকলন করিয়াছেন, তাঁহার রচিত ব্রহ্মসূত্রে। বলা বাহুল্য, শরীরে আত্মার স্থান—এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে তিনি উপেক্ষণীয় মনে করেন নাই। এ বিষয়ে তাঁহার সূত্রঃ 'অবস্থিতিবৈশেষ্যাৎ ইতি চেৎ, ন, অভ্যুপগমাৎ হৃদি হি।' তাৎপর্য এই যে, যদি বলা হয়, আত্মা দেহের কোন এক স্থানে আছেন, তাহা হইলে আত্মার সর্বশরীরব্যাপী উপলব্ধি সঙ্গত হয় না, কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষই দেখি যে জাহ্নবী বা হ্রদের শীতল জলে অবগাহন করিলে সর্বাঙ্গে শৈত্যের অনুভূতি হয় এবং গ্রীষ্মকালে সর্বাঙ্গে তাপের উপলব্ধি হয়, সুতরাং আত্মা কিভাবে দেহের একটি বিশেষ স্থানে থাকিতে পারেন? ইহার উত্তরে বাদরায়ণ বলেন যে, ইহাতে কোন বিরোধ নাই—চন্দনবিন্দু যেরূপ শরীরের একদেশে অবস্থিত থাকিলেও সর্বাঙ্গ প্রসন্ন করে, আত্মারও সেইরূপ সর্বাঙ্গব্যাপী উপলব্ধির কারণ হইতে কোন বাধা নাই। ইহার উত্তরে যদি পুনরায় শঙ্কা করা হয় যে, চন্দন-বিন্দুর দৃষ্টান্ত যথাযথ হইলেও—আত্মার ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গে সুখাদির অনুভূতি প্রত্যক্ষ হইলেও—শরীরের একাংশে আত্মার অবস্থিতির কোনও প্রমাণ নাই, তাহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন—না, উপনিষদ্ই এ বিষয়ে প্রমাণ, উপনিষদেই ইহা স্বীকৃত। এই সূত্রের ভাষ্যকার আচার্যগণ তাঁহাদের ব্যাখ্যায় পূর্বে উল্লেখিত একাধিক উপনিষদ্-বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, যেগুলির আলোচনা আমরা পূর্বেই করিয়াছি।

উপনিষদ্ ও পুরাণাদি শাস্ত্রে হৃদয়, হৃদয়াকাশ, হৃদয়কমল ইত্যাদি আত্মার স্থান বলিয়া উল্লেখিত হইলেও 'হৃদয়' শব্দটির প্রকৃত অর্থ যে কি, তাহা স্পষ্ট নহে। আচার্য শংকর বলেনঃ

> 'হৃদয়' শব্দের অর্থ 'বুদ্ধি'। বুদ্ধি আত্মার উপলব্ধি-স্থান। এইজন্যই হৃদয়কে অর্থাৎ বুদ্ধিকে আত্মার স্থান বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। আত্মা সর্বব্যাপী, শরীরের কোন অংশ-বিশেষে তিনি অবস্থিত—এরূপ বলা চলে না। তবে হৃদয়ে অর্থাৎ বুদ্ধিতেই তিনি বিশেষরূপে প্রতিভাত বা প্রতি-বিম্বিত হন। এইজন্যই বলা হয়, হৃদয়েই তাঁহার অধিষ্ঠান। গীতা ও উপনিষদাদি শাস্ত্রে মৃত্যুকালে আত্মার এক দেহ হইতে উৎক্রমণ এবং দেহান্তর ধারণের কথা উল্লেখিত থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে ঐ উৎক্রমণ ও দেহধারণ সূক্ষ্মশরীরেরই, আত্মার নহে। সূক্ষ্ম-শরীরটি সর্বব্যাপী এক অখণ্ড আত্মার প্রতিচ্ছায়া নিজ বক্ষে অর্থাৎ বুদ্ধিতে ধারণ করিয়া দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়—ইহারই নাম মৃত্যু এবং ঐভাবেই সূক্ষ্ম-শরীর দেহান্তর ধারণ করে—ইহারই নাম জন্মান্তর।

পক্ষান্তরে দ্বৈতবাদী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী

ভেদাভেদবাদী প্রভৃতি আচার্যগণ, যাঁহারা বহু আত্মা স্বীকার করেন এবং আত্মা ও পরমাত্মার ভেদও স্বীকার করেন, তাঁহারা বলেন, আত্মা পরমাত্মার অংশ, হৃদয়ে সত্যসত্যই অধিষ্ঠিত এবং মৃত্যুকালে সূক্ষ্মদেহকে সঙ্গে লইয়া শরীর হইতে সত্যসত্যই উৎক্রমণ করেন ও নূতন দেহে সূক্ষ্মশরীরসহ সত্যসত্যই প্রবেশ করেন। গীতা ও উপনিষদের বহু উক্তির আক্ষরিক অর্থ যে তাঁহাদের মতের অনুকূল—এ বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। যেমন বৃহদারণ্যক উপনিষদে জীবের মরণকালের বর্ণনায় আছে: 'তস্য হৃদয়স্য অগ্রং প্রদ্যোততে, তেন প্রদ্যোতনেন এষ আত্মা নিষ্ক্রামতি।' অর্থাৎ সেই মুমূর্ষু ব্যক্তির হৃদয়ের অগ্রভাগ উজ্জ্বল হয়, সেই উজ্জ্বল জ্যোতি অবলম্বনে এই [শরীরস্থিত] আত্মা নিষ্ক্রান্ত হন। এখানে 'হৃদয়ের অগ্রভাগ'কে শরীরেরই কোন অংশ-বিশেষ বলিয়া স্পষ্ট উপলব্ধ হয়।[২] কিন্তু দ্বৈতবাদী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ভেদাভেদবাদী প্রভৃতি আচার্যগণ 'হৃদয়' বস্তুটি যে কি তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন নাই।

স্বামী বিবেকানন্দের একটি পত্রে আছে, "'জ্ঞানবলক্রিয়া'-শালী আত্মার অধিবাস হৃদয়ে, মস্তিষ্কে নয়। 'শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যঃ' (হৃদয়ে একশত এবং একটি নাড়ী আছে) ইত্যাদি। হৃদয়ের নিকট 'সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন' নামক যে প্রধান কেন্দ্র, সেথায় আত্মার কেল্লা।"

স্বামীজী যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্মোদ্ধার করিতে হইলে শারীরস্থান (anatomy) ও শারীরবৃত্তির (physiology) কিছু আলোচনা প্রয়োজন।

আমাদের অনেক কাজ, যেমন চলাফেরা, চিন্তা করা ইত্যাদি, পরিচালিত হয় মস্তিষ্ক (brain), সুষুম্নাকাণ্ড (spinal cord) এবং এই উভয় স্থান হইতে নির্গত অনেকগুলি স্নায়ুর দ্বারা। এই সকল কাজের পরিচালনা-কেন্দ্র হইতেছে মস্তিষ্ক। কিন্তু হৃৎপিণ্ড, অন্ননালী, যকৃৎ প্রভৃতি শরীরাংশবিশেষ (organs) এবং থাইরয়েড, সুপ্রারেনাল, প্যানক্রিয়াস প্রভৃতি গ্রন্থিগুলির (glands) কাজ পরিচালিত হয় সিম্প্যাথেটিক ও প্যারা-সিম্প্যাথেটিক নামক অন্য এক প্রকার স্নায়ুমণ্ডলীর দ্বারা। এই স্নায়ুমণ্ডলী সুষুম্নাকাণ্ড হইতে নির্গত হইয়া শিরদাঁড়ার সামনে অবস্থিত কয়েকটি স্থানে মিলিত হয়, যেগুলিকে গ্যাংলিয়া বলে। এক একটি গ্যাংলিয়ন কতকগুলি স্নায়ু-কোষের সমষ্টি। গ্যাংলিয়া-গুলি ভিন্ন ভিন্ন আকারের ও আয়তনের হইয়া থাকে। এই গ্যাংলিয়াগুলি হইতে নির্গত স্নায়ুর দ্বারা উপরি-উক্ত হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি শরীরাংশগুলির এবং গ্রন্থিগুলির কার্যকলাপ পরিচালিত হয়। ইহাদের পরিচালনার উপর মস্তিষ্কের সরাসরি কোন প্রভাব নাই। হৃৎ-পিণ্ডের নিকট অবস্থিত এইরূপ একটি

২ এমনকি আচার্য শংকরও এই শ্রুতির ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, 'হৃদয়স্য' অর্থাৎ হৃদয়-ছিদ্রের, 'অগ্রং' অর্থাৎ নির্গমন-দ্বার নাড়ীমুখ, 'প্রদ্যোততে' অর্থাৎ আত্মার জ্যোতির দ্বারা দীপ্তিমান হয়, এবং সূক্ষ্মশরীররূপ-উপাধিধারী আত্মা দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন। সুতরাং 'হৃদয়-ছিদ্র', 'নাড়ীমুখ' ইত্যাদি কথার দ্বারা হৃদয়কে শারীরস্থানের (anatomy) বিষয় বলিয়া বুঝা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন হৃৎপিণ্ডকে পরিচালিত করে। স্বামীজী ইহাকে 'প্রধান কেন্দ্র' বলিয়াছেন। মনে হয়, ইহার কারণ এই যে, হৃৎপিণ্ডের দ্বারা প্রেরিত রক্তের চলাচলের উপরই সমস্ত শরীরাবয়বের (এমনকি মস্তিষ্কেরও) সক্রিয় থাকা নির্ভর করে।

স্বামীজী বলিতেছেন, উপরি-উক্ত সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়নেই আত্মার অধিষ্ঠান। এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, আচার্য শংকর ও স্বামীজী উভয়েই যখন অদ্বৈতবাদী, তখন আত্মার স্থান, যাহা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—সে সম্পর্কে উভয়ের মতের সামঞ্জস্য নাই কেন? ইহার উত্তরে বলা যায়, শংকরের ন্যায় স্বামীজী যে সর্বত্র অদ্বৈতবাদের কথাই বলিয়াছেন, তাহা নহে। তাঁহার বক্তৃতা, চিঠিপত্র ও রচনাবলীর বহু স্থলেই দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি অন্যান্য বৈদান্তিক মতবাদের উল্লেখ আছে। উল্লেখ আছে সাংখ্য-পাতঞ্জল-দর্শনের সিদ্ধান্তেরও। অনেকেই স্বামীজীর 'Each soul is potentially divine' ('আত্মামাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম') কথাটিকে এমনভাবে উপস্থাপিত করেন যে, উহাই যেন স্বামীজীর শেষ সিদ্ধান্ত। তাঁহারা বিস্মৃত হন যে, পাতঞ্জল দর্শনের একটি সূত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গেই স্বামীজী ঐকথা বলিয়াছেন। অনুরূপভাবে চিঠিপত্র হইতে বহু উদ্ধৃতি দিয়া দেখানো যাইতে পারে যে, স্বামীজী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ, প্রভৃতির কথাই বলিতেছেন। ফলে বিভিন্ন দর্শনের সহিত কিছুটা পরিচয় না থাকিলে পাঠকের মনে হইবে ঐগুলিই স্বামীজীর চরম সিদ্ধান্ত। আলোচ্য স্থলেও স্বামীজী রামানুজ প্রমুখ আচার্যদেরই অনুসরণ করিয়াছেন (অবশ্যই গ্যাংলিয়ন অংশে নহে)। আত্মা 'জ্ঞানবল-ক্রিয়া-শালী'—ইহা অদ্বৈতবাদের কথা নহে, যদিও অদ্বৈতপক্ষে ইহার ব্যাখ্যা অবশ্যই করা যায়।

যখন যেমন প্রয়োজন হইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ উপস্থাপিত করিলেও স্বামীজী যে পুরাপুরি অদ্বৈতবাদী এবিষয়ে কাহারও দ্বিমত থাকিতে পারে না। সুতরাং শংকরের ন্যায় স্বামীজীরও শেষ সিদ্ধান্ত এই যে, আত্মা প্রকৃতপক্ষে দেহে অবস্থান করেন না বা দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন না; এক অদ্বিতীয় অখণ্ড সর্বব্যাপী আত্মার প্রতিবিম্বই সূক্ষ্মশরীরসহায়ে এই সকল কার্য করে। স্বামীজীর কথা: 'যখন বলা হয়—আত্মা আসিতেছে ও যাইতেছে, তখন তাহা কেবল বুঝিবার সুবিধার জন্যই বলা হয়, যেমন জ্যোতির্বিদ্যা-পাঠের সুবিধার জন্য তোমাদের মনে করিতে বলা হয়, সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে, যদিও তাহা সত্য নহে।'; 'একমাত্র সেই অনন্ত সত্তা আছেন। যেমন একই সূর্য বিভিন্ন জলবিন্দুর উপর প্রতিবিম্বিত হইয়া বহুরূপে প্রতিভাত হয়…এবং প্রত্যেকটি জলকণিকাই সূর্যের পরিপূর্ণ প্রতিমূর্তি ধারণ করে, অথচ সূর্য একটিমাত্রই থাকে, ঠিক সেইরূপ এই সকল জীব ভিন্ন ভিন্ন অন্তঃকরণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব মাত্র।'

এখন অদ্বৈতবাদের দিক হইতে আত্মার 'কেল্লা' হিসাবে গ্যাংলিয়নের উল্লেখ ব্যাখ্যা করা যায় কিনা দেখা যাইতে পারে—যদিও আগেই বলা হইয়াছে যে, স্বামীজী ঐ স্থলে অদ্বৈতবাদের কথা বলেন নাই। এই প্রসঙ্গে শংকরাচার্যের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য। শংকরাচার্য ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে লিখিয়াছেন, 'হৃদয়ায়তনত্ববচনম্ অপি বুদ্ধেঃ এব, তদায়তনত্বাৎ।' অর্থাৎ হৃদয়রূপ আশ্রয়ে আত্মার

অবস্থিতিবোধক বাক্যও 'বুদ্ধি'রই অবস্থিতি-বোধক বলিয়া বুঝিতে হইবে, কারণ হৃদয়ই বুদ্ধির আশ্রয়। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, 'হৃদি হি এবঃ আত্মা' ইত্যাদি বাক্যের ব্যাখ্যায় শংকর বলিয়াছেন, হৃদয় বলিতে বুদ্ধিকে বুঝিতে হইবে। এখানে কিন্তু হৃদয়কে বুদ্ধির আশ্রয় বলিতেছেন, যে বুদ্ধিতে সর্বব্যাপী এক অখণ্ড আত্মচৈতন্য বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়। অবশ্য 'হৃদয়' বস্তুটি কি, তাহা শংকর এখানে ব্যাখ্যা করেন নাই। স্বামীজীর উল্লেখিত সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়নটিকে যদি আমরা আত্মপ্রতিবিম্ব-গ্রাহিকা বুদ্ধির আশ্রয় বলিতে পারি, তাহা হইলে বিষয়টি অদ্বৈতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে যথাসম্ভব ব্যাখ্যাত হয়। ইহা পারা যায় কিনা শারীরবিজ্ঞানীরাই বলিতে পারিবেন। তবে সেখানেও অসুবিধা আছে। কারণ, সাধারণ মানুষের বহু স্নায়ু-কোষ নিষ্ক্রিয় থাকে। আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা সেগুলি সক্রিয় হয়। সাধক যখন সমাধিস্থ হন—যখন তাঁহার ইন্দ্রিয়-সকল এবং মন ও বুদ্ধি সম্পূর্ণ স্থির হইয়া যায়, তখনই স্থির স্বচ্ছ বুদ্ধি সর্বগত আত্মার প্রতিবিম্ব পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে। বর্তমানে শারীর-বিজ্ঞানের সম্ভবতঃ এতটা উন্নতি হয় নাই যে, সমাধিকালে সাধকের শরীরের সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়নের অবস্থা কিরূপ হয়, তাহা নির্ণয় করিতে পারে। সুতরাং শারীরবিজ্ঞানের আরও অগ্রগতি না হইলে এবং গবেষণার জন্য বহু-সংখ্যক সমাধিমান ব্যক্তিরও নমুনা না পাইলে এবিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা বিজ্ঞানসম্মত তথ্য আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভব নহে। শারীরবিজ্ঞানবিদ্‌দের আরও একটি প্রশ্নের জবাব দিতে হইবে—সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়নে কি কোনও আকাশ (শূন্য স্থান) আছে এবং যদি থাকে তাহা কি অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ?

আর বিজ্ঞানীদের ভবিষ্যৎ গবেষণার ফলে যদি অনুকূল সিদ্ধান্ত না পাওয়া যায় অর্থাৎ স্বচ্ছ ও স্থির বুদ্ধি এক অদ্বিতীয় আত্মার প্রতি-বিম্ব পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করিতেছে, অথচ আলোচ্যমান সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়নটি সাধারণ মানুষে যেমন থাকে তেমনি রহিয়াছে, উহাতে কোন লক্ষণীয় পরিবর্তন নাই—পরিস্থিতি যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে বিবেকানন্দ-সাহিত্যে যাঁহারা হাস্যরসের খোঁজে আছেন, তাঁহারা নিঃসন্দেহে কিছু নূতন খোরাক পাইবেন, কারণ স্বামীজীর চিঠি-খানির প্রতিপাদ্য বিষয় 'আত্মার কেল্লা' নহে। সহৃদয়তা সমবেদনা সহানুভূতি সহমর্মিতাই উহার প্রতিপাদ্য বিষয়। গ্রামাঞ্চলে দরিদ্রদের মধ্যে অনাথাশ্রম খুলিয়া কয়েকটি অনাথ বালকের সেবায় ব্রতী গুরুভ্রাতা স্বামী অখণ্ডানন্দকে স্বামীজী ঐ পত্রেই লিখিয়াছেন, 'বিদ্যাবুদ্ধি বাড়ার ভাগ—উপরে চাকচিক্য মাত্র; সমস্ত শক্তির ভিত্তি হচ্ছে হৃদয়'; 'হৃদয় যত দেখাতে পারবে, ততই জয়। মস্তিষ্কের ভাষা কেউ কেউ বোঝে, হৃদয়ের ভাষা আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সকলে বোঝে।' ইত্যাদি। সুতরাং 'গ্যাংলিয়ন'-এর বিশেষণ 'সিম্প্যাথেটিক' শব্দটি শ্লেষালঙ্কাররূপে (pun) প্রয়োগ করা জীবদরদী 'সহাস্য বিবেকানন্দ'-এর পক্ষে কিছু বিচিত্র নহে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘে ফলহারিণী-কালিকাপূজার বিশেষ তাৎপর্য

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ

আজ ফলহারিণী-কালিকাপূজার পুণ্য দিন। এই দিনে কালীপূজা ত হয়ই। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘে এর একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এই দিনে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সাধক জীবনের ব্রত উদ্‌যাপিত করেন। উদ্‌যাপিত করেন একটি বিশেষভাবে। সেটি হচ্ছে এই দিনে তিনি শ্রীসারদামণিদেবীকে ষোড়শীদেবীরূপে পূজা করেন। আপনারা জানেন, আদ্যাশক্তির বিভিন্ন রূপ রয়েছে। সেই রূপের মধ্যে কালী তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ছিন্নমস্তা ভৈরবী ধূমাবতী বগলা মাতঙ্গী কমলা এই দশটি রূপ প্রসিদ্ধ। মূর্তিমতী বিদ্যারূপিণী মানবীর দেহাবলম্বনে জগদীশ্বরী আদ্যাশক্তিকে ষোড়শীরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ পূজা করেছিলেন, পূজা ক'রে আত্মসমর্পণ করেছিলেন দেবীর চরণে এবং জপমালা প্রভৃতি সাধনার সব উপকরণ তাঁর চরণে নিবেদন ক'রে তাঁর দীর্ঘ ও বিচিত্র সাধনার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিলেন। এই দিনটির তাই বিশেষ ব্যঞ্জনা রয়েছে।

তিনি কেন ষোড়শীদেবীরূপে শ্রীশ্রীমাকে পূজা করলেন সংক্ষেপে তাই আজ আলোচনা করছি। আমাদের এই সংঘ শংকরাচার্যের দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত। দশনামীদের ভেতর পুরী গিরি ভারতী তীর্থ বন অরণ্য পর্বত আশ্রম সাগর সরস্বতী—এই সব সম্প্রদায় রয়েছে। আমাদের সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় পুরী-সম্প্রদায়ভুক্ত। শ্রীমৎ তোতাপুরী শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের সন্ন্যাসের গুরু ছিলেন। তাই আমরা গুরুপরম্পরাক্রমে নিজেদের পুরী-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী বলে মনে করি। আমাদের এই পুরী-সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীদের আদি মঠের নাম হ'ল শৃঙ্গেরী মঠ। প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই বিভিন্ন দেবদেবী আছেন। পুরী-সম্প্রদায়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন কামাক্ষী দেবী। এই দেবীর মন্দির রয়েছে দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চীপুরমে। সেখানে দেবীর ষোড়শী মূর্তি রয়েছে। ষোড়শীদেবীর অপর নাম হ'ল রাজরাজেশ্বরী ত্রিপুরাসুন্দরী বা শ্রীবিদ্যা।

দক্ষিণভারতে এই শ্রীবিদ্যার উপাসনা বিশেষ প্রচলিত। বঙ্গদেশে যে উপাসনা প্রচলিত তাকে বলা হয় কালীকুলের উপাসনা। আর দাক্ষিণাত্যের যে উপাসনা তাকে বলা হয় শ্রীকুলের উপাসনা। আচার্য শংকর ভারতের চার দিকে চারটি সন্ন্যাসীদের মঠ স্থাপন করেন। তার মধ্যে দক্ষিণভারতে শৃঙ্গেরীতে যে মঠটি স্থাপন করেন, তার অধিষ্ঠাত্রী হিসাবে শ্রীযন্ত্র প্রতিষ্ঠা ক'রে নিত্য পূজার প্রচলন করেন। তিনি কাঞ্চীপুরমে দেবীকে শ্রীমূর্তিতে কামাক্ষী নামে অভিহিত ক'রে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং শ্রীযন্ত্রেরও প্রতিষ্ঠা করেন। এই দেবীই পুরী-সম্প্রদায়ের ইষ্ট-দেবী। প্রত্যেক দেবতারই এক একটি যন্ত্র আছে। কতকগুলি রেখার মাধ্যমে নির্দিষ্ট একটি আধার অঙ্কন ক'রে তাতেই সেই সেই দেবতার অধিষ্ঠান কল্পনা করতে হয়। শৃঙ্গেরী মঠে এই শ্রীযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত আছে, ঐ মঠান্তর্গত সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে।

পুরী-সম্প্রদায়ের পীঠাধিষ্ঠাত্রী এই দেবী ষোড়শী, যাঁর অপর নাম—আগেই বলেছি—কামাক্ষী রাজরাজেশ্বরী ত্রিপুরাসুন্দরী বা শ্রীবিদ্যা। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাস গ্রহণের পর পুরী-সম্প্রদায়ান্তর্গত শ্রীকুলে এসে পড়লেন। যদিও তিনি কালীকুলের সাধনা আরম্ভ করেন, কিন্তু সাধনার সমাপ্তি ঘটান শ্রীকুলে এসে এবং শ্রীকুলের সাধনা ক'রে। এটি তন্ত্রশাস্ত্রসম্মতও বটে। দাক্ষিণাত্যে তন্ত্রসাধনা পরশুরামকল্পসূত্রসম্মত। সেই পরশুরামসূত্রে শ্রীকুলের প্রধানা দেবীকে বলা হয়েছে সম্রাজ্ঞী—'সেয়ং সম্রাজ্ঞী'। শ্রীদেবী হচ্ছেন সম্রাজ্ঞী, সমস্ত দেবীর ভেতর। শ্যামা বা কালী হচ্ছেন তাঁর প্রধান সচিব। শ্রীবিদ্যার অর্চনা করতে হলে প্রথমে শ্যামার অর্চনা করতে হবে। কেন? প্রধান সচিবের, প্রধান মন্ত্রীর উপাসনা কেন? সম্রাজ্ঞীরই ত প্রথম উপাসনা করা উচিত। কিন্তু না। রাজার যদি উপাসনা করতে হয় তাহলে প্রথমে মন্ত্রীকেই সন্তুষ্ট করতে হবে। 'প্রধান-দ্বারা রাজপ্রসাদনং হি কুর্যাৎ।' সেইজন্য সাধক কালীপূজায় সিদ্ধি লাভ ক'রে তারপর শ্রীবিদ্যার উপাসনার অর্থাৎ সম্রাজ্ঞী ষোড়শী দেবীর উপাসনার অধিকারী হন।

শ্রীরামকৃষ্ণ অবশ্য এতো সব ভেবে চিন্তে বা শাস্ত্র পড়ে এই ভাবে সাধনায় অগ্রসর হননি। কিন্তু তাঁর জীবনটাই হচ্ছে শাস্ত্র। তাঁর জীবনেই শাস্ত্রের তত্ত্ব প্রমাণিত হয়েছে। ঠিক আপনা আপনি একটির পর একটি সাধনা তাঁর জীবনে এসেছে। এবং সেই সমস্ত সাধনা শাস্ত্রসম্মতভাবেই হয়ে গেছে। কালী-কুলের সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। মা কালীর দর্শন তিনি লাভ করেছিলেন এবং তার পরে শ্রীবিদ্যার উপাসনা তিনি করেছেন। কিন্তু সেই শ্রীবিদ্যার উপাসনা তিনি কোন মাটির মূর্তি গড়ে করেননি। একজন দিব্য মানবীর দেহ-মনের উপরে এই শ্রীবিদ্যার অবতরণ ঘটেছিল। সেই মানবীর নাম হচ্ছে দেবী সারদামণি। তিনিই শ্রীবিদ্যাস্বরূপিণী। এই 'সম্রাজ্ঞী'কে শ্রেষ্ঠা শক্তিরূপেই—সন্ন্যাসী শ্রীরামকৃষ্ণ উপাসনা করেছিলেন। পূজা করেছিলেন কাঞ্চীপুরমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ষোড়শী কামাক্ষীকেই ত্রিপুরাসুন্দরীরূপে এই দেবীর শরীর অবলম্বনে।

আর সেই দিনেই আমাদের এই সন্ন্যাসী-সংঘের দেবী শ্রীবিদ্যা মানবীর দেহ অবলম্বন ক'রে ভাবী শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘকে যে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করবেন, তারই সূচনা। এই যে ফলহারিণী-কালীপূজা হয় আমাদের বিভিন্ন আশ্রমে, তার মূল তত্ত্ব হচ্ছে এই।

আজকের দিনে শ্রীশ্রীমাকে স্মরণ ক'রে ফলহারিণী-কালীপূজাও আমরা করি। পূর্বোক্ত তত্ত্বই ফলহারিণী-কালীপূজাকে শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘে বিশেষ তাৎপর্য এনে দিয়েছে।*

---

* ৪ঠা জুন ১৯৭৮, বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের 'সারদানন্দ হলে' নিয়মিত রবিবাসরীয় কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যার প্রারম্ভে ফলহারিণী-কালিকাপূজা উপলক্ষে আলোচনা। শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত।

দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়

ডক্টর রমা চৌধুরী

(নবম পর্যায়)

শ্রীপতির 'বিশেষাদ্বৈতবাদ'

শঙ্করের অত্যুগ্র অসমসাহসী অতি-কঠোর অতি-দুর্বোধ্য নির্ভেজাল নিঃশর্ত আপস-বিহীন' উপমাহীন 'কেবলাদ্বৈতবাদে'র প্রখর প্রচণ্ড আলোকে অন্ধচক্ষু পরবর্তী সকল বৈদান্তিকের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যই যেন হয়ে দাঁড়াল সেই সর্বগ্রাসী 'একে'র সর্বত্র সর্বদা এবং সর্বাবস্থায় প্রসারিত লোলুপ ও করাল হস্ত থেকে নিজেদের ব্যক্তি-সত্তাকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে ব্যক্তি-মর্যাদাকে যে কোনোক্রমে রক্ষা করা; এবং সেই 'একে'র পার্শ্বে নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে নির্দ্বিধায় নিজেদের যোগ্য বিশেষ স্থানটি ক'রে নেওয়া। আর বিনাশ নয়, বিকাশ; আর লুপ্তি নয়, পূর্তি; আর মরণ নয়, জীবন—ব্যক্তির পরিপূর্ণ জীবন সমষ্টির পার্শ্বে; অংশের পরিপূর্ণ মহিমা অংশীর পার্শ্বে; কার্যের পরিপূর্ণ স্থিতি কারণের পার্শ্বে; গুণের পরিপূর্ণ প্রকাশ দ্রব্যের পার্শ্বে। বস্তুতঃ, 'একে'র কথা ত বলতে পারেন কেবল 'এক'ই; 'বহু'র কথা 'বহু'। এক্ষেত্রেও ত ঠিক তাই ঘটল—'একে'র কথা বলার মত দুঃসাহসী জন ত আমরা পেলাম কেবল এককেই, কেবল শঙ্করকেই। কিন্তু 'বহু'র কথা বলবার জন্য পেলাম 'বহু'জনকেই—বস্তুতঃ, শঙ্কর ব্যতীত অন্যান্য সকল বৈদান্তিককেই; এবং যা পূর্বেই বলা হয়েছে, একবাদী শঙ্কর হয়ে পড়লেন বেদান্তের ক্ষেত্রে নিতান্তই একাকী, নিতান্তই নিঃসঙ্গ, নিতান্তই ,একঘরে'। তাঁর পরবর্তী সুবিশাল ও সুনিগূঢ় বেদান্ত-দর্শন সুপ্রতিষ্ঠিত, সুবিন্যস্ত এবং সুপ্রসারিত হ'ল একমাত্র শঙ্করের 'কেবলাদ্বৈত-বাদে'র বিরুদ্ধেই অস্ত্রধারণ ক'রে। কেবল 'অভেদ'! 'কি সর্বনেশে অলুক্ষুণে' কথা—যেমন ক'রে পার আন 'ভেদ'কে—এবং সেই 'ভেদ'কে আনবার প্রচেষ্টা কতই না বিবিধ-বিচিত্র; কতই না আশ্চর্যজনক ও কৌতূহলোদ্দীপক; কতই না ভাব-ভাবনাপ্রসূত ও আবেগোচ্ছ্বাস-রণিত। কারণ, শঙ্কর যে 'একাই একশ'—তাঁকে ধরাশায়ী করতে পরবর্তী সকলে যে যেদিক থেকে পারেন তীর নিক্ষেপ করেছেন সবেগে এবং কতই না নব নব গুণশক্তিবিভূষিত সেই সকল তীর। তাতে শঙ্করের অভ্রভেদী একত্ব-বর্মে, অদ্বৈত-দুর্গে বিন্দুমাত্রও আঘাত লেগেছে কি না জানি না; কিন্তু একথা স্থির জানি যে, প্রত্যেকটি তীরই স্ব স্ব গৌরবে, স্ব স্ব সাহসে, স্ব স্ব আত্ম-বিশ্বাসে, স্ব স্ব প্রাণশক্তিতে ভরপুর, নিঃসন্দেহে।

এরূপ একটি দুঃসাহসী আত্মবিশ্বাসী জন হলেন 'বিশেষাদ্বৈতবাদী' শ্রীপতি। সত্যই মনে হয়, কি প্রবলপরাক্রান্ত জন তিনি! কারণ, কোথায় বা শঙ্কর, আর কোথায় বা শ্রীপতি! এমন কি, শঙ্করবিরোধী সুপ্রসিদ্ধ রামানুজ-নিম্বার্কাদির ন্যায়ও ত নেই তাঁর কোনো তর্ক-কুশলতা; নেই কোনো নূতন তত্ত্বাবিষ্কার-ক্ষমতা; নেই কোনো সুদূরপ্রসারী আর্ষ-দৃষ্টি। অথচ নূতন কিছু বলবার মোহে, তিনি যে ভাবে

নির্ভয়ে কোনোদিকে দৃক্‌পাত না ক'রে একটি নব-বেদান্ত-সম্প্রদায়স্থাপনে ব্রতী হলেন, তা আর যাই হোক না কেন, সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য—যেহেতু তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে শঙ্করবিরোধীরা সমস্ত সম্ভাব্য পক্ষ বা বিকল্পই ত যেন শেষ ক'রে ফেলেছেন বলেই বোধ হচ্ছিল। অথচ পরমোৎসাহে এবং অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে শ্রীপতি বের ক'রেই ফেল্লেন আরেকটি নূতন পক্ষ বা বিকল্প—তাঁর অত্যন্ত অভিনব, অত্যন্ত অদ্ভুত, অত্যন্ত অবিশ্বাস্য 'বিশেষাদ্বৈতবাদ' দ্বারা। তিনি আমাদের চিরনমস্য—তাঁর এই চিত্তচমৎকারী মতবাদের জন্য। শেষ পর্যন্ত তা যুক্তির কষ্টিপাথরে সোনা হয়ে দাঁড়াতে পারুক, বা নাই পারুক।

অন্যান্য ক্ষেত্রে যেরূপ, এ ক্ষেত্রেও ঠিক সেইরূপই, শ্রীপতির পুণ্যজীবনী আমাদের নিকট প্রায় অজ্ঞাতই বলা চলে যেটুকু তাঁর সম্বন্ধে জানা গেছে, তা থেকে এইমাত্রই বলা চলে যে, সম্ভবতঃ তিনি তেলেগুভাষাভাষী কৃষ্ণা-গোদাবরী অঞ্চলস্থ 'আরাধ্য ব্রাহ্মণ' ছিলেন। তাঁর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের প্রত্যেক পাদের শেষে (Colophon) তিনি 'শ্রীপতি-পণ্ডিতাচার্যঃ' বা 'শ্রীপতি-পণ্ডিত-ভগবৎ-পাদাচার্যঃ' ব'লে নিজেকে উল্লেখ করেছেন এইভাবে: 'ইতি শ্রীমদ্‌যতিব্রজ-পরিবৃঢ়-শ্রীপতি-পণ্ডিত-ভগবৎপাদাচার্যকৃত-ভেদাভেদাত্মক-বিশেষাদ্বৈত-সিদ্ধান্তস্থাপকে বৈয়াসিক-ব্রহ্ম-মীমাংসা-সূত্রার্থ-প্রকাশকে শ্রীকরভাষ্যে'...... ইত্যাদি।

কেবল প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের শেষে (Colophon-এ) একটি নূতন বিশেষণ সংযুক্ত করা হয়েছে। সেটি এরূপ—

'শ্রীমন্নিরাভার- বীরশৈব- যতিব্রজ-পরিবৃঢ়-শ্রীপতি-পণ্ডিত-ভগবৎ-পাদাচার্যকৃত...' ইত্যাদি।

এরূপে, আমরা দেখি যে শ্রীপতি নিজেকে নিজেই অভিহিত করেছেন এই ভাবে:—

শ্রীমন্‌-নিরাভার-বীরশৈব-যতিব্রজপরিবৃঢ়-শ্রীপতি-পণ্ডিত-ভগবদাচার্যঃ।

এস্থলে, 'নিরাভারঃ' শব্দের অর্থ হ'ল: যিনি দুঃখক্লেশক্লিষ্ট সংসারভার থেকে মুক্ত, অথবা সন্ন্যাসী। 'যতিব্রজপরিবৃঢ়ঃ' শব্দের অর্থ হ'ল: যিনি সন্ন্যাসিগণকর্তৃক পরিবেষ্টিত। অতএব, শ্রীপতির নিজের বর্ণনা থেকেই জানা যায় যে, শ্রীপতি নিজেই যে কেবল প্রখ্যাত সন্ন্যাসী ছিলেন, তা-ই নয়; সেই সঙ্গে সঙ্গে, তিনি বহু প্রখ্যাত সন্ন্যাসী কর্তৃক পরিবৃতও হয়ে থাকতেন সর্বদা—অর্থাৎ, তিনি একজন তুল্য প্রখ্যাত 'গুরু'ও ছিলেন, যিনি শিষ্যরূপ বহু প্রখ্যাত সন্ন্যাসী কর্তৃক নিত্যই পরিবৃত হয়ে থাকতেন এবং পূজিত হতেন।

উপরে যা বলা হ'ল, শ্রীপতিকে বলা হ'ত 'আরাধ্য-ব্রাহ্মণ' এবং সেই সঙ্গে, তাঁকে 'দেশিক'ও বলা হ'ত। 'আরাধ্য' শব্দটির অর্থ হ'ল 'পূজার্হ'; এবং শ্রীপতি স্বয়ং 'আরাধ্য' শব্দটিকে 'আচার্য' শব্দটির সঙ্গে সমার্থক ব'লে গ্রহণ করেছেন; এবং 'দেশিক' শব্দটিরও সেই একই অর্থ (অর্থাৎ 'আচার্য') করেছেন—যখন তিনি এই দুটি শব্দের দ্বারা শ্রীকণ্ঠ-শৈবাচার্যকে প্রণতি নিবেদন করেছেন। সাধারণতঃ 'আচার্য' বলতে আমরা তাঁকেই বুঝি, যিনি গুরুরূপে শিষ্যদের শিক্ষাদান করেন, এবং জ্ঞানিরূপে নূতন তত্ত্ব প্রপঞ্চিত করেন। বলাই বাহুল্য, শ্রীপতি এই দুই অর্থেই 'আচার্য'-পদের পরিপূর্ণ অধিকারী।

সাধারণতঃ, শৈবদের তিনটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা হয়—সামান্য-শৈব, মিশ্র-শৈব ও শুদ্ধ-শৈব। সামান্য-শৈব ও মিশ্র-শৈবেরা

শিব ও বিষ্ণু উভয়েরই পূজা করেন; কিন্তু শুদ্ধ-শৈবেরা কেবলমাত্র শিবেরই পূজা করেন।

বীর-শৈবেরা এই তিনটি সম্প্রদায়ের একটিরও অন্তর্গত নন। তাঁরা অবশ্য শুদ্ধ-শৈবদের ন্যায় কেবলমাত্র শিবেরই উপাসনা করেন। কিন্তু শুদ্ধ-শৈবদের সঙ্গে তাঁদের বহু প্রভেদও আছে। যথা, বীর-শৈবেরা দেহে, অর্থাৎ প্রায়শঃই মস্তকে বা কণ্ঠে দৃশ্যমান ও দোদুল্যমান লিঙ্গচিহ্ন ধারণ করেন, যা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বহন ক'রে নিয়ে যাওয়া যায়; শুদ্ধ-শৈবেরা তা করেন না।

শ্রীপতি Colophon ব্যতীত তাঁর ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের স্বরচিত প্রারম্ভিক শ্লোকেও নিজেকে 'যতি' ব'লে উল্লেখ করেছেন (শ্লোক ১১)।

শ্রীপতির আবির্ভাব সময়ও নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। তিনি তাঁর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে ভেদবাদী বৈদান্তিক মধ্বের মত খণ্ডন করেছেন। মধ্ব খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং শ্রীপতি যে সেই সময়ের পরবর্তী ছিলেন, তা বলাই বাহুল্য। পুনরায়, কন্নাদনিবাসী বীরশৈব কবি গুব্বিয়মল্লন্ন খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত তাঁর 'ভাবচিন্তারত্নে' শ্রীপতিকে 'শ্রীপতিদেব' ব'লে প্রণতি নিবেদন করেছেন। সেজন্য, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া চলে যে, শ্রীপতি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে ভারতভূমি ধন্য করেন।

শ্রীপতির একটিমাত্র গ্রন্থের কথাই আমরা জানি। অর্থাৎ, তাঁর সুবিখ্যাত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য 'শ্রীকর-ভাষ্য'। অবশ্য কথিত আছে যে, তিনি ঈশোপনিষদ্ ও গীতার ভাষ্যও রচনা করেছিলেন। তিনি এই সুবিশাল 'শ্রীকর-ভাষ্যে'র প্রত্যেক পাদের শেষে (Colophon-এ) স্বয়ং এই গ্রন্থের নামোল্লেখপূর্বক বলেছেন: 'বৈয়াসিক- ব্রহ্ম- মীমাংসা- সূত্রার্থ- প্রকাশকে শ্রীকর-ভাষ্যে'···ইত্যাদি। 'শ্রীকর' শব্দের অর্থ 'শিবংকর' অথবা শুভকারী বা 'শিব'। গ্রন্থের প্রারম্ভেও শ্রীপতি নিজেই নিজের এই ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যকে 'শিবংকর' ব'লে উল্লেখ করেছেন: 'অগস্ত্য-মুনি-চন্দ্রেণ কৃতবৈয়াসিকাং শুভাম্। সূত্রবৃত্তিং সমালোচ্য কৃতং ভাষ্যং শিবংকরম্॥' (১৬)

এর থেকেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, এই ভাষ্যের উদ্দেশ্যই হ'ল শিবই যে পরব্রহ্ম, তা প্রমাণিত করা; এবং সেজন্যই এর নাম 'শ্রীকর-ভাষ্য' অথবা 'শিব-ভাষ্য'। বিশেষ ক'রে, এই অনুপম গ্রন্থটি বীর-শৈব-সম্প্রদায়-তত্ত্বানুসারী; এবং এতে বীর-শৈব-সম্প্রদায়ের দুটি প্রধান তত্ত্ব—'অষ্টাবরণ' এবং 'ষট্‌স্থলে'র বারংবার উল্লেখ আছে। সুতরাং নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, 'শ্রীকর-ভাষ্য' বীর-শৈব-সম্প্রদায়ের প্রামাণিক বেদান্ত-ভাষ্য।

সাধারণতঃ 'শ্রীকর'-ভাষ্যের ভাষা সহজ-সরল এবং বৃহৎ-বৃহৎ-সমাস-রহিত হলেও, দুর্ভাগ্যবশতঃ, স্থানে স্থানে কঠিন ও দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে। তা সত্ত্বেও 'শ্রীকর-ভাষ্যে' শ্রীপতির গভীর দার্শনিক জ্ঞান, সুতীক্ষ্ণ নৈয়ায়িক বুদ্ধি, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারশক্তি, দুর্লঙ্ঘ্য তর্কপ্রণালী প্রভৃতি বহুবিধ গুণের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তাঁর ভাষ্যে বেদ উপনিষদ স্মৃতি পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি থেকে অজস্র বাক্য উদ্ধৃত করেছেন স্বীয় মতবাদের প্রমাণরূপে; এবং পূর্ববর্তী বহু জ্ঞানি-গুণিজনের নামোল্লেখ ক'রে তাঁদের মতবাদ গ্রহণ অথবা খণ্ডন করেছেন। এর থেকে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের কিছু প্রমাণ

পাওয়া যায়। সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ তাঁর প্রগাঢ় 'ন্যায়-জ্ঞান'। তিনি তাঁর 'শ্রীকর-ভাষ্যে' ৬৯টি 'ন্যায়ে'র উল্লেখ করেছেন—যথা, 'দগ্ধ-পট-ন্যায়', 'দধি-ক্ষীর-ন্যায়', 'নদী-সমুদ্র-ন্যায়', 'ভ্রমর-কীট-ন্যায়', 'লোহ-রসাদি-ন্যায়', 'বীজাঙ্কুর-ন্যায়', 'অন্ধ-পরম্পরা-ন্যায়', 'গো-বলীবর্দ-ন্যায়', 'অরুন্ধতী-ন্যায়', 'সমুদ্র-তরঙ্গ-ন্যায়', ইত্যাদি; যেস্থলে, স্বয়ং শঙ্করও ২৫টির অধিক 'ন্যায়ে'র উল্লেখ করেননি।

'শ্রীকর-ভাষ্যে'র প্রারম্ভে যে ১৬টি শ্লোক আছে, তাতে শ্রীপতি প্রথমেই শিবকে নানা-ভাবে স্তুতি ও প্রণতি নিবেদন করেছেন; পরে স্বীয় ভাষ্যকে নানারূপ প্রকৃষ্ট বিশেষণে বিভূষিত করেছেন; এবং পরিশেষে এই ভাষ্য-রচনার মূল উদ্দেশ্য বিবৃত করেছেন সগৌরবে:

'শ্রীবৈয়াসিক-ব্রহ্মসূত্র-পদ-মু-
খ্যার্থং শিবানুগ্রহাৎ
ভাষ্যং শ্রীকর-নামকং ভবহরং
দুর্বাদিগর্বাপহম্।
শ্রীমচ্ছ্রীপতি-পণ্ডিতেন্দ্র-যতিনা
ব্যাচক্ষতে সাম্প্রতম্
সর্বানর্থ-বিনাশকরং বুধ-স্তুতং
তত্ত্বার্থ-বোধাকরম্॥
অশেষোপনিষৎ-সার-বিশেষাদ্বৈত-মণ্ডনম্।
শিব-জ্ঞান-প্রদং সূত্র-ভাষ্যং জয়তু সর্বদা॥
বেদাগমার্থ-তত্ত্বজ্ঞ-শৈবানাং
মোক্ষ-কাঙ্ক্ষিণাম্।
বৈদিকানাং বিশুদ্ধানাং এতদ্‌ভাষ্যং
হি কল্পকম্॥
শ্রুত্যেকদেশ-প্রামাণ্যং দ্বৈতাদ্বৈত-মতাদিষু।
দ্বৈতাদ্বৈতমতে শুদ্ধে বিশেষাদ্বৈতসংজ্ঞিকে।
বীরশৈবক-সিদ্ধান্তে সর্ব-শ্রুতি-সমন্বয়ঃ॥'
(১১-১৫)

অর্থাৎ, শ্রীশিবের অনুগ্রহে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ, সন্ন্যাসী শ্রীপতি 'শ্রীকর' নামক ভাষ্য অধুন রচনা করেছেন—

(১) যে ভাষ্য, ব্যাসপ্রণীত-ব্রহ্মসূত্রের মুখ্য অর্থস্বরূপ; (২) যে ভাষ্য সংসারত্রাতা; (৩) যে ভাষ্য অসত্যবাদিগণের গর্ব হরণ করেছে; অর্থাৎ তাঁদের বাক্য বা তত্ত্বের মিথ্যাত্ব প্রমাণ করেছে; (৪) যে ভাষ্য সকল অনর্থ বিনষ্ট করেছে; অর্থাৎ অজ্ঞান বা অবিদ্যা, তজ্জনিত বাসনা-কামনা, এবং তজ্জনিত দুঃখক্লেশ, পাপ-তাপ দূর করেছে; (৫) যে ভাষ্য প্রাজ্ঞজন কর্তৃক পূজিত হয়েছে; (৬) যে ভাষ্য তত্ত্বজ্ঞানের আধার; (৭) যে ভাষ্য সকল উপনিষদের সারস্বরূপ; (৮) যে ভাষ্য 'বিশেষাদ্বৈত-মতবাদে'র অলঙ্করণ সাধিত করেছে; (৯) যে ভাষ্য শিবজ্ঞান প্রদান করেছে; (১০) যে ভাষ্য সর্বদা জয়যুক্ত হবে।

বেদজ্ঞ মোক্ষকামী বিশুদ্ধ বৈদিক শৈবদের জন্যই এই ভাষ্য রচিত হয়েছে। দ্বৈতাদ্বৈত-মতবাদসমূহে শ্রুতির একাংশেরই কেবল প্রামাণ্য পাওয়া যায়। কিন্তু বীরশৈব-সিদ্ধান্তরূপ 'বিশেষাদ্বৈত'-মতবাদে সকল শ্রুতিরই সমন্বয় ঘটেছে।

অবশ্য, প্রাজ্ঞজনই বিচার করবেন, আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাসী শ্রীপতির এই সকল দাবী ন্যায়সঙ্গত কি না। আমরা কেবল এইটুকুই বলব যে, পৃথিবীর নবচিন্তার ক্ষেত্রে শ্রীপতির মতবাদও নিশ্চয় একটি নব-দান, তার পরিপূর্ণ মূল্যায়ন শেষ পর্যন্ত যা-ই হোক না কেন!

অন্যান্য বৈদান্তিকের ন্যায়, শ্রীপতিও 'ব্রহ্ম'কে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব, মহত্তম সত্য, বৃহত্তম সত্তা ব'লে গ্রহণ করেছেন; এবং সাম্প্রদায়িক দিক থেকে তাঁর মতে শিবই হলেন ব্রহ্ম, যা পূর্বেই বলা হ'ল। তিনি তাঁর ভাষ্যের প্রারম্ভেই

(১।১।১ সূত্রভাষ্যে) এইভাবে 'ব্রহ্ম' ও 'জীবে'র মধ্যে প্রভেদ করেছেন :

"বেদাগমোভয়-বেদান্ত-প্রতিপাদিত-স্বাভাবিকানন্ত-শক্তি-বিশিষ্ট-জগদুভয়-কারণ-পশুপাশ-নিয়ামক-সকল-নিষ্কল-স্থূল-সূক্ষ্ম- চিদচিৎ-প্রকাশক-সত্য-জ্ঞানানন্ত- কল্যাণ-গুণ- বিভবাশ্রয়ত্বং 'ব্রহ্মত্বম্'। অনাদি-স্বাভাবিক-মায়াপাশ-বদ্ধ-ঘোরাপার-নিস্তার-সংসার-ব্যাপার-তাপ-ত্রয়ানল-দংদহ্যমান-নানা-শরীর-প্রবেশ-নির্গমন-বর্ণাশ্রমাভিমান- বিশিষ্ট- কাম- ক্রোধাদ্যনুস্যূত-সুখ-দুঃখাশ্রয়ত্বং 'জীবত্বম্'।" (১।১।১)

অর্থাৎ—ব্রহ্মের লক্ষণ প্রধানতঃ এরূপ :

(১) ব্রহ্ম বেদ, আগম এবং বেদান্তের একমাত্র প্রতিপাদ্য বস্তু ; (২) ব্রহ্ম স্বাভাবিক অনন্তশক্তিবিশিষ্ট ; (৩) ব্রহ্ম জগতের অভিন্ন নিমিত্ত ও উপাদান কারণ ; (৪) ব্রহ্ম 'পশুপাশ' অথবা জীবের 'বন্ধ' বা বদ্ধাবস্থা অথবা সংসারদশার কারণ জীবেরই নিজের অভুক্ত সকাম কর্মানুসারে ; (৫) ব্রহ্ম চিৎ ও অচিৎ, জীব ও জগতের সূক্ষ্ম স্থূল রূপের ধারক ও প্রকাশক ; (৬) সত্য-জ্ঞান-প্রমুখ অনন্ত-কল্যাণগুণমণ্ডিত ইত্যাদি।

অপর পক্ষে, জীবের লক্ষণ প্রধানতঃ এরূপ : (১) জীব অনাদি স্বাভাবিক-মায়া-পাশবদ্ধ ; (২) জীব ঘোর অপার নিস্তরণীয় সংসার-ব্যাপারজনিত তাপত্রয়ের অগ্নিতে পুনঃপুনঃ দগ্ধ ; (৩) জীব নানা শরীরে প্রবেশ ও নির্গমন-জনিত, অর্থাৎ জন্ম ও মরণজনিত, বর্ণাশ্রমমূলক সঙ্কীর্ণ অহঙ্কার, অথবা অহং-মম-বোধদূষিত ; (৪) জীব কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্যরূপ ষড়্রিপুচালিত ; (৫) জীব সুখ-দুঃখ-ভাগী।

এই সকল লক্ষণের কথা সাধারণতঃ সকল সম্প্রদায়ের বৈদান্তিকেরাই সমন্বয়ে বলেছেন। যেমন, সকল বেদান্ত-সম্প্রদায়ের মতেই ধর্ম বা কর্ম নয়, একমাত্র ব্রহ্মই সকল শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। এ বিষয়ে বিশদ এবং যুক্তিসঙ্গত আলোচনার সূত্রপাত করেন স্বয়ং শঙ্কর 'চতুঃসূত্রী'র শেষ সূত্র 'তত্তু সমন্বয়াৎ' (১।১।৪) -এ ; এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, 'তস্মান্ন প্রতিপত্তি-বিধিবিষয়তয়া শাস্ত্র-প্রমাণকত্বং ব্রহ্মণঃ সম্ভবতীতি। অতঃ স্বতন্ত্রমেব ব্রহ্ম শাস্ত্রপ্রমাণকং বেদান্ত-বাক্যসমন্বয়াদিতি সিদ্ধম্।' (১।১।৪ শঙ্করভাষ্য) অর্থাৎ ব্রহ্ম কোনো বিধির বিষয় নন, কর্মের মত,—এমন কি, জ্ঞান-বিধিরও বিষয় নন। বরং সমগ্র বেদান্তশাস্ত্র সমন্বিত হয়ে, একত্রিত ভাবে, ব্রহ্মকে স্বতন্ত্র তত্ত্বরূপেই প্রমাণিত করে—বিধির অঙ্গরূপে নয়।

তারপরে, অন্যান্য বৈদান্তিকেরাও এই সিদ্ধান্তই সাধারণভাবে গ্রহণ করেন। সেই দিক থেকে শ্রীপতিও তাঁদের সঙ্গে একমত।

পুনরায়, সকল একেশ্বরবাদী ও ত্রিতত্ত্ববাদী বৈদান্তিকের মতেই ব্রহ্ম সগুণ ও সবিশেষ, নির্গুণ ও নির্বিশেষ নন। শ্রীপতিও এই মতবাদ সানন্দে গ্রহণ করেছেন ; এবং তাঁর মতেও ব্রহ্ম অনন্ত-কল্যাণ-গুণ-মণ্ডিত ; এবং সকল হেয়-গুণ-রহিত। প্রথম দিক থেকে, তাঁর দুটি রূপ : ভীষণ ও মধুর, 'ঘোরা' ও 'অঘোরা'। প্রথম রূপে, তিনি 'রুদ্র', দ্বিতীয় রূপে, তিনি 'সোম'।

শাস্ত্রে অবশ্য কোনো কোনো স্থলে ব্রহ্মকে 'নির্গুণ' রূপেও বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যান্য ত্রিতত্ত্ববাদী বৈদান্তিকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে শ্রীপতিও বলেছেন যে, তার কারণ হ'ল তিনটি :

প্রথমতঃ ব্রহ্ম স্বভাবতঃই সকল-হেয়-গুণ-বর্জিত এবং কেবল সেই দিক থেকেই

তিনি নির্গুণ।

দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্ম সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ—প্রকৃতির এই ত্রিগুণবিহীন—'গুণশব্দ-প্রয়োগাভাবেন সত্ত্বাদিগুণত্রয়াভাব-পরত্বাৎ।' (১।১।১)

অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ ব্রহ্মে নেই বলেই, এই অর্থেই কেবল তাঁকে 'নির্গুণ' বলা যেতে পারে।

তৃতীয়তঃ ব্রহ্মের দুটি রূপ, অমূর্ত বা অপ্রকাশিত, এবং মূর্ত বা প্রকাশিত। সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্ম নামরূপাদিরহিত হয়ে কেবলমাত্র স্বীয় সত্তাতেই স্বয়ং স্থিতি করেন; এবং সেই সময়ে তাঁর গুণ শক্তি কার্য অংশ পরিণাম প্রভৃতি স্বগতভেদ অপ্রকটিত অবস্থায় তাঁর মধ্যেই তাঁর সঙ্গেই বিলীন হয়ে থাকে এক ও অভিন্ন-রূপে। সেজন্য, সেই অর্থেই কেবল, সেই সময়েই কেবল, তাঁকে বলা যেতে পারে 'একমেবা-দ্বিতীয়ম্' (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৬।২।১), 'কেবলোনির্গুণশ্চ' (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ৬।১১) প্রভৃতি। অবশ্য, প্রকৃতকল্পে, এই অমূর্ত অবস্থাতেও ব্রহ্ম সত্য সত্যই 'নির্গুণ' হয়ে পড়েন না, যেহেতু তাঁর অন্তর্নিহিত গুণ শক্তি প্রভৃতি সেই সময়েও তাঁর স্বগতভেদ-রূপেই তাঁর মধ্যেই বিদ্যমান থাকে তাঁর শাশ্বত গুণ শক্তি প্রভৃতি রূপেই। কেবল তখন তাদের স্বতন্ত্ররূপে জানা যায় না।

এরূপে, রামানুজ-নিম্বার্কাদির ন্যায় শ্রীপতির মতেও ব্রহ্ম সর্বদা সর্বাবস্থাতেই সত্য সত্যই 'সগুণ'—'ব্রহ্মধর্মাণাম্ অনিষিদ্ধত্বাৎ' (১।১।১)—ব্রহ্মের গুণশক্তিসমূহকে মূর্ত-অমূর্তরূপ কোনো অবস্থাতেই নিষিদ্ধ বা অস্বীকার করা যায় না। মূর্ত-অবস্থায় ব্রহ্ম যে সগুণ ও সবিশেষ, তা সর্বজনবিদিত সত্য। অমূর্ত-অবস্থায়, অবশ্য, আপাতদৃষ্টিতে ব্রহ্মের গুণ-শক্তির প্রকাশ থাকে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পূর্বেই যা বলা হ'ল, সেই সময়েও ব্রহ্ম নিজের গুণ-শক্তিকে নিজের মধ্যেই বিলীন ক'রে রেখে দেন, কিন্তু তাদের ধ্বংস ক'রে দেন না। সেজন্য সেই অমূর্ত-রূপেও ব্রহ্ম প্রকৃতপক্ষে 'সগুণ-সবিশেষ'-রূপেই বিরাজ করেন—এই কথা শ্রীপতি বিশেষ জোরের সঙ্গেই উদাহরণ দিয়ে বলছেন: অগ্নির দাহিকাশক্তির ন্যায়, চুম্বকের লৌহ-আকর্ষণশক্তির ন্যায়, পরমেশ্বরের গুণ ও শক্তিও জ্ঞাত হোক বা অজ্ঞাতই হোক, ব্যক্ত হোক বা অব্যক্তই হোক, সর্বদাই তাঁর মধ্যে গুণ ও শক্তিরূপেই পূর্ণবিরাজিত।

যদি আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, সর্বজ্ঞ-সর্বশক্তি-সর্বব্যাপী ব্রহ্ম মূর্ত-অমূর্তরূপ দুইটি বিভিন্ন রূপে বিরাজ করতে পারেন কিভাবে? তার উত্তর হ'ল এই যে, জড়া প্রকৃতি যদি অমূর্ত ও মূর্ত এই দুই রূপেই স্থিতি করতে পারে, অর্থাৎ মহৎ (অমূর্ত) ও জগৎ (মূর্ত) রূপে তা হ'লে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরই বা তা পারবেন না কেন?

অবশ্য এতে নির্বিকাররূপে সর্বত্র স্বীকৃত ব্রহ্মে সবিকারত্ব এসে যাবে কি না—অনিবার্য ভাবেই—এ প্রশ্নের উত্তর নেই, যা পূর্বেই বলা হয়েছে।

পুনরায়, ত্রিতত্ত্ববাদী রামানুজ-নিম্বার্কাদির ন্যায় শ্রীপতির মতেও একমাত্র ব্রহ্মই জীব-জগতের অভিন্ন নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। ১।১।১ সূত্রভাষ্যে শ্রীপতি এ বিষয়ে সমস্ত বিরুদ্ধ মতবাদকে পূর্বপক্ষরূপে উপস্থাপিত ক'রে খণ্ডন করেছেন যুক্তিসঙ্গত ভাবে এবং এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, একমাত্র ব্রহ্মই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের 'জন্মাদি'র কারণ—'জন্মাদ্যস্য যতঃ' (ব্রহ্মসূত্র ১।১।২)—যাঁর থেকে

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্ম-প্রভৃতি হয়েছে, একমাত্র তিনিই ব্রহ্ম। 'জন্মাদি' শব্দের পূর্ণ অর্থ হ'ল : জন্ম স্থিতি লয় তিরোধান (বন্ধ) ও অনুগ্রহ (মোক্ষ)।

'সিদ্ধান্তস্তু সর্বাধিষ্ঠান-সচ্চিদানন্দ-ষট্‌স্থল-পরশিব-ব্রহ্মণ এব জগজ্জন্মাদি-কারণত্বং যুক্তম্।' (১।১।২)

অর্থাৎ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল যে, সকলের অধিষ্ঠানস্বরূপ সচ্চিদানন্দস্বরূপ ষট্‌স্থলস্বরূপ পরশিবরূপ পরব্রহ্মই জগতের জন্ম-প্রভৃতির কারণ হওয়া যুক্তিযুক্ত। ('ষট্‌স্থল'—শব্দটির ব্যাখ্যা পরবর্তী সংখ্যায় দ্রষ্টব্য)।

'জন্মাদি' শব্দটির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে উপরে বলা হয়েছে যে, এর অর্থ—ব্রহ্ম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-বন্ধ ও মোক্ষের কারণ। এই হ'ল ব্রহ্মের পাঁচটি প্রধান কার্য বা 'কৃত্যপঞ্চক'। সেজন্য ব্রহ্ম সক্রিয়, অদ্বৈতবেদান্ত-মতানুযায়ী নিষ্ক্রিয় নন।

নির্বিকার ব্রহ্ম কিরূপে সক্রিয় হতে পারেন, নিজের নির্বিকারত্ব রক্ষা ক'রে—এই উত্তরবিহীন প্রশ্নের আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। এস্থলে, আরেকটি তুল্য মূলীভূত প্রশ্ন উত্থাপিত করা যেতে পারে। সেটি হ'ল এই :

ভারতীয় দর্শনের অন্যতম মূলভিত্তি 'কর্মবাদ' অনুসারে জীব নিজের বন্ধ ও মোক্ষের জন্য নিজেই সম্পূর্ণরূপেই দায়ী—যেহেতু অজ্ঞানকবলিত জীব তার নিজেরই সকাম কর্মের অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে বারংবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ ক'রে অশেষ দুঃখক্লেশভাগী হয়—এবং এই ত হ'ল 'বন্ধ', 'বদ্ধাবস্থা' বা 'সংসারদশা'। পুনরায়, সুবুদ্ধি-সম্পন্ন জীব অজ্ঞানের হস্ত থেকে পরিত্রাণ লাভ ক'রে তারই ফলস্বরূপ বাসনা-কামনাকে জয় ক'রে নিষ্কাম-কর্ম-সাধন, এবং জ্ঞান-ভক্তি প্রমুখ বিভিন্ন সাধন কঠোরভাবে অভ্যাস ক'রে মোক্ষের অধিকারী হয়ে জন্ম-জন্মান্তর বা সংসার-চক্র থেকে মুক্তিলাভ করে। সেজন্য ভারতদর্শনসার শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌-গীতার সেই অনুপম উৎসাহ-উদ্দীপনা-জনক মহাবাণী—

'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্' ইত্যাদি (গীতা ৬।৫)। 'নিজেই নিজের উদ্ধার সাধন কর'—অনুসারে, জীব নিজেই সবকিছু করছে নিজের জন্য—ঈশ্বরের কার্য বা স্থান এক্ষেত্রে কোথায়? বস্তুতঃ সৃষ্টি ও মুক্তি, যা থেকেই 'পঞ্চকৃত্য' সৃষ্ট হয়েছে—সবই জীবের নিজেরই কর্মানুযায়ী সম্পূর্ণরূপেই। তা হ'লে?

তা হ'লে এক্ষেত্রেও এই মূলীভূত প্রশ্নের সত্যই কোনো যুক্তিসঙ্গত উত্তর নেই। একটি উত্তর অবশ্য ত্রিতত্ত্ববাদী বৈদান্তিকেরা অতি কষ্টে 'খাড়া' করেছেন—অর্থাৎ তাঁদের সুপ্রসিদ্ধ ও সুমধুর 'ঈশ্বর-কৃপাবাদে'র অবতারণা ক'রে। তাঁরা বলেছেন, যতই না স্বপ্রচেষ্টা থাকুক, যতই না আত্মবিশ্বাস থাকুক, যতই না স্বনির্ভর-শীলতা থাকুক, যতই না সাহস থাকুক, তথাপি সকল স্বপ্রচেষ্টারই শেষে থাকতে হবে পরম করুণাময়ের সস্নেহ সানুগ্রহ সাগ্রহ সাদর সানন্দ করুণা ও আশীর্বাদ—নয়ত হয়ে যাবে সবই ব্যর্থ। কিন্তু কেন? উত্তর নেই। অতএব ভারত-দর্শনের, বিশেষতঃ, বেদান্ত-দর্শনের আরেকটি পরমাশ্চর্যজনক তত্ত্ব হ'ল এই যে, প্রকৃতকল্পে ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্তাও নন, মুক্তিদাতাও নন—জীব নিজেই নিজের সৃষ্টিকর্তা; জীব নিজেই নিজের মুক্তিদাতা। অথচ ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় নন, সক্রিয় ব'লে তাঁকে সৃষ্টিকর্তা ও মুক্তিদাতা বলতেই হবে। এখন উপায়?

উপায় যখন একটা করতেই হবে

ত্রিতত্ত্ববাদিগণের রক্ষার্থে, তখন অগত্যা তা করতে হবে যুক্তির দিক থেকে নয়, ভাবানুভূতির দিক থেকেই কেবল। একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত ধরা যাক। দেশের আইন অনুসারে স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে, পুত্র পিতার নিকট থেকে ভরণপোষণ প্রভৃতি অনেক কিছুই দাবী করতে পারেন। কিন্তু কোন্ স্ত্রী, কোন্ পুত্র তা করেন সেই একই পরিবারে থেকে? বরং ঠিক তার বিপরীত ব্যাপারই ঘটে প্রায় সব পরিবারেই। স্ত্রী স্বামীর নিকট, পুত্র পিতার নিকট চোখ রাঙিয়ে ধমক দিয়ে রূঢ় কথা ব'লে, আইনের দোহাই দিয়ে কোনো দাবী-দাওয়া পেশ ও আদায় কোনো দিনও করেন না; বরং সবিনয়ে সশ্রদ্ধায় সাগ্রহে সাদরে তাঁর নিকট থেকে কাম্য বস্তুটির জন্য বিশেষ আবদার করেন, সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন, শ্রদ্ধা ও প্রীতি সহকারে। এতে স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর, সন্তানের সঙ্গে পিতার মধুরতম সুন্দরতম পবিত্রতম প্রাণের সম্বন্ধ অটুট থাকে, এবং পরিপূর্ণভাবে বিকশিতও হয়। এইটিই আমাদের সকলের পরম লাভ—পরিবারের শান্তিও বজায় রইল, অথচ দাবীও আদায় হ'ল। তা হ'লে আর অকারণে আইন তু'লে ভয় দেখিয়ে ন্যায্য অধিকারের কথা ব'লে শান্তির কলঙ্ক রটিয়ে লাভ কি?

অবশ্য ত্রিতত্ত্ববাদী এবং ঈশ্বরপ্রসাদবাদী বৈদান্তিকেরা উপরে উদ্ধৃত সমস্যাটির প্রতি একবারও দৃক্‌পাতও করেননি; বরং যেন ধরেই নিয়েছেন যে, 'কর্মবাদ' ও 'ঈশ্বরপ্রসাদ-বাদ' পরস্পর-বিরোধী ত নয়ই, বরং পরস্পর-পরিপূরক। কিন্তু হায়! আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে আমরা এ কথা কোনোক্রমেই বুঝতে পারি না যে, কি ক'রে জীব নিজের কর্মানুসারে সৃষ্ট হচ্ছে এবং সাধনানুসারে মুক্ত হচ্ছে, অথচ স্বয়ং পরমেশ্বরই সৃষ্টিকর্তা ও মুক্তি-দাতারূপে বন্দিত হচ্ছেন! সেক্ষেত্রে পূর্বোক্ত পরিবারের উদাহরণ থেকে আমাদেরও ত পরমেশ্বরের নিকট কোনো যুক্তিসঙ্গত দাবী-দাওয়া রাখা চলবে না, যেহেতু দাবীর ত আর অবশিষ্ট কিছুই রইল না, কৃপাভিক্ষারও নয়, প্রসাদলাভেরও নয়—যখন আমরা স্বতঃই নিজেরাই সব কিছু পেয়েই যাচ্ছি নিজেদের স্বতন্ত্র-স্বাধীন প্রচেষ্টাতেই। অতএব পরমে-শ্বরের সঙ্গে আমাদের প্রাণের নিকট মধুর সম্পর্ক যাতে চির-অম্লান থাকে, সেজন্য আমরাও বলি উচ্চকণ্ঠে সানন্দে—'হে সৃষ্টি-কর্তা! হে মোক্ষদাতা! তোমারই ইচ্ছায় সৃষ্টি, আর তোমারই প্রসাদে মুক্তি—আমরা যা নিজেরাই পেতাম তা তুমিই হাতে তুলে আমাদের দাও কৃপারূপে, আশীর্বাদরূপে, প্রসাদরূপে।' তা হ'লে ত তার রূপ যাবে বদলে। তা হবে ভীতির ফল নয়, প্রীতির ফল; দাবীর ফল নয়, দানের ফল; আদায়ের ফল নয়, করুণার ফল।

এই ভাবেই হয়ত কোনোক্রমে 'ত্রিতত্ত্ব-বাদ' রক্ষা করা যাবে, অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এ ক্ষেত্রেও। [ক্রমশঃ]

ব্রহ্মনগর*

ডক্টর অনিলেন্দু চক্রবর্তী

ব্রহ্মনগরের মধ্যে ক্ষুদ্র এক হৃদিপদ্মকলি,
অভ্যন্তরে আছে সে আকাশ। এখানেই স্বর্গমর্ত্য
অগ্নিবায়ু সূর্যচন্দ্র বিদ্যুৎতারকা—যাকিছুই
আছে আর নাই। দেহমন্দিরের এই হৃদিপদ্মে
ব্রহ্মবাস। এখানে বার্ধক্য নাই, নাই মৃত্যুভয়
নাই রোগদুঃখশোক ক্ষুধাতৃষ্ণাক্ষয়—এ আকাশে
মর্ত্যের কৃতিত্ব মুছে যায়, খসে যায় কর্মফল।
গূঢ় এ আকাশে নিজেকে পেয়েছে যে-ই স্বয়ম্ভূ সম্রাট
সার্বভৌম ; সকলি এখানে তার, এখানই সকল।
পিতামাতা ভাইভগ্নী পুত্রকন্যা পত্নী বন্ধুজন
সকলি এখানে ; আছে গন্ধবায়ু কুসুমমালিকা
বিহগকূজন আহার্য-রোচন ; এখানে সঙ্গীত
ইচ্ছামাত্র বেজে ওঠে, প্রাণের সঙ্গিনী কাছে কাছে—
সবকাম্যধন-কেন্দ্রে মূর্ত সদা আনন্দ অগাধ।
সমস্ত সুখের সমাহার এই আত্মার আবাসে,
তবু মিথ্যা আবরণে আছে সবি ঢাকা। অজ্ঞান যে
বাহিরেই ঘোরে ফেরে, জানে না যে মর্মতলে তার
মহারত্নের ভাণ্ডার ; যে জানে সে খোলা পায় দ্বার।

---

* ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৮।১-৩ অবলম্বনে।

প্রপত্তি

শ্রীমতী অমিয়া ঘোষ

প্রভু! ভকতি-প্রণাম লহগো আমার
করুণা করে।
ভজন পূজন জানি না কিছুই,
শুধু রয়েছি জড়ায়ে
চরণ ধরে।

যে ডাক শুনে তব মন গলে
যে ডাক শুনে কাছে আস চলে
যে ডাকেতে ঠাঁই দাও পদতলে
ডাকিতে তোমারে সে ডাক শিখাও
করুণা করে।
হে প্রভু আমার! রয়েছি দুয়ারে দাঁড়ায়ে তোমার
কৃপার আশায়
নয়ন ঝরে।

গান

শ্রীহরিপদ গোস্বামী

[দরবারী কানাড়া—তেওরা]

বাজায় কে বাঁশী এক রন্ধ্রে
সপ্ত স্বর লুটায়ে পড়ে,
যেথায় নাহিক দিবস রাতি
উঠে সে নাদ উদাত্ত স্বরে॥
সে স্বরে হয়ে সে মাতোয়ারা
অসীম আনন্দে আপনাহারা,
নাম রূপ ভাষা হয়ে সব হারা
পশিছে অতল স্বরসাগরে॥
আপনা হারায়ে ঐ এক স্বরে
কি আনন্দ হায় কে বলিতে পারে,
মন চাহে মোর রূপে সৌরভে
মিলায়ে সে স্বর শোনাব তোমারে।
(আমি) রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাঁশী বাজাব,
তানে মানে স্বরলহরী তুলিব,
হাসিব কাঁদিব, হাসাব কাঁদাব,
তুমি আমি নৈলে বোঝে কে কারে॥

বন্দনা

শ্রীশেফালিকা দেবী

জয় জয় গদাধর পূর্ণিমা-শশধর
হৃদি মাঝে আসি নাথ হও হে উদয় ;
প্রেমের জোয়ার বেগে উঠুক পরাণে জেগে
মোহ শোক তমোরাশি হোক প্রভু ক্ষয়।
কামারপুকুরবাসী হইয়ে কাননবাসী
সাধন ভজন তপ করেছিল কত
হয়ে লীলাসহচর এবে এল ধরা 'পর
প্রাণের গদায়ে পেয়ে সেবে মনোমত।
অনুরাগ-প্রেমফাঁদে তোমারে যতনে বাঁধে
তাহাদের ঘরে ঘরে যাও নিতি নিতি,
শুন প্রভু গুণধাম কামারপুকুর গ্রাম
আজি হতে হোক মম তাপিত এ হৃদি।
ফেলি রাঙা শ্রীচরণ কর সেথা বিচরণ
জাগায়ে পরাণে মম সুখ-হিল্লোল,
মেলিয়া ভাবের আঁখি অপরূপ রূপ দেখি
শ্রবণে শুনিয়া তব মধুঝরা বোল।
খোড়ো চাল মেটে ঘরে দুখী ধনী বাস করে
তবু ধনী এ জগতে সবচেয়ে ধনী,
দাঁড়ায়ে যাহার আগে জগপতি ভিখ মাগে
সুখের সায়রে ভাসে দীন কামারণী।
মালিকা পরায়ে গলে ভাসিয়া চোখের জলে
নিজ হাতে কিবা চিনু তোমারে খাওয়ায় !
হেরি তব হাসিমুখ পাসরি সকল দুখ
বিভোর সুখের ভরে অনিমিখে চায়।

দীনবৎসল নাথ লও পাতি দুই হাত
ভকত যাহাই দেয় অনুরাগভরে,
বিদুরের ক্ষুদ আর চিপিটক সুদামার
শবরীর বনফল রাখা তোমা তরে।
কি আছে আমার প্রভু মন দিতে চায় তবু
অখিলের নাথ তুমি কি দিব তোমায় !
নিরমল কর প্রাণ তাহাই করিব দান
চিরতরে তব ওই রাঙা দুটি পায়।
বঙ্কিম সুশোভন ভুরু দুটি বিমোহন
মনসিজ-শরাসন নহে সমতুল,
মনে মানি পরাভব দূরে যায় মনোভব
পরাণে অমনি ফুটে ভকতি-মুকুল।
বসি দেব যোগাসনে কি ভাব জাগিছে মনে
আধো মুদিত আঁখি কার পানে চায় !
কত না শান্তি জানি মাখা ও ললাটখানি
শরতের নিরমল নীলাকাশ প্রায়।
ঘিরি কমনীয় কায় কি জ্যোতি খেলিয়া যায়
নেহারি নয়ন আর ফিরিতে না চায়,
করতল রাখি ক্রোড়ে বিভোর ভাবের ভরে
হেরিয়া তাপিত প্রাণ নিমেষে জুড়ায়।
কর প্রভু দীনে দয়া শিরে দেহ পদছায়া
মায়ার বাঁধন হতে কর হে মোচন,
যখন যে ভাবে থাকি ও চরণে মন রাখি
অন্তিমে দেখা দিয়া জুড়াও লোচন।

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার'

শ্রীমতী রমা বসু

ভাবের ঘরে চুরি করে ভাবছো হলেম ধন্য
ঠাকুরপূজার খেলায় মেতে ভাবছো হোচ্ছে পুণ্য,
দেবদেবীদের নানান পূজা করছো তুমি নিত্য
ভাবছো বুঝি মোক্ষ পাবে শুদ্ধ হবে চিত্ত।
নিত্য ভোগের আয়োজনে করছো কত ব্যয়
ভাবছো এতেই ঘুচে যাবে যা কিছু অন্যায়।
ভুলছো কেন জ্যান্ত ঠাকুর আছেন তোমার পাশে
নিঃস্ব, আর্ত, সর্বহারা তোমার কৃপার আশে,
ঠাকুরপূজায় গদগদ চোখে অশ্রু ঝরে
ঘরের পাশেই ক্ষুধার্ত জন অন্ন বিনা মরে,
মাটির ঠাকুর-সেবায় যতই কর আত্মদান
জ্যান্ত ঠাকুর না সেবিলে নাইকো পরিত্রাণ।
ভুলছো সবে যুগাবতার রামকৃষ্ণের কথা
দুখীর দুঃখে আর্দ্র হৃদয় কতই পেতেন ব্যথা,
তাঁর কৃপাতে তরে গেল গিরিশ হেন নট
বিনোদিনী নটী পেল তাঁরই চরণ-পট।
তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দ বলে গেছেন সবে,
'ঈশ্বর সেবিছে, যেবা ভালবাসে জীবে'।
কী লাভ তবে এমন পূজায় (যেথা) জীবের সেবা নাই
মোক্ষ যদি চাও গো পেতে জীবের সেবা চাই।
চিত্ত আগে শুদ্ধ কর দয়ায়, ক্ষমায়, স্নেহে
আপনি ঠাকুর দেবেন দেখা রবেন তোমার দেহে।

———

ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র

স্বামী গীতানন্দ

গিরিশচন্দ্র ঘোষের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যে এবং নাট্যজগতে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। সরস্বতীর বরপুত্র—এক শ'রও বেশী বই তিনি লিখেছিলেন এবং সেই সব বই সুধী-সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। আবার বাংলার নাট্য-জগতের তিনি ছিলেন একচ্ছত্র সম্রাট। নাম-যশ তিনি যথেষ্টই পেয়েছিলেন, কিন্তু সংসারে তাঁর সুখ ছিল না। শৈশবে মাতৃহীন, কৈশোরে পিতৃহীন, যৌবনে পত্নীহীন। মনটা ছিল তাঁর বড় নরম; অপরের দুঃখকষ্টে ব্যথিত হ'ত এবং তাদের সেই দুঃখকষ্ট দূর করবার চেষ্টাও করতেন; হৃদয়টা ছিল ভক্তিবিশ্বাসে ভরপুর—যার চরিতার্থতা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূত সান্নিধ্যে। সংক্ষেপে এই তো গিরিশ-চরিত্র।

গিরিশবাবুর বাল্যজীবনের একটা ঘটনা থেকে তাঁর জীবনাদর্শের একটা আভাস পাওয়া যায়। ঠাকুরমার কাছে শিশু গিরিশ রামায়ণ, মহাভারতের গল্প শোনে। একদিন ঠাকুরমা শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন থেকে মথুরায় যাবার গল্প বললেন। এমন মর্মস্পর্শী ভাবে তিনি গল্পটি বলেছিলেন যে, গোপীদের চোখের জল ও মা যশোদার হাহাকারের বর্ণনা বালককে বিশেষ অভিভূত করেছিল। বালক ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'শ্রীকৃষ্ণ কি আবার ফিরে এলেন ?' ঠাকুরমা উত্তর দিলেন, 'না'। বালক আবার প্রশ্ন করলে, 'তিনি আর এলেন না ?' এবারও উত্তর হল, 'না'। বালক আর কোন কথা না ব'লে সেখান থেকে চলে গেল। কোমল প্রাণের এই দারুণ বিরহ-ব্যথা ভুলতে তার তিন দিন সময় লেগেছিল। এই তিন দিন বালক আর ঠাকুরমার কাছেও গল্প শুনতে যায় নি। স্বভাবতই মনে হয়, বালক এমন একজনের কথা শুনতে চেয়েছিল, যে ফেলে চলে যায় না। এই তো গিরিশবাবুর সারা জীবনের আকাঙ্ক্ষা—এমন একজনকে তিনি চেয়েছেন, যিনি তাঁকে কখনও ফেলে যাবেন না, যিনি তাঁর সমস্ত ভার নেবেন, শত অপরাধ সত্ত্বেও তাঁকে ভালবাসবেন, অজস্র রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করলেও তাঁকে ত্যাগ ক'রে যাবেন না। কিন্তু এমন মানুষ তো সংসারে মেলে না। তাই গিরিশবাবু বলেছিলেন, 'আমার বন্ধু-বান্ধব বড় কম; সে অপর কারো দোষে নয়, আমারই দোষে।' কিন্তু বহু ভাগ্যে গিরিশ-বাবু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মধ্যে এমনই একজন জীবন-সখা, হিতৈষী বন্ধু এবং পরম কারুণিক সদ্‌গুরুকে পেয়েছিলেন। কিন্তু সে তো অনেক পরের কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসার আগে গিরিশবাবুর কথাবার্তা আচার-আচরণের মধ্যে নাস্তিকতার ছাপ আপাত-দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হলেও মনে হয় তাঁর জীবনে ভক্তিবিশ্বাসের ফল্গুধারা বাল্যকাল থেকেই প্রবাহিত ছিল। শোনা যায়, একবার রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে তিনি একটি শিবমন্দির দেখে গালাগালি করতে আরম্ভ করেন। সঙ্গী জিজ্ঞাসা করলে, 'কাকে গালি দিচ্ছেন ?' গিরিশবাবু বললেন, 'মন্দিরের শিবকে; দেখি শিব আমায় শাস্তি দেন কি না।' আর

একবার ভাগলপুরে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে একটি অন্ধকার গুহায় সকলে নেমে পড়েছিলেন। সেখান থেকে বাইরে আসবার পথ না পেয়ে বন্ধুরা বলতে থাকেন যে, নাস্তিক গিরিশ সঙ্গে থাকার জন্যই তাঁরা এই বিপদে পড়েছেন। এখন ভগবানকে ডাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। সকলের পীড়াপীড়িতে গিরিশবাবুও তাঁদের সঙ্গে প্রার্থনায় যোগ দেন। কিন্তু বাইরে এসে বলেছিলেন, 'আজ বিপদে পড়েই তাঁকে ডাকলাম; কিন্তু যদি বিশ্বাস ক'রে কখনও তাঁর নাম নিতে পারি, তবেই নেব; নতুবা বিপদে কি, মৃত্যুভয়েও নয়।' প্রথম ঘটনাটিকে আপাতদৃষ্টিতে নাস্তিকতার পরিচয়-বাহী মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে গিরিশবাবুর অবচেতন মনে যে প্রগাঢ় আস্তিকতার ভাব নিহিত ছিল, তারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আর দ্বিতীয় ঘটনাটিতে তো যথার্থ ঈশ্বরবিশ্বাসীর জীবনাদর্শই প্রতিফলিত!

গিরিশবাবু যাঁকে গুরু ব'লে গ্রহণ করেছিলেন, ঈশ্বরাবতার ব'লে প্রচার করেছিলেন, সেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কিন্তু তিনি প্রথমেই মেনে নেন নি। প্রথম দর্শনের পর, গিরিশবাবু শ্রদ্ধার পরিবর্তে বরং অশ্রদ্ধার ভাব নিয়েই ফিরেছিলেন। ঠাকুর সেদিন দীননাথ বসু মহাশয়ের বাড়িতে এসেছেন। গিরিশবাবুও সেখানে গেছেন। দেখলেন ঠাকুর কথা বলছেন এবং কেশববাবু প্রভৃতিরা সানন্দে শুনছেন। সন্ধ্যা হ'লে একজন আলো এনে ঠাকুরের সামনে রেখে দিলে। আলো দেখে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, 'সন্ধ্যা হয়েছে?' শুনে গিরিশবাবু ভাবলেন, 'ঢং দেখ—সন্ধ্যা হয়েছে! সামনে আলো জলছে তবু ইনি বুঝতে পারছেন না সন্ধ্যা হয়েছে কি না।' সুতরাং সেখানে আর থাকা নিষ্প্রয়োজন মনে ক'রে তিনি সেদিন বাড়ি ফিরে গেলেন।

এই ঘটনার প্রায় সাত বছর পরে তিনি ঠাকুরকে তৃতীয়বার দর্শন করেন। ঠাকুর সেদিন স্টার থিয়েটারে 'চৈতন্যলীলা' দেখতে এসেছেন। অভ্যর্থনা করতে গিরিশবাবু এগিয়ে গেলেন। ঠাকুর তাঁকে দেখে প্রথমেই নমস্কার করলেন। গিরিশবাবু প্রতিনমস্কার জানালেন। ঠাকুর আবার তাঁকে নমস্কার করলেন। এইভাবে কয়েকবার চললে গিরিশবাবু ভাবলেন, 'এই ভাবেই নমস্কার-প্রতিনমস্কারের পালা চলবে দেখছি!' তিনি তখন মনে মনে ঠাকুরকে প্রণাম ক'রে তাঁকে উপরে এনে Box-এ বসিয়ে দিলেন। গিরিশ-বাবু পরে বলেছিলেন, 'রাম-অবতারে ধনুর্বাণ নিয়ে জগৎ-জয় হয়েছিল; কৃষ্ণ-অবতারে জয় হয়েছিল বংশীধ্বনিতে; আর রামকৃষ্ণ-অবতারে জয় হবে প্রণাম-অস্ত্রে।' 'ছদ্মবেশী রাজা' দীন-হীন ভাব নিয়ে প্রণাম-অস্ত্রে কত মানুষকে জয় করেছেন, কে তার ইয়ত্তা করবে! তবে এই অস্ত্রে গিরিশ-বিজয় একটি মোক্ষম দৃষ্টান্ত। ঠাকুরের সম্পর্কে এসে ধীরে ধীরে গিরিশবাবুর মধ্যে পরিবর্তন আসতে থাকে। ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, 'তুমি দিন দিন শুদ্ধ হবে। তোমার দিন দিন খুব উন্নতি হবে। লোকে দেখে অবাক্ হবে।' ঠাকুরের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল।

আর একদিন ঠাকুর থিয়েটার দেখতে গেছেন। গিরিশবাবু ঠাকুরকে সেবা করবার জন্য এক অদ্ভুত অনুরোধ করলেন—ঠাকুর যেন তাঁর ছেলে হয়ে তাঁর কাছে আসেন; তা হলে তিনি প্রাণভরে তাঁর সেবা করতে পারবেন। গিরিশবাবুর অনুরোধ মানতে

অস্বীকার করলে তিনি ঠাকুরকে খুব গালাগালি করতে আরম্ভ করেন। যে সব ভক্তেরা ঠাকুরের সঙ্গে থিয়েটারে ছিলেন তাঁরা ঠাকুরকে পরামর্শ দিলেন—'যাবেন না আর ঐ পাষণ্ডের কাছে।' ঠাকুর চুপ করে সব শুনলেন। পরদিন রামবাবু দক্ষিণেশ্বর যেতেই ঠাকুর ঐ প্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাম, তুমি কি বল?' রামবাবু বললেন, 'দেখুন, কালীয়নাগ শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিল, প্রভু আমায় বিষ দিয়েছেন, অমৃত কোথায় পাব? গিরিশবাবুরও সেই দশা, তিনি অমৃত পাবেন কোথায়?' রামবাবুর কথা শুনে ঠাকুর বললেন, 'তবে চল রাম, তোমার গাড়িতেই একবার সেখানে যাই।' এদিকে ঠাকুরকে ঐ ভাবে গালাগালি করার পরে গিরিশবাবুর মনে খুব অনুশোচনা এসেছে। খাওয়া দাওয়া ছেড়ে তিনি কেবল কেঁদেছেন। সন্ধ্যার সময় ঠাকুরকে তাঁরই বাড়িতে আসতে দেখে গিরিশবাবু তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলছিলেন, 'আজ যদি তুমি না আসতে, তা হলে বুঝতুম তুমি এখনও নিন্দাস্তুতিকে সমান জ্ঞান করতে পার নি; তোমার পরমহংস নামে অধিকার আসে নি। আজ বুঝেছি, তুমি সেই, তুমি সেই।'

এরপর গিরিশবাবু ঠাকুরের কাছে আত্মসমর্পণ করে একদিন বলেছিলেন, 'এখন থেকে আমি কি করব?' ঠাকুর বলেছিলেন, 'যা করছ তাই করে যাও; এখন এদিক ওদিক দুদিক রেখে চল; তারপর যখন একদিক ভাঙবে তখন যা হয় হবে। তবে সকালে-বিকালে তাঁর স্মরণমননটা রেখো।' গিরিশবাবু ভাবলেন—'একে তো আমার আহার-নিদ্রার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। কোথা দিয়ে দিন গিয়ে রাত আসে আবার রাত গিয়ে দিন আসে খেয়ালই থাকে না। তার ওপর কোন নিয়মের মধ্যে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়; নিয়মের মধ্যে যেন হাঁপিয়ে উঠি, শেষে কি কথা দিয়ে গুরুর কাছেও মিথ্যাবাদী হব?' গিরিশবাবুর মনের ভাব বুঝে ঠাকুর তাঁকে খাবার-শোবার আগে একবার স্মরণ করে নিতে বললেন। গিরিশবাবুকে তখনও নীরব দেখে ঠাকুর সবশেষে বললেন, 'তবে আমায় বকলমা দে।' গিরিশবাবু ভাবলেন—'বাঁচা গেল—সমস্ত দায় ঠাকুরের উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আমার হয়ে তিনিই যা হয় করবেন।' বকলমার অর্থ Power of Attorney দেওয়া—একজনের হয়ে অপরে কাজটি করবেন। যদি জীবনের সব কিছুই আমার হয়ে অপর কেউ করে, এমন কি চিন্তা পর্যন্ত, তা হলে তো আর আমিত্ব বলে কিছু থাকতে পারে না। অতএব বকলমা দেওয়ার অর্থ হচ্ছে আমিত্বের নাশ করা। বিড়ালশিশুর অবস্থা। মা তাকে কখনও বিছানার উপর রাখে আবার কখন ছায়ের গাদার উপর রাখে। বিড়ালশিশু নির্বিকার। তবে খিদে পেলে সেও মিঁউ মিঁউ করে; কিন্তু বকলমা দেওয়ার পর শত দুঃখকষ্টেও কাঁদবার উপায় থাকে না। কাঁদা মানেই তো নির্ভরতার অভাব—আমিত্বের প্রকাশ। গিরিশবাবু ধীরে ধীরে বকলমার অর্থ বুঝতে পারলেন। কোন কাজেই আর 'আমি, আমার' বলার অধিকার রইল না। প্রতি পদে, প্রতি নিঃশ্বাসে এখন গিরিশবাবুকে দেখতে হয়, ঠাকুরের জোরে পা ফেলছেন, নিঃশ্বাস নিচ্ছেন অথবা নিজের আমিত্বের জোরে করছেন। প্রত্যেক সাধককেই চরমে এই বকলমা দেওয়ার অবস্থায় উপনীত হতে সর্বতোভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল হতে

হয়। এইটিই সাধনার শেষ কথা। ঠাকুর গিরিশবাবুকে দিয়ে এখান থেকেই সাধনা আরম্ভ করালেন

গিরিশবাবুর এই সাধনা যেমন অপূর্ব তেমনি অননুকরণীয়। ঠাকুরের ত্যাগী শিষ্যরা বরানগর এবং আলমবাজার মঠে নিজেদের মধ্যে ত্যাগের ভাবকে উদ্দীপ্ত রাখবার জন্য অনেক সময় হোম করতেন। সেই হোমাগ্নিতে নিজেদের বাসনা-সংস্কার সব ভস্মীভূত হচ্ছে ভেবে তাঁরা আহুতি দিতেন। একদিন গিরিশবাবুও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আহুতি দিয়েছেন। পরে গিরিশবাবুর মনে হল যে, ঠাকুর তো তাঁকে ঐ রকম হোম করতে বলেন নি, তিনি নিজের ইচ্ছাতেই ঐ রকম করেছেন। তবে তো তিনি ঠাকুরকে ছেড়ে হোমের সাহায্যে নিজের বাসনা-সংস্কার দূর করবার স্পর্দ্ধা করেছেন! ঠাকুরের উপর বিশ্বাস না রেখে হোমের উপর অথবা নিজের উপর বিশ্বাস করে ঘোরতর অন্যায় করেছেন। এই ভাবে চিন্তা করে তিনি বারবার বলতে লাগলেন, 'হায়! হায়! আমার এমন দুর্বুদ্ধি কেন হল?' বারবার ঠাকুরের কাছে অপরাধ স্বীকার করবার পর তিনি শান্ত হলেন। আর একবার গিরিশবাবু তাঁর শেষ অসুখের সময় ভাবলেন, 'মৃত্যু তো সন্নিকট; মৃত্যুর পরে কি হবে, কোথায় যাব, কিছুই তো জানি না, এখন উপায়?' গিরিশবাবুর মনে এই রকম চিন্তার উদয় হবার পর একদিন মাস্টার মশায় (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) তাঁকে দেখতে গেছেন। মাস্টার মশায়ের সঙ্গে ঠাকুরের কথা বলতে বলতে হঠাৎ গিরিশবাবু বলে উঠলেন, 'ভাই, আমায় ঘা কতক জুতো মেরে যাও তো। জুতো খাওয়াই আমার উচিত প্রায়শ্চিত্ত। তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) আমার রয়েছেন। তবু কি না আমি ভাবি, মৃত্যুর পরে আমার কি হবে!' সাধারণ অর্থে আমরা যাকে সাধন-ভজন বলি, তা না করেও একমাত্র বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে যে মানুষ আধ্যাত্মিক জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ লাভ করতে পারে, গিরিশবাবুই তার প্রমাণ এই রকম প্রমাণ ধর্ম-জগতের ইতিহাসে আর আছে কি না জানি না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বকলমা দিয়ে তাঁর ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে গিরিশবাবুর কি অবস্থা হয়েছিল তা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। ঠাকুর একদিন গিরিশবাবুকে দশহরার দিন গঙ্গায় স্নান করতে বলেছিলেন। ইচ্ছা না থাকলেও ঠাকুরের কথায় গিরিশবাবু সেদিন গঙ্গায় স্নান করেছিলেন। তারপর থেকে গিরিশবাবু পালপার্বণে গঙ্গায় স্নান করতেন। একদিন গিরিশবাবুর মনে হ'ল যে, ঠাকুর তো তাঁর সমস্ত ভার নিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে গেছেন, নিষ্পাপ করে গেছেন; তবে আবার গঙ্গাস্নান করে নিষ্পাপ হবেন—এ আবার কেমন কথা? হঠাৎ গিরিশবাবুর মনে হ'ল যে, মা গঙ্গা পাপীদের পাপ গ্রহণ করে তাদের নিষ্পাপ করে দেন। আর যাঁরা নিষ্কাম, পবিত্র, তাঁদের স্নানের দ্বারা তিনি নিজে পুণ্য অর্জন করেন। গিরিশবাবু ভাবলেন, 'ঠাকুরের কৃপায় আমরা সকলে পবিত্র হয়ে গেছি। সুতরাং আমরা গঙ্গাস্নান করলে মা গঙ্গার পাপীদের উদ্ধার করবার শক্তিবৃদ্ধি হবে।' এই ভেবে তিনি গঙ্গায় নেমে বললেন, 'মা গঙ্গা, ঠাকুরের কৃপায় তোমাকে পবিত্র করবার জন্য তোমার জলে স্নান করছি'—এই বলে ডুব দিয়ে প্রাণে অপূর্ব আনন্দ অনুভব করলেন। যার অহং-ভাব সম্পূর্ণভাবে দূর হয়নি তার পক্ষে এরকম চিন্তা করাও পাপ। কিন্তু

শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ গিরিশবাবু ঠাকুরের শক্তিতেই নিজেকে পাপমুক্ত করে নিজের মধ্যে ঈশ্বরীয় শক্তি অনুভব করতেন। স্বামীজী গিরিশবাবুর সম্বন্ধে শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বলেছিলেন, 'ওকে imitate করতে গেলে অন্যের সর্বনাশ হবে, ওর কথা শুনে যাবি, কিন্তু কখনও ওর দেখাদেখি কাজ করতে যাবি না।'

গিরিশবাবু বিশ্বাস করতেন যে, ঠাকুর যা কিছু করেন, অপরের কল্যাণের জন্যই, নিজের জন্য নয়। একবার ঠাকুর বাগবাজারে নন্দলাল বসুর বাড়ি থেকে যাবার সময় এক গ্লাস জল চাইলেন। তিনি বলতেন যে, সাধু যদি বাড়ি এসে কিছু গ্রহণ না করেন, তবে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়। তাই তিনি এক গ্লাস জল চাইলেন। নন্দলালবাবু জল দিয়ে তাঁর নিজের পানের ডিবা ঠাকুরের সামনে এগিয়ে ধরে পান নিতে বললেন। ঠাকুর পান না নিয়ে বললেন যে, অগ্রভাগ নেওয়া হয়েছে এমন জিনিস তিনি খেতে পারেন না। নন্দলালবাবু বাড়ির ভেতর থেকে পান সাজিয়ে এনে ঠাকুরকে দিয়ে বললেন, 'আপনি পরমহংস, আপনার আবার বিধিনিষেধ মানা কেন? অজ্ঞানীরাই তো ঐ রকম করে।' ঠাকুর হেসে বলেছিলেন, 'ও আমার একটা আছে; ওর ব্যতিক্রম করতে পারি না।' নন্দলালবাবুর ধারণা হল যে, ঠাকুরের ঠিক ঠিক জ্ঞান হয়নি এবং এই কথা তিনি অপরকেও বলতে লাগলেন। গিরিশবাবু শুনে বলেছিলেন, 'অবতারকল্প মহাপুরুষেরা অপরের কল্যাণের জন্য বিধিনিষেধ মেনে চলেন। নন্দলালবাবু পাণ্ডিত্যের অহংকার নিয়ে ঠাকুরকে পরীক্ষা করতে গেছেন; তাই ঠাকুরও তাঁকে ধরা দিলেন না। নন্দলালবাবুর দুর্ভাগ্য। আমি প্রমাণ করে দেব যে, ঠাকুর নিজের জন্য বিধিনিষেধ মানেন না।' এই ঘটনার কিছুদিন পরে ঠাকুর একদিন গিরিশবাবুর বাড়ি এসেছেন। গিরিশবাবু ভেতর থেকে পান সাজিয়ে এনে. তার থেকে একটা পান নিজে নিয়ে বাকি পান ঠাকুরকে নিতে অনুরোধ করলেন। ঠাকুর গিরিশবাবুর মনের ভাব বুঝে একটু হেসে একটি পান নিয়ে মুখে দিলেন। গিরিশবাবু তখন পাগলের মত আনন্দে বারবার তাঁকে প্রণাম করতে লাগলেন। ঠাকুরের পক্ষে ঐ রকম করা ভাবাও যায় না; কিন্তু গিরিশবাবুর বিশ্বাসই ঠাকুরকে দিয়ে ঐ রকম করিয়েছিল।

গিরিশবাবু শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ঈশ্বরের অবতার বলে জনসাধারণের কাছে প্রচার করতে থাকেন। এর আগেও অবশ্য কেউ কেউ তাঁকে অবতার বলেছেন। কিন্তু তা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। শ্যামপুকুরে কালীপূজার রাত্রে গিরিশবাবুই প্রথম ঠাকুরকে কালীরূপে পূজা করেছিলেন। আবার ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুআরিতে তাঁরই গভীর ভক্তিবিশ্বাসে মুগ্ধ ঠাকুর কল্পতরু হয়েছিলেন। ঠাকুর সেদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আমার সম্বন্ধে যে তুমি এত কথা বলে বেড়াও, তুমি কি দেখেছ, কি বুঝেছ?' উত্তরে গিরিশবাবু ভক্তিতে গদ্গদ হয়ে বলেছিলেন, 'ব্যাস বাল্মীকি যাঁর ইয়ত্তা করতে পারেন নি আমি তাঁর সম্বন্ধে আর বেশী কি বলতে পারি।' শুনে ঠাকুর ভাবাবস্থায় উপস্থিত ভক্তদের আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, 'তোমাদের চৈতন্য হোক।' সঙ্গে সঙ্গে ভক্তেরা এক দিব্য ভাবরাজ্যে উপস্থিত হয়েছিলেন। গিরিশবাবুর ভক্তিবিশ্বাসের জোরেই সেদিন ঠাকুরের মানুষী আবরণ সরে

গিয়ে ঈশ্বরীয় ভাবের পূর্ণ প্রকাশ হয়েছিল—ভক্তেরা ঠাকুরকে কল্পতরুরূপে পেয়ে নিজেদের জীবন সার্থক করেছিলেন। আবার ঠাকুর গলরোগে আক্রান্ত হয়ে কাশীপুরে অবস্থান করছেন। একদিন তাঁর গলা থেকে পুঁজরক্ত পড়েছে। ঠাকুর গিরিশবাবুকে পুঁজরক্তের পাত্রটি দেখিয়ে বলেছিলেন, 'এই তো অবস্থা; আবার বলে কি না অবতার!' গিরিশবাবু একটুও ইতস্ততঃ না করে বলেছিলেন, 'এবারে এসব খেয়ে কীট-পিপড়ে পর্যন্ত মুক্ত হয়ে যাবে—তাই এই রোগ।' শুনে ঠাকুর বলেছিলেন, 'পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস'। একদিন গিরিশবাবু ঠাকুরকে বলেছিলেন, 'তুমি আসবে আগে জানলে আরো বেশী করে অপকর্ম করে নিতুম।'

গিরিশবাবুর ছোট ছেলেটি অকালে মারা যাবার পর তাঁর 'শূন্য হৃদয়, শূন্য সংসার'। জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমার কাছে গিয়ে থাকলে তাঁর হৃদয় শান্ত হবে ভেবে নিরঞ্জন মহারাজ একদিন গিরিশবাবুকে বললেন, 'ঠাকুর তো তোমায় সন্ন্যাসী করেছেন; চল দুজনে কোথাও চলে যাই।' গিরিশবাবু বললেন, 'তোমরা যা বলবে ঠাকুরেরই কথা মনে করে এখনই করতে প্রস্তুত। কিন্তু ভাই, নিজে ইচ্ছা করে সন্ন্যাসী হবারও যে আমার সামর্থ্য নেই। ঠাকুরকে যে আমি বকলমা দিয়েছি।' নিরঞ্জন মহারাজ বললেন, 'আমি বলছি, চল।' জয়রামবাটীতে এসে পুকুরে স্নান করে গিরিশবাবু ভিজে কাপড়ে মাকে প্রণাম করে যেই উপরের দিকে তাকিয়েছেন, অমনি মায়ের মুখ দেখে আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলেন, 'মা, তুমি!' বহু বছর আগের একটা ঘটনা তাঁর মনে পড়ে যায়। একবার তিনি কলেরায় মরণাপন্ন হয়েছেন, জীবনের কোন আশা নেই। এমন সময় তিনি স্পষ্ট দেখলেন যে, এক মাতৃমূর্তি তাঁর মুখে প্রসাদ দিয়ে বললেন, 'এই প্রসাদ খাও; সেরে যাবে।' তারপর থেকেই তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন। এতদিন পরে গিরিশবাবু দেখলেন যে সেই মাতৃমূর্তি তাঁরই সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাই তিনি আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন, 'মা, তুমি!' যিনি একদিন তাঁর রোগ সারিয়েছিলেন, আজ তিনিই বোধ হয় তাঁর হৃদয়ের রোগ, জন্মজন্মান্তরের রোগ সারাতে এসেছেন। শ্রীশ্রীমাকে তিনি সাক্ষাৎ জগদম্বা জ্ঞানে পূজা করতেন; জেনেছিলেন যিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেব, তিনিই মা কালী আবার তিনিই শ্রীশ্রীমা সারদা।

একদিন কাশীপুরে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার গিরিশবাবুকে ঠাকুরের সামনেই বলেছিলেন—'দেখ, আর যা কর—but don't worship him as God—ঈশ্বর বলে এঁকে পূজা করো না। এমন ভাল লোকটার মাথা খাচ্ছ।' গিরিশবাবু বলেছিলেন, 'কি করি মশায়? যিনি এ সংসারসমুদ্র ও সন্দেহসাগর থেকে পার করলেন, তাঁকে আর কি করব বলুন!'

নরেন অবতার মানেন না আর গিরিশবাবুর 'পাঁচ সিকে পাঁচ আনা' বিশ্বাস। একদিন ঠাকুরই দুইজনকে তর্ক করতে বললেন। নরেন শেষে চুপ করে গেলেন। পরে বলেছিলেন, 'গিরিশ ঘোষের মানুষকে অবতার বলে যখন এত বিশ্বাস, তখন আমি আর কি বলব! অমন বিশ্বাসের উপর কিছু বলতে যাওয়া বৃথা।' সেই নরেন ঠাকুরকে অবতার বলে মেনেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁকে বলেছেন, 'অবতারবরিষ্ঠ'। সেই নরেন স্বামী

বিবেকানন্দ হয়ে পাশ্চাত্যে বেদান্ত প্রচার করে দেশে ফিরেছেন। একদিন গিরিশবাবু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। তাঁকে দেখে স্বামীজী বলেছিলেন, 'জি. সি., তোমার ঠাকুরকে সাগরপারে রেখে এলুম'—বলেই সেই পুরানো প্রাণমাতানো প্রশ্ন, 'সাড়ে তিন হাত মানুষের মধ্যে কি ভগবান আসতে পারেন জি. সি. ?' আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে গিরিশবাবু বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, এসেছেন—আমি যে দেখেছি।' এর পর তো আর কোন কথা চলে না। 'আমি দেখেছি'—এই তো দর্শনেরও শেষ কথা।

গিরিশবাবু শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ঈশ্বরাবতার বলে জেনেছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব গিরিশবাবুকে কি দৃষ্টিতে দেখতেন? বহু বছর আগে শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেখেছিলেন একটি উলঙ্গ মূর্তি নাচতে নাচতে এসে দক্ষিণেশ্বরের কালী-মন্দিরে ঢুকল। তার মাথায় ঝুঁটি বাঁধা, কোমরে রূপার পেটি; এক হাতে সুধাভাণ্ড আর এক হাতে সুরাপাত্র। ঠাকুর প্রশ্ন করেছিলেন, 'কে তুমি?' সে উত্তর দিয়েছিল, 'আমি ভৈরব—তোমার কাজ করতে এসেছি।' গিরিশবাবুকে দেখেই ঠাকুর চিনেছিলেন—এই সেই পূর্ব-দৃষ্ট ভৈরব।

'চৈতন্যলীলা' নাটকের মধ্য দিয়ে গিরিশ-বাবু ঘরে ঘরে হরিনাম সুধা বিলিয়েছেন। আবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যলাভের পর তিনি 'বিল্বমঙ্গল', 'নসীরাম', 'পাণ্ডব-গৌরব' প্রভৃতি নাটকের মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের নব ভাব প্রচার করে দেশবাসীকে কৃতকৃতার্থ করেছেন। ঠাকুর তাঁকে বলে-ছিলেন, 'তুমি যা করছ তাই করো; ওতেও লোকশিক্ষা হবে।' ঠাকুর ছিলেন ওস্তাদ খেলোয়াড়—জানতেন কাকে কি ভাবে খেলালে সে সবচেয়ে ভাল খেলতে পারবে, সবচেয়ে বেশী জগতের কল্যাণ করতে পারবে। ঠাকুরের কথায় গিরিশবাবুর স্থির বিশ্বাস হয়েছিল যে, পতিতদের উদ্ধার করবার জন্যই তিনি কখন কখন ভক্তিমূলক নাটক দেখতে আসতেন। বাস্তবিক 'চৈতন্য-লীলা' দেখে ঠাকুর অভিনেত্রীদের আশীর্বাদ করেছিলেন এবং বিনোদিনী, যিনি চৈতন্যদেবের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, তাঁর মাথায় হাত দিয়ে বলেছিলেন, 'মা, তোমার চৈতন্য হোক।'

ঠাকুরের ইচ্ছাতেই গিরিশবাবু থিয়েটারে রয়েছেন, এই নিয়ে তাঁর গুরুভাইদের সঙ্গে এক-দিন তর্ক বেঁধে যায়। তাঁরা বললেন, 'বাসনার ঠেলায় বই লিখছ, থিয়েটার করছ; আর বলছ কি না ঠাকুর তোমাকে পতিতোদ্ধারের জন্য ঐ সাজে ওদের মধ্যে রেখেছেন! বলতে লজ্জা করে না?' গিরিশবাবু একটুও বিচলিত না হয়ে বলেছিলেন, 'আচ্ছা, রোস, তোদের দেখাচ্ছি। এবার দেখা হলেই ঠাকুরকে ধরে বসছি যে প্রতিবারেই আমি জগাই-মাধাইয়ের সাজে কেন আসবো? আগামী বারে আমায় ভাল ছেলের সাজে আনতে হবে; এবার যাদের সন্ন্যাসীর সাজে এনেছ, তাদের ভেতর কাউকে আগামী বারে জগাই-মাধাইয়ের সাজে এনো—হম হরদফে জগাই-মাধাই নহীঁ হোঙ্গে।'

গিরিশবাবুর এই উক্তি থেকে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, জীবন-সায়াহ্নে তাঁর প্রত্যয়-ভাস্বর অন্তরে এই সত্য উদ্ভাসিত হয়েছিল যে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নরলীলায় সহায়তা করতেই তাঁর দেহধারণ—যে কথা

তিনি তাঁর সোপাধিক স্বরূপে ভৈরবমূর্তিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বলেছিলেন :

'কিবা প্রয়োজন ?'—তারে পুছিলে আবার
উত্তর করিল, 'কার্য করিব তোমার।'

শ্রীরামকৃষ্ণ-দৃষ্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দের সোপাধিক স্বরূপ ও মহাসমাধির পূর্বে তাঁদের উক্তিসমূহও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বস্তুতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলানাট্যে ত্যাগী বা গৃহী, স্ত্রী বা পুরুষ প্রত্যেকেরই নিজস্ব ভূমিকা আছে—প্রত্যেকেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। একজনের কাজ অপরের দ্বারা হবার নয়—হয়ও নি। নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই অপরিহার্য। যাঁরা ভগবানের লীলা-অনুরাগী তাঁদের পক্ষে লীলাপার্ষদদের মধ্যে কে বড়, কে ছোট বিচার করা অপরাধের সামিল। একথা মনে রেখেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাপার্ষদ ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্রকে বারংবার প্রণাম জানাই।

একটি নোতুন দাগ

স্বামী সুমেধানন্দ

পৃথিবী যেমন আপন কক্ষপথে সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ করছে তেমনই আবার নিজের আহ্নিক আবর্তে নিজেই ঘুরে চলেছে। এই গতি দুটির কোন একটিকে বাদ দিলে পৃথিবীর প্রতীতি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বিবেকানন্দ-জীবনের অনুধ্যানও তেমনই অসমাপ্ত থাকে যদি 'দাগা বোলান'টিকে[১] গ্রহণ করে 'দাগ দেওয়া'টিকে বাতিল করে দেওয়া হয়। এই আচার্য সনাতন ধর্মের ওপরে দাগা বুলিয়েছেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি দাগও ধরিয়ে দিয়েছেন যার মূল বৈশিষ্ট্য হল ত্যাগের সঙ্গে সেবার অভিনব সমন্বয়। রামকৃষ্ণ-অবতারের পাঞ্চজন্য বিবেকানন্দ-শঙ্খের সুরটি ছিল মানুষের মন-মাতান ত্যাগের জয়গান। ত্যাগ শব্দের তাৎপর্য আত্ম-বলিদান। ভোগাকাঙ্ক্ষা নামযশ সুখস্বাচ্ছন্দ্য তুচ্ছ-করা নিজের জীবন দেখিয়ে পৃথিবীর মানুষের কাছে আত্মোৎসর্গের আহ্বান জানিয়ে গেলেন সপ্তর্ষির ঋষি, নররূপী নারায়ণ। পৃথিবী যেমন নিজেই ঘুরে ঘুরে তার অন্ধকার দিকটাকে আলোর কাছে এনে দেয় তেমন করে স্বামীজী নিজেই ঘুরে ঘুরে দুনিয়ার দরবারে সকলের দরজায় হাজির হলেন তাদের অন্ধকার ঘরে গীতার ও গুরুর জ্ঞানরশ্মি পৌছে দেবার জন্য। ত্যাগই ছিল তাঁর গীতা আর লড়াই-করে-বুঝে-নেওয়া গুরুর জীবন ছিল তার ভাষ্য। অনেকেরই চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল কিন্তু স্বীকার করতে সকলেই বাধ্য হল যে, এই বিবেকানন্দ-রূপের মধ্যে জ্ঞানভাস্করের উদয় হয়েছে। ভাস্বর সেই ভাস্করের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে থাকতে যারা অসুবিধা বোধ করল তারা অন্য দু'পাঁচটা আপসরূপী আদর্শের মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দ-মার্তণ্ডের কিরণ গ্রহণ করতে চাইল। আপস-কাচের ঘনত্বের জন্য বা রঙের বিভিন্নতার ফলে গ্রহণেচ্ছু মানুষের কাছে একটু নমনীয় রূপে প্রতিভাত হলেও কিরণটি

১ উদ্বোধন, চৈত্র, ১৩৮৪ সংখ্যায় লেখকের 'দাগা বোলানর নোতুন নজির' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

আদতে উজ্জ্বল উষ্ণ ও উদার।

দেশ-কাল ধর্ম-অধর্ম জাত-বেজাতের হিসেব না করেই সেই কিরণমালা দিকে দিকে প্রাণে প্রাণে ছুটে চলেছে। প্রাণের কপাট আর মনের জানলা যে খুলবে তারই ঘরে সেই আলো গিয়ে পৌছবে। বিকীর্যমাণ এই বিবেক-রশ্মির কাছে ছোট-বড়র প্রভেদ আর পক্ষপাতিত্বের বালাই নেই। তবে তাপ যার বেশী মনে হবে, সে জানলায় রঙীন সার্সি বসিয়ে নেবে, অথবা একটি পাল্লা বন্ধ করে দেবে। সমস্ত দরজা জানলা খুলে সেই রশ্মিকে যে আমন্ত্রণ জানাতে পারবে, তার জীবন ধন্য—'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা'। সূর্যকিরণ যেমন স্ফুটনোন্মুখ কুঁড়িটিকে ফুটিয়ে তোলে, অথবা একটি নোতুন কুঁড়িকে দিনে দিনে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে, স্বামীজীর জীবন ও বাণীও তেমনই মানুষের হৃদয়কে জাগিয়ে তোলে, অথবা তার সুপ্ত সম্ভাবনাকে ফুটে উঠতে সহায়তা করে। তিনি বলতেন: 'জগতে যখন এসেছিস, তখন একটা দাগ রেখে যা।' আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে একটা দাগ রেখে জগৎ থেকে বিদায় নেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে, কিন্তু ত্যাগ ও সেবার সমন্বয়-সুতো দিয়ে ইতিহাসের মাটির ওপরে তিনি যে দাগ রেখে গেছেন, তার সঙ্গে আপন আপন জীবনটিকে মিলিয়ে দিতে আমরা সকলেই সচেষ্ট হতে পারি।

এই যে বিবেকানন্দ-জীবনের দাগের সঙ্গে আমাদের জীবনগুলিকে মিলিয়ে দিতে চাইছি অথবা সেই জীবন-আঁকের ওপরে আমরা দাগা বোলাতে সচেষ্ট হচ্ছি তার কারণ হল, সে জীবনপ্রবাহে এমন একটি চৌম্বক শক্তি আছে যা মরচেবিহীন মনকে আকর্ষণ করে এমনভাবে যে ওজর-আপত্তি চলে না, বাধা-বিপত্তি গ্রাহ্যের মধ্যেই আসে না। তা ছাড়া স্বার্থ-মরচে বা কামনা-কলঙ্কের আবরণ থাকলেই যে রেহাই আছে এমনও নয়। ঐ জ্ঞান-রশ্মি বিবেক-কিরণ বা যুক্তি-যন্ত্রের ক্রিয়ার ফলে মরচের আস্তরণ বা কলঙ্কের আবরণটি আমাদের মন থেকে ধীরে ধীরে সরে যেতে বাধ্য। আর সরে যখন যায়, তখন 'হে ক্ষুদ্র মানব, তোমার কি সাধ্য যে মায়ের শক্তিসঞ্চার রোধ কর?'

স্বামীজী-প্রবর্তিত এই রামকৃষ্ণ-আন্দোলন-প্রবাহের গতিই হোক বা পৃথিবীর প্রান্ত জুড়ে সেই আন্দোলনমুখী জনজীবনের গতিই হোক, দুটির কোনটিই অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চল হয়ে যাবে না। জনচেতনায় নিজের আগ্নেয় জীবনটি দিয়ে রামকৃষ্ণ-যজ্ঞের ঋত্বিক্ এমন একটি চিহ্ন রেখে গেছেন যে, চোখ ফিরিয়ে নিয়ে নৈরাশ্য দেখিয়ে বা উদাসীন হয়ে সেই দগ্ধ দাগটিকে ধুয়ে দেওয়া যাবে না। এই দাগের উৎসাগ্নি নিভে গেছে বলে মনে করলে ভুল করা হবে। কয়লার টুকরো যেমন ছাইয়ের নিচে জ্বলতে থাকে, নিষ্ক্রিয় বলে মনে হলেও আগুন যেমন খড়ের গাদায় ভেতরে ভেতরে দহনক্রিয়া চালিয়ে যায়, বিবেকানন্দ-জীবনের বারুদও তেমন দৃষ্টির অলক্ষ্যে মানুষের মনের গভীরে কাজ করে চলেছে। ১৯০২-এর ৪ঠা জুলাই যে সেই আগুনটি নিভে গিয়েছিল এমন নয়। দেশলাই-কাঠির আগুন নিভে গেলেও যেমন তার থেকে দাহ্যবস্তুর একটি বিরাট স্তূপ জ্বলে ওঠে, মোটর গাড়ির স্পার্কার নিভে যাবার আগে যেমন সঞ্চিত জ্বালানিটিকে ধরিয়ে দেয়, বিবেকানন্দ-নামধারী শরীরটিও তেমন বেলুড় মঠের বেলতলায় ছাই হয়ে যাবার আগে একটি

সুদূরপ্রসারী অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত করে গিয়েছে। সংস্কৃত মার্জিত ও উন্নীত মনে এই আগুনটি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে অথবা নিষ্কম্প দীপশিখার মত নিশ্চল ও অনির্বাণ হয়ে রয়েছে। অশোধিত মনেও এই আগুনের দহনকার্য চলছে। সেখানে তেমন দৃষ্টি-আকর্ষণকারী লেলিহান শিখা দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু তুষের আগুনের মত মনকে তপ্ত করে চলেছে, কামনা-বাসনার আবর্জনাগুলি ধীরে ধীরে পুড়ে ছাই হচ্ছে। তাই স্বামীজীকে একটি অতীত ব্যক্তিত্ব বলে সরিয়ে দেওয়া চলে না। তাঁর সূক্ষ্ম প্রেরণা-পদ্ধতিটি আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের মতই একটি বর্তমান সত্তা। সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিতে স্বামীজী হলেন 'আশার দূত', যিনি এসেছিলেন 'আমাদের প্রাণের সকল তমঃ নাশ' করে হৃদয়ে হৃদয়ে 'অনির্বাণ শিখা' জ্বালিয়ে দিতে। ব্যথিত বঞ্চিত অভিশপ্ত এই জাতির জীবনে স্বামীজীর মতো দূতের আগমনের জন্য সুভাষচন্দ্র ভগবানকে 'করুণাময়' বলে উল্লেখ করেছিলেন। সুভাষ-ভাষিত এই দূতের বৈশিষ্ট্য হল, করুণাময়ের যে বিশেষ বার্তাটি তিনি বহন করে এনেছিলেন, সেটি কোনও দেশাচার লোকাচার বা ধরাবাঁধা বিধিবিধানের কুক্ষিগত ছিল না। চরম সত্যটিকে রাজারাজড়া থেকে শুরু করে মুচি-মেথরের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন প্রত্যেকের নিজস্ব ভাবগত বৈশিষ্ট্যটি স্মরণ রেখে। সকলের সঙ্গে মিশেছিলেন তাদের আপনজন হয়ে, প্রাণ ঢেলে।

স্বামীজীর দাগ-রেখে-যাওয়া জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির অন্যতমটি হল মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসা। দেশের তথা বিশ্বের কল্যাণে নিজের জীবনটিকে তিলে তিলে উৎসর্গ করেছিলেন— 'বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ'। মানুষের ঐহিক কল্যাণের জন্য তিনি জীবনপণ সংগ্রাম করেছেন। ক্লিন্ন ক্লিষ্ট তৃষিত তাপিত মানুষের ঐহিক শ্রীবৃদ্ধিহেতু যেমন নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন, তেমনই আবার অস্ত্র ধরেছেন ভোগবাদের রাক্ষসী মূর্তির বিরুদ্ধে।

এই যে ঐহিক উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া এবং ইহলোকসর্বস্ব মতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা—এ দু'টি ধারাই তাঁর ত্যাগ ও সেবা আদর্শের অন্তঃপাতী। তিনি বুঝেছিলেন যে, ঐহিক শ্রীবৃদ্ধি প্রহসনের নামান্তর এবং ধ্বংসের প্রস্তুতি, যদি না সেখানে আত্মিক অগ্রগতির সচেতনতা থাকে। মানুষ কেবলমাত্র রক্তমাংস ইচ্ছা-অনিচ্ছা দিয়ে গড়া একটি পিণ্ডমাত্র নয়। হাড়মাসের খাঁচা আর মনবুদ্ধির ক্রিয়া তার বাইরের রূপ মাত্র। তাই চার্বাক ফ্রয়েড ডারউইন বা মার্কস দিয়ে মানুষের সবটুকু বোঝা যায় না। মানুষের ভেতরে রয়েছে একটি অনন্ত ঐশী সত্তা যেখানে 'সোঽহম্'-সঙ্গীতের অনুরণন চলেছে অনাদি কাল ধরে। 'অতীত-আগামী-কালহীন' 'অরূপ-নাম-বরণ' আত্মার যে একটি বর্ণনাতীত রূপ বা সত্তা রয়েছে, সেটি 'দেশহীন সর্বহীন'। তাকে মুখে বলে বা কাগজে লিখে বোঝানো যায় না বটে, কিন্তু মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। আশা-নিরাশা সুখ-দুঃখ স্বস্তি-অস্বস্তির সংঘাতে আলোড়িত মানুষের জীবন বিধৃত রয়েছে গুরুহীন শেষহীন সেই সচ্চিদানন্দ-সাগর-সঙ্গমে। শুধু মানুষ বলি কেন, জড়জগৎ ও তার অন্তর্বর্তী সকল প্রাণীই সেই একই চৈতন্যের স্ফুরণমাত্র। 'তাহে বসে কত জড় জীব প্রাণী / সুখ দুখ জরা জনম মরণ'।

পায়ের তলার মাটি যদি সরে যায়, তাহলে যেমন আমরা দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না, যে চেয়ারে বসে আছি সেটি সরিয়ে নিলে যেমন বসার কোন আধার থাকে না, তেমনই সচ্চিদানন্দটিকে উড়িয়ে দিলে পাকা কাঁচা কোন আমিরই অস্তিত্ব থাকে না। আগুন সরিয়ে নিলে কেবলমাত্র আবহাওয়ার উষ্ণতায় জল কখনও ফুটে ওঠে না। আত্ম-শক্তিকে সরিয়ে দিলে মনবুদ্ধির প্রচেষ্টা আর শারীরিক শক্তিও মিথ্যা হয়ে যায়। এই জগৎ-সংসারটি একটি অবর্ণনীয় অথচ অনুভবযোগ্য 'অস্ফুট মন আকাশে' ভেসে রয়েছে যেখানে 'বহে মাত্র আমি আমি এই ধারা অনুক্ষণ'। আমিত্বের এই যে ধারাটি বয়ে চলেছে এ হল সেই সচ্চিদানন্দের ইতিহীন সঙ্গীত। গ্রহণক্ষমতা যত শক্তিশালী হবে, মনবুদ্ধি যত নির্মল হবে, এই সঙ্গীতের মীড় ও মূর্চ্ছনা ততই ধরা পড়বে। নতুবা 'যে বধির সে ত শুনিয়াও শুনিবে না'।

যে বধির সে শুনলো না বটে, যে দৃষ্টিহীন সে দেখলো না বটে, যে বিকৃতমস্তিষ্ক সে বুঝলো না বটে, কিন্তু সংবেদনশীল মনের মাটিতে স্বামীজীর নববার্তা একটি গভীর দাগ কেটে দিল। বেতারের প্রেরকযন্ত্রে যেমন ঈথার-মণ্ডলে কম্পন তোলে, রেকর্ডিং ম্যাগনেট যেমন টেপের ওপরে দাগ ধরিয়ে দেয়, কার্ডিওগ্রাম যন্ত্র যেমন কাগজের ওপরে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়াটি এঁকে রাখে, স্বামীজীর ত্যাগ ও সেবার আহ্বানও তেমনই দেশে-বিদেশে মানুষের প্রাণে একটি কম্পন তুলে দিল, তাদের হৃদয়-ভূমিতে একটি দাগ ধরিয়ে দিল। টিউনিং সঠিক হলে রেডিও যেমন পরিষ্কার সোচ্চার হয়ে ওঠে তেমনই মন মালিন্যবিহীন স্বচ্ছ হলে শোনা যায় স্বামীজী বলছেন: 'ওঠ জাগো।' রুদ্রের এই আহ্বান কানে গেলে আর 'উঠি কি না উঠি / অন্ধ তামস গেছে কিনা ছুটি' ভাববার অবকাশ থাকে না। এই ঈশানের বিষাণ-বাদন মানুষকে চলার নেশায় পাগল করে তোলে। স্বপ্নেও স্বামীজীর বাণী শুনলে ঘুমন্ত লোককে গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে হয়, আর উঠে বসে সেই বিরাট সেবাযজ্ঞে আত্মত্যাগ করার জন্য এগিয়ে যেতে হয়। কিন্তু কেন এমন হয়? কেন তাঁর অশরীরী বাণী মানুষকে ত্যাগের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রলুব্ধ করে? কেন সেই আহ্বান কত শত কচি-কাঁচা জীবনকে ভোগসুখের প্রলোভন উপেক্ষা করিয়ে ত্যাগের বন্ধুর পথে নেমে আসতে বাধ্য করে? 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া' দুর্গম এই পথটি ফুলের পাপড়ি দিয়ে ঢাকা তো নয়ই বরং কণ্টকাকীর্ণ—এ তো পথে নেবেই সকলে বুঝতে পারে; কিন্তু তবু কেন মন এগিয়ে যেতে বলে, গৃহে ফেরার প্রলোভনকে নস্যাৎ করে দেয়? এই কেনর উত্তর প্রত্যেক পথিক নিজেই জানে। সেবাযজ্ঞে আত্মত্যাগী হোতা হবার এই দুর্বার আহ্বানটি রবীন্দ্রনাথের কথায় 'মানুষের আত্মাকে ডেকেছে, আঙুলকে নয়'। আঙুলকে ডাকার বাণী হয়তো কালক্রমে মানুষ ভুলে যেতে পারে, কিন্তু আত্মাকে ডাকা এই আহ্বান তো কোনমতেই ভুলে থাকা যায় না। কম্পাসের কাঁটা যেমন নড়ে চড়ে উত্তর-দক্ষিণের দাগে দাগে দাঁড়াতে চায়, 'যে শুনেছে কানে তার আহ্বান-গীত' তার মনও তেমন ঐ ত্যাগ-সেবার দাগে দাগে মিলে যেতে চায়। কম্পাসের পূব-পশ্চিম বাতিল করার মতো স্বামীজীর আদর্শে অনু-প্রাণিত মানুষের কাছে ভোগ-সুখের লালসা নস্যাৎ হয়ে যায়।

ভোগাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে সুখেচ্ছা পরিহার করে বাসনা বিদায় করে আর স্বার্থবুদ্ধি জলাঞ্জলি দিয়ে ত্যাগের আদর্শটি যারা বরণ করবে স্বামীজী তাদের সমাজ থেকে সরে গিয়ে গুহায় বা জঙ্গলে আশ্রয় খুঁজতে বলেননি। স্বামীজীর দৃষ্টিতে ত্যাগ হল সেবাযজ্ঞের মন্ত্র। আত্মসুখ-সন্ধান বা কর্মবিরতির জন্য এই ত্যাগ নয়। আর কেবল মন্দিরে-বসে-থাকা দেবতার নৈবেদ্য সাজাবার জন্য এই সেবা নয়। স্বামীজীর ত্যাগ ও সেবার আদর্শটি অদ্বৈত দৃষ্টির উচ্চস্তরে উন্নীত। এই সেবার মধ্যে দয়ার গন্ধমাত্র নেই, আছে প্রেমের সুমিষ্ট সুরভি। সেবা করি কেন, না ভালবাসি বলে। ভালবাসি কেন, না আত্মার প্রতিচ্ছবি দেখি বলে। এই আত্মার প্রতিচ্ছবি দেখা আর ভালবেসে সেবা করা কিন্তু বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সীমিত নয় অথবা সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত নয়। এই সেবার মধ্যে অহঙ্কার করে দান করার প্রয়াস নেই, আছে শ্রদ্ধা করে পূজার অভীপ্সা। আর এই শ্রদ্ধা ও ভালবাসা কেবলমাত্র শ্রদ্ধেয় গুরুজনদের জন্য বা স্নেহার্হ কনিষ্ঠদের জন্য একচেটিয়া অঙ্গীকার নয়। স্বামীজীর সংজ্ঞায় সেবার ও শ্রদ্ধার বিস্তার অতি উদার। তাঁর প্রেমদৃষ্টিতে প্রেমময় ব্যাপ্ত রয়েছেন 'ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে'। তাই স্বামীজীর ভালবাসা জীবজগৎকে অতিক্রম করে জড় জগতেও সঞ্চারিত। গীতার পরা ও অপরা দুই প্রকৃতিই তাঁর চোখে সজীব ও সচেতন। তাই প্রেমিক বিবেকানন্দ বললেন: 'মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে এ সবার পায়।' নিছক উপদেশ দেবার জন্য যে বললেন এমন নয়। প্রেমের পরাকাষ্ঠার অনেকগুলি নিদর্শনও দেখিয়ে দিলেন নিজের জীবনে। মা ঠাকরুণের আদেশ না হলে রাখাল শরতের সাধ্য ছিল না নরেনের প্রেমবন্যা থেকে তারই বহুবাঞ্ছিত বেলুড় মঠের নোতুন জমিটিকে বাঁচিয়ে রাখার। হাজার হাজার মাইল দূরে ফিজির কাছে কোনও দ্বীপে অগ্ন্যুৎপাতে আর্ত নরনারীর ক্রন্দন স্বামীজীর বুকে এসে লেগেছে। তাই বেদনাহত বিবেকানন্দ রাতদুপুরে বেলুড় মঠের বারান্দায় পায়চারি করছেন। চিঠি তো কেউ তাঁকে লেখেনি, বা টেলিগ্রামও কেউ পাঠায়নি। তবে অতদূরের মানুষের ক্রন্দন তাঁর কানে কেমন করে পৌছল, তাদের আর্তনাদ তাঁর স্নায়ুজালকে কেন আহত করল? কি করে বা কেন তা জানি না; তবে মনে হয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে কোনও বেদনা এই প্রেমপুরুষের এ্যান্টেনায় ধরা পড়ে যেত।

বেদান্তাদি শাস্ত্রের সত্যদর্শন আর জীব-জগতের বেদনাদর্শন এই দুটি ধারা একত্রে তাঁর এ্যান্টেনায় ধরা পড়ে কোনও দ্বন্দ্ব বা বিবাদের সূচনা করল না। এই দর্শন দুটি বিবেকানন্দ-ব্যক্তিত্বের দ্বৈত-সত্তা হয়ে তাঁর জীবন-নাটকটিকে আরও জমিয়ে তুলল। টেলি-ভিসনের পর্দায় যেমন ছবি দেখার সঙ্গে সঙ্গে শব্দও শোনা যায় স্বামীজীর জীবন ও বাণীর পর্দাতেও তেমন অদ্বৈতের সঙ্গে দ্বৈত, ত্যাগের সঙ্গে সেবা, বর্জনের সঙ্গে গ্রহণ আর কর্মের সঙ্গে পূজার একটি সহজ সরল সাবলীল মিশ্রণ দেখতে পাই। অনেকদূর থেকে ভেসে আসা অদৃশ্য তরঙ্গগুলি দূরদর্শনের কাঁচে যেমন হাতের কাছে নাগালের মধ্যে সজীব সচল হয়ে আত্মপ্রকাশ করে, অনাদি অনন্ত সত্য আর শাস্ত্রের দুরূহ তত্ত্বগুলিও তেমনই স্বামীজীর জীবনপর্দায় ভেসে উঠলো জীবন্ত হয়ে। দেশের অতীত ইতিহাস আর অনাগত ভবিষ্যতের ছবি যেমন তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠতো

তেমনই পারমার্থিকের ব্যবহারিক রূপ আর ব্যবহারিকের পারমার্থিক মূল্য প্রতিফলিত হল তাঁর জীবনের প্রতি পদক্ষেপে, কর্মের প্রতি ছন্দে, বার্তার প্রতি অক্ষরে। উপনিষদের ঔদার্যকে আর গীতার সমন্বয়কে বিবেকানন্দ-ভগীরথ প্রবাহিত করলেন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের মরুভূমিতে। বাঁধ খুলে দিলে সঞ্চিত জলরাশি যেমন তৃষিত প্রান্তরকে পরিব্যাপ্ত ও পরিতৃপ্ত করে তেমনই অনাবশ্যক বিধিনিষেধের বাঁধনগুলি খুলে দিয়ে বনের বেদান্তকে তিনি বইয়ে দিলেন ক্ষেতে-খামারে কলে-কারখানায় ঘরে-বাইরে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে। বাঁধের মধ্যে জল আটকে রাখার মতো করে বেদান্তকে আর পুঁথির মধ্যে তর্কযুক্তির পাঁচিল তুলে আটকে রাখা গেল না। 'অন্তস্থ পারে ভুবনস্থ মধ্যে নাকস্থ পৃষ্ঠে মহতো মহীয়ান্'কে কেমন করে আবদ্ধ করা চলে লোকাচার আর দেশাচারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে!

অপ্রয়োজনীয় আচারের বাঁধ ভেঙে 'সমবস্থিতম্' ঈশ্বরকে 'সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র' স্বামীজী সমদর্শনের যে ধারা সর্বত্র বইয়ে দিলেন সেটি তাঁর ত্যাগ-সেবা সংস্থাপনের একটি বৃহৎ প্রচেষ্টা। সেই একই ভগবৎসত্তা যখন 'রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব'-বোধে অনুভূত হবে তখনই তো 'ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানম্' তত্ত্বটির যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব। ভগবান বসে রয়েছেন লক্ষ কোটি কিলোমিটার দূরে স্বর্গের সিংহাসনে আর ইহলোকের ধর্মোদ্যমগুলি সেই ভগবানের দিকে একটু একটু করে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে এমন চিন্তা বা ভাবধারার ছলনা থেকে স্বামীজী আমাদের মুক্ত করে দিয়ে বললেন বিভুরূপী ভগবান ছড়িয়ে রয়েছেন বিশ্বচরাচরে সর্বভূতে। চোখ খুলেও তাঁর আরাধনা হয়, মন্দিরে না গিয়েও উপাসনা করা যায়, জীবের মধ্যেও শিবের পূজা হয়। তাই তো বিবেকানন্দের-জীবন ও দর্শনের ভাষ্যকর্ত্রী নিবেদিতা বুঝেছিলেন যে আচার্য এসেছিলেন এবং চলেও গেছেন; কিন্তু তাঁকে দেখার ও জানার সুযোগ যাদের হয়েছিল তাদের কাছে তিনি রেখে গেছেন মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসার অমূল্য স্মৃতিসম্ভার। স্বামীজীর দৃষ্টিতে প্রেমের চেয়ে বড়ো কিছু ছিল না— 'প্রেম প্রেম এই মাত্র ধন'।

স্বামীজীর এই প্রেমপ্লাবন সজীব ও সুন্দরের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। তাঁর সর্বতোমুখ প্রেম আলিঙ্গন করতে চেয়েছিল 'মৃত্যুর কালিমা মাখা' কালীর করাল মূর্তিকে। শাশ্বত সচ্চিদানন্দের মধ্যে যেমন সত্যের আলো দেখেছিলেন তেমনই অনুভব করেছিলেন মৃত্যু মহামারী ধ্বংসের মধ্যে কালান্তকের অন্ধকারকেও। এই আলো-অন্ধকার জীবন-মৃত্যু নিন্দা-স্তুতি শিব-অশিব ছিল তাঁর ব্রহ্মানুভূতির অন্তর্ভুক্ত দুটি অভিজ্ঞতা। রাতকে বাদ দিয়ে যেমন দিনকে পৃথক্ করে নেওয়া যায় না তেমনই মৃত্যুকে বাদ দিয়ে জীবনকে ধরে রাখা যায় না। তাই 'মৃত্যুরূপা মাতা' দামালছেলে বিবেকানন্দের বড়ো আদরের ধন। তাইতো বুকের রক্ত দিয়ে মায়ের পুজো করতে চেয়েছিলেন। সাহস করে মায়ের কাছে দুঃখদৈন্য চাইতে বলেছিলেন। মায়ের কোলে বসে থাকলে অথবা আঁচলের আড়ালে মুখ লুকালে চলবে না। লক্ষ্মী কমলা অন্নপূর্ণা যেমন মায়ের রূপ, তারা কালী ছিন্নমস্তাও তেমনই তাঁরই মূর্তি। মায়ের ছেলে বলে যদি পরিচয় দিতে হয় তাহলে গৃহসুখ ত্যাগ করে ত্যাগের সমরাঙ্গণে বিবেক-খড়্গ ধরে ভোগের সঙ্গে লড়াই করতে হবে।

কিন্তু প্রেয় স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে কেন শুধু শুধু দুঃখ-দৈন্যকে ইচ্ছা করে ডাকতে যাব? এখানেও স্বামীজী উত্তর দিলেন—ভালবাসি বলে। দুঃখ-কে ভালবাসতে বললেন, দৈন্যকে ভালবাসতে বললেন। এ ভালবাসা নিছক পাগলামি নয়। এর মধ্যেও রয়েছে অদ্বৈত সাধনার প্রচেষ্টা। অন্যের মধ্যে নিজেকে দেখি বলে, জীবের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখি বলে তাদের সেবা করতে চাই নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে। মায়ের মূর্তিতে যেমন খড়্গের সঙ্গে বরাভয়ের সমন্বয় রয়েছে আমাদের জীবনেও তেমন ত্যাগের সঙ্গে সেবাকে মিলিয়ে দিতে হবে। নিজের জন্য ত্যাগ আর পরের জন্য সেবাই হল স্বামীজীর ব্যবহারিক বেদান্তের একটি বিশেষ দ্যোতনা। মৃত্যু মহামারীর আরাধনাও এই বেদান্তেরই আর একটি ব্যঞ্জনা। দুঃখ-যন্ত্রণা ব্যথা-বেদনা সত্ত্বেও আশা ও উদ্যম নিয়ে যে ব্যক্তি নিষ্কাম কর্মে নিরত থাকতে পারে সে মহাপ্রাণ। আর মহত্ত্বের এই বিশেষ রূপটি স্বামীজীর দাগ-দিয়ে-যাওয়া জীবনে দেখা দিয়েছিল বহুবার।

তাই স্বামীজীর জীবনের উজ্জ্বল ঘটনাগুলি আর তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসা জ্বলন্ত কথাগুলি মানুষকে প্রবুদ্ধ করে ত্যাগের আর সেবার ডানায় ভর করে ক্ষুদ্র থেকে ভূমার দিকে উড়ে যেতে। স্বদেশমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ নলিনী-কিশোরের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল যে, স্বাধীনতা-সংগ্রামে নিবেদিতপ্রাণ শত শত যুবকের আত্মাহুতির পেছনে ছিল স্বামীজীর আহ্বান। 'বাংলায় বিপ্লববাদ' গ্রন্থে নলিনীকিশোর লিখেছিলেন যে, স্বামীজীর বিজয়বার্তা দেশের যুবকদের 'আত্মসম্বিতে সচেতন করিল—ত্যাগী স্বদেশপ্রাণ সন্ন্যাসী সাজাইল।' স্বামীজীর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বদেশসেবায় যারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাদের কাছে তাঁর রচনাবলী 'হইয়া উঠিল নবগীতা, নব-জীবন-বেদ।' এই নোতুন গীতা আর নব বেদের সঙ্গে যারা পরিচিত হল লাঞ্ছনা-গঞ্জনা জ্বালা-যন্ত্রণা সবই তাদের কাছে মাতৃ-আরাধনার উপচার হয়ে দাঁড়াল। তাদের চোখে 'স্বামীজীর বীরমূর্তিই যেন গুরু—তাঁহারই নিকট তরুণ বাংলা লইল দীক্ষা'। বিপ্লবী-সাধক শ্রীঅরবিন্দ অনুভব করেছিলেন যে 'ভারতের বিরাট প্রাণপুরুষ' 'নরকেশরী বিবেকানন্দে'র 'প্রভাব ভারত-আত্মাকে আলোড়িত করিতেছে।' শ্রীঅরবিন্দের মনীষায় উপলব্ধ হল: 'স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্ত্য-বিজয়াভিযান ভারতের কেবল নব-জাগরণ নহে পরন্তু পুনরভ্যুদয় এবং বিশ্ব-বিজয়েরও প্রথম প্রত্যক্ষ নিদর্শন।' স্বদেশী আন্দোলনের দিনে শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন যে, তাঁর নরেন বেঁচে থাকলে কোম্পানী তাকে জেলে পুরে রাখতো। যে লোকের লেখা পড়লেই দাসত্বে বিরাগ আসে, মন মেতে ওঠে, 'উদ্বোধন মন্ত্রে জাতি উদ্বুদ্ধ' হয়, সে লোক বেঁচে থাকলে না জানি কি হত! দীপ্ত এই সন্ন্যাসীর 'উদার জয়ভেরী'তে সাড়া দিয়ে দেশের প্রাণ যেন শপথ নিল—'আমরা দাঁড়াব উঠি, ছুটিয়া বাহিরিব, অর্পিব পরাণ।'

দেশের ছেলেদের ত্যাগের মন্ত্রে বৈরাগী করা আর মঠের বৈরাগী ছেলেদের সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করা এই আচার্যের একটি নোতুন অবদান। দর্শনের তথা মানবেতিহাসের পৃষ্ঠায় এটি একটি নোতুন সংযোজন। বিশ্বমানবের মনের ক্যানভাসে এটি একটি নোতুন দাগ।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী

সংরক্ষণার্থ

আবেদন

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর নিকট 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী', ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩, পবিত্র তীর্থভূমি হিসাবে বহুপরিচিত। এই পবিত্র গৃহেই শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘাধিষ্ঠাত্রী জগজ্জননী শ্রীসারদামণি দেবী ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার লীলাবসান পর্যন্ত দীর্ঘ একাদশ বর্ষ বাস করিয়া ইহাকে তীর্থে পরিণত করিয়াছেন। এই স্থানেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম লীলাসহচর পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' রচনা করিয়াছিলেন, যে গ্রন্থের উপস্বত্ব সহায়ে তিনি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে এই গৃহটি নির্মাণ করান।

এই কেন্দ্র হইতেই যুগাচার্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত 'উদ্বোধন' পত্রিকা উহার দশম বর্ষ হইতে দীর্ঘ সত্তর বৎসর ধরিয়া প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে।

কিন্তু নানা কারণে এই তীর্থভূমি আজ কালের গ্রাসে জীর্ণপ্রায়। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে নির্মিত এই সুপ্রাচীন গৃহের দেওয়াল, ছাদ এবং কোন কোন স্থানে ভিত্তি পর্যন্ত দুর্বল হইয়া ইহার অস্তিত্বকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে।

সম্প্রতি বহুস্মৃতি-বিজড়িত এই প্রাচীন 'মায়ের বাড়ী' সংরক্ষণের জন্য আমরা বিশিষ্ট স্থপতি ও কুশলী বাস্তুকারদের পরামর্শ লইয়াছি, যাহাতে এই গৃহের মূল কাঠামো ও প্রাচীন আকার বজায় রাখিয়া ইহার মেরামত করা সম্ভব হয়। ইহার জন্য আনুমানিক দুই লক্ষ টাকা প্রয়োজন।

বর্তমানে সংস্কার-কার্যের জন্য অপরিহার্য এই বিপুল অর্থ আমাদের না থাকায় আমরা শ্রীশ্রীমায়ের ভক্তমণ্ডলীর নিকট একান্ত অনুরোধ জানাইতেছি, তাঁহাদের যাঁহার যতটুকু সামর্থ্য তাহা লইয়াই মাতৃপূজায় সাহায্য করুন।

সর্বপ্রকার দান 'প্রেসিডেন্ট, রামকৃষ্ণ মঠ, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩' এই ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে। চেকে অর্থ দিলে তাহা 'রামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার' এই নামে লিখিতে হইবে। এই দান সরকারী আয়করমুক্ত।

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ

স্নানযাত্রা — অধ্যক্ষ

২০.৬.৭৮ — রামকৃষ্ণ মঠ ('মায়ের বাড়ী'), বাগবাজার

প্রার্থনা

ব্রহ্মচারিণী সুমিত্রা

ভারতবর্ষে তথা সমগ্র বিশ্বে অধ্যাত্মপথের পথিক এবং জাগতিক উন্নতি-কামী মানুষ চিরকাল প্রার্থনা জানিয়েছে শ্রেয় ও প্রেয় লাভের আকাঙ্ক্ষায়। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র জগতেই অধ্যাত্ম-ইতিহাসের বিবর্তন, আলোড়ন, ভাবোচ্ছ্বাস এবং সংহতির মধ্যে প্রার্থনার করুণধ্বনি শ্রুত হয়। বোঝা যায়, দুর্বল মানব-মন সর্বদাই এক বিরাট সত্তার কাছে আত্ম-সমর্পণে ব্যাকুল এবং আন্তর সত্তার গভীরে ফিরে যাবার এক অজানা প্রেরণা থেকেই মূলতঃ সমস্ত প্রার্থনাগুলির জন্ম। ভারতে সভ্যতার অরুণোদয়ের কাল থেকেই কখনও উচ্চগ্রামে, কখনও নিম্নগ্রামে এই প্রার্থনার গম্ভীর ও মধুর সুরলহরী ধর্মজীবনে এনেছে পরম আশ্বাস ও নির্ভরতা।

প্রার্থনা মানব-অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত আকূতি এবং ধর্ম-জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। কখনও সরবে, কখনও নীরবে প্রার্থনা চিত্তকে অন্তর্মুখ ও প্রশান্ত করে। ধর্মজীবনের মূল অন্তরায় বাসনা। 'বাসনা থাকতে জীবের যাতায়াত ফুরায় না।' শ্রীমদ্‌ভাগবতের কাহিনী অনুসরণ করে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, অবধূত তাঁর চব্বিশ গুরুর মধ্যে চিলকে এক গুরু মেনে-ছিলেন। চিলটি একটা মাছ নিয়ে যাচ্ছে দেখে শতশত কাক তাকে তাড়া করে তার পেছনে যেতে লাগলো। অবশেষে বিরক্ত হয়ে চিলটি মাছটা ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হল। ওই মাছই ভোগের বস্তু—বাসনা। বাসনার পশ্চাতে শতশত চিন্তা-বায়সের অনুসরণই মানুষকে অস্থির করে। অথচ জীবনবোধের সঙ্গে চাওয়া-পাওয়া এমনভাবে সংলগ্ন যে, তা অস্বীকার করা অসম্ভব বোধ হয়। অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের কিন্তু অভ্রান্ত অনুশাসন—অন্তর নির্বাসনা না হলে ঈশ্বরলাভ হয় না।

বিষয়াশামহাপাশাদ্ যো বিমুক্তঃ সুদুস্ত্যজাৎ।
স এব কল্পতে মুক্ত্যৈ নান্যঃ ষট্‌শাস্ত্রবেত্ত্যপি ॥[১]

—সুদুস্ত্যজ বিষয়ভোগেচ্ছারূপ দারুণ বন্ধন থেকে যিনি মুক্ত, তিনিই মোক্ষের অধিকারী, কিন্তু অপরে নন, যদি তিনি ষড়্‌দর্শনবিদ্‌ও হন।

এ যুগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব সহজ কথায় প্রবৃত্তিকে মোড় ফিরিয়ে দিতে বললেন। বাসনার কেন্দ্রে রয়েছে জগৎ। তাকে স্থানা-ন্তরিত করে সেই স্থলে ভগবানকে অভিষিক্ত করলেই বাসনা হয় প্রার্থনা। অনন্ত বাসনা-কামনার প্রবাহকে সংহত করে ঈশ্বরমুখী করলেই তা জগৎ-বাসনার নাশ করে। চিনি খেলে অম্বল হয় কিন্তু মিছরি অম্লনাশক। বিষকে ঔষধে পরিণত করলে তা বিষকেই জীর্ণ করে। বাসনার পরিশোধিত রূপই প্রার্থনা।

ভক্তের কাছে প্রার্থনার মূল্য অপরিসীম। ভগবান ও ভক্তের মধ্যে এটি চিরকালের যোগসূত্র। প্রার্থনার সার্থকতা শুধু প্রার্থনার পূর্তিতেই নয়; পুষ্টিকর আহার্য যেমন শরীরকে সবল করে, তেমনি সাধকের মনকে এটি পরি-তৃপ্ত করে, পুষ্ট করে, অন্তরের ভাবকে গাঢ় করে। প্রার্থনার নিবেদনেই আনন্দ। তাই

১ বিবেকচূড়ামণি, ৭৮

জপ-ধ্যানের সঙ্গে প্রার্থনার কথাও উল্লেখ করেছেন আচার্যগণ।

প্রার্থনার ভাষার বিভিন্নতা ও ভাবের তারতম্য দেশকালপাত্রভেদে ঘটেছে স্বাভাবিকভাবেই, কিন্তু মূল বিশ্লেষণ করলে এ সত্য প্রমাণিত হয় যে, শ্রেয় ও প্রেয় লাভের প্রার্থনার মধ্যে ক্রমে শ্রেয়মার্গের প্রার্থনাই ধীরে ধীরে মানুষকে অন্তর্মুখ করেছে, অন্তরতম সত্তার নিবিড় সান্নিধ্যে আকর্ষণ করেছে। সুতরাং সেই-জাতীয় প্রার্থনাগুলিই সর্বজনীন প্রার্থনায় পরিণত

ব্যক্তিগত কল্যাণের অপেক্ষা সকলেরই কল্যাণের জন্য সাধনা—মহত্তর ধর্মসাধনা। ব্যক্তিগত জীবনের জাগ্রত কল্যাণবোধকে বিশ্বে সম্প্রসারিত করার অনুশীলনই যথার্থ ধর্মসাধনা। এক সময় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রশস্ত রাজপথ-দর্শনে বিহ্বল হয়ে বলেছিলেন —'আহা ঠিক যেন সাধুর হৃদয়—সোজা আর প্রশস্ত'।[২] এক বিরাট উন্মুক্ত হৃদয়বত্তার মনন ও অনুধ্যান ব্যতীত সর্বব্যাপী অনন্ত-সত্তার একাত্মতা-ধ্যানে অধিকার জন্মায় না। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—'যে সন্ন্যাসীর অন্তরে অপরের কল্যাণসাধন-স্পৃহা বর্তমান নাই, সে কখনও সন্ন্যাসের উপযুক্ত নহে…।' অন্তরে এই কল্যাণস্পৃহার উদ্বোধনই ধর্মজীবনের প্রথম সোপান। কথামৃতে শুনি—'অনুরাগের ঐশ্বর্য কি কি? বিবেক, বৈরাগ্য, জীবে দয়া, সাধুসেবা, সাধুসঙ্গ, ঈশ্বরের নামগুণ কীর্তন, সত্য কথা এই সব।' জীবে দয়ার অর্থ আরও ব্যাপকভাবে অন্যত্র বলছেন— 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'।

জগতের মঙ্গলের জন্য যুগে যুগে যে সমস্ত আচার্য আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁদের সকলের মধ্যে জীব ও জগতের জন্য প্রবল কল্যাণ-কামনা ও অদ্ভুত নিঃস্বার্থভাব দর্শনে জগৎ ধন্য হয়েছে। ভেদ-বিভেদের গণ্ডী ওই হৃদয়বত্তার দ্বারাই অপসারিত হয়েছে। তাঁদের অন্তর থেকে অবিরাম নির্গত হয়েছে সর্বজীবের জন্য কল্যাণময় প্রার্থনার নির্ঝরিণী। তাঁরাই 'প্রাণাত্যয়েঽপি পরকল্যাণচিকীর্ষবঃ'—প্রাণ-ত্যাগ হলেও পরের কল্যাণসাধনে ব্যাকুল। বস্তুতঃ প্রার্থনার বাণী তাঁরা নিজ নিজ জীবনে রূপায়িত করেছেন সার্থকভাবে। ভগবান বুদ্ধ সিদ্ধিলাভের পর মৃগদাবে তাঁর শিষ্যদের আহ্বান করে বলেন—'…ভিক্ষুগণ তোমরা এখন গমন কর এবং বহুলোকের শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণকল্পে জগতের প্রতি অনুকম্পাপরবশ হইয়া মঙ্গলের নিমিত্ত…বিচরণ কর।' স্বামি-শিষ্য-সংবাদে স্বামী বিবেকানন্দ শিষ্যকে বলছেন—"…মনে মনে ভাবাব—'জীবের, জগতের উপকার হোক।' এরূপ ধারাবাহিক চিন্তাতরঙ্গের দ্বারাই জগতের উপকার হবে। জগতের কোন সদনুষ্ঠানই নিরর্থক হয় না, তা উহা কার্যই হোক, আর চিন্তাই হোক।" স্বামীজী-প্রদত্ত ধ্যানশিক্ষা সম্বন্ধে স্বামী শুদ্ধানন্দের বিবরণের মধ্যেও সর্বজনীন কল্যাণ-চিন্তার মধ্যেই যে ব্যক্তিগত মঙ্গল নিহিত, তার পরিচয় পাওয়া যায়: 'এইরূপ ভাব যে, আমার নিকট হতে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম— চতুর্দিকে প্রেমের প্রবাহ যাচ্ছে—হৃদয়ের ভিতর হতে সমগ্র জগতের জন্য শুভকামনা হচ্ছে— সকলের কল্যাণ হোক, সকলে সুস্থ ও নীরোগ হোক।'

সনাতন ধর্মের এই মূল সুরটি কণ্ঠতঃ

২ শ্রীমদর্শন, ২য় ভাগ, পৃঃ ১০৪

ব্যক্ত হয়েছিল বৈদিক যুগের প্রার্থনার মধ্য দিয়ে। সাম্য মৈত্রী সৌভ্রাত্র সৌমনস্য এবং বিশ্বের কল্যাণকামনায় বৈদিক প্রার্থনাগুলি মহিমা-মণ্ডিত। ঐহিক সুখসম্পদের কামনাকে অতিক্রম করে গেছে সমস্ত জীব-জগতের মঙ্গলবিষয়ক শুভ প্রার্থনা।

দৃতে দৃংহ মা মিত্রস্য মা চক্ষুষা
সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্।
মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে।
মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে ॥৩

—হে পরমেশ্বর, (আমার দেহ জরাজীর্ণ হলেও) আমাকে এরূপ দৃঢ় কর যেন সকল প্রাণী আমাকে মিত্রের দৃষ্টিতে দর্শন করে, আমিও যেন সকল প্রাণীকে মিত্রের দৃষ্টিতে দর্শন করি, আমরা যেন পরস্পরকে বন্ধুভাবে দর্শন করি।

ওঁ তচ্ছংয়োরাবৃণীমহে।
গাতুং যজ্ঞায় গাতুং যজ্ঞপতয়ে।
দৈবীস্বস্তিরস্তু নঃ স্বস্তির্মানুষেভ্যঃ।
ঊর্ধ্বং জিগাতু ভেষজম্।
শন্নো অস্তু দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥৪

—যজ্ঞ এবং যজ্ঞপতির উদ্দেশে স্তুতিসমূহ (আমাদের কল্যাণে) উচ্চারিত হোক। আমাদের উপর দেবগণের আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। নিখিল মানবজাতির মঙ্গল হোক। ওষধিসমূহ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হোক। দ্বিপদ (জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সমগ্র মনুষ্য-কুলের) এবং চতুষ্পদ প্রাণিগণের কল্যাণ হোক। শান্তি শান্তি শান্তি

ইদমুচ্ছ্রেয়োঽবসানমার্গাং
শিবে মে দ্যাবাপৃথিবী অভূতাম্।
অসপত্নাঃ প্রদিশো মে ভবন্তু
ন বৈ ত্বা দ্বিষ্মো অভয়ং নো অস্তু ॥৫

—আমরা যেন শান্তি এবং প্রশান্তির পথে অগ্রসর হই। দ্যুলোক এবং ভূলোক শান্তিময় হোক। আমাদের চারিদিক অরিশূন্য হোক অর্থাৎ কোন প্রাণী যেন আমাদের প্রতি শত্রু-ভাবাপন্ন না হয়, আমরা যেন কারুকে দ্বেষ না করি, যেন অভয় লাভ করি।

শিবেন বচসা ত্বা গিরিশাচ্ছ বদামসি।
যথা নঃ সর্বমিজ্জগদযক্ষ্মং সুমনা অসৎ ॥৬

—হে গিরিশ, তোমাকে লাভ করার জন্য এই প্রসন্নকারী মন্ত্রসমূহের দ্বারা প্রার্থনা করছি; তুমি এই বিশ্বজগৎকে (মানুষ পশু পক্ষী বৃক্ষ-লতাদি সহ) নিরাময় কর, উদার কর (সহৃদয় কর)।

বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব।
যদ্ ভদ্রং তন্ন আসুব ॥৭

—হে দেব, হে প্রকাশস্বরূপ, বিশ্বের অকল্যাণ দূর করুন। যা কল্যাণময় তাই প্রেরণ করুন।

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্বং
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥৮

—দেবগণের উৎপত্তিস্থল ও ঐশ্বর্য-বিধাতা, বিশ্বপালক সর্বজ্ঞ রুদ্র যিনি জগৎসৃষ্টির পূর্বে

৩ শুক্লযজুর্বেদীয়-স্বস্তিবচন, ৩৬।১৮
৪ ঋগ্বেদ (খিলসূক্ত): অ-৫, খি-১, ম-৫ ; অ-৫, খি-৩, ম-৭
৫ অথর্ববেদ ১৯।১৪।১
৬ শুক্লযজুর্বেদসংহিতা ১৬।৪
৭ শুক্লযজুর্বেদসংহিতা ৩০।৩
৮ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৩।৪

হিরণ্যগর্ভকে জন্ম দিয়েছিলেন, তিনি আমাদের শুভমতিযুক্ত করুন।

'ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্'—এই সর্বব্যাপী একত্বের উপলব্ধিই সর্বজনীন প্রার্থনাগুলির ভিত্তিভূমি। সকলেই সেই একই সত্তার প্রকাশ—এই বোধ জাগ্রত হলে সাধক-হৃদয়ে সকল মানুষ, সকল জীবের প্রতি প্রেমভাব সঞ্চারিত হয়। বৈদিক ঋষিগণ একই সদ্-বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার মধ্যে দর্শন করে সকলের কাছেই শান্তি ও আনন্দের জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছেন—

শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্যমা।
শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ।[৯]

—মিত্রদেব আমাদের সুখকারী, বরুণদেব আমাদের সুখপ্রদ ও সূর্য আমাদের আনন্দপ্রদ হোন; দেবগণের পালয়িতা ইন্দ্র এবং দেব-গুরু আমাদের সুখকারী এবং বিস্তীর্ণ পাদ-বিক্ষেপকারী বিষ্ণু মঙ্গলপ্রদ হোন।

কখনও বা অসীম শান্তির সিঞ্চনে প্রশান্ত কল্যাণময় বিশ্বের রূপদর্শনে বৈদিক প্রার্থনা মন্ত্রিত হল শান্তির আকাঙ্ক্ষায়—

দ্যৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তি-রাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ শান্তিঃ। বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বে দেবা শান্তির্ব্রহ্ম শান্তিঃ সর্বং শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ সা মা শান্তিরেধি॥[১০]

—দ্যুলোকে যে শান্তি, অন্তরীক্ষে যে শান্তি, পৃথিবীতে যে শান্তি, যে শান্তি জলে, ওষধিতে, বনস্পতিতে, সকল দেবতায় ও পরব্রহ্মে যে শান্তি, যে শান্তি সর্বজগতে, স্বরূপতই যা শান্তি (ভগবৎকৃপায়) সেই শান্তি আমার হোক।

শুভ ও শোভন শ্রুত বিষয় এবং দর্শনীয় পদার্থগুলি অন্তরের শুভভাব জাগ্রত করে ঋগ্বেদের ঋষি তাই প্রার্থনা করছেন—

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।[১১]

—হে দেবগণ, আমরা কর্ণে যেন কল্যাণবচন শ্রবণ করি, হে যজনীয় দেবগণ, আমরা চক্ষে যেন সুন্দর বস্তু দর্শন করি।

শুক্লযজুর্বেদের ঋষির প্রার্থনা—

শং নো ভবতু ভুবনস্য যস্পতিঃ।[১২]

—জগতের যিনি অধিপতি তিনি আমাদের কল্যাণ করুন।

এই সব প্রার্থনামন্ত্রের পাবনী শক্তি পরবর্তী কালেও মানুষের মনকে অনুভবের ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছে। চিত্ত থেকে দূর করেছে স্বার্থপরতা এবং নীচতাদি দৈন্যের কলুষ। তাই বৈদিক যুগের পরবর্তী প্রার্থনার মধ্যেও শুনি ওই মহান উদার ভাবের প্রতিধ্বনি—

সর্বস্তরতু দুর্গাণি সর্বো ভদ্রাণি পশ্যতু।
সর্বঃ সদ্বুদ্ধিমাপ্নোতু সর্বঃ সর্বত্র নন্দতু॥
সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ্ ভবেৎ॥
দুর্জনঃ সজ্জনো ভূয়াৎ সজ্জনঃ শান্তিমাপ্নুয়াৎ।
শান্তোমুচ্যেত বন্ধেভ্যো মুক্তশ্চান্যান্ বিমোচয়েৎ॥

—সর্বজীব পার হোক সকল দুর্গতি, এ সংসার ভদ্রময় দেখুক। সকলেই সদ্বুদ্ধি লাভ করুক; সর্বত্র সকলে আনন্দে থাকুক। সর্বজীব সুখী হোক, নিরাময় হোক। এ সংসার মঙ্গলময় দেখুক। কেউ যেন দুঃখভাজন না হয়। দুর্জন ব্যক্তি সুজন হোক এবং সজ্জন শান্তি লাভ করুক। শান্ত ব্যক্তি বন্ধন-মুক্ত হোন এবং অপরদেরও বন্ধন হতে মুক্ত করুন।

৯ তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ১।১
১০ শুক্লযজুর্বেদসংহিতা ৩৬।১৭
১১ ঋগ্বেদ ১।৮৯।৮।
১২ শুক্লযজুর্বেদসংহিতা ৩৬।২

শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহারাজ রন্তিদেবের প্রার্থনা—

ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরাম্
অষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।
আর্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজাম্
অন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ ॥ (৯।২১।১২)

—আমি ঈশ্বরের নিকট অষ্টৈশ্বর্যযুক্ত পরমগতি অথবা নির্বাণমুক্তিও কামনা করি না; আমি জগতের সকল প্রাণীর অন্তরে থেকে তাদের দুঃখ নিজেই ভোগ করতে চাই, যাতে তারা দুঃখরহিত হয়।

বহুল-প্রচলিত অনুরূপ আরেকটি প্রার্থনা—

ন ত্বহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামার্তিনাশনম্ ॥

—আমি রাজ্য, স্বর্গ, এমনকি মুক্তিও কামনা করি না কিন্তু দুঃখতপ্ত প্রাণীদের আর্তি দূর হোক—এই আমার প্রার্থনা।

মার্কণ্ডেয় পুরাণেও সর্বপ্রাণীর জন্য কল্যাণ-ময় প্রার্থনার কথা পাই। খনিত্র নামে এক রাজা সর্বদাই প্রার্থনা করতেন—

নন্দন্তু সর্বভূতানি স্নিহ্যন্তু বিজনেষ্বপি।
স্বস্ত্যস্তু সর্বভূতেষু নিরাতঙ্কানি সন্তু চ ॥
মা ব্যাধিরস্তু ভূতানামাধয়ো ন ভবন্তু চ।
মৈত্রীমশেষভূতানি পুষ্যন্তু সকলে জনে ॥
শিবমস্তু দ্বিজাতীনাং প্রীতিরস্তু পরস্পরম্।
সমৃদ্ধিঃ সর্ববর্ণানাং সিদ্ধিরস্তু চ কর্মণাম্ ॥···
যো মেঽদ্য স্নিহ্যতে তস্য শিবমস্তু সদা ভুবি।
যশ্চ মাং দ্বেষ্টি লোকেঽস্মিন্ সোঽপি ভদ্রাণি পশ্যতু ॥

—সর্বপ্রাণী আনন্দ লাভ করুক, বিজন স্থানেও প্রীতিমান্ হোক, সর্বজীবের মঙ্গল হোক, সকলেই নিরাতঙ্ক হোক। প্রাণিগণের ব্যাধি বিনষ্ট হোক, কাহারও যেন মনোবেদনা না হয় এবং সকল প্রাণীই সকলের প্রতি মিত্রভাব প্রকাশ করুক। দ্বিজাতিগণের মঙ্গল, পরস্পরের প্রীতি, সর্ববর্ণের সমৃদ্ধি এবং সর্বকর্মের সিদ্ধি সংঘটিত হোক।··· —যে আমাকে এখন স্নেহ করে, পৃথিবীতে তার মঙ্গল হোক এবং যে আমায় দ্বেষ করে সেও কল্যা' লাভ করুক। আবার এই মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্যত্রও—

প্রজাভ্যোঽস্তু দেবেশ শং নোঽস্তু জগতাং পতে।
শং নোঽস্তু দ্বিপদে নিত্যং শং নশ্চাস্তু চতুষ্পদে ॥

—হে দেবেশ! হে জগৎপতি [তোমার] প্রজারূপী আমাদের মঙ্গল হোক। আমাদের পুত্রাদি ও গবাদিরও সর্বদা মঙ্গল হোক। এই শ্লোকটি হুবহু বৈদিক মন্ত্র বলেই মনে হয়। ভাষা এবং ভাবের আশ্চর্য মিল। বস্তুতঃ বৈদিক যুগচেতনা যেমন গভীর, তেমনি ব্যাপক। ভারতবর্ষের সব মহৎ ভাবের আকর এই সাহিত্য। অনুভূতির ওপর প্রতিষ্ঠিত বলেই এই সমস্ত উদাত্ত ভাবের উত্তরাধিকার পরবর্তী সাহিত্যে পরম গৌরবের বস্তু। এইগুলি চিরকাল মানুষকে প্রেরণা যুগিয়েছে এবং অনন্ত কাল ধরেই 'সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্'-এর সেবায় ও সর্বাত্ম-ভাবের জাগরণে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের বৈদিক প্রার্থনাগুলিকে আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য ঐকান্তিক প্রার্থনা বলে অভিহিত করা যেতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—'মুক্তি বা স্বাধীনতা, দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক—ইহাই উপনিষদের মূলমন্ত্র।' উপনিষদের প্রার্থনাগুলি যেমন গভীর তেমনি মহদ্‌ভাবদ্যোতক। সত্যলাভের প্রবল প্রেরণায় ত্যাগ ও তপস্যার ভাবে উদ্বুদ্ধ ঋষিকুল কি ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষায় অগ্রসর হয়েছিলেন—তারই বৈরাগ্যোজ্জ্বল চিত্র উপনিষদের উদার প্রার্থনাসমূহ। অনন্ত

শক্তিবলে পরম অভয় লাভের প্রেরণায় অদম্য স্পৃহায় মহা-আন্দোলনে তাঁদের হৃদয়-সমুদ্রের মহান্ তরঙ্গভঙ্গের মতো কল্লোলময়, গুরুগম্ভীর, নির্ভীক-আরাব—এই প্রার্থনাগুলি।

বাসনা বা কামনার ভাবটি উপনিষদে সংক্ষেপে এষণা-শব্দ দ্বারা ব্যক্ত। সমগ্র এষণাকে বিশ্লেষণ করে তিনটি শব্দে সংহত রূপ দান করা হয়েছে—পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা। এষণাত্রয় থেকে ব্যুত্থিত হলে তবে অধ্যাত্ম রাজ্যের পথ সুগম। 'অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন'—'ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ'। এই পার্থিব এষণাকে অতিক্রম করতে উপনিষদ্‌গুলির আদিতে ও অন্তে মহত্তর প্রার্থনার শান্তিবচন। অধ্যাত্ম-জীবনে এগুলির আবেদন যেমন সর্বজনীন, তেমনি এদের ভাবও গম্ভীর দৃঢ় ঋজু এবং সংশয়-বর্জিত। 'উপনিষদ্‌সমূহ বৃহৎ শক্তির আকর। উপনিষদ্ যে শক্তি সঞ্চার করতে সমর্থ, সেই শক্তি সমগ্র জগৎকে তেজস্বী করতে পারে।' জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে সমস্ত আবরণ ছিন্ন করতে বদ্ধপরিকর ঋষিকুল প্রবল বীর্যে অগ্রসর হয়ে ঘোষণা করছেন—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—বীর্য বিনা আত্মজ্ঞান হয় না। আত্মাই শক্তির উৎস। আত্মানুভবই কাম্য, আত্ম-কামীই হন আপ্তকাম। আধ্যাত্মিকতা অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। উপনিষদের প্রার্থনা সেই অনুভূতিময় প্রার্থনা, যা উচ্চারণ মাত্র হৃদয়ে অননুভূত বলের সঞ্চার হয়, জীব আত্মশক্তিতে ও বীর্যে উদ্বুদ্ধ হয়। উপনিষদের প্রার্থনার ভাষা জড়ের নয়, চৈতন্যের মহাবাণী। সে ভাষা এক অনির্বচনীয় লোকের দ্বারোদ্ঘাটন করে।

উপনিষদ্‌গুলির আদিতে ও অন্তে প্রার্থনাগুলি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যান্য প্রার্থনা নানা স্থানে প্রকীর্ণ। অধিকাংশ বৈদিক মন্ত্রই স্তুতিমিশ্র প্রার্থনা। ধন, জন ও আত্মরক্ষার প্রার্থনায় তাঁদের কম্প্রকণ্ঠের করুণধ্বনি স্বাভাবিক ভাবেই হৃদয় স্পর্শ করে—'মা মা হিংসীঃ', 'মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়', 'নঃ আয়ুর্গন্তোঃ মধ্যা মা রীরিষত'—প্রভৃতি ভক্তি-কুণ্ঠিত কারুণ্যসিক্ত যাচ্ঞা বড়ই মর্মস্পর্শী। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য যখন বৈদিক ঋষি উদ্যম করছেন, তখন ওই দূরত্বের ব্যবধান, সম্ভ্রম, সংকোচ, অসহায় আর্তি কোন্ মন্ত্রবলে অন্তর্হিত। সেই স্থলে এক অসীম আত্মপ্রত্যয়, প্রবল সত্যানুসন্ধিৎসা এবং বীর্যের ভাব আর্যমনকে 'অভীঃ'তে উন্নীত করেছে। 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ'কে অতিক্রম করতে অতি সতর্ক পদক্ষেপ। সেই সঙ্গে পথের বিশেষ বিঘ্ন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হৃদয়ঙ্গম করে সেগুলি অপসারণের জন্য সগুণ ব্রহ্মের কাছে তাঁদের ওজস্বী প্রার্থনা যেন ভরাট গলায় নিখুঁত রাগবিস্তার, এক মহান্ ভাবের আবাহনের যোগ্য আধ্যাত্ম-পরিমণ্ডল-রচনা।—

ওঁ বাঙ্ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্; আবিরাবীর্ম এধি; বেদস্য ম আণীস্থঃ, শ্রুতং মে মা প্রহাসীঃ; অনেনাধীতে-নাহোরাত্রান্ সংদধামি। ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি; তন্মামবতু, তদ্বক্তারমবতু, অবতু মাম্, অবতু বক্তারম্, অবতু বক্তারম্॥[১৩]

—আমার বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হোক, আমার মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হোক। হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম, আমার কাছে প্রকাশিত হও। (হে বাক্য ও মন তোমরা) আমার কাছে বেদার্থ আনতে সমর্থ হও। শ্রুত বিষয় যেন

১৩ ঋগ্বেদীয় শান্তিবচন

আমাকে ত্যাগ না করে। এই অধ্যয়ন দিয়ে আমি দিন ও রাত্রি সংযোজিত করব। আমি মানসিক সত্য বলব, বাচনিক সত্য বলব। ব্রহ্ম আমায় রক্ষা করুন, আচার্যকে রক্ষা করুন, আচার্যকে রক্ষা করুন।

নবযুগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অভূতপূর্ব সত্যানুরাগ, সত্যের অকুণ্ঠ অনুসরণ এবং সত্য-স্বরূপ ভগবানের অনুচিন্তন—এই বৈদিক মন্ত্রের ওপর যেন নূতন আলোকপাত। বলছেন 'সত্যই কলির তপস্যা', 'মন মুখ এক কর', 'ভাবের ঘরে চুরি কর না', 'সংসারে থাকতে গেলে সত্য কথার খুব আঁট চাই। সত্যতেই ভগবানকে লাভ করা যায়।'—সত্যস্বরূপকে পাবার সাধনা কঠিন। এই দীর্ঘ যাত্রায় অতি সামান্যতম স্খলনও সত্যচ্যুতি ঘটায়, পরম তত্ত্বের সঙ্গে সংযোগসূত্র ছিন্ন করে। সত্যই মূলধন, ধর্মজীবনের দৃঢ় বনিয়াদ—'সত্যং প্রতিষ্ঠা'।

ধর্মানুভূতির ক্ষেত্রে চিন্তা ও বাক্যের সংযম আবশ্যক। অন্যত্র 'অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ' বলে সংবিধানও শোনা যায়। আত্মানুচিন্তন, আত্ম-তত্ত্ব-আলাপন ও তদ্বিষয়েই নিদিধ্যাসন—এই প্রবাহকে নিরন্তর করার জন্য ওই প্রার্থনা। কথামৃতে শুনি—'ঠিক ঠিক ত্যাগী হলে ঈশ্বর বই তাদের আর কিছু ভাল লাগে না। বিষয়-কথা হলে উঠে যায়; ঈশ্বরীয় কথা হলে শুনে। ঠিক ঠিক ত্যাগী হলে নিজেরা ঈশ্বর-কথা বই আর অন্য বাক্য মুখে আনে না।'—কিন্তু মহাবৈরাগ্যের এই স্তরে আরূঢ় হতে হলেও কৃপা চাই—'ঈশ্বরের অনুগ্রহ চাই, তবে তাঁতে সব মন হয়।' সুতরাং বৈদিক ঋষিকুল প্রার্থনা নিবেদন করছেন—বাক্য ও মনকে একটি ভাবে সংহত করার জন্য। আরও বলছেন—শ্রুত বিষয় যেন আমাকে ত্যাগ না করে, অর্থাৎ যা শুনেছি তার ধারণা যেন হয়, যেন তত্ত্ব-বিস্মরণ না ঘটে। অধ্যয়ন আমার দিবা-রাত্রির তপস্যা হোক। চিন্তা, বাক্য ও কার্যে যেন অবিসংবাদিতরূপে সত্যকেই প্রকাশ করি। 'সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য'—যে সাংসারিক ব্যবহার প্রচলিত, তাকে অতিক্রম করার মনোবল যেন হয়। সত্যকে যাঁরা অন্তরের সঙ্গে পরিপালন করেন, সত্যে যাঁদের আঁট আছে, তাঁরাই অনুধাবন করতে পারবেন এই প্রার্থনার গভীরতা। অন্তরের মালিন্য দৈন্য স্বার্থসংঘাত কল্পনাবিলাস পক্ষপাতিত্ব অনুদার মনোবৃত্তি—সত্যসূর্যের প্রকাশকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ব্রহ্মবিদ্যা পরাবিদ্যা, শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। তার অধিকারী, প্রার্থী যথাযোগ্য প্রার্থনাই করেছেন।

ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ
বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ ॥[১৪]

—[ব্রহ্ম] আমাদের উভয়কে [সমভাবে] রক্ষা করুন; উভয়কে [তুল্যভাবে] বিদ্যাফল দান করুন; আমরা যেন [সমভাবে] সামর্থ্য অর্জন করতে পারি; আমাদের উভয়ের লব্ধ বিদ্যা তেজস্বিনী হোক; আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি।

যে কোন বিদ্যার ক্ষেত্রে গুরুকরণ ভারতবর্ষের প্রাচীন প্রথা। গুরুপরম্পরায় প্রবহমানতা রক্ষা করে বিদ্যা শিষ্যে প্রশিষ্যে সংক্রমিত হয়। যেখানেই শিক্ষার প্রশ্ন, সেখানেই এই চিরন্তন সম্বন্ধের, এই বিদ্বেষ-

১৪ কৃষ্ণযজুর্বেদীয় শান্তিবচন— তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ২।২

রহিত পরম শ্রদ্ধার সম্পর্কের প্রসঙ্গ। উপযুক্ত গুরু যোগ্য শিষ্যলাভে কৃতার্থ হন। কুশলী শিষ্য গুরুর ভাবকে বিপুলতা দান করেন। জগতের ইতিহাসে এই গুরু-শিষ্যের মাধ্যমে ভাবপ্রচার সকল যুগেই লক্ষিত হয় এবং কোন একটি ভাবের অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সংরক্ষণ এই সম্বন্ধের ওপরই নির্ভর করে। ব্রহ্মবিদ্যার প্রসঙ্গে শ্রুতি বলেছেন—'আশ্চর্যোঽস্য বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা'। ব্রহ্মবিদ্ গুরু দুর্লভ এবং যথার্থ তত্ত্বজিজ্ঞাসুও বিরল। গুরুর প্রবল অধ্যাত্ম-শক্তি এবং সুযোগ্য শিষ্যের প্রযত্ন, অধ্যবসায় ও নৈপুণ্য ব্রহ্মবিদ্যালাভের অন্যতম কারণ। তাই গুরু ও শিষ্য উভয়কে তুল্যরূপে পরিপালন এবং আত্মবিদ্যার অনুশীলনকে সার্থক করার প্রার্থনা। পারস্পরিক শ্রদ্ধার বিনিময় বিদ্যার সর্ব শাখায়ই ভাবশুদ্ধির এবং সিদ্ধির সহায়ক। এই নিষ্কলুষ ভাব বিদ্যার্থী এবং আচার্যের জীবনের সম্পদ।

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি, বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথ বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি। সর্বং ব্রহ্মোপনিষদং। মাঽহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্তু, অনিরাকরণং মেঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু।[১৫]

—আমার অঙ্গসমূহ বাক্ প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র বল ও সকল ইন্দ্রিয় পুষ্টিলাভ করুক। সকলই (বস্তুমাত্রই) উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য [ব্রহ্ম]। আমি যেন ব্রহ্মকে অস্বীকার না করি; ব্রহ্ম যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান না করেন; তাঁর সঙ্গে আমার ও আমার সঙ্গে তাঁর নিত্য অবিচ্ছেদ হোক। সেই পরমাত্মায় সততনিষ্ঠ আমাতে উপনিষদ্‌গুলিতে যে ধর্মসমূহ আছে, তা বিদ্যমান থাকুক—তা আমাতে বিদ্যমান থাকুক।

ব্রহ্মবিদ্যালাভেচ্ছুর অন্তরের স্বত-উৎসারিত আকুতি এটি। শরীর ইন্দ্রিয় ও মনের সামগ্রিক শক্তি অধ্যাত্ম-সাধনায় নিয়োগ না করলে বস্তুলাভ হয় না।

পরাবিদ্যালাভের অধিকারী দুর্লভ। ত্যাগবৈরাগ্যাদি গুণাবলী, সবল দেহ, মন এবং ইন্দ্রিয়াদির সহায়তা এবং আত্মনিষ্ঠা—আত্মজ্ঞান লাভের পক্ষে অপরিহার্য। দুর্বল মস্তিষ্ক, দুর্বল দেহ, মন ও ইন্দ্রিয় এ পথের অন্তরায়। এই বিপুল অন্তরায় সম্বন্ধে সচেতন জিজ্ঞাসুর প্রার্থনার মধ্যে কোথাও সংশয়-কুণ্ঠিত দ্বিধা নেই। নির্ভীক আত্মপ্রত্যয়ের এবং বিবেকের আলোকে পরম সত্য জ্যোতির্ময়-সত্তায় উদ্ভাসিত। সেই চরম লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে সমস্ত বাধা-বিপত্তি ছিন্ন করার জন্য এই প্রার্থনার আর্তির সঙ্গে গভীর প্রত্যয়ের ধ্বনি এক অনুপম গাম্ভীর্যের সৃষ্টি করেছে। বৈদিক স্বরযোজনাও অভ্রান্তভাবে ওই নির্ভীক ভাবকে, ওই দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের ব্যঞ্জনাকে স্বচ্ছ সুস্পষ্টতায় উদ্ভাসিত করেছে।

বাজসনেয় সংহিতার বীর্যপ্রার্থনা কাব্যময় সুষমামণ্ডিত এবং সারল্যে-ভরা এক অতলস্পর্শী ভাবের প্রশান্তি-সিক্ত শতদলের মত শুভ্র লাবণ্যে বিকশিত—

তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি।
বীর্যমসি বীর্যং ময়ি ধেহি।
বলমসি বলং ময়ি ধেহি।
ওজোঽস্যোজো ময়ি ধেহি।

১৫ সামবেদীয় শান্তিবচন

মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি।
সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি। ১৬

—তুমি তেজ, আমায় তেজস্বী কর; তুমি বীর্য, আমায় বীর্যবান্ কর; তুমি বল, আমায় বলবান্ কর; তুমি ওজঃ, আমায় ওজস্বী কর; তুমি অন্যায়দ্রোহী, আমায় অন্যায়দ্রোহী কর; তুমি সহশক্তি, আমায় সহনশীল কর।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলছেন—'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।' অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ লাভ করলে মানুষ কোন কিছু থেকেই ভীত হন না। সেই অভয়স্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করতে হলে 'অভীঃ' হওয়া চাই। নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে যত দৃঢ়নিশ্চয় হওয়া যায়, ততই তেজ বীর্য বল ওজঃ মন্যু সহনশীলতা প্রভৃতি গুণ চরিত্রকে বজ্রের মতন দৃঢ় করে। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন—'...মনের খুব তীব্রতা, ঐকান্তিক ইচ্ছা চাই। ভাববি যে আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব, আমি কি কখনও অন্যায় কাজ করতে পারি?' তাই উপনিষদ্ বলছেন—তুমি অন্যায়দ্রোহী, আমায় অন্যায়-দ্রোহী কর। স্বামি-শিষ্য-সংবাদে শুনি স্বামীজীর বজ্রকণ্ঠের হুংকার—'আমি কি সামান্য কামকাঞ্চনলোভে পড়ে সাধারণ জীবের ন্যায় মুগ্ধ হতে পারি? মনে এমনি করে জোর করবি।' এই বীর্য ও বল। "...'এখনই ভগবান লাভ করব, এই জন্মেই করব'—এই হচ্ছে বীরের কথা।" '...হৃদয়ে সিংহের মত বল রাখবি।'—এই আত্মসংস্থ আত্মপর হবার জন্যই তেজ বীর্যের প্রার্থনাটি বলপ্রদ শক্তিপ্রদ এবং 'অভীঃ' ভাবের উদ্গাতা।

*

অসতো মা সদ্ গময়, তমসো মা
জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।
আবিরাবীর্ম এধি, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং
তেন মাং পাহি নিত্যম্॥১৭

—উপনিষদের এই রুদ্রস্তুতিতে প্রার্থনা করা হচ্ছে—আমাকে অসত্য থেকে সত্যে নিয়ে যাও, অন্ধকার থেকে আলোকে, মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যাও। হে স্বপ্রকাশ, রুদ্র, তুমি আমার কাছে আবির্ভূত হও। তোমার যেটি কারুণ্যপূর্ণ দক্ষিণ-মুখ তা দিয়ে আমাকে নিত্য রক্ষা কর। এই গম্ভীর ভাবদ্যোতক মন্ত্রটি রত্নতুল্য, এটি মানবাত্মার অন্তরের চিরন্তন অভিব্যক্তি।

দুর্যোধনের প্রসিদ্ধ উক্তিটি এ বিষয়ে স্মরণীয়—

'জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ।
জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ॥'

—ধর্ম কি তা আমি জানি, কিন্তু তাতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। অধর্ম কি তা-ও আমি জানি, কিন্তু তা থেকে আমার নিবৃত্তি হয় না।

সব জেনে শুনেও কোন এক অজ্ঞাতশক্তির দুর্বার বেগে যেন অসহায় মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। এই অবস্থায় সে প্রার্থনা জানায় এক মহত্তর শক্তির কাছে। দিশাহারা অন্তর থেকে নির্গত হয়—অসৎ থেকে আমায় সত্যে নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে অমৃতে। বৈদিক ঋষি অমৃতের সন্ধানে অন্তর্মুখ হয়েছিলেন। তাঁর অন্তরে ধ্বনিত হয়েছিল—প্রবৃত্তিমূলক স্বাভাবিক কর্ম ও লৌকিক জ্ঞান থেকে আমাকে শাস্ত্রীয় সৎকর্ম ও অতীন্দ্রিয় জ্ঞানে উন্নীত কর; অজ্ঞানরূপ যে ঘন অন্ধকার আমাকে আবৃত করেছে, সেই অজ্ঞান-আবরণ সরিয়ে নাও,

১৬ বাজসনেয় সংহিতা ১৯।৯ ১৭ বৃহদারণ্যক ১।৩।২৮, শ্বেতাশ্বতর ৪।২১

আমাকে জ্ঞানের উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় মার্গে নিয়ে চল ; আমি বার বার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মের প্রবৃত্তির গণ্ডীতে যেন আত্মাকে হত্যা করেছি—আমি আত্মঘাতী। আমার প্রবৃত্তির স্বাভাবিক প্রেরণায়, অজ্ঞানের বশবর্তী আমি আত্মাকে অস্বীকার করে যেন মৃত্যুর মধ্যেই বিচরণ করছি। আমাকে ওই বিশাল আত্মভাবের অনুশীলনে উদার মহান মৃত্যুঞ্জয় কর। আমার সকল 'কলুষ-তামস' হরণ কর। বিশ্বকবি তাঁর অতুলনীয় ভাষায় সেই একই আর্তি প্রকাশ করেছেন—

'আছ অন্তরে চিরদিন, তবু কেন কাঁদি ?
তবু কেন হেরি না তোমার জ্যোতি,
কেন দিশাহারা অন্ধকারে ?'
'জ্ঞান-সূর্য-উদয়-ভাতি
ধ্বংস করুক তিমির রাতি।'

অমৃতলোকের অনুসন্ধানে আজও দুর্গম পথের যাত্রীর কণ্ঠ মুখর হয় ওই প্রার্থনার মহাবাণীর ধ্বনিতে। [ক্রমশঃ]

সমালোচনা

শ্রীশ্রীমায়ের অনুধ্যান : অধ্যাপক শচীন্দ্রনাথ দত্ত, ডি. লিট.। প্রকাশক: শ্রীসুধীরেন্দ্রমোহন কর, ২১ জাস্টিস দ্বারকানাথ রোড, কলকাতা-৭০০০২০। (ফাল্গুন, ১৩৮৪), পৃঃ ৮২, মূল্য সাত টাকা (বোর্ড বাঁধাই), ছ টাকা (সাধারণ)।

'মাকে সম্যক্‌ভাবে বুঝিতে ও জানিতে পারা অসম্ভব বলিলেই হয়। তবে তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করা কেন ? ইহার উত্তর হইতেছে—এরূপ আলোচনায় মন ভরিয়া উঠে, এক অপার্থিব অনুভূতি হৃদয়কে স্পন্দিত করে, জীবন পবিত্র হয়, ধন্য হয়। নানা দৃষ্টিকোণ হইতে মাকে দেখিয়া মায়ের অপূর্বত্ব সম্পর্কে কিছু ধারণা হয়। এই ধারণা মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত করিয়া শ্রীশ্রীমায়ের অনুধ্যান করিলে অভাবনীয় আলোকে মনপ্রাণ উদ্ভাসিত হয়।' —লেখকের এই স্বকথিত স্বচ্ছ সরল ভাষণে বইখানির বিশেষত্ব সূচিত।

একটি মাসিক পত্রিকায় ছাপা কয়েকটি প্রবন্ধ সংকলন করে, সেগুলি অধ্যায়ে সাজিয়ে বইটি প্রকাশিত হয়েছে। পরিচ্ছেদগুলির পরিচয়বহ শিরোনাম: শ্রীশ্রীমায়ের অলৌকিকত্ব, রামকৃষ্ণ-আন্দোলনে শ্রীশ্রীমায়ের অবদান, শ্রীশ্রীমায়ের ব্যক্তিত্ব ও শ্রীশ্রীমায়ের বুদ্ধিমত্তা। সম্ভবত নতুন সংযোজন আড়াই পৃষ্ঠাব্যাপী মায়ের জীবনকাহিনীর একটি রেখাচিত্র, আরো সংক্ষিপ্ত একটি ভূমিকা এবং মায়ের সুভাষিত-সংবলিত উপসংহার।

কুশলী কৌসুলির মতো ডক্টর দত্ত বিভিন্ন অধ্যায়ের শিরোলিপিতে সংকেতিত তাঁর প্রতিপাদ্য বক্তব্যগুলির সমর্থনে ঘটনার পর ঘটনা গুছিয়ে সাজিয়ে অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ হাজির করেছেন। যাবতীয় তথ্য প্রামাণিক আকর গ্রন্থসমূহ থেকে আহৃত এবং অবিকৃত ; তাঁর তর্কবিচার পরিমিত ও শাণিত। ঘটনাবলী বিষয়ানুসারে সুবিন্যস্ত, কালানুক্রমিক নয়। সাল-তারিখ ও অন্যান্য নাতিপ্রয়োজনীয় অনুপুঙ্খ ও অনুষঙ্গ দিয়ে লেখক ঘটনাপ্রবাহকে ভারাক্রান্ত করেননি। তাই তাঁর বিবরণ এমন চপলচরণ হৃদয়হরণ হয়েছে, বাঁধুনি হয়েছে এমন দৃঢ়-সংবদ্ধ সংক্ষিপ্ত-সুন্দর। এইটাই বইটির প্রধান আকর্ষণ ও অভিনবত্ব।

তাছাড়া, বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে শ্রদ্ধার মণিকাঞ্চন সংযোগ গ্রন্থটির ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট: বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তিনির্ভর হয়েও ভক্তিতে নিষ্ণাত, কিন্তু গদগদ নয়। এমন একখানি উৎকৃষ্ট বইকে সর্বসাধারণের কাছে সর্বান্তঃকরণে সুপারিশ করা যায়। বকলম

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণকার্য

ভারতে: ঘূর্ণিবাত্যাত্রাণ: (ক) উপযুক্ত রাস্তার অভাব এবং জলের বিষম ঘাটতি সত্ত্বেও অন্ধ্রপ্রদেশে পুনর্বাসন-কার্য যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছে। ১৯শে জুন ১৯৭৮ পর্যন্ত গোল্লা-পালেম, ইরালি এবং পালাকায়াটিপ্পা গ্রামে ৩৪৮টি গৃহের নির্মাণকার্য বিভিন্ন স্তরে রহিয়াছে। প্রথমোক্ত গ্রামে ১৩০টি গৃহের নির্মাণকার্য প্রায় সমাপ্ত। বৃষ্টি শুরু হওয়ায় নির্মাণকার্যে অসুবিধা হইতেছে। অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচেন্না রেড্‌ডি রাজস্বমন্ত্রী শ্রীরাও-এর সঙ্গে পুলিগাড্‌ডায় মিশনের কারখানাটি পরিদর্শন করেন এবং নির্মীয়মাণ ঝড়-প্রতি-রোধক গৃহগুলির মধ্যে নমুনাস্বরূপ একটি গৃহ উদ্বোধন করেন।

(খ) তামিলনাড়ুর পারাতেরুর গ্রামে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক নির্মিত গৃহে গঠিত নূতন উপনিবেশটি শীঘ্রই উদ্বোধন করা হইবে

উদ্বাস্তুত্রাণকার্য: দণ্ডকারণ্য-পরিত্যাগীদের জন্য খড়্গপুর রেল স্টেশনের কেন্দ্রটি গত ১০ই জুন হইতে সরকারের পরামর্শে বন্ধ করা হয়।

বাংলাদেশে: বাগেরহাট ঢাকা দিনাজপুর ও নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রের মাধ্যমে রোগীদের চিকিৎসা এবং ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রের মাধ্যমে দুগ্ধবিতরণ অব্যাহত আছে।

দেহত্যাগ

স্বামী পরমেশ্বরানন্দ (কিশোরী মহারাজ) গত ১২ই জুন ১৯৭৮, বেলা একটার সময় ৯২ বৎসর বয়সে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা-প্রতিষ্ঠানে বার্ধক্যজনিত পীড়ায় দেহত্যাগ করেন। গত কয়েক মাস যাবৎ তাঁহার শরীর ভাল ছিল না এবং গত ৮ই জুন তাঁহাকে সেবা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়।

তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ১৯১০ সালে কোয়ালপাড়া আশ্রমে যোগদান করেন। শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে গেরুয়া বস্ত্র প্রদান করেন এবং ১৯১৬ সালে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট তিনি আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস-দীক্ষা প্রাপ্ত হন। সঙ্ঘে যোগদানের সময় হইতেই তিনি জয়রামবাটী-কোয়ালপাড়ায় থাকেন এবং শ্রীশ্রীমায়ের দৈনন্দিন কাজে তাঁহার সেবা করিবার দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯১৮ হইতে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত তিনি জয়রামবাটী আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। পরে ওখানেই অবসর-জীবন যাপন করিতে থাকেন। তাঁহার শেষকৃত্য জয়রামবাটীতেই করা হয়।

বিবিধ সংবাদ

বিগত ২৪-২৮শে জুন ১৯৭৮, নতুন দিল্লী হরিসভার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব স্থানীয় কালীবাড়ীতে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। এই জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করেন এবং সভানেত্রীরও আসন অলঙ্কৃত করেন ডক্টর রমা চৌধুরী। প্রধান অতিথি ছিলেন দিল্লীর প্রধান কার্যনির্বাহী পরিষদ্‌সদস্য শ্রীকেদারনাথ সাহানী। ভাষণ দেন দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী বুধানন্দজী। এই উপলক্ষে 'শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর শিক্ষা' সম্বন্ধে চারদিনব্যাপী একটি মনোজ্ঞ আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়; বিভিন্ন দিনে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ডক্টর রমা চৌধুরী ও অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী; আলোচনায় যোগ দেন সর্বশ্রী রসরঞ্জন গোস্বামী মোহিনী-মোহন গোস্বামী লক্ষ্মীনারায়ণদাস বাবাজী

নৃসিংহবল্লভ গোস্বামী অনন্তদাস বাবাজী প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ। ডক্টর রমা চৌধুরী তাঁহার ভাষণে বলেন যে, ধর্ম-দর্শনের ক্ষেত্রে শ্রীমন্ মহাপ্রভু-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের বহু বিশিষ্ট দান আছে যাহাদের মধ্যে একটি অভিনব তত্ত্ব এই যে, মুক্তি অপেক্ষা ভক্তি গরীয়সী, যে ক্ষেত্রে চার্বাক ব্যতীত অন্যান্য সকল মতবাদেই মুক্তিই পরমপুরুষার্থরূপে গৃহীত হইয়াছে। অধ্যাপক চক্রবর্তী বৈষ্ণবধর্মের মূল তত্ত্বসমূহ ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের (শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী—উদ্বোধন) অধ্যক্ষ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ গত ৯ই এপ্রিল ১৯৭৮ হইতে প্রতি রবিবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং গত ১৫ই জুন হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। বর্তমানে উভয় পাঠ ও ব্যাখ্যাই নূতন বাড়ীর সারদানন্দ হলে হইতেছে। গত ১১ই জুন ১৯৭৮, কথামৃত-ব্যাখ্যার ভূমিকার অন্তিম পর্যায়ে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সার-সংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

ভগবানের যে অমিয়-কথা, সেটি সংসার-সন্তপ্ত মানুষদের কাছে জীবনস্বরূপ। জীবনের একটি অর্থ হচ্ছে জল। সংসার-দাবাগ্নি-নির্বাপণে কথামৃত জলের মতো—সংসাররূপ রুক্ষ মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত জীবের পক্ষে এই অমিয়-কথা সঞ্জীবনী পানীয়সদৃশ।

যাঁরা 'কবি'—ত্রিকালদ্রষ্টা ঋষি—তাঁরা নিত্য বন্দনা-আরাধনা করেন এই দেববাণীর, অনুধ্যান করেন, অনুস্মরণ করেন।

এই কথামৃত পাঠে বা শ্রবণে চিত্তের সব মালিন্য দূরীভূত হয়। জীব নিষ্কলঙ্ক হয়। এটি বললে বা শুনলে বক্তা ও শ্রোতা, উভয়েরই পরম কল্যাণ। কেমন ধারা? ভাগবত বলছেন :

বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ পুরুষাংস্ত্রীন্ পুনাতি হি।
বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৃংস্তৎপাদসলিলং যথা॥
(১০।১।১৬)

—বিষ্ণুচরণোদ্ভূত ভগবতী সুরধুনীর পবিত্র সলিলস্পর্শে যেমন স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে ত্রিলোকের সকলেই পবিত্র হয়, তেমনি শ্রীভগবানের কথাসম্বন্ধীয় প্রশ্ন, প্রশ্নকর্তা, বক্তা ও শ্রোতা—এই ত্রিবিধ মানুষকেই পবিত্র করে।

ভাগবত আরও বলেন :

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্
ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোভিরামাৎ।
ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥
(১০।১।৪)

—যাঁদের তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয়েছে, অর্থাৎ সংসারের প্রতি, বিষয়ের প্রতি আসক্তি আর নেই; তাঁদের দ্বারা, সেই ঋষিদের দ্বারা বন্দিত এই কথামৃত ভবব্যাধির ঔষধস্বরূপ। অন্য কিছুতেই এই সংসারব্যাধি থেকে নিরাময় হওয়া সম্ভব নয়। একমনে ঈশ্বরানুরক্তি—ঈশ্বরের নাম-গুণ-গান, তাঁর ভজনেই এটি সম্ভব। এই কথামৃত শ্রোত্রমনোভিরাম—শ্রবণ ও মনের তৃপ্তিদায়ক, কুশলকারী। 'উত্তমঃ'—যাঁর থেকে সব তমঃ বিদূরিত হয়েছে, তিনিই 'উত্তমঃ'। তিনি কে? তিনি ভগবান। সেই ভগবানের গুণানুকীর্তন—যা ঐ নিবৃত্ততৃষ্ণ ঋষিরা করে থাকেন—তা থেকে কে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারে? কেউ না। তবে হ্যাঁ। নরাধম কেউ কেউ ভগবানের গুণ-মহিমা-ভজন-বন্দনাদিতে আনন্দ পায় না। তারা কারা? তারা পশুহননকারী—কসাইয়ের মতো কঠোরহৃদয়।

এই হ'ল কথামৃতের মহিমা।

(উর্ষ্টরের সঙ্গীতোৎসবে।)

সেপ্টেম্বরের শেষে স্বামীজি মাসাচুসেট্‌সস্থ উর্ষ্টরের একটি সঙ্গীতোৎসবে গমন করেন। এখানে ইউরোপ আমেরিকার কতকগুলি বিখ্যাত কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতবেত্তা সমবেত হন। তারপর ১লা অক্টোবরে নিউইয়র্কে আসিয়া আবার বেদান্তসভার নিয়মিত কার্য্য আরম্ভ করিলেন; এই সহরে ইঁহার তৃতীয় বর্ষ পদার্পণ হইল। এইরূপ প্রায় ২০০০ মাইলের উপর ভ্রমণ করিয়া স্বামীজির সহিত অনেক শিক্ষিত মার্জ্জিতমনা, বিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ ধার্ম্মিক লোকের সাক্ষাৎ হয়—যাঁহাদের সহিত অন্য কোনরূপে সাক্ষাতের সম্ভাবনা ছিল না। স্বামীজি এই ছয়মাস নিয়মিতরূপে প্রচারকার্য্যে নিবৃত্ত ছিলেন না; অনেকে মনে করিতে পারেন, এই সময় অধ্যয়ন বিশ্রামাদির জন্য তিনি সময় পাইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার যে কার্য্যবিবরণ প্রদত্ত হইল, তাহাতেই বুঝা যাইবে, আমেরিকায় বেদান্তপ্রচারের সময় উপস্থিত কি না। বন্ধুগণ স্বামী অভেদানন্দের সর্ব্বদা মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন, তাঁহাতেও দিন দিন অধিকতর শক্তির বিকাশ হইতেছে। যেখানেই তিনি থাকুন, যেখানেই তিনি কার্য্য করুন, তাঁহার কার্য্যে ঈশ্বর সর্ব্বদাই আশীর্ব্বাদ করিবেন।

সমালোচনা।

আর্য্যপ্রতিভা।—কালীবর বেদান্তবাগীশ-প্রণীত। ১২৭ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট হইতে শ্রীহীরালাল ঢোল কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মূল্য ছয় আনা।

বিজ্ঞান জন্মগ্রহণ করিয়া এ জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। বিজ্ঞান যখন অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণবলে বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিতে থাকেন, তখন কতকগুলি লোকে প্রাচীন দেশপ্রচলিত শাস্ত্রের তথ্যসকলের উপর একবারে অবিশ্বাসী হয়। আর একদল লোকে বলে, প্রাচীনেরা সমুদয় বিজ্ঞান তত্ত্ব জানিতেন; আমরা তাঁহাদের শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝি না বলিয়াই আমরা বুঝিতে পারি না—তাঁহারা বিজ্ঞানে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইহা হইতেই প্রাচীন শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সৃষ্টি। কেহ কেহ আবার আর একটু সাহসী হইয়া বলেন, আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তই যে অভ্রান্ত, তাহারই বা প্রমাণ কি? আমরা যে কয়েকটি কারণের উল্লেখ করিলাম, সেই কার্যকারণেই আর্য্যপ্রতিভার জন্ম। কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়, এই পুস্তকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন—আর্য্যেরা পৃথিবী, সলিল, ব্যোম, চন্দ্রমণ্ডল ও সূর্য্যমণ্ডল সম্বন্ধে কি জানিতেন। বিষয়টি অতি জটিল, তবে বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মত উপযুক্ত ব্যক্তি এবিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ সুখী।

বেদান্তবাগীশ মহাশয়, আমাদের বেদ পুরাণ ও জ্যোতিষে বর্ণিত বাহ্য জগতের তত্ত্বের কতকগুলি আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত মিলাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। স্থানে স্থানে তাঁহাকে রূপক ব্যাখ্যার সাহায্য লইতে হইয়াছে, আবার কোন কোন পৌরাণিক বিষয় একেবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। কোন কোন স্থলে আবার আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। স্থলে স্থলে আমাদের ঋষিদিগের বহুদিনের আবিষ্কৃত

সিদ্ধান্তের সহিত আধুনিক বিজ্ঞান-সিদ্ধান্তের মিল দেখিয়া বাস্তবিকই আশ্চর্য হইতে হয়।

আমরা সত্যের অন্বেষী হইতে ইচ্ছা করি। যদি বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবিক যুক্তি ও সত্যের উপর স্থাপিত হয়, তবে আমরা তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য। তবে যাঁহারা কেবল সাহেবে বলিতেছেন, অতএব সত্য, এই যুক্তির পক্ষপাতী, তাঁহাদের মস্তিষ্কের সবিশেষ উন্নতি হয় নাই বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। পক্ষান্তরে আর্য্যঋষিগণ সবই জানিতেন, অতএব তাঁহারা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত মিলিবেই, না মিলে ত কোন না কোনরূপ ব্যাখ্যার সাহায্য অবলম্বন করিয়া মিলাইতেই হইবে, এও আমাদের ভাল লাগে না। সত্য বলিতে হইবে, নির্ভীক হইতে হইবে। 'দোষা বাচ্যা গুরোরপি'। মোট কথা, স্বাধীন চিন্তা অবলম্বন করিয়া দেখিতে হইবে। যিনি যে সত্য পাইয়াছেন, তাঁহার নিকটই সেই সত্য অবলম্বন করিতে হইবে, তা আমাদের আর্য্য-পিতৃগণই হউন আর আধুনিক বিজ্ঞানবিৎই হউন।

আমরা বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের আলোচনাপ্রণালীর প্রশংসা করি।

ভগবদ্গীতা-শঙ্করভাষ্যানুবাদ।

(পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত।)

[গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬৩তম শ্লোকের ভাষ্যানুবাদ ; ৬৪ হইতে ৬৯ সংখ্যক শ্লোক, অন্বয়, মূলের অনুবাদ, ভাষ্য ও ভাষ্যের অনুবাদ এবং ৭০তম শ্লোক অন্বয় ও অনুবাদসহ —বর্ত্তমান সম্পাদক]

উদ্বোধন।

২য় বর্ষ।] ১লা চৈত্র। (১৩০৬ সাল) [৫ম সংখ্যা।]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।*

(শ্রীম – কথিত।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[শ্রীশ্রীভগবান্‌রামকৃষ্ণের ভক্তগৃহে আগমন ; ও তাঁহার সহিত শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র, গিরিশ ঘোষ, বলরাম, চুনীলাল, লাটু, নারায়ণ, ইত্যাদি ভক্তের কথোপকথন ; ভক্তগৃহে ভক্তসঙ্গে আনন্দ।]

ফাল্গুন কৃষ্ণাদশমী তিথি, পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র। ২৯এ ফাল্গুন বুধবার, ইংরাজী ১১ই মার্চ্চ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ।

* মতামতের জন্ত লেখক মহাশয় সম্পূর্ণ দায়ী।

আজ ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভক্তগৃহে বসু-বলরামের মন্দিরে। আন্দাজ বেলা ১০ টার সময় দক্ষিণেশ্বর হইতে আসিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথের প্রসাদ পাইয়াছেন। সঙ্গে লাটু আদি ভক্ত।

ধন্য বলরাম! তোমারই আলয় রাজধানীমধ্যে আজ ঠাকুরের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র হইয়াছে। কত নূতন নূতন ভক্তকে ঠাকুর আকর্ষণ করিয়া প্রেমডোরে বাঁধিলেন; ভক্ত সঙ্গে কত নাচিলেন, গাইলেন; যেন আবার শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবাসমন্দিরে প্রেমের হাট বসাচ্ছেন।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে বসে বসে কাঁদেন; নিজের অন্তরঙ্গ দেখিবেন বলে ব্যাকুল; রাত্রে ঘুম নাই। মাকে বলেন, 'মা, ওর বড় ভক্তি, ওকে টেনে নাও; মা ওকে এখানে এনে দাও; যদি না আসিতে পারে, তা হলে মা আমায় সেখানে নিয়ে যাও, আমি দেখে আসি।' তাই বলরামের বাড়ী ছুটে ছুটে আসেন। লোকের কাছে কেবল বলেন, বলরামের ৺জগন্নাথের সেবা আছে, খুব শুদ্ধ অন্ন। যখন আসেন, অমনি নিমন্ত্রণ করিতে বলরামকে পাঠান; বলেন "যাও, নরেন্দ্রকে†, ভবনাথকে, রাখালকে নিমন্ত্রণ করে এসো; পূর্ণ, ছোট নরেন, নারাণ এইসব ভক্তকে নিমন্ত্রণ করে এসো। এদের খাওয়ালে নারায়ণকে খাওয়ান হয়। এরা সামান্য নয়, এরা ঈশ্বরাংশে জন্মেছে, এদের খাওয়ালে তোমার খুব ভালো হবে।" বলরামের আলয়েই শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষের সঙ্গে প্রথম ব'সে আলাপ। এইখানেই রথের সময় কীর্ত্তনানন্দ, এইখানেই কতবার প্রেমের দরবারে আনন্দের মেলা হইয়াছে।

('পশ্যতি তব পন্থানং')

মাষ্টার নিকটে একটি বিদ্যালয়ে পড়ান্। শুনিয়াছেন, আজ দশটার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের বাটীতে আসিবেন। মাঝে অধ্যাপনার অবসর কিঞ্চিৎ পাইয়া বেলা দু প্রহরের সময় ঐখানে আসিয়া উপস্থিত। আসিয়া দর্শন ও প্রণাম করিলেন। ঠাকুর আহারান্তে বৈঠকখানায় সেই ঘরে একটু বিশ্রাম করিতেছেন। মাঝে মাঝে থলী থেকে কিছু মস্‌লা বা কাবাবচিনি খাচ্চেন। অল্পবয়স্ক ভক্তেরা চারিদিকে ঘেরিয়া বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সস্নেহে) তুমি এখন এলে! স্কুল নাই?

মাষ্টার। স্কুল থেকে আস্‌ছি, এখন সেখানে বিশেষ কাজ নাই।

একজন ভক্ত। না মহাশয়, উনি স্কুল পালিয়ে এসেছেন (সকলের হাস্য)।

মাষ্টার। (স্বগতঃ) হায়, কে যেন টেনে আন্‌লে।

ঠাকুর একটু চিন্তিত হইলেন।

পরে মাষ্টারকে কাছে বসাইয়া কত কথা কহিতে লাগিলেন। আরও বলিলেন আমার গামছাটা নিঙড়ে দাও তো গা। আর জামাটা শুকোতে দাও, আর আমার পা'টা একটু কামড়াচ্ছে, একটু হাত বুলিয়ে দিতে পার? মাষ্টার সেবা করিতে জানেন না, তাই ঠাকুর তাঁকে সেবা করিতে শিখাইতেছেন। মাষ্টার শশব্যস্ত হইয়া একে একে ঐ কাযগুলি করিতে লাগিলেন। তিনি পায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন ও শ্রীরামকৃষ্ণ কথাচ্ছলে কত উপদেশ দিতে লাগিলেন।

† নরেন্দ্র,—স্বামী বিবেকানন্দ।

(শ্রীরামকৃষ্ণ ও ঐশ্বর্য্যত্যাগের পরাকাষ্ঠা)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মাষ্টারের প্রতি) হ্যাঁগা, এটা আমার কদিন ধরে হচ্ছে কেন বল দেখি: ধাতুর কোন জিনিসে হাত দেবার যো নাই; একবার একটা বাটিতে হাত দিছলুম, তাহাতে সিঙী মাছের কাঁটা ফোটার মত হলো। হাত ঝন্ ঝন্ কন্ কন্ করতে লাগ্‌ল। গাড়ু না ছুঁলে নয়, তাই মনে করলুম, গামছাখানা ঢাকা দিয়ে দেখি, তুল্‌তে পারি কিনা। যাই হাত দিয়েছি অমনি হাতটা ঝন্ ঝন্ কন্ কন্ করে খুব বেদনা। শেষে মাকে প্রার্থনা কর্‌লুম, মা আর এমন কর্ম্ম কর্‌বো না, মা এবার মাফ্ করো।

[শুদ্ধ (pure) কে ?]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মাষ্টারের প্রতি) হ্যাঁগা, ছোট নরেন যাওয়া আসা করে বাড়ীতে কি কিছু ব'ল্‌বে ? কিন্তু খুব শুদ্ধ, মেয়ে সঙ্গ কখনও হয় নাই।

মাষ্টার। আর খোল্‌টা বড়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, আবার বলে যে, ঈশ্বরীয় কথা একবার শুন্‌লে আমার মনে থাকে। বলে, ছেলে বেলায় আমি কাঁদতুম, ঈশ্বর দেখা দিচ্ছেন না বোলে।

মাষ্টারের সঙ্গে ছোট নরেন সম্বন্ধে এইরূপ অনেক কথা হইল। এমন সময় উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিলেন, মাষ্টার মহাশয়, স্কুলে যাবেন না ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কটা বেজেছে ?

একজন ভক্ত। একটা বাজ্‌তে দশ মিনিট।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মাষ্টারের প্রতি) তুমি এস, তোমার দেরী হ'চ্ছে। একে কাজ ফেলে এসেছ। [লাটুর প্রতি] রাখাল কোথায় ?

লাটু। চলে গেছে—বাড়ী।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমার সঙ্গে দেখা না ক'রে ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(অপরাহ্নে—ভক্তসঙ্গে।)

স্কুলে ছুটীর পর মাষ্টার আসিয়া দেখিলেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলরামের বৈঠকখানায় ভক্তের মজ্‌লিশ করিয়া বসিয়া আছেন। ঠাকুরের মুখে মধুর হাসি—সেই হাসি ভক্তদের মুখে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। মাষ্টারকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া ও তিনি প্রণাম করিলে পর ঠাকুর তাঁহাকে তাঁহার কাছে আসিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ, সুরেশ মিত্র, বলরাম, লাটু, চুনীবাবু ইত্যাদি ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (গিরিশের প্রতি) তুমি একবার নরেন্দ্রের সঙ্গে বিচার ক'রে দেখো, সে কি বলে।

(অবতারবাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ ।)

গিরিশ। নরেন্দ্র বলে, ঈশ্বর অনন্ত, যা কিছু আমরা দেখি শুনি, এ জিনিসটী, কি এই ব্যক্তিটী—তাঁর অংশ এপর্য্যন্ত আমাদের বলবার যো নাই। Infinity এক, তার আবার অংশ কি ? অংশ হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বর অনন্ত হউন আর যত বড়ই হউন—তিনি ইচ্ছা কর্‌লে তাঁর ভিতরের সার বস্তু যে মানুষ, সেই মানুষের ভিতর দিয়ে আস্‌তে পারেন ও আসেন।

তিনি অবতার হন—ইহা উপমা দিয়ে বুঝান যায় না ; অনুভব হওয়া চাই। প্রত্যক্ষ হওয়া চাই। উপমার দ্বারা কতকটা আভাস পাওয়া যায়। দেখ, গরুর মধ্যে শিংটা যদি ছোঁয়, গরুকেই ছোঁয়া হলো, পাটা বা ল্যাজটা ছুঁলেও গরুটাকে ছোঁয়া হলো। কিন্তু আমাদের পক্ষে গরুর ভিতরের সার পদার্থ হচ্ছে দুধ। সেই দুধ বাঁট দিয়ে আসে। সেইরূপ ঈশ্বর, প্রেমভক্তি শিখাবার জন্য, মানুষদেহ ধারণ করে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন।

গিরিশ। নরেন্দ্র বলে, তাঁর কি সব ধারণা করা যায় ? তিনি অনন্ত—

(Perception of the Infinite*)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (গিরিশের প্রতি) ঈশ্বরের সব ধারণা কে কর্‌তে পারে ? তা তাঁর বড় ভাবটাও পারে না আবার ছোট ভাবটাও পারে না। আর, সব ধারণা করা কি দরকার ? তাঁকে প্রত্যক্ষ কর্‌তে পার্‌লেই হলো। তাঁর অবতারকে দেখ্‌লেই তাঁকে দেখা হলো।

"গঙ্গাজল যদি কেউ গঙ্গার কাছে গিয়ে স্পর্শ করে, সে বলে, গঙ্গা দর্শন স্পর্শন করে এলুম। সব গঙ্গাটা হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত হাত দিয়ে ছুঁতে হয় না।

[সকলের হাস্য]।

"তোমার পা'টা যদি ছুঁই, তা' হলে তোমায় ছোঁয়াই হলো।

"যদি সাগরের কাছে গিয়ে একটু জলস্পর্শ করো, তা'হলে সাগর স্পর্শ করাই হলো।

"অগ্নিতত্ত্ব সব যায়গায় আছে, তবে কাঠে বেশী—

গিরিশ। [হাসিতে হাসিতে] যেখানে আগুন পাবো, সেই খানেই আমার দরকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ। [হাসিতে হাসিতে] অগ্নিতত্ত্ব কাঠে বেশী। ঈশ্বরতত্ত্ব যদি খোঁজ, মানুষে খুঁজবে, মানুষে তিনি বেশী প্রকাশ। যে মানুষে দেখবে উর্জ্জিতাভক্তি, প্রেমভক্তি উথ্‌লে পড়্‌ছে—ঈশ্বরের জন্য পাগল—তাঁর প্রেমে মাতোয়ারা, সেই মানুষে নিশ্চিত জেনো, তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন।

[মাষ্টার দৃষ্টে] তিনি আছেনই তো, তবে তাঁর শক্তি কোথাও বেশী প্রকাশ

* Compare discussion about the order of perceptions of the Infinite and the finite in Max Muller's Hibbert Lectures and Gifford Lectures.

(শ্রাবণ, ১৩০৫, পৃঃ ৩০৫)

কোথাও বা কম প্রকাশ। অবতারের ভিতর তাঁর শক্তি বেশী প্রকাশ ; কখন কখন পূর্ণভাবে থাকে। শক্তিরই অবতার।

(ঈশ্বর কি—মনের গোচর ?)

গিরিশ। নরেন্দ্র বলে, তিনি 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্‌'।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, এ মনের গোচর নয়—কিন্তু শুদ্ধ মনের শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর। কামিনী-কাঞ্চন হ'তে আসক্তি গেলেই—শুদ্ধমন আর শুদ্ধবুদ্ধি। তখন তিনি শুদ্ধমন-শুদ্ধ-বুদ্ধির গোচর। ঋষি মুনিরা কি তাঁকে দেখেন নাই ? তাঁরা চৈতন্যের দ্বারা চৈতন্যের সাক্ষাৎ করেছিলেন।

গিরিশ। [হাসিতে হাসিতে] নরেন্দ্র আমার কাছে তর্কে হেরেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, আমায় বলেছে "গিরিশ ঘোষের—মানুষকে অবতার ব'লে অত বিশ্বাস, এখন আমি কি বল্‌বো ? অমন বিশ্বাসের উপর কিছু বল্‌তে নাই"।

* * * *

গিরিশ। [হাসিতে হাসিতে] মহাশয়, আমরা সব হল্‌ হল্‌ করে কথা কচ্চি, কিন্তু মাষ্টার ঠোঁট চেপে বসে আছে। কি ভাবে ? মহাশয়, কি বলুন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। [হাসিতে হাসিতে]—

"মুখ হল্‌সা ভেতরবুদে কানতুল্‌সে দীঘলঘোমটা নারী।
পানা-পুকুরের শীতল জল বড় মন্দকারী॥" [সকলের হাস্য]

—ইনি তা নন, ইনি গম্ভীরাত্মা। [সকলের হাস্য]

গিরিশ। মহাশয়, শোলোকটী কি বল্লেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। এই কটী লোকের কাছে সাবধান হবে :—১ম, মুখ হল্‌সা ; তার পর, ভেতরবুদে (মনের ভিতর ডুবুরি নামালেও অন্ত পাবে না) ; তার পর, কানতুল্‌সে (কানে তুলসি দেয়, ভক্তি জানাবার জন্য) ; দীঘলঘোমটা নারী (লম্বা ঘোমটা, লোকে মনে করে ভারি সতী, তা' নয়) ; আর পানা পুকুরের ঠাণ্ডা জল—নাইলে সান্নিপাতিক হয় ; [হাস্য]।

চুনীবাবু। এঁর (মাষ্টারের) নামে কথা উঠেছে। ছোট নরেন ওঁর পোড়ো, বাবুরাম ওঁর পোড়ো ; নারাণ, পল্টু, পূর্ণ, তেজচন্দ্র এরা সব ওঁর পোড়ো। কথা উঠেছে যে, উনি তাদের এই খানে আনেন, আর তাদের পড়াশুনা সব খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এঁর নামে দোষ দিচ্চে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাদের কথা কে বিশ্বাস করবে ?

এই সকল কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় নারাণ আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিল। নারাণ গৌরবর্ণ, ১৭।১৮ বছর বয়স, স্কুলে পড়ে, ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাকে বড় ভালবাসেন, তাকে দেখ্‌বার জন্য, তাকে খাওয়াবার জন্য ব্যাকুল, তার জন্য দক্ষিণেশ্বরে বসে বসে কাঁদেন। নারাণকে তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখেন।

(৮০তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ৩৮৬ পৃঃ)

গিরিশ। (নারাণ দৃষ্টে) কে খপর দিলে ? মাষ্টারই দেখ্‌ছি সব সার্‌লে !

শ্রীরামকৃষ্ণ। [হাসিতে হাসিতে] রোসো ! চুপ্‌ চাপ্‌ করে থাকো ! ঐ এঁর (মাষ্টারের) নামে বদ্‌নাম উঠেছে।

(অন্নচিন্তা।)

নরেন্দ্রর কথা আবার পড়িল।

একজন ভক্ত। এখন তত আসেন না কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। অন্নচিন্তা চমৎকারা, কালিদাস হয় বুদ্ধিহারা। [সকলের হাস্য]

বলরাম। শিবু গুহোর বাড়ীর ছেলে অন্নদা গুহোর কাছে খুব আনা গোনা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, একজন আফিসওয়ালার বাটীতে নরেন্দ্র, অন্নদা এরা সব যায়। সেখানে তারা ব্রাহ্মসমাজ করে।

একজন ভক্ত। আফিসওয়ালার নাম তারাপদ।

(প্রতিগ্রহ ও মতামত।)

বলরাম। [হাসিতে হাসিতে] মহাশয়, বামুনরা বলে, অন্নদা গুহ লোকটার বড় অহঙ্কার।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বামুনদের ও সব কথা শুনো না। তাদের তো জানো, না দিলেই খারাপ লোক, দিলেই ভাল ! [হাস্য]। অন্নদাকে আমি জানি—ভাল লোক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(ভক্তসঙ্গে—ভজনানন্দে।)

এই সময়ে ঠাকুর গান শুনিবেন ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বলরামের বৈঠকখানায় এক ঘর লোক। সকলেই তাঁহার পানে চাহিয়া রহিয়াছেন, কি বলেন শুনিবেন, কি করেন দেখিবেন।

তারাপদ গান গাইলেন—

কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জকাননচারী।
মাধব মনোমোহন মোহনমুরলীধারী॥
[হরিবোল হরিবোল হরিবোল মন আমার।]
ব্রজকিশোর কালীয়হর কাতরভয়ভঞ্জন
নয়ন বাঁকা বাঁকা শিখিপাখা, রাধিকাহৃদিরঞ্জন।
গোবর্দ্ধনধারণ ; বনকুসুমভূষণ,
দামোদর কংসদর্পহারী, শ্যাম রাসরসবিহারী॥
[হরিবোল হরিবোল হরিবোল মন আমার]।

শ্রীরামকৃষ্ণ [গিরিশের প্রতি]। আহা বেশ গানটী ! তুমিই কি সব গান বেঁধেছ ?

একজন ভক্ত। হাঁ, উনিই চৈতন্যলীলার সব গান বেঁধেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (গিরিশের প্রতি)। এ গানটি খুব উতরেছে !

শ্রীরামকৃষ্ণ। (গায়কের প্রতি)। নিতাইয়ের গান গাইতে পার ?

আবার গান হইল। (নিতাই গেয়েছিলেন)—

কিশোরীর প্রেম নিবি আয়,
প্রেমের জুয়ার বয়ে যায়।
বহিছে রে প্রেম শত ধারে, যে যত চায় তত পায়॥
প্রেমের কিশোরী, প্রেম বিলায় সাধ করি,
রাধার প্রেমে বল'রে হরি।
প্রেমে প্রাণ মত্ত করে, প্রেমতরঙ্গে প্রাণ নাচায়,
রাধার প্রেমে হরি বলি আয় আয় আয় আয়॥

শ্রীগৌরাঙ্গের গান হইল—

কার ভাবে গৌর বেশে জুড়ালে হে প্রাণ।
প্রেমসাগরে উঠলো তুফান, থাক্‌বে না আর কুলমান।
(মন মজালে গৌর হে)
ব্রজমাঝে রাখাল সাজে চরালে গোধন
ধর্‌লে করে মোহন বাঁশী, মজলো গোপীর মন।
ধরে গোবর্দ্ধন রাখ্‌লে বৃন্দাবন
ভেসে গেল চাঁদ বয়ান।
[মন মজালে গৌর হে]।

সকলে মাষ্টারকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তুমি একটী গান গাও; মাষ্টার লাজুক; ফিস্ ফিস্ করে মাফ্ চাহিতে লাগিলেন।

গিরিশ। [ঠাকুরের প্রতি] মহাশয়, মাষ্টার কোন মতে গান গাইলে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ও স্কুলে দাঁত বার কর্‌বে, যত গান গাইতেই লজ্জা !

মাষ্টার মুখ্‌টী চুন করে খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন।

শ্রীযুক্ত সুরেশ মিত্র একটু দূরে বসেছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁহার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষকে দেখাইয়া সহাস্য বদনে কথা বলিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি তো কি, ইনি (গিরিশ) তোমার চেয়ে !

সুরেশ [হাসিতে হাসিতে]। আজ্ঞা হাঁ, আমার বড় দাদা। [সকলের হাস্য]

(শাস্ত্র, পাণ্ডিত্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ)

গিরিশ [ঠাকুরের প্রতি]। আচ্ছা মহাশয়, আমি ছেলেবেলায় কিছু লেখা পড়া করি নাই, তবু লোকে বলে বিদ্বান—

শ্রীরামকৃষ্ণ। মহিম চক্রবর্ত্তী অনেক শাস্ত্র টাস্ত্র দেখেছে শুনেছে, খুব আধার ! [মাষ্টারের প্রতি] কেমন গা ?

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ — স্বামী সারদানন্দ। দুই ভাগ, রেক্সিন-বাঁধাই: মূল্য ১ম ভাগ ১৯·০০। ২য় ভাগ ১৭·০০

সাধারণ ১ম খণ্ড ৩·৫০; ২য় খণ্ড ৭·৮০; ৩য় খণ্ড ৫·২০; ৪র্থ খণ্ড ৭·০০; ৫ম খণ্ড ৭·৫০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন। সুললিত কবিতায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী। মূল্য ২৬·০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ-সংকলিত। মূল্য ১·৬০; কাপড়ে বাঁধাই ১·৮০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা— শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন। মূল্য ৩·৫০

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। মূল্য ২·৫০

শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ—স্বামী নির্বেদানন্দ (অনুবাদ: স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। পৃঃ ২৯৬, সাধারণ ৬·০০; হাফ-রেক্সিন। বোর্ড বাঁধাই, শোভন ৭·০০

শ্রীরামকৃষ্ণজীবনী—স্বামী তেজসানন্দ। পৃঃ ২০৮, মূল্য ৫·০০

শিশুদের রামকৃষ্ণ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৪০, মূল্য ৩·০০

শ্রীশ্রীমা-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীমায়ের কথা—শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সন্তানগণের ডায়েরী হইতে। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। মূল্য ১ম ভাগ ৭·০০, ২য় ভাগ ১০·০০

মাতৃ-সান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ। পৃঃ ২৫৬, মূল্য ৬·০০

শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীশ্রীমায়ের বিস্তারিত জীবনীগ্রন্থ। পৃঃ ৬৪২, মূল্য ১৭·০০

শিশুদের মা সারদাদেবী (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৪০, মূল্য ৩·০০

স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয়

যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত স্বামীজীর প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। তিন খণ্ডে প্রকাশিত। মূল্য ১ম খণ্ড ১৬·০০; ২য় খণ্ড যন্ত্রস্থ; ৩য় খণ্ড ৮·০০

স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীপ্রমথনাথ বসু। ১ম ভাগ (ছাপা নাই), ২য় ভাগ—মূল্য ৪·২৫

স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১০৬, মূল্য ২·৫০

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—(দুই খণ্ড একত্রে)। শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। স্বামীজীর সহিত লেখকের কথোপকথন। পৃঃ ২৫৮, মূল্য ৭·০০

স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতা। (অনুবাদ: স্বামী মাধবানন্দ)। মূল্য ৮·০০

স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে—ভগিনী নিবেদিতা (বঙ্গানুবাদ)। পৃঃ ১২৪, মূল্য ১·২৫

শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। ৩য় সং, মূল্য ২·৫০

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

অন্যান্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা — স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য ১৩'০০, ২য় ভাগ পৃঃ ৫২৪, মূল্য ৮'০০

ভারতে শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ। মূল্য ৩'০০

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৯১, মূল্য ৫'০০

স্বামী অখণ্ডানন্দ— স্বামী অন্নদানন্দ। পৃঃ ৩১০, মূল্য ৪'০০

গোপালের মা — স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৪৪, মূল্য ১'৫০

আচার্য শঙ্কর—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৪৬, মূল্য ৬'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র—মূল্য ৭'৮০

শিবানন্দ-বাণী— স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত। ২য় ভাগ ২'৫০

স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ। মূল্য ৪'০০

দিব্যপ্রসঙ্গে — স্বামী দিব্যাত্মানন্দ। (যন্ত্রস্থ)

স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী— (ছাপা নাই)

আরতি-স্তব—মূল্য ০'৭০

পুণ্যস্মৃতি—স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ। পৃঃ ১১৬, মূল্য ৩'০০

মহাভারতের গল্প—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, সাধারণ ২'৫০, বোর্ড বাধাই ৩'০০ ৬ষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য সংক্ষেপিত "স্কুলপাঠ্য" সংস্করণ—পৃঃ ৭২, মূল্য ২'০০

শঙ্কর-চরিত — শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। ৭ম সংস্করণ মূল্য ২'৫০

দশাবতার-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য পৃঃ ১০৮, মূল্য ২'৫০

সাধক রামপ্রসাদ—স্বামী বামদেবানন্দ। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৫'২০

সাধু নাগমহাশয়—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। পৃঃ ১৪৪, মূল্য ৩'৫০

ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী তেজসানন্দ। পৃঃ ১২৪, মূল্য ১'৫০

শিব ও বুদ্ধ—ভগিনী নিবেদিতা। পৃঃ ৬৩, মূল্য ০'৬৫

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ— পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৫'০০

পত্রমালা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২, মূল্য ৪'০০

গীতাতত্ত্ব—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৭৬, মূল্য ৫'০০

লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৪২০, মূল্য ১০'০০

পরমার্থ-প্রসঙ্গ— স্বামী বিরজানন্দ। পৃঃ ১৩৭, মূল্য ৪'০০

ভগবানলাভের পথ—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। মূল্য ১'০০

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী — স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৩২, মূল্য ০'৬০

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-সঞ্চয়ন— পৃঃ ৩১৬, মূল্য ৭'০০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

বেদান্তের আলোকে খৃষ্টের শৈলোপদেশ—স্বামী প্রভবানন্দ। মূল্য সাধারণ ৪'০০

অতীতের স্মৃতি—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। পৃঃ ৪৬৪, মূল্য ১০'০০

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ১৪২, মূল্য ৩'৩০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। পাচশতাধিক সঙ্গীত। মূল্য ৬'০০

ঠাকুরের নরেন, নরেনের ঠাকুর—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ২৯, মূল্য ১'২০

সংস্কৃত

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত

১ম ভাগ পৃঃ ৪৫৪, মূল্য ১১'০০
২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ১১'০০
৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মূল্য ১১'০০

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত, স্বামী জগদানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪১৫, মূল্য ৭'৮০

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৬'৪০

স্তবকুসুমাঞ্জলি—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪০৮, মূল্য ৭'০০

বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা—স্বামী ধীরেশানন্দ-সংকলিত। (ছাপা নাই)

বৈরাগ্যশতকম্—স্বামী ধীরেশানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ১'৫০

নারদীয় ভক্তিসূত্র—স্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ১৬৩, মূল্য সাধারণ ৫'০০, শোভন ৭'৫০

বেদান্তদর্শন—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য: ১ম অধ্যায় (চারখণ্ডে) ১৭'০০, ২য় অঃ ১৩'০০; ৩য় অঃ ১৩'০০; ৪র্থ অঃ ৯'০০

গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা—স্বামী রঘুবরানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য ১'৮০

শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজাপদ্ধতি—পৃঃ ৬৪, মূল্য ১'৫০

অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—সুরেশ দত্ত। মূল্য ৫'০০

পরমহংসদেব—স্বামী প্রেমেশানন্দ। পৃঃ ২৪, মূল্য ০'৭৫

জননী সারদাদেবী—স্বামী নির্বেদানন্দ। (অনুবাদক: স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। মূল্য ২'৮০

শ্রীশ্রীমা সারদা—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৯০, মূল্য ২'০০

গল্পে বেদান্ত—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, মূল্য সাধারণ ৩'০০, বোর্ড বাঁধাই ৩'৫০

বীরবাণী—স্বামী বিবেকানন্দ। পৃঃ ১১৪, মূল্য ২'০০ (যন্ত্রস্থ)

বিবেকানন্দের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। পৃঃ ১৫৪, মূল্য ৩'৫০

প্রাপ্তিস্থান: উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩

COVER PRINTED BY—

৮০।৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত।

সম্পাদক—স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ : সংযুক্ত সম্পাদক—স্বামী ধ্যানানন্দ

বার্ষিক মূল্য ১২·০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১·২০ টাকা

উদ্বোধন

উত্তিষ্ঠত
জাগ্রত
প্রাপ্য
বরান্‌
নিবোধত



উদ্বোধন, ভাদ্র, ১৩৮৫

সূচীপত্র

আমি কি আর উপদেশ দেব! ঠাকুরের কথা সব বইয়ে বেরিয়ে গেছে। তাঁর একটা কথা ধারণা করে যদি চলতে পার তো সব হয়ে যাবে।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

উদ্বোধনের মাধ্যমে
প্রচার হোক
এই বাণী। শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়



দিব্য বাণী

শ্রুত্বা স্পৃষ্ট্বা চ দৃষ্ট্বা চ ভুক্ত্বা ঘ্রাত্বা চ যো নরঃ।
ন হৃষ্যতি গ্লায়তি বা স বিজ্ঞেয়ো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
ইন্দ্রিয়াণাং তু সর্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ম্।
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকম্॥
বশে কৃত্বেন্দ্রিয়গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা।
সর্বান্ সংসাধয়েদর্থানক্ষিণ্বন্ যোগতস্তনুম্॥

—মনুসংহিতা, ২।৯৮-১০০

শ্রবণ দর্শন স্পর্শ ভোজন আঘ্রাণ
করিয়াও হর্ষ-গ্লানি-মুক্ত যে ধীমান্
নিশ্চয় জানিতে হবে তিনি জিতেন্দ্রিয়
(নির্বিকার তাঁর কাছে নাহি প্রিয়াপ্রিয়।)

মশকেতে ছিদ্র যদি একটিও রয়
সব জল ক্রমে ক্রমে বিনিঃসৃত হয়
সর্বেন্দ্রিয় মাঝে তথা একটিও হায়!
থাকে যদি অসংযত প্রজ্ঞা লোপ পায়।

ছাড়ো দেহ-উৎপীড়ন কৃচ্ছ্র-সাধনায়
(বৃথা কালক্ষেপ হয়—ও নয় উপায়।)
যোগযুক্ত হয়ে করি মন নিগৃহীত
বিজিত-ইন্দ্রিয় সাধো সর্ব-অভীপ্সিত।

কথাপ্রসঙ্গে

পার্থসারথির বাণী : 'তানি সর্বাণি সংযম্য'

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৪-সংখ্যক শ্লোকে অর্জুন স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ এবং তাঁহার আচার-ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত —এই বিষয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিয়াছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উত্তর আছে ৫৫ হইতে ৭২-সংখ্যক—মোট ১৮টি শ্লোকে। শ্রীভগবানের উত্তরটি বিশ্লেষণ করিলে আমরা পূর্ণজ্ঞানীর লক্ষণ, জ্ঞানসাধনায় প্রবৃত্ত সাধকের লক্ষণ, সাধনার স্বরূপ, সাধনায় অন্তরায় এবং সাধনার ফল—এই সমস্ত অবশ্য জ্ঞাতব্য গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাই।

অর্জুনের প্রশ্ন হইতে অবশ্য ইহা স্পষ্ট নহে যে, তিনি সিদ্ধের লক্ষণাদি জানিতে চাহিয়াছিলেন অথবা সাধকের। যদি বলা হয় যে, তিনি সিদ্ধেরই লক্ষণাদি জানিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা হইলে 'প্রভাষেত' 'আসীত' 'ব্রজেত' এই বিধিবোধক ক্রিয়াপদগুলির প্রয়োগ সঙ্গত হয় না। কারণ, সিদ্ধ ব্যক্তি যাবতীয় শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের বহির্ভূত। শুকাষ্টকে আছে, 'নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ।' তাৎপর্য এই যে, যিনি ত্রিগুণাতীত অর্থাৎ সিদ্ধ, তাঁহার পক্ষে কোনও বিধিনিষেধ নাই। ইহার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, তিনি অশাস্ত্রীয় কর্ম করিতে পারেন। অর্থ শুধু এই যে, তিনি যাহা কিছু করেন, তাহা সর্বদাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে শাস্ত্র-সম্মত হইয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায় তাঁহার কখনও 'বেতালে পা পড়ে না।' এইজন্যই তাঁহার সম্বন্ধে বলা চলে না—তাঁহার এইরূপ করা উচিত বা ঐরূপ করা অনুচিত।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই সকল দার্শনিক জটিলতার অবতারণা না করিয়া— 'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্' (২।৭) বলিয়া শরণাগত অর্জুনের যাহা একান্ত প্রয়োজন, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সিদ্ধের লক্ষণ এবং সাধকের লক্ষণ ও কর্তব্যাকর্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে উপদেশ দিলেন। বস্তুতঃ শিষ্যের প্রশ্নে যতই অস্পষ্টতা বা অন্যবিধ ত্রুটি থাকুক না কেন, জগতে চিরকালই প্রকৃত আচার্যগণ শিষ্যের যথার্থ কল্যাণের জন্যই তাহার যাহা অবশ্য জ্ঞাতব্য, সেই দিকে দৃষ্টি দিয়া উপদেশ করিয়া থাকেন।

স্থিতপ্রজ্ঞ-প্রকরণে কোন্ কোন্ শ্লোকে সাধকের লক্ষণাদি বিবৃত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। শ্রীধরস্বামী, মধুসূদন সরস্বতী প্রমুখ টীকাকারগণের মতে শ্রীকৃষ্ণের উত্তরের প্রথম চারিটি শ্লোকের (২।৫৫-৫৮) প্রত্যেকটিতেই সিদ্ধের লক্ষণাদি বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু শংকরাচার্য ভিন্ন মত পোষণ করেন। পক্ষান্তরে রামানুজ বলেন, উক্ত চারিটি শ্লোকেই সাধকের লক্ষণাদি বিবৃত হইয়াছে, সিদ্ধের নহে। সুতরাং বিষয়টি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে।

প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'প্রজহাতি যদা কামান্' ইত্যাদি (২।৫৫)। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মনোগত সমস্ত কামনা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন এবং নিজেই নিজের আত্মাতে পরিতৃপ্ত, তাঁহাকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়। এখানে শ্রীকৃষ্ণ যে সিদ্ধেরই লক্ষণ বলিতেছেন, ইহাতে

সন্দেহের অবকাশ নাই, কারণ উপনিষদেই বলা হইয়াছে, 'যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামাঃ যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥' অর্থাৎ হৃদয়ে আশ্রিত সমস্ত কামনা যখন সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়, তখনই মরণশীল মানুষ অমৃত (মুক্ত) হয়—এখানেই, এই শরীরেই ব্রহ্মকে লাভ করে। (স্বসংবেদ্য এই লক্ষণের দ্বারাই বুঝিতে হইবে যে, দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬৯ হইতে ৭১-সংখ্যক শ্লোকেও সিদ্ধেরই কথা বলা হইয়াছে, সাধকের নহে।)

'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ' ইত্যাদি শ্লোকটিতেও (২।৫৬) সিদ্ধেরই কথা বলা হইয়াছে, কারণ যিনি সম্পূর্ণরূপে বীতরাগ অর্থাৎ আসক্তিশূন্য, তিনি অবশ্যই সিদ্ধ। এই শ্লোকে যে বীতভয় ও বীতক্রোধের কথা বলা হইয়াছে, তাহার দ্বারা অবশ্য সিদ্ধত্ব নির্ণীত হয় না।

পরবর্তী শ্লোকটিতে (২।৫৭) সাধকের কথা বলা হইয়াছে। সিদ্ধের কথা বলা হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। কারণ, হর্ষবিষাদরহিত হইলেই যে একজন সিদ্ধ হইবেন, এমন কোন কথা নাই।

ফলতঃ যে ব্যক্তি বীতভয় বীতক্রোধ ও হর্ষবিষাদরহিত তিনি অবশ্যই সাধক, কিন্তু তিনি সিদ্ধ নাও হইতে পারেন। যিনি বালকবৎ অবনীতে বিচরণ করেন, সেই সিদ্ধের এই সকল বাহ্য লক্ষণ থাকে না। বস্তুতঃ সিদ্ধের কোন নিশ্চিত বাহ্য লক্ষণই নাই।

চতুর্থ শ্লোকটি ('যদা সংহরতে চায়ং…' ২।৫৮) যে সাধকেরই লক্ষণবাচক, ইহা শংকরাচার্যের সুস্পষ্ট অভিমত। এই শ্লোকের শেষ চরণটি হইতেছে, 'তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা'। লক্ষণীয় যে, যদিও সাধকের প্রজ্ঞাকে 'প্রতিষ্ঠিতা' বলা যায় না, তথাপি প্রযত্নশীল সাধক অচিরকালেই স্থিতপ্রজ্ঞ হইবেন, এই অর্থেই 'তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা' বলা হইয়াছে। গীতায় অন্যত্রও সাধকদেরও সিদ্ধ বলা হইয়াছে—'যততাম্ অপি সিদ্ধানাম্' (৭।৩)। সুতরাং কোনও শ্লোকের শেষে 'তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা'—কথাগুলি থাকিলেই যে সেখানে সিদ্ধ ব্যক্তির প্রসঙ্গ চলিতেছে, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই।

এই ভূমিকার পর আমরা আমাদের উদ্দিষ্ট শ্লোকটির (২।৬১) আলোচনায় আসিতেছি। সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই :

তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

—সেই সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া [সাধক] মৎপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিবেন ; ইন্দ্রিয়গুলি যাঁহার বশে থাকে, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত।

অব্যবহিত পূর্ববর্তী শ্লোকে (২।৬০) বলা হইয়াছে, ইন্দ্রিয়সমূহ এতই বিক্ষেপকারী যে, তাহারা যত্নশীল শাস্ত্রজ্ঞ সাধকেরও মন বলপূর্বক বিষয়াভিমুখী করে। আমাদের আলোচ্য শ্লোকে (২।৬১) 'তানি সর্বাণি' পদদ্বয় পূর্ববর্তী শ্লোক হইতে অনুবৃত্ত। অর্থাৎ পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লেখিত ও বিশেষিত ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিতে হইবে। 'সর্বাণি'—সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই। একটিকেও বাদ দিলে চলিবে না। কারণ, একটি ইন্দ্রিয়ও অসংযত থাকিলে প্রজ্ঞাপ্রতিষ্ঠ হওয়া অসম্ভব। (এই সংখ্যার 'দিব্য বাণী' দ্রষ্টব্য)। 'আসীত মৎপরঃ'—মৎপরায়ণ হইয়া থাকিবেন। 'মৎপরঃ' কথাটির ব্যাখ্যা শংকরাচার্য এইরূপ করিয়াছেন : "সকল জীবের অন্তরাত্মা আমি বাসুদেবই যাঁহার পরম, তিনিই 'মৎপর'।" এই ব্যাখ্যায় উপাস্য ও উপাসকের ভেদবুদ্ধি নিরসনের জন্য

শংকরাচার্য আরও বলিয়াছেন, সাধক ভাবিবেন যে, তিনি বাসুদেব' হইতে ভিন্ন নহেন; জ্ঞানমার্গে প্রবৃত্ত সাধক সংযতেন্দ্রিয় হইয়া এইরূপ অভেদভাবনা অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিবেন।

এখানেও একটি দার্শনিক প্রশ্ন উপস্থিত হয়। শংকরাচার্য যেভাবে 'মৎপরঃ আসীত' কথাটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে জীব-ব্রহ্মের অভেদদর্শনাত্মক ব্রহ্মজ্ঞানের কথাই বলা হইয়াছে—'অভেদদর্শনং জ্ঞানম্'। এবং 'আসীত' ক্রিয়াপদটি বিধিলিঙে থাকায় সম্পূর্ণ বাক্যটিকে বিধি-আত্মক-রূপেই গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু জ্ঞানে কোনও বিধি হইতে পারে না। যখন বলা হয় 'শালগ্রামটি দেখো', তখন যাহাকে উদ্দেশ করিয়া উহা বলা হইতেছে, তাহার দৃষ্টি মাত্র শালগ্রামের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়—শালগ্রামে শালগ্রাম-জ্ঞান করিতে বলা হয় না। কারণ শালগ্রামে শালগ্রাম-জ্ঞান করিতে বলা বাতুলতামাত্র। সুতরাং 'শালগ্রামটি দেখো'—এই বাক্যে কোনও বিধি বা নির্দেশ নাই। কিন্তু 'শালগ্রামে বিষ্ণুবুদ্ধি করো'—এই বাক্যটিতে বিধি বা নির্দেশ আছে। এই বিধি উপাসনাবিধি। উপাসনা ব্যক্তিতন্ত্র। অর্থাৎ উপাসনা করা-না-করা উপদিষ্ট ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে। পক্ষান্তরে জ্ঞান বস্তুতন্ত্র—উহা ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। শালগ্রামটির দিকে দৃষ্টি ফিরাইলে শালগ্রাম-জ্ঞান হইতে বাধ্য।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছিলেন—আত্মা দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য। এখানে দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য—এই চারিটি পদেই 'তব্য'-প্রত্যয় আছে। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে প্রত্যেকটি পদই বিধিবোধক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রোতব্য মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য—আত্মজ্ঞানের এই সাধনগুলিতেই বিধি। 'আত্মা দ্রষ্টব্য'—ইহাতে কোন বিধি নাই। শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন—এই সাধনগুলি আয়ত্ত হইলে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (আমিই ব্রহ্ম), এই বৃত্তির উদয়ে অজ্ঞান ধ্বংস হওয়ামাত্র আত্মা স্বয়ং প্রকাশিত হন। সুতরাং আত্মাতে আত্মার জ্ঞান করা কর্তব্য বলা বাতুলতামাত্র। অবিদ্যা—যাহার অপর নাম অজ্ঞান—অস্তমিত হইলেই মোক্ষস্বরূপ নিত্য অপরোক্ষ আত্মার পরোক্ষত্ব দূর হয়।

সুতরাং 'তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ'—এই শ্লোকার্ধের শাংকর-ব্যাখ্যায় বিধি সম্পূর্ণ বাক্যটিতে নহে। বিধি কেবলমাত্র 'তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্তঃ'—এই অংশে। অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সংযমে এবং চিত্তকে সমাহিত করিতেই বিধি—'মৎপরঃ'-এ বিধি হয় না। সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া 'আমিই বাসুদেব' অর্থাৎ 'অহং ব্রহ্মাস্মি', এই বৃত্তিতে যদি মন সমাধিস্থ হয়, তাহা হইলে আত্মার জ্ঞান স্বতঃস্ফূর্তভাবেই হইয়া থাকে।

আলোচ্য শ্লোকটির শেষার্ধের অর্থঃ ইন্দ্রিয়গ্রাম যাঁহার বশীভূত, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত।

শংকরাচার্যের মতে এই শ্লোকটিতে এবং স্থিতপ্রজ্ঞের কথা অন্য যে সকল শ্লোকে আছে, সবগুলিতেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাসীরই কথা বলিয়াছেন—গৃহস্থের নহে।

শংকরাচার্য যে ভাবে 'মৎপরঃ' শব্দটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে ভক্তগণ পরিতৃপ্ত হইবেন কিনা সন্দেহ। আচার্য রামানুজের ব্যাখ্যা তাঁহাদের নিকট উপাদেয় মনে হওয়া

স্বাভাবিক। রামানুজের মতে 'মৎপরঃ' শব্দটিতেও বিধি আছে, কারণ উহা উপাসনাত্মক—আত্মদর্শনাত্মক নহে। অতএব সেই ভক্তিমূলক ব্যাখ্যার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতে পারে।

আমাদের আলোচ্যমান শ্লোকের পূর্ববর্তী দুইটি শ্লোকে (২।৫৯, ৬০) শ্রীভগবান বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয়ভোগ হইতে নিবৃত্ত করিলেও বিষয়রস অর্থাৎ বিষয়-ভোগের প্রতি লালসা দূর হয় না; একমাত্র আত্মদর্শন হইলেই বিষয়রস নিবৃত্ত হয়। এইজন্যই বিক্ষেপকারী ইন্দ্রিয়সমূহ প্রযত্নশীল শাস্ত্রজ্ঞ সাধকেরও মন বলপূর্বক বিষয়াভিমুখী করে। সুতরাং ইন্দ্রিয়জয় আত্মদর্শনাধীন এবং আত্মদর্শনও ইন্দ্রিয়জয়াধীন। অর্থাৎ পরিস্থিতিটা এইরূপ: ইন্দ্রিয়জয় কি করিয়া করিব?—না, আত্মদর্শন করিয়া। আত্মদর্শন কি করিয়া করিব?—না, ইন্দ্রিয়জয় করিয়া। এই 'অন্যোন্যাশ্রয়দোষ' অর্থাৎ পরস্পর-সাপেক্ষতাদোষের ফলে আত্মদর্শনের উপায় কি বা ইন্দ্রিয়জয়েরই বা উপায় কি, তাহা নির্ণীত হয় না। রামানুজের মতে আমাদের আলোচ্যমান শ্লোকে 'মৎপরঃ' শব্দের দ্বারা শ্রীভগবান সেই উপায়েরই কথা বলিয়াছেন। উপায়টি হইতেছে এই: মনে তো সূক্ষ্মভাবে বিষয়রস থাকিবেই। উহা থাকা সত্ত্বেও সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে যথাসম্ভব সংযত করিয়া নিখিল-মঙ্গল-নিলয় শ্রীভগবানকেই পরমাশ্রয় জানিয়া মনকে তাঁহাতে সমাহিত করিয়া অবস্থান করিতে হইবে। ইহারই নাম 'মৎপর' হইয়া অবস্থান করা। মন এইভাবে শুভাশ্রয় শ্রীভগবানে স্থির হইলে উহার যাবতীয় মালিন্য দূরীভূত হয়। তখন সেই শুদ্ধ মন ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত করে। এইরূপ ইন্দ্রিয়-বিজয়ী মন আত্মসাক্ষাৎকারে সমর্থ হয়। রামানুজ এ বিষয়ে প্রমাণরূপে বিষ্ণুপুরাণ হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন:

যথাগ্নিরুদ্ধতশিখঃ কক্ষং দহতি সানিলঃ।
এবং চিত্তস্থিতো বিষ্ণুর্যোগিনাং সর্বকিল্বিষম্॥
(৬।৭।৭৩)

—যেমন উচ্চশিখাযুক্ত অগ্নি বায়ুসহায়ে শুষ্ক তৃণকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপ যোগিগণের চিত্তস্থিত বিষ্ণু সমস্ত পাপ ভস্মীভূত করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী মধুসূদন সরস্বতীও 'মৎপরঃ'-শব্দটিকে রামানুজেরই ন্যায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সর্বাত্মা বাসুদেব আমিই যাহার পর অর্থাৎ পরম অবলম্বন—সেই ব্যক্তি 'মৎপর'। সুতরাং মধুসূদনের মতে 'মৎপর' হইয়া অবস্থান করিবে—ইহার অর্থ হইল একান্ত ভক্ত হইবে। একটি রূপকের সাহায্যে মধুসূদন শ্লোকটির আশয় পরিস্ফুট করিয়াছেন। রূপকটি এই: প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতিকে আশ্রয় করিয়াই কোন ব্যক্তি দস্যুগণকে নিগৃহীত করিতে পারে। দস্যুগণও 'এই ব্যক্তি রাজার আশ্রিত' ইহা বুঝিতে পারিয়া আপনাআপনিই তাহার বশীভূত হইয়া থাকে। রূপকটিতে নৃপতি—ঈশ্বর; ব্যক্তি—সাধক; দস্যুগণ—ইন্দ্রিয়সমূহ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য নিরক্ষর লাটু মহারাজেরও অনুরূপ উক্তি আছে। উহা আরও হৃদয়গ্রাহী। লাটু মহারাজের অননু-করণীয় ভাষায় উহা উপস্থাপিত করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি: 'কুকুর দেউড়িতে লম্ফ ঝম্ফ করছে, ভয়ে কেউ গৃহস্থের কাছে যেতে পারছে না। বাকী যদি কেউ ভাবে যে, যেমন ক'রেই হোক বাড়ীর কর্তার সঙ্গে আলাপ করবো, তাহলে সে দূর থেকেই বাড়ীর কর্তাকে ডাকাডাকি লাগিয়ে দেয়।

সে ডাকাডাকিতে কর্তার চমক ভাঙে। তখন বাড়ীর কর্তাই কুকুরকে ধমক দিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে রাখে। লোকটা তখন তাড়াতাড়ি কর্তার কাছে যাবার সুবিধা পায়। কুকুরও তখন বুঝতে পারে যে, লোকটা কর্তার চেনা লোক। তাই ঘেউ ঘেউ ছেড়ে লোকটার পা চাটতে আসে। ঠিক তেমনি এ ব্যাপারেও [যথা-উচ্চারিত] (ধর্মরাজ্যেও) ঘটে থাকে। প্রাণের ব্যাকুলতা দেখলে জগৎকর্তাই দয়া ক'রে তাঁর কুকুরগুলিকে (ইন্দ্রিয়গুলিকে) চুপ করিয়ে রাখেন, তাই তো জীব কর্তার নাগাল পায়।'

দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়

ডক্টর রমা চৌধুরী

(নবম পর্যায়)

শ্রীপতির 'বিশেষাদ্বৈতবাদ'

[পূর্বানুবৃত্তি]

এরূপে আমরা দেখলাম যে, অন্যান্য একেশ্বরবাদী ও ত্রিতত্ত্ববাদী বৈদান্তিকের ন্যায় শ্রীপতির মতেও ব্রহ্ম সক্রিয়—এবং সৃষ্টিকর্তা ও মোক্ষদাতা। সৃষ্টির পূর্বে জীব-জগৎ ব্রহ্মের চিৎ- ও অচিৎ-শক্তিরূপে ব্রহ্মেই বিলীন হয়ে থাকে; সৃষ্টিকালে জীব ও স্থূল জগৎ প্রপঞ্চরূপে অভিব্যক্ত হয়, পরিণত হয়। সেজন্য জীব-জগৎও ব্রহ্মেরই ন্যায় নিত্য ও সত্য; এবং সৃষ্টি ব্রহ্মের অনভিব্যক্ত স্বরূপের অভিব্যক্তিই মাত্র। কিরূপে নির্বিকার ব্রহ্মের পরিণতি সম্ভবপর? এই মূলীভূত প্রশ্নের উত্তররূপে শ্রীপতিও 'উর্ণনাভ ও তন্তু'র উদাহরণের উল্লেখ করেছেন (মুণ্ডকোপনিষদ্ ১।১।৭)। উর্ণনাভ তন্তুতে পরিণত হলেও স্বয়ং অপরিবর্তিত থাকে—ব্রহ্মের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হচ্ছে। অবশ্য আমরা বলব যে, এই উদাহরণটি যথার্থ নয়—যেহেতু উর্ণনাভ ত আর সত্যই তন্তুতে পরিণত হয় না, যে অর্থে মৃৎপিণ্ড মৃন্ময় ঘটে 'পরিণত' হয়; এবং এই শেষোক্ত উদাহরণটিই প্রকৃত উদাহরণ ব্রহ্মেরও ক্ষেত্রে—যদিও পরিণত হয়েও অপরিণত কিরূপে থাকা যায়—সে প্রশ্ন বা সমস্যা ত থেকেই যায় অমীমাংসিত।

সে যা হোক, এই প্রসঙ্গে শ্রীপতি একটি নূতন উপমাও দিয়েছেন—

'কুসূল-ধান্যবৎ' (১।১।২)

—অর্থাৎ, একটি ধানের গোলায় অসংখ্য ধান সঞ্চিত থাকে আত্যন্তকাল; এবং তা সময়ে সময়ে উল্টিয়ে বাইরে ফেলে দেওয়া হয়। একইভাবে ব্রহ্মে শাশ্বতকাল অসংখ্য জীব বিলীন হয়ে থাকে; সৃষ্টিকালে তাদের কয়েকটি মাত্র বাইরে উল্টিয়ে ফেলা হয়, এবং অনভিব্যক্ত জীব-জগৎ অভিব্যক্ত হয়। অবশ্য এই উপমাটিও কোনো কাজের নয় এবং অনভিব্যক্তের অভিব্যক্তির দিক থেকে একেবারেই অচল, যেহেতু এস্থলে সেরূপ কিছুই ঘটছে না।

সে যা হোক, শ্রীপতিও অন্যান্য একেশ্বরবাদী ও ত্রিতত্ত্ববাদী বৈদান্তিকের ন্যায়ই ঈশ্বরের স্বরূপ-গুণ-শক্তি-কর্মাদির কথা

বলেছেন—যথা, ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি সর্বব্যাপী স্বতন্ত্র, জগল্লীন হয়েও জগদ্‌বহির্ভূত, জীব-জগতের অভিন্ন নিমিত্ত- ও উপাদান-কারণ, সর্বান্তর্যামী সর্বাত্মক সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরম-করুণাময় ভক্তবৎসল মোক্ষদাতা প্রভৃতি।

এস্থলে শ্রীপতির বৈশিষ্ট্য হ'ল, সাম্প্রদায়িক দিক থেকে বীর-শৈব-মতানুযায়ী 'ষট্‌স্থল'রূপে ব্রহ্মরূপী শিবকে প্রপঞ্চিত করা। বীরশৈব-মতে ব্রহ্মের অপর একটি নাম 'স্থল'—যেহেতু শিব জীব-জগতের সৃষ্টি-স্থিতি বা 'স্থ', এবং লয় অথবা 'ল'য়ের একমাত্র কারণ।

পুনরায় শিবই জীবের একমাত্র আশ্রয়স্থল এবং মোক্ষস্থল—সেজন্যও তিনি 'স্থল'। শিবের অন্তর্নিহিত শক্তিবলে এই 'স্থল' 'লিঙ্গস্থল' বা উপাস্য শিব এবং 'অঙ্গস্থল' বা উপাসক জীবে বিভক্ত হয়। পুনরায় 'লিঙ্গস্থল' তিন ভাগে বিভক্ত হয়—'ভাবলিঙ্গ' 'প্রাণলিঙ্গ' ও 'ইষ্টলিঙ্গ'। প্রথমটি শিবের নিষ্কল নিরংশ দেশকালাতীত চক্ষু ও মনের দ্বারা অপ্রাপ্য 'সৎ-রূপ'। দ্বিতীয়টি শিবের সাংশ, সূক্ষ্ম, মনের দ্বারা প্রাপ্য 'চিৎ-রূপ'। তৃতীয়টি শিবের সাংশ, স্থূল, চক্ষুর দ্বারা দৃশ্য 'আনন্দ-রূপ'। প্রথমটি শিবের মহত্তম কেবল-রূপ; দ্বিতীয়টি শিবের সূক্ষ্ম-রূপ; তৃতীয়টি শিবের স্থূল-রূপ। প্রয়োগ মন্ত্র এবং কর্ম-সমন্বিত এই তিনটি বিভাগের নাম—যথাক্রমে 'কাল' 'নাদ' ও 'বিন্দু' এবং প্রত্যেকটির দুটি বিভাগ—যথাক্রমে 'মহালিঙ্গ' ও 'প্রসাদলিঙ্গ'; 'চারলিঙ্গ' ও 'শিবলিঙ্গ'; 'গুরুলিঙ্গ' ও 'আচারলিঙ্গ'।

এরূপে, ছ'টি শক্তিসমন্বিত এই ছ'টি লিঙ্গ হ'ল 'ষট্‌স্থল' শিবের ছ'টি রূপ :

(১) মহালিঙ্গ—এটি শিবের চিৎ-শক্তি-সমন্বিত নিত্য জন্ম-মরণরহিত পূর্ণতম মহত্তম এক ও অদ্বিতীয় 'চৈতন্যরূপ'। শ্রদ্ধা ভক্তি বা ঈশ্বরপ্রেম দ্বারাই এই রূপ লভ্য।

(২) প্রসাদলিঙ্গ—এটি শিবের পরা-শক্তি-সমন্বিত 'সদাখ্য-রূপ'। এটি বুদ্ধিগম্য।

(৩) চারলিঙ্গ—এটি শিবের আদিশক্তি-সমন্বিত 'পুরুষরূপ'। এটি মনোগম্য।

(৪) শিবলিঙ্গ—এটি শিবের ইচ্ছাশক্তি-সমন্বিত 'অহঙ্কার-রূপ'।

(৫) গুরুলিঙ্গ—এটি শিবের জ্ঞান-শক্তি-সমন্বিত-রূপ।

(৬) আচার-লিঙ্গ—এটি শিবের ক্রিয়া-শক্তি-সমন্বিত-রূপ।

প্রথম রূপে শিব জগৎ-প্রপঞ্চবহির্ভূত শুদ্ধ 'চিৎ'। দ্বিতীয় রূপে শিব জগৎ-স্রষ্টা। তৃতীয় রূপে শিব জড়-প্রধান-ভিন্ন 'পুরুষ'। চতুর্থ রূপে শিব অপার্থিব দেহধারী। পঞ্চম রূপে শিব জীবের জ্ঞানগুরু। ষষ্ঠ রূপে শিব জীবের মুক্তিদাতা।

এরূপে শ্রীপতি বীর-শৈব মতানুসারে 'ষট্‌স্থলবাদ' প্রপঞ্চিত করেছেন প্রথমে জীব-জগতের দিক থেকে। পরে তিনি সাধন-তত্ত্বের দিক থেকেও 'ষট্‌স্থলবাদে'র উল্লেখ করেছেন এই ভাবে—শ্রবণ মনন জ্ঞান নিধি ধ্যান ও আসন—এই ছয় সাধন অনুসারে আত্মলিঙ্গ ভাবলিঙ্গ জ্যোতির্লিঙ্গ প্রাণলিঙ্গ উপাসনালিঙ্গ ও ধ্যানলিঙ্গ—এই 'ষট্‌স্থল'।

ব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রীপতি কি প্রপঞ্চিত করেছেন, সে সম্বন্ধে কিছু বলা হ'ল।

এবার আসছে 'জীবে'র কথা। এ সম্বন্ধেও শ্রীপতি কিছু নূতন কথা বলেননি; এবং অন্যান্য একেশ্বরবাদী ও ত্রিতত্ত্ববাদী বৈদান্তিকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলেছেন যে, জীব জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা; কর্তা ভোক্তা; পরিমাণে অণু এবং সংখ্যায় বহু

জগৎ সম্বন্ধেও শ্রীপতি কোনো নূতন তত্ত্ব প্রপঞ্চিত করেননি; এবং তাঁর সমধর্মী অন্যান্য বৈদান্তিকের ন্যায়ই বলেছেন যে, ব্রহ্মশক্তি—'অচিৎ' বা জড় 'প্রধান'—থেকে সাংখ্য-যোগ-মতানুযায়ী ক্রম-বিবর্তন হয়; এবং এইভাবে জগতের উৎপত্তি হয়।

এস্থলে ত্রিতত্ত্ববাদিদের সৃষ্টিতত্ত্ব পরিণাম-বাদের অন্তর্নিহিত অযৌক্তিকতা দূর করতে শ্রীপতিও প্রয়াসী হয়েছেন, অবশ্য পূর্বাচার্যগণের পুণ্য পদাঙ্কানুসরণ ক'রেই, নূতন ভাবে নয়:

'সাবয়বস্য ব্রহ্মণ এব বিচিত্র-জগন্নির্মাণাদি-হেতুত্বম্; নিরবয়বস্য ব্রহ্মণঃ কথং সাবয়ব-প্রপঞ্চকারণত্বমিত্যাশঙ্কায়ামাহ—পরিচ্ছিন্ন-শক্তি-বিশিষ্টে নিরবয়বে জীবাত্মনি স্বমনঃশক্ত্যা জাগ্রৎ-প্রপঞ্চবৎ স্বপ্নকালে গজতুরগাদি-নানা-বিধ-প্রপঞ্চ-কল্পন-বিচিত্রাঃ দৃষ্টাঃ। এবং সর্ব-শক্তি-বিশিষ্টে নিরবয়বে পরমাত্মনি পরশিবে স্বমায়াশক্ত্যা বিচিত্র-নানাবিধ-ব্রহ্মাণ্ড-কল্পন-মুপপন্নম্। কিংচ চেতনপুরুষে অচেতন-কেশ-নখাদি-বিচিত্রাঃ, জলানলাদীনামন্যোন্য-বিজাতীয়ানামৌষ্ণ্যাদি-শক্তয়শ্চ বিজাতীয়াঃ দৃশ্যন্তে। তমঃ-প্রকাশবদ্বিরুদ্ধস্বভাব-বহ্নি-সলিলয়োরবিরোধিত্বেন সমুদ্রে দৃষ্টত্বাৎ। পুরুষ-শরীরে জাঠরাগ্নিদর্শনাচ্চ। লোকাতীতস্য সর্ব-মহিমাতিশয়স্য শিবস্য ন কিঞ্চিদনুপপন্নম্।' (২।১।২৬)।

অর্থাৎ সাবয়ব-ব্রহ্মই কেবল বিচিত্র-জগৎ-নির্মাণাদি-হেতু হতে পারেন; কিন্তু নিরবয়ব-ব্রহ্ম কিরূপে সাবয়ব ব্রহ্মাণ্ডের কারণ হতে পারেন?—এই যদি আশঙ্কা করা হয়, তা হ'লে আমরা বলব যে—দেখা যায় যে, নিরবয়ব-জীবাত্মা পরিমিত-শক্তি-বিশিষ্ট হয়েও স্বপ্নকালে জাগ্রৎ-সংসার-তুল্য নানারূপ হস্তী অশ্ব প্রভৃতি কল্পনা বা রচনা করতে পারেন নিজের মনের শক্তির দ্বারা। তা হ'লে অপরিমিত-সর্বশক্তি-বিশিষ্ট, নিরবয়ব-পরমাত্মা বা পরম শিবেরও নিজের মায়াশক্তির দ্বারা বিচিত্র-বিবিধ-ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা বা রচনা যুক্তিযুক্ত। পুনরায় চেতন পুরুষ থেকে অচেতন-কেশ-নখাদির উৎপত্তিও ত দেখা যায়। পুনরায় অগ্নি জল প্রভৃতি পরস্পর ভিন্নজাতীয় দেখা যায়, যেহেতু অগ্নির উষ্ণতাদি গুণ ও জলের শীতলতাদি গুণ সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয়। তা সত্ত্বেও আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় বিরুদ্ধস্বভাব অগ্নি ও জলেরও অবিরোধীরূপে সমুদ্রে সহাবস্থিতি দেখা যায়; পুরুষশরীরেও জাঠরাগ্নি দেখা যায়। সুতরাং লোকাতীত যিনি, সকল মহিমার আতিশয্য যাঁতে রয়েছে, সেই [নিরবয়ব] শিবের পক্ষে সাবয়ব ব্রহ্মাণ্ডের কারণ হ'তে কিছুমাত্র অযৌক্তিকতা নেই।

এক্ষেত্রে শ্রীপতি নিরবয়ব-ব্রহ্ম থেকে সাবয়ব-ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তির যৌক্তিকতা প্রমাণে সচেষ্ট হয়েছেন এই ভাবে—

(১) নিরবয়ব জীবাত্মা ক্ষুদ্রশক্তি হয়েও নিজের মনের শক্তি দ্বারা স্বপ্নকালে নানাবিধ সাবয়ব বস্তু সৃষ্টি করেন, যা জাগ্রৎ-কালেও তিনি করেন—যেমন, তিনি গজ অশ্ব প্রভৃতিকে স্বপ্নে দেখেন, অর্থাৎ এই সকল বস্তু তাঁরই স্বমনের কল্পনা বা রচনা।

তা হ'লে সর্বশক্তিমান অপরিমিত গুণ-বিশিষ্ট শ্রীভগবানও তাঁর 'অঘটন-ঘটন-পটীয়সী' মায়াশক্তির সাহায্যে স্বয়ং নিরবয়ব হয়েও সাবয়ব ব্রহ্মাণ্ড কল্পনা বা রচনা করতে পারেন অনায়াসে নিশ্চয়ই।

এস্থলে সর্বশক্তিমান ব্রহ্ম সব কিছুই করতে পারেন ব'লে জীব-জগতে পরিণত হয়েও স্বয়ং অপরিণতই থাকেন—এ ত কোনো যুক্তিরই

কথা নয়। তাই যদি হয় ত ব্রহ্ম সম্বন্ধে কোনোরূপ দর্শন- ও ন্যায়শাস্ত্র-সম্মত আলোচনাদির অবকাশই থাকে না—ব্রহ্মবাদের সব অসঙ্গতিই ব্রহ্মের সর্বশক্তিমত্তাদি দিয়ে চাপা দেওয়া চলে। সেক্ষেত্রে 'দর্শন' আর রইল কোথায়? এসে গেল অন্ধ বিশ্বাস (Dogmatism) অনিবার্যভাবেই।

(২) কারণ ও কার্য যে সর্বদাই সমস্বভাব হবে—এরূপ সর্বজনীন নিয়ম করা যেতে পারে না। যেমন, চেতন পুরুষ থেকে অচেতন কেশ-লোম-নখাদি সৃষ্ট হয়।

বেদান্ত-দর্শনের আরেকটি সুপ্রসিদ্ধ উদাহরণ অবশ্য শ্রীপতি এস্থলে দেননি—ঠিক বিপরীত উদাহরণ—অচেতন গোময় কাষ্ঠাদি থেকে চেতন বৃশ্চিকাদির ও কৃমিকীটাদির উৎপত্তি, যে কথা তিনি ২।১।৬ সূত্রভাষ্যে বলেছেন।

বলাই বাহুল্য, এই দুটি উদাহরণই সম্পূর্ণরূপেই অযথার্থ— যেহেতু, চেতন পুরুষ বা আত্মা থেকে অচেতন কেশ-লোম-নখাদির উৎপত্তি ত একেবারেই হয় না—অচেতন দেহ থেকেই হয়। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, মৃতদেহে কেশ-লোম-নখাদি বর্ধিত হয় না—কিন্তু মৃতদেহে ত কোনো কিছুই বর্ধিত হয় না—প্রাণ থেকেই তা হয় এবং বেদান্তমতে প্রাণ, এমন কি মনও জড় বস্তু, জড় 'প্রধান' বা 'প্রকৃতি'র কার্যই মাত্র। তা হ'লে অজড় বস্তু থেকে, আত্মা থেকে, জড় বস্তুর—দেহের—উৎপত্তি কোথায় এস্থলে? তা ত অসম্ভব একেবারেই।

দ্বিতীয় উদাহরণটি আরো হাস্যকর। বায়োলজি বা প্রাণিবিজ্ঞানের মূলীভূত তত্ত্বই হ'ল এই যে, 'Life must come from life.' —'প্রাণ থেকেই প্রাণের উৎপত্তি সম্ভবপর'। সেজন্য সকলেই জানেন যে, গোময় থেকে বৃশ্চিকাদির উৎপত্তি বা কাষ্ঠ থেকে কৃমিকীট বা উই পোকার উৎপত্তিও একেবারেই অসম্ভব—এক বৃশ্চিক থেকেই কেবল আরেক বৃশ্চিক সৃষ্ট হতে পারে কেবল প্রাণিবিজ্ঞানের নিয়মানুসারেই।

তা হ'লে অতি-প্রাজ্ঞ বৈদান্তিকেরা, শঙ্কর থেকে আরম্ভ ক'রে পরবর্তী সকলেই (শঙ্কর অবশ্য ব্যাবহারিক দিক থেকেই কেবল, পারমার্থিক দিক থেকে নয়) এরূপ অত্যদ্ভুত উদাহরণ দিতে গেলেন কেন? দিতে গেলেন নিতান্ত নিরুপায় হয়েই। কারণ, পরিণামবাদ —যা সকলেই গ্রহণ করেছেন, এমন কি, শঙ্করও ব্যাবহারিক দিক থেকে—তার তিনটি অন্তর্নিহিত স্ববিরোধ:

(ক) কারণ কার্যে সত্যসত্যই পরিণত হচ্ছে, যেমন কারণ মৃৎপিণ্ড সত্যসত্যই মৃন্ময় ঘটে পরিণত হচ্ছে। সেজন্য নির্বিকার অপরিবর্তনীয় ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডে সত্যসত্যই পরিণত হচ্ছেন, পরিবর্তিত হচ্ছেন, অথচ পূর্বের ন্যায় নির্বিকার অপরিবর্তিত অপরিণত থেকেই যাচ্ছেন—তা কি করে হয়?

(খ) কারণ ও কার্য সর্বদাই সমস্বভাব হতে বাধ্য। Chemical Compound-এর ক্ষেত্রে তা অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে হয় না। সাধারণ দৃষ্টান্ত—অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের সংমিশ্রণে জলের উৎপত্তি (H_2O); এবং কারণে যে গুণ আপাতদৃষ্টিতে নেই, কার্যে তা এসে যাচ্ছে—তরলতা প্রভৃতি। কিন্তু ব্রহ্মের ক্ষেত্রে এরূপ সংমিশ্রণের প্রশ্নই ত ওঠে না— তিনি যখন সর্ববাদিসম্মতিক্রমে এক অদ্বিতীয় অখণ্ড শুদ্ধ সত্তা—কেবলই ব্রহ্ম, আর অন্য কিছুই নন, বিন্দুমাত্রও। সেজন্য ব্রহ্মের মধ্যে 'ব্রহ্মত্ব' ব্যতীত আর অন্য কিছুই থাকতেই পারে না। তাঁর সঙ্গে অন্য কোনো কিছুর

সংমিশ্রণ অসম্ভব সম্পূর্ণরূপেই। সেক্ষেত্রে যখন স্বীকার ক'রে নেওয়া হচ্ছে যে, তিনিই স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডে পরিণত হন, তখন ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মত্ব ভিন্ন আর অন্য কিছুই থাকতেই পারে না; এবং ব্রহ্মাণ্ডও আর জড় অচেতন বস্তু হয়ে থাকতে পারে না, ব্রহ্মেরই ন্যায় অজড় চেতন সত্তা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু কোনো বৈদান্তিকই ত সাহস ক'রে জগৎকে অজড় চৈতন্যস্বরূপ বলতে পারেননি—যা সেই বিশ্ববিশ্রুত মন্ত্র-দ্বয়ের অনিবার্য ফল—

'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।' (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৩।১৪।১)

'ব্রহ্মেদং সর্বম্।' (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ২।৫।১)

'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্ম।'

'ব্রহ্মই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।'

সেজন্য তাঁরা জগৎকে, ব্রহ্মাণ্ডকে জড় অচেতনই রেখে দিয়েছেন; এবং সেক্ষেত্রে চেতন ব্রহ্ম থেকে অচেতন ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি নিশ্চয়ই অযৌক্তিক।

(গ) ঊর্ণনাভ ও তন্তুর উদাহরণও যে পূর্ববৎ অসার্থক, তা পূর্বেই বলা হয়েছে।

(৩) চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের মধ্যে অচিৎস্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডই বা থাকতে পারে কিরূপে? কারণ স্বরূপের বিরুদ্ধ কোনো গুণ বা শক্তি কিরূপে তারই মধ্যে, তারই স্বগতভেদরূপে থাকতে পারে? অসম্ভব, যতই না সমুদ্রের তলদেশে বাড়বানলের দৃষ্টান্ত দেওয়া হোক—যা অসম্ভব—এবং দুটি বিরুদ্ধ ধর্মের সহাবস্থিতির কথা বলা হোক। সেদিক থেকেও, ব্রহ্মের অচিৎ-শক্তি ব'লে কিছুই থাকতে পারে না—তাঁর মধ্যে যা কিছু থাকবে, তা সবই চিৎস্বরূপ হতে বাধ্য। কিন্তু ব্রহ্মের অচিৎ-শক্তিকে ত কোনো বৈদান্তিকই ছেড়ে দেবেন না! তা হ'লে? তা হ'লে অসঙ্গতি ত থেকেই গেল সেদিক থেকে বৈদান্তিক ত্রিতত্ত্ববাদসম্মত 'ব্রহ্মবাদে'।

বিশ্বসৃষ্টির উদ্দেশ্যের দিক থেকে শ্রীপতি বেদান্ত-দর্শনের সুবিখ্যাত 'লীলাবাদে'র অবতারণা করেছেন। সৃষ্টি অভাবজনিত নয়, স্বভাবজনিত—ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দস্বরূপ বা স্বভাবের অভিব্যক্তিই মাত্র, লীলা বা ক্রীড়ার মাধ্যমে; এবং এই লীলা জীবের কর্মানুযায়ী—যাতে জীব সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ ক'রে সকাম কর্মের ফলভোগ ক'রে মোক্ষলাভ করতে পারে। এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সেজন্য ব্রহ্ম অন্তর্যামী হলেও কেবলই সাক্ষী—জীব নিজেই কর্মকর্তা ও ফলভোক্তা।

এবারে বেদান্ত-দর্শনে শ্রীপতির বিশিষ্ট মৌলিক দানের কথা আসছে। তা হ'ল তাঁর ব্রহ্ম-ব্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধ বিষয়ক; এবং আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, অন্যান্য বৈদান্তিকেরাও দান করেছেন প্রধানতঃ এই দিক থেকেই কেবল; অন্যান্য বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত।

অন্যান্য ত্রিতত্ত্ববাদী এবং একেশ্বরবাদী বৈদান্তিকের ন্যায় শ্রীপতি আরম্ভ করেছেন ভেদবাচক এবং অভেদবাচক—উভয় প্রকারের বাক্যেরই সমসত্যতা স্বীকার ক'রে। তিনিও তাঁর পূর্ববর্তী সমগোত্রীয়দের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলেছেন যে, যখন সর্বজনগ্রাহ্য শাশ্বতসত্য-প্রকাশক সত্যদ্রষ্টা ও ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের শ্রীমুখনিঃসৃত অমৃতবাণীর আধার শাস্ত্র বিনা দ্বিধায় 'ভেদ' ও 'অভেদ'কে একই সঙ্গে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন সানন্দে সাদরে সাগ্রহে—তখন পরবর্তী দার্শনিকগণের কর্তব্য ত কেবল তাদের মধ্যে একটি সুন্দর সুষ্ঠু সুসম্পূর্ণ সমন্বয় সাধন ক'রে মুমুক্ষু সাধক এবং সাধারণ জ্ঞানপিপাসু জনদের শঙ্কা-সংশয় দূর করা।

কিন্তু রামানুজ থেকে পরবর্তী দ্বৈতাদ্বৈতবাদী সকল বৈদান্তিকই এ বিষয়ে ভ্রান্ত মত পোষণ করেছেন; এবং অসত্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন এত দিন ধরে—এই হ'ল শ্রীপতির সুদৃঢ় অভিমত। সেজন্য পূর্বাচার্যগণের বিবিধ-বিচিত্র প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে শ্রীপতি নির্ভয়ে নবোদ্যমে সর্বদিক থেকেই অভিনব ও মৌলিক তাঁর নিজস্ব একটি মতবাদ এস্থলে প্রপঞ্চিত করেছেন অনেক আশা নিয়ে।

প্রথমেই তিনি অন্যান্য ত্রিতত্ত্ববাদী ও একেশ্বরবাদী বৈদান্তিকের ন্যায় প্রমাণ করতে উদ্যোগী হয়েছেন যে, ব্রহ্ম ও জীব-জগতের মধ্যে 'ভেদ' ও 'অভেদ' উভয়ই স্বীকার না ক'রে আমাদের উপায় নেই।

প্রথমতঃ 'ভেদে'র কথাই ধরা যাক, কারণ এটি প্রত্যক্ষ-সত্য এবং সেজন্য সহজবোধ্য। এরূপ 'ভেদ' অবশ্য আছে জীবের 'বন্ধ'-কালে বা বদ্ধাবস্থায় অর্থাৎ সংসারাবস্থায়। এই সংসারাবস্থায় যে, ব্রহ্ম ও জীব পরস্পর সম্পূর্ণ ভিন্ন, তা কেবল পূর্বোক্ত শ্রুতি কেন, যুক্তির ভিত্তিতেও ত সমভাবে প্রমাণিত করা যায়। প্রথমেই ধরুন ব্রহ্ম ও জীবের কথা। একথা সকলেই জানেন যে, ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ ও সর্বজ্ঞ; কিন্তু জীব জ্ঞানস্বরূপ ও অল্পজ্ঞ। ব্রহ্ম ভূমা মহান; জীব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুপরিমাণ। ব্রহ্ম 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ (ঈশোপনিষদ্ ৮) নিত্য-শুদ্ধ নির্দোষ নিরঞ্জন; জীব অশুদ্ধ দোষদুষ্ট সংসারপঙ্কলিপ্ত। ব্রহ্ম পূর্ণানন্দ রসঘন সচ্চিদানন্দস্বরূপ অমৃতপরিপূর্ণ; জীব দুঃখ-ক্লেশক্লিষ্ট পাপতাপপীড়িত জন্মমরণভাগী। ব্রহ্ম নিত্য-নির্বিকার; জীব ষড়্‌বিকারভাগী—জন্ম-স্থিতি-বৃদ্ধি-পরিণাম-জরা- মরণ- কবলিত। এইভাবে অসংখ্য দিক থেকে ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে জীবের সাংসারিক অবস্থায় বা 'বন্ধ'-কালে অনিবার্য অনস্বীকার্য 'ভেদে'র কথা বলা চলে নিঃসন্দিগ্ধভাবে।

১।১।১ সূত্রভাষ্যে শ্রীপতি 'ব্রহ্মত্ব' এবং 'জীবত্বের' সংজ্ঞা দিয়ে সেজন্য বলছেন—

"বেদাগম - উভয় - বেদান্ত - প্রতিপাদিত-স্বাভাবিকানন্ত - শক্তি- বিশিষ্ট-জগদুভয় কারণ-পশুপাশ-নিয়ামক-সকল-নিষ্কল-স্থূল-সূক্ষ্ম চিদচিৎ-প্রকাশ-সত্য-জ্ঞানানন্ত-কল্যাণ-গুণ-বিভবাশ্রয়ত্বং 'ব্রহ্মত্বম্'।

"অনাদি স্বাভাবিক- মায়াপাশবদ্ধ- ঘোরা-পার- নিস্তার- সংসার- ব্যাপার- তাপত্রয়ানল-দহ্যমান-নানা-শরীর-প্রবেশ-নির্গমন-বর্ণাশ্রমাভি-মান- বিশিষ্ট- কাম- ক্রোধাদ্যনুস্যূত- সুখ-দুঃখা-শ্রয়ত্বং 'জীবত্বম্'।"

অর্থাৎ ব্রহ্মের লক্ষণ হ'ল এই—

(১) ব্রহ্ম বেদোপনিষদ, বেদান্ত, আগম-নিগমপ্রমুখ সকল শাস্ত্রের একমাত্র প্রতিপাদ্য তত্ত্ব।

(২) ব্রহ্ম স্বাভাবিক অনন্ত শক্তিবিশিষ্ট।

(৩) ব্রহ্ম জগতের অভিন্ন উপাদান ও নিমিত্ত কারণ।

(৪) ব্রহ্ম জীবের নিয়ন্তা।

(৫) ব্রহ্ম সকল স্থূল ও সূক্ষ্ম, চিৎ ও অচিতের প্রকাশক।

(৬) ব্রহ্ম সত্য-জ্ঞানপ্রমুখ অনন্ত কল্যাণ-গুণের আকর।

অপর পক্ষে জীবের লক্ষণ হ'ল এই—

(১) জীব অনাদি, স্বাভাবিক মায়াপাশে বদ্ধ।

(২) জীব ঘোর - অপার - নিস্তারবিহীন সংসার- ব্যাপারের = ত্রিতাপের (আধ্যাত্মিক-আধিভৌতিক-আধিদৈবিকের) অনলে দগ্ধ।

(৩) জীব নানা শরীরে প্রবেশ করে এবং তা থেকে নির্গতও হয়; অর্থাৎ জন্মের সময়ে

নূতন দেহ ধারণ করে ; মৃত্যুর সময়ে সেই দেহ ত্যাগ করে।

(৪) জীব এরূপে নানারূপ-বর্ণাশ্রমাভিমানী হয় ; অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি-কুলে জন্ম গ্রহণ করে নানাভাবে স্বকর্মানুসারে।

(৫) জীব কামক্রোধাদিবিশিষ্ট।

(৬) জীব সুখদুঃখভাগী।

এ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাবে যে, ব্রহ্ম ও বদ্ধজীবের মধ্যে ভেদ কত গভীর ও দুর্লঙ্ঘ্য।

বলাই বাহুল্য যে, ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে 'ভেদ' আরও বহুলভাবে, অধিক পরিমাণে বিদ্যমান। কারণ, জীব, আর যাই হোক না কেন, অন্ততঃ ব্রহ্মের ন্যায় জ্ঞানস্বরূপ, যদিও অণু হওয়ায় পরিমাণে অনেক অনেক অল্প। এস্থলে উভয়ের 'ভেদ' বরং পরিমাণগত (Quantitative), গুণগত (Qualitative) নয়। কিন্তু জগৎ অজড় জ্ঞানস্বরূপ ত নয়ই, বরং ঠিক তার বিপরীত। পুনরায় জীবের ক্ষেত্রে যদি বা সামান্য মাত্রও আনন্দের সম্ভাবনা থাকে, জগতের ক্ষেত্রে ত সে প্রশ্নই উঠে না একেবারেই ; এবং সেজন্য তার সঙ্গে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের 'ভেদ' ত সহস্রগুণ অধিক। পুনরায় ব্রহ্ম যেস্থলে নিত্যশুদ্ধ নিত্য-পূর্ণ, জগৎ সেস্থলে সম্পূর্ণরূপে অশুদ্ধ ও অপূর্ণ। এইভাবে ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে 'ভেদে'র ত সীমা-পরিসীমা নেই।

সেজন্য ব্রহ্ম ও জীব-জগতের 'ভেদ' বদ্ধাবস্থায় অবশ্যস্বীকার্য।

কিন্তু মোক্ষাবস্থায় ঘটছে ঠিক তার বিপরীত ব্যাপার, যেহেতু মোক্ষাবস্থায় জীব হয়ে পড়ছেন ব্রহ্ম থেকে হঠাৎ সম্পূর্ণ অভিন্ন। কারণ, মোক্ষকালে জীব ব্রহ্মের সঙ্গে 'তাদাত্ম্য' অথবা একাত্মতা প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপত্ব বা পরমশিবত্ব লাভ করেন।

এরূপে শ্রীপতির মতে ব্রহ্ম ও জীব-জগতের সম্বন্ধের কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে ব্রহ্ম ও জীব-জগতের মধ্যে রয়েছে বদ্ধাবস্থায় সম্পূর্ণ 'ভেদ' এবং কেবলই 'ভেদ'। অথচ মোক্ষা-বস্থায় তা হয়ে দাঁড়াচ্ছে সম্পূর্ণ 'অভেদ' এবং কেবলই 'অভেদ'।

এইটিই হ'ল শ্রীপতির বৈশিষ্ট্য এবং সম্পূর্ণ মৌলিক নূতন মতবাদ। কারণ, অন্যান্য সকল 'ভেদাভেদবাদে'র ক্ষেত্রেই আমরা দেখেছি যে, বন্ধ এবং মোক্ষ—উভয় অবস্থাতেই রয়েছে 'ভেদ' এবং 'অভেদ' উভয়ই পাশাপাশি একই সঙ্গে—অর্থাৎ বদ্ধজীবও ব্রহ্ম থেকে ভিন্নাভিন্ন ; মুক্তজীবও ব্রহ্ম থেকে ভিন্নাভিন্ন—অবশ্য বিভিন্ন পরিমাণে নিশ্চয়ই ; অর্থাৎ বদ্ধ-জীবের ক্ষেত্রে ব্রহ্ম থেকে তার 'ভেদ' অনেক বেশী, 'অভেদ' অনেক কম। কিন্তু মুক্তজীবের ক্ষেত্রে ব্রহ্ম থেকে তার 'অভেদ' অনেক বেশী, 'ভেদ' অনেক কম।

কিন্তু শ্রীপতি বলছেন এক্ষেত্রে একটি আশ্চর্যতম, সম্পূর্ণ নূতন অনুপম কথা—বদ্ধজীব ব্রহ্ম থেকে সম্পূর্ণরূপেই ভিন্ন এবং কেবলই তাই ; অথচ মুক্তজীব ব্রহ্ম থেকে সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন এবং কেবলই তাই। পূর্বে কোনো ভেদাভেদবাদীই এরূপ কথা বলেননি।

সেজন্য শ্রীপতি পরমোৎসাহে একটি সম্পূর্ণ নূতন কথা বলতে পেরে বলছেন যে—এই যে অপরূপ মতবাদ তার মূল কথা হ'ল এই যে, বদ্ধাবস্থায় কেবল 'ভেদ', এবং মোক্ষাবস্থায় কেবল 'অভেদ' উভয়ই সমসত্য—সেজন্য 'ভেদাভেদবাদ'ই অবশ্যগ্রহণীয়।

১।৪।২০-২২ সূত্রভাষ্যে শ্রীপতি ব্রহ্ম ও জীবের প্রকৃত সম্বন্ধের বিষয়ে বিশদভাবে প্রপঞ্চনা ও আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনটি প্রাচীন মুনি-ঋষির মতবাদ উল্লিখিত

হয়েছে—যথা ১।৪।২০ সূত্রে আশ্মরথ্য; ১।৪।২১ সূত্রে ঔড়ুলোমি; এবং ১।৪।২২ সূত্রে কাশকৃৎস্ন মুনির মতবাদ উদ্ধৃত করা হয়েছে। শ্রীপতির মতে আশ্মরথ্য 'শুদ্ধাদ্বৈতমতং দর্শয়তি'। অর্থাৎ তাঁর মতে ব্রহ্ম ও জীব সম্পূর্ণ অভিন্ন; কিন্তু তিনি অশুদ্ধ 'মায়া'র সাহায্য বিনাই এরূপ 'শুদ্ধাদ্বৈতমতবাদ' স্থাপিত করেছেন বল্লভীয় অর্থে। অপরপক্ষে শ্রীপতির মতে ঔড়ুলোমির মতেও ব্রহ্ম ও জীব সম্পূর্ণ অভিন্ন; কিন্তু তিনি অশুদ্ধ 'মায়া'র সাহায্যেই এরূপ 'কেবলা-দ্বৈতবাদ' স্থাপিত করেছেন শাঙ্করীয় অর্থে। পরিশেষে শ্রীপতি কাশকৃৎস্নের মতবাদকেই নিজের মতবাদরূপে গ্রহণ করেছেন সসম্মানে। তিনি বলেছেন যে—সেজন্য আর অপেক্ষা না ক'রে, আর দ্বিধা না ক'রে, আর ভয় না ক'রে—'ভেদাভেদবাদ'ই গ্রহণ করা যাক, পূর্বসূরীদের অর্থে অবশ্য নয়—যা বলা হ'ল পূর্বেই—নিজস্ব একটি বিশেষ অর্থে—সংসার-দশায় জীব ও ব্রহ্মের ভেদ—মোক্ষদশায় অভেদ—

'সংসার-দশায়াং জীব-ব্রহ্মণোর্ভেদঃ, মোক্ষ-দশায়াম্ অভেদশ্চ প্রতিপদ্যতে।' (১।৪।২২)

এক্ষেত্রে কেউ যদি আপত্তি উত্থাপন করেন যে, আলোক ও অন্ধকারের মত ভেদ ও অভেদও ত পরস্পরবিরোধী। তা হ'লে তাদের সহাবস্থিতি সম্ভবপর কিরূপে? তার উত্তরে শ্রীপতি বলছেন—

'সুপ্তি-প্রবোধবৎ, তমঃ-সত্ত্ববৎ, বহ্নি-সলিলবৎ, তমঃ-প্রকাশবৎ বিরোধো ন বিভাব্যঃ।' (১।৪।২১)

অর্থাৎ "এরূপ ভাবা উচিত নয় যে, 'ভেদ' ও 'অভেদ'—নিদ্রা ও জাগরণ, সত্ত্ব বা জ্ঞান ও তমস্ বা অজ্ঞান, অগ্নি ও জল, আলোক ও অন্ধকারের ন্যায়ই পরস্পর-বিরোধী।"

প্রকৃতকল্পে আমাদের ত মনে হয় যে, ভেদ ও অভেদের সহাবস্থিতির প্রশ্ন শ্রীপতি-বেদান্তে নেই একেবারেই—আছে বরং রামানুজ-নিম্বার্কাদি-মতবাদে। কারণ সে সব স্থলেই বদ্ধ ও মোক্ষ উভয় দশাতেই ভেদ ও অভেদ সহাবস্থিতি করছে। কিন্তু শ্রীপতি ত নিজেই বলেছেন যে, তাঁর মতে বদ্ধাবস্থায় ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে রয়েছে কেবলই ভেদ; মোক্ষ-দশায়, কেবলই অভেদ। তা হ'লে আর ভেদ ও অভেদের সহাবস্থিতি হ'ল কই? তা সত্ত্বেও কেন জানি না—শ্রীপতি তাঁর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে ভেদ ও অভেদের সহাবস্থিতি যে সম্পূর্ণরূপে যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য, তা প্রমাণিত করতে যথেষ্ট প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম করেছেন। যেমন, তিনি ১।৪।২২ সূত্রভাষ্যে দশটী সম্ভাব্য আপত্তি উত্থাপন ক'রে তার সমাধান করেছেন অতি যত্নের সঙ্গে। এই দশটি সম্ভাব্য আপত্তি হ'ল এরূপ:

'ভেদাভেদয়োঃ পরস্পরবিরুদ্ধাঙ্গীকারস্তু বস্তুবিরোধাৎ বা, কারণভাবাৎ বা, অযুক্তাৎ বা, অভাবাৎ বা, অমানাৎ বা, অসম্ভবাৎ বা, অফলাৎ বা, অমতাৎ বা, অবিশেষাৎ বা, শ্রুতৈকত্বাভাবাৎ বা।' (১।৪।২২)

এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে।

[ক্রমশঃ]

জাতিবৈষম্য ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ*

ডক্টর নিমাইসাধন বসু†

১

ভারতবর্ষে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ এবং স্বাধীনতাসংগ্রামের সূচনার পিছনে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিভিন্ন কারণ ছিল। এই বিষয়ে নানাবিধ গ্রন্থ-নিবন্ধ রচিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে অর্থনৈতিক কারণটিই অধিকতর গুরুত্ব ও মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, কিন্তু জাতিবৈষম্য ও শাসকশ্রেণীভুক্ত শ্বেতাঙ্গদের উদ্ধত মনোভাব ও আচরণ, অন্যায় সুযোগ-সুবিধা ভোগ এবং এদেশের সাধারণ মানুষের ওপর প্রায় অবাধে নির্যাতন ও উৎপীড়ন ভারতীয়দের মনে রাজনৈতিক চেতনা এবং বিদেশী-শাসন-বিরোধী জনমত গড়ে তুলতে কতখানি সহায়তা করেছিল সে বিষয়ে তথ্যভিত্তিক গবেষণা এখনও পর্যন্ত ঐতিহাসিকেরা করেননি। খুব সংক্ষেপে এই বিষয়টির উল্লেখ করা হলেও যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।** উনিশ শতকের বিভিন্ন সংবাদপত্রপত্রিকায় এই শাসক-শোষিত বিজেতা-বিজিত বা শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ বিরোধকে 'জাতি-বৈরিতা' রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শুধুমাত্র ভারতবর্ষই নয়, এশিয়া আফ্রিকা আমেরিকা ইউরোপ প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের ইতিহাসও জাতিবৈরিতার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম প্রধান সমস্যা হল জাতিবৈষম্য বা বর্ণ বৈষম্য।

জাতিবৈষম্য বা বর্ণবৈষম্য সমস্যাটির সঙ্গে আইনের চক্ষে সমান অধিকার (Equality in the eye of Law)-এর প্রশ্নটি বিশেষ করে এবং সমতার (Equality) প্রশ্নটি সামগ্রিক ভাবে জড়িত। মানুষে মানুষে সমতা এবং সমমর্যাদা ও অধিকারের অসীম গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিচারপতি ডগলাস বলেছিলেন: 'Wherever equality is the theme, men live together in peace. Wherever inequality is the practice,

* রামমোহন রায় স্মারক বক্তৃতামালা (১৯৭৬)। কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে গত জুন (১৯৭৮) মাসে প্রদত্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে প্রকাশিত। —সঃ

† এম. এ , পিএচ্. ডি., ডি. লিট্ । যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক।

** 'জাতি' বলতে বর্তমান আলোচনায় 'Race' কথাটির প্রতিশব্দ বোঝাচ্ছে। 'জাতি-বৈষম্য' বলতে আমরা 'Racial discrimination' ধরে নিয়েছি, যদিও বাংলাভাষা ও সমাজের ক্ষেত্রে জাতি শব্দটির ভিন্ন অর্থ ও ব্যবহার প্রচলিত আছে। জাতি বলতে আমরা শ্বেতাঙ্গদের এবং কৃষ্ণাঙ্গদের ধরেছি অর্থাৎ শাসকশ্রেণীভুক্ত শ্বেতাঙ্গরা এবং কৃষ্ণাঙ্গ ভারতীয়রা। উনিশ শতকের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে শ্বেতাঙ্গরা 'Europeans' 'British-born subjects', 'Anglo-Indians' প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়েছে। অন্যদিকে এদেশীয় কৃষ্ণাঙ্গরা 'Indians' এবং 'Natives' রূপে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের আলোচনা ভারতে এই শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ বিরোধ ও জাতীয় আন্দোলনে তার প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে।

grievances and complaints foster. Equality among men of all creeds, nationality and colors is the greatest curative of social evils.'[১] অর্থাৎ জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সকলের সম-অধিকার ও মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হলে মানুষ একত্রে শান্তিতে বাস করতে পারে। সমতার অভাব অশান্তির কারণ হয়।

পৃথিবীর ইতিহাসে প্রাচীনকাল থেকে এই সমতার কথা বারবার উচ্চারিত হলেও কার্যক্ষেত্রে এই আদর্শের রূপায়ণ হয়নি। প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, Concept of Equality বা সমতার ধারণা রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থায় কার্যকর ছিল না। গুরুতর ফৌজদারী মামলায় সকলের সাক্ষ্য গৃহীত হত। কিন্তু সাধারণ বা দেওয়ানী মামলায় সকলের সাক্ষ্যদানের অধিকার ছিল না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সাক্ষ্যদানের জন্য আদালতে হাজির হবার আদেশপত্র জারি করা যেত না। উচ্চবর্ণের মানুষের বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণের মানুষের সাক্ষ্য বৈধ গণ্য হত না। অভিযুক্ত ব্রাহ্মণরা দৈহিক শাস্তি ভোগ করত না। শাস্তিদানের ক্ষেত্রেও বৈষম্য ছিল। কোন ক্ষত্রিয়কে হত্যা করলে এক সহস্র গরু জরিমানা হত, বৈশ্যহত্যার জরিমানা ছিল একশত গরু, কোন শূদ্র বা নারী হত্যা করলে দশটি গরু জরিমানা হত, কিন্তু ব্রাহ্মণ হত্যা করলে জরিমানা দিয়ে অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব ছিল না। আইনের দৃষ্টিতে সমতার আদর্শ প্রাচীন ভারতে স্বীকৃত হয়নি। পুরোহিতসম্প্রদায় নিজেদের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করে বহুবিধ বিশেষ সুযোগসুবিধা ভোগ করতেন। এর বিরুদ্ধে কালক্রমে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। অশোকের শিলালিপিতে 'সমতা'র প্রতি গুরুত্ব আরোপিত হয়েছিল। কোন কোন শাস্ত্রকার অভিযুক্ত ব্রাহ্মণদের জন্য কঠোরতর শাস্তি নির্দেশ করেছিলেন। অপরাধীর শাস্তিবিধান ও যোগ্যের পুরস্কার বা 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন' পবিত্র রাজকর্তব্য বলে বিবেচিত হত। নিরপেক্ষ বা ন্যায়বিচার করলে যাগযজ্ঞের সম-পরিমাণ পুণ্য অর্জিত হয় এবং অন্যথায় নরকে শাস্তিভোগ করতে হয় বলে মনে করা হত। ন্যায়বিচারে বিলম্বও দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হত। বিচার চলাকালে বিবদমান পক্ষ বা অভিযুক্তের সঙ্গে বিচারকদের সাক্ষাৎকার বা যোগাযোগ অনুমোদিত ছিল না। কিন্তু উচ্চ আদর্শের উল্লেখ থাকলেও বিচারব্যবস্থা বা রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে সমমর্যাদা সম-অধিকার ও আইনের দৃষ্টিতে সমতার নীতি প্রাচীন ভারতে অনুসৃত হয়নি।[২]

মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষেও বিচারব্যবস্থা ও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের সম-অধিকার ও মর্যাদার নীতি অনুসৃত হয়নি। কোরানে 'সব মানুষ সমান' (Equality of Man) এবং জাতি ধর্ম বর্ণ ও রাষ্ট্রনির্বিশেষে সকলের[৩] সম-অধিকার ও কর্তব্যের আদর্শ স্বীকৃত হলেও ভারতবর্ষে সুলতানী আমল

১ গোপেন্দ্রনাথ দাসের 'Concept of Equality in the eye of Law' গ্রন্থে উদ্ধৃত (পৃষ্ঠা ১)

২ এ. এল. ব্যাশমের 'The Wonder that was India' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৩ আফজল ইকবালের 'The Prophet's Diplomacy' গ্রন্থে পৃষ্ঠা XXVII, XXVIII দ্রষ্টব্য।

এবং মুঘল আমলে অ-মুসলমান নাগরিকরা এ সুযোগ ও সম্মানে বঞ্চিত ছিল। মধ্যযুগে ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থার দুর্বলতম শাখা ছিল বিচারব্যবস্থা। অ-মুসলমান অধিবাসীরা 'জিম্মি' (Zimmi) নামে অভিহিত হত। কাজীর আদালতে তাদের সাক্ষ্য গ্রাহ্য হত না। জিজিয়া কর সকল নাগরিকের সম-অধিকার ও মর্যাদানীতির বিরোধী ছিল। ইসলামী আইন অনুসারে জনসাধারণ দুভাগে বিভক্ত ছিল—বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী। অবিশ্বাসী বা অ-মুসলমানরা রাষ্ট্রের নাগরিক বলে স্বীকৃত হত না। রাষ্ট্রে ইসলামী আইন-অনুসারে বিচার হওয়ায় অ-মুসলমানরা অসুবিধা ভোগ করত। আকবর এই ব্যবস্থার সংস্কার করে কিছুটা অসঙ্গতি ও বৈষম্য দূর করেছিলেন। রাজ্যের মধ্যে সুলতান বা সম্রাটের পরেই বিচারব্যবস্থার প্রধান ছিলেন মুখ্য কাজী। তাঁর তলায় ছিলেন প্রাদেশিক কাজী। এছাড়া প্রতি শহরে এবং বড় বড় গ্রামে কাজী ছিল। কাজীরা প্রায় সকলেই ছিল দুর্নীতিগ্রস্ত, যার ফলে 'কাজীর বিচার' কথাটি বিদ্রূপাত্মক অর্থে প্রবাদে পরিণত হয়। গ্রামের মধ্যে স্থানীয় বিবাদ-বিরোধ মীমাংসার ভার ছিল পঞ্চায়েতের ওপর। প্রচলিত রীতি বা ব্যবস্থা (Common Law) অনুসারে পঞ্চায়েত বিচার করত। দীর্ঘকাল ধরে এবং এক বিশাল ভূখণ্ডে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল, সুতরাং শাসন ও বিচারব্যবস্থার রূপ সর্বত্র ও সর্বস্তরে একই রকম ছিল না। কোনও কোনও শাসক বা বিচারপতি ন্যায়-নীতি ও নিরপেক্ষ বিচারের আদর্শ পালন করতেন, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে যে সমতার নীতি এবং সকল নাগরিকের সম-মর্যাদা ও সম-অধিকার স্বীকৃত ছিল না সে বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই।[৪]

অষ্টাদশ ও উনিশ শতকের পাশ্চাত্য রাজনৈতিক দর্শন ও যুক্তিবাদের ফলেই সকল শ্রেণীর নাগরিকের সম-অধিকার ও সমমর্যাদা এবং আইনের দৃষ্টিতে সমতানীতির উদ্ভব হয়েছিল। আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময় 'ভার্জিনিয়া বিল অব রাইটস্'-এ (Virginia Bill of Rights, 1776) ফরাসী-বিপ্লবের সূচনায় গৃহীত মানব-অধিকারের ঘোষণায় (Declaration of the Rights of Man, 1789) মানুষের অধিকার ও সাম্যের নীতি সোচ্চার হয়েছে। আধুনিক পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রের সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে সকল নাগরিকের সম-অধিকার এবং আইনের দৃষ্টিতে সমতার আদর্শ পালনের কথা উল্লিখিত আছে।

ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য সংঘাত এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে জাতীয়তাবোধ নাগরিক অধিকার নিয়মতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি ধ্যান-ধারণার উৎপত্তি হয়। মানুষে মানুষে সম-অধিকার ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা সম্বন্ধে চেতনার বিকাশ ঘটে। ঐতিহাসিক পার্সি-ভাল স্পিয়ার-এর (Percival Spear) মতে এই নবজাত ধ্যান-ধারণাকে কেন্দ্র করেই 'নতুন' ভারতীয় অর্থাৎ পাশ্চাত্য-শিক্ষিত ভারতীয় এবং 'নতুন শাসক' অর্থাৎ ইংরাজদের মধ্যে

৪ যদুনাথ সরকারের 'The Mughal Administration' ও এ. এল. শ্রীবাস্তবের 'The Mughal Empire' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

বিভেদ-বিরোধের সূত্রপাত হয়।[৫] শিক্ষিত ভারতীয়রা শাসকসম্প্রদায়ভুক্ত শ্বেতাঙ্গদের 'জাতিগত প্রাধান্য' (Racial Supremacy) অস্বীকার করতে শুরু করে। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পর প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস-সংস্কৃতি সম্বন্ধে গবেষণার সূত্রপাত হয়। প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার (Indology) দ্রুত অগ্রগতি হতে থাকে। উইলিয়াম জোন্স, প্রিন্সেপ, ক্যানিংহাম, উইলসন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ম্যাক্সমুলার প্রমুখ পণ্ডিতদের গবেষণার ফলে প্রাচীন ভারতবর্ষের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে সকলে অবহিত হন। এই সব নতুন জ্ঞান ও তথ্য ভারতীয়দের মনে গর্ববোধ ও আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি করে। তারা উপলব্ধি করে যে, কালের আবর্তে ঘটনাচক্রে ভারতবর্ষ বর্তমানে গৌরবহীন ও পরাধীন হয়ে পড়লেও একদিন ভারত ছিল পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ। এই নতুন প্রেরণা যেমন ভারতীয় নবজাগরণ এবং জাতীয়তাবাদের উন্মেষে বিশেষ সহায়তা করেছিল, তেমনি এক স্বাজাত্যাভিমান সৃষ্টি করেছিল।

শিক্ষাবিস্তার ও রাজনৈতিক চেতনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়রা এদেশে বসবাসকারী শ্বেতাঙ্গদের উদ্ধত দুর্বিনীত আচরণ, ভারতীয়দের প্রতি উপেক্ষার মনোভাব, শ্বেতাঙ্গদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি সম্বন্ধে অসহিষ্ণু ও প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠতে থাকে। গ্রামাঞ্চলে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে দরিদ্র জনসাধারণের জীবন-মান-সম্পত্তি বিপন্ন হত। কৃষকদের ঘরবাড়ী লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ এমন কি হত্যা করলেও শ্বেতাঙ্গরা খুব লঘু শাস্তি পেত এবং বহুক্ষেত্রে কোন রকম শাস্তি পেত না। ভারতীয় বিচারক তো দূরের কথা কোম্পানীর শাসনাধীন এলাকার কোনও আদালতের শ্বেতাঙ্গ বিচারকদেরও এদেশে বসবাসকারী শ্বেতাঙ্গদের বিচার ও শাস্তিদানের অধিকার ছিল না। একমাত্র কলকাতার সুপ্রিম কোর্টের শ্বেতাঙ্গদের বিচার ও দণ্ডদানের এখতিয়ার ছিল। এর ফলে শুধুমাত্র গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষই নয়, শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভারতীয়রাও অপমানের হাত থেকে রেহাই পেতেন না। তাছাড়া আদালতে অভিযোগ করা ছিল ব্যয়সাধ্য এবং পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অভিযোগ করলেও সুবিচারের আশা ছিল না। এর ফলে ক্রমে ক্রমে ভারতীয়দের মনে ইংরাজ শাসন সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়। তারা অনুভব করে যে, এই বৈষম্য ও ঔদ্ধত্যের মূলে রয়েছে দেশের পরাধীনতা।

স্বদেশের শাসনকার্যেও শিক্ষিত ভারতীয়রা কোন উচ্চপদলাভের অধিকারী ছিল না। শাসনব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, কর্মক্ষেত্র—দৈনন্দিন জীবনের নানা ক্ষেত্রে বর্ণবৈষম্য ও শাসক-শাসিত-পার্থক্য উৎকটভাবে প্রকাশ হতে থাকে। এই অবস্থা ও পরিবেশ ভারতীয়দের পক্ষে বেদনাদায়ক ও অসহনীয় হয়ে ওঠে এবং স্পিয়ারের ভাষায় 'ভারত-মাতার ভাবমূর্তি ম্লান' করে। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে শাসনতান্ত্রিক এবং অর্থনৈতিক শোষণ এবং ব্যর্থতা অপেক্ষা এদেশে বসবাসকারী শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার ঔদ্ধত্য ও দুর্বিনীত ব্যবহার ভারতীয়দের মনে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে ক্রোধানল

পার্সিভাল স্পিয়ার : 'India : A Modern History'.

প্রজ্বলিত করে তুলেছিল।[৬]

ভারতবর্ষে রাজনৈতিক চেতনা এবং বৃটিশ-শাসনবিরোধী মনোভাবের উন্মেষ ও প্রসারে জাতিবৈরিতার আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্বন্ধে বিতর্ক হতে পারে। কিন্তু উনিশ শতকের সূচনাকাল থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকাল (১৮৮৫) পর্যন্ত ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি বিচার-বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হবে যে, বর্ণবৈষম্য জাতি-বৈরিতা এবং আইনের দৃষ্টিতে সমতা-নীতির প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র এবং উপলক্ষ করেই বিগত শতকের রাজনৈতিক আন্দোলন বহুলাংশে বিবর্তিত হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকের উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও রাজনৈতিক আন্দোলনের একটি প্রধান সমালোচনা হল যে, এই জাতীয়তাবোধ ও আন্দোলন ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী-ভিত্তিক। শিক্ষিত উচ্চাভিলাষী মধ্যবিত্তদের হতাশা থেকেই জাতীয় চেতনার জন্ম হয়েছিল। তাদের জন্য সুযোগ-সুবিধা আদায় করাই ছিল গত শতকের রাজনৈতিক আন্দোলনের মুখ্য লক্ষ্য। এই সমালোচনা সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য না হলেও অসার বা ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু জাতি বা বর্ণের বৈষম্য এবং বিচারব্যবস্থায় শ্বেতাঙ্গদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব শুধুমাত্র শিক্ষিত মধ্যবিত্তদেরই নয়, দেশের গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবনও অসহনীয় করে তুলেছিল। ফলে এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে যে বিক্ষোভ ও আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তা সকল শ্রেণীর ভারতীয়দের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত ছিল। শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর মানুষের কাছে এই সংগ্রাম ছিল চাকুরীর ক্ষেত্রে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা, সামাজিক মর্যাদা এবং আত্ম-সম্মান রক্ষার প্রশ্ন। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে এই সমস্যা ছিল জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা এবং অবশ্যই আত্মমর্যাদা রক্ষার প্রশ্ন। সুতরাং জাতিবৈষম্যের অবসান ও আইন-আদালতে সমতা-নীতির প্রতিষ্ঠার দাবীতে গড়ে ওঠা জনমত এবং আন্দোলন ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনকে ব্যাপক ও বৃহত্তর রূপদান করেছিল।

সামগ্রিকভাবে জাতীয় আন্দোলনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত জাতিবৈষম্যের অবসান ও আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকের সমান অধিকার এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের পিছনেও পাশ্চাত্য শিক্ষিত তরুণরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। পাশ্চাত্যের উদার-নৈতিক চিন্তাধারায় প্রভাবিত ও উদ্দীপ্ত এই যুবকেরা চাকুরীর ক্ষেত্রে এবং আইন-আদালতে বৈষম্যের অবসান ঘটানোর জন্য উদ্‌গ্রীব হয়। বাংলাদেশে ইংরাজী শিক্ষার সাফল্য, জনজীবনে ঔৎসুক্য, শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন ও সংস্কার সম্বন্ধে চেতনা সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় প্রতিফলিত হতে থাকে। সাপ্তাহিক 'বঙ্গদূত' মন্তব্য করে (জুন ১২৮৯) যে, ভবিষ্যতে মধ্যবিত্তশ্রেণী দেশকে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করাবে। এই সাপ্তাহিকেরই ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত সহযোগী 'বেংগল হেরাল্ড' কাগজে জনৈক পত্রদাতা অভিযোগ করেন যে, ইংরাজ রাজকর্মচারীরা প্রায়শই

৬ ডঃ মজুমদার সম্পাদিত 'British Paramountcy and Indian Renaissance' Pt. II গ্রন্থে তাঁর স্বরচিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ভারতীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহার করে। উচ্চপদস্থ ইংরাজরা সাক্ষাৎপ্রার্থী ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও সম্মাননীয় ব্যক্তিদের আসন গ্রহণ করতে পর্যন্ত বলে না এবং অসৌজন্যপূর্ণ আচরণ করতে দ্বিধাবোধ করে না। পরিশেষে পত্রপ্রেরক শ্লেষপূর্ণ মন্তব্য করেন যে, এইরূপ ঔদ্ধত্য ইউরোপীয়দের জাতীয় বৈশিষ্ট্য, সুতরাং তা উপেক্ষা করাই উচিত।

২

১৮২৬ খৃষ্টাব্দের জুরী অ্যাক্টের (Jury Act) একটি বৈষম্যমূলক ধারাকে উপলক্ষ করেই এদেশে সর্বপ্রথম জাতিবৈষম্যের বিরুদ্ধে ও আইন-আদালতে সমতাপ্রতিষ্ঠার সপক্ষে আন্দোলনের সূচনা হয়। ইতিপূর্বে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ করা হয়েছিল তার মূলে ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের জুরী আইনের শর্ত-বিরোধী আন্দোলনেরও পুরোভাগে ছিলেন রামমোহন। এই আন্দোলন ও রামমোহনের ভূমিকা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার পূর্বে 'জাতি' (race) ও 'জাতি-বৈষম্য' (racial discrimination) সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া আবশ্যক।

স্বদেশপ্রেমিক রামমোহন পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। শিক্ষিত ভারতীয়দের নেতৃস্বরূপ রামমোহন ইংরাজ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতেন এবং তাঁর মতে নতুন জ্ঞানের যাদুদণ্ডই ছিল এই শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান কারণ। পাশ্চাত্যজাতিসমূহের জাগতিক উন্নতি ও অগ্রগতি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, কারিগরি-বিদ্যা রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিকাশ তাঁকে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুরাগী করে তুলেছিল। এই কারণেই তিনি ভারতবর্ষে ইউরোপীয়ানদের আগমন ও স্থায়িভাবে বসবাস করার ওপর বাধানিষেধ তুলে দিয়ে এদেশে অধিকসংখ্যক ইউরোপীয়ানদের নাগরিকতার সুযোগ দেওয়ার সমর্থক ছিলেন। নিজের মতের সমর্থনে তিনি বলেছিলেন যে, 'ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা (personal experience) থেকে আমার এই ধারণা ও বিশ্বাস জন্মেছে যে, ইউরোপীয়দের সঙ্গে যতবেশী আদান-প্রদান ও সংস্রব হবে ততই আমাদের সাহিত্য, সমাজ ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটবে।' তিনি বলেন, যে সব ভারতীয় বিদেশীদের সংস্পর্শে এসেছেন এবং যাঁরা আসেননি তাঁদের অবস্থা ও মানসিকতার তুলনামূলক বিচার করলেই তাঁর অভিমতের যথার্থতা প্রমাণিত হবে।

ইউরোপীয়ানদের সম্বন্ধে তাঁর এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সামগ্রিকভাবে ইউরোপীয়ানদের প্রতি তাঁর মনোভাব গঠনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর জীবনে তিনি একবারই মাত্র শ্বেতাঙ্গদের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে বর্ণবিদ্বেষ ও ঔদ্ধত্যের নগ্নরূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুআরি ভাগলপুরে স্থানীয় কালেক্টর স্যার ফ্রেডারিক হ্যামিলটনের সঙ্গে এক বিরোধ হয়। মুসলমান আমলে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের সামনে দিয়ে সাধারণ মানুষের পাল্কীতে বা ঘোড়ায় চেপে বা ছাতা মাথায় দিয়ে যাবার অধিকার ছিল না। অনেক ইংরাজ রাজকর্মচারীও এই 'সম্মান' আদায় করতে ভালোবাসতেন। হ্যামিলটন ছিলেন সেই শ্রেণীর মানুষ। রামমোহন যখন পাল্কীতে চেপে যাচ্ছিলেন সেই সময় হ্যামিলটন এক ইটের পাঁজার ওপর দাঁড়িয়েছিলেন, একজন ভারতীয়কে তাঁর

সামনে দিয়ে চাপরাসী বরকন্দাজ সঙ্গে নিয়ে যেতে দেখে হ্যামিলটন ক্রোধে অগ্নিমূর্তি হন। তিনি চীৎকার করে রামমোহনকে পাল্কী থেকে নামতে বলেন, কিন্তু পাল্কী না থামায় নিজে ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে পাল্কী আটকান। তখন রামমোহন পাল্কী থেকে নেমে বিনীত-ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে তিনি হ্যামিলটনকে দেখতে পাননি এবং ইচ্ছাকৃত-ভাবে তাঁর প্রতি কোনও অসৌজন্য প্রকাশ করেননি। কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত না করে হ্যামিলটন রামমোহনকে গালিগালাজ করতে থাকেন। তখন রামমোহন পুনরায় পাল্কীতে চেপে ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন। এর কিছুদিন পর তিনি বড়লাট লর্ড মিণ্টোকে একটি পত্র লিখে সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করেন ও প্রতিকারের জন্য আবেদন জানান (১২ই এপ্রিল, ১৮০৯)। তিনি তাঁর পত্রে লেখেন যে, উচ্চবর্ণ ও সম্ভ্রান্ত ভারতীয়রা যদি পদস্থ ইংরাজ কর্মচারীদের কাছে এই ধরনে অপমানিত হন তাহলে তো সাধারণ মানুষের পক্ষে শ্বেতাঙ্গদের হাতে লাঞ্ছিত ও আক্রান্ত হবার ভয়ে গৃহের বাইরে যাওয়া পর্যন্ত অসম্ভব হয়ে উঠবে। রামমোহনের এই তেজোগর্ভ পত্রে সুফল হয়েছিল। হ্যামিলটনকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল ভবিষ্যতে তিনি যেন এরকম আচরণ না করেন।

হ্যামিলটনের দুর্ব্যবহারের অভিজ্ঞতা ছাড়া রামমোহন তাঁর পরিচিত ইউরোপীয়ানদের কাছে যথাযথ সম্মান ও মধুর ব্যবহার পেয়ে-ছিলেন। এদের মধ্যে জন ডিগবি, রেভারেণ্ড উইলিয়াম অ্যাডাম, ডেভিড হেয়ার, জেমস সিল্ক বাকিংহাম প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সরকারী মহলেও তিনি সম্মানিত ছিলেন এবং বেণ্টিঙ্কও তাঁকে সম্মান করেছিলেন। ইংলণ্ডে ও ইউরোপে তিনি সর্বত্র সমাদৃত হয়েছিলেন। এর ফলে স্বভাবতই ইউরোপীয়দের প্রতি তাঁর মনোভাব ছিল প্রসন্ন। এই প্রসঙ্গে ভারতীয়দের সম্বন্ধে ইউরোপীয়ানদের মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী অভিমত ব্যাখ্যা করে রামমোহন যা বলে-ছিলেন তা স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন, যেসব ইউরোপীয় এদেশে পৌছবার পর ভারতীয়দের কাছ থেকে ভদ্র সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার পান তাঁরা এদেশীয় লোকেদের সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে ভাল ধারণা পোষণ করেন ও তাদের সেইমত শ্রদ্ধা করেন। পক্ষান্তরে ঘটনাচক্রে যেসব ইউরোপীয় এদেশীয় লোকেদের কাছ থেকে অসৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার ও নানা ক্ষেত্রে বাধা পান সেই সব ইউরোপীয়ানদের মনে সমগ্র ভারতীয় জাতি সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা ও অশ্রদ্ধার মনোভাব জন্মায়। ইউরোপীয় তথা শ্বেতাঙ্গ জাতি সম্বন্ধে রামমোহনের নিজের ধ্যানধারণাও এই রকম ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-নির্ভর ছিল। রামমোহনের সৌভাগ্য ছিল যে, তিনি জীবনে একবারই মাত্র হ্যামিলটনের মত উদ্ধত দুর্বিনীত শ্বেতাঙ্গের মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং তাঁর বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল যে ইংরাজদের আইন ঐ রকম স্বেচ্ছাচারী আক্রমণাত্মক আচরণ বরদাস্ত করবে না।

ভাবলে একটু বিস্মিত হতে হয় যে, রাজা রামমোহনের মত একজন ক্ষুরবুদ্ধি অভিজ্ঞ মানুষ বৃটিশ আইন ও বিচারব্যবস্থার ওপর এতখানি আস্থাশীল ছিলেন। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে ইংরাজশাসন এবং আইন ইউরোপ থেকে আগত শ্বেতাঙ্গদের হাতে অপমান লাঞ্ছনা থেকে এদেশের মানুষকে রক্ষা করবে এবং মর্যাদা সুনিশ্চিত করবে। তিনি

ভারতীয়দের প্রতি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের মনোভাব এবং বৃটিশ সরকারের মনোভাবের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা টেনেছিলেন। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের মনোভাব তাঁর কাছে অন্যায় ও বৈষম্যমূলক মনে হলেও বৃটিশ সরকারের মনোভাব তিনি 'ন্যায়পরায়ণ ও নিরপেক্ষ' বলে বিশ্বাস করতেন। পরবর্তী কালেও চরমপন্থী রাজনৈতিক মতবাদের জন্ম না হওয়া পর্যন্ত ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এদেশের বৃটিশ শাসনকর্তৃপক্ষের এবং ইংলণ্ডের ইংরাজ সরকারের ভারতসম্পর্কীয় দৃষ্টিভঙ্গী এবং নীতির মধ্যে অনুরূপ অলীক পার্থক্যে বিশ্বাস করতেন।

রামমোহন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতেন। তিনি একান্তভাবে বৃটিশ-শাসনকে ভারতবর্ষের পক্ষে কল্যাণকর বলে মনে করতেন। কিন্তু তিনি কখনও ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত সম্পদ এবং মূল্য সম্বন্ধে আস্থা হারাননি। তিনি কখনও স্বীকার করেননি যে, ইউরোপীয় জাতিসমূহের এশীয় জাতিগুলির অপেক্ষা কোনও জন্মগত চিরস্থায়ী শ্রেষ্ঠত্ব আছে। টাইটলারের সঙ্গে বিতর্কের সময় 'হরকরা' কাগজে জনৈক খৃষ্টান পত্রপ্রেরক মন্তব্য করেন যে রামদাসের মত (রামমোহনের ছদ্মনাম) ভারতীয়দের, যাঁরা খৃষ্টান জ্ঞানালোকের দ্বারা গভীরভাবে উপকৃত, খৃষ্টানদের অবমাননা করতে দেখে তিনি দুঃখবোধ করছেন। তিনি ভারতীয় খৃষ্টানদের কাছে আবেদন জানান যে, তাঁরা যেন তাঁদের 'এশিয়ায় জন্মজনিত দুর্বলতা' (Asiatic effiminacy) দূর করে খৃষ্টধর্ম ও হিন্দুধর্মকে একাসনে বসানোর প্রচেষ্টার প্রতিবাদ করেন। এই ধরনের জাতিশ্রেষ্ঠত্বের দাবীর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে রামমোহন লেখেন যে, জ্ঞানালোক বলতে পত্রপ্রেরক যদি প্রয়োজনীয় কারিগরি-বিদ্যা বুঝিয়ে থাকেন তাহলে ভারতীয়রা নিশ্চয় ইংরাজদের কাছে ঋণী, কিন্তু বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ধর্ম—এই সব বিষয়ে ভারতীয়রা ইংরাজদের কাছে উপকৃত নয়। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে ইতিহাস পড়লেই দেখা যাবে যে, প্রথম জ্ঞানালোকের উদয় প্রাচ্যেই হয়েছিল এবং সারা বিশ্ব আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছেই ঐ বিষয়ে ঋণী। এশিয়ার অধিবাসীদের 'জন্মগত দুর্বলতা' সম্বন্ধে অপবাদ দেওয়ার পূর্বে বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, সমস্ত প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ, প্রাচীন খ্রীষ্টীয় যাজকেরা এবং স্বয়ং যীশু এশিয়ার অধিবাসী ছিলেন। নিজের জাতি ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে রামমোহনের গর্ব এবং পাশ্চাত্য জাতির শ্রেষ্ঠত্বের দাবীর প্রত্যাখ্যানের এক বিরল দৃষ্টান্তরূপে এই উক্তি স্মরণীয়।

রামমোহন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবীর যে কোনও সভ্য জাতির মত ভারতীয়দেরও উন্নতি করার ক্ষমতা আছে। কিন্তু তিনি সচেতন ছিলেন যে, তাদের বর্তমান অবস্থায় ভারতীয়রা পাশ্চাত্যদেশের লোকেদের তুলনায় অনেকখানি পিছিয়ে পড়েছে এবং তাদের যোগ্যতা ও ক্ষমতার সম্যক্ পরিচয়দান করতে পারছে না। হিন্দু নারীদের প্রাচীন অধিকার ('Brief Remarks Regarding the Ancient Rights of Female') শীর্ষক রচনায় তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, আইন ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে ইউরোপীয় আইনজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু তিনি অনুমান করেছিলেন যে, তাঁর এই অভিমতের ফলে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, তিনি ভারতীয় বিচারকদের ইউরোপীয় বিচারকদের তুলনায় নিকৃষ্ট বলে মনে করছেন। তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করেন যে ভারতীয় বিচারকরা যদি ইউরোপীয় বিচারকদের মত সমান শিক্ষালাভের সুযোগ পান এবং অনুরূপ পরিবেশের মধ্যে শিক্ষণপ্রাপ্ত হন, তাহলে তাঁরা ইউরোপীয় বিচারকদের সমমর্যাদাসম্পন্ন এবং স্বদেশবাসীর আস্থাভাজন হবেন। [ক্রমশঃ]

জাগো নারায়ণ !

শ্রীমতী মানসী বরাট

বাঁশরীতে সুর তোলো কৃষ্ণকিশোর
নিদ্রিত সবাকার ভাঙো ঘুমঘোর
জাগাও পুরুষকার টুটাও বাঁধন
জাগো নারায়ণ !

ধর্মের গ্লানি আজ, কি যে হবে গতি !
ঘোরতর পাপভারে কাঁপে বসুমতী।
নিষ্কম্প কেন তব সাগর-শয়ন ?
জাগো নারায়ণ !

রাধাহৃদিরঞ্জন কালীয়দমন
শ্রীবৃন্দাবনধন ভালে চন্দন
যশোমতীনন্দন জগৎকারণ
জাগো নারায়ণ !

শত শত শিশুপাল শত অপরাধে
অপরাধী, তবু ঘোরে আত্মপ্রসাদে।
হে চক্রধারী হরি কমলনয়ন
জাগো নারায়ণ !

প্রেমের ঠাকুর

শ্রীপ্রীতীশ মিত্র

অশ্রুজলে হৃদয়বেদী
রাখবো মুছে তোমার তরে।
প্রেমের ঠাকুর বসবে আমার
শূন্য হিয়া পূর্ণ ক'রে।

এই বুঝেছি জীবনে সার
তুমি বিনে নেই কেউ আর

তোমার প্রেমের একটি কণা
অতল বিষাদসিন্ধু হরে।

আছো তুমি সর্বভূতে
তবু কেন পাই না ছুঁতে !
দাও ছুঁতে দাও রাতুল চরণ
রাখি বারেক হিয়ার 'পরে।

দয়া ক'রে ধরো হাত

শ্রীমুরারিশংকর ভট্টাচার্য

কেমনে বা হবো পার দুস্পার পারাবার
যদি তুমি কৃপা নাহি করো !

কৃপাময় দীননাথ ! দয়া ক'রে ধরো হাত
ভবভয় প্রভু মোর হরো।

অন্তিমে যেন পাই দরশন

শ্রীমতী গৌরী সেন

বড় অসহায় ওগো দয়াময়
করো মোরে তুমি চির-নির্ভয়
বিস্মৃত হয়ে আছি সংসারে
করো এ আশিস ভুলি না তোমারে।

বারে বারে যেন করি হে স্মরণ
চেয়ে দেখি যেন তোমার আনন
প্রীতি-প্রসন্ন ভব-কান্তারে
দীপ্তি যাহার জীবে নিস্তারে।

শ্রীগুরু তুমি হে ভবকাণ্ডারী
ফেরাও আমার ছোট্ট এ তরী
যেথায় আছেন প্রাণের শ্রীহরি
নিয়ে চলো আজি সেথা ত্বরা করি।

প্রাণনাথ হরি! দেখা দাও মোরে
ডাকি যে তোমায় সংসারঘোরে
মাগি হে তোমার চরণে শরণ
অন্তিমে যেন পাই দরশন।

রেশমী সুতো করছে উচাটন

শ্রীমতী ছায়া সরকার

দু হাত তুলে আমারো যে
নাচার ছিল সাধ!
লোভই আমার সাধলো সাধে বাদ
ভোগবাসনার রেশমী সুতো
বগলতলায় চাপা
একটি হাত বন্ধ ব'লে
ছন্দে চলে না পা
তোমার সঙ্গে নাচছি তবু
নাচে তো নাই মন!
বগলতলায় রেশমী সুতো
করছে উচাটন!
ছন্দে চলে না পা
স্বামী পুত্র রেশমী সুতো
বগলতলায় চাপা।

তোমায় ফাঁকি দিয়ে তোমার
জিনিস নিয়ে হায়
(এবার) ঘটলো একি দায়!
তোমার কৃপায় পূর্ণ করো
প্রভু আমার মন
(যেন) তোমার সুতো করতে পারি
তোমায় সমর্পণ।

হালকা ক'রে সুতোর বোঝা
(যেন) নাচতে পারি তোমার সনে
দু হাত তুলে সোজা
(যেন) রেশমী সুতোয় ভুলে না আর প্রাণ
দু হাত তুলে নাচার শক্তি
আমায় করো দান।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী

সংরক্ষণার্থ

আবেদন

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর নিকট 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী', ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩, পবিত্র তীর্থভূমি হিসাবে বহুপরিচিত। এই পবিত্র গৃহেই শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘাধিষ্ঠাত্রী জগজ্জননী শ্রীসারদামণি দেবী ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার লীলাবসান পর্যন্ত দীর্ঘ একাদশ বর্ষ বাস করিয়া ইহাকে তীর্থে পরিণত করিয়াছেন। এই স্থানেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম লীলাসহচর পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' রচনা করিয়াছিলেন, যে গ্রন্থের উপস্বত্ব সহায়ে তিনি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে এই গৃহটি নির্মাণ করান।

এই কেন্দ্র হইতেই যুগাচার্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত 'উদ্বোধন' পত্রিকা উহার দশম বর্ষ হইতে দীর্ঘ সত্তর বৎসর ধরিয়া প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে।

কিন্তু নানা কারণে এই তীর্থভূমি আজ কালের গ্রাসে জীর্ণপ্রায়। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে নির্মিত এই সুপ্রাচীন গৃহের দেওয়াল, ছাদ এবং কোন কোন স্থানে ভিত্তি পর্যন্ত দুর্বল হইয়া ইহার অস্তিত্বকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে।

সম্প্রতি বহুস্মৃতি-বিজড়িত এই প্রাচীন 'মায়ের বাড়ী' সংরক্ষণের জন্য আমরা বিশিষ্ট স্থপতি ও কুশলী বাস্তুকারদের পরামর্শ লইয়াছি, যাহাতে এই গৃহের মূল কাঠামো ও প্রাচীন আকার বজায় রাখিয়া ইহার মেরামত করা সম্ভব হয়। ইহার জন্য আনুমানিক দুই লক্ষ টাকা প্রয়োজন।

বর্তমানে সংস্কার-কার্যের জন্য অপরিহার্য এই বিপুল অর্থ আমাদের না থাকায় আমরা শ্রীশ্রীমায়ের ভক্তমণ্ডলীর নিকট একান্ত অনুরোধ জানাইতেছি, তাঁহাদের যাঁহার যতটুকু সামর্থ্য তাহা লইয়াই মাতৃপূজায় সাহায্য করুন।

সর্বপ্রকার দান 'প্রেসিডেণ্ট, রামকৃষ্ণ মঠ, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩' এই ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে। চেকে অর্থ দিলে তাহা 'রামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার' এই নামে লিখিতে হইবে। এই দান সরকারী আয়করমুক্ত।

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ
অধ্যক্ষ
রামকৃষ্ণ মঠ ('মায়ের বাড়ী'), বাগবাজার

স্নানযাত্রা
২০.৬.৭৮

বল্কলম্

শ্রীমতী সুনন্দা ঘোষ

স্থানের নাম বল্কলম্। নামটা শুনলেই মনে পড়ে শান্ত স্নিগ্ধ শ্যামল ছায়াঢাকা এক তপোবনের কথা। সত্যিই চারিদিকে তার চোখ-জুড়ান শ্যামলিমা। আরবসমুদ্রের উপকূলে নারকেলবনের আড়ালে ছোট্ট একখানি গ্রাম। দূরপাল্লার রেলগাড়ী সেখানে থামে না, সাধারণ পর্যটকদের তালিকায় সে জায়গার নাম স্থান পায় না।

ত্রিবান্দ্রামমুখী ব্যাঙ্গালোর এক্সপ্রেসটা (ব্যাঙ্গালোর-ত্রিবান্দ্রাম আইল্যাণ্ড এক্সপ্রেস) যখন ওই স্টেশনের ওপর দিয়ে শ্লথগতিতে চলছিল এক ঝলকের জন্য দেখেছিলাম বল্কলম্‌কে। নিজের অজান্তেই নামটা উচ্চারণ ক'রে বলেছিলাম—'বড় পবিত্র নাম'। মালয়ালী সহযাত্রীটি বোধহয় আমার উচ্চারিত দু'টি শব্দ বুঝেছিলেন—'বল্কলম্' আর 'পবিত্র'। ইংরাজীতে বললেন, 'বল্কলম্ কেরলের এক পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। এখানকার জনার্দনস্বামীর মন্দির অতি প্রাচীন। মনোমুগ্ধকর সমুদ্রতট। দেবর্ষি নারদের বল্কল এখানে পড়েছিল কিনা, তাই ওই নাম।'

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'দেবর্ষির বল্কল এখানে পড়ল কি ক'রে?'

"ওঃ, সে গল্প তো পুরাণেই আছে। বীণার সুরে কণ্ঠ মিলিয়ে হরিগুণগানে বিভোর হয়ে নারদ ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন লোক থেকে লোকান্তরে। ভক্তের সুললিত কণ্ঠে বন্দনাগান শুনে আত্মহারা বিষ্ণু তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলেন। বিষ্ণুলোক শিবলোক অতিক্রম ক'রে তাঁরা পৌঁছুলেন ব্রহ্মলোকে। ভক্তবৎসল ভগবানের এই অনুগ্রহ দেখে শ্রদ্ধাবনত ব্রহ্মা তাঁর যাত্রাপথের ওপর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। সচকিত বিষ্ণু সম্বিৎ ফিরে পেয়ে মুহূর্তের মধ্যে অন্তর্হিত হলেন। প্রণামশেষে মাথা তুলতেই ব্রহ্মা দেখলেন কোথায় বিষ্ণু?—সমুখে দাঁড়িয়ে আপন পুত্র নারদ। নয়জন প্রজাপতি এই ব্যাপার দেখে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন। অপ্রতিভ অপমানিত ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁদের অভিশাপ দিলেন, 'মনুষ্যজন্ম নিয়ে মর্ত্যে গিয়ে অশেষ দুঃখ ভোগ কর।' প্রজাপতিরা বুঝলেন কাজটা ভাল হয় নি। তাঁরা নারদের শরণাপন্ন হলেন। নারদ বললেন, 'যেতে তোমাদের হবেই। তবে সেখানে গিয়ে বিষ্ণুর আরাধনা কর, শান্তি পাবে।' কিন্তু এই বিশাল জগতে কোথায় ব'সে করবেন তাঁরা বিষ্ণুর ধ্যান? স্থানও নির্দিষ্ট ক'রে দিলেন নারদ। ব্রহ্মলোক থেকে নিক্ষেপ করলেন নিজের উর্ধ্বাঙ্গের বল্কলখানি। বল্কল এসে পড়ল ভারতবর্ষের পাদদেশে এই ক্ষুদ্র গ্রামে। মর্ত্যযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে অভিশপ্ত প্রজাপতিরা প্রতিষ্ঠা করলেন 'স্বামী জনার্দন'কে।—মর্ত্যজনের তিনি অর্দন, পরমগতি।"

ত্রিবান্দ্রাম দেখার পর দলের কাছে প্রস্তাব রেখেছিলাম—'বল্কলমের জন্য কি মাত্র একটি বেলা খরচ করা যায় না?' কথাটা ওঁরা প্রথমে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কারণ দক্ষিণভারত মন্দিরময়, আর সমুদ্র কোথায় নেই?—কোবলম্ (Kovalam), কন্যাকুমারী, কোচিন সর্বত্র। যাই হোক, সেদিন তর্কে

জিতে কয়েক ঘণ্টার জন্য আমরা ত্রিবান্দ্রাম ত্যাগ করব স্থির করেছিলাম। ত্রিবান্দ্রামের ছাব্বিশ মাইল উত্তরে চিরাইন্কিল্ তালুকে বক্কলম্,—সুতরাং যেতে সময় বেশী লাগবে না। ভোর ছটায় ট্রেন বেনড এক্সপ্রেস (Trivandrum-Ernakulam Venad Express)।

নামেই ছটা কিন্তু ভোর হতে এখনও অনেক বাকি। তবু এই শেষরাতে মালয়ালীরা অনেকেই স্নান সেরে পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে কপালে বিভূতির রেখা এঁকে প্রস্তুত হয়ে এসেছেন। ট্রেনের কামরায় বসে সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠা ওল্টাচ্ছেন।

৮ই জানুআরি ১৯৭৮। বক্কলমে পৌঁছুতেই অন্ধকার কাটল। নাগরী হরফে লেখা প্রিয় নামটির ওপর চোখ বোলাতে গিয়ে দেখি পাশে কয়টি ইংরাজী অক্ষর—VARKALA। উঃ, বিদেশীদের হাতে পড়ে এমন সুন্দর নামটারও এই পরিণতি? উচ্চারণ করলেই মনে হয় 'বড়-কালা', এ কি বিদ্রূপ? এখানকার অধিবাসীরা কানে কালা, না বর্ণে কালা? কিন্তু পরিসংখ্যান বলে ভারতবর্ষের এই প্রদেশের মানুষগুলোরই নাকি চোখ কান সব চাইতে বেশী খোলা। কেরলে শতকরা একষট্টি জনের নিরক্ষরতা ঘুচে গেছে। আর বর্ণে ওঁরা অনেকেই কালো তা ঠিক।—বিষুব সূর্যের আগুনে পুড়ে মলিন হয়েছে ওঁদের বর্ণ। কিন্তু সামাজিক আর রাজনৈতিক আগুনে পুড়ে ওঁরা এখন বিশুদ্ধ স্বর্ণ।

বক্কলম্ আমাদের কাছে সম্পূর্ণ নূতন। কেউই কিছু চিনি না, মালয়ালাম ভাষা জানি না, দক্ষিণে হিন্দী অচল, তবু অনেকেই ইংরাজী বোঝেন, বলেন। কিন্তু আশেপাশে কাউকেই তেমন দেখছি না। তাই অগত্যা একটা চায়ের দোকানে ঢুকে পড়তে হ'ল। ব্যবসায়ীকে পাঁচজনের সঙ্গে কথা বলতে হয়, যদি বা আমাদের কথা বোঝেন। কিন্তু দেখি এখানেও আমরা সকলে মূকাভিনয় করছি। তবু কিছু কাজ হ'ল। উনি আমাদের একটা ট্যাক্সি ঠিক ক'রে দিলেন। চারটে দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়ে আবার এখানেই পেঁ'ছে দেবে, ভাড়া নেবে দশ টাকা।

পাহাড়ী গ্রাম বক্কলম্কে ঘিরে নিরবচ্ছিন্ন নারকেলবনের নীলিমা। মাঝে মাঝে শস্য-খেতের শ্যামলিমা। গৃহস্থের আঙিনাতেও নারকেল গাছ, সব্জীর চারা, ফলভারে ন্যুব্জ কদলীকাণ্ড, প্রস্ফুটিত গোলাপী জবা, প্রবেশ-দ্বারের দুই পাশে পুষ্পিতলতা ঊর্ধ্বে উঠে আলিঙ্গনাবদ্ধ। তরঙ্গায়িত সর্পিল পথ বেয়ে ট্যাক্সিচালক আমাদের নিয়ে চলেছেন পূর্বদিকে। সূর্য এখনও ওঠেনি। বাতাসে সামান্য ঠাণ্ডার আমেজ আছে।

পাহাড়ের গা বেয়ে ক্রমাগত ওপরে উঠে ট্যাক্সি এসে থামল এক সোপানশ্রেণীর সমুখে। এই হ'ল শিবগিরি। কেরলের ধর্মগুরু আর সমাজসংস্কারক শ্রীনারায়ণগুরুর সমাধিক্ষেত্র। কি শুভক্ষণে শিবগিরিতে পৌঁছেছি জানি না—এক অনন্ত শান্তির অমৃত আস্বাদন করছি। পাহাড়চূড়ায় শ্বেতশুভ্র মন্দির, মন্দিরশীর্ষে প্রথম সূর্যের সোনালী কিরণ, বাতাসে নিস্তরঙ্গ নিস্তব্ধতা। মন্দিরের পাদমূলে চক্রাকারে বিছানো মুক্তোর মত কাঁকরদানা। কাঁকরদানার শেষে পুষ্প-লতার কেয়ারি, কেয়ারির শেষে পাহাড়ী ঢাল। কাঁকরের গালিচায় কম্পন তুলে উঠে এসেছি মন্দিরদালানে। ভেতরে দেখছি শ্রীনারায়ণগুরুর উপবিষ্ট মূর্তি।

এই শান্ত সৌম্য মূর্তির প্রতিচ্ছবি দেখে

আসছি সেই মাদ্রাজ থেকে ত্রিবান্দ্রাম পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি স্টেশনে, দোকানে, মানুষের বাসস্থানে। ভূমিষ্ঠ প্রণাম ক'রে বললাম, 'আশীর্বাদ কর মানুষকে যেন মর্যাদা দিতে পারি।' নিষ্পেষিত মানুষের মর্যাদাকে পুনরুদ্ধারের জন্য শ্রীনারায়ণগুরুর অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা এদেশের মানুষ কখন ভুলবে না। দক্ষিণ ভারতের জনমানসে তিনি এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। কি সাহিত্যের ইতিহাস, কি ধর্মের ইতিহাস, কি সমাজজীবনের ইতিহাস—সব কিছুর মধ্যেই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন শ্রীনারায়ণগুরু।

একজন সন্ন্যাসী আমাদের হাতে চরণামৃত দিলেন। তারপর মালয়ালাম ভাষায় কিছু ব'লে অন্য এক সোপানশ্রেণীর দিকে নির্দেশ করলেন। সেগুলি বেয়ে নেমে আসতেই সামনে পড়ল ছোট্ট একটি রুদ্ধদ্বার মন্দির, আর তার ডান দিকে একখানি ঘর। লোহার গরাদের ফাঁক দিয়ে সে ঘরের বেশ খানিকটা দেখা যাচ্ছে। মেঝের শয্যায় বালিশে হেলান দিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে শ্রীনারায়ণগুরুর একখানি ছবি। হঠাৎ সবিস্ময়ে দেখি দরজার মাথায় টাঙানো অপর একটি ছবির মধ্যে মুখোমুখি ব'সে আছেন রবীন্দ্রনাথ আর শ্রীনারায়ণগুরু। 'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীনারায়ণগুরুর দেখা হয়েছিল নাকি?'—দলনেতাকে জিজ্ঞাসা করলাম। কিন্তু উনি উত্তর দেবার আগেই ঘরের পেছন থেকে একজন সন্ন্যাসী এগিয়ে এসে ইংরাজীতে উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথ শিবগিরিতে এসেছিলেন ১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে। সিংহল থেকে ফেরবার পথে ত্রিবান্দ্রামে উনি গুরুজীর কথা শোনেন। তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে শিবগিরিতে এসে সাক্ষাৎ করেন। পরের বছর আসেন গান্ধীজী। এর বছর পাঁচেক পরেই ১৯২৮ সালে এই ঘরখানিতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ওপরে সমাধি আছে দেখে আসুন।'

সমাধি দেখা হয়ে গেছে জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—'এই রুদ্ধদ্বার মন্দিরটি কার?'

'এটি সারদামায়ের গুরুজী এটি প্রতিষ্ঠা করেন ১৯১২ সালে।'

প্রশ্ন করলাম—'শুনেছি তাঁর বাণী ছিল "এক জাতি, এক ধর্ম, এক ঈশ্বর"—তবে কেন এই মন্দির?'

সন্ন্যাসীটি বললেন—'গুরুজী মনে করতেন অন্তরের পবিত্রতা রক্ষার্থে মন্দিরের প্রয়োজন। এটি শেষ লক্ষ্যে পৌঁছুবার পথস্বরূপ। মন যখন একটা নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে যায়, তখন আর মন্দিরের প্রয়োজন থাকে না। তবে যিনি এ সবে বিশ্বাসী নন তাঁর জন্য অন্য পথ চিন্তা করতে হবে। সেইজন্য যে গুরুজী এত মন্দির গড়েছেন, গড়তে উৎসাহিত করেছেন, তিনিই আবার ১৯১৭ সালে বলেছেন—"তোমরা আর মন্দির গ'ড়ো না। কেননা মানুষের মনে মন্দিরের মূল্য কমে গেছে।" শ্রীনারায়ণগুরুর তৈরি একটি মন্দিরে কোন বিগ্রহ নেই, আছে একটি বিরাট আয়না।—আয়নায় আপনাকে দেখ, চেন, জান। গুরুজী বলতেন, "সকল সুকর্মের উৎস হ'ল উন্নত আর প্রশস্ত মন।"'

সন্ন্যাসীটির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এক দীর্ঘ সোপানশ্রেণীর চূড়ায় এগিয়ে এলাম। অনেকটা নামতে হবে। ট্যাক্সিচালক আমাদের জন্য পাহাড়ের নিচে অপেক্ষা করবেন।

নামছি আর ভাবছি, আজকের কেরল-বাসীর মনের দিগন্ত কত প্রশস্ত। অথচ এককালে এই কেরলের ব্রাহ্মণকুল 'জাতের

নামে বজ্জাতি' কতই না করেছেন! যুগ যুগ ধরে অন্ত্যজদের ওপর চলেছে তাঁদের অকথ্য অত্যাচার। ব্রাহ্মণদের ত্রিসীমানায় আসা অন্ত্যজদের নিষেধ ছিল। এমন কি নায়ারদের (যোদ্ধা) কাছ থেকেও কম ক'রে চব্বিশ ফুট দূরে থাকতে হ'ত। অন্যথা হলেই যথেচ্ছ নিষ্পেষণ। অথচ অন্ত্যজ নারী তাঁদের কাছে সব সময়ে অস্পৃশ্যা ছিল না। স্বামী বিবেকানন্দ এই সব কাণ্ডকারখানা দেখে এই প্রসঙ্গে ব'লেছিলেন, কেরল একেবারে 'পাগলাগারদ'। অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা তিনি করেছিলেন শ্রীনারায়ণের গুরু চট্টম্পিস্বামীর সঙ্গে। এর্নাকুলামে একবার একটা গোটারাত অতিবাহিত হয়েছিল এইসব আলোচনায়। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য চট্টম্পিস্বামী, স্বামী নির্মলানন্দ, কেরলের শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধক স্বামী আগমানন্দ অনেকেই সচেষ্ট ছিলেন, কিন্তু নারায়ণগুরুর দান সর্বোচ্চে। নিজে অন্ত্যজ এঝাওয়াকুলে জন্মেছিলেন ব'লে প্রতি মুহূর্তে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতেন সমাজের তথা-কথিত নিম্নস্তরের মানুষগুলির লাঞ্ছনা-বঞ্চনার গ্লানি। হয়ত এই লাঞ্ছনা-গঞ্জনার কথা স্মরণ ক'রে ১৮৫৪ সালের বিশে সেপ্টেম্বর নবজাত শিশুটির মুখ চেয়ে কুট্টিআম্মার বক্ষ ভেদ ক'রে বেরিয়ে এসেছিল একটি চাপা দীর্ঘশ্বাস। তবু মানুষ আশা নিয়েই বেঁচে থাকে। আপন সন্তানকে মানুষের মত মানুষ করতে ইচ্ছে হয়। তাই 'নানু' একটু বড় হ'তেই পিতা মদন আসান আর কুট্টিআম্মা তাকে চেম্পাথান্‌ঝি গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি ক'রে দিলেন। সেই নানু একদিন সংস্কৃতভাষা বেদ উপনিষদ্ যোগবিদ্যায়পারদর্শী হয়ে বহু গুণীজনের সংস্পর্শে এসে নিজেকে প্রস্তুত করলেন এক বৃহত্তর সংগ্রামের জন্য। কেরলের বহু গ্রামে-শহরে প্রতিষ্ঠা করলেন সংস্কৃত বিদ্যালয় মঠ মন্দির। জনজাগরণের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন। ১৯০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হ'ল 'শ্রীনারায়ণ ধর্ম পরিপালয় যোগম্' সংস্থা। আজ কুট্টিআম্মার সেই ছোট্ট নানু কেরলের নিপীড়িত মানুষের মুক্তিদাতা।

শিবগিরি থেকে সোজা চলে এলাম বর্কলমের সমুদ্রতীরে। কিছু পথ হাঁটতে হ'ল, কারণ সমুদ্রতট বন্ধুর প্রস্তরময়। এখানকার সৌন্দর্য অতুলনীয়। দিগন্তে নীল আকাশ আর নীল সমুদ্রে মাখামাখি, নিকটে অর্ধমগ্ন প্রস্তর আর সমুদ্রজলে মাতামাতি। উপকূলে বর্ণময় পর্বত আর তরঙ্গময় সমুদ্র পাশাপাশি হাত ধরাধরি ক'রে চলে গেছে বহুদূর। নথিপত্রের হিসাবে ওদের এই বন্ধুত্বের ব্যাপ্তি বাইশ মাইল। বাইশ মাইল বিস্তৃত এই প্রস্তরময় ভূখণ্ডের ইংরাজী নাম 'ভারকালা ক্লিফ্‌স্'। ভূতাত্ত্বিকদের কাছে ভারকালা ক্লিফ্‌স্ অত্যন্ত আকর্ষণীয়। নানারকমের বালি পাথরে তৈরি এই অনুচ্চ পর্বতমালা নাকি 'ইয়োসিন্' (eocene) যুগের। বহু বহু বছর আগে ভূকম্পনের ফলে সমুদ্রের তলদেশ থেকে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল এক বিরাট ভূখণ্ড। দক্ষিণসমুদ্রের জলহাওয়ার সংস্পর্শে এসে এই রূপ পরিগ্রহ করেছে। পাহাড়ের ফাটল দিয়ে যে কয়টি ঝরনা বেরিয়ে এসেছে তাদের জল খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ।

দলনেতা বললেন, 'দেখ, লোকশিক্ষার্থে আমাদের পুরাণকাররা বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কেমন সুন্দর কাহিনী রচনা করেছেন। একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করবার পর পিতামহ ঋচীকের অনুরোধে পরশুরাম এই দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়ে এক মহাযজ্ঞ করলেন। যজ্ঞের দান হিসাবে সমস্ত পৃথিবী কশ্যপকে

দিলেন। নিজে দাঁড়িয়ে থাকবার মত সামান্য জমিটুকুও তাঁর রইল না। তখন তিনি সমুদ্রের দেবতা বরুণের কাছে কিছু ভূমি প্রার্থনা করলেন। বরুণ স্বীকৃত হয়ে তাঁকে কুঠার নিক্ষেপ করতে বললেন। কন্যাকুমারিকায় দাঁড়িয়ে পরশুরাম হাতের কুঠারখানি নিক্ষেপ করলেন। কুঠার গিয়ে পড়ল সহ্যাদ্রির কাছ বরাবর সমুদ্রজলে। কন্যাকুমারী থেকে গোকর্ণম্ (গোয়া) পর্যন্ত আরবসাগরের গর্ভ থেকে আবির্ভূত হ'ল এক নূতন ভূখণ্ড,—সেটাই কেরল। পুরাণকাররা যে কথা বলেছেন বহু যুগ আগে, আজকের ভূতাত্ত্বিকরা সেই তথ্যই পরিবেশন করছেন অনেক গবেষণার ফলে।'

পাহাড়ের ওপর থেকে একটা জলস্রোত গড়িয়ে এসে সমুদ্রে পড়ছে। সমুদ্রতটে পরিচিত এক ভদ্রলোক বললেন ওই জলধারা আসছে 'পাপনাশম্ কুণ্ড' থেকে। জনার্দন-মন্দিরের বিপরীতে পাপনাশম্ কুণ্ড আমরা ফিরতি পথে দেখব। প্রস্তরময় সমুদ্রে স্নানার্থী কেউ নেই। অল্পজলে ব'সে কয়েকজন পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদান করছেন। ভদ্রলোকটি বললেন, 'বল্কলম্ দক্ষিণের বারাণসী, কেরলের গয়া। মালয়ালীরা তাই এখানে পিণ্ডদান ক'রে পিতৃপুরুষকে বন্ধনপাপ থেকে মুক্ত করেন। সেইজন্য এই সমুদ্রতটের নাম "পাপনাশম্ কদলপুরম্"।'

কয়েকজনকে দেখছি পাহাড়ী বাঁকের আড়াল থেকে ভিজে কাপড় হাতে স্নান সেরে ফিরছেন। শুনলাম ওদিকে ঝরনা আছে। পাপনাশমের স্রোত পার হয়ে আমরা সেদিকে এগুলাম। পথে বালির ওপর প্রস্তরখণ্ডের পাশে পড়ে আছে এক বিশালবপু চিংড়ি। ওজন প্রায় কেজি দুয়েক হবে। বর্তুলাকার অসহায় চোখ মেলে চারিদিকে চাইছে। নড়বার ক্ষমতা নেই। ওর শুঁড় ধরে শূন্যে তুলতেই দাঁড়া নেড়ে মুক্তির জন্য মিনতি জানাতে লাগল। পাপনাশম্ কদলপুরমের ঘাটে দাঁড়িয়ে ওকে বন্ধনমুক্ত করা অবশ্য কর্তব্য। তাই ওকে মুক্তি দিতে পৌঁছে দেওয়া হ'ল সমুদ্রজলে। অতি সন্তর্পণে জলে ছেড়ে দিতেই সে মুহূর্তে হারিয়ে গেল।

পাথুরে পাঁচিল ভেদ ক'রে বেরিয়ে আসছে কয়েকটি জলধারা। স্নানার্থীরা ফাটলে কাঠের টুকরো, ভাঁজ করা পাতা গুঁজে জলধারাকে সঙ্কুচিত ক'রে চমৎকার স্নানের ব্যবস্থা করেছেন। পরিচিত ভদ্রলোকটি যিনি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিলেন, বললেন, 'খনিজ পদার্থে পূর্ণ এই জলের ওষধিগুণ প্রচণ্ড। অনেকে তাই বল্কলমে স্বাস্থ্যোদ্ধারে আসেন। এখানকার মাটিতে এককালে স্বর্ণখণ্ডও পাওয়া যেত। ঘন ঘন ভূকম্পনের ফলে আগে মানুষ এখানে বসবাস করতে ভয় পেত, সেইজন্য পরশুরাম বল্কলম্‌কে শীতল করতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন স্বর্ণকণার রাশি। যে স্বর্ণখণ্ডগুলি কিছুকাল আগেও পাওয়া গেছে সেগুলি পরশুরামের প্রোথিত।'

ওখান থেকে আমরা সকলে কথা বলতে বলতে জনার্দন-মন্দিরের দিকে ফিরলাম। আমরা চড়াই উঠছি, বাঁয়ে পাপনাশমের স্রোত ত্রস্তপদে উৎরাই নামছে। পাড়ে সবুজ ধানের ক্ষেত। মালয়ালী সঙ্গীটি বললেন, 'বল্কলম্ তীর্থ প্রাচীন হ'লেও এর যা কিছু জলুস দেখছেন সবই নবীন। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিবাঙ্কুর মহারাজার দালওয়া (দেওয়ান) বল্কলমের উন্নতিকল্পে বনজঙ্গল সাফ ক'রে চব্বিশ ঘর ব্রাহ্মণকে বসতি দেন। তাঁদেরই

বংশধরেরা এখানে আছেন। আর আছেন কিছু নায়ার, এঝাওয়া, মুসলমান, খ্রীষ্টান।' ভাবলাম বঙ্কলমের এ উন্নতি না হ'লেই ছিল ভাল। পাকারাস্তার জালে এখন পর্বত চাপা পড়েছে। অরণ্যের অপসারণে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

জনার্দন-মন্দিরের পাদদেশে আমাদের গাড়ী অপেক্ষা করছিল। এবার আর একটি সঙ্গী বাড়ল। ট্যাক্সিচালক আমাদের সঙ্গে মন্দিরে এলেন। পাহাড়চূড়ায় প্রশস্ত অঙ্গনের মাঝখানে ধানের গোলার মত অদ্ভুত গঠনের মন্দির। মন্দিরের গোল ছাউনি চাষীদের টোকার মত একটি বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। মন্দিরের ঊর্ধ্বাংশ কাঠের, নিম্নাংশ পাথরের। টোকার মত কাঠের ছাউনিটি আবার তামার পাতে মোড়া। সামনের নাটমন্দিরে নানা অলঙ্করণ। স্তম্ভের গায়ে বদ্ধকরাঞ্জলি মনুষ্য-মূর্তি। মুকুট আর আভরণের গড়ন দেখে মনে হ'ল কোন পাণ্ড্যরাজা। পুরোহিত প্রদীপের আলোয় বিগ্রহ দর্শন করালেন—চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি। তিনটি হাতে শঙ্খ, চক্র ও গদা। বাঁদিকের নিচের হাতটি শূন্য—তাতে আভোজন মুদ্রা।

মন্দিরে প্রাপ্ত একটি শিলালিপি থেকে জানা গেছে এটি সংস্কৃত হয়েছিল ১২৫২ । সেই মহাভারতের যুগ থেকে নবম শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত কেরলে রাজত্ব করে এসেছেন 'চের'-রাজারা। তারপরে আসেন চোল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মাদুরা থেকে এসেছিলেন পাণ্ড্যরা। জনার্দন-মন্দিরের সংস্কার করেছিলেন কোন এক পাণ্ড্যরাজা। স্তম্ভের গায়ে এ মূর্তি তাঁরই।

পাণ্ড্যদের পর স্থানীয় রাজারা আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে দেশ শাসন করতে থাকেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এঁদের একত্র করেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজা মার্তণ্ডবর্মা। সে সময় বঙ্কলমের নাম হয়েছিল 'উদয় মার্তণ্ড-পুরম্'।

সঙ্গী ভদ্রলোকটি এবার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন মন্দির-প্রাঙ্গণে অবস্থিত একটি বিরাট ঘণ্টার প্রতি। বিদেশী এই ঘণ্টাটির গায়ে লাতিন ভাষায় কিছু লেখা আছে। হিন্দুমন্দিরে এই বস্তুটি কৌতূহলো-দ্দীপক সন্দেহ নেই। পুরোহিত ঠাকুর বললেন, 'এখান থেকে ছয় মাইল দক্ষিণে আঞ্জেনগোতে ওলন্দাজ ব্যবসায়ীদের একটি কুঠি ছিল। একবার ওদের একটা মালবোঝাই পালতোলা জাহাজ বাতাসের অভাবে বঙ্কলমের সমুদ্রে আটকা পড়ে। জাহাজের ক্যাপ্টেন জনার্দন-মন্দিরের তৎকালীন পুরোহিতকে বললেন—"খুব তো বল, তোমাদের ঠাকুর সর্বশক্তিমান। পারেন বাতাস বওয়াতে?" "নিশ্চয়ই পারেন" —ব'লে পুরোহিত সন্ধ্যারতির পর মন্দিরদ্বার রুদ্ধ ক'রে হাত জোড় ক'রে পড়ে রইলেন। বললেন, "ঠাকুর মুখ রেখো। তোমার অপমান যে সইতে পারিনে।" ভোর হ'তে না হ'তেই ঘণ্টা ঘাড়ে ক'রে ক্যাপ্টেন হাজির। কালরাত থেকে বাতাস বইছে। এবার তিনি জাহাজ ছাড়বেন।'

জনার্দনস্বামীকে আর একবার প্রণাম ক'রে নেমে এলাম।

সোপান বেয়ে নেমে এসে ডানদিকে দেখলাম চক্রতীর্থ। অভিশপ্ত প্রজাপতিরা জনার্দনমূর্তি প্রতিষ্ঠার পর দেখেছিলেন অর্চনার জন্য পূতবারির অভাব। তাঁদের প্রার্থনায় বিষ্ণু স্বয়ং চক্র দিয়ে ভূগর্ভ ভেদ ক'রে জলকুণ্ড সৃষ্টি করেছিলেন।

পাপনাশম্ কুণ্ডের উৎপত্তি সম্বন্ধেও কিংবদন্তী আছে। একবার ব্রহ্মা এখানে এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করেছেন,—ধুন্ধুমার কাণ্ড। ভাবছেন 'আমার মত যজ্ঞ করা অন্যের সাধ্যাতীত।' এমন সময় সেখানে আবির্ভূত হলেন এক অতিবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। তিনি কিছু আহার্য চাইলেন। যজ্ঞস্থলের সমস্ত খাদ্য পানীয় শেষ ক'রেও তাঁর ক্ষুন্নিবৃত্তি হ'ল না। তখন তিনি ব্রহ্মাকে তিরস্কার ক'রে বললেন, 'এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে যে তৃপ্ত করতে পারে না, সে তৃপ্ত করবে অগ্নিকে?' ব্রহ্মা বুঝতে পারলেন এই বৃদ্ধ স্বয়ং বিষ্ণু। আত্মগ্লানিতে যজ্ঞ বন্ধ ক'রে সঞ্চিত সমস্ত তীর্থবারি নিক্ষেপ করলেন। নিক্ষিপ্ত সেই তীর্থবারি থেকেই পাপনাশম্ কুণ্ডের উৎপত্তি। এর জলস্পর্শ করলে জীব পাপমুক্ত হয়।

আমাদের মালয়ালী সঙ্গীটি এবারে প্রস্তাব করলেন,—'চলুন, আপনাদের একটা নতুন জিনিস দেখাই।' ট্যাক্সিতে উঠে আমরা আবার ফিরে চললাম শিবগিরির দিকে।

উনি বললেন, 'দেখুন, প্রকৃতি আমাদের কেরলকে প্রচুর দিয়েছেন। তার মধ্যে একটি বিশিষ্ট দান হ'ল মালার মত সাজানো কয়েকটি হ্রদের সমষ্টি। উত্তরের এ্যালেপ্পে থেকে দক্ষিণে ত্রিবান্দ্রাম পর্যন্ত আরব সাগরের উপকূল বরাবর সমান্তরালভাবে তারা বিন্যস্ত। মহাসমুদ্র থেকে তাদের ব্যবধান কোথাও সাত মাইল, কোথাও বা মাত্র আধ মাইল। দু'একটি হ্রদ কেবল সঙ্কীর্ণ পথে মহাসমুদ্রের সঙ্গে সংযুক্ত। এই হ্রদগুলি আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ড দ্বারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। এখন, এই ব্যবধানগুলি যদি ভেঙ্গে ফেলা যায় তবে ত্রিবান্দ্রাম থেকে তিরুর পর্যন্ত দু'শো কুড়ি (২২০) মাইল বিস্তীর্ণ জলপথ পাওয়া যায়। চাই কি আরও আটষট্টি (৬৮) মাইল উত্তরে সেই 'বেপুর' পর্যন্ত জলপথেই (Back Water) মাল-পরিবহনের কাজ করা চলতে পারে। —এই কথা ভেবে ত্রিবান্দ্রামের রানী গৌরী পার্বতী বাঈ ব্যবধান ভাঙ্গতে খালখননের কাজ শুরু করেন। কয়েকটি হ্রদকে যুক্ত করবার পর দেখা গেল মাঝখানে বিরাট বাধা হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে বল্কলম্ পর্বতমালা। সেইজন্য ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে পাহাড় ভেদ ক'রে পথ তৈরির কাজে হাত দেওয়া হ'ল। বল্কলম্ পাহাড়ের ভেতর অশ্বক্ষুরাকৃতি দু'টি সুড়ঙ্গ খুঁড়ে দুইভাবে যোগাযোগ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হ'ল। খরচ পড়ল আঠারো লাখ টাকা। একটি সুড়ঙ্গের দৈর্ঘ্য ৯২৪ ফুট, অপরটি ২৩৬৪ ফুট। প্রথমটি ১৮৭৭ সালে এবং দ্বিতীয়টি ১৮৮০ সালে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হ'ল। এই দেখুন সেই সুড়ঙ্গের একটি মুখ।'

পাহাড়ী পথের ওপর দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে দেখছিলাম মানুষের এই দুঃসাহসিক কীর্তি। সুড়ঙ্গপথে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল একটি ডিঙ্গি নৌকা। আজ আমার বল্কলমে আসা সার্থক।

স্টেশনে ফিরবার সময় দেখি ট্যাক্সির পিছু পিছু আসছে একটি ত্রিবান্দ্রামগামী বাস। সঙ্গী ভদ্রলোকটির উপদেশমত আমরা মাঝ-পথে নেমে পড়লাম। ট্রেনের সময় অনেক পরে। বাসই আগে পৌছুবে। কেরালা স্টেট ট্রান্সপোর্টের রক্তরাঙা শকটের অভ্যন্তরে বসে গলা বাড়িয়ে দেখছি আমাদের ফেলে আসা দুই সঙ্গীকে। ওঁদের ঊর্ধ্ববাহু আন্দোলিত হচ্ছে। ঢালুপথে আমাদের গাড়ী নেমে এল উৎরাই-এর শেষ প্রান্তে। ওঁদের এখনও দেখতে পাচ্ছি।—পরনে সাদা হাফ্ সার্ট আর লুঙ্গির মত ক'রে পরা সাদা ধুতি হাঁটু থেকে

ভাঁজ ক'রে কোমরে গোঁজা। এ বস্ত্রখণ্ড যেন বল্কলেরই প্রকারভেদ। ধীরে ধীরে ওঁরা দৃষ্টিপথ থেকে অপসৃত হলেন। কিন্তু আমার মানসপটে শুভ্রতুলির টানে চিরকালের জন্য ধরা রইল ওঁদের আতিথ্য আর বল্কলের শুক্লিমা।

প্রার্থনা

ব্রহ্মচারিণী সুমিত্রা

[পূর্বানুবৃত্তি]

বৈদিক যুগের ঋষিরা ছিলেন শান্তরতি। চৈতন্যভাগবতে বলা হয়েছে—'শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতা-গন্ধহীন। পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান-প্রবীণ। কেবল স্বরূপজ্ঞান হয় শান্তরসে।' ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন—'ঋষিদের শান্ত ভাব ছিল।' সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হয়ে কঠোর তপস্যার মধ্য দিয়ে অদ্বৈততত্ত্বে উপনীত হবার তীব্র ব্যাকুলতাই তাঁদের মূলমন্ত্র। সমস্ত ভাবাবেগকে অতিক্রম করে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যোপলব্ধি করতেই তাঁরা বদ্ধপরিকর। 'ঋষিরা সর্বদা হয় নির্জনে, নয় সাধুসঙ্গে থাকতেন—তাই তাঁরা অনায়াসে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করে ঈশ্বরেতে মন যোগ করে-ছিলেন—নিন্দা, ভয় কিছু নাই। ত্যাগ করতে হলে ঈশ্বরের কাছে পুরুষকারের জন্য প্রার্থনা করতে হয়। যা মিথ্যা বলে বোধ হবে, তৎক্ষণাৎ ত্যাগ। ঋষিদের এই পুরুষকার ছিল।'

(কথামৃত, ৫।১৪।১)

বস্তুত উত্তুঙ্গ অদ্বৈতশিখরে আরোহণের একমুখী ভাবকে শান্তরসাবলম্বী ঋষিকুল উপনিষদে সর্বপ্রকারে অব্যাহত রাখেন। এখানে আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করি, উপাখ্যানের মধ্যে প্রত্যেক প্রার্থী আত্মজিজ্ঞাসু, অমৃতত্বা-ভিলাষী। দুর্লভ অধিকারীর সমাবেশে শ্রুতি দুর্লভ অনুভূতি-রাজ্য উদ্ঘাটন করেছেন। অধ্যাত্ম-রাজ্যে তাই উপনিষদের প্রার্থনাগুলি উচ্চকোটির। কেনোপনিষদে—'কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ'—মন্ত্রে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, কঠোপনিষদে—'যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে'—দ্বারা আত্মতত্ত্বের প্রার্থনা, বৃহদারণ্যকে —'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্'—মন্ত্রে মৈত্রেয়ীর বৈরাগ্যপূর্ণ উক্তি; মুণ্ডকে—'কস্মিন্ন্ ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি'—প্রভৃতি তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসাগুলি নিঃসংশয়ে ওই যুগের তীব্র সত্যানুসন্ধিৎসা প্রমাণ করে।

পৌরাণিক যুগ বিশেষভাবে অবতারবাদ ও ভক্তিভাবের যুগ। 'সনাতন হিন্দুধর্মে সাকার নিরাকার দুই মানে; নানাভাবে ঈশ্বরের পূজা করে; শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর। রোশনচৌকিওয়ালারা একজন শুধু পোঁ ধরে বাজায় অথচ তার বাঁশীর সাত ফোকর আছে; কিন্তু আর একজন তারও সাত ফোকর আছে, সে নানা রাগরাগিণী বাজায়।' (কথামৃত, ৫।১।৩) 'তিনি নিরাকার-সাকার হয়ে আছেন, আরও কত কি! যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা। সেই বাক্যমনের অতীত যিনি, তিনি নানারূপ ধরে অবতীর্ণ হয়ে কাজ করছেন।' (৫।১৩।২) বেদ, পুরাণ তন্ত্র—সব শাস্ত্রে তাঁকেই চায়, আর কারুকে চায় না—সেই এক সচ্চিদানন্দ। যাঁকে বেদে

নন্দ ব্রহ্ম' বলেছে, তন্ত্রে তাঁকেই 'সচ্চিদানন্দ শিব' বলেছে, তাঁকেই আবার পুরাণে 'সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ' বলেছে।"

(কথামৃত, ২।১৩।৩)

মানুষ যখনই সেই বিরাটের ধ্যানে, তাঁর ভাবধারণে অক্ষম হ'ল, অথবা ওই অদ্বৈত-ভাবের একাত্মতায় পরিতৃপ্ত হ'ল না, তখনই ব্যক্তি-ঈশ্বরের যুগ শুরু হ'ল। উপনিষদের যুগে ব্রহ্মের কাছে প্রার্থনার ঋজুভঙ্গী ও চিত্তের একতানতা যেন সানাই-এর 'পোঁ ধরে থাকা' নিরবচ্ছিন্ন সুরস্থিতি। পরবর্তী কালে মানব-অন্তরের প্রেম-বিচ্ছেদ-বিরহ-মিলনের রঙে চুনীমুক্তাপান্নার মতো বর্ণসুষমায় মণ্ডিত হ'ল প্রার্থনা,—ঝলমল ক'রে উঠলো হৃদয়ের দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর-ভাবগুলি।

মহাবিশ্বে একাকী পুরুষের মধ্যে যখনই জেগেছে বহু হবার বাসনা, আস্বাদনের ইচ্ছা, তখনই অলক্ষিতে ভক্ত-ভগবানের এক গোপন মধুচক্রের নির্মিতি। কখনও ভক্ত ভ্রমর, ভগবান পদে পদে স্বাদু মধুরস, অথবা কখনও কোন দুর্লভ-ভক্ত-হৃদয়পদ্ম আকর্ষণ করেছে জগদীশ্বরকে। ভক্ত পদ্ম, ভগবান অলি। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যে সম্বন্ধ হতে পারে তার একটি সামগ্রিক চিত্র পাই মহাবীরের উক্তিতে—

দেহবুদ্ধ্যা দাসোঽস্মি তে জীববুদ্ধ্যা ত্বদংশকঃ।
আত্মবুদ্ধ্যা ত্বমেবাহমিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ॥

—(হে রাম!) যখন দেহবুদ্ধি থাকে তখন ভাবি, 'আমি দাস, (তুমি প্রভু)', যখন ভাবি 'আমি জীবাত্মা, (তুমি পরমাত্মা)', তখন (তুমি পূর্ণ), আমি তোমার অংশ, আর যখন ব্রহ্ম-জ্ঞান হয় তখন দেখি, 'তুমিই আমি (আমিই তুমি)'—এই আমার স্থির সিদ্ধান্ত। 'ভক্তের রাজা' এ যুগের অবতার অতি সরল কথায় বলেছেন, 'অনেক মত, অনেক পথ দেখলাম। এ সব আর ভাল লাগে না। পরস্পর সব বিবাদ করে। এখানে আর কেউ নাই; তোমরা আপনার লোক, তোমাদের বলছি, শেষ এই বুঝেছি, তিনি পূর্ণ আমি তাঁর অংশ; তিনি প্রভু, আমি তাঁর দাস; আবার এক একবার ভাবি তিনিই আমি আমিই তিনি।' অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব পর্যন্ত এই দ্বৈতবোধ থাকবে, থাকবে কোন সম্বন্ধ এবং ভাবের আশ্রয়। 'আমি' থাকলেই কোন একটি ভাব আশ্রয় ক'রে ঈশ্বরকে ডাকতে হয়—দাস্য সখ্য বাৎসল্য প্রভৃতি। ভগবানের প্রতি অনুরাগ ওই সানাই-এর বিচিত্র-ভাবের রন্ধ্র-পথে সাধনার রাগরাগিণীকে নবীনভাবে সঞ্জীবিত ও আপ্লুত করলো। কখনও ভগবান চুম্বক, ভক্ত সূচ, কখনও বা ভক্তই চুম্বক। ভক্তের নাম-রূপের রাজ্যে ভগবানকে আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষাই আকর্ষণ ক'রে আনলো অনন্তকে সান্তরূপে। ভগবান অবতীর্ণ হলেন মর্তে—রাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যীশু চৈতন্য প্রভৃতি রূপে। ভক্ত ও ভগবানের প্রেমের সম্বন্ধ হ'ল নিবিড়, প্রার্থনার তরঙ্গিণীও এক বিশাল শান্ত মহানদীতে পরিণত হয়ে অবিরাম ছন্দে মিলনের আগ্রহে মহাসমুদ্রের দিকে অগ্রসর হ'ল। বিচিত্র রঙের খেলা, তরঙ্গের উচ্ছ্বাস, কলকল গুঞ্জন, সব মিলিয়ে পরিণামে অদ্বৈত-স্থিতির ইঙ্গিত ক'রেও মৃদু গদ্গদকণ্ঠে দ্বৈত-ভাবের স্তুতি করলো—

সত্যপি ভেদাপগমে
নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ
ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥

—হে নাথ! দ্বৈতবুদ্ধি অপগত হলেও আমি তোমারই, তুমি আমার নও; কেননা

সমুদ্রেরই তরঙ্গ হয়, সমুদ্র কখনও তরঙ্গের হয় না।

বিচার ও ধ্যানবলে ব্রহ্ম-তত্ত্বাববোধ জ্ঞান-যোগের মূলকথা এবং যাঁরা তীব্র বৈরাগ্যবান, সেই বিরল অধিকারীদের পক্ষে এটি আশু-ফলপ্রদ পন্থা। ভক্তিমার্গ সহজসাধ্য কিন্তু বিলম্বে ফললাভ হয়। তবে এও সত্য যে, প্রার্থনার সঙ্গে প্রবল ব্যাকুলতার সংযোগ যখনই ঘটেছে, তখনই প্রার্থনার স্ফীত উচ্ছ্বাস চারিদিক প্লাবিত ক'রে সাধকের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করেছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন এর অনুপম উদাহরণস্থল।

প্রার্থনা স্বভাবতই ভক্তিরসাশ্রিত, মানবীয় কল্পনায় রঞ্জিত। পুরাণগুলিতে এবং অন্যত্র জ্ঞানী এবং যোগীদের প্রার্থনার ধারাও পাশা-পাশি রয়েছে। অনন্ত মত এবং পথের মধ্যে, বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষে কোন সংঘর্ষের ঘটনা বিরল। তবে ধীরে ধীরে ভক্তিযোগের প্রাবল্যে ওই দুটি ধারা অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। ভক্তিযোগীর প্রার্থনাগুলি কখনও আর্তের, কখনও অর্থার্থীর, কখনও নিষ্কাম ভক্তের—'হে বিশ্ববন্দ্য করুণাময় দীনবন্ধো / সংসারদুঃখ-গহনাজ্জগদীশ রক্ষ।', 'প্রসীদ পরমানন্দ প্রসীদ পরমেশ্বর / আধিব্যাধিভুজঙ্গেন দষ্টং মামুদ্ধর প্রভো।', 'বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে / জলে বাহনলে পর্বতে শত্রুমধ্যে। অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি।', 'অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য / ক্ষুধার্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ। ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারকর্ত্রী / নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥'

সংসারচক্রে নিষ্পেষিত জীবের এই সব আর্ত প্রার্থনা বারংবারই শোনা যায়। আবার—'রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।' ইত্যাদি ব'লে দেবীমাহাত্ম্যের অর্গলাস্তোত্রে রূপ-সম্পদ-পুত্র-কলত্রাদি লাভের আকাঙ্ক্ষায় সাংসারিক যাচ্ঞাও দৃষ্ট হয়। নিষ্কাম ভক্তের প্রার্থনা সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয়। সংস্কৃত-সাহিত্য-সমুদ্রে প্রার্থনার বহু মণি-মাণিক্য ছড়িয়ে আছে। মোটামুটি প্রসিদ্ধ প্রার্থনাগুলি উদ্ধৃত করলেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত অমৃতত্বের সুর ধরা পড়বে। ভগবান শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের বাণীর মর্ম-অনুধ্যানে বোঝা যায় ভগবানের কাছে পার্থিব অনিত্য সুখের আকাঙ্ক্ষা করা, রাজার কাছে 'লাউ-কুমড়ো' চাইবার মতই হাস্যকর। দেবতার পূজার উপকরণ বাইরের আড়ম্বর আর হীরে-জহরতের চাকচিক্য নয়। 'হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে' যে 'রতন-মাণিক্য' আছে তা অন্তরে ডুব না দিলে মেলে না। নিষ্কাম ভক্ত প্রার্থনা করেন বিবেক-বৈরাগ্য জ্ঞান-ভক্তি ও প্রেম। 'মানুষীং তনুমাশ্রিতম্' শ্রীভগবানকে দর্শন করলে তবে এ সত্য অনুভব করে ভাগ্যবান মানুষ। তাই তিনি বার বার আসেন। অবতীর্ণ ভগবান, তাঁর পার্ষদগণ এবং মহান আচার্যগণ আমাদের শিখিয়ে গেছেন কীভাবে নিষ্কাম প্রার্থনা করতে হয়।

আচার্য শঙ্কর জগন্মাতার কাছে নিবেদন করছেন—

অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে।
জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্বতি॥

—হে অন্নপূর্ণে, সর্বদা পরিপূর্ণে, শঙ্করের প্রিয়ে পার্বতি! জ্ঞান ও বৈরাগ্যসিদ্ধির জন্য আমায় ভিক্ষা দিন।

ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব প্রার্থনা জানাচ্ছেন—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

—হে জগদীশ, আমি ধন জন সুন্দরী স্ত্রী অথবা কবিত্বশক্তি কামনা করি না, হে ভগবান তোমাতে যেন জন্মে জন্মে আমার অহৈতুকী ভক্তি হয়।

তুলসীদাসের রামায়ণেও অনুরূপ আর্তি—

নান্যা স্পৃহা রঘুপতে হৃদয়েঽস্মদীয়ে
সত্যং বদামি চ ভবানখিলান্তরাত্মা।
ভক্তিং প্রযচ্ছ রঘুপুঙ্গব নির্ভরাং মে
কামাদিদোষরহিতং কুরু মানসঞ্চ॥

—হে রঘুনাথ! সত্য বলছি আর আপনিও সকলের অন্তরাত্মা ব'লে অবগত আছেন যে, আমার হৃদয়ে অন্য কোন বাসনা নেই। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! আমাকে একান্ত নির্ভরশীল ভক্তি প্রদান করুন এবং মনকে কামাদিদোষশূন্য করুন।

পাণ্ডবগীতায় ভগবানের চরণে দাস্যভক্তির অভিলাষ নিবেদন করছেন ভক্ত—

নান্যদ্ বদামি ন শৃণোমি ন চিন্তয়ামি
নান্যং স্মরামি ন ভজামি ন চাশ্রয়ামি।
ভক্ত্যা ত্বদীয়চরণাম্বুজমন্তরেণ
শ্রীশ্রীনিবাস পুরুষোত্তম দেহি দাস্যম্॥

—ভক্তিপূর্বক তোমার পাদপদ্ম (আশ্রয়) ভিন্ন আমি অন্য কিছু বলি না, অন্য কিছু শুনি না, অন্য কিছু চিন্তা করি না, অন্য কিছু স্মরণ, ভজন এবং আশ্রয় করি না; হে শ্রীমান, শ্রীনিবাস, হে পুরুষোত্তম আমায় তোমার প্রতি দাস্যভক্তি দাও।

কুন্তীর প্রার্থনা বড়ই মর্মস্পর্শী। ভক্তের সম্বল ভগবান এবং তাঁর পবিত্র নাম। নাম ও নামী অভেদ। তাই কুন্তী বলছেন—

বিচিন্ত্যানি বিচেয়ানি বিচার্যানি পুনঃ পুনঃ।
কৃপণস্য ধনানীব ত্বন্নামানি ভবন্তু মে॥

—তাৎপর্য এই যে, কৃপণ যেমন সযতনে সঙ্গোপনে তার ধন গণে গাঁথে, নাড়াচাড়া করে ও তাই নিয়েই চিন্তা করে, তেমনি তোমার নাম আমার ধ্যান, জ্ঞান, সব হোক।

প্রহ্লাদের প্রার্থনাটি 'ভক্তিযোগে' স্বয়ং স্বামীজী উল্লেখ করেছেন। বিষয়ের প্রতি সমস্ত টানটুকু ভগবানে অর্পিত হ'লে তবেই তিনি ধরা দেন—

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥

—অবিবেকীদের বিষয়ের প্রতি যে অন্তহীন আকর্ষণ, (হে প্রভু!) তোমাকে অনুসরণকারী আমার হৃদয় থেকে সেইরূপ প্রীতি যেন অপসৃত না হয়।

ভক্তপ্রবর বিল্বমঙ্গল তাঁর বিখ্যাত 'শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত' স্তোত্রে প্রণতি জানিয়ে নিবেদন করছেন—

হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম।
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে॥

—হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নাভিরাম, হায় কবে তুমি আমার নয়নদ্বয়ের গোচর হবে?

ঈশ্বরদর্শনের জন্য এই নিবিড় আর্তির ভাব দুর্লভ। ভগবান শ্রীচৈতন্য-রচিত জগন্নাথ-স্তোত্রেও—'জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে' ব'লে—ওই ঈশ্বরীয় ব্যাকুলতাই সুব্যক্ত।

রাজা কুলশেখরের মুকুন্দ-মালাস্তোত্র অতি মধুর। তাঁর একটি প্রার্থনা স্বকীয় দ্যুতিতে ভাস্বর—

নাস্থা ধর্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্ভাব্যং তদ্ভবতু ভগবন্ পূর্বকর্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥

—আনুষ্ঠানিক ধর্মে আমার আস্থা নেই, ধনরত্নে, কাম-উপভোগেও নেই। হে ভগবান

পূর্বকর্ম অনুযায়ী যা হবার তাই হোক। কিন্তু জন্মজন্মান্তরেও তোমার পাদপদ্মযুগলে আমার অচলা ভক্তি হোক—এই আমার একান্ত প্রার্থনীয়।

প্রপন্ন গীতার প্রার্থনা নির্ভীক ভক্তের প্রার্থনা। জন্মমরণচক্রে বারংবার নিপতিত, নানা যোনিতে পরিভ্রমণে ক্লান্ত জীব স্বভাবতই মুক্তির জন্য ব্যাকুল হয়, কিন্তু এখানে মুক্তি অপেক্ষা ভক্তির আকাঙ্ক্ষাই ভক্তের বাঞ্ছনীয়—
স্বকর্মফলনির্দিষ্টাং যাং যাং যোনিং ব্রজাম্যহম্।
তস্যাং তস্যাং হৃষীকেশ ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়াঽস্তু মে॥
—হে হৃষীকেশ, নিজের কর্মফলের দ্বারা নির্ধারিত যে যে যোনিতেই আমার জন্ম হোক না কেন, সেই সেই যোনিতে তোমার প্রতি আমার যেন দৃঢ় ভক্তি হয়।

এটি বৈষ্ণবসাহিত্যে বিদ্যাপতির প্রসিদ্ধ প্রার্থনার কথা স্মরণ করায়—

কিয়ে মানুষ পশু পাখি কুলে জনমিয়ে
অথবা কীটপতঙ্গে
করম বিপাকে গতাগতি পুনঃ পুনঃ মতি রহুঁ
তুয়া পরসঙ্গে॥

কখনও আবার ভক্তিপ্রার্থনাও নেই। সন্তানের কিসে কল্যাণ জননীই জানেন। তাই শোনা যায়—

'ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ।',
'দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥',
'গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি।'

মোটামুটি সকল প্রার্থনার মূলকথা প্রপঞ্চ থেকে মুক্তি ও ভগবৎপাদপদ্মে অচলা ভক্তি-লাভ। প্রার্থনার তরঙ্গিত উচ্ছ্বাসের অবলম্বন সর্বদাই দ্বৈতভূমি, ভক্ত-ভগবানের লীলা-নিকেতন। নির্বিশেষ ও অখণ্ড ভাবের সাধনায় উত্তীর্ণ হতে সগুণব্রহ্মের কাছে প্রার্থনাগুলি হিমগিরির অনন্ত মহিমায় শান্ত, গম্ভীর। বৈদিক যুগের এই তেজস্বী ভাব পৌরাণিক যুগে প্রীতিস্নিগ্ধ কোমল ভাবে আচ্ছন্ন। নূতন গতিভঙ্গে তাই প্রার্থনার সুরও পরিবর্তিত। উঁচুপর্দায় সুরসংযোগ আয়াসসাধ্য, তাই নিম্ন-স্বরে প্রার্থনার রাগরাগিণীর বিস্তার পরবর্তী যুগের বৈশিষ্ট্য। বিশেষ করে, মধ্যযুগে ভারতবর্ষে ভক্তিভাবের আধিক্যে ধর্ম সাহিত্য সংস্কৃতি—সব কিছুই বৈচিত্র্যের আলোক-সম্পাতে উজ্জ্বল। প্রার্থনার মধ্যে ভগবদ্-অনুরক্তি ও নির্ভরতার সঞ্চার লক্ষণীয়। কোন এক মাধুর্যময় বালকের কটি-কিঙ্কিণির ধ্বনি, নূপুর-নিক্কণ, মুরলীর তান, গম্ভীর ভাব-প্রবাহকে ভেঙ্গে ছোট ছোট ছন্দোময়ী তটিনীতে রূপান্তরিত করল। প্রার্থনার অনিবার্য ফলশ্রুতি হ'ল প্রিয়তমের অন্তরতম সান্নিধ্য;—অলক্তক-রঞ্জিত দুটি পাদপদ্ম, কোমল অধরপুট, বঙ্কিম দৃষ্টি, কখনও ধনুর্বাণ-হস্তে নবদূর্বাদলশ্যাম সুস্মিত কিশোর, করাল-বদনা অভয়ার বরহস্ত, কখনও বা শ্মশানচারী দিগম্বর নীলকণ্ঠের রজতগিরিনিভ ধ্যানমূর্তি ইত্যাদি। সনাতন বলছেন—'মন্মানসমধুকর-মর্পয় নিজ-পদ-পঙ্কজ-মকরন্দে।' —আমার মন-মধুকরকে তোমার পদপঙ্কজের মধুপানে মত্ত কর।

অন্যত্র নানাভাবে সংগীতাদির মধ্যে প্রার্থনা উচ্চারিত—

'ভনই বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদ-পল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥'
'শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বন্দন

পাদ-সেবন দাসীরে।
পূজন সখীজন আত্মনিবেদন
গোবিন্দদাস অভিলাষীরে॥'
'আপনে পদ-পঙ্কজ-পিঞ্জর মেঁ
চিত-হংস হামারা বৈঠাও জী॥
তুলসীদাস কহ কর জোড়ি
ভব-সাগর পার উতার জী॥'
'তুলসীদাস পর কিরপা কীজে
ভকতি-দান দেহু আজ।'
'মীরা কে প্রভু গিরিধর-নাগর
চরণ-কমল চিত লাগী।'
'শ্রীরামপ্রসাদে বলে, মা বিরাজে শতদলে
আমি শরণ নিলাম চরণতলে,
অন্তে না ফেলিও ঠেলি।'
'না করি নির্বাণে আশ, না চাহি স্বর্গাদি-বাস,
নিরখি চরণ-দুটি হৃদয়ে রাখিয়ে
কমলাকান্তের এই নিবেদন ব্রহ্মময়ি
তাহে বিড়ম্বনা কর মা, কি ভাব ভাবিয়ে॥'

মহাকারুণিক ভগবান বুদ্ধাবতারের যুগে প্রার্থনা কণ্ঠতঃ সংলগ্ন নয়, তবু প্রার্থনার ভাবকে অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি—হয়তো একথা বলা চলে। ভগবান তথাগতের অধ্যাত্ম-শক্তি, তাঁর করুণাসিক্ত চরিত্রমাধুর্য, তাঁর প্রবর্তিত উচ্চমানের নীতিভিত্তিক ধর্মাচরণ এবং অনুশাসিত জীবননীতি বৌদ্ধ ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং সংঘবদ্ধ অনুশীলনের ফলে ক্রমে ওই ধর্ম ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম ক'রে বিশ্বে শান্তি ও করুণার শুভ্ররশ্মি বিকীর্ণ করে। ত্যাগ, বৈরাগ্য ও শীলের অনুশীলনের দ্বারাই নির্বাণ লাভ হয়। 'ঈশ্বর' সম্বন্ধে বুদ্ধদেব নীরব। অতএব প্রার্থনার ক্ষেত্রও শুদ্ধ। কিন্তু মানুষের শরণ-গ্রহণের ভাবটি চরিতার্থ হল ত্রিশরণের মন্ত্রটি উচ্চারণ করে—

'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি,
সংঘং শরণং গচ্ছামি।'

অপরদিকে ভগবান যীশুখ্রীষ্টের সমগ্র সত্তাই প্রার্থনাময়। স্বামী বিবেকানন্দ নিষ্কাম-কর্মের প্রসঙ্গে বলেছেন, 'বুদ্ধদেব ধ্যানের দ্বারা ও যীশুখ্রীষ্ট প্রার্থনার দ্বারা যে আধ্যাত্মিক অবস্থা ও দিব্যভাব লাভ করেছিলেন, অনাসক্ত কর্মী নিষ্কাম-কর্মের দ্বারাও সেই উচ্চাবস্থা লাভ করিবেন।' তাই ভগবান ঈশার জীবনে তাঁর স্বাভাবিক ত্যাগ-বৈরাগ্য-প্রদীপ্ত আচরণের সঙ্গে সঙ্গে যে চিত্রগুলি মানব-মনকে শান্ত ও অন্তর্মুখী হতে সাহায্য করে, তাদের অন্যতম হ'ল, তাঁর প্রার্থনারত অনবদ্য স্বর্গীয় চিত্র। তিনি সারারাত প্রার্থনা করছেন, ক্লান্ত শিষ্যেরা নিদ্রিত। নিদ্রাভঙ্গে বিস্মিত হয়ে দেখছে, তিনি ওই একই ভঙ্গীতে প্রার্থনামগ্ন। কি এক দিব্যবিভায় তাঁর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত। ক্রুশের ওপর অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি প্রার্থনা করছেন তাদের জন্য, যারা ক্লেশ দিয়েছে, করেছে অমানুষিক নির্যাতন। আবার সাধারণ মানুষকে পরম-করুণায় জগৎ-পিতার কাছে প্রার্থনা করতে নিজেই শেখাচ্ছেন—Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name: Thy kingdom come. Thy will be done in earth, as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not unto temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory for ever. —হে আমাদের প্রিয় পিতা, যিনি দিব্যধামে

প্রতিষ্ঠিত, তোমার পবিত্র নাম মহিমান্বিত হোক। তোমার রাজ্য আসুক। যেমন স্বর্গে তেমনি এ মর্তে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। আমাদের নিত্যকার আহার দান কর। আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা কর; এবং আমরাও যেন তেমনি আমাদের কাছে যারা অপরাধী তাদের ক্ষমা করি। প্রভু, আমাদের প্রলুব্ধ করো না, মায়া থেকে মুক্ত কর: কারণ, রাজ্য শক্তি ও মহিমা তোমারই চিরকাল।

সাক্ষাৎ ঈশ্বরপুত্র প্রার্থনা শেখাচ্ছেন। খ্রীষ্ট-ভক্তগণ আজও মন্ত্রের মতই ওই প্রার্থনা উচ্চারণ করেন। আপাতদৃষ্টিতে সহজ সরল প্রার্থনাটি কিন্তু গভীর ভাব-দ্যোতক। বলছেন—তোমার ইচ্ছা সর্বত্রই পূর্ণ হোক। অর্থাৎ কাঁচা আমি বা অহমিকা মুছে যাক আর সেখানে পাকা আমি 'ভক্তের আমি' প্রতিষ্ঠিত হোক। আমি হই যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী। এই বিশ্বাস ও নির্ভরতাই অধ্যাত্মজীবনের ভিত্তি। নিত্যকার আহার মানে শুধুমাত্র দৈহিক আহার নয়, ভগবৎ-কৃপারূপ আহার্য। তাঁর কৃপায় হাজার বছরের অন্ধকার ঘর এক মুহূর্তে আলোকিত হয়। মহাপাতক মুক্ত হয়ে ক্ষুদ্র মানুষ মহামানবে পরিণত হয়। ওই কৃপালাভের জন্যও চাই অন্তরের আগ্রহ ও ব্যাকুলতা। অন্যত্রও ঈশা তাঁর ভক্তদের আশ্বাস দিয়ে বলছেন—'আমি সত্য সত্যই তোমাদের বলছি, আমার নাম নিয়ে পিতার কাছে তোমরা যা চাইবে তিনি তাই দেবেন।...... প্রার্থনা কর—তোমরা পাবে।' 'Lord Jesus Christ, have mercy on me', 'Hail Mary'—এই ভাবে ভগবানের নাম-জপের বিধিও খ্রীষ্টান ধর্মে দেখা যায়। অন্তরে অবিরত কৃপা-প্রার্থনার ফলে প্রাণে আসে গভীর প্রশান্তি। খ্রীষ্টভক্ত ও সাধকদের জীবনগুলিই তার উদাহরণস্থল। আবার ভগবদ্গীতায় ক্ষমাকে দৈবী সম্পদ বলা হয়েছে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে যেমন নিজের, তেমনি অপরের কর্মও আমাদের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তাই নিজের কর্মফলকে মেনে নিয়ে অপরের প্রতি ক্ষমার ভাব অনুশীলন করতে হয়। তাই ভগবান ঈশা শেখাচ্ছেন—আমরাও যেন অপরাধীদের ক্ষমা করতে পারি। প্রার্থনার শেষ অংশটি আমাদের বৈদিক যুগের প্রার্থনা এবং আধুনিক যুগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তির কথা স্মরণ করায়। গীতায়ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।' অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া অতিক্রম করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই ভয়ঙ্কর মোহ-সমুদ্র উত্তীর্ণ হবার জন্য ভগবানেরই শরণাগত হয়ে প্রার্থনা জানাতে হয়। তাই ভগবান ঈশা বলছেন—'আমাদের প্রলুব্ধ করো না।' যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন—'মা, আমি শরণাগত। রক্ষা কর মা, রক্ষা কর। আমি তোমার সন্তান। মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় কখনও মুগ্ধ করো না।'

খ্রীষ্টের উপাসিকা সন্ত তেরেসার রচনা-বলীতেও দেখা যায় তিনি ধ্যান ও প্রার্থনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করছেন। 'দীনতা ও নিরভিমানতা ছাড়া প্রার্থনা হয় না'—এটি তিনি আন্তরিকভাবে বলতেন। তাঁর দিব্য জীবনেও তিনি বৈখরী প্রার্থনা অর্থাৎ স্তব-আবৃত্তি এবং মনন-প্রার্থনাকে অধ্যাত্মজীবনের অপরিহার্য অঙ্গরূপে পরিপালন করেছেন এবং 'স্তব বা প্রার্থনা সকলই প্রভুর প্রীতির জন্যই অনুষ্ঠিত'—এই ভাবটিও তাঁর মঠ-বাসিনীদের মনে মুদ্রিত ক'রে দিতেন। তাঁর প্রার্থনাময় জীবনের স্নিগ্ধ চিত্রগুলি বহুযুগ ধরে

ভক্তগণকে প্রার্থনায় উদ্বুদ্ধ করেছে এবং আজও করে।

'টমাস এ কেম্পিস্'এর 'দি ইমিটেশন অব ক্রাইষ্ট' স্বামী বিবেকানন্দের প্রিয় গ্রন্থ। সাধক-জীবনের নানা সমস্যায় কণ্টকিত অধ্যাত্মপথে পথিকের আকুল প্রার্থনাগুলি ধর্ম-সাহিত্যে রত্নতুল্য। ধর্মজীবনকে যথার্থ অনুধাবন করেছিলেন বলেই ভগবান যীশুর প্রত্যেক বাণীর গভীর তাৎপর্য তাঁর কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল। নিজের ক্ষুদ্র তুচ্ছাতিতুচ্ছ ভগবদ্‌বিমুখী তরঙ্গগুলিকে শান্ত করার জন্য তাঁর অনবদ্য প্রার্থনাসমূহ চিরকাল সাধককুলকে প্রেরণা দেবে। তাঁর মর্মস্পর্শী কয়েকটি প্রার্থনার অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করছি—

'তুমি ভক্ত এবং ধার্মিক লোকদের বহু দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়াছ; সুতরাং ধর্মজীবনে উন্নতি করিবার বাসনা যাহাতে একেবারে নিষ্ক্রিয় হইয়া না পড়ে, তজ্জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা উচিত।'

'যেহেতু এখনও আমার ভালবাসা গভীর হয় নাই এবং আমি আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণতা লাভ করিতে পারি নাই, সেই হেতু তোমার কাছে আমি শক্তি ও সান্ত্বনা প্রার্থনা করি। সুতরাং মাঝে মাঝে তুমি আমাকে দর্শন দিয়া তোমার দিব্য-নির্দেশ প্রদান করিও।'

"প্রেমিক ব্যক্তি যখন 'হে ঈশ্বর! প্রেমস্বরূপ! তুমিই আমার সব, এবং আমিও তোমার সব'—এই বলিয়া প্রার্থনা করেন, তখন ঈশ্বর সেই ভক্তের গভীর অনুরাগ-প্রসূত প্রার্থনা শ্রবণ করেন।"

'অহো, আনন্দপ্রদ ভগবদ্‌ভজন! উহা চিরকাল আকাঙ্ক্ষার বিষয়।'

'আমার রসনা যেন নীরবে তোমার নাম জপ করে, এবং আমার নীরবতার দ্বারাই তোমার সঙ্গে আমি যেন কথা বলি।'

'কৃপাময় যীশু! শুদ্ধ উজ্জ্বল জ্ঞানালোক দ্বারা আমার অন্তর আলোকিত করিয়া উহার সমস্ত অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিয়া দাও।'

এই পুস্তকের বিভিন্ন প্রার্থনার সুর আমাদের মুগ্ধ করে। বিচার মনন ও ধ্যানের সঙ্গে অবিরাম প্রার্থনার ভাবটি খুবই হৃদয়-গ্রাহী। অন্তর-বীণাটিকে ঈশ্বরীয় সুরে বাঁধার এমন সহজ সরল পদ্ধতি প্রার্থনাতেই সম্ভব। গুরু নানক কোন এক ব্যবসায়ীকে উপদেশ করেন—

'জীবন ক্ষণস্থায়ী, এই জ্ঞানই হোক তোমার দোকান এবং ঈশ্বরের কথা হোক মূলধন। প্রার্থনা ও ধ্যান হোক পাত্র এবং সেই পাত্রগুলো ঈশ্বরীয় কথায় পূর্ণ কর।'

প্রার্থনারূপ পাত্রটি পূর্ণ করতে হবে ঈশ্বরীয় ভাবে, অর্থাৎ ঈশ্বরই হবেন সাধকের একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত বস্তু।

[ক্রমশঃ]



সমালোচনা

শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকর-প্রসঙ্গ : স্বামী কমলেশ্বরানন্দ। প্রকাশক : শ্রীতারকনাথ মজুমদার, ৪৫/ডি/৪ মুর এভিনিউ, কলিকাতা ৪০। (১৩৮৪) পৃঃ ১৭৭, মূল্য ৫.৫০ টাকা।

শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য গ্রন্থকার স্বামী কমলেশ্বরানন্দ প্রায় ৪২ বৎসর পূর্বে দেহরক্ষা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিবার দুর্লভ সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমার ও শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রিয় শিষ্যদের সম্পর্কে স্বামী কমলেশ্বরানন্দ গভীর অনুপ্রেরণায়, উচ্ছ্বসিত ভালবাসায় অনেক কিছু লিখিয়াছিলেন। সেগুলি একত্রে সন্নিবিষ্ট করিয়া বর্তমান অপূর্ব গ্রন্থটি রচিত। ইহার পৃষ্ঠাসমূহে শ্রীশ্রীমা স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বামী প্রেমানন্দ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামী শিবানন্দ স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি যেন জীবন্তরূপ ধরিয়া আশ্চর্যজনকভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিলে পাঠক এক দিব্য ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা লইয়া পুস্তকটির আরম্ভ। শ্রীশ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের অসমাপ্ত কাজকে পূর্ণতর, পূর্ণতম রূপ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কার্যপ্রণালীর একটি অসামান্য বৈশিষ্ট্য ছিল, যাহার উল্লেখ কমলেশ্বরানন্দজী করিয়াছেন। অসংখ্য নরনারী শ্রীশ্রীমায়ের নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি গুরুশিষ্য-সম্পর্ক উঠাইয়া দিয়া তাহার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন মা ও সন্তানের সম্পর্ক। ইহার সার্থকতা গ্রন্থকার সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন: 'মা, জগতে এসে এক নূতন আলো দিলে মা—গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ উঠিয়ে দিলে, মা আর তাঁর ছেলে এই এক নূতন, অতি নূতন সম্পর্ক দেখালে মা!...শেষ পর্যন্ত সে ভাব (গুরুশিষ্যভাব) টিকবে না সেই জন্যই এই নূতন সম্বন্ধ পাতালে মা?' (পৃঃ ১৭-১৮)। এস্থলে উল্লেখ্য যে, শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন, গুরু শেষ পর্যন্ত থাকেন না, তিনি ইষ্টে লয় হন। হয়তো তাহা স্মরণ করিয়াই শ্রীশ্রীমা গুরুশিষ্য-সম্বন্ধের পরিবর্তে মা ও সন্তানের সম্বন্ধ কায়েম করিয়াছিলেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ ছিলেন কমলেশ্বরানন্দজীর সন্ন্যাস-গুরু। এই গুরুদেবকে তিনি কি ভক্তিই না করিতেন! তিনি লিখিয়াছেন: 'এত বড় মঠ-মিশনের একচ্ছত্র সম্রাট কিন্তু তিনি কিনা সামান্য ফষ্টিনষ্টি, আমোদপ্রমোদ নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন—এ রহস্য, এ তত্ত্ব কে বুঝবে? বোঝা তো যায় না! বোঝাবুঝির পারের মানুষের তত্ত্ব বুঝতে যাওয়াই বাতুলতা। কেবল ধ্যানের বিষয় তিনি। তাঁকে ধ্যান করলে আমাদের কল্যাণ—ঐহিক কল্যাণ, পারত্রিক কল্যাণ। তাই তো গুরু-মূর্তি ধ্যানের এত মহিমা শাস্ত্রে বলেছেন। গুরুর বাণীই বেদ, গুরুর বাণীই মন্ত্র, গুরুর কৃপাই মোক্ষের অমোঘ উপায়। একবার ধ্যান করলে, একবার স্মরণ করলে হৃদয় পবিত্র হয়ে যায়।' (পৃষ্ঠা ২২)।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন গ্রন্থকার। বাস্তবিক তাঁহার পরিকল্পনা ছিল পূজ্যপাদ শশী মহারাজের বিস্তৃত জীবনী তিনি রচনা

করিবেন। অকালমৃত্যু হওয়ায় (৪৪ বৎসর বয়সে) সেই ইচ্ছা বাস্তবে রূপায়িত হয় নাই। তাহা হইলেও আলোচ্য পুস্তকে বহু মূল্যবান এবং এযাবৎ অজানা তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। এই সব তথ্যকে ভিত্তি করিয়া এবং আরও বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করিয়া কোনও মনীষী ভবিষ্যতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করিলে লেখকের শুভ বাসনা পূর্ণ হইবে।

স্বামী শিবানন্দ স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের সম্পর্কে কত সুন্দর সুন্দর কথা ও ঘটনাই না কমলেশ্বরানন্দজী তাঁহার রচনাগুলিতে উল্লেখ করিয়াছেন! এমন সব কথা আছে যাহা পূর্বে কোনও গ্রন্থে পড়ি নাই বা কোথাও শুনি নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদদের সকলকেই তিনি গুরুস্থানীয় মনে করিতেন এবং সেইভাবে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। তাঁহাদের উপদেশ ও আচরণ হইতে কমলেশ্বরানন্দজী কতই না শিখিয়াছিলেন এবং এই পুস্তকের মাধ্যমে সেই শিক্ষার দ্বার আমাদের নিকট উদ্ঘাটিত করিয়া গিয়াছেন।

স্বামী প্রেমানন্দের সহিত গ্রন্থকারের একটি বিশেষ ভালবাসাপূর্ণ সম্বন্ধ ছিল। তাঁহার সম্বন্ধে গ্রন্থকার লিখিতেছেন: "আমাদের মঠের যিনি মা তাঁকে আমি নিভৃতে প্রভু বলে ডাকতাম। একদিন প্রভুর কাছে বললাম, 'প্রভু, এত বকেন যে কাছে আসতে ভয় হয়।' তিনি আদর করে গলা জড়িয়ে বুকে আঁকড়ে বললেন, 'আর এটা, এই ভালবাসাটা মনে হয় না! কত যে ভালবাসি সেটা বুঝি দেখিস না।" (পৃঃ ১৪২)। বাস্তবিক স্বামী প্রেমানন্দের অপূর্ব ভালবাসা, প্রেম-পূর্ণ দৃষ্টি, সুন্দর মুখশ্রী যুবক কমলেশ্বরানন্দের হৃদয় একেবারে জয় করিয়াছিল। শেষ বারের মতো পূর্ববঙ্গে যাইবার সময়ে স্বামী প্রেমানন্দ মঠের দিকে মুখ করিয়া নৌকায় দাঁড়াইয়া আছেন; কমলেশ্বরানন্দ মুগ্ধনেত্রে তাঁহার দিকে তাকাইয়াছিলেন এবং বহুকাল পরে লেখেন: 'সে এক অপূর্ব শোভা! মনে হইতেছিল কবিরা যে মুখের সঙ্গে কমলের তুলনা করে তাহা কল্পনা নহে। শ্রীভগবান নিজ প্রেম অনুভবের জন্য ভক্তের মুখশ্রী এমনি মাধুর্যভরা করিয়া বোধ হয় সৃষ্টি করেন। ভক্তের মুখদর্পণে নিজ মুখের প্রতিবিম্বের শোভা নিরীক্ষণই বুঝি তাঁহার অভিলষিত।' (পৃঃ ১৭৩-৭৪)।

আলোচ্য গ্রন্থটি আধ্যাত্মিক সম্পদে পরিপূর্ণ। ভক্তবৃন্দ তথা জ্ঞানী ব্যক্তিরাও ইহা পাঠ করিয়া প্রভূত আনন্দ পাইবেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কেও অনেক নূতন তথ্য ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের প্রাক্তন অধ্যক্ষ স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দজী গ্রন্থকার কর্তৃক লিখিত 'বেদ ও আচার্য স্বামী প্রেমানন্দ' শীর্ষক প্রবন্ধটি এবং গ্রন্থকারের দেহত্যাগের বিস্তারিত সংবাদটি 'উদ্বোধন' পত্রিকা হইতে বর্তমান গ্রন্থে পুনর্মুদ্রণের জন্য অনুমতি দিয়া গ্রন্থটির শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় সহসা দেহান্ত হওয়ায় তিনি ইহার প্রকাশন দেখিয়া যাইতে পারেন নাই।

শ্রীতারকনাথ মজুমদার বইটি প্রকাশের ব্যয়ভার বহন করিয়া ধর্মপিপাসু ব্যক্তিদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু শ্রীলোকেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীমানসপ্রসূন চট্টোপাধ্যায় বইটির প্রকাশে নানাভাবে সক্রিয়

সহায়তা করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। বইটির কাগজ ও ছাপা বেশ ভাল। মূল্যও কম। ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ দত্ত, ডি. লিট্.

Golden Jubilee Souvenir. Published by the President, Sri Ramakrishna Ashrama, Trichur. (1978), pp. 156.

ত্রিচুরস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম গত ৫০ বছর ধরে স্থানীয় গ্রামের মানুষদের, বিশেষত হরিজনদের, সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্যে বিদ্যালয় ছাত্রাবাস গ্রন্থাগার ও হাসপাতাল পরিচালন করছেন, পুস্তক-প্রকাশন এবং বক্তৃতা ও আলোচনাদির মধ্যে দিয়ে আধ্যাত্মিক আলোক বিকিরণ করছেন। আশ্রমটি এখন কেরলরাজ্যে সমাজসেবার একটি অনন্য পীঠস্থান বোলে খ্যাত। এ হেন একটি ফলবান প্রথিতযশা প্রতিষ্ঠানের অর্ধশতকে উত্তরণ অবশ্যই চিহ্নিত ও কীর্তিত হওয়ার মতো ঘটনা।

এই উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থটিতে আছে—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ ও স্বামী গম্ভীরানন্দের আশীর্বাণী; রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন সম্পর্কে স্বামীজী, নিবেদিতা, রম্যাঁ রলাঁ, অলডাস হাক্সলী ও ইসারউডের 'ক্লাসিক' রচনাবলীর সুনির্বাচিত সঙ্কলন; এবং স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী তপস্যানন্দ, স্বামী সিদ্ধিনাথানন্দ, স্বামী মৈত্রানন্দ, ডক্টর ভি. গোপালন, এ. করুণাকর মেনন প্রমুখের প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ। 'ক্লাসিক' পর্যায়ের রচনাগুলি সম্বন্ধে নতুন কিছু বলার নেই। সেগুলি বারংবার ও অবশ্য পাঠ্য শাশ্বত সম্ভার। অন্যান্য লেখাগুলির মধ্যে, আশ্রমটির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস নিয়ে স্মৃতিচারণ করেছেন শ্রীমেনন, কেরলে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর প্রভাব খতিয়ে দেখেছেন স্বামী সিদ্ধিনাথানন্দ, লোকশিক্ষার লক্ষ্যের ওপর আলো ফেলেছেন ডক্টর গোপালন, জাতীয় সংহতিতে ধর্মের ভূমিকা নির্ণয় করেছেন স্বামী মৈত্রানন্দ এবং, সর্বোপরি, শ্রীরামকৃষ্ণের 'নিত্যোৎসবে' শরিক হওয়ার জন্যে প্রাণের শিকল-নাড়া ডাক দিয়েছেন 'আশ্চর্য বক্তা' স্বামী রঙ্গনাথানন্দ। লেখাগুলি মহামূল্য।

এসব ইংরিজি প্রবন্ধ ছাড়াও আরো অনেকগুলি রচনা এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে; সেগুলির ভাষা, হায়, এ অধমের অবোধ্য! গ্রন্থটিতে অধিকন্তু আছে ঠাকুর মা ও স্বামীজীর অতি সুন্দর ত্রিবর্ণরঞ্জিত প্রতিকৃতি এবং হরিজন ছাত্রছাত্রীদের অধ্যয়ন ও উপাসনা, মুদ্রাযন্ত্র, গ্রন্থাগার, চিকিৎসাকেন্দ্র ইত্যাদি আশ্রমের নানামুখী কর্মযজ্ঞের সাক্ষ্যবহ কতকগুলি আলোকচিত্র। এমন একটি সুসজ্জিত ও সুসমৃদ্ধ স্মারক গ্রন্থ সচরাচর চোখে পড়ে না।

বকলম

প্রাপ্তিস্বীকার

Ramakrishna Dipika : Published by G. S. Shukla. Ramakrishna Mission Ashrama, Narendrapur, 24 parganas.

Journal of Ramakrishna Institute of Moral and Spiritual Education : 1977-78. Published by Ramakrishna Institute of Moral and Spiritual Education, Mysore-2.

Souvenir : 1978. Published by Swami Vikashananda, Ramakrishna Mission Ashrama, Katihar, Bihar.

নৌমি জগদ্গুরু-শ্রীরামকৃষ্ণম্ : প্রকাশক শ্রীভূপেন্দ্রমোহন ঘোষ, পশ্চিম রাজাপুর

শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ, স্বামী বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৩২

Swamiji Smaraney : Published by Sri Bimal Roy, Shree Ramakrishna Vivekananda Yuva Sangha, Bagbazar.

বিবেকানন্দ ইন্‌স্টিটিউশন্ পত্রিকা : (সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা), প্রকাশক : শ্রীব্রজমোহন মজুমদার, ৭৫ ও ৭৭ স্বামী বিবেকানন্দ রোড, হাওড়া-৪

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণকার্য

ভারতে : ঘূর্ণিবাত্যাত্রাণ : অন্ধ্রপ্রদেশে পুনর্বাসনকার্য প্রাগ্রসর। প্রথম পর্যায়ে পরিকল্পিত ৫১২টি গৃহের মধ্যে গোল্লাপালেম গ্রামে ২১৮টি গৃহ প্রায় সম্পূর্ণ। ইরালি ও পালাকায়াটিপ্পা গ্রামসহ উল্লেখিত গ্রামে অবশিষ্ট ২৯৪টি গৃহের নির্মাণ-কার্য বিভিন্ন স্তরে রহিয়াছে। গত ১৪ই জুলাই ১৯৭৮, ভারত সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ী অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এম. চেন্না রেড্‌ডি এবং রাজস্বমন্ত্রী শ্রীজনার্দন রেড্‌ডি সহ পুলিগাড্‌ডায় মিশনের কারখানাটি পরিদর্শন করেন।

বাংলাদেশে : বাগেরহাট ঢাকা দিনাজপুর ও নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রের মাধ্যমে রোগীদের চিকিৎসা এবং ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রের মাধ্যমে দুগ্ধবিতরণ অব্যাহত আছে।

কার্যবিবরণী

The Vedanta Society of St. Louis : ১৯৭৭ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৭৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সোসাইটির বাৎসরিক কার্যবিবরণীর সারসংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

প্রতি রবিবার সকালে এবং মঙ্গলবার রাত্রে সোসাইটির ভজনালয়ে সারা বৎসর নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী সৎপ্রকাশানন্দজীর অসুস্থতা-নিবন্ধন তাঁহার পূর্বপ্রদত্ত ভাষণ ও উপদেশাবলীর রেকর্ডবদ্ধ টেপ বাজানো হয়। ১লা মার্চ

১৯৭৮, স্বামী চেতনানন্দ তাঁহার সহকারীরূপে যোগদান করেন এবং তখন হইতে তিনি রবিবার ও মঙ্গলবার ভাষণ দিতে আরম্ভ করেন। রবিবারের বক্তৃতার বিষয়—বেদান্তের নানা ধর্মীয় ও দার্শনিক প্রসঙ্গ এবং মঙ্গলবারের বিষয়—মুণ্ডক কঠ ও প্রশ্ন উপনিষদ্। স্বামী চেতনানন্দ আসার পর চিত্রপ্রদর্শন শুরু করেন প্রতি মঙ্গলবার রাত্রে; কামারপুকুর, দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় মঠ, অমরনাথ ইত্যাদি পুণ্যস্থানের ছবি এসকল চিত্রের অন্তর্ভুক্ত। এপ্রিল মাস হইতে স্বামী চেতনানন্দ পাতঞ্জল যোগসূত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন। সংবৎসর বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে ভক্তিমূলক সংগীত পরিবেশিত হয়।

সোসাইটির সদস্য ও বন্ধুগণ ছাড়াও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গির্জা ও নানা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও স্কুল হইতে অতিথি-অভ্যাগতরা আসেন। কখনও কখনও বহু দূর হইতে আসিয়া তাঁহারা ধর্মসভায় উপস্থিত হন। স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ যথাসাধ্য আগন্তুকগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর দেন। স্বামী চেতনানন্দও আলাপ-আলোচনায় যোগদান করেন। শিশুদের জন্য রবিবার সকালে নিয়মিতভাবে স্কুল বসিত। রবিবার অপরাহ্ণেও ছোটদের ক্লাস বৎসরের অধিকাংশ সময়ে অব্যাহত থাকে।

মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার ভক্তগণ পালাক্রমে Gospel of Sri Ramakrishna শ্রোতৃমণ্ডলীকে পাঠ করিয়া শোনান।

শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধদেব শংকরাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমা স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বামী প্রেমানন্দ ও স্বামী শিবানন্দের আবির্ভাব-দিবস যথারীতি পালিত হয়। দুর্গাপূজা কালীপূজা ইস্টার ও ক্রিসমাস উপলক্ষেও উৎসবের আয়োজন করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবের দিন পূজান্তে প্রায় ১১০ জন অভ্যাগতকে ভূরিভোজে আপ্যায়িত করা হয়। অন্যান্য উৎসব উপলক্ষেও উপস্থিত সকলের জলযোগের ব্যবস্থা ছিল।

সোসাইটির গ্রন্থাগারের বহুল ব্যবহার হয়। ১৯৭৭ সালের শেষে গ্রন্থের সংখ্যা ছিল ১,৬৬৩; এগুলির মধ্যে ৪৪টি উপহারস্বরূপ পাওয়া গিয়াছিল।

বেদান্তের প্রবচন ও স্বামী সৎপ্রকাশানন্দের গ্রন্থাবলির সদ্য প্রকাশিত সমালোচনাদি-সংবলিত পুস্তিকাদি ডাকযোগে ও হাতে হাতে বিতরণ করা হয়।

স্বামী সৎপ্রকাশানন্দের দুইখানি বই সোসাইটি কর্তৃক আলোচ্যমান বৎসরে প্রকাশিত হয়: (১) The Goal and the Way, the Vedantic Approach to Life's Problems, (২) The Universe, God and God-Realization.

এই বৎসরে অভ্যাগত সন্ন্যাসীদের মধ্যে ছিলেন স্বামী স্বাহানন্দ, স্বামী তথাগতানন্দ, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, স্বামী স্বানন্দ, স্বামী ভাষ্যানন্দ ও স্বামী নিঃশ্রেয়সানন্দ। স্বামী স্বাহানন্দ Vedanta and the Individual এবং Ritual and its Use শীর্ষক দুইটি ভাষণ দেন।

অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি যাঁহারা সোসাইটি পরিদর্শন করেন তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: Susan Gerhard, যিনি St. Vincent's High School-এর World's Religions Class-এর ছাত্রবৃন্দ ও তাঁহার স্বামী সহ আসেন; এবং Seminex-এর Christ Seminary-র অধ্যাপক Kang, যিনি তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে অনেককে সঙ্গে আনেন।

ছাত্রদের কৃতিত্ব

রামকৃষ্ণ মিশনের কামারপুকুর পুরুলিয়া রহড়া ও সরিষা কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি হইতে ১৯৭৮-এর মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রেরিত সকল ছাত্রই উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। উল্লেখযোগ্য যে, প্রথম দশটি স্থানের মধ্যে পুরুলিয়া কেন্দ্রের বিদ্যালয়ের ছাত্ররা চতুর্থ, পঞ্চম ও অষ্টম স্থান এবং রহড়া কেন্দ্রের বিদ্যালয়ের ছাত্ররা সপ্তম ও অষ্টম স্থান অধিকার করে। (রহড়ার দুইজন ছাত্র এবং পুরুলিয়ার একজন—মোট তিনজন অষ্টম স্থান অধিকার করে)।

*

বিবিধ

গত ৭ই জুন কেন্দ্রীয় শক্তি-মন্ত্রী শ্রীপি. রামচন্দ্রন রামকৃষ্ণ মিশনের আলঙ কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দের আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচিত করেন।

কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পৈতৃক গৃহের রক্ষাকল্পে যে নূতন রাস্তাটি সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক নির্মিত হইয়াছে, গত ১৩ই জুলাই পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীত্রিভুবননারায়ণ সিং তাহার উদ্বোধন করেন। পশ্চিমবঙ্গের পূর্ত ও গৃহনির্মাণ মন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বিবিধ সংবাদ

স্মৃতিশক্তিবৃদ্ধির ঔষধ ?

স্মৃতিশক্তি দুর্বল অথবা লুপ্ত হইলে কোন রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে তাহা ফিরিয়া পাওয়া কি সম্ভব ? চিকিৎসা-সংক্রান্ত মাসিক পত্রিকা ল্যান্সেট (Lancet)-এ প্রকাশিত হইয়াছে যে, মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিত পিটুইটারি (Pituitary) নামক গ্রন্থি হইতে নির্গত রসের এই কর্মক্ষমতা থাকিতে পারে। এই গ্রন্থিরসের মধ্যে ভ্যাসোপ্রেসিন নামক যে উপাদানটি আছে, সেটি শরীরের জলীয় অংশের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করিতে সাহায্য করে বলিয়া জানা ছিল। পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সের লোকের রক্তে ভ্যাসোপ্রেসিনের পরিমাণ মনে হয় কমিয়া যায় এবং ওই বয়স হইতেই লোকে স্মৃতিশক্তিহ্রাসের অনুযোগ করে।

এই বিষয়ে গবেষকগণ ৫০ হইতে ৬৫ বৎসর বয়স্ক স্বেচ্ছাসেবকদের নাসিকায় পর পর তিন দিন প্রতিদিন তিনবার করিয়া ভ্যাসোপ্রেসিন সূক্ষ্ম বাষ্পাকারে (spray) দিয়াছিলেন। অনুরূপ স্বেচ্ছাসেবকদের নাসিকায় ভ্যাসোপ্রেসিন না দিয়া তাহার বদলে উহার নকল কিছু দেওয়ায় তাঁহাদের স্মৃতিশক্তির কোন পরিবর্তন হয় নাই। কিন্তু যাঁহারা ভ্যাসোপ্রেসিন পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের স্মৃতিশক্তির অনেক উন্নতি হইয়াছিল। তিনজন রোগী যাঁহারা মোটর দুর্ঘটনায় আংশিক ভাবে স্মৃতিশক্তি হারাইয়াছিলেন, তাঁহাদের চার সপ্তাহ ধরিয়া নাকে ওই ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে ৫৫ বৎসর বয়স্ক একজন তাঁহার দুর্ঘটনার, বিবাহের এবং জীবনের অন্যান্য বিশেষ ঘটনাগুলির তারিখ স্মরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। চিকিৎসার পূর্বে তিনি এই সকল ঘটনার কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

(Time, February 27, 1978. Page 44)

উৎসব

আগরতলা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৯ই হইতে ১৩ই মার্চ ১৯৭৮, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। ৯ই একশত দরিদ্র-

নারায়ণের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। ১০ই শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতিসহ শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা হোম ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ এবং আট হাজার ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন শ্রীসুশান্তকুমার চৌধুরী। ১১ই শ্রীশ্রীসারদাদেবীর জীবন ও বাণী আলোচনা করেন শ্রীমতী বীথিকা ঘোষ ও শ্রীমাধবলাল চট্টোপাধ্যায়। ১২ই স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করেন শ্রীলালা এন কে. দে ও শ্রীমাধবলাল চট্টোপাধ্যায়। ১৩ই সর্বসাধারণ ও স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ঠাকুর মা ও স্বামীজী সম্বন্ধে বক্তৃতা আবৃত্তি ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীঅচিন্ত্যকুমার রায়।

কল্যাণী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসংঘে গত ১৬ই হইতে ১৯শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে মঙ্গলারতি শোভাযাত্রা বিশেষ পূজা নাম-সংকীর্তন ভজন শ্রীমদ্ভাগবত ও কথামৃত পাঠ, রামায়ণগান লীলাকীর্তন দরিদ্রনারায়ণসেবা ধর্মসভা ও ছায়াচিত্র-প্রদর্শন প্রভৃতি হয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন স্বামী নিঃস্পৃহানন্দ স্বামী রমানন্দ স্বামী প্রত্যয়ানন্দ শ্রীমতী রমা বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীনিখিল চট্টোপাধ্যায় শ্রীঅতুলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় শ্রী ডি. এন. পাল শ্রীশ্রীরাধারমণ কীর্তনসমাজ সারদা সংঘ রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দির রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসংঘের সভ্য ও শিল্পিবৃন্দ।

জঙ্গীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রের উদ্যোগে গত ৩রা এবং ৪ঠা এপ্রিল ১৯৭৮, জঙ্গীপুর শহরে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণোৎসব পালিত হয়।

এই উপলক্ষে কথামৃত ও উপনিষদ্ পাঠ শোভাযাত্রা পূজা হোম ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী তীর্থানন্দ স্বামী উমানন্দ স্বামী অনাময়ানন্দ স্বামী শ্রবণানন্দ ও ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ। প্রতিদিন রাত্রে রামায়ণগান করেন শ্রীকানাইলাল হালদার।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য, মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সভাপতি **ভুজেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়** গত বুদ্ধপূর্ণিমা তিথিতে ৮০ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। দেশবিভাগের পূর্বে তিনি সুদীর্ঘকাল বরিশাল রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক ছিলেন।

তিনি চন্দননগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং কলিকাতার হিন্দু স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি ফেণী কলেজ, বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ ও মেদিনীপুর কলেজে অর্থনীতির অধ্যাপক এবং মতিঝিল কলেজের উপাধ্যক্ষ ও মেদিনীপুর কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ ছিলেন। বরিশাল ও মেদিনীপুরের নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণচরণে নিবেদিতপ্রাণ এই শিক্ষাব্রতীর মৃত্যুতে মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন তথা ঐ অঞ্চলের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীর মন্ত্রশিষ্যা **শৈলবালা ভৌমিক** গত ১১ই আষাঢ় ১৩৮৫, রাত্রি ৯টায় ৮৬ বৎসর বয়সে থ্রম্বোসিস্ রোগে আক্রান্তা হইয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার কলিকাতাস্থিত বাসভবনে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার আদি নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গে ঢাকা জিলায়। ভক্ত স্বর্গীয় হরেন্দ্রচন্দ্র নাগের ঢাকা শহরের নিকটবর্তী বেঞ্জারা গ্রামের বাড়ীর

ঠাকুরঘরে এই মহিলা মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। ধর্মশীলা ভক্তিমতী বালবিধবা অল্পবয়স হইতেই মহাপুরুষজীর পদাশ্রিতা হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর একনিষ্ঠ সেবা-পূজা, ধ্যান-ধারণায় জীবন কাটাইয়াছেন। রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন এবং বারাসত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমের যাবতীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সেবামূলক জনহিতকর কার্যে তাঁহার অনুরাগ ও সহযোগিতা ছিল। তাঁহার ভক্তি-বিনম্র ও মধুর প্রকৃতি সকলকে মুগ্ধ করিত।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের একনিষ্ঠ ভক্ত **লাবণ্যবতী দত্ত** গত ১৬ই জুন ১৯৭৮, সকাল ৮-৩০ মিনিটে মেদিনীপুরস্থ নিজ বাসভবনে ৭২ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে ইষ্ট ও শ্রীগুরুকে স্মরণ করিতে করিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহার জীবন ভক্তিময় নির্ভরতাময় ও ত্যাগময় ছিল। তিনি আজীবন নিয়মিত সাধন-ভজনে নিরত ছিলেন। মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সেবাকার্যের তিনি অকুণ্ঠ সমর্থক ছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের (শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী—উদ্বোধন) অধ্যক্ষ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ গত জুন মাসে চারিটি রবিবারে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত-প্রসঙ্গ এবং তিনটি বৃহস্পতিবারে গীতা-প্রসঙ্গ করেন। ৪ঠা জুন কথামৃত-প্রসঙ্গের প্রারম্ভে শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘে শ্রীশ্রীফলহারিণী-কালিকাপূজার বিশেষ তাৎপর্য সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা এবং ১১ই জুনের কথামৃত-প্রসঙ্গের সারসংক্ষেপ উদ্বোধনের গত শ্রাবণ-সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮ই জুনের কথামৃত-প্রসঙ্গের কিয়দংশের সার-সংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

শাস্ত্র বলতে সাধারণতঃ বুঝি বেদবেদান্ত গীতা ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ। আর বর্তমান যুগের শাস্ত্র বিতরণ করেছেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, যিনি যুগাবতার—যুগপ্রয়োজন মেটানোর জন্যই আবির্ভূত হয়েছেন। স্বামীজী বলেছেন, অবতাররা যখন তখন আসেন না। নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্যই তাঁদের আবির্ভাব। তাঁরা যুগগুরু। শাস্ত্র বলছেন, 'আচার্যবান্ পুরুষো বেদ'। ইনি কেমন? শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ শান্ত দান্ত উপরত। এই গুরু বিনা জ্ঞান—পরম-তত্ত্ব লাভ হয় না। 'গুরু বিনু জ্ঞান নহীঁ'। এই গুরুকে বেছে নিতে হবে—তাঁকে দিনে দেখে রাতে দেখে। গুরু ইষ্ট এক হলেও, সব গুরুই কিন্তু অবতার নন। যিনি অবতার তাঁর একটা নির্দিষ্ট যুগপ্রয়োজন থাকে, যার জন্যই তিনি অবতীর্ণ হন। যেমন রাম কৃষ্ণ বুদ্ধ চৈতন্য রামকৃষ্ণ।

শ্রীরামচন্দ্র ইতিহাস-পুরুষ নন। তিনি মর্যাদাপুরুষোত্তম। সর্বপ্রকার মানবাদর্শের মর্যাদায় ভূষিত।

শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পৃথিবীর ভার লাঘব করেছেন উপনিষদাদি শাস্ত্রের সার সংকলন ক'রে। স্ত্রী বৈশ্য শূদ্র—আপামর সকলের কাছে গীতাশাস্ত্রের মাধ্যমে সর্বধর্মসমন্বয়ের বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছেন।

ভগবান বুদ্ধও সে-যুগের প্রয়োজনেই জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সেই উপনিষদের বাণী, অভয়ের বাণী নূতনভাবে প্রচার করেছেন। যদিও

বেদকে তিনি স্বীকার করেননি, তবুও বেদের ঔপনিষদিক জ্ঞানের কথাই তিনি বলেছেন কর্মকাণ্ডের অংশ বাদ দিয়ে।

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনেও দেখি বাংলাদেশের তন্ত্রাভিলাষী পঞ্চ-মকারাদিলুব্ধ মানুষের কাছে, প্রবল জাতি-বর্ণ-ধর্মদ্বেষী জনসমষ্টির কাছে, তিনি পৌঁছে দিয়েছিলেন অপূর্ব নাম-মহিমা। প্রচার করলেন সর্ববর্ণের সর্বজনের কাছে সহজসাধ্য সাধনপন্থা—মুচি হলেও সে যদি একমনে হরিনাম করে, তবে শুচি হবেই। তাঁর আবির্ভাবও একটা বৈপ্লবিক যুগপ্রয়োজন সংসিদ্ধ করেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের কালকে বলতে পারি age of reason (বুদ্ধির যুগ)। সদ্যলব্ধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান তখনকার মানুষদের বলেছিল—'যা কিছু প্রমাণসিদ্ধ নয়, তা গ্রহণীয়ও নয়।' ঈশ্বরের প্রয়োজন নেই, কারণ তাঁকে প্রমাণ করা যায় না। Darwin-এর মতে মানুষ জীবকোষের বিবর্তনের দ্বারা সৃষ্ট, এর মধ্যে ঈশ্বরের স্থান কোথায়? হার্বার্ট স্পেন্সার, মিল প্রভৃতিরাও agnostic (অজ্ঞেয়বাদী)। এই যুগে—মানুষের মনের এই সংশয়ের যুগে, ঈশ্বরের অস্তিত্বের উপরে সন্দেহের এই যুগেই শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। আর সেই শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে সংশয়াচ্ছন্ন মানবসমাজের প্রতীক হিসাবে যুবক নরেন্দ্রনাথের প্রশ্ন ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট যুগপ্রশ্ন। শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তরটিও সেই বৈদিক ঋষির 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্'-এর সুরে—অনবদ্য স্বকীয় ভঙ্গীতে। নরেন্দ্রের যেমন চ্যালেঞ্জ, জবাবও তেমনি স্বতঃস্ফূর্ত। হ্যাঁ, দেখেছি, তোমাকে যেমন দেখছি তার থেকেও বেশী সত্য। আর মজা এমনি—পাছে সংশয়-আচ্ছন্ন মানুষ অবিশ্বাস করে সেই জন্য বিজ্ঞানবিশ্বাসী মানুষের সামনে demonstration দ্বারা (পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে) প্রমাণ করার ভঙ্গীতেই বললেন, 'তুই যদি চাস্ তোকেও দেখাতে পারি।'

নরেন্দ্রের জীবনে এই demonstration বহুবার প্রত্যক্ষীভূত হয়েছে, প্রমাণীকৃত হয়েছে। শুধু মুখের কথা নয়, জীবনের অনুভূতিতে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমাণ করিয়ে দিয়েছেন তাঁর অনুভূত সত্য তত্ত্ব। দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দিরে, হেদোর রেলিঙে মাথা ঠুকে, কাশীপুরে নির্বিকল্প সমাধিতে নানাভাবে নরেন্দ্রনাথ জেনেছেন এটা কেমন সত্য। শুধু তাঁকেই নয়। বহু বহু ভক্ত গৃহস্থকেও তিনি তাঁর ইচ্ছায়, স্পর্শে ঐ সত্যকে প্রমাণ করিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, সর্বভূতে ব্রহ্ম অনুস্যূত। সর্বত্র একই ব্রহ্মের অবস্থিতি প্রমাণ করেছেন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে, তাঁদের নিজস্ব অনুভূতির মধ্যে দিয়ে। কথামৃত সেই যুগাবতারের শ্রীমুখের কথা—নূতন বেদ—নূতন শাস্ত্র।

১৫ই, ২২শে ও ২৯শে জুন গীতার কালনির্ণয়, ঐতিহাসিক ভিত্তি, শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়। এই ভূমিকাটি উদ্বোধনে ধারাবাহিক প্রবন্ধরূপে পরে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংরক্ষণের জন্য যে আবেদন করা হইয়াছে তাহাতে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যাইতেছে। গত ১৩ই অগস্ট (১৯৭৮) হইতে প্রয়োজনীয় সংরক্ষণকার্য শুরু করা হইয়াছে। (৩. ৮. ৭৮)

মাষ্টার। আজ্ঞা হাঁ।

গিরিশ। কি? বিদ্যা! ও আমি অনেক দেখেছি, ওতে আর ভুলি না!

শ্রীরামকৃষ্ণ [হাসিতে হাসিতে]। আমার এখানকার ভাব কি জান?

"বই, শাস্ত্র, এসব কেবল ঈশ্বরের কাছে পঁহুছিবার পথ বলে দেয়। পথ—উপায়—জেনে লেবার পর আর বই, শাস্ত্রে কি দরকার? তখন নিজে কায কর্‌তে হয়।

"একজন একখান চিঠি পেয়েছিল, কুটুম্ বাড়ী তত্ত্ব কর্‌তে হবে, কি কি জিনিস লেখা ছিল। জিনিস কিন্‌তে দেবার সময় চিঠিখানি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। তখন খুব ব্যস্ত হয়ে চিঠির খোঁজ আরম্ভ হ'ল। অনেকক্ষণ ধরে অনেক জন মিলে খুঁজে খুঁজে শেষে চিঠিখানি পাওয়া গেল। তখন আনন্দের আর সীমা নাই। কর্ত্তা ব্যস্ত হয়ে অতি যত্নে চিঠিখানি হাতে নিলেন, আর দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, কি লেখা আছে। লেখা এই, পাঁচ সের সন্দেশ পাঠাইবে আর একখানি কাপড় পাঠাইবে, আরও কত কি। তখন আর চিঠির দরকার নাই, চিঠি ফেলে দিয়ে সন্দেশ ও কাপড়ের আর অন্যান্য জিনিসের চেষ্টায় বেরুলেন। চিঠির দরকার কতক্ষণ? যতক্ষণ সন্দেশ, কাপড় ইত্যাদির বিষয় না জানা যায়। তারপরই পাবার চেষ্টা।

"শাস্ত্রে তাঁকে পাবার উপায়ের কথা পাবে। কিন্তু ঐগুলি জেনেই কর্ম্ম আরম্ভ। তবে বস্তুলাভ।

"শুধু পণ্ডিতে কি হবে? অনেক শ্লোক, অনেক শাস্ত্র পণ্ডিতের জানা থাকৃতে পারে। কিন্তু যার সংসারে আসক্তি আছে, যার কামিনী ও কাঞ্চনে মনে মনে ভালবাসা আছে, তার শাস্ত্রে ধারণা হয় নাই, মিছে পড়া।

"পাঁজীতে লিখেছে, বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজী টিপ্‌লে এক ফোঁটাও পড়ে না। একফোঁটা পড়্, কিন্তু একফোঁটাও পড়ে না।" [সকলের হাস্য]

গিরিশ [সহাস্য]। মহাশয়, পাজী টিপ্‌লে একফোঁটাও পড়ে না? [হাস্য]

শ্রীরামকৃষ্ণ [সহাস্য]। পণ্ডিত খুব লম্বা লম্বা কথা বলে, কিন্তু নজর কোথায়? —কামিনী আর কাঞ্চনে, দেহের সুখে আর টাকায়।

শকুনি খুব উঁচুতে উড়ে, কিন্তু নজর ভাগাড়ে, [সকলের হাস্য]

—কেবল খুঁজ্‌ছে কোথায় মরা জানোয়ার, কোথায় ভাগাড়্, কোথায় মড়া।

(নরেন্দ্রের কথা)

শ্রীরামকৃষ্ণ [গিরিশের প্রতি]। নরেন্দ্র খুব ভাল। গাইতে, বাজাতে, পড়ায়, শুনায়, বিদ্যায়। এদিকে জিতেন্দ্রিয়, বিবেক বৈরাগ্য আছে, সত্যবাদী। অনেক গুণ!

[মাষ্টারের প্রতি] কেমন রে?—কেমন গা, খুব ভাল নয়?

মাষ্টার। আজ্ঞা হাঁ, খুব ভাল।

(গিরিশ)

শ্রীরামকৃষ্ণ [জনান্তিকে, মাষ্টারের প্রতি]। দেখ, ওর [গিরিশের] খুব অনুরাগ আর বিশ্বাস্!

(ভাদ্র, ১৩৮৫, পৃঃ ৪৩৭)

[[illegible]]

মাষ্টার অবাক হইয়া গিরিশকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। গিরিশ ঠাকুরের কাছে কএকদিন আসিতেছেন মাত্র। মাষ্টার কিন্তু দেখিলেন, যেন পূর্ব্বপরিচিত, অনেক দিনের আলাপ, পরম আত্মীয়, যেন একসূত্রে গাঁথা মণিগণের একটি মণি!

একজন ভক্ত বলিলেন, মহাশয়, আপনার গান হবে না?

ঠাকুর রামকৃষ্ণ সেই মধুর কণ্ঠে মায়ের নাম গুণ গান করিতে লাগিলেন।

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।
মাকে তুমি দেখো আর আমি দেখি আর যেন
কেউ নাহি দেখে॥
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি,
রসনারে সঙ্গে রাখি সে যেন মা বলে ডাকে। (মাঝে মাঝে)
কুরুচি কুমন্ত্রী যত, নিকট হতে দিও নাকো
জ্ঞাননয়নে প্রহরী রেখো সে যেন সাবধানে থাকে।

ঠাকুর ত্রিতাপে তাপিত সংসারী জীবের ভাব আরোপ করিয়া মার কাছে অভিমান করিয়া গাইতে লাগিলেন—

গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায়, নিরানন্দ কোরো না।
(ওমা) ওদুটী চরণ, বিনে আমার মন, অন্য কিছু আর জানে না,
তপনতনয় আমায় মন্দ কয় কি বলিব তায় বল না।
ভবানী বলিয়ে ভবে যাব চলে মনে ছিল এই বাসনা,
অকূল পাথারে ডুবাবে আমারে (ওমা) স্বপনেও তাতো জানি না।
অহরহ নিশি, দুর্গা নামে ভাসি, তবু দুখরাশি গেল না,
এবার যদি মরি, ও হরসুন্দরী, তোর দুর্গা নাম কেউতো লবে না।

আবার নিত্যানন্দময়ীর আনন্দের কথা গাইলেন—

শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা,
সুধাপানে ঢল ঢল তবু ঢলে পড়ে না (মা)।
বিপরীতরতাতুরা, পদভরে কাঁপে ধরা,
উভয়ে পাগলের পারা, লজ্জা ভয় আর মানে না (মা)।

ভক্তেরা নিস্তব্ধ হইয়া গান শুনিতে লাগিলেন আর একদৃষ্টে ঠাকুরের অদ্ভুত আত্মহারা মাতোয়ারা ভাব দেখিতে লাগিলেন। গান সমাপ্ত হইল। কিয়ৎকাল পরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিলেন, আমার আজ গান ভাল হ'ল না—সর্দ্দি হয়েছে।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। সিন্ধুবক্ষে, যথায় অনন্তের ছায়া পড়িয়াছে, নিবিড় অরণ্য-মধ্যে, অম্বরস্পর্শী পর্ব্বতশিখরে, অনিলবিকম্পিত নদীতীরে, দিগ্দিগন্তব্যাপী প্রান্তরমধ্যে, ক্ষুদ্র মানবের সহজেই ভাবান্তর হইল। এই সূর্য্য চরাচর বিশ্বকে আলোকিত করিতেছিলেন, কোথায় গেলেন! বালক ভাবিতেছে, আবার ভাবিতেছেন বালক-স্বভাবাপন্ন মহাপুরুষ। সন্ধ্যা হইল! কি আশ্চর্য্য, কে এরূপ করিল? পাখীরা পাদপশাখা

আশ্রয় করিয়া রব করিতেছে। মানুষের মধ্যে যাঁহাদের চৈতন্য হইয়াছে, তাঁহারাও সেই আদি কবি, কারণের কারণ, পুরুষোত্তমের নাম করিতেছেন।

কথা কহিতে কহিতে সন্ধ্যা হইল। ভক্তেরা যে যে আসনে বসিয়াছিলেন, তিনি সেই আসনেই বসিয়া রহিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ মধুর নাম করিতেছেন, তাই সকলে উদ্‌গ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছেন। এমন মিষ্ট নাম তাঁরা কখন শুনেন নাই—যেন সুধাবর্ষণ হইতেছিল। এমন প্রেমমাখা বালকের মা মা বলে ডাকা, তাঁরা কখন দেখেন নাই। আকাশ, পর্ব্বত, মহাসাগর, প্রান্তর, বন আর দেখবার প্রয়োজন কি? গরুর শৃঙ্গ, হস্ত, পদ, শরীরের অন্যান্য অংশ আর দেখিবার কি প্রয়োজন? দয়াময় গুরুদেব যে গরুর বাঁটের কথা কহিলেন, এই গৃহ মধ্যে কি তাই দেখিতেছি? সকলের অশান্তমন কিসে শান্তিলাভ করিল? নিরানন্দ ধরা কিসে আনন্দে ভাসিল? কেন ভক্তদের দেখিতেছি শান্ত ও আনন্দময়? এই প্রেমিক সন্ন্যাসী কি সেই সুন্দররূপধারী অনন্ত ঈশ্বর? এইখানেই কি দুগ্ধপানপিপাসুর পিপাসার শান্তি হইবে? অবতার হউন আর নাই হউন, ইঁহার চরণপ্রান্তে মন বিকাইয়াছে, আর যাইবার যো নাই। ইঁহারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা! দেখি ইঁহার হৃদয়সরোবরে সেই আদিপুরুষ কিরূপ প্রতিবিম্বিত হইয়াছেন।

ভক্তেরা কেহ কেহ এরূপ চিন্তা করিতেছেন ও ঠাকুর রামকৃষ্ণের শ্রীমুখবিগলিত হরিনাম আর মায়ের নাম শ্রবণ করিয়া কৃতকৃতার্থ বোধ করিতেছেন। নামগুণকীর্ত্তনান্তে ঠাকুর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, যেন সাক্ষাৎ ভগবান্ প্রেমের দেহ ধারণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিতেছেন, কিরূপে প্রার্থনা করিতে হয়। বলিলেন, 'মা, আমি তোমার শরণাগত, তোমার শ্রীপাদপদ্মে শরণ নিলাম। মাগো, দেহসুখ চাই না, মা লোকমান্য চাই না, [অণিমাদি] অষ্টসিদ্ধি চাই না; কেবল এই কোরো, যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয়—নিষ্কাম, অমলা, অহেতুকী ভক্তি হয়। আর যেন মা তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। তোমার মায়ার সংসারের—কামিনী-কাঞ্চনের উপর ভালবাসা যেন কখন না হয়। মা, তোমা বই আমার আর কেউ নাই। আমি ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন, কৃপা করে শ্রীপাদপদ্মে আমায় ভক্তি দাও।

ত্রিসন্ধ্যা যিনি তাঁর নাম করিতেছেন—যাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত নামগঙ্গা তৈলধারার ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন, তাঁর আবার সন্ধ্যা কি? পরে বুঝিলাম। লোকশিক্ষার জন্য ঠাকুর মানবদেহ ধারণ করিয়াছেন!

"হরি আপনি এসে যোগী বেশে করিলে নাম সঙ্কীর্ত্তন।"

* * * *

গিরিশ ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সেই রাত্রেই যেতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। রাত হবে না?

গিরিশ। না, যখন ইচ্ছা আপনি যাবেন; আমায় আজ theatre [থিয়েটর] যেতে হবে, তাদের ঝগড়া মেটাতে হবে।

বিলাতযাত্রীর পত্র।

(স্বামী বিবেকানন্দ প্রেরিত)

(বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা।)

এই ভূমধ্য সাগরপ্রান্ত, যে ইয়ুরোপী সভ্যতা এখন বিশ্বজয়ী তাহার জন্মভূমি। এই তটভূমিতে মিসরি, বাবিলি, ফিনিক, য়াহুদী প্রভৃতি সেমিটিক জাতিবর্গ ও ইরাণি, যবন, রোমক প্রভৃতি আর্য্যজাতির সংমিশ্রণে বর্ত্তমান ইয়ুরোপী সভ্যতা।

(মিসরতত্ত্ব।)

"রোজেট্টাষ্টোন" নামক একখণ্ড বৃহৎ শিলালেখ মিসরে পাওয়া যায়। তাহার উপর জীব, জন্তুর, লাঙ্গুল ইত্যাদি রূপ চিত্রলিপিতে লিখিত এক লেখ আছে, তাহার নীচে আর একপ্রকার লেখ, সকলের নিম্ন গ্রীকভাষার অনুযায়ী লেখ। একজন পণ্ডিত ঐ তিন লেখকে এক অনুমান করেন। কপ্ত নামক যে ক্রীশ্চিয়ান জাতি এখনও মিসরে বর্ত্তমান এবং যাহারা প্রাচীন মিসরিদের বংশধর বলে বিদিত, তাদের লেখের সাহায্যে তিনি এই প্রাচীন মিসরি লিপির উদ্ধার করেন। ঐরূপ বাবিলিদের ইট এবং টালিতে খোদিত ভল্লাগ্রের ন্যায় লিপিও ক্রমে উদ্ধার হয়। এদিকে ভারতবর্ষের লাঙ্গলাকৃতি কতকগুলি লেখ মহারাজা অশোকের সমসাময়িক লিপি বলিয়া আবিষ্কৃত হয়। এতদপেক্ষা প্রাচীন লিপি ভারতবর্ষে পাওয়া যায় নাই। মিসরময় নানাপ্রকার মন্দির স্তম্ভ শবাধার ইত্যাদিতে যে সকল চিত্রলিপি লিখিত ছিল, ক্রমে ক্রমে সেগুলি পঠিত হয়ে, প্রাচীন মিসরতত্ত্ব বিশদ করে ফেলছে।

মিসরিরা "পুণ্ট" নামক সমুদ্রপার দক্ষিণ দেশ হতে মিসরে প্রবেশ করেছিল। কেউ কেউ বলেন যে ঐ "পুণ্ট"ই বর্ত্তমান মালাবার, এবং মিসরিরা এবং দ্রাবিড়িরা এক জাতি। ইহাদের প্রথম রাজার নাম "মেনুস্"। ইহাদের প্রাচীন ধর্ম্মও কোনও কোনও অংশে আমাদের পৌরাণিক কথার ন্যায়। "শিবু" দেবতা "নুই" দেবীর দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছিলেন, পরে আর এক দেবতা "শু" এসে বলপূর্ব্বক "নুইকে" তুলে ফেললেন। নুইর শরীর আকাশ হল, দুহাত আর দুপা হল সেই আকাশের চারস্তম্ভ। আর শিবু হলেন পৃথিবী। নুইর পুত্রকন্যা "অসিরিস্" আর "ইসিস্" মিসরের প্রধান দেবদেবী এবং তাঁহাদের পুত্র "হোরস" সর্ব্বোপাস্য। এই তিন জন একসঙ্গে উপাসিত হতেন। "ইসিস্" আবার গোমাতারূপে পূজিত।

পৃথিবীতে নীলনদীর ন্যায়, আকাশে ঐ প্রকার নীলনদী আছেন। পৃথিবীর নীলনদী তাহার অংশ মাত্র; সূর্য্যদেব ইহাদের মতে নৌকায় করে পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন। মধ্যে মধ্যে "অহি" নামক সর্প তাঁহাকে গ্রাস করে, তখন গ্রহণ হয়।

চন্দ্রদেবকে এক শূকর মধ্যে মধ্যে আক্রমণ করে এবং খণ্ড খণ্ড করে ফেলে, পরে ১৫ দিন তাঁর সারতে লাগে। মিসরের দেবতাসকল কেউ "শৃগালমুখ", কেউ "বাজের"

মুখবুক্, কেউ "গোমুখ", ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গেই ইউফ্রেটিসতীরে আর এক সভ্যতার উত্থান হয়েছিল।

তাদের দেবতাদের মধ্যে "বাল" "মোলখ" "ইস্তারত্" ও "দমুজি" প্রধান। ইস্তারৎ দমুজি নামক মেষপালের প্রণয়ে আবদ্ধ হলেন। এক বরাহ দমুজিকে মেরে ফেল্‌লে। পৃথিবীর নীচে পরলোকে ইস্তারৎ দমুজির অন্বেষণে গেলেন। সেথায় "আলাৎ" নামক ভয়ানক দেবী তাঁকে বহু যন্ত্রণা দিলে। শেষে ইস্তারৎ বলিলেন যে আমি দমুজিকে না পেলে মর্ত্ত্যলোকে আর যাব না। মহামুস্কিল; উনি হলেন কামদেবী, উনি না এলে মানুষ জন্তু গাছপালা আর কিছুই জন্মাবে না। তখন দেবতারা সিদ্ধান্ত কর্লেন যে, প্রতি বৎসর "দমুজি" চারমাস থাক্‌বেন পরলোকে পাতালে, আর আট মাস থাকবেন মর্ত্ত্যলোকে। তখন "ইস্তার" ফিরে এলেন, বসন্তের আগমন হলো, শস্যাদি জন্মাল।

এই দমুজি আবার "আদুনোই" বা আদুনিস্ নামে বিখ্যাত। সমস্ত সেমিটিক জাতিদের ধর্ম্ম কিঞ্চিৎ অবান্তর ভেদে প্রায় একরকমই ছিল। "বাবিলি" "য়াহুদী" ফিনিক ও পরবর্ত্তী আরাবদের একই প্রকার উপাসনা ছিল। প্রায় সকল দেবতারই নাম "মোলখ", যে শব্দটী বাঙ্গলা ভাষাতে মালিক্ মুল্লুক ইত্যাদি রূপে এখনও রয়েছে, অথবা "বাল", তবে অবান্তরভেদ ছিল। কারুর কারুর মত, এ "আলাৎ" দেবতা পরে আরবদিগের "আল্লা" হলেন।

এই সকল দেবতার পূজার মধ্যে কতকগুলি ভয়ানক ও জঘন্য ব্যাপারও ছিল। মোলক বা বালের নিকট পুত্রকন্যাকে জীবন্ত পোড়ান হত। ইস্তারদের মন্দিরে স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক কামসেবা প্রধান অঙ্গ ছিল।

(য়াহুদী জাতির ইতিহাস।)

য়াহুদী জাতির ইতিহাস বাবিল অপেক্ষা অনেক আধুনিক। পণ্ডিতদের মধ্যে "বাইবল" নামক ধর্ম্মগ্রন্থ খৃঃ পূঃ ৫০০ শতাব্দী হতে আরম্ভ হয়ে খৃঃ পর পর্য্যন্ত লিখিত হয়। বাইবলের অনেক অংশ, যা পূর্ব্বের বলে প্রথিত, তাহা অনেক পরের। এই বাইবলের মধ্যে স্থূল কথাগুলি "বাবিল" জাতির। বাবিলদের সৃষ্টিবর্ণনা, জলপ্লাবন বর্ণনা অনেক স্থলে বাইবল গ্রন্থে সমগ্র গৃহীত। তার উপর পারসী বাদসারা যখন আসিয়া-মাইনরের উপর রাজত্ব কর্ত্তেন, সেই সময়ে অনেক "পারসী" মত য়াহুদীদের মধ্যে প্রবেশ করে। বাইবেলের প্রাচীন ভাগের মতে এই জগৎই সব; আত্মা বা পরলোক নাই। নবীন ভাগে "পারসীদের" পরলোকবাদ, মৃতের পুনরুত্থান ইত্যাদি দৃষ্ট হয় এবং সয়তানবাদটী একেবারে "পারসীদের"।

(য়াহুদী ধর্ম্ম।)

য়াহুদীদের ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ "যাভে" নামক "মোলখের" পূজা। এই নামটী কিন্তু য়াহুদী ভাষার নয়, কারুর কারুর মতে ঐটী মিসরীয় শব্দ। কিন্তু কোথা থেকে এলো কেউ জানে না। বাইবেলে বর্ণনা আছে যে য়াহুদীরা মিসরে আবদ্ধ হয়ে অনেক দিন ছিল, সে

(ভাদ্র, ১৩৮৫, পৃঃ ৪৪১)

সব এখন কেউ বড় মানে না এবং "এব্রাহিম" "ইসহাক" "ইয়াকুব" প্রভৃতি গোত্র-পিতাদের রূপক বলে প্রমাণ করে।

(য়াহুদী ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ।)

য়াহুদীরা 'যাভে' এ নাম উচ্চারণ কর্ত্তনা, তার স্থানে "আদুনোই" বলত। যখন য়াহুদীরা ইস্রেল আর ইফ্রেম দুই শাখায় বিভক্ত হলো, তখন দুই দেশে প্রধান মন্দির নির্ম্মিত হল। জিরুশালমে ইস্রেলদের যে মন্দির নির্ম্মিত হলো, তাতে "যাভে" দেবতার একটি নরনারী সংযোগ মূর্ত্তি একটী সিন্দুকের মধ্যে রক্ষিত হত। দ্বারদেশে একটী বৃহৎ পুংচিহ্ন স্তম্ভ ছিল। ইফ্রেমে যাভে দেবতা সোণামোড়া বৃষের মূর্ত্তিতে পূজিত হতেন।

উভয় স্থানেই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দেবতার নিকট জীবন্ত অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হত এবং একদল স্ত্রীলোক ঐ দুই মন্দিরে বাস করত। তারা মন্দিরের মধ্যেই বেশ্যাবৃত্তি করে যা উপার্জ্জন করত, তা মন্দিরের ব্যয়ে লাগ্‌ত।

(নবী বা প্রফেট।)

ক্রমে য়াহুদীদের মধ্যে একদল লোকের প্রাদুর্ভাব হলো, তারা গীত বা নৃত্যের দ্বারা আপনাদের মধ্যে দেবতার আবেশ করতেন। এদের নাম নবী বা Prophet ভাববাদী। এদের মধ্যে অনেকে ইরানীদের সংসর্গে মূর্ত্তিপূজা পুত্রবলি বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদির বিপক্ষ হয়ে পড়্‌লো। ক্রমে বলির যায়গায় হলো "সুন্নত"। বেশ্যাবৃত্তি মূর্ত্তিআদি ক্রমে উঠে গেল। ক্রমে ঐ নবীসম্প্রদায়ের মধ্য হতে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের সৃষ্টি হলো।

(ঈশা কি ঐতিহাসিক ? Higher Criticism)

'ইসা' নামক কোনও পুরুষ কখনও জন্মেছিলেন কিনা এ নিয়ে বিষম বিতণ্ডা; নিউ-টেষ্টামেণ্টের যে চার পুস্তক, তার মধ্যে সেণ্টজন নামক পুস্তক ত একেবারে অগ্রাহ্য হয়েছে। বাকি তিন কোনও এক পুস্তক দেখে লেখা এই সিদ্ধান্ত; তাও "ইসা" হজরতের যে সময় নির্দ্দিষ্ট আছে, তার অনেক পরে।

তার উপর যে সময় 'ইসা' জন্মেছিলেন বলে প্রসিদ্ধি, সে সময় ঐ য়াহুদীদের মধ্যে দুজন ঐতিহাসিক জন্মেছিলেন, জোসিফুস্ আর "ফিলো"। এঁরা য়াহুদীদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়েরও উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ঈষা বা কৃশ্চীয়ানদের নামও নাই, অথবা রোমান জজ্ তাঁকে ক্রুশে মারতে হুকুম দিয়েছিল, এ কোনও কথাই নাই। জোসিফুসের পুস্তকে এক ছত্র ছিল, তা এখন প্রক্ষিপ্ত বলে প্রমাণ হয়েছে।

রোমকরা ঐ সময়ে য়াহুদীদের উপর রাজত্ব করত, গ্রীকেরা সকল বিদ্যা শিখ্‌ত। ইঁহারা সকলেই য়াহুদীদের সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখেছেন কিন্তু 'ঈষা' বা কৃশ্চানদের কোনও কথাই নাই।

আবার মুস্কিল যে, যে সকল কথা উপদেশ বা মত নিউটেষ্টামেণ্ট গ্রন্থে প্রচার আছে, ও সমস্তই নানা দিক্‌দেশ হতে এসে খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই য়াহুদীদের মধ্যে বর্ত্তমান ছিল এবং 'হিলেল্' প্রভৃতি রাব্বি (উপদেশক) গণ প্রচার করছিলেন। পণ্ডিতেরা ত এইসব বলছেন,

তবে অন্যের ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেমন সাঁ করে এক কথা বলে ফেলেন, নিজেদের দেশের ধর্ম্ম সম্বন্ধে তা বল্লে কি আর জাঁক থাকে? কাজেই শনৈঃ শনৈঃ যাচ্ছেন। এর নাম Higher Criticism হাইয়ার ক্রিটিসিসম্।

(ভারতে প্রত্নতত্ত্ব বিদ্যাচর্চ্চার বিঘ্ন।)

পাশ্চাত্য বুধমণ্ডলী এই প্রকার দেশ দেশান্তরের ধর্ম্ম-নীতি জাতি ইত্যাদির আলোচনা কর্‌ছেন। আমাদের বাঙ্গলা ভাষায় কিছুই নাই, হবে কি করে! এক বেচারা ১০ বৎসর হাড় গোড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করে যদি এই রকম একখানা বই তর্জ্জমা করে ত সে নিজেই বা খায় কি, আর বই বা ছাপায় কি দিয়ে?

একে দেশ অতি দরিদ্র, তাতে বিদ্যা একেবারে নেই বল্লেই হয়। মা জগদম্বাই জানেন এমত দিন কি হবে যে, আমরা সব প্রকার বিদ্যার চর্চ্চা করবো। কে জানে "মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং—যৎ কৃপা"।

ইউরোপ।

জাহাজ নেপলসে লাগ্‌লো। আমরা ইটালীতে পৌঁছুলাম। এ ইটালীর রাজধানী 'রোম'। এই 'রোম' সেই প্রাচীন মহাবীর্য্য রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী। যাহাদের রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যা, উপনিবেশ সংস্থান, পরদেশবিজয় এখনও সমগ্র পৃথিবীর আদর্শ।

নেপলস্ ত্যাগ করে জাহাজ মার্সাইতে "লেগেছিল", তারপর একেবারে লণ্ডন।

ইউরোপ সম্বন্ধে তোমাদের ত নানা কথা শোনা আছে, তারা কি খায়, কি পরে, কি রীতিনীতি আচার ইত্যাদি। তা আর আমি কি বলবো। তবে ইউরোপী সভ্যতা কি। এর উৎপত্তি কোথায়? আমাদের সঙ্গে ইহার কি সম্বন্ধ। এ সভ্যতার কতটুকু আমাদের লওয়া উচিত। এ সব সম্বন্ধে অনেক কথা বল্‌বার রইল। শরীর কাউকে ছাড়ে না ভায়া, অতএব বারান্তরে সে সব কথা বল্‌তে চেষ্টা কর্‌বো। অথবা বলে কি হবে? বকাবকি বলা কওয়াতে আমাদের (বিশেষ বাঙ্গালীর) মত কে বা মজবুত? যদি পার ত করে দেখাও। কাজ কথা কউক্, মুখকে বিরাম দাও। তবে একটা কথা বলে রাখি, গরীব নিম্নজাতিদের মধ্যে বিদ্যা ও শক্তির প্রবেশ যখন থেকে হতে লাগ্‌লো, তখন

(গরীবের উন্নতিতে দেশের উন্নতি।)

থেকেই ইউরোপ উঠ্‌তে লাগ্‌লো। রাশি রাশি অন্য দেশের আবর্জ্জনার ন্যায় পরিত্যক্ত দুঃখী গরীব আমেরিকায় স্থান পায়, আশ্রয় পায়, এরাই আমেরিকার মেরুদণ্ড। বড় মানুষ পণ্ডিত ধনী এরা শুন্‌লে বা না শুন্‌লে, বুঝ্‌লে বা না বুঝ্‌লে, তোমাদের গাল দিলে বা প্রশংসা কর্লে, কিছুই এসে যায় না। এঁরা হচ্চেন শোভা মাত্র দেশের বাহার, কোটি কোটি গরীব নীচ যারা, তারাই হচ্ছে প্রাণ। সংখ্যায় আসে যায় না, ধন বা দারিদ্র্যে আসে যায় না, কায়মনবাক্য যদি এক হয়, একমুষ্টি লোক পৃথিবী উল্টে দিতে পারে, এই বিশ্বাসটি ভুলো না। বাধা যত হবে, ততই ভাল। বাধা না পেলে কি নদীর বেগ হয়, যে জিনিষ যত নূতন হবে, যত উত্তম হবে, সে জিনিষ প্রথম তত অধিক বাধা পাবে। বাধাই ত সিদ্ধির পূর্ব্ব লক্ষণ। বাধাও নাই সিদ্ধিও নাই। অলমিতি॥

(ভাদ্র, ১৩৮৫, পৃঃ ৪৪৩)

রামকৃষ্ণ মিশন।

স্বামী বিবেকানন্দ।

বিগত ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮৯৯ খৃঃ স্বামী বিবেকানন্দ ক্যালিফর্ণিয়া দেশস্থ লস্ এঞ্জেলিস্ Los Angelis সহরে উপস্থিত হন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম তিনি রোগমুক্ত হইয়া পূর্ব্ব-স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছেন এবং ১৯ ডিসেম্বর হইতে পুনরায় ধর্ম্মপ্রচার ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত সহরে সত্যমন্দির House of truth নামক ধর্ম্মালয়ে দর্শনোপলব্ধ সত্যের মনুষ্য-জীবনে পরিণতির Applied Psychology বিষয়ে তিনি চারিটী বক্তৃতা দিয়াছেন। শ্রোতার সংখ্যা সহস্রাধিক হইয়াছিল। তত্রস্থ জনৈক বন্ধুর ২৬এ ডিসেম্বর তারিখের পত্রে জানিলাম যে, জনসাধারণের আগ্রহাতিশয়ে তাঁহাকে প্রায় প্রত্যহই উক্ত ধর্ম্মমন্দিরে বক্তৃতা দিতে হইয়াছে। জানুয়ারি মাসের প্রারম্ভে লস্ এঞ্জেলিস্ হইতে ১০ মাইল দূরে অবস্থিত Pasadena পাসাডিনা সহরের Shakespeare Club সেক্ষপীয়র-সভা তাঁহাকে ধর্ম্মসম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে নিমন্ত্রণ করেন। সেখানে কয়েক সপ্তাহ বক্তৃতার পর তিনি ক্যালিফর্ণিয়ার রাজধানী সান্ ফ্রান্সিস্কো সহরে যাত্রা করিবেন।

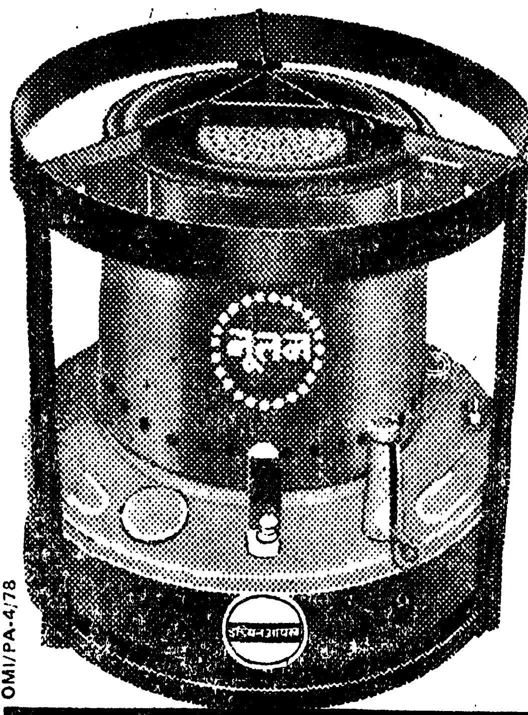
স্বামী তুরীয়ানন্দ।

গত ১০ই ডিসেম্বর Cambridge Conference কেম্ব্রিজ সমিতিতে তুরীয়ানন্দ স্বামী "আচার্য্য শঙ্কর" সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। আমেরিকার বিখ্যাত Harvard University হারবার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা এবং অন্যান্য কৃতবিদ্য সভ্যেরা তাঁহার প্রবন্ধের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। উক্ত বিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক ল্যানম্যান্ Prof. Lanman সাহেব স্বামিজির বক্তৃতান্তে, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের অদ্ভুত প্রতিভা এবং অলোক-সামান্য চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন।

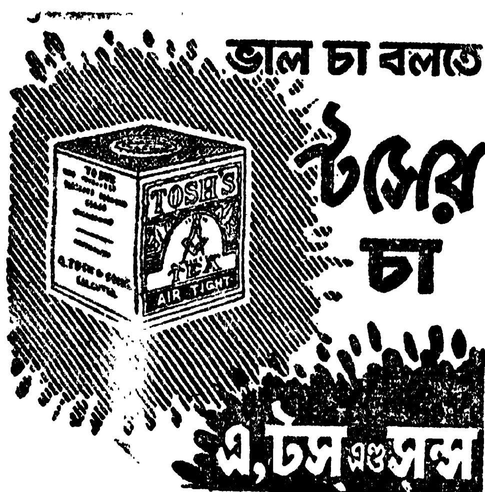
স্বামী অভেদানন্দ।

বিগত ২৫শে জানুয়ারি বৃহস্পতিবার রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত অভেদানন্দ স্বামী নিউইয়র্কে স্থানীয় যুবকদিগের উপকারার্থ "যুবকবৃন্দের যোগসমিতি" Youngmen's Yoga Association নামক একটী নূতন সভার অধিবেশন করিয়াছেন। যোগসমিতির সভ্যদিগকে প্রতি সপ্তাহে যথানিয়মে প্রাণায়াম ও ধ্যান ধারণাদির শিক্ষা দেওয়া হইবে।

১৮৯৯ খৃঃ অক্টোবর মাস হইতে ১৯০০ খৃঃ মে মাস পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত অভেদানন্দ স্বামীর, বেদান্তজ্ঞান সম্বন্ধে, বক্তৃতা হইতেছে। বক্তৃতাগুলি নিউইয়র্কের বেদান্ত সমিতির আফিস এবং লাইব্রেরী গৃহেই দেওয়া হয়। মঙ্গলবার—বক্তৃতা; বুধবার—বিশেষ জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের সহিত জীবনে ধর্ম্ম পরিণতির উপায় সম্বন্ধে কথোপকথন; বৃহস্পতিবার—ছাত্রদের, প্রশ্নোত্তরের দ্বারা শঙ্কা সমাধান; এবং শনিবারে—হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করা হয়। এতদ্ভিন্ন ছাত্রদিগকে প্রতিদিন বৈকালে একঘণ্টা করিয়া ধ্যানশিক্ষা এবং প্রতি রবিবার Tuxedo Hall টুক্সেডো হলে এক মহতী সভাসমক্ষে বিশেষ বক্তৃতা হইয়া থাকে। হিন্দু ধর্ম্মের জ্ঞানকাণ্ডের উচ্চ



OMI/PA-4/78



ভাল চা বলতে
টসের
চা
TOSH'S
AIR TIGHT
এ, টস এণ্ড সন্স
কলিকাতা—১

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ— স্বামী সারদানন্দ। দুই ভাগ, রেক্সিন-বাঁধাই : মূল্য ১ম ভাগ ১৯'০০। ২য় ভাগ ১৭'০০

সাধারণ ১ম খণ্ড ৩'৫০ ; ২য় খণ্ড ৭'৮০ ; ৩য় খণ্ড ৫'২০ ; ৪র্থ খণ্ড ৭'০০ ; ৫ম খণ্ড ৭'৫০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন। সুললিত কবিতায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী। মূল্য ২৬'০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ-সংকলিত। মূল্য ১'৬০ ; কাপড়ে বাঁধাই ১'৮০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা— শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন। মূল্য ৩'৫০

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। মূল্য ২'৫০

শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ—স্বামী নির্বেদানন্দ (অনুবাদ : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। পৃঃ ২৯৬, সাধারণ ৬'০০ ; হাফ-রেক্সিন। বোর্ড বাঁধাই, শোভন ৭'০০

শ্রীরামকৃষ্ণজীবনী—স্বামী তেজসানন্দ। পৃঃ ২০৮, মূল্য ৫'০০

শিশুদের রামকৃষ্ণ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৪০, মূল্য ৩'০০

শ্রীশ্রীমা-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীমায়ের কথা—শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সন্তানগণের ডায়েরী হইতে। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। মূল্য ১ম ভাগ ৭'০০, ২য় ভাগ ১০'০০

মাতৃ-সান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ। পৃঃ ২৫৬, মূল্য ৬'০০

শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীশ্রীমায়ের বিস্তারিত জীবনীগ্রন্থ। পৃঃ ৬৪২, মূল্য ১৭'০০

শিশুদের মা সারদাদেবী (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৪০, মূল্য ৩'০০

স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয়

যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত স্বামীজীর প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। তিন খণ্ডে প্রকাশিত। মূল্য ১ম খণ্ড ১৬'০০ ; ২য় খণ্ড ১৬'০০ ; ৩য় খণ্ড ৮'০০

স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীপ্রমথনাথ বসু। ১ম ভাগ (ছাপা নাই), ২য় ভাগ—মূল্য ৪'২৫

স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১৩৬, মূল্য ২'৫০

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—(দুই খণ্ড একত্রে)। শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। স্বামীজীর সহিত লেখকের কথোপকথন। পৃঃ ২৫৮, মূল্য ৭'০০

স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতা। (অনুবাদ : স্বামী মাধবানন্দ)। মূল্য ৮'০০

স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে—ভগিনী নিবেদিতা (বঙ্গানুবাদ)। পৃঃ ১২৪, মূল্য ১'২৫

শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। ৩য় সং, মূল্য ২'৫০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

অন্যান্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা — স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য ১৩'০০, ২য় ভাগ পৃঃ ৫২৪, মূল্য ৮'০০

ভারতে শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ। মূল্য ৩'০০

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৯১, মূল্য ৫'০০

স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ। পৃঃ ৩১০, মূল্য ৪'০০

গোপালের মা — স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৪৪, মূল্য ১'৫০

আচার্য শঙ্কর—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৪৬, মূল্য ৬'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র—মূল্য ৭'৮০

শিবানন্দ-বাণী— স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত। ২য় ভাগ ২'৫০

স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ। মূল্য ৪'০০

দিব্যপ্রসঙ্গে — স্বামী দিব্যাত্মানন্দ।

স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী— (ছাপা নাই)

আরত্রিক-স্তব—মূল্য ০'৭০

পুণ্যস্মৃতি—স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ। পৃঃ ১১৬, মূল্য ৩'০০

মহাভারতের গল্প—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, সাধারণ ২'৫০, বোর্ড বাঁধাই ৩'০০ ৬ষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য সংক্ষেপিত "স্কুলপাঠ্য" সংস্করণ—পৃঃ ৭২, মূল্য ২'০০

শঙ্কর-চরিত — শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। ৭ম সংস্করণ মূল্য ২'৫০

দশাবতার-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য পৃঃ ১০৮, মূল্য ২'৫০

সাধক রামপ্রসাদ—স্বামী বামদেবানন্দ। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৫'২০

সাধু নাগমহাশয়—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। পৃঃ ১৪৪, মূল্য ৩'৫০

ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী তেজসানন্দ। পৃঃ ১২৪, মূল্য ১'৫০

শিব ও বুদ্ধ—ভগিনী নিবেদিতা। পৃঃ ৬৩, মূল্য ০'৬৫

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ— পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৫'০০

পত্রমালা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২, মূল্য ৪'০০

গীতাতত্ত্ব—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৭৬, মূল্য ৫'০০

লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৪২০, মূল্য ১০'০০

পরমার্থ-প্রসঙ্গ— স্বামী বিরজানন্দ। পৃঃ ১৩৭, মূল্য ৪'০০

ভগবানলাভের পথ—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। মূল্য ১'০০

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী — স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৩২, মূল্য ০'৬০

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-সঞ্চয়ন— পৃঃ ৩১৬, মূল্য ৭'০০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

বেদান্তের আলোকে খৃষ্টের শৈলোপদেশ—স্বামী প্রভবানন্দ। মূল্য সাধারণ ৪'০০

অতীতের স্মৃতি—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। পৃঃ ৪৬৪, মূল্য ১০'০০

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ১৪২, মূল্য ৩'৩০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। পাঁচশতাধিক সঙ্গীত। মূল্য ৬'০০

ঠাকুরের নরেন, নরেনের ঠাকুর—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ২৯, মূল্য ১'২০

সংস্কৃত

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত

১ম ভাগ পৃঃ ৫৫৪, মূল্য ১১'০০
২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ১১'০০
৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মূল্য ১১'০০

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত, স্বামী জগদানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪৯৫, মূল্য ৭'৮০

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৬'৪০

স্তবকুসুমাঞ্জলি—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪০৮, মূল্য ৭'০০

বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা—স্বামী ধীরেশানন্দ-সংকলিত। (ছাপা নাই)

বৈরাগ্যশতকম্—স্বামী ধীরেশানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ১'৫০

নারদীয় ভক্তিসূত্র—স্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ১৬৩, মূল্য সাধারণ ৫'০০, শোভন ৭'৫০

বেদান্তদর্শন—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য : ১ম অধ্যায় (চারখণ্ডে) ১৭'০০, ২য় অঃ ১৩'০০ ; ৩য় অঃ ১৩'০০ ; ৪র্থ অঃ ৯'০০

গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা—স্বামী রঘুবরানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য ১'৮০

শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজাপদ্ধতি—
পৃঃ ৬৪, মূল্য ১'৫০

অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—সুরেশ দত্ত। মূল্য ৫'০০

পরমহংসদেব—স্বামী প্রেমেশানন্দ। পৃঃ ২৪, মূল্য ০'৭৫

জননী সারদাদেবী—স্বামী নির্বেদানন্দ। (অনুবাদক : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। মূল্য ২'৮০

শ্রীশ্রীমা সারদা—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৯০, মূল্য ২'০০

গল্পে বেদান্ত—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, মূল্য সাধারণ ৩'০০, বোর্ড বাঁধাই ৩'৫০

বীরবাণী—স্বামী বিবেকানন্দ। পৃঃ ১১৪, মূল্য ২'০০ (যন্ত্রস্থ)

বিবেকানন্দের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। পৃঃ ১৫৪, মূল্য ৩'৫০

প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩

UDBODHAN PUBLICATIONS (In English)

WORKS OF SWAMI VIVEKANANDA

CHICAGO ADDRESSES
Price : Re. 0·85

MY MASTER
Price : Re. 0·60

VEDANTA PHILOSOPHY
Price : Rs. 1·50

CHRIST THE MESSENGER
Price : Re. 0·80

SIX LESSONS ON RAJA YOGA (Tenth Edition)
Price : Re. 1·50

RELIGION OF LOVE
Price : Rs. 3·50

A STUDY OF RELIGION
Price : Rs. 2·50

REALISATION AND ITS METHODS
Price : Rs. 3·00

THOUGHTS ON VEDANTA
Price : Rs. 1·50

THE SCIENCE AND PHILOSOPHY OF RELIGION
Price : Rs. 3·80

WORKS OF SISTER NIVEDITA

THE MASTER AS I SAW HIM
Price : Rs. 12·00

CIVIC AND NATIONAL IDEALS (Sixth Edition)
Price Rs. 7.00

HINTS ON NATIONAL EDUCATION IN INDIA (Sixth Edition)
Price : Rs. 6·00

AGGRESSIVE HINDUISM
(Fifth Edition)
Price : Rs. 1·10

SIVA AND BUDDHA
Price : Re. 1·00

NOTES OF SOME WANDERINGS WITH THE SWAMI VIVEKANANDA
(Sixth Edition)
Price : Rs. 7·50

BOOKS ON SRI RAMAKRISHNA

WORDS OF THE MASTER
COMPILED BY SWAMI BRAHMANANDA
Price : Paper Rs. 1·50 Cloth Rs. 2·30

RAMAKRISHNA FOR CHILDREN
(Pictorial)
By SWAMI VISHWASHRAYANANDA
Price : Rs. 3·50

MISCELLANEOUS BOOK

VEDANTA, ITS THEORY AND PRACTICE
BY SWAMI SARADANANDA
Price : Re. 0·70

UDBODHAN OFFICE 1, Udbodhan Lane, Calcutta-700003

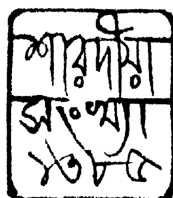
COVER PRINTED BY

৮৩।৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্ট্রীগণের পক্ষে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত।

সম্পাদক—স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ : সংযুক্ত সম্পাদক—স্বামী ধ্যানানন্দ

বার্ষিক মূল্য ১২·০০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ১·২০ টাকা।

উদ্বোধন



প্রচ্ছদপট-পরিচিতি

'প্রবুদ্ধ ভারতে'র প্রচ্ছদ সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ ১৪ই জুলাই ১৮৯৬, ইংলণ্ড হইতে মান্দ্রাজের ডাঃ নঞ্জুণ্ড রাওকে লেখেন: 'একটি বিষয়ে কিন্তু আমায় একটু মন্তব্য করতে হ'ল—মলাটটা একেবারে রুচিহীন—অতি বিশ্রী এবং কদর্য। সম্ভব হলে এটাকে বদলে ফেলুন। এটাকে ভাবব্যঞ্জক অথচ সরল করুন···চারুশিল্পে আমরা বড়ই পেছিয়ে আছি, বিশেষতঃ চিত্রশিল্পে। বনে বসন্ত জেগেছে, বৃক্ষলতায় নবকিশলয় আর মুকুল দেখা দিয়েছে—এই ভাবের একটি বনের ছবি আঁকুন দেখি। কত ভাবই তো রয়েছে—ধীরে ধীরে তা চিত্রশিল্পে ফুটিয়ে তুলুন।' (ইংরেজীর অনুবাদ)

স্বামীজীর উল্লিখিত কথাগুলি মনে রাখিয়া প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 'উদ্বোধনে'র বর্তমান সংখ্যার প্রচ্ছদপটটি আঁকিয়াছেন।

—সম্পাদক

উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৩

৮০তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা
আশ্বিন, ১৩৮৫



সুধাংশু পাত্রের ।। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র ও ভারতীয় বিজ্ঞান ।।

দশ টাকা

প্রাচীন ভারতীয় ও হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, গণিত ও রসায়ন শাস্ত্রের অসংখ্য পুঁথিপত্রে, আকরগ্রন্থে ছড়িয়ে আছে নানান্ বৈজ্ঞানিক তথ্য, আবিষ্কারের কাহিনী ও উন্নত বিজ্ঞানচিন্তা। সেই সব পুঁথি ও পুরাণ ঘেঁটে, মূল্যবান অনেক তথ্যের মধ্য থেকে অমূল্য তথ্যরাজি বাছাই করে রচিত হয়েছে এই গ্রন্থ, যা যে কোন এন্‌সাইক্লোপিডিয়ারই পরিপূরক।

বাংলা জীবনীসাহিত্যে একটি অসামান্য সংযোজন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের আত্মচরিত

দশ টাকা

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কখনো আত্মচরিত রচনা করেন নি, সত্য। কিন্তু তাঁর ভক্ত ও অনুরাগীদের কাছে বিভিন্ন প্রসঙ্গে নিজের জীবনলীলার প্রায় সব কথাই বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ করেছেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরলভঙ্গিতে। রামকৃষ্ণ-ভক্তদের রচিত বিভিন্ন আকরগ্রন্থ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রামাণ্য উক্তিসমূহ সংগ্রহ করে দীর্ঘদিনের নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা এই গ্রন্থটি অভূতপূর্ব পরিকল্পনায় জীবনচরিতাকারে সংকলন করেছেন নীরেন্দ্র গুপ্ত। শুধুমাত্র সংকলন নয়, শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পূর্ণ জীবনচরিত হিসাবে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ও সার্থকনামা গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান : দে বুক স্টোর, নাথ ব্রাদার্স, কথা ও কাহিনী, উদ্বোধন অফিস ও শৈব্যা পুস্তকালয়
প্রকাশক : বাণীশিল্প, ১১৩াই, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯

উদ্বোধন, আশ্বিন, ১৩৮৫

সূচীপত্র

বালকের মত বিশ্বাস। বালক মাকে দেখার জন্য যেমন ব্যাকুল হয়, সেই ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা হল তো অরুণ উদয় হল, তারপর সূর্য উঠবেই। এই ব্যাকুলতার পরেই ঈশ্বরদর্শন।

ঈশ্বরচিন্তা যত করবে, ততই সংসারে ভোগের জিনিসে আসক্তি কমবে।

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

ভক্তের হৃদয় তাঁর আবাসস্থান। তিনি সর্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু ভক্তের হৃদয়ে বিশেষরূপে আছেন। যেমন কোনও জমিদার জমিদারীর সকল স্থানে থাকতে পারে, তবে অমুক বৈঠকখানায় তিনি প্রায়ই থাকেন, এই কথা লোকে বলে। ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা।

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোন প্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হ'য়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হ'য়ে থাকে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

তোমরা আহারের দ্বারা শরীরের পুষ্টি করিতেছ—কিন্তু শরীর পুষ্ট করিয়া কি হইবে, যদি উহাকে অপরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিতে না পার? তোমরা অধ্যয়নাদির দ্বারা মনের পুষ্টি বা বিকাশ সাধন করিতেছ—ইহাতেই বা কি হইবে, যদি ইহাকেও অপরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিতে না পার?

—স্বামী বিবেকানন্দ

বালকের মত বিশ্বাস। বালক মাকে দেখার জন্য যেমন ব্যাকুল হয়, সেই ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা হল তো অরুণ উদয় হল, তারপর সূর্য উঠবেই। এই ব্যাকুলতার পরেই ঈশ্বরদর্শন।

ঈশ্বরচিন্তা যত করবে, ততই সংসারে ভোগের জিনিসে আসক্তি কমবে।

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব



দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা
সর্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা॥



দিব্য বাণী

নমো দেবি মহামায়ে বিশ্বোৎপত্তিকরে শিবে।
নির্গুণে সর্বভূতেশি মাতঃ শঙ্করকামদে॥
ত্বং ভূমিঃ সর্বভূতানাং প্রাণঃ প্রাণবতাং তথা।
ধীঃ শ্রীঃ কান্তিঃ ক্ষমা শান্তিঃ শ্রদ্ধা মেধা ধৃতিঃ স্মৃতিঃ॥
ত্বমুদ্গীথেঽর্ধমাত্রাসি গায়ত্রী ব্যাহৃতিস্তথা।
জয়া চ বিজয়া ধাত্রী লজ্জা কীর্তিঃ স্পৃহা দয়া॥

—দেবীভাগবত, ১।৫।৫৩-৫৫

প্রণাম তোমায় দেবি মহামায়ে!
তুমি মঙ্গলা বিশ্বমাতা
তুমি নির্গুণা নিখিলেশ্বরী
জননা আমার শম্ভুপ্রিয়া।
তুমি মা আধার সর্বভূতের
তুমিই তো প্রাণ প্রাণিগণের
মেধা ধৃতি স্মৃতি শ্রদ্ধা বুদ্ধি
শোভা ও কান্তি, শান্তি ক্ষমা।
প্রণবে তুমি মা অর্ধমাত্রা
তুমি ব্যাহৃতি গায়ত্রীতে
জয়া ও বিজয়া ধাত্রী লজ্জা
তুমিই ইচ্ছা, কীর্তি দয়া।

কথাপ্রসঙ্গে

'যেমন ভাব তেমন লাভ, মূল সে প্রত্যয়'

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানে আছে : 'প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে, এ বিশ্ব নিখিল তোমারি প্রতিমা !...তোমার প্রতিমা শশী তারা রবি / সাগর নির্ঝর ভূধর অটবী / নিকুঞ্জ-ভবন বসন্তপবন তরু লতা ফল ফুলমধুরিমা।'

নিঃসন্দেহে অতি উত্তম কথা। শাস্ত্রেও ঐ কথা আছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন: 'খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীং চ / জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্। সরিৎসমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং / যৎকিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥' অর্থাৎ আকাশ বায়ু অগ্নি জল ও পৃথিবী, (চন্দ্র সূর্য ও নক্ষত্রাদি) জ্যোতিষ্কগণ, প্রাণিবর্গ তরুলতা দিক্‌সমূহ নদী সমুদ্র—(স্থাবর-জঙ্গমাত্মক) যাহা কিছু পদার্থ আছে, সে সকলকেই শ্রীভগবানের বিগ্রহ জানিয়া অনন্য-মনে প্রণাম করিবে।

কিন্তু প্রাগ্রসর সাধকের পক্ষেই ইহা সম্ভব—প্রবর্তকের পক্ষে নহে। প্রবর্তকের জন্য শুভাশ্রয় একটি স্থির অবলম্বন প্রয়োজন। নতুবা তাহার মনের একাগ্রতা অসম্ভব। আর একাগ্রতা ভিন্ন আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হওয়াও সম্ভব নহে। এইজন্যই শাস্ত্রে বাহ্য-পূজার ব্যবস্থা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন: 'অর্চায়াং স্থণ্ডিলেঽগ্নৌ বা সূর্যে বাপ্সু হৃদি দ্বিজঃ। দ্রব্যেণ ভক্তিযুক্তোঽর্চেৎ স্বগুরুং মামমায়য়া॥' অর্থাৎ প্রতিমাতে যজ্ঞ-বেদীতে অগ্নিতে সূর্যে জলে বা হৃদয়ে দ্বিজাতিগণ স্বীয় গুরুরূপ আমাকে (গন্ধপুষ্পাদি বিবিধ) উপচারের দ্বারা অকপটভাবে ভক্তি-ভরে অর্চনা করিবে। অবশ্য এখানে 'হৃদি' শব্দটি থাকাতে বাহ্যপূজার অতিরিক্ত মানস-পূজার কথাও বলা হইয়াছে।

উপরি-উক্ত শ্লোকে প্রতিমার কথা সর্বাগ্রে উল্লেখিত হইয়াছে, কারণ প্রতিমায় পূজা করা সর্বাপেক্ষা সহজ। ঐতিহাসিকগণ অবশ্য বলেন যে, বৈদিক যুগে কোনও মন্দির বা প্রতিমার প্রচলন ছিল না—আর্য ঋষির হৃদয় হইতে সূর্য অগ্নি নদী প্রভৃতির উদ্দেশেই ভাবময় স্তবাত্মক উপাসনা নিবেদিত হইত; তথাপি কালক্রমে প্রসিদ্ধ পৌত্তলিক ও সুদক্ষ ভাস্কর গ্রীকগণ যখন দলে দলে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিতে থাকেন, তখনই বুদ্ধমূর্তি ও বৌদ্ধ মন্দিরাদির সৃষ্টি হয়। তাহার পর হিন্দুগণও দেবদেবীর বিগ্রহ ও মন্দিরাদি নির্মাণ করিতে থাকেন। ঐতিহাসিকদের মতে এদেশে প্রতিমায় পূজা গ্রীকদেরই দান।

সে যাহাই হউক, প্রতিমা-পূজা অর্থাৎ প্রতিমায় শ্রীভগবানের পূজা এদেশে একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যাপার এবং যতই দিন যাইতেছে, উহার আড়ম্বর বাড়িতেছে। প্রতিমার সংখ্যাও দিন দিন বাড়িতেছে। অধিকন্তু সাম্প্রতিক কালে পূজাপ্রতিমা চারুকলার সামগ্রীতে পরিণত হইয়াছে। পূর্বেও যে প্রতিমা চারুকলা-মণ্ডিত হইত না, তাহা নহে, কিন্তু চারুকলা লইয়া ইদানীংকালের ন্যায় মাতামাতি তৎকালে ছিল না।

আজকাল বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন উপাদানে নির্মিত প্রতিমা আমরা দেখি। এবং প্রতি বৎসরই অভিনব একটা কিছু করিবার প্রয়াস—কোন কোন ক্ষেত্রে অপপ্রয়াসও—

পরিলক্ষিত হয়। সকলেই যেন এ বিষয়ে প্রতিযোগিতায় নামিয়াছেন। বিভিন্ন ধরনের প্রতিমা নির্মাণে আপত্তির কিছু নাই। কিন্তু ভাব ঠিক থাকা চাই। প্রতিমাগুলি যেন যথার্থ আধ্যাত্মিক ভাবের দ্যোতক হয়। ভাব না থাকিলে শিল্পের মূল্য কি? ভাবের ঘরে অভাব থাকিলে সবই 'মাটি'। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, 'মানুষ যে জিনিসটি তৈরি করে তাতে কোন একটা idea express (ভাব প্রকাশ) করার নামই art (শিল্প)। যাতে idea-র expression (ভাবের প্রকাশ) নেই, রঙ-বেরঙের চাকচিক্য পরিপাটি থাকলেও তাকে প্রকৃত art বলা যায় না। ঘটি, বাটি, পেয়ালা প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রগুলিও ঐরূপে বিশেষ কোন ভাব প্রকাশ ক'রে তৈরি করা উচিত।'

স্বামীজী আরও বলিয়াছিলেন, 'হিন্দুদের নিত্য-ধ্যেয় মূর্তিগুলিতে প্রাচীন ভাবের উদ্দীপক expression দিয়ে আঁকবার চেষ্টা করলে ভাল হয়।' মা কালীর মূর্তি যুগপৎ ক্ষেমঙ্করী ও ভয়ঙ্করী। কিন্তু প্রচলিত চিত্র-গুলিতে ঐ উভয় ভাবের যথার্থ প্রকাশ নাই—একথাও স্বামীজী বলিয়াছিলেন। ভাবের যথার্থ প্রকাশ তাঁহার অভীপ্সিত ছিল।

'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে স্বামীজী একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন, 'যেটা ভাবহীন প্রাণহীন—সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত কোনও কাজের নয়। এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি আপনাআপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নেই। তখন দেবতার মূর্তি দেখলেই ভক্তি হবে, গহনা-পরা মেয়েমাত্রই দেবী ব'লে বোধ হবে, আর বাড়ী ঘর দোর সব প্রাণস্পন্দনে ডগমগ করবে।'

সুতরাং দেবতার মূর্তি এমনভাবে গঠিত হওয়া উচিত যে, দর্শনমাত্রেই ভক্তিভাবের উদ্রেক হয়। তাহা যদি না হয়, দেবদেবীর প্রতিমা দেখিয়া দর্শক যদি শিল্পীর কার-সাজিকেই বড় করিয়া দেখিতে বাধ্য হন, তাহা হইলে যে উদ্দেশ্যে প্রতিমা নির্মিত হয়, তাহাই ব্যর্থ হইয়া যায়।

প্রতিমার উপাদান সম্পর্কেও কথা আছে। আজকাল শোলা সুপারি কাঠি পুঁতি খই নারিকেল-ছোবড়া ইত্যাদির দ্বারা প্রতিমা নির্মিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু শাস্ত্রে অষ্টবিধ প্রতিমার উল্লেখ আছে। ভাগবত বলেন, 'শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী। মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥' অর্থাৎ প্রতিমা অষ্টবিধ—শিলাময়ী, কাষ্ঠময়ী, (সুবর্ণাদি-) ধাতুময়ী, লেপময়ী (মৃত্তিকা বা চন্দনাদির লেপনে প্রস্তুত করা), লেখময়ী (চিত্রপট), বালুকাময়ী, রত্নময়ী ও মনোময়ী। কোন সন্দেহ নাই যে, মনোময়ী প্রতিমাই সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ, সাধকের মন তখন স্থূল হইতে সূক্ষ্মে—বাহ্যপূজা ছাড়িয়া ধ্যান-লোকে উন্নীত। 'প্রেমিক'ও গাহিয়াছেন, 'শ্যামা, মন-ছাঁচে তোমাকে ফেলে / মনোময়ী মূর্তি আজ ল'ব তুলে।'

সুতরাং বাহ্যপূজায় শাস্ত্রোক্ত ঐ সপ্তবিধ উপাদান অবলম্বনেই প্রতিমা গঠিত হওয়া সঙ্গত। আরও কথা এই যে, অভিনব উপাদানসমূহের দ্বারা প্রতিমা নির্মিত হইলে দর্শকগণ আসল জিনিস—দেবদেবীকে ছাড়িয়া খোলসটার দিকেই আকৃষ্ট হন—ফল ছাড়িয়া

ছালটিই গ্রহণ করেন। তাই পূজা যাহাতে প্রতিমা-প্রতিমা-খেলায় পর্যবসিত না হয়, সেদিকে সকলেরই লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। যেমন ভাব তেমন লাভ—'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী', ইহা চিরকালের সত্য।

দুর্গাপূজার প্রাক্কালে দুর্গাপ্রতিমার কথাই আলোচনা করা যাক। ইহা সুবিদিত যে, দুর্গাপ্রতিমা ভারতের সর্বত্র একরূপ নহে। দেবী কোথাও চতুর্ভুজা, কোথাও অষ্টভুজা, কোথাও দশভুজা, কোথাও অষ্টাদশভুজা ইত্যাদি। স্বভাবতই দেবীর হস্তস্থিত আয়ুধাদিও ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু দেবীর রূপের এই বিভিন্নতা আমাদের আরাধনার বাধক হয় না। প্রত্যেকটি প্রতিমাতেই আমরা দেবী দুর্গাকেই দর্শন ও প্রণামাদি করি।

দেবীকে আবার বিভিন্ন ভাবেও উপাসনা করা হয়। অনেকের ভাবনায় তিনি কন্যা-রূপিণী। সহস্র সহস্র উপাসক তাঁহাকে দুর্গতি-নাশিনী মহাদেবীজ্ঞানে আরাধনা করেন। ।-সপ্তশতী অবলম্বনে তাঁহারা দেবীকে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের কারণীভূতা, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদিরও বন্দিতা শক্তিভূতা সনাতনী জানিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি-প্রণত হন। আবার ব্রহ্মসংহিতা ও নারদ-পঞ্চরাত্র অবলম্বনে অনেকে তাঁহাকে আদি-পুরুষ গোবিন্দের শক্তি হিসাবে সম্মান প্রদর্শন করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের একনিষ্ঠ ভক্তগণের মতে শ্রীদুর্গা সেই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি, যাঁহার দ্বারা শ্রীভগবানের অবতারলীলা সম্পন্ন হয়। মধ্বাচার্যের অনুগামীরা বলেন, দুর্গা লক্ষ্মীরই একটি রূপ। লক্ষ্মীদেবী বিষ্ণুর ক্রিয়াশক্তিরূপিণী এবং তাঁহারই সাহায্যে নিমিত্তকারণ বিষ্ণু উপাদানকারণ জড়া প্রকৃতি হইতে জগৎ-সৃষ্টি করেন। লক্ষ্মীদেবীই শ্রী, ভূ ও দুর্গারূপে যথাক্রমে সত্ত্ব রজঃ ও তমো-গুণের প্রকাশিকা।

উপাসক-সম্প্রদায়সমূহের এই ভাব-বৈচিত্র্য শাস্ত্রাশ্রিত। বস্তুতঃ সনাতন ধর্মের বৈশিষ্ট্যই এই যে, সকলেরই উপর একটিমাত্র মত চাপাইয়া দেওয়া হয় না। ধর্মের ব্যাপারে আমাদের শৃঙ্খলা আছে, শৃঙ্খল নাই—পরিপূর্ণ স্বাধীনতাই আছে। এখানে মতের অন্ত নাই, কিন্তু প্রত্যেকটি মতই চরম লক্ষ্যে পৌঁছিবার পথ। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায়—'যত মত তত পথ।' এই কারণে যে শাস্ত্রগ্রন্থে আমাদের—যে কোন প্রকারেই হউক—গভীরতম শ্রদ্ধা, সেই শাস্ত্রগ্রন্থ অনুযায়ী ভাব আশ্রয় করিয়া সরল বিশ্বাসে যদি আমরা নিষ্ঠার সহিত সাধনায় প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমাদের আধ্যাত্মিক অগ্রগতি অপ্রতিরোধ্য। মূল জিনিস প্রত্যয়—স্থির বিশ্বাস। তাহারই ফলে ভাবের উদয় এবং ভাবের ঘরে চুরি না থাকিলে সিদ্ধি অনিবার্য। রামপ্রসাদের কথা—'যেমন ভাব তেমন লাভ, মূল সে প্রত্যয়।'

সেবার মর্মকথা

স্বামী গম্ভীরানন্দ

ক্রমবিকাশবাদীদের অভিমত—প্রাণি-জগতের উন্নতি হয় বেঁচে থাকার জন্যে প্রচণ্ড প্রচেষ্টা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভেতর দিয়ে এবং যোগ্যতমের উদ্বর্তনের ভেতর দিয়ে। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ বললেন—ঠিক তা নয়, প্রেমের ভেতর দিয়েই মানুষ এগিয়ে যায়; প্রেমের বন্ধনে সমাজ একত্র হয়ে আছে এবং প্রেমকে অবলম্বন ক'রেই সমাজের অগ্রগতি হচ্ছে। তিনি বললেন—'প্রেম, প্রেম—এই মাত্র ধন।' বললেন—'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

দয়া ক'রে আপনারা মনে রাখবেন, আমি কোন মতবাদের সমালোচনা করবার জন্যে এই কথাগুলি বলছি না। আমি শুধু ব'লে যাচ্ছি, স্বামী বিবেকানন্দ কিরূপ ভাবতেন এবং কিরূপ ভাবধারা অবলম্বনে এই রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

এই ভাবধারা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদপ্রান্তে ব'সে। দু-একটি ঘটনা বললে আপনারা বিষয়টি বুঝতে পারবেন। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞেস করেছিলেন নরেন্দ্রনাথকে—'তুই কি চাস্?' নরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'আমি নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে থাকতে চাই। তারপর শরীররক্ষার জন্যে খানিকটা নীচে নেমে এসে আবার সমাধিতে চলে যেতে চাই।' শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তুষ্ট না হয়ে বলেছিলেন—'ছিঃ ছিঃ, তুই এত বড় আধার—তোর মুখে এই কথা! আমি ভেবেছিলুম তুই তো একটা মস্ত বড় বট গাছের মতো বেড়ে উঠবি, যার তলায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে—তা না হয়ে তুই কিনা স্বার্থপর হয়ে শুধু নিজের মুক্তি চাস্।' অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে নির্বিকল্প সমাধি লাভ হয়েছিল, কিন্তু সেকথা এখানে আমাদের আলোচ্য নয়। আমাদের আলোচ্য হচ্ছে স্বামীজীর সমাজদৃষ্টি, মানুষের প্রতি তাঁর বুকভরা দরদ—যা তিনি উত্তরাধিকার-সূত্রে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছ থেকে পেয়ে কাজে পরিণত করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব গিয়েছেন শ্রীযুক্ত মথুরানাথ বিশ্বাসের সঙ্গে তীর্থদর্শনে। গিয়ে উপস্থিত হলেন দেওঘরের কাছে। গরিব লোকেরা সেখানে—খেতে পায় না, পরতে পায় না, জীর্ণ-শীর্ণ কঙ্কাল-সার চেহারা, উস্‌কো-খুস্‌কো চুল। তাদের দেখে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন—'এদের একমাথা ক'রে তেল দাও, একখানা ক'রে নতুন কাপড় দাও, আর পেটটা ভরে খাইয়ে দাও।' মথুরবাবু বিষয়ীলোক। শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে বললেন—'বাবা, এদের সংখ্যা ত নেহাত কম নয়। এত টাকা যদি এখানে খরচ করি, তা হ'লে তীর্থদর্শন হবে কি ক'রে?' শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'তোর কাশী আমি যাবো না, আমি এদের কাছেই থাকবো। এদের কেউ নেই, এদের ছেড়ে যাবো না।'

কথাটা ভেবে দেখতে হবে। কথাটা শ্রীরামকৃষ্ণের, যিনি মৃন্ময়ী দেবীতে চিন্ময়ীকে দর্শন করেছিলেন এবং হাতে-নাতে দেখিয়ে প্রমাণ ক'রে দিয়েছিলেন যে, হিন্দুরা পৌত্তলিক নয়, তারা প্রতিমাকে পুজো করে না,

প্রতিমাতে ভগবানকেই পুজো করে। উনবিংশ শতাব্দীতে তিনি এটা দেখিয়ে দিয়েছিলেন বলেই হিন্দুধর্ম আজও বেঁচে আছে। সেই শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—আমি তীর্থদর্শনে যাবো না। কথাটা কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন নয়। এটা আমরা ভাগবতেও দেখতে পাই। ভাগবত বলছেন—

যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ ভস্মন্যেব
জুহোতি সঃ॥

—আমি সর্বভূতে বর্তমান—সকল প্রাণীরই আত্মা ও ঈশ্বর। যে আমাকে ত্যাগ ক'রে প্রতিমাকে পুজো করতে যায় তার পুজো কি রকম? না—ভস্মে আহুতি দেওয়ার মতো।

দক্ষিণেশ্বরে হাজরামশাই তাঁকে বলেছিলেন, 'আপনি পরমহংস, সর্বদা সমাধিতে ডুবে থাকুন। তা না ক'রে নরেন্দ্র, রাখাল—এদের কথা ভাবছেন।' শুনে ঠাকুর ভাবলেন, 'ঠিক বলেছে, আর অমনটা করা হবে না।' তারপর ঝাউতলা থেকে আসছেন, হঠাৎ জগন্মাতা তাঁকে দেখালেন, কলকাতাটা সামনে আর কলকাতার লোকগুলি সংসার-পঙ্কে দিনরাত ডুবে রয়েছে আর যন্ত্রণা ভোগ করছে। দেখে তাঁর দয়া হ'ল। ভাবলেন, লক্ষগুণ কষ্ট পেয়েও যদি তাদের মঙ্গল হয়, উদ্ধার হয় তো তা করবেন।

একথাও অবশ্য একেবারে নতুন নয়। আমরা ভাগবতে পাই—

প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ।
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো
নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে॥

প্রহ্লাদ নৃসিংহদেবকে বলছেন—

হে দেব! মুনিরা প্রায়ই নিজেদের মুক্তিকামনায় নির্জনে মৌনব্রত আচরণ করেন। তাঁরা পরার্থনিষ্ঠ নন। কিন্তু এই দীন [অসুর বালকদের] ত্যাগ ক'রে আমি একা মুক্ত হতে চাই না। সংসারে ভ্রমণশীল এই জীবগণের আপনি ভিন্ন আর অন্য কোন আশ্রয় দেখতে পাই না।

জীবকল্যাণের এই পথই শ্রীরামকৃষ্ণ অনুসরণ করেছিলেন এবং স্বামী বিবেকানন্দকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, এই পথ অবলম্বন ক'রে জগতের কল্যাণসাধন করতে। অবশ্য প্রচলিত কথা হিসাবেই আমরা বলছি, 'জগতের কল্যাণ-সাধন'। কিন্তু ঠাকুরের ভাব ছিল অন্য রকম। আপনারা হয়তো পড়ে থাকবেন, তখনকার দিনের জননেতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস পালকে শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞেস করেছিলেন—'জীবনের উদ্দেশ্য কি?' তিনি বলেছিলেন—'জগতের উপকার করা'। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন—'জগতের উপকার তুমি কি করবে? জগৎ কি এতটুকু?'

বাস্তবিক জগতের উপকার করতে পারেন একমাত্র ভগবান। তবে আমরা কি করতে পারি? আমরা শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করতে পারি। একথা স্বামীজী শুনেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন একটা বিশেষ ধর্মমতের কথা তুলে বলেছিলেন, ঐ মতে মানুষের কর্তব্য হচ্ছে—জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণবসেবন। 'নামে রুচি' ঠিক বুঝলেন, 'বৈষ্ণবসেবন' ঠিক বুঝলেন, কিন্তু 'জীবে দয়া' বলতেই তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন—'জীবে দয়া—জীবে দয়া? কীটানুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না—না, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।'

দয়া মানে কি? আমি বড় আর তুমি ছোট। আমার দেবার মতো কিছু আছে, আমি দিচ্ছি। আমি দিচ্ছি, তুমি নতমস্তকে গ্রহণ করো এবং চিরজীবন আমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকো। এই হ'ল দয়ার ভেতরের ভাব। ঠাকুর বললেন, 'না, না—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা। এরা সব শিব, এরা সব নারায়ণ। এই নারায়ণবুদ্ধিতে, এই শিববুদ্ধিতে এদের সেবা করতে হবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনে স্বামীজী—তখন নরেন্দ্রনাথ—সেবার নিগূঢ় মর্ম হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন এবং এই সেবাদর্শ রূপায়িত করতে কৃতসংকল্প হয়েছিলেন। সারা ভারত তিনি ঘুরেছিলেন। পথ খুঁজে তিনি পাননি। অবশেষে কন্যাকুমারীতে ভারতের শেষ প্রস্তর-খণ্ডের উপরে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের শেষ সপ্তাহে, হয়তো বা যীশুখৃষ্টের জন্মদিনে, ব'সে তিনি ধ্যানমগ্ন হলেন। সত্য তাঁর কাছে উদ্‌ঘাটিত হ'ল। তিনি জানলেন—ভারতের উন্নতি ততদিন কিছুতেই হতে পারে না, যতদিন পর্যন্ত না জনগণের জাগরণ হয়—যত দিন পর্যন্ত না তাদের উন্নতি হয়। কিন্তু সে উন্নতি হবে ধর্মের ভেতর দিয়ে—ধর্মকে বাদ দিয়ে নয়।

তারপর স্বামীজী পাশ্চাত্যে গেলেন অদ্বৈতবেদান্তের বার্তা বহন ক'রে। ওদেশে আধ্যাত্মিকতার অভাব। সে অভাব পূরণ ক'রে বিনিময়ে যদি কিছু পাওয়া যায়, তাই দিয়ে ভারতবর্ষের উন্নতি করতে চেয়েছিলেন স্বামীজী। পাশ্চাত্যে আধ্যাত্মিকতার বীজ উপ্ত হয়েছিল, ভারতেও উন্নতির বীজ উপ্ত হয়েছিল তাঁর চেষ্টায়।

এদেশে সন্ন্যাসীরা বনে-জঙ্গলে পর্বতে সাধনা করেছেন নিজেদের মুক্তির জন্যে। পরের সেবাতে তাঁরা আত্মনিয়োগ করেননি—অবশ্য সব সময়ে নয়। কেননা আমরা জানি বৌদ্ধসমাজে সেবাব্রত প্রচলিত ছিল। আপনারা জানেন বাসবদত্তাকে সেবা করেছিলেন একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। কিন্তু অতীত যুগের সেকথা আমাদের কাছে অপরিজ্ঞাত থেকে গিয়েছিল। স্বামীজী সেই সেবাব্রত পুনরুজ্জীবিত করলেন।

স্বামীজী বললেন—এই সেবাব্রত গ্রহণ করতে হবে সন্ন্যাসীদের। শুধু নিজের মুক্তির জন্যে নয়, পরের কল্যাণের জন্যেও এবং তাতে নিজেরও মুক্তি সহজ হয়ে যাবে। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—এই ছিল তাঁর মন্ত্র। পরকে পর ভেবে তার কল্যাণ করা নয়—আমি পুজো করছি পরকে নারায়ণ ভেবে। বস্তুতঃ তখন আর পর ব'লে কেউ নেই—মানুষরূপে ভগবানই রয়েছেন সামনে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন—'প্রতিমায় ঈশ্বরের পুজো হয় আর জীয়ন্ত মানুষে হয় না!' আমরা ভগবতীর পুজো ক'রে থাকি কুমারীতে। আমরা জানি, গৃহস্থ যাঁরা ভক্তিমান, তাঁরা এ সমস্ত বিশ্বাস করেন—তাঁরা পতি ও পত্নীকে শিব ও শক্তিরূপে ধারণা ক'রে থাকেন। একটা ধর্মভাব নিয়ে আসেন জীবনে। তেমনি ভাবে, আমরা অপরের সেবা করি একটি ধর্মভাব অবলম্বন ক'রে—ভগবানকে অবলম্বন ক'রে। আমরা ভাবি নারায়ণ আমাদের সামনে উপস্থিত, আমাদের সেবা নেবার জন্যে। যার যা অভাব আছে যে ক্ষেত্রে হোক না কেন—বিদ্যার অভাব হোক, শারীরিক অভাব হোক, আধ্যাত্মিক অভাব হোক সব রকমের অভাব মেটাবার জন্যে আমাদের প্রযত্ন করতে হবে। আমরা তা-ই করে চলেছি—শিবজ্ঞানে জীবসেবা।

শ্রীরামকৃষ্ণ যেদিন 'জীবে দয়া' প্রসঙ্গে শিবজ্ঞানে জীবসেবার কথা বলেছিলেন, সেদিন সেই কথা শুনে স্বামী বিবেকানন্দ —তখন নরেন্দ্রনাথ—বলেছিলেন, আজকে একটা নতুন কথা শুনেছি, যদি ভগবান দিন দেন, তবে আমি কাজে পরিণত ক'রে দেখাব এটি। আর এরই ভেতর আমি সমন্বয় দেখছি সমস্ত সাধনপথের। কর্মযোগ জ্ঞান-যোগ ভক্তিযোগ রাজযোগ বা ধ্যানযোগ—সব এখানে সম্মিলিত হচ্ছে।

স্বামী বিবেকানন্দ যে ভাবধারা শ্রীগুরু-পাদপদ্মে ব'সে লাভ করেছিলেন, তা-ই তিনি আমাদের দিয়ে গিয়েছেন। এখানে একটি কথা বিশেষ ক'রে বলা দরকার। স্বামীজী যখন শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘ ক'রে, তার নিয়মাবলী রচনা ক'রে আমাদের আদেশ দিয়েছিলেন কাজে নামতে তখন সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুটি কথা বলেছিলেন— 'তোমরা রাজনীতির সঙ্গে কখনো জড়িত হবে না এবং সমাজ-সংস্কারে কখনো যাবে না।'

স্বামীজীর নির্দেশ অনুযায়ী আমরা সমাজের সেবা করে যাই। রাজনীতিকে আমরা অবজ্ঞা করি না, সমাজ-সংস্কারকেও অবহেলা করি না। প্রয়োজন প্রত্যেকটিরই আছে। স্বামীজী তাঁর বক্তৃতাবলীতে কত কথা ব'লে গেছেন, কত দৃষ্টিভঙ্গি দেখিয়ে গেছেন—কোন্ দিকে গেলে সমাজের উন্নতি হবে, কোন্ দিকে গেলে দেশের মঙ্গল হবে। কিন্তু আমরা যারা রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের ভেতর দিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি, আমরা কখনো রাজনীতিতে জড়িত হতে চাই না, আমরা কখনো সমাজ-সংস্কারে যেতে চাই না। আপনারা হয়তো জানেন, আমাদের সন্ন্যাসীরা কেউ কখনো ভোট দিতে যান না অথবা কোন পার্টির হয়ে প্রচার করতে যান না।

স্বামীজী এই বার্তা দিয়ে গেছেন, বাণী দিয়ে গেছেন, পথ আমাদের নির্দেশ ক'রে গেছেন। আমরা চেষ্টা করছি তাঁর প্রদর্শিত পথে চলতে। এই পথকে অবলম্বন ক'রে বিভিন্ন জায়গায় কতকগুলি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং কাজ চলেছে। প্রয়োজনের তুলনায় তা কম হতে পারে, কিন্তু এতে আমাদের প্রাণের টান আছে। আমরা চাই কাজটা ভালভাবে হোক। ভগবানের দেওয়া যে কাজ আমাদের উপরে পড়েছে, আমরা চাই তা যেন ঠিক ঠিক ভাবে পরিচালিত হয়, যাতে সেবার একটা model বা আদর্শ দেখে অন্যেরাও নানা জায়গায় নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে এবং সমাজের ও জগতের সত্যিকার কল্যাণ হয়।*

* বিগত ২৪শে জুলাই ১৯৭৭, দক্ষিণ কলিকাতাস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের ৪৫তম প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উপলক্ষে প্রদত্ত অভিভাষণ। শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত।

মন্ত্রযোগ

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

মন্ত্র দ্বারা শ্রীভগবানের সহিত যুক্ত হইবার সাধনাকে মন্ত্রযোগ বলা যাইতে পারে। জপ-যোগ শব্দটিও প্রায় একার্থক, তবে সাধনার উধ্বর্তর স্তরে মন্ত্রযোগের প্রয়োগ জপযোগ অপেক্ষা অধিক বৈশিষ্ট্যময়। জপযোগে জপ-ক্রিয়াটির উপর জোর দেওয়া হয়, মন্ত্রযোগের এক অবস্থায় জপ থাকে না, মন্ত্র-ভাবনা থাকে। কিন্তু মন্ত্র তখন আর শব্দাত্মক নয়, চৈতন্যাত্মক।

মন্ত্র কি? শ্রীভগবানের নাম। শ্রীভগবান সগুণ হউন বা নির্গুণ হউন, সাকার হউন বা নিরাকার হউন শব্দ দ্বারা তাঁহার নির্দেশ আছেই। ঐ শব্দই মন্ত্র। উহা একটি শব্দ বা একাধিক শব্দ হইতে পারে। 'নারায়ণ' একটি শব্দের মন্ত্র। 'নমো নারায়ণায়' দুইটি শব্দের, 'ওঁ নমো নারায়ণায়' তিনটি শব্দের। যাঁহারা অদ্বৈতবাদী তাঁহারা ভগবান বা ঈশ্বর কথাটি ব্যবহার না করিয়া আত্মা শব্দটির উপর জোর দেন। তাঁহারা বলেন মানুষের অন্তরতম সত্য তাহার নিত্যশুদ্ধ জন্মহীন মৃত্যুহীন চৈতন্যসত্তা। আত্মার উপলব্ধির জন্য উপনিষদে মন্ত্রযোগের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্র এক্ষেত্রে প্রণব বা ওঁকার। প্রণব ব্যতীত উপনিষদে সংক্ষিপ্ত বহু বাক্যও আত্মসত্যের ভাবনার জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। যেমন, 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (বৃহদারণ্যক উপনিষদ), 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' (ঐতরেয় উপনিষদ), 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (ছান্দোগ্য উপনিষদ)। এই সব শ্রুতিবাক্যও মন্ত্র। বৌদ্ধধর্মেও শব্দের সাহায্যে ধ্যানের প্রণালী প্রচলিত। 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি'—এই ত্রিশরণমন্ত্রের জপ ও ভাবনা দ্বারা বৌদ্ধভক্ত তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনকে দৃঢ় করেন। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও ভগবান যীশুখ্রীষ্টের নাম বা তাঁহার নিকট প্রার্থনাজ্ঞাপক নাতিদীর্ঘ বাক্যের জপ ও অনুধ্যান অভ্যাসের প্রচলন আছে। হিন্দুধর্মানুসারে মন্ত্র সাধারণ মানুষের রচিত শব্দ বা শব্দসমবায় নয়। মন্ত্র শাস্ত্র হইতে জানিতে হয়। শুদ্ধাত্মা ঋষিদের হৃদয়ে মন্ত্র স্ফুরিত হয়।

ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সাধনায় মন্ত্রের সাহায্যে ভগবানের উপাসনা যেরূপ ব্যাপক-ভাবে প্রচলিত অন্যান্য ধর্মে সেরূপ নয়। ইহার কারণ এই যে, ভারতের বেদপ্রমুখ শাস্ত্রে নামকে নামীর সহিত অভিন্ন বলা হইয়াছে। শব্দব্রহ্মের ধারণা হইতেই মন্ত্রের প্রতি একটি গভীর সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা ভারতের ধর্ম-সাধকের হৃদয়ে গভীরভাবে বদ্ধমূল। 'ওমিতি ব্রহ্ম'—ওঁকার ব্রহ্মস্বরূপ—বেদের এই ঘোষণা ক্রমশঃ স্মৃতি ও পুরাণাদি শাস্ত্রে শ্রীভগবানের সকল নামের সহিত জড়িত হইয়া সাধারণ ভাবে ঈশ্বরের পবিত্র নামকে একটি উত্তুঙ্গ মহিমায় স্থাপিত করিয়াছে। ধর্মপ্রাণ হিন্দু সমগ্র জীবন এই আশা পোষণ করিয়া চলেন, যেন মৃত্যুকালে ইষ্টের নাম না বিস্মৃত হন। যে ব্যক্তি সজ্ঞানে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়া দেহত্যাগ করেন, তাঁহাকে আমরা শতমুখে প্রশংসা করি। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার অষ্টম অধ্যায়ে, সার্থক যোগীর দেহত্যাগের বর্ণনা আছে—

সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥
(গীতা ৮।১২, ১৩)

'সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার সংযত এবং মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া, তথা যোগধারণা অবলম্বনে দেহে সঞ্চরণশীল প্রাণকে মস্তকে স্থাপন করিয়া একাক্ষর শব্দব্রহ্ম ওঁঙ্কার উচ্চারণ এবং পরমাত্মার স্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ করেন তিনি পরমা গতি প্রাপ্ত হন।'

* * *

মন্ত্র দ্বারা যোগ—মন্ত্রযোগ; তৃতীয়া-তৎ-পুরুষ সমাস। মন্ত্রের পাবন শক্তির উপর দৃঢ় শ্রদ্ধা রাখিয়া সাধক মন্ত্র জপ করিয়া চলেন। মন্ত্রযোগের ইহা প্রথম স্তর। মন্ত্রের ইষ্টস্বরূপতা হৃদয়ঙ্গম করা গোড়ায় কঠিন। তাই এই অবস্থায় মন্ত্র শ্রীভগবানের শুদ্ধ চৈতন্যশক্তি দ্বারা সমন্বিত, এই ভাবটি মনে রাখিয়া জপ ভাবনা চালাইলেই যথেষ্ট। সাধক ভাবেন জপ দ্বারা দেহ-মন-প্রাণে একটি আধ্যাত্মিক স্পন্দন সঞ্চারিত হইতেছে। তাপ বা বিদ্যুৎ বা চুম্বকশক্তির মতো ঐ স্পন্দন জড়শক্তির স্পন্দন নয়—উহা ভাগবত শক্তির স্পন্দন। সাধক মন্ত্রকে শরীরের প্রাণপ্রবাহের সহিত মিশাইয়া দেন। ধীরে ধীরে তিনি অনুভব করিতে থাকেন যে, প্রাণগতি আর মন্ত্রগতি পৃথক্ নয়। প্রাণপ্রবাহই যেন মন্ত্রজপ। জপ জিহ্বা বা কণ্ঠ হইতে প্রাণে সংক্রমিত হইয়াছে। এই সংক্রমণের ফলে প্রাণে বিপুল সাম্য নামিয়া আসে। রাজযোগের প্রাণায়াম-ক্রিয়া দ্বারা যেমন নাড়ীর ও নিশ্বাসপ্রশ্বাসপ্রবাহের স্থিরতা সম্পন্ন করা যায় মন্ত্রজপ দ্বারাও এই ভাবে উহা সংসাধিত হয়।

চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক্—এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রতি মন্ত্র প্রযুক্ত হইলে ঐ ইন্দ্রিয়গুলি উত্তরোত্তর শুদ্ধি লাভ করে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় রূপ শব্দ গন্ধ রস ও স্পর্শ পরিশুদ্ধ হইতে থাকে। আমরা তো জানি যে, এই বিষয়গুলি প্রতিনিয়ত আমাদের মনকে বাহিরে টানিয়া আনিয়া বিক্ষেপ বিক্ষোভ উন্মত্ততা ও দুঃখ সৃষ্ট করিতেছে। ইন্দ্রিয়গুলি পরিশুদ্ধ অর্থাৎ সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হইলে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তখন চোখ কান প্রভৃতি দিয়া আমরা যাহা অনুভব করি তাহা আর চিত্তকে চঞ্চল করিতে পারে না। শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতার ২য় অধ্যায়ের ৬৪ শ্লোকে রাগ-দ্বেষবিযুক্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়োপলব্ধির উল্লেখ আছে—

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥
(গীতা ২।৬৪)

'যাঁহার ইন্দ্রিয়গ্রাম আসক্তি এবং বিদ্বেষ হইতে বিমুক্ত, তিনি মনের প্রভু হইয়াছেন। নিজের বশীভূত ঐ ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় উপলব্ধি করিলেও তাঁহার চিত্তপ্রসাদ ব্যাহত হয় না।' মন্ত্রযোগ দ্বারা সহজেই ইন্দ্রিয়গ্রামকে রাগ-দ্বেষ-বিমুক্ত করা চলে। প্রাণায়ামাদি প্রক্রিয়া অপেক্ষা ইহা প্রকৃষ্টতর।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের ১ম অধ্যায়, ৩য় ব্রাহ্মণে প্রাণের উপাসনা দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়-নিচয়ের দৈবীভাব প্রাপ্তির কথা আছে। দেবভাব প্রাপ্ত হইয়া চক্ষু তখন সূর্যের মতো জ্যোতির্ময় হয়, মন চন্দ্রের স্নিগ্ধ শুভ্রতা লাভ করে। ভগবৎপ্রেম বা আত্মজ্ঞান যদি জীবনের চরম লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের পরিশুদ্ধি সর্বাগ্রে প্রয়োজন। মন্ত্র-যোগ দ্বারা এই পরিশুদ্ধি সহজসাধ্য।

কর্মেন্দ্রিয়গুলির চেষ্টাসমূহকে মন্ত্রসাধনা দ্বারা পরিশুদ্ধ করা যায়। হস্তপদাদির সঞ্চালনের সঙ্গে (রান্না করা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাগান করা, চলা-ফেরা প্রভৃতি) যদি মন্ত্রজপ চালানো হয়, তাহা হইলে ঐ কর্মগুলির প্রকৃতি বদলাইয়া যায়। ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়-সঞ্চালনগুলি আধ্যাত্মিক স্পন্দন বলিয়া মনে হয়। রামপ্রসাদের একটি গান আছে—

মন বলি ভজ কালী ইচ্ছা হয় তোর যে আচারে
গুরুদত্ত মহামন্ত্র দিবানিশি জপ করে।

*   *   *

কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে
মা বিরাজেন সর্বঘটে
(তুমি) নগর ফের মনে কর
প্রদক্ষিণো শ্যামা মারে॥

অতঃপর চিত্তের বৃত্তিগুলির প্রতি মন্ত্রের প্রয়োগ। মনে প্রতিনিয়ত অসংখ্য চিন্তা ও আবেগ (হর্ষ বিষাদ কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি) উঠিতেছে। উহাদিগকে নিরুদ্ধ করা সত্যই কঠিন। অর্জুন যখন হতাশ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে চিত্তসংযমের অসম্ভাব্যতার কথা জানাইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥
(গীতা ৬।৩৫)

'হে কুন্তীনন্দন মহাবাহু অর্জুন, চঞ্চল মনকে নিগ্রহ করা দুঃসাধ্য বটে, তবে অভ্যাস ও বৈরাগ্য সহায়ে উহাকে অবশ্যই শান্ত করা যায়।'

মন্ত্রযোগের অভ্যাস হইল বিশ্বাস ও প্রেমের সহিত মন্ত্রের মহাশক্তি চিত্তবৃত্তিগুলির প্রতি সঞ্চালন করা। এই অভ্যাসে যুদ্ধের দাম্ভিকতা ও কঠোরতা নাই। মন্ত্রনিহিত ভাগবত শক্তি দ্বারা চিত্তের যাবতীয় বিক্ষেপ ও বিক্ষোভ অতি স্বাভাবিক ভাবে নরম হইয়া আসে।

দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ মন মন্ত্রাভ্যাস দ্বারা সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হইলে দেহের বাহিরে যাবতীয় বস্তু ও ঘটনাকে মন্ত্র-পরিশুদ্ধ করিবার প্রশ্ন ওঠে। উহাও সম্ভবপর এবং করণীয়। সর্বতোব্যাপ্ত মহাকাশ সাধারণ দৃষ্টিতে জড়—material space। আকাশের দিকে তাকাইয়া মন্ত্রজপ কর—আকাশকে মন্ত্রসংযুক্ত কর ; দেখিবে আকাশ তাহার রূপ বদলাইতেছে, মন্ত্রলক্ষ্য চৈতন্যস্বরূপ ভগবান আকাশের পিছন হইতে উঁকি দিতেছেন। আকাশ তাঁহার অঙ্গাবরণ। তেমনি চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, তেমনি বৃক্ষ লতা ফুল ফল, তটিনী বনানী পর্বত মরুভূমি আবার ভূচর, খেচর, জলচর যাবতীয় জীবমণ্ডলী—বিশ্বপ্রকৃতির প্রত্যেকটি অভিব্যক্তি মন্ত্রপূত হইলে সচ্চিদানন্দ ভগবানের অঙ্গ বলিয়া মনে হয়।

*   *   *

মন্ত্রে যোগ—মন্ত্রযোগ ; সপ্তমী-তৎপুরুষ সমাস। ইহা মন্ত্রযোগের দ্বিতীয় ধাপ। এই ধাপে মন্ত্রকে ভিতরে বা বাইরে নানা দিকে প্রযুক্ত করিবার প্রয়োজনীয়তা ফুরাইয়াছে। এখন মন্ত্রকে ইষ্টের (দেব বা দেবী বা পরমাত্মা) সহিত এক ভাবিয়া ঐ ভাবনাকে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিতে হইবে। জপের সহিত ইষ্টের মূর্তি বা নিরাকার ভাবের ভাবনাও আনিতে হইবে। অভ্যাস যত পাকিবে মন্ত্রজপের শব্দ এবং ইষ্টের রূপ ও অরূপ ভাব ততই এক বোধ হইতে থাকিবে। মন্ত্রচৈতন্য জাগিয়া উঠিবেন। মন্ত্র যে সচ্চিদানন্দ ভগবান তাহাতে আর সংশয় থাকিবে না। আনন্দে ও শান্তিতে হৃদয় ভরিয়া যাইবে। ক্রমশঃ বোধ হইবে শব্দব্রহ্ম মন্ত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিবিড়তম কেন্দ্র হইতে

উৎস্ফূর্ত হইতেছেন। সাধকের হৃদয় আর বিশ্বহৃদয় যেন এক হইয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, চরাচর জগৎসংসারের প্রত্যেকটি বস্তু ও ঘটনা মন্ত্রসত্যে বিধৃত হইয়া আছে। মুণ্ডক উপনিষদ বলিতেছেন—

যদর্চিমদ্ যদণুভ্যোঽণু চ
যস্মিঁল্লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ।
তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদু বাঙ্‌মনঃ
তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি॥
(মুণ্ডক উপনিষদ ২।২।২)

'চৈতন্যজ্যোতিতে যিনি জ্যোতিষ্মান্, যিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, যাঁহাতে যাবতীয় লোক এবং লোকবাসী নিহিত তিনিই এই অক্ষর (প্রণবাত্মা) ব্রহ্ম। তিনিই জীবদেহে প্রাণ-রূপে ক্রিয়মাণ, তিনিই তাহার বাক্‌শক্তি ও মন রূপে অভিব্যক্ত। তিনিই পরম সত্য, তিনিই অমৃতস্বরূপ। হে সোম্য, তাঁহাতে মন সমাহিত কর।'

মন্ত্রজপের দ্বিতীয় ধাপে মন্ত্রচৈতন্যের অধিক হইতে অধিকতর উৎস্ফূর্তি হইতে থাকে। মন্ত্রকে চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া বোধ হয়। দেহ মন ও প্রাণে ঐ চৈতন্য পরিব্যাপ্ত হয়। এবং উহার উপলব্ধি অন্তরকে গভীর শান্তিতে প্লাবিত করে। যিনি ভক্তিপথে মন্ত্রসাধনা করিতেছেন, তিনি হৃদয়ে ইষ্টের প্রতি গভীর প্রেম অনুভব করিতে থাকেন। যিনি আত্মজ্ঞানের জন্য মন্ত্রযোগ সাধিতেছেন, তিনি অন্তরতম আত্মসত্যকে দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট সাক্ষাৎ করেন। মন্ত্রচৈতন্য ও আত্মচৈতন্য এক বলিয়া উপলব্ধি হয়।

মন্ত্র যখন চৈতন্যস্বরূপ হইয়া উঠে, তখন বিশ্বসংসারকেও চৈতন্যরূপে মন্ত্রে প্রবিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। পঞ্চভূত এবং পঞ্চভূত দ্বারা গঠিত স্থূল সূক্ষ্ম যত কিছু, সবই তখন চৈতন্যজ্যোতি। উপনিষদের সর্বাত্মভাবদ্যোতক বাক্যগুলি যেমন 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (এই সব কিছুই নিশ্চিতই ব্রহ্ম), 'আত্মৈবেদং সর্বম্' (এই সকলই আত্মা) মন্ত্রযোগ দ্বারা সাধকের উপলব্ধিতে জীবন্ত হইয়া উঠে। চলিত অর্থে এখন আর মন্ত্রের জপ নাই কেন না মন্ত্র এখন আর শব্দ নয়, সচ্চিদানন্দস্বরূপ।

* * *

শব্দব্রহ্ম মন্ত্র অন্তরে বাহিরে স্বকীয় মহিমা পরিবিস্তার করিয়া চলিয়াছেন। সেই মহিমার চরম উপলব্ধি মন্ত্রযোগের তৃতীয় বা অন্তিম ধাপ। মন্ত্রই যোগ—মন্ত্রযোগ; তৎপুরুষ সমাস (অভেদে কর্মধারয়)। দেহ মন প্রাণ মন্ত্র-চৈতন্যের স্ফুরণ, বিশ্বসংসারও তাই। চৈতন্য, চৈতন্য ব্যতীত আর কিছু নাই। দূরে চৈতন্য, নিকটে চৈতন্য। যেন এক বিরাট প্লাবনে সব কিছু ভাসিয়া গিয়াছে। চৈতন্যমহাসিন্ধুতে সকল নামরূপ মগ্ন। তাহাই যদি হয়, তবে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র, স্থূল ও সূক্ষ্ম, বাহির ও ভিতর, আগে ও পরে—ইত্যাকার ব্যবহার আর চলে কি? যখন চৈতন্যের অনুভূতি হয় নাই, তখনই আমরা দেশ ও কালের সহিত সম্পৃক্ত ঐ সকল ব্যবহার করি। চৈতন্যে দেশও নাই কালও নাই। দেশ ও কাল চৈতন্য হইতেই উদ্ভূত। চৈতন্যের সাক্ষাৎকার হইলে উহারা চৈতন্যেই বিলীন হয়। অতএব মন্ত্রাত্মক শব্দব্রহ্মের চরম মহিমা আমরা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতে পারি কি? পারি না। শ্রুতি (তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২।৯) বলিয়াছেন—

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন॥

'যেখান হইতে সকল বাক্য ফিরিয়া আসে, মনও যথায় পৌঁছিতে পারে না, সেখানেই ব্রহ্মের চরম আনন্দ। সত্যদ্রষ্টা ইহা জানিয়া

সকল ভয় হইতে মুক্ত হন।'

অতএব শব্দব্রহ্মের চরমস্তরে শব্দ অশব্দ হইয়াছেন, রূপ অরূপ হইয়াছেন। তিনি এখন বাক্যমনাতীত, নেতি নেতি। সকল বহুত্ব নিবিড় চৈতন্যে একীভূত হইয়া সেই এক তাঁহার অবাঙ্‌মনসোগোচরম্‌ মহিমায় অধিষ্ঠিত। সাধক মূক, তাঁহার মনেরও মৃত্যু হইয়াছে।

ইষ্টমন্ত্রকে বিশ্বাস ও প্রীতির সহিত ধরিয়া স্তরে স্তরে মন্ত্রের প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া আমরা অধ্যাত্মজীবনের বেদান্তঘোষিত এই চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারি।

সমাধিতত্ত্ব

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ।

মাস্টার মশায়ের এই প্রথম সমাধি-দর্শন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থা-দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট। শ্রীরামকৃষ্ণের চোখের পাতা পড়ছে না, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বইছে কি না বইছে—নিঃস্পন্দ অবস্থা! শুনলেন এরই নাম সমাধি-অবস্থা। দেখে অবাক হয়ে ভাবছেন, ভগবানে কতদূর তন্ময় হ'লে এই রকম একটা অবস্থা হতে পারে!

এই সমাধির প্রসঙ্গ যোগশাস্ত্রে রয়েছে। যোগসাধনার আটটি অঙ্গের সর্বোচ্চ অবস্থার নাম সমাধি। নিজের জীবনকে পবিত্র ক'রে কতকগুলি শীল মেনে মানুষ ধীরে ধীরে এগিয়ে একাগ্রতায় পৌঁছোয়। সেই একাগ্রতা গাঢ় হ'লে ধ্যান-অবস্থা আসে। ধ্যানের চূড়ান্ত অবস্থার নাম সমাধি। যোগশাস্ত্রমতে সমাধি দু রকমের। একটি সম্প্রজ্ঞাত, অপরটি অসম্প্রজ্ঞাত। যখন চিত্তবৃত্তি একীভূত হয় জড়বস্তুতে বা সূক্ষ্ম তন্মাত্রা ইত্যাদিতে, তখন তাকে বলা হয় সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। কিন্তু যদি মানুষের মন এই সমস্ত বিষয়ে লগ্ন না হয়ে 'বিরাম-প্রত্যয়' অভ্যাসপূর্বক, অর্থাৎ সমস্ত মানসিক ক্রিয়ার বিরামের অভ্যাস ক'রে পূর্বের যে সংস্কার সেই সংস্কারটুকু নিয়ে অন্তর্মুখী হয়ে সর্ববৃত্তিশূন্য হয়, তখন সেটার নাম হচ্ছে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। আবার এই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিও দুই রকমের। সবীজ ও নির্বীজ। সবীজ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে বীজ বা অবিদ্যা থেকেই যায়। তাই পুনরায় জন্ম হয়—মুক্তি হয় না। এরই অপর নাম 'ভব-প্রত্যয়' অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। আর নির্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে অবিদ্যার নাশ হওয়ায় পুনর্জন্ম হয় না—মুক্তি হয়। এরই অপর নাম 'উপায়-প্রত্যয়' অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

এই একাগ্রতা বা ধ্যানের অভ্যাস ইষ্ট-দেবতাতে সম্প্রয়োগ করলে ইষ্টদেবতাকে সমাধিতে দর্শন হয়। ইষ্টদেবতার যে লোক, সেই লোকে গতি হয়। এটিও সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সম্প্রজ্ঞাত সমাধির প্রতিও আকর্ষণ না থাকলে—পরবৈরাগ্য হ'লে, তখনই হয় নির্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। সেখানে কি দেখা যায়, সেটা মুখে বলা যায় না—'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্‌'। আপনারা স্বামীজীর সেই গান শুনেছেন—'নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।' এই গানে স্বামীজী নিজের নির্বিকল্প সমাধির অনুভূতির প্রকাশ,

যা অন্য কোন ভাষায় এত স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে ব'লে আমি জানি না। ধ্যান হচ্ছে নিবিড়, ক্রমশঃ সেই ধ্যানের গভীরতা বাড়তে বাড়তে সমগ্র বিশ্ব অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এই বিশাল সূর্য, চন্দ্র, এতো আলো, এতো সৌন্দর্য সব বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এই যে বিরাট মহাকাশ বহির্বিশ্বে পরিদৃশ্যমান, সেটি শূন্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে অস্ফুট মন-আকাশ উদিত হচ্ছে । মনের ভেতরের যে আকাশ, তাতে এই বিশ্বচরাচর অস্পষ্ট আবছাভাবে ছবির মতো ভেসে উঠছে। বিশ্বচরাচরকে আমরা একটা কঠিন পদার্থ—জড়বস্তুরূপে দেখি, কিন্তু সেটা তখন ছবির মতো মনে হচ্ছে। সেই ছবি অস্ফুট মনের আকাশে ভাসছে। 'ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ।' কোথায়? মনের সেই আকাশে। 'অহং' তখন রয়েছে। সেই 'অহং'কে অবলম্বন ক'রে এই জগৎ-সংসাররূপ প্রপঞ্চ ছায়ার মত ভেসে চলেছে। ছায়ার মতো এই জগৎ-সংসারের যে চিত্র মন-আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছিল সেটি ধীরে ধীরে মহালয়ে—মহাপ্রলয়ে বিলুপ্ত হয়ে গেল, তার লয় হল, সেটিও মিলিয়ে গেল। থাকলো কি? 'বহে মাত্র "আমি" "আমি" '—"সোঽহম্" এই মাত্র। তারপরে ঐ আমিত্ব-টুকুও লুপ্ত হ'ল আরও ধ্যানের তন্ময়তার সঙ্গে সঙ্গে। 'সে ধারাও বন্ধ হ'ল।' 'অহং' চলে গেলে কি থাকলো? শূন্য। ওধারেও শূন্য। সেই শূন্যে শূন্য মিলিয়ে গেল। নির্বিকল্প। কোন বিকল্প নেই, কোন কল্পনা নেই জগতের। তাহলে থাকলো কি? 'অবাঙ্-মনসোগোচরম্'—বাক্য মনের অতীত অবস্থা। 'বোঝে—প্রাণ বোঝে যার।' এই হ'ল নির্বিকল্প সমাধির বর্ণনা। যতটা বলা যায়, প্রকাশ করা যায় স্বামীজী সেটুকু বলেছেন। ঠাকুরও নির্বিকল্প সমাধি সম্বন্ধে তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে যতটা পারা যায়, ততটা প্রকাশ করেছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে পারেননি।

যোগশাস্ত্রের দিক দিয়ে আমরা সমাধির আলোচনা করলাম। এখন আরও কয়েকটি দিক দিয়ে সমাধির আলোচনা আমরা করবো। আমি পূর্বেই বলেছি কথামৃত পাঠ করলে আনন্দ হয়—আনন্দের রসে আমাদের হৃদয় অভিষিঞ্চিত হয়। ভগবানের বাণী আনন্দের বাণী—সেটাকে নিয়ে ব্যাখ্যা করার বিশেষ প্রয়োজন নেই। তবুও আমরা ব্যাখ্যা করছি এইজন্য যে, এই প্রসঙ্গে আমাদের যে ধর্ম, যে দর্শন, তার কতকগুলি বিষয় আপনাদের জানা হয়ে যাবে। এবং সেটা জানা হ'লে পরে বুদ্ধির দিক দিয়ে, বিষয়ের দিক দিয়ে, কথামৃত বোঝবার সুবিধা হবে। যেমন আমি একটা গোলাপফুলকে দেখে খুব আনন্দ পাচ্ছি। খুব ভাল কথা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি যদি জানতে পারি এই গোলাপটা কি করে হ'ল, কোন্ জাতের গোলাপ এটি—এর নাম কি, তাহ'লে এই গোলাপ সম্পর্কে আমার জ্ঞানটা সম্পূর্ণ হ'ল। সেইভাবে আমি এখানে সমাধি সম্বন্ধে একটা পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করতে চাচ্ছি। সমাধি বিষয়ে আমি যোগ-শাস্ত্র থেকে আলোচনা করেছি, কিন্তু সমাধি শুধু যোগেরই কথা নয়। সমস্ত হিন্দু দর্শনের, হিন্দু সাধনার চরম কথা হ'ল সমাধি। এই সমাধি না হ'লে চরম যে জ্ঞান বা পরমা যে ভক্তি তা লাভ হয় না।

এই সমাধির কথা যোগশাস্ত্রে যেমন বলা আছে, তেমনি বেদান্তশাস্ত্রে—অদ্বৈত বেদান্তেও বলা হয়েছে। বেদান্তে বলা হচ্ছে এই দৃশ্য জগৎ কি উপাদানে গঠিত—বলা হচ্ছে

এটি পাঞ্চভৌতিক, পঞ্চভূতাত্মক। বেদান্ত-বিচারে এই পঞ্চভূতাত্মক জগৎকে ধীরে ধীরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যার ফলে সাধক গিয়ে পৌঁছচ্ছেন এক নির্গুণ পরব্রহ্মে। এই যে প্রণালী, এই যে পদ্ধতি, যা দিয়ে মূলতত্ত্বে পৌঁছনো যাচ্ছে, তাকে বলা হচ্ছে অধ্যারোপ এবং অপবাদ। অধ্যারোপ মানে কি কি দিয়ে জিনিসটা তৈরী হ'ল তার আরোপ করা। আর অপবাদ মানে এগুলো কিছুই নয়—ঠিক নয়, এই বিচার ক'রে এগুলো সরিয়ে দিয়ে ব্রহ্মতত্ত্বে পৌঁছনো। বেদান্ত-দর্শন এই অধ্যারোপ এবং অপবাদ ন্যায়ের দ্বারা তত্ত্বের প্রতিপাদন করেছে। কিন্তু সেটা হ'ল বুদ্ধির জগতে। আর সাধনার দিক থেকে উপনিষদের সেই বাণীটাকে নিয়ে বলা হচ্ছে, আত্মা কেবল অধ্যারোপ ও অপবাদ রূপ যুক্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত নন—এই যে দর্শন তাকে জীবনে প্রতিফলিত করতে হবে। কি ভাবে? না—'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ' অর্থাৎ আত্মাকে দর্শন করতে হবে। দর্শন করতে গেলে কি করতে হবে? না—শ্রোতব্য, শ্রুতি-বাক্যের মাধ্যমে উপযুক্ত গুরুমুখে তাঁর বিষয়ে শুনতে হবে। তারপরে মনন করতে হবে, অর্থাৎ ঐ বিষয়ে চিত্তকে সর্বদা লাগিয়ে রাখতে হবে, শাস্ত্র বার বার পাঠ করতে হবে। তারপরে নিদিধ্যাসন। এটিই আসল বস্তু। এর দ্বারাই মানুষের পরমতত্ত্ব লাভ হবে। এই প্রসঙ্গেই স্বামীজী বলেছেন, যে কোন বিষয়েই, জাগতিক বিষয়েও, মন একাগ্র না হ'লে জ্ঞান হয় না। চিত্তে যদি বিক্ষেপ হয়, তাহলে অনেক পুঁথি পড়লে আমার সার্থক জ্ঞানলাভ হবে না। সেজন্য আমার একাগ্রতার প্রয়োজন। যতক্ষণ একাগ্রতা না হচ্ছে ততক্ষণ জ্ঞান হবে না। এই একাগ্রতাই নিদিধ্যাসন—এটাই ধ্যান। এই নিদিধ্যাসনটা কি? না—'বিজাতীয়-দেহাদি-প্রত্যয়-রহিতা-দ্বিতীয়বস্তু-সজাতীয়-প্রত্যয়-প্রবাহঃ নিদিধ্যাসনম্।' অর্থাৎ বিজাতীয় বস্তু—যেটা আমার আত্মবস্তুর মতো নয়—এই যে সংসার, দেহ ইত্যাদি, এর যে প্রত্যয় যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান-রহিত হতে হবে। একমাত্র সত্যবস্তু, পরমবস্তু হলেন পরমাত্মা পরব্রহ্ম যাঁকে শ্রুতিতে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বলা হয়েছে। তিনি শুধু 'একম্' নন—এক নন, কারণ, এক থাকলেই দুই থাকবে। তিনি 'একম্' এবং 'অদ্বিতীয়ম্'ও। তাঁর কোন দ্বিতীয় নেই—দুই নেই। এক হয়েই তিনি অদ্বিতীয়—দুই তিন বহু সংখ্যা নিয়ে এক নন। সেই যে এক অদ্বিতীয় বস্তু, সেটাই আমার সজাতীয় বস্তু—আমার স্বরূপ। সেই সত্যবস্তুবিষয়ক নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ জ্ঞানের প্রবাহের নামই নিদিধ্যাসন—ধ্যান সেটাই। বেদান্তে তাই বলেছে, প্রথমে শুনতে হবে, তারপরে ভাবতে হবে, তারপরে গভীর ধ্যানে ডুবে যেতে হবে। বাইরের জগৎ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়ে সর্বপ্রকার বাহ্য অনুভূতির স্রোত লুপ্ত হয়ে গেলে তখনই সমাধি হবে। এই সমাধিকে বলা হচ্ছে—দুই প্রকার। সবিকল্প আর নির্বিকল্প। সবিকল্প হচ্ছে—'তত্র সবিকল্পকো নাম জ্ঞাতৃ-জ্ঞানাদি-বিকল্পলয়ানপেক্ষয়া অদ্বিতীয়বস্তুনি তদাকার-কারিতায়াঃ চিত্তবৃত্তেঃ অবস্থানম্।' এই সবিকল্প সমাধিতে কি হয়? আমাদের যে জ্ঞান হয়, তাতে ত্রিপুটী—তিনটি বিষয় থাকে—জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয়। যে জানছে সে জ্ঞাতা (প্রমাতা), যার দ্বারা জানা হচ্ছে সেটি জ্ঞান (প্রমাণ), যে বস্তুটিকে জানা হচ্ছে সেটি হ'ল জ্ঞেয় (প্রমেয়)। যে অবস্থায় চিত্তবৃত্তি অদ্বিতীয়

বস্তুর আকারে আকারিত হয়, অথচ জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয় রূপ ত্রিপুটীর লয় হয় না, চিত্ত-বৃত্তির সেই অবস্থাকে সবিকল্প সমাধি বলে। আর নির্বিকল্প সমাধি কি? না—'নির্বিকল্পকঃ তু জ্ঞাতৃজ্ঞানাদিবিকল্পলয়াপেক্ষয়া অদ্বিতীয়-বস্তুনি তদাকারকারিতায়াঃ চিত্তবৃত্তেঃ অতিতরাম্ একীভাবেন অবস্থানম্।' যখন নির্বিকল্প সমাধি হচ্ছে তখন ত্রিপুটী লয় হয়ে যাচ্ছে—ত্রিপুটী থাকছে না, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের ভেদ চলে যাচ্ছে। আর এগুলো চলে গিয়ে যখন অদ্বিতীয় বস্তুর সঙ্গে চিত্তবৃত্তি চূড়ান্ত-ভাবে একীকৃত হয়ে যাচ্ছে, তখনই নির্বিকল্প সমাধি।

ধ্যান করতে করতেই এই অবস্থা হয়। তবে এর মধ্যেও কথা আছে। আমাদের কেউ কেউ ধ্যান করতে করতে বেশ কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে দিচ্ছেন, বেশ আনন্দ পাচ্ছেন। তাঁদের হয়তো মনে হতে পারে, সমাধি হয়ে গেল। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। সহজে সমাধি হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে যেমন ক্ষণে ক্ষণে মনের ঊর্ধ্বগতি, অতিমানসলোকে উত্তরণ, সেটি সকলের হয় না। সেই নির্বিকল্প সমাধি দুর্লভ। শাস্ত্রে এই কথাই বলে। কীর্তনে ভাবাবেশাদি দেখে স্বামীজী কখনো কখনো ঠাট্টা করেছেন। বলেছেন—ঐগুলি স্নায়বিক দুর্বলতার লক্ষণ। কারণ যিনি সমাধিমান পুরুষ, তাঁর দৈনন্দিন জীবন একটা আদর্শ জীবন হবে। শুধু কীর্তনে অশ্রু পুলক লম্ফ-ঝম্প দেখেই সাধকের অধ্যাত্মজীবনের অগ্রগতি প্রমাণিত হবে না। জীবনের সামগ্রিক রূপরেখা বিচারেই তার মূল্যায়ন হবে। আমার যদি তথাকথিত সমাধি হয়, এবং তারপরেও যদি আমার মনে জৈব ভাব আসে, তাহলে বুঝতে হবে আমার সমাধি-লাভ হয়নি। সুতরাং সমাধিপথে কয়েকটি বিঘ্নের কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে। তাদের একটি হচ্ছে লয়। আমি ধ্যান করতে করতে খুব আরাম পাচ্ছি, ঘুম ঘুম ভাব আসছে, সেটা কিন্তু ধ্যান জমে আসা নয়। সেটা একেবারে ঘুম। তখন কি করতে হবে? 'লয়ে সম্বোধয়েৎ চিত্তম্'। মনটাকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে দিতে হবে। এখানে আটকে থাকলে আর এগোনো যাবে না। তারপর বিক্ষেপ। আমি একমেবাদ্বিতীয়ম্ বস্তু কিংবা মা-কালী অথবা অন্য কোন কিছুতে মন স্থির ক'রে ধ্যান করছি। হঠাৎ অন্য কোন বিষয়ে মন ঘুরে গিয়ে লগ্ন হ'ল এবং তাতেই আটকে গেল। এটা বিক্ষেপ, এটাও সমাধির পথে বিঘ্ন। তারপর কষায়। এতে মন জড়ীভূত হয়ে যায়, শুষ্কীভূত হয়ে যায়, কিছুই ভাল লাগে না, মন ধ্যানে এগোতে চায় না এটাও বিঘ্ন। তারপরে শেষ বিঘ্ন হচ্ছে রসাস্বাদ। ধ্যান করতে করতে হঠাৎ মনে খুব একটা আনন্দ হচ্ছে—সেই আনন্দরসেই মন বসে গেল, আর এগোতে চাইছে না, এটা শেষ বাধা। এই রসাস্বাদবিঘ্নকে অতিক্রম করতে পারলেই সমাধি। এই সব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম ক'রে আমি যখন অদ্বিতীয় বস্তুর সঙ্গে একাকার হয়ে যেতে পারবো, তখনই হবে সেই চরমকাম্য নির্বিকল্প সমাধি।

বেদান্তশাস্ত্র ও যোগশাস্ত্র—এর ভেতরেই সমাধির কথা বিশেষ ক'রে বলা হয়েছে। যোগ বলতে আমি সাংখ্য ও পাতঞ্জল, এই দুটিকেই বোঝাচ্ছি। বৈশেষিক এবং ন্যায়-দর্শনে ঠিক এইভাবে সমাধির কথা বলা না হলেও বস্তুবিচারের কথা বলা হয়েছে। বিচার করতে করতে মনের ভেতরে জ্ঞান এসে যাবে। তখন সে মন যোগজ প্রত্যক্ষের

অধিকারী হবে। আমি এখনি যে আপনাদের দেখছি, সেটা সাধারণভাবে দেখছি—'প্রত্যক্ষ' করছি। এটা জ্ঞানলাভের একটা উপায়। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিকে 'অসাধারণ' প্রত্যক্ষের কথাও বলা হয়েছে। 'অসাধারণ' প্রত্যক্ষ-গুলির মধ্যে যোগজ প্রত্যক্ষ অন্যতম। জীব সাধনার দ্বারা যোগজ শক্তিলাভ ক'রে ইন্দ্রিয়গত জীবনের উর্ধ্বে যে অনুভূতি, তার দ্বারা পরমাত্মার সাক্ষাৎ দর্শন পেতে পারে। এই যোগজ প্রত্যক্ষ সমাধির দ্বারাই লভ্য।

এছাড়া সমাধির কথা তন্ত্রশাস্ত্রেও আছে। তন্ত্রশাস্ত্রের ঐ কথা বুঝতে গেলে আমাদের জানতে হবে তন্ত্রশাস্ত্রটি কি। বেদান্ত ও যোগের সঙ্গে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের সমন্বয় ক'রে রচিত কতকগুলি গ্রন্থের নাম তন্ত্র। বহু তন্ত্র আছে। ঠাকুরের ৬৪তন্ত্রোক্ত সাধনার কথা আপনারা জানেন। এই ভারতবর্ষকে তন্ত্রশাস্ত্রমতে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটি বিষ্ণুক্রান্তা—বিন্ধ্য-পর্বত থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত যে ভূমি, আর একটি বিন্ধ্যপর্বত থেকে সমুদ্র পর্যন্ত ভূমি, সেটি অশ্ব-ক্রান্তা, আর একটি বিন্ধ্যপর্বত থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত ভূমি, তার নাম রথক্রান্তা। এই তিনটি ক্রান্তায় প্রত্যেকটির জন্য ৬৪খানি ক'রে তন্ত্র রয়েছে। এই বিষ্ণুক্রান্তার ভেতরে ৬৪খানা তন্ত্রমতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সহায়তায় যে তন্ত্রসাধনা করেছিলেন, সেটি তাঁর জীবনের একটি বিরাট অধ্যায়। তন্ত্রশাস্ত্রের ভেতরে একটি অংশ আছে, যেটিকে স্বামীজী বলতেন, diabolism (পৈশাচিক বা নারকীয়)—সাধারণের মধ্যে যার প্রচলিত নাম 'বামাচার'। অবশ্য তান্ত্রিকদের মতে এই বামাচারের মধ্যে দিয়েও তাঁরা অদ্বৈতানুভূতিতে পৌছাতে পারেন। আমি এখানে এবিষয়ে কিছু আলোচনা করছি না। এটি বাদ দিয়ে আমাদের সাধন-জীবনে যে পন্থায় আমরা সাধনা করি সে কথাই বলছি। রামকৃষ্ণ সংঘের সাধকদের সাধনায় তন্ত্রমতের সাধন-পন্থাই প্রধান। যদিও তার সঙ্গে অদ্বৈতবেদান্ত এবং যোগও আছে, তবু সাধন-পদ্ধতিটি তন্ত্রের উপরই প্রতিষ্ঠিত। তবে সেটি দক্ষিণাচার পদ্ধতি। সেই দক্ষিণাচার পদ্ধতির মধ্যে প্রথম কথা হচ্ছে, গুরুগ্রহণ—গুরুর কাছ হতে নাম বা মন্ত্র-গ্রহণ। এই মন্ত্রগ্রহণ নানা রকমে হয়। লীলাপ্রসঙ্গে দেখেছেন, মান্ত্রী শাক্তী আর শাম্ভবী দীক্ষার কথা। স্পর্শমাত্রে দৃষ্টিমাত্রে নানাভাবে দীক্ষাদানের কথা সেখানে আছে। আমাদের সাধারণত মান্ত্রী দীক্ষাই হয়। মন্ত্র দেওয়া হয় জপের জন্য ও ধ্যান অভ্যাস করতে বলা হয়। আবার আমরা এসে পৌ বেদান্তের ধ্যানে বা যোগের ধ্যানে। তন্ত্রের ধ্যানটা কিন্তু একটু অন্য রকম দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বেদান্ত বলছেন—'একমেবা-দ্বিতীয়ম্'। তন্ত্রেও সব শেষের তত্ত্ব বলতে গিয়ে বলছেন—পরমশিব, পরমব্রহ্ম। সেই পরমব্রহ্মে একটা স্পন্দন বা কম্পন জাগলো, তাকে বলছেন—'স্পন্দ-প্রথম'। যেমন উপনিষদেও আছে, ব্রহ্মের ইচ্ছা হ'ল 'একোঽহং বহু স্যাম্'। তাঁর সৃষ্টির ইচ্ছা হ'ল —এক আমি, বহু হবো। পরমাত্মাতে—পরমশিবে স্পন্দন জাগতে, তাঁর ভেতরে দুটি যুগল শক্তির আবির্ভাব হ'ল। একটি শক্তিকে বলা হচ্ছে সমনাশক্তি অন্যটিকে উন্মনাশক্তি বলা হচ্ছে। 'উন্মনা নাম যা শক্তিঃ সর্বকারণ-কারণম্।' উন্মনা নামে যে শক্তি সেটি সর্ব-কারণের কারণ। কিন্তু তিনি নিষ্ক্রিয়। আর সমনাশক্তি যিনি, তিনি সক্রিয়। এই দুটি

শক্তি ধীরে ধীরে বিভক্ত হয়ে গেলেন। বিভক্ত হয়ে গিয়ে উৎপন্ন হ'লেন শিব ও শক্তি। এই শিব ও শক্তি নিয়েই জগৎ। শিব ও শক্তি মিলে এই জগৎ সৃষ্ট হয়েছে। আর, 'যা আছে ভাণ্ডে তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে।' আমাদের এই ভাণ্ডরূপী শরীরের মধ্যেও শিব ও শক্তির খেলা চলছে, কিন্তু আমরা সেটা জানি না। এই শক্তি ও শিবের সঙ্গে যুক্ত নই ব'লে আমাদের এতো দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। আমাদের ভেতরে এই শক্তির অধিষ্ঠানক্ষেত্র মূলাধারে। নিদ্রিত অবস্থায় তিনি আছেন। তিনি কুণ্ডলিনী শক্তি। তাঁকে জাগরিতা করতে হবে। এবং এই শক্তির প্রকাশ স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে, যেগুলির নাম sensory ও motor nerves. সাধারণতঃ নিদ্রিতা কুণ্ডলিনী শক্তি স্নায়ুগুলিকে অবলম্বন ক'রে বাইরে যেতে চায়। তারই ফলে আমরা দর্শন-স্পর্শনাদির সাহায্যে জাগতিক ভোগ করছি। কিন্তু জগতে সুখ নেই, দুঃখ আছে। কাজেই আমাকে ঐ নিদ্রিতা শক্তিকে জাগ্রতা করতে হবে। কিভাবে? না—ধ্যান-জপাদি সাধনার দ্বারা। সাধনার দ্বারা জাগ্রতা হ'লে ঐ কুণ্ডলিনী শক্তি যিনি অধোমুখে রয়েছেন, তিনি ঊর্ধ্বমুখে ধীরে ধীরে উঠতে থাকবেন ও মেরুদণ্ডে স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে অধিষ্ঠিত বিভিন্ন স্নায়ুকেন্দ্রের মধ্যে ক্রিয়াশীল হবেন। এতকাল বাইরের জগতে তিনি ক্রিয়া করতেন। তাই সেটি সত্য ব'লে মনে হ'ত। এখন সেটি রুদ্ধ হয়ে অন্তর্জগতের দ্বার খুলে গেল। তিনি ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বদিকে উঠতে লাগলেন। একে একে জগতের ভোগসুখের স্নায়ুকেন্দ্রগুলি—স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর চক্র অতিক্রম ক'রে তিনি এলেন অনাহতে, হৃদয়ে। প্রতিটি চক্রেই বিভিন্ন দলের পদ্মগুলি প্রস্ফুটিত হ'লো। এই চক্রগুলি শারীরবিদ্‌দের মতে plexus. স্নায়ুমণ্ডলীর এই বিচিত্র সমাবেশ স্থূলদৃষ্টিতে সাধারণের দৃষ্টিগোচর নয়। অন্তর্জগতের দৃষ্টিতে এগুলি সত্য। অনাহত চক্র ইষ্টের স্থান—তাঁর বৈঠকখানা। সেখান থেকে বিশুদ্ধ-চক্র কণ্ঠে। সেখানে ঈশ্বরীয় কথা শোনা যায়। নানা-রকম ধ্বনি শোনা যায়। তারপরে ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাচক্র। সেখানে ইষ্টস্বরূপের সঙ্গে মাত্র একটা হালকা পর্দার ব্যবধান। তারপরে গিয়ে উপস্থিত হয় একেবারে সহস্রারে আমাদের মস্তিষ্কে। সেখানে উপস্থিত হ'লে ঐ পর্দার ব্যবধান ঘুচে যায়। সমস্ত বৃত্তি তিরোহিত হয়, নিরুদ্ধ হয়। 'অহম্ অহম্'-স্রোতও রুদ্ধ হয়ে যায়। কি অনুভূতি তখন হয়? 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্, বোঝে প্রাণ বোঝে যার'—এই অনুভূতি হয়। কাজেকাজেই তন্ত্র-শাস্ত্রের দিক দিয়েও নানারকম দর্শন হয়, দেব-দেবীর দর্শন, ইষ্টদর্শন হয়, আবার ইষ্টদর্শনের ঊর্ধ্বে উঠে যাওয়ার কথাও আছে। স্বামী সারদানন্দ তাঁর 'লীলাপ্রসঙ্গে'র 'সাধকভাব'-এর 'সাধক ও সাধনা' অধ্যায়ে বলেছেন, ধ্যান করতে গিয়ে প্রথমে হয়তো ইষ্টের পূর্ণরূপ মনে আসবে না। শরীরের একটু একটু অংশ ধ্যানে আসবে। তারপরে বেশ কিছুদিন সাধনের পরে তাঁর কৃপায় সমগ্রমূর্তি ধ্যানে আসবে, তবে হয়তো ক্ষণেকের জন্য। ক্রমশঃ সেই মূর্তি দীর্ঘস্থায়ী হবে। তারপরে সেটি হবে সজীব—সচল। ইষ্ট আমার সঙ্গে কথা বলছেন, ঘোরাফেরা করছেন। তবে এই চোখ দিয়ে দেখা নয়। ঠাকুরের কথা অবশ্য আলাদা। ঠাকুরের যে দর্শন সেটি অন্য ভাবে। তিনি সীতাকে সাদা চোখে দর্শন করেছেন, আরও বহু বহু আশ্চর্য দর্শন তাঁর

হয়েছে। তারপরে এই ধ্যান যখন আরও গভীর হবে, তখন সাধকের অভিলাষে ও ইষ্টের কৃপায় ঐ ইষ্টমূর্তিও মিলিয়ে যাবে। তখনই হবে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের অনুভূতি—নির্বিকল্প, যা ঠাকুরের হয়েছিল প্রথম সন্ন্যাসের পরে। যে নির্বিকল্প অবস্থা লাভ করতে তোতাপুরীজীর চল্লিশ বছর লেগেছিল, সেই অবস্থায় ঠাকুর এলেন মাত্র এক দিনের প্রচেষ্টায়।'

এই হচ্ছে সমাধি বিষয়ে একটু ছোট্ট আলোচনা। যোগ বেদান্ত বা তন্ত্র সব পথের সাধনের শেষ কথা এই নির্বিকল্প সমাধি। সাধক নানা অনুভূতির মধ্যে দিয়ে গিয়ে চরমে এই জগতের সমস্ত স্থূল সূক্ষ্ম বিষয়ের ঊর্ধ্বে উঠে বিকল্পহীন এই অবস্থা লাভ করেন। আধ্যাত্মিক অনুভূতির এইটাই উচ্চতম অবস্থা।*

* ৬ই অগস্ট ১৯৭৮, বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের 'সারদানন্দ হলে' কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে সমাধিতত্ত্বের আলোচনা। স্বামী অচ্যুতানন্দ কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত।

'অন্তর্যামী অমৃত'

ডক্টর রমা চৌধুরী*

সর্বজন-বিদিত সর্বজন-সমাদৃত বৃহদারণ্যক উপনিষদে **'অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ'** রূপে কথিত (তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম ব্রাহ্মণ) অধ্যায়টি সর্বদিক থেকেই বিশেষ মূল্যবান এবং কৌতূহলোদ্দীপক। এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রকরণে 'উদ্দালক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ' অথবা কথোপকথনের মাধ্যমে ভারতীয় ধর্ম-দর্শনের একটি অভিনব অপরূপ অত্যাশ্চর্য তত্ত্ব সহজ-সরল-সরস-সুমিষ্ট ভাবে প্রকটিত করা হয়েছে পূর্ণতম মহিমায় গরিমায় মধুরিমায়।

দিগ্বিজয়ী মহাপণ্ডিত মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যখন রাজা জনকের প্রকাশ্য রাজসভায় নিজেকে 'ব্রহ্মিষ্ঠ' অথবা 'সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ' রূপে প্রচার ক'রে জনকপ্রদত্ত প্রত্যেকটির শৃঙ্গদ্বয়ে দশ দশ সুবর্ণমুদ্রাবদ্ধ একসহস্র গাভী দাবী করলেন পুরস্কাররূপে, তখন স্বভাবতঃই অন্যান্য ঋষিরা তাতে ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করলেন; এবং যাজ্ঞবল্ক্যকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান ক'রে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করলেন; কিন্তু অচিরেই পরাস্ত হয়ে নিজেরাই বিরত হলেন। এঁদের শুভ নাম—হোতা অশ্বল, জরৎকারব আর্ত-ভাগ, ভুজ্যু লাহ্যায়নি, উষস্ত চাক্রায়ণ এবং কহোল কৌষীতকী। পরিশেষে পরম-সাহসিনী মহাপ্রজ্ঞাশীলা গার্গী বাচক্নবীর প্রশ্নবাণে জর্জরিত যাজ্ঞবল্ক্য, তাঁর—'ব্রহ্মলোক-সমূহ কিসে ওতপ্রোতভাবে বর্তমান?' (৩৷৬৷১) —এই শেষ মহাপ্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তাঁকে এই ভীতি প্রদর্শন ক'রে নিরস্ত করলেন—

* প্রাক্তন উপাচার্যা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি—(১) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট উপাধি প্রাপ্ত. (২) ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপাচার্যা এবং (৩) রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের সদস্যা।

ইনি কুড়িটিরও অধিক আধুনিক সংস্কৃত নাটিকা রচনা করিয়া এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ঐগুলির অভিনয় পরিচালনা করিয়া ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রচারে ব্রতী রহিয়াছেন। দর্শন-বিষয়ক হঁহার মূল্যবান প্রকাশনগুলিও উল্লেখযোগ্য।

'স হোবাচ গার্গি মাতিপ্রাক্ষীর্মা তে মূর্ধা ব্যপপ্তদনতিপ্রশ্ন্যাং বৈ দেবতামতিপৃচ্ছসি গার্গি মাতিপ্রাক্ষীরিতি। ততো হ গার্গী বাচক্নব্যু-পররাম।' (৩।৬।১)

—তিনি (যাজ্ঞবল্ক্য) বললেন, "হে গার্গি! 'অতিপ্রশ্ন' করো না,—তোমার মস্তক যেন নিপতিত না হয়। যে দেবতার বিষয়ে অতি-প্রশ্ন করা উচিত নয়, তুমি তাঁরই বিষয়ে অতি-প্রশ্ন করছ। হে গার্গি! অতিপ্রশ্ন করো না।" অনন্তর গার্গী বাচক্নবী বিরত হলেন। (৩।৬।১)

এরূপে ছজন সুবিখ্যাত পণ্ডিতকে নিরস্ত ও পরাজিত ক'রে যাজ্ঞবল্ক্য যাতে গর্বান্ধ হয়ে না পড়েন, তজ্জন্য তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী গুরু উদ্দালক আরুণি অগ্রসর হয়ে এলেন শিষ্যের সম্মুখীন হয়ে। বিশেষ ক'রে পরমবিদুষী গার্গীর চরম ও পরম প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না দিয়ে তাঁকে মস্তক নিপতিত হবার ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করাকেও উদ্দালক আরুণি সমর্থন করতে পারছিলেন না। সেজন্যই এতক্ষণ নীরবে বসে থেকেও এইবার তিনি কর্তব্যবোধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন, অবশ্য "যুদ্ধং দেহি" এই উগ্র মনোভাব নিয়ে নয়—স্নেহের মনোভাব নিয়েই কেবল।

জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ উদ্দালক আরুণি 'গৌতম' নামেও সুপরিচিত ছিলেন। 'প্রিয়ব্রত সৌমাপি' এঁর একজন গুরু (শাঙ্খায়ন আরণ্যক, ১৫)। যাজ্ঞবল্ক্য উদ্দালকের অন্যতম শিষ্য (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৬।৩।৭, ৬।৫।৩)। তাঁর আরো দুজন শিষ্যের নাম পাওয়া যায়—কৌষীতকী (শাঙ্খায়ন আরণ্যক, ১৫) এবং প্রোতি কৌশাম্বেয় কৌসুরুবিন্দি (শতপথ ব্রাহ্মণ, ১২।২।২।১৩)। এই শতপথ ব্রাহ্মণ থেকেই আমরা জানতে পারি যে, উদ্দালক 'ব্রহ্মোদ্য' বিষয়ে প্রাচীন-যোগ্য শৌচেয়কে পরাস্ত করেছিলেন (শতপথ ব্রাহ্মণ, ১১।৫।৩)। তিনি যে একজন সর্বজন-বিদিত সর্বজনসমাদৃত ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি ছিলেন, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, শতপথ ব্রাহ্মণ (১।১।২।১১, ৩।৩।৪।১৯ প্রভৃতি), ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৮।৭), কৌষীতকী ব্রাহ্মণ (২৬।৪), ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণ (১।৬), ছান্দোগ্যোপনিষদ্ (৬), প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত বৈদিক গ্রন্থে, তাঁর মতবাদকে সত্য ব'লে গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দান হ'ল, তাঁর সেই জগদ্বিখ্যাত মহাবাণী—'তত্ত্বমসি' (ছান্দোগ্যো-পনিষদ্, ৬)—'তিনিই (ব্রহ্মই) তুমি (জীব)।' উদ্দালক অতি উদারচেতা, প্রকৃত জ্ঞানপিপাসু মহর্ষি ও পরম পণ্ডিত ছিলেন; এবং জ্ঞানলাভ করবার জন্য তিনি রাজা অশ্বপতি কেকয় (ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৫।১১) এবং রাজা প্রবাহণ জৈবলি (ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৫।৩; বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ৬।২)—এই দুজন ক্ষত্রিয়েরও শিষ্যত্বগ্রহণে পশ্চাৎপদ হননি।

বৃহদারণ্যকোপনিষদের এই 'অন্তর্যামী ব্রাহ্মণে' (৩।৭) প্রপঞ্চিত তত্ত্বসমূহ তাঁর পরিপূর্ণভাবে জানাই ছিল। তথাপি শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যের মঙ্গলার্থে তিনি যাজ্ঞবল্ক্যের নিজের মুখ থেকেই তা পুনরায় শুনতে ইচ্ছুক হয়ে তাঁকে বললেন—'হে যাজ্ঞবল্ক্য! আমরা যজ্ঞশাস্ত্র অধ্যয়ন করবার জন্য মদ্রদেশে পতঞ্চল কাপ্যের গৃহে বাস করেছিলাম। তাঁর ভার্যা গন্ধর্বাবিষ্টা হয়েছিলেন। সেই গন্ধর্বকে আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আপনি কে?" তিনি বলেছিলেন—"আমি কবন্ধ আথর্বণ।" তিনি কাপ্য এবং তাঁর যজ্ঞাধ্যয়নশীল যাজ্ঞিক শিষ্যগণকে বললেন, "কাপ্য! তুমি কি সেই সূত্রকে জান, যার দ্বারা ইহলোক পরলোক এবং সর্বভূত সংগ্রথিত

হয়েছে?" পতঞ্চল কাপ্য বললেন, "ভগবন্! আমি তা জানি না।" তখন তিনি পুনরায় পতঞ্চল কাপ্য এবং তাঁর যজ্ঞাধ্যয়নশীল যাজ্ঞিক শিষ্যগণকে বললেন—"কাপ্য! তুমি কি সেই অন্তর্যামীকে জান, যিনি অন্তরস্থ থেকে ইহলোক পরলোক ও সর্বভূতকে নিয়মিত করছেন?" পতঞ্চল কাপ্য বললেন, "ভগবন্! আমি তা জানি না।" তখন তিনি পতঞ্চল কাপ্য এবং তাঁর যজ্ঞাধ্যয়নশীল যাজ্ঞিক শিষ্যগণকে বললেন, "কাপ্য! যিনি সেই সূত্র এবং অন্তর্যামীকে জানেন, তিনি ব্রহ্মবিৎ লোকবিৎ দেববিৎ বেদবিৎ ভূতবিৎ ও সর্ববিৎ হন।" এই সঙ্গে সেই গন্ধর্ব এ কথাও তাঁদের বলেছিলেন যে, তিনি তা জানেন।'

এই পর্যন্ত ব'লে উদ্দালক আরুণি যাজ্ঞবল্ক্যকে সাবধান ক'রে দিয়ে বললেন, 'তুমি যদি "সূত্র" এবং "অন্তর্যামী"কে না জেনেও এই সব ব্রহ্মগবীকে নিয়ে যাও, তা হ'লে তোমার মস্তক নিশ্চয়ই নিপতিত হবে।'

অল্পক্ষণ পূর্বেই ত স্বয়ং যাজ্ঞবল্ক্যই প্রাজ্ঞশ্রেষ্ঠা গার্গীকে মস্তক নিপতিত হবার ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করেছিলেন। তাঁর গুরুদেব যে তাঁরই নিক্ষিপ্ত শরে পুনরায় তাঁকে বিদ্ধ করবার প্রচেষ্টা করছেন, এই জেনে যাজ্ঞবল্ক্যও অটল আত্মবিশ্বাসভরে বললেন, 'হে গৌতম! আমি সেই "সূত্র" ও "অন্তর্যামী"কে জানি।' গুরুজনোচিত অধৈর্যসহকারে উদ্দালক আরুণি পুনরায় বললেন একটু রূঢ়ভাবেই, 'যে কেউ ত তোমার মত বলতে পারে, "আমি জানি, আমি জানি।" যা জান, তা বলে ফেল।'

শ্রীগুরুর নিগূঢ় উদ্দেশ্য বুঝে বিন্দুমাত্রও ক্ষুব্ধ না হয়ে জ্ঞানশক্তিতে শক্তিমান যাজ্ঞবল্ক্য অনায়াসে বললেন, 'হে গৌতম! বায়ুই সেই "সূত্র"। বায়ুরূপী সূত্র দ্বারাই, হে গৌতম, ইহলোক পরলোক ও সর্বভূত গ্রথিত হয়ে রয়েছে।'

এস্থলে 'বায়ু' শব্দের অর্থ 'হিরণ্যগর্ভ'। এই হিরণ্যগর্ভ-তত্ত্ব বেদান্তের একটি মূলীভূত তত্ত্ব। এই মতানুসারে সমষ্টি লিঙ্গশরীর হিরণ্যগর্ভের দেহ; এবং সমষ্টি বুদ্ধি তাঁর উপাধি। সমষ্টিরূপে তিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত; এবং ব্যষ্টিরূপে তিনি প্রত্যেক জীবের অন্তঃস্থলে বিরাজমান। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রাণস্বরূপ ও সাররূপ। তিনিই সমস্ত কর্মফল এবং কর্মসংস্কারের আশ্রয়, ধারক বাহক ও নিয়ামক; —কর্ম ও জ্ঞানসহিত কর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ ফল। বায়ুরূপী তিনিই পঞ্চভূত পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় প্রাণ ও অন্তঃকরণরূপ সপ্তদশাবয়ববিশিষ্ট লিঙ্গ-শরীরের উপাদান। উনপঞ্চাশ বায়ু তাঁরই বাহ্য-প্রকাশ।

হিরণ্যগর্ভের অপরাপর নাম হ'ল—প্রথমজ সূত্র মৃত্যু সত্য প্রভৃতি। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কার্যব্যাপারে একটি কেন্দ্রীভূত স্থান অধিকার ক'রে আছেন। কারণ ব্রহ্মের অচিৎ শক্তি 'প্রকৃতি' বা 'প্রধান' থেকে যেরূপ সর্বপ্রথম সৃষ্ট হয় 'মহৎ', এবং তার থেকে ক্রমান্বয়ে অন্যান্য জড়বস্তু, জীবের স্থূলদেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ মন প্রভৃতি—ঠিক তেমনি ব্রহ্মের চিৎ-শক্তি থেকে সর্বপ্রথম সৃষ্ট হন হিরণ্যগর্ভ; এবং তাঁর থেকে, অন্যান্য জীব, তাঁদের সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ দেহ প্রভৃতি। সেজন্য হিরণ্যগর্ভকে বলা হয় ব্রহ্মের সাক্ষাৎ পরিণাম, প্রতিচ্ছবি ও প্রতিনিধি। সচ্চিদানন্দস্বরূপ, অনন্ত-অচিন্ত্য-শক্তিমান ব্রহ্ম হঠাৎ সাক্ষাৎভাবে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হ'লে তা হয়ত তাঁর প্রচণ্ড তেজ এবং অবর্ণনীয় মহিমা গরিমা সহ্য করতে পারবে না—এই ভেবেই প্রাচীন ঋষিগণ ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মাণ্ডের

মধ্যে যোগসূত্ররূপে মিলনসেতুরূপে ঐক্যধারারূপে হিরণ্যগর্ভকে সংস্থাপিত করেছিলেন পরম-গৌরবভরে।

শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যের অতুল জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে সন্তুষ্টচিত্ত গুরু উদ্দালক আরুণি বললেন, 'যাজ্ঞবল্ক্য! এ এরূপই বটে ("এতৎ এবম্ এব")। এখন অন্তর্যামীর কথা বল।'

পরমপ্রজ্ঞাধন্য যাজ্ঞবল্ক্য তখন 'অন্তর্যামী' সম্বন্ধে যে অপূর্ব প্রপঞ্চনা দান করলেন, ভারতীয় দর্শনে তা প্রাণস্বরূপ হয়ে আদ্যন্ত বিরাজিত। তিনি 'অধিদৈবত', 'অধিভূত', এবং 'অধ্যাত্ম'—এই তিনটি দিক থেকে এই বিষয়ে বললেন—অবশ্য ঠিক সেই একই কথা বারংবার। এরূপে 'অধিদৈবত' অথবা দেবতা-বিষয়ক দিক থেকে তিনি প্রথমেই বললেন পৃথিবীর কথা—

'যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবী-মন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।'

(৩।৭।৩)

'যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত, (অথচ) পৃথিবী যাঁকে জানে না; পৃথিবী যাঁর শরীর, এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরে থেকে যিনি পৃথিবীকে নিয়মিত করছেন—তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী এবং অমৃত, অথবা অমর অথবা জন্মমরণহীন।'

এই 'অধিদৈবত' দিক থেকে যাজ্ঞবল্ক্য তারপরে ক্রমান্বয়ে আরো এগারোটি বস্তুর বিষয়ে ঠিক সেই একই কথা বললেন। তারা হ'ল—জল অগ্নি অন্তরিক্ষ বায়ু দ্যুলোক আদিত্য দিক্‌সমূহ চন্দ্র-তারকা আকাশ অন্ধকার ও তেজ।

তারপরে 'অধিভূত' অথবা পার্থিব ভূত-সংক্রান্ত দিক থেকে তিনি ঠিক সেই একই কথা বললেন—সর্বভূতের বিষয়ে—'যঃ সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্' ইত্যাদি। 'যিনি সর্বভূতে অবস্থিত' ইত্যাদি।

পরিশেষে তিনি 'অধ্যাত্ম' অথবা জীবের দিক থেকে ঠিক সেই একই কথা বললেন আটটি বস্তুর বিষয়ে। তারা হ'ল—প্রাণ বাক্ চক্ষু শ্রোত্র মন ত্বক্ বিজ্ঞান ও জীববীজ—'যঃ প্রাণে তিষ্ঠন্' ইত্যাদি। 'যিনি প্রাণে অবস্থিত' ইত্যাদি।

এরূপে এস্থলে যাজ্ঞবল্ক্য সর্বসমেত একুশবার একুশটি বস্তুর বিষয়ে সেই একই কথা বারংবার বললেন। তার সারমর্ম হ'ল এই যে—দেবতা জীব ও জগৎ—এই তিনটি তত্ত্বের মধ্যে সর্বত্রই সর্বদাই সর্বাবস্থাতেই সেই একই মহাসত্য পরমতত্ত্ব চরমসত্তা নিহিত হয়ে আছেন—পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম। তিনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী আত্মাস্বরূপ; এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই তাঁর দেহস্বরূপ। সেজন্য, সুবিখ্যাত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক রামানুজের ন্যায় যাজ্ঞবল্ক্যও বলছেন যে, ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধ শরীরী ও শরীর, আত্মা ও দেহের সম্বন্ধের অনুরূপ।

আত্মা ও দেহের সম্বন্ধের মূল কথা কি? মূল কথা হ'ল এই যে—

(১) আত্মা দেহের মধ্যে অবস্থিত, অথচ দেহ আত্মাকে জানে না; কারণ—

(২) আত্মা দেহের মধ্যে অবস্থিত হলেও দেহ থেকে ভিন্ন; এবং—

(৩) আত্মা দেহের মধ্যে অবস্থিত হয়ে দেহকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করছেন।

সেজন্যই তাঁর নাম 'অন্তর্যামী' এবং তিনি দেহ থেকে ভিন্ন ব'লে দেহের অভ্যন্তরে থেকেও দেহের ন্যায় জন্ম-জরা-মরণাদি ষড়্-বিকারের অধীন নন এবং সেজন্যই তিনি

'অমৃত'।

এস্থলে অবশ্য আত্মা ও দেহের উদাহরণ দ্বারা ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অভেদ অপেক্ষা ভেদই অধিকতর সূচিত হয়েছে; এবং আমরা জানি যে, রামানুজের 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে'র বিরুদ্ধে এটি একটি প্রধান আপত্তি।

সে যাহোক, জীবজগৎ ব্রহ্মের দেহ, তিনি তাদের আত্মা; জীবজগৎ ব্রহ্মের মূর্তরূপ, তিনি তাদের প্রাণ—এই ভাবটিও ত কম মধুর নয়, কম গৌরবের নয়, কম আনন্দের নয়। বিশেষ ক'রে আজ শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার শুভলগ্নে, আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি শ্রীশ্রীমাতৃলীলার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ শ্রীশ্রীচণ্ডীর সেই অমৃতরসঘনা আশার বাণী—

'নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্।' (১৬৪)

'তিনি অবশ্যই নিত্যা, [তথাপি] এই [অনিত্য] জগৎপ্রপঞ্চই তাঁর বিরাট মূর্তি; এবং সব কিছুই তাঁর দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে।'

'আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।' (১১।৪)

'পৃথিবীরূপে বিরাজিতা ব'লে একাকিনী আপনিই জগতের আধারস্বরূপা।'

সমগ্র পৃথিবীতে যে পরমা জননী ব্যতীত আর কিছুই নেই—অন্তরে-বাহিরে জীবে-জগতে একমাত্র তিনিই বিরাজিতা—তাঁর অনন্ত সৌন্দর্য-মাধুর্য-ঐশ্বর্য নিয়ে, তাঁর অসীম স্নেহ-সেবা-করুণা নিয়ে, তাঁর অপরিসীম জ্ঞান-শক্তি-কৃতি নিয়ে—এই মহাতত্ত্বই ত শ্রীশ্রীমাতৃ-পূজার মর্মোত্থ বাণী। এই মধুময়ী বাণীই আজ আমাদের হৃদয়বীণাতন্ত্রে রণিত অনুরণিত হোক অহরহ মধুরতম মোহনতম তানে লয়ে ছন্দে। ওঁ শান্তিঃ।

ধর্মীয় বিরোধ ও যুক্তি

ডক্টর শিবপদ চক্রবর্তী*

ধর্মীয় ভাবনা প্রসঙ্গে কোন কোন পণ্ডিত যুক্তিবিচারকে কাকদন্তপরীক্ষার মতো নিষ্ফল বললেও অন্যেরা বলেন—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য নৈব কার্যা বিচারণাঃ।
যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে॥

এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সম্পর্কে আমরা কেবল আবেগ বা উদ্দীপনাকেই আশ্রয় করি, আদৌ যুক্তিবিচার করি না—এমন হয়তো বলা যায় না। এ কথা যদি ঠিক হয়, তা হলে ঐ যুক্তি-শৃঙ্খলের স্বরূপই বা কি, আর ধর্মীয় চিন্তায় বিরোধ উপস্থিত হলে যুক্তি কতটা ঐ বিরোধ দূর করতে সক্ষম—এ আলোচনা উপাদেয় হতে পারে

ধর্মপ্রাণ উপাসকেরা ঈশ্বর সম্পর্কে কতকগুলি বিশ্বাস পোষণ করেন এবং জীবনে ঐ বিশ্বাসের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন। ভগবানের অস্তিত্ব, তাঁর জগন্নিয়ামকত্ব, তাঁর অনন্তজ্ঞান, অনন্ত প্রেমময় এবং মঙ্গলময় স্বরূপ ইত্যাদিতে সকল সম্প্রদায়ের উপাসকেরাই, স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে, বিশ্বাস স্থাপন করে থাকেন। আবার অন্যেরা এ সব বিশ্বাসের বিরোধীও হতে পারেন। ধর্মবোধের এই সাধারণ বিশ্বাসগুলিকে আমি

* এম. এ., ডি. লিট্.। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনবিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান।

'মৌলিক' বা 'মুখ্য' বিশ্বাস বলতে চাই ; আর এগুলিকে বিশেষ বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের বিশেষ বিশ্বাসের থেকে ভিন্ন বলতে চাই। এ ধরনের বিশেষ বিশ্বাসের উদাহরণ হলো যীশুর অ-লৌকিক জন্ম বা তাঁর মৃতাবস্থা থেকে উত্থান যা কেবল খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরাই বিশ্বাস করেন; অথবা হিন্দুসম্প্রদায়ের বিশ্বাস যে 'শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অবতার' বা 'প্রাণায়ামের সাহায্যে নির্বাধ ঘণ্টাধ্বনির মতো ওঁকারধ্বনিকে হৃৎপদ্মে স্থাপিত করলে ঐ ওঁকার অলৌকিক শক্তির ব্যঞ্জক হয়।' এই সম্প্রদায়গত বিশ্বাস-গুলিকে আমি 'গৌণ' বিশ্বাস বলব আর এদের আলোচনা এ প্রবন্ধে থাকবে না। এই গৌণ বিশ্বাসগুলো রয়েছে আর তাদের সত্যতার দাবিও রয়েছে ; অথচ তাদের স্থাপনে বা নিরাকরণে কোন সুদৃঢ় যুক্তি আছে কি না আমি জানি না। এই গৌণ বিশ্বাসগুলি স্বভাবতঃই বিশেষ সম্প্রদায়ের বিশেষ শাস্ত্রকে আশ্রয় করে, আর দুর্ভাগ্যবশতঃ সম্প্রদায়গত অসহিষ্ণুতা উৎপন্ন করতে চায়। কিন্তু 'মৌলিক' ধর্মীয় বিশ্বাসগুলিকেও অবহেলা করলে মনুষ্যজীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হয়তো বাদ পড়ে যাবে। এই 'মৌলিক' বা 'মুখ্য' বিশ্বাসগুলির সমর্থনে কি ধরনের যুক্তি সার্থক, তার আলোচনাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ভারতবর্ষ এক সুবিশাল ধর্মপ্রাণ মহাদেশ। এ দেশ জুড়ে রয়েছে কতশত তীর্থস্থান দেব-মন্দির গির্জা মসজিদ গুরুদ্বার ফকিরের দরগা পুণ্যতোয়া নদনদী পবিত্র কূপ 'পুণ্যিপুকুর' প্রভৃতি উপাসনাস্থল ; পূজা পার্বণ ব্রত উপবাস মন্ত্র দীক্ষা জপ তপ তুলসীচন্দনের তো কথাই নেই। ভারতবর্ষই বোধ হয় একমাত্র দেশ যেখানে একটি দেবমন্দিরের আয় দিয়ে একটি প্রথমশ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়নির্বাহ হয় আর এই দেশে উত্তেজিত ভিড়ের মধ্যে পদদলিত হয়ে হাজার হাজার তীর্থযাত্রী মারা গেলেও কুম্ভমেলায় জনসমাগম কিছু কম হয় না। যে সব অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত নরনারী তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ান, অনেক ঝুঁকি নিয়ে দুরধিগম্য পর্বতগাত্রে রক্ষিত দেববিগ্রহের দর্শনে ছোটেন, সেই সব সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষ অবশ্যই তাঁদের বিশ্বাসের যুক্তিবিচারে প্রবৃত্ত হবেন না। একমাত্র উচ্চশিক্ষিত, বিদগ্ধ ব্যক্তিরাই এই যুক্তিবিচার উপাদেয় মনে করতে পারেন।

কোন বিশ্বাসকে বিচারসহ হতে হলে তাকে তিনটি শর্ত পালন করতে হয়ঃ (১) তাকে একটি অর্থবান, সুসংহত বাক্যে প্রকাশ করতে হবে। 'শনিবার আর রবিবার ফুটবল খেলা দেখতে গেছে'—এ বাক্য সুসংহত সার্থক বাক্য নয়। ধর্মপ্রবক্তার বাক্য এমন হলে বিচার চলে না। (২) ঐ বিশ্বাসের বিরোধী বিশ্বাসকেও অর্থবান বা সম্ভব হতে হবে। ধর্মবিশ্বাস যদি গণিতের মতো সর্বজন-গ্রাহ্য হতো তা হলে যুক্তিবিচারের প্রশ্নই উঠত না। (৩) ঐ বিশ্বাসবোধক বাক্যকে বিবৃতি- বা বর্ণনা-মূলক হতে হবে যথা, 'ঈশ্বর মঙ্গলময়'; অনুজ্ঞা হলে চলবে না। 'জানাকে জেনে নিয়ে জানার পথে এগিয়ে যাও'—যদি অর্থবান হয়ও, তবু যেহেতু এটি অনুজ্ঞা, এর যুক্তিবিচার হয় না।

মনে করুন দুজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কোন গল্পের দুটি চরিত্র আলোচনা করছেন। উভয়েই গল্পটি পড়েছেন। প্রথম ব্যক্তি বললেন, 'মেয়েটি ছেলেটিকে ঘৃণা করে।' দ্বিতীয় ব্যক্তি বিরোধী বিশ্বাসে বললেন, 'না, মেয়েটি ছেলেটিকে ভালবাসে।' এই দুই বাক্যই

অর্থবান ও বর্ণনামূলক। এরা পরস্পর-বিরোধী বলে এক মত সমর্থন ও অন্য মত নিরাকরণের প্রশ্ন রয়েছে। গল্পটি আবার দুজনেই মনোযোগ দিয়ে পড়লেন; আলাদা আলাদা ঘটনাগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করলেন; তবু হয়তো প্রথম ব্যক্তি গল্পের সামগ্রিক ছকের মধ্যে এমন কিছু দেখেছেন, যা অপরে দেখতে পাননি। এখন যদি প্রথম ব্যক্তি গল্পের কাঠামো আর সামগ্রিক নির্মাণ-কৌশলের মধ্যে সেই উপাদানটি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখিয়ে দিতে পারেন, তা হলে হয়তো বিরোধ দূর হতে পারে। সমগ্রের মধ্যে যে রূপ ফুটে ওঠে অংশের মধ্যে তা হয়তো দেখা দেয় না। সকলেই জানেন যে, মিশনারী কলেজের ছাত্র নরেন্দ্রনাথ দত্ত এক সময়ে সাধারণ ধর্ম-বিশ্বাসের যৌক্তিক ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল বলে মনে করতেন। তবে তাঁর মতো উচ্চশিক্ষিত দৃঢ়মনোভাবাপন্ন মানুষও কি করে অবিশ্বাস থেকে বিশ্বাসে উপনীত হয়েছিলেন, ভেবে দেখতে হবে। তিনি অবশ্যই এই বিশ্ব-প্রকৃতির সুসংহত ছন্দের মধ্যে, তার সামগ্রিক রূপের মধ্যে, সদ্‌গুরুর কৃপায় এমনকিছু দেখতে পেয়েছিলেন, যা অধিকাংশ মানুষ দেখে না; তাই অবিশ্বাস থেকে বিশ্বাসে উত্তরণ।

আমাদের যুক্তি বিষয়ভেদে ভিন্ন প্রকারের হয়। অঙ্কশাস্ত্রের যুক্তি পদার্থবিদ্যায় সর্বত্র প্রাসঙ্গিক নয়। জল বায়ু অগ্নি তেজ বিদ্যুৎ শৈত্য প্রভৃতি জগতের অস্তিত্ববান পদার্থগুলি প্রত্যক্ষ অনুভবগম্য। পদার্থবিদ্যায় বা রসায়ন-শাস্ত্রে, প্রাকৃতিক নিয়মের প্রমাণে যে যুক্তি, তা ঐ নিয়মের দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষকে আশ্রয় করে। যথা ভূয়োদর্শনের দ্বারা নানা দৃষ্টান্তে, উত্তাপ বস্তুর প্রসার ঘটাচ্ছে দেখে, 'সর্বক্ষেত্রে উত্তাপ পদার্থের প্রসার ঘটায়' এই সাধারণীকৃত প্রাকৃতিক নিয়মকে, অন্তত: সম্ভব বলে, প্রমাণ করা যায়। অথচ অঙ্কশাস্ত্রের উপাদান-গুলি (০, ১, ১৩, ত্রিভুজ ইত্যাদির ধারণা) প্রত্যক্ষগম্য নয়। তাই এখানকার যুক্তি প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ হবে। এরূপ যুক্তিতে যখন প্রমাণ হয় যে, 'ত্রিভুজের তিনটি অন্তঃস্থ কোণ দুই সমকোণের সমান', তখন এই গাণিতিক নিয়মের বিরোধ সম্ভব হয় না।

ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে উপরের কোন যুক্তিই প্রাসঙ্গিক নয়। ধরা যাক কোন এক ভদ্রলোক দাবি করলেন যে, তাঁর জীবন ঈশ্বরের কৃপাধন্য। এই দাবির সমর্থনে তিনি কতক-গুলো প্রত্যক্ষগম্য দৃষ্টান্ত উপস্থিত করলেন। তিনি তাঁর অবিশ্বাসী বন্ধুকে বললেন যে, ছোটবেলায় তিনি কাশী দশাশ্বমেধ ঘাটে একবার ডুবে যাচ্ছিলেন আর এক হিন্দুস্থানী পানওয়ালা তাঁকে উদ্ধার করে। পরে অন্যান্য দুর্ঘটনাতেও তিনি অযাচিত সাহায্য লাভ করেছেন। তাঁর গবেষণা-পত্র সহজেই তাঁর উপাধি এনেছে, তাঁর ছেলেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র হয়েছে, সংসারে কোথাও কোন অনটন নেই ইত্যাদি। এর উত্তরে তাঁর অবিশ্বাসী বন্ধু তাঁকে পাল্টা বলতে পারেন যে, তিনি (প্রথম ব্যক্তি) অনেক অহেতুক দুঃখ বরণ করেছেন, তাঁর কোন এক আত্মীয় রেলদুর্ঘটনায় মারা গেছে ইত্যাদি। সহজেই বোঝা যায় যে, এই বিরোধী ঘটনাগুলি ভগবৎকৃপাতে বিশ্বাসকে অপ্রমাণও করে না বা শতসহস্র প্রত্যক্ষগম্য ব্যাপার-স্যাপারও ঐ অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরানুগ্রহের প্রমাণেও পর্যাপ্ত নয়। প্রত্যক্ষগম্য সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষগম্য গ্রহরত্ন, কবচ ইত্যাদি সম্পর্কস্থাপনেরও কোন উপায় নেই, অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরানুগ্রহ তো দূরের কথা।

জ্যামিতির উপপাদ্যের উপপাদনে আমরা যে যুক্তিকে আশ্রয় করি তা প্রত্যক্ষগম্য দৃষ্টান্ত-সংগ্রহ নয়। গাণিতিক সত্যের বিরোধ-কল্পনা অসম্ভব; কিন্তু দৃষ্টান্তের ভূয়োদর্শনলব্ধ প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম কল্পনা করা যায়। ভবিষ্যতে বা অতিদূরস্থ নক্ষত্ররাজিতে উত্তাপ যদি পদার্থকে প্রসারিত না করে তবে আমরা আশ্চর্য হবো না। কিন্তু ৭+৫=১২—এই গাণিতিক সত্য অবিসংবাদী। ধর্ম-বিশ্বাস কিন্তু গণিতের মতো অবশ্যম্ভব নয়। ভক্তের বিশ্বাস 'ঈশ্বর করুণাময়'; এর বিরোধী বাক্য 'ঈশ্বর নিষ্করুণ' স্ববিরোধী নয় আর অনেকে তা বিশ্বাস করতে পারে। তাছাড়া অস্তিত্ববান পদার্থ সম্পর্কে গণিতের প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ যুক্তি একান্তই নিরর্থক, অথচ ঈশ্বরকে অস্তিত্ববান বলে না মানলে ধর্মবোধের মূলোৎপাটন হয়ে যায়। নান্দনিক ললিত-কলার যে আদর্শ 'সৌন্দর্য' তা কাল্পনিক হলেও, সহৃদয় রসবেত্তার রসবোধ ব্যাহত হয় না। ধর্মবোধ কিন্তু আরাধ্যকে বাস্তব বলেই মানবে। তাই এই রকমের অস্তিত্ববান পদার্থ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ গাণিতিক যুক্তির প্রাসঙ্গিকতা দার্শনিকেরা স্বীকার করেন না। ঈশ্বরের মঙ্গলময় স্বরূপ বা কৃপাময়তা কোন জ্যামিতিক উপপাদ্য নয়

তাই মনে হয় যে, ধর্মীয় বিরোধ অন্য কোন তৃতীয় প্রকারের যুক্তির সাহায্যে নিরাকৃত হতে পারে। যে বিশাল বিশ্বপ্রকৃতি আমাদের চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে, তা কোন ভাবুকের কাছে কখনো-সখনো একটা ধাঁধার ছবি বলে মনে হতে পারে। শিশুদের বইতে অনেক মজার ছবি থাকে। প্রথম দৃষ্টিতে হয়তো পর্বতমালা, একটা নদী ও গাছপালা দেখা যায়; কিন্তু মনোযোগ দিয়ে দেখলে ঐ ছবির এখানে-ওখানে কুকুরের মুখ উঁকি মারতে থাকে। ঠিক তেমনি এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে কোন রহস্য রয়েছে, সাধারণ দৃষ্টিতে যার প্রকাশ নেই, অথচ ভাবুকের তত্ত্বদৃষ্টিতে তা প্রকট হতে পারে। এই অপার্থিব আলো কেবল দরদীর চোখকেই বিমুগ্ধ করে। ইস্পাত কারখানায় সাধারণ মানুষ যেখানে একটা একটানা পীতাভ দ্যুতি দেখতে পায়, কোন সুদক্ষ কারিগর হয়তো সেখানে নানা বর্ণের বর্ণালী দর্শন করে। এমন বর্ণালী দর্শনের জন্য অভ্যাস শিক্ষা ও অনুশীলন প্রয়োজন। তেমনি যে তত্ত্ব 'নিহিতং গুহায়াম্', যে গলিত অবস্থায় সমগ্র বিশ্বচরাচরে মিশে রয়েছে, তাকে তার 'গলন' থেকে তুলে নিয়ে পৃথক্ করে গ্রহণ করতে হলে বিশেষ প্রযত্ন দরকার। তত্ত্ববিচার তত্ত্বের এই পৃথক্-করণ করতে সাহায্য করে; ঐ বিচার বা যুক্তি প্রামাণ্যযুক্তি নয়। দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্বসাধক যে যুক্তিগুলো দেখা যায়, কাণ্ট্ সেগুলিকে 'প্রমাণাভাস' বলেছেন। তবু যুক্তিবিচারের অন্য কোন সার্থকতা থাকতে পারে। উপনিষদে 'শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনে'র নির্দেশ রয়েছে। এই 'মনন' একপ্রকার যুক্তিবিচার, আর আমার মনে হয় যে, ঐ বিচার শ্রৌত বিশ্বাসের প্রামাণ্যা-প্রামাণ্যের স্থাপনে সমর্থ নয়। ঐ মননের উদ্দেশ্য হলো কোন বিশেষ প্রত্যয় বা দৃষ্টিভঙ্গীর অস্পষ্ট অগভীর বোধকে সুস্পষ্ট বা গভীর করে তোলা। বিশ্বচরাচরের মধ্যে অনুরণিত এক কেন্দ্রীয় প্রত্যয়ভূমিতে অধিষ্ঠিত করার জন্যও যুক্তি প্রদর্শিত হতে পারে; আর ঐ কেন্দ্র-প্রত্যয়ের সাহায্যে, সমগ্রের মধ্যে আপাত-দৃষ্টিতে যা কিছু বিচ্ছিন্ন, যা কিছু দুর্বোধ্য, তাদের এক সুসংহত ছন্দের অঙ্গ হিসেবে

ব্যাখ্যা করা যায়। উপনিষদে দেখতে পাই জিজ্ঞাসু শিষ্য গুরুর কাছে প্রশ্ন নিয়ে এসেছে; গুরু শিষ্যের অপরিণত বুদ্ধিকে নানাভাবে, নানা দিক থেকে ধাক্কা দিতে থাকেন, যাতে করে হঠাৎ সেই চিত্তচমৎকারী মূল প্রত্যয়-ভূমিতে শিষ্য অধিষ্ঠিত হয়ে যায়। এই 'মনন' বা যুক্তি-বিচারের কাজ হচ্ছে কোন সন্দিগ্ধ চিত্তকে এমন এক কেন্দ্রীয় প্রত্যয়ভূমিতে অধিষ্ঠিত করে দেওয়া যার আলোকে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি এক নূতন ব্যঞ্জনায় অভিষিক্ত হয়ে নবকলেবর ধারণ করে।

তাই আমরা দুরকমের যুক্তির কথা বলব: (ক) প্রমাণের যুক্তি, যা দিয়ে কোন মতের প্রতিষ্ঠা বা অপ্রতিষ্ঠা হয়, আর (খ) বিস্তারের যুক্তি, যা সংশয়াচ্ছন্ন কোন সর্বাত্মক প্রত্যয়ের দিকে সন্দিগ্ধ চিত্তকে ঘুরিয়ে দিতে সাহায্য করে। ধর্মীয় বিরোধে এই বিস্তারের যুক্তিই সার্থক হতে পারে। যুক্তির এই বিস্তারের ফলে, বুদ্ধির অগভীর থেকে গভীর, গভীর থেকে গভীরতর, গভীরতর থেকে গভীরতম প্রদেশে আমাদের দৃষ্টি সংসর্পিত হতে পারে, আর আমরা কোন সূক্ষ্মভূমিতে অধিষ্ঠিত হতে পারি। এ রকমের যুক্তিতে, যে গভীর প্রত্যয়টিকে উদ্‌বুদ্ধ করা অভিপ্রেত, তার বহুল দৃষ্টান্ত স্থাপন, অনবস্থা বা স্ববিরোধ প্রদর্শনে প্রতিপক্ষের যুক্তির অসারতা প্রতিপাদন, উপমার সাহায্যে নিজমতে যুক্তি উত্থাপন করতে হয়। এরূপ বিচার-বিবেচনার ফলে কোন বিশেষ ভাবুকতার স্তরলাভ হতে পারে।

প্রমাণের যুক্তি হলো এমনই যে, একটি বা দুটি যুক্তির যদি সার্থক প্রয়োগ হয়, তা হলে কোন মতের প্রমাণে, দু হাজার যুক্তির কোন প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু বিস্তারের যুক্তির যত প্রসার, তত তার উপাদেয়তা। যত বিভিন্ন স্থানে, যত বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে ভগবানের কথা যত বেশী হবে ততই তা হবে সার্থক। 'যেখানেই ঈশ্বর-কথা / সেখানেই আসন পাতা' হলে, 'যেখানেই নাম/সেখানেই ধাম' করতে পারলে, নানারকমে সংশয়-নিরাস, আত্মজিজ্ঞাসা, বিশ্বজিজ্ঞাসা, বিশ্ব-প্রকৃতির সামগ্রিক ছকের মূল প্রত্যয়টির অনুধাবনের চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ এক চিত্তচমৎকারী আত্মিক ভূমি প্রকট হতে পারে। জিজ্ঞাসু শিষ্য ও প্রেমময় গুরুর মধ্যে বাদানুবাদ বা মতবিরোধ হতেই পারে; কিন্তু তার মধ্যে দ্বেষ বা বিজিগীষা থাকে না। এঁদের মধ্যে নানাভাবে কথা হতে হতে শিষ্য যখন গুরুর অনুভূতির স্তরে পৌঁছে যায়, তখন আর শিষ্যের কোন সংশয় থাকে না। আমার মনে হয় যে, এই রকমের 'মনন' বা বিস্তারের যুক্তি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে সাহায্য করে এবং পরোক্ষভাবে ধর্মীয় মতভেদ দূর করতে পারে।

আর একটি কথা। তত্ত্বদৃষ্টি লাভ হলে কোন অজানা তথ্য আবিষ্কৃত হয় না—জানা-বিষয়কেই এক নূতন প্রত্যয়ভূমি থেকে নূতন করে জানা হয় মাত্র। তত্ত্ব অতি সরল, স্বতঃপ্রকাশ, বিশ্বচরাচরে 'গলিত' অনুস্যূত হয়ে রয়েছে; এই 'গলন'কে অপসারণ করে, পৃথক্-করণের সাহায্যে, স্বতঃপ্রকাশকে স্বতঃ-প্রকাশ বলে উপলব্ধি করার দিকে নিয়ে যায় 'মনন' বা যুক্তিবিস্তার। কোন তত্ত্বের অতি সহজ সারল্যই কখনো কখনো বিষম কঠিন ও জটিল আকার ধারণ করে। নচিকেতাকে যম বলছেন যে, সৌক্ষ্ম্যবশতঃ তত্ত্ব সাধারণ্যে প্রকাশিত হয় না (কঠোপনিষৎ)। অথচ অতিসারল্যে ও স্বচ্ছতায় তা সর্বত্র অবস্থান করে। ঠিক এইভাবেই সর্বত্র প্রসারিত

সূর্যালোক, স্বচ্ছতাবশতঃ, আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না; পরন্তু ঐ আলোকে উদ্‌ভাসিত বৃক্ষ-লতাদিই আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়। প্লেটো বলেছেন যে, তত্ত্ববিচারের দ্বারা মনশ্চক্ষু সূর্যের দিকে ঘুরে যায়, দৃষ্টিভঙ্গী পালটায়, আর যা অপ্রকটভাবে স্বতঃসিদ্ধ হয়ে আছে, তাই করামলকবৎ প্রত্যক্ষ হয়ে যায়। এ এক প্রকারের 'প্রাপ্তপ্রাপ্তি'—নূতন কিছু পাওয়া নয়। নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা বৈজ্ঞানিক জগতে নূতনের সন্ধান দিয়ে জ্ঞানরাজ্যের সীমা বিস্তৃত করে চলেছে—কিন্তু তা অনাত্ম বিষয়ের জ্ঞান; আত্মবস্তু ঐ জ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকে। ধর্মীয় প্রসঙ্গে যুক্তিবিস্তার হয়তো ঐ প্রচ্ছন্ন তত্ত্বকে প্রকট করতে পারে। গ্রীক দার্শনিক সক্রেতিশ এই প্রাপ্তপ্রাপ্তির এক চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, সদ্‌গুরুর কাজ অনেকটা ধাই-এর মতো। মায়ের কুক্ষিগত বাঞ্ছিত সন্তানকে প্রকট করে ধাই মাকেই তা ফিরিয়ে দেয়। এতে করে মা যেন তাঁর আপন জিনিসই আরো সাক্ষাৎ-ভাবে ফিরে পান। যুক্তি-বিস্তারের ফলেও যা অপ্রকটভাবে সব সময়েই রয়েছে, তা প্রকট হতে পারে, আর সংশয়ের নিরসন হতে পারে।

শঙ্করাচার্যের 'বিবেকচূড়ামণি' ও বিবেকানন্দের 'সখার প্রতি'

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ*

স্বামী বিবেকানন্দের কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ 'সখার প্রতি' কবিতাটি পাক্ষিক[১] পত্রিকা 'উদ্বোধনে'র মাঘ, ১৩০৫, প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় (১৫ই মাঘ) প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যাটি দু'বার মুদ্রিত হয়েছিল। তার কারণ, 'সখার প্রতি' কবিতার পাঠভেদ। একটি মুদ্রণে সমগ্র কবিতাটির কয়েকটি চরণ বর্জিত এবং 'পক্ষহীন শোন বিহঙ্গম' স্থলে 'লক্ষ্যহীন' পাঠ। অন্য মুদ্রণে বর্তমানে প্রচলিত পূর্ণাঙ্গ কবিতা এবং 'লক্ষ্যহীন' স্থলে 'পক্ষহীন' পাঠ।

বর্তমানে কবিতাটির পাণ্ডুলিপির যে প্রতিচ্ছবি 'বাণী ও রচনায়'[২] রয়েছে, তাতে ভালোভাবে লক্ষ্য করলে 'পক্ষহীনে'র পক্ষ অংশটির জায়গায় 'লক্ষ্য' পুনর্লিখনের চেষ্টা দেখা যায়। এটি স্বামীজীর নিজের সংশোধন কি না বলা কঠিন। কিন্তু আমরা যে মুদ্রণটিতে পুরো কবিতাটি পেয়েছি, সেইটিই এখন

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের অধ্যাপক। 'বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য' বিষয়ে গবেষণাগ্রন্থের জন্য উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. লিট. উপাধি প্রাপ্ত। 'ভারতাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ', 'উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য' এবং 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলাসাহিত্য'—ইঁহার অপর তিনটি বিশিষ্ট গ্রন্থ।

১ প্রথম বর্ষ থেকে নবম বর্ষ অবধি 'উদ্বোধন' পাক্ষিক পত্রিকা ছিল। দশম বর্ষ (মাঘ, ১৩১৪—পৌষ, ১৩১৫) থেকে 'উদ্বোধন' মাসিকরূপে প্রকাশিত।

২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড দ্রষ্টব্য।

প্রামাণ্যরূপে স্বীকৃত এবং মূল পাণ্ডুলিপির সঙ্গে তার মিলই বেশী। †

কবিতাটিতে বিবেকানন্দজীবনসাধনার সংক্ষেপিত রূপায়ণ এবং গভীরতম উপলব্ধির অনবদ্য আভাসন। সমগ্র কবিতাটি পর্যালোচনা করতে গেলে এ কবিতার পটভূমিতে বেদান্তবাদী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসী-সত্তার আদি প্রেরণা আচার্য শঙ্করের কথা স্বভাবতঃই মনে জাগে। শঙ্করাচার্য থেকে বিবেকানন্দ—ভারতীয় মানসে বেদান্ত-উপলব্ধির অবিচ্ছিন্ন ধারায় আধ্যাত্মিক সাধনার তুঙ্গশিখর যেমন বারংবার আমাদের দৃষ্টিকে মুগ্ধ করে, তেমনি বিস্মিত করে অনুভূতির বাঙ্ময় প্রকাশে এ দুই মহাসাধকের বাণীসৌন্দর্য। ইন্দ্রিয়াতীত অনুভবের সৌন্দর্য কেমন করে কবিতা হয়ে ওঠে এক উপনিষদে তার অজস্র প্রমাণ। সে প্রমাণ শঙ্করাচার্যের নির্বাণষট্‌ক, কৌপীনপঞ্চক, দক্ষিণামূর্তিস্তোত্র, বিবেকচূড়ামণি—এমনি সব স্তোত্র ও মন্ত্রমালায় ভাব ও ভাষার অনন্ত ইঙ্গিত নিয়ে প্রকাশিত। বিশেষভাবে 'বিবেকচূড়ামণি'র ভাব, ভাষা ও প্রেরণা সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে কতোভাবে অনুপ্রাণিত করেছে, তাঁর বাণী ও রচনাবলীতে তার অনেক উদাহরণ। স্বামীজীর একটি অবিস্মরণীয় পত্র থেকে সে-বিষয়ে উদাহরণ সর্বাগ্রে স্মরণ করি।

স্বামীজীর 'পত্রাবলী'তে স্বামী অখণ্ডানন্দজীকে লেখা ফেব্রুআরি, ১৮৯০ তারিখের পত্রটিতে৩ বুদ্ধ ও শঙ্করপ্রসঙ্গ অপূর্ব বিশ্লেষণে ব্যাখ্যাত। এই পত্রটিরই প্রান্তভাগে পরিব্রাজক অখণ্ডানন্দকে স্বামীজী ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির আচরণ সম্বন্ধে 'বিবেকচূড়ামণি'তে আচার্য শঙ্কর যা লিখেছেন, তার তিনটি শ্লোক তুলে দিয়েছেন :

চিন্তাশূন্যমদৈন্যভৈক্ষমশনং
পানং সরিদ্বারিষু
স্বাতন্ত্র্যেণ নিরঙ্কুশা স্থিতিরভী-
র্নিদ্রা শ্মশানে বনে।
বস্ত্রং ক্ষালনশোষণাদিরহিতং
দিগ্বাস্ত শয্যা মহী
সঞ্চারো নিগমান্তবীথিষু বিদাং
ক্রীড়া পরে ব্রহ্মণি॥
বিমানমালম্ব্য শরীরমেতদ্
ভুনক্ত্যশেষান্ বিষয়ানুপস্থিতান্।
পরেচ্ছয়া বালবদাত্মবেত্তা
যোঽব্যক্তলিঙ্গোঽননুষক্তবাহ্যঃ॥
দিগম্বরো বাপি চ সাম্বরো বা
ত্বগম্বরো বাপি চিদম্বরস্থঃ।
উন্মত্তবদ্বাপি চ বালবদ্বা
পিশাচবদ্বাপি চরত্যবন্যাম্॥

[বিবেকচূড়ামণি, ৫৩৮-৪০ শ্লোক]

এই উদ্ধৃতির সঙ্গে স্বামীজী অংশটির ভাবানুবাদও দিয়েছেন—'ব্রহ্মজ্ঞের ভোজন, চেষ্টা বিনা উপস্থিত হয়—যেথায় জল, তাহাই পান। আপন ইচ্ছায় ইতস্ততঃ তিনি পরিভ্রমণ করিতেছেন—তিনি ভয়শূন্য, কখন বনে, কখন শ্মশানে নিদ্রা যাইতেছেন; যেখানে বেদ শেষ হইয়াছে, সেই বেদান্তের পথে সঞ্চরণ করিতেছেন। আকাশের ন্যায় তাঁহার শরীর, বালকের ন্যায় পরের ইচ্ছাতে পরিচালিত; তিনি কখন উলঙ্গ, কখন উত্তমবস্ত্রধারী, কখনও জ্ঞানমাত্রই আচ্ছাদন, কখন বালকবৎ, কখন উন্মত্তবৎ, কখন পিশাচবৎ ব্যবহার

† 'সখার প্রতি' কবিতার পাণ্ডুলিপি-চিত্র দ্রষ্টব্য।

৩ বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড : ২য় সংস্করণ : পৃঃ ৩১৫-৩১৬

করিতেছেন।'

এই ভাবানুবাদটুকুর পরে পরম স্নেহের গঙ্গাধরের উদ্দেশে স্বামীজীর সানুরাগ কৌতুকে নির্দেশ—'গুরুচরণে প্রার্থনা করি যে তোমার তাহাই হউক এবং তুমি গণ্ডারবৎ[৪] ভ্রমণ কর।'

ব্রহ্মবিদ্ সন্ন্যাসীর জীবন ও আদর্শের দিক থেকে 'বিবেকচূড়ামণি'র প্রভাব স্বামীজীর জীবনে ও মননে নানাভাবেই প্রভাব বিস্তার করেছে। স্বামীজীর উদ্ধৃত অংশটির সামান্য পরেই 'বিবেকচূড়ামণি'র একটি শ্লোকে স্বামীজীর পরিব্রাজকজীবনের চিত্রটিই যেন জীবন্তরূপে প্রতিভাত :

ক্বচিন্মূঢ়ো বিদ্বান্ ক্বচিদপি মহারাজবিভবঃ
ক্বচিদ্ভ্রান্তঃ সৌম্যঃ ক্বচিদজগরাচারকলিতঃ।
ক্বচিৎ পাত্রীভূতঃ ক্বচিদবমতঃ ক্বাপ্যবিদিত-
শ্চরত্যেবং প্রাজ্ঞঃ সততপরমানন্দসুখিতঃ॥

[বি. চূ. ৫৪২]

—ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিকে কখনো দেখায় অজ্ঞের মতো; কখনো তিনি বিশিষ্ট বিদ্বান, কখনো মহারাজার মতো তাঁর বিত্ত-বিভব, কখনও ভ্রান্তবৎ, কখনো সৌম্য, কখনো অজগরবৃত্তি নিয়ে নিশ্চেষ্ট, কখনো তিনি সম্মানিত, কখনো অপমানিত, কখনো বা (লোকসমাজে) একান্ত অপরিচিত—এইভাবে (সর্বাবস্থায়) সর্বদা পরমানন্দে তিনি বিচরণ করেন।

পরিব্রাজকজীবনে দুটি গ্রন্থ স্বামীজীর সঙ্গে থাকতো—গীতা এবং Imitation of Christ (ঈশানুসরণ)। সেই সঙ্গে অনুমান করা চলে গুরুপরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত আচার্য শঙ্করের উত্তরাধিকার—বিশেষভাবে 'বিবেক-চূড়ামণি'—তিনি হৃদয়ে বহন করে চলেছেন।

পরিব্রাজকজীবনের আগে স্বামীজী যখন 'নরেন্দ্রনাথ দত্ত' এই নামেই লিখছেন, তখনও 'বিবেকচূড়ামণি'র প্রভাব তাঁর রচিত গানে ছায়াপাত করেছে। শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাকের সংগৃহীত 'সঙ্গীত-কল্পতরু'র তৃতীয় সংস্করণে (জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫) নরেন্দ্রনাথের তিনটি গান সঙ্কলিত—'তাথেইয়া তাথেইয়া নাচে ভোলা' (ইংরাজী সুর—একতালা); 'নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতি' (রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়ঠেকা), 'একরূপ-অরূপ-নামবরণ' (রাগিণী খাম্বাজ—তাল চৌতাল)। 'বাণী ও রচনা'র ষষ্ঠ খণ্ডে 'প্রলয়' শিরোনামে 'নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি' গানটি এদিক থেকে স্মরণীয়। অবশ্য 'প্রলয়' ও 'সৃষ্টি' (একরূপ-অরূপ-নামবরণ) কাশীপুরে থাকাকালে স্বামীজীর সমাধি-লব্ধ অনুভূতিরই প্রকাশ।[৫] কিন্তু পূর্বসূরী শঙ্করাচার্যের সাধনোপলব্ধির সঙ্গে 'নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি'-গানটির ভাবাভঙ্গীর সাদৃশ্য এক্ষেত্রে আমাদের লক্ষণীয়। 'নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর'—এ অংশটি 'ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং'—এই উপনিষদ্‌শ্লোকের দ্বারা অনুপ্রাণিত। আমাদের অন্বিষ্ট 'বিবেকচূড়ামণি'র ভাবসাদৃশ্য গানটির পরবর্তী অংশে লক্ষণীয়।

---

৪ স্বামী অখণ্ডানন্দ স্বামীজীকে 'সুত্তনিপাতে'র গণ্ডারসুত্ত থেকে কিছু অংশ অনুবাদ করে পাঠিয়েছিলেন। "তুমি যে 'সুত্তনিপাত' হইতে গণ্ডারসুত্ত তর্জমা লিখিয়াছ, তাহা অতি উত্তম।" (উল্লেখিত পত্র)

৫ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড, স্বামি-শিষ্য-সংবাদ : ৭ম ও ১৭শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

অস্ফুট মন-আকাশে, জগৎসংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহংস্রোতে নিরন্তর ॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র 'আমি' 'আমি'—এই ধারা অনুক্ষণ ॥

'বিবেকচূড়ামণি'তে 'অহংজ্ঞানের আশ্রয় শুদ্ধ আত্মার স্বরূপ-বর্ণনায়'[৬] শ্লোক :

প্রকৃতিবিকৃতিভিন্নঃ শুদ্ধবোধস্বভাবঃ
সদসদিদমশেষং ভাসয়ন নির্বিশেষঃ।
বিলসতি পরমাত্মা জাগ্রদাদিষ্ববস্থা-
স্বহমহমিতি সাক্ষাৎ সাক্ষিরূপেণ বুদ্ধেঃ ॥

[বি চূ. ১৩৫]

—কারণ ও কার্য থেকে ভিন্ন, শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ নির্বিশেষ পরমাত্মা অখিল স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎকে প্রকাশ করে বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষিরূপে জাগ্রৎ আদি অবস্থায় 'আমি' 'আমি' এই বলে যেন নিজেকে প্রকাশ করছেন।[৭]

'বিবেকচূড়ামণি'র উদ্ধৃত শ্লোকটির দ্বিতীয়ার্ধ এক্ষেত্রে আমাদের অভিনিবেশযোগ্য —পরমাত্মা সাক্ষাৎ সাক্ষিরূপে জাগ্রৎ আদি অবস্থায় 'আমি' 'আমি'—এই বলে নিজেকে প্রকাশ করে লীলারত। স্বামীজীর "বহে মাত্র 'আমি আমি' এই ধারা অনুক্ষণ"— আমাদের ধারণায়—আত্মোপলব্ধির এই মুহূর্ত।

অবশ্য তারও পারে 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্' —অদ্বৈতানুভবের তুঙ্গশিখরে গানটির পরিসমাপ্তি।

স্বামীজীর পূর্বোল্লেখিত গান দুটি—'নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি' এবং 'একরূপ-অরূপ-নাম-বরণ' ১৮৮৬ সালের রচনা বলে মনে হয়। স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দজীর সংগৃহীত স্বামীজীর ব্যক্তিগত 'গানের খাতা'য় এ দুটি গানের স্বরলিপিসহ পাঠ স্বামীজীর স্বহস্তে লেখা রয়েছে।[৮] ১৮৮৭-র শিবরাত্রিব্রতের দিন সকালে বরাহনগর মঠে মাষ্টারমশাই শ্রীতারক (স্বামী শিবানন্দ) ও শ্রীরাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ)—এ দু'জনের কণ্ঠে নরেনের সদ্য-রচিত 'তা থৈয়া তা থৈয়া নাচে ভোলা' গানটি শুনতে পান। 'গান গাহিয়া দুইজনেই নৃত্য করিতেছেন।' (কথামৃত : ৪র্থ ভাগ : ২১শে ফেব্রুআরি, ১৮৮৭ সালের দিনলিপি।) এ গানটিও স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ-সংগৃহীত স্বামীজীর 'গানের খাতা'য় রয়েছে।

উপরের গান তিনটির পরে ১৮৯৪ খ্রীঃর গ্রীষ্মকালে স্বামীজীর আমেরিকা থেকে লেখা একটি চিঠিতে 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' কবিতাটির প্রথম দিকের অংশ ('একা আমি, হই বহু, দেখিতে আপনরূপ'—অবধি পাঠ) পাওয়া যায়। এ কবিতাটি প্রথমে ভক্ত-ভগবানের লীলাসম্বন্ধে সূচিত হ'লেও শেষ অবধি অদ্বৈতবাদী চেতনায় উত্তীর্ণ।[৯]

৬, ৭ স্বামী বেদান্তানন্দ-সম্পাদিত 'বিবেকচূড়ামণি' দ্রষ্টব্য। এ প্রবন্ধে ব্যবহৃত 'বিবেকচূড়ামণি'র উদ্ধৃতি ও অনুবাদের প্রধান উৎস এই গ্রন্থখানি।

৮ স্বামীজীর 'গানের খাতা'র সামনের পাতায় 'নরেন্দ্রনাথ দত্ত' নামে ইংরেজী স্বাক্ষর এবং তারিখ ২২শে জানুআরি, ১৮৮৬। এ প্রসঙ্গে এই 'গানের খাতা'টি অবলম্বনে স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দজীর কয়েকটি সুলিখিত সচিত্র প্রবন্ধ 'উদ্বোধন'-পত্রিকার গৌরব। এই প্রবন্ধগুলি এখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হ'লে পাঠকসমাজের বিশেষ উপকারে লাগবে।

৯ উদ্বোধন, পঞ্চম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ১লা আষাঢ়, ১৩১০-সংখ্যায় প্রথম প্রকাশ। স্বামীজীর দেহাবসানের পরে তাঁর চিঠিপত্র থেকে আবিষ্কৃত।

বাংলায় লেখা স্বামীজীর খুব সম্ভব পরবর্তী কবিতা প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা (১৫ই মাঘ, ১৩০৫) 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত 'সখার প্রতি'। এর এক বছর পরে দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১লা মাঘ, ১৩০৬-সংখ্যার 'উদ্বোধনে' 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতাটি প্রকাশিত। প্রকাশকালের এতটা পার্থক্য থেকে স্বভাবতই মনে হয় 'সখার প্রতি' আগে লেখা।

স্বামীজীর অনুভবে ও সে অনুভবের বাণী-রূপে আচার্য শঙ্করের প্রভাবের একটি বিশেষ উদাহরণ তাঁর 'সখার প্রতি' কবিতা। পরিব্রাজকজীবনের দুটি অধ্যায় তাঁর জীবনে। প্রথমবার ভারতপরিক্রমান্তে আমেরিকা-ইংল্যাণ্ড-য়ুরোপ-ভ্রমণ, দ্বিতীয়বার ভারত-পরিক্রমান্তে ইংল্যাণ্ড-আমেরিকা-য়ুরোপ-ভ্রমণ। প্রথমবারে যাত্রা শুরু হয়েছিল একাকী, দ্বিতীয়-বারে নানা সঙ্গী থাকলেও শেষ অবধি বেলুড় মঠে একা ফিরে আসা। প্রথমবারের অভিজ্ঞতার পরেই তাঁর জীবনদর্শন 'সখার প্রতি'তে প্রকাশ করেছেন :

যোগ-ভোগ গার্হস্থ্য সন্ন্যাস,
জপ-তপ, ধন-উপার্জন,
ব্রত ত্যাগ তপস্যা কঠোর,
সব মর্ম দেখেছি এবার ; ···

*　　*　　*

বিদ্যাহেতু করি প্রাণপণ,
অর্ধেক করেছি আয়ুক্ষয়—
প্রেমহেতু উন্মাদের মতো,
প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায় ;
ধর্মতরে করি কত মত,
গঙ্গাতীর শ্মশান আলয়,
নদীতীর, পর্বতগহ্বর,
ভিক্ষাশনে কত কাল যায়।
অসহায়—ছিন্নবাস ধরে
দ্বারে দ্বারে উদর পূরণ—
ভগ্নদেহ তপস্যার ভারে,
কি ধন করিনু উপার্জন ?
শোন বলি মরমের কথা,
জেনেছি জীবনে সত্য সার—
তরঙ্গ-আকুল ভবঘোর,
এক তরী করে পারাপার—

উদ্ধৃত চরণগুলির শেষ দিকে 'শোন বলি'—বিবেকচূড়ামণির 'শৃণু সখে' সম্বোধনটি স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়ায়। আচার্য শঙ্করের মতোই তিনি সত্যসন্ধানীর কাছে একাধারে গুরু ও বন্ধু; আর শঙ্করের আত্মো-পলব্ধি স্বামীজীর অন্তরে প্রেমের মহাসত্যে রূপান্তরিত। গুরুভাই স্বামী তুরীয়ানন্দজী সেই কথাটি মনে করিয়ে লিখেছিলেন—" 'প্রীতিঃ পরমসাধনম্।'—আবার সাধন কি ?—সকলে প্রেম। স্বামীজী বলেছেন 'এক তরী করে পারাপার।' "[১০]

স্বামীজীর ভাষায় সেই এক তরী কি ?

মন্ত্র-তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন,
মতামত, দর্শন-বিজ্ঞান,
ত্যাগ-ভোগ, বুদ্ধির বিভ্রম,
'প্রেম' 'প্রেম'—এই মাত্র ধন।

কিন্তু জীবনের যে মর্মান্তিক অভিজ্ঞতায় চরম জ্ঞান করুণার অশ্রুতে পরিণত হয় একদিক থেকে দেখলে তাই তো 'মায়া'। 'সখার প্রতি'-র সূচনায় সে কথা স্বামীজী আশ্চর্য কয়টি বিপরীত উদাহরণে উপস্থাপনা করেছেন :

১০ 'স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র' : ১১।৮।১৬ তারিখের পত্র

সখার প্রতি (পাণ্ডুলিপি)

আঁধারে আলোক অনুভব, দুঃখে সুখ, রোগে স্বাস্থ্যভান, প্রাণসাক্ষী শিশুর ক্রন্দন হেথা সুখ ইচ্ছ মতিমান?
দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলে অনিবার, পিতাপুত্রে নাহি দেয় স্থান, 'স্বার্থ' 'স্বার্থ' সদা এই রব, হেথা কোথা শান্তির আকর?
সাক্ষাৎ নরক স্বর্গময় কেবা পারে ছাড়িতে সংসার? কর্মপাশ গলে বাঁধা যার ক্রীতদাস বল কোথা যায়?
যোগ ভোগ, গার্হস্থ্য-সন্ন্যাস, জপ তপ, ধন উপার্জন, ব্রত ত্যাগ তপস্যা কঠোর, সব মর্ম দেখেছি এবার।
জেনেছি সুখের নাহি লেশ, শরীরধারণ বিড়ম্বন, যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়।
হৃদিবান নিঃস্বার্থ প্রেমিক এ জগতে নাহি তব স্থান, লৌহপিণ্ড সহে যে আঘাত মর্মর মূরতি তা কি সয়? #
হও জড়প্রায় অতি নীচ, মুখে মধু অন্তরে গরল—সত্যহীন, স্বার্থপরায়ণ, তবে পাবে এ সংসারে স্থান।
বিদ্যাহেতু করি প্রাণপণ অর্ধেক করেছি আয়ুক্ষয়; প্রেমহেতু উন্মাদের মত প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায়;
ধর্মতরে করি কত মত, গঙ্গাতীর শ্মশান আলয়, নদীতীর পর্বতগহ্বর, ভিক্ষাশনে কত কাল যায়।
অসহায় ছিন্নবাস ধরে, দ্বারে দ্বারে উদরপূরণ, ভগ্নদেহ তপস্যার ভারে, কি ধন করিনু উপার্জন?
শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্যসার, তরঙ্গ আকুল ভবঘোর এক তরী করে পারাপার—
মন্ত্র তন্ত্র, প্রাণনিয়মন, মতামত, দর্শন বিজ্ঞান, ত্যাগ ভোগ বুদ্ধির বিভ্রম, 'প্রেম' 'প্রেম' এই মাত্র ধন।
জীব, ব্রহ্ম, মানব, ঈশ্বর, ভূত প্রেত আদি দেবগণ, পশু পক্ষী কীট অণুকীট—এই প্রেম হৃদয়ে সবার।
'দেব' 'দেব' বল আর কেবা? কেবা বল সবারে চালায়? পুত্র তরে মায়ে দেয় প্রাণ, দস্যু হরে প্রেমের প্রেরণ!!
হয়ে বাক্যমন অগোচর, সুখে দুঃখে তিনি অধিষ্ঠান, মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপা, মাতৃভাবে তাঁরি আগমন।
রোগ, শোক, দারিদ্র্যযাতনা, ধর্মাধর্ম, শুভাশুভ ফল, সব ভাবে তাঁরি উপাসনা, জীবে বল কেবা কিবা করে?
ভ্রান্ত সেই যেবা সুখ চায়, দুঃখ চায় উন্মাদ সে জন, মৃত্যু মাগে সেও যে পাগল, অমৃতত্ব বৃথা আকিঞ্চন।
যতদূর যতদূর যাও, বুদ্ধিরথে করি আরোহণ, এই সেই সংসার জলধি, দুঃখ সুখ করে আবর্তন।
পক্ষহীন শোন বিহঙ্গম, এ যে নহে পথ পালাবার, বারংবার পাইছ আঘাত, কেন কর বৃথায় উদ্যম?
ছাড় বিদ্যা, জপ যজ্ঞ বল, স্বার্থহীন প্রেম যে সম্বল, দেখ শিক্ষা দেয় পতঙ্গম অগ্নিশিখা করি আলিঙ্গন।
রূপমুগ্ধ অন্ধ কীটাধম, প্রেমমত্ত তোমার হৃদয়, হে প্রেমিক স্বার্থমলিনতা অগ্নিকুণ্ডে কর বিসর্জন।
ভিক্ষুকের কবে বল সুখ? কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল? দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।
অনন্তের তুমি অধিকারী, প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান, 'দাও' 'দাও' যেবা ফিরে চায়, তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান।
ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়, মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

আঁধারে আলোক-অনুভব,
দুঃখে সুখ, রোগে স্বাস্থ্যভান;
প্রাণ-সাক্ষী শিশুর ক্রন্দন,
হেথা সুখ ইচ্ছ মতিমান্?

আচার্য শঙ্কর মানুষের এই অন্তর্নিহিত অজ্ঞানের স্বরূপ বুঝাতে গিয়েই শিষ্য ও সখার উদ্দেশে বলেছেন:

অতস্মিংস্তদ্বুদ্ধিঃ প্রভবতি বিমূঢ়স্য তমসা
বিবেকাভাবাদ্ বৈ স্ফুরতি ভুজগে রজ্জুধিষণা।
ততোঽনর্থব্রাতো নিপততি সমাদাতুরধিক-
স্ততো যোঽসদ্গ্রাহঃ স হি ভবতি বন্ধঃ শৃণু সখে॥
[বি. চু. ১৩৮]

—অজ্ঞানতমসায় আচ্ছন্ন ব্যক্তি যাকে যা নয় তাকে তাই বলে ভুল করেন। বিবেকের (পৃথক্করণের) অভাবেই (প্রকৃত) সর্পে (মিথ্যা) রজ্জুবুদ্ধি স্ফুরিত হয়। এই ভুলের বশে কেউ যদি (প্রকৃত) সাপকে দড়ি ভেবে গ্রহণ করে, তবে তো তার মহাবিপদ। শোনো বন্ধু, মিথ্যাকে গ্রহণ করাই বন্ধন। [অদ্বৈত-বেদান্তের প্রসিদ্ধ উদাহরণ 'রজ্জুতে সর্পভ্রম'। এখানে শঙ্কর 'সর্পে রজ্জুভ্রম' দৃষ্টান্তটির উল্লেখ করেছেন।]

স্বামীজী 'সখার প্রতি' সম্বোধনে কোনো গুরুভ্রাতাকে বিশেষভাবে উদ্দেশ করেছেন, এই প্রচলিত ধারণায় না গিয়ে আমরা একথাও ভাবতে পারি যে, আচার্য শঙ্করের 'শৃণু সখে'—এই সম্বোধন থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে তিনি তাঁর সমকালীন ও ভবিষ্যতের সব পাঠকবর্গের উদ্দেশেই 'সখা' সম্বোধন করেছেন। সব আর্ত-জিজ্ঞাসুর কাছেই তাঁর নিবেদন 'শোন বলি, মরমের কথা।'

'সখার প্রতি' কবিতার একটি মিশ্র উপমা কবিতার ইতিহাসে অতুলনীয়। সে উপমায় 'সংসার-জলধি' উত্তীর্ণ হওয়ার একমাত্র সম্বল —'স্বার্থহীন প্রেমে'র কথা বলতে গিয়ে স্বামীজী লিখেছেন:

যতদূর যতদূর যাও,
বুদ্ধিরথে করি আরোহণ,
এই সেই সংসার-জলধি
দুঃখসুখ করে আবর্তন।
পক্ষহীন শোন বিহঙ্গম,
এ যে নহে পথ পালাবার,
বারংবার পাইছ আঘাত,
কেন কর বৃথায় উদ্যম?

আপাতদৃষ্টিতে 'বুদ্ধিরথে' 'জলধি' উত্তীর্ণ হওয়ার প্রচেষ্টা অসঙ্গত মনে হতে পারে। কিন্তু কবির ভাষায় উপমাগত মিশ্রণ এখানে দোষ নয়, গুণই হয়ে উঠেছে। স্বয়ং শেক্সপীয়র যখন 'হ্যামলেটে'র সংশয়দোলায়িত হৃদয়ের বাণীরূপে—'to take arms against a sea of troubles' লেখেন—তখন সমস্যার সিন্ধুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের চেষ্টার অসম্ভাব্যতা আমাদের বিস্মিত করে না। বরং যুদ্ধক্ষেত্র ও সমস্যা-জর্জরিত হৃদয়সিন্ধু—এ দুয়ের অন্তরতম মিল পাঠককে আরো মুগ্ধ করে।

আর 'পক্ষহীন বিহঙ্গমে'র বৃথা পলায়নের চেষ্টাই কি আমাদের সংসার থেকে পলায়নের সব চেষ্টার ব্যর্থতার অনিবার্য উপমা নয়? এ জগৎকে ভালোবেসেই জগৎকে উত্তীর্ণ হতে হবে। সেক্ষেত্রে বুদ্ধি নয়, হৃদয়ই সব চেয়ে বড়ো সহায়।

'পক্ষহীন বিহঙ্গম' কথাটিতে একটু বিরুদ্ধতা রয়েছে। তাই হয়তো কেউ কবিতাটির পাণ্ডুলিপিতে ও 'উদ্বোধনে' 'লক্ষ্য-হীন' করতে চেয়েছিলেন এই শব্দটিকে।[১১]

১১ বর্তমান লেখকের 'বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য' (২য় সংস্করণ) গ্রন্থে পৃঃ ২৭১ দ্রষ্টব্য।

কিন্তু তাতে আরো অর্থহীন হয়ে পড়তো বক্তব্য। বিরোধাভাসসহ 'পক্ষহীন বিহঙ্গম'ই আমাদের বুদ্ধিনির্ভর সমাধানপ্রচেষ্টার যোগ্য প্রতীক।

স্বামীজীর উপমায় 'পক্ষহীন বিহঙ্গমে'র পলায়নচেষ্টার মতো 'বুদ্ধিরথে' সিন্ধুতরণের অসম্ভাব্যতা আরো স্পষ্টভাবে মানবজীবনের গভীরতম সঙ্কটকে প্রকাশিত করে। ঠিক কোন্ উপায়ে সংসাররূপ মহাসিন্ধু আমরা উত্তীর্ণ হবো? আচার্য শঙ্করের ভাষায়:

নিয়মিতমনসামুং ত্বং স্বমাত্মানমাত্ম-
ন্যয়মহমিতি সাক্ষাদ্ বিদ্ধি বুদ্ধিপ্রসাদাৎ।
জনিমরণতরঙ্গাপারসংসারসিন্ধুং
প্রতর ভব কৃতার্থো ব্রহ্মরূপেণ সংস্থঃ॥

[বি. চূ. ১৩৬]

—সংযত মনে এবং শুদ্ধবুদ্ধির সহায়ে এই দেহে (এই জীবনে) আত্মস্বরূপকে 'আমিই সেই শুদ্ধ আত্মা'—এইভাবে প্রত্যক্ষরূপে অনুভব কর এবং এর ফলে জন্মমরণের তরঙ্গসমাকুল অপার সংসারসাগর উত্তীর্ণ হও; ব্রহ্মে স্থিতি-লাভ করে কৃতার্থ হও।

আচার্য শঙ্করের দৃষ্টিতে যে মুক্তি (সংসার-সিন্ধু-উত্তরণ) শুদ্ধবুদ্ধির দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধিতে লাভ করা যায়, স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে সেই মুক্তির এক তরী বা উপায়—'স্বার্থহীন প্রেম'। দু'জনের দৃষ্টিতেই সংসার জলধি বা সিন্ধু। দু'জনেই ব্রহ্মসংস্থের দৃষ্টিতে বিশ্বজনের মুক্তির উপায়-অন্বেষণে ব্যাকুল। শঙ্করের নির্দেশ—'সংসার-সিন্ধুং প্রতর'—স্বামীজী মনে করিয়ে দিয়েছেন—'এক তরী করে পারাপার।' শুদ্ধ জ্ঞানই কখন শুদ্ধ প্রেমে জগৎ-সংসারকে নিয়ে মুক্তির অভিলাষী।

জীবন্মুক্তের লক্ষণ বলতে গিয়ে আচার্য শঙ্করের বাণী:

ন প্রত্যগ্ ব্রহ্মণোর্ভেদং কদাপি ব্রহ্মসর্গয়োঃ।
প্রজ্ঞয়া যো বিজানাতি স জীবন্মুক্তলক্ষণঃ॥

[বি. চূ. ৪৩৯]

—যথার্থ জ্ঞানের ফলে যিনি জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে এবং ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে কখনো ভেদ দর্শন করেন না, তিনিই জীবন্মুক্ত।

আচার্যের দৃষ্টিতে ব্রহ্মোপলব্ধির পরম সত্য:

বক্তব্যং কিমু বিদ্যতেঽত্র
বহুধা ব্রহ্মৈব জীবঃ স্বয়ং [বি. চূ. ৩৯৪]

—জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য সম্বন্ধে আর বেশী কি বলবো? জীব স্বয়ং ব্রহ্মই।

'সখার প্রতি'র শেষ চার পঙ্‌ক্তিতে স্বামীজী ভারতবর্ষের চিরন্তন ব্রহ্মোপলব্ধির সত্যকে তাঁর নিজস্ব 'প্রেম'-মন্ত্রে অনুপ্রাণিত করে নবযুগের সাধনমন্ত্র উচ্চারণ করেছেন:

ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু,
সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ
কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

(বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড)

সমস্ত জীবই ব্রহ্ম, তাই সকলের প্রতি প্রসারিত প্রীতির দ্বারা, সকলের সেবার দ্বারা বিরাটের উপাসনাকে স্বামীজী তাঁর উদ্দিষ্ট শিষ্য বা সখাদের কাছে আদর্শরূপে স্থাপন করেছেন। আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দ—ভারতীয় অদ্বৈতচেতনার এ দুই মহান ঋষির ভাবগত যোগসূত্ররূপে এখানে শ্রীরামকৃষ্ণবাণী স্মরণীয়—'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'। বস্তুতঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাধ্যমেই স্বামীজীর

অদ্বৈত-সাধনার সঙ্গে যোগ।

ব্রহ্ম, জীব, জগৎ—এই তিনের মধ্যে এক ব্রহ্মসত্যকেই কোনো ঋষি জগতের কাছে ঘোষণা করে অনন্ত সত্যের আবরণ মোচন করতে পারেন, আবার কোনো ঋষি জীব ও জগৎকে আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ফিরে ফিরে জন্মগ্রহণ করতে পারেন। 'সখার প্রতি'র বিবেকানন্দ সেই অনন্ত প্রেম ও করুণার অধীশ্বর। আচার্য শঙ্করের 'বিবেকচূড়ামণি' স্বামীজীর সাধনা ও উপলব্ধির অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথনির্দেশক। মানুষের সহজাত 'অনন্তের অধিকার'কে যিনি যেভাবে মনে করিয়ে দেন, তিনিই একাধারে মহাজ্ঞানী মহাপ্রেমিক। আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দ—দুই 'কবির্মনীষী'ই সংসাররণাঙ্গনে আমাদের সখা ও সারথি।

ডেভিড হেয়ার

ডক্টর কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত *

দেশীয় শিক্ষার জনকরূপে নন্দিত ডেভিড হেয়ার জন্মসূত্রে বিদেশী। তাঁর জন্ম এদেশে নয়, সুদূর স্কটল্যাণ্ডে, ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ ফেব্রুআরি। ধর্মে খ্রীষ্টান, কর্মে ঘড়ির কারবারী। ঘড়ির ব্যাবসার সূত্রেই ১৮০০ সালে তিনি কলকাতায় আসেন এবং কয়েক বছরের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই ব্যাবসা তাঁর সহকারী এডওআর্ড গ্রেকে হস্তান্তরিত ক'রে এক লক্ষ টাকা পান এবং ঐ টাকার একটি বড়ো অংশ জায়গা-জমি কেনায় খরচ করেন। বর্তমান ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীট অঞ্চলে, যেখানে হেয়ারের বাড়ি ও জায়গা-জমি ছিল, সেখানেই শুধু নয়, কলেজ স্কোয়ারের উত্তরে তিনি পাঁচ বিঘা সাত কাঠা জমি কিনেছিলেন। নিজের নামে শুধু নয়, তাঁর বেনিয়ান গোলক কর্মকারের নামেও জায়গা-জমি ছিল।

ডেভিড হেয়ারের মহত্ত্ব এইখানেই—উপার্জিত অর্থ এবং ভূ-সম্পত্তি তিনি নিজের ভোগে নিয়োজিত করেননি। বাংলাদেশকে তিনি মায়ের মতোই ভালোবেসেছিলেন, বাঙালীর উন্নতিসাধনকে তিনি ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। ব্যাবসা-সূত্রে এদেশের সচ্ছল ভদ্রলোকদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে তিনি তাঁদের সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরতে পেরেছিলেন এবং উপলব্ধি করেছিলেন, সমস্ত সংস্কারের আগে যে-সংস্কারের কাজে হাত দেওয়া প্রয়োজন তা হলো, প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তন। দু'ভাবে তিনি এই পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন: প্রথম, ধর্মীয়

* অধ্যাপক, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ইঁহার প্রধান গ্রন্থ A Tribal History of Ancient India: A Numismatic Approach প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও মুদ্রাতত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রামাণিক গ্রন্থরূপে সর্বজনস্বীকৃত। অন্যান্য বিশিষ্ট গ্রন্থ: Indian Historiography and Rajendralal Mitra এবং 'ইতিহাস ও সংস্কৃতি'। Comprehensive History of India, Dictionary of National Biography প্রভৃতি বহু গ্রন্থ ইঁহার রচনায় সমৃদ্ধ। একাধিক বিশিষ্ট গ্রন্থের সম্পাদনা তথা বঙ্গানুবাদ ইঁহার অন্যতম উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব।

গোঁড়ামি থেকে শিক্ষার মুক্তি এবং দ্বিতীয়, পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানের চর্চা ও প্রসার। এবং সর্বোপরি তিনি সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষার আলো বিকীর্ণ করতে চেয়েছিলেন। এই শিক্ষাদর্শেই হেয়ারের আধুনিক মন প্রতিফলিত হয়েছে। এবং বাংলার নবজাগরণের মূলে এই শিক্ষাদর্শের দান ও প্রেরণা নতুন ক'রে বলার অপেক্ষা রাখে না।

হেয়ার তাঁর জীবনব্রতের পবিত্রতা ও দুরূহতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলে ব্যক্তিগত কারবার ছেড়ে দিয়েছিলেন। ব্যাবসার পাট চুকোবার আগেই তিনি একটি ইংরেজী স্কুল স্থাপনের কথা ভেবেছিলেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের বাড়িতে আহূত একটি সভায় রামমোহন একটি ব্রহ্ম সভা স্থাপনের প্রস্তাব করলে সভায় উপস্থিতদের অন্যতম হেয়ার একটি বিদ্যায়তন স্থাপনের প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাবটিই ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজের মাধ্যমে বাস্তবে রূপায়িত হয়। ডেভিড হেয়ার হিন্দু কলেজের আদি কল্পক কি না এ নিয়ে ঐতিহাসিকরা একমত নন, তবে হেয়ারের অল্প-বিস্তর সমসাময়িক লেখকবৃন্দ এবং পত্র-পত্রিকার সাক্ষ্য ও মতামত মানলে বলতে হয়, ডেভিড হেয়ারই হিন্দু কলেজের 'প্রকৃত জন্মদাতা'। অর্থাৎ তিনি এই কলেজের আদি কল্পক, যদিও কলেজ স্থাপনার ব্যাপারে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি স্যর এডওআর্ড হাইড ঈস্ট প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন।[১]

ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি (৪ঠা জুলাই ১৮১৭) এবং ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি (১লা সেপ্টেম্বর ১৮১৮) নামে যে-দু'টি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছিল, হেয়ার তাদের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। তিনি ছিলেন স্কুল বুক সোসাইটির ইউরোপীয় সম্পাদক এবং হেয়ারের চরিতকার প্যারীচাঁদ মিত্রের অনুমান, এই সোসাইটিকে তিনি বাৎসরিক ১০০৲ চাঁদা দিতেন। স্কুল সোসাইটির সূত্রে হেয়ার এদেশে প্রাথমিক শিক্ষার দুরবস্থার সঙ্গে পরিচিত হন এবং সেই সঙ্গে জানতে পারেন অধিকাংশ শিক্ষার্থীর দারিদ্র্যের কথা। ১৮২০ সোসাইটির রিপোর্টে জানা যায়, সে সময় 'আরপুলিতে (এখনকার ঠনঠনে অঞ্চলে) হেয়ারের বিদ্যালয়টি বস্তুতঃ তাঁর নিজের ব্যয়ে পরিচালিত হচ্ছিল।' ১৮১৯ সালের ১২ জুন হিন্দু কলেজের 'ভিজিটার'রূপে কলেজটির কাজকর্ম দেখা-শোনার দায়িত্বও হেয়ারের উপর অর্পিত হয়। এই সঙ্গে হিন্দু কলেজে স্কুল সোসাইটির যে-সব ছেলেরা পড়াশোনা করত, তাদের তত্ত্বাবধান করার দায়িত্বও হেয়ারকে দেওয়া হয়। ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির ঊর্ধ্বে শিক্ষাবিস্তারের কাজকে তিনি স্থান দিয়েছিলেন, তাই তিনি শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত ব্যাবসা ছেড়ে দিয়ে দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। শোনা যায়, তিনি নিয়মিত দশটা থেকে পাঁচটা স্কুল সোসাইটির পরিচালনাধীন স্কুলগুলি এবং হিন্দু কলেজ পরিদর্শন করতেন। ১৮৩৫ সাল থেকে মেডিকেল কলেজ পরিদর্শনও তাঁর দৈনিক কর্তব্যের

---

১ 'সাহিত্য দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালার (সংবাদ। সম্পাদক : কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত) অন্তর্গত প্যারীচাঁদ মিত্রের 'ডেভিড হেয়ার' (গ্রন্থাঙ্ক ৩, বঙ্গানুবাদ : ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদনা সুশীলকুমার গুপ্ত) গ্রন্থে এ সম্পর্কে আমার বিশদ আলোচনা (পৃঃ ২৬৩-৭৪) দ্রষ্টব্য।

তালিকাভুক্ত হয়। ১৮৪০ সালে তিনি কোর্ট অফ রিকোয়েস্টস্ (পরবর্তী কালের স্মল কজেস কোর্ট)-এর কমিশনার (অর্থাৎ বিচারপতি) নিযুক্ত হলে প্রতিদিন বেলা ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা বা ৭টা পর্যন্ত হিন্দু কলেজ, পটলডাঙা ইংরেজী স্কুল এবং মেডিকেল কলেজ এই প্রতিষ্ঠান তিনটি পরিদর্শন করতেন।

এদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের ব্যাপারেও হেয়ার আগ্রহী ছিলেন। একবার তাঁর এক বন্ধুকে বলেছিলেন, 'আরও দশ বছর যদি জীবিত থাকি, তাহলে এদেশীয় মহিলাদের শিক্ষার কাজে আমি আত্মনিয়োগ করব।' স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহের নিদর্শন, ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'লেডিজ সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশন'-এ তিনি নিয়মিত চাঁদা দিতেন। তা ছাড়া, রাধাকান্ত দেবের বাড়িতে যখন হিন্দু মেয়েদের পাঠ শেষে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হতো, তাতে তিনি নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার মতো উচ্চতর ও বিশেষ শিক্ষার প্রতিও হেয়ারের সদাজাগ্রত দৃষ্টি ছিল। উদাহরণস্বরূপ, মেডিকেল কলেজের প্রারম্ভিক পর্যায়ে ও প্রগতিতে তাঁর প্রভাব ও সহযোগিতার কথা বলা চলে। প্রথমে সম্পাদক ও পরে কলেজ কাউন্সিলের অবৈতনিক সদস্যরূপে তিনি মেডিকেল কলেজের উন্নতিতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কেও হেয়ারের চিন্তা ছিল স্বচ্ছ। এ সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল, শুধু ইংরেজী নয়, সেই সঙ্গে মাতৃভাষা শিক্ষা দেওয়াও একান্ত আবশ্যক এবং সে উদ্দেশ্যে সাবলীল ইংরেজী ও মাতৃভাষায় লিখিত উন্নত ধরনের বই প্রকাশের গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। বাংলাভাষায় পারদর্শিতালাভের উপর তিনি জোর দিতেন। এবং তরুণমতি ছাত্রদের উপযোগী প্রাথমিক বা ঐ ধরনের বই ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করার জন্য পণ্ডিতদের নিযুক্ত করেছিলেন। শিক্ষার বাহন নিয়ে যখন দেশ-মনীষা দ্বিধাবিভক্ত, তখন হেয়ার যে সমন্বয়ী পন্থা আবিষ্কার করেছিলেন, তা তাঁর দূরদর্শিতারই পরিচায়ক।

মূলত শিক্ষাব্রতী হলেও হেয়ার তৎকালীন বাংলাদেশের বৃহত্তর জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও অংশ নিয়েছিলেন। তিনি যথার্থই এদেশের জনগণের সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার ছিলেন। তাই ১৮৩৫ সাল ও তার পর থেকে যখন বিদেশে কুলি চালানের ব্যাবসা শুরু হলো' তখন হেয়ার জোর করে বাইরে কুলি পাঠাবার প্রথার বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ জানালেন। ১৮৩৫ সালে সরকার এ ব্যাপারে যে-অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করেছিলেন, হেয়ার ও তাঁর সহমর্মীরা এই কমিটির কাছে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। সম্প্রতি ভারতবর্ষে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা হয়েছে, বই বেরিয়েছে, অথচ কোথাও হেয়ারের এই ভূমিকার উল্লেখ নেই।

অন্যান্য আরও কয়েকটি বিষয়ে হেয়ারের কর্মৈষণার স্বাক্ষর মেলে: যেমন, সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতারক্ষার্থে এবং জনসভার উপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে গভর্নর-জেনারেলের কাছে আবেদন-পত্র দাখিল করার জন্য ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জানুআরি কলকাতার নাগরিকেরা টাউন হলে যে-সভার আয়োজন করেন, তার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন হেয়ার। ঐ সভার একজন বক্তাও ছিলেন তিনি। দ্বিতীয়, ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ জুলাই কলকাতার টাউন হলে সমগ্র দেশে

জুরি প্রথার প্রবর্তন করার দাবিতে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এরও উদ্যোক্তা ছিলেন ডেভিড হেয়ার। তৃতীয়, হেয়ার বিচারালয়-গুলিতে ফারসি ভাষা রদ করার প্রস্তাব দিয়ে-ছিলেন। চতুর্থ, ইংল্যাণ্ডের 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র সঙ্গে সহযোগিতা করার অনুকূলে কালীকৃষ্ণ দেব যে-প্রস্তাব দিয়েছিলেন, হেয়ার তাকে সমর্থন করেছিলেন। সে সময়কার রামমোহনের আত্মীয়-সভা, অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন, সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা, এশিয়াটিক সোসাইটি, এগ্রিকালচারাল অ্যাণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি প্রভৃতি বিভিন্ন বিদ্বৎ-সমাজ ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

মানুষ হিসাবে হেয়ার ছিলেন অসাধারণ। ছাত্রপ্রীতি, পরোপচিকীর্ষা, চিত্তের ঔদার্য ও সরলতা, কর্তব্যনিষ্ঠা প্রভৃতি গুণে হেয়ারের চরিত্র নিত্য দীপ্যমান ছিল। তাঁর ছাত্রপ্রীতি ঐতিহ্যরূপে উজ্জ্বল। শোনা যায়, বাড়ির মেয়েরা পর্যন্ত সংকোচ ত্যাগ করে বাবা বা ভাইয়ের মতো তাঁর সঙ্গে ছেলেদের পড়াশোনা তাদের ভালোমন্দ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তিনি ছিলেন মূর্তিমান 'ছাত্রের দেবতা', ছাত্রপল্লী কলেজ স্কোয়ার ছাড়া তাঁর যোগ্য সমাধিস্থল আর কি হতে পারে?

জন্মসূত্রে খ্রীষ্টান হয়েও ডেভিড হেয়ার খ্রীষ্ট-ধর্মে অবিশ্বাসী ছিলেন, এমন সন্দেহ কেউ কেউ করেছেন। এ সন্দেহ অমূলক এবং একজন সমসাময়িকের ভাষায়, হেয়ারের জীবন ছিল খাঁটি খ্রীষ্টানের জীবন। বলা বাহুল্য খাঁটি খ্রীষ্টান তিনি নিছক লৌকিক অর্থে প্রয়োগ করেননি, করেছেন গুণগত অর্থে। অন্য পক্ষে হেয়ারের খ্রীষ্টধর্ম-বিরোধিতার কোন নিশ্চিত তথ্য আমাদের হাতে নেই। আসল কথা, যুক্তিবাদী ডিরোজিওর সহমর্মী বন্ধু ডেভিড হেয়ারও ছিলেন মুক্ত মনের মানুষ। তিনি ছিলেন আত্মন্ত মানবতাবাদী, তাঁর ধর্ম ছিল মানবধর্ম, কোন বিশেষ আয়োজনের দ্বারা যাকে পেতে হয় না, যে-ধর্ম সর্বকালীন বিশ্বভূমীন। এ জন্য তিনি জন্মসূত্রে বিদেশী হয়েও বাংলাদেশকে ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলে জ্ঞান করতেন এবং এদেশের কোলেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। এদেশের লোকেরাও তাঁকে আপনজন করে নিয়েছিলেন এবং ১৮৪২ সালের ৩১ মে তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর বাসভবন লোকারণ্যে পরিণত হয়েছিল। পরের দিন প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল, তা সত্ত্বেও পাঁচ হাজার লোকের বিপুল জনতা শান্ত হয়ে হেয়ার স্ট্রীট থেকে কলেজ স্কোয়ার পর্যন্ত শবানুগমন করেছিল।[২]

সংক্ষেপে, ডেভিড হেয়ার নবযুগের মানুষ, বাংলার নবজাগরণের যোগ্য প্রতিনিধিদের অন্যতম। মধ্যযুগীয় আদর্শে বিত্ত ও বিদ্যা কুলবৃত্তিগত বন্ধনে আবদ্ধ, আধুনিক যুগে সমস্ত রকম বন্ধন থেকেই বিত্ত ও বিদ্যা মুক্ত। উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই মধ্যবিত্তশ্রেণী সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত, জাতিধর্মনির্বিশেষে বিদ্যাও মধ্যবিত্তশ্রেণীর করায়ত্ত। ডেভিড হেয়ার শিক্ষাপ্রসারের মাধ্যমে সমকালীন সমাজে সেই বিদ্যার ভিত্তিকে প্রশস্ত করেছিলেন। ধর্মমুক্ত শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের মাধ্যমে তিনি এদেশের নবজাগরণকে অনুপ্রেরিত ও ত্বরান্বিত করেছেন। অক্ষয়-কুমার দত্ত যখন বলেন 'ভারতরাজ্যের বিদ্যারূপবৃক্ষমূলে হেয়ার সাহেবকে বীজরূপে দৃষ্টি করা যায়', তখন তাঁর উক্তি আক্ষরিক সত্য রূপেই প্রতিভাত হয়।

২ হেয়ার খ্রীষ্টধর্মের বিরোধী ছিলেন, প্রচলিত এই মতের বিরুদ্ধে আমার আলোচনার জন্য 'শতরূপা' পত্রিকার 'ডেভিড হেয়ার স্মরণ সংখ্যা' (পৃঃ ৩৩-৩৬) দ্রষ্টব্য।

'জ্যান্ত দুর্গা'

স্বামী চণ্ডিকানন্দ

[গান : মিশ্র জয়জয়ন্তী—কাহারবা]

'জ্যান্ত দুর্গা' মা এলোরে আনন্দের আর সীমা নাই।
এক ডাকে সে দেয়রে ধরা, মা ডেকে তুই ত্থাখনা ভাই ॥
মা যে নিজেই বলেছে, 'মা ডাকে ছুটে যাই কাছে'
ত্রিজগতে এমন মা তো কেউ কখনো দেখে নাই ॥
না করে দোষগুণের বিচার, যারে তারে সে করে পার
না চাহিতে কোলে নিয়ে দেয় ঘুচিয়ে সব বালাই।
মাটির দুর্গা মা তো নয়, হেসে হেসে কথা কয়
আপামরে দেয় অভয়, আহা বলিহারি যাই।
জোড়হাতে রামকৃষ্ণ-ভোলা মা'র মহিমা গায় সদাই ॥

তোমাকে

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী*

সবাই ডাকে তোমাকে—কত সম্পর্ক, কত সংজ্ঞা!
গুরুজন প্রিয়জন—কত নামে ডাকে!
গুরুজনের নাম ধরে না লোকে। তোমার নাম ধরে—তুমি হলেও গুরুজন।
কত নাম—হরি রাম আল্লা গড নারায়ণ!
কত পরিচয়—জনক জননী বন্ধু সখা তনয় দুহিতা!
মনে হয় আমিও ডাকি!
কিন্তু ডাকা হয় না—জল ভরে যায় দুটি চোখে!
মনে মনে অদৃশ্য পা-দু'টি জড়িয়ে ধরে দুটি হাত।
কথা ফুরিয়ে যায় কণ্ঠে—
নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে সে ডাকে—
প্রভু! নাথ! জগন্নাথ! বিশ্বনাথ!

---

* সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকা। গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ ও কবিতার মাধ্যমে অর্ধশতাব্দীর অধিককাল বাংলা সাহিত্যের সেবিকা। ১২টি গ্রন্থের লেখিকা। 'সোনা রূপা নয়'—গ্রন্থটির জন্য রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিতা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবায়

শ্রীদিলীপকুমার রায় *

করুণা তোমার ছোঁয়ে নাথ যারে
যে তোমার স্নেহধন্য,
কে বলে আর্ত পাপী তাপী তারে
লক্ষ্যহারা, নগণ্য ?

তোমার নাম যে উচ্ছলি' গায়,
লীলাকীর্তনে কাঁদে যে,
ভূমিকম্পেও অভী সে ধরায়
তোমারি মন্ত্র সাধে সে।

ম্লান তারে বলে কে—প্রার্থনায়
চায় যে শুদ্ধা ভক্তি ?
অক্ষম তারে কে বলে—যে পায়
শরণাগতির শক্তি ?

কে বলে—সে মূঢ়, দীন হ'তে দীন,
পাতকী, মলিন, নিঃস্ব ?
তোমারি ঠাকুর, যে চরণাধীন
হাতে পায় যে সে বিশ্ব।

নয় এ তো মায়ামোহের সাধনা,
ছদ্মবেশী অহঙ্কার :
যে শুধু তোমারি করে আরাধনা
অহং কি তার থাকে আর ?

শোনে তার প্রতি কাজে চিন্তায়
তোমারি পদধ্বনি সে
তোমার বাঁশির ঝঙ্কারে পায়
তোমার পরশমণি সে।

---

* সুপ্রসিদ্ধ গায়ক, কবি, সাহিত্যিক, গ্রন্থকার। পুনা হরিকৃষ্ণ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা।

তা কি সত্যি ?

বনফুল

কাল রাতে সুগোপনে
আমার মনে যা শুনলাম
তা কি তুমি বললে ?
তা কি সত্যি ?

তারা-ভরা আকাশের দিকে চেয়ে
অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।
মনে হয়েছিল
এ কোন্ বিরাট পূজারী
লক্ষ কোটি আলো জ্বেলে
করছে তোমার আরতি ?
ভয়ও হ'ল সঙ্গে সঙ্গে—
আমি তো একটি ছোট্ট প্রদীপ দিয়ে
আরতি করি তোমার—
আমার উপকরণ তো অতি সামান্য
আমার আরতি কি তোমার চোখে পড়ে ?
সঙ্গে সঙ্গে মনের ভিতর
কে যেন বলে উঠল
আমি উপকরণ চাই না
তোমাকে চাই।
আমাকে চাও ?
সত্যি ?
আমি যে অতি ক্ষুদ্র
অতি নগণ্য।

চতুর্দশপদী

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ*

শক্তিক্ষেত্র চলাচলে সবি জানা সবি চেনা যাঁর—
সে কোন সর্বজ্ঞ সত্তা অণুতে বৃহতে বিদ্যমান ?
হে আমার অহমের সর্বাঙ্গ বেষ্টিত অন্ধকার
কেন আর্ত অন্তরের থামে না অশান্ত স্তবগান ?
যাঁর স্তব তাঁরি শক্তি, যাঁর জানা তিনি যে অজানা
তাঁরি বুকে উড়ে উড়ে বাসনার কী অক্লান্ত ডানা
জানে সে দিগন্তহীন সে শক্তির আকাশ দুষ্পার
যে আকাশে ক্রমাগত অভিব্যক্ত কোটি কোটি প্রাণ।

মায়াময় অন্ধকার সবিকার সুখদুঃখে ভরা
ঘিরে রাখে জীবজন্ম অহোরাত্র জানে বসুন্ধরা
অন্ধকারে সৃষ্টি জপে অগ্নিসূক্তে 'রত্নধাতমম্'-এ
জানে কালস্রোতে ভাসে অবিরাম বাঁচা আর মরা।
শক্তির উন্মেষে দীপ্ত জাতবেদঃ স্থাবরে জঙ্গমে
তিমিরের জপগর্ভে অগ্নিবীজ জপে মধুক্ষরা।

---

* সুপ্রসিদ্ধ কবি। অর্ধশতাব্দী যাবৎ কবিতা ও কাব্যসমালোচনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের সেবক। মোট ১৭টি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। ইংরেজী ফরাসী জার্মান রুশ ও চীন ভাষায় ইঁহার বহু কবিতা অনূদিত ও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। বিখ্যাত ও জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ : 'উদাত্ত ভারত' ও 'রক্ত গোলাপ'। ভারত সরকারের সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিম বঙ্গ হইতে একমাত্র ইঁহাকেই 'ফেলো' নির্বাচিত করিয়াছেন গত ১.৪.৭৮ তারিখ হইতে, —বিষয় : কাব্য ও দর্শন।

আকুতি

শ্রীবীণাপাণি ভট্টাচার্য

আলোর রেখা দেখতে পাব তোমার কাছে এসে
তাই তো আমি দাঁড়ালেম আজ তোমার দুয়ার ঘেঁষে।
আঁধার-ঘেরা এই জীবনে পথ হারায়ে ক্ষণে ক্ষণে
পরশ তোমার চাই যে প্রভু আজকে বেলা শেষে।

প্রশ্নঃ মায়ের কাছে

শ্রীশান্তশীল দাশ*

মা, তোর পূজা হচ্ছে দেখি
কত আলোর আড়ম্বরে,
সন্ধ্যা সকাল আঙিনা তোর
কোলাহলে উঠছে ভরে।
কত রঙিন বসনভূষণ
কত পূজার উপকরণ ;
ঘুরে ফেরে পূজারীদল
কত-না সাজ অঙ্গে ধ'রে !

আড়ম্বরের মাঝে মা, তোর
আসনখানি—সত্য কি সেই ?
অন্ধকারে দিন কাটে যার
সেইখানেতে মা, তুই কি নেই ?
যার কিছু নেই কান্না ছাড়া
পাবে না তোর আশিস্ তারা ;
সকল জনের জননী তুই,
বলবো তবে কেমন ক'রে ?

রসিক মেথরের কান্না

শ্রীমতী জয়ন্তী সেন

সে শুধু একাকী নয়
যুগযুগান্তের
অন্তহীন মানবাত্মা কেঁদে ফেরে শরণাগতির
অচলপ্রতিষ্ঠ স্থির সমুদ্র সুনীল
চিরাশ্রয়ে মিশে যেতে,
দুঃখ ভুলে দুঃখাতীতে খুঁজে
ও দুটি চরণতলে
আকুলিত আত্মনিবেদনে !

সে শুধু একাকী নয়
অশ্রুময় মানব আকৃতি
অনন্ত কান্নায় ব্যক্ত করে তার মৌন অনুভূতি।
ভূলুণ্ঠিত লতা সম
চরণের রজ বিভূষিত
সর্বাঙ্গে প্রার্থনা করে—
'প্রভু বলো আমার কি হবে !'

সে ক্রন্দন-বেদীতলে
ধূপের ধোঁয়ায়,
পূজার পুষ্পিত ঘ্রাণে, স্থির দীপালোকে
দেবতার শ্রীচরণে
চিরন্তন করুণ অঞ্জলি
সে প্রার্থনা জীবনের
আলোহীন নিবিড় আঁধারে
চিরদ্যুতি ধ্রুবতারা
পথভ্রষ্ট প্রাণের দিশারী।

* শিক্ষাব্রতী সুপ্রসিদ্ধ কবি ও আকাশবাণীর অনুমোদিত গীতিকার। রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম : 'জীবনায়ন', 'পরিক্রমণ', 'একটি প্রসন্ন সুর', 'তোমায় কী দিয়ে বরণ করি', 'তুমি মহাত্মা', 'হে মহাজীবন', 'শবরী পৃথিবী জাগে' এবং 'অপরূপা'।

আমি শুধু মা-ই ডাকি

ডক্টর গোপেশচন্দ্র দত্ত*

আমার মায়ের নাম আমার তো অন্তরের মালা,
আমার মায়ের জ্যোতি আমার যে প্রদীপ প্রাণের,
এ-মালা-প্রদীপ নিয়ে পথ-চলা শিখি জীবনের,
আনন্দের নির্মাল্যেতে ভরে তুলি আমার নিরালা।
মায়ের ফুটানো ফুলে শরতের অঙ্গে শোভা ঢালা,
শেফালির গন্ধমাখা হাসি ভাসে ঢেউয়ে বাতাসের ;
কী মধুর স্তবমন্ত্র সুদূর সে কোন্ অতীতের,—
ভেসে আসে, সুরু হয় প্রণত প্রাণের ধূপ জ্বালা।

কোনো ঋষি দিয়াছিল মায়ের নামটি হৈমবতী,
এবং চণ্ডী ও দুর্গা : কবি ডাকলো উমা, গৌরী বলে ;
কোনো বা পুরাণে দেখি দশভুজা, সতী ও পার্বতী,
কেউ বা পাষাণী ডেকে অভিমানে ভাসে আঁখিজলে !
আমি শুধু মা-ই ডাকি, এ আমার স্নিগ্ধ মাতৃছায়া,
এ-ডাকই আমার থাক, আর থাক জননীর মমতা ও মায়া।

---

* বিভাগীয় প্রধান, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, শ্যামসুন্দর কলেজ, বর্ধমান। কাব্য-গ্রন্থ 'মধুমঞ্জরী' ও 'বনবাঁশরী' এবং 'কৃষ্ণযাত্রা ও নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়', 'বাংলা সাহিত্যের রূপচিত্র', 'বঙ্কিমসাহিত্যপরিক্রমা' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক।

অমৃতবাণী

শ্রীধনেশ মহলানবীশ

এগিয়ে পড় সুমুখ পানে, আর বিলম্ব নয়—
এখনই এই মুহূর্তেই ভয়কে ক'রে জয়।
চন্দনবন পেরিয়ে পাবে রতনভরা খনি—
এগিয়ে গেলে পাবেই পাবে অমূল্য সব মণি।
এগোও যদি সাহসভরে অনুভূতির পথে
অন্ধ তামস হবেই দূর নয়ন-দু'টি হতে।

দাবি ! দাবি !

শ্রীশিবশম্ভু সরকার*

শুধুই মর্ত্যের জীব !—এই মাত্র পরিচয় লয়ে
আলো আর আঁধারের ছন্দে গাঁথা রীতিটুকু বয়ে
কালো-ভালো, সুখদুঃখ—আজগুবী কাহিনীটি ক'য়ে
চলে যায়—পথে পথে—শরতের মেঘমালা হোয়ে !

এরি তরে আঁটসাঁট—অতি তুচ্ছ মূর্খ পরিচয় !
শ্বা শৃগাল সাপ বাঘ—এদেরও তো 'জীব' নামে কয় !
কৃমিকীট-মণ্ডলীতে শ্রেষ্ঠতার করি অভিনয়—
কী সান্ত্বনা মানুষের ? কোথা তার মহিমা-আশয় ?

শক্তি যদি দিলে তুমি, দাবি তাই তোমার সকাশে
অন্তরে আগুন জ্বালো—তৃপ্তি যাক পুড়িয়া হতাশে।
অসহ্য কী যাতনায় জীবত্বের ছিঁড়িয়া মোড়ক
আকাশ-শিশিরে টানো দেবত্বের অতুল কোরক।
পাঁক ফেটে উঠুক পঙ্কজ ! তপ্ত গঞ্জনার জ্বালা
অনন্ত অভীপ্সা যেন, দগ্ধ করে সংসার-দেয়ালা।

দাবি তাই—চিরদাবি—অহরহ নিত্য তুচ্ছতায়
সঙ্গী তারে কোরো নাকো ছলনার মায়াবী খেলায়।
ছাড়ো, ছাড়ো, যাদু ছাড়ো, মুক্তি দাও উন্মুখে উদ্দামে
মানুষেরে পেতে দাও—জীবনেই—তার ন্যায্য দামে।

---

* প্রধান অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চারুচন্দ্র কলেজ (নৈশ বিভাগ), কলিকাতা। কবিতা ও প্রবন্ধাদি রচনার মাধ্যমে বাংলাসাহিত্যসেবী।

আনন্দময়ি, আন আনন্দ

শ্রীহৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ

রজতছটায় এলো যে শরৎ রূপোর নূপুর পায়
যে দিকে তাকাই ভ'রে গেছে দেখি অপরূপ সুষমায় ;
মুছেছে কৃষ্ণ মেঘের কালিমা
পূব অঙ্গনে ফুটে অরুণিমা—
ইন্দুদ্যুতিতে উজল নীলিমা—সুধা ক্ষরে বসুধায়।

শিশিরে সিক্ত বিটপীর যত শ্যাম সুন্দর শাখা
নীল নভতলে শুভ্র বলাকা পুলকে মেলেছে পাখা ;
মাঠে কাশ বুঝি চামর ঢুলায়
কি মধু কাকলি কুলায় কুলায়
গগনাঙ্গনে লক্ষ তারায় যেন আলপনা আঁকা।

নিশিগন্ধা শিউলি সুবাসে সুরভিত সমীরণ
পিয়ে পরিমল মধুপের দল গায় মধু গুঞ্জন ;
বাপী ব্যেপে কোটি কমলের কলি
হাসিতে ভুবন তুলেছে উজলি
দুর্গে ! প্রকৃতি হরষে উথলি করে তব বন্দন।

জগজ্জননি ! জনজীবনেতে জ'মে আছে শুধু গ্লানি
ব্যথা ও শঙ্কা দূরিতে অভয়া বাড়াও অভয় পাণি ;
স্বার্থে স্বার্থে সদাই দ্বন্দ্ব
উজ্জীবনের কোথায় ছন্দ ?
আনন্দময়ি, দাও আনন্দ তিলেকের তরে আনি।

কে তুমি মা মহাশক্তি?

স্বামী গর্গানন্দ

কে তুমি মা মহাশক্তি হৈমবতী—কল্যাণী জননী
সুরাসুর-যক্ষরক্ষঃ মর্ত নর—নিখিল জীবের ?
ভূমা মহীয়সী উমা প্রকৃতি পরমা সনাতনী
বরদাত্রী রক্ষাকর্ত্রী প্রাণদাত্রী বিধাত্রী বিশ্বের।

ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি রূপ—সে তোমারই মূর্ত প্রতিচ্ছায়া,
সকলের মাঝে তুমি অধিষ্ঠিত সবার অজ্ঞাতে ;
সর্বতঃপ্রসারী নেত্রে নেহারিছ প্রতি ক্ষুদ্র কায়া,
তোমায় দেখে না কেহ মরীচিকা-ভ্রমের সংঘাতে।

অণু পরমাণু স্থূল সূক্ষ্ম বস্তু গুণ শক্তি মন
বুদ্ধি চিত্ত অহংকার তোমার সত্তায় সত্তায়িত ;
স্পন্দিত নন্দিত স্তব্ধ বৃত্তায়িত করম-মগন,
নিত্যকাল সর্বঘটে তব ইচ্ছা সদা সঞ্চারিত।

ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া কাল-বারিধির তরঙ্গমালায়
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-লীলা বহমান প্রবল গতিতে ;
জন্ম-মৃত্যু-চক্রমাঝে জীবকুল আবর্তিত হায়,
উঠিছে ভাসিছে পুন অনিবার্য ডুবিছে ত্বরিতে।

প্রলয়ে প্লাবিত সব লুপ্ত যবে জীবনের রেখা,
সংসারের প্রতিস্তরে সূক্ষ্মবীজ থাকে তব কাছে ;
তারপর সৃষ্টিকালে সমারোহে সবই দিবে দেখা,
জাগিবে নূতন বিশ্ব যথারীতি নব পূর্বসাজে।

সংসারের রঙ্গমঞ্চে ঘূর্ণ্যমান অস্থির জীবন,
হাসি-কান্না সুখ-দুঃখ অভিমান ক্রোধ হিংসা মাঝে ;
অশান্তি নিয়ত দ্বন্দ্ব হানাহানি কভু মহারণ
তোমার মায়ার খেলা কি বিষম মোহনীয়া সাজে !

মুগ্ধ রাখিয়াছ সবে সৃষ্টিচক্রে আপন খেয়ালে,
অঘটন ঘটনের পটীয়সী তুমি স্বেচ্ছাময়ী ;
কারণেরও মূল তুমি নিজভাবে থাকি' অন্তরালে,
বিচিত্র খেলায় মত্ত হেতুহীন সদা অবিষয়ী।

ব্যাপ্ত তুমি সর্বস্থলে সীমাতীত আদি-অন্তহারা,
কিরূপে ধরিবে তোমা ক্ষুদ্রচিত্ত অনুভূতি মাঝে ?
দেখা দিয়ে ধন্য তাই করো ভক্তে বর্ষি' কৃপা-ধারা,
দ্যুতিময়ী শান্তিময়ী শান্ত স্নিগ্ধ অপরূপ সাজে।

ব্যর্থতা বরিল কেহ সুকঠোর তপশ্চর্যা করি',
অল্পায়াসে কৃপাসিদ্ধ কারো ভাগ্যে অনন্য বিস্ময় ;
অপূর্ব সম্পদ কেহ লভিল বা অনুরাগে স্মরি',
সুদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান তোমা হ'তে একমাত্র হয়।

তোমার বিরাট ইচ্ছা ক্রিয়াশীল একান্ত নীরবে,
সাক্ষী শুধু একমাত্র সীমা যথা অসীমে মিলায় ;
বাক্য-মন-অগোচরে প্রতিষ্ঠিত পরম বৈভবে
আপন আনন্দে পূর্ণ রাজো তুমি নিজ মহিমায়।

তোমার মহিমা তুমি, সমতুল কেহ কভু নয়,
চিন্ময়ী আনন্দময়ী সনাতনী সকলের গতি ;
দাও যোগ জ্ঞান ভক্তি দরশন দিব্য জ্যোতির্ময়,
তুচ্ছ মর্ত-মানবের লহ মাগো মানস প্রণতি।

রামকৃষ্ণ মিশন

বন্যাসেবাকার্য

আবেদন

বিহারের বন্যাকবলিত দ্বারভাঙ্গা জেলার হায়াঘাটে ছাতনা পঞ্চায়েতের ছয়টি গ্রামে আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে রামকৃষ্ণ মিশনের আরব্ধ সেবাকার্য ভাগলপুর জেলার নওগাছিয়া মহাকুমায়ও প্রসারিত হইয়াছে। এইসব অঞ্চলে দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য ও জামা-কাপড় বিতরণ করা হইতেছে। কাটিহার সহরের উপকণ্ঠে বন্যাদুর্গত গৃহহারাদের মধ্যে ঘর-বাড়ী তৈয়ারীর জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিতরণের ব্যবস্থা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে মালদহ জেলার রাতুয়ায় এবং মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগে আশ্রয়প্রাপ্ত বন্যাপীড়িত জনগণের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন রান্না করা খাদ্যদ্রব্য (খিচুড়ি ইত্যাদি) বণ্টন করিতেছে।

সারাদেশব্যাপী বন্যার যে তাণ্ডবনৃত্য শুরু হইয়াছে, তাহাতে অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলেও সেবাকার্য আরম্ভ করা প্রয়োজন হইতে পারে।

এই সেবাকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে এবং প্রয়োজনমত আরও বৃহত্তর অঞ্চলে ব্যাপকভাবে সেবাকার্য শুরু করার জন্য মুক্তহস্তে অর্থ ও সাহায্যদ্রব্যাদি দান করিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের এই প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে উদারহৃদয় জনসাধারণের নিকট অনুরোধ জানাইতেছি। নিম্নলিখিত ঠিকানায় সকল প্রকার দান সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

চেক ও ব্যাংক ড্রাফ্‌ট "রামকৃষ্ণ মিশন"-এর নামে লিখিয়া "একাউন্ট পেয়ী" করিয়া দিতে হইবে। রামকৃষ্ণ মিশনে দান আয়করমুক্ত।

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা ঃ

১। রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ ৭১১-২০২, হাওড়া

২। অদ্বৈত আশ্রম, ৫, ডিহি ইণ্টালী রোড, কলিকাতা ৭০০-০১৪

৩। উদ্বোধন কার্যালয়, ১, উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০-০০৩

৪। রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটিউট অব্ কালচার, গোলপার্ক, কলিকাতা ৭০০-০২৯

৫। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পাটনা ৮০০-০০৪

৬। রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটি, জামসেদপুর ৮৩১-০০১

৭। রামকৃষ্ণ মিশন খার, বোম্বাই ৪০০-০৫২

৮। রামকৃষ্ণ মিশন, নয়া দিল্লী ১১০-০৫৫

তারিখ, বেলুড় মঠ
২৯শে আগষ্ট, ১৯৭৮

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক

বিবেকানন্দ-মন্দির

শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু*

১

ঠিক যেন গঙ্গাগর্ভে সমাধিতে তিনি লীন হয়ে আছেন। অনন্ত অপার্থিব শান্তি আর মৌন তাঁকে ঘিরে। এই তিনি চেয়েছিলেন—

'উপরে সূর্য তাঁর নির্মল কিরণ বিস্তার করছেন, পৃথিবী চারিদিকে শস্যসম্পদশালিনী হয়ে শোভা পাচ্ছেন, দিনের উত্তাপে সব প্রাণী ও পদার্থ কত নিস্তব্ধ, স্থির—শান্ত! আর আমিও···প্রভুর ইচ্ছারূপ প্রবাহিণীর সুশীতল বক্ষে ভেসে চলেছি!···যাই! মা, যাই!—তোমার স্নেহময় বক্ষে ধারণ ক'রে যেখানে তুমি নিয়ে যাচ্ছ, সেই অশব্দ, অস্পর্শ, অজ্ঞাত, অদ্ভুত রাজ্যে···কেবল দ্রষ্টা বা সাক্ষীর মতো ডুবে যেতে আমার দ্বিধা নেই!'

বেলুড় মঠের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে, একেবারে গঙ্গাতটে, বিবেকানন্দ-মন্দিরের সংকীর্ণ প্রবেশপথ দিয়ে প্রবেশ করে, যখনই স্বামীজীর ধ্যানমূর্তির সামনে নত হয়েছি, তখনই ভিতর থেকে ভেসে-আসা সূক্ষ্ম সৌগন্ধ্যে, আর বিচিত্র অপূর্ব এক প্রভাবে মন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। কী নিবিড়! কী গভীর!···মনে হয়েছে, উপরের ঐ বর্ণনাটি স্মরণ করেই যেন মন্দিরটি নির্মিত! নচেৎ গর্ভমন্দির এত নীচু কেন? কেন স্বামীজীর রিলিফ-মূর্তিটি প্রায় গঙ্গাপ্রবাহের সমস্তরে স্থাপিত? তা কি এইজন্য যে, গঙ্গার ঢালু পাড়ে, যেখানে স্বামীজীকে দাহ করা হয়, তারই উপরে তৈরী বেদীতে স্থাপিত করতে হয়েছে রিলিফটিকে;—এবং তারপর ক্রমে নদীর পাড় উঁচু করা হয়েছে বলে মনে হয়, মূর্তিটি যেন গঙ্গার অন্তঃপ্রবাহিত তরঙ্গের উপরে ভাসমান!!

এইসব বাস্তব তথ্য-যুক্তি পূর্বে মনে আসেনি। অপরপক্ষে মন্দিরে প্রবেশ করলেই মনের মধ্যে দোলা দিয়ে গেছে মিস ম্যাক-লাউডকে ১৮ এপ্রিল, ১৯০০ তারিখে লেখা স্বামীজীর কথাগুলি, যার কিছু অংশের অনুবাদ উপরে উৎকলন করেছি। ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজীর ঐ পত্রটিকে তাঁর বিশাল ভাবানুভূতির সর্বাধিক-সম্পূর্ণ অক্ষয় অভিব্যক্তি বলেছেন। 'It is···the most complete single expression that I can remember of His Great Mood, in permanent form'. [Nivedita to Miss MacLeod, 21.2.1907]

২

বিবেকানন্দ-মন্দিরের নির্মাণকাজ শুরু হয় কবে? আরম্ভের দিনটি ঠিকভাবে নির্ধারণ করতে না পারলেও, প্রবুদ্ধ ভারতের পুরনো সংখ্যার পৃষ্ঠা উল্টে মোটামুটি বলতে পারি—কাজ শুরু হয়েছিল ১৯০৭ সালের জানুআরি মাসের পরে। প্রবুদ্ধ ভারতে ১৯০৩-১৯০৭ পর্যন্ত সময়ে স্বামীজীর জন্মোৎসবের যেসব

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' (তিন খণ্ডে), 'সহাস্য বিবেকানন্দ', 'নিবেদিতা লোকমাতা', 'সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং', 'ভারতচন্দ্র', 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি', মধ্যযুগের কবি ও কাব্য' ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা। 'বিবেকানন্দ ইন্ ইণ্ডিয়ান নিউজপেপার্স' গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক।

বিবরণ বেরিয়েছে, তাতে স্বামীজীর সমাধি-মন্দিরের কোনো উল্লেখ নেই। তা প্রথম পাওয়া যায় ১৯০৯ সালের জন্মোৎসব বিবরণে। ঐ বৎসরের ফেব্রুআরি-মার্চ সংখ্যায় পাই :

'.. At the extreme south-east corner of the lawn, washed by the rippling waves of the holy Ganges, is the site where the ashes of the great Swami rest; on it a Memorial Temple is now being erected to perpetuate his memory. In the interior of this *unfinished building*, a large portrait of Swamiji was placed and beautifully decorated.'

[বক্রলিপি লেখক-নির্দেশে]

উপরে উল্লেখিত 'অসমাপ্ত ভবন' সমাপ্ত হওয়ার ইতিহাস দীর্ঘ, অর্থাৎ বহু বৎসর ধরে ক্রমনির্মিত মন্দির এটি। এবং সে ইতিহাস বেদনাদায়ক, কারণ মন্দিরটি পূর্ণাঙ্গ আকার ধারণ করতে বহু বৎসর লাগার হেতু আর কিছু নয়—অর্থাভাব। মন্দিরটি এখন যে-আকারে বর্তমান তাতে এটিকে বিপুল ব্যয়ে নির্মিত মন্দির মনে হয় না। তথাপি সেই অর্থের জন্যই স্বামী ব্রহ্মানন্দকে কাতরভাবে ভিক্ষা করতে হয়েছিল সারা ভারতবর্ষের কাছে—ভারতের বাইরের মানুষের কাছেও।

লোকমান্য তিলক-প্রবর্তিত এবং তাঁর সহকর্মী এন সি কেলকার-সম্পাদিত, পুনার বিখ্যাত ইংরাজি সাপ্তাহিক 'মরাঠা'র [*Mahratta*] পুরনো সংখ্যাগুলি ওল্টাবার সময়, তাতে ১৯১২, ১৪ জানুআরি, স্বামী ব্রহ্মানন্দের একটি আবেদনপত্র প্রকাশিত হয়েছে দেখেছি।[১] এই আবেদনপত্রের উপরে ভূমিকারূপে সম্পাদক কিছু মন্তব্য যুক্ত করেন—শিরোনামা ছিল *Semi-Centenary of Swami Vivekananda*। মরাঠার বিখ্যাত সম্পাদক স্বামী বিবেকানন্দের বিরাট কীর্তির মূল্যায়ন করতে গিয়ে যা বলেছিলেন, তার মধ্যে একালের ইতিহাসসচেতন পাঠক জ্ঞাতব্য বস্তু পাবেন। তিনি বলেছিলেন—'স্বামী বিবেকানন্দই ভারতীয় জাতীয়তার আসল পিতা।...প্রত্যেক ভারতবাসী আধুনিক ভারতের এই পিতার জন্য গর্বিত।'

'Swami Vivekananda's achievements were in a sense meteoric, so suddenly and brilliantly did they shine. Within a life of 39 years, the Swami did the grand work of re-establishing Hinduism in its pedestal of supremacy against the onsets of scientific materialism... *Swami Vivekananda is the real father of Indian nationalism*···*Every Indian is proud of this father of Modern India.*'

['Semi-Centenary of Swami Vivekananda, *Mahratta*, January 14, 1912],

প্রত্যেক ভারতবাসী যদিও আধুনিক ভারতের পিতার জন্য গর্বিত ছিল, তথাপি তাঁর স্মৃতিরক্ষায় তারা বাস্তবিকপক্ষে কী করেছিল? মরাঠা কাগজে মুদ্রিত স্বামী ব্রহ্মানন্দের আবেদনপত্রে কিন্তু ভারতবাসীর দায়িত্বপালনের গৌরবময় ইতিহাস নি...

১ এটি বলা বাহুল্য প্রবুদ্ধ ভারতেও প্রকাশিত হয়েছিল, জানুআরি, ১৯১২ সংখ্যায় —*The Coming Semi-Centennial of Swami Vivekananda's Birthday.*

ছিল না।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রেরিত এই আবেদনপত্রের সূচনায় স্বামীজীর কর্মকীর্তির উল্লেখ করে বলেছিলেন: মাত্র দশ বছর আগে স্বামীজীর দেহান্ত হয়েছে; সমগ্র ভারতবর্ষে তাঁর লোকান্তর 'জাতীয় বিপর্যয়' বলে প্রতীয়মান হয়েছে; এবং সেজন্য 'শোক ও ভক্তির তুলনারহিত অভিব্যক্তি' দেখা গিয়েছে। 'কিন্তু'—ব্রহ্মানন্দ প্রশ্ন করেছিলেন—'আধুনিক ভারতের এই দেশপ্রেমিক-ঋষির উপযুক্ত স্মারকের কোন্ ব্যবস্থা আমরা করতে পেরেছি?'

স্বামীজীর উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের প্রয়াস ও পরিকল্পনার বিবরণ স্বামী ব্রহ্মানন্দ দিয়েছিলেন। 'রামকৃষ্ণ মিশন চায়, স্বামীজীর স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে গঙ্গাতীরে একটি মন্দির নির্মাণ করতে, যার ছাদতলে লোকান্তরিত আচার্যের চিতাভস্ম রক্ষিত হবে, তদুপরি থাকবে একটি বৈদিক বিদ্যালয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ধর্ম ও দর্শনগ্রন্থের একটি গ্রন্থাগার, এবং ঐ বিষয়ে আলোচনার জন্য সভাকক্ষ। এই পরিকল্পনা সফল করার জন্য স্বামীজীর ভারতীয় বন্ধু ও অনুরাগীগণ, সেই সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য বেদান্ত-কেন্দ্রগুলির কাছে ব্যক্তিগত পত্র প্রেরিত হয়েছিল। তাতে যেটুকু সাড়া পাওয়া গিয়াছে, তার দ্বারা নদীতটের বাঁধাই, এবং মূল মন্দিরভবনের ভিত্তিনির্মাণের কাজ পর্যন্ত শেষ করা যায়নি, কেবল স্বামীজীর চিতাভূমির উপরিস্থ বেদীকে আচ্ছাদিত করেছে, এমন একটি সাদা-মাঠা নীচু-ছাদ ঘর তৈরী করা গেছে। স্বামীজীর চিতাভস্ম বর্তমানে মঠের [শ্রীরামকৃষ্ণ-] মন্দিরের মধ্যে অস্থায়ীভাবে রক্ষিত।'

দুঃখে বেদনায় স্বামী ব্রহ্মানন্দ লিখেছিলেন, 'এই অসমাপ্ত স্মারক-মন্দির ভারত-সন্তানদের লজ্জা ও অপদার্থতার স্মারক-রূপে দাঁড়িয়ে আছে।'

কিভাবে এই লজ্জা অপনোদন করা যায়, তার বিষয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ একটি প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি জানান, পরিকল্পনাটির পূর্ণ রূপায়ণের জন্য আরও তিরিশ হাজার টাকা প্রয়োজন। 'যাঁরা স্বামীজী ও তাঁর জীবনব্রতের দ্বারা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কোনো না কোনোভাবে উপকৃত হয়েছেন এমন প্রতিটি মানুষ এই ধর্মীয় শপথ গ্রহণ করুন—স্বামীজীর পঞ্চাশত্তম জন্মবৎসরে তাঁরা তাঁদের মাসিক আয়ের এক-পঞ্চাশৎ অংশ সরিয়ে রেখে, তা পাঠিয়ে দেবেন গুরুদক্ষিণারূপে।...সেই একই কাজ করুন পৃথিবীর সর্বস্থানের মিশনের প্রতিটি প্রকাশন-সংস্থা, এবং মিশনের দ্বারা অনুমোদিত বা অননুমোদিত প্রতিটি বেদান্ত-কেন্দ্রও বিবেকানন্দ সোসাইটি, যাঁরা স্বামীজীর নামে ব্যবসায়িক লেনদেন করে থাকেন। ...এই সহজ উপায়টির দ্বারা—যা কারো সঙ্গতির উপরে বিশেষ চাপসৃষ্টি করবে না—আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস, স্মৃতিমন্দিরের গম্বুজের শীর্ষ সাগরবাহিনী পবিত্র গঙ্গাতীরে উর্ধ্বাকাশে মাথা তুলে দাঁড়াবে—তা হবে ভারতের দেশপ্রেম ও ধর্মচেতনার প্রতীক-তুল্য। এক বছরের কিছু ত্যাগের ফলে এই স্মারকমন্দির জাতীয় গৌরবের নিদর্শনরূপে ভবিষ্যৎ কালের জন্য সমুন্নতদেহে বর্তমান থাকবে—এই কল্পনায় কার হৃদয় না আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠবে?'

৩

অত্যন্ত আক্ষেপ ও আকুলতায় পূর্ণ স্বামী ব্রহ্মানন্দের আবেদনে কোন্ সাড়া মিলেছিল? বলা চলে, তা 'চমকপ্রদ', তবে অভিপ্রেত

অর্থে নয়। ১৯১৩ সালের ফেব্রুআরি-মার্চ সংখ্যার প্রবুদ্ধ ভারতে 'বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল ফাণ্ড'—এই নামে স্মৃতিভাণ্ডারে লব্ধ অর্থের যে-হিসাব মেলে, তার সারাংশ এই :

'দেখা যাচ্ছে, প্রবুদ্ধ ভারত অফিস, অদ্বৈত আশ্রম এবং তার সদস্যগণ প্রদত্ত ১৮৯ টাকা ছাড়া আমরা [প্রবুদ্ধ ভারত কর্তৃপক্ষ] সাধারণের কাছ থেকে ১৯১৩ সালের ফেব্রুআরি মাস পর্যন্ত সময়ে [অর্থাৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ কর্তৃক নির্ধারিত এক বৎসরে] ২৮৭ টাকা ৪ আনা সংগ্রহ করেছি। এবং ১৯১২, ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে বেলুড় মঠে দাতারা ৬০৭ টাকা ১৫ আনা পাঠিয়ে দিয়েছেন। সব জড়িয়ে দাঁড়িয়েছে ১০৮৪ টাকা ৩ আনা।'

এই শুভ সংবাদ দানের পরে প্রবুদ্ধ ভারত কর্তৃপক্ষ, যাঁরা আয়ের এক-পঞ্চাশৎ অংশ দানের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, সেই 'ব্রতী'দের সবিশেষ ধন্যবাদ দিয়েছিলেন। তারপর লেখেন, 'মানুষের কৃতজ্ঞ হৃদয়ের কাছে আমরা আবেদন জানিয়েছিলুম—যে-মানুষের সেবায় স্বামীজী নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।… আমাদের আবেদনে অতি নগণ্যসংখ্যক মানুষকে সাড়া দিতে দেখে তাই আমরা বিস্মিত। কিন্তু নৈরাশ্যের কারণ নেই। আমাদের মহান আচার্যের অনুগামী বা শিষ্য-রূপে আমাদের প্রিয় পোষিত পরিকল্পনাকে আমরা পরিত্যাগ করতে পারি না।'

প্রিয় পোষিত পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়নি, কিন্তু তাকে অবিলম্বে কার্যকর করাও যায়নি। 'আধুনিক ভারতবর্ষের পিতা' নামে স্বীকৃত মহাপুরুষের মাঝারি আকারের সমাধি-মন্দিরের নির্মাণকাজ ১৯০৭ সালে আরম্ভ হয়ে সমাপ্ত হয়েছিল ১৯২৩ সালের শেষের দিকে। এই সময়ের মধ্যে অগণিত সভায় হাজার-হাজার মানুষ বিবেকানন্দের নামে জয়ধ্বনি দিয়েছে। হাজার হাজার মানুষ স্বামীজীর অসমাপ্ত সমাধিমন্দিরে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে গেছে। এই সকল মানুষের ভক্তির আন্তরিকতায় সন্দেহ করা সম্ভব নয়—তবে মনে রাখতে হবে—আমাদের ভক্তির সঙ্গেই আছে জাড্য, যার জন্য গঠনমূলক কাজ আমরা করে উঠতে পারি না।

যাই হোক, স্বামীজীর সমাধিমন্দির মধ্যমাকার হলেও এর স্থাপত্য অতি চমৎকার। চিতাভূমির উপরে আচ্ছাদনী হিসাবে নির্মিত নীচুছাদ ঘরটির সঙ্গে পরবর্তী কালে নানা অঙ্গ যোজনা করে যে-মন্দির হয়েছে—তার ছন্দোময় সামগ্রিকতা প্রশংসাযোগ্য। এখন, এই মন্দিরের স্থাপত্য-পরিকল্পনা কার? সঙ্গত-ভাবেই অনুমান করতে পারি—স্বামী বিজ্ঞানানন্দই একাজ করেছেন—রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম পর্বের ভবন ও মন্দিরাদির স্থাপত্য-পরিকল্পনা যিনি করতেন—স্বামীজীর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের স্থাপত্য-পরিকল্পনা করে যিনি অমর গৌরবের অধিকারী হয়েছেন।

নানা সূত্র থেকে প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী আমরা বলতে পারি, ১৯০৮ সালের অসমাপ্ত সমাধিমন্দির আরও ১২ বছর প্রায় একই ভাবে পড়ে থেকেছিল। ১৯২০ বা ১৯২১ সাল থেকে তোড়জোড় করে এর নির্মাণ সমাপ্ত করার চেষ্টা করা হয়। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ "স্বামী বিজ্ঞানানন্দ" গ্রন্থে লিখেছেন, 'এই সময়েই [১৯১৯ খ্রী] [১৯২০ ? ১৯২১ ?] বিজ্ঞান-মহারাজ রাখাল-

মহারাজের আহ্বানে বেলুড় মঠে বিবেকানন্দ-মন্দির নির্মাণ করাইতে যান। ইহার কয়েক মাস পূর্ব হইতেই তিনি স্বামীজীর ভাবে খুব মগ্ন ছিলেন।' [পৃ. ৮৮]।[২]

'প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ' গ্রন্থে ধৃত আরও কয়েকটি স্মৃতিকথায় (যেমন স্বামী জ্ঞানদানন্দের ও স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দের স্মৃতিকথায়) বিজ্ঞানানন্দ কর্তৃক বিবেকানন্দ-মন্দির তত্ত্বাবধানের কথা আছে। ঐ কালে বিজ্ঞান-মহারাজের আচার আচরণের চমৎকার বিবরণ পাই স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দের লেখায়—তার অংশ এই :

'আমরা তাঁহাকে [বিজ্ঞানানন্দকে] প্রথম দর্শন করি ১৯২১ সালে। তখন তিনি স্বামীজীর মন্দির নির্মাণের জন্য বেলুড় মঠে আসিয়াছেন। উহার কিছু পূর্ব হইতে স্বামীজীর মন্দিরের পূজাদির ভার আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। তখন শুধু স্বামীজীর মন্দিরের নীচের অংশটুকু (যেখানে স্বামীজীর প্রতিমূর্তি রহিয়াছে), ও উহার চারিদিকের আবরণশূন্য বারান্দামাত্র ছিল। নিকটে তখন অন্য কোনো মন্দিরাদি ছিল না। মঠবাড়ির অংশ ছাড়া, তাহার দক্ষিণ দিকে, স্বামীজীর মন্দিরের দিকেও, কোনো পোস্তা বাঁধানো হয় নাই। জোয়ারে গঙ্গার জল প্রায় স্বামীজীর মন্দিরের কাছাকাছি আসিয়া পড়িত।…ঐ মন্দিরের চারিদিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিছু ইষ্টকাদি পড়িয়াছিল। একদিন একটি বিদেশাগত ভদ্রলোক (সাহেব) আসিয়া আমাদের দেখিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা বিবেকানন্দ মন্দিরটি এরূপ অযত্নে ফেলিয়া রাখিয়াছ কেন ?"…পরে মহাপুরুষ-মহারাজকে উহা নিবেদন করিলে তিনি বলিলেন, "কেন, ওটি under construction [নির্মাণাধীন] বললে না কেন ?" …মঠের অফিসের…জনৈক ব্রহ্মচারীও…

২ 'প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ'নামক গ্রন্থে ধৃত স্বামী সদাশিবানন্দের স্মৃতিকথায় অনুরূপ সংবাদ পাই—

'ইহার প্রায় বৎসরখানেক পরে [আন্দাজ ১৯২০] পূজনীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের আহ্বানে বিজ্ঞানানন্দজী স্বামীজীর সমাধিমন্দির নির্মাণ উপলক্ষে কিছু দিনের জন্য বেলুড় মঠে যাইয়া অবস্থান করেন। এলাহাবাদে থাকিতে আমরা দেখিয়াছি, সেই সময় পূজনীয় বিজ্ঞান-মহারাজ স্বামীজীর ধ্যানে গভীরভাবে মগ্ন থাকিতেন। তখন তিনি আমাদের নিকট শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা অপেক্ষা স্বামীজীর কথাই বেশি বলিতেন। প্রায় প্রত্যহ স্বামীজীর উপদেশ ও তাঁহার মহাজীবনের অপূর্ব ঘটনাবলী আলোচনা করিতেন। প্রায়ই তিনি ভরদ্বাজ আশ্রমে যাইয়া সপ্তর্ষির যে মূর্তিটি আছে তাহা তন্ময় হইয়া দর্শন করিতেন। আবার আমাদিগকে বলিতেন, কল্পে-কল্পে যে-সকল সপ্তর্ষিমণ্ডল হয়, তাঁহারাই বিশ্বমঙ্গলের একমাত্র নিয়ন্তা। এই সময়ে তিনি জয়পুরবাসী একজন প্রবীণ চিত্রশিল্পীর দ্বারা সপ্তর্ষিমণ্ডলের একখানি তৈলচিত্র অঙ্কন করান ও তাঁহার শয়নকক্ষে তাহা রাখেন। মহারাজজী বলিতেন, "বিশ্বের সর্বত্র স্বামীজী আছেন; কিন্তু সপ্তর্ষিমণ্ডলেই তাঁর স্থান। তিনি সেখান থেকেই জগতের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন।"' [৩০৩]।

আধ্যাত্মিক দর্শনাদি সম্পর্কে পাঠক নিজ ইচ্ছামতো ধারণা গঠন করবেন। কিন্তু আমাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সংবাদ—স্বামীজীর মন্দির নির্মাণের ভার নেবার পূর্ব থেকেই, নির্মাণকালেও অবশ্যই, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ স্বামীজীতে একেবারে মগ্ন থাকতেন, যা দেখিয়ে দেয়—ঐ মন্দিরগঠনের পিছনে কোন্ ভাব-শক্তি সক্রিয় ছিল।

বলিলেন, "মহাপুরুষ-মহারাজ ঠিকই বলেছেন; এই মন্দিরের ওপরে শীঘ্রই একটি দোতলা মন্দির হবে। তার নকশাদিও ঠিক হয়েছে, এবং এর জন্য অর্থাদিও এসেছে। কিন্তু তা করবার ভার বিজ্ঞান-মহারাজের উপর। তিনি এলাহাবাদে থাকেন—একটু খাম-খেয়ালী লোক। তাই কবে এসে যে কাজ করবেন তা এখনো ঠিক হয়নি।"···

'[তারপর—] তখন ফাল্গুন কি চৈত্র মাস। দেখিলাম একটি ছ্যাকরা-গাড়ি করিয়া তিনি হঠাৎ সামনের মাঠে আসিয়া নামিলেন। ...নামিয়াই কিন্তু সোজা স্বামীজীর মন্দির অভিমুখে গেলেন, ও নিকটবর্তী যাঁহাদের দেখিতে পাইলেন (তাঁহাদের মধ্যে বোধ হয় স্বামী শঙ্করানন্দজীও ছিলেন) তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, স্বামীজীর মন্দিরের জন্য কি-কি মালমসলা জোগাড় করা হইয়াছে। উহা সবিশেষ শুনিয়া তিনি মঠবাড়ির দিকে অগ্রসর হইলেন। ···আহার ও বিশ্রামাদির পর তিনি আবার স্বামী শঙ্করানন্দজী প্রভৃতির সহিত স্বামীজীর মন্দির সম্বন্ধে কথা বলিতে লাগিলেন।

'অতি শীঘ্রই মালমসলা জোগাড় হইল এবং তিনিও নির্মাণকার্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। তখন তাঁহার বয়স পঞ্চাশেরও উর্ধ্বে, দেহও খুব স্থূল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তাঁহাকে কি অক্লান্ত পরিশ্রমই না করিতে দেখিয়াছি। সকালে চা ও তৎসঙ্গে সামান্য কিছু খাইয়া, কুলি-মজুরেরা কাজে আসিবা-মাত্রই—বেলা আটটায় তিনি কার্যস্থলে উপস্থিত হইতেন, এবং বেলা একটা পর্যন্ত, যতক্ষণ মিস্ত্রি ও কুলিরা কাজ করিত, ততক্ষণ, নিকটবর্তী দেবদারু বৃক্ষতলে কখনো-বা দাঁড়াইয়া, কখনো-বা বেঞ্চিতে বসিয়া সকল কার্যই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করিতেন। একটায় সকলের কাজ শেষ হইলে তিনি আসিয়া হাত-মুখ ধুইয়া (স্নান তিনি অতি অল্পই করিতেন) দুপুরের আহারাদি শেষ করিয়া (আহার অতি সাধারণই ছিল) সামান্য একটু বিশ্রাম করিতেন। আবার দুইটা হইতে কাজ আরম্ভ হইলেই তিনি বিশ্রাম হইতে উঠিয়া সেখানে যাইতেন। তাঁহাকে এই বৃদ্ধ বয়সেও ঐরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে দেখিয়া লজ্জায় অধোবদন হইতাম।'

জ্ঞানাত্মানন্দের স্মৃতিকথা থেকে কতকগুলি দরকারী কথা পাই। বিবেকানন্দ-মন্দিরের নির্মাণকার্যের তত্ত্বাবধান করেন অন্য কেউ নন স্বয়ং স্বামী বিজ্ঞানানন্দই। দ্বিতীয়তঃ স্বামীজীর 'অভিন্নহৃদয়' গুরুভ্রাতা স্বামী ব্রহ্মানন্দের চোখের সামনেই ঐ নির্মাণকাজ প্রায় শেষ হয়েছিল। তৃতীয়তঃ এই শেষ পর্যায়ের কাজের আগেই স্বামীজীর মর্মর রিলিফ একতলা নীচু গর্ভমন্দিরের মধ্যে স্থাপিত হয়ে গেছে, এবং তার পূজাদিও শুরু হয়েছে। এখন প্রশ্ন, ঐ মূর্তি কবে স্থাপিত হয়েছিল?

প্রবুদ্ধ ভারতে স্বামীজীর জন্মতিথি-উৎসবের বিবরণের মধ্যে এই রিলিফ মূর্তির প্রথম উল্লেখ পাই ১৯১৩ ফেব্রুআরি-মার্চ সংখ্যায়। তার আগের কয়েকটি সংখ্যায় কেবল স্বামীজীর চিতাস্থলের উপরে নির্মিত মর্মর বেদীর কথা আছে। ১৯১৩ সালের রিপোর্টে 'সম্প্রতি স্থাপিত স্বামীজীর মর্মর ধ্যানমূর্তি'র কথা এই প্রকার:

'From early morning until late at night vast crowds came···sojourning in meditation before the image in marble, recently placed in the Memorial Chapel

erected in his honour'[৩]

পরবর্তী দুই বৎসরে, অর্থাৎ ১৯১৪ ও ১৯১৫ সালের জন্মোৎসব বিবরণীতেও 'স্বামীজীর পূর্ণাবয়ব মর্মর প্রস্তর-নির্মিত ধ্যানমূর্তির' কথা আছে—কিন্তু ঐ মূর্তি তখনো বর্তমানে যে-রকম দেখা যায়, সেইভাবে ভিত্তিপ্রাকারে গ্রথিত হয়নি। মিস ম্যাকলাউডের ১৬ ডিসেম্বর, ১৯১৫ তারিখের পত্র অনুযায়ী সেই ধারণা আমরা করতে পারি। মিস ম্যাকলাউড তাঁর ভাগিনেয়ী অ্যালবার্টা মার্জেসনকে (অল্প পরে লেডী স্যাণ্ডউইচ) ঐ পত্রে লিখেছিলেন:

'আমি মঠে ছিলাম—স্বামীজীর মর্মর প্রস্তরে প্রস্তুত ব্যাস-রিলিফ (bas-relief) মূর্তিটি কিভাবে বসানো হবে ঠিক করে এসেছি। সেটি বসানো হবে দেওয়ালের গায়ে; চার ইঞ্চি পুরু বালির কাজ করে তা করতে হবে; মর্মর প্রস্তরের ফ্রেমের যেটুকু গভীরতা, সেইটুকু দেওয়ালের সঙ্গে ব্যবধান থাকবে। ওঁরা রিলিফকে দেওয়ালের ভিতরে ঢুকিয়ে বসাতে পারলেন না, কারণ ঐ দেওয়ালই হবে নতুন গ্রন্থাগার-ভবনের ভিত্তিপ্রাকার।'

মনে হয়, ১৯১৬ সালে জন্মতিথি উৎসবের আগেই মর্মর-রিলিফ দেওয়ালে গাঁথা হয়ে যায়। তবে ১৯১৬ সালের উৎসব-বিবরণীতে এ-বিষয়ে স্পষ্ট কোন উল্লেখ নেই।[৪]

স্বামী গম্ভীরানন্দের 'History of the Ramakrishna Math and Mission' গ্রন্থে পাই, ('957 Ed., p. 281) সমাধিমন্দির ১৯২৩ সালের মধ্যেই সমাপ্ত হয়েছিল। ১৯২৪ সালের ২৮ জানুআরি তার প্রতিষ্ঠাকার্য হয়। এ সম্পর্কে উদ্বোধন পত্রিকার ফাল্গুন ১৩৩০ সংখ্যায় স্বামীজীর মন্দিরের একটি চিত্র ছাপা হয়। তার তলায় এই অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণটি বেরিয়েছিল:

বেলুড় মঠে শ্রীবিবেকানন্দের ওঁকার-মন্দির

প্রতিষ্ঠিত—সোমবার ১৪ই [২৮শে] মাঘ (১৩৩০), ২৮ জানুয়ারী (১৯২৪)

বিগত ২৪শে মাঘ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব দিবসে বেলুড় মঠে তাঁহার ওঁকার মন্দির প্রতিষ্ঠাকার্য সুসিদ্ধ হইয়াছে। ঐ উপলক্ষে প্রায় ৫০০০ সহস্র ভক্তনারায়ণ প্রসাদ প্রাপ্ত হন।

৩ ১৯১২, ফেব্রুআরি-মার্চের প্রবুদ্ধ ভারতে রিলিফ মূর্তির উল্লেখ নেই।—

'Across the length of the monastery grounds there is a small chapel which has been erected over the very ground on which the dead body of the Master was consigned to the flames. A marble altar is there, and upon it was a portrait of the Swami in meditation posture.'

এর আগের বছরের রিপোর্টেও 'শুভ্র মর্মর বেদী'র কথা আছে যার উপরে চিতাভস্ম স্থাপিত।

৪ প্রবুদ্ধ ভারত, ১৯১৬ ফেব্রুআরি-মার্চ সংখ্যায় পাই—

'In another place others were looking with worshipful eyes into the temple where is reposed the ashes of the Swami, and where a marble bas-relief of the Swamiji in meditation-posture was most tastefully decorated with garlands.'

প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকাও এই মন্দির উদ্বোধনের বিবরণ দেওয়ার ব্যাপারে সবিশেষ সংযম দেখিয়েছিল।[৫]

মিস ম্যাকলাউড অ্যালবার্টা মার্জেসনকে এই উপলক্ষে, ১৩ ফেব্রুআরি, ১৯২৪ তারিখে লিখেছিলেন,

'মাদার [মিসেস লেগেট] স্বামীজীর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাদিবস ২৮ জানুয়ারিতে ৫০০০ টাকা দিয়েছেন মন্দিরের পিছনের পোস্তা তৈরির জন্য। দেখা যাচ্ছে, বর্তমান দেওয়াল-টিকে পিছনের আর একটি দেওয়ালের দ্বারা আরও জোরদার করা দরকার, যেটি শ্রীমা ও ব্রহ্মানন্দজীর মন্দিরের সমরেখায় নির্মিত হবে। অত্যন্ত উপযুক্ত এবং একেবারে মূলগত কাজ এটি—কারণ স্বামীজী—তাঁর দেহত্যাগের আগের দিন ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে, যা ১৫০০ বৎসর বর্তমান থাকবে এবং দু মাইল বিস্তৃত হবে।'

এখানেই মন্দিরের গঠনপ্রসঙ্গ শেষ হচ্ছে না। প্রথমে যে-সিঁড়ি নির্মিত হয়, তা এতই খাড়াই ও সংকীর্ণ ছিল যে, অনেকেরই পছন্দ হয়নি, বিশেষতঃ মিস ম্যাকলাউডের। এগার বছর পরে, ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৩৫ তারিখে তিনি অ্যালবার্টাকে লিখেছেন, 'মিসেস বি. ইতালির Villa d' Este-এর সিঁড়ির একটি বিশেষ পরিচ্ছন্ন নকশা করে পাঠিয়েছেন, যার অনুরূপ আমরা স্বামীজী-মন্দিরের জন্য করতে পারব। বর্তমানে যে-সিঁড়ি আছে তা খাড়াই উঁচু এবং সংকীর্ণ—একেবারেই তা স্বামীজী ও তাঁর শিক্ষার মতো নয়।'

আরও চার বছর পরে, ২৪ জানুআরি, ১৯৩৯ তারিখে মিস ম্যাকলাউড লিখেছেন—মিসেস লেগেট স্বামীজীর মন্দিরের গায়ে পোস্তা তৈরির জন্য যে-টাকা দিয়েছিলেন, তাও কাজটার পক্ষে যথেষ্ট নয়, কারণ মন্দির-রক্ষার জন্য আরও বিস্তৃত পোস্তা তৈরি করা দরকার।

ঐ বছরই ১০ ফেব্রুআরি এক চিঠিতে মিস ম্যাকলাউড জানান—মন্দির-শীর্ষের ৯ ফুট দীর্ঘ ত্রিশূলের ফলাগুলি নতুন করে সোনার জলে ধোয়া হবে—তার খরচ ৪০০ টাকা তিনিই দেবেন।

৪

বিবেকানন্দ-মন্দিরের ভিতরে যে-রিলিফ মূর্তি রয়েছে, যার কথা প্রবুদ্ধ ভারতের ১৯১৩ ও ১৯১৪ সালের বিবরণে এবং মিস ম্যাকলাউডের ১৯১৫ সালের চিঠিতে পাই—সেটি কখন, কার উদ্যোগে নির্মিত হয়? এ বিষয়ে কোনো সংবাদই অন্ততঃ আমাদের জানা থাকত না, যদি না নিবেদিতার পত্রাবলীতে এ-সম্পর্কে বেশ কিছু সংবাদ পেয়ে যেতাম। সেখানে পাই, মিসেস লেগেটের অর্থানুকূল্যে এবং ভগিনী নিবেদিতার উদ্যোগে স্বামীজী-মন্দিরের জন্য একটি রিলিফ মূর্তি তৈরি হয়েছিল। সেই মূর্তিই যদি বিবেকানন্দ-মন্দিরের মধ্যে স্থাপিত হয়ে থাকে, প্রায় নিশ্চিতভাবে তাই হয়েছে (নাহলে মিস ম্যাকলাউড রিলিফ মূর্তি সম্বন্ধে অ্যালবার্টাকে লিখে পাঠাবেন কেন—তাঁর মা এই মূর্তির জন্য টাকা দিয়েছেন, এবং তিনি এর নির্মাণের কথা জানতেন—এই জন্যই

---

৫ 'The special feature of this year's celebration was the opening of the Swami's Memorial Temple in which only the non-sectarian symbol "Om" was installed on a marble pedestal.' [*Prabuddha Bharata*, March, 1916]

তো !)—তাহলে শিহরিত হয়ে আমরা ভাবি —স্বামীজীর মূর্তি ও মন্দিরের মূলে কতজনের কতদিনের স্বপ্ন ও কল্পনার সম্মিলন ! এই মন্দির তাহলে নির্মিত হয়েছে যতখানি না অর্থে, ততোধিক বিন্দু বিন্দু অশ্রু ও রক্তে। কী যন্ত্রণা স্বামী ব্রহ্মানন্দের—কী আবেগ ভগিনী নিবেদিতার—কী পরিশ্রম স্বামী বিজ্ঞানানন্দের —কতখানি শ্রদ্ধার উৎসর্গ মিসেস লেগেট ও মিস ম্যাকলাউডের—রামকৃষ্ণ-সংঘের সাধু-সন্ন্যাসীদের—এবং জ্ঞাত-অজ্ঞাত কত মানুষের !!

নিবেদিতার পত্রাবলীতে স্বামীজীর রিলিফ মূর্তি নির্মাণের প্রসঙ্গে যা পাই, তার অংশ এখানে সংকলন করতে পারি। ১৯১১ সালের এপ্রিল মাস থেকে এ-বিষয়ে উল্লেখ আছে। স্মরণ করিয়ে দিতে পারি, এই সময়ের ৬ মাসের মধ্যে নিবেদিতার দেহান্ত হবে। কিন্তু এখনই তিনি অনুভব করছেন, তাঁর দিন ঘনিয়েছে। মিসেস ওলি বুলের উইল-মামলায় তিনি চরম আঘাত পেয়েছেন, যাতে মিসেস বুলের বিকৃতমস্তিষ্ক কন্যা ওলিয়া তাঁকে মিথ্যা-ভাবে জড়িয়ে দিয়েছিলেন [এ-প্রসঙ্গ লেখকের 'নিবেদিতা লোকমাতা' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে]। দেহে-মনে নিবেদিতা ভগ্ন শ্রান্ত নারী এখন। তিনি কর্তব্য সাঙ্গ করে ফেলতে চাইছেন। এক প্রধান কর্তব্য—তাঁর আচার্যের জীবন ও বাণীর সংরক্ষণ। আচার্যের অপূর্ব চরিতকথা তিনি লিখেছেন—'দি মাস্টার অ্যাজ আই স হিম।' আচার্যের সঙ্গে ভ্রমণকথা লিখেছেন ডায়েরির উপর নির্ভর করে—'নোটস্ অব সাম্ ওয়াণ্ডারিংস্ উইথ দি স্বামী বিবেকানন্দ'—তা ব্রহ্মবাদিন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে গেছে। স্বামীজীর পত্রাবলীর সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন। স্বামীজীর আরও কয়েকটি গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন। এবার চাইলেন প্রণামের মন্দির এবং মূর্তিকে—যেখানে যুগ-যুগ ধরে মানুষ নত হবে স্বয়ং-জ্যোতি পুরুষের স্মরণে। স্বামীজীর মূর্তি স্থাপিত হবে সেই পবিত্র ভূমিখণ্ডের উপরে, যেখানে তাঁর মরদেহ ভস্মীভূত হয়েছিল—এবং জ্বলন্ত চিতা থেকে বার্তা এসেছিল নিবেদিতার কাছে — 'তিনি জীবিত — জীবিত — চির-জীবিত।'

স্বামীজীর রিলিফ মূর্তির জন্য নিবেদিতা-গোষ্ঠীর মধ্যে আলাপ আলোচনা ঠিক কবে আরম্ভ হয়েছিল বলতে পারব না। ২০ এপ্রিল, ১৯১১, মিস ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার চিঠিতে এ-বিষয়ে প্রথম উল্লেখ পাচ্ছি :

'লেডী বেটী [মিসেস বেটী লেগেট] যা চান, সেইভাবে সমাধি-মন্দিরের ফলক তৈরি করবার মতো সত্যই একজন প্রস্তর-ভাস্কর ভারতে আছেন। তবে কাজটা করিয়ে নেবার জন্য গণেনকে সেখানে পাঠাতে হবে। লেডী বেটী কি মাপ ও অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়গুলি জানাবেন ? তবে যে-কোনো ক্ষেত্রেই হোক, গণেন জুলাইয়ের আগে জয়পুরে যেতে পারবে না, কারণ এখন প্রচণ্ড গরম। যদি লেডী বেটী কোন্ আকারে তিনি শুভ্র মর্মর প্রস্তরের প্যানেলটি চান বলে পাঠান—এক ফুট কিংবা দেড় ফুট, কিংবা আরও বড়—তা চৌকো কিংবা আয়তাকার —ধরা যাক, এক ফুট চওড়া দেড় ফুট লম্বা—তাহলে আমরা সেইমতো করবার চেষ্টা করব। আমার ধারণা, তুমি চাইবে, রিলিফের গভীরতা খুব কম হোক। তবে অনুগ্রহ করে অবশ্যই নির্দেশগুলি নির্দিষ্টভাবে

লিখে পাঠাবে।'

নিবেদিতা যখন এই চিঠি লিখেছেন, তখন ভারতীয় চিত্রশিল্পের পুনরুজ্জীবন আন্দোলন আরম্ভ হয়ে গেলেও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে নতুন প্রতিভার অভ্যুদয় হয়েছে, এমন তিনি মনে করেননি। মহারাষ্ট্রে ম্হাত্রে বা বাংলায় শীতলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু ভাস্কর্য-কাজ করছিলেন সত্য, কিন্তু মুখাকৃতি নির্মাণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট যোগ্য শিল্পী ছিল কিনা সন্দেহ। এইকালের মূর্তিগুলি প্রায়শঃই বহির্ভারত থেকে তৈরি হয়ে আসত। এই পটভূমিকা স্মরণ রেখে মিস ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার ১২ জুলাই, ১৯১১, চিঠি পড়তে হবে। তিনি লেখেন:

'লেডী বেটীর দ্বারা অর্পিত কর্মভার সম্বন্ধে গণেন ক্রমেই রীতিমতো উদ্দীপনা বোধ করছে। সুতরাং আশা হচ্ছে, কাজটা শেষ পর্যন্ত করে ওঠা যাবে। সে বলছে, তার ধারণা, এটা যুগসূচনাকারী ঘটনা হয়ে দাঁড়াবে। [শিল্পের দিক দিয়েই বোধ হয় এই মন্তব্য]।···তবে প্রচেষ্টা পুরো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে, এ-বিষয়ে লেডী বেটীকে মনে-মনে প্রস্তুত থাকতে বলো। সময়ের ব্যাপারে—আমি জয়পুরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি—এবং গণেন ও অন্য একজন বন্ধুকে সেখানে পাঠাবার আশা করি, যাকে কাজ চলার সমস্ত সময়টা সেখানে থাকতে হবে। কিন্তু সেখানে শীতকালে আমাদের যাবার আগে রিলিফটিকে তৈরি পাবার আশা করি না। ছোকরা দুটির ভ্রমণ ও হোটেল খরচ খুবই সামান্য হবে। ওখানে গিয়ে তারা জানাবে—শিল্পী কত টাকা চান। যদি তা ৫০০ টাকা বা তার কম হয়, তাহলে সেটা আমার পক্ষে মেনে নেওয়াই ঠিক কাজ হবে। আর যদি বেশি হয়, তাহলে তোমাকে তার করে জানাব। পারিশ্রমিক যদি ৫০০ টাকাও হয়, তদুপরি ২০০ টাকা লাগবে ভ্রমণ ও ফটোগ্রাফ ইত্যাদির খরচের জন্য।'

এই চিঠি লেখার আগেই মিসেস লেগেটের কাছ থেকে রিলিফ মূর্তির ঈপ্সিত মাপ এসে গিয়েছিল। নিবেদিতা আগে সন্তর্পণে (অবশ্যই খরচের ভয়ে) এক ফুট × দেড় ফুট মাপের রিলিফের কথা বলেছিলেন, কিন্তু মিসেস লেগেট যখন আড়াই ফুট × তিন ফুট রিলিফের প্রস্তাব করে পাঠালেন, তখন নিবেদিতার আনন্দের অবধি রইল না। উপরি-উদ্ধৃত চিঠিতেই তিনি লেখেন,

'৩০″ × ৩৬″ প্যানেল তো বিরাট কাণ্ড হয়ে দাঁড়াবে!!—এবং তা বিবেকানন্দ-মন্দিরকে গৌরবময় ব্যাপার করে তুলবে, যা বহু যুগের বিখ্যাত ঘটনা হয়ে থাকবে। সুতরাং আশা করি, মাপ ছোট করতে হবে না। গণেন ভাবছে—[শিল্পীকে দেবার জন্য] স্বামীজীর একটা বেশ বড়ো-করা ফটোগ্রাফ অবশ্যই চাই। সে অনেকগুলি ফটোগ্রাফ নিয়ে যাবে, কিন্তু আমাকে বলছিল—যতক্ষণ না অসুবিধা হচ্ছে, বা শিল্পীকে আরো পরিষ্কার করে বোঝাবার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে—ততক্ষণ সে তাঁকে অন্য ফটোগুলি দেখাবে না। গণেন কতখানি বুদ্ধিমান, তা দেখাবার জন্যই তোমাকে একথা বলছি। অবশ্য মিসেস হ্যারিংহামের কাছে [অজন্তা চিত্রাবলী নকলের সময়ে] তার যথেষ্ট শিল্পশিক্ষা হয়ে গেছে।'

মাস দুয়েক পরে, ১৪ সেপ্টেম্বর নিবেদিতা গণেন্দ্রনাথকে একটি ছোট চিঠি লেখেন নির্দেশ দিয়ে, যার মধ্যে তাড়াহুড়ায় রিলিফ

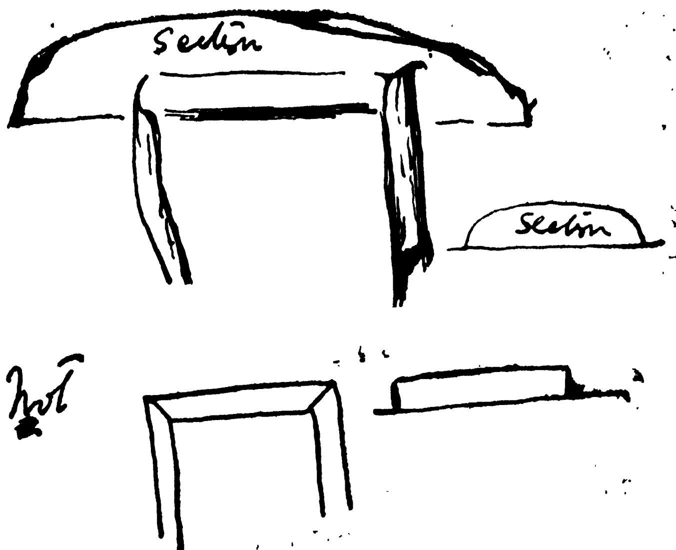
মূর্তির প্রস্তাবিত ফ্রেমের চেহারা এঁকে দিয়েছিলেন। (নিচে নকশা দেখুন) নিবেদিতা লেখেন,

'লণ্ডন থেকে জেনেছি, ফ্রেম গোলাকার হবে, সমতল নয়। ওঁরা এখন বলছেন, তা হবে সাড়ে তিন ইঞ্চি থেকে চার ইঞ্চি চওড়া। আমি দ্রুত লিখছি—পাছে তুমি বেরিয়ে পড়ো। তবে আবার [লণ্ডন থেকে] নির্দেশ শুনবার আশা রাখি, এবং তা তোমাকে কিংবা প্রিন্সিপালকে [হ্যাভেল ?] জানাবার আশা রাখি।'

একই তারিখে মিসেস লেগেটকে লেখা নিবেদিতার গোটা পত্রের বিষয়বস্তু—এই রিলিফ মূর্তি। এর মধ্যে, মূর্তিটি যে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এই শুভ সংবাদ ছিল। সেই সঙ্গে খরচের একটা হিসাব। 'প্রিয় লেডী বেটী, আপনার চীন যাত্রার আগেই দ্রুত কয়েক ছত্র লিখছি—খরচপত্রের অসুন্দর বিষয়টি নিয়ে। গণেন লিখেছে, কাজটা অনবদ্য হয়েছে, তবে এখনো সম্পূর্ণ শেষ হয়নি। কথাটাকে খাঁটি সত্য বলে বিশ্বাস করতে চাই। শিল্পীর পারিশ্রমিক ৬৫০ টাকা। আর গণেনকে সেখানে পাঠাতে, রাখতে, ফটো এনলার্জ করা, তার করা, ইত্যাদিতে আরও ১০ পাউণ্ড খরচ হয়েছে। তাই সব জড়িয়ে দাঁড়িয়েছে বা দাঁড়াবে ৮০০ টাকার মতো।'

রিলিফের আকার ইত্যাদি বিষয়ে নিবেদিতা লেখেন—

'য়ুম [মিস ম্যাকলাউড] লিখেছিল, আড়াই ইঞ্চি ফ্রেম-সুদ্ধ স্ল্যাবটি হবে ৩০″×৩৬″ ইঞ্চি। শুনলাম, ওরা মাপ আরও বড় করেছে। আমার মনে হয়, সেটিকে বসাবার জন্য ক্ষুদ্র সমাধি-বেদীকে আরও নীচু করতে হবে। তবে সেটা করা যাবে। ফ্রেমের খোদাই নকশা কী আকারের হবে, তা আমি য়ুমকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম। সে বলেছিল



নিবেদিতার আঁকা নকশা

তা হবে বৃত্তাকার, যা সঙ্গত। এবং বলেছিল, ৩½×৪ ইঞ্চি চওড়া হবে; সেটা অধিকন্তু ভালো। সেই মর্মে গণেনকে লিখছি। কিন্তু তা করা যদি সম্ভব না হয় তাহলে যেন আপনি নিরাশ হবেন না, কারণ আগে কম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সে [গণেন] লিখেছে, [মূর্তির] মুখ ও শরীরের অনেকখানি অংশ [খোদাই হয়ে] বেরিয়ে এসেছে—তবে কুড়ি কি পঁচিশ দিনের কাজ এখনো বাকি আছে। যদি মূর্তিটি আমাদের কাছে এসে যায়, তাহলে আপনার জন্য ফটো তুলে পাঠাবো। আশা করছি, শীতকালে আপনি সেটিকে যথাস্থানে স্থাপিত দেখবেন।'

একই চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছিলেন, তিনি নিজের খরচে একটি ছোট প্যানেলের অর্ডার দিয়েছেন, সেটা 'উপযুক্তভাবে নির্মিত হলে' মিস ম্যাকলাউডকে পাঠাবেন।[৬]

স্বামীজীর মূর্তির জন্য মিসেস লেগেট টাকা দিয়েছেন, যার ফলে নিবেদিতার বড় প্রিয় একটি আশা চরিতার্থতার পথে। প্রাণ ঢেলে ধন্যবাদ দিয়ে নিবেদিতা লিখলেন, 'অপূর্ব আপনার অর্থের সদ্ব্যয়। এ-জিনিস মানুষ না খেয়েও করবে।' তার পরে তিনি হৃৎস্পন্দিত ভাষায় এই কথাগুলি লিখেছিলেন:

'ভাস্কর তাঁর কার্যারম্ভ করেছিলেন প্রস্তরগত স্বামীজীর উদ্দেশে নৈবেদ্যসহ পূজামন্ত্র উচ্চারণ ক'রে—"হে স্বামীজী! আবির্ভূত হও আমার হস্তে।" সকাল আটটা থেকে রাত সাড়ে নটা পর্যন্ত তিনি কাজ করেন, কাজের ফাঁকেই খেয়ে নেন। আমাকে তিনি এই সংবাদ পাঠিয়েছেন—যদি শেষ পর্যন্ত কাজটি সন্তোষজনক না হয়, তাহলে এক পাই পয়সাও নেবেন না, সব টাকা ফেরত দেবেন।

৬ আমাদের ধারণা স্বামীজীর সেই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার মর্মর পাথরের রিলিফ মূর্তি 'উপযুক্তভাবে' নির্মিত হয়েছিল, এবং মিস ম্যাকলাউড সেটি পেয়েছিলেন। এমন ধারণার কারণ আছে। ইংলণ্ডে স্ট্রাটফোর্ড অন অ্যাভনে শেক্সপীয়ারের কন্যার বাড়ি 'হলস্‌ক্রফট্‌' মিসেস লেগেট কেনেন, যার উত্তরাধিকার মিস ম্যাকলাউডে বর্তেছিল। ঐ বাড়িতে পূর্ব থেকেই একটি 'প্রফেটস্‌ চেম্বার' ছিল, যেটিকে এঁরা নিজেদের প্রফেট অর্থাৎ স্বামীজীর নামে উৎসর্গ করেন। সেই ঘরেই মিস ম্যাকলাউড স্বামীজীর পাতলা একটি রিলিফ মূর্তি রেখেছিলেন, যেটি আমাদের ধারণা, নিবেদিতার করানো মূর্তি। মিস ম্যাকলাউড ৩১ মে, ১৯৪৪ এক চিঠিতে লেখেন:

'I don't want the Prophet's chamber turned into a chapel. It was consecrated when we bought it 30 years ago. So I put our Prophet into the wall···a window behind it—the thin marble bas-relief of Swamiji—so there is a translucent glow. Then all the tiny pictures, S. Sara's, Nivedita's, Mrs. Mildred Adams', all hang on the beam.'

[লণ্ডন বেদান্ত কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত মিস ম্যাকলাউডের পত্রাংশ। এর আগে অ্যালবার্টাকে লেখা মিস ম্যাকলাউডের যে-সব পত্রাংশ উদ্ধৃত করেছি, সে সবই একই সূত্র থেকে পাওয়া। এই সূত্রে জানাই, স্বামীজীর রিলিফ মূর্তির ফটো তুলে দিয়েছেন শিল্পী শ্রীনিত্যানন্দ ভকত।]

'ব্যাপারটি নিয়ে আমি অবশ্যই শিহরিত; কেন তা আপনি বুঝবেন। ডাঃ (জগদীশচন্দ্র) বসু শুরুতেই আমাকে দিয়ে এই কথাটি লিখিয়ে নিয়েছেন—"এই কাজ সমগ্র জাতীয় জীবনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ।" কোনো সন্দেহ নেই তাতে—যদি যথাযোগ্যভাবে তা সম্পাদিত হয়।'

নিবেদিতা কি স্বামীজীর রিলিফ মূর্তি দেখেছিলেন? না। কারণ, উপরের চিঠি লেখার আট দিন পরে ২২ সেপ্টেম্বর তিনি দার্জিলিঙ যাত্রা করেন, এবং ১৩ অক্টোবর তাঁর দেহাবসান হয়। মুক্তিপ্রাণা-লিখিত নিবেদিতা-জীবনীতে দেখেছি, গণেন্দ্রনাথ নিবেদিতার শেষ সময়ে দার্জিলিঙে পৌছেছিলেন। যদি তিনি ২২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে জয়পুর থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন, তাহলে নিবেদিতাকে মূর্তি-বিষয়ক সংবাদ দিয়েছেন। কিন্তু তা ঘটেনি বলেই আমাদের ধারণা। আর যদি তিনি দার্জিলিঙে সজ্ঞানে নিবেদিতাকে দেখে থাকেন এবং তাঁকে স্বামীজীর মূর্তির সংবাদ দিয়ে থাকেন, তাহলে মৃত্যুপূর্বে না জানি কী অপূর্ব তৃপ্তির প্রশান্তিতে নিবেদিতার অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠেছিল!

নিবেদিতার বড় ইচ্ছা ছিল, ১৯১১ শীতকালের মধ্যে স্বামীজীর মূর্তি যথাস্থানে স্থাপিত হবে—তা হয়নি। তার জন্য আরও ১২ বছরের বেশি অপেক্ষা করতে হয়েছে। এই মধ্যবর্তী কালে বিবেকানন্দ-ভক্তির ক্ষেত্রে নিবেদিতা যাঁকে সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বান্ধবীরূপে পেয়েছিলেন সেই মিস ম্যাকলাউড একই স্বপ্নরেখা অনুসরণ করে গেছেন। এবং যখন স্বামীজীর মূর্তি সত্যই স্থাপিত হয়েছিল, তখন সেইক্ষণে, মিস ম্যাকলাউড নিশ্চয় একটি অদৃশ্য কিন্তু উজ্জ্বল উপস্থিতি অনুভব করেছিলেন—স্বামীজীর পাদমূলে তাঁর প্রণতা কন্যা নিবেদিতা।

চিকের আড়ালে

বকলম

রাজা সুরথ রাজ্য-ধন-মান হারিয়ে অরণ্যে আশ্রয় নিয়েছেন। প্রবল পরাক্রান্ত শত্রু তাঁকে নির্জিত করেছে, অসৎ অমাত্যবর্গ তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে তাঁর রাজকোষ ও সৈন্যদল জবরদখল করেছে। হার-মানা মানহারা মানুষ একা একা জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু তাঁর মন পড়ে আছে তাঁর ফেলে-আসা রাজ্যপাটের ওপর। হৃতগৌরব হৃতসর্বস্ব হয়েও তাঁর অবর্তমানে কেমন করে তাঁর হারানো রাজ্য চলছে—এই ভেবে ভেবে তিনি শোকাকুল। মনের এইরকম বিধ্বস্ত অবস্থায় তিনি এসে পৌছলেন এক আশ্রমে। সেখানে থাকতেন সত্যদ্রষ্টা ঋষি মেধা। ঋষির আশ্রমের সৌষ্ঠব ও প্রশান্তির প্রলেপে সুরথের মনের জ্বালা কিছুটা জুড়োলো।

এই আশ্রমে তাঁর পরিচয় হলো আর একজন ভাগ্য-বিড়ম্বিত দুঃখী মানুষের সঙ্গে। বৈশ্য সম্প্রদায়ের এই ব্যক্তিটির নাম সমাধি। একদা-ধনী বণিক সমাধিও সব ধনসম্পত্তি খুইয়ে এসেছেন। অর্থলোলুপ স্ত্রীপুত্রগণ তাঁকে বঞ্চনা করেছে, আত্মীয়-পরিজন তাঁকে বর্জন করেছে। তবু তাদের প্রতি তাঁর

আসক্তি নিদারুণ। তিনিও অরণ্যচারী, এখন ঋষি মেধার শরণাগত।

তাঁরা দেখলেন তাঁরা দুজনেই প্রায় অনুরূপ দুর্ভাগ্যের শিকার। দুজনেই জীবন-সংগ্রামে পরাস্ত প্রতারিত পলাতক। কিন্তু একটা প্রচণ্ড কৌতুক উপলব্ধি করে তাঁরা বিস্ময়াবিষ্ট হলেন। তাঁদের সব ক্ষতক্ষতির যা কিছু কারণ সেগুলোই তাঁদের মনকে টানছে দুঃসহতম টানে! হৃদয় খুঁড়ে শুধু বেদনা জাগাতে এ কী সর্বনাশা ভালবাসা!

দুজনেই এ আশ্চর্য ব্যাপারটা টের পেলেন। এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে অনেক আলাপ-আলোচনা হলো; কিন্তু এ রহস্যের কুলকিনারা করতে পারলেন না। মনের এ কী বিচিত্র কুটিল গতি! যাতে কোন আনন্দ নেই, যাতে শুধু দুঃখ বাড়ে—মন তাই আঁকড়ে ধরে থাকে; যেখানে ঘা খায় সেখানেই বার বার ফিরে ফিরে যায়! কেন মন উটের মতন মুখে রক্তক্ষরণ করতে করতে কাঁটা গাছ চিবিয়ে মরে? কেন এমনটা হয়?—এ প্রহেলিকার মীমাংসা চাইলেন তাঁরা ঋষি মেধার কাছে: হে জ্ঞানী মহাপুরুষ, আমাদের মন আমাদের বশীভূত নয়। সকল দুঃখের যা কারণ, সকল বেদনার যা নিদান তার প্রতি অন্তরের এ কী দুর্মর আসক্তি? কেন এ অন্ধ মোহবন্ধ? কেন এ মর্মঘাতী মমতা? প্রশ্নটা ছিল রাজা সুরথ ও শ্রেষ্ঠী সমাধির। কিন্তু আসলে এইটাই সকল চিন্তাশীল মানুষের চিরন্তন জীবন-জিজ্ঞাসা।

এর শাশ্বত উত্তর দিলেন ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি মেধা। ব্যাখ্যাত হলো মহামায়ার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি, যার ফলে চিত্ত নিত্য বস্তু ছেড়ে অনিত্য বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়, আনন্দসাগরে আপ্লুত না হয়ে মোহগর্তে ও মমতার আবর্তে আবদ্ধ হয়। ঋষি বললেন: মানুষের মন এক অদ্ভুত মোহের দ্বারা আবৃত। এই মোহ তার বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে। এর ফলেই যেসব বস্তু বা ব্যক্তি মানুষের দুঃখকষ্টের হেতু সেগুলির প্রতিই তার এমন প্রচণ্ড আকর্ষণ। এই মোহিনী মায়া, এই মহামোহ ভগবতী মহামায়ার রহস্যময় শক্তি। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেবী মহামায়ারই অভিক্ষেপ। এ জগৎ-প্রপঞ্চ তাঁরই মূর্তি। তিনি জগন্ময়ী বিশ্বাত্মিকা নিত্যাস্বরূপা। তিনি ব্রহ্মশক্তি। নানারূপে, নানান আকারে তিনি আবির্ভূতা হন। তিনি এক অদ্বিতীয়া, আবার তিনিই বহুরূপা। জীবদেহের প্রতি অঙ্গে, বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুতে, অণুপরমাণুতে তিনি প্রকাশিতা। সৃষ্টি স্থিতি ও সকল নামগ্রাসী আকারগ্রাসী অন্তিম পরিণতিরও তিনি রচয়িত্রী। মোহ-রাত্রির অবসান একমাত্র মহাশক্তির প্রসাদে লভ্য ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই সম্ভব।

রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি ঋষি মেধাকে দেবীর স্বরূপ আরো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করলেন। তখন ঋষি সাতশত মন্ত্রে দেবী মহামায়ার মহিমা ব্যক্ত করলেন। এই গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করে ঋষি মেধা ভূতপূর্ব নৃপতি ও বণিককে উপদেশ দিলেন আরাধনার ও শরণাগতির; তাঁদের বললেন জগদম্বার পূজা ও ধ্যান করে তাঁকে তুষ্ট করতে। যথাকালে দেবী প্রসন্ন হয়ে তাঁদের দর্শন দিয়ে ধন্য করলেন, তাঁদের মনস্কামনা পূর্ণ করলেন।

সংক্ষেপে এই হলো 'দেবীমাহাত্ম্য' বা 'দুর্গাসপ্তশতী'র নিষ্কর্ষ। সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রের সারস্বরূপ এই গ্রন্থের সাধারণ চলিত নাম 'চণ্ডী'। এটি মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৮১ থেকে ৯৩ অধ্যায় পর্যন্ত ত্রয়োদশটি অধ্যায়ে বিধৃত।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর রচনাকাল সাধারণত খ্রীষ্টপূর্ব বা প্রথম শতাব্দী বলে মনে করা হয়।

ভারতে শক্তিপূজা চলে আসছে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেকার মহেঞ্জোদারো নগরে দেবীপূজা হতো—তার প্রমাণস্বরূপ সেখানে অসংখ্য মৃন্ময়ী দেবীমূর্তি পাওয়া গেছে। অন্তত আড়াই হাজার বছর আগে বৈদিক যুগেও শক্তি-আরাধনার চল ছিল। ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্ত এবং সামবেদের রাত্রিসূক্ত তার উজ্জ্বল উদাহরণ। ঋগ্বেদে দেবীসূক্তে দেবী বলছেন: আমার দ্বারাই লোকে জীবনধারণ করে, অন্নগ্রহণ করে, শ্রবণাদি করে। ...রুদ্রের বাহুতে আমিই শক্তিরূপে অবস্থিতা, আমিই আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে প্রবিষ্টা। মহাভারতে ভীষ্মপর্বের ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে দুর্গাদেবীর আরাধনা করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। আবার বিরাটপর্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির দেবীর স্তুতি করছেন 'মহিষাসুরনাশিনী' 'বিন্ধ্যবাসিনী' ইত্যাদি আখ্যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে দেবী হলেন শ্রীকৃষ্ণের অতিজাগতিক যোগমায়া-শক্তি।

এই দেবী নানা কালে নানা শাস্ত্রগ্রন্থে তন্ত্রমন্ত্রে আরো নানা নামে বন্দিতা—যেমন, উমা হৈমবতী দুর্গা গৌরী পার্বতী ভবানী অম্বিকা চণ্ডী চণ্ডিকা চামুণ্ডা আদিশক্তি আদ্যাশক্তি পরাশক্তি মহাশক্তি নারায়ণী বৈষ্ণবী ভগবতী জগদ্ধাত্রী বিশ্বেশ্বরী তারা সাবিত্রী পরমেশ্বরী কাত্যায়নী কালী কপালী ভদ্রকালী ইত্যাদি।

এই দেবীই জগৎকারণ, বিশ্বচরাচর তাঁরই বিগ্রহ। তিনি সর্বগতা সর্বানুস্যূতা—সবকিছুই তিনি। তিনি পরমাপ্রকৃতি এবং পরমপুরুষ—দুইয়ে এক: গতিশীল এবং গতিহীন সাপ যেমন একই, তেমনি। যিনি ব্রহ্ম তিনিই ব্রহ্মময়ী মহামায়া। যখন নিষ্ক্রিয় তখন ব্রহ্ম, যখন সক্রিয়—যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সংঘটন করেন—তখন তিনিই মহামায়া। সচ্চিদানন্দের এই চিৎশক্তির বিকাশ সারা জগৎ। অরূপা হয়েও তিনি ভক্তদের কৃপা করতে নানা রূপ ধরেন। তাঁর বহু প্রকাশ ও বিভূতি। তিনি সগুণা ও নির্গুণা দুই-ই। তাঁর রূপ রুদ্র ও মধুর। তিনিই আবার অবতারের লীলাবিলাস। বিশ্বভুবনেশ্বরী এই দেবী তাঁর সম্মোহনী মায়ায় সৃষ্টির গূঢ় রহস্য আড়াল করে রেখেছেন, মানুষকে রেখেছেন মোহতিমিরে। সময় হলে প্রসন্ন হয়ে এই ছলনাজাল, মায়াবী আড়াল তিনি নিজেই সরিয়ে দিয়ে তাঁর জগজ্জননীরূপ উদ্ভাসিত করেন। ভাগবতী জননীর করুণা ছাড়া মানুষের মোহঘোর ঘোচে না, জীবনযন্ত্রণার অবসান হয় না।

এ প্রসঙ্গে মহানির্বাণতন্ত্রে দেবীব্যাখ্যানের কাব্যরূপ স্মর্তব্য (৪।১৩-১৬):

ত্বং কালী তারিণী দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ধূমাবতী ত্বং বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তকা॥
ত্বমন্নপূর্ণা বাগ্দেবী ত্বং দেবী কমলালয়া।
সর্বশক্তিস্বরূপা ত্বং সর্বদেবময়ীতনুঃ॥
ত্বমেব সূক্ষ্মা স্থূলা ত্বং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি॥
উপাসকানাং কার্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি।
দানবানাং বিনাশায় ধৎসে নানাবিধাস্তনূঃ॥

—অর্থাৎ, তুমি কালী তারিণী দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ধূমাবতী বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তা; তুমি অন্নপূর্ণা বাগ্‌দেবী কমলালয়া; তুমি সর্বশক্তিস্বরূপা, তুমিই পরিগ্রহ কর সর্বদেবকায়া; তুমি সূক্ষ্ম ও স্থূল, ব্যক্ত ও অব্যক্ত, সাকার ও

নিরাকার। কে তোমাকে জানতে পারে? সাধকের সিদ্ধি, জগতের কল্যাণ ও দানবের বিনাশের জন্যে তুমি আসো নানা রূপ ধরে।

* * *

উইনটারনিট্জের মতে শাক্ত ধর্ম ও দর্শনের, বিশেষত তন্ত্রশাস্ত্রের, উদ্ভব হয়েছিল সম্ভবত বঙ্গদেশে। অবশ্য, আসাম মণিপুর ত্রিপুরা অন্ধ্র কোচিন মালাবার প্রভাস কাশ্মীর নেপাল বেলুচিস্তান প্রভৃতি স্থানেও শাক্ত ভাবধারা শতধারে প্রবাহিত হয়েছিল এবং সাধনার প্রভেদ থাকলেও সে নানামুখী স্রোত আজো বহমান। কিন্তু নদীর পলিমাটিতে তৈরি এই বাংলা দেবীভক্তির জোয়ারে যেমন প্লাবিত হয়েছে তেমনটি বোধহয় আর কোথাও দেখা যায়নি।

এর ইতিহাসও প্রাচীন। ১৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লেখা মহামহোপাধ্যায় পরিব্রাজকাচার্যের 'কাম্যযন্ত্রোদ্ধার' গ্রন্থের পুঁথি পাওয়া গেছে। এর পরে লেখা হয় পঞ্চদশ শতকের শেষ পাদে শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের 'তন্ত্রসার' ও 'শ্রীতত্ত্ববোধিনী'। তন্ত্রকে গ্লানিমুক্ত করার ও শ্যামাবিগ্রহের পূজার প্রবর্তন করার পথিকৃৎ এই সিদ্ধপুরুষ।

শক্তিপীঠবহুল বাংলার শক্তিসাধনার একটা নিজস্বতা ও বিশেষত্ব আছে। এখানে দেবী ও ভক্তের মধ্যে সম্পর্ক শুধু উপাস্য-উপাসকের নয়; এখানে তিনি ঘরোয়া দেবী, মানবী। পরাৎপরা ব্রহ্মময়ীকে জননী তনয়া, এমন কি, প্রণয়িনীর মানুষী আকারে ও আধারে সাধনা করে বাঙালী কৃতার্থ হয়েছে। একদিকে মুক্তিস্বরূপিণী হয়ে তিনি আমাদের সব মোহ-বন্ধন, সব ক্লেশপাশ থেকে মুক্তি দেন; আবার অন্যদিকে তিনিই পরমা স্নেহময়ী হয়ে সংসারের বেড়া বেঁধে তাঁর ভালবাসার জগতে আমাদের বেঁধে রাখেন। সেই 'মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া'র সংকেত দিয়েছেন আপ্তকাম সাধক রামপ্রসাদ। অষ্টাদশ শতকে রামপ্রসাদ শক্তিসাধনাকে সকল সাম্প্রদায়িক গণ্ডির ঊর্ধ্বে একটি সর্বাবগাহ রূপ দেবার যে সূচনা করেন তার পরিপূর্ণ পরিণতি হলো একশ বছর পরে শ্রীরামকৃষ্ণের লীলায়।

প্রতিমায় দুর্গাপূজা বাংলায় এক হাজার বছর থেকে চলে আসছে বোলে অধ্যাপক অশোক শাস্ত্রী সিদ্ধান্ত করেছেন। চতুর্দশ শতকে শূলপাণি বিরচিত 'দুর্গোৎসববিবেক' ও 'বাসন্তীবিবেক' এবং পঞ্চদশ শতকে লেখা বাচস্পতি মিশ্রের 'ক্রিয়াচিন্তামণি' এবং 'বাসন্তীপূজাপ্রকরণ' গ্রন্থগুলিতে শ্রীদুর্গার মৃন্ময়ী প্রতিমার পূজাপদ্ধতির বর্ণনা পাওয়া যায়।

* * *

স্বামী বিবেকানন্দ জগজ্জননীকে যে তিনটি গুণে চিহ্নিত করেছেন তা হলো: সর্বশক্তিমত্তা সর্বব্যাপিতা ও অনন্ত করুণা। তাঁর আরাধনা না করে, স্বামীজী বলেছেন, আমরা পরম জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করতে পারি না। জগন্মাতাই আমাদের দেহের অভ্যন্তরে মূলাধারপদ্মে স্থিত কুলকুণ্ডলিনী। জগতে যতো শক্তি আছে তিনি তার সমষ্টিরূপিণী। তিনি অতি সত্বর প্রার্থনা পূরণ করেন এবং যখন ইচ্ছা যে কোন রূপে আমাদের দেখা দেন। (দেববাণী, ১৩৭০, পৃঃ ৭৭-৭৮)—এ বিবৃতি, লেখা বাহুল্য, স্বামীজীর প্রত্যক্ষ উপলব্ধি থেকে উৎসারিত।

যোগীপ্রবর শ্রীঅরবিন্দ মায়ের চারটি মহারূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন। এই শক্তি-চতুষ্টয়ের তিনি নাম দিয়েছেন মহেশ্বরী মহাকালী মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী এবং জ্ঞান

বল সঙ্গতি ও সংসিদ্ধি—এইভাবে যথাক্রমে তাঁদের বিভিন্ন গুণগরিমা বর্ণনা করেছেন (মা, ১৯৫৭, পৃঃ ৫৭-৬৯)। তাঁর আর্ষদৃষ্টিতে দেবীর বিশেষ প্রকাশ মানুষের মনে—যেখানে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম চলেছে দেবাসুরের, শুভাশুভের, জ্ঞানের সঙ্গে অজ্ঞানের। মা আমাদের অন্তর্নিহিত চিতি বা চৈতন্য। এই ভাগবতী চিৎশক্তিকে জাগিয়ে তোলাই শক্তি-সাধনার উদ্দেশ্য। এবং এর উপায় পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ও নিঃশেষ আত্মবলি।

তন্ত্রসিদ্ধির তুঙ্গে আরোহণ করেছিলেন স্বামী সারদানন্দ। তিনি জগন্মাতাকে নারীমাত্রে অধিষ্ঠিতা দেখতে পেতেন। তিনিই নববঙ্গে অভিনব শক্তিপীঠ স্থাপন করেন। সেই স্থিতপ্রজ্ঞ সন্ন্যাসী জানিয়েছেন, 'ছাগমহিষ বলি তো অনুকল্পমাত্র। হৃদয়ের শোণিতদান, যে উদ্দেশ্যে পূজা সে উদ্দেশ্যে আপনার শরীর মন সম্পূর্ণ উৎসর্গ না করিলে কোনপ্রকার শক্তিপূজাতেই ফলসিদ্ধি অসম্ভব।' (ভারতে শক্তিপূজা, ১৩৮২, পৃঃ ৮)

এ বিষয়ে চরম উচ্চারণ অবশ্য এ যুগে যিনি মাকে প্রত্যক্ষ ও প্রবুদ্ধ করেছেন, জগন্মাতার আশ্রিত হয়ে যিনি জগতের আশ্রয় হয়েছেন সেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের: চিকের আড়ালে দেবী সর্বদাই রয়েছেন।...আনন্দময়ী মাকে আপনার হতে আপনার জেনে তাঁকে দেখবার জন্য যিনি সরল শিশুর ন্যায় ব্যাকুল হয়ে ক্রন্দন করেন, তাঁকে সচ্চিদানন্দময়ী মা দেখা না দিয়ে থাকতে পারেন না।

অসৎকার্যবাদ-খণ্ডন

শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য*

অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের প্রবক্তা ভারতীয় দার্শনিক-গণ নিজ নিজ বক্তব্য নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণ করিয়া সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যে সমস্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, প্রত্যক্ষ-অনুভূত জাগতিক পদার্থের কার্যকারণভাবের বিচার তাহাদের অন্যতম। আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করিবার পথ হিসাবেই বাহ্যিক বস্তু-সমূহের তত্ত্বনির্ধারণ প্রয়োজন হইয়াছে। সুতরাং অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের নির্ধারণ প্রধান লক্ষ্য হইলেও বহির্জগৎ আলোচ্যবিষয়ের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুকে অবলম্বন করিয়াই অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব বুঝিতে হয়; অতএব দৃশ্যজগতের বস্তুর স্বরূপ কি, তাহা অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে। এই রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দময় বিচিত্র জগতের মূল স্বরূপ জানিতে না পারিলে অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে না। কারণ যাহা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য জাগতিক পদার্থনিচয়ের মূল, প্রত্যেকটি পদার্থের মধ্যে যাহার স্ফুরণ হয়, তাহাই ইন্দ্রিয়াতীত পরমতত্ত্ব। এইজন্যই পদার্থ-সমূহের মূল উৎস অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে। এই মূলানুসন্ধানের যুক্তিসম্মত পদ্ধতিই কার্য-কারণভাবের বিচার নামে প্রসিদ্ধ।

ব্যাবহারিক জীবনের প্রয়োজন সাধনের জন্যই যাবতীয় পদার্থ মানবজগতে সমাদৃত ও গৃহীত হয়। প্রত্যেকটি বস্তুর নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যই

* ন্যায় তর্ক-তর্ক-ব্যাকরণ-পুরাণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ। যাদবপুর ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক। 'ক্ষণভঙ্গবাদ' ও 'মাধ্যমক-কারিকা' গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা।

বিভিন্ন প্রয়োজন নির্বাহ করে। কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্যের মূল রহস্য কি, তাহা না জানিলে ব্যবহার্য বস্তুকে সম্পূর্ণ জানা যায় না। বস্তুর সামগ্রিকস্বরূপ জানিতে না পারিলে সেই বস্তুর মৌলিক তত্ত্ব অনাবিষ্কৃতই থাকে, অর্থাৎ বস্তুকে অবলম্বন করিয়া কোনও ইন্দ্রিয়াতীত রহস্য-লোকে পৌঁছানো সম্ভব হয় না। সুতরাং আমাদের অতিপরিচিত প্রত্যেকটি বস্তুও যে একটি অপরিচিত মহান এবং আনন্দময় ভাবেরই দ্যোতনা বহন করে, তাহা বুঝিতে হইলে বস্তুর কার্যকারণভাব একান্তভাবেই বুঝিতে হইবে, একটি মহাসত্তার সহিত সমস্ত ক্ষুদ্রসত্তা যে অঙ্গাঙ্গিভাবে আবদ্ধ, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। এইজন্যই দর্শনশাস্ত্রে কার্যকারণভাবের আলোচনার একটি বিশেষ প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

কার্যকারণভাববিচার প্রত্যেক দর্শনে প্রাধান্য লাভ করিলেও এই বিচারের ফল অর্থাৎ বস্তুর কারণসম্বন্ধে ধারণা বিভিন্ন দর্শনে এক নহে। প্রত্যেক দার্শনিক নিজ আদর্শ, লক্ষ্য এবং মূলনীতির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে কার্যকারণ-ভাবের বিচার করিয়াছেন।

এই সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ সংক্ষেপে এইরূপ —অসৎকারণবাদ, সৎকারণবাদ। ইহার মধ্যে আবার সৎকারণবাদ নানাভাবে বিভক্ত। কাহারও মতে সূক্ষ্মকারণ হইতে স্থূলকার্যের উৎপত্তি হয়, কিন্তু উৎপত্তির পূর্বে কার্যবস্তুটি একেবারেই অসৎ। কার্যের উৎপত্তি কর্তার প্রযত্নসাধ্য। সুতরাং যাহা পূর্বে একেবারেই ছিল না, সেই অসৎ কার্যই কর্তার প্রযত্নের দ্বারা সৎ হইয়া উৎপন্ন হয়। ইঁহাদের মতে কার্য ও কারণ অত্যন্ত ভিন্ন পদার্থ। এই মত ন্যায়দর্শনে এবং বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত হইয়াছে।

অপর দার্শনিক সম্প্রদায় কারণকে যেমন সৎ বলিয়া স্বীকার করেন, তেমনই কার্যকেও সর্বদাই সৎ বলিয়া মনে করেন। ইঁহাদের মতে উৎপত্তির পূর্বেও কার্যটি অসৎ নহে, কিন্তু সৎ। উৎপত্তির পূর্বে কার্যটি সূক্ষ্মরূপে কারণেই অবস্থান করে। কর্তার প্রযত্নের দ্বারা সূক্ষ্মরূপ হইতে কার্যটি স্থূলরূপে আবির্ভূত হয়। এই সিদ্ধান্তের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ইঁহারা কার্য ও কারণকে অত্যন্ত ভিন্ন বা অত্যন্ত অভিন্ন—ইহার কোনটাই বলেন না। কার্য ও কারণের মধ্যে পরস্পর অভেদ এবং ভেদ—এই দুইটিই রহিয়াছে, ইহাই এই দার্শনিকগণের বক্তব্য। ইঁহারা কার্য এবং কারণ—এই উভয়কেই সত্য বা যথার্থ বলিয়া মনে করেন। সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শন এই মতাবলম্বী।

অপর একদল দার্শনিক বলেন, কারণই একমাত্র সত্য বস্তু। কারণের একটি অবস্থান্তরই কার্য নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই অবস্থান্তর বা কার্য যথার্থ নহে। ব্যাবহারিক অবস্থায় কার্যের প্রয়োজন সিদ্ধ করার সামর্থ্য আছে বলিয়াই উহাকে সৎ বা যথার্থ বলিয়া মনে করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কার্যের বাস্তব সত্তা নাই। ইহার যুক্তি হিসাবে তাঁহারা বলেন কার্য এবং কারণের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, কারণপদার্থের সত্তা ভিন্ন কার্যের নিজস্ব কোন পৃথক্ সত্তাই নাই। কারণেরই একটি বিশেষ আকৃতি এবং উহার একটি ব্যাবহারিক নাম, ইহাই কার্যের স্বরূপ। মৃত্তিকা ও ঘট অথবা সুবর্ণ ও কুণ্ডল ইহার উদাহরণ। এই দুইটি ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, মৃত্তিকা বা সুবর্ণ ভিন্ন ঘট বা কুণ্ডলের মৌলিক স্বতন্ত্র সত্তা নাই। মৃত্তিকারই বিশেষ একটি আকারের নাম ঘট। সুতরাং ঘটের উপাদান-

কারণ মৃত্তিকা ভিন্ন ঘটের পৃথক্ অস্তিত্বই নাই। এই মতাবলম্বিগণ আরও বলেন যে, কারণের যে অবস্থান্তরকে কার্য বলা হয়, সেই অবস্থান্তর কারণসত্তার অতিরিক্ত সত্তা-বিহীন হইলেও ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে কিন্তু তাহা কারণ হইতে পৃথক্ একটি স্বতন্ত্রসত্তাশালী বস্তু বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে কারণ হইতে পৃথক্‌সত্তাবিহীন হওয়া সত্ত্বেও কার্যকে স্বতন্ত্র অস্তিত্বশীল বলিয়া যে বোধ জন্মে, তাহা যথার্থ নহে, অর্থাৎ মিথ্যা। সুতরাং কারণই একমাত্র সৎ, কার্য সত্য নহে,—রজ্জুসর্পের মতই মিথ্যা। ব্রহ্মাদ্বৈতবাদী আচার্য শঙ্কর এই মতের প্রবক্তা। পরবর্তী কালে শঙ্করের মতানুবর্তী বহু ধুরন্ধর বৈদান্তিক এই মতের উপর বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া অমরকীর্তিলাভের অধিকারী হইয়াছেন। ভারতীয় দর্শনে কার্যকারণভাব-বিচারের এই তিনটিই মূলসূত্র।

পক্ষান্তরে অসৎকারণবাদ অবলম্বন করিলে কার্যকে অবলম্বন করিয়া শেষ পর্যন্ত কারণ হিসাবে কোনও অস্তিত্বশীল মৌলিক বস্তু পাওয়া যায় না। অতএব জগতের মৌলিক তত্ত্ব বলিতে কিছুই থাকে না। এই মতবাদ পূর্বপক্ষরূপেই ছান্দোগ্য-উপনিষদে উল্লেখিত হইয়াছে। 'অসদেব ইদমগ্র আসীৎ' (ছাঃ ৬।২।১)। ইহার অর্থ, উৎপত্তির পূর্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমান—অভাব-স্বরূপই ছিল। কিন্তু আস্তিক দার্শনিকগণ এই মত খণ্ডন করিয়াছেন। ছান্দোগ্যশ্রুতিই এই মতবাদ খণ্ডন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 'কুতস্তু খলু সৌম্য এবং স্যাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েত ইতি' (ছাঃ ৬।২।২)। ইহার অর্থ, হে সৌম্য! কোন্ প্রমাণ অনুসারে এইরূপ হইতে পারে? অসৎ হইতে কেমন করিয়া সতের উৎপত্তি হইতে পারে?[১]

বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের একটি সূত্রেও[২] এই মতবাদের উল্লেখ-পূর্বক খণ্ডন করা হইয়াছে। 'ইহা অগ্রে অসৎই ছিল' ('অসদেব ইদমগ্রে আসীৎ', ছাঃ ৩।১৯।১; 'অসদ্ বৈ ইদমগ্রে আসীৎ' তৈত্তিরীয় ২।৭।১)—উৎপত্তির পূর্বে জগৎ অসৎ বা অভাবরূপেই ছিল, ইহাই শ্রুতির নির্দেশ—এই আশঙ্কার উত্তরে সূত্রকার বলিয়াছেন যে, উৎপত্তির পূর্বে কার্য সৎ ছিল না—এইরূপ বলায় ইহা বুঝা যায় না যে, কার্য অসৎ ছিল অথবা কারণ বলিয়া কিছুই ছিল না। কিন্তু যাহাকে আমরা সাধারণভাবে 'সৎ' বলি, তাহা ছিল না—ইহাই বুঝা যায়। কোনও একটি বিশেষ অবস্থা বা আকারযুক্ত বস্তুই একটি বিশেষ নামের দ্বারা অভিহিত হয়। যাহার কোনও আকৃতি বা বিশেষ অবস্থা নাই, তাহাকে বুঝাইবার জন্য নির্দিষ্ট কোন নামও নাই। অথচ সাধারণবুদ্ধিতে বিশেষ অবস্থা বা আকৃতিযুক্ত বস্তুকেই সৎ বলিয়া বুঝা যায়। আকৃতিহীন বা অবস্থাশূন্য হইলে তাহা আকাশকুসুমের মত অসৎ—ইহাই সাধারণতঃ মনে হয়। ব্যাবহারিক এই অভিজ্ঞতা অনুসারেই উৎপত্তির পূর্বকালীন বস্তুকে অসৎ বলা হইয়াছে—ইহাই এখানে

১ এই মতবাদের বিরুদ্ধে বিস্তৃত বিচার ছান্দোগ্য-উপনিষদের শাঙ্কর ভাষ্যে রহিয়াছে।

২ 'অসদ্ব্যপদেশাৎ নেতি চেৎ, ন, ধর্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ।' (ব্রহ্মসূত্র ২।১।১৭)

বুঝিতে হইবে।[৩] এই সূত্রের অভিপ্রায় অনুসারে কার্যকেই উৎপত্তির পূর্বে নামরূপ-বিহীন বলিয়া অসৎ বলা হইয়াছে, কিন্তু ইহা অসত্তা বা অভাবের বোধক নহে। নামরূপ-হীন বলিয়া কার্যকে আবির্ভাবের পূর্বে 'সৎ' এইরূপ বলা না চলিলেও 'অসৎ' এই শব্দটি অস্তিত্বহীনতার বোধক নহে—ইহাই সূত্র ও ভাষ্যের বক্তব্য। সুতরাং কার্যই যখন অসৎ বা অলীক নহে, তখন কারণকে আর অসৎ বলা যায় কি ভাবে? মোটের উপর ইহাই বলা যায় যে, যাহা একেবারেই অসৎ, তাহা কোনপ্রকারেই কার্যের জনক হইতে পারে না। কার্য জন্মাইবার সামর্থ্যহীন বস্তু কখনও কারণ হয় না। সামর্থ্য বা শক্তি একটি অস্তিত্ব-শীল বস্তুরই ধর্ম হইতে পারে। সুতরাং শশ-শৃঙ্গ বা বন্ধ্যাপুত্রের মত অলীক হইলে তাহা কারণ হইতে পারে না। অসৎকারণবাদের বিরুদ্ধে ইহাই মূল বক্তব্য।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে সদ্‌বস্তুই কারণরূপে স্বীকৃত হইলেও উৎপত্তির পূর্বে কার্যের সত্তা স্বীকৃত হয় নাই। অতিসূক্ষ্ম নিরবয়ব পরমাণু হইতে দ্ব্যণুক, ত্র্যণুক প্রভৃতিরূপে স্থূল কার্যদ্রব্য জন্মে। উৎপত্তি না হওয়া পর্যন্ত উৎপন্ন দ্রব্যটির অস্তিত্ব থাকিতেই পারে না। সূক্ষ্ম কারণ হইতে কর্তার প্রচেষ্টায় সাংগঠনিক পদ্ধতি অনুসারে একটি পূর্ণাবয়ব বস্তু উৎপন্ন হয়। ঘটের যে আকার কুম্ভকারের প্রযত্নে উৎপন্ন হয়, একটি মৃৎপিণ্ডের মধ্যে সেই আকারটি কোন রকমেই অনুভূত হইতে পারে না। ঐরূপ বিশেষ আকার ভিন্ন ঘটের কোনও অস্তিত্ব সম্ভব নহে। মানুষের প্রযত্ন ভিন্ন ঐরকমের বিশেষ আকার হইতে পারে না। যদি ঘটের অস্তিত্ব ঘট উৎপন্ন হওয়ার পূর্বেও থাকিত, তাহা হইলে ঘট উৎপাদনের জন্য কুম্ভকারের প্রচেষ্টার কোন প্রয়োজনই হইত না। যদি বলা হয় যে, ঘটের স্থূলভাবে আত্মপ্রকাশের জন্যই কুম্ভকারের প্রচেষ্টা আবশ্যক, কারণ উৎপত্তির পূর্বে নিজের উপাদানকারণের মধ্যে ঘটের অব্যক্তভাবে বিদ্যমানতা থাকে এবং উক্ত অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্তরূপে বা স্থূলভাবে অভিব্যক্তির জন্যই মানুষের প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়, সুতরাং উৎপত্তির পূর্বে অনভিব্যক্ত ঘটের অভি-ব্যক্তিকেই ঘটের উৎপত্তি বলা হয়—ইহার উত্তরে ন্যায় ও বৈশেষিক মতাবলম্বিগণ বলেন, বিশেষ একটি সাংগঠনিকরূপ লাভ না করা পর্যন্ত মৃৎপিণ্ডকে তো ঘট বলাই যায় না। 'ঘট' এই শব্দটি একটি বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। কম্বুগ্রীবা প্রভৃতি বিশেষ আকৃতিযুক্ত বস্তুই তো ঘট। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত ঐরূপ বিশেষ আকৃতিধারণ না হইবে, ততক্ষণ 'ঘট' আছে—ইহা কেমন করিয়া বলা যায়? কুম্ভকারের প্রচেষ্টার ফলেই ঐরূপ আকৃতির উদ্ভব হয়। যাহা পূর্ব হইতেই বিদ্যমান, তাহার উদ্ভব হইতেই পারে না। ঘট নিষ্পন্ন হওয়ার পর ঘট হইতে আরও একটি ঘটের উদ্ভব হয় কি? সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, উৎপত্তির পূর্বে ঘট বিদ্যমান থাকে না।

ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্তদর্শনের পক্ষ হইতে প্রবল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই

৩ 'ব্যাকৃতনামরূপত্বাৎ ধর্মাৎ অব্যাকৃতনামরূপত্বং ধর্মান্তরম্, তেন ধর্মান্তরেণ অয়ম্ অসদ্‌ব্যপদেশঃ প্রাগুৎপত্তেঃ।' (ব্রহ্মসূত্র, শাঙ্করভাষ্য ২।১।১৭)

সমস্ত যুক্তির পূর্ণাবয়ব আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নহে। সুতরাং সংক্ষেপে কয়েকটি মাত্র কথাই বলা হইতেছে।

অসৎকার্যবাদের বিরুদ্ধে প্রথম যুক্তি এই যে, সাক্ষাৎভাবে বস্তুটি বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ করিতে পারিলেই তাহার অস্তিত্ব সর্বসম্মত হইয়া থাকে। বস্তুটির সাক্ষাৎভাবে বুদ্ধির বিষয় হওয়া অর্থাৎ প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় হওয়াই বস্তুটির অভিব্যক্তি বলিয়া বুঝিতে হইবে।[৪] অভিব্যক্ত না হওয়া পর্যন্ত কার্যের অস্তিত্ব বুঝা যায় না বলিয়াই উৎপত্তির পূর্বে কার্যের অবিদ্যমানতা প্রতিবাদিগণ স্বীকার করিয়াছেন। এখন বুঝিতে হইবে—তাঁহারা উৎপত্তি এবং অভিব্যক্তিকে এক বলিয়া স্বীকার করেন কি না। যদি উৎপত্তি আর অভিব্যক্তি এক হয়, তাহা হইলে অসৎকার্যবাদ যুক্তিসিদ্ধ হইবে না। কারণ যাহা পূর্বে অনভিব্যক্ত ছিল, তাহারই অভিব্যক্তি হইতে পারে। যে বস্তুর অস্তিত্ব বা সত্তাই নাই, তাহা অনভিব্যক্ত থাকিতে পারে না। কারণ অনভিব্যক্ত শব্দের অর্থ অপ্রকাশিত বা অজ্ঞাত। যাহা একেবারেই নাই, যাহা অলীক, অজ্ঞাত বা অপ্রকাশিত বলিয়া তাহাকে নির্দেশ করা যায় না। কারণ কোনও বস্তু জ্ঞাত হইলেই জ্ঞানের পূর্বে বস্তুটির অজ্ঞাতত্ব সিদ্ধ হয়। যাহা কখনও কোনভাবেই জ্ঞানের বিষয় হয় না, তাহাকে অজ্ঞাতও বলা চলে না। সুতরাং জ্ঞাতত্ব দ্বারাই অজ্ঞাতত্ব সিদ্ধ হয়। যাহার অস্তিত্বই নাই, তাহা অজ্ঞাতও হইতে পারে না। জ্ঞানই বস্তুর স্বরূপ প্রকাশ করে বলিয়া জ্ঞানের পূর্বে বস্তুটি অজ্ঞাত থাকে। যে বস্তুটি অন্ধকারের দ্বারা আবৃত থাকে, তাহাই আলোকের দ্বারা প্রকাশিত হয়, অন্ধকারাদির দ্বারা আবৃত অবস্থায় বস্তুটি অজ্ঞাত থাকে, আবার আলোক প্রভৃতির দ্বারা অন্ধকারাদি দূর হইলেই তাহা জ্ঞানের বিষয় হয়; সুতরাং আলোক প্রভৃতি বস্তুর আবরণ বিনাশ করে মাত্র, বস্তুটিকে উৎপন্ন করে না অথবা বস্তুটিও অন্ধকারাবৃত অবস্থায় এবং আলোকিত অবস্থায় পূর্বসত্তা ত্যাগ করে না। সুতরাং উৎপত্তি বলিলে যদি অভিব্যক্তিকেই বুঝিতে হয়, তাহা হইলে উৎপত্তির পূর্বেও বস্তুর অস্তিত্ব একান্তভাবেই স্বীকার করিতে হইবে।

অসৎকার্যবাদের পক্ষ হইতে বলা যাইতে পারে যে, উৎপত্তির পূর্বে যদি কার্যের অবিদ্যমানতা স্বীকার করা না হয়, তাহা হইলে বিদ্যমান বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হওয়ার বাধা না থাকায় তখনও বস্তুটির প্রত্যক্ষ হয় না কেন? কারণ মৃৎপিণ্ডের মধ্যে যদি ঘট বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে যখন মৃৎপিণ্ড চক্ষুর সন্নিকটে বর্তমান থাকে, তখন মৃৎপিণ্ডের প্রত্যক্ষ হওয়ায় স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক কিছুই সেখানে নাই। এই অবস্থায় ঘটের বিদ্যমানতা স্বীকার করিলে তাহা প্রত্যক্ষ না হওয়ার কোন কারণ থাকিতে পারে না। সুতরাং তখন মৃৎপিণ্ডের মত ঘটেরও প্রত্যক্ষ হউক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘটের প্রত্যক্ষ ঐ অবস্থায় তো হয় না বাস্তবের সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে তখন ঘটের অবিদ্যমানতাই স্বীকর্তব্য। ইহার উত্তরে সৎকার্যবাদিগণ বলেন—ঘটের অবিদ্যমানতার জন্যই যে তখন ঘট প্রত্যক্ষ হয় না—ইহা ঠিক নহে। কিন্তু ঘটের যে সমস্ত অবয়ব অভিব্যক্ত হইয়া 'ঘট' নামে ব্যবহারের

৪ 'অভিব্যক্তিঃ সাক্ষাদ্ বিজ্ঞানালম্বনত্বপ্রাপ্তিঃ।' (শাঙ্করভাষ্য, বৃহদাঃ ১।২।১)

যোগ্যতা লাভ করে, অনভিব্যক্ত অবস্থায় সেই সমস্ত ঘটাবয়ব মৃৎপিণ্ডরূপ অবস্থার সহিত অভিন্নরূপে থাকায়—অর্থাৎ অবয়বসমূহের নিজস্ব মৌলিক বা স্বতন্ত্রস্বরূপ বিদ্যমান না থাকায় তখন ঘটের প্রত্যক্ষ হয় না। চক্ষুর সহিত অভিব্যক্ত ঘটাবয়বের সংযোগ সম্ভব হইলেও অব্যক্তরূপে অবস্থিত ঘটাবয়বের সংযোগ সম্ভব নহে। মৃৎপিণ্ডের সহিত অভিন্নরূপে বা মৃৎপিণ্ডরূপে ঘটাবয়বসমূহের অবস্থানকালে ঘট আবৃতই থাকে। কারণ যাহা বস্তুর যথাযথ প্রকাশের পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করে তাহাই আবরণ। সুতরাং অন্ধকার এবং ব্যবধানকারক প্রাচীর প্রভৃতির মত কার্যরূপে অভিব্যক্ত হইবার পূর্বে ঘটাবয়বসমূহের মৃত্তিকাপিণ্ড প্রভৃতি কার্যান্তররূপে অবস্থিতিও ঘটের আবরণ বলিয়াই গণ্য হইবে।[৫] সুতরাং উৎপত্তির পূর্বে ঘটাদি বস্তু স্বরূপতঃ বিদ্যমান থাকিলেও পিণ্ডাদি-আকাররূপ আবরণের দ্বারা আবৃত থাকায় উহাদের উপলব্ধি সম্ভব হয় না।

এখানে আপত্তি হইতে পারে যে, ঘটের অংশ বা পিণ্ডাকারতা কখনও ঘটের আবরক হইতে পারে না। কারণ আবরণকারী বস্তু এবং আবরণের বিষয় একই সময় বিদ্যমান থাকে বলিয়া এই দুইটিকে বিভিন্ন স্থানেও দেখিতে পাওয়া যায়। অন্ধকার ঘটকে আবৃত করিলেও অন্ধকার ও ঘট—এই দুইটি বস্তুকে পৃথক্‌ভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব। বিশেষতঃ অন্ধকার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষেরই বাধা জন্মাইতে পারে, কিন্তু স্পার্শন প্রত্যক্ষের বাধা জন্মায় না। অন্ধকারেও ঘটের স্পর্শ অনায়াসেই হয়। অতএব যে দুইটি বস্তু পৃথক্‌ভাবে উপলব্ধির যোগ্য, কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে একটি অপরের আবরক হইতে পারে। অর্থাৎ যাহা আবরক বস্তু, তাহা আবরণীয় পদার্থকে ছাড়িয়া অন্যত্রও থাকে—ইহাই নিয়ম। কিন্তু ঘটের যাহা অবয়ব তাহা ঘটকে ছাড়িয়া কোথায়ও থাকে না এবং ঘটও অবয়বকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং পিণ্ড প্রভৃতি অবস্থা বিদ্যমান ঘটের আবরক—এইরূপ বলা যুক্তিযুক্ত নহে। লৌকিক অভিজ্ঞতায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আবরক অন্ধকার প্রভৃতির সহিত পিণ্ডাকারতা প্রভৃতির স্বভাবগত পার্থক্য রহিয়াছে। ইহার প্রত্যুত্তরে বলা যায় যে, আবরক ও আবরণীয় বস্তু বিভিন্ন স্থানবর্তী হইবেই—এমন কোন নিয়ম নাই। দুগ্ধমিশ্রিত জল দুগ্ধের দ্বারা আবৃত হয়, অথচ সেখানে আবরক দুগ্ধ এবং আবরণীয় জল উভয়েই এক অভিন্নস্থানে বিদ্যমান থাকে। সুতরাং আবরক ও আবরণীয় পদার্থের বিভিন্নস্থানবর্তিতা সর্বত্র থাকে না। ঘটের অবয়ব মৃত্তিকাপিণ্ড-চূর্ণ প্রভৃতি ঘটেরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ঘট হইতে পৃথক্ পদার্থ না হওয়ায় উহারা ঘটের আবরক হইবে না,—এইরূপ আশঙ্কাও অযৌক্তিক। কারণ মৃৎপিণ্ড-চূর্ণ-কপাল প্রভৃতি ঘট হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ কার্যবস্তু বলিয়া উহারা নিজ হইতে ভিন্ন ঘট নামক অপর একটি বস্তুকে অবশ্যই আবৃত করিতে পারে। ঘট একটি কার্যপদার্থ, কিন্তু ঘটের যাহা অবয়ব তাহাও

৫ 'দ্বিবিধত্বাদ্ আবরণস্য। ঘটাদিকার্যস্য দ্বিবিধং হি আবরণং,—মৃদাদেরভিব্যক্তস্য তমঃকুড্যাদি, প্রাঙ্‌মৃদোঽভিব্যক্তে র্মৃদাদ্যবয়বানাং পিণ্ডাদিকার্যান্তররূপেণ সংস্থানম্।' (শাঙ্করভাষ্য, বৃহদাঃ ১।২।১)

ঘট হইতে পৃথক্‌ভাবাপন্ন স্বতন্ত্র কার্যপদার্থ বলিয়াই স্বীকৃত হয়, সুতরাং তাহারা ঘটের আবরক কেন হইতে পারিবে না ?

পুনরায় আপত্তি হইতে পারে যে, চূর্ণ-কপালাদি অবস্থায়ও যদি ঘটের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণই থাকে, কেবল আবরণ আছে বলিয়াই যদি ঘটের উপলব্ধি না হয়, তাহা হইলে ঘট নির্মাণ করিবার জন্য কেবল চূর্ণ-কপাল প্রভৃতি অবস্থার বিনাশের জন্য যত্ন করাই প্রয়োজন হইবে, ঘট উৎপাদনের জন্য তো আর যত্ন করা আবশ্যক হইবে না। অথচ ইহা কোথায়ও দেখা যায় না; যদি আবরণ বিনাশ করিলেই পূর্ব হইতে বিদ্যমান ঘটটি অভিব্যক্ত হইত, তাহা হইলে ঘটনির্মাণের জন্য বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা থাকিত না। কিন্তু চূর্ণ-কপাল প্রভৃতির বিনাশ করিলেই তো ঘট উৎপন্ন হয় না, ঘট নির্মাণের জন্য বিশেষ কৌশল অবলম্বন করিতেই হয়। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, ঘট পূর্বে ছিল না, বিশেষ প্রযত্নের ফলেই পূর্বের অবিদ্যমান ঘট জন্মে। সুতরাং ঘট কেবলমাত্র আবৃত অবস্থায় ছিল—ইহা কল্পনামাত্র। ইহার উত্তরে সৎকার্যবাদিগণ বলেন—কার্যকে অভিব্যক্ত করিবার অনুকূল প্রচেষ্টা হইতেই কার্যের অভিব্যক্তি হয়—ইহাই নিয়ম। সুতরাং ঘট নামক কার্যের অভিব্যক্তি-সম্পাদনই যাহার উদ্দেশ্য, তাহার পক্ষে এমন একটি প্রচেষ্টাই করিতে হইবে, যে প্রচেষ্টার ফলই হইবে ঘটের অভিব্যক্তি। এইরূপ ফলসাধনের উপযোগী পদ্ধতি অবলম্বন করিলেই ঘটের অভিব্যক্তি অবশ্যম্ভাবী হইবে। অতএব কার্যকে অভিব্যক্ত করিবার পক্ষে ঐকান্তিক অনুকূল প্রচেষ্টা ব্যতীত কার্যের অভিব্যক্তি হইবে না। অভিব্যক্তিরূপ ফলসিদ্ধির উপযোগী প্রচেষ্টার ফলে আবরণ-নাশ অবশ্যই হইবে বলিয়া আবরণনাশ প্রাসঙ্গিক ফলরূপে গণ্য হয়। আরও বলা যায় যে, অন্ধকার প্রভৃতি আবরক বস্তুর বিনাশের জন্যও প্রদীপাদির উৎপত্তির প্রচেষ্টাই প্রয়োজন হয়। প্রদীপ জ্বালাইবার জন্য যে প্রযত্ন করা হয়, তাহার মুখ্য ফল প্রদীপের উৎপত্তি। প্রদীপ প্রজ্বালিত হইলেই অন্ধকার দূর হয়, অর্থাৎ অন্ধকার বিনাশের জন্য আর পৃথক্ প্রয়াসের দরকার হয় না।

এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে; তাহা এই—উৎপত্তির পূর্বে কারণের মধ্যে অব্যক্ত অবস্থায় কার্য বিদ্যমান থাকে, অর্থাৎ মৃৎপিণ্ডের মধ্যে ঘট অব্যক্তরূপেই থাকে। মৃৎপিণ্ডের তদানীন্তন অবস্থাই ঘটের আবরক বলিয়া উক্ত অবস্থা যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ ঘট অভিব্যক্ত হইবে না। এখন কথা এই যে, যদি ঘটের অভিব্যক্তির জন্য ঘটের পূর্বেই অভিব্যক্ত মৃৎপিণ্ড বা কপালের (ঘটের অংশদ্বয়ের) বিনাশের জন্যই যত্ন করা হয়, তাহা হইলে সেই প্রযত্নের ফলে মৃৎপিণ্ড চূর্ণরূপ কার্যকে এবং কপাল তাহার বিভিন্ন ভগ্ন অংশকেই জন্মাইবে। ইহার ফলে এই চূর্ণ প্রভৃতি কার্যের দ্বারাও ঘট পুনরায় আবৃতই থাকিয়া যাইবে। সুতরাং কেবলমাত্র আবরকের বিনাশের চেষ্টা দ্বারা কখনও ঘট জন্মিতে পারে না। এইজন্যই বলিতে হয় যে, ঘট প্রভৃতি কার্যের অভিব্যক্তির জন্যই বিশেষ প্রচেষ্টার আবশ্যকতা রহিয়াছে।

এই বিষয়ে আরও একটি যুক্তি এইরূপ—ঘট প্রভৃতি যে কোন উৎপন্ন বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া ত্রৈকালিক ব্যবহার হয়। যেমন, অনাগত ঘট, বর্তমান ঘট এবং অতীত ঘট। 'বর্তমান ঘট' এই জ্ঞানের বিষয় হিসাবে ঘটের

অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে, কারণ বিষয়-হীন জ্ঞান হয় না। তেমনই 'ভবিষ্যৎকালীন ঘট' বা 'অতীতকালীন ঘট' এইরূপ জ্ঞানও নির্বিষয় হইতে পারে না। সুতরাং উৎপত্তির পূর্বে যদি ঘটের কোনওরকম অস্তিত্বই না থাকিত, তাহা হইলে বিষয় না থাকায় 'অনাগত ঘট' এইরূপ জ্ঞানও হইতে পারিত না। কারণ, বিষয়ীভূত ঘট নাই, অথচ ঘট-জ্ঞান হইতেছে—ইহা সম্ভব নহে। ভবিষ্যৎ বিষয়ের জন্য অভিলাষী হইয়া মানুষ সেই বিষয় লাভের জন্য প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু যদি উৎপত্তির পূর্বে কার্যের কোনওরকম অস্তিত্বই না থাকিত, তাহা হইলে আকাশকুসুমের মত সম্পূর্ণ অসৎ বা অলীক বস্তু লাভের উদ্দেশ্যে কাহারও প্রবৃত্তি হইতে পারিত না। যাহা অসৎ, তাহা লাভ করিবার জন্য লোকপ্রবৃত্তি দেখা যায় না। আরও একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন;—ঈশ্বরের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান বিষয়ের নিত্যপ্রত্যক্ষ জ্ঞান রহিয়াছে—ইহা ঈশ্বরবাদিগণ স্বীকার করেন। অসৎকার্যবাদী ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শনে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ভবিষ্যৎ ঘট যদি সম্পূর্ণ অসৎ বা অস্তিত্ববিহীনই হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ ঘট বিষয়ে ঈশ্বরের যে জ্ঞান রহিয়াছে, সেই জ্ঞান প্রত্যক্ষাত্মক হইলেও তাহাকে মিথ্যা-জ্ঞানই বলিতে হইবে। এইরূপ বলিলে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতার হানি হয়, তাহার ফলে ঈশ্বর অসিদ্ধ হইয়া পড়েন। আর ঈশ্বরের প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যৎ বিষয়ের জ্ঞান হয় না, কেবল তাঁহার গুরুত্ব বা মহিমা বাড়াইবার জন্যই ঐরূপ বলা হয়—এরূপ বলাও সঙ্গত নহে। কারণ অন্য যুক্তির দ্বারাই ঘটের ত্রৈকালিক অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।

অন্য যুক্তি এই প্রকার হইতে পারে—কোনও কার্যবস্তুর উৎপত্তির জন্য মানুষ যথাযথ প্রবৃত্ত হইলে প্রচেষ্টার ফলেই কার্যটি জন্মে। এবং বিভিন্ন কার্য্যবস্তু জন্মাইবার জন্য যে প্রচেষ্টা আবশ্যক, তাহাও বস্তুভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। কিন্তু বস্তুটি না জন্মিতে কিভাবে বুঝা যাইবে যে, এইরূপ প্রবৃত্তির ফলে অভিলষিত নির্দিষ্ট বস্তুটিই জন্মিবে? যদি প্রমাণের দ্বারা উৎপত্তির পূর্বেও কার্যের অস্তিত্ব নির্ধারিত হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যৎকালীন ঘটের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণার ফলে কার্য উৎপাদনের জন্য মানুষ চেষ্টিত হয় এবং 'কার্যটি হইবে' অর্থাৎ 'ঘট জন্মিবে' এইরূপ ভবিষ্যৎ ঘটের বিষয়ে বলা চলে। সুতরাং 'ঘট হইবে' এইরূপ সর্বজনপ্রসিদ্ধ ব্যবহারের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ভবিষ্যৎকালের সঙ্গে ঘটের একটি সম্বন্ধ আছে। সুতরাং ঘট যদি উৎপত্তির পূর্বে একেবারেই অসৎ হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যৎকালের সহিত ঘটের সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। অসৎকার্যবাদীর মতানুসারে বলিতে হয় যে, 'ভাবী ঘটটি অসৎ' অর্থাৎ ঘট হইবে না। বন্ধ্যাপুত্রের মত অস্তিত্ববিহীন বা অসৎ হইলে কোনকালে কোনরকমেই ঘটের উৎপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং ভাবী ঘট যদি অসৎ বা অস্তিত্বশূন্যই হয়, তাহা হইলে তাহাকে আর 'ভবিষ্যতি' অর্থাৎ 'সত্তাশালী হইবে' এরূপ বলা যায় না। অতএব বর্তমানকালে উপস্থিত ঘটকে যেমন অসৎ বা 'নাই' বলা চলে না, 'ভাবী অসৎ ঘট উৎপন্ন হইবে' ইহাও তেমনই বলা যায় না।

আরও কথা এই যে, ঘটনির্মাণের জন্য কুম্ভকার উপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহ করিয়া প্রযত্ন-বিশেষের দ্বারাই ঘট উৎপাদন করে। 'ঘট নির্মাণ করিব'—এই সঙ্কল্প অনুসারেই ঘট প্রস্তুত

করিবার মত বিশেষ বিশেষ দ্রব্য সংগৃহীত হয়। ঘট যদি উৎপত্তির পূর্বে একেবারে অস্তিত্বশূন্যই হয়, তাহা হইলে ঘটনির্মাণের সঙ্কল্প না হইয়া অসতের (সত্তাহীন বস্তুর) উৎপাদনের জন্যই সঙ্কল্প হইবে। কিন্তু কোন-ক্ষেত্রেই কেহ অসদ্‌বস্তুনির্মাণের সঙ্কল্প করে না। 'শশশৃঙ্গ নির্মাণ করিব'—কোন সুস্থ-মস্তিষ্কের মানুষ এই সঙ্কল্প করে না। সুতরাং ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, সদ্‌বস্তুই সঙ্কল্পের উপজীব্য হয়। উৎপত্তির পূর্বে ঘট সম্পূর্ণ অসৎ হইলে উহাকে অবলম্বন করিয়া সঙ্কল্প হইতে পারে না। সঙ্কল্পিত বস্তুর আকার প্রদান করিবার প্রচেষ্টা দ্বারা কার্যের উৎপত্তি হয়। কিন্তু যাহা অসৎ, তাহার কোন আকার প্রদান করা কোনরকমেই সম্ভব নহে। সহজ কথায় বলা যায়, যাহা অসৎ, তাহাকে সৎ করা যায় না। 'অসদকরণাৎ'—(সাংখ্য-কারিকা ৯) স্বরূপতঃই যাহা সৎ নহে, তাহা সৎ হইতে পারে না। কারণ যাহা সৎ নহে, তাহা সৎ হইতে ভিন্ন। যাহা হইতে যাহা ভিন্ন, তাহা কেমন করিয়া সেই ভিন্ন বস্তু হইবে। পট ঘট হইতে ভিন্ন, সুতরাং পট কখনও ঘট হইতে পারে না। অসৎ—সৎ হইতে ভিন্ন, অতএব অসৎ কখনও সৎ হইতে পারে না; সাংখ্যকারিকায় ইহাই বলা হইয়াছে।

এখানে অসৎকার্যবাদীর পক্ষ হইতে বলা যায় যে, যাহা স্বাভাবিক নীল নহে, তাহাও কৃত্রিম উপায়ে নীল করা যায়, সুতরাং এখানেও তেমন হইতে পারে। অর্থাৎ নীলবর্ণ যেমন কোন সময়ে বস্তুতে থাকিতে পারে, তেমনই সেই বস্তুতে নীলভিন্নত্বও কালভেদে থাকে। অতএব একই বস্তুতে নীলভিন্নত্ব ও নীলত্ব—এই বিরুদ্ধ ধর্ম থাকিবার বাধা হয় না। এখানেও উৎপত্তির পূর্বে বস্তুতে অসত্ত্ব ধর্ম এবং উৎপত্তির পরে সেই একই বস্তুতে সত্ত্ব নামক ধর্ম থাকিতে পারিবে। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, অসত্ত্ব এবং সত্ত্ব—এই দুইটিকে যদি কালভেদে একই বস্তুর ধর্ম বলা হয়, তাহা হইলে উৎপত্তির পূর্বে কার্যের অস্তিত্ব স্বীকৃতই হইবে। কারণ ধর্মী না থাকিলে ধর্মটি থাকিবে কোথায়? উৎপত্তির পূর্বে অসত্ত্ব নামক ধর্ম যে বস্তুতে থাকিবে, সেই বস্তুর যদি অস্তিত্বই তখন না থাকে তাহা হইলে ধর্ম হিসাবে অসত্ত্বও থাকিতে পারে না।[৬]

এখানে নৈয়ায়িক পক্ষ হইতে অন্যভাবে অসৎকার্যবাদের অনুকূলে বলা যাইতে পারে যে, 'অসত্ত্ব' বলিতে আকাশকুসুমাদির মত অলীক অর্থ এখানে বিবক্ষিত নহে। কার্যটি জন্মিবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কার্যটির অভাব থাকে—ইহা তো অস্বীকার করা যায় না। উৎপত্তির পূর্বে কার্যের সমবায়িকারণে কার্যের যে অভাব থাকে—তাহার নাম প্রাগভাব। ঘট উৎপত্তির পূর্বে 'এই কপালে ঘট হইবে'—এইরূপ যে প্রতীতি জন্মে, তাহাই ঘটের প্রাগভাববিষয়ক বোধ। সুতরাং উৎপত্তির পূর্বে 'ঘট অসৎ'—ইহার অর্থ ঘট নামক ভবিষ্যদ্ বস্তুটির প্রাগভাব আছে। যদি তখন ঘট বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে আর ঘটের অভাব থাকিতে পারিত না। কারণ একই সময়ে এক অধিকরণে বস্তুটির সত্তা এবং তাহার অভাব বিদ্যমান থাকিতে পারে না। অতএব উৎপত্তির পূর্বে ঘটের প্রাগভাব

৬ অসতি ধর্মিণি ন তস্য ধর্ম ইতি সত্বং তদবস্থমেব। (তত্ত্বকৌমুদীটীকা সাঃ কাঃ ৯)

বিদ্যমান থাকায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে, তখন ঘটের অস্তিত্ব বা সত্তা ঘটের সমবায়িকারণে থাকিতে পারে না। সমবায়িকারণ ভিন্ন অন্যত্র ঘটের উৎপত্তিপূর্বকালীন সত্তা সৎকার্যবাদিগণও স্বীকার করেন না। সুতরাং উৎপত্তির পূর্বে ঘটের প্রাগভাব ঘটের সমবায়িকারণে বিদ্যমান থাকায় ঘটের তৎকালীন অস্তিত্বহীনতাই প্রতিপন্ন হয়।

ইহার উত্তরে সৎকার্যবাদিগণ বলেন, ঘটের ইতরেতরাভাব বা অন্যোন্যাভাব বলিলে প্রকৃতপক্ষে একটি ভাববস্তুকেই বুঝা যায়। 'পট ঘট নহে'—ইহার অর্থ ঘটের অন্যোন্যাভাব পটে আছে। এখানে দেখা যায় যে, পট ঘট হইতে পৃথক্ বস্তু বলিয়াই পটে ঘটের অন্যোন্যাভাব আছে। 'ঘটের অন্য'—বলিলে ঘট হইতে পৃথক্ পটাদি বস্তুকেই বুঝায়, কিন্তু ঐ পট বস্তুটিতে ঘটের অভাব থাকিলেও উহা যে অভাবাত্মক অর্থাৎ কিছুই নহে, তাহা নহে; কিন্তু তাহা ভাবস্বরূপ একটি পদার্থ। সুতরাং ঘটের অন্যোন্যাভাব ঘট হইতে একটি স্বতন্ত্র ভাববস্তু—ইহাই সিদ্ধ হয়। ঘটের প্রাগভাবও ঘটেরই অভাব বলিয়া উহাও ঘট হইতে একটি স্বতন্ত্র ভাববস্তুই হইবে, উহাও অভাবাত্মক কিছু নহে।[৭] কারণ, ঘটের ইতরেতরাভাবের ন্যায় এই প্রাগভাবও যখন ঘটাদির নামের দ্বারাই উল্লিখিত হয়, তখন ইতরেতরাভাবের ন্যায় প্রাগভাবেরও ভাবস্বরূপতাই সিদ্ধ হয়। বিশেষতঃ 'ঘটের প্রাগভাব'—এই কথার দ্বারা উৎপত্তির পূর্বে ঘটের স্বরূপই ছিল না, ইহা বুঝায় না; কিন্তু বর্তমানে ঘট যেমন আছে, সেরূপ ছিল না, ইহাই বুঝা যায়। সুতরাং ঘটের প্রাগভাবপক্ষ গ্রহণ করিলেও উৎপত্তিপূর্বকালীন অসত্তা প্রমাণিত হয় না।

আরও কথা এই যে, 'ঘটের প্রাগভাব'—এই কথাটির দ্বারাই ঘটের উৎপত্তিপূর্বকালীন সত্তা সিদ্ধ হয়। কারণ, ঘটের প্রাগভাব ঘটস্বরূপ অথবা ঘট হইতে ভিন্ন কিছু—ইহার সমাধান করিতে হইবে। যদি ঘটের প্রাগভাব ঘটের স্বরূপই হয়, তাহা হইলে আর 'ঘটের' বলা সঙ্গত হয় না। কারণ, বিদ্যমান দুইটি বস্তুর মধ্যে ভেদ থাকিলেই উভয়ের সম্বন্ধ হইতে পারে কিন্তু ঘট যদি প্রাগভাবস্বরূপ হয়, তাহা হইলে তাহার সহিত সম্বন্ধ নির্দেশ করাই যায় না। আর যদি ঘটের প্রাগভাব ঘট হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু হয়, তাহা হইলেও প্রকারান্তরে ঘটের সত্তাই স্বীকৃত হইয়া পড়ে। কারণ ঘটের সহিত ঘট হইতে অত্যন্ত ভিন্ন প্রাগভাবের সম্বন্ধ না থাকিলে 'ঘটের প্রাগভাব'—ইহা বলা যায় না। যে দুইটি বস্তুর সম্বন্ধ হইবে, সেই বস্তু-দুইটির বিদ্যমানতা প্রয়োজন। কারণ সম্বন্ধ সর্বত্রই দুইটি সম্বন্ধীর সত্তা-সাপেক্ষ। অতএব উৎপত্তির পূর্বে ঘট একেবারেই অসৎ হইলে সম্বন্ধীর অভাববশতঃ প্রাগভাবের সহিত তাহার সম্বন্ধও হইবে না। ফলতঃ 'ঘটের প্রাগভাব'—এই নির্দেশ করিতে হইলে ঘটের অস্তিত্ব-স্বীকার অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে।

এই বিষয়ে আরও একটি যুক্তি এই যে, উৎপত্তির পূর্বে কার্যের সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীনতা স্বীকার করিলে কার্যের উৎপত্তির কথাই বলা যায় না। কারণ, উৎপত্তি কি? ইহার উত্তর—উৎপত্তি এক প্রকার ক্রিয়া।

৭ ন চ ঘটাভাবঃ সন্ পটোঽভাবাত্মকঃ, কিং তর্হি? ভাবরূপ এব; এবং ঘটস্য প্রাক্প্রধ্বংসাত্যন্তাভাবানামপি ঘটাদন্যত্বং স্যাৎ, ঘটেন ব্যপদিশ্যমানত্বাৎ, ঘটস্যেতরেতরাভাববৎ। (শাঙ্করভাষ্য, বৃহদাঃ ১।২।১)

'উৎপন্ন হইতেছে'—এইরূপ ব্যবহারের দ্বারাই উৎপত্তির ক্রিয়াস্বরূপতা সিদ্ধ হয়। ক্রিয়া একান্তভাবেই কর্তৃ-সাপেক্ষ ; অতএব উৎপত্তি-ক্রিয়ারও কর্তা অবশ্যই থাকিবে। কর্তা নাই, অথচ ক্রিয়া আছে—ইহা হইতে পারে না। ঘটের উৎপত্তির ক্ষেত্রেও একজন কর্তা থাকিবে। সেই কর্তা ঘট নিজেই হইবে, অথবা অন্য কেহ হইবে—ইহাই বিবেচ্য। সাধারণতঃ 'কুম্ভকার ঘট করিতেছে' এইরূপ বাক্যের মধ্যে ঘটের কর্তা কুম্ভকার—ইহাই বুঝায়। কিন্তু কুম্ভকার 'করিতেছে' এই ক্রিয়ার কর্তা হইলেও 'উৎপত্তি'-রূপ ক্রিয়ার কর্তা কুম্ভকার নহে। 'ঘট উৎপন্ন হইতেছে'—ইহা বলিলে উৎপত্তিক্রিয়ার কর্তারূপে ঘটকেই বুঝা যায়। অতএব যাহার উৎপত্তি হয়, সেই বস্তুটিই উৎপত্তিক্রিয়ার আশ্রয় বলিয়া কর্তা হইবে। সুতরাং উৎপত্তিক্রিয়ার যাহা আশ্রয়, তাহা যদি উৎপত্তির পূর্বে না থাকে, তাহা হইলে উৎপত্তিক্রিয়ার কর্তা হইতে পারে না। ঘটের উৎপাদনই কুম্ভকারের প্রযত্নসাধ্য, উৎপত্তি ঘটনিষ্ঠ ক্রিয়া বলিয়া উহা কুম্ভকারগত ক্রিয়া হইতে পারে না। উৎপত্তির অনুকূল প্রযত্নকেই উৎপাদন বলা হয়। সুতরাং উৎপত্তি এবং উৎপাদন এক নহে। যিনি উৎপন্ন করিবার জন্য প্রচেষ্টা করেন, তাঁহাকে উৎপাদক বলে; পক্ষান্তরে যাহা উৎপন্ন হয় তাহাই উৎপত্তিক্রিয়ার আশ্রয় বা কর্তা। সুতরাং উৎপাদক এবং উৎপন্ন বস্তু এক হইতে পারে না বলিয়াই উৎপাদন ও উৎপত্তি এক নহে। উৎপাদনরূপ ক্রিয়ার আশ্রয় কুম্ভকার হইলেও উৎপত্তিক্রিয়ার আশ্রয় কুম্ভকার নহে, কিন্তু ঘটই উক্ত ক্রিয়ার কর্তা। 'ঘট উৎপাদন করিতেছে' এবং 'ঘট উৎপন্ন হইতেছে'—এই দুইটি বাক্য একার্থক নহে, কিন্তু ভিন্নার্থক। অতএব উৎপত্তিক্রিয়ার কর্তা ঘট ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। এই অবস্থায় যদি উৎপত্তির পূর্বে ঘটের অস্তিত্বই না থাকে, তাহা হইলে উৎপত্তিক্রিয়ার কর্তা ঘট হইতে পারে না। আর কর্তা না থাকিলে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেও পারে না। সুতরাং অসৎকার্যবাদীর মতে 'ঘট উৎপন্ন হইতেছে'—এই ব্যবহার সম্ভব হইবে না। ঘটের যে উৎপত্তি, সেই উৎপত্তিক্রিয়ার কর্তা যদি কুম্ভকার হয়, তাহা হইলে 'ঘট উৎপন্ন হইতেছে'—এইরূপ বাক্যের প্রয়োগ না হইয়া 'কুম্ভকার উৎপন্ন হইতেছে'—এইরূপ ব্যবহারই হইত। কিন্তু তাহা হয় না। সুতরাং উৎপত্তিক্রিয়ার আশ্রয় ঘট ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না বলিয়া ঘটের উৎপত্তিপূর্বকালীন অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

নৈয়ায়িক পক্ষ হইতে বলা হয়, উৎপত্তির স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, উৎপত্তি-শব্দের দ্বারা কুম্ভকারগত প্রযত্ন অথবা ঘটনিষ্ঠ ক্রিয়া—ইহার কিছুই বুঝা যায় না; কিন্তু নিজের কারণ কপালের সহিত অথবা সত্তার সহিত নিজের সম্বন্ধই উৎপত্তি শব্দের অর্থ। সুতরাং উৎপত্তিক্রিয়া অবলম্বন করিয়া যে সমস্ত যুক্তিজাল বিস্তার করা হইয়াছে তাহার কোনও সার্থকতা নাই। তাৎপর্য এই যে, সমবায়-সম্বন্ধে কপালে ঘট জন্মে। সমবায়-সম্বন্ধ নিত্য পদার্থ, ঘটের সমবায়িকারণ কপালও ঘটোৎপত্তির পূর্বেই থাকে। সুতরাং সমবায়-সম্বন্ধে কপালের সহিত ঘটের সম্বন্ধ হওয়াই ঘটের উৎপত্তি। ইহার প্রত্যুত্তরে বলা হয়, যে বস্তুটির কোনরূপ সত্তাই নাই, তাহা কি ভাবে নিজের কারণের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত হইবে? দুইটি বিদ্যমান বস্তুরই সম্বন্ধ হইতে পারে; কিন্তু যে দুইটি বস্তুর সম্বন্ধ

হইবে তাহার মধ্যে একটি অবিদ্যমান থাকিলে বিদ্যমান অপর বস্তুটির সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না; সুতরাং উৎপত্তির পূর্বকালীন অস্তিত্ববিহীন ঘট কপালের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারে না।

এখানে অসৎকার্যবাদী বলিতে পারেন, উৎপত্তির পূর্বে 'ঘট অসৎ' বলিলে শশশৃঙ্গের মত অসৎ—ইহা বুঝায় না। শশশৃঙ্গ কোনও কালেই সৎ হয় না; কিন্তু ঘট উৎপত্তির পূর্বে এবং বিনাশের পরে অসৎ হইলেও উৎপত্তির পরে বিনাশের পূর্ব পর্যন্ত সৎ থাকে। সুতরাং ঘট অলীক পদার্থ নয় বলিয়াই কারণের সহিত তাহার সম্বন্ধ অনুপপন্ন হইবে না। ইহার উত্তরে বলা হয় যে, উৎপত্তির পূর্বে যদি ঘটের কোনরকম সত্তাই না থাকে, তাহা হইলে 'ঘটের অভাব আছে' এই ভাবে নাম নির্দেশ-পূর্বক ঘটের উৎপত্তির পূর্বকালীন অসত্তা কি করিয়া প্রতিপাদন করা যায়? কারণ অস্তিত্ব-শালী বস্তুরই সীমা নির্ধারণ করা সম্ভব। যাহার উৎপত্তি হয় নাই, নৈয়ায়িক মতে সেই অসৎ পদার্থের সহিত কালের সম্বন্ধ না থাকায় তাহাকে অবলম্বন করিয়া 'উৎপত্তির পূর্বে' এই প্রকারের শব্দপ্রয়োগ করিয়া ভাবপদার্থের ন্যায় তাহার সময়সীমা নির্দেশ করা সম্ভব নহে। গৃহ, ক্ষেত্র প্রভৃতি ভাবপদার্থেরই সাময়িক বা দৈশিক সীমা নির্ধারিত হইতে পারে, অভাবের কোনরূপ সীমা নির্দিষ্ট হইতে পারে না। 'পূর্ণবর্মার অভিষেকের পূর্বে বন্ধ্যাপুত্র রাজা হইয়াছিল'—এইরূপ বাক্যের প্রয়োগ হয় না। কারণ, অভাব কোন সীমাবদ্ধ বস্তু নহে। এই জন্য 'বন্ধ্যাপুত্র রাজা হইবে, হইতেছে বা হইয়াছিল' এইরূপ প্রয়োগ হয় না।

এখানে অভিপ্রায় এই যে, ঘটের প্রাগভাবও অভাব, এবং বন্ধ্যাপুত্রের অভাবও অভাব। সুতরাং উৎপত্তির পূর্বে ঘটের প্রাগভাব এবং বন্ধ্যাপুত্রের অভাব—এই উভয়ই বিদ্যমান থাকায় কোন্‌টি কাহার অভাব, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। এই অবস্থায় ব্যবহারের অযোগ্য বলিয়া অভাবের কোন বিশেষত্ব না থাকায় এইরূপ অভাবের অর্থাৎ ঘটাদির প্রাগভাবের কোন সীমা নিরূপণ করা সম্ভব হয় না। ভাবী ঘটের দ্বারাও ঘট-প্রাগভাবের ব্যবহারযোগ্যতা সম্পন্ন হইতে পারে না; কারণ ঘট-প্রাগভাবের সহিত ঘটের কোনও-প্রকার সম্বন্ধই সম্ভব হইবে না। উৎপত্তির পূর্বে অস্তিত্ববিহীন ঘটের সহিত প্রাগভাবের সম্বন্ধ স্বীকার করিলে বন্ধ্যার সহিতও বন্ধ্যা-পুত্রের সম্বন্ধ হইতে পারে। অথচ—বিচারশীল কোন ব্যক্তিই বন্ধ্যার সহিত পুত্রের সম্বন্ধ স্বীকার করেন না। ঘট-প্রাগভাবও কারক-ব্যাপারের দ্বারা ঘটের উৎপাদক হইবে—ইহা স্বীকার করিলে কারকব্যাপারের দ্বারা বন্ধ্যা-পুত্রেরই বা উৎপত্তি হইবে না কেন? কারণ ঘট-প্রাগভাব ও বন্ধ্যাপুত্র ইহাদের মধ্যে অসত্তার কোন বৈলক্ষণ্য নাই। অতএব কারকব্যাপারের দ্বারাও বন্ধ্যাপুত্রের অনুৎ-পত্তির ন্যায় ঘট-প্রাগভাব হইতেও ঘটের অনুৎ-পত্তিই যুক্তিসিদ্ধ হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে, যাহা বিদ্যমান নাই, তাহার উৎপত্তি স্বীকার না করিলে যাহা বিদ্যমান আছে, তাহারই উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এইরূপ স্বীকার করিলে উৎপত্তির জন্য কোনরকম প্রযত্ন নিরর্থক হইয়া পড়ে। কারণের স্বরূপ পূর্ব হইতেই সিদ্ধ আছে বলিয়া কারণস্বরূপ বস্তুটির উৎপত্তির জন্য যেমন নূতন কোনও প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না, উৎপত্তির পূর্বে কার্যদ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার

করিলে তেমনই কার্যদ্রব্যের উৎপত্তির জন্যও কোন প্রযত্ন আবশ্যক হইবে না। অথচ ঘটাদি কার্যদ্রব্যের উৎপত্তির জন্য কুম্ভকার প্রভৃতির বিশেষ প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা সর্বত্রই দেখা যায়। সুতরাং কার্যদ্রব্যের উৎপাদনের জন্য প্রচেষ্টার আবশ্যকতা থাকাতে বুঝা যায় যে কার্যদ্রব্যটি উৎপত্তির পূর্বে সৎ ছিল না। ইহার উত্তরে বলা হয় যে, কার্য্যদ্রব্যটি উৎপত্তির পূর্বে নিজ উপাদানকারণে অব্যক্ত-ভাবে উপাদানকারণের সহিত অভিন্নরূপেই ছিল ; সুতরাং অনভিব্যক্ত ঘটাদি কার্যদ্রব্যকে অভিব্যক্ত করিবার জন্যই কারকব্যাপারের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। এই বিষয়ে এই প্রবন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং ইহাই সিদ্ধান্ত যে, উৎপত্তির পূর্বেও কার্যদ্রব্য ঘট প্রভৃতি অসৎ বা অস্তিত্ববিহীন নহে। কিন্তু উৎপত্তির পূর্বে সূক্ষ্মরূপে উপাদান-কারণে বিদ্যমান থাকিলেও ব্যবহারযোগ্য আকৃতিসম্পন্ন অবস্থায় থাকে না ; সেইজন্য উক্ত অবস্থায় তাহাকে বিশেষরূপে প্রত্যক্ষ করা বা নামের দ্বারা নির্দেশ করা চলে না। ব্যবহার-যোগ্য আকৃতি সম্পাদন করিবার জন্যই কর্তার প্রচেষ্টা আবশ্যক হয়। বস্তুটি যদি একেবারেই অসৎ হইত, তাহা হইলে কোন প্রযত্নের দ্বারাই তাহাকে সৎ করা সম্ভব হইত না। সুতরাং উৎপত্তির পূর্বেও কার্যদ্রব্যটি অসৎ নহে।

এইভাবে অসৎকার্যবাদ খণ্ডন করিয়া সৎকার্যবাদী সাংখ্যাচার্যগণ পরিণামবাদ স্বীকার করেন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা জড়া প্রকৃতিই বিশ্বসংসারের যাবতীয় কার্যদ্রব্যের মূল উপাদান। প্রকৃতির পরিণামই জড়জগৎ— ইহাই সৎকার্যবাদী সাংখ্যদর্শনের সিদ্ধান্ত। কিন্তু বিবর্তবাদী ব্রহ্মাদ্বৈতমতাবলম্বী বৈদান্তিক-গণ কার্যের সত্তাও স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে কারণ ব্রহ্মই একমাত্র সদ্বস্তু, কার্য-জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত অর্থাৎ মিথ্যা ; উহা সৎও নহে, আবার অসৎ বা অলীকও নহে, কিন্তু অনির্বাচ্য। এই মতবাদ স্থাপন করিতে হইলেও প্রথমতঃ অসৎকার্যবাদ খণ্ডন করিতেই হইবে। বিশেষতঃ সাংখ্য মতবাদও খণ্ডনীয় হইবে। সুতরাং বিবর্তবাদের পটভূমিকায় প্রথমে অসৎকার্যবাদ-খণ্ডন প্রয়োজন। ইহার পর সৎকার্যবাদ যুক্তি সহকারে স্থাপন করিয়া বিবর্তবাদের যুক্তিতে তাহার খণ্ডন করিতে পারিলেই বিবর্তবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। সুতরাং সেই উদ্দেশ্য অনুসারেই এখানে অসৎ-কার্যবাদ-খণ্ডনের পদ্ধতি আলোচিত হইল।

কুলালাদ্ ঘট উৎপন্নো ভিন্নশ্চেতি ন শঙ্ক্যতাম্। মৃদ্বদেষ উপাদানং ন নিমিত্তং কুলালবৎ॥
স্থিতির্লয়শ্চ কুম্ভস্য কুলালে স্তো ন হি ক্বচিৎ। দৃষ্টৌ তৌ মৃদি তদ্বৎ স্যাদুপাদানং তয়োঃ শ্রুতেঃ
উপাদানং ত্রিধা ভিন্নং বিবর্তি পরিণামি চ। আরম্ভকঞ্চ তত্রান্ত্যৌ ন নিরংশেঽবকাশিনৌ॥
আরম্ভবাদিনোঽন্যস্মাদন্যস্যোৎপত্তিমূচিরে। তন্তোঃ পটস্য নিষ্পত্তের্ভিন্নৌ তন্তুপটৌ খলু॥
অবস্থান্তরতাপত্তিরেকস্য পরিণামিতা। স্যাৎ ক্ষীরং দধি মৃৎ কুম্ভঃ সুবর্ণং কুণ্ডলং যথা॥
অবস্থান্তরভানন্তু বিবর্তো রজ্জুসর্পবৎ। নিরংশেঽপ্যস্ত্যসৌ ব্যোম্নি তলমালিন্যকল্পনাৎ॥
ততো নিরংশ আনন্দে বিবর্তো জগদিষ্যতাম্। মায়াশক্তিঃ কল্পিকা স্যাদৈন্দ্রজালিকশক্তিবৎ।

—পঞ্চদশী, ১৩।৪-১০

‘প্রযোজক’ শ্রীরামকৃষ্ণ ঃ নাটক বিল্বমঙ্গল

শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়*

১

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর

মূল কাহিনী : ভক্তমাল গ্রন্থ থেকে গৃহীত

নাট্যপরিকল্পনা : শ্রীরামকৃষ্ণ

নাট্যরূপারোপ : গিরিশচন্দ্র ঘোষ

নাট্যনির্দেশনা : শ্রীরামকৃষ্ণ

ও

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

শুভ উদ্বোধন : ৩রা জুলাই, ১৮৮৬

১৮৮৬ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি কলকাতার দেওয়ালে দেওয়ালে স্টার থিয়েটারের এই রকম কোনো পোস্টার যদি দেখা যেত, তাহলে তা বিস্ময়ের উদ্রেক করলেও সত্যের অপলাপ হত না। প্রকৃত-পক্ষে ‘বিল্বমঙ্গল’ নাটক-পরিকল্পনা, কোনো কোনো চরিত্রের অভিনয়-নির্দেশনা শ্রীরাম-কৃষ্ণেরই। এই নাটকটির প্রধান কাল্পনিক চরিত্র যে পাগলিনী, তাকেও গিরিশচন্দ্র বহিরঙ্গভাবে পেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে গল্প শুনে, আর অন্তরঙ্গভাবে সেই চরিত্র গড়ে তুলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্র অবলম্বন করে। মূল কাহিনীর সঙ্গে অতিরিক্ত যে প্রধান দুটি চরিত্র গিরিশচন্দ্র সংযুক্ত করেছেন, তার একটি ‘পাগলিনী’, অপরটি একটি কপট সাধু চরিত্র ‘সাধক’। দ্বিতীয় চরিত্রটি সম্পূর্ণভাবে রামকৃষ্ণ নির্দেশিত। সাক্ষ্য প্রমাণ যাচাই করলে এর সত্যতা নির্ধারিত হবে।

২

‘বিল্বমঙ্গল’ নাটক রচনার পটভূমিকা বর্ণনা করেছেন মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর ‘গিরিশচন্দ্র—মন ও শিল্প’ বক্তৃতাবলীতে। একদিন গিরিশচন্দ্র গেছেন রামকৃষ্ণ-সকাশে—সেদিন নানাকারণে তাঁর মন ভারাক্রান্ত। গিরিশের মানসিক অবসাদ দূর করার জন্যে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমাল থেকে বিল্বমঙ্গল কাহিনীটি নাটকীয়-ভঙ্গিতে গল্প করে শোনালেন। কাহিনীর নাটকীয়তা, শ্রীরামকৃষ্ণের বিচিত্র বর্ণনাভঙ্গি—সব কিছু মিলে গল্পটি গিরিশের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠল। শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে গিরিশ স্থির করলেন, এ কাহিনী নাট্যরূপায়িত করবেন।

গিরিশ-জীবনী-রচয়িতা অবিনাশ গঙ্গো-পাধ্যায়ও লিখেছেন, ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণের পর পরমহংসদেবের শ্রীমুখে বিল্বমঙ্গলের উপাখ্যান শুনিয়া গিরিশচন্দ্র এই নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হন।’ (‘গিরিশচন্দ্র’—দে’জ সংস্করণ, ১৯৭৭, পৃঃ ২১৫)

অপরেশ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, ‘শুনিতে পাই, ভগবান রামকৃষ্ণদেবের আদেশেই গিরিশচন্দ্র “বিল্বমঙ্গল” লিখিয়াছিলেন।’ (রূপ ও রঙ্গ, ১৮ মার্চ ১৩৩১)

বিল্বমঙ্গলের মূল কাহিনী হল :

দক্ষিণদেশে মধুবেণা নদীর তীরে লম্পট-স্বভাব বিপ্র ‘বিল্বমঙ্গল’ বাস করত। নদীপারে ছিল বারবণিতা চিন্তামণির আবাস।

* কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান

গৃহে উপস্থিত হল। দ্বার রুদ্ধ—পিচ্ছিল উচ্চ-প্রাচীর। সে বাধাও সে অতিক্রম করল প্রাচীরগাত্র-সংলগ্ন একটি রজ্জু পেয়ে। অবশেষে চিন্তামণির কাছে যখন সে পৌঁছেছে তখন বিস্মিত চিন্তামণি জানতে চাইল, এই দারুণ দুর্যোগে সে কেমন করে নৌকাবিহীন তরঙ্গ-সঙ্কুল নদী অতিক্রম করেছে—কেমন করেই বা উচ্চপ্রাচীর লঙ্ঘন করেছে। বিল্বমঙ্গলের বর্ণনায় কৌতূহলী চিন্তামণি রজ্জুদর্শনের অভি-প্রায়ে প্রাচীরের কাছে এসে দেখেছে একটি প্রকাণ্ড বিষধর স প—বিল্বমঙ্গল তাকেই রজ্জু মনে করে, তাকেই অবলম্বন করে অতিক্রম করেছে উচ্চপ্রাচীর। বিল্বমঙ্গলের গায়ে তীব্র দুর্গন্ধের কারণ অনুসন্ধান করতে নদীতীরে গিয়ে দেখতে পেয়েছে—একটি গলিত মৃতদেহ —যাকে অবলম্বন করে বিল্বমঙ্গল নদী পার হয়ে এসেছে। চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলকে ধিক্কার দিয়ে বলেছে :

এ হেন অকার্য কর্মে হেন অনুরাগ।
ইহার যে শতাংশের অংশ একভাগ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণে যদি হইত তোমার।
তবে কি না হইত চতুর্বর্গ সেবাসার॥

চিন্তামণির ভৎর্সনাবাক্যে বিল্বমঙ্গলের জীবনে এসেছে পরিবর্তন। সে কৃষ্ণপ্রেমের সন্ধানে গৃহত্যাগ করে সোমগিরির কাছে গিয়ে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেছে। কিছু কাল পরে পরিব্রাজক বিল্বমঙ্গল একগ্রামের বৃক্ষতলে অবস্থানকালে, স্নানরতা এক বণিক-পত্নীকে দেখে বিভ্রান্ত হয়েছে—তার চিত্ত-বিকার উপস্থিত হয়েছে। স্নানশেষে রমণী নিজগৃহে ফেরার পথে বিল্বমঙ্গল তাকে অনুসরণ করে বণিকগৃহে উপস্থিত হয়ে বণিকের কাছে তার স্ত্রীকে দর্শনের প্রার্থনা জানিয়েছে। অতিথির সম্মানরক্ষার জন্য বণিক আপন স্ত্রীকে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করে বিল্বমঙ্গলের সামনে উপস্থিত করলে সে তাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে আপন মনে নিজের চক্ষুকে ধিক্কার দিয়ে বলেছে :

আরে মূঢ় চক্ষু কি দেখিয়ে ভুলিয়াছ।
অগ্রাহ্য অবিদ্যাপথে কি ধন পাইয়াছ॥
রক্তমাংস ক্লেদবিষ্ঠা মূত্রময় দেহ।
ত্বক আচ্ছাদন মাত্র দরশ সুবহ॥

যে ইন্দ্রিয় এই বহিরঙ্গরূপের প্রতি আকৃষ্ট করে তাকে পথভ্রষ্ট করেছে, সে বিল্বমঙ্গলের সাধনপথের শত্রু। তাই বণিকপত্নীর কাছে বিল্বমঙ্গের অনুরোধ, 'তীক্ষ্ণ দুটি সূচ আনি শীঘ্র দেহ মোরে।' সেই সূচ-দুটি তার দুই-চোখে বিদ্ধ করে দেবার জন্যে বার বার অনুরোধ করায় অবশেষে বণিকপত্নী তার অনুরোধ রক্ষা করেছে। এবার নির্বিঘ্ন সাধনা। সেই সাধনার শেষে বিল্বমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শন ও পুনরায় দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে। এদিকে বিল্বমঙ্গলের গৃহত্যাগের পর চিন্তামণির মধ্যেও জেগেছে অনুশোচনা। সমস্ত ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করে সে বৃন্দাবনে মিলিত হয়েছে বিল্বমঙ্গলের সঙ্গে। সাধনার মধ্যে দিয়ে সে-ও পেয়েছে কৃষ্ণকৃপা।

এই কাহিনীর নাট্যরূপায়ণে গিরিশচন্দ্র

নতুন যে দুটি চরিত্র যোগ করেছেন, তার জন্য তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছেই ঋণী—একথা আগেই বলেছি। এ কালের নাট্যসমালোচক এই চরিত্র দুটির উপযোগিতা সম্পর্কে বলেছেন, 'বিল্বমঙ্গল ভক্তিসাধক চরিত্র হইলেও তাঁহার মানসিক ভাবাবেগের দ্বান্দ্বিক বিকাশ দেখান হইয়াছে, তাহার ফলে এই ভক্তিতত্ত্বমূলক নাটকের মধ্যে নাটকীয় রসের অভাব ঘটে নাই। বস্তুত নাটকটির মধ্যে একদিকে অধ্যাত্মরাজ্যের আকুতি, অন্যদিকে বাস্তব সমাজের আলেখ্য। বেশ্যাসক্ত ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণমুগ্ধ বেশ্যা, শ্মশানচারিণী পাগলিনী, ভিক্ষুক চোর, কপট সাধু প্রভৃতি চরিত্র নাটকের মধ্যে যথেষ্ট বিচিত্র রস আনিয়াছে সন্দেহ নাই।' [বাংলা নাটকের ইতিহাস—ডঃ অজিতকুমার ঘোষ (১৯৭০), পৃঃ ২০৩]

এই বিচিত্র রসসৃষ্টিতে প্রথম দুটি চরিত্র ভক্তমাল গ্রন্থ থেকেই প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় গৃহীত, ভিক্ষুক-চোর চরিত্রটিও ভক্তমালে লভ্য, বাকী দুটি চরিত্র গিরিশচন্দ্র-সংযোজিত। এই সংযোজিত চরিত্রদুটিই যে নাটকটিকে বহুলপরিমাণে শক্তিশালী করে তুলেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পাগলিনী চরিত্রটির কাঠামো শ্রীরামকৃষ্ণ-বর্ণিত একটি সত্যঘটনার ভিত্তিতে। একদিন কাশীপুর উদ্যানবাটীতে গিরিশপ্রমুখ ভক্তদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ কৃষ্ণাবতারের বিভিন্ন ভাব ব্যাখ্যা করছিলেন। প্রসঙ্গত এসেছে মধুর-ভাবের কথা এবং সেইসঙ্গে পাগলিনীর কাহিনী। শ্রী-ম লিখেছেন :

'বিজয়ের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে একটি পাগলের মত স্ত্রীলোক ঠাকুরকে গান শুনাইতে যাইত। শ্যামাবিষয়ক গান ও ব্রহ্ম-সঙ্গীত। সকলে পাগলী বলে। সে কাশী-পুরের বাগানেও সর্বদা আসে ও ঠাকুরের কাছে যাবার জন্য বড় উপদ্রব করে। ভক্তদের সেইজন্য বড় ব্যস্ত থাকতে হয়।

'শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশাদি ভক্তের প্রতি)—পাগলিনীর মধুর ভাব। দক্ষিণেশ্বরে একদিন গিছলো। হঠাৎ কান্না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন কাঁদছিস? তা বলে, মাথা ব্যথা করছে (সকলের হাস্য)।

'আর একদিন গিছলো। আমি খেতে বসেছি। হঠাৎ বলছে "দয়া করলেন না?" আমি উদার বুদ্ধিতে খাচ্চি। তারপর বলছে, "মনে ঠেললেন কেন?" জিজ্ঞাসা করলুম, "তোর কি ভাব?" তা বললে, "মধুর ভাব"! আমি বললাম, "আরে আমার যে মাতৃযোনি! আমার যে সব মেয়ে মা হয়।" তখন বলে, "তা আমি জানি না।" তখন রামলালকে ডাকলাম। বললাম, "ওরে রামলাল, কি মনে ঠ্যালাঠ্যালি বলছে শোন দেখি।" ওর এখনও সেই ভাব আছে।

'গিরিশ—সে পাগলী ধন্য! পাগল হোক আর ভক্তদের কাছে মারই খাক, আপনাকে তো অষ্টপ্রহর চিন্তা করছে। সে যে ভাবেই করুক, তার কখনও মন্দ হবে না।' (কথামৃত, ২।২৬।৩)

অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় 'গিরিশচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছেন, 'দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকট বহুপূর্বে এক ব্রাহ্মণী ভৈরবী আসিয়াছিলেন। তাহার অনেক পরে এক পাগলী যাতায়াত করিত। শুনিয়াছি, ইঁহাদের অদ্ভুত চরিত্র সম্বন্ধে নানারূপ গল্প শুনিয়া গিরিশচন্দ্র এই পাগলিনী চরিত্র পরিকল্পনা করিয়াছিলেন।' (গিরিশচন্দ্র, পৃঃ ২১৫ পাঃ টীঃ)

গিরিশচন্দ্র যে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখেই গল্পগুলি শুনেছিলেন এবং এই গল্পশোনা তাঁর পাগলিনী

চরিত্র সৃষ্টির প্রত্যক্ষ ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে তা স্পষ্টই বোঝা যায়।—তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে পাগলিনীর গল্প শুনছেন ১৬ এপ্রিল, ১৮৮৬—নাটক মঞ্চস্থ হবার আড়াই মাস পূর্বে। প্রসঙ্গত স্বামী অভেদানন্দের সাক্ষ্যও উল্লেখ করতে পারি :

'গিরিশবাবু কিন্তু পাগলিনীকে ভুলতে পারেন নি। তিনি পাগলিনীর মধুর চরিত্র তাঁর 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে অপরূপভাবে ফুটিয়েছেন; তাঁর অমর লেখনী দিয়ে পাগলিনীকে চিরস্মরণীয় করে গেছেন।' (মন ও মানুষ : স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, পৃঃ ১৬৫)

পাগলিনী চরিত্রের অবয়ব সেই উন্মাদিনীকে অবলম্বন করে গড়ে তুললেও বিল্বমঙ্গলে এই চরিত্র শুধু মধুরভাবের নিদর্শনরূপে উপস্থিত করে গিরিশচন্দ্র ক্ষান্ত হন নি। তিনি সেই সঙ্গে সাধনা ও সর্বধর্মসমন্বয়ের দ্যোতকরূপে চরিত্রটি পরিকল্পনা করেছেন এবং এই পরিকল্পনার উপাদানও সংগ্রহ করেছেন কালীবাড়ীর অঙ্গন থেকেই। শ্রীরামকৃষ্ণ সব ধর্মসাধনাকে ঈশ্বরলাভের পথরূপে নির্দেশ করেছেন, নিজেও সকল পদ্ধতিতে সাধনা করেছেন কিন্তু সব পথের শেষে সেই এককেই দেখেছেন। পাগলিনীর অমার্জিত সংলাপে সেই চিন্তারই প্রতিধ্বনি :

আমি মা পাঁচভাতারী;—এই দুর্গা, কালী, শিব, কৃষ্ণ— না মা আমি একভাতারী এয়ো

আমার ভাতার সেই, মা, সেই
সে বিনা আর নেই, মা, নেই॥

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথমজীবনের অন্বেষণের আর্তি পাগলিনীর সংলাপে মূর্ত :

হৃদয়ের মণিহারা আমি পাগলিনী।
দেখ দেখ এসেছি শ্মশানে—
সে ত নাই লো এখানে,
পর্বতগুহায় নিবিড় কাননে
তারই অন্বেষণে কেটে গেছে কতদিন।
কভু ভস্ম মাখি গায়
এ প্রাণের জ্বালা না জুড়ায়
শূন্যে শূন্যে ফিরি
বুকে বজ্র ধরি
সে কোথায় দেখা ত হল না।

এই পাগলিনীই বিল্বমঙ্গলের কাছে চিন্তামণির স্বরূপ ব্যাখ্যা করে তাকে 'প্রকৃত চিন্তামণি'র সন্ধান দিয়েছে :

চিন্তামণি—কভু এলোকেশী
উলঙ্গিনী ধনী
বরাভয়করা ভক্তমনোহরা
শবোপরে নাচে বামা।
কভু ধরে বাঁশী…
কভু রজতভূধর…
কভু রাসরসময়ী প্রেমের প্রতিমা…
একা সাজে পুরুষপ্রকৃতি; …
কভু একাকার
নাহি আর কালের গমন;
নাহি হিল্লোল কল্লোল,
স্থির—স্থির সমুদয়;
নাহি নাহি ফুরাইল বাক;—

পাগলিনীর গানগুলি 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের প্রধান আকর্ষণ। এই গানগুলির মধ্যে অন্ততপক্ষে একটি, নাটকের জন্য লেখা নয়—নাটক রচনার পূর্বেই রচিত হয়েছিল। ১৭ এপ্রিল ১৮৮৬ কথামৃতের দিনপঞ্জীতে দেখা যায়—কাশীপুরে রোগশয্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ শায়িত। তিনি দোতলায় নিজের ঘরে শুয়ে আগ্রহের সঙ্গে ভক্তদের কীর্তন শুনছেন।—কীর্তন শেষ হল। সুরেন্দ্র ভাবাবিষ্ট হয়ে গান ধরলেন :

আমার পাগল বাবা পাগলী আমার মা
আমি তাদের পাগল ছেলে মায়ের
নাম শ্যামা

ঠিক কবে, কিভাবে গিরিশ গানটি রচনা করেছিলেন সে সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য আমাদের হাতে নেই। অনুমান করতে পারি, সুরেন্দ্রের অনুরোধে অথবা ভাবতন্ময় শ্রীরামকৃষ্ণের রূপদর্শনে গিরিশ কোনো সময় গানটি রচনা করেন এবং স্বয়ং গিরিশচন্দ্র অথবা অন্য কেউ তাতে সুরারোপ করেছিলেন। সেই গানটি ভক্তরা (অন্তত পক্ষে সুরেন্দ্র) শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত বলেই আয়ত্ত করেছিলেন এবং গাইতেন। তারপর যখন 'বিল্বমঙ্গল' রচিত হয়ে মঞ্চস্থ হল (৩.৭.৮৬), তখন শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবকল্পনা-উদ্বুদ্ধ পাগলিনীর কণ্ঠে সেইটি আরোপ করলেন গিরিশচন্দ্র সামান্য পরিবর্তনের পর :

আমার পাগল বাবা পাগলী আমার মা
আমি তাদের পাগল মেয়ে মায়ের নাম শ্যামা।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিল্বমঙ্গল দেখতে পান নি কিন্তু সেই নাটকের অন্তত একটি গান শুনেছিলেন।

দ্বিতীয় কাল্পনিক চরিত্র সাধকের। নাটকের পক্ষে এই সাধক চরিত্রের উপযোগিতা সম্পর্কে আগেই বলেছি। কিন্তু এর উপযোগিতা এবং নাটকে এই চরিত্র সংযোজনার পরিকল্পনা স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের। গিরিশের জীবনী-লেখক ও আজীবন সঙ্গী অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন :

'ভক্ত চরিত্রের সহিত ভণ্ড চরিত্রের অঙ্কনে তিনি [শ্রীরামকৃষ্ণ] ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। সাধক চরিত্রের ইহাই মূল।'

বৈপরীত্য-সৃষ্টির জন্য এই চরিত্রটির পরিকল্পনায় শ্রীরামকৃষ্ণের সূক্ষ্ম নাট্যবোধের পরিচয় পাই। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এর পর আছে অভিনয়-নির্দেশনা ও রূপসজ্জা। সেই অভিনয় ও রূপসজ্জা সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশকাহিনী স্বয়ং গিরিশচন্দ্রই বিবৃত করেছেন বিবেকানন্দ-অনুজ মহেন্দ্রনাথের কাছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন গিরিশকে বলেছিলেন 'এ সব লোকের চিহ্ন কি জান? লম্বা জামা পরে, জামার আস্তিনটা কনুই পর্যন্ত থাকে। গলায় বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা—সেগুলি আবার সোনার বা রুপার তারে গাঁথা। মাঝে মাঝে একটি প্রবাল বা অন্য দামী জিনিষ দেয়। কথায় বার্তায় তারা সবজান্তা আর এইরূপ করিয়া তারা হাত নাড়ে।' হস্তসঞ্চালনের পদ্ধতিটিও দেখিয়ে দিয়েছিলেন : 'ডানহাতের তর্জনী কিছু উঁচু করিয়া এবং অবশিষ্ট তিনটি আঙ্গুল নীচু করিয়া হাতের পাতাটা দুলাইয়া সাধক' চরিত্রের পুরো নির্দেশনাই দিয়েছিলেন। 'গলা কি করিয়া সঞ্চালন করিতে হয়, কণ্ঠস্বর কিরূপে পরিবর্তন করিতে হয়, চক্ষু ও মুখভঙ্গী কিরূপে নানাপ্রকার করিতে হয় তাহাই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সেইদিন হুবহু দেখাইতে লাগিলেন। গিরিশবাবু বলিলেন, তিনি নিজে অভিনেতা, অভিনয় করাই তাঁহার ব্যবসা কিন্তু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অব্যবসায়ী অভিনয় করা এত সুন্দর ও উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে তিনি হুবহু সেইটা লিখিয়া লইলেন এবং অভিনয়কালে ঠিক তদ্রূপই দেখাইতেন।'

মহেন্দ্রনাথ সব শেষে মন্তব্য করেছেন :

'বিল্বমঙ্গলে সাধকের পালা যে এত উত্তম হইয়াছিল, কারণ তাহাতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রদর্শিত পথ ছিল, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।' (শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪২-৪৩)

নাটকটির অভিনয়কালেও আর একটি

ঘটনা ঘটল যার তাৎপর্য কিছু কম নয়। বিল্বমঙ্গল চরিত্রে নিজের প্রতিচ্ছায়া থাকা সত্ত্বেও গিরিশচন্দ্র গ্রহণ করলেন সাধকের ভূমিকা। যে অভিনয়-নির্দেশনা তিনি লাভ করেছিলেন এবং তিনি হুবহু লিখে নিয়েছিলেন, মঞ্চে তাকে উপস্থিত করা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। তাই বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্য-নির্দেশক মাত্র একজনের নির্দেশনায় মাত্র একটি নাটকে অভিনয় করলেন—গিরিশচন্দ্র আর কখনো অন্য কোন নাট্য-নির্দেশকের পরিচালনায় অভিনয় করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। গিরিশচন্দ্র মনে করতেন শ্রীরামকৃষ্ণের 'সর্ব বিষয়ে উৎকর্ষ ছিল।' নট-নাট্যকার-পরিচালকের কাছে সর্ববিষয়ের মধ্যে যে নাট্যবিষয়টাই বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত, একথা বলাই বাহুল্য।

গিরিশচন্দ্রের পরে যাঁরা বিল্বমঙ্গলে সাধকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তাঁরাও গিরিশকে অনুসরণ করে রূপসজ্জা ও অভিনয় করে আসছেন কিন্তু এই ধারাটি যে শ্রীরামকৃষ্ণ-নির্দিষ্ট এ কথা হয়ত তাঁদের জানা নেই।

৩

'বিল্বমঙ্গল' নাটক রচিত হল—অভিনয়ও হল কিন্তু সে নাটক বিচার করবে কে? প্রকৃত বিচারকর্তা যিনি, তাঁর পক্ষে আর নাটক দেখা সম্ভব নয়—নাটক পড়াও নয়, কারণ তাঁর অসুস্থতা তখন চরম পর্যায়ে। ভক্তেরা গভীর আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন। গিরিশ এ নাটক বিচার করবার ভার দিলেন নরেন্দ্রনাথের উপর। বিল্বমঙ্গল একখানি সাধারণ ধর্মীয় নাটক মাত্র নয়—সাধারণ দর্শকের মনোরঞ্জন করার জন্যেই পেশাদার নাট্যকারের মত গিরিশ এ নাটক লেখেন নি—তাই তার বিচারও সাধারণ পাঠক-দর্শকের পক্ষে সম্ভব নয়—এ কথা তিনি জানতেন বলেই নরেন্দ্রনাথকে আহ্বান করলেন বইটি পড়বার জন্যে—তাঁর অভিমত জানাবার জন্যে। বই পড়ে নরেন্দ্রনাথ বললেন:

'ছাখ, আমি সংস্কৃত ও ইংরাজীতে বহু কাব্য পড়িয়াছি, মিল্টন, সেক্সপীয়র, কালিদাস আমার কণ্ঠস্থ রয়েছে কিন্তু বিল্বমঙ্গলখানা কেমন আমার সবচেয়ে ভাল লাগছে, অন্য বইগুলি তত ভাল লাগছে না।' (শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী: মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৪)

আর নাটক যেদিন স্বামীজী দেখতে গিয়েছিলেন সেদিন অভিনয়ের পর মঞ্চে বসে গান গাইতে গাইতে প্রায় সমাধিস্থ হয়েছিলেন—শেষ পর্যন্ত গিরিশ এসে হাত থেকে তানপুরা কেড়ে নেন। (ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৯)

বিল্বমঙ্গল যে নরেন্দ্রনাথের কতখানি ভাল লেগেছিল তা বোঝা যায়, যখন দেখি তিনি নিবেদিতা প্রমুখ শিষ্যাদের বিল্বমঙ্গলের কাহিনী শোনাচ্ছেন। সে কাহিনী ভক্তমালের নয়—গিরিশচন্দ্রের নাটকের, কারণ এই গল্প বলার ঘটনাটির বর্ণনা প্রসঙ্গে নিবেদিতা লিখেছেন, বিল্বমঙ্গল বণিকপত্নীর কাছে 'begged for two hairpins from her hair.' 'ভক্তমালে' বিল্বমঙ্গল চেয়েছিলেন দুটি সূচ—গিরিশচন্দ্র নাটকে 'অলঙ্কার হ'তে দুটি কাঁটা'-য় পরিবর্তিত করেছেন।

মাত্র কয়েক মাস পরেই দেখি নিবেদিতা বিল্বমঙ্গল অনুবাদে হাত দিয়েছেন। ৪ জানুআরি ১৮৯৯ তিনি শ্রীমতী এরিক হ্যামণ্ডকে একটি পত্রে লিখেছেন:

I am finding great riches in Bengali.

If Mr. Hammond would learn it he would make his fortune by translations. I have undertaken a play. I cannot understand why we have never heard of these things. From all accounts this play would stand comparison with Ibsen's 'Brand.'

নাটকটি যে বিল্বমঙ্গল সেটা বোঝা যায় পাঁচদিন পরে (৯।১।৯৯) শ্রীমতী ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠি থেকে :

I have begun to translate Mr. Ghose's 'Mad Woman' [পাগলিনী]. Here is a little poem. I wish Swami were here to translate it.

Rising and sinking on the great billows
Life is carried on in the current of love
Where it is drifted to who can tell
Here it is sucked into a roaring whirlpool.

চিনতে অসুবিধা হয় না গানটি :

ওঠা নামা প্রেমের তুফানে
টানে প্রাণ যায় রে ভেসে
কোথায় নে যায় কে জানে ?
(১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক)

কিন্তু নিবেদিতা সম্ভবত পুরো নাটকটি অনুবাদ করেন নি। তবে ইংরেজিতে অনুবাদের পর তিনিই বিল্বমঙ্গল নাটকটি সংশোধন করে দিয়েছিলেন। 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ মুদ্রণে ইচ্ছুক ভারতীয় বা বিদেশী প্রকাশক আহ্বান করে 'Lucifer' পত্রিকার সম্পাদিকার [শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত] কাছে একটি পত্র প্রেরিত হয়েছিল। সেই পত্রটি উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ৯ ডিসেম্বর ১৯১৮। অনুবাদটি সম্পর্কে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে 'an able rendering into English by a veteran educationist with a kind revision by late Sister Nivedita.'

এই পত্রটিতে প্রদত্ত 'বিল্বমঙ্গলে'র পরিচয়ের মধ্যে কয়েকটি অত্যন্ত মূল্যবান কথা বলা হয়েছে, যা নাটকটির অভিনবত্ব প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য :

It is the first drama—a drama with a mission and the mission is the one with which Ramkrishna Mission, established long after its composition, is associated—he [Girish Chandra] wrote after having come in contact with the master-spirit of the age—the late Paramahansa Ramkrishna whose pithy and homely utterances have been seized upon and worked up with a skill that is entirely the author's own. In certain respects the piece might be called an illustrated edition of Gita.

[এই প্রথম নাটক—যার মধ্যে একটা মহৎ আদর্শ আছে। সেই মহৎ আদর্শের সঙ্গে, নাটক রচনার অনেক পরে প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন জড়িত। গিরিশচন্দ্র এ যুগের মহত্তম আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের সান্নিধ্যে এসে তাঁর সারগর্ভ ও সুন্দর ঘরোয়া কথাগুলি গ্রহণ করে নিজস্ব নৈপুণ্যে এই নাটকের অঙ্গীভূত করেছেন। কোন কোন দিক থেকে এটিকে 'গীতা'র নাট্য-আলেখ্য বলা যায়।]

'বিল্বমঙ্গলে'র আরও একটি বিশেষত্ব আছে যার সঙ্গে গিরিশের ব্যক্তিজীবনের দিকটি

সমগ্র গিরিশ নাট্যসাহিত্যে মাত্র দুবার কোন চরিত্রের নামকরণে 'চিন্তামণি' নামটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'বিল্বমঙ্গলে' চিন্তামণি নারী—বারবণিতা। পাগলিনীই বিল্বমঙ্গলকে আর এক চিন্তামণির সন্ধান দিয়েছে—প্রকৃত সেই চিন্তামণির স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছে। 'কালাপাহাড়ে' পৌঁছে আমরা সেই দ্বিতীয় চিন্তামণিকে পেলাম—সে চিন্তামণি পুরুষোত্তম—সে চিন্তামণি শ্রীরামকৃষ্ণেরই রূপক।

'বিল্বমঙ্গল' থেকে 'কালাপাহাড়'—গিরিশের জীবনে এক 'চিন্তামণি' থেকে অন্য 'চিন্তামণি'তে উত্তরণ। সে জীবন-নাট্যের নির্দেশনাও শ্রীরামকৃষ্ণের।*

[প্রবন্ধে ব্যবহৃত নিবেদিতার পত্রগুলি ও Lucifer পত্রিকায় প্রকাশিত পত্রটি অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর সৌজন্যে তাঁর সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত।]

* লেখকের 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চ' শীর্ষক গবেষণা-গ্রন্থের অংশবিশেষ। গ্রন্থটি আগামী মাসে (অক্টোবর ১৯৭৮) প্রকাশিত হইবে।—সঃ

রবীন্দ্রসাধনায় আত্মবাণীর অগ্রণী ভূমিকা

ডক্টর অনিলেন্দু চক্রবর্তী*

এক

রবীন্দ্রনাথের সমুচ্চ ব্যক্তিত্ব ও বহুমুখী জীবনসাধনা বুঝবার পক্ষে সবচেয়ে বড় এক সুবিধা হল তাঁর জীবনায়নে বাণীর ভূমিকাই অগ্রগণ্য। তাঁর সমগ্র জীবনের ভাব ও অনুভব, বোধ ও অভিজ্ঞতা তিনি নিজেই বহুরূপ বাণীমূর্তিতে প্রকাশ করেছেন। সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সর্বক্ষেত্রেই এই বাণীরূপ তাঁর জীবনের ও কর্মক্ষেত্রের অগ্রপথিক। কেবল তাই নয়, এটাই তাঁর জীবনের ও কর্মক্ষেত্রের রূপরূপান্তরেরও প্রেরণা, এমনকি নিয়ন্ত্রক ও পথনির্দেশক।

দুই

অব্যাহত বাণীরচনায় কোনো ভাবের বোধন ও পূর্ণপ্রতিষ্ঠাই রবীন্দ্রনাথকে অব্যবহিতরূপেই কর্মজীবনে তথা কর্মকাণ্ডে ব্রতী রাখে। জীবন ও বাণীর নিগূঢ় সম্পর্কের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের নিজেরই ভাষায় যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা অনুধাবন করাটা ঔৎসুক্যজনক :

(১) '...অনেকদিন থেকে জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে ভাষার দ্বারা চিহ্নিত করে এসে জগতের অন্তর্জগৎ, জীবনের অন্তর্জীবন, স্নেহপ্রীতির দিব্যত্ব আমাদের কাছে আজ আকার ধারণ করে উঠছে—নিজের কথা আমার নিজেকে সহায়তা করছে—অন্যের কথা থেকে আমি এ জিনিষ পেতুম না।''

(২) '...বরাবর আমি দেখে আসছি আমি কেবল কথা কয়ে কয়ে নিজেকে শিক্ষা দিয়েছি। নিজের ভিতরে কোনো ভাল জিনিষ ভাব আকারে বা সঙ্কল্প আকারে দেখা দেবামাত্র সেটাকে প্রকাশ করেই আমি

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিটি কলেজ, কলিকাতা। সাহিত্যগবেষক ও গ্রন্থকার।

নিজের কাছে পরিস্ফুট করে তুলতে পারি—সেটা আমার ভাষায় ব্যক্ত হতে হতেই উত্তরোত্তর জীবনের সামগ্রী হয়ে উঠতে থাকে। এই বিশেষভাবে আমার স্বভাব।'[২]

(৩) '...উচ্চারিত বাণী ক্রমশ আমার উপরে জয়লাভ করতে থাকে।...জীবনের ক্ষেত্রে কোনো জিনিষের প্রকাশের পূর্বে বাণীর ক্ষেত্রে যে তার অভ্যুদয় হয়েছে তার কারণ আমার কাব্যের প্রকাশ আমার জীবনের অঙ্গ।'[৩]

(৪) '...আমার এই জীবনের প্রক্রিয়া এমন নিগূঢ় যে অনেক সময় এ আমার অগোচরে হয়ে থাকে।'[৪]

—এই বিশিষ্ট আত্মবাণীর বৈশিষ্ট্যগুলি এইভাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে :

(ক) রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবন-গহনে কোনো 'ভাব' বা 'সঙ্কল্প' উপস্থিত হওয়ামাত্রই তা সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণ স্বরূপে উদ্ভাসিত হবার জন্য বাণীবাহনে অগ্রসর হয়, এবং ক্রমশ প্রকাশ পেতে থাকে ভাবের ঘরে রূপসিদ্ধি। জীবনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ কর্মলোকে স্বপ্রকাশের পূর্বেই ভাবের ক্ষেত্রে তথা বাণীলোকে যে তার অভ্যুদয় ঘটে, এতে রবীন্দ্র-স্বভাবই প্রকাশিত।

(খ) রবীন্দ্রনাথের উচ্চারিত বাণী ক্রমশ তাঁর উপরে জয়লাভ করতে থাকে। ভাষায় ব্যক্ত হতে হতেই তা উত্তরোত্তর জীবনের প্রধান অঙ্গ হয়ে উঠতে থাকে, এবং এই ভাবই তাঁর স্ব-ভাব এবং তাঁর জীবনের এই প্রক্রিয়া এমন নিগূঢ় যে, অনেক সময়েই এটা তাঁর অগোচরেই হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের অগোচর অন্তর্জীবনের উন্মুখ দাবিটাই তাঁর সচেতন জীবন-ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করে থাকে, এবং এটাই রবীন্দ্র-স্বভাবে স্বাভাবিক।

(গ) অন্তর্জগৎ ও অন্তর্জীবন একমাত্র নিজের ভাষায়-অর্থাৎ রবীন্দ্র-বাণীরূপে প্রকাশিত হয়েই রবীন্দ্রসত্তার কাছে তা অনুকূল শক্তির স্বরূপ গ্রহণ করে,—এই আত্মপ্রকাশক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের আত্মবাণীই অগ্রগণ্য এবং একমাত্র আশ্রয়।

তিন

নবনব সম্ভাবনার উদয়-দিগন্তে পৌঁছানোর অর্থাৎ অগ্রণী ভাবসত্তার অনুরাগী হবার প্রেরণা ও শক্তিই হল কথার পর কথার বলাকা-রচনা। বাণীদিশারী রবীন্দ্রনাথ এই-ভাবেই অলক্ষ্য আদর্শে পৌঁছে যান। তাই তিনি বলেন :

(১) '...আমি যে পথচলতি মানুষ—যখনি হঠাৎ বাঁক ফিরি তখন নতুন দিগন্তে নতুন দৃশ্য চোখে পড়ে, তখন সেটা আমার সঙ্গে সমস্ত চিত্তকে উদ্বোধিত করে তোলে—তখন সেই দৃশ্যে পৌঁছবার পূর্বেই আনন্দগান জুড়ে দেই। কেননা এই গানে পথ চলবার বল দেয়, ক্লান্তি দূর করে।'[৫]

(২) '...আমার অন্তরতর যে প্রকৃতি আমার চেয়ে এগিয়ে গিয়েছে তার বাক্‌রোধ করলে সেটা আমার পক্ষে ব্যাঘাতস্বরূপ হয়। তাকে কথা বলতে দিয়ে দিয়েই আমি শিখতে থাকি—'[৬]

(৩) '...প্রকাশের চেষ্টার মধ্যে যে বেগ আছে সেই বেগের দ্বারা যে আমাদের অনেক বাধা ক্ষয় হতে থাকে—আমাদের অন্তরতম জীবনের বাণীকে ব্যক্ত করার দ্বারা আমাদের বাইরের দিকের আবরণকে আমরা ক্রমে ক্রমে কাটিয়ে উঠতে থাকি।'[৭]

(৪) 'আমার চিত্তের স্বভাবই হচ্ছে নদীর মতো চলা, চলতে চলতে বলা—সে ধারা একটানা চলে না—নানা বাঁকে বাঁকে চলে। আমি জীবনের অভিজ্ঞতাকে বাণী জোগাব এ

ফরমাস নিয়ে এসেছি—কোথাও এসে শুদ্ধ হলেই আমার কাজ ফুরাবে।'[৮]

উদ্ধৃতিগুলি থেকে সুপরিস্ফুট রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর অপরিমিত অবিরাম বাণীরচনা কেবল ভাবের প্রকাশমাত্রই নয়, জীবনের বাধাকে ক্ষয় ও জয় করা—অন্তরতম জীবনকে বহিরাবরণ উন্মোচনে প্রকাশ করা, এবং অগ্রসর স্বরূপে তাকে দর্শন করা। অবিরাম বাণীপ্রবাহে মন্ত্র-মুখর আত্মপ্রকাশ কেবলমাত্র ভাব বা সঙ্কল্পকে সাকাররূপে দুকূলবন্ধনে দর্শন করবার জন্যেই নয়, তার চেয়েও বেশী দাবি সেখানে। সে দাবি সঙ্গম-মুখে আত্ম-মুক্তি সন্ধানের তথা অন্তর্জীবনের পরম অভিব্যক্তির। কেবল কবি-মানসের নয়, এই বাণীর বলাকা কবিজীবনের তথা সমগ্র রবীন্দ্রসত্তারই অগ্রণী অংশবিশেষ। এবং সদাচলমান রবীন্দ্র-মানসের বিশেষ দায় হল জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে আমরণ বাণী-রূপ দান করা। কেবল পথচলার শুরুতেই পথশেষে পৌছানোর আনন্দসঙ্গীত উচ্চারণ নয়, কেবল পূর্ণভাবের উদয়রাগেই আত্ম-প্রকাশ নয়, জীবনের পথে চলতে চলতে পথের ও মোড়ের অভিজ্ঞতাকেও বাণীরূপ দান করাটা সদাচলমান রবীন্দ্রনাথের স্বধর্ম।

চার

কোনো বিশেষ ভাবমণ্ডলের পূর্ণপ্রকাশ বাণীরূপে দেখা দেবার পরে রবীন্দ্রনাথের শিল্পী-জীবন-কবিজীবনেই এক অভিনব ও অ-সাধারণ ঘটনা ঘটে। মুক্তভাব অন্তর্জীবনের দাবিই এবারে তাঁর কর্মীসত্তাকে উদ্বোধিত করে—কবিশিল্পীই রূপকার কর্মী হতে চায়। নইলে তাঁর বাণী-সংরচিত ভাবজীবন-সাধনা কেবল অসম্পূর্ণ ই নয়, ব্যর্থ মনে হয়। বাণীব্রতীর পূর্ণ-উদয়ের পরে কর্মব্রতীর কঠিন মৃত্তিকা-যোগ প্রতিবিম্বিত কর্মরূপের মধ্যেই পূর্ণ-ভাবের পরিণাম দর্শনাকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রজীবন-সাধনার এক লক্ষণীয় বিশিষ্টতা। সহজ কথায় বললে, রবীন্দ্রসাধনার তাৎপর্য কেবল কথায় নয়, কাজে—কথা-মতো কাজে।

দেখবার বিষয়, ভাবের অভিব্যক্তি এখানে যুগ্মরূপী—সহোদর যমজ-সদৃশ, অগ্রজ বাণীরূপে ও কনিষ্ঠ কর্মরূপে। দুইয়ের মধ্যে অচ্ছেদ্য এক প্রাণবন্ধন—দেবতার আবাহন-বোধনের মন্ত্র উচ্চারণ ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার মতো। প্রাসঙ্গিক রবীন্দ্রবাণী :

'...আমি রূপকারের জাতি। আকার-হীন আইডিয়া আমার থেকে কেবল রূপের দাবী করে—যতক্ষণ সে দাবী ব্যর্থ হতে থাকে ততক্ষণ আমি নিরন্তর দুঃখ পাই। আমার জীবনের গাছে কাব্যের ফুল বা সাহিত্যের ফল বেশিক্ষণ জোর পায় না যদি কর্মের ক্ষেত্রে তার শিকড় পুরোপুরি ও গভীরভাবে আপন স্থান না পায়।'[৯]

—দ্রষ্টব্য, 'আকারহীন আইডিয়া' রূপলাভ না করার জন্য কেবল আর্তি জানায়। তার অর্থ বাণীরূপই সাকার-বাস্তব নয়, 'আকারহীন আইডিয়া' মাত্র। তাই কাব্য সাহিত্যের ঐ 'আকারহীন আইডিয়া' প্রত্যক্ষ সাকার-রূপে বাস্তবের কঠিন জমিতে অনুকূল শক্তি-সন্ধান দ্বারা কর্মে প্রতিষ্ঠা না পেলে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র ভাবলোক ও তার বাণীবিন্যাস অচিরেই ব্যর্থ মনে হয়; কারণ, কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা না পেলে ভাব বেশীদিন বাঁচতে পারে না। কেবল ভাবের তথা সাহিত্যের খেলায়ই রবীন্দ্রনাথ খুশি নন, কাজের বেলায় সেই ভাবকেই স্ব-রূপে সাকারে দেখা চাই, অন্যথা কেবল তাঁর সাহিত্যিক জীবনই নয়, সমস্ত জীবনই অর্থহীন মনে হয়। বস্তুত, যুগপৎ ভাবযোগী ও কর্ম-

যোগী হওয়াটাই রবীন্দ্র-জীবনাদর্শ। নন্দন-শিল্পী রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনায় এ এক স্বেচ্ছাকৃত দায়বিশেষ। এ দায় রবীন্দ্রজীবন-বিধাতার—এ দায় কবিকর্মী যমজসত্তার। এবং অচ্ছেদ্যবন্ধনে বাঁধা এই যুগ্মসত্তার ঐক্যরূপকে জানাই রবীন্দ্রনাথকে এবং তাঁর জীবন-সাধনাকে জানা। রবীন্দ্রসাধনা কেবলমাত্র সাহিত্যের ও শিল্পসাধনার ব্রতেই দায়বদ্ধ নয়, সাহিত্য-শিল্প ও কর্মকাণ্ড সেখানে সহযোগী ও সম্পূরক—দ্বৈতলীলায় দ্বন্দ্ববোধে ও দ্বন্দ্বোত্তরণে সমন্বয়ধর্মী। তাই 'আমার জীবনের গাছে··· আপন স্থান না পায়'—এই আত্মবাণীমূলক অংশটি রবীন্দ্রনাথের ভাব ও কর্মের যুক্ত সাধনা সম্পর্কে বিশেষ অর্থপূর্ণ ও তাঁর জীবনালোচনায় বিশেষ সহায়ক।

রবীন্দ্রনাথ যুক্ত-স্বভাবের চেয়েও মুক্ত-স্বভাবের বাণী-শিল্পী, সাযুজ্যের চেয়েও স্বাতন্ত্র্যের সাধক, প্রত্যক্ষের চেয়েও নবনব সম্ভাবনার বাণীদূত—স্বপ্নাদর্শের আহ্বায়ক। তাই নিয়মনিষ্ঠ কর্মের দায়বদ্ধতা ও অভ্যস্ততার সীমাবন্ধনটাও তাঁর আত্মাকে বা মুক্ত-মানসকে পীড়া দিতে থাকে। কারণ, ঐরূপ অব্যাহত কর্মে নবনব সম্ভাবনার রক্তিম প্রত্যাশা জাগরূক থাকে না। তাই নতুনের সম্ভাবনা-রুদ্ধ অভ্যস্ত কর্মের তুচ্ছতা-জনিত মর্মপীড়া, কর্ম-সহযোগী-দের কাছ থেকে প্রত্যাশার ব্যর্থতা এবং বহির্বিরোধের প্রত্যাঘাত-জনিত বেদনা রবীন্দ্র-বাণীলোকের মধ্যে কিছুকাল প্রকাশ পেতে থাকে, তারপর মুক্তির নবোদয়-দিগন্ত বা জীবনপথের কোনো নতুন বাঁক দেখা দিতেই উত্তরোত্তর আনন্দিত কথার অবারিত অজস্র প্রকাশে নতুন ভাবাধিকার ঘটে এবং কর্ম-লোকে চলতে থাকে নবরূপসাধন। এই ভাবেই চলে 'ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা'[১০]: ভাব থেকে ভাবান্তর, রূপ থেকে রূপান্তর—ভাবাশ্রয়ে বাণীরূপ, বাণীমূর্তি অনু-সারে কর্মরূপ।

পাঁচ

তবে, রবীন্দ্রসাধনায় আত্মবাণী-রচিত ভাব-রূপের পরম-সিদ্ধির স্তর নিশ্চয়ই ভব-এর অর্থাৎ কর্মরূপের মধ্যে প্রত্যাশা করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এ প্রসঙ্গে বলেছেন—'ভবের সাথে ভাবের মিলন হবে কবে ?'—সম্পূর্ণ মিলন কখনই হবে না। কারণ, ভবও যতটা ভাবের কাছে অগ্রসর হতে থাকবে, আবার ভাবও ততটা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে চলবে। ঠিক যেন ভাবটা ভবের বড়ো ভাই···'[১১]

রবীন্দ্রসাধনায় বাণীরূপবাহী ভাবসত্য ও কর্মরূপবাহী ভাবকর্ম তথা বাস্তব-সত্য কিভাবে সহোদর জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠের মতো অগ্রপশ্চাৎ হাতধরাধরি করে অগ্রসর হয় তা দেখাটা বেশ ঔৎসুক্যের বিষয়।

(ক) মানসী-সোনার তরী-চিত্রা-চৈতালি-কল্পনা থেকে নৈবেদ্য [১৮৮৮—১৯০০ খ্রী.] বাণীলোকের কেবল কাব্যরূপেই নয়, অব্যাহত প্রবন্ধ-গল্প-পত্রের ধারাবাহিকতায় লক্ষ্য করা যায় স্বদেশ-ভাবনা ও মানবপ্রীতি তথা মর্তপ্রীতির সঙ্গেই সৌন্দর্যবোধ ও অধ্যাত্মচেতনার সমন্বয়-সন্ধান ও নৈবেদ্য-এ তার ভাবপরিণাম তথা ভাবমুক্তি; আর তারই অনিবার্য কর্মপরিণাম হল শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' [দ্র. নৈবেদ্য-র রচনাকাল ১৯০০ খ্রী. ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা-কাল ১৯০১ খ্রী]।

(খ) চারবৎসরব্যাপী [১৯০১-১৯০৪ খ্রী.] ব্রহ্মচর্যাশ্রম-কেন্দ্রিক কর্মযোগের পরে খেয়া-শান্তিনিকেতন- গোরা- গীতাঞ্জলি- প্রায়শ্চিত্ত-শারদোৎসব-রাজা-অচলায়তন [১৯০৬-১৯১২ খ্রী.] কাব্য-নাটক-প্রবন্ধ-ভাষণে যে নবধর্মবোধ

।। অধ্যাত্মচেতনার সঙ্গে দেশাত্মবোধের মিলন-
।পনায় নবভাবমুক্তি—সেই বাণীরূপের
ানুষঙ্গেই নবকর্মরূপে দেখা দিয়েছে
হ্মচর্যাশ্রমে নববিন্যাস তথা মুক্তিপর্ব। এই
ক্তিপর্ব সাম্প্রদায়িকতা ও সংস্কারমুক্ত সর্বধর্মের
নুষ্ঠানের মানবিকতায় এবং নিয়ম-নিগড়ের
দলে স্বেচ্ছাব্রত সহৃদয়তায়—শিক্ষাক্ষেত্রেও
নিয়মনিষ্ঠ কড়া ব্যবস্থার বদলে প্রাণযোগমূলক
ত:স্ফূর্ত ব্যবস্থার অনুবর্তনে।

(গ) ডাকঘর-ফাল্গুনী-পথের সঞ্চয়-পরিচয়-
রবাইরে-বলাকা [১৯১২-১৯১৬ খ্রী.]
টিক-প্রবন্ধ-উপন্যাস-কাব্যে বৃহত্তর জগৎ ও
বনের সঙ্গে যে যোগাকাঙ্ক্ষা তারই পরিণাম
ল 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠা [১৯১৯ খ্রী.]।
খানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিদ্যা-
মবায় মাধ্যমেই যে ভারতবর্ষের ঐক্যরূপ
াগ্রত করা সম্ভব এই ভাবভাবনার সাহিত্য-
প 'বিদ্যাসমবায়' [১৯১৯ খ্রী.] এবং কর্মভাবনা
বশ্বভারতী-পূর্ব আয়োজন-পর্ব [১৯১৭-১৯১৮
খ্রী.]।

(ঘ) প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রিক-বাণিজ্যিক
বষম বিরোধ-সম্পর্কের মধ্যে সাংস্কৃতিক-
াত্মিক মিলন রক্ষাই যে আন্তর্জাতিক শান্তি
ও সাম্য রক্ষার নির্বিরোধ সৎপন্থা ও সর্বপ্রধান
আন্তর্জাতিক কর্তব্য, এবং এই ক্ষেত্রে
ারতেরই যে এক বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা তথা
থপ্রদর্শকের দায়-দায়িত্ব আছে—এই চিন্তা-
চেতনার বাণীরূপ হল 'যাত্রার পূর্বপত্র'
শিক্ষার মিলন' এবং বিশিষ্ট ইংরেজী ভাষণ-
গ্রন্থ Nationalism, Creative Unity; এবং
ই চিন্তাচেতনার ও দায়দায়িত্ববোধের
অনিবার্য ও অব্যবহিত কর্মরূপ হল বিশ্ব-
াগতিক বিশ্ববিদ্যালয় বা 'ইণ্টারন্যাশনাল
নিভার্সিটি'—বিশ্বভারতীকেই ঐ স্তরে উন্নয়ন
(১৯২১ খ্রী.)।

(ঙ) স্পষ্টতই ১৯০৪ থেকে জমিদারী জগতে বাসকালে রবীন্দ্রনাথের যে পল্লীকল্যাণ-ভাবনা প্রবন্ধে-পত্রে প্রকাশিত [দ্র. 'পল্লী প্রকৃতি' গ্রন্থ পরিশিষ্টসহ], তারই প্রথম কর্মরূপ জমিদারী জগতে 'পল্লী-স্বরাজ' তথা 'স্বদেশী সমাজ' প্রতিষ্ঠা [১৯০৮ খ্রী.], দ্বিতীয় কর্মরূপ সুরুলে 'পল্লী-উদ্যোগ' [১৯১৭ খ্রী.], এবং পরিণত কর্মরূপ 'শ্রীনিকেতন' [১৯২২ খ্রী.]। এবং এইখানেই রবীন্দ্রনাথের কথাশ্রয়ী ভাব ও কর্মাশ্রয়ী ভবের শেষ-সমন্বয় সন্ধান।

ছয়

এবারে সামগ্রিকভাবে বুঝলে দেখা যায়:

(১) রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনায় ভাবরূপ-বাণীরূপ ও তার কর্মরূপ অচ্ছেদ্য ও অলঙ্ঘ্য বন্ধনে বাঁধা। কোনো ভাব তাঁর নিজের ভাষায় উত্তরোত্তর ব্যক্ত হতে হতেই পূর্ণতা পেয়ে তাঁর জীবনের সম্পদ ও শক্তি হয়ে উঠতে থাকে—অর্থাৎ ক্রমগঠিত বাণীই সমগ্র রবীন্দ্রসত্তায় পরিপূর্ণ আকারে নিয়ন্ত্রণী আধিপত্য ও সৃজনশীল প্রভাব-প্রেরণা বিস্তার করে।

(২) সদাচলমান রবীন্দ্রজীবনের সহযাত্রী হল বিচিত্র পথবাহী বাণীস্রোত; এভাবে আত্মপ্রকাশ রবীন্দ্রনাথেরই স্বভাব তথা জীবন-ধর্ম—আত্মজীবনের বিচিত্র মোড়গুলির অভিজ্ঞতাকে বাণী জোগানোও তাঁর দায়-বিশেষ।

(৩) ভাববন্ধমুক্ত অর্থাৎ নিজের ভাষায় সংগঠিত ও পূর্ণ-প্রকাশিত রবীন্দ্র-ভাবসত্তাই কর্মের মধ্যে রূপলাভ করার জন্যে নিরন্তর দাবি জানাতে থাকে, এই দাবি প্রত্যক্ষভাবেই পূরণ না হলে রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনা তথা ভাবজীবন ও সাহিত্যসৃষ্টি দুই-ই ব্যর্থ

মনে হয়। তাই এক একটি ভাবমণ্ডলের অনুষঙ্গেই এক একটি কর্মমণ্ডল গঠন অনিবার্য হয়ে পড়ে।

সাত

রবীন্দ্রজীবনসাধনায় রবীন্দ্রবাণীরূপেরই কী নিগূঢ় ভূমিকা! কথা কেবল কর্মযজ্ঞের আবাহন-মন্ত্র নয়, তাঁর জীবনপ্রেরণা, তাঁর আত্মশক্তিবিশেষ, তাঁর অন্তঃসত্তার উদ্বোধক, তাঁর শিক্ষাদাতা, তাঁর নিয়ন্ত্রক। কথা শুধু কর্মের পরিপোষকই নয়, কর্মের জনক মর্মসহচর এবং পথপ্রদর্শক সহযাত্রী। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত ভাবসাধক ও বাণীশিল্পী-রূপেই অগ্রপথিক, তার পরেই ভাবকর্মী বা 'রূপকার'।*

* প্রধানত রবীন্দ্রনাথের মধ্যজীবন-সংশ্লিষ্ট [১৮৮৮-১৯২২ খ্রী.] এই প্রবন্ধের বিষয়প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি-সূত্র হল রবীন্দ্রলিখিত কিছু পত্র: সূত্রচিহ্নানুসারে ১।' ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ১৫৭, রচনাকাল ১৮৯৪ খ্রী; ২।, ৩।, ৪।, ৫।, ৬।, ৭।, বিশ্বভারতী পত্রিকা, আষাঢ়, ১৩৫০, পৃ. ৭৭৬; ৮। চিঠিপত্র ৯, পত্রসংখ্যা ৬; ৯। বিশ্বভারতী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯, পৃ. ৩৩৫; ১০। উৎসর্গ কাব্য, কবিতা-সংখ্যা ১৭; ১১। ছিন্নপত্রাবলী, পত্র-সংখ্যা ১৮৩, রচনাকাল ১৮৯৪।

সমালোচনা

নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় পত্রিকা: প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী সংখ্যা (১৯৭৭)। প্রকাশক: প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা, সম্পাদিকা, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন, ভগিনী নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়, ৫ নিবেদিতা লেন, কলকাতা ৭০০০০৩। (ডিসেম্বর ১৯৭৭), পৃ: ১৪৫, মূল্য দশ টাকা।

'নিবেদিতার সাধনার অগ্নি এখানে অম্লান শিখায় জ্বলন্ত আছে। অভাব হয়নি উত্তর-সাধিকাদের। হয়নি তার কারণ নিবেদিতা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের। কারণ নিবেদিতা এখানে শ্রীশ্রীমাকে অধিষ্ঠিতা করেছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের নিত্য-উপস্থিতিই এই তীর্থটিকে জাগিয়ে রেখেছে।...এখানে মিলিত হয়েছে স্বামীজীর স্বপ্ন, নিবেদিতার সাধনা, শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বব্যাপী কৃপা।'

'এই বিদ্যালয় ভগিনী নিবেদিতা নামে এক নিবেদিত প্রাণের স্মারক।...উনিশ শতকের শেষ প্রহরে কলকাতার বাগবাজারের এক গলিতে ভগিনী নিবেদিতা জ্বালিয়েছিলেন এই প্রদীপ,—পরবর্তী কালে যা আলোর উৎসব, নিবেদিতা-বিদ্যালয়। অন্য ধরনের বিদ্যালয়। মেম তৈরী নয়, বিবিয়ানার দীক্ষাদানও নয়, তাঁর উদ্যোগের লক্ষ্য ছিল একটাই—মেয়েদের বাস্তব জীবনের বাস্তব প্রয়োজন মেটানো...।'

'আপাতদৃষ্টিতে বাগবাজারের গলিতে সীমাবদ্ধ এই বিদ্যায়তন আসলে সমগ্র ভারতের সাধনাকে নীরবে রূপায়িত করে চলেছে।'

—এমন অনেক কথা ছড়ানো রয়েছে নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থটিতে। কোন কথাটিই একটুও অসত্য অতিরঞ্জিত বা অপ্রাসঙ্গিক নয়। ওপরের ঐ উদ্ধৃতিগুলির পরে বিদ্যালয়টির বিষয়ে আর কিছু লেখা নিষ্প্রয়োজন।

গ্রন্থটিতে কতকগুলি অতি দামী দলিল-

স্থানীয় রচনা অন্তর্ভুক্ত, যেমন 'Project of the Ramakrishna School for Girls' শীর্ষক বিদ্যালয়টির পরিকল্পনার নিবেদিতা-কৃত রূপ-রেখা, ক্রিস্টিন সম্বন্ধে তাঁর মূল লেখা 'What an American Woman is doing in India' ও সেটির বঙ্গানুবাদ, স্বামী সারদানন্দ বিরচিত 'Prospectus—A concise report 1905-12' ও 'Extracts from the old report' নামে নারীশিক্ষা আন্দোলনের ইতিহাস রচনার জন্যে অত্যাবশ্যক দুটি নথি এবং শ্রীমতী সরলা-বালা সরকারের ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত 'নিবেদিতা বিদ্যালয় ও তাহার আদর্শ'।

অন্যান্য রচনার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য : প্রব্রাজিকা জ্ঞানদাপ্রাণার 'Seventy-five years through faith and trial', বনফুলের 'নিবেদিতা প্রণাম', শ্রীশংকরী-প্রসাদ বসুর 'নারীর শিক্ষা, স্বাধীনতা, মর্যাদা সম্পর্কে স্বামীজীর বক্তব্যের খসড়া', শ্রীঅশোক-কুমার সরকারের 'নিবেদিতা', প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণার 'কে কে যেতে প্রস্তুত', প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার 'স্বামীজীর পরিকল্পনা ও নিবেদিতা বিদ্যালয়', প্রব্রাজিকা দয়াপ্রাণার 'ভাবের উৎস', শ্রীমতী বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের 'কিছু স্মৃতি ও কৃতজ্ঞতা', শ্রীমতী সুষমা চক্রবর্তীর 'মনে পড়ে' এবং—যে শক্তিশালী গ্রন্থনির্মাতাদের নিবন্ধ থেকে উদ্ধৃতির উপচার সাজিয়ে এ আলোচনা আরম্ভ করেছি সেই তিনজন, যথাক্রমে—শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপান্থ ও ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষের লেখা।

সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী, শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রী, অভিভাবক ও পরিচালক, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক, অধ্যাপক গবেষকদের নানান চোখের আলোয় এই অনন্য পীঠস্থানের বৃত্তান্ত ও তার অনন্যা প্রতিষ্ঠাত্রীর ব্যক্তিত্ব নানা দিক থেকে আলোকিত হয়েছে। শংকরীবাবুর লেখাটি নারীশিক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজীর মহামূল্য মৌলিক চিন্তা নিয়ে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা। সব মিলিয়ে, বইখানি শিক্ষার্থী ও শিক্ষাব্রতী, বিশেষ করে, বালিকা ও বালিকাদের শিক্ষাদানের সঙ্গে যাঁরা জড়িত—তাঁদের সকলের সামনে এক নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করবে। অন্যান্য পাঠক-পাঠিকারাও এই গ্রন্থের মাধ্যমে নিবেদিতা-তীর্থ পরিক্রমা করে পরিতৃপ্ত হবেন আশা করি। বেশির ভাগ লেখাই শ্রদ্ধান্বিত তো বটেই, সুপাঠ্য এবং সারবান; গ্রন্থসজ্জা সুন্দর; সম্পাদনা উন্নত মানের। এমন একখানি বই ঘরে ঘরে ও প্রতি গ্রন্থাগারে থাকা উচিত।

বকলম

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

বন্যাত্রাণ

৮ই অগস্ট ১৯৭৮, রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দ বন্যাসেবাকার্যে সহায়তার জন্য দেশের উদারহৃদয় জনসাধারণের নিকট যে প্রথম আবেদন করেন, তাহা হইতে জানা যায় রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক সীমিত সামর্থ্য লইয়া বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলায় হায়াঘাটে বন্যাপীড়িত জনগণের মধ্যে সেবাকার্য আরব্ধ হয় (অগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে)। ঐ সময়ে ১৬৬ বর্গ কিলোমিটারব্যাপী ১৭টি পঞ্চায়েতের ৭৭,৪০০ ব্যক্তি উক্ত বন্যায় বিশেষভাবে

ক্ষতিগ্রস্ত হন।

২৯শে অগস্ট ১৯৭৮ তারিখের দ্বিতীয় আবেদন (এই সংখ্যার ৪৯২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত) হইতে জানা যায় যে, উল্লিখিত সেবাকার্য ভাগলপুর জেলার নওগাছিয়া মহকুমায়ও প্রসারিত হইয়াছে, ঐ সকল অঞ্চলের দুর্গত জনগণের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য ও জামা-কাপড় বিতরণ করা হইতেছে, কাটিহার শহরের উপকণ্ঠে গৃহহারাদের মধ্যে ঘরবাড়ি তৈয়ারীর জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিতরণের ব্যবস্থা হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গে মালদহ জেলার রাতুয় এবং মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগে আশ্রয়প্রা বন্যাপীড়িত জনগণের মধ্যে খিচুড়ি ইত্যা বণ্টন করা হইতেছে।

ইহার পর সেপ্টেম্বরের শুরু হইতে পশ্চিমবঙ্গ দিল্লী উত্তর প্রদেশ বিহার প্রভৃ অঞ্চলে যে অভূতপূর্ব বন্যা দেখা দিয়া তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে স্বামী গম্ভীরানন্দ ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ যে তৃতীয় আবে করিয়াছেন, তাহা নিম্নে মুদ্রিত হইল :

রামকৃষ্ণ মিশন

বন্যাসেবাকার্য

আবেদন

অস্বাভাবিক বৃষ্টির ফলে দেশের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে বন্যায় যে অসংখ্য জীবন-হানি, বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ও বিপর্যয় হইয়াছে, জনসাধারণ সে বিষয় অবগত আছেন। কত ঘরবাড়ী ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে, কত গৃহপালিত পশু ভাসিয়া গিয়াছে এবং কি পরিমাণ ফসল নষ্ট হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ আহার ও বাসস্থানের অভাবে অসহায়ভাবে দিন কাটাইতেছে। ইতিমধ্যেই নানা রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় দুর্দশাগ্রস্তদের অবস্থা আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে।

বিহারে দ্বারভাঙ্গা জেলায় হায়াঘাটে এবং ভাগলপুর জেলায় নওগাছিয়ায় সেবাকার্য শেষ করিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বর্তমানে বন্যার্তদের সেবায় নিযুক্ত আছে : বিহারে কাটিহার সহরের উপকণ্ঠে, দিল্লী ও এলাহাবাদে, **পশ্চিমবঙ্গে** মালদহ জেলায় রতুয়ায়, মুর্শিদাবাদ জেলায় (লালবাগ ও অর্জুনপুরে কাজ শেষ করিয়া) জঙ্গিপুর মহকুমায় তেঘরিয়ায়, হুগলী জেলায় গোঘাটে এবং মেদিনীপুর জেলায় দাসপুর, পিঙ্গলা-জলচক, ময়না ও গোপীনাথপুরে।

মিশন প্রধানতঃ রান্না করা খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করিলেও স্থানবিশেষে চিড়া, গুড়, গম বা আটা, কাপড়-চোপড়, ত্রিপল, গৃহমেরামতী সরঞ্জাম ইত্যাদি বিতরণ, এবং দাসপুরে প্রয়োজনীয় ঔষধাদি দ্বারা দাতব্য চিকিৎসাকার্য পরিচালনা করিতেছে।

এই সেবাকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে এবং প্রয়োজনমত আরও বৃহত্তর অঞ্চলে ব্যাপকভাবে সেবাকার্য শুরু করার জন্য মুক্তহস্তে অর্থ ও সাহায্যদ্রব্যাদি দান করিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের এই প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে উদারহৃদয়

জনসাধারণের নিকট অনুরোধ জানাইতেছি। নিম্নলিখিত ঠিকানায় সকল প্রকার দান সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

চেক ও ব্যাংক ড্রাফ্‌ট "রামকৃষ্ণ মিশন"-এর নামে লিখিয়া "একাউন্ট পেয়ী" করিয়া দিতে হইবে। রামকৃষ্ণ মিশনে দান আয়করমুক্ত।

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা:

১। রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ, হাওড়া ৭১১২০২

২। অদ্বৈত আশ্রম, ৫ ডিহি ইণ্টালী রোড, কলিকাতা ৭০০০১৪

৩। উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩

৪। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোল পার্ক, কলিকাতা ৭০০০২৯

৫। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান, ৯৯ শরৎ বসু রোড, কলিকাতা ৭০০০২৬

৬। রামকৃষ্ণ মিশন, খার, বোম্বাই ৪০০০৫২

৭। রামকৃষ্ণ মিশন, নিউ দিল্লী ১১০০৫৫ ৮। রামকৃষ্ণ আশ্রম, রাজকোট, ৩৬০০০১

১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮
বেলুড় মঠ

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক

অন্যত্র ত্রাণকার্য

তামিলনাড়ু: গত ১৭ই অগস্ট তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল শ্রীপ্রভুদাস বি. পাটওয়ারি, সাধু, ভক্ত ও জনসাধারণের এক বিরাট সমাবেশে, ত্রিচি জিলার মানাপ্পারাই তালুকের বেম্বানুর পঞ্চায়েতের পারাতেক্কুর গ্রামে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা পুরম' নামক কলোনীটির উদ্বোধন করেন। গত নভেম্বর মাসের ঘূর্ণিঝড়ে গৃহহারা হরিজনদের জন্য এই কলোনীতে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক খেলার মাঠ সহ ২৫টি ঝড়-প্রতিরোধী গৃহ ও কমুউনিটি হল নির্মিত হয়।

অন্ধ্রপ্রদেশ: পুনর্বাসনকার্য প্রাগ্রসর। ২৩৫টি গৃহ প্রায় সম্পূর্ণ। আরো ২৭৭টি গৃহের নির্মাণকার্য বিভিন্ন স্তরে রহিয়াছে।

বাংলাদেশ: চারিটি কেন্দ্রের মাধ্যমে রোগীদের চিকিৎসা এবং দুইটি কেন্দ্রের মাধ্যমে দুগ্ধবিতরণ অব্যাহত আছে।

ছাত্রদের কৃতিত্ব

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত বি. এ. এবং বি. এস্‌সি. অনার্স পরীক্ষায় নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন কলেজের দুইটি ছাত্র পরিসংখ্যান ও রসায়নে প্রথম স্থান অধিকার করে।

ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ মিশন স্কুল হইতে একটি ছাত্র ১৯৭৮-এর মধ্য স্কুল বৃত্তিপরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

সর্বভারতীয় সংস্কৃত-দিবস

বিগত ১৮ই অগস্ট ১৯৭৮, শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের সাদর আহ্বানে নতুন দিল্লীতে 'সর্বভারতীয় সংস্কৃত-দিবস' বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের পৌরোহিত্যে সম্পাদিত হয়। তিনি তাঁহার সংস্কৃত ভাষণে জাতীয় জীবনে সংস্কৃতের অবশ্য প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষ জোরের সঙ্গে উল্লেখ করেন। প্রধান অতিথির সংস্কৃত ভাষণে ডক্টর রমা চৌধুরী দেবভাষা সংস্কৃতের উন্নতিকল্পে সকলকে আহ্বান জানান। ভাষা-বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীকে. কে. সেথী ও রাষ্ট্রীয় লালবাহাদুর সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীসি. আর. স্বামীনাথনও সংস্কৃতে ভাষণ দেন।

সভান্তে শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যজীবনী অবলম্বনে ডক্টর রমা চৌধুরী কর্তৃক বিরচিত সংস্কৃত নাটক 'যুগ-জীবনম্' 'প্রাচ্যবাণী-সংস্কৃত-পালি-নাট্য-পরিষদ' কর্তৃক বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। বহুদিন পূর্বে কলিকাতায় এই নাটকটির উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ; এবং তৎপরে ইহা ভারতের সর্বত্র বহুবার অভিনীত হইয়া সকলের প্রশংসা ও আশীর্বাদ লাভ করিয়াছে। 'সর্বভারতীয় সংস্কৃত-দিবসে'ও তিনি সানুগ্রহে শুভেচ্ছা ও আশীর্বাণী প্রেরণ করেন, যাহা প্রারম্ভে পঠিত হয়।

সভায় ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত বহু সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত-ভক্ত-সাধক উপস্থিত ছিলেন। সভান্তে তাঁহারা ও দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজীরা এবং সাহিত্য একাডেমির সভাপতি 'জ্ঞানপীঠ-পুরস্কারবিজয়ী' সুবিখ্যাত গুজরাতী কবি শ্রীউমাকান্ত যোশী 'প্রাচ্যবাণী'র সদস্য-সদস্যাদের তাঁহাদের প্রাণস্পর্শী অভিনয়ের জন্য আশীর্বাদ জ্ঞাপন করেন।

উৎসব

ঘোকসাডাঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ৫ ও ৬ই মে ১৯৭৮, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। ৫ই মঙ্গলারতি ঊষাকীর্তন শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ বিশেষ পূজা কথামৃতপাঠ প্রসাদ-বিতরণ ও আলোকচিত্র-প্রদর্শন হয়। ৬ই প্রাতে গীতাপাঠ হয়। অপরাহ্ণ হইতে রাত্রি পর্যন্ত 'কৃষ্ণলীলাকীর্তন' পরিবেশন করেন শ্রীহৃদয়চন্দ্র দেবনাথ ও সম্প্রদায়।

পিরোজপুর (বাংলাদেশ) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৮ই হইতে ১০ই মে ১৯৭৮, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। ৮ই মঙ্গলারতি ঊষাকীর্তন ভজন বিশেষ পূজা হোম শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে ভাষণ দেন স্বামী পরদেবানন্দ শ্রীজয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত শ্রীবীরেন্দ্র-কুমার পাণ্ডে ও সভাপতি স্বামী অক্ষরানন্দ। ৯ই ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী সম্বন্ধে ভাষণ দেন শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দাস শ্রীপ্রফুল্লকুমার ভাবুক শ্রীআনন্দমোহন কীর্তনীয়া ও সভাপতি স্বামী পরদেবানন্দ। পরে 'করুণাসিন্ধু বিদ্যাসাগর' নাটক অভিনীত হয়। ১০ই স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ভাষণ দেন ব্রহ্মচারী ধনেশ্বর শ্রীজয়ন্ত-কুমার দাশগুপ্ত শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দাস ও সভাপতি স্বামী পরদেবানন্দ। প্রায় ৪০০০ দরিদ্রনারায়ণ খিচুড়ি প্রসাদ পান।

পরলোকে

শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য **মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত** বিগত ৭ই শ্রাবণ সকাল ১০টায় ৮৬ বৎসর বয়সে পূর্ণজ্ঞানে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন।

তিনি ১৯০৮ সালে প্রথম বেলুড় মঠ দর্শন করেন এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বামী প্রেমানন্দ স্বামী শিবানন্দ 'শ্রীম' প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যবর্গ এবং ভগিনী নিবেদিতা ক্রিষ্টিন প্রভৃতি রামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর অনেককে দর্শন করেন বা ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। ১৯১৭ সালে তিনি জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন।

ফরিদপুর জিলার ভাঙ্গা মহকুমা শহরের বিবেকানন্দ সেবাসমিতি, জানদী রামকৃষ্ণ আশ্রম ও ফরিদপুর রামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা ও প্রাণস্বরূপ। এই সকল প্রতিষ্ঠানে একত্রিত তরুণবর্গের মধ্যে চার জন পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করেন।

মানদাশঙ্কর বরাবরই সুলেখক ছিলেন। ১৯৩৬ সালে রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী কমিটি আয়োজিত থীসিস প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কৃত হন এবং পরে শ্রীশ্রীমা স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণের উপর তিনখানি গবেষণামূলক জীবনীগ্রন্থ রচনা করেন। তিনখানি গ্রন্থই ভক্তমহলে ও শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের সন্ন্যাসীদের নিকট উচ্চ সমাদর লাভ করে।

চরিত্রের দৃঢ়তা তেজস্বিতা সরলতা মনস্বিতা ও ধর্মপরায়ণতার সমাবেশে এক অপূর্ব ব্যক্তিত্বের অধিকারী মানদাশঙ্কর একটি অনবদ্য সুন্দর জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের (শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী—উদ্বোধন) অধ্যক্ষ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ গত জুলাই মাসে পাঁচটি রবিবারে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত-প্রসঙ্গ এবং তিনটি বৃহস্পতিবার ও একটি শনিবারে গীতা-প্রসঙ্গ করেন। উভয় প্রসঙ্গের সারসংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

কথামৃত—

শাস্ত্রে আছে :

উত্তমো ব্রহ্মসদ্‌ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।

স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বাহ্যপূজাধমাধমা॥

—ব্রহ্মবস্তু রয়েছেন, সর্বদা তাঁর অনুভূতি হচ্ছে, এই হ'ল সব চেয়ে উত্তম। তারপর ধ্যান, এটি মধ্যম। স্তবস্তুতি ও জপ হচ্ছে অধম। তারও নীচে বাহ্য পূজা—অধমেরও অধম।

এই ব্রহ্মসদ্ভাব অবস্থা লাভ করা আমাদের পক্ষে সহজ নয়। হিমালয়ের তুষারশৃঙ্গ নয়নশোভন, অপূর্ব সুন্দর! কিন্তু তাতে আমাদের তৃষ্ণা নিবারিত হয় না। সেই তুষার গলে জল হলে, তবেই তাতে তৃষ্ণা দূর হওয়া সম্ভব। তেমনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর হৃদয়ের উত্তাপে ঐ ব্রহ্মসদ্ভাবকে নিজের জীবনের সুরধুনীধারায় রূপান্তরিত ক'রে কথামৃতের আকারে আমাদের কাছে পরিবেশন করেছেন। সকলের মধ্যে ভগবান আছেন, এই পারমার্থিক সত্যকে বাক্যে ও আচরণে প্রতিষ্ঠিত ক'রে দেখিয়ে দিয়েছেন অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে কেমন ক'রে চলতে হয়। প্রেমস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অমিয়

কথা শুনতে আমরা এসেছি।

সেইদিনটি আমাদের চোখের সামনে আজ ছবির মত ফুটে উঠেছে পূজনীয় মাষ্টার মশায়ের (শ্রীম) নিপুণ লেখনীতে। কথামৃত শুধু-কথা-সংকলন নয়। এটি বর্ণময় সজীব চিত্র। তাঁর প্রতিদিনের দিনলিপি যা তিনি সংক্ষেপে লিখে রাখতেন, তাই পরবর্তী কালে ধ্যানের মাধ্যমে স্মৃতি রোমন্থন ক'রে চিত্রকরের মতো অক্ষয় ক'রে রেখে গেছেন কথামৃত-গ্রন্থে। এটি যেন শ্রীরামকৃষ্ণলীলার একখানি জীবন্ত দলিলচিত্র। তাই শ্রীশ্রীমা কথামৃতপাঠ শুনে বলেছিলেন, 'একদিন তোমার মুখে শুনিয়া আমার বোধ হইল, তিনিই ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন।'

মাষ্টার মশায় দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুআরি মাসে—প্রথমেই বর্ণনা দিচ্ছেন শ্রীধাম দক্ষিণেশ্বরের। এমন কাব্যময় ভাষা আর এত নিখুঁত বর্ণনা যে, আমরা যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি সেই দেবভূমি—যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র, জাহ্নবীতীরের সেই অপরূপ পরিবেশ।

সংসারের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে মাষ্টার মশায় তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে শরীর মনের ক্লান্তি দূর করতে এসেছেন দক্ষিণেশ্বরের বাগানে। শুনেছেন এখানে একজন পরমহংস আছেন। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মাষ্টার মশায় সংশয়ান্বিত মন নিয়ে নিতান্ত কৌতূহলবশেই এসেছেন তাঁকে দেখতে। সমস্ত মন্দিরাদির বর্ণনা শেষ ক'রে তিনি আরম্ভ করেছেন তাঁর প্রথম দর্শনের প্রথম অনুভূতির কথা—যেন তিনি এসে পৌঁছেছেন এমন একটি স্থানে যেখানে সর্বতীর্থের সমাগম হয়েছে আর সাক্ষাৎ শুকদেব ভগবৎ-কথা বলছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে: 'বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ পুরুষাংস্ত্রীন্ পুনাতি হি। বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৄংস্তৎ-পাদসলিলং যথা।'—ভগবানের কথা যেখানে হয় সেটি তীর্থসদৃশ। শ্রোতা বক্তা প্রশ্নকর্তা সকলেই ঐ তীর্থসলিলের স্পর্শে পবিত্রীকৃত হন। পরমভাগবত বেদান্তঘনমূর্তি শ্রীশুকদেব যেন আজ নবকলেবর ধারণ ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ-মুখে ভক্তবৃন্দের কাছে তাঁদের চির-আকাঙ্ক্ষিত জীবনসমস্যার সমাধানে মুখর।

গীতা—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখের বাণী, সর্বশাস্ত্রের সার অদ্বৈততত্ত্বরূপ অমৃত-বর্ষিণী— সংসার-মোহ-নাশিনী। ঋষিশ্রেষ্ঠ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের অপূর্ব ধ্যানসৃষ্টি মহাভারতের অন্তর্গত এই যে গীতা, এটি অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করবার জন্য জ্ঞানময় প্রদীপবিশেষ। উপনিষদের সার—গীতা। যাঁরা সময়াভাবে উপনিষদ্-পাঠে অক্ষম, গীতাপাঠে ও তার মর্মার্থ অনুধাবনে তাঁরা উপনিষদ্তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন। কুরুক্ষেত্রের মহারণাঙ্গন—ন্যায় ও অন্যায়ের, সুনীতি ও দুর্নীতির বিচারক্ষেত্র। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সখা ও শিষ্য ধনঞ্জয়কে সেই বিচারে প্রবুদ্ধ করছেন—তাঁর কর্মে তাঁকে নিয়োজিত করছেন। এই প্রথম অধ্যায়কে বলা হয় বিষাদযোগ। কেন অর্জুনের এই বিষণ্ণতা এবং কিভাবে এই বিষাদের দ্বারাই তিনি নিজ জীবনে সত্যপথের সন্ধান লাভ করেছেন, শ্রীভগবানের কাছ থেকে সেটি আমরা এই অধ্যায়ে পেয়েছি।

গত ৮ই ভাদ্র (২৫শে অগস্ট) শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ ও শ্রীকৃষ্ণজন্মবৃত্তান্ত আলোচনা করা হয়।

"The only God to worship is the human soul in the human body."

—Vivekananda.

তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়—আমাকে ভক্তি, বিশ্বাস দাও।
বিশ্বাস হয়ে গেলেই হ'লো। বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিস নাই।
—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

মনমুখ এক করাই হচ্ছে প্রকৃত সাধন। নতুবা মুখে বলছি—'হে ভগবান, তুমি আমার সর্বস্ব ধন' এবং মনে বিষয়কেই সর্বস্ব জেনে ব'সে রয়েছি; এরূপ লোকের সকল সাধনই বিফল হয়।

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

বাসনার লেশমাত্র থাকলে ভগবান লাভ হয় না। মন যখন বাসনারহিত হয়, তখনই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়।

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

অপরের নিকট ভাল যাহা কিছু পাও শিক্ষা কর, কিন্তু সেইটি লইয়া নিজেদের ভাবে গঠন করিয়া লইতে হইবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ



ভগবান এই মানুষের দেহের মধ্যেই রয়েছেন। মানুষ তাঁকে জানতে না পেরে ঘুরে মরছে। ভগবানই সত্য আর সব মিথ্যা।

প্রারব্ধের ভোগ ভুগতেই হয়। তবে ভগবানের নাম করলে এই হয়—যেমন একজনের পা কেটে যাবার কথা ছিল সেখানে একটা কাঁটা ফুটে ভোগ হল।

—শ্রীসারদাদেবী

মাছ যতদূরে থাক না, ভাল ভাল চার ফেলবামাত্র যেমন তারা ছুটে আসে, ভগবান্ হরিও সেইরূপ বিশ্বাসী ভক্তের হৃদয়ে শীঘ্র এসে উদিত হন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব

যিনি এই সংসার-মায়ার পারে লইয়া যান, যিনি কৃপা ক'রে সমস্ত মানসিক আধিব্যাধি বিনষ্ট করেন, তিনিই যথার্থ গুরু।

—স্বামী বিবেকানন্দ

আমি কি আর উপদেশ দেব! ঠাকুরের কথা সব বইয়ে বেরিয়ে গেছে। তাঁর একটা কথা ধারণা করে যদি চলতে পার তো সব হয়ে যাবে।

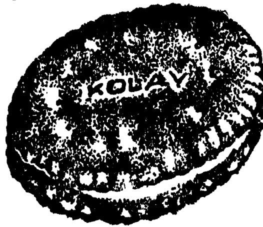
শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

KOLAY

BISCUITS & SWEETS

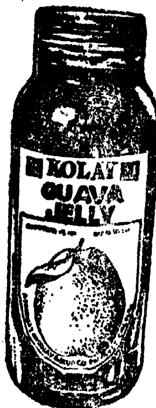












AND NEW INTRODUCTION

CONDIMENTS—
JAM, JELLY,
SAUCE, VINEGAR
AND SQUASHES



A PRODUCT OF
KOLAY BISCUIT
CO. PVT. LTD.
CALCUTTA-700

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

অন্যান্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা — স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য ১৩'০০, ২য় ভাগ পৃঃ ৫২৪, মূল্য ৮'০০

ভারতে শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ। মূল্য ৩'০০

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৯১, মূল্য ৫'০০

স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ। পৃঃ ৩১০, মূল্য ৪'০০

গোপালের মা — স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৪৪, মূল্য ১'৫০

আচার্য শঙ্কর—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৪৬, মূল্য ৬'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র—মূল্য ৭'৮০

শিবানন্দ-বাণী— স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত। ২য় ভাগ ২'৫০

স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ। মূল্য ৪'০০

দিব্যপ্রসঙ্গে — স্বামী দিব্যাত্মানন্দ। পৃঃ ১৯৪, মূল্য ৬'৩৫

স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী— (ছাপা নাই)

আরত্রিক-স্তব—মূল্য ০'৭০

পুণ্যস্মৃতি স্বামী আনাত্মানন্দ। পৃঃ ১১৬, মূল্য ৩'০০

মহাভারতের গল্প—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, সাধারণ ২'৫০, বোর্ড বাঁধাই ৩'০০ ৬ষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য সংক্ষেপিত "স্কুলপাঠ্য" সংস্করণ—পৃঃ ৭২, মূল্য ২'০০

শঙ্কর-চরিত — শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। ৭ম সংস্করণ মূল্য ২'৫০

দশাবতার-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য পৃঃ ১০৮, মূল্য ২'৫০

সাধক রামপ্রসাদ—স্বামী বামদেবানন্দ। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৫'২০

সাধু নাগমহাশয়—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। পৃঃ ১৪৪, মূল্য ৩'৫০

ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী তেজসানন্দ। পৃঃ ১২৪, মূল্য ১ ৫০

শিব ও বুদ্ধ—ভগিনী নিবেদিতা। পৃঃ ৬৩, মূল্য ০'৬৫

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ— পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৫'০০

পত্রমালা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২, মূল্য ৪ ০০

গীতাতত্ত্ব—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৭৬, মূল্য ৫'০০

লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৪২০, মূল্য ১০'০০,

পরমার্থ-প্রসঙ্গ— স্বামী বিরজানন্দ। পৃঃ ১৩৭, মূল্য ৪'০০

ভগবানলাভের পথ—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। মূল্য ১'০০

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী — স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৩২, মূল্য ০'৬০

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-সঞ্চয়ন— পৃঃ ৩১৬, মূল্য ৭'০০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

বেদান্তের আলোকে খৃষ্টের শৈলোপদেশ—স্বামী প্রভবানন্দ। মূল্য সাধারণ ৪·০০

অতীতের স্মৃতি—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। পৃঃ ৪৬৪, মূল্য ১০·০০

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ১৪২, মূল্য ৩·৩০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। পাঁচশতাধিক সঙ্গীত। মূল্য ৬·০০

ঠাকুরের নরেন, নরেনের ঠাকুর—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ২৯, মূল্য ১·২০

সংস্কৃত

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত

১ম ভাগ পৃঃ ৪৫৪, মূল্য ১১·০০
২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ১১·০০
৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মূল্য ১১·০০

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত, স্বামী জগদানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪১৫, মূল্য ৭·৮০

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৬·৪০

স্তবকুসুমাঞ্জলি—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪০৮, মূল্য ৭·০০

বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা—স্বামী ধীরেশানন্দ-সংকলিত। (ছাপা নাই)

বৈরাগ্যশতকম্—স্বামী ধীরেশানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ১·৫০

নারদীয় ভক্তিসূত্র—স্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ১৬৩, মূল্য সাধারণ ৫·০০, শোভন ৭·৫০

বেদান্তদর্শন—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য: ১ম অধ্যায় (চারখণ্ডে) ১৭·০০, ২য় অঃ ১৩·০০; ৩য় অঃ ১৩·০০; ৪র্থ অঃ ৯·০০

গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা—স্বামী রঘুবরানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য ১·৮০

শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজাপদ্ধতি—পৃঃ ৬৪, মূল্য ১·৫০

অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—সুরেশ দত্ত। মূল্য ৫·০০

পরমহংসদেব—স্বামী প্রেমেশানন্দ। পৃঃ ২৪, মূল্য ০·৭৫

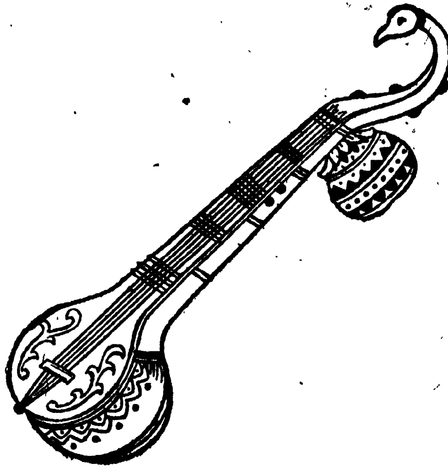
জননী সারদাদেবী—স্বামী নির্বেদানন্দ। (অনুবাদক: স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। মূল্য ২·৮০

শ্রীশ্রীমা সারদা—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৯০, মূল্য ২·০০

গল্পে বেদান্ত—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, মূল্য সাধারণ ৩·০০, বোর্ড বাঁধাই ৩·৫০

বীরবাণী—স্বামী বিবেকানন্দ। পৃঃ ১১৪, মূল্য ২·০০ (যন্ত্রস্থ)

বিবেকানন্দের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। পৃঃ ১৫৪, মূল্য ৩·৫০



আমাদের এখন এমন ধর্ম চাই যাহা আমাদিগকে মানুষ করিতে পারে। আমাদের এমন সব মতবাদ আবশ্যক, যেগুলি আমাদিগকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলে। যাহাতে মানুষ গঠিত হয় এমন সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ শিক্ষার প্রয়োজন।

—স্বামী বিবেকানন্দ

যতদিন না হিন্দুজাতি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং এক নূতন জাতি তাহার স্থান অধিকার করে, ততদিন প্রাচ্যে প্রতীচ্যে যতই চেষ্টা কর না কেন, জীবিত থাকিতে ভারত কখনও ইওরোপ হইতে পারে না।

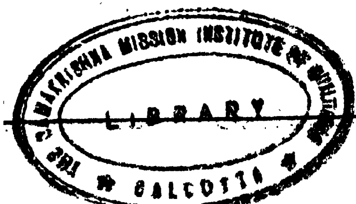
—স্বামী বিবেকানন্দ

ভারতে নারীর আদর্শ মাতৃত্ব—সেই অপূর্ব, স্বার্থশূন্য, সর্বংসহা, নিত্যক্ষমাশীলা জননী।

নারীর সমগ্র জীবনে এই একটি চিন্তা তাঁহাকে তৎপর রাখে যে, তিনি মাতা; আদর্শ মাতা হইতে গেলে তাঁহাকে খুব পবিত্র থাকিতে হইবে।

আমাদের দেশের মেয়েরা বিদ্যাবুদ্ধি অর্জন করুক—ইহা আমি খুবই চাই; কিন্তু পবিত্রতা বিসর্জন দিয়া যদি তাহা করিতে হয় তবে নয়।

—স্বামী বিবেকানন্দ


LIBRARY
CALCUTTA

Udbodhan—Phone : 55-2447 SEPTEMBER 1978 Regd. No. WB/NC-19

৮০।৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত।
সম্পাদক—স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ : সংযুক্ত সম্পাদক—স্বামী ধ্যানানন্দ

উদ্বোধন

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত



কার্তিক ১৩৮৫

৮০তম বর্ষ

৺

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্ম (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়; ৮০তম বর্ষ হইতে **বার্ষিক মূল্য সডাক ১২৲ টাকা, ষাণ্মাষিক ৭৲ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে ৩৩৲ টাকা, এয়ার মেল-এ ১০১৲ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ১.২০ টাকা। নমুনার জন্ম ১.২০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সাত দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে; তাহার পরে চাহিলে পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হইবে না।

রচনা ঃ—ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্ম সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা প্রবন্ধ ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহকনম্বর পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময়: সকাল ৭৷৷০টা হইতে ১১টা; বিকাল ২৷০টা হইতে ৫টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০০০৩

উদ্বোধন, কার্তিক, ১৩৮৫

সূচীপত্র

উদ্বোধন, ৮১তম বর্ষ, ১৩৮৫-৮৬

নিবেদন

বর্তমান বৎসরের পৌষ মাসে 'উদ্বোধন' পত্রিকার ৮০ তম বর্ষ শেষ হইবে। আগামী মাঘ (১৩৮৫) মাসে পত্রিকা ৮১ তম বর্ষে পদার্পণ করিবে। পত্রিকার গ্রাহক-গ্রাহিকাগণকে জানানো যাইতেছে, তাঁহারা যেন আগামী ১৫ই ডিসেম্বরের (১৯৭৮) মধ্যে তাঁহাদের **পূরা নাম ও ঠিকানা এবং গ্রাহক-সংখ্যা সহ** বার্ষিক চাঁদা ১২ টাকা (ভারতের বাহিরে হইলে ৩৩'০০ টাকা, এয়ার মেল-এ ১০১'০০টাকা) মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দেন। **তৎপূর্বে যত শীঘ্র সম্ভব সংলগ্ন কার্ডখানি পূরণ করিয়া জানাইবেন**—মনিঅর্ডার-যোগে বা লোক মারফত টাকা পাঠাইবেন অথবা মাঘ মাসের পত্রিকা ভি. পি. পি.-তে গ্রহণ করিতে চান; কার্ডটিতে ১৫ পয়সার ডাকটিকিট আঁটিয়া পোস্ট করিবেন। ভি. পি. পি.-তে লইলে ১৫ টাকা ৮০ পয়সা লাগিবে।

অনিবার্য কারণে কাহারও পক্ষে আগামী বৎসরে গ্রাহক থাকা সম্ভব না হইলে তাহা উক্ত কার্ডেই জানাইয়া দিবেন।

উক্ত তারিখের মধ্যে বার্ষিক চাঁদা ১২ টাকা না আসিলে অথবা কোন পত্র না পাইলে মাঘ মাসের পত্রিকা ভি. পি. পি.-তে পাঠানো হইবে। ভি পি পি ফেরত দিলে আমাদের অযথা ক্ষতি হয়; সেজন্য সংলগ্ন কার্ডখানি অতি অবশ্যই অবিলম্বে পূরণ করিয়া পাঠাইবেন।

সুদীর্ঘ ৮০ বর্ষ ধরিয়া উদ্বোধন-পত্রিকার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবপ্রচারের কাজে আপনাদের সহায়তা আমরা পাইয়া আসিতেছি। আশা করি উহা অব্যাহত থাকিবে।

অফিসে চাঁদা জমা দিবার সময়ঃ { সকাল ৭॥—১১টা; বিকাল ২॥— ৫টা }

[রবিবার অফিস বন্ধ থাকে]

কার্যাধ্যক্ষ
উদ্বোধন কার্যালয়

১ কার্তিক, ১৩৮৫ — ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০-০০৩

উদ্বোধন, ৮১তম বর্ষ, ১৩৮৫-৮৬

নিবেদন

বর্তমান বৎসরের পৌষ মাসে 'উদ্বোধন' পত্রিকার ৮০ তম বর্ষ শেষ হইবে। আগামী মাঘ (১৩৮৫) মাসে পত্রিকা ৮১ তম বর্ষে পদার্পণ করিবে। পত্রিকার গ্রাহক-গ্রাহিকাগণকে জানানো যাইতেছে, তাঁহারা যেন আগামী ১৫ই ডিসেম্বরের (১৯৭৮) মধ্যে তাঁহাদের **পুরা নাম ও ঠিকানা এবং গ্রাহক-সংখ্যা সহ** বার্ষিক চাঁদা ১২ টাকা (ভারতের বাহিরে হইলে ৩৩·০০ টাকা, এয়ার মেল-এ ১০১·০০টাকা) মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দেন। তৎপূর্বে যত শীঘ্র সম্ভব সংলগ্ন কার্ডখানি পূরণ করিয়া জানাইবেন—মনিঅর্ডার-যোগে বা লোক মারফত টাকা পাঠাইবেন অথবা মাঘ মাসের পত্রিকা ভি. পি. পি.-তে গ্রহণ করিতে চান; কার্ডটিতে ১৫ পয়সার ডাকটিকিট আঁটিয়া পোস্ট করিবেন। ভি. পি. পি.-তে লইলে ১৫ টাকা ৮০ পয়সা লাগিবে।

অনিবার্য কারণে কাহারও পক্ষে আগামী বৎসরে গ্রাহক থাকা সম্ভব না হইলে তাহা উক্ত কার্ডেই জানাইয়া দিবেন।

উক্ত তারিখের মধ্যে বার্ষিক চাঁদা ১২ টাকা না আসিলে অথবা কোন পত্র না পাইলে মাঘ মাসের পত্রিকা ভি. পি. পি.-তে পাঠানো হইবে। ভি পি পি ফেরত দিলে আমাদের অযথা ক্ষতি হয়; সেজন্য সংলগ্ন কার্ডখানি অতি অবশ্যই অবিলম্বে পূরণ করিয়া পাঠাইবেন।

সুদীর্ঘ ৮০ বর্ষ ধরিয়া উদ্বোধন-পত্রিকার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবপ্রচারের কাজে আপনাদের সহায়তা আমরা পাইয়া আসিতেছি। আশা করি উহা অব্যাহত থাকিবে।

অফিসে চাঁদা জমা দিবার সময়: সকাল ৭॥—১১টা; বিকাল ২॥— ৫টা

[রবিবার অফিস বন্ধ থাকে]

কার্যাধ্যক্ষ

উদ্বোধন কার্যালয়

১ কার্তিক, ১৩৮৫ — ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩



৮০ তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা কার্তিক, ১৩৮৫

দিব্য বাণী

প্রসূতে সংসারং জননি ভবতী পালয়তি চ
সমস্তং ক্ষিত্যাদি প্রলয়সময়ে সংহরতি চ।
অতস্ত্বং ধাতাঽসি ত্রিভুবনপতিঃ শ্রীপতিরহো
মহেশোঽপি প্রায়ঃ সকলমপি কিং স্তৌমি ভবতীম্॥

ধরিত্রী কীলালং শুচিরপি সমীরোঽপি গগনং
ত্বমেকা কল্যাণী গিরিশরমণী কালি সকলম্।
স্তুতিঃ কা তে মাতর্নিজকরুণয়া মামগতিকং
প্রসন্না ত্বং ভূয়া ভবমনু ন ভূয়ান্মম জনুঃ॥

—মহাকাল-বিরচিতং দক্ষিণকালিকা-স্তোত্রম্, ১২, ১৪

বিশ্বপ্রসবিনী তুমি জননি হে! ভুবনপালিকা
প্রলয়ের কালে তুমি পৃথ্বী আদি সর্বসংহারিকা
তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব (তুমি ছাড়া আর কেবা আছে!)
সকলি তো তুমি মাগো—কি করিব স্তুতি তব কাছে

তুমি ক্ষিতি তুমি অপ্ তুমি তেজ মরুৎ ব্যোম তুমি
গিরিশরমণী কালি! স্তুতি তব কি করিব আমি!
কল্যাণী জননী মম এ সংসারে আমি নিরাশ্রয়
কৃপায় প্রসন্ন হও, আর যেন জন্ম নাহি হয়।

কথাপ্রসঙ্গে

শুভ ৺বিজয়া

উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা বিজ্ঞাপন-দাতা, শুভানুধ্যায়ী, অনুরাগী ও সংশ্লিষ্ট সকলকেই আমরা শুভ ৺বিজয়ার শুভেচ্ছা ও প্রীতি-সম্ভাষণাদি জানাইতেছি। শ্রীশ্রীজগন্মাতার কৃপায় সকলের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হউক, ইহাই তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

বেদান্তে কালীতত্ত্ব

আহার আচ্ছাদন আবাসন ও আরোগ্যের সমস্যায় জর্জরিত অথবা নিত্য নূতন ভোগোপকরণের সংগ্রহ-লালসায় উন্মথিত মানুষের পক্ষে উচ্চচিন্তা করা অসম্ভব। অভাব ও প্রাচুর্য, এই দুই বিষম—বিপরীত ও উৎকট—প্রতিবন্ধক যাঁহাদের নাই, তাঁহারাই চিরকাল নির্বাধ মননের রাজ্যে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে সমর্থ। আর মননশীল মানুষই প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যপদবাচ্য। 'স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি'—তিনিই জীবিত, যাঁহার মন মননের দ্বারা জীবিত।

বর্তমান কালেও যেমন, সুপ্রাচীন যুগেও তেমনই, উপরি-উক্ত প্রতিবন্ধকদ্বয়-রহিত মানুষ সৃষ্টিরহস্য উদ্ঘাটনে প্রয়াসী হইয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে, ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ পরস্পরকে প্রশ্ন করিতেছেন: 'ব্রহ্মই কি জগৎ-কারণ? আমরা কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, কাহার দ্বারা জীবিত আছি এবং অবশেষে কোথায় অবস্থান করিব? কাহার দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমরা সুখদুঃখভোগের নিয়মিত ব্যবস্থা অনুসরণ করিতে বাধ্য হই?'

তাঁহারা আরও বলিতেছেন: 'জগতের উৎপত্তি কি একটি আকস্মিক ঘটনা? কাল, পদার্থসমূহের নিজস্ব শক্তি (যেমন অগ্নির উষ্ণতা, জলের শৈত্য, ইত্যাদি), কর্মফল ও পঞ্চভূত—ইহারা কি স্বতন্ত্রভাবে জগতের কারণ হইতে পারে?—এ সকলই চিন্তনীয় বিষয়। কাল প্রভৃতি পরস্পর সংহত বা সম্মিলিত হইয়াও জগৎকারণ হইতে পারে না, কারণ সংহতি অপরের জন্যই হয় এবং সেই অপর জীবাত্মা। আর জীবাত্মাও জগৎকারণ হইতে পারেন না, কারণ তিনি সুখদুঃখভাগী।'

এইভাবে পরস্পর আলোচনা করিয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, বুদ্ধিবিচারের দ্বারা এই তত্ত্ব নির্ণীত হইবে না। কারণ, মানুষ যে-বুদ্ধির এত গর্ব করে, তাহার ক্ষেত্র খুবই সীমিত। তখন তাঁহারা ধ্যানযোগ অবলম্বন করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, 'বিচারের শেষ যেখানে, সেখানে সমাধি'। এই বাণীর আলোকেই আমরা ব্রহ্মবাদী ঋষিদের ধ্যান-পরিণাম বিচারের ব্যাপারটি পরিষ্কার বুঝিতে পারি। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলিতেছেন:

> তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
> দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈ র্নিগূঢ়াম্।
> যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
> কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥

—তাঁহারা ধ্যানযোগ অবলম্বন করিয়া সেই দেবের অর্থাৎ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের স্বকীয় শক্তিকে দর্শন করিলেন। দুর্জ্ঞেয়া সেই শক্তি ত্রিগুণাত্মিকা। তাঁহারই সহায়ে ব্রহ্ম জগৎ-

কারণ হন এবং পূর্বোক্ত কাল প্রভৃতি অস্বতন্ত্র কারণসমূহকে পরিচালিত করেন।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' (যাঁহা হইতে এই ভূতবর্গ জাত হয়) ইত্যাদি মন্ত্রে ব্রহ্মকেই জীবজগতের কারণ বলা হইয়াছে। অন্যান্য বহু উপনিষদে ব্রহ্মেরই জগৎকারণত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এই জন্যই ঐ ধারার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের উল্লিখিত ব্যাখ্যাটিতেও ব্রহ্মেরই জগৎকারণত্ব সমর্থিত হইয়াছে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মের এই জগৎকারণত্ব তাঁহারই আত্মভূত শক্তির সহায়তায়।

মন্ত্রটির এই ব্যাখ্যা শংকরাচার্য-রচিত সুপ্রসিদ্ধ 'সৌন্দর্যলহরী'র প্রথম শ্লোকটির দুইটি চরণ আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয়:

শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো
যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং
নচেদেবং দেবো
ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।

—শিব যদি শক্তিযুক্ত হন, তাহা হইলেই তিনি সৃষ্টি স্থিতি সংহার করিতে সমর্থ হন; অন্যথা সেই দেব স্পন্দিত হইতেও পারেন না।

এখানেও শিবেরই জগৎকারণত্ব বিবৃত হইয়াছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে যে, শক্তি ব্যতীত শিবের ঐ জগৎকারণত্ব সিদ্ধ হয় না। বলা বাহুল্য, শিব ও ব্রহ্মে কোনও ভেদ নাই।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের পূর্বোক্ত মন্ত্রটির ব্যাখ্যা একটু অন্যভাবেও করা হয়। বলা হয়, ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ ধ্যানযোগে ব্রহ্মশক্তিকেই জগৎকারণরূপে প্রত্যক্ষ করিলেন, যে-ব্রহ্মশক্তি সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের দ্বারা প্রচ্ছন্না। সেই শক্তিরই সাহায্যে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম কাল প্রভৃতি কারণসমূহকে নিয়মিত করেন।

এই ব্যাখ্যায় শক্তিকেই জগৎকারণ বলা হইয়াছে—ব্রহ্মকে নহে। এক দিক দিয়া ইহা খুবই সমীচীন মনে হয়। কারণ, আমরা দেখিয়াছি, ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ প্রথমে জীব-জগতের কারণের অনুসন্ধান করিতেছিলেন—ঐ বিষয়ক নানা প্রশ্ন তাঁহাদের মনে জাগিয়াছিল। ঠিক তাহার অব্যবহিত পরেই বলা হইল যে, তাঁহারা সমাধিসহায়ে দেবতার স্বকীয় শক্তিকে দেখিলেন, যে ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি [সমাহিত ব্যক্তি ভিন্ন অপরের নিকট] নিগূঢ়া বা প্রচ্ছন্না। সুতরাং স্বাভাবিক অর্থ ইহাই হয় যে, ঋষিগণ তাঁহাদের অভীষ্ট কারণটিকেই আবিষ্কার করিলেন এবং সেই কারণটি হইল ব্রহ্মশক্তি।

অবশ্য এই দুইটি ব্যাখ্যা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে উভয়ের মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য পাওয়া যায় না; প্রথমটিতে ব্রহ্মের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে, দ্বিতীয়টিতে ব্রহ্মশক্তির উপর—এই মাত্র প্রভেদ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি সুপ্রসিদ্ধ কথা—'ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ।' 'কথামৃতে' এই উক্তিটি প্রায় ত্রিশবার উদ্ধৃত হইয়াছে। এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ঐ মন্ত্রটির উল্লিখিত ব্যাখ্যাদ্বয়ের মধ্যে মৌল পার্থক্য কী থাকিতে পারে!

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, এই ব্রহ্মশক্তিই কালী বা আদ্যাশক্তি, যিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন। কালী ব্রহ্মাশ্রিতা ও ব্রহ্মাভিন্না। বিষ্ণুপুরাণে আছে, 'লতাভূতা জগন্মাতা শ্রীর্বিষ্ণুর্দ্রুমসংস্থিতঃ', অর্থাৎ জগন্মাতা লক্ষ্মী-দেবী যেন লতা এবং নারায়ণ যেন বৃক্ষ—লতার আশ্রয়। কালিদাসের ন্যায় উপমাপ্রিয় কবিগণ হয়তো মাধবীলতা ও তমালতরুর

উপমা দিবেন। এই উপমা শ্রুতিমধুর ও সরস হইতে পারে এবং আশ্রিতত্বের দিক হইতে সমীচীনও বটে, কিন্তু আশ্রিতত্বের সঙ্গে সঙ্গে অভিন্নত্বের দিকটিও পরিস্ফুট করিতে হইলে অগ্নি ও অগ্নির দাহিকাশক্তি, মণি ও মণির জ্যোতি, সূর্য ও সূর্যপ্রভা, চন্দ্র ও জ্যোৎস্না, অর্থাভিধায়িকা বাক্ ও অর্থ ইত্যাদি উপমা নিঃসন্দেহে সুষ্ঠুতর। এই সকল উপমার অনেকগুলি শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং ব্যবহার করিয়াছেন এবং বিষ্ণুপুরাণেও উল্লেখিত দেখা যায়।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের পূর্বোক্ত মন্ত্রে আমরা কালীতত্ত্ব পাই, যদিও 'কালী' শব্দটির উল্লেখ সেখানে নাই; যে-অর্থে আমরা 'কালী' শব্দটি ব্যবহার করিতেছি, সেই অর্থে 'কালী' শব্দের প্রয়োগ উপনিষদ্‌গুলিতে—অন্ততঃ সুপ্রসিদ্ধ উপনিষদ্‌গুলিতে নাই।

কেনোপনিষদেও কালীতত্ত্ব আছে—সুবিখ্যাত 'উমা হৈমবতী'র উপাখ্যানে। অগ্নি ও বায়ু দেবতার পর ইন্দ্র যখন যক্ষের পরিচয় জানিতে উপস্থিত হইলেন, তখন যক্ষ অন্তর্হিত হইলেন এবং উমা হৈমবতী আবির্ভূতা হইলেন। কিন্তু কেন? যক্ষই তো স্বয়ং ইন্দ্রকে সেই কথা বলিতে পারিতেন, যে-কথা উমা ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন। ইহার তাৎপর্য—স্বামী ব্রহ্মানন্দের ভাষায়: 'মার কাছেই ব্রহ্মজ্ঞানের চাবি। মা কৃপা ক'রে চাবি দিয়ে দোর না খুললে আর উপায় নেই।'

এই উমা হৈমবতীর পরিচয় দিতে যাইয়া শংকরাচার্য লিখিয়াছেন, 'উমৈব হিমবতো দুহিতা হৈমবতী, নিত্যমেব সর্বজ্ঞেন ঈশ্বরেণ সহ বর্ততে', অর্থাৎ উমা হইতেছেন হিমালয়ের কন্যা, যিনি সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের সহিত নিত্য বর্তমান। এই উমা হৈমবতীই দুর্গা বা আদ্যাশক্তি কালী।

শ্বেতাশ্বতর ও কেন উপনিষদ্ ব্যতীত দু-একটি অপ্রসিদ্ধ উপনিষদেও (দেবী উপনিষদ্, ত্রিপুরা উপনিষদ্) কালীতত্ত্বের উল্লেখ দেখা যায়, অর্থাৎ শক্তিই যে 'বিশ্বযোনি' বা জগৎকারণ সে-কথা সরাসরিই সেগুলিতে বলা হইয়াছে।

এখন আমরা গীতায় কালীতত্ত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় কিনা, তাহা দেখিতে চেষ্টা করিব। যদিও গীতাকে পারিভাষিক অর্থে বেদান্ত বলা যায় না, তথাপি গীতায় সমস্ত উপনিষদের সার সংগৃহীত হওয়ায় আবহমান কাল ধরিয়া গীতা উপনিষদেরই ন্যায় সম্মানিত ও পূজিত। সেই দিক হইতে 'বেদান্তে কালীতত্ত্ব', এই শীর্ষকের সহিত গীতায় কালীতত্ত্বের অন্বেষণ ও আলোচনা অসমঞ্জস নহে।

গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন: 'ব্রহ্মণঃ হি প্রতিষ্ঠা অহম্'—'আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা।' আচার্য শংকর ইহার দুইটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন। একটি ব্যাখ্যার মূল কথা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ 'আমি' (অহম্) বলিতে নির্গুণ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিতেছেন এবং 'ব্রহ্মের' (ব্রহ্মণঃ) শব্দের দ্বারা সগুণ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিতেছেন। সুতরাং শ্লোকের চরণটির অর্থ হইল—নির্গুণ ব্রহ্মই সগুণ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়, অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম নির্গুণ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত। সাদা বাংলায়—নির্গুণ ব্রহ্ম ছাড়া সগুণ ব্রহ্ম দাঁড়াইতেই পারেন না! যাঁহারা কথামৃতের সহিত পরিচিত—'সগুণ ব্রহ্মকে বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে কালী বা আদ্যাশক্তি বলে গেছে', শ্রীরামকৃষ্ণদেবের

এই উক্তির সহিত পরিচিত—তাঁহাদের শংকরাচার্যের উপরি-উক্ত গীতাব্যাখ্যা শ্রবণমাত্রেই শবশিবারূঢ়া কালীমূর্তি মানসপটে উদিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। শবরূপী শিবই নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম এবং সগুণ ব্রহ্ম মা-কালী—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী জগন্মাতা—তাঁহারই উপর প্রতিষ্ঠিত। শিব না থাকিলে মায়ের দাঁড়াইবার স্থান কোথায়!

এই অবধি তত্ত্বটি সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু বিষয়টি অত সরল নহে। কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণদেব আবার একথাও বলিয়াছেন: 'প্রতিবিম্ব সূর্যই আদ্যাশক্তি। ব্রহ্মজ্ঞান যদি চাও—সেই প্রতিবিম্বকে ধ'রে সত্য সূর্যের দিকে যাও।' বলা বাহুল্য নির্গুণ ব্রহ্মই 'সত্য সূর্য'।

এইবার আমরা অদ্বৈতবেদান্তের গহনে প্রবেশ করিতেছি। অদ্বৈতবেদান্ত অনুসারে সাধারণভাবে বলা যায়, শুদ্ধসত্ত্বগুণপ্রধান মায়াতে চিৎপ্রতিবিম্বই ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন বলিতেছেন, 'সগুণ ব্রহ্মই কালী' এবং 'কালী প্রতিবিম্ব সূর্য', তখন 'কালী প্রতিবিম্ব সূর্য', এই জটিল কথাটি একান্ত দুর্বোধ্য নহে; আমরা বুঝি যে, কালী (সগুণ ব্রহ্ম) মায়াতে প্রতিবিম্বিত। প্রতিবিম্ব নিরাধার হয় না—একটা আধারেই হয়, যেমন জলাধার, দর্পণ ইত্যাদিতে। সুতরাং কালী যখন প্রতিবিম্ব, তখন সেই প্রতিবিম্বের একটি আধার প্রয়োজন। 'মায়া' সেই আধার। আবার আধার এবং প্রতিবিম্ব একই বস্তু হয় না। সুতরাং মায়া ও কালী এক বস্তু নহে। 'মায়া'র সংজ্ঞা কী? অদ্বৈতবেদান্তমতে মায়া সৎও নহে; অসৎও নহে; সৎ ও অসৎ, এই উভয়াত্মকও নহে; পরন্তু 'অনির্বচনীয়'। মহামায়া কালী সম্পর্কে আমরা এসকল কথা মুখেও আনি না। 'অনির্বচনীয়' বলিতে বাধা নাই—কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তোক্ত পারিভাষিক অর্থে নহে।

ইহা স্পষ্ট যে, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের পূর্বোক্ত মন্ত্রের দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় এবং গীতার পূর্বোক্ত শ্লোক-চরণের ব্যাখ্যায় কালীতত্ত্বের উপস্থাপনা একরূপ নহে। প্রকৃতপক্ষে এই দ্বিবিধ উপস্থাপনা দুইটি স্বতন্ত্র মতবাদ-প্রসূত। অনেকেই বলিবেন, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের মন্ত্রটির উল্লিখিত ব্যাখ্যা রামানুজীয় বা নিম্বার্কীয় মতবাদ-ঘেঁষা। কিন্তু তাহাতে কী যায় আসে! শংকরভিন্ন আচার্যদের মতবাদের সহিত আমাদের কোন বিরোধ নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, 'বেদান্ত—শংকর যা বুঝিয়েছে, তাও আছে, আবার রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও আছে।' তাই আমরা যেমন শংকরের মতবাদকে শ্রদ্ধা করি তেমনি অন্যান্য আচার্যদের মতবাদকেও শ্রদ্ধা করি। এক শাংকরভাষ্যকেই উপজীব্য করিয়াই তো আভাসবাদ প্রতিবিম্ববাদ অবচ্ছেদবাদ উপাধিবাদ ইত্যাদি কতই না বাদের উদ্ভব হইয়াছে! সকল বাদেরই সার্থকতা আছে। স্বামী তুরীয়ানন্দ লিখিয়াছেন, 'অবস্থাবিশেষে গৌড়পাদের অজাতবাদ, শংকরের বিবর্তবাদ, রামানুজের পরিণামবাদ অথবা শিবাদ্বৈতবাদ—সকলই সত্য।...তাঁহাকে লইয়াই সকল বাদ, কিন্তু তিনি বাদবিচারের পারে।'

সুতরাং প্রত্যেকটি মতবাদের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়া লওয়াই উত্তম পন্থা। সামঞ্জস্যের চেষ্টা নিষ্ফল বলিয়াই মনে হয়। মতের বিভিন্নতা চিরকালই থাকিবে। মতের বিভিন্নতায় পথের বিভিন্নতা। সামঞ্জস্য পথের শেষে।

ধর্ম ও জাতীয় সংহতি*

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর স্বামী বিবেকানন্দ ভারত ও সিংহলে (অধুনা শ্রীলঙ্কা) যে সব বক্তৃতা দিয়েছিলেন ('ভারতে বিবেকানন্দ' গ্রন্থরূপে প্রকাশিত), সেগুলি পড়লে আপনারা দেখতে পাবেন যে, প্রায় প্রত্যেকটিতেই একটি বিষয় তিনি পরিষ্কার বলেছেন—সেটি হচ্ছে এই জাতির আদর্শ। তিনি বলেছেন, এই জাতির আদর্শ—ধর্ম ও মোক্ষ। এইখানেই জাতির প্রাণশক্তি নিহিত। প্রত্যেক জাতিরই একটি জাতীয় আদর্শ থাকে। ভারত অতি প্রাচীন কাল থেকে—প্রায় তিন চার হাজার বছর আগে—মোক্ষের আধ্যাত্মিক আদর্শটিকে বেছে নিয়েছিল। তাই তিনি বলেছিলেন, আমরা যদি এই ধর্মীয় আদর্শকে ছেড়ে দিই, তাহলে এই জাতি টিঁকে থাকবে না। এখন এই আদর্শকে ছেড়ে পাশ্চাত্য দেশের কোন নতুন আদর্শকে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। যে গঙ্গা হিমালয় থেকে প্রবাহিত হয়ে এসেছে, আজ তার গতি পরিবর্তন করে একটা নতুন খাতে বইানো যায় না। ঠিক সেইরকম—ভুল হোক বা ঠিক হোক, বহুপূর্বেই আমরা এই আদর্শকে বেছে নিয়েছিলাম। এখন এ আদর্শ বর্জন করে অন্য কোন আদর্শ বরণ করলে তা হবে সাংস্কৃতিক আত্মহনন। তাছাড়া, তিনি বলেছেন, এই আদর্শ তো ভ্রান্ত নয়। গত তিরিশ চল্লিশ শতাব্দী ধরে এই আদর্শই আমাদের বেঁচে থাকার সহায়ক হয়েছে। অন্যান্য জাতি অন্যান্য আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অল্পকাল প্রাণবন্ত জীবন যাপন করে জগৎ থেকে বিলীন হয়ে গেছে, কিন্তু ভারতবর্ষ বেঁচে রয়েছে এই মহান আদর্শ—এই ধর্মাদর্শের জন্যই। যদি ভারত আবার বেঁচে উঠে এক মহান জাতিতে পরিণত হতে চায় তাহলে—তিনি জোর দিয়ে বলেছেন—ধর্মের এক মহান পুনরুজ্জীবন অত্যাবশ্যক।

হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে স্বামীজী যখন আমেরিকার ধর্ম-মহাসভায় গেলেন, তাঁকে বিপুল অভিনন্দন জানান হলো আর মহাসভায় সবাই তাঁর কথা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলেন। তারপর সর্বত্র চলল অভিনন্দনের পর অভিনন্দন। অপরিসীম আগ্রহের সঙ্গে সবাই তাঁর বাণীকে গ্রহণ করল। তাঁর সম্বন্ধে অনেক কিছুই পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি ভারতেও পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

পাশ্চাত্যে স্বামীজীর আত্মপ্রকাশ সম্বন্ধে মহামনীষী শ্রীঅরবিন্দ বলেন—একদিন পৃথিবীটাকে দু'হাতের মধ্যে নিয়ে তার পরিবর্তন ঘটাতে বিধিনির্দিষ্ট এক বীরপুরুষরূপেই তিনি তাঁর প্রভুর দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিলেন এবং বিবেকানন্দের অভিযাত্রার প্রথম সুস্পষ্ট সংকেত দেখা গেল যে ভারত জেগেছে—শুধু বেঁচে থাকার জন্যই নয়—সমস্ত জগৎকে প্রেম, মৈত্রী ও শান্তির দ্বারা জয় করবার জন্য। পারমাণবিক বোমা বা সৈন্য-

* বাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ আশ্রমে এপ্রিল ১৯৭৮-এ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষের ইংরেজী আশীর্ভাষণের স্বামী জয়দেবানন্দ-কৃত অনুবাদ। মূল আশীর্ভাষণটি Vedanta Kesari পত্রিকায় জুন ১৯৭৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।—সঃ

বল নয়, ত্যাগ ও প্রেম, শান্তি ও মৈত্রী—ধর্মের এইসব মহান আদর্শ সকল জাতির মধ্যে প্রচার করেই এই জয় অর্জন করতে হবে। স্বামীজী বলেছেন, অতীতে যখনই প্রয়োজন হয়েছে ভারত বারংবার জগৎকে এই উপহার দিয়ে এসেছে। যখনই বিশ্বের প্রয়োজন হয়েছে তখনই ভারত এইসকল আদর্শ—ধর্মের এই সঞ্জীবনী সুধা—অন্যান্য দেশে নিয়ে গেছে, জয়লোভে নয়, করুণাপরবশ হয়ে—শিশিরবিন্দু যেমন সকলের অগোচরে ঝরে পরম সুন্দর ফুল-গুলিকে প্রস্ফুটিত করে। অন্য সব বড় বড় দেশ সৈন্যবলের দাপটে রক্তের নদী পার হয়ে তাদের আদর্শগুলি প্রচার করেছে। কিন্তু ভারত কোন দিনই কোন দেশবিজয়ে যায়নি, কোন দেশের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করেনি। তার বিজয় ছিল শুভেচ্ছা প্রেম ও শান্তির দ্বারা সাংস্কৃতিক বিজয়। যে ধর্মাদর্শ ভারতবর্ষ বহুশতাব্দী ধরে পোষণ ও বিকিরণ করেছে তার দ্বারা ভারত বার বার জগৎকে অধর্ম বা জড়বাদের কবল থেকে রক্ষা করে এসেছে। এখনও সে আবার তাই করছে। পাশ্চাত্য জড়সভ্যতা প্রায় পতনোন্মুখ, অনেক ঠেকা দিয়েও তাকে ভাঙ্গনের হাত থেকে খাড়া রাখা যাচ্ছে না। এখন প্রয়োজন হচ্ছে এক নতুন ধর্মবাণী যা তার মধ্যে নতুন জীবন সঞ্চারিত করবে। আবার ভারতই হবে এই বার্তাবহ।

হাজার বছরের নিদ্রাচ্ছন্ন ভারতে যখন শিকাগো ধর্ম-মহাসভায় স্বামীজীর সাফল্যের সমাচার এসে পৌছোল তখন ভারত জেগে উঠল,—দেখল যে সে ভিক্ষুক নয় যে সর্বদাই গ্রহণ করে যাবে; বরং তার কাছেও এমন একটি সম্পদ আছে যা বেঁচে থাকার জন্য আজ জগতের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন, পৃথিবীকে চলতে হলে, বাঁচতে হলে ভারতের আদর্শ, ভারতীয় জীবনধারার মতো একটা কিছু তাকে গ্রহণ করতেই হবে। আধুনিক প্রায় সব লেখাতেই কিছু-না-কিছু ভারতীয় আদর্শ, বিশেষতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের কথা, আছে। এতে বোঝা যায় যে ধর্মের ক্ষেত্রেই ভারতের প্রথম জাগরণ।

পূর্বে ধর্মান্দোলন যে একেবারেই হয়নি এমন নয়—বাংলা, পাঞ্জাব, বোম্বাই এবং অন্যত্রও হয়েছে। কিন্তু সেগুলি ছিল একান্তই স্থানীয় আকারের—জাতীয় পর্যায়ে পড়ে না। পাশ্চাত্যে স্বামীজীর সাফল্যই সমস্ত দেশটাকে জাগিয়ে দিয়েছে এবং ধর্মের ক্ষেত্রে ঘটিয়েছে এক বিরাট অভ্যুত্থান। যদিও এটা ছিল ধর্মের ক্ষেত্রে, তবু তদানীন্তন বৃটিশ শাসককুল এই মহা-জাগৃতিকে সন্দেহের চোখে দেখল; কারণ একবার কোন ক্ষেত্রে দেশ জাগ্রত হলে অন্যান্য ক্ষেত্রেও সে দেশ জেগে উঠবে। তারা ভয় পেল—ধর্মের ক্ষেত্রে এই জাগরণ রাজ-নীতির ক্ষেত্রেও প্রসারিত হতে পারে এবং জনসাধারণ রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সচেষ্ট হতে পারে। শেষ পর্যন্ত হলোও তাই। যদিও ইংরেজ সরকার এবং সরকারের পক্ষপাতী পত্রিকাগুলো স্বামীজীর সমালোচনা করেছিল, হিন্দুধর্মকে খাটো করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারা কিছুই করতে পারেনি। এমন কি ভারতীয়দের মধ্যেও কিছু লোক স্বামীজীর দুর্নাম করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু যে ভারত জেগে উঠেছে তাকে আর ঘুম পাড়ান গেল না। সমস্ত ভারত জুড়ে বহু ধর্মসভা হলো, ধর্মসমিতি গড়ে উঠল, সমস্ত দেশে ধর্মের একটা উদ্দীপনা এলো। এই ধর্মীয় জাগরণ থেকে সৃষ্টি হলো রাজনৈতিক চেতনার—শুরু হলো জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম। জন্ম নিল কংগ্রেস এবং পরিশেষে পেলাম আমরা রাজনৈতিক

স্বাধীনতা।

কিন্তু এখন আরেকটি ক্ষেত্রে আমাদের স্বাধীন হতে হবে, তা হচ্ছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্র। অর্থনৈতিক দিক থেকে জনগণের একটা বিরাট অংশ এখনও স্বাধীন নয় এবং তাদের চাই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য এই সংগ্রাম সমগ্র ভারতে চলছে। প্রাচীন ভারতে মানুষ—রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন, শিক্ষা—সব কিছুই ধর্মের ভিত্তিতে সংগঠিত করেছিল। আমাদের ছিল নিজস্ব রাজনীতি এবং সামাজিক বিধিবিধান। কিন্তু সেগুলি সবই ছিল এক মহান আদর্শের ওপর নির্ভরশীল—সে আদর্শ চরম মুক্তি বা মোক্ষের আদর্শ। এইভাবেই ছিল আমাদের সমাজের সংগঠন।

আমরা যদি মনু, যাজ্ঞবল্ক্য এবং অন্যান্যদের লেখা স্মৃতিগ্রন্থাদি পাঠ করি—'অধিকার' এই শব্দটি কোথাও পাব না। প্রত্যেকটি গ্রন্থে 'কর্তব্যে'র কথাই বলা হয়েছে—'অধিকার'-এর কথা কদাপি নয়। কিন্তু আমাদের আধুনিক সংবিধানে 'মৌল অধিকার'-এর কথা আছে। 'মৌল অধিকার' আমাদের অত্যন্ত স্বার্থপর করে তুলেছে। আমরা সর্বদা নিজেদের অধিকার দাবি করছি, কিন্তু অন্যের অধিকারের দিকে নজর দিই না, যা আমাদের কর্তব্য। দেখুন, 'মৌল অধিকার' কথাটি অল্পবিস্তর পাশ্চাত্য ভাব। ভারতে সর্বদাই ছিল কর্তব্য ও সেবা।

প্রাচীন প্রচলিত প্রথায় জীবনের চারটি অবস্থার কথাই ধরুন—যথা ব্রহ্মচর্যাশ্রম, গার্হস্থ্যাশ্রম, বানপ্রস্থাশ্রম ও সন্ন্যাসাশ্রম। প্রথম তিনটির ব্যবস্থা এমন ছিল যাতে মানুষ ধীরে ধীরে সেগুলির মধ্যে দিয়ে গিয়ে চতুর্থাশ্রম—সন্ন্যাস বা সর্বস্বত্যাগের দ্বারা জীবনের মহান লক্ষ্য—মোক্ষ অর্থাৎ অজ্ঞান ও দুঃখের কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করতে সমর্থ হতো। সমস্ত জীবনটাই শাস্ত্রীয় আদর্শে নিয়ন্ত্রিত হতো। বিদ্যার্থীদের যেতে হতো সংসারের সমস্ত আলোড়ন থেকে মুক্ত অরণ্যাশ্রমে—গুরুগৃহে। তাদের নীতিপরায়ণ জীবনযাপন, অধ্যাত্মসাধনা, ব্রহ্মচর্যপালন ও শ্রদ্ধা-সহকারে গুরুর সেবা করতে হতো। তাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস পোষণ করতে হতো, যাতে করে তারা গুরুদত্ত বিদ্যা ঠিক ঠিক মনে গেঁথে নিতে পারতো। এইভাবে ছাত্রজীবন হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধ্য। আজকালের মত নয় যে দল বেঁধে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবে, চিৎকার করে দলের বাঁধাবুলি আওড়াবে আর জিনিসপত্র ভেঙ্গে তছনছ করবে। যাই হোক, তারা ভাঙছে আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। এতে ক্ষতি কার হচ্ছে? দেশেরই ক্ষতি। এটা তারা বুঝতে চায় না। তারা মনে করে এটা সরকারের সম্পত্তি যা তারা নষ্ট করছে। সরকারী সম্পত্তি ত জাতীয় সম্পদ—যখন নষ্ট হয় জাতিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রাচীন কালে এসব একেবারেই সম্ভব হতো না, কেননা কতকগুলি 'কর্তব্যবোধ'ই ছাত্রজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করত, 'অধিকার' কখনোই নয়। আজকাল আমরা শুধু দাবির কথাই বলি। তাই ছাত্রসমাজে এত শৃঙ্খলাহীনতা দেখা যাচ্ছে

শিক্ষাজগতে আজ এত বিশৃঙ্খলা—বিশৃঙ্খলা বিশ্ববিদ্যালয়ে, মহাবিদ্যালয়ে, বিদ্যালয়ে—সর্বত্র। তার কারণ কর্তব্যের পরিবর্তে শুধু দাবির ওপর অসংগত জোর দেওয়া আর 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র অছিলায় আমাদের জাতীয় ধর্মাদর্শকে পরিত্যাগ করা। প্রাচীনকালে আমাদের ছাত্রজীবন ছিল অনেক সুশৃঙ্খল।

ছাত্রকে ৮ বছর বয়সে গুরুগৃহে গিয়ে প্রায় ১৫ বছর কাটিয়ে ২৩ বছর বয়সে ফিরে এসে বিবাহ করে গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করতে হতো। গার্হস্থ্য আশ্রমটি কেমন ছিল? এটি মোটেই ভোগসর্বস্ব ছিল না। গৃহস্থের জন্যও ছিল কতকগুলো কর্তব্যের অনুশাসন —কীভাবে সমাজে চলতে হবে, কীভাবে অতিথি-সৎকার করতে হবে, কীভাবে সমাজের মঙ্গলের জন্য অর্থব্যয় করতে হবে ইত্যাদি। সমগ্র গৃহস্থজীবনে গুরুত্ব আরোপ করা হতো প্রথমত সমাজসেবা, তারপর পরিবার, সর্বশেষে নিজের ব্যক্তিগত সুখ-ভোগের ওপর। কিন্তু আজকের জীবনে সেবাদর্শের কোন বালাই নেই; আছে শুধু ভোগবাসনা। দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, বাবা মা যখন খুশি, যেখানে খুশি, ক্লাবে সিনেমায় যাচ্ছেন আর তাঁরা আশা করেন সন্তানেরা সব সাধুচরিত্রের হবে—এটা একেবারেই অসম্ভব। সন্তানদের জন্য সুপরিবেশ আপনাদেরই সৃষ্টি করতে হবে এবং এ থেকেই তারা আপনাদের প্রত্যাশিত ভাবগুলি গ্রহণ করতে সমর্থ হবে। বাড়িতে এবং বিদ্যালয়ে যদি পরিবেশ ঠিক না থাকে, সন্তানদের অসদাচরণ বা আদর্শহীনতার জন্য দোষ দিতে পারেন না। আপনাদের আদর্শ জীবন যাপন করতে হবে যেমন প্রাচীন ভারতে আরণ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং গৃহে আদর্শ জীবন যাপন করা হতো। গৃহস্থাশ্রমকে মনে করা হতো ত্যাগের আশ্রম, সমাজের প্রধান খুঁটি; কারণ অন্যান্য আশ্রমগুলি—ব্রহ্মচর্যাশ্রম, বানপ্রস্থাশ্রম ও সন্ন্যাসাশ্রম—এই গৃহস্থাশ্রমের ওপর নির্ভরশীল ছিল। সমাজজীবনের প্রধান অবলম্বন ছিলেন গৃহস্থ এবং তাঁকে অনেক রকমের কর্তব্য পালন করতে হতো। গৃহস্থাশ্রম ও সন্ন্যাসের মধ্যবর্তী ছিল বান-প্রস্থাশ্রম। সর্বশেষে সন্ন্যাস—মোক্ষলাভের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ। এইভাবেই প্রাচীনকালে মহান ধর্মীয় আদর্শের সঙ্গে সুরসঙ্গতি বজায় রেখে গড়ে উঠেছিল সমাজ।

একইরূপে ছিল জীবনের চারটি নৈতিক মূল্য—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ। ধর্ম কী? সদাচারই ধর্ম, অর্থাৎ শাস্ত্রের অনুশাসন অনুযায়ী নিষ্কামভাবে নিজ নিজ কর্তব্য পালনই ধর্ম। কামনার বশবর্তী হয়ে কর্ম করাকে ধর্ম বলে না এবং শাস্ত্রে নিষিদ্ধ কর্মও বর্জনীয়। এই হচ্ছে ধর্ম, এই সদাচার। ধর্মের এই আদর্শ পালন করা প্রত্যেকের কর্তব্য ছিল। অতীত ভারতে মহাপুরুষগণ এই মহান ধর্মাদর্শ যথাযথভাবে পালন করে গেছেন—যেমন শ্রীরামচন্দ্র ভীষ্ম পাণ্ডবগণ প্রমুখ। আবার শুকদেবাদি পালন করে গেছেন মহান ত্যাগের ব্রত। সামাজিক কাঠামোটির ভিত্তিভূমি ছিল সদাচার।

ধর্মের পর অর্থ। অর্থও প্রয়োজন। অর্থের প্রয়োজনীয়তা কেউই অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু অর্থ উপার্জন সৎভাবেই করতে হতো এবং অর্থ উপার্জনই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং কাম্য ছিল না। শাস্ত্রের অনুশাসন দ্বারাই এটি নিয়ন্ত্রিত হতো। আবার 'কাম' অর্থাৎ বাসনা-কামনা চরিতার্থ করারও সুযোগ-সুবিধা ছিল; তবে তার উপায়গুলোও ছিল শাস্ত্রীয় অনুশাসনের দ্বারা সীমিত। কেউ যথেচ্ছ ইন্দ্রিয়োপভোগ করতে পারত না। প্রত্যেকেই কিছু কিছু জাগতিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় এবং কিছু কিছু ভোগ করতে পারত কিন্তু সেগুলি ছিল ধর্মাদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পরিশেষে মোক্ষ, যা কেউ কখনোই বিস্মৃত হতো না। জীবনের প্রতি কাজেই

একথাটা মনে রাখতে হতো। এই ছিল চারটি নৈতিক মূল্য।

এছাড়া ছিল চারটি বর্ণ—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র। ব্রাহ্মণরা ছিলেন বুদ্ধিজীবী—সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, ক্ষত্রিয়েরা সংস্কৃতিকে রক্ষা করতেন, বৈশ্যরা দেশকে সমৃদ্ধ করতেন, আর শূদ্ররা ছিলেন দেশের সম্পদ-উৎপাদনকারী শ্রমিকশ্রেণী। কাজেই তাঁরা সকলেই সমানভাবে দেশের পক্ষে সমাজরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ছিলেন। পরে অবশ্য কোন কোন বর্ণকে কতক কতক বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হলো—যা মূল আদর্শের মধ্যে ছিল না। গোড়াকার ভাবটি ছিল—প্রত্যেকে নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী সমাজকে যা দিতে পারেন তা দেবেন। প্রত্যেককেই যথাশক্তি সমাজসেবা করতে হতো। এবং যাঁর যা প্রয়োজন তা তাঁর প্রাপ্য ছিল। আমার মনে হয় এটি সমাজতন্ত্রের একটি মূল-তত্ত্ব। প্রত্যেককেই সমাজসেবা করতে হতো। ব্রাহ্মণকেও সমাজসেবা করতে হতো। কেবল-মাত্র কতকগুলো সুযোগ গ্রহণের অধিকার তাঁদের ছিল না। ব্রাহ্মণদের কতকগুলো নির্দিষ্ট আচারগত আদর্শ মেনে চলতে হতো। তা যদি তাঁরা না করতেন তাঁদের ব্রাহ্মণ বোলে গণ্য করা হতো না। ক্ষত্রিয়দেরও কতকগুলি সামরিক আদর্শ মেনে চলতে হতো। বৈশ্যরা বিদেশে গিয়ে ব্যবসার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতেন; কিন্তু ভিত্তি ছিল নীতিপরায়ণতা। ঠিক সেইরকম শ্রমিকেরা বিদেশে রপ্তানী-যোগ্য দ্রব্যাদি উৎপন্ন করে দেশকে সমৃদ্ধিশালী করতেন। তাঁরাও ছিলেন সমাজের কাঠামোর সমান অঙ্গ; তাঁরা অবহেলিত ছিলেন না—যেমনটা পরে হয়েছে। এদের অবহেলা করেই সমাজের পতন হয়েছে। উচ্চবর্ণের ব্যক্তিগণ জনসাধারণ থেকে নিজেদের পৃথক্ করে জনগণকে সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান থেকে বঞ্চিত করলেন।

স্বামীজী বলেছেন—তার ফল হল হাজার বছরের দাসত্ব। কারণ, দেশে কী ঘটছে জনসাধারণ জানতে কখনো উৎসুক ছিলেন না। কিন্তু এখন—স্বামীজী যেমন চেয়েছিলেন—তাঁদের অর্থনৈতিক পরাধীনতা থেকে মুক্ত ও উন্নত করার চেষ্টা চলছে। এই হচ্ছে আমাদের কর্তব্য। বর্তমান সমাজ-সেবীরাও পরার্থপর। এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁরা পাশ্চাত্য জড়বাদের ভাবে ভাবিত। তাঁরা শুধু বাহ্যিক এবং অর্থনৈতিক স্তরেই কাজ করে থাকেন কিন্তু সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ভূমিতে নয়। এই হচ্ছে আধুনিকতার ত্রুটি।

তাই স্বামীজী বলেছেন—আমি একজন সমাজতন্ত্রবাদী। তার অর্থ এই নয় যে সমাজতন্ত্র সর্বরোগহর; কারণ, নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। অর্থনৈতিক উন্নতি—অর্ধেক সমাধান। জনসাধারণকে শুধু জাতীয় সম্পদের যথাযোগ্য অংশভাগী করলেই হবে না, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পদের অংশও তাদের দিতে হবে যা—আমাদের পূর্বপুরুষগণের প্রযত্নে ক্রমবিকশিত হয়েছিল। তাই স্বামীজী উচ্চবর্ণের উদ্দেশে একটি লেখায় বলেছিলেন—'তোমরা হচ্চ দশ হাজার বচ্ছরের মমি!!… এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরু-মরীচিকা তোমরা — ভারতের উচ্চ-বর্ণেরা!…তোমাদের অস্থিময় অঙ্গুলিতে পূর্ব-পুরুষদের সঞ্চিত কতকগুলি অমূল্য রত্নের অঙ্গুরীয়ক আছে, তোমাদের পূতিগন্ধ শরীরের আলিঙ্গনে পূর্বকালের অনেকগুলি রত্নপেটিকা রক্ষিত রয়েছে। এতদিন দেবার সুবিধা হয়

নাই। এখন ইংরেজ রাজ্যে—অবাধ বিদ্যাচর্চার দিনে উত্তরাধিকারীদের দাও, যত শীঘ্র পার দাও। তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধ'রে চাষার কুটির ভেদ ক'রে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।'

—একথা সমাজতান্ত্রিক অভ্যুত্থানের আহ্বান ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্য জায়গায় স্বামীজী বলেছেন—আমি এমন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না যিনি এখানে আমাকে এক টুকরা রুটি দিতে অক্ষম অথচ স্বর্গে অনন্ত সুখ দিতে সক্ষম।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিঃসন্দেহে প্রয়োজন, কিন্তু একমাত্র সেটিই যথেষ্ট নয়। ঠিক এই ভাবটি স্বামীজী প্রচার করতে চেয়েছিলেন। যদি এই সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সত্যগুলো জাতির কাছে, বিশেষ করে দরিদ্র জনগণের কাছে, তুলে ধরা যায় তাহলেই আসবে বিরাট নবোন্মেষ এবং ভারতের সে নবজাগরণ হবে অভূতপূর্ব।

আর একটি মহান আদর্শ যার ওপর স্বামীজী জোর দিতেন তা হলো প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সমন্বয়ের ভাবটি। প্রাচীন যুগে এক মহর্ষি ঘোষণা করেছিলেন—'একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। (সত্য এক, পণ্ডিতেরা তাঁকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করে থাকেন)। সেই সময় থেকেই এই আদর্শ জাতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার একটি মুখ্য প্রবাহরূপে চলে আসছে। এই প্রাচীন ধারাটি বর্তমান কাল পর্যন্ত অব্যাহত। মহান আচার্য ও অবতারগণ এই বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ভগবদ্গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ এই মহান সত্য ও সমন্বয়ের আদর্শের ওপর জোর দিয়েছেন। আনুমানিক সপ্তম শতাব্দীতে আচার্য শঙ্করও এই সমন্বয়ের আদর্শ প্রচার করে গেছেন। পঞ্চদেবতাপূজার প্রবর্তক এবং প্রচারকও তিনি। যে কোন দেবতার পূজায় প্রারম্ভে এই পঞ্চদেবতার পূজা বিধেয়। যে পাঁচটি ধর্মসম্প্রদায় ভারতে একদা বর্তমান ছিল এই পঞ্চদেবতা তাঁদেরই প্রতীক। সর্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে না হলেও কার্তিকেয় ছিলেন ষষ্ঠ দেবতা। এজন্য শঙ্করকে বলা হয়—'ষণ্মতস্থাপকাচার্য'—অর্থাৎ ছয়টি সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। বস্তুতঃ এখন সারা দেশে কেবল পঞ্চদেবতার পূজাই প্রচলিত; এবং শঙ্করই এটি লোকপ্রিয় করে তোলেন।

বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ আবার সর্বধর্মের ঐক্য ও সমন্বয়ের আদর্শের ওপর জোর দিয়েছেন। শুধু প্রচারের দ্বারা নয়, হিন্দুধর্মের নানা সম্প্রদায় ও বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের অনুশাসনাবলী তিনি নিজ জীবনে অনুশীলন করেছেন। তিনি বিভিন্ন সাধন দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে সমস্ত আধ্যাত্মিক পথগুলি একই লক্ষ্যে নিয়ে যায়। এই উপলব্ধি তাঁর অপরোক্ষ অনুভূতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাই বিজ্ঞানসম্মত; কেননা আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ বোলে গণ্য। এই মহান তত্ত্বই আজ আমাদের দেশে প্রয়োজন।

আমাদের সংবিধান বলে, আমাদের রাষ্ট্র 'ধর্মনিরপেক্ষ'। 'ধর্মনিরপেক্ষ' বলতে কী বোঝায়? দেখুন, এটি একটি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী। আমাদের বলা উচিত ছিল যে আমরা সব ধর্মই মানি—যেমন সম্রাট অশোক

বলেছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন বৌদ্ধ। কিন্তু জৈন ও হিন্দুধর্মকেও তিনি সত্য বলে স্বীকার করেছিলেন। যদিও তিনি বৌদ্ধ ছিলেন তবু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য মঠ ও মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে কিছু ছিল না। অশোক সকল ধর্মকেই মেনে নিয়েছিলেন। আজ আমাদের রাষ্ট্র 'ধর্মনিরপেক্ষ', যার পরিণতি এই যে আমাদের কোন ধর্ম নেই। স্কুলে আমাদের ছেলে-মেয়েদের ধর্মশিক্ষা দিতে পারি না, কারণ তা আমাদের সংবিধান ও 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র বিরোধী। বোধ হয় এইমাত্র তাঁরা বুঝছেন যে, এ একটা অদ্ভুত অবস্থা। সম্ভবত তাঁরা এখন স্কুল-কলেজে ধর্মশিক্ষার অনুমতি দিচ্ছেন।

'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি নেতিবাচক। বরং এভাবে বলা ভাল—'আমরা সকল ধর্মকেই সত্য বলে মনে করি এবং ধর্মের জন্য মানুষে মানুষে প্রভেদ করব না।' সেইটাই হতো সঠিক বিবৃতি—যেমন মৌল অধিকারের বদলে মৌল কর্তব্যের বিধান দেওয়াই উচিত ছিল। প্রাচীন ভারতে শুধু চারটি আশ্রমের জন্য কর্তব্য নির্ধারিত ছিল না; চারটি বর্ণের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য ছিল। সমস্ত জীবনই ছিল কতকগুলো কর্তব্যের সমষ্টি। যেমন স্বামীজী বলতেন, ত্যাগ ও সেবাই ভারতের আদর্শ। আমরা যা কিছু করতাম তাতে আমাদের ত্যাগের শিক্ষা দেওয়া হতো। আবার সমস্ত কর্মের মাধ্যমে শিখতে হতো সমাজসেবা। আধুনিক ছাঁচে ঢালা না হলেও এগুলি ছিল মহান সমাজতান্ত্রিক আদর্শ।

ভারতীয় সমাজের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সমাজতান্ত্রিক। কিন্তু কালক্রমে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। পুরোনো রীতিনীতিগুলো এখন বীভৎস মনে হয়। কিন্তু গোড়াতে এটি ছিল একটি অতি উন্নত ব্যবস্থা যাতে সকলে অন্যের স্বার্থ প্রথমে এবং সর্বশেষে নিজের স্বার্থ চিন্তা করত। আর এখন প্রত্যেকেই নিজেকে সর্বপ্রথমে এবং অপরকে সর্বশেষে স্থান দেয়। এইখানেই বর্তমান শাসনতন্ত্র এবং প্রাচীন স্মৃতির পার্থক্য।

আজকের দিনে দেশে আমাদের প্রয়োজন—এই সব মহান আদর্শ—প্রাচীন ভারতের সমাজতান্ত্রিক আদর্শ, মোক্ষের আধ্যাত্মিক আদর্শ, ত্যাগ ও সেবার ভাব, এবং সমস্ত পথই ভগবানলাভের বিভিন্ন পথ—এই সমন্বয়ী দৃষ্টি-ভঙ্গী। আমাদের দেশকে বিরাট জাতিরূপে সংহত করার জন্য এই সবই প্রয়োজন।

আমাদের দেশে বিভিন্ন নৃকুলের, বিভিন্ন ধর্মের মানুষের বাস; আমাদের নানা ধর্ম-সম্প্রদায়। যদি এঁদের সকলকে একজাতি-সূত্রে গ্রথিত করতে হয় তবে তা এই নীতি মেনে নিয়েই করতে হবে যে ধর্মের সকল পথই সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণের এই বাণী স্বামীজী প্রচার করে গেছেন। এটি বাদ দিয়ে দেশে জাতীয় সংহতি আনা খুব কঠিন।

জাতীয় সংহতির কথা আমরা বলি বটে; শূন্য থেকে জাতীয় সংহতি কখনো আসতে পারে না। সর্বপ্রথমে চাই একটি সর্বাবগাহ আদর্শ, সকল আদর্শই যার অন্তর্ভুক্ত। তারপর চাই সেই আদর্শ রূপায়ণের জন্য মিলিত প্রচেষ্টা। পরে আসবে সাফল্য। একমাত্র এইভাবেই জাতীয় সংহতি সম্ভব।

এই সাধারণ আদর্শটি কী? স্বামীজী দেখিয়েছেন—এইটি হচ্ছে ধর্ম যা সমন্বয়ের ভাবের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কেবলমাত্র এইটি জাতিকে সংহত করতে পারে। স্বামীজী ছিলেন একটি বহুমুখী হীরকখণ্ড—যে দিক দিয়ে দেখা যাক না কেন সেই দিকই দীপ্যমান

দেখায়। আজকের দিনে কেউ কেউ ভাবেন—স্বামীজী ছিলেন একজন মহান দেশপ্রেমিক, কেউ ভাবেন তিনি একজন বড় কবি, একজন সমাজসংস্কারক বা একজন শিক্ষাবিদ্ ইত্যাদি। আসলে স্বামীজী ছিলেন এ সবই, আবার তারও বেশি। তিনি ছিলেন ঋষি, সত্যদ্রষ্টা এবং ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ। স্বানুভূতির সেই উচ্চভূমিতে দাঁড়িয়ে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিক তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং আত্মশক্তি ও আত্মজ্যোতির আলোকে জাতীয় জীবনের প্রত্যেক স্তরকে পুনরুজ্জীবিত ও সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন সেই আত্মজ্যোতি জাতীয় জীবনের বিভিন্ন স্তরে বিকীর্ণ করতে যাতে ঐ মহান আদর্শ অনুসরণ করে দেশ নবজীবন লাভ করতে পারে। এইটাই তিনি করতে চেয়েছিলেন।

আমরা যদি স্বামীজীকে জানতে চাই—শুধু তাঁর বই পড়ে তা হবে না। তিনি ধ্যান-গম্য। ধ্যানের গভীরে তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়ে আমরা তাঁর মহত্ত্ব, তাঁর বাণী অনুধাবন করতে সক্ষম হব। এক সময়ে স্বামীজী বলেছিলেন—যদি আর একটা বিবেকানন্দ থাকত তবে এই বিবেকানন্দ কী করেছে বুঝতে পারত। স্বামীজীর সম্যক্ মূল্যায়ন আমাদের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। স্বামীজী পৃথিবীতে এসেছিলেন জগৎকে দিতে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী, বিশ্বময় তা ছড়িয়ে দিতে, যার ফলে এই দেশটা এক মহান জাতি হয়ে উঠতে পারে। স্বামীজীর অধিগত ও প্রচারিত শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর মাধ্যমেই ভারত বড় হতে পারবে। যত শীঘ্র এ বাণী আমরা গ্রহণ করব এবং সে অনুসারে দেশকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করব ততই এদেশের মঙ্গল। অন্যথায় বৃথাই আমরা এদিক ওদিক ঘুরে মরব এবং নানা বিধ্বংসী আন্দোলনে সামর্থ্য সময় ও সম্ভবত সম্পদ—সবই খোয়াব। আমরা যদি তাঁর পথ অনুসরণ করি, যদি স্বামীজীর প্রচারিত আদর্শ অবলম্বন করে দেশ গড়ার কাজে লাগি তবেই এ দেশের আশা-ভরসা।

একবার স্বামীজী বলেছিলেন—'শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতাত্মা এবং ভারত শ্রীরামকৃষ্ণেরই।' সমস্ত দেশের একীকরণের শক্তিস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁরই পতাকাতলে নানা ধর্ম, সমস্ত সম্প্রদায়াদি এক মহাজাতিরূপে সম্মিলিত হবে। তিনিই হচ্ছেন মিলনসূত্র, জাতির কেন্দ্রমণি। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে আচরিত এবং স্বামীজী কর্তৃক জগতে প্রচারিত মহান আদর্শগুলিই আমাদের নতুন ভারত গঠনে সাহায্য করবে। যত শীঘ্র এগুলো আমরা গ্রহণ করব, ততই আমাদের মঙ্গল। স্বামীজীর করুণা আমাদের উপর বর্ষিত হোক—যেন আমরা তাঁর বাণীর মর্ম গ্রহণ করতে পারি এবং তিনি যে পথ আমাদের দেখিয়েছেন সেই পথে যেন আমরা আমাদের দেশকে পুনরুজ্জীবিত করার কাজ করতে পারি।

দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়

ডক্টর রমা চৌধুরী

(নবম পর্যায়)

শ্রীপতির 'বিশেষাদ্বৈতবাদ'

[ভাদ্র ১৩৮৫ সংখ্যার পর]

শ্রীপতির মতে 'ভেদ' ও 'অভেদে'র সহাবস্থিতি যে সম্পূর্ণরূপেই সম্ভব ও যুক্তিযুক্ত এবং সেজন্য 'ভেদাভেদবাদ'ও যে সম্পূর্ণরূপেই গ্রহণযোগ্য, নিম্নোক্ত এই দশটি সম্ভাব্য আপত্তি খণ্ডনের মাধ্যমেই তা অনায়াসে প্রমাণিত করা যায়:

(১) 'বস্তু-বিরোধাদ্বা'—প্রথমতঃ, যদি বলা হয় যে, ভেদ ও অভেদ পরস্পরবিরোধী; কারণ, তাদের স্বরূপ বা স্বভাবই বিপরীত, এবং সেজন্য 'ভেদাভেদবাদ' অযৌক্তিক, তা হ'লে তার উত্তর হ'ল এই:

ভেদ ও অভেদ বিপরীতস্বভাব হ'লেও তাদের সহাবস্থিতি অবশ্যস্বীকার্য। কারণ, প্রথমতঃ, অদ্বৈতাত্মক ব্রহ্ম ও দ্বৈতাত্মক বিশ্বপ্রপঞ্চের সম্বন্ধ আধার-আধেয়, সাক্ষি-সাক্ষ্য, কারণ-কার্য, অনুপ্রবেশক-অনুপ্রবেশয়িতব্য, ভাসক-ভাস্য প্রভৃতি সম্বন্ধ। অর্থাৎ, ব্রহ্ম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আধার বা আশ্রয়; বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মের আধেয় বা আশ্রিত বস্তু। ব্রহ্ম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষী বা দ্রষ্টা; বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মের সাক্ষ্য বা দ্রষ্টব্য বস্তু। ব্রহ্ম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কারণ বা স্রষ্টা; বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মের কার্য বা সৃষ্ট বস্তু। ব্রহ্ম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনুপ্রবেশক; অর্থাৎ তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অনুপ্রবেশ করেছেন, যে কথা বহু শাস্ত্রগ্রন্থে বলা আছে—যথা,

'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ'

(তৈত্তিরীয়োপনিষদ ২।৬)

'তিনি তা সৃষ্টি ক'রে তাতেই অনুপ্রবেশ করলেন।'

—এবং, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হ'ল তাঁর সেই অনুপ্রবেশের বস্তু বা স্থান। ব্রহ্ম ভাসক বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে উদ্ভাসিত ক'রে রেখেছেন।

'তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।'

(কঠোপনিষদ ২।২।১৫; শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ ৬।১৪; মুণ্ডকোপনিষদ ২।২।১০)

'তিনি দীপ্তি পেলেই সকলে দীপ্তি পায়; তাঁরই দীপ্তিতে সকলে উদ্ভাসিত।'

—এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভাস্য, বা তাঁর দ্বারা উদ্ভাসিত বস্তু। কিন্তু যিনি এইভাবে যাকে আশ্রয় দেন, যাকে দর্শন করেন, যাকে সৃষ্টি করেন, যাতে অনুপ্রবেশ করেন, এবং যাকে উদ্ভাসিত করেন—তার থেকে ভিন্ন হলেও তার সঙ্গে সহাবস্থান ত তাঁর করতেই হবে; তা না হ'লে তাকে আশ্রয়দান, তাকে দর্শন প্রভৃতি কর্ম তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হবে কিরূপে? একই ভাবে অদ্বৈতাত্মক ব্রহ্ম ও দ্বৈতাত্মক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভিন্নস্বরূপ হ'লেও নিশ্চয়ই সহাবস্থান করছেন।

দ্বিতীয়তঃ, বদ্ধ জীবে জ্ঞান ও অজ্ঞান; প্রকৃতিতে সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ-রূপ ত্রিগুণ; শরীরে

জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি, শৈশব-যৌবন-বার্ধক্য-রূপ অবস্থাত্রয়; ব্রহ্মাণ্ডে অণুরূপে নিত্যত্ব ও বস্তু-রূপে অনিত্যত্ব; পৃথিবীতে উষ্ণতা ও শীতলতা; ব্রহ্মে সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব; মহেশ্বরে নর ও নারীরূপ; মানুষে পুণ্য ও পাপ, খদ্যোতে প্রকাশ ও অপ্রকাশরূপ নানাবিধ বিরুদ্ধ ধর্মের সহাবস্থান দেখা যায়।

একই ভাবে ভেদ ও অভেদও পরস্পর-বিরুদ্ধ হ'লেও অনায়াসে সহাবস্থিতি করতে পারে; এবং তা তাদের করতেও হচ্ছে অনবরত।

(২) 'কারণভাবাদ্বা'—দ্বিতীয়তঃ, যদি বলা হয় যে, ভেদ ও অভেদ পরস্পরবিরোধী, কারণ তাদের পরস্পর অবিরোধী রূপে গ্রহণ করবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই, তা হ'লে তার উত্তর হ'ল এই :

সৃষ্টির পূর্বে কেবল অদ্বৈত ব্রহ্ম বা শিবই বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু সৃষ্টির পরে সেই অদ্বৈত ব্রহ্মই দ্বৈত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন। এরূপে, দ্বৈত ও অদ্বৈতের ভেদ ও অভেদের সহাবস্থান অবশ্যস্বীকার্য, তাদের অবিরোধী ব'লে গ্রহণ করবার কোনো কারণ না থাকলেও। যেমন, ধর্মী ও ধর্ম, দ্রব্য ও গুণ, মণি ও প্রভা পরস্পর বিভিন্ন হ'লেও সহাবস্থান করে; এবং করতে বাধ্য; ঠিক সেই একই ভাবে ব্রহ্ম ও তাঁর স্বাভাবিক গুণ শক্তি প্রভৃতিও পরস্পরভিন্ন হ'লেও তাঁদের সহাবস্থানও অবশ্যম্ভাবী।

উপরের প্রথম ও দ্বিতীয় সম্ভাব্য আপত্তির মধ্যে প্রভেদ এই যে, প্রথমটিতে 'সদর্থক' (positive) ও দ্বিতীয়টিতে 'নঙর্থক' (negative) দিক থেকে প্রশ্নটির আলোচনা করা হয়েছে।

(৩) 'অযুক্তাদ্বা'—তৃতীয়তঃ, যদি বলা হয় যে, ভেদ ও অভেদ পরস্পরবিরোধী, কারণ তাদের সহাবস্থিতি সম্পূর্ণরূপেই অযৌক্তিক, তা হ'লে তার উত্তর হ'ল এই :

'জীব-ব্রহ্মণোশ্চিদৈক্য-ব্যপদেশোঽপি অণুত্ব- বিভুত্বাত্মক- পরস্পর- বিরুদ্ধপরিণামবত্ত্ব-দর্শনাৎ ভেদাভেদো যুক্তঃ'—ইত্যাদি। (১।৪।২২) অর্থাৎ, ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে চিদৈক্য থাকা সত্ত্বেও অর্থাৎ, তাঁদের আত্মা এক ও অভিন্ন হ'লেও, তাঁদের ধর্ম বা গুণ পরস্পরবিরুদ্ধ—যেমন, ব্রহ্ম বিভু, জীব অণু ইত্যাদি। একই ভাবে অপ্রসারিত ও কুণ্ডলীকৃত হ্রস্ব সর্প এবং প্রসারিত কুণ্ডলমুক্ত ঋজু দীর্ঘ সর্প, স্বরূপ বা সর্পত্বের দিক থেকে এক ও অভিন্ন হ'লেও গুণ বা হ্রস্বত্ব-দীর্ঘত্বের দিক থেকে ভিন্ন। সঙ্কুচিত (গোটানো) পট বা বস্ত্র ও বিস্তৃত (খোলা) পট বা বস্ত্রের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। সূর্য ও প্রভাও তেজ-স্বরূপত্বের দিক থেকে অভিন্ন হ'লেও ব্যাপকত্ব ও পরিচ্ছিন্নত্বরূপ ধর্মের দিক থেকে ভিন্ন। এরূপ বহু পাওয়া যায়, যার জন্য ভেদাভেদের সহাবস্থিতি অবশ্যস্বীকার্য।

(৪) 'অভাবাদ্বা'—চতুর্থতঃ, যদি বলা হয় যে, ভেদাভেদবাদ গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ ভেদ ও অভেদের সহাবস্থিতির প্রমাণের অভাব আছে, তা হ'লে তার উত্তর হ'ল এই :

ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কারণ-কার্যসম্বন্ধ সুবিদিত; এবং এরূপ সম্বন্ধ যে একমাত্র ভেদাভেদসম্বন্ধ, তা-ও সুবিদিত। কারণ ব্রহ্ম এবং কার্য ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অসংখ্য ভেদ ত আমরা চক্ষেই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তাঁদের মধ্যে অভেদ হঠাৎ চক্ষে না পড়লেও—

'কার্যজাতস্য প্রপঞ্চস্য কারণ-শিবাদভিন্নত্বং দ্বিতীয়-খণ্ডে নির্ণীতম্।' (১।৪।২২) 'কার্যস্বরূপ ব্রহ্মাণ্ড ও কারণস্বরূপ শিব যে অভিন্ন, তা দ্বিতীয় খণ্ডে নির্ণীত হয়েছে।'

(৫) 'অমানাদ্বা'—পঞ্চমতঃ, যদি বলা হয় যে, ভেদাভেদ অসমীচীন, কারণ, তা সম্মান-যোগ্য ব'লে বিবেচিত হয়নি, তা হ'লে তার উত্তর হ'ল এই :

এস্থলেও বলা যেতে পারে যে, ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে ভেদের সম্বন্ধে ত কোনো প্রশ্নই ওঠে না, প্রশ্ন ওঠে তাঁদের মধ্যে অভেদ সম্বন্ধেই কেবল ; এবং সেজন্যই ভেদাভেদবাদকে অসম্মানযোগ্য, অথবা অপ্রামাণিকরূপে গ্রহণ করা অনুচিত। যেহেতু—

'ভেদাভেদয়োঃ প্রামাণ্যাবিরুদ্ধম্। দ্বৈতাদ্বৈতমেব পারমার্থিকেন নির্দেশাৎ তদেব রমণীয়ম্।' (১।৪।২২)

'ভেদাভেদবাদের প্রামাণ্য অবিরুদ্ধ। দ্বৈতাদ্বৈত-মতবাদকেই পারমার্থিকরূপে নির্দেশ করেছেন শ্রুতি। সেজন্য এই মতবাদই রমণীয়।'

(৬) 'অসম্ভবাদ্বা'—ষষ্ঠতঃ, যদি বলা হয় যে, ভেদাভেদবাদ অসমীচীন, কারণ ভেদ ও অভেদের সহাবস্থিতি একেবারেই অসম্ভব, তা হ'লে তার উত্তর হ'ল এই :

'শ্রুতি-শতেষু দ্বৈতাদ্বৈতাত্মক-প্রপঞ্চ-পরমাত্মনো নিয়ম্য-নিয়ামকত্বমবিরোধতয়া দর্শনাৎ।' (১।৪।২২)

'শত শত শ্রুতিতে দ্বৈতাত্মক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং অদ্বৈতাত্মক ব্রহ্মের মধ্যে নিয়ম্য-নিয়ামক-সম্বন্ধের মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে ভেদ ও অভেদ উভয়ই যে সমভাবে বিদ্যমান, তা জানা যায়।' একথা প্রথম আপত্তির খণ্ডনেও বলা হয়েছে।

(৭) 'অফলাদ্বা'—সপ্তমতঃ, যদি বলা হয় যে, ভেদাভেদবাদ অগ্রহণীয়, কারণ, এই মতবাদের ফল কিছুই নেই এবং সেজন্য তা অর্থ-শূন্য, তা হ'লে তার উত্তর হ'ল এই :

অভেদের মহাফলের কথা বাদই দিচ্ছি, ভেদেরও ফল নিশ্চয়ই কিছু আছে। ভেদের ফল হ'ল এই যে, ভেদমূলক কর্মাদি মোক্ষের সাক্ষাৎ না হ'লেও, অসাক্ষাৎ সাধনরূপে সর্বত্র বন্দিত ; কারণ, নিষ্কাম কর্মের ফল চিত্তশুদ্ধি ; এবং একেবারে প্রারম্ভেই এরূপ চিত্তশুদ্ধি লাভ না হ'লে ত অশুদ্ধচিত্তে মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধন জ্ঞান ও ভক্তির উদয় হতেই পারে না। সেই দিক থেকে ভেদেরও অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই আছে।

(৮) 'অমতাদ্বা'—অষ্টমতঃ, যদি বলা হয় যে, ভেদাভেদবাদ সম্পূর্ণরূপেই অযৌক্তিক, কারণ, এই মতবাদ সুধীজনসম্মত নয়, তার উত্তর হ'ল এই :

সর্বজ্ঞ-চূড়ামণি, অনন্ত-অসীম-অপরিসীম-জ্ঞান-বিজ্ঞানঘন, প্রাজ্ঞশ্রেষ্ঠ, সত্যদ্রষ্টা ও সত্য-প্রকাশক, স্বয়ং ভগবান ব্যাসদেব চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থপাদে (৪।৪।১০-১১) এই অভিমত স্পষ্ট-ভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, ভেদবাচক ও অভেদবাচক—এই উভয়প্রকারের শ্রুতিবাক্যের সমন্বয়মূলক ভেদাভেদবাদই একমাত্র গ্রহণীয় মতবাদ।

'সর্বশাস্ত্রার্থ-সারভূত-স্বাভিপ্রেতং ভেদাভেদমতত্বেন ব্যপদেশাৎ।' (৪।৪।১০-১১)

'তিনি (সূত্রকার বাদরায়ণ) সর্বশাস্ত্রের সারস্বরূপ তাঁর নিজের যে মতবাদ, তা ভেদাভেদমতবাদরূপেই প্রপঞ্চিত করেছেন।'

(৯) 'অবিশেষাদ্বা'—নবমতঃ, যদি বলা হয় যে, ভেদাভেদবাদ গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ, সেক্ষেত্রে এই অত্যদ্ভুত তত্ত্বটিকেই স্বীকার ক'রে নিতে হয় যে, ভেদ ও অভেদের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই, তার উত্তর হ'ল এই :

ভেদ ও অভেদের মধ্যে প্রভেদ নিশ্চয়ই আছে, তা সত্ত্বেও তাদের সহাবস্থিতি সম্পূর্ণ-রূপেই সম্ভবপর—এ কথা ত বারংবার পূর্বেই

বলা হয়েছে। বরং, ভেদাভেদবাদ না স্বীকার করলে হয় কেবল-অভেদবাদ, নয়, কেবল-ভেদবাদই সত্য ব'লে গ্রহণ করতে হয়, যা একেবারেই অসম্ভব। সেজন্য, এক্ষেত্রে ভেদাভেদবাদই একমাত্র গ্রহণীয় মতবাদ। অতীব সমন্বয়মূলক এই মতবাদ—কেবল-অভেদবাদের ন্যায় ভেদকে, এবং কেবল-ভেদবাদের ন্যায় অভেদকে একেবারে এক ফুৎকারে বুদ্বুদের ন্যায় উড়িয়ে না দিয়ে উভয়কেই সমান সম্মান, যোগ্য সম্মান দান ক'রে জগতে সাম্য-ঐক্যের একটি অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপিত করেছে সগৌরবে। কেবল দর্শনশাস্ত্রের দিক থেকেই নয়, নীতি-তত্ত্বের দিক থেকেও এই মতবাদ সমান সমন্বয়-মূলক, যেহেতু এই ভেদাভেদ-মতবাদেই কেবল জ্ঞান ভক্তি কর্ম—এই সাধনত্রয়কে সমান গৌরবময় স্থান দেওয়া হয়েছে। অবশ্য, একথা সত্য যে, ভেদাভেদবাদানুসারেও, কর্ম বা নিষ্কাম কর্ম মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধন নয়—যা পূর্বেই বলা হ'ল। তা হ'লেও তার গরিমা-মহিমার সীমা-পরিসীমা নেই, যেহেতু নিষ্কাম কর্ম না থাকলে জ্ঞান-ভক্তিও নেই, কারণ নিষ্কাম কর্ম দ্বারা মন পবিত্রীকৃত না হ'লে জ্ঞান ও ভক্তির উদয় হবে কোথায়? ধূলি-মলিন দর্পণে যেরূপ প্রচণ্ড-প্রখর সূর্যের রশ্মিও প্রতিফলিত হতে পারে না, সেরূপ অজ্ঞান-অবিদ্যা, বাসনা-কামনা, ক্রোধ-মাৎসর্যাদি দ্বারা মলিন মন-দর্পণেও জ্ঞান ও ভক্তির সুন্দর সুবর্ণালোক প্রতিবিম্বিত হতে পারে না নিমেষের জন্যও। সেই দিক থেকে প্রারম্ভিক সাধন নিষ্কাম কর্মের মহিমা-গরিমাও ত অল্প নয়, যেহেতু আরম্ভই না হ'লে শেষ হবে কিরূপে? সেই দিক থেকে মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধন না হ'লেও কর্ম ব্যতীত মোক্ষলাভ একেবারেই অসম্ভব। সেজন্য, অনায়াসে বলা চলে যে, সমন্বয়বাদী ভেদাভেদ-মতবাদে জ্ঞান ভক্তি ও কর্মের সমান স্থান, সমান মূল্য, সমান মর্যাদা, সমান অত্যাবশ্যকতা সুনিশ্চিত।

(১০) 'শ্রুত্যৈকত্বাভাবাত্'—দশমতঃ যদি বলা হয় যে, ভেদাভেদবাদ অযৌক্তিক, যেহেতু সমস্ত শ্রুতি সমভাবে, এক হয়ে এই মতবাদ গ্রহণ করেননি, তার উত্তর হ'ল এই:

প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত শ্রুতিই, সমগ্র বেদান্ত-দর্শনই, বেদান্ত-দর্শনের সমস্ত শাখাপ্রশাখাই, শেষ পর্যন্ত সমস্বরে ভেদাভেদবাদই সমর্থন করেছেন। সেজন্য—'এতদেব মুখ্যবেদান্ত-মতমিতি বেদিতব্যম্।' (১।৪।২২)।

'কেবল এই (ভেদাভেদ) মতবাদকেই প্রধানতম বেদান্ত-মতবাদ ব'লে জানতে হবে।'

এইভাবে সকল প্রকার সম্ভাব্য আপত্তি উত্থাপিত এবং নিরাকৃত ক'রে শ্রীপতি পরিশেষে তাঁর স্বীয় সিদ্ধান্ত নির্ভয়ে সানন্দে সশ্রদ্ধায় ঘোষণা ক'রে বলছেন যে, একমাত্র ভেদাভেদবাদই সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য মতবাদ। তাঁর মতে ১।৪।১৯-২২ ব্রহ্মসূত্রে ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে ভেদাভেদ; এবং ১।৪।২৩-২৪ ব্রহ্মসূত্রে ঈশ্বর ও জগতের মধ্যে ভেদাভেদ নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত করা হয়েছে।

উপরে যে এতটা বেশী স্থান ও সময় নষ্ট ক'রে শ্রীপতির ভেদাভেদের বিরুদ্ধে আপত্তি-খণ্ডনের বিষয় বলা হ'ল, তা তিনি নিজেই তার জন্য অতটা প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম করেছেন ব'লেই কেবল—অন্য কোনো কারণেই নয়। কারণ আমাদের মতে শ্রীপতির এই দিক থেকে অতটা উত্তেজিত হয়ে অতটা জোরের সঙ্গে, অতটা বিশদভাবে এই বিষয়ে আলোচনা-প্রপঞ্চনার বস্তুতঃ কোনো অবকাশ

বা প্রসঙ্গই নেই, যদি ভেদাভেদবাদের এই অর্থই হয় যে, আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরুদ্ধ ভেদ ও অভেদ প্রকৃতকল্পেও পরস্পরবিরুদ্ধ অতি নিশ্চয়ই, স্থির নিশ্চয়ই, নিঃসন্দেহে; কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা সহাবস্থিতও একই ভাবে নিঃসন্দেহে।

ঠিক কথা—আপাততঃ ধরেই নিলাম যে, এ ঠিকই কথা। কিন্তু তাতে শ্রীপতির নিজের কি আসে যায়? তাঁর নিজস্ব অভিনব মতবাদ ত এই অর্থেই, তাঁর নিজেরই দেওয়া অর্থেই 'ভেদাভেদবাদ' একেবারেই নয়। কারণ, ভেদাভেদবাদের সুস্পষ্ট অর্থ হ'ল ভেদ ও অভেদের একত্রে স্থিতি বা সহাবস্থিতি—যে কথা শ্রীপতি নিজেই বারংবার ব'লে ব'লেও যেন তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না। কিন্তু তাঁর নিজের 'বিশেষাদ্বৈতবাদে'ই ভেদ ও অভেদের এরূপ সহাবস্থিতি ঘটল কোথায় মুহূর্তের জন্যও? কারণ, তাঁর মতে সৃষ্টির পূর্বে এবং প্রলয়ের পরে, এবং মোক্ষকালে ব্রহ্ম ও জীব-জগতের মধ্যে রয়েছে কেবলই 'অভেদ'—তখন তাদের মধ্যে 'ভেদ' একেবারেই নেই। সুতরাং তখন ভেদ ও অভেদের সহাবস্থিতির প্রশ্নই উঠতে পারে না একবারও। পুনরায়, শ্রীপতির নিজের মতেই সৃষ্টির পরে, স্থিতিকালে, এবং বদ্ধাবস্থায় ব্রহ্ম ও জীব-জগতের মধ্যে কেবলই 'ভেদ'—তখন তাদের মধ্যে 'অভেদ' একেবারেই নেই। সুতরাং তখন তাদের মধ্যে ভেদ ও অভেদের সহাবস্থিতির প্রশ্নই উঠতে পারে না একবারও। অতএব শ্রীপতি কেন যে নিজের মতবাদকে ভেদাভেদমতবাদরূপে গ্রহণ ক'রে ভেদ ও অভেদ পরস্পরবিরুদ্ধ হ'লেও অনায়াসে সহাবস্থান করতে পারে, তা প্রমাণের জন্য এরূপ অধিক ব্যগ্র ও ব্যাকুল হয়ে পড়লেন, তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য সম্পূর্ণরূপেই। তাঁর ন্যায়-জ্ঞান অতি প্রখর ছিল, বিচারবুদ্ধিও ছিল তুল্য সুতীক্ষ্ণ। সেক্ষেত্রে তিনি কেন যে হঠাৎ এরূপ বিচারশৈথিল্যের পরিচয় দিলেন একটি মূলীভূত প্রশ্নের ক্ষেত্রে, তা বোঝা দায়। একথা পূর্বেই কিছু বলা হয়েছে। (ভাদ্র ১৩৮৫ সংখ্যা, পৃঃ ৪০১ দ্রষ্টব্য)।

[ক্রমশঃ]

জাতিবৈষম্য ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ

ডক্টর নিমাইসাধন বসু*

[ভাদ্র ১৩৮৫ সংখ্যার পর]

রামমোহনের ইউরোপীয় বিচারপতিদের প্রতি আস্থা এবং ইউরোপীয়দের সঙ্গে ভারতীয়দের অধিকতর সংস্পর্শ ও যোগাযোগ সম্বন্ধে আগ্রহের কারণ বিশ্লেষণ করলে তাঁর মনোজগতের এক বিচিত্র দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রগতিশীল সংস্কারকরূপে রামমোহনের কার্যকলাপ তাঁকে তাঁর আত্মীয়স্বজন ও দেশবাসীর এক বৃহৎ অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল। গ্রামাঞ্চলের মানুষ তো দূরের কথা শহর কলকাতার মুষ্টিমেয় মাত্র

---

*এম. এ., পিএচ. ডি., ডি. লিট্.। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক। দক্ষিণ ক্যালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ইতিহাস বিভাগের প্রবর্তয়িতারূপে আমন্ত্রিত হইয়া সেখানে আপাততঃ দুই বৎসরের জন্য ভিজিটিং অধ্যাপক।

লোক তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। বিত্তশালী ও প্রভাবশালী বাঙালী সমাজের অধিকাংশ মানুষই তাঁর বিরোধী ছিল। ফলে তাঁর প্রগতিশীল চিন্তা ও কাজের সমর্থনের জন্য তিনি অন্যত্র সন্ধান করতেন। অমানবিক সতীদাহপ্রথা উচ্ছেদ করে বৃটিশ সরকার তাঁর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিল। ইংরাজি পত্রপত্রিকায় তিনি সাধারণতঃ সমর্থন পেয়েছিলেন, তাঁর বিদেশী বন্ধুবান্ধবরা তাঁকে সমর্থন জানিয়েছিলেন এবং বিদেশে তাঁর বহু গুণগ্রাহী সমর্থক ছিলেন। ইউরোপীয়দের সম্বন্ধে রামমোহনের মনোভাব বিশ্লেষণ করার সময় এই বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে। কিন্তু ইউরোপীয়দের জাত্যভিমান, এদেশীয় লোকেদের প্রতি উদ্ধত অশিষ্ট মনোভাব এবং আচরণ সম্বন্ধে তিনি উদাসীন বা অজ্ঞ ছিলেন না।

ইংলণ্ডে অবস্থানকালে পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির কাছে প্রদত্ত সাক্ষ্যে তিনি অভিযোগ করেন যে, ইউরোপীয় বিচারকেরা প্রায়ই ভারতীয় ব্যবহারজীবীদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন না। এর কারণ শ্বেতাঙ্গ বিচারকরা নিজেদের শাসকশ্রেণীভুক্ত মনে করে এদেশীয় ব্যবহারজীবীদের নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষ বলে অবজ্ঞা করেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে জানান যে, ভারতীয়রা যে-কোন দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালনে সক্ষম।

ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের আগমন ও স্থায়ীভাবে বসবাস করবার সম্ভাব্য কুফল সম্বন্ধে তিনি যে অবহিত ছিলেন না তা নয়। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে, শাসকশ্রেণীভুক্ত শ্বেতাঙ্গরা এদেশের মানুষের প্রতি কর্তৃত্বের মনোভাবসুলভ আচরণ করতে পারে, সাধারণ মানুষের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগের দাবী করতে পারে, এদেশীয় মানুষের বিশ্বাসে আঘাত করতে পারে এবং তাদের লাঞ্ছিত করতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি চেয়েছিলেন এদেশে আরও অধিকসংখ্যক ইউরোপীয় স্থায়ীভাবে বসবাস করুক এবং ভারতীয়রা তাদের সংস্পর্শে আসুক, কেননা তার ফলে ভারতীয়দের জাগতিক উন্নতি হবে। সম্ভাব্য কুফলগুলি তিনি আশা করেছিলেন উপযুক্ত আইন প্রণয়ন এবং ন্যায় ও সমতাভিত্তিক বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে দূর করা সম্ভব হবে। কিন্তু তাঁর এই পরিকল্পনা ও আশা বাস্তব ছিল না। তাঁর সমর্থক 'ইণ্ডিয়া গেজেট' কাগজ পর্যন্ত মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছিল যে রামমোহনের ঐ মতবাদ যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

রামমোহন পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, প্রথম কুড়ি বছর শুধুমাত্র উচ্চশিক্ষিত চরিত্রবান বিত্তশালী ইউরোপীয়ানদের এদেশে বসবাসের অনুমতি দেওয়া উচিত; কেননা এই শ্রেণীর শ্বেতাঙ্গরা ভারতীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহার করবে না। তিনি বলেছিলেন, সকলের জন্য একই আইন ও সমান নাগরিক অধিকার প্রবর্তন করতে হবে। জুরী প্রথা চালু করতে হবে ও সমস্ত শ্রেণীর মানুষ নিয়ে সমান ও নিরপেক্ষভাবে জুরী গঠন করতে হবে। এই সব ব্যবস্থা গৃহীত হলে শ্বেতাঙ্গদের উদ্ধত ও অবাধ্য আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। রামমোহন সুস্পষ্টভাবে বলেন যে এদেশে বসবাসকারী শ্বেতাঙ্গদের অবশ্যই এদেশীয় সাধারণ আইন-আদালত এবং বিচারপতিদের এখতিয়ার অধীন হতে সম্মতি জানাতে হবে। রামমোহনের প্রস্তাবিত প্রতিকার-ব্যবস্থাগুলি যুক্তিযুক্ত মনে হলেও এগুলি কার্যকর করতে হলে দুটি জিনিসের প্রয়োজন ছিল। প্রথমতঃ

ইংরাজ সরকারের দিক থেকে ভারতবর্ষে আইনের দৃষ্টিতে সমতার নীতি বলবৎ করার আন্তরিক সদিচ্ছা। দ্বিতীয়তঃ ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয়ানদের ঐ ধরনের সমতার নীতি স্বেচ্ছায় মেনে নেবার অভিপ্রায়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এ দুটির অভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল। এদেশে বসবাসকারী শ্বেতাঙ্গদের অধিকাংশই ভারতীয়দের ঘৃণা বা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখত এবং তাদের বর্বর অসভ্য বলে গণ্য করত। ঐ রকম মানসিকতায় সমতার নীতি তাদের কাছে অকল্পনীয় ছিল।

উপরোক্ত পরিস্থিতি ও পরিবেশে রামমোহনের মত বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন একজন মানুষ কি করে যে ভারতবর্ষে আইনের চক্ষে সমতা ও জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সম-অধিকার-এর নীতি প্রবর্তিত হবার আশা করেছিলেন তা ভাবলে বিস্ময় জাগে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইংরাজ জাতির ন্যায়-নীতিবোধ ও নিষ্ঠা সম্বন্ধে গভীর আস্থা এর অন্যতম কারণ ছিল। তাছাড়া ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের জুরী আইনের বৈষম্যমূলক সর্তের বিরুদ্ধে তাঁর পরিচালিত আন্দোলনের আশু সাফল্য তাঁকে বোধ হয় আরও বেশী আশাবাদী করে তুলেছিল।

উনিশ শতকের সূচনায় সিংহলের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যার আলেকজাণ্ডার জনস্টন (Alexander Johnston)-এর উদ্যোগে সিংহলে জুরী বিচার-ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। সিংহলে জুরী প্রথার সাফল্য ভারতীয়দেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং 'সংবাদকৌমুদী' পত্রিকায় আশা প্রকাশ করা হয় যে, অনতিবিলম্বে ভারতবর্ষেও এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি চার্লস উইলিয়ামস উইন (Charles Williams Wynn) বোম্বাই কলিকাতা ও মাদ্রাজের সুপ্রিম কোর্টের এলাকাধীন অঞ্চলে জুরী বিচারব্যবস্থা চালু করে এক আইন প্রবর্তন করেন। আপাতদৃষ্টিতে প্রগতিশীল হলেও এই আইনের একটি সর্তে বলা হয় যে, শুধুমাত্র খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরাই গ্র্যাণ্ড জুরীর সদস্য মনোনীত হতে পারবে। হিন্দু বা মুসলমানরা জুরীর সদস্য হয়ে কোনও অভিযুক্ত এদেশীয় খ্রীষ্টানেরও বিচার করতে পারবে না। স্পষ্টতই এই বৈষম্যমূলক আইনে হিন্দু ও মুসলমানদের তাচ্ছিল্য করে এদেশীয় খ্রীষ্টানদের উচ্চতর সামাজিক ও আইনগত মর্যাদা দান করা হয় এবং তাদের শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়দের সমতুল্য অধিকার দেওয়া হয়। এই বৈষম্যমূলক আইনটির বিরুদ্ধে কলকাতা ও বোম্বাই-এর সম্রান্ত ব্যক্তিরা তীব্র প্রতিবাদ জানান। ভারতীয় সংবাদপত্রপত্রিকায় আলোচনা-বিতর্ক শুরু হয়। রামমোহনের উদ্যোগে এই আইনের বিরুদ্ধে বৃটিশ পার্লামেণ্টে একটি আবেদন প্রেরণ করা হয়। আবেদনপত্রে বলা হয় যে, এই বৈষম্যমূলক আইন ভারতীয়দের আইনের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করা ছাড়া অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয়, বিরক্তিকর এবং অবিবেচনাপ্রসূত। ভারতীয়-দের খ্রীষ্টধর্মগ্রহণে প্ররোচিত করাও বোধ হয় এই আইনের অপর এক উদ্দেশ্য। কেননা, এই আইনে প্রকারান্তরে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শ্বেতাঙ্গ শাসক জাতির মত বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদালাভ করার প্রকৃষ্ট উপায় হল তাদের ধর্ম গ্রহণ করা।

জুরী অ্যাক্টের বিরুদ্ধে প্রেরিত আবেদন-পত্রটি একাধিক কারণে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ। এই আবেদনে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রসময় দত্ত,

রামকমল সেন ও কয়েকজন মুসলমান নাগরিক। অর্থাৎ জুরী অ্যাক্ট বিরোধী আন্দোলন ধর্মীয় ও আদর্শগত প্রতিবন্ধক অতিক্রম করেছিল। তা ছাড়া এই আবেদনে প্রথম সুস্পষ্টভাবে শাসকশ্রেণীভুক্ত লোকেদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা সম্বন্ধে কটাক্ষ করা হয়। পরবর্তী কালে এই সুযোগ-সুবিধাগুলির অবসানের জন্য ব্যাপক আন্দোলন দেখা দেয়। পার্লামেণ্টে এই আবেদনটি পেশ করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে জে.ক্রফোর্ডকে (J. Crawford) রামমোহন যে পত্র দেন, তাতে তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে লেখেন যে, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের দৃঢ়সঙ্কল্প শত্রুভাবে পরিণত হবে না মিত্র থাকবে, তা বৃটিশ সরকারের দৃষ্টি-ভঙ্গী ও নীতির ওপর নির্ভর করবে।

বোম্বাই-এর হিন্দু, মুসলমান ও পার্সি নাগরিকদের পক্ষ থেকেও জুরী আইনের বিরুদ্ধে আবেদন প্রেরণ করা হয়। এই আবেদনেও বৈষম্যমূলক ও বিরক্তিকর সর্তটির তীব্র সমালোচনা করে বলা হয় যে, এর দ্বারা ভারতীয়দের নিকৃষ্ট ও নিম্নতর জাতিরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। মাদ্রাজেও জুরী অ্যাক্টকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। সেখানে শ্বেতাঙ্গদের প্ররোচনায় তাদের অনুগ্রহভাজন একদল ভারতীয় একটি সভা আহ্বান করে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ভারতীয়রা জুরীর দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি। মাদ্রাজের পত্র-পত্রিকায় এই সভার কঠোর সমালোচনা করে সভার উদ্যোক্তাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা হয়। 'সংবাদকৌমুদী' মন্তব্য করে যে, এই সভা মাদ্রাজে সুসংগঠিত জন-মতের অভাবের ইঙ্গিত বহন করছে।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুন হাউস্ অব কমন্স-এ বাংলাদেশ থেকে প্রেরিত আবেদন-পত্রটি আলোচিত হয়। উইন স্বীকার করেন যে, ঐরূপ একটি আবেদন ভারতবর্ষে শিক্ষার অগ্রগতি এবং ভারতীয়দের বুদ্ধির পরিচায়ক। তিনি বর্ণ বা জন্মগত কারণে ভারতীয়দের ন্যায়সঙ্গত আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার পথ রুদ্ধ করার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ভারতীয়রা গ্র্যাণ্ড জুরী বা জে. পি. (Justice of the Peace) নিযুক্ত হবার অনুপযুক্ত। তিনি আরও বলেন যে, বিজিতদের বিজয়ী শ্রেণীভুক্ত লোকেদের বিচারকের আসনে বসানো সমীচীন হবে না। পার্লামেণ্টের কয়েকজন সদস্য ভারতীয়দের সম্বন্ধে উইনের এইরকম নিয়ধারণার সমালোচনা করেন। যোশেফ হিউম (Joseph Hume) এবং স্যার চার্লস ফর্বস (Charles Forbes) ভারতীয়দের নৈতিক চরিত্রের প্রশংসা করে বলেন যে, ভারতবর্ষে শ্বেতাঙ্গ ও স্থানীয় অধিবাসীদের একইরকম নাগরিক অধিকার থাকা উচিত। কিন্তু এই বিতর্কের ফলে সরকারী নীতির কোনও পরিবর্তন ঘটেনি।

ইংলণ্ডে যাঁরা জুরী আইনের বৈষম্যমূলক সর্তটির অবসান প্রয়োজনীয় বলে মনে করে-ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন চার্লস গ্র্যাণ্ট (Charles Grant)। অল্পকালের মধ্যেই তিনি যখন বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি নিযুক্ত হন, তখন তিনি ঐ আইনের সংশোধনের জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হন। জুরী আইনের বৈষম্যমূলক ধারাটি তুলে দিয়ে সংশোধনের একটি খসড়া তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অব ডাইরেকটরদের কাছে প্রেরণ করেন। পরিচালকমণ্ডলী গ্র্যাণ্টের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বৈষম্যমূলক ধারাটি বজায় রাখার পক্ষে মত দেন। কিন্তু

গ্র্যাণ্ট তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থেকে পার্লামেণ্টে একটি সংশোধিত জুরী বিল পেশ করেন। গ্র্যাণ্টের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে একটি পত্রে (৮ই ডিসেম্বর ১৮৩১) কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী বলেন যে, ভারতীয়দের যদি জে. পি. নিযুক্ত করা হয় এবং ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিচারের ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাহলে ভারতীয়দের চক্ষে ইউরোপীয়দের সেই 'মর্যাদা'-হানি হবে, যে বিশেষ মর্যাদা ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সংরক্ষণের জন্য একান্ত প্রয়োজন। এই যুক্তি অগ্রাহ্য করে গ্র্যাণ্ট বলেন যে, ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্য শ্বেতাঙ্গদের 'ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বে'র ধারণার ওপর নির্ভরশীল বলে তিনি মনে করেন না। পক্ষান্তরে সকল প্রকার অপ্রয়োজনীয় বৈষম্যের উচ্ছেদ করে সকল শ্রেণীর মানুষকে দেশের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করার প্রচেষ্টাই হল সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা সুদৃঢ় করার প্রকৃষ্ট উপায়। সুতরাং পরিচালকমণ্ডলী 'অপ্রয়োজনীয় ও অসমীচীন' মনে করলেও তিনি সংশোধিত জুরী বিলটি পার্লামেণ্টে গৃহীত হবার জন্য পেশ করেন।

কমন্স সভায় প্রায় বিনাবাধায় সংশোধিত জুরী বিলটি অনুমোদিত হয়। কিন্তু লর্ডস সভায় ডিউক অব ওয়েলিংটন বিলটির তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন যে, ইতিপূর্বে এত ক্ষতিকর বিল তিনি আর প্রত্যক্ষ করেননি। ভারতীয়দের গ্র্যাণ্ড জুরী এবং জে. পি. পদে নিযুক্ত না করার সপক্ষে যুক্তি উত্থাপন করে তিনি বলেন যে, ঐরকম দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হওয়ার জন্য কয়েকটি যোগ্যতা আবশ্যক। কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গদের বর্ণ তাদের অযোগ্যতার পরিচায়ক এবং শ্বেতাঙ্গদের মত প্রভাব তাদের নেই। এই উৎকট বর্ণবিদ্বেষী মনোভাবের নিন্দা করে লর্ড চ্যানসেলর বলেন যে, ওয়েলিংটন বর্ণ-শ্রেষ্ঠত্বের ওপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করছেন।

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট সংশোধিত জুরী অ্যাক্ট পাস হয়। নতুন আইন অনুসারে কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই শহরে ভারতীয়দের জে. পি. পদে নিযুক্ত হবার বাধা দূর হয়। অতঃপর ভারতীয়রা গ্র্যাণ্ড জুরী এবং অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটপদে নিযুক্ত হলে বাংলা পত্র-পত্রিকায় স্বাগত জানান হয়। সংশোধিত জুরী আইন ভারতে বসবাসকারী শ্বেতাঙ্গদের এবং খ্রীষ্টানদের হতাশ ও বিক্ষুব্ধ করে। শেষ মুহূর্তে বিলটিকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য জানিয়ে তারা লর্ডস সভায় একটি আবেদন পাঠায়। ঐ আবেদনে বলা হয় যে, আইনের মাধ্যমে জোর করে শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে যে বিশেষ সম্পর্ক তার পরিবর্তন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ভারতীয়রা বিচারব্যবস্থার ভার নেবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। 'রিফর্মার' 'ইণ্ডিয়া গেজেট' প্রমুখ কাগজে এই আবেদনটির কঠোর সমালোচনা হয়েছিল।

নতুন সংশোধিত জুরী আইন পাস হলে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন শিক্ষিত ভারতীয়রা বিশেষ আনন্দিত হন এবং গ্র্যাণ্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সবচেয়ে সুখী মানুষ ছিলেন রামমোহন, কেননা তিনিই এই বৈষম্যমূলক আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। অন্যদিকে শ্বেতাঙ্গদের পত্র-পত্রিকায় আইনটির নিন্দা করে মন্তব্য করা হয় যে, গ্র্যাণ্ট রামমোহনের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে এই কাজ করেছেন। অন্যদিকে রামমোহন ও তাঁর সহযোগীরা গ্র্যাণ্ট ও অন্যান্য ইংরাজ রাজনৈতিক নেতাদের প্রগতিশীল

সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সমসাময়িক অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, রামমোহনের যুক্তি ও অনুরোধেই লর্ড অ্যালেনবরো (Lord Ellenborough) শ্বেতাঙ্গদের আবেদনটি লর্ডস সভায় সমর্থন করেননি।

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের জুরী অ্যাক্টের বিরুদ্ধে আন্দোলনটির বিশেষ ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে। সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রেস অর্ডিন্যান্সের (Press Ordinance) বিরুদ্ধে রামমোহন প্রমুখ কয়েকজন ভারতীয় যে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, সেইটিই প্রথম নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের পথ নির্দেশ করে। কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হবে যে, এই সম্মান জুরী অ্যাক্টের বিরুদ্ধ আন্দোলনেরই প্রাপ্য। প্রেস অর্ডিন্যান্সের বিরোধিতা করে যে আবেদনপত্র ইংলণ্ডে পাঠান হয়েছিল, তার কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল বলে প্রমাণ নেই। পার্লামেণ্টে ঐ বিষয় নিয়ে কোন বিতর্ক হয়নি বা প্রশ্ন করাও হয়নি। বোম্বাই বা মাদ্রাজে কোনও আলোড়ন হয়েছিল বলে জানা যায় না। কিন্তু জুরী অ্যাক্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন দেশের বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে স্পর্শ করেছিল। ১৮২৬ থেকে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জুরী আইন নিয়ে বিভিন্ন ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় লেখা হয়েছিল। এই প্রথম বিভিন্ন মতাদর্শ ও বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ একত্র হয়ে একটি বৈষম্যমূলক আইনের বিরোধিতা করে। জুরী আইন-বিরোধী আন্দোলন তিনটি বড় প্রশ্ন ভারতীয় জনমানসে তুলে ধরে। প্রথমটি হল ভারতবর্ষে শ্বেতাঙ্গদের তথাকথিত ভাবমূর্তির (image) প্রশ্ন। দ্বিতীয়টি হল শ্বেতাঙ্গদের উগ্র জাতি-শ্রেষ্ঠত্বের দাবী। পরবর্তী কালে ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় বারবার এই দুটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল। তৃতীয় হল এদেশ থেকে বিদেশীদের প্রত্যাগমন এবং তার আর্থিক প্রতিক্রিয়া।

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের জুরী আইনে দুরকমের বৈষম্য ছিল—ধর্মীয় বৈষম্য এবং জাতি-বৈষম্য। ধর্মীয় বৈষম্য নিয়ে বিতর্কের শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত ঐ আইনের সমর্থকরা 'ইউরোপীয়ান' এবং 'খ্রীষ্টান' এই দুটি শব্দ প্রায় সমার্থকভাবে ব্যবহার করতে থাকে। কমন্স ও লর্ডস সভার বিতর্কেও আইনটির অন্তর্নিহিত জাতি-বৈষম্যের দিকটি প্রকট হয়ে উঠেছিল। উইন, ওয়েলিংটন ও কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর বক্তব্যে জাতি-বৈষম্যের প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। এদেশীয় শ্বেতাঙ্গ ও খ্রীষ্টানরা যে আবেদন পাঠিয়েছিল, তাতেও জাতি-বৈষম্য অব্যাহত রাখার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু গ্র্যাণ্ট প্রমুখ ব্যক্তিরা আইনটি সংশোধন করার সময় ধর্মীয় বৈষম্যের অবসানের ওপরই জোর দিয়েছিলেন। তাঁরা যেন খানিকটা ইচ্ছাকৃতভাবেই জাতিবৈষম্য বা শ্বেতাঙ্গদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়েছিলেন। রামমোহন ও তাঁর সহযোগীরাও এই দিকটির ওপর বেশী জোর দেননি। সম্ভবতঃ তাঁরা আশঙ্কা করেছিলেন যে, ঐরকম একটি আবেগজনক বিষয় উত্থাপন করলে জটিলতা-বৃদ্ধি পেতে পারে এবং সহানুভূতিসম্পন্ন ইংরাজরাও দ্বিধাগ্রস্ত হতে পারেন। অবশ্য এও অনস্বীকার্য যে, সমসাময়িক ভারতীয়রা বর্ণ বা জাতিবৈষম্যের বিরুদ্ধে তখনও পর্যন্ত সোচ্চার হয়ে ওঠেননি। রামমোহন নিজেও নবজাত ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মুখপাত্র হলেও বৃটিশ শাসনের এই দিকটি সম্বন্ধে ততটা

সচেতন ছিলেন না। ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে, এর প্রধান কারণ ছিল বৃটিশ-শাসনের কল্যাণকর দিক এবং বৃটিশ ন্যায়বোধ ও বিচার সম্বন্ধে তাঁর গভীর আস্থা। কিন্তু এছাড়াও সম্পূর্ণ অন্য এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রামমোহনের ভূমিকা ও চিন্তাধারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

সর্বজনীনতার আদর্শে বিশ্বাসী রামমোহনের রচনা এবং বক্তৃতায় জাতি-চেতনার ইঙ্গিত খুব বেশী পাওয়া যায় না। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী, সহানুভূতি ও আগ্রহ ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। সুদূর দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, ইংলণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষের আশা-নিরাশা, সাফল্য-ব্যর্থতা তাঁর মনকে আন্দোলিত করত। ফরাসী দেশের বৈদেশিক মন্ত্রীকে লেখা পত্রে তিনি লিখেছিলেন যে, সমগ্র মানবজাতি এক বিরাট পরিবারভুক্ত ; বিভিন্ন জাতি, উপজাতি সেই একই পরিবারের শাখামাত্র।

তাঁর Precepts of Jesus গ্রন্থের ভূমিকায় রামমোহন বলেছিলেন যে, জাতি, বিত্ত, পদমর্যাদা প্রভৃতি কোন কিছুর বিভেদ না রেখে ঈশ্বর সব মানুষকেই নিরাশা, বেদনা, মৃত্যু এবং সর্বোপরি তাঁর অসীম করুণার অংশীদার করেছেন। যীশুর বাণী 'মানব-জাতি'র (Human Race) জীবন-নিয়ন্ত্রণের উপযোগী। এই মানবজাতির কল্যাণচিন্তাই ছিল রামমোহনের জীবন ও চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

১৮৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে জাতি-বৈষম্য সমস্যা এবং আইনের দৃষ্টিতে সমতা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের এক নবপর্যায়ের সূচনা হয়। এর মূলে দুটি প্রধান কারণ ছিল। প্রথমতঃ ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের নতুন সনন্দ আইনে (Charter Act) ভারতবর্ষে কোম্পানী শাসনাধীন অঞ্চলে ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গদের প্রবেশ এবং স্থায়ীভাবে বসবাসের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, তা তুলে নেওয়া হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, এই বিষয়টি নিয়ে ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে বেশ কিছুদিন ধরে বিতর্ক চলছিল। রামমোহন প্রমুখ ভারতীয়রা মনে করছিলেন যে, নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলে আরও অধিকসংখ্যক শিক্ষিত, বিত্তবান ও ভদ্র পরিবারের শ্বেতাঙ্গরা এদেশে আসবেন ও স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন। তার ফলে এদেশ থেকে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা যে প্রচুর পরিমাণ অর্থ-সম্পদ বিদেশে প্রেরণ করছিলেন, তা কমে যাবে এবং ভারতীয় অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে। তাছাড়া ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে আশার ফলে ভারতের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে। কিন্তু রাধাকান্ত দেব প্রমুখ রক্ষণশীল ব্যক্তিরা এবং অন্যান্য অনেকেও এই অভিমত সমর্থন করেননি। তাঁরা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ইংলণ্ডেও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সম্ভাব্য সুফল ও কুফল নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক চলেছিল। শেষ পর্যন্ত নতুন সনন্দ আইনে ভারতে ইউরোপীয়দের প্রবেশ ও বসবাসের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছিল। এর ফলে ইংরাজ শাসনাধীন অঞ্চলে বসবাসকারী শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়দের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায় এবং জাতি-বৈষম্য ও আইনের দৃষ্টিতে সমতা রক্ষার সমস্যা আরও ব্যাপক ও জটিল হয়ে ওঠে।

[ক্রমশঃ]

নবমীর চাঁদ

স্ব-মো-দে

নবমীর চাঁদ ডুবে গেল ঐ
দশমী রবির উদয়রাগে
সানাই কাঁসর কাড়া-নাকাড়ার
বিদায়ের সুরে বেদনা জাগে।

সাঙ্গ হ'ল কি অকালবোধন
ধূলার ধরণী বিষাদ-মগন
স্বর্ণদ্যুতির শরৎ-তপন
ম্লান তাই হায় নীলিমাকাশে!

শিউলি ঝরিয়া ধূলায় মলিন
হিমে ভিজে ভিজে—নয়ন ভাসে।
নীরব স্তব্ধ পূজা-কোলাহল,
আকাশে উড়ে না বলাকার দল।

শরৎরানীর আঁখি ছলছল
আনন্দময়ী বিদায় মাগে;
নবমীর চাঁদ ডুবে গেল ঐ
দশমী রবির উদয়রাগে।

অভয় ভাষা

শ্রীশ্যামলবরণ সাহা

সমাজের বনে আমি
সামাজিক জীব হয়ে বেঁচে আছি;
এখানে
এখনো ছড়ায় অনেক জীব
জিভের বিষাক্ত লালা;
তখনি খুঁজেছি আমি
'মন—কোণ—বন'।
সেখানেও
নিঃশব্দ নিরালায় কেবলি
শুনেছি প্রতিধ্বনি:
'খালি পেটে ধর্ম হয় না।'

তখন সূর্যের তাপে সেঁকে নিই
আমার সমস্ত দেহ।
তারপর? ...
সোজা মেরুদণ্ডের শীর্ষে
উড়াই আমি
আমার মানবতার পতাকা;
পৌষের শীতের মতো কাঁপা
পতাকার মুখে শুনি
শুধু অভয় ভাষা—
'জীবন? ...ভয় কী?
মৃত্যু? ...ঘর-বদল।'

নিত্য ও অনিত্য*

ডক্টর অনিলেন্দু চক্রবর্তী

সর্বময় এক সত্তা—অধঃ-ঊর্ধ্বে অভ্যন্তরে, রূপে ও স্বরূপে
রূপাতীতে। স্থানান্তর কালান্তর পাত্রান্তরে বৈষম্য-অতীত
নিত্য সে, সমস্ত বিকারহীন সর্বগুণে আছে।
আদি-অন্তে নিত্যের স্বরূপ, স্বমধ্যে ভাসিছে তারি
অনিত্যের মায়া : ইন্দ্রিয়ের বিলসন চলচ্ছবি যত
জাগে আর নেভে,—ভ্রূকুটিতে বারংবার আনে
বজ্রঝড়, অস্বীকার করে সত্যধৃত তার বন্দিনী জীবন,
দাপটে দেখায় সে যে কত স্বয়ম্ভর কত শক্তিধর,
কত না স্বাধীন! নিজ শক্ত দাঁতে খণ্ড খণ্ড করে তার
ইন্দ্রিয়-শরীর—বস্তুঘাতে ভাঙ্গে যা বাস্তব।
বিধ্বংসী স্বরূপ তার ভগ্নাংশ-বিকারে যত স্ফীত করে
তত যেন দিগ্বিজয়ী সম্রাট সে সাজে! তাকে বড় যে-ই জানে
সঙ্কুচিত কাঁপে; ভয়ে ভূলুণ্ঠিত হয়। আর সত্যকে যে
সর্বজয়ী নিত্যসত্তা জানে—নাটকে ঘাতক সাজা দেখে
নির্বিকার, জানে অসহায় অপমৃত্যু বিরাট বিকৃতি-রূপে
জীবনেরে ব্যঙ্গ করে, ভূতেশকে শাসায় সে ভূতবেশে।
সত্যের অনন্ত ব্যূহে অমঙ্গল অনৃত যে দাপট দেখিয়ে
সরে যায়—পড়ে যায় নিজহাতে গড়া সমাধিতে;
সত্যের আকাশ চিরনির্বিকার মঙ্গল-কিরণে হাসে।
ঝঞ্ঝার দাপট কিংবা কুহেলী ঝাপট সে তো মিথ্যাগর্ভ—
মিথ্যা হয়ে যায় যথাকালে, জীবনকে ধরে সে রাখে না।

---

* বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৫।৫।১ অবলম্বনে। সত্য : 'স' ও 'য' হ'ল নিত্য বা সত্যের স্বরূপ; 'ৎ' হ'ল অনিত্য বা মিথ্যার স্বরূপ—মধ্যবর্তী বিকারবিশেষ। স+ৎ+য=সত্য।

ওঠো যত হতমান

স্বামী বিবিক্তানন্দ

শুন শুন ভাই 'বিবেকে'র বাণী
মুছে ফেলে দাও জাতি কুল গ্লানি
নতুন ভারত করিতে গঠন
এসো ছুটে ত্বরা করি'।

কেহ নহে ছোট এই দুনিয়ায়
সবার মাঝারে এক প্রেমময়
দরশ তাঁহারে করো অনুখন
চিত্ত শুদ্ধ করি'।

যারা করে বাস চাষার কুটীরে
ঝোড়-জঙ্গল পাহাড়ের চূড়ে
মুচি-মেথরের ঝুপড়ি-ভিতরে
ভুনাওয়ালার উনুনের ধারে
দলিত নরসমাজ—
যুগ যুগ ধরি সহিছে যাতনা
পায় নাই কভু আপন পাওনা
শোধিতে তাদের হবে সব দেনা—
কম্বুকণ্ঠে গরজে শোন না
বিবেকানন্দ আজ।

আমি অতি দীন ঘৃণিত মন্দ
এ হীন ভাবনা করো হে'বন্ধ
নিজ মহিমায় ছাড়িয়া সন্দ
ওঠো যত হতমান।

অভীর মন্ত্র বাজিতেছে কানে
সাধিতে কি তাহা হবে না জীবনে
সময় আছে কি সময়-হরণে
অমৃতের সন্তান!

আপন কার্য করিতে সাধন
নিজ অধিকারে হও দৃঢ়পণ।
সিংহ কেন যে মেষের মতন
কাটায় খিন্ন দিন!

অভয় মন্ত্রে তোল একতান
স্বার্থবোধের হোক অবসান
মা'র পায়ে সব করো বলিদান
কেহ নহে, নহে হীন।

কর্মযোগ

শ্রীদিলীপ দাস

প্রতিটি কর্ম করো
আবেগের জোয়ারে নয়
বুদ্ধির আলোকে,
যে-বুদ্ধি প্রস্ফুটিত হয়—
সত্য শিব সুন্দরের ভাবনায়
আনন্দ ও প্রেমের সাধনায়।
সেই কর্মে দূর হবে জীবনের দুঃখ সব
নতুন বিশ্বে জাগবে আনন্দ-উৎসব।

চিন্ময় তুমি আনন্দময়

শ্রীমোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায়*

তুমি সুন্দর মনোহর তুমি নিত্য নিরঞ্জন
দিব্য দ্যুতির তোমাতে দ্যোতনা—করো ভয় ভঞ্জন।
শঙ্কাহরণ শঙ্খ তোমার
ধ্বনিত রণিত হয় বার বার
তুমি হে শান্ত—অশান্ত কভু মত্ত প্রভঞ্জন
তোমাতে বহিছে সৃষ্টিলীলার মধুর প্রস্রবণ।

তুমি সৃষ্টির বাঁশরী বাজাও—মোহন মধুর সাজে
তোমার হাতেই শুনি প্রলয়ের বজ্রবিষাণ বাজে।
তোমাতে উদয়, তোমাতে বিলয়
তুমিই উৎস—শেষ আশ্রয়
তোমাতেই হেরি বিশ্বসৃষ্টি—তুমি ছাড়া কেবা আছে!
বিশাল প্রকৃতি উন্মাদ হয়ে ছুটিছে তোমার কাছে।

ভিতরে বাহিরে তুমি একাকার—অম্লান অপরূপ
রূপে রূপে হেরি অরূপ তোমার বিশ্বে বিশ্বরূপ।
মহা সৃষ্টির তুমি মূলাধার
তোমা ছাড়া নেই কিছুই তো আর
তোমার চরণপদ্মে মজিতে এ মন-মধুপ চায়।
সে মকরন্দ পান ক'রে যেন সুখ-দুখ সব যায়।

চিন্ময় তুমি আনন্দময়—তোমারি ধেয়ান করি
স্মরি তব নাম অকূল সাগরে ভাসাই জীবনতরী।

---

* সম্পাদক, 'কেতকী'

'করিষ্যে বচনং তব'

ডক্টর হরিপদ চক্রবর্তী*

শ্রীবৈষ্ণবীয় তন্ত্রসার গ্রন্থে গীতামাহাত্ম্য বর্ণনায় উক্ত হয়েছে—'সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ। পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥' গীতা দুগ্ধ-স্বরূপ। মহামৃতরূপ এই দুগ্ধের ধেনু বা উৎস—উপনিষদ্। দোহনকারী—শ্রীকৃষ্ণ। বৎস—পার্থ। পার্থের প্রশ্নে উপনিষদ্ মন্থন ক'রে যে সার-তত্ত্ব সংগ্রহ ক'রে উত্তর দিয়েছিলেন পার্থ-সারথি—তাই গীতা। উপনিষদের এক নাম ব্রহ্মবিদ্যা। জিজ্ঞাসু শিষ্যকে গুরু ব্রহ্মবিদ্যা দান করেন। আমি, তুমি এবং আমি-তুমি ছাড়া সব কিছু—ব্যাকরণশাস্ত্রে উত্তম-মধ্যম-প্রথম পুরুষ—এই তিনরূপেই তো প্রত্যেকের কাছে ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ। এই জগতের স্বরূপ কী?— কিমিদম্? তোমার স্বরূপ কী?—কস্ত্বম্? আমি কে?—কোঽহম্? এই প্রশ্নত্রয়ের উত্তর উপনিষদ্ দিয়েছেন—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'; 'তত্ত্বমসি'; 'অহং ব্রহ্মাস্মি'। এই ব্রহ্মচেতনা, ব্রহ্মলাভই মনুষ্যজীবনের চরম প্রাপ্তি। উপনিষদের এটিই সার কথা।

তুরীয়ক্ষেত্রে আমি-তুমি-সে এক ও অখণ্ড হলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কিন্তু এদের মধ্যে তারতম্য নয় শুধু—পার্থক্য প্রচুর। আর এই ব্যবহারিক জগৎকে মায়া বা মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দেওয়াও সম্ভব নয়। জীবনানুশীলনের মধ্য দিয়েই তো আমরা ব্রহ্ম-সচেতন মহাজীবনের দিকে তিলে তিলে অগ্রসর হই, অমৃতত্ব লাভ করি। কাজেই উপনিষদের যে জিজ্ঞাসা, তাকে বর্তমান পরিভাষায় বলা চলে জীবন-জিজ্ঞাসা। এই জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর-সার হচ্ছে 'গীতামৃতং মহৎ'।

এই জিজ্ঞাসা নিত্য নিয়ত বিচিত্র কামনার তরঙ্গে আন্দোলিত হচ্ছে মানুষের মনে। কিন্তু একটা তীব্র সংকটমুহূর্তেই কেবল পরিপূর্ণ অবয়ব নিয়ে তা প্রত্যক্ষ হয়, যেমন হয়েছিল অর্জুনের মনে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রাক্‌কালে। যুদ্ধ করা, যুদ্ধে আততায়ীকে নিধন করা—শুধু পারিবারিক নয়, সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব, ক্ষত্রিয়ের অপরিহার্য ধর্ম ও কর্তব্য—একদিকে। অপর দিকে আত্মীয়বর্গ- ও প্রিয়-জন-বধের আশঙ্কা-আতঙ্ক শোকার্ত ব্যক্তি-হৃদয়ের অসহ বেদনা। উভয় সংকটে 'শোক-সংবিগ্নমানসঃ' অর্জুন 'ধর্মসংমূঢ়'-চিত্তে কোন্‌টি শ্রেয়, কী করা উচিত তা জানতে চাইলেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে—বন্ধুরূপে নয়, শরণাগত শিষ্যরূপে 'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্' (২।৭)। জীবন-প্রশ্ন—বিচিত্র কর্ম-চিন্তা-আবেগ-চঞ্চল জীবন—জন্ম-মৃত্যু-ভয়-ব্যথা-সংকুল অসংখ্য প্রশ্ন উত্তাল হয়ে উঠল অর্জুনের মনে। একদিক দিয়ে প্রতিটি মানুষই অর্জুন। কোন কোন সময় কুরুক্ষেত্রের সংকট ঘনায় জীবনে। জীবন-রথের অচেনা সারথির কাছে উচ্ছ্বসিত

---

* এম. এ., পিএচ্. ডি.। প্রাক্তন 'বিদ্যাসাগর' অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ, উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। 'দাশরথি ও তাঁহার পাঁচালী', 'দাশরথি রায়ের পাঁচালী' এবং 'বৈষ্ণবপদ-নৈবেদ্য'—ইঁহার প্রধান প্রকাশিত গ্রন্থ।

হয়ে উঠে ব্যথাভরা অনন্ত জিজ্ঞাসা। স্থান-কাল-পাত্র অর্থাৎ যুগভেদে এই সংকট ও সমাধানের রূপ বা বহিরঙ্গ ঢং বদলায় বটে, কিন্তু স্বরূপতঃ তা অপরিবর্তনীয়। অনেকে এই কারণে গীতাকে রূপক বলে থাকেন। স্বামীজীও গীতার প্রথম অধ্যায়টিকে রূপক হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে বলেছেন। [স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড]। রূপক অনেক সময়ে বাস্তবতার সীমাকে বিস্তৃত ক'রে তার অন্তর্নিহিত বিষয়কে একটা মহত্তর তাৎপর্যে ও সার্বজনীন লোকোত্তরতায় উন্নীত করে।

গীতাগ্রন্থের পঠন ও শ্রবণাদির নানা ফল গীতামাহাত্ম্যে বর্ণিত হয়েছে। কোন কার্যকে জনপ্রিয় ও আকর্ষণীয় ক'রে তোলার জন্য মানুষের কামনার বা প্রয়োজনের অর্থাৎ মনোগত অভিমুখিতার দিকে দৃষ্টি রেখে প্রাচীন কালেও নানা লোভনীয় বাগ্‌বিস্তার—এখনকার বিজ্ঞাপনাদি-প্রচারের মতো—করা হোতো ব'লে অনেকে মনে করেন। এটা মোটেই অসম্ভব নয়, কারণ মানুষের প্রতিটি কর্মের মূলে থাকে অভাববোধের, প্রয়োজন-বোধের তাগিদ। কিন্তু কেবল শ্রবণ-পঠন-পাঠনের মধ্যেই গীতাচর্চার চরম ফল নিহিত, একথা যথার্থ বলে মনে হয় না। গীতা সাধন-শাস্ত্র। ব্যক্তি-জীবনের সঙ্গে মহাজীবনের—জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের—যোগ সাধন করতে হবে, এটাই গীতার শিক্ষা। কর্ম জ্ঞান ভক্তি যোগসাধনা—যে পথেই হোক্ তা অবশ্য করণীয়। এইজন্য গীতাতে কর্ম শুধু কর্ম নয়—কর্মযোগ, ভক্তি—ভক্তিযোগ, জ্ঞান—জ্ঞান-যোগ। অর্থাৎ কর্ম জ্ঞান ভক্তি প্রমুখ যাবতীয় পথে মানুষের গতি যখন ঈশ্বর বা ব্রহ্মাভিমুখী হয় তখন জীবন যোগযুক্ত। এইজন্যই বোধহয় গীতার অধ্যায়ান্তিক পরিচয়ে লেখা হয়ে থাকে '...শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে...' ইত্যাদি। পঠন-শ্রবণাদির দ্বারা আগ্রহবৃদ্ধি হয়, শ্রদ্ধা জন্মে এবং তা থেকেই আসে আচরণ-ইচ্ছা। গীতা পুরোপুরি আচরণ-শাস্ত্র, যোগ কর্মের কৌশল—'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্।' (২।৫০) কী ভাবে কর্ম করলে, জ্ঞান-ভক্তি-যোগাদি সাধন করলে সিদ্ধি বা ব্রহ্মলাভ সহজতর হয়—গীতায় তারই উপদেশ।

কী বলেছেন শ্রীভগবান বারবার অর্জুনকে?—'দুর্বলতা ত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়াও; যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর' [তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ —২।৩৭]। যুদ্ধ মানে সংসারে কর্তব্যকর্ম করা। করার কৌশলটি শিখে নিলে আর ভয় থাকে না। কৌশলটি কী? কর্তৃত্ববুদ্ধি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ ক'রে, অনাসক্ত হয়ে, নিমিত্তমাত্র হয়ে কাজ করা। [নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্—১১।৩৩]। সতেরটি (২-১৮) অধ্যায়ে অর্জুনের যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গীতাগ্রন্থে তাঁর শেষ উক্তিটি করলেন শ্রীভগবান—'খুব মন দিয়ে আমার কথাটি শুনেছো তো অর্জুন, তোমার অজ্ঞান-সম্মোহ নষ্ট হয়েছে তো?' ['কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা। কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয়॥' ১৮।৭২] অর্জুনও গীতায় তাঁর শেষ উত্তরটি নিবেদন করলেন শ্রীকৃষ্ণকে—'হে অচ্যুত, আমার মোহ সন্দেহ নষ্ট হয়েছে, স্মৃতি ফিরে পেয়েছি—তোমার নির্দেশিত কাজ আমি করবো।' ['নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎ-প্রসাদান্ময়াচ্যুত। স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥' ১৮।৭৩] সর্ব-মোহ-সংশয়-মুক্ত হয়ে ঈশ্বর-নির্দিষ্ট পথে কর্ম করার প্রতি-শ্রুতিই গীতাপাঠের মূল কথা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সার কথাটি এইভাবে বলেছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব—'গীতার অর্থ কি? দশবার বললে যা হয়। গীতা গীতা দশবার বলতে গেলে ত্যাগী ত্যাগী হয়ে যায়। গীতার এই শিক্ষা—হে জীব, সব ত্যাগ করে ভগবানকে লাভ করবার চেষ্টা কর। সাধুই হোক, সংসারীই হোক, মন থেকে সব আসক্তি ত্যাগ করতে হয়। [কথামৃত : ৩য় ভাগ, ১ খণ্ড, ৫ পরিঃ] অন্যান্য প্রসঙ্গেও গীতার —'ত্যাগ'-তত্ত্বই বারবার বলেছেন ঠাকুর। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে সাধনমার্গে অভ্যাস জ্ঞান ধ্যান কর্মফলত্যাগ—এগুলির ক্রমশ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করেছেন ভগবান দ্বাদশ অধ্যায়ে এবং 'ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্' (১২।১২) ব'লে ত্যাগের মহিমাই প্রতিষ্ঠা করেছেন।

কর্মযোগ, ভক্তিযোগাদি সম্বন্ধে আলাদা আলাদা আলোচনা ছাড়াও স্বামীজী ১৯০০ খৃষ্টাব্দে স্যানফ্রান্‌সিস্‌কোতে গীতা সম্বন্ধে তিনটি আলাদা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। অন্যত্রও নানা প্রসঙ্গে গীতার বিভিন্ন দিকের কথা আলোচনা করেছেন তিনি। ত্যাগের গুরুত্ব সম্বন্ধে স্বামীজীর দুটি মন্তব্যের উল্লেখ করা যাক। (১) 'কেবল ত্যাগের দ্বারাই এই অমৃতত্ব লাভ হইয়া থাকে, ত্যাগই মহাশক্তি।…ত্যাগই ভারতের সনাতন পতাকা।' [সর্বাবয়ব বেদান্ত] (২) 'যুবকগণের নিকট এখন এই আহ্বান আসিয়াছে—"কাজ করো, ঝাঁপিয়ে পড়ো, ত্যাগী হয়ে জগৎকে উদ্ধার করো।"' [মদীয় আচার্যদেব]। শুধু অনাসক্তি বা কর্তৃত্ব- ও কর্মফল-ত্যাগ নয়—স্বামীজী ত্যাগের ক্ষেত্রে গীতার নির্দেশ সর্বপ্রকার দুর্বলতা-আলস্য-ভয়-শোক-মোহ ত্যাগের উদাত্ত আহ্বানের মধ্যেও লক্ষ্য করেছেন। তাঁর মনে হয়েছিল আসক্তি অপেক্ষা সমকালের ভারতীয়দের বড় শত্রু ভয় আলস্য দুর্বলতা। কলিকাতার তরুণ শিষ্যবর্গের কাছে গীতাতত্ত্ব ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ' ইত্যাদি (২।৩) শ্লোকটি সম্বন্ধে বলেছিলেন—'তোমরা যদি জগৎকে এ-কথা শুনাইতে পারো—"ক্লৈবং মাস্ম গমঃ"…, তাহা হইলে তিন দিনের ভিতর এ-সকল রোগ-শোক পাপ-তাপ কোথায় চলিয়া যাইবে। এখানকার বায়ুতে ভয়ের কম্পন বহিতেছে। এ কম্পন উলটাইয়া দাও। তুমি সর্বশক্তিমান—যাও, তোপের মুখে যাও, ভয় করিও না। মহাপাপীকে ঘৃণা করিও না,—তাহার বাহির দিক দেখিও না। ভিতরের দিকে যে পরমাত্মা রহিয়াছেন, সেই দিকে দৃষ্টিপাত কর; সমগ্র জগৎকে বলো—তোমাতে পাপ নাই, তাপ নাই, তুমি মহাশক্তির আধার। এই একটি শ্লোক পড়িলেই সমগ্র গীতাপাঠের ফল পাওয়া যায়, কারণ এই শ্লোকের মধ্যেই গীতার সমগ্র ভাব নিহিত।' [বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড—গীতাতত্ত্ব]

উপনিষদের নামান্তর ব্রহ্মবিদ্যা, যা ব্রহ্মবিদ্ ঋষির অপরোক্ষজ্ঞানলব্ধ সত্য। অধিকারী অন্তেবাসীকে গুরু এ বিদ্যা দান করেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন ব্রহ্মবিত্তম — সবিকল্প-নির্বিকল্প-সমাধিভূমিতে যথেচ্ছ-বিহারী, অদ্বৈত ও লীলাবাদের মূর্ত বিগ্রহ। তাঁর অনুভব ও আস্বাদনের কথা শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলীকে নানা ভাবে বলেছেন তিনি, তাঁর অনবদ্য ভাষায়, সঞ্চারণ করেছেন আনন্দের শিহরন। কথামৃতে ও অন্যত্র সমাহৃত এই বাণীগুলিকে বলা যায় শ্রীরামকৃষ্ণোপনিষৎ এবং তার সার তত্ত্বকে শ্রীরামকৃষ্ণ-গীতা। কিন্তু এই সার তত্ত্ব নির্বাচন করার পন্থা কী? ঠাকুর তাঁর ত্যাগী শিষ্যদের

যে-কথা বলতেন, গৃহী ভক্তদের সর্বদা সে-কথা বলতেন না। কারণ শুধু অধিকারীভেদ ও প্রয়োজনের পার্থক্য নয়, সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তের মধ্যে ধর্মে-কর্মে বিভিন্নতাও অনেকখানি। কাজেই শ্রীরামকৃষ্ণ-গীতা সর্বতোভাবে অবিসংবাদী হবে এটা আশা করা ভুল। তবে ঠাকুরের এমন কতগুলি দিব্য অনুভব ও উপদেশ আছে যা সনাতন, সার্বভৌমিক ও সর্বজনীন, যা শুধু ভারতীয় ধর্মের সিদ্ধান্ত নয়, বিশ্বমানবধর্মের পরম অধ্যাত্ম সম্পদ। এগুলিকে শ্রীরামকৃষ্ণ-গীতা বলা চলে।

আরও একটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি আলোচনা করা যায়। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদর্শ প্রচার করা—যার সংঘবদ্ধ অবয়বের নাম রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন। স্বামীজী ঠাকুরের কোন্ কোন্ উপদেশ কর্মে রূপ দিয়েছেন, লেখায় ও বক্তৃতায় কোন্গুলির উপর জোর দিয়েছেন বেশি, মিশনের বহুমুখী কর্মের মধ্যে কোন্গুলি অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছে—তার সংকলিত রূপ শ্রীরামকৃষ্ণ-গীতা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নানা সাম্প্রদায়িক ভাষ্য আছে—স্বানুভূতি ও জ্ঞানের আলোকে আচার্যগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ-গীতারও বিভিন্ন ভাষ্য হওয়া বিচিত্র নয়। তবে এ-সত্য তর্কাতীত যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-গীতার মুখ্য ভাষ্যের নাম বিবেকানন্দ-ভাষ্য। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ যে দৃষ্টি দিয়ে ঠাকুরকে দেখেছেন ও বুঝেছেন—অন্যে পরে কা কথা—তাঁর গুরুভ্রাতৃগণও সর্বদা বিনা বাধায় ও বিনা দ্বিধায় তা গ্রহণ করেন নি। অনেক আছে, এখানে স্বামি-শিষ্য-সংবাদ থেকে একটি অংশ উদ্ধার করা যাক।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসের পয়লা তারিখে স্বামীজী ৺বলরাম বাবুর গৃহে বিকেল বেলায় ঠাকুরের গৃহী ভক্তদের সভা ডাকলেন। স্বামী যোগানন্দও উপস্থিত ছিলেন। সেখানে স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক আলোচনা, উদ্দেশ্য ও নিয়মকানুনাদি আলোচনা করলেন। এই সভাশেষে সবাই চলে গেলে এই আলোচনা হোলো।

স্বামী যোগানন্দ। তোমার এ সব বিদেশী ভাবে কাজ করা হচ্ছে। ঠাকুরের উপদেশ কি এ রকম ছিল?

স্বামীজী। তুই কি করে জানলি এ সব ঠাকুরের ভাব নয়? অনন্তভাবময় ঠাকুরকে তোরা তোদের গণ্ডিতে বুঝি বদ্ধ ক'রে রাখতে চাস? আমি এ গণ্ডি ভেঙে তাঁর ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব। ঠাকুর আমাকে তাঁর পূজাপাঠ প্রবর্তনা করতে কখনো উপদেশ দেন নি। তিনি সাধন-ভজন, ধ্যানধারণা ও অন্যান্য উচ্চ উচ্চ ধর্মভাব সম্বন্ধে যে সব উপদেশ দিয়ে গেছেন, সেগুলি উপলব্ধি ক'রে জীবকে শিক্ষা দিতে হবে। অনন্ত মত, অনন্ত পথ, সম্প্রদায়-পূর্ণ জগতে আর একটি নূতন সম্প্রদায় তৈরী ক'রে যেতে আমার জন্ম হয় নি। প্রভুর পদতলে আশ্রয় পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি। ত্রি-জগতের লোককে তাঁর ভাব দিতেই আমাদের জন্ম।...এবার এ দেশে কিছু কাজ ক'রে যাব। তোরা সন্দেহ ছেড়ে আমার কাজে সাহায্য কর, দেখবি—তাঁর ইচ্ছায় সব পূর্ণ হয়ে যাবে।

স্বামী যোগানন্দ। তুমি যা ইচ্ছে করবে, তাই হবে। আমরা তো চিরদিন তোমারই আজ্ঞানুবর্তী। ঠাকুর যে তোমার ভিতর দিয়ে এ সব করছেন, মাঝে মাঝে তা বেশ দেখতে পাচ্ছি। তবু কি জানো, মধ্যে মধ্যে কেমন খটকা লাগে—ঠাকুরের কার্যপ্রণালী অন্যরূপ দেখেছি কি না; তাই মনে হয়, আমরা তাঁর

শিক্ষা ছেড়ে অন্য পথে চলছি না তো? তাই তোমায় অনুরূপ বলি ও সাবধান ক'রে দিই।

স্বামীজী। কি জানিস, সাধারণ ভক্তেরা ঠাকুরকে যতটুকু বুঝেছে, প্রভু বাস্তবিক ততটুকু নন। তিনি অনন্তভাবময়। ব্রহ্মজ্ঞানের ইয়ত্তা হয় তো প্রভুর অগম্য ভাবের ইয়ত্তা নেই। তাঁর কৃপাকটাক্ষে লাখো বিবেকানন্দ এখনি তৈরী হতে পারে। তবে তিনি তা না ক'রে এবার আমার ভিতর দিয়ে, আমাকে যন্ত্র ক'রে এরূপ করাচ্ছেন—তা আমি কি করব—বল?

[বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড]

শ্রীরামকৃষ্ণোপনিষদের অর্থাৎ ঠাকুরের অমৃতময়ী বাণী থেকে সার চয়ন ক'রে আমরা দশটি সিদ্ধান্ত ও নির্দেশকে শ্রীরামকৃষ্ণ-গীতা রূপে চিহ্নিত করছি। ঠাকুর বিভিন্নভাবে এইগুলি বলেছেন। ঠাকুরের ভাষা উল্লেখ করলাম না, কারণ এইগুলি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধাশীল পাঠকের মনে তা ফুটে উঠবে, জিজ্ঞাসু পাঠক শুধু 'কথামৃত' পাঠ করলেই বুঝতে পারবেন। (১) মানবজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। (২) নানা নামে ও রূপে উক্ত হলেও স্বরূপতঃ ব্রহ্ম বা পরমতত্ত্ব এক ও অদ্বিতীয়। (৩) বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়, উপাসনা-পদ্ধতি ও মত একই ঈশ্বরলাভের জন্য বিভিন্ন পন্থামাত্র। (৪) অধিকারীভেদে মত ও পথের পার্থক্য। (৫) ঈশ্বরলাভের উপায় ত্যাগ অনাসক্তি বিশ্বাস বিবেকবৈরাগ্য ব্যাকুলতা ও শরণাগতি। (৬) কলিতে ভক্তিযোগ মুখ্য উপায়। (৭) প্রধান বাধা কামিনী-কাঞ্চন। (৮) ঈশ্বরই জীব-জগৎ হয়েছেন। (৯) শিবজ্ঞানে জীবসেবা করা উচিত। (১০) লোকশিক্ষার জন্য ঈশ্বরের আদেশ চাই। এই দশটি সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ বিশ্লেষণ করলে ঠাকুরের সব ভাবগুলিই মোটামুটি পাওয়া যাবে। পঞ্চম সূত্রের ছ'টি উপায়ের প্রত্যেকটি এক-একটি আলাদা সূত্ররূপে বিচারের যোগ্য এবং ষষ্ঠ সূত্রে কৃপা, 'পাকা আমি' ও আমমোক্তারি অনুস্যূত। সুতরাং উক্ত ভাবগুলিকে বিশদ করলে আরও (৫+৩) আটটি সূত্র বেড়ে যায় এবং শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার মতো অষ্টাদশাধ্যায়েও শ্রীরামকৃষ্ণ-গীতা আলোচনা সম্ভব।

ঠাকুরের শিষ্যমণ্ডলীর ঠাকুর-মনোনীত নেতা তথা ঠাকুরের মতাদর্শের মুখ্য ধারক ও বাহক ছিলেন নরেন্দ্রনাথ। ঠাকুরের অন্তর্ধানের (১৬ই অগস্ট, ১৮৮৬) পর স্বামীজী দেহে ছিলেন মাত্র ১৬ বৎসর কাল। এই সময়ের প্রথম সাত বৎসর কাল (আমেরিকা যাত্রার কাল পর্যন্ত—৩১শে মে, ১৮৯৩) মুখ্যতঃ ভারত-প্রব্রজ্যা ও সাধনকাল, পরবর্তী নয় বৎসর (৪ঠা জুলাই, ১৯০২ পর্যন্ত) লোকশিক্ষা তথা ঠাকুরের মতাদর্শের প্রচারকাল। ভারত-পরিক্রমার মধ্যে স্বামীজী ভারতের নানা সমস্যা — সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সংকট-কণ্টকিত অসহায় রূপ প্রত্যক্ষ ক'রে নরনারায়ণের সেবায় জীবনোৎসর্গের সংকল্প নিয়েছিলেন। প্রতীচ্যভ্রমণের ফলে উভয় দেশের বৈসাদৃশ্য তাঁর চিন্তাকে আরও বলিষ্ঠ করেছিল। ফলে আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সমগ্র পৃথিবীর সম্মুখে স্বামীজী ধর্মসমন্বয়ের মহাবাণী, ব্রহ্মানুভূতির বা আত্মসাক্ষাৎকারের আদর্শ, সমাজ তথা নরনারায়ণসেবার নূতন পন্থা এবং ত্যাগী সন্ন্যাসী ও তরুণদের কাছে দেশপ্রেমের ও কর্মযোগের অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষাদান সম্বন্ধে নূতন কর্তব্যের নির্দেশ রাখেন। স্বামীজীর বক্তৃতা রচনা চিঠিপত্র—এইগুলির যে কোন স্থান থেকে উল্লেখ করলেই এর ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

একটি বিশেষ দিকের ব্যাখ্যা প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণ-গীতার প্রথম থেকে সপ্তম নির্দেশের মূল কথা আত্মজ্ঞানলাভ বা ঈশ্বরলাভ—'অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বাঁধা'। স্বামীজী ঠাকুরের তিরোভাবের পর সাতটি বছর এই সাধনা করেছেন। শেষ তিনটি সূত্র লোকশিক্ষা-বিষয়ক। নারায়ণই নররূপে সেবা নেন—এই বিশ্বাস নিয়ে কর্ম করা। এই কারণে স্বামীজীর চিঠিপত্রে বক্তৃতায় আলাপচারীতে কর্মের—অবশ্যই নিষ্কাম নিরাসক্ত কর্মযোগীর সেবা-ধর্মের উদাত্ত বাণী। কিন্তু ঠাকুরের আদর্শের ক্রমিক পর্যায় (আগে ঈশ্বরলাভ তারপর লোক-শিক্ষা) বিন্দুমাত্র লঙ্ঘিত হয় নি। আমেরিকা-প্রত্যাগত স্বামীজী মাদ্রাজের ভিক্টোরিয়া হলে 'আমার সমরনীতি' (My plan of campaign) নামে যে বিখ্যাত বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তাতে স্পষ্টই বলেছেন, 'ভারতে যে কোন সংস্কার বা উন্নতির চেষ্টা করা হউক, প্রথমতঃ ধর্মের উন্নতি আবশ্যক।...দানের মধ্যে ধর্মদান—আধ্যাত্মিক জ্ঞানদানই শ্রেষ্ঠ দান; দ্বিতীয় বিদ্যাদান, তৃতীয় প্রাণদান, চতুর্থ অন্নদান।' [বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড] অন্নময় কোষ থেকে আনন্দময় কোষ পর্যন্ত ব্যাপ্ত যে ব্রহ্মসত্তা—মানুষের মধ্যে যার বিকাশ—তার চতুরাঙ্গিক সেবার কার্যসূচী নিয়েছিলেন স্বামীজী। রামকৃষ্ণ মিশনের নিজ কার্যসূচী এবং রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শের অনুসরণকারী সমধর্মা বহু ধর্মীয় ও জনকল্যাণ-প্রতিষ্ঠানের কর্মপ্রণালীতে স্বামীজীর এই মহান সেবাদর্শ প্রতিফলিত।

কর্মের জন্য উদ্যম বীরত্ব সাহস ও শক্তির প্রয়োজন—যাকে আমরা ক্ষাত্রগুণ বলি। গুণত্রয়ের মধ্যে এটিকে বলে রজোগুণ। ঠাকুর স্বাভাবিকভাবেই সত্ত্বগুণের প্রশংসা করেছেন, কিন্তু স্বামীজী খোলা চোখে দেখেছেন, 'সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণ-সমুদ্রে ডুবিয়া গেল।' কাজেই তিনি বলেছেন—'চাই—সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতা-প্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা; চাই—সর্বদা-পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখসম্প্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।' [বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড] সত্ত্বগুণ সম্বন্ধে স্বামীজী ব্যবহারিক উপযোগিতার দিক থেকে বিচার করে লিখেছেন—'অতএব সত্ত্বগুণ এখনও বহুদূরে। আমাদের মধ্যে যাঁহারা পরমহংসপদবীতে উপস্থিত হইবার যোগ্য নহেন বা ভবিষ্যতে [হইবার] আশা রাখেন, তাঁহাদের পক্ষে রজোগুণের আবির্ভাবই পরম কল্যাণ। রজোগুণের মধ্য দিয়ে না যাইলে কি সত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়? ভোগ শেষ না হইলে যোগ কি করিবে? বিরাগ না হইলে ত্যাগ কোথা হইতে আসিবে?' [তদেব]

শ্রীরামকৃষ্ণ-গীতার বিবেকানন্দ-ভাষ্য প্রসঙ্গে স্বামীজীর একটি উক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা থেকে স্বামী শিবানন্দকে একটি পত্রে স্বামীজী লিখেছিলেন, '...রামকৃষ্ণ পরমহংস the latest and the most perfect (সবচেয়ে আধুনিক ও সবচেয়ে পূর্ণবিকশিত চরিত্র)—জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য, লোকহিতচিকীর্ষা, উদারতার জমাট; কারুর সঙ্গে কি তাঁহার তুলনা হয়? তাঁকে যে বুঝতে পারে না, তার জন্ম বৃথা। আমি তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের দাস, এই আমার পরম ভাগ্য, তাঁর একটা কথা বেদবেদান্ত অপেক্ষা অনেক

বড়। তস্য দাস-দাস-দাসোঽহং। তবে এক-ঘেয়ে গোঁড়ামি দ্বারা তাঁর ভাবের ব্যাঘাত হয়—এইজন্য চটি। তাঁর নাম বরং ডুবে যাক—তাঁর উপদেশ (শিক্ষা) ফলবতী হোক। তিনি কি নামের দাস?' [বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড]

বস্তুতঃ ঠাকুরের জীবনই মূর্তিমতী গীতা—তাঁর প্রতিটি কথা সত্যমূর্তি গ্রহণ ক'রে তাঁর চরিত্রে জীবন্ত। আর স্বামীজীর অলোক-সামান্য জীবনই—বিচিত্র কর্মের সমাবেশই—ঠাকুরের জীবনের শ্রেষ্ঠ ভাষ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাস্করের দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত—ঠাকুরের ভাষায়—'পদ্মমধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল

জপযোগ

স্বামী প্রমেয়ানন্দ

'জন্মান্তরসহস্রেষু কৃতপাপপ্রণাশনাৎ।
পরদেবপ্রকাশাচ্চ জপ ইত্যভিধীয়তে॥'

(কুলার্ণবতন্ত্র, ১৭।৩৪) তাৎপর্য এই যে, সহস্রজন্মের কৃত পাপ নাশ করে এবং পরদেবতাকে প্রকাশ করে যে ক্রিয়া, তাকে জপ বলে।

কোন দার্শনিক পরিভাষা হিসাবে 'জপযোগ' শব্দ এখানে ব্যবহার করা হয়নি, বা কোন জটিল দার্শনিক সমস্যার বিচার করাও এ লেখার উদ্দেশ্য নয়। অন্যান্য যোগের ন্যায় জপ অভ্যাসের দ্বারাও যে সাধক জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারেন, ভগবান লাভ করতে সমর্থ হন, এটি বোঝাবার জন্যই এখানে 'জপযোগ' শব্দের প্রয়োগ।

শ্রীশ্রীমায়ের কথায় আছে—'জপ অভ্যাস করতে করতে মানুষ সিদ্ধ হয়—জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধিঃ। ধ্যান হয় না, জপ করবে, জপাৎ সিদ্ধিঃ। জপ করলেই সিদ্ধিলাভ করবে।' 'জপ করলেই সিদ্ধিলাভ করবে'—সংসারতাপে দগ্ধ জীবকে ভগবান-রূপ শান্তির শীতল ছায়ায় নিয়ে যাওয়ার একেবারে মোক্ষম ব্যবস্থাপত্র (prescription)। আমাদের মত সাধারণ অধিকারীর পক্ষে এর চেয়ে আশার বাণী আর কি হতে পারে?

ধর্মসাধনায় সিদ্ধিলাভের উপায় হিসাবে সাধককে শ্রেয়ের পথে পরিচালিত করতে জপ একটি অপরিহার্য অঙ্গ। ত্রিতাপদগ্ধ জীবকে শান্তির পথে, ভগবানের দিকে নিয়ে যাওয়ার উপায় হিসাবে জপ অভ্যাসের বিধান দিয়ে আসছেন ঐ পথের দিশারীরা সর্বকাল ধরে, অনুপ্রাণিত করছেন নির্দেশ ও প্রেরণা দিয়ে। ঐ পথের অভিনব কুশলী দিশারী শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়—'একমনে নাম করতে করতে—জপ করতে করতে তাঁর রূপ দর্শন হয়—তাঁর সাক্ষাৎকার হয়। শিকলে বাঁধা কড়িকাঠ গঙ্গার গর্ভে ডুবান আছে—শিকলের আর একদিক তীরে বাঁধা আছে। শিকলের এক একটি পাব (link) ধরে ধরে গিয়ে ক্রমে ডুব মেরে শিকল ধরে ধরে যেতে যেতে ঐ কড়ি-কাঠ সাক্ষাৎকার হয়। ঠিক সেইরূপ জপ করতে করতে মগ্ন হয়ে গেলে ক্রমে ভগবানের

সাক্ষাৎকার হয়। জপ থেকে ঈশ্বরলাভ হয়। নির্জনে গোপনে তাঁর নাম করতে করতে তাঁর কৃপা হয়। তারপর দর্শন।' অতি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত, কোন ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

নিরন্তর জপ অভ্যাসের দ্বারা যে জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব, শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত সৃষ্টি লাটু মহারাজ তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। উচ্চতম আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী লাটু মহারাজের জপই ছিল প্রধান সহায়, বিশেষ করে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্থূল শরীরের অন্তর্ধান হওয়ার পর থেকে।

'জপ করা কিনা নির্জনে নিঃশব্দে তাঁর নাম করা।' সাধকের মানসিক সংস্কার ও রুচি অনুযায়ী বিশেষ কোন দেবতার নাম বার বার আবৃত্তি করার নামই জপ। এক ঈশ্বরই বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তিতে—কালী দুর্গা শিব নারায়ণ রাম কৃষ্ণ বা রামকৃষ্ণরূপে বিরাজমান। তবে যে সাধক ভগবানকে যে রূপে দেখতে ইচ্ছা করেন, যে রূপে তাঁর চিন্তা করতে ভালবাসেন, ভগবানও সে সাধকের জন্য সে রূপেই দর্শন দিয়ে তাঁকে অনুগৃহীত করেন। গীতায় ভগবানের—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্' (৪।১১)—আমাকে যারা যে-ভাবে আশ্রয় করে, আমিও তাদের সে-ভাবেই অনুগ্রহ করি—উক্তিটি এ প্রসঙ্গে বিশেষ স্মরণীয়। তাই সাধক-জীবন পাঠে আমরা জানতে পারি বিভিন্ন সাধকের বিভিন্নরূপে ভগবদ্দর্শনের প্রেরণাদায়ক অদ্ভুত সব কাহিনী। তাঁদের জীবনালোকে নিজেদের পথ চলার প্রেরণা লাভের জন্য আমরা চিরকাল ধরে তাঁদের ধরে রেখেছি নিজেদের মানসপটে, ধরে রেখেছি তাঁদেরই মত ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করে পরিপূর্ণ জীবনের আস্বাদ পেতে। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনীর পাঠকেরা 'কামারহাটীর বামনী'র (গোপালের মার) অদ্ভুত জীবনকথার সঙ্গে সুপরিচিত। শ্রীশ্রীঠাকুরকে কেন্দ্র করে সেই গোপালভাবের অশ্রুতপূর্ব লীলা এবং ঠাকুরের মধ্যে নিজ ইষ্ট গোপালের দর্শনের অবিস্মরণীয় কাহিনী আজও সমানভাবে আকর্ষণ করে পাঠকদের বিস্ময়-মুগ্ধ চিত্তকে, অনুপ্রাণিত হন তাঁরা দৃঢ় পদক্ষেপে আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। এ প্রসঙ্গে রামচন্দ্র-গত-প্রাণ ভক্তাগ্রণী মহাবীরের কথা বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। তাঁর কথায়—'শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি। তথাপি মম সর্বস্বঃ রামঃ কমল-লোচনঃ॥'—শ্রীনাথ এবং জানকীনাথ একই পরমাত্মার দুটি বিভিন্ন রূপ মাত্র, তথাপি আমি তাঁকে কমললোচন শ্রীরামচন্দ্ররূপেই দেখতে অভিলাষী, ঐ চরণেই যে আমি আমার মন প্রাণ সব অর্পণ করেছি।

এবার আমরা আবার আমাদের মূল বক্তব্যে ফিরে আসি। সাধকমাত্রেই জানেন, করে বা মালায় সংখ্যা রেখে গুরু-নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে জপ করতে হয়। 'সংখ্যাং বিনা মন্ত্রজপস্তথা মন্ত্রপ্রকাশনম্' (হরিভক্তিবিলাস, ২য় বিঃ।১১৯)—সংখ্যাবিহীন জপ ও নিজের মন্ত্র কখনও প্রকাশ করা উচিত নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সংখ্যা রেখে জপ করা ইত্যাদির বিশেষ কোন তাৎপর্য আছে কি? শ্রীশ্রীমা বলতেন—'সংখ্যা, করগণনা, এসব শুধু মন আনবার জন্য। মন এদিক ওদিক যেতে চায়, তবু ঐ সবের দ্বারা এদিকে আকৃষ্ট হয়।' এত দীর্ঘ-কাল ধরে মন নিজের ইচ্ছামত বাইরে বিক্ষিপ্ত হয়ে বেড়িয়েছে যে, ঝট করে ঐ সব থেকে গুটিয়ে নিয়ে এসে ইষ্টচিন্তায় নিবিষ্ট করা এক প্রকার অসম্ভব। তাই করগণনা, মালায় সংখ্যা রাখা ইত্যাদি দ্বারা বিক্ষিপ্ত মনকে অন্য

বিষয় থেকে উঠিয়ে নিয়ে ধরে রাখা, নতুবা সে যে কখন কোথায় চলে যায়, তা জানতেও পারা যায় না।

সংখ্যাও আবার নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে রাখতে হয়, নিজের ইচ্ছামত রাখলে হবে না। নির্দিষ্ট প্রণালীতে গুনে প্রতিবারে ১০৮ করে জপ হবে; অর্থাৎ প্রতি ১০৮এ এক একটি একক (unit) হয়। এখন দেখা যাক, এই একক ১০৮ সংখ্যার কোন বিশেষ অর্থ আছে কি না। 'বিশেষ অর্থ' তত্ত্বের দিক দিয়ে ততটা বিচার না করলেও, এটুকু বোঝা যায় যে, বিশেষ সংখ্যাটি কোন প্রতীক অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন জ্ঞানের প্রতীক সূর্য। সূর্য পূর্বদিকে উঠে। কাজেই পূর্বদিকের কথা মনে হলেই সূর্য উঠার কথা তথা জ্ঞানসূর্য উদিত হওয়ার ভাব মনকে সহজেই উদ্দীপিত করে। কম্পাসের কাঁটা সব সময় উত্তরমুখী থাকে। তাকে যতই এদিক ওদিক ঘোরাও না কেন, ছেড়ে দিলেই সোজা উত্তরমুখী হয়ে তবে থামবে। আমরাও সংসারে যে যে-কাজই করি না কেন, মন সব সময় ঈশ্বরমুখী রেখে করার কথা। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন—'সংসারে থাকো, যেমন বড় মানুষের বাড়ীর ঝি।… সব কাজ করে, কিন্তু তার মন দেশে পড়ে থাকে। তেমনি সব কর্ম কর, কিন্তু ঈশ্বরের দিকে মন রেখে।' উত্তর দিকের কথা বললেই সর্বদা মন ঈশ্বরমুখী রাখার কথা সহজেই মনে আসে। তাই অনুমান হয় জপধ্যানে, পূজা-পাঠাদিতে পূর্ব বা উত্তরমুখী হয়ে বসবার নির্দেশ। এর ফলে মন সহজেই উদ্দীপিত হয়। কথামৃতে আছে—'চৈতন্যদেব মোড়গাঁর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। শুনলেন ঐ গাঁয়ের মাটিতে খোল তৈয়ার হয়। অমনি ভাবে বিহ্বল হলেন, কেন না হরিনাম কীর্তনের সময় খোল বাজে।' চিড়িয়াখানা দেখতে গিয়ে ঈশ্বরীর বাহন সিংহকে দেখে ঠাকুরের ঈশ্বরীর ভাবে বিভোর হয়ে সমাধিস্থ হওয়ার ঘটনা তাঁর জীবনী-পাঠকদের সকলেরই জানা আছে। তাহলে আমাদের আলোচ্য ১০৮ সংখ্যা কিসের প্রতীক? জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব প্রদর্শনের প্রতীক। এ সম্বন্ধে যে দু-একটি উপনিষদ্ প্রমাণ আমাদের জানা আছে, সেগুলি লক্ষণীয় এবং এ বিষয়ে যাঁদের কৌতূহল আছে, তাঁদের জন্য দেওয়া হল।

বরাহোপনিষদে আছে—'শরীরং সর্ব-জন্তূনাং ষন্নবত্যঙ্গুলাত্মকম্' (বরাহোপনিষদ্ ৫।১৯)—জীবশরীরের পরিমাণ ৯৬ অঙ্গুলি। আর জীবশরীরের নাভির দ্বাদশ অঙ্গুলি উপরেপরমাত্মার স্থান—'অধো নিষ্ট্যা বিতস্ত্যান্ত নাভ্যামুপরি তিষ্ঠতি।' (মহানারায়ণোপনিষদ্ ১৩।৭) কাজেই ৯৬+১২=১০৮ সংখ্যায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব সূচিত হয়। খুব ভক্তিসহকারে ভগবানের পবিত্র নাম জপ করলে সাধক (জীব) ক্রমশ: পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হন।

অন্যভাবে, জীবশরীরের পরিমাণ ৯৬ অঙ্গুলি। আর আদিত্যমণ্ডলস্থিত আত্মা দ্বাদশ কলাযুক্ত। পুরুষশরীরে অর্থাৎ জীব-শরীরে অনুপ্রবিষ্ট প্রত্যগাত্মা ও আদিত্য-মণ্ডলস্থিত প্রত্যগাত্মা এক—'স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে স একঃ।' (তৈঃ উঃ ৩।১০।৪) অতএব ৯৬+১২ সংখ্যার মিলনে জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব প্রতিপাদিত হয়। একাগ্র-মনে আন্তরিকতার সঙ্গে ভগবানের নাম জপ করলে সাধক ক্রমশঃ দেহাত্মবুদ্ধির অতীত হয়ে ভগবানের সঙ্গে মিলিত হন।

অক্ষমালিকা উপনিষদে আছে 'অ'কার থেকে 'ক্ষ' পর্যন্ত বর্ণমালার এক একটি অক্ষর

মালার এক একটি দানা। সাধক রামপ্রসাদেরও একটি গানে আছে—'কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে।' বর্ণের সংখ্যা হল ৫০। এ সংখ্যা অনুলোম ও বিলোমক্রমে ৫০+৫০= ১০০ হয়। তার সঙ্গে পঞ্চতত্ত্ব (ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোম) এবং তিন গুণ (সত্ত্ব রজঃ তমঃ) যোগ করলে ১০৮ হয়। অতএব এই ১০৮ সংখ্যা দ্বারা জগদ্রূপী-কার্যব্রহ্মকে বোঝায়। মালার সুমেরু দানা নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতীক। তাই উহা অতিক্রম করতে নাই—'তস্মিল্লোঁকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।' (কঠ উঃ ২।২।৮)

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম পার্ষদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ এর একটি মজার অথচ অত্যন্ত অর্থপূর্ণ বাস্তবধর্মী ব্যাখ্যা দিতেন। তিনি বলতেন—জীব মাতৃজঠরে বাস করে পূর্ণাঙ্গ হয়ে মাতৃগর্ভ থেকে বেরুবার আগে তার আগের সব জন্মের কথা, নিজের কর্মফলহেতু নানা দুঃখ ভোগের কথা স্মরণ করে। ভগবানকে উপলব্ধি করতে না পারায় ঐসব জন্ম যে তার ব্যর্থ হয়েছে তা সে ভাবতে থাকে।[১] তাই এবারকার জন্ম যাতে আগের মত ব্যর্থ না হয় তার জন্য সে তখন বার বার প্রতিজ্ঞা করে যে, এবার মাতৃ-জঠর থেকে বের হওয়ার পর থেকে প্রতি শ্বাসে সে ভগবানকে স্মরণ করবে, তাঁর নাম নেবে। একজন সুস্থকায় মানুষ চব্বিশ ঘণ্টায় ২১,৬০০ বার নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।[২] কিন্তু জন্মের সঙ্গে সঙ্গে, এই মায়া-জগতের সংস্পর্শে আসা মাত্র সে তার প্রতিজ্ঞার কথা একেবারে ভুলে যায়। সংখ্যার দুই শূন্য সঙ্গে সঙ্গে উড়ে যায়। তখন বাকী থাকে ২১৬। তাই সে সকালে ১০৮ বার এবং সন্ধ্যায় ১০৮ বার জপ করে তার কর্তব্য পালন করে !

১ এই ধরনের কথা গর্ভোপনিষদে আছে।

২ বরাহোপনিষদে আছে—

ষট্‌শতান্যধিকান্যত্র সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ।
অহোরাত্রবহৈঃ শ্বাসৈর্বায়ুমণ্ডলঘাততঃ॥ (৫।৩)

বায়ুমণ্ডলে আঘাত হলে শ্বাসসমূহ প্রবাহিত হয়। দিবারাত্রিতে সে শ্বাসের সংখ্যা একুশ হাজার ছ'শ।

নিরুক্ততন্ত্রে আছে—

হংসেতি পরমং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্বদা।
ষট্‌শতানি দিবারাত্রৌ সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ॥

Heart-beat-এর সংখ্যা প্রতিমিনিটে ১৫ ধরলে চব্বিশ ঘণ্টায় ২১,৬০০ বার হয়।

হিন্দুসমাজে জাতিভেদ সম্পর্কে স্বামীজীর অভিমত

ডক্টর জলধিকুমার সরকার*

সমস্যাসঙ্কুল ভারতবর্ষে নিত্য নূতন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। কিন্তু কিছু কিছু সমস্যা বহু পুরাতন। এদের সকলের সমাধান সহজ-সাধ্য নয়। অনেকক্ষেত্রে সমাধানের পথ খুঁজতে হচ্ছে দেশবিদেশের চিন্তানায়কদের চিন্তাধারা হ'তে। গন্তব্যপথের নির্দেশ ঠিক না হ'লে সমস্যা আরও জটিল হবে। হিন্দু-সমাজে বর্ণভেদ বা জাতিভেদ এইরূপ একটি সমস্যা। এটি এতই বদ্ধমূল ও পুরাতন এবং হিন্দুধর্মের সহিত এতই ওতপ্রোত হয়ে গেছে যে, সমাজ ও ধর্ম—কোনটি হ'তেই একে পৃথক্ করা সহজসাধ্য নয়। প্রাচীনত্বের সঙ্গে সঙ্গে এর মধ্যে নানা আবর্জনা মিশে যাওয়ার জন্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এর চেহারা বিভিন্ন। ফলে, এর আসল রূপ যে কি ছিল, তা বর্তমানে গবেষণার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বর্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রচণ্ড সংঘাতে এর সব রকম মূর্তিই ভগ্নপ্রায়। তাই এখন বিচার করার সময় এসেছে যে, এর আসল রূপ কি, এটির সম্পূর্ণ বিলোপ দরকার কিনা, অথবা এর পরিশুদ্ধিকারক বা পরিপূরক কিছু আবশ্যক।

যতই দিন যাচ্ছে, দেশের কল্যাণকামী চিন্তানায়করা স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারার মধ্যে নানা সমস্যার সমাধান খুঁজে পাচ্ছেন। ক্রমে একথাও স্পষ্টতর হচ্ছে যে, স্বামীজীর নির্দিষ্ট পথই ভারতের ভাবী কল্যাণের পথ।

কয়েক বৎসর পূর্বে 'উদ্বোধন'-পত্রিকার একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে[১] বর্ণভেদ সম্বন্ধে স্বামীজীর চিন্তাধারা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছিল। স্বামীজী এদেশের দোষের কথা ওদেশে বলতেন, আবার এদেশের গুণের কথা ওদেশে বলতেন। আবার ওদেশের দোষ গুণ সম্বন্ধেও একই নিয়ম অনুসরণ করতেন। ফলে তাঁর মতামত সম্বন্ধে অনেক সময় ভুল ধারণা হবার সম্ভাবনা। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য পূর্বোক্ত নিবন্ধের আলোচনা হ'তে আরো অধিক আলোচনা করা নয়—শুধু বর্ণভেদ সম্বন্ধে স্বামীজীর নির্দিষ্ট অভিমত সংক্ষেপে তুলে ধরা। জাতিভেদ-প্রথা হিন্দু সমাজকে এতই পঙ্গু ক'রে ফেলেছে যে, এর বার বার আলোচনাও দূষণীয় হবে না। মোটামুটিভাবে তাঁর মতামতগুলি এই :

(ক) জাতিভেদ-প্রথা একটি সামাজিক বিধান মাত্র। এর সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। সামাজিক বিধানগুলি সমাজের নানা প্রকার অবস্থাসঞ্জাত হ'তে উৎপন্ন। ঋষিরা এই সকল বিধান লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন মাত্র। আধুনিক যুগের প্রতিযোগিতার ফলে জাতি-ভেদের ভিত্তি শিথিল হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু একে সম্পূর্ণ নাশ করতে হ'লে ধর্মকে টেনে আনার দরকার নেই।

(খ) প্রাচীন কালে জাতিবিভাগ গুণগত ছিল। বংশগত হয়েছে অনেক পরে।

* কলিকাতা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনে ভাইরলজি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান। বর্তমানে ঐ বিভাগে ইমেরিটাস সায়েন্টিস্ট। এফ. এন. এ.।

১ উদ্বোধন, ৭৬।৫০৬-৫১৬

জাতিবিভাগ মূলতঃ দোষের নয়, এবং পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই যেখানে জাতিবিচার নেই, তা সেটা অর্থনৈতিক ভিত্তিতেই হোক অথবা অন্য কোন ভিত্তিতে হোক। জাতি-বিভাগের উদ্দেশ্য ছিল, যাতে কোন শিল্পকলা বা সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ বজায় থাকে; নষ্ট না হয়। কিন্তু চাতুর্বর্ণ্য সুদীর্ঘকাল বংশানুগত থাকলেও কোন সময়েই এটি বর্তমান কালের ন্যায় বিবর্তনরহিত একটি অনড় অপরিবর্তনীয় প্রথা ছিল না। শঙ্করাচার্য প্রভৃতি যুগাচার্যগণ সময় সময় ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে দলকে দল ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় ক'রে দিতেন। বিদেশী বহু জাতি ভারতে এসে দীর্ঘকাল বসবাসের ফলে ভারতীয় বর্ণাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

(গ) ছুঁৎমার্গ সনাতন ধর্মকে অধঃপাতিত করেছে। আমরা এখন বৈদান্তিকও নই, পৌরাণিকও নই, তান্ত্রিকও নই—এখন কেবল ছুঁৎমার্গী। শ্রীরামকৃষ্ণ যে সকলের স্পর্শ করা দ্রব্য খেতে পারতেন না, তা জাতিগত স্পর্শের জন্য নয়, চরিত্রগত দোষের জন্য। কেবলমাত্র উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন যোগীরাই স্পর্শ-দোষ বুঝতে পারেন।

(ঘ) সত্যযুগের প্রারম্ভে একমাত্র ব্রাহ্মণ-জাতিই ছিল। পরে ব্রাহ্মণগণ বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন ক'রে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। ব্রাহ্মণ অর্থে যাঁতে সংসারিকতা একেবারেই নাই, এবং জ্ঞান প্রচুর পরিমাণে আছে। ব্রাহ্মণদের কর্তব্য হচ্ছে, চারিপাশের অব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করা। অব্রাহ্মণ-দেরও উদ্দেশ্য হবে, ব্রাহ্মণত্বলাভ। যখন যুগচক্র ঘুরে আবার সত্যযুগের অভ্যুদয় হবে, তখন সকলে ব্রাহ্মণ হয়ে যাবে।

এই ব্রাহ্মণত্ব কেবলমাত্র ভারতে সীমাবদ্ধ রাখা চলবে না, সমগ্র পৃথিবীতে এর বিস্তার ঘটাতে হবে।

(ঙ) স্বামীজী চেয়েছিলেন যে, জাতি-ভেদ প্রাচীনকালের ন্যায় গুণগত হোক, পরে সকলেই এক জাতিতে অর্থাৎ ব্রাহ্মণজাতিতে পরিণত হোক। বংশগত বা গুণগত জাতি-ভেদে, ভোগ বা অধিকারের তারতম্য উঠে যাওয়া উচিত। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে (অথবা একই বর্ণের মধ্যে যে সকল অবান্তর বিভাগের সৃষ্টি হয়েছে, তাদের মধ্যে) যাতে বিবাহাদি আদান-প্রদান হয়, তার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

হিন্দুজাতি ও হিন্দুসমাজ যত শীঘ্র স্বামীজীর উপরি-উক্ত নির্দেশগুলি গ্রহণ করবেন, এবং সেইমত নিজেদের কার্যাবলী পরিচালিত করবেন, ততই মঙ্গল। আর পৃথিবীর অন্যান্য জাতিও স্বামীজীর অভিমত থেকে অনেক শিক্ষালাভ করতে পারবেন।

সমালোচনা

The Essence of the Philosophy of Vivekananda : Professor Sachindra Nath Dutt, D. Litt. Published by Sri S M. Kar, 21 Justice Dwarkanath Road, Calcutta 700020, (1978), pp 64, Price Rs. 8.

ভূমিকায় বিবেকানন্দের একটি ছোট্ট জীবনী দিয়ে শুরু করে, পর পর চারটি অধ্যায়ে স্বামীজীর 'জ্ঞানযোগ' 'ভক্তিযোগ' 'কর্মযোগ' ও 'রাজযোগ'-এর প্রবচন সাজিয়ে এ সাধন-চতুষ্টয়ের যোগফলকে 'বিশ্বজনীন ধর্ম' এই নাম—এবং শেষ অধ্যায়ের শিরোনাম—দিয়ে

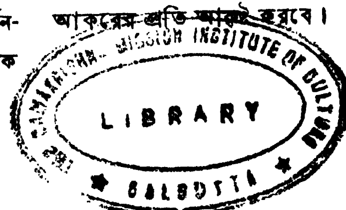
ডক্টর দত্ত মোট ৬৪ পৃষ্ঠায় বইটির ছেদ টেনে বলেছেন: 'In the pages of this book we have discussed the four different ways to God-realization. The whole of it is the picture of a universal religion.' অর্থাৎ, বইখানিতে ঈশ্বর-উপলব্ধির চারটি বিভিন্ন পথ নিয়ে আলোচনা করলাম। এর সমস্তটা এক বিশ্বজনীন ধর্মের চিত্র।

বইটি স্বামীজীর ধর্মচিন্তার একটি, সংক্ষিপ্ত হলেও, সমর্থ রসগ্রাহী সারসংকলন। তবে মনে হয় লেখক যেন গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা নিষ্পন্ন করেছেন। স্বামীজীর বই থেকে অজস্র উদ্ধৃতি দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হয়েছেন; বিচার-বিশ্লেষণ থেকে বিরত হয়ে নিজেকে রেখেছেন অন্তরালে। অল্পস্বল্প মন্তব্য যা আছে তা উজ্জ্বল ও সারবান; কিন্তু সেগুলি এসেছে নিছক গ্রন্থনাসূত্রে, ব্যাখ্যার প্রয়োজনে নয়। মোটের ওপর, লেখক বিবেকানন্দের বাণীমালঞ্চের মালাকার হয়েই সন্তুষ্ট হয়েছেন, তার নিগূঢ় অর্থের—বিশেষত দার্শনিক তত্ত্বের ভাষ্যকার হতে চাননি।

স্বামীজী দর্শনচর্চা করেছেন এবং দর্শনবিদ্ তিনি নিশ্চয়ই। কিন্তু তিনি কি দার্শনিক? তাহলে কী নতুন দার্শনিক মতবাদ তিনি সৃষ্টি করেছেন? সে দর্শনের মৌলিকতা ও বৈশিষ্ট্য কী? এসব প্রশ্নের উত্তর মেলে না এ বইয়ে। স্বামীজীর দর্শনের দুটি ভাগে—জ্ঞানে ও কর্মে—অদ্বৈতবাদীদের ঐতিহ্য অনুযায়ী সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী যে দুটি ভাবধারার দ্বন্দ্বমধুর সহাবস্থান দেখা যায় এবং যার ফলে বিশ্বের দর্শনের ইতিহাসে সে তত্ত্ব তুলনারহিত তার কোন হদিস নেই 'বিবেকানন্দের দর্শন-সার'-এ। মুখবন্ধে লেখক স্বামীজীকে 'neo-Vedantist' (নববৈদান্তিক) বলেছেন, প্রশ্নও করেছেন—যে প্রশ্ন আমাদেরও—'What is neo-Vedantism, however?' (কিন্তু নববেদান্ত কী?), সে প্রশ্নের জবাব দেননি। তাঁর পূর্বাচার্যদের কাছ থেকে স্বামীজী কতোটা গ্রহণ করেছেন এবং তার সঙ্গে কতোটা কী যোগ করেছেন অধ্যাপক দত্ত সে হিসেবনিকেশের মধ্যে যাননি। অদ্বৈতবাদের সঙ্গে সর্বেশ্বরবাদ, মায়াবাদের সঙ্গে জীবপ্রেম, পারমার্থিকের সঙ্গে ব্যাবহারিক, বুদ্ধির সঙ্গে বোধি, খরধার মস্তিষ্কের যুক্তিনিষ্ঠ বিচারের সঙ্গে দরদী হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত উপহার—কেমন সোনায় সোহাগার মতো মিশ খেয়ে গেছে স্বামীজীর দর্শনে তা খতিয়ে দেখালে বইটি আরো সার্থকনামা হোত, স্বামীজীর দার্শনিক মানসের অন্তরঙ্গ পরিচয়লাভের চাবিকাঠি পাওয়া যেত। তাহলে বোঝা যেত কী কাব্যময় অথচ কার্যকর, অভিনব ও যুগোপযোগী এক সমন্বয়ী পরিপূর্ণ দর্শনবিজ্ঞান স্বামীজী উদ্ভাবন করেছেন, কেন তিনি দিগ্বিজয়ী দর্শনাচার্য, দার্শনিকদের দার্শনিক।

তাহলেও, প্রায় বিনা মন্তব্যে লেখক যা পরিবেশন করেছেন তার মূল্যও অপরিসীম। স্বামীজীর স্বতঃপ্রকাশ দর্শন টীকা-টিপ্পনীর ধার ধারে না, সূত্রকারের নীরবতাই হিরণ্ময়—এ কথাও হয়তো ঠিক। সে যাই হোক, স্বল্প পরিসরে লেখক মূল অমৃতবাণীর যে নির্ভেজাল নির্যাস দিয়েছেন তার জন্যে তিনি নিঃসংশয়ে প্রশংসার্হ। আশা করি বইখানি ইংরিজি-জানা সাধারণ পাঠকের চেতনাকে উসকে দেবে, গভীরতর ও বিস্তৃততর আকরের প্রতি আকৃষ্ট করবে।

বকলম



বাইবেল: নতুন ধারা। প্রকাশক: Living Bibles India, ১৫ ক্যামাক স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১৭। (১৯৭৮), পৃঃ ৩৫৭।

বিশ্বের সর্বযুগের সর্বাধিক বিক্রীত ও প্রচারিত বই বোধহয় বাইবেল। এতে আছে জগতের এক মহত্তম ধর্মাচার্যের জীবনী ও বাণী শুধু নয়, চিরকালের এক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি। আধুনিক চলতি বাংলায় সেই বাইবেলের একাংশের এই অনুবাদ-গ্রন্থটিকে সাগ্রহে স্বাগত জানাবেন যাঁরা ধর্মমনস্ক এবং যাঁরা তা না হয়েও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী তাঁরাও। এর আগেও অবশ্য বাইবেলের একাধিক বঙ্গানুবাদ বেরিয়েছে। প্রথম বেরোয় ১৮০০ সালে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে। কিন্তু ইত্যবসরে বাংলা ভাষার বহতা নদীর জল প্রবল উচ্ছ্বাসে নতুন খাতে প্রবাহিত হয়ে অনেক দূরদূরান্তে গড়িয়ে গেছে। শুধু ভাষার রূপান্তর, তথা জন্মান্তর, হয়নি; বানানেরও অনেক রকমফের হয়েছে কিন্তু বাংলায় লেখা আগেকার বাইবেল সরল চলতি ভাষার সেই বর্ণাঢ্য জয়যাত্রার সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে পারেনি। আলোচ্য গ্রন্থটি সেই অভাব অনেকখানি পরিপূরণ করেছে।

এই তরতাজা তরঙ্গমাতে অনুবাদক-মণ্ডলী মূলের স্বাদ গন্ধ ও গভীরতা বজায় রেখে ভাবের রসরহস্য পাঠকের মনে সঞ্চারিত করতে বহুলাংশে কৃতকার্য হয়েছেন। প্রচ্ছদ ও ভেতরের ছবিগুলি বইটির আকর্ষণ বাড়িয়েছে।

বকলম

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গে বন্যাত্রাণকার্য

পশ্চিমবঙ্গের বন্যাকবলিত মালদা, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর ও হুগলী জেলায় প্রায় চল্লিশ হাজার দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির মধ্যে মিশন প্রত্যহ রান্না-করা আহার্য বিতরণ করিতেছে। তদুপরি মিশনের প্রধান কার্যালয় বেলুড় মঠ সহ কলিকাতা ও সন্নিহিত কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে দৈনিক প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার ব্যক্তিকে রান্না-করা এবং তিন হাজার ব্যক্তিকে খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হইতেছে। অভূতপূর্ব বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অসংখ্য অঞ্চল হইতে অনুরূপ সেবার জন্য মিশনের নিকট অনুরোধ আসিতেছে।

এই চরম বিপর্যয়ে বন্যার্তদের সেবায় মিশন সর্বশক্তিসহায়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। সেবার পরিধি ব্যাপকতর এবং দীর্ঘস্থায়ী করা প্রয়োজন।

এই বিরাট সেবাযজ্ঞ ত্বরান্বিত করা এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মিশন-কর্তৃপক্ষ সহৃদয় জনসাধারণের নিকট অর্থ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দান করিয়া সাহায্যের জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। যে কোন প্রকার দান সাদরে গৃহীত হইবে। রামকৃষ্ণ মিশনে দান আয়করমুক্ত। ফোন: ৬৬-২৩৯১, ৬৬-৩৫৭৮, ৬৬-৫৮৬৫।

(৪. ১০. ৭৮)

কার্যবিবরণী

মহীশূর রামকৃষ্ণ আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান (রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট অব মরাল অ্যাণ্ড স্পিরিচুয়্যাল এডুকেশন)-টির সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। উহার সারসংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আশ্রম কর্তৃক আয়োজিত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাদান-ব্যবস্থা ১৯৬৫ সাল হইতেই বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়া আসিতেছিল। আশ্রমের শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাশালার পরিচালিত এই শিক্ষাক্রম দুই প্রকারের ছিল : (১) মে মাসে সমগ্র দেশের সকল স্থান হইতে সমাগত কলেজের ছাত্রদের জন্য দুইসপ্তাহ-ব্যাপী পাঠক্রম ও (২) শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাশালার ছাত্রদের জন্য অগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে তিনদিন-ব্যাপী পাঠক্রম।

পৃথিবীর সকল প্রধান প্রধান ধর্মসমূহের বৈশিষ্ট্য, সেগুলির শাস্ত্র হইতে নির্বাচিত অংশ, ধর্মপ্রবর্তকগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী ইত্যাদি আলোচনা এবং ধ্যান উপাসনা সমবেত ভজন-গান মৌনপালন ইত্যাদি ব্যবহারিক অনুশীলন প্রথমোক্ত শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় কর্মসূচীর মধ্যে ছিল প্রথম শিক্ষাক্রমের ব্যবহারিক ক্রিয়াদিসহ বিভিন্ন দেশের নানা স্তরের মহাপুরুষগণের জীবনী পর্যালোচনা।

এই সকল আলোচনাচক্রের সাফল্যে শিক্ষকসমাজও আগ্রহান্বিত হন। এবং তাঁহাদের অনুরোধে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও ছাত্র সম্প্রদায়ের জন্যও অনুরূপ শিক্ষাক্রমের আয়োজন করা হয়।

বহু বিশিষ্ট জননেতা শিক্ষাব্রতী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন উপাচার্য এই সকল শিক্ষাক্রমের বিবরণ পাঠ করিয়া ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এগুলি অব্যাহত রাখার জন্য তাঁহাদের সমর্থন ও সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এইভাবে সাফল্য ও পোষকতায় উৎসাহিত হইয়া এই প্রয়াসকে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিবার সংকল্প করা হয়।

তদনুসারে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাশালার সন্নিকটে একটি মনোরম অট্টালিকা নির্মিত হয়। ১৯৬৮ সালের ২১শে জানুআরি শ্রীমোরারজী দেশাই এই ভবনটির শিলান্যাস করেন। ১৯৭৪ সালে মে মাসে নির্মাণকার্য সমাপ্ত হইলে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ কর্তৃক ভবনটি উৎসর্গীকৃত হয়। এই অট্টালিকায় আবাস ও পরিচালনার প্রয়োজনানুগ সকল সুব্যবস্থা ছাড়াও বক্তৃতাগৃহ পাঠাগার প্রার্থনাকক্ষ প্রদর্শনশালা চিকিৎসাগার অতিথিশালা ইত্যাদির প্রশস্ত স্থান আছে।

ইতিমধ্যেই ধর্মীয় প্রদর্শনশালাটির সূত্রপাত করা হইয়াছে। সকল ধর্মের মূলগত ঐক্য ইহার প্রধান বিষয়বস্তু। প্রার্থনাকক্ষের প্রবেশ-পথে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের দুইটি মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন ধর্মের ১৪টি প্রতীকচিহ্ন কক্ষের দেওয়ালে সন্নিবেশিত।

গ্রন্থশালায় ধর্ম দর্শন মনোবিজ্ঞান ইতিহাস পুরাতত্ত্ব ললিতকলা সাহিত্য শিক্ষা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ক ৬,৫০০টি গ্রন্থ আছে।

নিয়মিত শিক্ষাক্রম হিসাবে, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা, আলোচনাচক্র সমেত বি. এড. শিক্ষাক্রম শুরু করা হয় এবং ১৯৭৪ সালে উহা মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন প্রাপ্ত হয়। ইতিমধ্যে তিন দল ছাত্র এ শিক্ষাক্রম সমাপ্ত করেন। ইহার বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হইল :

সাল	ছাত্রসংখ্যা	শতকরা হার	বিশ্ববিদ্যালয়ে পাসের স্থানলাভকারী ছাত্রসংখ্যা
'৭৪-৭৫	৭২	৯৪.৫	৪
'৭৫-৭৬	৪৪	৯৮.৬	১
'৭৬-৭৭	৯৭	১০০	

কলেজের ছাত্রগণের জন্য দুইসপ্তাহব্যাপী যে আলোচনাচক্র ১৯৬৫ সালে আরম্ভ হয়, তাহার কার্যের কিছুটা পরিচয় মিলিবে নিম্নলিখিত তালিকায়:

সাল	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
'৬৫	৬১
'৬৬	৮১
'৬৭	৮৩
'৬৮	৩৯
'৬৯	৬৪
'৭৩	৩৪
'৭৪	৪৪
'৭৫	৪৬
'৭৬	১১১
'৭৭	৭৭

গড় বয়স : ২০ বৎসর

গড় শ্রেণী : দ্বিতীয় বার্ষিক ডিগ্রী

ছাত্রগণ আসিয়াছিল অন্ধ্রপ্রদেশ বিহার দিল্লী গুজরাট কর্ণাটক কেরল পণ্ডিচেরি মহারাষ্ট্র ওড়িশা তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গ হইতে।

১৯৬৮ সালে আলোচনাচক্রটি বোম্বের শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সঙ্গে একযোগে আয়োজিত হইয়াছিল।

১৯৭৪ সাল হইতে ভারত সরকার এই আলোচনাচক্র পরিচালনার জন্য আনুকূল্য প্রদান করিতেছেন।

জনসাধারণের জন্য প্রথম আলোচনাচক্রটি আয়োজিত হয় ১৯৭৩ সালে। ইহাতে প্রভূত উৎসাহজনক সাড়া পাওয়া যায় বলিয়া পরে প্রতি বৎসর ইহা অনুষ্ঠিত হয়। নীচের ছকে এই কাজের কিছুটা আভাস দেওয়া হইল:

সাল	আলোচনাচক্রের মেয়াদ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১৯৭৩	৪ দিন	৪৪
১৯৭৪	৫ „	৬১
১৯৭৫	৪ „	৭০
১৯৭৬	„ „	৯৬
১৯৭৭	„ „	৯৪

যোগদানকারীরা আসিয়াছিলেন কর্ণাটক অন্ধ্রপ্রদেশ তামিলনাড়ু কেরল গুজরাট ও পণ্ডিচেরি হইতে।

আলোচনায় যোগদানকারীগণের বয়স ছিল ২০ হইতে ৮০ পর্যন্ত। অবশ্য, অধিকাংশের বয়ঃক্রম ছিল ৪৬ হইতে ৫৫-র মধ্যে। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী সাধারণ কর্মচারী ব্যবসায়ী চিকিৎসক আইনজীবী শিক্ষক অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ—ধর্ম সম্প্রদায় ও সামাজিক পদমর্যাদা নির্বিশেষে—এই সকল আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের উপযোগী তিনসপ্তাহব্যাপী সংক্ষিপ্ত শিক্ষণক্রম ১৯৭৫ ও ১৯৭৬ সালে নতুন শিক্ষাভবনে অনুষ্ঠিত হয়। কর্ণাটক অন্ধ্রপ্রদেশ পণ্ডিচেরি ও অরুণাচল প্রদেশের সরকার কর্তৃক প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত ৫২ জন প্রথম শিক্ষাক্রমে ও ৬৪ জন দ্বিতীয়বারে যোগদান করেন।

চরিত্রগঠনের উদ্দেশ্যে প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাশালার ছাত্রদের জন্য যে আলোচনাসভা শুরু হয়, পরে সেটিকে অব্যাহতভাবে চালানো হয় এবং সম্প্রসারিত করা হয়। মহীশূরের মহাজন উচ্চ বিদ্যালয়েও প্রতি বৎসর রামকৃষ্ণ

ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ অনুরূপ আলোচনাসভার আয়োজন করিতেছেন।

অল্পবিস্তর একই প্রকারের আলোচনাসভা পুত্তুরে বিবেকানন্দ কলেজে ও কারকলায় শ্রীভুবনেন্দ্র কলেজেও অনুষ্ঠিত হয়।

বিবিধ সংবাদ

'বিশ্ব-বন্ধুত্ব দিবস'

কন্যাকুমারীতে বিবেকানন্দপুরম্-এ গত ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ কন্যাকুমারী বিবেকানন্দ কেন্দ্র কর্তৃক বিবেকানন্দ শিলা স্মরণিকের অষ্টম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও তৎসহ 'বিশ্ব-বন্ধুত্ব দিবস' মহাসমারোহে পালিত হয়। মাদ্রাজ উচ্চ আদালতের বিচারপতি জনাব এম. এম. ইসমাইল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন; আশীর্ভাষণ দেন বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের (শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী—উদ্বোধন) অধ্যক্ষ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ।

কেন্দ্রের প্রধান কর্মসচিব শ্রীআর. মানিঅন সমাগত অভ্যাগতগণকে স্বাগত জানান এবং কেন্দ্রের সূচনা ও ক্রমবিকাশের বিবরণ দেন। সংযুক্ত প্রধান সচিব ও জীবনব্রতী কুমারী শৈলজা জীবনব্রতীদের শিক্ষণ ও কর্মধারা সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও স্বদেশের কল্যাণসাধনে তাঁহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদানের উপর আলোকসম্পাত করেন স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ। কেন্দ্রের যুবব্রতীদের তিনি আশীর্বাদ করেন এবং সকলকে, বিশেষতঃ জীবনব্রতী ও শিক্ষার্থীগণকে, স্বামীজীর উপদেশ ও আদর্শগুলির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া যথার্থরূপে জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে আহ্বান জানান।

সভাপতির অভিভাষণে বিচারপতি জনাব এম. এম. ইসমাইল বলেন: স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশাবলী ধর্মীয় অনুশাসনের ঊর্ধ্বে এবং সেইজন্য সেগুলির প্রয়োগক্ষেত্র বিশ্বব্যাপী; সুমহান স্বামী বিবেকানন্দের নামে প্রতিষ্ঠিত এই কেন্দ্রের ক্রমোন্নতির একটি বিশেষ পর্যায় চিহ্নিত করিবার উদ্দেশ্যে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে যোগদানের সুযোগ পাইয়া তিনি সম্মানিত বোধ করেন।

কেন্দ্রের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক কে. এন. ভাসবানী সমবেত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কালাডিস্থ রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী কৃতানন্দ, পণ্ডিচেরির প্রাক্তন উপরাজ্যপাল শ্রীছেদীলাল প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

উৎসব

বালুরঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ আলোচনা চক্রে গত ৬ই ও ৭ই মে ১৯৭৮, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়।

৬ই মঙ্গলারতি, শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ নগর-পরিক্রমা, ঠাকুরের বিশেষ পূজা হোম শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ও প্রসাদবিতরণ হয়। অপরাহ্নে ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ ডঃ অতুলচন্দ্র চক্রবর্তী ও সভাপতি স্বামী বাগীশানন্দ। পরে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাকীর্তন করেন শ্রীলক্ষ্মীকান্ত রায়। ৭ই মধ্যাহ্নে দুই সহস্রের অধিক দরিদ্রনারায়ণের

সেবা হয় এবং অপরাহ্ণে ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ শ্রীবদ্রীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সভাপতি স্বামী বাগীশানন্দ। সভায় আবৃত্তি-প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পরে সারদালীলাগীতি পরিবেশন করেন শ্রীলক্ষ্মী-কান্ত রায়।

বিগত ১০ই মার্চ শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব-তিথিতেও ভাবগম্ভীর পরিবেশে পূজা জপ পাঠ ভজন ও আলোচনাদি হইয়াছিল।

পাঁচগ্রাম (মুর্শিদাবাদ) শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে গত ১০-১২ই মে ১৯৭৮, শ্রীরামকৃষ্ণের বাৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হয়।

১০ই আশ্রমে মন্দিরের উদ্বোধন করেন স্বামী মিত্রানন্দ এবং তিনি ও স্বামী সিদ্ধিদানন্দ ঠাকুরদের প্রতিকৃতি বেদীতে স্থাপন করেন। সেদিন মঙ্গলারতি ও বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়, বিকালে ভাগবত পাঠ করেন শ্রীগৌরহরি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী মিত্রানন্দ ও প্রধান অতিথি স্বামী সিদ্ধিদানন্দ ঠাকুর মা ও স্বামীজী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় সরকারের বহরমপুর শাখার সৌজন্যে 'সত্যের জয়' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় এবং রামায়ণগান পরিবেশন করেন শ্রীকানাইলাল হালদার। ১১ই প্রাতে ও মধ্যাহ্নে বাউল গান, অপরাহ্ণে অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষণ এবং কানাই-বাবুর রামায়ণগান অনুষ্ঠানসূচীর প্রধান অঙ্গ ছিল। ১২ই ঠাকুরের প্রতিকৃতি লইয়া গ্রাম-পরিক্রমা বাউল গান এবং শ্রীঅশ্বিনীকুমার মণ্ডল ও সম্প্রদায় কর্তৃক কীর্তনের মাধ্যমে যাত্রাগান হয়। প্রায় ১৫০০ ভক্ত ও দরিদ্র-নারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করেন।

কলিকাতা গান্ধী কলোনী: শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র ও সেবাশ্রমে গত ১০ই ও ১১ই জুন ১৯৭৮, শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকা-নন্দের আবির্ভাব-উৎসব পালিত হয়। ১০ই মঙ্গলারতি প্রভাতফেরি বিশেষ পূজা ও হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডী ও গীতা পাঠ, শ্রীরূপচাঁদ চক্রবর্তী ও সম্প্রদায় কর্তৃক শ্রীশ্রীমায়ের গীতি-আলেখ্য পরিবেশন ও অপরাহ্ণে ধর্মসভা হয়। সভায় ভাষণ দেন শ্রীপাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও সভাপতি স্বামী ভৈরবানন্দ। পরে শিল্পীলোক কর্তৃক 'মাতৃপূজা' পালা পরিবেশিত হয়। ১১ই মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা শ্রীশ্রীচণ্ডী গীতা ও মহাভারত পাঠ, নরনারায়ণসেবা শ্রীরামকৃষ্ণ-গীতি-আলেখ্য পরিবেশন প্রভৃতি হয়। দরিদ্রদিগকে ১০২ খানি শাড়ি ও ধুতি প্রদান করা হয়। অপরাহ্ণে ধর্মসভায় ভাষণ দেন শ্রীশিবশম্ভু সরকার ও সভাপতি স্বামী নিবৃত্ত্যানন্দ।

শ্যামপুকুর (কলিকাতা) শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা মণ্ডপে গত ২০শে জুন ১৯৭৮, শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীসারদাদেবীর বার্ষিক স্মরণোৎসব শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ বিশেষ পূজা হোম ভজনকীর্তন প্রসাদবিতরণ সাধুসেবা প্রভৃতির মাধ্যমে পালিত হয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন শ্রীমতী কান্তিলতা দেবী, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রীগোবিন্দগোপাল ভট্টাচার্য, শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, শ্রীকৃষ্ণবল্লভ পালচৌধুরী, ডাঃ অনিলকুমার ঘোষ ও শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বাদশ জন সন্ন্যাসী উপস্থিত ছিলেন।

তিনহাটা: গত ১৫ই ও ১৬ই জুলাই ১৯৭৮, অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুবমহা-মণ্ডলের স্থানীয় শাখার উদ্যোগে একটি যুব-শিক্ষণ-শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবির উদ্বোধন

করেন শ্রীহৃষীকেশ সাহা। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করেন শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়। সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীরণজিৎ ঘোষ এবং 'বিবেকানন্দ' ছায়াচিত্র প্রদর্শন করেন ও বক্তৃতা দেন শ্রীযোগেশ দাস।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের (শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী—উদ্বোধন) অধ্যক্ষ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ গত ৬ই অগস্ট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং ৩রা অগস্ট গীতাপ্রসঙ্গ করেন। উভয় প্রসঙ্গের সারসংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

কথামৃত—

সংসারতাপক্লিষ্ট মাষ্টার মশায় দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-উদ্যানে বেড়াতে এসেছেন। সোজা এসে প্রবেশ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে। তাঁর মন তৈরীই ছিল। তাই প্রথম দর্শনেই তাঁর মন ভাববিহ্বল। ভক্তসমাবৃত, কথামৃত-পরিবেশনরত শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে তাঁর মনে হচ্ছে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য আবার বুঝি আবির্ভূত হয়েছেন দিগ্‌ভ্রান্ত জীবকুলকে নূতন পথের সন্ধান দিতে। এই সেই পরমহংস, যাঁকে তিনি দর্শন করতে এসেছেন।

কিন্তু পরমহংস কাকে বলে?—দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে,সন্ন্যাসকালে গৃহীত দণ্ড যাঁরা সারাজীবন সঙ্গে রাখেন তাঁদের বলা হয় দণ্ডী, আর যাঁরা সন্ন্যাসের অনুষ্ঠানশেষে স্নানান্তে নদীতেই দণ্ড বিসর্জন দেন, তাঁদের বলা হয় পরমহংস। তাঁরা বলেন, আমাদের বাহ্যদণ্ডের প্রয়োজন নেই, আন্তরদণ্ড—জ্ঞানদণ্ডের সাহায্যেই আমরা নিজেদের সংযত করবো।

ভেদাভেদৌ সপদি গলিতৌ
পুণ্যপাপে বিশীর্ণে
মায়ামোহৌ ক্ষয়মপগতৌ
নষ্টসন্দেহবৃত্তেঃ।
শব্দাতীতং ত্রিগুণরহিতং
প্রাপ্য তত্ত্বাববোধং
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ
কো বিধিঃ কো নিষেধঃ॥

—শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধের অতীত, সত্ত্বরজস্তমোগুণরহিত তত্ত্বের জ্ঞান লাভ ক'রে যাঁর ভেদাভেদবুদ্ধি, পাপপুণ্য ও মায়ামোহ তৎক্ষণাৎ অপগত হয়েছে, এবং সমস্ত সংশয়াত্মিকা বৃত্তি দূর হয়েছে—নিস্ত্রৈগুণ্যের পথে বিচরণকারী সেই ব্যক্তির পক্ষে বিধিই বা কি আর নিষেধই বা কি! এটা একটা অবস্থা। সকল দ্বৈতভেদের উর্ধ্বে তাঁরা চলে যান, জ্ঞানের চরম অবস্থায় তাঁরা উন্নীত হন। এঁদের কেউ উন্মাদবৎ, কেউ পিশাচবৎ, জড়বৎ, কেউ বা বালকবৎ। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে নানান সময়ে সাধনার নানান স্তরে এই সব রকম অবস্থারই ছবি আমরা দেখি। শুধু সম্প্রদায়গতভাবেই তিনি পরমহংস নন। সাধনার সহায়ে নির্বিকল্প অবস্থায় পৌঁছে, জীবাত্মা-পরমাত্মার অভেদত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পরমহংসত্ব অর্জন করেছেন তিনি।

এই সুন্দর পরিবেশে এই যুগপুরুষের দর্শনে মাষ্টার মশায় মুগ্ধ। আর আলোচনার বিষয়টিও অভিনব– কর্মত্যাগ কখন? যখন নিজের বলতে আর কিছু থাকবে না। চিন্তা-ভাবনা ক্রিয়া-কর্ম সব কিছুই যখন ভগবানকে নিয়েই হবে। ভগবানের জন্যই কর্ম করা হবে—'ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যা'। তখন আপনা থেকেই

বৈধী—আনুষ্ঠানিক সন্ধ্যা-বন্দনাদিরও আর প্রয়োজন থাকবে না। বিধির বেড়া তখন আপনিই খুলে যাবে। তখনই 'কো বিধিঃ কো নিষেধঃ'।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মাষ্টার মশায় বিস্মিত—শ্রীরামকৃষ্ণ বই পড়েন না শুনে। কারণ তখনও তিনি জানেন না যে, আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিরা যে সব তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন, সেগুলি তাঁদের হৃদয়েই উদ্ভাসিত হয়েছিল। নিউটনের যে অভিকর্ষ বা মহাকর্ষ সম্পর্কিত তত্ত্ব সেটি আপেলের মধ্যে ছিল না —ছিল তাঁরই ভিতরে। আপেলটি উদ্দীপক মাত্র ঐ জ্ঞানকে বাইরে আনার ব্যাপারে। ঠিক তেমনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণও মুহূর্তে মুহূর্তে এই মর্ত্য জগতের উর্ধ্বে কোন্ এক অন্তর্জগৎ থেকে অতিমানসের তত্ত্ব আহরণ ক'রে নিত্য ভক্তদের পরিবেশন করতেন। জ্ঞানস্বরূপ তাঁর যে প্রকৃত সত্তা, তার সঙ্গে নিত্যযুক্ত থাকার জন্য তাঁর বই পড়ে কিছু শেখার অপেক্ষা ছিল না। জগতের সর্ববিষয় তাঁর অধিগত ছিল। তাই সব কিছু ছিল 'তাঁর মুখে'।

বাইরের বিষয় দেখা শেষ হ'লে বা দেখবার ইচ্ছা শেষ হ'লে মন আপনা থেকেই অন্তর্মুখী হয়। তখন তিনি বলেন, 'যদি দেখবি তারে নয়ন ভরে এ'দুটি চোখ কর রে কানা, যদি শুনবি রে তার মধুর বাণী বাইরের কানে আঙ্গুল দে না।'

আমরা ঠাকুরের সন্তানদের দেখেছি, তাঁদের কাছে গিয়ে বেশী প্রশ্ন করার কথা মনে আসতো না। তাঁদের চাহনি, একটু হাসি, দুটি-একটি কুশল প্রশ্ন এতেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত, মন ভরে যেত। তাঁদের উপস্থিতিই মনের সব জটিলতা ঘুচিয়ে দিত। তাই বই পড়েই সব কিছু বোঝা বা বোঝানো যায় না। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ ঠাকুর আর তাঁর সন্তানগণ।

গীতা—

গীতার অনেক রকম টীকাভাষ্য আছে, তবে আমরা সাধারণভাবে শাংকরভাষ্যকে অনুসরণ ক'রে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর জীবনালোকে গীতাব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হবো। প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি বিষাদের দ্বারাই অর্জুন ভগবানের কাছ থেকে আত্ম-তত্ত্বলাভে সমর্থ হয়েছেন—এরই সাহায্যে তিনি যুক্ত হয়েছেন ভগবানের করুণাধারার সঙ্গে।

গীতা শুধু অর্জুনের জন্যই বলা হয়নি—উপলক্ষ্য তিনি হ'লেও এটি সর্বজনের, আত্ম-তত্ত্বাভিলাষী সকল সুধীজনের জন্যই। অর্জুনের মতো এই সমস্যা আমাদের সকলের জীবনে প্রতি মুহূর্তেই আসে। তাঁর মতো আমাদেরও ভেতরে বাইরে জীবনসংগ্রাম চলছে অহর্নিশ। আমাদের জীবনেও ঐ রকম মোহ আসে, আসে সংশয়, ভীতি। তাঁরই মতো আমাদেরও নানান বিঘ্ন-বাধার বিপক্ষে দাঁড়াতে হয়। অনেক মনগড়া যুক্তি আমরাও খাড়া করি আমাদের দুর্বলতা, অসামর্থ্য ও ত্রুটির সপক্ষে। কিন্তু ভগবৎকৃপায় যদি আমাদের শরণাগতি আসে, ঈশ্বর-নির্ভরতা আসে তবে তাঁর অভয়বাণী শুনবার অধিকারী আমরা হতে পারি। আমাদের অন্তরের সুপ্তশক্তিকে জাগিয়ে দিয়ে, আত্মপ্রতিষ্ঠ ক'রে পরম কারুণিক শ্রীভগবান তখনই বলেন—
'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥'

ক্লীবতা পরিত্যাগ ক'রে আপন স্বভাবে প্রবুদ্ধ করবার মহামন্ত্র তিনি দেন শিষ্যের কানে —তার মনে-প্রাণে জাগিয়ে তোলেন সেই অভয়ের বাণী—চোখে লাগিয়ে দেন সেই জ্ঞানাঞ্জন, যার ফলে সত্যদৃষ্টিসহায়ে সে আপন কর্তব্য কর্মে দৃঢ়নিশ্চয় হয়।

আমি কি আর উপদেশ দেব। ঠাকুরের কথা সব বইয়ে বেরিয়ে গেছে।
তাঁর একটা কথা ধারণা করে যদি চলতে পার তো সব হয়ে যাবে।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

উদ্বোধনের মাধ্যমে
প্রচার হোক
এই বাণী। শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ— স্বামী সারদানন্দ। দুই ভাগ, রেক্সিন-বাঁধাই: মূল্য ১ম ভাগ ১৯'০০। ২য় ভাগ ১৭'০০

সাধারণ ১ম খণ্ড ৩'৫০; ২য় খণ্ড ৭'৮০; ৩য় খণ্ড ৫'২০; ৪র্থ খণ্ড ৭'০০; ৫ম খণ্ড ৭'৫০

-অক্ষয়কুমার সেন।

সুললিত কবিতায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী। মূল্য ২৬'০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ-সংকলিত। মূল্য ১'৩০; কাপড়ে বাঁধাই ১'৮০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা— অক্ষয়কুমার সেন। মূল্য ৩'৫০

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। মূল্য ২'৫০

শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ—স্বামী নির্বেদানন্দ (অনুবাদ: স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। পৃঃ ২৯৬, সাধারণ ৬'০০; হাফ-রেক্সিন। বোর্ড বাঁধাই, শোভন ৭'০০

শ্রীরামকৃষ্ণজীবনী—স্বামী তেজসানন্দ। (যন্ত্রস্থ)

শিশুদের রামকৃষ্ণ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৪০, মূল্য ৩'০০

মা-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীমায়ের কথা—শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সন্তানগণের ডায়েরী হইতে। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। মূল্য ১ম ভাগ ৭'০০, ২য় ভাগ ১০'০০

মাতৃ-সান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ। পৃঃ ২৫৬, মূল্য ৬'০০

শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীশ্রীমায়ের বিস্তারিত জীবনীগ্রন্থ। পৃঃ ৬৪২, মূল্য ১৭'০০

শিশুদের মা সারদাদেবী (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৪০, মূল্য ৩'০০

স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয়

যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত স্বামীজীর প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। তিন খণ্ডে প্রকাশিত। মূল্য ১ম খণ্ড ১৬'০০; ২য় খণ্ড ১৬'০০; ৩য় খণ্ড ৮'০০

স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীপ্রমথনাথ বসু। ১ম ভাগ (ছাপা নাই), ২য় ভাগ—মূল্য ৪'২৫

স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১৩৬, মূল্য ২'৫০

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—(দুই খণ্ড একত্রে)। শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। স্বামীজীর সহিত লেখকের কথোপকথন। পৃঃ ২৫৮, মূল্য ৭'০০

স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতা। (অনুবাদ: স্বামী মাধবানন্দ)। মূল্য ৮'০০

স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে—ভগিনী নিবেদিতা (বঙ্গানুবাদ)। পৃঃ ১২৪, মূল্য ১'২৫

শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। ৩য় সং, মূল্য ২'৫০

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

অন্যান্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা — স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য ১৩'০০,
২য় ভাগ পৃঃ ৫২৪, মূল্য ৮'০০

ভারতে শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ। মূল্য ৩'০০

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৯১, মূল্য ৫'০০

স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ। পৃঃ ৩১০, মূল্য ৪'০০

গোপালের মা — স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৪৪, মূল্য ১'৫০

আচার্য শঙ্কর—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৪৩, মূল্য ৬'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র—মূল্য ৭'৮০

শিবানন্দ-বাণী— স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত। ২য় ভাগ ২'৫০

স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ। মূল্য ৪'০০

দিব্যপ্রসঙ্গে — স্বামী দিব্যাত্মানন্দ। পৃঃ ১৯৪, মূল্য ৬'৩৫

স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী—
(ছাপা নাই)

আরতি-স্তব—মূল্য ০'৭০

পুণ্যস্মৃতি স্বামী জানাত্মানন্দ। পৃঃ ১১৬, মূল্য ৩'০০

মহাভারতের গল্প—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, সাধারণ ২'৫০, বোর্ড বাঁধাই ৩'০০
৬ষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য সংক্ষেপিত "দ্রুতপাঠ্য" সংস্করণ—পৃঃ ৭২, মূল্য ২'০০

শঙ্কর-চরিত — শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। ৭ম সংস্করণ মূল্য ২'৫০

দশাবতার-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য পৃঃ ১০৮, মূল্য ২'৫০

সাধক রামপ্রসাদ —স্বামী বামদেবানন্দ। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৫'২০

সাধু নাগমহাশয়—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। পৃঃ ১৪৪, মূল্য ৩'৫০

ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী তেজসানন্দ। পৃঃ ১২৪, মূল্য ১'৫০

শিব ও বুদ্ধ—ভগিনী নিবেদিতা। পৃঃ ৬৩, মূল্য ০'৬৫

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—
পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৫'০০

পত্রমালা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২, মূল্য ৪'০০

গীতাতত্ত্ব—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৭৬, মূল্য ৫'০০

লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৪২০, মূল্য ১০'০০

পরমার্থ-প্রসঙ্গ— স্বামী বিরজানন্দ। পৃঃ ১৩৭, মূল্য ৪'০০

ভগবানলাভের পথ—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। মূল্য ১'০০

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী — স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৩২, মূল্য ০'৬০

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-সঞ্চয়ন—
পৃঃ ৩১৬, মূল্য ৭'০০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

বেদান্তের আলোকে খৃষ্টের শৈলোপদেশ—স্বামী প্রভবানন্দ। মূল্য সাধারণ ৪'০০

অতীতের স্মৃতি—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। পৃঃ ৪৬৪, মূল্য ১০'০০

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ১৪২, মূল্য ৩'৩০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। পাঁচশতাধিক সঙ্গীত। মূল্য ৬'০০

ঠাকুরের নরেন, নরেনের ঠাকুর—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ২৯, মূল্য ১'২০

সংস্কৃত

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত

১ম ভাগ পৃঃ ৪৫৪, মূল্য ১১'০০

২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ১১'০০

৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মূল্য ১১'০০

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত, স্বামী জগদানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪৯৫, মূল্য ৭'৮০

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৬'৪০

স্তবকুসুমাঞ্জলি—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪০৮, মূল্য ৭'০০

বৈরাগ্যশতকম্—স্বামী ধীরেশানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ১'৫০

নারদীয় ভক্তিসূত্র—স্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ১৬৩, মূল্য সাধারণ ৫'০০, শোভন ৭'৫০

বেদান্তদর্শন—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য: ১ম অধ্যায় (চারখণ্ডে) ১৭'০০, ২য় অঃ ১৩'০০; ৩য় অঃ ১৩'০০; ৪র্থ অঃ ৯'০০

গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা—স্বামী রঘুবরানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য ১'৮০

শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজাপদ্ধতি—পৃঃ ৬৪, মূল্য ১'৫০

অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—সুরেশ দত্ত। মূল্য ৫'০০

পরমহংসদেব—স্বামী প্রেমেশানন্দ। পৃঃ ২৪, মূল্য ০'৭৫

জননী সারদাদেবী—স্বামী নির্বেদানন্দ। (অনুবাদক: স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। মূল্য ২'৮০

শ্রীশ্রীমা সারদা—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৯০, মূল্য ২'০০

গল্পে বেদান্ত—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, মূল্য সাধারণ ৩'০০, বোর্ড বাঁধাই ৩'৫০

বীরবাণী—স্বামী বিবেকানন্দ। পৃঃ ১১৪, মূল্য ২'০০ (যন্ত্রস্থ)

বিবেকানন্দের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। পৃঃ ১৫৪, মূল্য ৩'৫০

প্রাপ্তিস্থান: উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩

৮০।৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত।

সম্পাদক—স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ : সংযুক্ত সম্পাদক—স্বামী ধ্যানানন্দ

বার্ষিক মূল্য ১২·০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১·২০ টাকা

উদ্বোধন



উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত

অগ্রহায়ণ ১৩৮৫

৮০তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়; ৮০তম বর্ষ হইতে **বার্ষিক মূল্য সডাক ১২৲ টাকা, ষাণ্মাষিক ৭৲ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে ৩৩৲ টাকা, এয়ার মেল-এ ১০১৲ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ১.২০ টাকা। নমুনার জন্য ১.২০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সাত দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে; তাহার পরে চাহিলে পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হইবে না।

রচনা ঃ—ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা প্রবন্ধ ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময় তাঁহারা** যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌঁছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহকনম্বর পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময়ঃ সকাল ৭॥০টা হইতে ১১টা; বিকাল ২॥০টা হইতে ৫টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০০০৩

উদ্বোধন, অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬

সূচীপত্র

উদ্বোধন, ৮১তম বর্ষ, ১৩৮৫-৮৬

নিবেদন

বর্তমান বৎসরের পৌষ মাসে 'উদ্বোধন' পত্রিকার ৮০তম বর্ষ শেষ হইবে। আগামী মাঘ (১৩৮৫) মাসে পত্রিকা ৮১তম বর্ষে পদার্পণ করিবে। পত্রিকার গ্রাহক-গ্রাহিকাগণকে জানানো যাইতেছে, তাঁহারা যেন আগামী ১৫ই ডিসেম্বরের (১৯৭৮) মধ্যে তাঁহাদের **পুরা নাম ও ঠিকানা এবং গ্রাহক-সংখ্যা সহ** বার্ষিক চাঁদা ১২৲ টাকা (ভারতের বাহিরে হইলে ৩৩.০০ টাকা, এয়ার মেল-এ ১০১.০০ টাকা) মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দেন। **তৎপূর্বে, কার্তিক সংখ্যায় সংলগ্ন কার্ডখানি যদি ইতিমধ্যে না পাঠাইয়া থাকেন, তাহা হইলে যত শীঘ্র সম্ভব উহা পূরণ করিয়া জানাইবেন**—মনিঅর্ডার-যোগে বা লোক মারফত টাকা পাঠাইবেন অথবা মাঘ মাসের পত্রিকা ভি. পি. পি.-তে গ্রহণ করিতে চান : কার্ডটিতে ১০ পয়সার ডাকটিকিট আঁটিয়া পোস্ট করিবেন। ভি. পি. পি.-তে লইলে ১৫৲ টাকা ৮০ পয়সা লাগিবে।

অনিবার্য কারণে কাহারও পক্ষে আগামী বৎসরে গ্রাহক থাকা সম্ভব না হইলে তাহাও উক্ত কার্ডেই জানাইয়া দিবেন।

উক্ত তারিখের মধ্যে বার্ষিক চাঁদা ১২৲ টাকা না আসিলে অথবা কোন পত্র না পাইলে মাঘ মাসের পত্রিকা পাঠানো হইবে না, কারণ ভি. পি. পি. ফেরত দিলে আমাদের অযথা ক্ষতি হয়। সেজন্য সংলগ্ন কার্ডখানি অতি অবশ্যই অবিলম্বে পূরণ করিয়া পাঠাইবেন।

সুদীর্ঘ ৮০ বৎসর ধরিয়া উদ্বোধন-পত্রিকার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভাবপ্রচারের কাজে আপনাদের সহায়তা আমরা পাইয়া আসিতেছি। আশা করি উহা অব্যাহত থাকিবে।

অফিসে চাঁদা জমা দিবার সময় : { সকাল ৭॥—১১টা
বিকাল ২॥—৫টা }

[রবিবার অফিস বন্ধ থাকে]

কার্যাধ্যক্ষ
উদ্বোধন কার্যালয়

১ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫ — ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০ ০০৩



৮০ তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা

অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫

দিব্য বাণী

জিতেন্দ্রিয়স্য যুক্তস্য জিতশ্বাসস্য যোগিনঃ।
ময়ি ধারয়তশ্চেত উপতিষ্ঠন্তি সিদ্ধয়ঃ॥
ত্রিকালজ্ঞত্বমদ্বন্দ্বং পরচিত্তাদ্যভিজ্ঞতা।
অগ্ন্যর্কাম্বুবিষাদীনাং প্রতিষ্টম্ভোঽপরাজয়ঃ॥
মদ্‌ভক্ত্যা শুদ্ধসত্ত্বস্য যোগিনো ধারণাবিদঃ।
তস্য ত্রৈকালিকী বুদ্ধির্জন্মমৃত্যুপবৃংহিতা॥
জিতেন্দ্রিয়স্য দান্তস্য জিতশ্বাসাত্মনো মুনেঃ।
মদ্ধারণাং ধারয়তঃ কা সা সিদ্ধিঃ সুদুর্লভা॥

—শ্রীমদ্‌ভাগবত, ১১।১৫।১, ৮, ২৮, ৩২

(ভগবান কহিলেন উদ্ধবেরে—) সিদ্ধি সব আসে
জিতেন্দ্রিয় জিতপ্রাণ ধৃতচিত্ত যোগীর সকাশে।
ত্রিকালের জ্ঞান আর শীত-উষ্ণ আদি দ্বন্দ্বজয়
পরচিত্ত-অভিজ্ঞতা, অজেয়ত্ব অগ্নি সূর্য জল বিষে হয়।
আমাতে ভক্তির ফলে ধৃতিবিদ্‌ শুদ্ধ যোগী পান
জন্মমৃত্যু-পরিচ্ছেদ-বিরহিত ত্রিকালের জ্ঞান।
শরীর ইন্দ্রিয় আর প্রাণ মন বশীভূত যাঁর
যুক্ত যিনি আমাতেই কোন্‌ সিদ্ধি সুদুর্লভ তাঁর!

কথাপ্রসঙ্গে

মৃত্তিকা ও ঘট

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অগ্রজ রামকুমার চট্টোপাধ্যায় আদ্যাশক্তির উপাসক ছিলেন। ইষ্টদেবীকে নিত্য পূজা করিবার কালে একদিন তাঁহার এক অপূর্ব দর্শনলাভ হয় এবং তিনি অনুভব করেন দেবী যেন নিজ অঙ্গুলির দ্বারা তাঁহার জিহ্বায় জ্যোতিষবিদ্যায় সিদ্ধিলাভের জন্য কোন মন্ত্রবর্ণ লিখিয়া দিতেছেন। ফলতঃ কোনও রোগীকে দেখিলেই তিনি ভবিষ্যদ্‌বাণী করিতে পারিতেন, সে-ব্যক্তি আরোগ্যলাভ করিবে কিনা।

একদা কোনও ধনী রমণী নিজ শিবিকার মধ্যে বসিয়াই গঙ্গাস্নান করিতেছিলেন. রামকুমারও সে-সময়ে স্নানরত ছিলেন। কোনও অভিনব দৃশ্য নয়নগোচর হইলে মানুষের দৃষ্টি সেই দিকে স্বভাবতই আকৃষ্ট হয়। রামকুমারেরও তাহাই হইল এবং রমণীকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন, 'আজ যে-দেহকে এত আদব-কায়দায় স্নান করানো হচ্ছে, কাল তাকেই গঙ্গায় বিসর্জন দিতে হবে।' বস্তুতঃ পরদিনই উক্ত মহিলার দেহান্ত হয়।

রামকুমার প্রাপ্তযৌবনা নিজ স্ত্রীকে দেখিয়াও বলিয়াছিলেন, সন্তানপ্রসব করিলেই গর্ভধারিণীর মৃত্যু হইবে। ইহাও সত্য হইয়াছিল

'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' গ্রন্থে আছে, 'ঠাকুরের বড় ভাই বিকারের সময় জল খাচ্ছিলেন। একটুখানি খেতেই ঠাকুর হাত থেকে গ্লাসটি টেনে নিলেন। তিনি তাতে অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "তুই আমাকে জল খেতে দিলিনি, তুইও এমনি কষ্ট পাবি, তোরও গলায় এমনি যাতনা হবে।" ঠাকুর বললেন, "দাদা, আমি তো তোমার মন্দ করিনি। তোমার অসুখ, জল খেলে অনিষ্ট হবে, তাই দিইনি। তবে কেন তুমি আমায় এমন শাপ দিলে?" তিনি কেঁদে বললেন, "কি জানি ভাই, আমার মুখ থেকে ওকথা বেরিয়ে পড়লো। এ তো অন্যথা হবে না।"'

অগ্রজের ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরও এই শক্তি ছিল, যদিও তিনি এই সব ব্যাপারে সহজে ধরা দিতেন না। তাঁহার কয়েকটি উক্তি আমরা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিতে পারি:

বিবাহের মনোমত পাত্রীর অন্বেষণে যখন আত্মীয়গণ ব্যস্ত, তখন যুবক শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহাদের বলিয়া দেন যে, জয়রামবাটী গ্রামের রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা পাত্রীরূপে দৈব-কর্তৃক রক্ষিত আছে—তাঁহার নিজের ভাষায়: 'মেয়েটি কুটো বেঁধে রাখা আছে, দেখ্‌গে যা।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'ঘর-সংসার' না করায় তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী দুঃখ প্রকাশ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, 'শাশুড়ী ঠাকরুণ, সেজন্য আপনি দুঃখ করবেন না—আপনার মেয়ের এত ছেলেমেয়ে হবে, শেষে দেখবেন মা ডাকের জ্বালায় আবার অস্থির হয়ে উঠবে।

শ্রীশ্রীমায়ের মৌন মনোবেদনার কথা জানিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকেও অনুরূপভাবে

বলিয়াছিলেন, 'তোমার ভাবনা কিসের? তোমায় এমন সব রত্ন-ছেলে দিয়ে যাব, মাথা কেটে ভূপিণ্ডে করেও মানুষে পায় না। পরে দেখবে এত ছেলে তোমায় মা বলে ডাকবে, তোমার সামলানো ভার হয়ে উঠবে।'

তাঁহার প্রথম রসদদার মথুরানাথ বিশ্বাসকে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'দেখ, মা আমায় দেখিয়ে দিয়েছেন, এখানকার (ঠাকুরের নিজের) সব ঢের অন্তরঙ্গ আছে, তারা সব আসবে, এখান থেকে ঈশ্বরীয় বিষয় জানবে, প্রত্যক্ষ করবে।'

নিজের দেহত্যাগের সময় সম্পর্কেও শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। কণ্ঠরোগ হইবার চার-পাঁচ বৎসর পূর্বে তিনি শ্রীশ্রীমাকে বলিয়াছিলেন, 'যখন যার-তার হাতে খাব, কলকাতায় রাত কাটাব, আর খাবারের অগ্রভাগ কাউকে দিয়ে বাকীটা নিজে খাব, তখন জানবে দেহরক্ষা করবার বেশী দেরী নাই।' বলা বাহুল্য, তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল। উল্লেখযোগ্য যে, তাঁহার জন্য প্রস্তুত আহার্যের অগ্রভাগ একদা তিনি নরেন্দ্রনাথকে দিয়া অবশিষ্টাংশ স্বয়ং গ্রহণ করেন।

শেষ অসুখের সময়ে কাশীপুরে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমা ও অন্যান্যদের বলিয়াছিলেন, 'এর পর ঘরে ঘরে আমার পূজা হবে। মাইরি বলছি—বাপান্ত দিব্যি!'

একাদশ বৎসর বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীমণিদেবীর বিবাহ হয়। বিবাহের পর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন, 'লক্ষ্মী দেখছি আর শ্বশুরবাড়ী যাবে না।' বস্তুতঃ বিবাহের দুই-এক মাস পরেই লক্ষ্মীমণিদেবীর স্বামী মাত্র একদিনের জন্য কামারপুকুরে আসিয়া কর্মের সন্ধানে অন্যত্র চলিয়া যান এবং তদবধি তাঁহার কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই। দ্বাদশ বৎসর পরে তাঁহার শ্রাদ্ধাদি করা হয়।

অনেকের মৃত্যু সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভবিষ্যদ্বাণী আছে। নিজ ভ্রাতা রামেশ্বর দক্ষিণেশ্বর হইতে শেষ বার কামারপুকুর রওনা হইবার সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার মৃত্যু আসন্ন জানিয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন।

তাঁহার ভক্ত ও দ্বিতীয় রসদদার শম্ভুচরণ মল্লিক একবার পীড়িত হইলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে দেখিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন, 'শম্ভুর প্রদীপে তেল নেই।' ইহার পরই শম্ভুবাবুর দেহান্ত হয়।

শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, 'নরেন, রাখাল, বলরাম, ভবনাথ, মনোমোহন···ছোট নরেন-···ঠাকুর এদের যার যার সম্বন্ধে যা যা বলে গেছেন, তা বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছে।'

জনৈক সাধকের ভাবাবস্থা দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'এ যে দেখছি মধুর ভাবের পূর্বাভাস! কিন্তু এ-অবস্থা এর থাকবে না, রাখতে পারবে না।' ফলতঃ কিছুকাল পরেই সংবাদ পাওয়া যায় যে, সংকীর্তনের ক্ষণিক উত্তেজনায় সে-ব্যক্তি যত উচ্চে উঠিয়াছিল, ভাবাবসাদে আবার ততই নিম্নে নামিয়াছে।

প্রশ্ন হইতে পারে, ভবিষ্যদ্বাণীর এত দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন কি? 'আমার অনাগত আমার অনাহত, তোমার বীণাতারে বাজিছে তারা'—ইহা তো অতি প্রসিদ্ধ কথা! কবির কথা না হয় বাদই দিলাম, জ্যোতিষীরাও তো ভবিষ্যতের কথা বলেন এবং বলেন বলিয়াই বহু বিদ্বান বুদ্ধিমান গণ্যমান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরাও তাঁহাদের দ্বারস্থ হইতে সঙ্কুচিত হন না।

সুতরাং এত সাড়ম্বর ভণিতা কেন ?

ইহার উত্তরে বলা যায়, জ্যোতিষীরা গণনার দ্বারা যে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেন, তাহা সকল সময়ে যথাযথ হয় না। এবং অন্যান্য ভবিষ্যদ্‌বক্তাদের যে সকল সংবাদ লোকমুখে শ্রুত হয়, সেগুলিও যে অনেক ক্ষেত্রেই রসাল গালগল্প মাত্র, তাহাও সুবিদিত। এইজন্যই আপ্তপুরুষের ভবিষ্যদ্‌বাণীর দৃষ্টান্তসমূহ উপস্থাপিত করা হইয়াছে। আর আমরা যে বহু-বিতর্কিত তত্ত্বে প্রবেশ করিতে যাইতেছি, তাহার মুখবন্ধ হিসাবে অমোঘ ভবিষ্যদ্‌বাণীর দৃষ্টান্তের উপস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে।

আপ্তব্যক্তির ভবিষ্যদ্‌বাণী জ্যোতিষিক গণনানির্ভর নহে। ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ করিবার শক্তি তাঁহার থাকে এবং সেই যোগজ শক্তি-সহায়েই তিনি ভবিষ্যদ্‌বাণী করেন। এই যোগজ শক্তি সাধনার দ্বারাই লভ্য, তবে ঈশ্বরাবতারদের ক্ষেত্রে উহা স্বভাবসিদ্ধ। যে-উপায়ে এই যোগজ শক্তি লাভ করা যায়, তাহার স্পষ্ট নির্দেশ মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার যোগসূত্রে দিয়াছেন। তিনি বলেন, 'পরিণাম-ত্রয়-সংযমাৎ অতীতানাগত-জ্ঞানম্' (৩।১৬)। ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিতে হইলে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ হইয়া যায়! এইজন্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার 'রাজযোগ'-গ্রন্থে সূত্রটির যে-ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহার নিষ্কর্ষ মাত্র উল্লেখ করা হইতেছে। স্বামীজী বলিয়াছেন, আমাদের কতকগুলি সংস্কার বর্তমান অবস্থায় কার্য করিতেছে, কতকগুলির ভোগ শেষ হইয়াছে এবং কতকগুলি ভবিষ্যতে ফল প্রদান করিবে বলিয়া সঞ্চিত আছে। মনের এই ত্রিবিধ পরিণামের উপর 'সংযম' (ধারণা-ধ্যান-সবিকল্পসমাধি) করিলে যোগী অতীত ও ভবিষ্যতের জ্ঞান লাভ করেন।

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, অতীত ও ভবিষ্যৎ—বর্তমানে দৃষ্ট না হইলেও, তাহারা স্বরূপেই অবস্থিত আছে। এবিষয়ে মহর্ষি পতঞ্জলির সূত্র : 'অতীতানাগতং স্বরূপতঃ অস্তি, অধ্বভেদাৎ ধর্মাণাম্' (৪।১২)। তাৎপর্য এই যে, অতীত ও ভবিষ্যৎ যদিও ব্যক্তরূপে এখন নাই, তথাপি সূক্ষ্মাকারে বিদ্যমান আছে।

উল্লিখিত 'সংযমে'র প্রয়োগ করিয়াই স্বামীজী আমেরিকায় সহস্রদ্বীপোদ্যানে ভগিনী ক্রিষ্টীন প্রমুখ কয়েকজনের ভবিষ্যৎ জীবনের অনেক ঘটনা বলিয়াছিলেন। ভগিনী ক্রিষ্টীন লিখিয়াছেন :

> একজনের ক্ষেত্রে স্বামীজীর মনোদৃষ্টিতে দৃশ্যের পর দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হইতে লাগিল, যাহার অর্থ ঐ ব্যক্তির প্রাচ্যদেশে ভ্রমণ। যে সকল গৃহে তাঁহার ও অপরদের থাকিতে হইবে, যাহাদের সংস্পর্শে আসিতে হইবে, ইত্যাদি ছোট-বড় সমস্ত ভাবী ঘটনা স্বামীজী তাঁহাদের জানাইয়া দেন। স্বামীজী আরও দেখিয়াছিলেন, উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ভারতের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইবেন।

সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই 'একজন' বলিতে ভগিনী ক্রিষ্টীন নিজের কথাই বলিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, স্বামীজী যে কেবল যোগশাস্ত্রোক্ত 'সংযম' প্রয়োগের দ্বারাই ভবিষ্যতের ঘটনাবলী জানিতেন, তাহা নহে। তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী প্রেমানন্দ বলেন, 'একদিন স্বামীজী আমাদের বলেছিলেন, জগদম্বা বায়োস্কোপের

ফিল্মের মতো চার শ বছরের ভবিষ্যৎ ভারত তাঁকে দেখিয়ে দিয়েছেন।' নিজের সম্বন্ধেও স্বামীজী বলিয়াছিলেন, ইহজন্মে যে সকল ব্যক্তি বস্তু বা বিষয়ের সহিত তাঁহাকে পরিচিত হইতে হইবে, জন্মগ্রহণের পূর্বে সেই সকলকে চিত্র-পরম্পরায় তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং তাহারই স্মৃতি জীবৎকালে তাঁহার অন্তরে মধ্যে মধ্যে উদিত হইত। 'লীলাপ্রসঙ্গে'র সহিত পরিচিত পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, স্বীয় গুরুভ্রাতা শরৎচন্দ্রের গৃহে প্রথম প্রবেশ করিয়াই নরেন্দ্রনাথ সহসা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, 'এ বাড়ী যে আমি ইতিপূর্বেই দেখিয়াছি! ইহার কোথা দিয়া যাইতে হয়, কোথায় কোন্ ঘর আছে, সে সকলি যে আমার পরিচিত—আশ্চর্য!'

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, 'সংযম' ব্যতিরেকেই অতীত ও ভবিষ্যতের জ্ঞান প্রভৃতি যাবতীয় বিভূতি যে-শক্তিসহায়ে লাভ করিতে পারা যায় মহর্ষি পতঞ্জলি তাহাকে 'প্রাতিভ' শক্তি বলিয়াছেন—'প্রাতিভাৎ বা সর্বম্' (৩।৩৩)।

ভবিষ্যতের ঘটনাবলী যেভাবে জানা যায়, তাহার একটু অন্য ধরনের ব্যাখ্যাও স্বামীজীর 'জ্ঞানযোগ' ও 'দেববাণী' গ্রন্থদ্বয়ে দেখা যায়। স্থানাভাবে সেগুলির বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নহে। 'দেববাণী'তে আছে: 'জগৎপ্রপঞ্চ…যেন নাগরদোলা—আত্মা যেন ঐ নাগরদোলায় চড়ে ঘুরছে। এই ক্রম চিরন্তন। এক একজন লোক ঐ নাগরদোলা থেকে নেমে পড়ছে বটে, কিন্তু চিরকাল সেই একরকম ঘটনাই বারবার ঘটছে; আর এই কারণেই লোকের ভূত-ভবিষ্যৎ সব বলে দেওয়া যেতে পারে; কারণ প্রকৃতপক্ষে সবই তো বর্তমান। যখন আত্মা একটা শৃঙ্খলের ভেতর এসে পড়ে, তখন তাকে সেই শৃঙ্খলের যা কিছু অভিজ্ঞতা, তার ভেতর দিয়ে যেতে হবে।…ঐরূপ শ্রেণীর বা ঘটনা-পরম্পরার একটি প্রধান ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে সমুদয় ঘটনা-শৃঙ্খলটাই টেনে আনা যেতে পারে, আর তার ভেতরের সমুদয় ঘটনাই যথাযথ পাঠ করা যেতে পারে।'

'জ্ঞানযোগ' গ্রন্থে সংকলিত 'অমৃতত্ব' শীর্ষক বক্তৃতাতেও স্বামীজী ঐ কথার উল্লেখ করিয়াছেন। অধিকন্তু কল্পে কল্পে ঘটনাগুলি যে পুনরাবৃত্ত হইতেছে, তাহাও সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছেন। স্বামী সারদানন্দও 'বিবিধ প্রসঙ্গ' গ্রন্থে 'সার কথা: (মায়া ও মায়ার পাশা)' শীর্ষক প্রবন্ধে[১] এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থেও তিনি লিখিয়াছেন যে, ভবিষ্যৎ ঘটনাসমূহ 'বিরাট মনে' সূক্ষ্মাকারে পূর্ব হইতেই প্রকাশিত থাকে এবং 'বিরাট মনে'র সহিত যুক্ত থাকায় শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধ যীশু প্রমুখ অবতারপুরুষগণ এবং জীবন্মুক্তপুরুষগণও নিজ নিজ শরীরত্যাগ সম্পর্কে অনুপুঙ্খ জানিয়াও যে-ব্যক্তি বা বস্তু দেহান্তের কারণ হইবে, তৎপ্রতি সদা-অনুদ্বিগ্ন তাঁহাদের মনে কখনও সম্প্রীতির অভাব হয় না।

শংকরাচার্য মৃত্তিকা ও ঘটের দৃষ্টান্তের দ্বারা বিষয়টির উপর আলোকসম্পাত করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্যের তাৎপর্য এই:

> কুম্ভকারের গৃহে এক তাল মৃত্তিকা আছে; যদি সেই মৃত্তিকা হইতে ভবিষ্যতে ঘট নির্মিত হইবার হয়—সব

১ 'উদ্বোধন' ভাদ্র ১৩১৮ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত।

মৃৎপিণ্ড হইতেই যে ঘট নির্মিত হইবে, এমন কোন কথা নাই—তাহা হইলে ভাবী ঘটকে ঈশ্বরের তো কথাই নাই, যোগীরাও বর্তমান কালেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। কুম্ভকারের অথবা অন্য কোন ব্যক্তির বা বস্তুর কোনও সামর্থ্য নাই যে, সেই ভাবী ঘটকে নস্যাৎ করিয়া দেয়। কারণ, যে ঘটটি ভবিষ্যতে হইবেই, তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে যোগীর দৃষ্টি ও ঈশ্বরের দৃষ্টি মিথ্যা হইয়া যাইবে।[২] কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টি কখনও মিথ্যা হয় না। বস্তুতঃ ভবিষ্যৎ ঘটটি বর্তমানে মৃত্তিকার মধ্যে অনভিব্যক্ত অবস্থায় আছে, কালে উহা কুম্ভকারাদির দ্বারা অভিব্যক্ত হয়। কুম্ভকার ঘটাভিব্যক্তির নিমিত্তমাত্র।

[স্মরণীয় গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তি: হে সব্যসাচী, আমি ইহাদিগকে পূর্ব হইতেই বধ করিয়া রাখিয়াছি, তুমি নিমিত্তমাত্র হও।]

ঘটের এই অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ প্রবল আপত্তি তুলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, ভাবী ঘট মৃত্তিকার মধ্যে বর্তমানে অব্যক্তাবস্থায় আছে, ইহা কোন কাজের কথা নহে। কুম্ভকার কর্তৃক ঘট উৎপন্ন হয়—ইহাই সকলের প্রত্যক্ষ; সুতরাং উৎপত্তির পূর্বে ঘটের কোনও অস্তিত্ব থাকিতে পারে না।[৩]

এই উভয় পক্ষের তুমুল তর্ক প্রকৃতপক্ষে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে দৈব ও পুরুষকার সম্পর্কে যে-বাদানুবাদ আবহমান কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহা ভিন্ন আর কিছুই নহে। অধিকাংশ মানুষের চিরকালই এই ভ্রম থাকে যে, তাহারা কর্তা এবং ইহাও নিশ্চিত সত্য যে, তাহাদের দ্বারা বড় বড় কাজও সম্পন্ন হয়। কিন্তু জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃততর হইতে থাকিলে মানুষ ক্রমশঃ বুঝিতে পারে যে, পুরুষকারও ঈশ্বরেরই ইচ্ছা—ঈশ্বরেচ্ছা ব্যতিরেকে পুরুষকারের প্রকাশ অসম্ভব। তখনই মানুষ ঠিক ঠিক ঈশ্বরের শরণাগত হইতে পারে, তৎপূর্বে নহে। এইভাবে জীবের ভ্রমাত্মক কর্তৃত্ববোধ দূর হইতে থাকে এবং পরিশেষে পরিপূর্ণ ভগবৎ-শরণাগতির মাধ্যমে সে নিজ নিষ্ক্রিয়-আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

[এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী সারদানন্দজীর একটি চিঠির কথা। মহাসমাধির ঠিক দুই বৎসর পূর্বে তিনি লিখিয়াছিলেন, 'The thing is, it is literally true, and I am finding it to be so every day at present, that we cannot do anything, however little or simple, unless the Divine Being wills it!'—কথাটি এই: ইহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য এবং এখন আমি এইরূপই অহরহ অনুভব করিতেছি যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত আমরা কিছুই করিতে পারি না, তাহা যতই ক্ষুদ্র বা সামান্য হউক না কেন।]

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়। শংকরাচার্যের মৃত্তিকা- ও ঘট-বিষয়ক যে যুক্তির উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে, তাহা জগতের ব্যবহারিক

---

২ 'যোগিনাং চ অতীতানাগত-জ্ঞানস্য সত্যত্বাৎ। অসন্ চেৎ ভবিষ্যদ্-ঘটঃ, ঐশ্বরং ভবিষ্যদ্-ঘট-বিষয়ং প্রত্যক্ষজ্ঞানং মিথ্যা স্যাৎ।'—বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ১।২।১, 'ঘটভাষ্য'।

৩ নৈয়ায়িক-বৈশেষিকগণের যুক্তিজাল ও তাহার খণ্ডন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা গত শারদীয়া সংখ্যায় অধ্যাপক শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্যের 'অসৎকার্যবাদখণ্ডন' শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

সত্যতা স্বীকার করিয়াই। অদ্বৈতবাদীদের মতে জগতের পারমার্থিক সত্তা নাই। উপনিষদ্ বলিতেছেন: 'বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং, মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্', অর্থাৎ [ঘটরূপ] বিকার বা পরিণাম বলিয়া যাহা অভিহিত হয়, তাহা কথার কথা মাত্র, মৃত্তিকাই সত্য। তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্মরূপ মৃত্তিকার পরিণাম যে জগৎ-রূপ ঘট, তাহার পারমার্থিক সত্তা নাই। সুতরাং ঐ পরিণামকে 'পরিণাম' না বলিয়া 'বিবর্ত' বলাই সমীচীন। ব্রহ্মই সত্য, জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত। অবশ্য এই চরম জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে পূর্বোক্ত মতবাদদ্বয়ের ক্রম-উপযোগিতা অনস্বীকার্য।

দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়

ডক্টর রমা চৌধুরী

(নবম পর্যায়)

শ্রীপতির 'বিশেষাদ্বৈতবাদ'

[পূর্বানুবৃত্তি]

তারপরের কথা এই হ'ল যে, এই দশটি সম্ভাব্য আপত্তি-খণ্ডনের ক্ষেত্রেও শ্রীপতি কোনো রকমেরই কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি—সেই একই কথা বারংবার বলেছেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যে, ভেদ ও অভেদ নিশ্চয়ই পরস্পর-বিরোধী, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের সহাবস্থিতিও অবশ্যস্বীকার্য; এবং বারংবার দশবার প্রায় সেই একই কথা না ব'লে একবারেই তা তিনি বুঝিয়ে বললে নিশ্চয়ই অনেক বেশী ভালো হত।

তারপরের বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা হ'ল এই যে, যদি দুটি বস্তু সত্যসত্যই পরস্পর-বিরুদ্ধ হয়, তা হ'লে তাদের সহাবস্থিতি বা একই স্থানে, একই পাত্রে, একই সময়ে যুগপৎ উপস্থিতি একেবারেই অসম্ভব। যথা, আলোক ও অন্ধকার নিশ্চয়ই পরস্পর-বিরোধী; এবং সেজন্য তাদের সহাবস্থিতিও একেবারেই অসম্ভব—একটি কণামাত্র আলোর রেখা দেখা দিলে সে স্থানের অন্ধকারও সঙ্গে সঙ্গেই নিমেষমধ্যেই অন্তর্হিত হয়ে যায়। আলোকও থাকবে, সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি অন্ধকারও থেকেই যাবে—এ ত অতি হাসির কথা, শিশুসুলভ নির্বুদ্ধিতার কথা, অসম্ভব কথা। যে সব উদাহরণ শ্রীপতি নিজেই দিয়েছেন (প্রথম সম্ভাব্য আপত্তি খণ্ডন দেখুন গত কার্তিক সংখ্যা, পৃ: ৫৫৪), তার কোনোটাই সহাবস্থিতির (simultaneous) উদাহরণ নয়—পরম্পরাগত উপস্থিতির (successive) উদাহরণই কেবল-মাত্র—যেমন, জীবে জ্ঞান ও অজ্ঞান; পুণ্য ও পাপ; শৈশব যৌবন ও বার্ধক্য; জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি; ব্রহ্মাণ্ডে স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল; পৃথিবীতে উষ্ণতা ও শীতলতা; প্রপঞ্চে নিত্যতা অণুরূপে, অনিত্যতা বস্তুরূপে; ব্রহ্মে সগুণত্ব মূর্তরূপে, নির্গুণত্ব অমূর্তরূপে; প্রকৃতিতে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ; অর্ধনারীশ্বরে নর ও নারী-রূপ ইত্যাদি। কিন্তু হায়! এই অতি সহজ কথাটিই দুর্ধর্ষ নৈয়ায়িক শ্রীপতিও বুঝলেন না

যে, এরা কোনো ক্ষেত্রেই simultaneous নয়, কেবল successive—কোনো ক্ষেত্রেই যুগপৎ নয়; একটার পর আরেকটা—এইভাবেই পরম্পরাগত। যেমন, মানবে জ্ঞান ও অজ্ঞানের সহাবস্থিতি কোথায়? জ্ঞান এখন আছে, তখন আছে অজ্ঞান; পুণ্য এখন আছে, তখন আছে পাপ—এই ত ঘটছে নিরন্তর—একত্রে তারা সহাবস্থিতি করছে কখন ও কোথায়? তা ত অসম্ভব—এত সহজ সরল কথা এটি, অথচ শ্রীপতির ন্যায় শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িকও তা বুঝতে পারলেন না। আশ্চর্য! এমন কি, প্রকৃতিতেও যখন ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা সংঘটিত হচ্ছে, তখন কিন্তু তাদের মধ্যে বিরুদ্ধত্ব নেই—সকলেই তখন সমান; এবং যখন অসাম্যাবস্থা, তখন তাদের মধ্যে সহযোগিতার সম্বন্ধই বিরোধসম্বন্ধের অপেক্ষা প্রবলতর, যেহেতু, এতদ্ব্যতীত সৃষ্টিই হতে পারে না। অর্ধনারীশ্বরে দুটি বিভিন্ন অংশে দুটি বিভিন্ন রূপ—একই অংশে ত নয়। সেজন্য, এইসকল উদাহরণের কোনোটিই শ্রীপতির প্রাণপ্রিয় তত্ত্বটিকে, পরস্পরবিরুদ্ধ বস্তুদেরও সহাবস্থিতিরূপ অভিনব তত্ত্বটিকে প্রমাণিত করছে না কোনোক্রমেই।

সে যা হোক, নিজের মতবাদকে সর্বশ্রেষ্ঠ মতবাদ 'ভেদাভেদবাদ' ব'লে গ্রহণ ক'রে ভেদাভেদবাদের বিরুদ্ধে একটি নয়, দুটি নয়, দশ দশটি সম্ভাব্য আপত্তি খণ্ডন ক'রে শ্রীপতি নিজে মহাসন্তুষ্ট হলেও আমরা যে নই, হতে পারছি না, সেই কথাই এস্থলে সংক্ষেপে বলা হ'ল।

তারপরে এই প্রসঙ্গেই আসছে বেদান্ত, তথা ভারতীয় দর্শনের সেই মূলীভূত দুর্বোধ্যতম কঠিনতম প্রশ্নটি—ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ড অথবা ব্রহ্ম ও জীব-জগতের সম্বন্ধ কি? আমরা জানি যে, দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভেদ প্রধানতঃ এই দিক থেকেই; এবং যতরকম সম্ভাব্য সম্বন্ধ এক্ষেত্রে হতে পারে, সে সবই যেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৈদান্তিকগণের আর্ষদৃষ্টিতে প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে ভূমাদৃষ্টিতে ধরা পড়ে গিয়েছে সুনিপুণভাবে। শ্রীপতিরও বৈশিষ্ট্য ঠিক এইখানেই এবং পূর্বেই যা বলা হ'ল, যখন মনে হচ্ছে যেন জীবেশ্বরের সম্বন্ধ সম্বন্ধে সমস্ত পক্ষই নিঃশেষিত হয়ে গেল, আর নূতন কিছুই বলবার নেই, তখন হঠাৎ অসমসাহসী স্থির-আত্মবিশ্বাসী ধীর-নবমার্গ-প্রকাশী শ্রীপতি দৃঢ়-দৃপ্ত পদে অগ্রসর হতে আরম্ভ করলেন লতাগুল্মাচ্ছাদিত কণ্টক-কঙ্কর-প্রপীড়িত কুটিল-পিচ্ছিল বনপথে, যে ঘোর অরণ্যে আজ পর্যন্ত কোনো দুঃসাহসী পথিকই পদার্পণ করতেও প্রস্তুত ও সম্মত হননি। কেন? কারণ, বহু পথ দিয়েই ত, কঠিন-সহজ বহু পথ দিয়েই ত 'যুগে যুগে চলেছে যাত্রী' সেই একই শুভ লক্ষ্যের দিকে—ব্রহ্ম। সেই সকল জ্ঞাত পথের পথিক হতে শ্রীপতির মন চায়নি; যেহেতু, তাঁর মতে ঐ সকল পথ, যতই না নিপুণ পূর্বপথিকগণ কর্তৃক আবিষ্কৃত ও সমাদৃত হোক না কেন—সত্যই ব্রহ্মলাভের পথ নয়। সেইজন্যই তাঁর এই অত্যাশ্চর্য ভূমিকা পথিকৃতের,—নবদিগন্ত-উদ্ভাসকের, নবশক্তি-উদ্বোধকের, নবোৎসাহ-উদ্দীপকের। এবং এই কারণেই তিনি চিরনমস্য।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, শ্রীপতি ছিলেন ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত; এবং ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে তিনি অনেকগুলি 'ন্যায়' অথবা সাধারণ উদাহরণের মাধ্যমে তাঁর জীবেশ্বরের সম্বন্ধমূলক তত্ত্বটিকে সুবোধ্য ক'রে তুলতে বিশেষ তৎপর হন। তাদের মধ্যে প্রধান দুটি হ'ল 'ভ্রমর-কীট-ন্যায়' এবং 'লোহরসাদি-ন্যায়'। এ দুটির মধ্যেও তাঁর বিশেষভাবেই

প্রিয়তর ছিল 'ভ্রমর-কীট-ন্যায়', যার উল্লেখ তিনি তাঁর 'বেদান্তসূত্রভাষ্য শ্রীকর-ভাষ্যে' ১৭।১৮ বার করেছেন, যেক্ষেত্রে 'লোহরসাদি-ন্যায়ে'র উল্লেখ পাওয়া যায় ঐ গ্রন্থে মাত্র ৪।৫ বার। এতদ্ব্যতীত এই প্রসঙ্গে তিনি 'জল-মৌক্তিকাদি-ন্যায়', 'নদী-সমুদ্র-ন্যায়', 'ক্ষীর-দধি-ন্যায়', 'সংকুচিত-পট-বিস্তৃত-পট-ন্যায়' প্রভৃতিরও উল্লেখ করেছেন সানন্দে।

সামান্য দু-একটি উদাহরণ—

'ভ্রমর-কীট-ন্যায়েন সত্যক্রমেঃ সত্য-ভ্রমরত্ব-প্রাপ্তিদর্শনাৎ। সত্যাত্মকস্য জলস্য স্বভাব-নিবৃত্তি-পূর্বক-সত্য-মৌক্তিকত্ব-প্রাপ্তিদর্শনাৎ।' (১।১।১)

'তস্মাজ্জীব-ব্রহ্মণোরাদৌ রস-লোহবৎ পরস্পর-স্বাভাবিক-ভেদসত্ত্বেঽপি সদাচার্য-কটাক্ষাজ্জীবঃ শিবো ভবতীতি নিশ্চীয়তে।' (৩।২।৩০)

'আরাধকারাধ্য-জীব-ব্রহ্মণোর্নদী-সমুদ্রবৎ পরস্পর-স্বাভাবিক-ভেদ-সত্ত্বেঽপি মোক্ষ-দশায়াং প্রাপ্য-প্রাপকত্বেন ভেদাভেদ-ব্যপদে-শাত্তদেবং যুক্তম্।' (৩।৩।২৬)

'সংকুচিত-বিস্তৃত-পটাদি-বহু-দৃষ্টান্তানু-রোধেন জীব-ব্রহ্মণো ভেদাভেদো নিশ্চীয়তে।' (৩।২।২৭)

'তন্ত্রাদি-সংস্পর্শবশেন ক্ষীরস্য স্বাভাবিক-নিবৃত্তি-পূর্বক-দধিত্বপ্রাপ্তিবজ্জীব-ব্রহ্মণোঃ পর-স্পর-পারমার্থিক-ভেদ-সত্ত্বেঽপি মোক্ষ-দশায়ামভেদঃ সিদ্ধ ইতি যথা পূর্বাধ্যায়ে প্রপঞ্চিতম্।' (৩।২।২৮)

অর্থাৎ—

' "ভ্রমর-কীট"-ন্যায়ানুসারে সত্য কৃমি থেকে সত্য ভ্রমরের উৎপত্তি দেখা যায়। সত্য জলের স্বভাব-নিবৃত্তি হয়ে সত্য মুক্তাদির দেখা যায়।' (১।১।১)

'সেজন্য প্রথমে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে গলিত লৌহ ও কঠিন লৌহের ন্যায় স্বাভাবিক পরস্পর ভেদ থাকা সত্ত্বেও সদাচার্যের কৃপা-কটাক্ষের দ্বারা জীব শিব হন—এই নিশ্চয় করা হ'ল।' (৩।২।৩০)

'আরাধক জীব এবং আরাধ্য ব্রহ্মের মধ্যে নদী ও সমুদ্রের ন্যায় স্বাভাবিক পরস্পর ভেদ থাকা সত্ত্বেও মোক্ষকালে প্রাপক-প্রাপ্য-রূপ সম্বন্ধের জন্য ভেদাভেদই প্রপঞ্চিত করা হয়েছে—সেজন্য এই মতবাদই যুক্তিযুক্ত।' (৩।৩।২৬)

'সংকুচিত-পট এবং বিস্তৃত-পটাদিরূপ বহু দৃষ্টান্তের জন্য জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদা-ভেদ-সম্বন্ধই নিশ্চিতভাবে স্থাপিত হ'ল।' (৩।২।২৭)

'যন্ত্রাদির মাধ্যমে দুগ্ধের স্বাভাবিক দুগ্ধত্ব-নিবৃত্তি হয়ে দধির উৎপত্তি হয়। একই ভাবে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে পারমার্থিক স্বাভাবিক ভেদ থাকা সত্ত্বেও মোক্ষকালে তাঁদের মধ্যে অভেদ সিদ্ধ হয়—একথা পূর্বাধ্যায়ে প্রপঞ্চিত করা হয়েছে।' (৩।২।২৮)

এরূপে, এস্থলে শ্রীপতি দুটি প্রধান উদাহরণের মাধ্যমে ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ নিরূপণে প্রচেষ্টা করেছেন। তা হল এই :

(১) 'ভ্রমর-কীট'—শ্রীপতির প্রথম সর্বা-পেক্ষা প্রিয় উদাহরণ, যা পূর্বেই বলা হ'ল। প্রারম্ভে ক্ষুদ্র কীট বৃহৎ পূর্ণ-পরিণত ভ্রমর থেকে স্বভাবতঃই সম্পূর্ণ ভিন্ন। তা সত্ত্বেও পরিশেষে সেই কীটই ত ভ্রমরে পরিণত হয় অনিবার্যভাবেই।

(২) 'লোহ-রস'—শ্রীপতির দ্বিতীয় সর্বা-পেক্ষা প্রিয় উদাহরণ। প্রারম্ভে কঠিন লোহা গলিত লোহা থেকে স্বভাবতঃই সম্পূর্ণ ভিন্ন। তা সত্ত্বেও পরিশেষে সেই কঠিন

লোহাই ত গলিত লোহায় পরিণত হয় অনিবার্যভাবেই।

(৩) 'জল-মুক্তা'—শ্রীপতির আরেকটি প্রিয় উদাহরণ। প্রারম্ভে জল মুক্তা থেকে স্বভাবতঃই সম্পূর্ণ ভিন্ন। তা সত্ত্বেও পরিশেষে সেই জলই মুক্তায় পরিণত হয় অনিবার্যভাবেই।

(৪) 'নদী-সমুদ্র'—শ্রীপতির আরেকটি প্রিয় উদাহরণ। প্রারম্ভে নদী সমুদ্র থেকে স্বভাবতঃই সম্পূর্ণ ভিন্ন। তা সত্ত্বেও পরিশেষে সেই নদীই সমুদ্রে পরিণত হয় অনিবার্যভাবেই।

(৫) 'ক্ষীর-দধি'—শ্রীপতির আরেকটি প্রিয় উদাহরণ। প্রারম্ভে দুগ্ধ দধি থেকে স্বভাবতঃই সম্পূর্ণরূপেই ভিন্ন। তা সত্ত্বেও পরিশেষে সেই দুগ্ধই দধিতে পরিণত হয় অনিবার্যভাবেই।

(৬) 'সংকুচিতপট-প্রসারিতপট'—শ্রীপতির আর একটি প্রিয় উদাহরণ। প্রারম্ভে সংকুচিত পট প্রসারিত পট থেকে স্বভাবতঃই সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। তা সত্ত্বেও পরিশেষে সেই সংকুচিত পটই প্রসারিত পটে পরিণত হয় অনিবার্যভাবেই।

এরূপে, ব্রহ্ম ও জীবের সম্বন্ধ সম্বন্ধে শ্রীপতির মত হ'ল এই :

সংসারদশায় সৃষ্টির পরে এবং প্রলয়ের পূর্বে অর্থাৎ, স্থিতিকালে অথবা বদ্ধাবস্থায় ব্রহ্ম ও জীব স্বভাবতঃই সম্পূর্ণরূপেই ভিন্ন—এ বিষয়ে বিশেষ কোনোরূপ বাগাড়ম্বরের প্রয়োজনই নেই, যেহেতু আমরা প্রত্যহই স্বচক্ষেই দেখছি কত অসত্য, কত অশুদ্ধ, কত অপূর্ণ, কত অসুখী, কত অশান্ত, কত অনাচারী, কত অত্যাচারী, কত অলস, কত অর্বাচীন, কত অসন্তুষ্ট এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—তার সঙ্গে নিত্যসত্য নিত্যশুদ্ধ নিত্যপূর্ণ নিত্যসুখী নিত্যশান্ত নিত্যসদাচারী নিত্য-আদরকারী নিত্যকর্মঠ নিত্যবুদ্ধ নিত্যসন্তুষ্ট ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নতা হতে পারে কি করে? তার ত কোনো প্রশ্নই নেই এস্থলে।

সেজন্য ব্রহ্ম ও জীব যে সংসার-কালে বদ্ধাবস্থায় পরস্পরবিরুদ্ধ, তা প্রমাণ করবার কোনরূপ আবশ্যকতাই নেই—যেহেতু তা সকলেরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

কিন্তু এইবার শুনুন শ্রীপতির অভিনব অত্যাশ্চর্য তত্ত্ব: যে জীব বদ্ধাবস্থায় ব্রহ্ম থেকে স্বরূপতঃ সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়েই গৃহীত ছিলেন, সেই জীবই হঠাৎ প্রলয় ও মোক্ষকালে ব্রহ্মের সঙ্গে স্বরূপতঃই সম্পূর্ণরূপেই অভিন্ন হয়ে যান। শ্রীপতির মতে উপরের ছটি 'ন্যায়' বা উদাহরণ থেকেই এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। এরূপে ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে বদ্ধাবস্থায় কেবল ভেদ, মোক্ষাবস্থায় কেবল অভেদ—এই হ'ল শ্রীপতির অভিনব মতবাদের মূল কথা এবং তাঁর মতে এই হ'ল তাঁর অপরূপ 'ভেদাভেদবাদ'।

বলাই বাহুল্য যে, এস্থলে 'ভেদাভেদবাদ' নামটি একটি বিশেষ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, সাধারণ অর্থে নয়। পূর্বেই যা বলা হয়েছে, 'ভেদাভেদবাদে'র সাধারণ অর্থ হ'ল ভেদ ও অভেদের সহাবস্থিতি, যা শ্রীপতি-বেদান্তে একেবারেই নেই; অথচ যা রামানুজ নিম্বার্কাদি-বেদান্তে স্পষ্টতমভাবে আছে আমরা জানি যে, রামানুজ-নিম্বার্কাদির মতে ব্রহ্মও জীবের মধ্যে বন্ধ-মোক্ষ সকল অবস্থাতেই রয়েছে অভেদ ও ভেদ দুই-ই—স্বরূপত অভেদ, গুণতঃ ভেদ—বদ্ধাবস্থায় ভেদটিই প্রধানতর ও পরিস্ফুটতর ব'লে প্রতিভাত হয় মোক্ষাবস্থায় অভেদটি; কিন্তু প্রকৃতকল্পে, বন্ধ ও মোক্ষ উভয় অবস্থাতেই ভেদ ও অভেদ দুই-ই আছে। আমাদের মতে এই ত হ'ল প্রকৃত 'ভেদাভেদবাদ'; কিন্তু বন্ধে কেবলই

ভেদ, মোক্ষে কেবলই অভেদ—এক্ষেত্রে ভেদ ও অভেদকে একত্রে মিলিয়ে 'ভেদাভেদবাদ' করা যায় না কোনোমতেই।

সে যাহোক, শ্রীপতি তাঁর নিজের এই নূতন 'ভেদাভেদবাদ' গ্রহণ ক'রে তার বিরুদ্ধে আপত্তিরও খণ্ডন করেছেন সজোরে। যেমন, ৪।১।১ সূত্রভাষ্যে বলা হচ্ছে—মোক্ষের অর্থ ই হ'ল স্বাভাবিক স্বরূপের পূর্ণাবির্ভাব অথবা যে স্বরূপ পূর্ব থেকেই সর্বদাই বিদ্যমান, তারই পূর্ণ প্রকাশ, সকল বাধা দূর ক'রে; কিন্তু কোনো সম্পূর্ণ নূতন, আগন্তুক স্বরূপের আবির্ভাব বা সৃষ্টি নয় একেবারেই। যেমন, মেঘাবৃত সূর্যকে আমরা কিছুক্ষণ দেখতে পাই না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সেই সময়ে সূর্য সত্যই তিরোহিত হয়ে গেল—সূর্য তখনও ঠিক পূর্বের ন্যায়ই সমান আলোকে, সমান তেজে বর্তমান, কেবল তার প্রকাশ নেই আমাদের কাছে কৃষ্ণ-মেঘজালের জন্য। তারপরে সেই কৃষ্ণমেঘাবরণ অপসৃত হ'লে পূর্বের সেই একই সূর্য পুনরায় আবির্ভূত হন পূর্ণতম গৌরবে। এস্থলেও ঠিক একই ব্যাপার ঘটছে। বদ্ধাবস্থায় জীবের যে প্রকৃত স্বরূপ অবিদ্যাবরণে আচ্ছাদিত হয়ে প্রকাশিত হয় না তার নিকট, মোক্ষাবস্থায় সেই একই শাশ্বত স্বরূপ আবরণ-আচ্ছাদন-মুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়। সেজন্যই উপনিষদে বলা হয়েছে যে, মোক্ষকালে জীব—

'স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে'

(ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৮।৩।৪)

'স্বীয় স্বরূপের দ্বারাই জাজ্বল্যমান হন।'

কিন্তু যদি এইভাবে বলা হয় যে, বদ্ধজীব কেবলব্রহ্মভিন্ন, অথচ মুক্তজীব কেবলব্রহ্ম-অভিন্ন, তা হ'লে জীবের স্বরূপের পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে; কেবলভিন্নতা থেকে কেবল-অভিন্নতায় এবং মোক্ষকালে একটি সম্পূর্ণ নূতন স্বরূপের (কেবলভিন্নতার পরিবর্তে কেবল-অভিন্নতার) সৃষ্টি হচ্ছে এ দুটিই একেবারে অসম্ভব।

সেজন্য, হয় বলতে হয় যে, মোক্ষকালেও উপাসক জীব উপাস্য ব্রহ্মের দাসরূপে ব্রহ্মাধীন হয়ে বিরাজ করেন; নয় বলতে হয় যে, মোক্ষকালেও জীব ব্রহ্মের সমান রূপে স্বাধীন-ভাবে স্থিতি করেন। উভয়ক্ষেত্রেই কিন্তু মোক্ষকালেও জীব ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন হয়েই বিরাজ করেন। অতএব, বদ্ধাবস্থায় ব্রহ্ম ও জীবের পারমার্থিক ভিন্নতা, এবং মোক্ষাবস্থায় ব্রহ্ম ও জীবের পারমার্থিক অভিন্নতা—এই মতবাদ গ্রহণীয় নয়। এই হ'ল পূর্বপক্ষ।

শ্রীপতি এই পূর্বপক্ষ বা বিপরীতপন্থীদের মতবাদ খণ্ডন করেছেন এরূপে: (৪।২।১৪)

সংসারদশায় বদ্ধাবস্থায় জীবের জীবত্ব এবং ব্রহ্ম থেকে তাঁর স্বরূপতঃ ভেদ—উভয়ই সমান সত্য—এতে আর অন্য কোনো কিছুই নেই—মায়া নেই, অবিদ্যা নেই, ভ্রম নেই, অধ্যাস নেই—আর অন্য কোনো কিছুই নেই—সোজাসুজি খোলাখুলি ভাবেই, প্রকৃত-প্রকৃষ্ট ভাবেই, আক্ষরিক অর্থেই তখন জীব কেবল জীবই, ব্রহ্ম নন একেবারেই।

কিন্তু মোক্ষাবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান এবং উপাসনা-ধ্যানাদির প্রভাবে এবং অঘটন-ঘটন-পটীয়ান্ পরমেশ্বরের কৃপায় (৪।২।১৪), জীবের অবিদ্যা দূর হয়ে যায়, তার সঙ্কীর্ণ-স্বার্থসঙ্কুল জীবত্বেরও বিনাশ হয়, এবং তখন 'জীবত্ব' ত্যাগ ক'রে তিনি নূতন 'ব্রহ্মত্ব'লাভে পরম ধন্য হন; এবং ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যান সম্পূর্ণরূপেই। সেজন্য শ্রীপতির মতে জীবেশ্বরের সংসারকালে বদ্ধাবস্থায় ভেদও পারমার্থিক—শাঙ্করীয় অর্থে ব্যাবহারিক নয়

এবং মোক্ষাবস্থায় জীবেশ্বরের অভেদও সমান পারমার্থিক।

বলাই বাহুল্য—শ্রীপতির এই পূর্বপক্ষ খণ্ডন খণ্ডনই নয় একেবারেই; এবং তিনি নিজেই যে আপত্তি তুলেছেন পূর্বপক্ষীয় রূপে, তা নিজেই খণ্ডন করতে পারেননি।

এই হ'ল শ্রীপতির অত্যাশ্চর্য 'ভেদাভেদ-বাদ', যার নাম তিনি নিজেই রেখেছেন 'বিশেষাদ্বৈতবাদ।' আমরা দেখছি যে, তাঁর 'শ্রীকর-ভায়্যে'র প্রত্যেক colophon-এ বা প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রত্যেক পাদের শেষে তিনি নিজের মতবাদকে 'ভেদাভেদাত্মক বিশেষা-দ্বৈত' ব'লে অভিহিত করেছেন—কেবল একবার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের শেষে 'দ্বৈতাদ্বৈতাভিধান-বিশেষাদ্বৈত' ব'লে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, শ্রীপতির মতে, তাঁর বেদান্ত-মতবাদ একটি 'বিশেষ' প্রকারের অদ্বৈতবাদ—ভেদাভেদমূলক অদ্বৈতবাদ।

রামানুজের 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে'র থেকে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্যই শ্রীপতি তাঁর মতবাদের নাম দিয়েছেন 'বিশেষাদ্বৈতবাদ'। 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে'র ক্ষেত্রে যেরূপ, এক্ষেত্রেও ঠিক সেরূপ ভাবেই এই নামটিকে ব্যাখ্যা করা চলে—

(১) 'বিশেষ' বা সংসারাবস্থায় স্বভাবতঃ ভিন্ন বস্তুর 'অদ্বৈত' বা মোক্ষাবস্থায় স্বভাবতঃ অভিন্নত্ব।

(২) 'বিশেষ' বা ভেদাভেদাত্মক 'অদ্বৈত' বা ব্রহ্মই পরম ও চরম সত্য।

বহু পরিশ্রম, বহু প্রচেষ্টা, বহু প্রণিধান ক'রে শ্রীপতি তাঁর এই তুলনাবিহীন 'ভেদাভেদাত্মক বিশেষাদ্বৈতবাদে' উপনীত হয়েছেন সগৌরবে। দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্রের দিক থেকে তার প্রকৃত মূল্য যা-ই হোক না কেন, হৃদয়ের আবেদনের দিক থেকে তা চিরসরস চিরসতেজ চিরসুন্দর চির-সুমধুর নিঃসন্দেহে। আমরা জীব, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হলেও আমরা জীব,—আমাদের জীবত্ব মিথ্যা নয়, তুচ্ছ নয়, অসত্য নয়, অবহেলনীয় নয়, ঘৃণ্য নয়, পরিত্যাজ্য নয়—এই ভাবটি হৃদয়ের আবেদনের দিক থেকে আমাদের কত প্রিয়, কত উৎসাহজনক, কত উদ্দীপনাময়, কত আশার স্থল। তা সত্বেও চিরকালই কি সেই 'জীব' হয়েই থাকব আমরা—আর বড় কিছুই হব না মোক্ষকালেও! না, তা-ও ত লাগে না ভালো আমাদের হৃদয়ের আবেদনের দিক থেকেই। সেজন্য, আন ব্রহ্মকে মোক্ষকালে, সংসারের রাজা জীব আর নয়—তাকে ক'রে দাও প্রজা শিবত্ব বা ব্রহ্মত্বের, তাকে মিলিয়ে দাও সেই রাজার শ্রীচরণে—জীবত্ব চলে যাক, আসুক পূর্ণ-গৌরবে শিবত্ব। এই ত হ'ল হৃদয়ের আবেদন —সংসারে থাক জীবত্ব, মোক্ষে আসুক শিবত্ব—আর কি চাই?

সাধারণ মানুষের এই আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকরূপী পুণ্যশ্লোক শ্রীপতি চিরনমস্য।

[ক্রমশঃ]

জাতিবৈষম্য ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ

ডক্টর নিমাইসাধন বসু

[পূর্বানুবৃত্তি]

দ্বিতীয়ত: ভারতে পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রবর্তন এবং বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত ভারতীয়দের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। স্বভাবতই এই সব শিক্ষিত বুদ্ধিমান উচ্চাভিলাষী তরুণরা দেশের শাসনব্যবস্থায় ও সরকারী কাজকর্মে যোগ্য মর্যাদা পাবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনকাল থেকে ভারতীয়দের সমস্ত উচ্চ রাজপদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ভারতীয়দের যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে তাঁর খুব নিম্নধারণা ছিল। সিভিল সার্ভিসে ভারতীয় যুবকদের প্রবেশাধিকার দিতে তিনি অসম্মত ছিলেন। তাঁর ঐ সঙ্কীর্ণ বৈষম্যমূলক একদেশদর্শী নীতি বৃটিশ পার্লামেণ্টেও অনুমোদিত হয়েছিল। ভারতীয়দের যতই শিক্ষা ও যোগ্যতা থাকুক না কেন, তারা রাজস্ববিভাগের 'দেওয়ান', বিচারবিভাগের 'মুনসেফ্', 'সদর আমীন' ইত্যাদি পদের উর্ধ্বে নিযুক্ত হত না। বেশীর ভাগ শিক্ষিত ভারতীয়দের করণিকের কাজ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হত। সামরিক বিভাগেও ভারতীয়রা মাত্র 'সুবেদার' পদ পর্যন্ত উন্নীত হতে পারত।

ভারতীয়দের প্রতি এই অন্যায় ও বৈষম্যমূলক নীতি বহু বিশিষ্ট ইংরাজ রাজকর্মচারীও সমর্থন করেননি। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে নতুন সনন্দ আইন পাস হবার প্রাক্কালে এই নিয়ে অনেক আলোচনা হয়। ভারতে নিযুক্ত একাধিক অভিজ্ঞ ইংরাজ কর্মচারী ভারতীয়দের প্রতি এই অবিচারের সমালোচনা করেন। রামমোহন প্রমুখ শিক্ষিত প্রগতিশীল ভারতীয়রাও উচ্চ সরকারীপদে ভারতীয়দের নিয়োগ করার দাবী উত্থাপন করেন। ক্ষমতা ও মর্যাদাপূর্ণ পদে শিক্ষিত ও যোগ্য ভারতীয়দের নিযুক্ত করার এই দাবী শেষ পর্যন্ত নতুন সনন্দ আইনে নীতিগতভাবে স্বীকার করা হয়। সনন্দ আইনের ৮৭ ধারায় ঘোষণা করা হয় যে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে ভারতীয়দের যোগ্যতা অনুসারে রাজপদে নিযুক্ত হতে কোনও বাধা থাকবে না। বৃটিশ পার্লামেণ্টে এই নীতি গৃহীত হবার মূলে টমাস ব্যাবিংটন মেকলের (Thomas Babington Macaulay) বিশিষ্ট অবদান ছিল। তিনি সনন্দ আইনের এই ধারাটিকে 'বিজ্ঞ, কল্যাণকর এবং মহান' বলে অভিহিত করেন। ভারতীয়দের মনেও এই ঘোষণাটি আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করে। কিন্তু নীতিগতভাবে শাসনকার্যে যোগ্যতানুসারে নিযুক্ত হবার পথে বাধা অপসারিত হলেও এই ঘোষণা কার্যকরী হয়নি। পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে শুধুমাত্র জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি কালেক্টর, সাবজজ ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট-এর পদ ভারতীয়দের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছিল। সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ এবং ভারতীয়দের যোগ্যতার স্বীকৃতির ব্যাপারে জাতি-বৈষম্য অব্যাহত থাকে এবং এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে ভারতীয়দের অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরবর্তী কালে বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান

অ্যাসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক কর্মসূচী ও আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ, পদোন্নতি, বেতন, সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে জাতি-বৈষম্যের অবসান ঘটান।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের নতুন সনন্দ আইন পাস হবার পর সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের বিষয়ে বৈষম্যের অবসানের চেয়ে অনেক বেশী গুরুতর সমস্যা ছিল এদেশে বসবাসকারী শ্বেতাঙ্গদের ভারতীয় আইন-আদালতের এখতিয়ার-অধীন করা এবং এদেশের সাধারণ মানুষকে তাদের অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করা। এই সমস্যাটি বহু পূর্ব হতেই কিছু কিছু অভিজ্ঞ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ইংরাজ রাজকর্মচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে উদ্বিগ্ন করেছিল। কিন্তু ভারতে বসবাসকারী শ্বেতাঙ্গদের মোট জন-সংখ্যা খুব কম থাকায় এই সমস্যাটি তেমন গুরুতর আকার ধারণ করেনি। সামরিক বাহিনীর সদস্যের সংখ্যা বাদ দিয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের সংখ্যা ছিল ১৫০১। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২০১৬। কিন্তু এই মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গরাই কোম্পানীর বিচারবিভাগের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে। এই শ্বেতাঙ্গরা নিজেদের বিশেষ ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী বলে মনে করত। তারা দাবী করত যে, বৃটিশ পার্লামেণ্ট ছাড়া অন্য কারোর তাদের ওপর এখতিয়ার নেই। তাদের এই অদ্ভুত দাবী কলকাতার সুপ্রিম কোর্টেরও বিরক্তির কারণ হয়ে উঠেছিল। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর প্রধান বিচারপতি স্যার এডোয়ার্ড রায়ান (Edward Ryan) স্বীকার করেন যে, ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ব্যাপক প্রসারের পরও শ্বেতাঙ্গদের বিচার করার ক্ষমতা একমাত্র সুপ্রিম কোর্টের ওপর ন্যস্ত থাকায় সমগ্র বিচারব্যবস্থা একটি প্রহসন তো বটেই, এমনকি ভাঁওতা ও নির্যাতনে পর্যবসিত হয়েছে বলা চলে। তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, অবিলম্বে ভারতের সমস্ত অধি-বাসীদের একই আইন, একই আদালত ও একই বিচারপদ্ধতির অধীনে আনা আবশ্যক। ভারতবর্ষে আইনের দৃষ্টিতে সমতা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ও আন্দোলনে বিচারপতি রায়ানের এই সুচিন্তিত অভিমত একাধিকবার উদ্ধৃত হয়েছিল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সুপ্রিম কোর্ট মন্তব্য করে যে, ভারতস্থ শ্বেতাঙ্গদের বিচারব্যবস্থা কার্যতঃ ভারত সরকার, কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী এবং কমিশনরদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে পড়েছে। বৃটিশ পার্লামেণ্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের নথিভুক্ত আইন ছাড়া তারা অন্য কোনও আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়।

উপরোক্ত প্রচলিত বিচারব্যবস্থায় শ্বেতাঙ্গ-জড়িত এমন কোনও দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলায় এদেশীয় লোকেদের কি হাল হত, তা সহজেই অনুমান করা যায়। অনেক সময় অন্যান্য আদালতের শ্বেতাঙ্গ বিচার-পতিরাও অভিযুক্ত শ্বেতাঙ্গ বা শ্বেতাঙ্গ ব্যবহারজীবীদের দ্বারা আদালতে অপমানিত হতেন। আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হলেও কোন শ্বেতাঙ্গকে জরিমানা বা কারাদণ্ডের শাস্তি দেবার ক্ষমতা বিচার-পতিদের ছিল না। অনেক সময় শ্বেতাঙ্গরা আদালতে আপত্তিকর কটুবাক্য ব্যবহার করে আদালতের কাজকর্ম অচল করে দিত। এই কারণেই ভারতবর্ষে শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়দের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা লুপ্ত করে দেশে

আইনের দৃষ্টিতে সমতা-নীতির প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিচারবিভাগ বিশেষ আগ্রহী ছিল।

নতুন সনন্দ আইন পাস হবার প্রাক্কালে ভারতে ইউরোপীয়দের অবাধ প্রবেশ ও বসবাসের অধিকারদান নিয়ে যখন বিতর্ক চলছিল, তখন অনেকেই এই সমস্যাটির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। স্যার চার্লস মেটকাফ্ (Charles Metcafe) ও উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক দুজনেই স্পষ্টভাবে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, ভারতবর্ষে শ্বেতাঙ্গদের প্রবেশাধিকার এবং ভূ-সম্পত্তি ক্রয় করতে দেওয়ার পূর্বে সকল শ্রেণীর লোকের সমান নিরাপত্তা, সুলভ ন্যায় ও দ্রুত বিচারব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু তাঁরা উভয়েই মনে করেছিলেন যে, ভারতীয় বিচারকদের আদালতে শ্বেতাঙ্গদের বিচার বাঞ্ছনীয় এবং শেষ পর্যন্ত অনিবার্য হলেও বর্তমানে তাদের ঐ ক্ষমতা দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না।

ভারতে ইউরোপীয়দের বসবাসের অধিকারদান এবং তাদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে দেওয়া সমীচীন কিনা—এই যুগ্ম সমস্যাটি সম্বন্ধে পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটি যে সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিল, তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ডেভিড হিল, রিচার্ড ক্লার্ক, হল্ট-ম্যাকেঞ্জি, চার্লস লুসিংটন প্রমুখ অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা অভিমত প্রকাশ করেন যে, ভারতে বসবাসকারী শ্বেতাঙ্গদের একই আইন-আদালতের নিয়ন্ত্রণাধীন করা অবশ্য প্রয়োজন এবং সাময়িক অসুবিধা থাকলেও কালক্রমে তাদের ভারতীয় বিচারপতিদের এখতিয়ার-অধীন করতেই হবে।

শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়দের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা, সাধারণ আদালতের এখতিয়ারমুক্ত থাকার অধিকার ইত্যাদির সপক্ষেও কম লোক সাক্ষ্য দেননি। জেমস্ ওল্ডহ্যাম্ নামে জনৈক ব্যক্তি ভারতবর্ষে পঁচিশ বছর রাজ-কর্মচারী ছিলেন। তিনি তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে, শ্বেতাঙ্গদের বিচার করার মত মনোবল ও দৃঢ়তা ভারতীয় বিচারকদের নেই এবং যদিও কারোর থাকে তাহলে তার ফল ভাল হবে না। আলেকজাণ্ডার ডানকান ক্যাম্পবেল, সদর দেওয়ানী এবং ফৌজদারী আদালতের একজন ভূতপূর্ব রেজিস্ট্রার অভিমত প্রকাশ করেন যে, শ্বেতাঙ্গদের দেশীয় বিচারপতিদের এখতিয়ার-অধীন করলে ভারতীয় প্রজাদের চক্ষে শ্বেতাঙ্গদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে, তাছাড়া ভারতীয় বিচারপতিরা নিজেরাই শ্বেতাঙ্গদের বিচার করতে আপত্তি জানাবেন, কেননা তাঁরা শ্বেতাঙ্গদের শাসকশ্রেণীর লোক বলে মনে করেন বলে অত্যন্ত সঙ্কোচ এবং ভয়ের সঙ্গে বিচারকার্য পরিচালনা করতে বাধ্য হবেন। রবার্ট হ্যামিলটন নামে একজন প্রাক্তন উপ-সচিব বলেন যে, ভারতীয় বিচার-পতিরা প্রভাবশালী শ্বেতাঙ্গদের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব দেখাবেন এবং যে শ্বেতাঙ্গ অভিযুক্তের বিশেষ গুরুত্ব নেই, তার ক্ষেত্রে উদ্ধত ও খামখেয়ালী আচরণ করবেন। তাছাড়া যখনই কোন ভারতীয় বিচারপতি কোন শ্বেতাঙ্গ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে রায় দেবেন, তখনই ভারতীয়দের চক্ষে শ্বেতাঙ্গ অধিবাসী-দের মর্যাদাহানি হবে। আর একজন তাঁর সাক্ষ্যে সুস্পষ্টভাবে জানান যে, শ্বেতাঙ্গরা নিজেদের ভারতীয়দের থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে এবং সে দেশের আদালত সম্বন্ধে নিম্ন ধারণা পোষণ করে। সুতরাং তারা কখনই তাদের ওপর দেশীয় বিচারপতিদের এখতিয়ার বরদাস্ত করবে না।

পার্লামেণ্টের সিলেক্ট কমিটি কর্তৃক গৃহীত (১৮৩১-১৮৩২) পরস্পরবিরোধী সাক্ষ্যগুলির মধ্যে ভবিষ্যতের কালাকানুন-বিতর্ক এবং ইলবার্ট বিল আন্দোলনের সময় উত্থাপিত যুক্তিতর্কের পূর্বাভাস ছিল। নতুন সনন্দ আইন পার্লামেণ্টে পেশ করার সময় বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি চার্লস গ্র্যাণ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, ভারতে গমনেচ্ছু ইউরোপীয়রা যদি সে দেশের আইন-আদালতের নিয়ন্ত্রণাধীন হতে সম্মত হয়, তবেই তাদের সে দেশে প্রবেশাধিকার এবং বসবাসের অনুমতি দেওয়া উচিত। তিনি আবেগের সঙ্গে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, ভারতবাসীর স্বার্থই ভারতবর্ষে অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত এবং ভারতীয়দের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত নয়, এমন কোনও উদ্দেশ্যে কারোর সে দেশে যাওয়া উচিত নয়। কমন্স্ সভায় গ্র্যাণ্টের বক্তব্যের কেউ প্রতিবাদ করেননি।

লর্ডস সভায় সনন্দ আইনের ৮৭তম ধারাটি প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়। লর্ড এলেনবরো ধারাটির বিরোধিতা করে সোজাসুজি বলেন, 'আমরা বাহুবলে সাম্রাজ্য জিতেছি এবং বাহুবলেই আমাদের ঐ সাম্রাজ্য রক্ষা করতে হবে।' ডিউক অব ওয়েলিংটন বলেন যে, সাম্রাজ্যরক্ষার জন্যই ভারতীয়দের সমস্ত উচ্চ রাজপদ থেকে বাদ দিয়ে রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সনন্দ আইন প্রবর্তিত হবার পর ঐ আইনের রচয়িতারা এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন। তাঁরা বিলটি পাস করানর সময় উচ্চস্বরে ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁরা আইনের দৃষ্টিতে সমতা প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয়দের স্থানীয় আইন-আদালতের এখতিয়ার-অধীন করা হবে। কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীও সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে বসবাসে ইচ্ছুক শ্বেতাঙ্গদের স্থানীয় আদালতের নিয়ন্ত্রণ মানতেই হবে। তা না হলে তাদের বসবাসের অনুমতিপত্র দেওয়া হবে না। সনন্দ আইন পাস হবার পর পরিচালকমণ্ডলী ভারত সরকারকে নির্দেশ দেন (১০ই ডিসেম্বর, ১৮৩৪) যে, ইউরোপীয়দের ভারতের অভ্যন্তরীণ অঞ্চলে থাকবার অনুমতি দেবার ফলে সরকারের ওপর এক বিশেষ দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। এই দায়িত্ব হল শ্বেতাঙ্গদের সম্ভাব্য আক্রমণ ও অপমান থেকে ভারতীয়দের জীবন, সম্পত্তি, ধর্ম ও স্বাধীন ইচ্ছাকে রক্ষা করা। পরিচালকমণ্ডলী সতর্ক করে দেন যে, ভারতে ভাগ্যান্বেষী ইউরোপীয়রা নিজেদের কাল্পনিক জাতি-প্রাধান্যে মদমত্ত হয়ে যথেচ্ছাচারে লিপ্ত হতে পারে। সুতরাং এদের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে রাখার জন্য এদের ওপর স্থানীয় আদালতগুলির ফৌজদারী এবং দেওয়ানী এখতিয়ার সুপ্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। মৃত্যুদণ্ড ছাড়া অন্য যে কোনও দণ্ড দেবার ক্ষমতা আদালতের হাতে থাকা আবশ্যক। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলেই যেন ন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচার পায়, সে দিকে ভারত সরকারের লক্ষ্য দেওয়া কর্তব্য।

আদর্শ এবং বাস্তবের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা কিন্তু সহজসাধ্য ছিল না। কিন্তু ভারতের শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকদের স্থানীয় আদালতের কর্তৃত্বাধীন করার দুরূহ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন মেকলে। নতুন সনন্দ আইন রচনার পিছনে ছিল তাঁরই কলম ও বুদ্ধি। চার্লস গ্র্যাণ্টের অনুপস্থিতিতে তিনিই কমন্স সভায় সনন্দ বিলটি পাস করাবার ভার নিয়েছিলেন।

কমন্স সভায় এক আবেগময়ী বক্তৃতায় (১০ই জুলাই, ১৮৩৩) তিনি বলেন যে, ৮৭ ধারা সংবলিত নতুন সনন্দ আইনটির অন্যতম রচয়িতা বলে তিনি তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত গর্ববোধ করবেন। ভারতীয় আইন ও বিচারব্যবস্থার বিশৃঙ্খল অবস্থা দূর করে একটি সংহিতা রচনার উদ্দেশ্যে আইন কমিশন গঠনের আবেদন জানান। ভারতীয়দের উচ্চরাজপদ এবং সামরিক পদ থেকে বঞ্চিত করে রাখার সমালোচনা করে তিনি বলেন যে, এটি সঠিক নীতি- এবং নৈতিক আদর্শ-বিরোধী কাজ। বাক্‌সর্বস্ব ও শাসনকার্যে অনভিজ্ঞ বলে সমালোচিত হলেও মেকলে কাজের মানুষ ছিলেন। ভারতে বসবাসকারী শ্বেতাঙ্গদের অবিলম্বে দেশের সাধারণ আদালতের দেওয়ানী এখতিয়ার অধীনে আনার স্থির সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে একটি নতুন আইনের খসড়া প্রস্তুত করেন।

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, এ-দেশে বসবাসকারী শ্বেতাঙ্গরা প্রকৃতপক্ষে একমাত্র সুপ্রিম কোর্ট ছাড়া অন্য কোনও আদালতের ফৌজদারী এবং দেওয়ানী এখতিয়ার অধীন ছিল না। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের সনন্দ আইনে নীতিগতভাবে শ্বেতাঙ্গদের কোম্পানীর শাসনাধীন এলাকার আদালত-গুলির দেওয়ানী কর্তৃত্বাধীন করা হলেও প্রতিটি মামলার ক্ষেত্রে তারা সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করতে পারত। এর ফলে সনন্দ আইনের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের এক আইনের বলে সদর আমীনদের দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গদের ওপর কিছুটা কর্তৃত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই শ্বেতাঙ্গদের চাপে এই প্রথা লুপ্ত করা হয়। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সনন্দ আইনে এদেশে ইউরোপীয়দের প্রবেশ, স্থায়ীভাবে বসবাস, ভূ-সম্পত্তিক্রয় ইত্যাদির ওপর বাধা-নিষেধ প্রত্যাহৃত হওয়ার ফলে পরিস্থিতির গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকদের সংখ্যাবৃদ্ধি পাওয়ায় তারা আরও শক্তিশালী, সঙ্ঘবদ্ধ এবং উদ্ধত-দুর্বিনীত হয়ে ওঠে। এই সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গরা ভারতীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। গ্রামাঞ্চলের সাধারণ দরিদ্র জনসাধারণের জীবন, সম্পত্তি ও মান-সম্মান রক্ষার সমস্যা আরও কঠিন হয়ে দেখা দেয়। শ্বেতাঙ্গদের ওপর কোম্পানীর শাসন ও বিচারব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ইংলণ্ড থেকে আগত এই শ্বেতাঙ্গরা দাবী করতে থাকে যে, বৃটিশ পার্লামেণ্ট ও বৃটিশ আইন-আদালত ছাড়া অন্য কোনও কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ তারা মানতে বাধ্য নয়। তাদের এই অদ্ভুত মনোভাব ও অন্যায় আবদারকে বিদ্রূপ করে কোন কোন ইংরাজ রাজকর্মচারী ও রাজনীতিবিদ্ বলেছিলেন যে, এইসব শ্বেতাঙ্গদের ধারণা তারা ইংলণ্ড থেকে সঙ্গে করে শুধু ওয়েস্টমিনিষ্টার ও বৃটিশ আইন-আদালতই আনেনি, ব্যাকিংহাম প্যালেস, লণ্ডনের আবহাওয়া এবং কর্নওয়ালের সূর্য-কিরণও নিয়ে এসেছে! এই পটভূমিতে মেকলের প্রস্তাবিত আইন ও তাঁর সাহসী প্রচেষ্টাকে বিশ্লেষণ করতে হবে।

মেকলে-প্রস্তাবিত আইনে (Act XI of 1836) বাংলা এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির এলাকাধীন ইউরোপীয়দের একমাত্র মুন্সেফের আদালত ছাড়া অন্য সব দেওয়ানী আদা-লতের কর্তৃত্বাধীনে আনা হয়। অল্পকালের

মধ্যেই বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতেও এই আইন বলবৎ হয়। এই আইনের সংবাদ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের বিশেষ করে কলকাতার শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে আলোড়ন দেখা দেয় এবং তারা সমস্বরে উষ্মা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করে। মেকলে-প্রস্তাবিত আইন-টিকে তারা কালা কানুন (Black Act) নামে অভিহিত করে আইনটির অবিলম্বে প্রত্যাহার দাবী করে। শ্বেতাঙ্গদের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে একাধিক প্রতিবাদপত্র পাঠানো হয়। এই সব প্রতিবাদপত্রে দেশীয় আদালতগুলিতে ব্যাপক ঘুষ ও দুর্নীতির প্রচলনের অভিযোগ করা হয় এবং বলা হয় যে, শ্বেতাঙ্গরা এতদিন ধরে যেসব বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে আসছে, তা তুলে দেবার অধিকার ভারত সরকারের নেই। তারা আশঙ্কা প্রকাশ করে যে, আজ যদি শ্বেতাঙ্গদের সাধারণ আদালতের দেওয়ানী কর্তৃত্বাধীন করা হয়, তাহলে অনতি-বিলম্বে তাদের ওপর দেশীয় আদালতের ফৌজদারী কর্তৃত্বও প্রতিষ্ঠা করা হবে। সরকারের পক্ষ থেকে তাদের আশ্বাস দেওয়া হয় যে, সেরকম কোনও পরিকল্পনা ভারত সরকারের নেই। কিন্তু এই আশ্বাসে শ্বেতাঙ্গরা সন্তুষ্ট হয়নি। তারা দাবী জানায় যে, কোন বিজিত রাজ্যে বা উপনিবেশে শ্বেতাঙ্গদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার জন্মগত অধিকার আছে এবং একমাত্র বৃটিশ সম্রাটের আদেশ ছাড়া অন্য কারোর ঐ অধিকার হরণের ক্ষমতা নেই।

প্রতিবাদপত্র, স্মারকলিপি প্রভৃতিতে যখন কোন ফল হল না, তখন কলকাতার শ্বেতাঙ্গ সমাজ ও তাদের সমর্থক কিছু ভারতীয় কলকাতার টাউন হলে একটি সভা আহ্বান করে (১৮ই জুন, ১৮৩৬)। ঐ সভায় টার্টন (Turton) একটি প্রস্তাব পেশ করেন এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর ঐ প্রস্তাব সমর্থন করেন। সভায় গৃহীত ঐ প্রস্তাবে বলা হয় যে, নতুন আইন কার্যকরী হলে দেশের অভ্যন্তরে বস-বাসকারী ইউরোপীয়দের সম্পত্তি এবং অধিকার বিপন্ন হবে, ভারতে বৃটিশ মূলধন এবং দক্ষতার প্রয়োগ হ্রাস পেয়ে ভারতবর্ষের উন্নতি ব্যাহত হবে। সুতরাং এই সভা কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী এবং বোর্ড অফ কণ্ট্রোলের কাছে আবেদন জানাবে যাতে প্রস্তাবিত আইনটি বাতিল বা রদ করা হয়। কিন্তু তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে পর শ্বেতাঙ্গরা বৃটিশ পার্লামেণ্টের কাছে আবেদন করে এবং ঐ আবেদনের ওপর পার্লামেণ্টে তুমুল বিতর্ক হয়।

কলকাতার শ্বেতাঙ্গ শ্রেণীর লোকেদের উষ্মা ও বিক্ষোভ মেকলে অত্যন্ত অযৌক্তিক, অন্যায় ও মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থপ্রণোদিত কার্য বলে মনে করেছিলেন। তিনি কঠোর ভাষায় আইনের চক্ষে এক শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে আর এক শ্রেণীর মানুষের পার্থক্যের নিন্দা করেন। তিনি বলেন, 'ভারতবর্ষের লোকেদের কাছে আমরা যেন প্রতিপন্ন করতে চাইছি যে, দুরকমের বিচারব্যবস্থা আছে—একটি নিকৃষ্ট ব্যবস্থা আছে ভারতীয়-দের জন্য, আর একটি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা রয়েছে আমরা যারা শ্বেতাঙ্গ তাদের জন্য।' তিনি বলেন যে, শ্বেতাঙ্গদের প্রতিবাদপত্র এবং স্মারকলিপির ছত্রে ছত্রে জাতি-প্রাধান্যের গর্ব ফুটে উঠেছে। তিনি তীব্র শ্লেষের সঙ্গে বলেন শ্বেতাঙ্গরা প্রস্তাবিত আইনটিকে 'জনমত'-বিরোধী বলে অভিহিত করার চেষ্টা করছে। এই 'জনমত' বলতে কি

বোঝায়? আনুমানিক পাঁচশত লোক যাদের এদেশের ৫ কোটি মানুষের ইচ্ছা, অনুভূতি এবং স্বার্থের সঙ্গে কোনও মিল নেই, তাদের ইচ্ছাকে কি 'জনমত' বলে ধরতে হবে? ঐ মুষ্টিমেয় কয়েকশত লোক এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে স্বেচ্ছাচারিতা যাতে না করতে পারে তার জন্য আইন করা মানে 'স্বাধীনতা-হরণ' বলে গণ্য করতে হবে? যে সংবাদপত্র-পত্রিকা এ মুষ্টিমেয় সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য সরব এবং ৫ কোটি মানুষের স্বার্থ সম্বন্ধে নীরব সেই সব সংবাদপত্রের বক্তব্যকে গুরুত্ব দিতে হবে?

সৌভাগ্যক্রমে মেকলে তাঁর নির্ভীক প্রচেষ্টায় গভর্নর জেনারেল অকল্যান্ড ও তাঁর পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের সমর্থন লাভ করেছিলেন। তার প্রধান কারণ শ্বেতাঙ্গরা ভারত সরকারের অধিকার চ্যালেঞ্জ করে গুরুতর শাসনতান্ত্রিক এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষার সমস্যা সৃষ্টি করছিল। অকল্যাণ্ড এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, নতুন আইনটি ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে রচিত হয়েছে' এবং এটি কার্যকরী হলে অন্যায় অযৌক্তিক বৈষম্যের অবসান ঘটবে। যদি শ্বেতাঙ্গশ্রেণীর লোকেদের তাদের বিশেষ সুযোগসুবিধাগুলি ভোগ করতে দেওয়া চলতে থাকে, তাহলে এ-দেশীয় লোকেদের প্রতি ঘোর অন্যায় করা হবে এবং তাদের ন্যায়বিচার-প্রাপ্তির অন্তরায় সৃষ্টি হবে। অকল্যাণ্ড ও তাঁর পরিষদের সমর্থন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে মেকলে আরও কঠোর ভাষায় বিক্ষুব্ধ শ্বেতাঙ্গদের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, বিক্ষুব্ধদের একটি যুক্তি হল যে, সাধারণ আদালতে পারসিক ভাষায় বা দেশীয় ভাষায় কাজকর্ম হয়, কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের ভাষা হল ইংরাজী। তিনি বলেন, আমি বুঝতে পারি না যে, এদেশের শতসহস্র মানুষ যারা ইংরাজী জানে না তারা যদি সুপ্রিম কোর্টের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়, তাহলে মুষ্টিমেয় কিছু লোক দেশীয় ভাষা না জানার অজুহাতে স্থানীয় আদালতগুলির কর্তৃত্ব মানবে না কোন্ যুক্তিতে? তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, নতুন সনন্দ আইনে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ভারতের অভ্যন্তরে বসবাসকারী ইউরোপীয়দের সেদেশের আদালতগুলির দেওয়ানী এবং ফৌজদারী উভয় কর্তৃত্বই মানতে হবে। কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী এবং পার্লামেন্টের সদস্যদের কাছে বিক্ষুব্ধদের স্মারকলিপি প্রত্যাখ্যান করার অনুরোধ জানিয়ে মেকলে বলেন যে, প্রস্তাবিত আইন রদ হলে ভারতবর্ষে জঘন্যতম স্বেচ্ছাচার—অর্থাৎ এক জাতির ওপর আর এক জাতির স্বেচ্ছাচার প্রতিষ্ঠিত হবে।

বোম্বাই সরকার বিতর্কিত আইনটির ব্যাপারে মেকলে এবং বাংলা সরকারের বক্তব্য পূর্ণ সমর্থন করেন। বোম্বাই-এর গভর্নর ফ্যারিস (Farish) ও তাঁর পরিষদের সদস্যরা ঐ আইন-বিরোধী বিক্ষোভকে 'নিকৃষ্ট' শ্রেণীর জাত্যভিমান ও কুসংস্কার বলে অভিহিত করেন।

প্রথম কালা কানুন বিতর্কে মেকলে জাতি-বৈষম্যের ঘোর বিরোধী এবং আইনের দৃষ্টিতে সমতা প্রতিষ্ঠার একনিষ্ঠ সমর্থকরূপে চিহ্নিত হন। ভারতীয় এবং ইউরোপীয়দের একই আইন-আদালতের কর্তৃত্বাধীনে আনা এবং ন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা প্রবর্তনের বিষয়ে তাঁর উৎসাহ এবং একাগ্রতা সমসাময়িক যে কোনও ভারতীয়কেও অতিক্রম করেছিল। গভর্নর জেনারেল অকল্যাণ্ড ও অন্যান্যরা কেন ঐ আইন কার্যকরী করতে

আগ্রহী ছিলেন, তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। একই সঙ্গে ভারতে বসবাসকারী শ্বেতাঙ্গদের ওপর ভারত এবং প্রাদেশিক সরকারগুলির নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং ন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা প্রবর্তন করার এর থেকে ভাল সুযোগ আর ছিল না। অপর দিকে শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকরা উপলব্ধি করেছিল যে, এই প্রথম বিরোধ বা সংঘর্ষে যদি তারা পরাজিত হয়, তাহলে ভবিষ্যতে তাদের পক্ষে অন্যান্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা, জাতি-প্রাধান্য ও স্বেচ্ছাচার বজায় রাখা ক্রমশঃ দুরূহ হয়ে পড়বে।

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী আইনটি অনুমোদন করে। এরপর বিরোধবিতর্কের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় বৃটিশ পার্লামেণ্টে। ইতিমধ্যে শ্বেতাঙ্গদের মুখপাত্র হয়ে টার্টন ইংলণ্ড যাত্রা করেছিলেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মার্চ কমন্স সভায় আইনটির ওপর বিতর্ক হয়। শ্বেতাঙ্গদের সপক্ষে এবং আইনটির বিপক্ষে প্রধান বক্তা ছিলেন ওয়ার্ড (G. W. Ward)। তিনি তাঁর ভাষণে প্রথমেই বলেন যে, সভাকক্ষে মাত্র ৬০।৭০ জন সদস্য উপস্থিত আছেন, তাতে অবশ্য তিনি বিস্মিত নন কেননা এর থেকে সুদূর ভারত সাম্রাজ্যের ব্যাপারে সদস্যদের আগ্রহের অভাব এবং অনীহাই প্রকাশ পাচ্ছে। তবে তিনি আলোচ্য বিষয়টির বিশেষ গুরুত্বের কথা চিন্তা করে সদস্যদের সমস্যাটি সম্বন্ধে গভীর মনোযোগ দিতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের আইনটি ভারতে বসবাসকারী প্রতিটি বৃটিশ নাগরিকের ন্যায়সঙ্গত অধিকার খর্ব করেছে। আইনটির বিরুদ্ধে যে স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে তাতে ১৪০০ শ্বেতাঙ্গ বৃটিশ নাগরিক ছাড়া ২০০ জন ভারতীয় ব্যবসায়ীও স্বাক্ষর করেছেন। মেকলেকে তীব্র আক্রমণ করে তিনি বলেন যে, ভাল বাগ্মী হলেই বাস্তববাদী নির্ভরযোগ্য রাজপুরুষ হওয়া যায় না। ওয়ার্ড সমগ্র বিষয়টি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে পার্লামেণ্টে রিপোর্ট পেশ করার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করার আবেদন জানান।

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের আইনের পক্ষে জোরাল যুক্তি উপস্থাপন করেন স্যার জে. সি. হবহাউস। তিনি বলেন শ্বেতাঙ্গদের অভিযোগ অত্যন্ত বেশী পরিমাণে অতিরঞ্জিত। প্রকৃতপক্ষে তাদের অভিযোগের কোনও কারণ নেই। তাদের বিশেষ সুযোগসুবিধা-ভোগের দাবীর সমালোচনা করে হবহাউস বলেন যে, বৃটিশ নাগরিকরা যদি মনে করে থাকে যে, তারা তাদের সঙ্গে ভারতবর্ষে ইংরাজী আইনগুলিও নিয়ে যাচ্ছে তাহলে তারা মস্ত ভুল করছে। তিনি বলেন যে, কমন্স সভার সদস্যদের গর্ববোধ করা উচিত যে, তারা সম-অধিকারের নীতিকে সমর্থন জানিয়েছে। আজ যদি তারা সেই নীতিবিরোধী কাজ করে তাহলে তারা শুধু ভারতবাসীদের প্রতিই নয়, এদেশের মানুষ যারা তাদের আইন রচনার জন্য নির্বাচিত করে পাঠিয়েছে, তাদের প্রতিও কর্তব্যের অবহেলা করবে। মেকলেকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে হবহাউস বলেন যে, ভারতবর্ষে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ভারত সরকার এবং সুপ্রিম কোর্ট সমেত সে দেশের সমস্ত আদালত ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। ওয়ার্ডের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে তিনি ঐ প্রস্তাবকে অপ্রয়োজনীয় এবং অর্থহীন বলে বর্ণনা করেন।

[ক্রমশঃ]

'সাহিত্য' পত্রিকায় 'উদ্বোধন' পত্রিকার সমালোচনা

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

বাংলা সাহিত্যে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রিকাটি নানা কারণে উল্লেখ-যোগ্য। রবীন্দ্র-অবনীন্দ্র-যুগের সাহিত্য-শিল্পের জয়যাত্রার পটভূমিকায় এ পত্রিকার নিরন্তর নিরঙ্কুশ সমালোচনার কথা যাঁরা জানেন, তাঁদের কাছে স্বামী বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত 'উদ্বোধন' পত্রিকা প্রসঙ্গে এ পত্রিকার সমা-লোচনাও বিশেষ আগ্রহ সঞ্চার করবে, সন্দেহ নেই। এই দিক থেকে আমরা 'উদ্বোধনে'র প্রথম চারটি বৎসরের বিভিন্ন সংখ্যা প্রসঙ্গে 'সাহিত্য' পত্রিকার সমালোচনা উপস্থাপিত করছি। 'উদ্বোধনে'র চতুর্থ বর্ষের ১লা আষাঢ় প্রকাশিত নবম সংখ্যাটিতে স্বামীজীর একটি পুরানো লেখা (হিন্দুধর্ম কি?) 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' নামে প্রকাশিত হওয়ার একমাসের মধ্যে (২০শে আষাঢ়) স্বামীজীর দেহত্যাগ। এই সময়সীমার মধ্যে 'সাহিত্য' পত্রিকার মন্তব্যগুলি আমরা সঙ্কলন করেছি।

'উদ্বোধন'-পত্রিকা প্রকাশের (মাঘ, ১৩০৫) অনতিকাল পরে 'সাহিত্য' পত্রিকার দশম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ, ১৩০৬) 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা' বিভাগে এ পত্রিকার সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল।

"উদ্বোধন। নূতন পাক্ষিক পত্র। 'প্রস্তাবনা'য় স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন—'যাহা আমাদের নাই, বোধ হয় পূর্বকালেও ছিল না। যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণ-স্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুদাধার হইতে ঘন ঘন শক্তির মহাসঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই। চাই সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতি-তৃষ্ণা; চাই,—সর্বদা পশ্চাদৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখসম্প্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।' '...রজোগুণের মধ্য দিয়া না যাইলে কি সত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়? ভোগ শেষ না হইলে যোগ কি করিবে? বিরাগ না হইলে ত্যাগ কোথা হইতে আসিবে? অপরদিকে তালপত্রবহ্নির ন্যায় রজোগুণ শীঘ্রই নির্বাণোন্মুখ, সত্ত্বের সন্নিধান নিত্যবস্তুর নিকট-তম; সত্ত্ব প্রায় নিত্য, রজোগুণপ্রধান জাতি দীর্ঘজীবন লাভ করে না; সত্ত্বগুণপ্রধান যেন চিরজীবী, ইহার সাক্ষী ইতিহাস। ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব; পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্ত্বগুণের। ভারত হইতে সমা-নীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিম্নস্তরে তমো-গুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণপ্রবাহ প্রতি-বাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত। এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা 'উদ্বোধনে'র জীবনো-দ্দেশ্য।' ইহা অপেক্ষা আর কোন মহত্তর উদ্দেশ্য আছে কিনা, জানি না। উদ্বোধনের আহ্বানে এই চিরনিদ্রিত জাতি উদ্বুদ্ধ হউক। এই আমাদের আন্তরিক কামনা।—আমরা আর কখনও বিবেকানন্দ স্বামীর বাঙ্গলা রচনা

দেখি নাই। শুনিলাম, এই তাঁহার প্রথম রচনা। স্বামীজীর ওজস্বিনী ভাষার নূতন ভঙ্গী ও লীলাগতি দেখিয়া মনে হয়, সত্যই প্রতিভা সর্বতোমুখী।"

উদ্ধৃত সমালোচনাটি 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির নিজের লেখা বলেই মনে হয়। 'উদ্বোধনে'র প্রস্তাবনা অংশ থেকে যেটুকু সমালোচক উদ্ধৃত করেছেন, তা বিশেষভাবে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বলেই আমরাও অবিকল উদ্ধৃত করে দিলাম। ভাবের মহত্ত্ব ও ভাষার লীলাভঙ্গীতে বিবেকানন্দ-প্রতিভার সর্বতোমুখীনতা সম্বন্ধে এমন সাধুবাদ 'উদ্বোধনে'র প্রারম্ভিক পর্বেই দেখা দিয়েছে। এর আগে স্বামীজী বিচ্ছিন্নভাবে বাংলা রচনায় হাত দিয়েছেন। 'উদ্বোধন' উপলক্ষেই ভাবে ও ভাষায় বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর সৃষ্টির সঙ্কল্প নিয়ে স্বামীজীর বিভিন্ন বাংলা রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। সে প্রকাশের মহিমা 'সাহিত্য' পত্রিকার সমালোচকের দ্বারা 'উদ্বোধন' প্রকাশের প্রথম লগ্নেই অভিনন্দিত।

'সাহিত্য' পত্রিকার ১০ম বর্ষ, ২য় সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬) 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা' বিভাগে মন্তব্য—"উদ্বোধন। বৈশাখ; ৭ম ও ৮ম সংখ্যা। শ্রীযুত বিবেকানন্দ স্বামীর 'বর্তমান ভারত' চিন্তাপূর্ণ সুপ্রবন্ধ চিন্তাশীলের সুপথ্য। 'তিব্বত ভ্রমণ'[১] চিত্তাকর্ষক, কিন্তু মাত্রায় অতি অল্প। ৮ম সংখ্যায় 'পরমহংস-দেবের উপদেশ' পরম স্মরণীয়।"[২]

একই বছরের 'সাহিত্য', ৩য় সংখ্যায় (আষাঢ়, ১৩০৬) উক্ত বিভাগে মন্তব্য—"উদ্বোধন, জ্যৈষ্ঠ; ৯ম ও ১০ম সংখ্যা। 'শ্রীম-কথিত' 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' উপাদেয়। 'তিব্বত ভ্রমণ' কৌতূহলের উদ্দীপক। কিন্তু হায়! লেখক প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তিনি পাঠকের উদ্বুদ্ধ কৌতূহল কখনই চরিতার্থ করিবেন না। শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ স্বামীর 'বর্তমান ভারত' নামক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের অল্পমাত্র দশম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বাঙ্গাল' একটি ক্ষুদ্র গল্প,—বিশেষত্ব আছে।"

ওই বছরের ৪র্থ সংখ্যায় (শ্রাবণ, ১৩০৬) উক্ত বিভাগে আছে—"উদ্বোধন। আষাঢ়; ১১শ ও ১২শ সংখ্যা। আষাঢ়ের প্রথম সংখ্যায় শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'গোবরা' নামক ক্ষুদ্র গল্পটি উল্লেখযোগ্য। বোধ করি ঘটনা সমাবেশে লেখকের দৃষ্টি ছিল না;—তাই কোনও কোনও ঘটনা অসম্ভব ও অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়;—কিন্তু বাগদিনীর চরিত্রচিত্রে লেখক সফল হইয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের 'বর্তমান ভারত' এবারও আছে। আষাঢ়ের দ্বিতীয় সংখ্যায় 'শ্রীশ্রীরামানুজচরিত'[৩] উল্লেখ-যোগ্য। ভাষার দারিদ্র্যে শ্রীযুত কিরণচন্দ্র দত্তের অনুবাদিত 'কারিষ্ট্‌' গল্পটি মাটি হইয়াছে।

এ পর্যন্ত 'উদ্বোধন' পত্রিকা প্রসঙ্গে স্বামীজীর রচনাভঙ্গীর সমর্থনই আমরা 'সাহিত্য' পত্রিকার সমালোচনায় দেখলাম। এবারে অসমর্থনের দিকটিও লক্ষণীয়।

'সাহিত্য' দশম বর্ষের সপ্তম সংখ্যার (কার্তিক, ১৩০৬) সমালোচনা বিভাগের মন্তব্য—"উদ্বোধন। আশ্বিন। 'বিলাতযাত্রীর পত্র' স্বামী বিবেকানন্দের লিখিত। স্বামীজীর পত্রসমূহ চিত্তাকর্ষক এবং তাঁহার বহুদিন সঞ্চিত বিবিধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যে পরিপূর্ণ।

১ লেখক: স্বামী শুদ্ধানন্দ। ২ সঙ্কলয়িতা: স্বামী ব্রহ্মানন্দ। ৩ লেখক: স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।

কিন্তু পত্রের ভাষার আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। এই সকল পত্রে অসংযত চলিত ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার কি উদ্দেশ্য বুঝা যায় না। বিশুদ্ধ ভাষাও সরল, প্রাঞ্জল, ও সর্বসাধারণের বোধগম্য হইতে পারে। 'তিব্বত ভ্রমণ' আর একটি সুখপাঠ্য ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।"

এর পর 'উদ্বোধন' প্রসঙ্গে আবার মন্তব্য পাই 'সাহিত্য' পত্রিকার দ্বাদশ বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ, ১৩০৮)—"উদ্বোধন : চৈত্র : পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যা। এই চৈত্রে 'উদ্বোধনে'র তৃতীয় বর্ষ পূর্ণ হইল। পঞ্চম সংখ্যার 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রবন্ধ উপাদেয়। লেখক স্বামী বিবেকানন্দ জ্ঞানের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া এই সন্দর্ভে বিবিধ রত্ন ঢালিয়া দিতেছেন। আমরা স্থানাভাবে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। যিনি না পড়িবেন, তিনি বঞ্চিত হইবেন। স্বামীজী ইচ্ছা করিয়া রচনাটিকে গ্রাম্যভাষার পরিচ্ছদ দিয়াছেন। চলিত গ্রাম্য ভাষা নহিলে যে সাধারণ বাঙ্গালী বুঝিত না, এমন মনে হয় না। যে সকল পাঠক বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিতে পারিবেন, প্রাঞ্জল সাধুভাষা তাহাদিগকে বাধা দিতে পারিবে না। 'রাখাল বেশে' এই রচনাটির সৌন্দর্যহানি হইতেছে।"—এই সমালোচনাটিতে একটি তথ্যগত ভ্রান্তি স্মরণীয়,—'উদ্বোধনে'র বর্ষপূর্তি হয় পৌষ মাসে, সুতরাং চৈত্র মাসের সংখ্যাটি বর্ষপূর্তির সংখ্যা নয়।

সমকালীন সাহিত্যপত্রিকার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পত্রিকা 'সাহিত্য' থেকে কৌতূহলী পাঠকদের কথা ভেবে স্বামীজীর সমকালীন 'উদ্বোধনে'র সমালোচনা কী ধরনের হতো, তার উদাহরণ সাজিয়ে দেওয়া হলো। অন্যান্য পত্রিকায়ও এ-জাতীয় সমালোচনা কিছু কিছু পাওয়া যাবে। সেকালের মতামত একালে সবটা স্বীকৃতি না পাওয়াই স্বাভাবিক।

'সাহিত্য' পত্রিকার সমালোচক 'উদ্বোধনে'র 'প্রস্তাবনা'কে স্বামীজীর প্রথম বাংলা রচনা মনে করলেও আসলে 'সঙ্গীত কল্পতরু'র ভূমিকাকেই আমরা এ পর্যন্ত পাওয়া প্রথম রচনা বলতে পারি।

প্রথম বর্ষের আষাঢ় মাসের 'উদ্বোধনে'র দ্বিতীয় সংখ্যায় কিরণচন্দ্র দত্ত-অনূদিত কারিষ্ঠু গল্পের 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত নির্মম সমালোচনা পড়ে কিরণচন্দ্র কিছুদিন লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। স্বামীজী সে কথা শুনে বেলুড় মঠে একদিন কিরণচন্দ্রকে বলেছিলেন,—'গ্যাখ., আমরা ভাব-রাজ্যের ঐরাবত। ভাবের সমুদ্র তোলপাড় করে দিয়ে চলে যাবো। ভাষা ব্যাটারা গড়ে নিক। আমরা ভাষা দিতে আসি নি; বাংলা ভাষার এখনও গঠনের যুগ। ঐ রকম গল্প, ত্যাগ, বৈরাগ্য, আত্মোৎসর্গের আদর্শ যে কোনও ভাষায় পাবি, তর্জমা করে দিবি।' একথা বলে স্বামীজী 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজীকে বলেছিলেন, 'কিরণের লেখা যেন ছাপা হয়।'[৪]

স্বামীজীর 'চলিত ভাষা' সম্বন্ধে 'সাহিত্য' পত্রিকার মতামত কালের বিচারে গ্রাহ্য হয় নি। তবে সব মিলিয়ে দেখলে 'সাহিত্য' পত্রিকা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে গভীর শ্রদ্ধার মনোভাবই গ্রহণ করেছিল। স্বামীজীর সাহিত্যপ্রতিভা প্রসঙ্গে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সমুচ্চ ধারণাই উপরি-উদ্ধৃত মন্তব্যগুলিতে প্রকাশিত।

৪ জীবন্মুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত : ব্রহ্মগোপাল দত্ত : পৃঃ ৪০

বাগান ও ফুল

ডক্টর গোপেশচন্দ্র দত্ত

পৃথিবী বাগান ক'রে ফুল ফোটার লীলাটি দেখাবে
বইবে দক্ষিণ বায়ু সঞ্জীবনী প্রত্যয় জাগাতে ;
অনেক গাছের রাশি ফুল ফোটার আনন্দ-মেলাতে
প্রাণের সামগ্রী দেবে,—সে-সামগ্রী ঘরে নিয়ে যাবে
একটি বালক, আমি সেই স্বপ্ন দেখতে ও দেখাতে
ভালোবাসি, বালকের হাত দিয়ে পুষ্পোদ্যান জলসেক পাবে,
নিজের বুকের মাঝে সুন্দরের কুঁড়িটি ফোটাবে
সবার অলক্ষ্যে জেগে। প্রাঞ্জল হাওয়ার নেত্রপাতে
থাকবে ফুলের আলো, থাকবে শুধু আনন্দ-বিশ্বাস।
অন্তরের বাতায়ন খুলে দিয়ে দেখতে হবে ফুল
দেখতে হবে সে-বালকটিকে। সৌরভের ভাবাকুল
পুলকিত উত্তরণে, বালকের কৌস্তুভ-আভাস
হবে সে ফুলেরই দান, সেই ফুল অম্লান অক্ষয় ;
পৃথিবী বাগান হোক, ফুল হোক সকল হৃদয়।

'যখন ঠিক জ্ঞান হয়, তখন সব জিনিস চৈতন্যময় বোধ হয়। আমি শিবুর সঙ্গে আলাপ করতুম। শিবু তখন খুব ছেলেমানুষ—চার পাঁচ বছরের হবে। ওদেশে তখন আছি। মেঘ ডাকছে, বিদ্যুৎ হচ্ছে। শিবু বলছে, খুড়ো, ঐ চক্‌মকি ঝাড়ছে। একদিন দেখি, সে একলা ফড়িং ধরতে যাচ্ছে। কাছে গাছে পাতা নড়ছিল। তখন পাতাকে বলছে, চুপ চুপ, আমি ফড়িং ধরবো। বালক সব চৈতন্য দেখছে! সরল বিশ্বাস, বালকের বিশ্বাস না হ'লে ভগবানকে পাওয়া যায় না।'

—শ্রীরামকৃষ্ণ

দেখা

শ্রীমতী বিভা সরকার

মাঝে মাঝে দেখেছি দু-একজন
অপরাজিত মানুষকে।
দেখা আমার ধন্য করেছেন তাঁরা।
দেখতে পেয়েছি আপন ক্ষুদ্রতা;
দুর্বলতার দীনতায় তুচ্ছ হয়ে গেছি।
যত আঘাত পেয়েছেন,
তাঁরা যেন বলেছেন—'প্রভু মারো;
আরও কোন্ বজ্র আছে তোমার
তাই দিয়ে আঘাত হানো
কিন্তু দূরে ঠেলে দিও না
তোমার সব দান আমি
যেন সইতে পারি; বইতে পারি
সব দুরূহ বোঝা বলিষ্ঠ চেতনায়।'
মানুষ যখন দুর্বল হয় তখনই ঘটে পরাজয়।
কর্তব্যে অটল, কর্মে কঠোর
তাঁরাই তো ঈশ্বরপ্রেরিত মানুষ।
বড়র দৃষ্টান্ত আমাদের বড় করে
মহতের ছায়া করে মহীয়ান।
বনস্পতির বিরাট বক্ষপুটে শতেক আশ্রয়
ছায়ায় তার শত গুল্মের রাজছত্র।
বিরাট সে দাঁড়িয়ে থাকে ঋজু—
আকাশে মাথা তুলে
ঝড় বিদ্যুৎ বয়ে যায়—সে অকম্প।
বড় যে, সে সব সহ্য করে
আপন মহিমায় অপার ধৈর্যে।
মাঝে মাঝে অপরাজিত মানুষদের দেখি
আমিও যেন বিরাট হয়ে যাই।

চেতনা

শ্রীবীণাপাণি ভট্টাচার্য

সাগরবেলায় বসেছিনু একা
অসীমের পানে চেয়ে,
ঢেউগুলি শুধু ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়
বেদনার গান গেয়ে।
সিঁদুরে রাঙানো প্রভাত-অরুণ
নীলাকাশ 'পরে জাগে,
প্রণমিয়া তায় ভকতের দল
করুণা আশিস মাগে।
আমি শুধু খুঁজি দেবতারে মোর
কবে পাব দেখা তার;
পথের নিশানা কে দেবে আমারে
চোখে নামে জলধার।
কহিল কে যেন কানে কানে মোর
অমিয়-মাখানো সুরে,
হৃদয়ে রয়েছি চাহিয়া দেখ না
পথে পথে মর ঘুরে।
ঝিনুক কুড়ায়ে সাজায়ে খেলনা
তীরে বসে গোনে ঢেউ,
অমল চিতের মাধুরী মিশায়ে
আমারে চায় না কেউ।
শিহরি উঠিনু মুদে এলো আঁখি
দেখিনু হিয়ার মাঝে,
দেবতা আমার রয়েছে দাঁড়ায়ে
অতি অপরূপ সাজে।

আন্দামানে একমাস

ডক্টর বিষ্ণুপদ পাণ্ডা*

'কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী'—ভারতবর্ষের উত্তর-দক্ষিণ সীমারেখা বোঝানোর জন্যে এই উক্তি যে ভ্রান্ত, এতোদিনে তা জানা গেল। পাঁচশ'রও বেশী ছোট বড় দ্বীপ নিয়ে যে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, তার দক্ষিণতম দিকে রয়েছে গ্রেট নিকোবর আর ওরই সর্বদক্ষিণপ্রান্ত হলো 'পার্স'ন্‌স পিগম্যালিয়ন পয়েন্ট'। কন্যাকুমারী থেকে এই 'পয়েন্ট' অনেকখানি দক্ষিণে। মানচিত্র খুঁটিয়ে দেখলে এই ভুলটি সংশোধিত করে নেওয়া যায়।

আন্দামান যেতে হয়েছিল সরকারী কাজে, মনের দিক থেকে খুব একটা আকর্ষণ তাই ছিল না। গিয়েই দিন গুনেছি, মনে মনে হিসেব করেছি 'দেশে পঁহুছিতে আর কতদিন আছে?' তখন কি জানতাম যে, ফিরে আসার দিন বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে চোখগুলো বাষ্পাকুল হয়ে উঠবে? ওখানকার দ্বীপপ্রকৃতি আর পরিচয়সূত্রে আপন-হয়ে-ওঠা মানুষগুলির জন্যে বিচ্ছেদ-বেদনা এত তীব্র হবে? আজ কেবলই মনে হয়, যদি আরও কিছুদিন আন্দামানে থাকতে পারতাম, দ্বীপবাসী আর দ্বীপপ্রকৃতির সঙ্গে আরও নিবিড় পরিচয় হতে পারত। সে হোত আমার অমূল্য সঞ্চয়।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যে কোন এক সময় দ্বীপপুঞ্জের নিকটবর্তী সমুদ্রে নিমজ্জিত জাহাজের লোকজনেরা আকস্মিকভাবেই এই দ্বীপগুলি আবিষ্কার করে। তার আগে হাজার হাজার বছর মূলভূখণ্ডের সাংস্কৃতিক ধারাপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেশ কিছু মানুষ এখানে বসবাস করছিল। ৮,২৯৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে এই দ্বীপপুঞ্জের সাম্প্রতিক লোকসংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষের মত। এর মধ্যে হাজার বাইশের মত মানুষ আন্দামান-নিকোবরের আদিবাসিন্দা। বাদ বাকী সবই মূলভূখণ্ড থেকে চাকরি বা ব্যবসার জন্যে গিয়েপড়া মানুষ। এঁদের মধ্যে বাংলা, তামিল, মালয়ালম্‌ এবং হিন্দী ভাষীদেরই সংখ্যা সব চাইতে বেশী।

মূলতঃ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কর্মসূত্রে গিয়েপড়া মানুষদের নিয়েই এখানকার জনসংখ্যা স্ফীত হয়ে ওঠার ফলে, এখানকার শিক্ষিতের হার বেশ উঁচু। কিন্তু আন্দামান-নিকোবরের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষিতের হার যে অত্যন্ত কম, তা বলাই বাহুল্য। এমনকি 'স্থানীয়' বলে চিহ্নিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও শিক্ষিতের হার নৈরাশ্য-জনক।

আন্দামান-নিকোবরের ছাত্রছাত্রীসংখ্যা আনুমানিক সাতাশ হাজার। এদের জন্যে রয়েছে প্রাক্‌বুনিয়াদি থেকে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মোট একশ' পঁচাশিটি। আন্দামান-প্রশাসন ওখানে একটি ডিগ্রী কলেজও স্থাপন করেছেন। সম্প্রতি এটিতে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাদানের কাজ শুরু হয়েছে।

---

* ভুবনেশ্বরে ভারত সরকারের রিজিওনাল কলেজ অব এডুকেশনের বাংলা বিভাগের প্রধান। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী সম্বন্ধে গবেষণাপত্রের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পিএচ. ডি. উপাধি প্রাপ্ত। ইঁহার আবিষ্কৃত ওড়িয়া-অক্ষরে-লেখা বাংলা পুঁথিগুলি বাংলা সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

মূলভূখণ্ড থেকে যে সব শিক্ষক-শিক্ষিকা এখানে কাজ করার জন্যে এসেছেন, তাঁদের মূল বেতন, ভাতা আর আন্দামান-এ্যালাওয়েন্স, সব মিলিয়ে মাসিক পাওনার অঙ্কটি ভালোই। তাছাড়া বিনা ভাড়ায় বাড়ি আর বছরে একবার মূলভূখণ্ডে পুরো পরিবারের আসা-যাওয়ার জাহাজভ এঁরা পান।

প্রকৃতপক্ষে, এই সব শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ-ব্যবস্থার জন্যই আন্দামান-প্রশাসন ওখানে গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণ-পাঠ্যক্রম শুরু করেছিলেন এবং তাতেই অংশগ্রহণের জন্যে আমরা কয়েকজন পোর্ট ব্লেয়ার গিয়েছিলাম। দক্ষিণ আন্দামানস্থিত এই শহরটি দ্বীপপুঞ্জের প্রাণকেন্দ্র শুধু নয়, স্নায়ুকেন্দ্রও বটে। ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত প্রভৃতি যেমনি এখানেই গড়ে উঠেছে, তেমনি এরই চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে বহু ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন। আটলাণ্টা পয়েণ্টে দাঁড়িয়ে রয়েছে কুখ্যাত সেলুলার জেল আর পোর্ট ব্লেয়ারের এখানে-ওখানে বাঙ্কার, ট্রেঞ্চ, কামানের প্ল্যাটফর্ম স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে ১৯৪২ সালের ২২শে মার্চ থেকে ১৯৪৫ সালের ৮ই অক্টোবর পর্যন্ত ১,২৯৬টি দিন এই দ্বীপপুঞ্জের অধিকার গিয়ে পড়েছিল জাপানীদের হাতে।

জাপানীদের বহু কাহিনী ওখানকার বর্ষীয়ানদের মুখে শুনেছি। সে সব কাহিনী এক্ষেত্রে অবান্তর। কিন্তু যে তথ্যটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় তা হোল এই যে, দ্বীপবাসী জাপানীরা আন্দামান-নিকোবরের সমস্যাগুলি অতি সহজেই বুঝতে পেরেছিল এবং সেগুলির সমাধানে সচেষ্টও হয়েছিল। সামরিক প্রয়োজনে কোন্ কোন্ অঞ্চলের মূল্য সব চাইতে বেশী, জাপানীরা সেই অঞ্চলগুলিকে খুঁজে বার করেছিল এবং পথঘাট বানিয়ে সেগুলিকে উন্নত করে তুলেছিল। তাছাড়া পাহাড়ের গায়ে বিভিন্ন ধরনের ফসল, বিশেষ করে মিঠে আলুর চাষ করার পদ্ধতি ওরাই এখানে দেখায়। ওরা নাকি বিরাট আকারের এক ধরনের শুগ্‌লি এনেছিল ওদের প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের অভাব মেটাতে। জাপানীরা চলে গেছে বহু দিন, কিন্তু তাদের বানানো বাঙ্কার, ট্রেঞ্চ ইত্যাদির ভগ্নাবশেষ ছাড়া ঐ শুগ্‌লিগুলির ক্ষুদ্রকায় বংশধরেরা আন্দামান চষে বেড়াচ্ছে। ওদের হাত থেকে (নাকি মুখ থেকে ?) শাকসবজি বাঁচানো রীতিমতো একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আন্দামানের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছিলেন শ্রীযুক্ত শ্রীবাস্তব উনি পোর্ট ব্লেয়ার স্টেট লাইব্রেরীর সম্পাদক। উনি শুধু সদালাপী এবং বন্ধুবৎসলই নন, আন্দামান-নিকোবর সম্পর্কিত বিচিত্র তথ্যের ভাণ্ডারীও বটে। শুধু ওঁর কাছ থেকে সংগ্রহ করা তথ্য আর কাহিনী নিয়ে এই দ্বীপপুঞ্জের ওপর বেশ বড় একটা বই লেখা যায়। কয়েকটি পান, একটু দামী জর্দা আর কয়েক কাপ গরম চায়ের আয়োজন থাকলে শ্রীবাস্তব-জীর কাছ থেকে তথ্যগুলো আর সংগ্রহ করতে হয় না। ওগুলো এমনিতেই বেরিয়ে আসে। সম্প্রতি উনি এই দ্বীপপুঞ্জের ওপর লেখা বিভিন্ন ভাষার যাবতীয় পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার একটি সংগ্রহ গড়ে তুলছেন। আগামী দিনের ঐতিহাসিকদের পক্ষে এ যে কত মূল্যবান আয়োজন তা বলাই বাহুল্য।

আর একজন মানুষ তাঁর স্মৃতিমঞ্জুষায় সঞ্চয় করে রেখেছেন কিছু অতীত তথ্য। তিনি হলেন সেলুলার জেলের ইদানীংকালের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গোবিন্দ রাও শ্রীহর্ষ। শ্রীহর্ষজী

কিছু শিখছেন না, সরকারী চাকুরে বলে। অবসর নেবার পর কিন্তু এ কাজে আত্মনিয়োগের বাসনা আছে তাঁর। ওঁর মুখে সেলুলার জেলের ইতিকথা শুনেছি পরম বিস্ময় আর শ্রদ্ধা নিয়ে। বিস্মিত হয়েছি তথাকথিত সভ্য আর শিক্ষিত ইংরেজ শাসকদের নির্যাতন-প্রণালীগুলির বৈচিত্র্য শুনে আর শ্রদ্ধায় মাথা অবনমিত হয়েছে সেই সব দেশপ্রেমিকদের কথা শুনে যাঁরা জীবনের মহামূল্যবান অংশটি এই নির্যাতন-কারায় কাটিয়ে গিয়েছেন। তাঁদের কয়েকজন এখানেই প্রাণ দিয়েছেন হয় ফাঁসির মঞ্চে, নয়ত কারাকক্ষগুলিরই মধ্যে। কতখানি মনোবল থাকলে ঐ সব নির্যাতন হাসিমুখে সহ্য করা যায় আর দেশপ্রীতি কী পরিমাণে গড়ে উঠলে তবে ঐ ধরনের মনোবল সৃজিত হয়, আজকের দিনে আমাদের পক্ষে তা সম্পূর্ণভাবেই অকল্পনীয়। আমার কেবলি মনে হয়, এই সব স্বদেশপ্রেমিকদের কথা আমরা নিতান্তই কর্তব্যের অজুহাতে স্মরণ করি এবং তাও করি বিশেষ ধরনের উৎসব-অনুষ্ঠানে। ঐ স্মৃতিচারণের সঙ্গে আমাদের শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতার সম্পর্ক থাকে না। পোর্ট ব্লেয়ারের সেলুলার জেলের টাওয়ারে দাঁড়িয়ে যখন শ্রীহর্ষজীর মুখ থেকে অতীতের ইতিহাস শুনছিলাম, নিঃসন্দেহে অনুভব করছিলাম তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতার গভীরতাটি। শ্রীহর্ষজীর পূর্বপুরুষেরা অনেকেই ছিলেন স্বাধীনতা-সংগ্রামী। আমি মেদিনীপুরের মানুষ। ক্ষুদিরামের জন্মভূমি আমারও। দেশপ্রাণ শাসমল আর মাতঙ্গিনী হাজরার স্মৃতি আমার রক্তকণিকার মধ্যে। সেলুলার জেলের কাহিনীর সূত্রেই বক্তা শ্রীহর্ষজী এবং শ্রোতা আমার মধ্যে সেদিন যে বেদনাতুর প্রীতির বন্ধন গড়ে উঠেছিল তা আমৃত্যু অমলিন থাকবে।

অশ্রুলবণাক্ত মহাসমুদ্রের মধ্যে আন্দামান যেন প্রস্তরীভূত একটি হৃদয়। চেনা-অচেনা আকাশচুম্বী বনস্পতিরাজীর ছায়ায় সে হৃদয়ের মধ্যে যে বেদনার্ত স্মৃতির জীবাশ্মগুলি স্তরে স্তরে সঞ্চিত আছে, তারা কখনো কখনো মুখর হয়ে ওঠে। 'ফ্লগিং ট্রায়াংগ্লে' যাঁদের রক্ত ঝরেছে, ফাঁসিঘরে যাঁদের প্রাণ হরণ করা হয়েছে, উনিশ আর তেরো ফিট পরিসরের কারাকক্ষের মধ্যে নির্মম অত্যাচারে যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, সেই সব ইন্দুভূষণ, মোহিতমোহনেরা* বিশেষ বিশেষ লগ্নে আজও আকাশে মাথা তুলে দাঁড়ান। তাঁদেরই দীর্ঘশ্বাস ম্লান জোৎস্নার তলায় সমুদ্রকল্লোলে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। আবার যদি কোনদিন ওখানে যাই, যাবো শুধু ঐ পরিবেশে তাঁদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাতে আর বলতে, 'তোমরা আমাদের ক্ষমা কোরো, তোমাদের স্বপ্নের ভারতবর্ষ আমরা গড়ে তুলতে পারলাম না।'

নিকোবর-আন্দামানের সম্পদ সীমিত। সেই সীমিত সম্পদ নিয়ে সে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। এই গড়ে ওঠার মধ্যে গতি যতখানি লক্ষ্য করেছি, দূরদৃষ্টি ততখানি দেখতে পাইনি। এই দ্বীপপুঞ্জ ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের মতো নয়। এর সমস্যার প্রকৃতি যেমনি সম্পূর্ণ পৃথক্‌, তেমনি উন্নয়নমূলক প্রকল্প

* ১৯২২ সালে ইন্দুভূষণ রায়, ১৯৩৩ সালে মোহিতমোহন মৈত্র আর মানকৃষ্ণ নামদাস এই জেলে প্রাণত্যাগ করেন।

গ্রহণের দিক থেকে এর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের প্রয়োজনও বাধ্যতামূলক।

আন্দামান আর নিকোবরের বনসম্পদ ও সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংগ্রহ, বৃদ্ধি ও যথাযথ ব্যবহার এবং কৃষির উন্নতির জন্যে প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, যার রূপায়ণের জন্যে অপরিহার্য একটি শ্রমপরায়ণ হৃদয়বান কর্মীগোষ্ঠীর সংস্থান। এ যদি ভারত সরকার করতে পারেন তাহলে আন্দামান-নিকোবরের স্থান ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য অর্জন অবশ্যই করতে পারবে।

দ্বীপপুঞ্জের 'ফরেষ্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন' যেমন বনসম্পদ আহরণের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের চিন্তা করছেন, তেমনি ত্রিমুখী পরিকল্পনা অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রয়োজন। কৃষির ক্ষেত্রে ওখানে যে গবেষণা চলছে তার মূল্য অনেক। ওঁরা লবঙ্গ, ছোট এলাচ, গোলমরিচ প্রভৃতি মসলার সঙ্গে তিন বছরের মধ্যে ফলন দিতে পারে এমন জাতের নারকোল আর সুপুরীও চাষ করছেন। ওখানকার গবেষকরা দাবি করছেন যে, এ সব চাষ ভারতবর্ষের মূলভূখণ্ডে ব্যাপকভাবেই করা সম্ভব। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কৃষিবিভাগ থেকে গবেষকদের ওখানে পাঠিয়ে ঐ সব অর্থকরী মসলা ও ফলচাষের রীতিপদ্ধতি হাতেকলমে শিখিয়ে আনা প্রয়োজন।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে স্যার ফ্রান্সিস ডে ভারতবর্ষের মাছ সম্পর্কে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। আন্দামান-নিকোবর অঞ্চলে মেলে এমন ১৩৬ ধরনের মাছের তালিকা তিনি দিয়েছিলেন। সাম্প্রতিক কালে এখানকার মাছধরা ট্রলার 'মীনখোজিনী' চারদিকের সমুদ্রে মাছ খুঁজে বেড়াচ্ছে আর সেন্ট্রাল মেরিন ফিসারিজ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট্ অনেক নতুন শ্রেণীর মাছ খুঁজে পেয়েছেন। ১৯৭৬ সালে এঁরা সম্পূর্ণ নতুন এক ধরনের চিংড়িও আবিষ্কার করেছেন। এখন এঁদের মাছের তালিকায় ছ'শয়েরও বেশী মাছের নাম পাওয়া যায়। এখনো কিন্তু সমুদ্র থেকে ধরা মাছের পরিমাণ বছরে দু'হাজার টনে গিয়ে পৌঁছয়নি। অথচ মৎস্য অধিকর্তার দপ্তরের ধারণা, বছরে পনেরো থেকে বিশ হাজার টন মাছ পাওয়া মোটেই কষ্টকর ব্যাপার নয়। ওখানকার মৎস্যকুলের বিরুদ্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিযোগ আছে। ওরা রূপে-রঙে যতোখানি আকর্ষণীয়, ততোখানি নয় রসে। সাধারণভাবে চিংড়ি আর দু'চার ধরনের মাছ ছাড়া বঙ্গসন্তানদের পক্ষে তৃপ্তিকর মাছ আর নেই বলা যায়।

আন্দামান-নিকোবরের সঙ্গে মূলভূখণ্ডের নাড়ীর যোগটিও বড় ক্ষীণ। তিনটে জাহাজ কোলকাতা আর বিশাখাপত্তনের মধ্যে কয়েকবার যাতায়াত করে। সপ্তাহে দু'দিন উড়োজাহাজে কোলকাতা থেকেও পোর্ট ব্লেয়ার যাতায়াত করা যায়। মালপত্র আর যাত্রীদের আনাগোনার সূত্র এই টুকুই। একমাত্র রেডিও ছাড়া মূলভূখণ্ডের দৈনন্দিন সংবাদ পৌঁছানোর কোন দ্বিতীয় পথ ওখানে নেই। খবরের কাগজ বা পত্রপত্রিকা উড়োজাহাজে গিয়ে পৌঁছয় সপ্তাহে দু'বার। মনে হয় প্রধানতঃ এই কারণে এবং কোন এক শ্রেণীর মানুষ নিয়ে বৃহৎ কোন স্থিতিশীল গোষ্ঠী গড়ে ওঠেনি বলেই, ওখানের মানুষ সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতায় ভুগছেন। দ্বীপপুঞ্জের উন্নয়ন-পরিকল্পনা রচনার সময় এ বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখা দরকার।

নিকোবরে যাবার সুযোগ আমি পাইনি।

সীমিত সুযোগের অবসরে আন্দামানের দক্ষিণাংশ দেখেছি, এর ইতিহাস শুনেছি আর মনের মধ্যে তার পূর্ণরূপটিকে পরম যত্নে গড়ে তুলেছি। আন্দামান আমার মানসপ্রতিমা। আনন্দ-বেদনার নিগূঢ় সূত্রেই তার সঙ্গে আমার হৃদয়ের যোগ গড়ে উঠেছে। ওখানকার ছাত্রছাত্রী, আত্মীয়স্বজন, দ্বীপপ্রকৃতির মনোরম বৈশিষ্ট্য, কোন কোন দুর্বল মুহূর্তে আমাকে এখনো চঞ্চল করে তোলে, ওখানে ফিরে যাবার একটা প্রবল আগ্রহ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। গভীর রাতের জ্যোৎস্নালোকিত প্রশান্ত সমুদ্র, বেলাভূমির বনস্পতিরাজী, ওখানকার স্নেহপ্রবণ মানুষগুলির স্মৃতি সবই আমার মনের মধ্যে সজীব হয়ে আছে।

প্রার্থনা

ব্রহ্মচারিণী সুমিত্রা

[ভাদ্র ১৩৮৫ সংখ্যার পর]

এ যুগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী প্রার্থনার ক্ষেত্রে এক নূতন আলোক-পাত। বহু যুগ ধ'রে মানুষ প্রার্থনা-বাণী উচ্চারণ করেছে, কখনও আত্ম-কল্যাণে, কখনও বহুজনহিতায়। কিন্তু প্রার্থনার মধ্যেই যে অসীম শক্তি প্রচ্ছন্ন, যা পরমশ্রেয় সাধন ক'রে মানবজীবন কৃতকৃতার্থ করে, এই সত্যটি দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছেন 'ভ্রমতমভাস্কর' নবীন যুগাবতার। পুরাণ প্রভৃতিতে শোনা যায় সুদীর্ঘকাল যোগী-মুনিগণ তপস্যায় নিরত। 'কলিযুগে অন্নগতপ্রাণ' মানুষ স্বল্পায়ু। শাস্ত্রের বিস্তারিত বিধান পালন ক'রে ধীরে সুস্থে ধর্মাচরণের সময় নেই। দশমূল কবিরাজী পাঁচনের ব্যবস্থা করতে গেলে রোগীকে বাঁচান দায়। সুতরাং যে কোন অবস্থায় নামকীর্তনের বিধান যেমন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব দিয়েছেন, এ যুগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবও অপর একটি বিশেষ আশ্বাস প্রদান করলেন—'ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে ভগবান দর্শন হয়।' ব্যাকুল প্রার্থনার অমোঘ শক্তিই এ অঘটন ঘটাতে পারে। কথামৃতের প্রতি ভাগে কতবারই ত 'ব্যাকুল প্রার্থনা'-কে উপায়রূপে নির্দেশ দিচ্ছেন তিনি। কোন ব্রাহ্ম ভক্ত যখন জিজ্ঞাসা করছেন—'কি উপায়ে তাঁকে দেখা যেতে পারে?' তৎক্ষণাৎ প্রতিপ্রশ্ন—'ব্যাকুল হয়ে তাঁর জন্যে কাঁদতে পার?' স্ত্রী-পুত্রের জন্য মানুষ ঘটি ঘটি কাঁদে, ঈশ্বরের জন্য ওই ব্যাকুলতা নিয়েই কাঁদতে হবে। বলছেন—'আন্তরিক ঈশ্বরকে যে জানতে চাইবে তার হবেই হবে।' প্রার্থনার সঙ্গে আন্তরিকতা ও ব্যাকুলতার সংমিশ্রণই ঈশ্বর-লাভের গতি ত্বরান্বিত করতে পারে। প্রার্থনার অন্তর্নিহিত ওই অপরিমিত অদ্ভুত-শক্তির প্রকাশ তাঁর সাধক জীবনের সর্বত্র। সেই স্বানুভূত সত্যকেই তিনি মানুষের সামনে পরম-আশ্বাসের বাণী-রূপে তুলে ধরেছেন।

অপরদিকে শেখাচ্ছেন প্রার্থনা উদ্দেশ্যানুগ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর-লাভ। পরমপ্রাপ্তির দিকে লক্ষ্য রেখে সচেতন হতে হবে প্রার্থনার নিবেদনে। বলছেন—'যখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে তাঁর পাদপদ্মে একমাত্র ভক্তি প্রার্থনা করবে।'

'মনে কর ঈশ্বর তোমার সামনে এলেন; এসে বললেন, তুমি বর লও। তা হলে তুমি কি বলবে, আমায় কতকগুলো হাসপাতাল ডিস্পেন্সারী করে দাও, না বলবে, হে ভগবান, তোমার পাদপদ্মে যেন শুদ্ধা ভক্তি হয়; আর যেন তোমাকে আমি সর্বদা দেখতে পাই। হাসপাতাল ডিস্পেন্সারী, এ সব অনিত্য বস্তু, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু।' 'দেখ, ঈশ্বর-দর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য, ব্যাকুল হয়ে নির্জনে গোপনে তাঁর ধ্যান চিন্তা করতে হয় ও কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতে হয়, ঠাকুর আমাকে দেখা দাও।' প্রার্থনারূপ যোগসূত্রটি কত দৃঢ় ও আন্তরিক তা লক্ষণীয়। যিনি ত্রিভুবননাথ তাঁকে ক্ষুদ্রপ্রাণ কেমন ক'রে আহ্বান ক'রে বলে, 'এসো হে মম হৃদয়ে।' প্রার্থনাই ভীরু হৃদয়ের সঙ্কুচিত বার্তাখানি অবলীলাক্রমে পৌঁছে দেয় রাজরাজেশ্বরের দ্বারে। যিনি মুহূর্তে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ও ধ্বংস করেন, তাঁর কাছে কি দাবি করা যায়—আমি তোমারই, তোমার সঙ্গে অভিন্ন? এবারে আশ্বাস দিচ্ছেন, নিশ্চয়ই যায়—তিনি যে নিজের পিতা মাতা, পাতান নয়। কিন্তু আরজি পেশ করতে হবে। 'সকলেরই জ্ঞান হতে পারে। জীবাত্মা আর পরমাত্মা। প্রার্থনা কর—সেই পরমাত্মার সঙ্গে সব জীবেরই যোগ হতে পারে। গ্যাসের নল সব বাড়ীতেই খাটান আছে। গ্যাস কোম্পানীর কাছ থেকে গ্যাস পাওয়া যায়। আরজি কর, করলেই গ্যাস বন্দোবস্ত করে দেবে—ঘরেতে আলো জ্বলবে।' চাইতে হবে, তবেই কৃপা করবেন। ওই চাওয়াটিই পুরুষকার।

'কথামৃত' প্রার্থনার রত্ন-ভাণ্ডার। কিন্তু ওই প্রার্থনার পটভূমিতে রয়েছে অপার্থিব-অনুভূতিময় একখানি জীবন। সুতরাং ওই পূত জীবনের একটি আলেখ্য হৃদয়ে স্থাপিত হলে প্রার্থনা হবে প্রাণবন্ত। তাই তাঁর জীবন ও আবির্ভাব-প্রসঙ্গের অতি-সংক্ষিপ্ত অবতারণা।

অনুভূতিই ধর্মের প্রাণ। এটি চিরন্তন সত্য। অনুষ্ঠান-সর্বস্ব মানব যখন ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য বিস্মৃত হয়, তখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান অনিবার্য। যুগাবতারগণের আবির্ভাবও ওই কারণেই অবশ্যম্ভাবী। বৈদিক যুগ থেকে শুরু ক'রে জ্ঞান যোগ কর্ম ও ভক্তির তরঙ্গ ভারত-মানস তথা বিশ্ব-মানসকে প্লাবিত করেছে। আবার যুগানুযায়ী সনাতন ধর্ম-রত্নকে যুগাচার্যগণ যেন পাত্রান্তরে সযত্নে রক্ষা করেছেন। এই বাহ্যিক পরিবর্তন যুগ-প্রয়োজনেই ঘটেছে।

এ যুগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন ভারতবর্ষের যুগ-সঞ্চিত অধ্যাত্ম-জ্ঞানের বৈভব নিয়ে। অন্তরের অনন্ত ভাবৈশ্বর্যে মণ্ডিত ছিল এই প্রায়-নিরক্ষর পূজারীর সরল সহজ ও অনাড়ম্বর জীবন। সাধনার জগতে প্রবল সিংহ-বীর্যের সঙ্গে মহা নম্রতা ও দীনতার সংমিশ্রণ ওই অদ্ভুত ব্যক্তিত্বকে লোকাতীত সৌন্দর্যে ভূষিত করেছে। দিনের মধ্যে কত ঘণ্টাই বা ওই দিব্য পুরুষ বাহ্যভূমিতে নামিয়ে রাখতে পারতেন তাঁর ঊর্ধ্বগামী মনকে! অথচ জীবকল্যাণে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করবেন তিল তিল ক'রে; তারই জন্য তপস্যা, লোক-ব্যবহার, অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ-লীলা। ক্রমাগত 'হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে' ডুব দিয়ে তুলে আনছেন মণিমাণিক্য, অকৃপণ হস্তে বিতরণ করছেন সমাগত ভক্তবৃন্দকে। নিজের চার পাশে রচনা করছেন এক দিব্য অধ্যাত্ম-পরিমণ্ডল। তাঁর শ্রীমুখের কথা—'এখানকার অনুভূতি বেদবেদান্ত ছাড়িয়ে গেছে।' 'চৌদ্দ পোয়া কলের ভিতর' জগদম্বা যে কত বিচিত্র

রঙ্গ করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। তাঁর অনন্ত-ভাবের ইতি করা যায় না। 'যত মত তত পথ' —এই যুগবাণীর উদ্গাতা যেন সর্ব ধর্ম-মতের সত্যোপলব্ধির পরীক্ষাগার। এই লোকোত্তর পুরুষপ্রবর যেমন মহান সত্যসমূহের উপলব্ধি দ্বারা প্রাচীন ধর্মের বনিয়াদ সুদৃঢ় করেছিলেন, তেমনি পারিবারিক সামাজিক সর্বপ্রকার দায়িত্ব সম্বন্ধেও সচেতন ছিলেন। নূতন ছাঁচ তৈরীর পরিকল্পনায় এবার শুধু ভারতবর্ষের নয়, সমগ্র বিশ্বমানবের কল্যাণের প্রেরণা নিহিত ছিল। তাই বিশেষ অধিকারীর জন্য যেমন নজির রেখেছেন তেমনি সাধারণের অনুসরণীয় অনুষ্ঠানের প্রবর্তন ক'রে ধর্ম-পথকে সহজ ও সুগম ক'রে দিয়েছেন। ধর্মের তত্ত্বের দিকটি 'কথামৃতে' সহজ সরল ভাষায় উদ্-ঘাটিত। উপরন্তু প্রার্থনার কৃপাবর্ষণে তিনি সঞ্জীবিত করেছেন নব যুগধর্মকে। যেকোন অবস্থাতেই প্রার্থনার বিধান দিচ্ছেন এবং 'তিনি প্রার্থনা একশোবার শোনেন'—এই নিশ্চয়তাও আমাদের অন্তরে মুদ্রিত ক'রে দিচ্ছেন। ভাগবত জীবন যেন প্রার্থনার স্নিগ্ধ-দ্যুতিতে কোমল এক কল্পলোক। পিতার ঐশ্বর্যে যেমন পুত্রের দাবি থাকে, তেমনি ভগবানের ঐশ্বর্যেও ভক্তের অধিকার। 'তাঁর ঐশ্বর্য—জ্ঞান ভক্তি, বিবেক বৈরাগ্য, প্রেম ও সমাধি।' ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন শিশু-সুলভ প্রার্থনায় মুখর। নিজেই বলছেন—'তিনি খুব কান-খড়কে, সব শুনতে পান গো। যত ডেকেছ সব শুনেছেন।' 'মাকে বলেছিলাম—মা, বেদ-বেদান্তে পুরাণে তন্ত্রে কি আছে আমায় জানিয়ে দাও। মা সব জানিয়ে দিয়েছেন।' বস্তুত ঈশ্বরীর কাছে দুই হাতে আদায় ক'রে নিয়েছেন দুর্লভ অপার্থিব অনুভূতি। বড় বিচিত্র তাঁর সাধন-কাহিনী। সহজ ভক্তির মেঠো পথে তিনি প্রবেশ করেন তপস্যা-প্রাঙ্গণে। প্রার্থনা দিয়ে আরম্ভ ক'রে, নিত্য অখণ্ডের রাজ্যে সঞ্চরণ, আবার ভক্তি-ভক্তের এলাকায় লীলায় এসে পরিক্রমণ-সমাপ্তি, পুনরায় শরণা-গতি ও প্রার্থনার ভাব। ক্রীড়াচপল শিশুর মতন নিত্য থেকে লীলায় ও লীলা থেকে নিত্যের স্তরে ক্ষণে ক্ষণে যাতায়াত।

অন্যদিকে বিবেক বৈরাগ্য তপশ্চর্যা ও অদ্বৈতানুভূতির সঙ্গে ব্যাকুল প্রার্থনার এমন আশ্চর্য সম্মিলন অভূতপূর্ব। প্রার্থনায় বিভোর, মাতৃমুখাপেক্ষী এক সরল শিশু! ওই বাল-স্বভাব মহাপুরুষের কণ্ঠে বার বার সকরুণ উক্তি—'ও মা ও মা—শরণাগত।' প্রকৃতপক্ষে প্রার্থনার দ্বারাই শরণাগতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর প্রার্থনার মধ্যে ভগবৎকামী নিখিল মানব-অন্তরের নিবিড় আর্তি ও আকূতি মুক্তা-বিন্দুর মত অশ্রুসজল আবেদনে সংহত। আধ্যা-ত্মিকতার জমাট-মূর্তি, ভাবসাগর, যুগাবতারের কঠোর সাধনের সিংহবিক্রমের সঙ্গে একটা অনির্বচনীয় মাধুর্য ও সারল্য মিশ্রিত ছিল, যে-কথার ইঙ্গিত আগেই দিয়েছি। ভগবানের ওপর একান্ত নির্ভরতা সাধনার ক্ষেত্রে কোমলতা ও মাধুর্যের প্রকাশ। সেই লীলা-চঞ্চল মাধুর্য-সাগরে প্রার্থনাগুলি তরঙ্গের মতন উত্থিত হয়ে আবার বিলীন হচ্ছে। ত্রিতাপ-দগ্ধ মানুষের জন্য একান্তে কাতরকণ্ঠে জগ-দম্বাকে বলছেন—'ও মা উপায় বল মা, উপায় বল।' মানুষকে আশ্বাস দিয়ে বলছেন—'আন্তরিক প্রার্থনা করলে তিনি শুনবেনই শুনবেন।' দ্বৈতভূমিতে প্রার্থনার মত সহজ উপাসনা আর নেই। ভক্তি-ভাবসংবলিত প্রার্থনাই হৃদয়ের ভার-লাঘবকারী, ভক্তের সান্ত্বনাস্থল। কিন্তু সত্যই কি নির্গুণ নিরাকার অখণ্ড সচ্চিদানন্দ কৃপায় সান্ত রূপ ধারণ ক'রে

মানবের আকৃতি শ্রবণ করেন? সংশয় নিরসন ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন—'ভক্তের পক্ষে সগুণ ব্রহ্ম অর্থাৎ তিনি সগুণ—একজন ব্যক্তি হয়ে, রূপ হয়ে দেখা দেন। তিনিই প্রার্থনা শুনেন, তোমরা যে প্রার্থনা করো, তাঁকেই করো। ···ঈশ্বর একজন ব্যক্তি বলে বোধ থাকলেই হলো—যে ব্যক্তি প্রার্থনা শুনেন, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন, যে ব্যক্তি অনন্তশক্তি।'

কিন্তু অনর্থ-পরম্পরা সৃষ্টি করে কামনা-মূলক প্রার্থনা। ঈশ্বর-কামনাই শুধু কামনার মধ্যে গণ্য নয়। শাশ্বত প্রার্থনার সুর অপরি-বর্তিত। সেই চিরন্তন সুরটি ধরিয়ে দিচ্ছেন 'কথামৃতে'—

'ঠিক ভক্ত যে, সে কোন কামনা করে না। কেবল শুদ্ধা ভক্তি প্রার্থনা করে; কোন শক্তি কি সিদ্ধাই কিছুই চায় না।' 'ভক্তিকামনা কামনার মধ্যে নয়। ভক্তিকামনা, ভক্তিপ্রার্থনা করতে পার।' 'ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর যাতে তাঁর নামে রুচি হয়। তিনিই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।' '···সর্বদাই তাঁর নাম গুণগান, কীর্তন ও প্রার্থনা করতে হয়।' 'সরলভাবে বলো হে ঈশ্বর, দেখা দাও, আর কাঁদ; আর বলো, হে ঈশ্বর কামিনী কাঞ্চন থেকে মন তফাৎ কর।' '···সাধুসঙ্গ আর সর্বদা প্রার্থনা করতে হয়। তাঁর কাছে কাঁদতে হয়। মনের ময়লাগুলো ধুয়ে গেলে তাঁর দর্শন হয়। মনটি যেন মাটি-মাখানো লোহার স্থচ—ঈশ্বর চুম্বক পাথর, মাটি না গেলে চুম্বক পাথরের সঙ্গে যোগ হয় না। কাঁদতে কাঁদতে স্থচের মাটি ধুয়ে যায়।'

আন্তরিকতা ও ব্যাকুলতাই এখানে মুখ্য; বাগাড়ম্বর, মৌখিক স্তবস্তুতি গৌণ। সরল প্রাণের সহজ কথাটি ভগবানের চরণে অনাড়ম্বরে অনায়াসে নিবেদন করা যায় এবং আন্তরিক হলে তিনি শোনেন—এ ভাবটি যেন চিত্তে দৃঢ় অঙ্কিত হয়।

পুরাণাদি-সমর্থিত প্রার্থনাসমূহও নিজস্ব ভাষায় ব্যক্ত করছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। অহল্যা মহাবীর নারদ প্রভৃতি ভক্তগণ একই প্রার্থনা-মন্ত্র যুগে যুগে উচ্চারণ করেছেন—

'অহল্যা বলেছিল, হে রাম! যদি শূকর-যোনিতে জন্ম হয় তাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি থাকে—আমি আর কিছুই চাই না।' 'হনুমান বলেছিল—হে রাম, শরণাগত, শরণাগত—এই আশীর্বাদ কর যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয় আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই!' 'রামচন্দ্র বললেন, নারদ! তোমার উপর বড় প্রসন্ন হয়েছি, তুমি বর নাও। নারদ বললেন, রাম! আর কি বর চাহিব? তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি দাও। আর তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় যেন মুগ্ধ করো না।' 'শুদ্ধা ভক্তি, কোন কামনা থাকবে না, সেই ভক্তি দ্বারা তাঁকে শীঘ্র পাওয়া যায়।' 'কোন কামনা বাসনা রাখতে নাই। কামনা বাসনা থাকলে সকাম ভক্তি বলে। নিষ্কাম ভক্তিকে বলে অহেতুকী ভক্তি। তুমি ভাল-বাসো আর নাই বাসো, তবু তোমাকে ভাল-বাসি। এর নাম অহেতুকী।'

কথামৃতকার লিখছেন, '···রামগুণ-কীর্তনান্তে ঠাকুর প্রার্থনা করিতেছেন। যেন সাক্ষাৎ ভগবান প্রেমের দেহধারণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিতেছেন, কিরূপে প্রার্থনা করিতে হয়।' কখনও ইতিমার্গে, কখনও নেতিমার্গে, কখনও ইতিবাচক ও নেতিবাচক শব্দ-সমষ্টি উদ্দেশ্যানুগ ক'রে প্রার্থনা করছেন। সাধকজীবনে অপরিহার্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষা, অনাবশ্যক সমস্তই বর্জন, মহামায়ার দুরতিক্রম-ণীয়া ভুবনমোহিনী মায়ার কবল থেকে মুক্ত

থাকার স্পৃহা এবং শরণাগতি—এই ভাবই তাঁর প্রার্থনায় প্রাধান্য লাভ করেছে—

'আমি মার কাছে প্রার্থনা করেছিলাম; বলেছিলাম, মা! আমি লোকমান্য চাই না মা, অষ্টসিদ্ধি চাই না মা, ও মা! শতসিদ্ধি চাই না মা, দেহসুখ চাই না মা, কেবল এই করো যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয় মা।' মানুষের মনে যে লোকমান্য—অষ্টসিদ্ধি এবং দেহ-সুখের স্বাভাবিক কামনা থাকে—যার কথা উল্লেখ ক'রে যমরাজ বলেছিলেন নচিকেতাকে, 'যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ' অর্থাৎ বহু মনুষ্য (যে অনিত্য বিষয়ে) মগ্ন হয়ে যায়—সেই সেই বিষয়ের উল্লেখপূর্বক পরিহার করছেন।

'মা আমি তোমার শরণাগত, শরণাগত। তোমার শ্রীপাদপদ্মে শরণ নিলাম। দেহসুখ চাই না মা! লোকমান্য চাই না, (অণিমাদি) অষ্টসিদ্ধি চাই না, কেবল এই ক'রো যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়—নিষ্কাম অমলা, অহেতুকী ভক্তি হয়। আর যেন মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই—তোমার মায়ার সংসারে কামিনী কাঞ্চনের উপর ভালবাসা যেন কখন না হয়। তোমা বই আমার আর কেউ নাই। আমি ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন—কৃপা ক'রে শ্রীপাদপদ্মে আমায় ভক্তি দাও।'

'আমি মার কাছে একমাত্র ভক্তি চেয়েছিলাম। মার পাদপদ্মে ফুল দিয়ে হাত জোড় ক'রে বলেছিলাম, "মা, এই লও তোমার অজ্ঞান, এই লও তোমার জ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই লও তোমার শুচি, এই লও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই লও তোমার পাপ, এই লও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই লও তোমার ভাল, এই লও তোমার মন্দ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই লও তোমার ধর্ম, এই লও তোমার অধর্ম, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।"'

মহামন্ত্রোচ্চারণের মতন এই সহজ সুগভীর বাক্যগুলির আবৃত্তি অন্তরের কোন রহস্যঘন রাজ্যে আকর্ষণ করে মনকে। সে রাজ্য পুণ্যাপুণ্য-ধর্মাধর্ম-সুখদুঃখাদি-দ্বন্দ্ব-বর্জিত, মলিন মন, মলিন বুদ্ধির অগোচর, অথচ শুদ্ধবুদ্ধির গোচর। দার্শনিক দৃষ্টিতে প্রার্থনাগুলি ভক্তি ও জ্ঞানের নির্যাস বললে অত্যুক্তি হয় না। যথার্থ মুমুক্ষুর অন্তরের ভাব স্পষ্ট কথায়, যুগোপযোগী ভাষায় অভিব্যক্ত। ত্যাগৈকভূষণ জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির তুল্য উদ্দীপ্ত বৈরাগ্যের প্রতিমূর্তি এই মহাপুরুষের প্রার্থনার মধ্য দিয়েও বৈরাগ্যের গৈরিক লাভাস্রোত প্রবাহিত হয়ে জীবের অবৈরাগ্যকে যেন দগ্ধ করতে উদ্যত। এ সব প্রার্থনা নিঃসন্দেহে অতি উচ্চকোটির।

অপরদিকে সন্তানস্নেহে দ্রবীভূতা মাতৃরূপিণী মহাশক্তি দক্ষিণেশ্বরের মহাপীঠে সাধনা ও প্রার্থনার এক অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। হাত জোড় ক'রে প্রার্থনা করছেন, সরল দ্বিধাহীন ভাষায়—'তোমার ঐ জোছনার মত আমার অন্তর নির্মল ক'রে দাও।' গঙ্গার স্থির জলে চন্দ্রের প্রতিচ্ছবি দেখে কখনও সজল নয়নে বলছেন—'চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে, আমার মনে যেন কোন দাগ না থাকে।' কখনও বা দোষদৃষ্টিকে অশান্তির মূল কারণ জেনে বলছেন—'আমারও আগে লোকের দোষ চোখে ঠেকতো। তারপর—"ঠাকুর আর দোষ দেখতে পারি নে"—ব'লে কত প্রার্থনা ক'রে তবে দোষ দেখাটা গেছে।

বৃন্দাবনে যখন থাকতুম, বাঁকে বিহারীকে দর্শন ক'রে বলতুম—"তোমার রূপটি বাঁকা, মনটি সোজা—আমার মনের বাঁকটি সোজা ক'রে দাও।"' কত কবিত্বময়, অথচ সরল প্রার্থনা। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রার্থনাগুলি যেন শুদ্ধচিত্ত ভক্তের অবলম্বনীয় প্রার্থনা। আর সন্তান-বৎসলা জননী যেন দুর্বল সন্তানকে চিত্ত-শুদ্ধি-পর্বের প্রার্থনা শেখাচ্ছেন। কারণ, জননী জানেন তাঁর দুর্বল সন্তান প্রবৃত্তির দাবদাহ সংযত করতেই সংগ্রাম করে জীবন-ভোর, সংসারের বিরুদ্ধ পরিবেশে পবিত্র ভাবটি বজায় রাখার তীব্র মানসতপস্যাই করতে হয় তাকে।

শান্ত ভাবোচ্ছ্বাসমুক্ত নীরব এবং গভীর যে জীবনটি তিনি যাপন করেছেন, তার সবটাই ছিল একটানা নীরব প্রার্থনা। প্রার্থনা ও তার অমোঘ ফল সম্বন্ধে তাঁর অভয়দান সর্বদাই স্মরণীয়—'ঠাকুরের কাছে মনের কথা জানিয়ে প্রার্থনা করবে। প্রাণের কথা কেঁদে বলবে,—দেখবে তিনি একেবারে কোলে বসিয়ে দেবেন।' 'যখন মনে কোন বিষয় উদয় হবে, জানবার ইচ্ছা হবে, তখন একাকী কেঁদে কেঁদে তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে। তিনি সমস্ত মনের ময়লা ও কষ্ট দূর ক'রে দেবেন, আর বুঝিয়ে দেবেন।'

স্বামী বিবেকানন্দ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীবাহকরূপে জগতে আবির্ভূত। তিনি বুঝেছিলেন, ব্রত কৃচ্ছ্র প্রার্থনা তপস্যার ভারতবর্ষ আবার এ যুগে জ্ঞান কর্ম ভক্তি ও যোগের সমন্বিত সাধনার দ্বারা নবরূপে রূপায়িত হবে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমন্বয়মূলক ধর্মবোধকে প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি চতুর্বিধ যোগের সামঞ্জস্যের কথা বারংবার বলেও, সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে, নিজ নিজ সামর্থ্য ও রুচি অনুযায়ী সাধকগণ চতুর্বিধ যোগের একটি বা একাধিক—সাধন-মার্গ হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন। সুতরাং ভক্তি-সম্ভূত প্রার্থনার সাধনও স্বীকৃত। বস্তুত ভক্তের দৃষ্টিতে এবং বৈদান্তিক ভঙ্গীতে তিনি প্রার্থনার মর্মোদ্‌ঘাটন করেন। শ্রীগুরুর তীব্র ইচ্ছাশক্তিতে তিনি একদিন সগুণা, সাকারা ব্রহ্মশক্তিকে মেনে নিয়েছিলেন। শ্রীমৎ তোতাপুরীর ন্যায় তিনিও অগ্নির দাহিকা শক্তির মতন অভিন্না মহাশক্তিকে জগৎকারণ ব'লে নির্ণয় করেন। সুতরাং দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে জগন্মাতার সাক্ষাৎ প্রকাশে বিহ্বল-চিত্তে ভক্তি-গদগদকণ্ঠে মার কাছে—জ্ঞান ভক্তি বিবেক বৈরাগ্য প্রার্থনা করলেন। 'ভক্তিযোগে'র মধ্যে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা অবতারবাদ ভক্তির সাধনা প্রভৃতি আলোচনা-কালে কত ভাবেই না তিনি ভগবৎপ্রেমের জয়গান করেছেন। যতক্ষণ না জীবব্রহ্মের অপরোক্ষ ঐক্যানুভূতি হয়, ততক্ষণ আমরা ভগবানকে ব্যক্তিরূপে উপাসনা না ক'রে পারি না। উপাসনার প্রাণ ব্যাকুলতা। 'ভক্তিযোগে' বলছেন, 'লোকে যদি "কেন আমি ভগবানকে পাইলাম না" বলিয়া অস্থির হয়, সেই যন্ত্রণা তাহার মুক্তির কারণ হইবে।'; 'প্রকৃত ভক্ত নিজের জন্য কোন ইচ্ছা বা কার্য করেন না। "প্রভু, লোকে তোমার নামে বড় বড় মন্দির নির্মাণ করে, তোমার নামে কত দান করে; আমি দরিদ্র, আমি অকিঞ্চন, আমার দেহ তোমার পাদপদ্মে সমর্পণ করিলাম, প্রভু, আমায় ত্যাগ করিও না"—ইহাই ভক্তহৃদয়ের গভীর প্রদেশ হইতে উত্থিত প্রার্থনা।' ধ্যান বিচার বৈরাগ্য ও জ্ঞানের মতন ভক্তি-সঞ্জাত প্রার্থনাও বস্তুত মানবাত্মার

অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করে, আত্ম-প্রকাশের পথ সুগম করে, অধ্যাত্মপথে উত্তীর্ণ করে।

অদ্বৈততত্ত্বের প্রসঙ্গে 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদে' স্বামীজী বলছেন, 'মানুষ তার ideal (আদর্শ)-কে মানুষরূপেই ভাবতে সক্ষম। এই জরামরণসঙ্কুল জগতে এসে মানুষ দুঃখের ঠেলায় "হা হতোঽস্মি" করে এবং এমন এক ব্যক্তির আশ্রয় চায়, যাঁর উপর নির্ভর ক'রে সে চিন্তাশূন্য হতে পারে। কিন্তু আশ্রয় কোথায়? নিরাধার সর্বজ্ঞ আত্মাই একমাত্র আশ্রয়স্থল। প্রথমে মানুষ তা টের পায় না! বিবেক-বৈরাগ্য এলে ধ্যান-ধারণা করতে করতে সেটা ক্রমে টের পায়। কিন্তু যে যে-ভাবেই সাধন করুক না কেন, সকলেই অজ্ঞাতসারে নিজের ভেতরে অবস্থিত ব্রহ্ম-ভাবকে জাগিয়ে তুলছে। তবে আলম্বন ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যার personal God (ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর)-এ বিশ্বাস আছে, তাকে ওই ভাব ধরেই সাধনভজন করতে হয়। ঐকান্তিকতা এলে ঐ থেকেই কালে ব্রহ্ম-সিংহ তার ভিতরে জেগে ওঠেন।'

'রাজযোগে' 'সাধনের প্রথম সোপান ব্যাখ্যাকালে তিনি যে সর্বজনীন প্রার্থনার অনুশীলন উল্লেখ করেছেন, তা অনবদ্য। সর্ব-কুসংস্কারমুক্ত বৈদিক ভাবের এক অনুরণন শ্রুত হয় অংশটিতে। 'জগতে পবিত্র চিন্তার একটি স্রোত চালাইয়া দাও। মনে মনে বল, জগতে সকলেই সুখী হউন, সকলেই শান্তি লাভ করুন; সকলেই আনন্দ লাভ করুন; এইরূপে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণে পবিত্র-চিন্তা-প্রবাহ প্রবাহিত কর।...তৎপরে যাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন—অর্থ, স্বাস্থ্য অথবা স্বর্গের জন্য নহে, জ্ঞান ও হৃদয়ে সত্য-তত্ত্বোন্মেষের জন্য প্রার্থনা প্রয়োজন।'

পরিশেষে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সেই মহতী প্রার্থনার বাণী উদ্ধৃত করছি, যা সর্ব যুগের সংশয়ী মানবকুলের চিরন্তন উপজীব্য—

'হে ভগবান, তুমি সাকার কি নিরাকার আমি বুঝতে পারি না, তুমি যাহাই হও, আমায় কৃপা কর, দেখা দাও।'

বাংলা নাট্যসাহিত্যের উষাকাল

শ্রীশংকর ঘোষ*

নাটকাভিনয় ও নাট্যসাহিত্য জাতি ও সংস্কৃতির প্রাণপ্রকাশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহন বলে স্বীকৃত হয়ে এসেছে। নাটক অভিনয়ের অপেক্ষা রাখে বলে একে একটা মিশ্র শিল্প বলা যায়। রঙ্গমঞ্চ, নাট্যকার, অভিনয়ের শিল্পীরা, সংযোজক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান—এদের পরস্পর-নির্ভর সহযোগিতার ফলেই নাটক সাহিত্য ও শিল্প হিসেবে একটা স্থায়ী মূল্য

* এম. এ.। 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে কালিদাস ও ভবভূতি' বিষয়ে বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণায় নিরত। 'নানান ফুলের মালা' (রচনা-সংগ্রহ) গ্রন্থের রচয়িতা। সুগায়ক ও আবাল্য অভিনেতা। 'ভারতের সাধক', 'চারণকবি মুকুন্দ দাস', 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন', 'নতুন তীর্থ' প্রভৃতি মোট এগারটি ছায়াছবিতে অভিনয় করিয়াছেন। বর্তমানে মঞ্চাভিনেতা, দূরদর্শনে ও আকাশবাণীতে নাটকাভিনেতা, স্বরচিত কথিকা ও ছোটগল্পের পাঠক।

পেয়ে থাকে।

'নাটক' সম্পর্কে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে প্রতীচ্যের দৃষ্টিভঙ্গীর একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। আমাদের দেশের প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মতে নাটক হচ্ছে দৃশ্যকাব্য, অর্থাৎ এ শুধু রঙ্গমঞ্চে অভিনেয় নয়, এ রসাত্মক বাক্যও বটে আর পাশ্চাত্য সমালোচকদের দৃষ্টিতে নাটক হচ্ছে মানুষের চলমান জীবনের প্রতিচ্ছবি। নাটক সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে এই যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, এর মূলে রয়েছে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে উভয় দেশের ভাবদৃষ্টির পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমরা জীবনটাকে দেখেছি লীলারূপে আর ইউরোপীয় জাতি দেখেছেন একটা বিরামহীন সংগ্রামরূপে। আমাদের দেশের পূর্বতন আলংকারিকেরা কাব্যে করুণ রসকে স্বীকৃতিদান করলেও বিয়োগান্ত নাটকের রচনা যে প্রতিষিদ্ধ করেছিলেন, তারও মূলে রয়েছে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে আমাদের বিশিষ্ট ধ্যানধারণা। আমরা দুঃখকে স্বীকার করেছি কিন্তু চরম সত্য বলে মানিনি। আমরা বিশ্বাসী 'কর্মফলে', তাই আমাদের দৃষ্টিতে প্রত্যেক মানুষ নিজ ভাগ্যের নির্মাতা। আমাদের দেশের দার্শনিকদের ভাষায় কৃতকর্মের প্রণাশ বা ধ্বংস নেই, আবার অকৃত কর্মেরও 'অভ্যাগম'[১] নেই।

ফলে আমাদের দেশে নাটক যে কিছু পরিমাণে বিধিনিষেধের দ্বারা শৃঙ্খলিত হয়ে পড়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। এজন্য মধুসূদন রাজনারায়ণকে এক পত্রে লিখেছিলেন—

'যদি আমাকে নাটক লিখিতে হয়, তবে তুমি নিশ্চিত জানিও যে, আমি সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথের বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিব না। য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণের নিকট হইতেই আমি নাটকরচনার আদর্শ গ্রহণ করিব।'

প্রায় একই ধরনের উক্তি করেছেন যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'কীর্তিবিলাসের' (১৮৫২) ভূমিকায়। অরিস্টটল, সেনেকা ও সেক্সপীয়রের উল্লেখ করে নাট্যকার বলেছেন—

'ভারতবর্ষীয় পূর্বতন পণ্ডিতেরা অনুমান করিতেন যে, ধার্মিক ব্যক্তির দুঃখাভিনয় করিবার সময় তাঁহাকে দুঃখার্ণবে রাখিয়া গ্রন্থ শেষ করিতে নাই। ইহা কেবল তাহাদিগের ভ্রান্তিমাত্র। জীবন ধারণ করিলেই ইষ্ট অনিষ্ট উভয়েরই ভোগী হইতে হইবে, ধার্মিক হইলেই যে আপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইবে না, এমন নহে।'

গৌরচন্দ্রিকা যাক, আসল প্রসঙ্গে এবার আসা যাক। 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের উষাকাল' বলতে অবশ্যই বুঝতে হবে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগকে। কারণ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এসেই বাংলা নাট্যশালা তার নবজীবন লাভ করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আসার পূর্ব পর্যন্ত বাংলা নাট্যশালা একটি স্থায়ী কীর্তি হয়ে উঠতে পারেনি। উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে মধ্যভাগ পর্যন্ত—এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কলকাতার কতিপয় ধনবান ব্যক্তির উৎসাহে যে কয়েকটি রঙ্গমঞ্চ নির্মিত হয়েছিল, তার একটিরও আয়ু দীর্ঘ ছিল না। এ সব প্রচেষ্টা ছিল ব্যক্তিগত খামখেয়ালীপনার ব্যাপার; এ সব প্রচেষ্টা পরস্পর বিচ্ছিন্ন। তাই পঞ্চাশ বছর ধরে বিভিন্ন স্থানে অভিনয় করা সত্ত্বেও

[১] যে কর্ম করা হয় নি, তার আগমন অর্থাৎ ফলভোগ

বাংলা দেশে একটি স্থায়ী নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই ব্যর্থতার বহু কারণ ছিল। প্রধান কারণ অবশ্যই এই যে জনসাধারণের শিক্ষা ও রুচির অভাব। তদুপরি, বাংলা ভাষায় রচিত নাটকের অভাব। ইংরাজী নাটক যত উচুঁদরেরই হোক না কেন, সাধারণ বাঙ্গালীর কথা দূরে থাক, ইংরাজী-শিক্ষালব্ধ বাঙ্গালীর পক্ষেও সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে তার রস আস্বাদন অনায়াসসাধ্য ব্যাপার ছিল না। সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত নাট্যাভিনয় একান্তই কৃত্রিম ছিল।

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'হিন্দু-থিয়েটার'ই ইংরাজীশিক্ষিত নব্য বাঙ্গালী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা। ১৮৩১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর এই নাট্যশালার দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। প্রথম অভিনীত নাটকটি বাংলা নাটক নয়, এমন কি অন্য কোন ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করা নাটকও না। প্রথম অভিনীত নাটক উইলসন কর্তৃক ইংরাজীতে অনূদিত-ভবভূতির 'উত্তররামচরিত'।

১৮৫২ থেকে ১৮৫৭, এই পাঁচ বছরে প্রকাশিত নাটকগুলিকে অবলম্বন করে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ঊষাপর্বকে বিশ্লেষণ করা যায়। ঐ সময় থেকেই বাংলা দেশে নাট্যাভিনয়ের ধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে। সেই সময় থেকেই বাঙ্গালীপ্রতিষ্ঠিত কোন বড় বা উল্লেখযোগ্য নাট্যশালায় আর কোন ইংরাজী নাটকের অভিনয় হয়নি। দু'এক জায়গায় ইংরাজী নাটক অভিনয়ের কথা শোনা গেলেও শুধু ইংরাজী নাটক অভিনয়ের জন্য আর কোন নাট্যশালা স্থাপিত হয়নি। এই নতুন ধারার সূত্রপাত হয় সাতুবাবুর বাড়ীতে। যে নাটক অভিনয়ের দ্বারা এই নতুন ধারার সূত্রপাত সেটি কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' অবলম্বনে নন্দকুমার রায় রচিত 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলা' নাটক। এই অভিনয়ের উদ্যোগ করেন পরলোকগত সাতুবাবুর দৌহিত্রেরা।

১৮৫৭-র ৩০শে জানুআরি তারিখে সরস্বতী-পূজা উপলক্ষে শকুন্তলা প্রথম অভিনীত হয়। এই অভিনয় সম্বন্ধে ১৮৫৭-র ৫ই ফেব্রুআরির 'হিন্দু পেটরিয়ট্' এবং ৯ই ফেব্রুআরির 'সমাচারচন্দ্রিকা' ভূয়সী প্রশংসা করে।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বাংলা দেশে নাট্যাভিনয়ের যে উৎসাহ দেখা যায়, বেলগাছিয়া নাট্যশালায় তার পূর্ণবিকাশ হয়েছিল বলা চলে। কিন্তু এর কিছুকাল পূর্বেই অপর একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই নাট্যশালার নাম 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ'। ১৮৫৩ সালে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' নামে একটি সাহিত্য-সভা গঠন করেন বিখ্যাত লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহ (ছদ্মনাম—'হুতোম প্যাঁচা')। এই বিদ্যোৎসাহিনী সভার সহিত সংযুক্ত ছিল 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ', যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্বয়ং কালীপ্রসন্ন। এই রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৬ সালে। ১৮৫৭-র ১১ই এপ্রিল শনিবার এই রঙ্গমঞ্চের দ্বার উদ্ঘাটিত হয় ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার' নাটকটি দিয়ে (মূল রচনাটিকে বাংলায় রূপান্তরিত করেছিলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন)। 'বেণীসংহারে' কালীপ্রসন্ন নিজে অভিনয় করেছিলেন এবং তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হওয়ায় তিনি উৎসাহিত হয়ে নিজেই নাটকরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ১৮৫৭-র সেপ্টেম্বর মাসে কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী'র অনুবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন। ১৮৫৭-র ২৪শে নভেম্বরে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে 'বিক্রমোর্বশী'

নাটক মহাসমারোহে অভিনীত হয়। কালীপ্রসন্ন স্বয়ং পুরূরবার ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

১৮৫২-৫৭ সালের মধ্যে রচিত নাটক ও নাট্যকারের নাম উল্লেখ করছি—

১। যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত—কীর্তিবিলাস (১৮৫২)
২। তারাচরণ শিকদার—ভদ্রার্জুন (১৮৫২)
৩। হরচন্দ্র ঘোষ—ভানুমতী চিত্তবিলাস (১৮৫৩)
৪। রামনারায়ণ তর্করত্ন—কুলীনকুলসর্বস্ব (১৮৫৪)
৫। কালীপ্রসন্ন সিংহ—বাবু নাটক (১৮৫৪)
৬। নন্দকুমার রায়—অভিজ্ঞানশকুন্তলা (১৮৫৫)
৭। উমেশচন্দ্র মিত্র—বিধবা-বিবাহ (১৮৫৬)
৮। রামনারায়ণ তর্করত্ন—বেণীসংহার (১৮৫৬)
৯। রাধামাধব মিত্র—বিধবা-মনোরঞ্জন (১৮৫৬)
১০। উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়—বিধবোদ্বাহ (১৮৫৬)
১১। যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়—চপলা চিত্ত-চাপল্য (১৮৫৭)
১২। বিহারীলাল নন্দী—বিধবা-পরিণয়োৎসব (১৮৫৭)
১৩। কালীপ্রসন্ন সিংহ বিক্রমোর্বশী (১৮৫৭

উল্লিখিত নাটকগুলির মধ্যে নন্দকুমার রায়ের 'শকুন্তলা' কিংবা কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিক্রমোর্বশী' অথবা রামনারায়ণ তর্করত্নের 'বেণীসংহার' বাঙ্গালী নাট্য-রসিকগণের মনে কি প্রচণ্ড উৎসাহের সঞ্চার করেছিল, তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। পাশাপাশি একথাও ধ্রুব সত্য যে উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে যাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার সংস্পর্শে এসে সে-দেশের শ্রেষ্ঠ নাটকসমূহের রস আস্বাদন করেছিলেন, বাংলা দেশের বাংলা নাটকের উষাকালের নাট্যকারগণ তাঁদের রস-পিপাসা চরিতার্থ করতে পারেননি। এই উষাকালের নাট্যকারগণের প্রতিভা অনুজ্জ্বল ছিল তা নয়, তবে তাঁরা সংস্কৃত-নাট্য-সাহিত্যের দ্বারা বড় বেশী প্রভাবিত হয়েছিলেন।

উল্লিখিত নাটকগুলির উপর অল্পবিস্তর আলোকপাত করা যাক। যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' বাংলা ভাষায় প্রথম বিয়োগান্ত নাটক। প্রথম বিয়োগান্ত বটে, কিন্তু সার্থক বিয়োগান্ত অবশ্যই নয়। লেখকের ভূমিকাতে বোঝা যায় যে তিনি ট্রাজেডীর ভাবের দিক দিয়ে যৌক্তিকতা অনুধাবন করেছিলেন, কিন্তু কার্যতঃ তার রূপ দেওয়া যোগেন্দ্রচন্দ্রের সাধ্যের অতীত ছিল। নাটকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আঙ্গিকের যোগসাধন ঘটানো হয়েছে অতিশয় বিসদৃশভাবে। সেই সঙ্গে রূপকথার অবাস্তবতার মধ্যে ট্রাজেডীবিধানের অমোঘতা প্রবর্তন করে তিনি এক অদ্ভুত জগাখিচুড়ী তৈরী করেছিলেন।

'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে'র প্রতিষ্ঠাতা কালীপ্রসন্ন সিংহ অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু সে প্রতিভা সর্বতোমুখী নয়। নতুবা 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র যে ঔপন্যাসিক আদর্শের সচেতন অনুসরণ লক্ষ্য করি, তা তাঁর মৌলিক নাটক রচনার (বাবু নাটক) ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি না কেন? অথচ সংস্কৃত নাটকের অনুবাদের ক্ষেত্রে তো তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 'বিক্রমোর্বশী'ই তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ।

ঈশ্বর গুপ্ত যেমন যুগসন্ধির কবি, তেমনই এক হিসাবে তারাচরণ শিকদার যুগসন্ধির নাট্যকার। প্রধানতঃ কাশীরাম দাসের

মহাভারত থেকে তিনি তাঁর নাটকের বিষয়-বস্তু গ্রহণ করেছিলেন। তিনি যদি নাট্য-রচনায় পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দের আশ্রয় না নিতেন তা হলে তাঁর নাট্য-রচনার প্রয়াস এমনভাবে ব্যর্থ হত না। তারাচরণের রচনাতে কোথাও অশ্লীলতা বা গ্রাম্যতা নেই। চরিত্র-সৃজনেও তিনি অন্ততঃ কথঞ্চিৎ সিদ্ধিলাভ করেছেন। তবে 'ভদ্রার্জুনে' নাটকীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্র তেমন পরিস্ফুট হয়নি। তথাপি, নাটকখানিতে লেখকের প্রতিভার পরিচয় আছে।

'ভদ্রার্জুন' রচয়িতা তারাচরণ নাট্যকার হিসাবে খ্যাতি অর্জন করতে পারেননি। কিন্তু বাংলা নাট্যসাহিত্যের উষাকালেই রাম-নারায়ণ তর্করত্ন কমেডী বা মিলনান্ত নাটক রচনা করে যশস্বী হয়েছিলেন। নাট্য-রচনায় তাঁর প্রতিভা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং হাস্যরসের পরিবেশনেও তাঁর দক্ষতা ছিল প্রচুর। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও তিনি অনেক বিষয়ে ছিলেন যুগেরই অগ্রগামী; তাঁর রচনার মধ্যে আমরা তাঁর সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হই। কি অনুবাদে, কি মৌলিক রচনায়—দুটিতেই তিনি সিদ্ধহস্ত। 'বেণীসংহার' নাটকে সংস্কৃতের আক্ষরিক অনুবাদের পরিবর্তে লেখক বাংলা বাচনরীতি গ্রহণ করেও মাঝে-মধ্যে যাত্রার অনুসরণে গানের সংযোজনা করে শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করতে চেষ্টা করেছেন। আর 'কুলীনকুল-সর্বস্ব' তো প্রথম সার্থক নাটকের গৌরব দাবী করতে পারে। এখানে লেখক পুরাণ ও পরানুকরণ ছেড়ে সর্বপ্রথম বাস্তব সামাজিক জীবনে পদক্ষেপ করেছেন। বাংলা সমাজে যা সর্বাপেক্ষা নিন্দনীয় প্রথা সেই কৌলীন্যের করুণ ও উপহাস্য দিক উদ্ঘাটনই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এ নাটকে প্রথম সত্যকার সমাজ-জীবনের স্পর্শ ও মানবহৃদয়ের আন্দোলন অনুভব করা যায়। চরিত্রগুলি ব্যক্তি নয়, শ্রেণী প্রতিনিধিত্ব করেছে। তাই এই নাটক সমাজসংস্কার উদ্দেশ্যে লেখা বাংলা নাটকের প্রথম নিদর্শনরূপে এই উষাকালের নাট্যসাহিত্যে অমর হয়ে আছে।

রামনারায়ণের প্রতিভা স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। 'নাটুকে রামনারায়ণ' সংস্কৃত নাটকের অভিনয়যোগ্য রূপ দিতে গিয়ে ভাষাকে যথা-সম্ভব মৌলিক করার চেষ্টা করেছেন, কোন কোন স্থলে চরিত্রগুলিকেও ঈষৎ পরিবর্তিত করে বাঙ্গালীর রুচি ও অভিজ্ঞতার অনুরূপ করে নিয়েছিলেন। রামনারায়ণের সহজ রসিকতা-বোধ এবং নাটকের ভেতর দিয়ে সমাজ-সংস্কারের প্রয়াস সেকালের বাঙ্গালী সমাজে বেশ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল।

হরচন্দ্র ঘোষের চূড়ান্ত ব্যর্থতা প্রতিফলিত হয় সেক্সপীয়রের 'মার্চেন্ট অব ভেনিসে'র বঙ্গ-রূপান্তর 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' নামক নাটক নির্মাণে।

তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' নাটকে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব থাকলেও ইনিই সর্ব-প্রথম ইংরাজী নাটকের অনুসরণে প্রতি অঙ্কে দৃশ্যের প্রবর্তন করেন। যদিও তারাচরণের 'ভদ্রার্জুন' এবং যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তি-বিলাস' অভিনয়ের উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল, তথাপি এ নাটক দুটি মঞ্চস্থ হয়নি। মূল কারণ হল এই যে তারাচরণ বা যোগেন্দ্রচন্দ্র ইংরাজী সাহিত্যে কৃতবিদ্য হলেও বাংলা নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত ছিলেন বলে মনে হয় না।

'কুলীনকুলসর্বস্ব' অভিনয়-সাফল্য অর্জন করলে বাঙ্গালীর সামাজিক কদাচারের

উপর আক্রমণ করে নানাবিধ নকশাজাতীয় অথচ সাহিত্য-গৌরব-হীন অকিঞ্চিৎকর প্রহসন রচিত হয় এই উষাপর্বে। এর মধ্যে উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ' ব্যতীত ঐ শ্রেণীর আর কোন নাটক 'কুলীনকুল-সর্বস্বে'র ধারে কাছেও যেতে পারে না।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন এই যে উষা-কালে রচিত এবং অভিনীত নাটকগুলি নাটক হিসাবে যত ব্যর্থই হোক না কেন, বাঙ্গালীর মন ও প্রকৃতি বিচারে এদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেই হবে। যদিও এই উষাকালে রচিত নাটকগুলির অতি সামান্য অংশই সাহিত্যের পঙ্‌ক্তি-ভোজে আহূত হতে পারে, তথাপি বাঙ্গালীর জীবনে নবযুগের তরঙ্গ-কল্লোল যে আঘাত হানতে আরম্ভ করেছিল এই পর্বের নাটকগুলির পরিচয় নিলেই তা বোঝা যায়। তাই তো এই উষাকালের অব্যবহিত পরেই বাংলা নাট্যসাহিত্যে যুগান্তরের সমুদ্র-ঝটিকা প্রবেশ করল, কারণ ১৮৫৯ সালে বেলগাছিয়া নাট্য-শালায় মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। বাংলা নাটকের বিকাশ মধুসূদন ও দীনবন্ধু মিত্রের সাধনায় সম্ভব হলেও, বাংলা নাটকের উন্মেষে উষাকালের লেখকগণের প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতা কখনোই বিস্মরণের নয়।

সমালোচনা

আয়ুর্বেদ দর্শন : ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ। প্রকাশক : সাধনা ঔষধালয়, কলকাতা ৭০০০৪৮। (১৩৮৪), পৃঃ ১৪৭+১২, মূল্য : দশ টাকা।

আয়ুর্বেদকে বলা হয়েছে অথর্ব বেদের উপাঙ্গ, উপ-বেদ তথা পঞ্চম বেদ। এই চিকিৎসা-বিজ্ঞান ভারতের এক অমূল্য সম্পদ। সে সম্পদের মূল আকর গ্রন্থ চরক-সংহিতা ও সুশ্রুত-সংহিতা আর, অংশত পরবর্তী কালের বাগ্‌ভট-সংহিতা। দুঃখের বিষয়, দেশের এই প্রাচীন ঐতিহ্যটি ষষ্ঠ শতাব্দীর পর থেকেই কেমন যেন ম্লান হয়ে পড়ে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর পর ইউরোপীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে আসর জাঁকিয়ে বসে ও আয়ুর্বেদকে প্রায় কোণঠাসা করে দেয়। সম্ভবত এর কারণ শুধু যথোচিত চর্চা ও পোষকতার অভাবই নয়, আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণের সময়োপযোগী ব্যবহার-বিজ্ঞানের আশ্রয় নিতে অসামর্থ্য বা অনীহা। কারণ যাই হোক, আয়ুর্বেদের সে অবচয় আজও চলেছে।

আশা ও আনন্দের কথা, ডাঃ ঘোষের মতো সুযোগ্য ব্যক্তি আয়ুর্বেদের নবোন্মেষের কাজে ব্রতী হয়েছেন। তিনি একাধারে আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানে কৃতবিদ্য এম. বি., বি. এস, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পারংগম 'আয়ুর্বেদা-চার্য' এবং, সর্বোপরি, সুলেখক। মুখ্যত চরক-সংহিতা অবলম্বনে বায়ু পিত্ত কফের বিকৃতি-বিষয়ক ত্রিদোষতত্ত্ব এবং তার সমর্থনে, বিশেষ করে, সাংখ্যদর্শন নিয়ে ডাঃ ঘোষ যে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন তাতে বিপুল পরিশ্রম, গভীর নিষ্ঠা ও অগাধ পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। মনে হয় বাঙলা ভাষায় এ বিষয়ে এমন পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণিক গবেষণা আগে প্রকাশিত হয়নি।

ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখেছেন : 'আয়ুর্বেদের

নবযুগ যে আসিয়াছে তাহা আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে।' কামনা করি, অমোঘ হোক তাঁর ধারণা এবং আয়ুর্বেদের প্রচারণার ও নবযুগ আনার এ আন্দোলনে তিনিই নেতৃত্ব দিন। তিনি যে একাজে সর্বতোভাবে সক্ষম এই বইখানি তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। **বকলম**

অমৃতবাণী। সংকলক ও প্রকাশক: শ্রীললিতকুমার বসু, ৮৬ডি, ডঃ সুরেশ সরকার রোড, কলকাতা-৭০০০১৪। (১৯৭৭), পৃঃ ৪২, মূল্য: ১.২৫ টাকা।

জীবনদর্পণ: শ্রীললিতকুমার বসু। প্রকাশক: শ্রীকামাখ্যাকুমার চক্রবর্তী, ৮/১ সি, শ্যামানন্দ রোড, কলকাতা-৭০০০২৫। (১৯৭৬), পৃঃ ১২৪, মূল্য: ৪ টাকা।

নিম্বার্কসম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবাচার্য শ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবার ধর্মীয় উপদেশের সংকলন 'অমৃতবাণী'। শিষ্যপরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত হিন্দী ভাষায় প্রদত্ত তাঁর মূল উপদেশাবলী, সরল ও স্বাদু বঙ্গানুবাদ ও স্থানে স্থানে ব্যাখ্যা সহ, গ্রন্থটিতে সন্নিবেশিত। উপদেশগুলিতে শ্রীনিম্বার্কের প্রখ্যাত দ্বৈতাদ্বৈতধারার সাধনতত্ত্ব অনুসারে ব্রহ্মলাভের উপায় হিসেবে ভক্তি প্রেম ও আত্মসমর্পণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, জপ ধ্যান বিশ্বাস বৈরাগ্য—বিশেষত গুরূপসত্তির—কথা বলা হয়েছে, সিদ্ধাই সম্বন্ধে সাবধান করা হয়েছে। একটি পরিণত ও পরিপূর্ণ দর্শনের ফসল এই সকল উপদেশ শুধু যে জিজ্ঞাসু মনের খোরাক যোগাবে তাই নয়, আর্ত জনকেও পথ চলবার বল দেবে।

দ্বিতীয় বইখানিতে আছে শ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবার প্রশিষ্য শ্রীধনঞ্জয়দাস বাবার দ্বন্দ্বদীর্ণ সংঘর্ষসংকুল সাধনসমরের অত্যন্ত বাস্তব ও বিশ্বাস্য এক বিজয়ান্ত বৃত্তান্ত। শ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবার সাক্ষাৎ শিষ্য শ্রীসন্তদাস বাবাজীর আশ্রিত ও স্বলাভিষিক্ত স্বামী ধনঞ্জয়দাস। সদ্‌গুরু শ্রীসন্তদাস ও কুশলী শিষ্য শ্রীধনঞ্জয়দাসের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী যে পত্রবিনিময় হয় গ্রন্থকার সেগুলি, স্পষ্টত, বিনা-বিবাচনে উৎকলিত করেছেন। ফলে, মোহ ও বিষাদের অবরোধ অতিক্রম করে কীভাবে অধিকারী অন্তেবাসী ক্রমশ প্রশান্তির অক্ষয় অধিকার অর্জন করলেন এই পত্রগুচ্ছ তার এক বিরল দলিলচিত্র হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে একাধারে বজ্রকঠোর ও কুসুম-কোমল গুরুদেব কেমন করে ক্রমোচ্চ শিক্ষা-পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে প্রিয় শিষ্যকে উত্তরোত্তর তাঁর উত্তরাধিকারের যোগ্য করে গড়ে তুলেছেন চিঠিগুলি তারও সাক্ষ্যবহ। তাছাড়া, গীতা যেমন একরকম 'গুরুশিষ্য-সংবাদ' এবং তার উপদেশের ক্ষেত্র শুধু কুরুক্ষেত্র নয় এবং পাত্র নয় একমাত্র অর্জুন, চিঠিপত্রে প্রশ্নোত্তরের মধ্যে দিয়ে এই বইয়েতেও কিছুটা সেই আদল ফুটে উঠেছে এবং এর মধ্যে ছড়ানো উপদেশগুলিও উপকারী হবে অনেক ধর্মচারীর কাছে। একটি নিদর্শন দিই: 'তোমার পড়াশুনা করিয়া শাস্ত্রবিৎ হওয়া আবশ্যক, ইহাতে তোমার কল্যাণই হইবে এবং অপরের উপকারও তোমার দ্বারা ভগবান্ করাইতে পারেন। এই কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। এইক্ষণকার কালে শাস্ত্রজ্ঞান আছে বলিয়া লোকেরও ধারণা না হইলে, লোকের মধ্যে বিশ্বাস স্থাপন করান কঠিন, কেবল সিদ্ধাই দেখাইয়া যে বিশ্বাস জন্মান, তাহাতে নিজের বিশেষ অনিষ্ট হয়।'

বাংলা ভাষায় দুটি মর্যাদাবান ধর্মগ্রন্থ সংযোজনের জন্যে শ্রীললিতকুমার বসুকে অজস্র ধন্যবাদ। **বকলম**

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণকার্য

ভারতে : (ক) বন্যাত্রাণ : পশ্চিমবঙ্গে গত ২৭শে অগস্ট হইতে রামকৃষ্ণ মিশন ব্যাপকভাবে ত্রাণকার্যরত রহিয়াছে। বেলুড় মঠ হইতে সরাসরি সাহায্য পরিচালন ছাড়াও নিম্নলিখিত শাখাকেন্দ্রগুলির সহযোগে কলিকাতার মধ্যে ও আশপাশে এবং বন্যা-কবলিত জেলাগুলিতে ত্রাণকার্য করিতেছে :

ইনস্টিটিউট অব কালচার, সেবাপ্রতিষ্ঠান, অদ্বৈত আশ্রম, বরানগর, সারদাপীঠ, বেলুড় (২টি শিবির), নরেন্দ্রপুর (২টি শিবির), বেলঘরিয়া, টাকি, সরিষা, রহড়া (৩টি শিবির), মালদহ, সারগাছি (২টি শিবির), কামারপুকুর, মেদিনীপুর (২টি শিবির) এবং তমলুক (৩টি শিবির)। প্রধানতঃ খিচুড়ি ও মাঝে মাঝে চাপাটি দেওয়া হয়। কোন কোন স্থানে চাল ডাল মুড়ি চিড়া গুড় প্রভৃতি দেওয়া হয়। শিশু ও রোগীদের দুধ দেওয়া হয়। অনেক অঞ্চলে কাপড়চোপড় কম্বল পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতিও দেওয়া হয়। ২৭শে অগস্ট হইতে ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত প্রায় ৩২,০০,০০০ (বত্রিশ লক্ষ) ব্যক্তি মিশনের সেবা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

গত ১লা নভেম্বর হইতে নিম্নলিখিত ৪টি কেন্দ্র ব্যতীত এলাহাবাদ ও পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র বন্যাত্রাণকার্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে : সারগাছি (মুর্শিদাবাদ জিলায়) ২টি শিবির, কামারপুকুর (হুগলী জেলার কোটা অঞ্চলে), সরিষা (২৪ পরগনার ফলতা অঞ্চলে), সারদাপীঠ, বেলুড় (হাওড়া জিলার কাশমোলি অঞ্চলে)। নভেম্বরের মাঝামাঝি এগুলিরও বন্ধ হইবার সম্ভাবনা। বাঁকুড়া এবং রাম-হরিপুর কেন্দ্র হইতে রান্না-করা খাদ্য, চালডাল, দুধ, কাপড়চোপড় এবং কিছু গৃহনির্মাণের সামগ্রী অভাবগ্রস্তদের দেওয়া হইতেছে। মিশন এখন পুনর্বাসনকার্যে ব্রতী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিতেছেন। কিন্তু এই বিপুল প্রয়োজনের তুলনায় মিশনের সামর্থ্য খুবই সীমিত।

তামিলনাড়ুর উত্তর আর্কট জিলায় বানিয়াম্বাদিতে মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন বন্যা-ত্রাণকার্য করে। গত ৫ই অক্টোবর ১৯৭৮, মিশন নট্টরমপল্লীর রামকৃষ্ণ মঠের সহযোগিতায় ৭৫০টি পরিবারের ২৯৫৭ ব্যক্তিকে ৫০,০০০ টাকা মূল্যের চাল ডাল লবণ কাপড়চোপড় ও বাসনপত্র বিতরণ করে।

(খ) ঘূর্ণিবাত্যাত্রাণ : গত ২৮শে অক্টোবর তামিলনাড়ুর তিরুচি জিলার মানাপ্পারাই তালুকে মুবারাইপট্টিতে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পুরম' নামক নবনির্মিত ২য় গ্রামটির উদ্বোধন করা হয়। এখানে বন্যাপীড়িত হরিজনদের পুনর্বাসনের জন্য ৩০টি ঝড়-প্রতিরোধী গৃহ নির্মিত হইয়াছে। অন্ধ্রপ্রদেশে গৃহনির্মাণ-কার্য বেশ ভালভাবে অগ্রসর হইতেছে।

বাংলাদেশে : চারিটি কেন্দ্রের মাধ্যমে চিকিৎসা এবং দুটি কেন্দ্রের মাধ্যমে দুগ্ধবিতরণ অব্যাহত আছে।

কার্যবিবরণী

ত্রিবান্দ্রাম রামকৃষ্ণ আশ্রমের ১৯৭৬-৭৮-এর প্রকাশিত কার্যবিবরণীর সার-সংক্ষেপ

নিম্নে প্রদত্ত হইল :

সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক : আশ্রমে নিত্য পূজা, প্রতি বুধবার ও রবিবারে ধর্মীয় আলোচনা এবং মাসের ২য় শনিবারে আন্তর্ধর্মীয় সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। আশ্রমের বাহিরেও সাধুগণ আমন্ত্রণক্রমে ধর্মীয় আলোচনা ও বক্তৃতাদি করেন। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও তাঁহারা যোগদান করেন। প্রতি মালায়ালাম মাসের প্রথম দিনে শ্রীআয়েপ্পার ও সম্প্রদায় বিশেষ ভজনাদি করেন। প্রতি রবিবার প্রাতে শিশুদিগকে ভজন ও গীতা-পারায়ণে শিক্ষণ দেওয়া হয় এবং পুরাণ-কাহিনীর সহিত পরিচয় করানো হয়। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের বাৎসরিক জন্মোৎসব পালিত হয়।

১লা মে ১৯৭৮, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ স্বাস্থ্যমঙ্গলমের নবীকৃত পূজাগৃহ ও প্রার্থনাকক্ষটি উৎসর্গ করেন।

হাসপাতালের কার্যাবলী : হাসপাতালে নিম্নলিখিত সুযোগ-সুবিধা আছে :

১। ২৪০ শয্যাযুক্ত অন্তর্বিভাগ।
২। একটি বহির্বিভাগীয় পলিক্লিনিক।
৩। প্রসূতি- ও শিশু-কল্যাণ বিভাগ।
৪। ৩০টি শয্যাযুক্ত মানসিক রোগীদের চিকিৎসা বিভাগ।
৫। দুইটি পূর্ণ-সজ্জিত আধুনিক অস্ত্রোপচার বিভাগ।
৬। কর্ণ-নাসিকা-কণ্ঠ বিভাগ, দন্ত বিভাগ ও শিশুচিকিৎসা বিভাগ।
৭। দুইটি এক্স-রে যন্ত্র।
৮। ইলেক্‌ট্রো-কার্ডিয়োগ্রাফি ও ফিজিও-থেরাপি।
৯। ক্লিনিক্যাল ও বায়ো-কেমিক্যাল বীক্ষণাগার।
১০। ৫টি শয্যাযুক্ত একটি ইন্‌টেন্‌সিভ্‌ করোনারি কেয়ার ইউনিট।
১১। আকস্মিক দুর্ঘটনার চিকিৎসা বিভাগ।

অন্তর্বিভাগে	'৭৬-৭৭	'৭৭-৭৮
রোগীর সংখ্যা	৯,৬৮৯	৯,৩৫৭
প্রসব-সংখ্যা	১,৫৫৫	১,৪৭৯
অস্ত্রোপচার-সংখ্যা	৮০৬	১,৪৮১
বহির্বিভাগে		
রোগীর সংখ্যা	৬০,৭৯০	৬১,৬৬৭
এক্সরে সংখ্যা	১,৭০০	২,০৬৭
অন্যান্য পরীক্ষাদি	২,৩৫৩	৩,৬১৮
বীক্ষণাগারে পরীক্ষা	১৭,৬৪৯	২৪,২৬৬

পরিচর্যাবিদ্যার স্কুল : সাহায্যকারিণী সেবিকা ও ধাত্রীদের শিক্ষণের জন্য সরকারী অনুমোদন থাকায় ১৯৬২ সাল হইতে প্রতি বৎসর দুই বৎসরের শিক্ষাক্রমে ১৫টি শিক্ষার্থিনীকে ভর্তি করা হয়। ১৯৭৮ সালের জানুআরি হইতে সরকারের অনুমোদনে ১০টি শিক্ষার্থিনীকে লইয়া সাধারণ শুশ্রূষাবিদ্যা ও ধাত্রীবিদ্যার চার বৎসরের শিক্ষাক্রম চালু করা হয়।

বিগত তিন বৎসরে আশ্রমের সঞ্চিত ঘাটতির পরিমাণ ১,৪৫,১০১ টাকা। হাসপাতালটির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য প্রয়োজন ৮,২৫,০০০ টাকা। আশ্রম কর্তৃপক্ষ উক্ত ঘাটতি পূরণের জন্য এবং হাসপাতালের উন্নতিসাধনের জন্য সরকার ও সদাশয় জনসাধারণের নিকট অর্থসাহায্যের আবেদন জানাইয়াছেন।

বেলুড় মঠে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা গত ২১, ২২ ও ২৩শে আশ্বিন যথোচিত ভাবগম্ভীর

পরিবেশে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বন্যার জন্য খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করা হয় নাই। লোক-সমাগমও কম ছিল।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিম্নলিখিত ২৩টি শাখাকেন্দ্রেও প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়ঃ আসানসোল বালিয়াটি বরিশাল বোম্বাই কাঁথি ঢাকা গৌহাটি জলপাইগুড়ি জামশেদপুর জয়রামবাটী কামারপুকুর করিমগঞ্জ লখ্‌নৌ মালদহ মেদিনীপুর নারায়ণগঞ্জ পাটনা রহড়া শেলা (চেরাপুঞ্জি) শিলং শিলচর শ্রীহট্ট ও বারাণসী অদ্বৈত আশ্রম।

উৎসব

বাগেরহাট রামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৪ই ও ১৫ই আশ্বিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪৩তম শুভ জন্মোৎসব পালিত হয়। পূর্বাহ্ণে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, ভোগরাগ ও হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়। উভয় দিনই অপরাহ্ণে আশ্রম-প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ ও ভাবধারা অবলম্বনে আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা-সভায় উভয় দিনে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন বাংলা একাডেমীর (ঢাকা) মহাপরিচালক ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী সাহেব এবং আলোচনা-সভার প্রথম দিন বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন জনাব সেখ আব্দুল রহমান সাহেব, চেয়ারম্যান, বাগেরহাট পৌরসভা। প্রথম দিন স্বামী যোগদানন্দ এবং দ্বিতীয় দিন শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র পাণ্ডে সভাপতিত্ব করেন। আলোচনায়ে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দাস, শ্রীসুধাংশুশেখর হালদার এবং অধ্যাপক জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত। উৎসবের দ্বিতীয় দিনের আলোচনার প্রারম্ভে প্রধান অতিথি কর্তৃক আশ্রমের সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ 'অর্ঘ্য' সভায় উপস্থিত বিদগ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে বিতরিত হয়।

দেহত্যাগ

স্বামী ভয়হরানন্দ (মণীন্দ্র মহারাজ) গত ১৩ই অক্টোবর, ১৯৭৮, ৭৩ বৎসর বয়সে লখ্‌নৌ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে বৃক্কের ক্রিয়া ব্যাহত হওয়ায় দেহত্যাগ করেন। তিনি বহুমূত্ররোগে ভুগিতেছিলেন এবং তাঁহার মূত্রগ্রন্থির পীড়া চিকিৎসার অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল।

তিনি স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ১৯৩৯ সালে বারাণসী সেবাশ্রমে যোগদান করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি স্বীয় গুরুর নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা প্রাপ্ত হন। বারাণসী ব্যতীত তিনি বেলুড় বিদ্যামন্দির, সেবা প্রতিষ্ঠান, রহড়া ও লখ্‌নৌ কেন্দ্রের কর্মী ছিলেন। কিছুদিন তিনি গুরুর সেবাও করেন।

স্বামী ইষ্টানন্দ (রাখাল মহারাজ) গত ১৯শে অক্টোবর অপরাহ্ণ ৫-৩০ মিনিটে ৮৩ বৎসর বয়সে বেলুড় মঠে শ্বাসনালীর রোগে এবং হৃদ্‌যন্ত্র ও ফুসফুসের ক্রিয়া ব্যাহত হওয়ায় দেহত্যাগ করেন। ১৯৬৭ হইতে তিনি বেলুড় মঠে অবসরজীবন যাপন করিতেছিলেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯২৬ সালে তিনি কাঁথি আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৪৪ সালে স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা প্রাপ্ত হন। দুই দশক কাল তিনি মনসাদ্বীপ আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। সেখানে তিনি একটি হাই স্কুল গড়িয়া তোলেন।

বিবিধ সংবাদ

ভিত্তিস্থাপন

রাউরকেলা রামকৃষ্ণ সংঘ কর্তৃক ১৭.৯.৭৮-এ আয়োজিত এক জনসভায় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় বর্তমান জড়বিজ্ঞানের যুগে আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করেন। পর দিবস প্রাতে অগণিত নরনারীর উপস্থিতিতে তিনি উক্ত সংঘের নূতন জমিতে নূতন আশ্রমের ভিত্তিস্থাপন করেন। ১৪.৯.৭৮ হইতে ১৮.৯.৭৮ পর্যন্ত তিনি রাউরকেলা বিশ্রামাগারে (Rest House) অবস্থান করিয়া সমাগত ভক্তবৃন্দকে ধর্মোপদেশ দেন।

আগরতলা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম কর্তৃক ৮.১০.৭৮ হইতে দিবসত্রয় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে প্রায় একশত শিশুকে পোশাক এবং পশ্চিমবঙ্গে বন্যাত্রাণে রামকৃষ্ণ মিশনকে ১০০১ টাকা দেওয়া হয়।

বরাভয়লীলা-উৎসব

শ্যামপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মরণ সংঘ কর্তৃক ৩১.১০.৭৮ তারিখে কালীপূজার সন্ধ্যায় শ্যামপুকুর বাটীতে (এই বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ২ মাস ৯ দিন বাস করেন এবং ৬ই নভেম্বর ১৮৮৫ তারিখে কালীপূজার রাত্রে শ্রীশ্রীজগদম্বার আবেশে বরাভয়করা মূর্তি ধারণ করিয়া সমাধিমগ্ন হন।) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বরাভয়লীলা-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। স্বামী পুরুষানন্দের পৌরোহিত্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজাদি হয়। স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ প্রমুখ বহু সন্ন্যাসী এবং ভক্ত নরনারীগণ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিন অগণিত ভক্ত সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত উক্ত বাটীতে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন।

পরলোকে

তেজপুরের প্রবীণ নাগরিক এবং প্রখ্যাত জনপ্রিয় চিকিৎসক, শ্রীমা সারদাদেবীর দর্শনধন্য ডাঃ **দীনেশচন্দ্র রায়** গত ৯ই আশ্বিন ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তেজপুরে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার প্রচারক তিনি তেজপুর রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানে তিনি তাঁহার নিজস্ব পাঠাগারের সমস্ত গ্রন্থ দান করেন। তিনি প্রায় ষাট বৎসর 'উদ্বোধন' ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার গ্রাহক এবং স্থানীয় বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

গত ৩১শে অক্টোবর শ্রীশ্রীকালীপূজার দিন প্রাতে শুভলগ্নে শ্রীশ্রীমাকে তাঁহার নবসংস্কৃত বাসকক্ষে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে একটি অনাড়ম্বর ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী গত ৭ই অগস্ট হইতে যে কক্ষে সাময়িকভাবে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা পূজিত হইতেছিলেন, সেই কক্ষ হইতে

শ্রীশ্রীমায়ের পূজিত শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাচীন চিত্র বক্ষে ধারণ করিয়া লইয়া আসিয়া নবসংস্কৃত শ্রীশ্রীমায়ের কক্ষে পূজার বেদীতে স্থাপন করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অপর একটি প্রাচীন চিত্র বক্ষে ধারণ করিয়া আনেন সহ-সংঘাধ্যক্ষ স্বামী ভূতেশানন্দজী। অনুরূপভাবে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর চিত্র স্বামী গহনানন্দ, শ্রীশ্রীকালীমাতার চিত্র স্বামী বন্দনানন্দ, স্বামীজীর চিত্র স্বামী আত্মস্থানন্দ এবং সারদানন্দ মহারাজের চিত্র স্বামী গীতানন্দ নবসংস্কৃত কক্ষে আনয়ন করিয়া বেদীগুলিতে স্থাপন করেন। এই শুভ অনুষ্ঠানে সংঘের প্রাচীন সন্ন্যাসী স্বামী অভয়ানন্দজী, স্বামী নির্বাণানন্দজী ও স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দজী এবং স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী অনন্তানন্দ, স্বামী আত্মানন্দ, স্বামী অসক্তানন্দ প্রমুখ প্রায় বত্রিশ জন সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী এবং বহু ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। পূজ্যপাদ বীরেশ্বরানন্দজী প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের চরণে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করিবার পরে ঐদিন শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা ও হোম অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিপ্রহরে উপস্থিত ভক্তদের হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

রাত্রে প্রতিমায় শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা যথারীতি সমারোহে সুসম্পন্ন হয়।

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ গত ১০ই অগস্ট গীতা এবং ১৩ই অগস্ট কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। উভয় আলোচনার সারসংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

কথামৃত—

প্রথম দর্শনেই মাষ্টার মশায় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করেছেন। বিস্মিত হয়েছেন তাঁর ভাবতন্ময়তা দেখে। সন্ধ্যার অন্ধকারে কক্ষের মধ্যে একাকী দিব্য ভাবে বিভোর শ্রীরামকৃষ্ণের বিহ্বল মূর্তি দেখে প্রাণের আবেগে আকুল হয়ে আবার কবে তাঁর কাছে আসবেন এই চিন্তায় চঞ্চল হয়েছেন তিনি।

গিয়েছেন কয়েকদিন পরেই দক্ষিণেশ্বরে, এবারে সকাল বেলা। খুব সহজ স্বাভাবিক অবস্থা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের। পূর্ব দিনের সে ভাব-বিহ্বল রূপ নয়। কতো যেন আপনার, কতো পরিচিত জনের মতো আলাপ! প্রতিটি প্রশ্নেই এবং কথাবার্তায় কি বাস্তববুদ্ধির পরিচয়! দ্বিতীয় দর্শনেই মাষ্টার মশায়ের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত চিন্তাধারা শ্রীরাম-কৃষ্ণের স্বচ্ছ দৃষ্টির সামনে বার বার প্রতিহত হয়েছিল। তিনি জানলেন, সংসারী মানুষের নিজের সংসারের প্রতি উদাসীন হওয়া ধর্ম নয়, বরং সেটি যথাযথ প্রতিপালন করাই উচিত। তিনি বুঝলেন, জাগতিক লেখাপড়া শেখার নাম জ্ঞান নয়, ঈশ্বরকে জানার নামই জ্ঞান। তিনি বুঝলেন, ঈশ্বর অনন্তভাবময়, তিনি সাকার আবার তিনিই নিরাকার; তবে একটি ভাব অবলম্বনে সাধককে প্রথমে অগ্রসর হতে হয়। তাতে চিত্ত সহজে স্থির হয়, বিশ্বাস ও নির্ভরতা আসে। দুই নৌকায় পা দিয়ে এগোনো যায় না। ইষ্টে অব্যভিচারিণী ভক্তি একান্ত প্রয়োজন। তবে সাধনার চরম সীমায় উঠে দেখা যায় সবই এক—যিনিই সাকার, তিনিই নিরাকার।

ব্রাহ্মচিন্তাধারায় বিশ্বাসী মাষ্টার মশায় তাঁর আর একটি বিশ্বাসের মূলে নিদারুণ ধাক্কা খেলেন, যখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে শুনলেন, ঈশ্বরের চিন্ময়ী প্রতিমার কথা। সেই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মই রূপ পরিগ্রহ করেন। 'চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্যাশরীরিণঃ। সাধকা-

নাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।' মৃন্ময় আধারে সেই চিন্ময়েরই আহ্বান করা হয়। ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার এটিই মূল কথা।

আর এই প্রতিমাপূজার প্রয়োজন প্রবর্তকের কাছে অপরিহার্য। সাধনার প্রথম স্তরে মনকে সন্নিবিষ্ট করবার জন্য, কেন্দ্রীভূত করবার জন্য একটি প্রতীকের প্রয়োজন হয়। অধ্যাত্মরাজ্যে অধিকারিভেদে, বৌদ্ধিক ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে প্রতীকোপাসনার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন সুন্দর উদাহরণ দিয়ে। বলছেন, যার পেটে যা সয়, মা সেইরূপই খাবার বন্দোবস্ত করেন। রুচির বিভিন্নতাবশতঃ শরীর-মনের চাহিদার পার্থক্যবশতঃ ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই তাঁর নানান রূপকল্পনা। এটি বুঝতে পারলে সব দ্বন্দ্বের অবসান।

মাষ্টার মশায়েরও সমস্ত তর্কের অবসান এখানে। আধুনিক শিক্ষার অহংকার চূর্ণ হওয়ায় এখন তিনি পরিপূর্ণভাবে আত্ম-নিবেদনে উন্মুখ শ্রীরামকৃষ্ণচরণে—তাই এই পরিচ্ছেদের শুরুতেই তিনি বলেছেন :

'অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥'

কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে উভয় পক্ষের যুযুধান মহারথী আত্মীয়দের দেখে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের মনেও চাঞ্চল্য এসেছে, এসেছে কিছুটা ভীতিও—স্বজনবধ-ভীতি অথবা পরাজয়-ভীতি আর তারই ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েও তাঁর চিত্তে অবাঞ্ছিত অনীহা আত্মীয় বধ করতে। আর সেই মনোবৃত্তির সপক্ষে নানান যুক্তির অবতারণা তিনি করেছেন প্রথম অধ্যায়ে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরুতেও। কিন্তু তারই সঙ্গে শরণাগতির ভাবটিও আছে—'যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে। শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্' এই যে আত্মসমর্পণ, এই যে নির্ভরতা—এরই দ্বারা ভগবানের কৃপালাভ সম্ভব। সেই কৃপাতেই অর্জুনের আত্মজ্ঞানলাভ।

শরণাগত শিষ্যের এই 'ভাবের ঘরে চুরি' ভগবান ঠিক ধরে ফেলেছেন। তিনি তীব্র উপহাসের ভঙ্গীতে অর্জুনকে বলছেন, 'পণ্ডিতদের মতো বড় বড় কথা বলছ, কিন্তু তাঁদের তত্ত্বদৃষ্টি তো তোমাতে দেখছি না, তাঁরা কখনও জীবিত বা মৃত ব্যক্তির জন্য শোক করেন না।' এই যে তত্ত্বদৃষ্টি এটিই ভারতীয় দর্শনের মূল কথা। সেটি কি? না,—এই দৃশ্য জগৎ বিনাশশীল, কিন্তু এর অন্তরালে রয়েছেন এমন এক অবিনশ্বর বস্তু, যিনি জন্ম-মরণ-রহিত, যিনি পুরাতন হলেও চিরনূতন, যিনি চিরকাল আছেন ও থাকবেন, যিনি সর্বানুস্যূত, যিনি সর্বব্যাপী। ইনিই ব্রহ্ম —ইনিই আত্মা। এই তত্ত্ব যিনি জেনেছেন, তিনি আর জন্ম-ব্যাধি-মৃত্যুর বাঁধনে বাঁধা পড়েন না। তাঁর অজ্ঞান-আবরণ চিরকালের জন্য অপসারিত হয়।

জীবের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হয়ে, আত্মস্থ হয়ে, 'অভয়প্রতিষ্ঠ' হন তিনি, অমৃতত্ব লাভ করেন তিনি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই চরমতত্ত্বটি তাঁর পরম স্নেহাস্পদ অর্জুনকে উপলক্ষ্য ক'রে সমগ্র জগৎবাসীকে শুনিয়েছেন। ভয়কে জয় করবার, মৃত্যুর ঊর্ধ্বে ওঠবার পথের সন্ধান তিনি দিয়েছেন। ঔপনিষদিক যে আত্মতত্ত্ব সেইটিই এখানে পুনঃপ্রচারিত হয়েছে। এই দেহ ষড়্‌বিকারশীল, মৃত্যু এর অবশ্যম্ভাবী—চরম পরিণতি 'দেহান্তরপ্রাপ্তি'। যাঁদের তত্ত্বদৃষ্টি লাভ হয়েছে, তাঁরা এই দেহান্তরপ্রাপ্তিতে বিচলিত হন না। এর রহস্য তাঁদের আয়ত্তে এসেছে। এই কথাই আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোক পর্যন্ত পেয়েছি।

আমি কি আর উপদেশ দেব! ঠাকুরের কথা সব বইয়ে বেরিয়ে গেছে।
তাঁর একটা কথা ধারণা করে যদি চলতে পার তো সব হয়ে যাবে।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

বেদান্তের আলোকে খৃষ্টের শৈলোপদেশ—স্বামী প্রভবানন্দ। মূল্য সাধারণ ৪'০০

অতীতের স্মৃতি—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। পৃঃ ৪৬৪, মূল্য ১০'০০

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ১৪২, মূল্য ৩'৩০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। পাঁচশতাধিক সঙ্গীত। মূল্য ৬'০০

ঠাকুরের নরেন, নরেনের ঠাকুর—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ২৯, মূল্য ১'২০

সংস্কৃত

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত

১ম ভাগ পৃঃ ৪৫৪, মূল্য ১১'০০

২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ১১'০০

৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মূল্য ১১'০০

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত, স্বামী জগদানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪৯৫, মূল্য ৭'৮০

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৬'৪০

স্তবকুসুমাঞ্জলি—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪০৮, মূল্য ৭'০০

বৈরাগ্যশতকম্—স্বামী ধীরেশানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ১'৫০

নারদীয় ভক্তিসূত্র—স্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ১৬৩, মূল্য সাধারণ ৫'০০, শোভন ৭'৫০

বেদান্তদর্শন—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য : ১ম অধ্যায় (চারখণ্ডে) ১৭'০০, ২য় অঃ ১৩'০০; ৩য় অঃ ১৩'০০; ৪র্থ অঃ ৯'০০

গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা—স্বামী রঘুবরানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য ১'৮০

শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজাপদ্ধতি—পৃঃ ৬৪, মূল্য ১'৫০

অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—সুরেশ দত্ত। মূল্য ৫'৫০

পরমহংসদেব—স্বামী প্রেমেশানন্দ। পৃঃ ২৪, মূল্য ০'৭৫

জননী সারদাদেবী—স্বামী নির্বেদানন্দ। (অনুবাদক : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। মূল্য ২'৮০

শ্রীশ্রীমা সারদা—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৯০, মূল্য ২'০০

গল্পে বেদান্ত—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, মূল্য সাধারণ ৩'০০, বোর্ড বাঁধাই ৩'৫০

বীরবাণী—স্বামী বিবেকানন্দ। পৃঃ ১১৪, মূল্য ২'০০ (যন্ত্রস্থ)

বিবেকানন্দের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। পৃঃ ১৫৪, মূল্য ৩'৫০

প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩

৮০।৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত।

সম্পাদক—স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ : সংযুক্ত সম্পাদক—স্বামী ধ্যানানন্দ

উদ্বোধন



উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত

পৌষ ১৩৮৫

৮০তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়; ৮০তম বর্ষ হইতে **বার্ষিক মূল্য সডাক ৯২৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৭৲ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে ৬৩৲ টাকা, এয়ার মেল-এ ৯০৯৲ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ১.২০ টাকা। নমুনার জন্য ১.২০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সাত দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে; তাহার পরে চাহিলে পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হইবে না।

রচনা ঃ—ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা প্রবন্ধ ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহকনম্বর পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময়ঃ সকাল ৭।।০টা হইতে ১১টা : বিকাল ২।০টা হইতে ৫টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০০০৩

উদ্বোধন, পৌষ, ১৩৮৫

সূচীপত্র

উদ্বোধন, ৮১তম বর্ষ, ১৩৮৫-৮৬

নিবেদন

এই সংখ্যায় (পৌষ, ১৩৮৫) উদ্বোধন পত্রিকার ৮০তম বর্ষ শেষ হইল। আগামী মাঘ মাসে পত্রিকা ৮১তম বর্ষে পদার্পণ করিবে।

আমরা পূর্বে কার্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন জানাইয়াছিলাম যে, তাঁহারা যেন কার্তিক সংখ্যায় সংলগ্ন কার্ডখানি পূরণ করিয়া অবিলম্বে আমাদের জানান তাঁহারা কিভাবে—১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে টাকা পাঠাইয়া সাধারণভাবে যেমন পাইতেছেন সেভাবে, অথবা ভি. পি. পি.-তে পত্রিকা পাইতে চান।

অধিকাংশ গ্রাহকই ইতিমধ্যে টাকা পাঠাইয়াছেন বা জানাইয়া দিয়াছেন, কিভাবে তাঁহারা পত্রিকা লইবেন। অনিবার্য কারণে গ্রাহক থাকা সম্ভব হইবে না, ইহাও কেহ কেহ জানাইয়াছেন। কিন্তু অনেকেই এখনো কিছুই জানান নাই, বা টাকা পাঠান নাই; তাঁহাদের প্রতি নিবেদন, তাঁহারা যেন অবিলম্বে কার্তিক সংখ্যায় সংলগ্ন কার্ডখানিতে ২০ পয়সার ডাকটিকিট লাগাইয়া জানাইয়া দেন :—

১। তাঁহারা কি ভি. পি. পি.-তে পত্রিকা লইতে চান? [ভি. পি. পি.-তে পত্রিকা লইলে অনর্থক বেশী খরচ লাগে, ১২.০০ টাকার জায়গায় ১৫.৮০ টাকা খরচ পড়ে।]

২। অথবা, তাঁহারা কি শীঘ্রই টাকা পাঠাইতেছেন?

৩। অথবা, অনিবার্য কারণে তাঁহাদের পক্ষে গ্রাহক থাকা সম্ভব নয়?

দয়া করিয়া পত্রে জানাইতে বিলম্ব করিবেন না। তাঁহাদের নিকট হইতে কোনরূপ খবর না পাইলে তাঁহাদের নামে পত্রিকা পাঠানো হইবে না; কারণ ভি. পি. পি. ফেরত আসিলে আমাদের অযথা লোকসান হয়।

আশা করি সহৃদয় গ্রাহকগণ আমাদের অসুবিধা বুঝিবেন এবং যাঁহারা এখনো কিছুই জানান নাই, তাঁহারা অবিলম্বে তাঁহাদের ইচ্ছা পত্রে জানাইয়া দিবেন। সুদীর্ঘ ৮০ বৎসর ধরিয়া সকলের সহায়তা আমরা পাইয়া আসিয়াছি। আশা করি উহা অব্যাহত থাকিবে।

কার্যাধ্যক্ষ

উদ্বোধন কার্যালয়

১ পৌষ, ১৩৮৫ ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০০০৩



৮০তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা পৌষ, ১৩৮৫

দিব্য বাণী

স্মরিষ্যামো যথা তেঽম্ব সদৈব পদপঙ্কজম্ ।
তথা কুরু জগন্মাতর্ভক্তিং ত্বয্যপ্যচঞ্চলাম্ ॥
অপরাধসহস্রাণি মাতৈব সহতে সদা ।
ইতি জ্ঞাত্বা জগদ্‌যোনিং ন ভজন্তে কুতো জনাঃ ॥
ন বা তে গুণানামিয়ত্তাস্বরূপং
বয়ং দেবি জানীমহে বিশ্ববন্দ্যে ।
কৃপাপাত্রমিত্যেব মত্বা তথাস্মান্
ভয়েভ্যঃ সদা পাহি পাতুং সমর্থে ॥

—দেবীভাগবত, ৫।১৯।৩৭-৩৮, ৫।২২।৩১

বিশ্বজননি! এই করো মাগো, সদা যেন মোরা করি স্মরণ
তোমার চরণ-পঙ্কজ, আর অচলা ভক্তি করি বরণ।
শতসহস্র অপরাধ কত জননীই সদা করেন ক্ষমা
জেনেও মানুষ জানি না কিহেতু জগজ্জননী ভজে না তোমা।
বিশ্ববন্দ্যা হে দেবি! তোমার স্বরূপের আর গুণচয়ের
অবধি কোথায় জানি না আমরা (—কোথা সে-দৃষ্টি হায় মোদের!)
কৃপার পাত্র আমরা তোমার জেনে তুমি করো ভয়ের পার
রক্ষা করিতে তুমি সমর্থা (অভয়দায়িনী কে আছে আর!)।

কথাপ্রসঙ্গে

অভয়দায়িনী

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে :

> প্রথমশরীরী প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করিয়া দেখিলেন যে, তিনি একাকী। নিজেকে একাকী দেখিয়া তিনি ভীত হইলেন। এবং সেই কারণে আজও লোকে একাকী থাকিতে ভয় পায়। প্রজাপতি চিন্তা করিলেন, 'আমা হইতে ভিন্ন তো কেহই নাই; সুতরাং আমি ভীত হইতেছি কেন?' এইরূপ বিচারের ফলে তাঁহার ভয় দূর হইল। বস্তুতঃ কেনই বা তিনি ভীত হইবেন? 'দ্বিতীয়াৎ বৈ ভয়ং ভবতি'—দ্বিতীয় কেহ থাকিলেই তো ভয় হয়!

বৃহদারণ্যক উপনিষদের এই বিবৃতিটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, আমাদের আদি-পুরুষ প্রজাপতি কেবলমাত্র বিচারের দ্বারাই অভয়পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কেহ তাঁহাকে উপদেশ না করিলেও তিনি নিজেই শুধু বিচারের দ্বারা ঈশোপনিষদের সেই মহা-বাণী—'তত্র কো মোহঃ, কঃ শোকঃ, একত্বম্ অনুপশ্যতঃ' (একত্বদর্শীর মোহই বা কি আর শোকই বা কি?—অর্থাৎ তাঁহার মোহশোক-ভয়াদি কিছুই থাকে না) অপরোক্ষভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমরা আরও দেখি যে, আমাদের আদিপুরুষ নিজেকে একাকী দেখিয়া প্রথমে ভীত হইয়া-ছিলেন বলিয়াই আজও আমরা সঙ্গিহীন অবস্থায় ভীত হই।

ব্যতিক্রম যে একেবারেই নাই, তাহা নহে; কিন্তু ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষ যে, মানুষ একাকী থাকিতে ভয় পায়। তবে মোক্ষম কথা এই যে, প্রজাপতির ভীতি মুহূর্তেই দূর হইয়াছিল, একটু বিচারের দ্বারাই; কিন্তু আমাদের ভীতি শত বিচারেও দূর হয় না। অনুপদিষ্ট হইয়াও যে প্রজাপতি ভয়নির্মুক্ত হইয়াছিলেন, আচার্য শংকরের মতে তাহার কারণ এই যে, প্রজাপতি জন্মজন্মান্তরে অনেক পুণ্যকর্ম করেন, যাহার ফলে ধর্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ঐশ্বর্য প্রভৃতির প্রতিকূল সমস্ত পাপ দগ্ধ হওয়ায় তিনি বিশুদ্ধ-দেহেন্দ্রিয়যুক্ত হইয়া উৎকৃষ্ট প্রজাপতি-জন্ম লাভ করিতে সমর্থ হন।

আচার্য শংকর আরও বলেন যে, আমাদের জন্ম প্রজাপতির জন্মের ন্যায় উৎকৃষ্ট নয় বলিয়াই 'আচার্যবান্ পুরুষো বেদ' (আচার্যবান্ ব্যক্তিই জ্ঞান লাভ করেন), উপনিষদের এই উক্তি ও 'তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন সেবয়া/ উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ' (যে-বিধির দ্বারা জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা অবগত হও। প্রণিপাত, সশ্রদ্ধ জিজ্ঞাসা ও সেবার দ্বারা প্রসন্ন হইয়া তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমাকে জ্ঞানোপদেশ করিবেন)—গীতায় অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি এবং এইজাতীয় অসংখ্য উক্তি আমাদের ন্যায় অধিকারীর পক্ষে নিরর্থক নহে।

বস্তুতঃ গুরু ব্যতীত মানুষ সংসারসমুদ্রে কোনও কূলকিনারা পায় না, নিজেকে একান্ত অসহায় বলিয়াই মনে করে এবং সন্ত্রস্ত হয়। গুরুকে 'গোপ্তৃত্বে বরণ' করিয়াই—রক্ষাকর্তা হিসাবে গ্রহণ করিয়াই—মানুষ নির্ভয় হয়। অবশ্য ঠিক ঠিক নির্ভয়তা তখনই আসিতে

পারে, যখন সে গুরূপদিষ্ট সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়া অন্তে 'দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি', পূর্বোক্ত এই উপনিষদ্বাক্যটির তাৎপর্য অপরোক্ষভাবে উপলব্ধি করে। দ্বিতীয় কেহ না থাকিলেই আমরা ভয় পাই—ইহা যেমন বাস্তব সত্য, দ্বিতীয় কেহ থাকিলেই আমাদের ভয় হয়—ইহাও উপনিষদের উক্তি বলিয়াই নিঃসন্দেহে চরম সত্য। কিন্তু সেই চরম সত্য উপলব্ধি করিতে হইলে—সম্পূর্ণভাবে নির্ভয় হইতে হইলে—বাস্তব সত্যকে স্বীকার করিয়াই আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে, অর্থাৎ যেহেতু আমরা একাকী থাকিতে ভয় পাই, সেইহেতু আমাদের সংকল্প করিতে হইবে যে, আমরা একাকী থাকিব না, আচার্যবান্ হইব। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, 'জোড় লাগাতে চেষ্টা করো। দাবা-বড়ে খেলায় জোড়কে কেউ মারতে পারে না। তেমনি গুরু পেলে আর ভয় নেই।'

জ্ঞানমার্গের সাধক আচার্যের নিকট আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া মনন ও নিদিধ্যাসনের ফলে আত্মোপলব্ধি করিয়া নির্ভয় হন। 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন'—ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি কোন কিছু হইতেই ভীত হন না। ভক্তিমার্গের সাধক এবং শ্রীগুরু-নির্ধারিত ইষ্টকে অবলম্বন করিয়াই নির্ভয় হন। শ্রীগুরু ও ইষ্টের কৃপায় তিনি 'ভাবরাজ্যের চরম ভূমিতে আরোহণ করিয়া অদ্বৈতজ্ঞানে অবস্থানপূর্বক চিরশান্তির অধিকারী হন।' প্রকৃতপক্ষে গুরু ও ইষ্ট একই বস্তু। ইষ্টই গুরুরূপে আসেন এবং পরিশেষে গুরু ইষ্টে লয় পান। তখন সাধক ইষ্টকে লইয়াই থাকেন। ভাগবতে আছে, 'অন্তর্বহিঃ তনুভৃতাম্ অশুভং বিধুন্বন্, আচার্যচৈত্ত্য-বপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি'—শ্রীভগবান বাহিরে গুরুরূপে এবং অন্তরে অন্তর্যামিরূপে জীবগণের অশুভ দূরীভূত করিয়া স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করেন। 'কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে/গুরু-অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে'; 'গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে/গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করে ভক্তগণে' ইত্যাদি বাক্যও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

ইষ্ট সম্বন্ধে অতি হৃদয়গ্রাহী আলোচন আমরা পাই স্বামী বিবেকানন্দের 'ভক্তিযোগ' ও 'ভক্তিরহস্য'-এ। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে স্বামীজী বলিয়াছেন:

> সাধারণ গুরুশ্রেণী অপেক্ষা উন্নততর আর এক শ্রেণীর গুরু আছেন—ঈশ্বরের অবতারগণ। ইঁহারা সকল গুরুর গুরু, মানুষের ভিতর ভগবানের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। এই সকল নররূপধারী ঈশ্বর ব্যতীত ভগবানকে দেখিবার আমাদের আর কোন উপায় নাই। যে-সকল জাতির উপাস্য এইরূপ মানবদেহধারী ঈশ্বর, তাহারা ধন্য। খ্রীষ্টানদের পক্ষে খ্রীষ্ট এইরূপ মানবদেহধারী ঈশ্বর। ঈশ্বরকে সাক্ষাৎভাবে উপাসনা করা যাইতে পারে না; তিনি সর্বব্যাপী হইয়া সমগ্র জগতে বিরাজিত আছেন। মানবরূপে প্রকাশিত তাঁহার অবতারের নিকটই আমরা প্রার্থনা করিতে পারি।

স্বামীজী এখানে নরদেহধারী ঈশ্বরাবতারগণকেই ইষ্টরূপে গ্রহণ করিতে বলিতেছেন। অবশ্য ইহা সুবিদিত যে, লক্ষ্মী-নারায়ণ, হরগৌরী, দুর্গা ও কালী-তারা আদি দশমহাবিদ্যা, গণপতি, সূর্যনারায়ণ প্রভৃতিও আমাদের দেশে আবহমান কাল হইতেই ইষ্টরূপে সম্পূজিত। কিন্তু সেই সকল ক্ষেত্রেও

লক্ষণীয় যে, আমরা ইষ্টকে নররূপে বা নারীরূপেই ধ্যানাদি করিয়া থাকি। আসল কথা এই যে, আমরা আমাদের মানব-প্রকৃতির ঊর্ধ্বে উঠিতে পারি না। তাই মনে হয়, মর্তভূমিতে নরদেহে বা নারীদেহে অবতীর্ণ ভগবান বা ভগবতীকেই ইষ্টরূপে গ্রহণ করা আরও স্বাভাবিক এবং সহজসাধ্য, যদিও এ বিষয়ে বিভিন্ন মানুষের রুচি ও সংস্কারের বৈচিত্র্য আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। অস্বীকার করা দূরে থাকুক, আমরা সকলেরই রুচি ও সংস্কারকে যথোচিত মর্যাদা দিই, কারণ ইষ্টনির্বাচন প্রত্যেক সাধক-সাধিকারই একান্ত নিজস্ব ব্যাপার।

সে যাহাই হউক, স্বামীজীর উপরি-উক্ত কথার প্রমাণস্বরূপ আমরা দেখি যে, শ্রীরামচন্দ্র শ্রীচৈতন্যদেব এবং শ্রীসীতাদেবী শ্রীরাধিকা প্রভৃতি ইষ্টের আসনে সমাসীন। বর্তমান যুগেও দেখা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদাদেবী সহস্র সহস্র নরনারী কর্তৃক ইষ্টরূপে গৃহীত ও নিত্য-আরাধিত।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ভক্তিমার্গের সাধক ইষ্টকে অবলম্বন করিয়াই নির্ভয় হন। এখন আমরা দেখিব, শ্রীমা সারদাদেবীকে ইষ্টদেবীরূপে গ্রহণ করিয়া কিভাবে আমরা সহজে জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে দুর্বিপাকে জরা ব্যাধি এবং মৃত্যুতেও নিঃশঙ্ক হইতে পারি। এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের কয়েকটি অভয়বাণীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন:

'আমি রয়েছি, আমি মা থাকতে ভয় কি?'

'যারা আমার ছেলে, তাদের মুক্তি হয়ে আছে।'

'আমার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকো। আর এটা সর্বদা স্মরণ রেখো যে, তোমাদের পিছনে এমন একজন রয়েছেন, যিনি সময় আসলে তোমাদের সেই নিত্যধামে নিয়ে যাবেন।'

'বিধির সাধ্য নেই যে, আমার ছেলেদের রসাতলে ফেলে।'

'মা কখনও ভুলতে পারে? জেনো, আমি সব সময়ে তোমার কাছে আছি। কোন ভয় নেই।'

'ভয় কি? সর্বদা জানবে তোমাদের পিছনে একজন আছেন।'

'মনে ভাববে, আর কেউ না থাক, আমার একজন মা আছেন।'

বিভিন্ন সময়ে গৃহী ও সন্ন্যাসী সন্তানগণের উদ্দেশে এই অভয়বাণীগুলি উচ্চারিত হইয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই যে, শ্রীশ্রীমা তো তাঁহার জীবৎকালে তাঁহার নিজ শিষ্যগণকে লক্ষ্য করিয়াই কথাগুলি বলিয়াছিলেন, সুতরাং এগুলির দ্বারা আজ আমরা কিভাবে আশ্বস্ত হইতে পারি? ভক্ত-গায়কের ভাষায় মায়েরই একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর দিই:

'মোর আশীর্বাদ আর ভালবাসা
সকলেরই তরে আছে।
যারা আসে নাই, যাহারা আসিবে
আর যারা আসিয়াছে।
সব সন্তানে আমার এ কথা
জানিয়ে দিও মা এ শুভ বারতা।
আমিই ঘুচাব সকলের ব্যথা
আদরে আনিয়া কাছে॥'

কবিতায় বা বেহাগ-রাগে যাঁহাদের মন ভরিবে না, তাঁহাদের উদ্দেশে বলি, মায়ের অভয়বাণীগুলির সর্বজনীন ও সর্বকালীন মূল্য আছে, যেমন কুরুক্ষেত্র-সমরাঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণের

উপদেশসমূহ সখা ও শিষ্য অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া প্রদত্ত হইলেও বস্তুতঃ সেগুলি নির্দিষ্ট দেশ কাল বা পাত্রের দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান, তাহা বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাসদেব এবং শ্রীকৃষ্ণও নিজমুখেই বলিয়াছেন। শ্রীশ্রীমায়ের ক্ষেত্রেও উহা সমভাবে সত্য। সপ্তর্ষির 'প্রধান ঋষি' 'নররূপী নারায়ণ' স্বামী বিবেকানন্দ তথা অন্যান্য ঈশ্বরকোটি ও জীবন্মুক্ত পুরুষগণ শ্রীশ্রীমাকে সাক্ষাৎ জগদম্বা বলিয়া জানিয়াছিলেন এবং তাঁহার উক্ত স্বরূপ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমা নিজেও বিভিন্ন সময়ে তাঁহার জগন্মাতৃত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীশ্রীমা যখন কোন ভক্তকে বলিতেছেন, 'বৈকুণ্ঠ, আমায় ডাকিস্', তখন সে উপদেশ বা আদেশ কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্য নহে, সকলেরই জন্য। 'মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু/মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে' (তুমি আমাতেই মন রাখো, আমার ভক্ত হও, আমাকে পূজা করো, আমাকে নমস্কার করো; তুমি আমাকেই পাইবে। তুমি আমার প্রিয়, এইজন্য আমি এই সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি।) —গীতায় অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি এবং শ্রীশ্রীমায়ের ঐ উক্তির মধ্যে আমরা—অদ্বৈতবাদীরা—মূলতঃ কোন পার্থক্য দেখি না। বাহ্যতঃ পার্থক্য শুধু এই যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাহা বিস্তারিতভাবে বলিয়াছেন, জগন্মাতা শ্রীশ্রীসারদাদেবী তাহাই এক কথায় বলিয়াছেন, কারণ চির-লজ্জাশীলা শ্রীশ্রীমায়ের পক্ষে স্বাভাবিকভাবেই অত কথা বলা সম্ভব হয় নাই। ফলতঃ ভাবের দিক দিয়া উভয় উক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

অভয়দায়িনী শ্রীশ্রীমায়ের সমাসন্ন শুভ আবির্ভাবতিথি-স্মরণে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা জানাই, যতক্ষণ আমরা মনবুদ্ধির এলাকায় আছি ততক্ষণ, কখনও যেন একাকী না থাকি—'মা আছেন আর আমি আছি/ভাবনা কি আছে আমার', এই বুদ্ধি যেন অটুট থাকে। ধনে-জনে সমৃদ্ধ ও পরিবৃত হইয়াও মানুষ নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করে। জনশূন্য গিরি-অরণ্যে যেরূপ, জনবহুল নগরীতেও সেইরূপ নিজেকে একাকী মনে করে। মহর্ষি মনু বলিয়াছেন: 'একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে। একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেক এব চ দুষ্কৃতম্॥'—জীব একাকীই জন্মগ্রহণ করে, একাকীই নিজ শুভাশুভ কর্মের ফল ভোগ করে এবং একাকীই কালকবলিত হয়। মনুক্ত এই নিষ্ঠুর সত্যটি সম্ভবতঃ সকল মানুষই জীবনের কোন-না-কোন সময়ে মর্মে-মর্মে অনুভব করে এবং নৈরাশ্যে অবসাদগ্রস্ত হয়। কিন্তু যদি আমরা শ্রীশ্রীমায়ের অভয়বাণী স্মরণে রাখি, তাহা হইলে নৈরাশ্য আমাদের মনে স্থান পাইতে পারে না। তাই মায়ের নিকট আমাদের এই আকুতি যে, জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে, সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, জরা-ব্যাধি-মৃত্যুতে—সর্বাবস্থায় আমরা প্রত্যেকে যেন মনে রাখিতে পারি, 'আর কেউ না থাক, আমার একজন মা আছেন' এবং সাধনার চরম ভূমিতে মায়ের সহিত ঐকাত্ম্যের ফলে 'দ্বিতীয়াৎ বৈ ভয়ং ভবতি', উপনিষদের এই মহাবাণীর নিগূঢ় তাৎপর্য অপরোক্ষভাবে অনুধাবন করিয়া কৃতকৃত্য হইতে পারি।

শ্রীশ্রীমা

স্বামী ভূতেশানন্দ*

'জননীং সারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্গুরুম্।
পাদপদ্মে তয়োঃ শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ॥'

গত রবিবার (১লা জানুআরি, ১৯৭৮) শ্রীশ্রীঠাকুরের কল্পতরু-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি-উৎসবও উদ্‌যাপিত হয়েছে। ভক্তরা আনন্দ ক'রে বলছেন, 'এবার মা-ও কল্পতরু হয়েছেন। ঠাকুর কল্পতরু হন বছরে বছরে, এবার মা-ও হয়েছেন।'

আসল কথা এই যে, মা শুধু এবার নয়, বছরে বছরে নয়, দিনে দিনে কল্পতরু হয়েছিলেন, আছেন ও থাকবেন।

ঠাকুরের সম্বন্ধে তাঁর পার্ষদরা বলেছেন যে, তিনি তাঁর ভক্তদের বেছে বেছে নিতেন, কিন্তু মায়ের কাছে সকলেরই অবারিত দ্বার। আর বাস্তবিক সেটাই তো স্বাভাবিক। মায়ের কাছেও যদি ছেলের জন্য মাঝে মাঝে দরজা বন্ধ হয়, তাহলে সে মা-ই বা কেমন, আর সে ছেলেই বা যায় কোথায়! সুতরাং মায়ের কাছে ছেলের জন্য দ্বার সবসময়েই অবারিত। আর সেই দৃষ্টিতে দেখলে সত্যিসত্যি মা-ই কল্পতরু—শুধু বছরে একদিন নয়, বছরে ৩৬৫ দিন। এবং মায়ের আবির্ভাবের কাল থেকে আরম্ভ ক'রে যতদিন তাঁর ভক্তরা থাকবেন, ততদিন তাঁর এরকম কল্পতরু হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

প্রশ্ন হতে পারে—আচ্ছা, এতে ক'রে আমরা কি মাকে ঠাকুর থেকে আলাদা ক'রে ফেলছি? না—আলাদা নয়।

আমরা অনেক সময়ে দেবতাদের সম্পর্কে বলি 'অমুক দেবতার শক্তি'। শক্তিকে আমরা স্ত্রী-বাচক শব্দ দিয়ে বলি, যেমন ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী, শিবের শিবানী ইত্যাদি। এর দ্বারা কিন্তু ইন্দ্র আর ইন্দ্রাণী বা শিব আর শিবানী আলাদা হলেন না। যিনিই শিব, তিনিই শিবানী। ঠাকুর আরও পরিষ্কার ক'রে বলেছেন, অগ্নি আর তার দাহিকা-শক্তি। অগ্নি আর তার দাহিকা-শক্তি দুটি ভিন্ন বস্তু নয়। একই বস্তুকে আমরা দুটি ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করি—একটিকে বলি অগ্নি আর একটিকে বলি সেই অগ্নিরই দাহিকা-শক্তি। অর্থাৎ যে কাজের দ্বারা সেই শক্তির অনুমান হয়, তার একটা পৃথক্ নাম দিই। আসলে শক্তি আর শক্তিমান ভিন্ন নয়। এটি হচ্ছে সিদ্ধান্ত, বিশেষ ক'রে তন্ত্রশাস্ত্রের। তবে শক্তিকে মিথ্যা বলা হয় না, যেমন বেদান্তে বলা হয়েছে। বেদান্তে 'শক্তি' শব্দটির ওপর বেশী ক'রে জোর দেওয়া হয়নি, বলা হয়েছে 'মায়া', 'মায়াশক্তি'। বলা হয়েছে 'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে'—ইন্দ্র (পরমেশ্বর) মায়ার দ্বারা বহুরূপে প্রতিভাত হন। সেইরকম যে শক্তির দ্বারা ভগবান এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় করছেন, তাঁকে আমরা ভাগবতী শক্তি বলি। ঠাকুর বলতেন সেই শক্তি ভগবৎ-সত্তা থেকে পৃথক্ নন—ভগবান আর তাঁর ভাগবতী শক্তি অভিন্ন। সুতরাং আগে যে আমরা উল্লেখ করেছি

---

* রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ।

ঠাকুর ভক্তদের বেছে বেছে নিতেন, মায়ের কাছে সকল সন্তানেরই ছিল অবারিত দ্বার, মা-ই দিনে দিনে কল্পতরু ছিলেন, আছেন ও থাকবেন—এ সব কথার দ্বারা ঠাকুর ও মাকে আমরা আলাদা করছি না। সর্বদাই মনে রাখতে হবে, ঠাকুর ও মা অভিন্ন।

অন্য দিক থেকেও—তত্ত্বের দিক ছাড়াও তথ্যের দিক থেকেও—আমরা বিষয়টি আলোচনা করতে পারি। সীতাদেবীকে দর্শন ক'রে ঠাকুর বলেছিলেন—সীতা 'রামময়-জীবিতা'। তেমনি আমাদের শ্রীশ্রীমাও ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণময়জীবিতা —— 'রামকৃষ্ণগতপ্রাণা' 'তন্নামশ্রবণপ্রিয়া' 'তদ্‌ভাবরঞ্জিতাকারা'। সীতার শুধু শরীর পড়ে ছিল, তার ভেতর মন প্রাণ ছিল না, মন প্রাণ তিনি শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মে সমর্পণ করেছিলেন। শ্রীশ্রীমায়েরও মন প্রাণ শ্রীরামকৃষ্ণচরণে চির-সমর্পিত ছিল, তাই তিনি রামকৃষ্ণগতপ্রাণা, রামকৃষ্ণনাম-শ্রবণপ্রিয়া আর রামকৃষ্ণভাবরঞ্জিতাকারা অর্থাৎ রামকৃষ্ণের ভাবের দ্বারা তাঁর আকার রঞ্জিত —রামকৃষ্ণভাব শ্রীশ্রীমায়ে ওতপ্রোত।

রামকৃষ্ণভাবরঞ্জিতাকারা হতে আক্ষরিক ভাবেও তাঁকে দেখা গিয়েছে। একবার মা গভীর সমাধিস্থ হন। সমাধি আর ভাঙছে না দেখে যোগানন্দ-স্বামীকে খবর দেওয়া হ'ল। তিনি এসে এক বিশেষ নাম শোনাতে মায়ের সমাধিভঙ্গ হ'ল। ঠাকুর যেভাবে সমাধি থেকে নামবার সময়ে বলতেন, 'জল খাব, তামাক খাব', মা-ও ঠিক তেমনি ভাবে বললেন, 'খাব'। কিছু খাবার, জল আর পান তাঁর সামনে দেওয়া হলে, ঠাকুর ভাবাবেশে যেভাবে খেতেন, মা সেইভাবেই সেগুলি একটু একটু খেলেন। পানটি পর্যন্ত ঠাকুর যেভাবে সরু দিকটা কেটে ফেলে দিয়ে খেতেন, মা-ও ঠিক সেইভাবে খেলেন। তখন তাঁর ভাবভঙ্গি খাওয়া-দাওয়া সবই হুবহু ঠাকুরের মতো হয়েছিল। ঐ ভাবাবস্থার সময়ে যোগানন্দ-স্বামী মাকে কয়েকটি প্রশ্ন ক'রে ঠাকুর যে-রকম উত্তর দিতেন ঠিক সেইরকম উত্তর পেয়েছিলেন। ঠিক সেই ঠাকুরের ভাব। সম্পূর্ণরূপে 'তদ্‌ভাবরঞ্জিতাকারা'।

ঠাকুরের অসুখ। ডাক্তার বলেছেন, গেঁড়ি-গুগলির ঝোল খেতে হবে। ঠাকুর মাকে সেকথা বললেন। মায়ের কোমল প্রাণ। বললেন, 'এগুলো জ্যান্ত প্রাণী, ঘাটে দেখি চলে বেড়ায়। এদের মাথা ইঁট দিয়ে কি ক'রে ছেঁচবো?' ঠাকুর বললেন, 'আমি খাবো, আমার জন্যে করবে।' 'রামকৃষ্ণগতপ্রাণা' মা তখনই রোখ ক'রে ঐ কাজে প্রবৃত্ত হলেন। ঠাকুরের জন্য মা সব-কিছু করতে প্রস্তুত ছিলেন।

এমনকি যে সত্যনিষ্ঠা মায়ের প্রাণের জিনিস, ঠাকুরের জন্যে সেই সত্যনিষ্ঠাকেও মা বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হননি। একবার ঠাকুরের অসুখের সময়ে কবিরাজ ঠাকুরকে জল খেতে নিষেধ করেছিলেন। মা ঠাকুরকে দুধ খেতে দিতেন ঘন ক'রে জ্বাল দিয়ে। ঠাকুর যখন জিজ্ঞাসা করতেন. 'কত দুধ?', মা ঘন দুধের মাপটাই বলতেন। একদিন ঠাকুর গোলাপ-মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, দুধ কতটা হবে। গোলাপ-মা পাতলা দুধের পরিমাণটাই বলে দিলেন। ঠাকুর চমকে উঠে বললেন, 'এ্যাঁ, এত দুধ! তাই তো আমার পেটের অসুখ হয়। ডাক, ডাক।' মা আসতেই ঠাকুর দুধের পরিমাণ জানতে চাইলেন। মা আগের মতোই বললেন, 'পাচ পো হবে আর কি।' ঠাকুর বললেন, 'তবে যে গোলাপ বলে এত?' মা বললেন, 'গোলাপ জানে না। এখানের

মাপ গোলাপ জানে? ঘটিতে কত দুধ ধরবে গোলাপ জানবে কি ক'রে?' এর পরেও একদিন এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। ঠাকুর মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাটিতে কত ধরে? ক ছটাক, ক পো?' মা উত্তর দিলেন, 'ক ছটাক, ক পো অত জানিনে। দুধ খাবে, তা ক ছটাকের ঘটি, কত পো, অত কেন? অত হিসাব কে জানে!' ঠাকুরের জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নি। ঠাকুরের জন্য কী না করতে পারতেন তিনি!

এখন মায়ের জীবনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করছি। প্রথমতঃ তাঁর মাতৃভাব। বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

মায়ের কৃপাপ্রাপ্ত এক ব্যক্তি দুর্ভাগ্যবশতঃ বিপথগামী হন। তাঁর কুখ্যাতি ভক্তমহলে ছড়িয়ে পড়ে। তবু তিনি মায়ের কাছে মাঝে মাঝে আসতেন। এই নিয়ে ভক্তমহলে একটু গুঞ্জন সৃষ্টি হ'ল। তাঁরা চাইলেন, মা যেন তাঁর আসা বন্ধ ক'রে দেন। মায়ের কানে কথাটা পৌঁছল। মা বললেন, তা কেমন ক'রে হবে! মা হয়ে তাকে আসতে নিষেধ করবো কি ক'রে! অমন কথা আমার মুখ দিয়ে বেরুবে না। ছেলে যদি ধুলোকাদা মেখে আসে, মা কি তাকে ফেলে দিতে পারে! মা হিসেবে আমার কাজ তার ধুলোকাদা পরিষ্কার ক'রে তাকে কোলে তুলে নেওয়া। ধুলোকাদা যাই মাখুক না কেন, সে তো আমারই ছেলে!

জনৈক ভক্তের একটি প্রশ্নের উত্তরে মা বলেছিলেন, 'বাবা জান তো জগতের প্রত্যেকের ওপর ঠাকুরের মাতৃভাব ছিল? সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য আমাকে রেখে গেছেন।'

ঠাকুর সর্বভাবের সমন্বয়মূর্তি, সন্দেহ নেই; তবু তাঁর দেহ ছিল নরদেহ, নারীদেহ নয়। তাই যেন তিনি মাকে রেখে গেলেন মাতৃভাবের পরিপূর্ণ বিকাশ সর্বত্র সকলের যাতে হয়। এ গূঢ় তত্ত্ব মা নিজে বলেছেন, কিন্তু আমরা সবটা বুঝতে পারবো কিনা সন্দেহ। ঠাকুরের পার্ষদদের মধ্যেও সকলে একথাটি গোড়া থেকে বোঝেননি, অনেকে মাকে শ্রদ্ধা করতেন গুরুপত্নী হিসেবে। এবং সেই গুরুপত্নী হিসেবে শ্রদ্ধা মাকে একান্তভাবে উপলব্ধি করবার জন্য তাঁদের তখনই সাহায্য করেনি। ক্রমশঃ মাতৃস্নেহের আস্বাদ পেয়ে তাঁরা মাকে একটু একটু ক'রে বুঝেছেন। 'একটু একটু ক'রে' বলছি, কারণ মায়ের সাক্ষাৎ পরিচয় পাওয়া সে সময়ে বড় কঠিন ছিল। মা নিজেকে নিজে লুকিয়ে রাখতেন—লজ্জাপটাবৃতা। লজ্জারূপ বস্ত্রের দ্বারা নিজেকে আবৃত ক'রে রাখতেন। ঠাকুরের সন্তানদের মধ্যেও অনেকে মার সংস্পর্শে আসতে পারতেন না। মার কাছে কোন সমস্যার সমাধানের জন্য যখন তাঁরা আসতেন, মাঝে গোলাপ-মা বা যোগীন-মা কেউ-না-কেউ মাধ্যম থাকতেন। এঁরা মা কি উত্তর দিচ্ছেন, তা তাঁদের বলে দিতেন।

একবার এক ভক্ত মাকে বললেন যে, তাঁর যেন মনে হচ্ছে, তিনি যেমন ছিলেন তেমনি আছেন অর্থাৎ তিনি যে সাধনপথে এগোচ্ছেন তা বুঝতে পারছেন না। মা সাদা কথায় উত্তর দিলেন, 'বাবা তুমি যদি একটা খাটে ঘুমিয়ে থাক, আর কেউ যদি খাটসুদ্ধ তোমাকে এগিয়ে নিয়ে যায়, তাহলে তুমি কি টের পাও?'

বাস্তবিক, ঘুমন্ত শিশুকে কোলে ক'রে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া—এ মা ছাড়া আর কে পারবে! গুরু শিক্ষা দেন,

আচার্য শাস্ত্র পড়ান, নানা পন্থায় নানান লোকে সাধন-ভজন করছে। তবে সন্তানের অজ্ঞাতসারে তাকে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া—এ এক মার পক্ষেই সম্ভব।

এই মাকে আমরা কত ভাবেই না দেখছি। দেখছি আদর্শ কন্যারূপে, আদর্শ পত্নীরূপে এবং লৌকিক দৃষ্টিতে সন্তানের জননী না হয়েও আদর্শ জননীরূপে। বিশ্বজননীরূপে তিনি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সারদানন্দেরও মা আবার দস্যু আমজদেরও মা। মা নিজে বলেছেন, 'আমার শরৎ যেমন ছেলে, আমজদও তেমন ছেলে।'

মায়ের জননী যখন দুঃখ করেছিলেন যে, তাঁর কন্যার একটিও সন্তান হ'ল না, ঠাকুর তাঁকে আশ্বস্ত করেছিলেন এই ব'লে যে, তাঁর কন্যার এত সন্তান হবে যে, 'মা' 'মা' ডাকে কান ঝালাপালা হয়ে যাবে। সত্যিই 'মা' 'মা' ডাক আজ চারদিক থেকে উঠছে আর মা তাঁর অফুরন্ত স্নেহভাণ্ডার থেকে অবাধে সকলকে মাতৃস্নেহ বিতরণ করছেন।

সেই গল্পটি আমরা মনে করি। দক্ষিণেশ্বরে থাকার সময়ে মা রাত্রে নিজে হাতে ক'রে খাবার নিয়ে গিয়ে ঠাকুরকে খাওয়াতেন। একদিন তিনি খাবার নিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময়ে একটি মেয়ে এসে বললো, 'দিন মা, আমায় দিন।' মায়ের শুধু এই একটিবার ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হ'ত। মা মেয়েটির হাতে খাবার তুলে দিলেন। ঠাকুর কিন্তু খেতে পারলেন না। মায়ের দিকে চেয়ে বললেন, 'তুমি একি করলে? ওর হাতে দিলে কেন? আমি ওর ছোঁয়া খাই কি ক'রে?' মেয়েটির কোন দোষ ছিল, যার জন্য তার স্পৃষ্ট খাবার ঠাকুর খেতে পারছিলেন না। ঠাকুর মাকে বললেন, 'আর কোন দিন কারও হাতে খাবার দেবে না বলো।' মা তখন তাঁর মাতৃত্ব-ভাব প্রকাশ ক'রে বললেন, 'তা তো আমি পারবো না, ঠাকুর, তোমার খাবার আমি নিজেই নিয়ে আসবো; কিন্তু কেউ আমায় মা ব'লে চাইলে, আমি তো থাকতে পারবো না।' ঠাকুর কিন্তু বিরক্ত হলেন না, বুঝলেন যে, তিনি মায়ের ভেতর যে মাতৃত্বের বিকাশ ঘটাতে চেয়েছিলেন তাই ঘটেছে।

আর একটি ঘটনা। বালক-ভক্তেরা রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে সাধন-ভজন করতেন। মাকে ঠাকুর বলে দিয়েছেন, রাত্রে কাকে ক'খানা রুটি খেতে দিতে হবে। বাবুরামের জন্য বরাদ্দ চারখানা। ঠাকুর একদিন বাবুরামকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলেন যে, তিনি পাঁচ-ছ'-খানা রুটি খান, মা-ই তাঁকে বেশী খেতে দেন। ঠাকুর মায়ের কাছে অনুযোগ করলেন যে, মা স্নেহের বশবর্তিনী হয়ে বালকদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছেন। প্রতিবাদে মা বললেন, 'ও দুখানি রুটি বেশী খেয়েছে ব'লে তুমি অত ভাবছো কেন? ওদের ভবিষ্যৎ আমি দেখবো।' ঠাকুর কিন্তু বিরক্ত হলেন না। খুশীই হলেন, কেননা তিনি এইটাই চাইছিলেন। মা তাঁর সন্তানদের আধ্যাত্মিক জীবনের ভার নিন, এইটাই তো তাঁর কাম্য!

কাশীপুরে একদিন ঠাকুর মাকে বলেছিলেন, 'তুমি কি কিছু করবে না? এই (ঠাকুর স্বয়ং) সব করবে?' মা উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমি মেয়েমানুষ, আমি কী করতে পারি?' ঠাকুর তখনই বলেন, 'না, না, তোমায় অনেক কিছু করতে হবে?' ভাব হচ্ছে এই যে, ঠাকুরের দেহাবসানের পর তাঁর অসমাপ্ত কাজ জ্ঞানদাত্রীরূপে মা সারদা করবেন। তাই ঠাকুর নিশ্চিন্ত হয়ে স্থূলদেহ ত্যাগ করলেন, জানলেন যে, তাঁর আরব্ধ

কাজ অসমাপ্ত থাকবে না।

মায়ের সম্বন্ধে ঠাকুর বলেছিলেন, 'ও সরস্বতী জ্ঞানদায়িনী—জ্ঞান দিতে এসেছে।' এই জ্ঞান মাকে অর্জন করতে হয়নি, কেননা এ ছিল তাঁর একেবারে সহজাত। আর সেই সহজাত জ্ঞানের ভাণ্ডার সকলের জন্য উন্মুক্ত করবার নিখুঁত যন্ত্রে তাঁকে পরিণত করেছেন ঠাকুর স্বয়ং।

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর ঠাকুরের আদেশ সত্ত্বেও মা স্বামী যোগানন্দকে দীক্ষা দিতে অস্বীকৃত হচ্ছেন, তাঁর স্বভাবসুলভ সংকোচের জন্য। অবশেষে মা ঠাকুরের বিশেষ আদেশ বুঝে স্বামী যোগানন্দকে দীক্ষা দিয়েছেন। সে দীক্ষা দেওয়ার ধরন আবার কি রকম! মা বসেছেন, ঠাকুরের পূজো করছেন। পূজো করতে করতেই ভাবাবিষ্ট হয়েছেন আর সেই ভাবাবেশেই মন্ত্র দিয়েছেন।

তখনও ঠাকুরের শক্তি যেন তিনি নিজের ভেতরে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু তাঁর বিপরীত চেষ্টা সত্ত্বেও সে শক্তি যেন জোর ক'রে ফুটে বেরুচ্ছে। মায়ের অস্বীকার করা সত্ত্বেও ঠাকুর মাকে তাঁর পদবীতে বসাচ্ছেন। সেই মাকে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে, মলিন দৃষ্টি দিয়ে কতটুকু বুঝতে পারি! মা তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে যে অবহিত ছিলেন না, তা নয়। কিন্তু তখনও তিনি বুঝতে পারেননি বা বুঝতে চাননি যে, ঠাকুরের এই কাজ তাঁকেই করতে হবে। যে কাজের জন্য ঠাকুরের এই জগতে আসা, ঠাকুর স্বয়ং তাঁর শক্তিকে সেই কাজে ব্রতিনী করছেন, মা অস্বীকার করলে হবে!

স্বামীজীও তো ঠাকুরের এই লোকোদ্ধার-কার্য এককথায় মাথা পেতে নেননি। ঠাকুরের কথার প্রতিবাদ করেছেন, তর্ক করেছেন। কিন্তু উপায় নেই। ঠাকুরের হাতের যন্ত্র যে তিনি! কতবার তিনি আক্ষেপ ক'রে বলেছেন, 'কতবার আমি চেষ্টা করেছি, হিমালয়ের গুহায় সমাধিস্থ হয়ে থাকতে। কিন্তু মা-কালী আমাকে ঘাড়ে ধরে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন।'

বাস্তবিক ঠাকুরের শক্তি কতভাবে যে লীলা করছেন, তা বোঝার পূর্ণ সুযোগ এখনও আমাদের আসেনি। আমরা একটু একটু করে বুঝছি। স্বামীজীকে বুঝি তাঁর বিদ্বত্তা আর বাগ্মিতা দিয়ে, তাঁর গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি দিয়ে আর তাঁর নির্বিকল্প সমাধি দিয়ে, যা আধ্যাত্মিক জগতে এক অপূর্ব সৃষ্টি ব'লে আমরা মনে করি। কিন্তু তাঁর চেয়ে অনেক বেশী অপূর্ব আমাদের এই মা। মায়ের মধ্যে ঠাকুরের শক্তির কি অপূর্ব প্রকাশই না আমরা দেখি! আবার এই প্রকাশ এমন একটি যন্ত্রের মাধ্যমে, যা পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া থেকে ঠাকুরের চেয়ে আরো বেশী মুক্ত। ঠাকুর নিজে শাস্ত্রপাঠ না করলেও অনেক পণ্ডিতের মুখ থেকে শাস্ত্রালোচনা শুনেছেন। কিন্তু মা! মা তো গ্রামের মেয়ে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত। পাড়াগেঁয়ে মেয়ে লেখাপড়া বিশেষ কিছুই শিখলেন না, এমন কি—লেখার অভ্যাস না থাকায়—শেষ বয়সে নিজের নামটিও সই করতে পারতেন না। এ হেন মায়ের ভেতর থেকে যে এত অলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশ এত সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারে—এ আমরা ভাবতেই পারি না। কী তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, কী সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, গভীর অধ্যাত্ম তত্ত্বের ওপর কী সাবলীল অধিকার—ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

*

ক্রমশঃ আমরা তাঁকে ভক্তদের জননী ও সংঘজননীরূপে দেখতে পাই। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর তাঁর ত্যাগী সন্তানরা যখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছেন, তখন মা ঠাকুরের কাছে তাঁদের অন্ন আর আশ্রয়ের জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছেন। বলছেন যে, ঠাকুরের সন্তানরা যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে তাঁর ভাবকে ধ'রে রাখবে কে আর ঠাকুরের আসার সার্থকতাই বা কোথায়। মা বুঝেছিলেন যে, ঠাকুর এসেছিলেন শুধু দু-চার জনের জন্য নয়, তিনি এসেছিলেন সমগ্র জগতের জন্য এবং তাঁর কাজ জগতে প্রসারিত করার জন্য তাঁর সন্তানদের সংঘবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এইভাবে সংঘজননী সংঘের প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর প্রার্থনার দ্বারা।

তারপর যতদিন মা স্থূলদেহে ছিলেন, তাঁর সন্তানরা সংঘপরিচালনায় কোন সমস্যার সম্মুখীন হ'লে অবাধে মায়ের শরণাপন্ন হতেন। আর মা অতি সহজ সরলভাবে সমস্যার সমাধান ক'রে দিতেন। মনে রাখতে হবে তাঁর এই ত্যাগী সন্তানরা এক একজন দিগ্বিজয়ী। সেই দিগ্বিজয়ী সন্তানরাও যখন দিগ্‌ভ্রান্ত হতেন, তখন মায়ের কাছে এসে দিকের সন্ধান নিয়ে যেতেন। মায়ের কথা তাঁদের কাছে চরম কথা—শেষ সিদ্ধান্ত।

স্বামী শিবানন্দ তখন মঠের পরিচালক। একজন ব্রহ্মচারী কোন অন্যায় করায় সমবয়সীরা তাঁকে ভয় দেখালেন যে, শিবানন্দ মহারাজ তাঁকে মঠ থেকে চলে যেতে বলবেন। ব্রহ্মচারীটি ভয়ে সোজা জয়রামবাটীতে মায়ের কাছে গিয়ে হাজির! মায়ের কাছে ছেলের অপরাধ হয় না—সন্তানের দোষ ত্রুটি মায়ের চোখে বড় দেখায় না। মা লিখে পাঠালেন স্বামী শিবানন্দকে যে, ছেলেটি দোষ করেছে তাঁর (শিবানন্দ মহারাজের) কাছে, তবু তাঁর (মায়ের) ইচ্ছা যে, সে যেন আবার মঠে স্থান পায়। মায়ের চিঠি পেয়ে শিবানন্দ মহারাজ ব্রহ্মচারীটিকে মঠে পাঠিয়ে দিতে মাকে চিঠি দেন। পরে ব্রহ্মচারীটি মঠে এলে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে বললেন, 'ব্যাটা, তুই আমার নামে হাইকোর্টে নালিশ করতে গিয়েছিলি ?'

এইরকম এক-আধটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। অনেক ঘটনা আছে। স্বামী বিবেকানন্দ তখন বিশ্ববিখ্যাত। বেলুড় মঠে দুর্গাপূজার আয়োজন করেছেন। পূজার সর্বাঙ্গ অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত মনে ক'রে তিনি পশুবলির জন্যও প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু মা নিষেধ করায় বলিদান বন্ধ করা হয়। স্বামীজী প্রমুখ সকল সন্তানই মায়ের নির্দেশকেই চরম সিদ্ধান্ত ব'লে মেনে নিতেন।

স্বামীজী পাশ্চাত্য দেশে যাবেন, ঠিক করেছেন। এমনকি ঠাকুরের কাছ থেকে ইঙ্গিতও পেয়েছেন। কিন্তু মায়ের আদেশ না পেলে তো তিনি যাবেন না! তাই মায়ের আশীর্বাদ চেয়ে চিঠি লিখলেন। মায়ের অনুমতি পেলেন, তবে নিশ্চিন্ত হয়ে বিদেশযাত্রা করলেন।

ভক্তজননীরূপে মা- তাঁর সন্তানদের কি ভাবে গড়ে তুলেছিলেন, তা তাঁরাই জানেন, যাঁরা মায়ের সংস্পর্শে এসেছিলেন। ভক্তদের কতরকমের আবদারই না তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। একবার এক ভক্ত বললেন যে, মা না খাইয়ে দিলে তিনি খাবেন না। মা তো এত লজ্জাশীলা, তবু ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করলেন—নিজের হাতে তাঁকে খাইয়ে দিলেন। এই

রকমের ঘটনা আরো আছে।

এই মাতৃভাব যতই আলোচনা করা যাবে, ততই আমরা তার নিগূঢ় তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারবো, মায়ের অন্তরের পরিচয় আমরা গভীরভাবে পাবো। মা তো লৌকিক মা নন যে, কেবল আমাদের দেহের ভরণপোষণ করবেন। এ মা কেবল ইহ-জগতের মা নন, পরজগতেরও মা—চির-কল্যাণকারিণী মা। আমরা ঘুমিয়ে থাকলেও, মা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছে দেবেন, এ বিশ্বাস যদি থাকে, তাহলে সংসারসমুদ্রে আর আমাদের ভয় নেই।*

* ১লা জানুআরি ১৯৭৮, শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব-তিথি স্মরণে ৮ই জানুআরি ১৯৭৮, কাঁকুড়গাছি রামকৃষ্ণ যোগোদ্যানে আলোচনা। শ্রীমতী বাসন্তী মুখোপাধ্যায় ও শ্রীঅরুণকুমার মিত্র কর্তৃক (প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে) টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত। সংক্ষেপিত আকারে মুদ্রিত।—সঃ

শ্রীসারদাস্বরূপব্যাখ্যানম্

স্বামিনা হিরণ্ময়ানন্দেন কৃতম্

বর্ণিতা যা বাণীরূপেতি রামকৃষ্ণেন শাশ্বতী
স্বস্বরূপং যন্মুখাৎ কালিকেতি প্রকাশিতং
দুর্গা বগলামুখী চেতি বিবেকানন্দেন ঘোষিতা
সৈব জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াময়ী শ্রীসারদাদেবী স্বয়ম্।

যা দেবী শ্রীবিদ্যেতি আগমাদিষু সংজ্ঞিতা
ষোড়শীতি চ যা ভগবতা রামকৃষ্ণেন পূজিতা
রামকৃষ্ণলীলাপ্রসারণায় সর্বকল্যাণকরণায় চ
সা নারীরূপেণেহ মর্তভূমৌ আবির্ভূতা।

ষোড়শীবিদ্যায়াস্ত্রিকূটমন্ত্রমধ্যে যো বাগ্‌ভবকূটঃ
স দেব্যাঃ সরস্বত্যাঃ জ্ঞাপয়তি স্বরূপং কথিতং যচ্চ রামকৃষ্ণপাদৈঃ।
ত্রিকূটমধ্যে কামরাজকূট ইচ্ছাত্মকং বর্ণয়তি শ্রীকালিকায়াঃ স্বরূপম্
অথ শক্তিকূটেন ক্রিয়াত্মকং যৎ সূচিতং
তদেব দিব্যদৃষ্ট্যা দুর্গা বগলা চেতি
বিবেকানন্দপাদৈঃ কীর্তিতম্।

ভাবত্রয়বিগ্রহায়াঃ সারদায়াঃ একৈকভাবঃ প্রকটীকৃতো
বিভিন্নকালে ভগবতা রামকৃষ্ণেন, স্বয়ং সারদয়া,
বিবেকানন্দপাদেন চ।
অতঃ সৈব নিরতিশয়প্রকাশা মহাশক্তি র্দেবী সারদেতি।

যস্যাস্ত্রিপুরসুন্দর্যাঃ বিভিন্নরূপং মহালক্ষ্মীরিতি
মহাসরস্বতীতি মহাকালিকেতি চ
জগদুদ্ভব-পালন-লয়ান্ কুরুতে,
শ্যামা যস্যাঃ প্রধানামাত্যো বারাহী দণ্ডনায়িকা,
সা সর্বেশ্বরেশ্বরী সম্রাজ্ঞী ভুবনানাম্।
তস্যা অর্চাং বিধাতুং শ্যামাং মহাবিদ্যাং
প্রথমং পূজয়তঃ সিদ্ধৌ সত্যাং
জায়তে অধিকারস্ত্রিপুরসুন্দর্যাঃ পূজায়াম্।

যস্যা মহিমানং হরিহরাদিদেবতাঃ কদাপি নহি বক্তুমলং,
সা দেবী সারদা সকলভুবনানাং সর্বভূতাধিবাসা
সর্বদা মামবতু।

দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়

ডক্টর রমা চৌধুরী

(নবম পর্যায়)

শ্রীপতির 'বিশেষাদ্বৈতবাদ'

[পূর্বানুবৃত্তি]

পূর্ব সংখ্যায় শ্রীপতির 'মোক্ষবাদ' সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, তাঁর অভিনব মতানুসারে, যে-জীব বদ্ধাবস্থায় ব্রহ্ম থেকে চিরভিন্ন, সেই জীবই অকস্মাৎ তাঁর স্বরূপ পরিবর্তন ক'রে মোক্ষাবস্থায় ব্রহ্মের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপেই অভিন্ন হয়ে যান।

শ্রীপতির মতে মোক্ষকালে জীব ব্রহ্মের সঙ্গে পরিপূর্ণভাবেই এক ও অভিন্ন হয়ে গিয়ে একত্রে সারূপ্য-মুক্তি সাধর্ম্য-মুক্তি সালোক্য-মুক্তি সাযুজ্য-মুক্তি এবং সামীপ্য-মুক্তি লাভ করেন। শ্রীভগবানের নিত্যাশীর্বাদ-ধন্য মুক্ত জীব তারপরে প্রথমতঃ ব্রহ্মের 'রূপ' অথবা স্বরূপ লাভ করেন; ব্রহ্মের 'সাধর্ম্য' অথবা 'ধর্ম'ও লাভ করেন; তাঁর 'সালোক্য' বা লোকও লাভ করেন; এবং এইভাবে, ব্রহ্মের সঙ্গে সম-স্বরূপ, সমধর্ম, সমলোক মুক্তজীব, তাঁর 'সাযুজ্যে' ও 'সামীপ্যে', অর্থাৎ, তাঁর সঙ্গে যুক্ত

হয়ে এবং তাঁর অতি নিকটে এসে পরমানন্দে ব্রহ্মানন্দে চিরস্থিত থাকেন।

এরূপে, অন্যান্য বৈদান্তিকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে শ্রীপতিও বলেছেন যে, মোক্ষ কেবল 'দুঃখাভাব'রূপ নঙর্থক ('নেগেটিভ্') অবস্থামাত্রই নয়; সেই সঙ্গে, অনন্ত-অচিন্ত্য-আনন্দরস-ঘনরূপে একটি অপরূপ 'সদর্থক' ('পসিটিভ্') অবস্থাও সমভাবে।

রামানুজ-নিম্বার্কাদির ন্যায় অন্যান্য ত্রিতত্ত্ববাদী ও একেশ্বরবাদী (শঙ্করাদির ন্যায় একতত্ত্ববাদী নন) বৈদান্তিকের মতানুযায়ী শ্রীপতিও 'বিদেহ-মুক্তিবাদী'। অর্থাৎ, তাঁরও মতে এই জড়-মর জগতে এরূপ জড়-মরদেহেন্দ্রিয়াদি-বিশিষ্টরূপে বিদ্যমান জীব মুক্তির দিব্যালোক দিব্যামৃত দিব্যানন্দ লাভে ধন্যাতিধন্য হতে পারেন না; চরম-দেহপাতের পরেই অথবা চরম-মৃত্যুর পরেই বর্তমান জগৎ ও দেহেন্দ্রিয়াদির সঙ্গে সম্পর্ক শাশ্বতভাবে ছিন্ন হলেই—তার পরে, তার পূর্বে নয়, তিনি মোক্ষলাভে পূর্ণ হন।

তাঁর ১।১।২ সূত্র-ভাষ্যে শ্রীপতি অদ্বৈতবেদান্ত-মতানুযায়ী 'জীবন্মুক্তিবাদে'র তীব্র সমালোচনা করেছেন। এই মতানুযায়ী 'জীবন্মুক্ত' ব্যক্তি পার্থিবদেহধারী ও পার্থিবস্থাননিবাসী। কিন্তু এ ত অতি অসম্ভব কথা! কারণ, অদ্বৈতবেদান্তমতেই অবিদ্যা বা অজ্ঞানই হ'ল জীবের দেহেন্দ্রিয়-মন ও ক্ষুধা-তৃষ্ণাদির এবং তার আবাসস্থান এই পৃথিবীর একমাত্র কারণ। সেক্ষেত্রে, মোক্ষোদয়ে অজ্ঞান বা অবিদ্যা নেই; অথচ তার ফলস্বরূপ দেহেন্দ্রিয়-মন প্রভৃতি ও পৃথিবী প্রভৃতি থেকেই যাবে—তা কি ক'রে হয়? কারণ না থাকলে কার্য থাকে কি ক'রে?

অদ্বৈতবাদীরা এক্ষেত্রে, অবশ্য, 'দগ্ধপট-ন্যায়ে'র উদাহরণ গ্রহণ ক'রে পরিত্রাণ লাভের প্রচেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ, একটি বস্ত্রখণ্ড সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হয়ে গেলেও তার আকার কিছুক্ষণ বর্তমান থাকে। ঠিক তেমনি জীবন্মুক্তের অবিদ্যা সম্পূর্ণরূপেই দগ্ধ হয়ে গেলেও তাঁর অবিদ্যাজনিত শরীরাদি কিছুদিন বিদ্যমান থাকে।

এর উত্তরে শ্রীপতি বলেছেন যে, উপরের উদাহরণ অনুসারে দগ্ধপটের একটি বাইরের আকারমাত্রই অতি অল্পক্ষণ 'যেন তেন প্রকারেণ' বিদ্যমান থাকতে পারে। কিন্তু সেই দগ্ধপটটি ত নামেই 'পট'—প্রকৃত 'পট' ত তা মুহূর্তের জন্যও নয়—যেহেতু তা দিয়ে পটোচিত কোনো কার্যই ত সম্পাদিত হতে পারে না। যেমন, অন্যান্য বস্ত্রখণ্ডের ন্যায় তাকে পরিধান করা যায় না, তার দ্বারা শীতনিবারণ হয় না ইত্যাদি। একই ভাবে, মায়া-মরীচিকার জল দিয়েও ত পিপাসাশান্তি হতে পারে না নিমেষের জন্যও। সেজন্য, জীবন্মুক্তের দগ্ধপট-তুল্য এই বর্তমান শরীরাদির দ্বারাও সাধারণ শরীরাদিকৃত কার্যাদি হতে পারে না; তাদের মধ্যে সাধারণ শরীরাদির গুণ ও শক্তিও বিন্দুমাত্র থাকতে পারে না। কিন্তু জীবন্মুক্তের দেহেন্দ্রিয়-মন প্রভৃতি বদ্ধজীবের দেহেন্দ্রিয়-মন প্রভৃতির ন্যায়ই গুণ-শক্তিসম্পন্ন, বিকারাধীন, ক্ষুধা-তৃষ্ণাকাতর প্রভৃতি তা কি ক'রে সম্ভবপর হয়? সেজন্য অদ্বৈত-বেদান্তমতানুসারী জীবন্মুক্তিবাদ একটি সম্পূর্ণরূপেই অযৌক্তিক মতবাদ।

সাধন

রামানুজ-নিম্বার্কপ্রমুখ অন্যান্য ত্রিতত্ত্ববাদী ও একেশ্বরবাদী বৈদান্তিকের ন্যায় শ্রীপতিও ভক্তিবাদী, জ্ঞানবাদী নন। তা হ'লেও তাঁর

স্বভাবসিদ্ধ উদারতা ও দূরদর্শিতার বশে তিনি জ্ঞান ও কর্মকেও তাঁর সাধনতত্ত্বে যথেষ্ট গৌরবের স্থান দিয়েছেন সানন্দে।

অন্যান্য সকল দার্শনিক, ধর্মগুরু, নীতিতত্ত্ব-বিদ্, জ্ঞানি-গুণী ও ভক্ত-সাধকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে শ্রীপতিও উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, চিত্তশুদ্ধিই সকল সাধনার পূর্ববর্তী অত্যাবশ্যক শর্ত। অর্থাৎ মুমুক্ষু সাধক সুকঠিন সাধন-মার্গে অগ্রসর হবার পূর্বে দেখে নেবেন যে, তাঁর চিত্ত সত্যসত্যই শুদ্ধ আছে কি না; অর্থাৎ, তাঁর চিত্ত থেকে 'মলত্রয়' সম্পূর্ণরূপেই বিদূরিত হয়েছে কি না। এই 'মলত্রয়' হ'ল —আণব, মায়িক ও কর্ম।

'আণব' হ'ল দেহ ও আত্মার সম্পূর্ণ ভ্রান্ত একীকরণ; এবং তজ্জনিত স্বীয় স্বরূপগুণাদি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। যেমন, নিজেকে —স্বীয় অজর অমর ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাকে— দেহাদি থেকে অভিন্ন, অপূর্ণ অপবিত্র অসার্থক অমহান অসুখী প্রভৃতি মনে করার নাম 'আণব'।

সংসার-মায়ায় আবদ্ধ হবার নাম 'মায়িক'। এই মায়া আমাদের আত্মাকে এরূপ ভাবে আবৃত ক'রে রাখে যে, আত্মাকে না জেনে আমরা মূঢ়ের ন্যায় সংসার-সাগরে নিমজ্জিত হয়ে যাই; সংসার-অরণ্যে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ি; সংসার-কারাগারে আবদ্ধ হয়ে থাকি; সংসার-মরুভূমিতে দগ্ধ হয়ে উঠি— উদ্ধারের কোনো আশাই আর আমাদের থাকে না।

সকাম-কর্ম সম্পাদনের নাম 'কর্ম'। এরূপ সকাম-কর্মের জন্য 'কর্মবাদানুসারে' আমরা কিরূপে জন্মজন্মান্তরভাগী হয়ে অশেষদুঃখক্লেশ-গ্রস্ত হই এবং মোক্ষলাভে অসমর্থ হই, সে কথা বারংবার বলা হয়েছে।

প্রকারভেদে মলত্রয় হ'ল—কায়িক, মানসিক ও বাচিক মল। এগুলি সম্বন্ধে আমরা সকলেই জানি। অশুদ্ধ পানাহারাদি গ্রহণ 'কায়িক'; অপবিত্র ভাব ভাবনা প্রবৃত্তি প্রভৃতি পোষণ 'মানসিক'; অসত্য বাক্যাদি কথন প্রভৃতি 'বাচিক' মলের মূলীভূত কারণ।

এরূপ 'মলত্রয়' দূর করবার প্রথম উপায় হ'ল নিষ্কাম-কর্মসাধন। নিষ্কাম-কর্ম দ্বারা মলত্রয় বিনষ্ট হয়ে চিত্তশুদ্ধি সম্পাদিত হ'লে মুমুক্ষু ব্যক্তি সদ্‌গুরুর পদপ্রান্তে সাগ্রহে উপনীত হন এবং তাঁর দ্বারা 'শিবদীক্ষা'-লাভে পরম কৃতার্থ হন। তার পরেই তাঁর মনে উদয় হয় 'ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা'র অথবা ব্রহ্মকে জানবার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষার এবং শ্রীপতির মতে 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' (১।১।১) —এই প্রথম ব্রহ্মসূত্রের 'অথ' কথাটির অর্থ হ'ল এই: মলত্রয় ধ্বংসের পর চিত্তশুদ্ধি হ'লে শিব-দীক্ষা হতে পারে; এবং এরূপ শিবদীক্ষাই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পূর্ববর্তী কারণ।

এই প্রসঙ্গে সাম্প্রদায়িক দিক থেকে শ্রীপতি 'শৈবলাঞ্ছন' বা শিবলিঙ্গ ভস্ম ও রুদ্রাক্ষ ধারণের অত্যাবশ্যকতার বিষয়েও বিশেষ জোরের সঙ্গেই বলেছেন। 'শৈবলাঞ্ছনে'র অর্থ হ'ল শৈবজনোচিত বাইরের চিহ্ন প্রভৃতি। যাতে সকলে একজন 'শৈব'কে শৈব বলে এক নিমেষেই চিনতে পারে, সেজন্য এরূপ চিহ্নাদি অত্যাবশ্যক। কারণ, একজন 'শৈব' অতি সম্মাননীয় ব্যক্তি; এবং তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরবই হ'ল, তাঁর সমাজের শ্রেষ্ঠ পরিচয়ই হ'ল যে, তিনি একজন 'শৈব'। সেজন্যই, তাঁর এরূপভাবে আচারাচরণ করা অবশ্য কর্তব্য যে, যাতে তিনি তাঁর এই অশেষ মহিমময় 'শৈবত্ব' সর্বত্রই প্রকটিত করতে পারেন পূর্ণতম মহিমায় গরিমায় মধুরিমায়। সেই দিক থেকে এরূপ

'শৈবলাঞ্ছনে'র অথবা, বাহ্য-লিঙ্গধারণের প্রয়োজন সত্যই অত্যন্ত অধিক। এমন কি, সাম্প্রদায়িক দিক থেকে শ্রীপতি এ কথাও বলতে দ্বিধা করেন নি যে, বাহ্য-লিঙ্গধারণ সাক্ষাৎ মুক্তিরও কারণ। তা সত্ত্বেও সাংসারিক বাসনা-কামনা লোভ-মোহাদি যাতে এরূপ সুপবিত্র লিঙ্গধারণের হানি করতে না পারে, সেজন্য 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'র প্রয়োজনও সমধিক। বস্তুতঃ, শ্রীপতির মতে লিঙ্গধারণ এবং ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার মধ্যে কোনরূপ পরস্পরবিরোধ নেই। বরং উভয়ের সমাবেশে দ্বিগুণ শক্তি এবং তজ্জনিত দ্বিগুণ ফল লাভ হয়।

'উভয়বিধ-বলাৎ উভয়সিদ্ধিবৎ ন বিরোধঃ।' (১।১।১)

এরূপে, নিষ্কাম-কর্ম-সাধনই মলত্রয়-ধ্বংসের কারণ; মলত্রয়-ধ্বংসই চিত্তশুদ্ধির কারণ; এবং চিত্তশুদ্ধিই জ্ঞান ও উপাসনার কারণ। কারণ, মলিন দর্পণে যেরূপ পরম জ্যোতির্ময় সূর্যের প্রখর রশ্মিও প্রতিফলিত হতে পারে না, সেরূপ মলিন চিত্তেও জ্ঞান ও উপাসনার সুবর্ণ দ্যুতি প্রকটিত হতে পারে না কোনোক্রমেই।

সেজন্য, শ্রীপতি-বেদান্তে নিষ্কাম-কর্ম-মহিমা বারংবার উদ্‌ঘোষিত হয়েছে উদাত্ত কণ্ঠে মধুরতম সুর-তান-লয়ে।

'তস্মাৎ কাম্য-কর্ম- নিষেধ-পূর্বক-নিগমাগ-মোভয়-বেদান্তোচিত- বর্ণাশ্রমোচিত- নিখিল-কর্মানুষ্ঠান- সংপন্ন- চিত্তশুদ্ধি- লব্ধ- ষট্‌স্থল- পর-শিবোপাসনস্য পরশিব-ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তিঃ।'

(১।১।৪)

'অতএব, কাম্য-কর্ম নিষিদ্ধ ক'রে নিগম ও আগমরূপ উভয়প্রকার বেদোপনিষদে যে সকল কর্ম বিহিত হয়েছে এবং বর্ণাশ্রমোচিত যে সকল কর্ম, সে সবই সম্পন্ন করলে যে চিত্ত-শুদ্ধির উদয় হয় এবং তারই মাধ্যমে যে ষট্‌স্থল-পরমশিবের উপাসনা করা সম্ভব হয়, তারই দ্বারা পরমশিবরূপ-ব্রহ্মপ্রাপ্তিও সংঘটিত হয়।'

এস্থলে বলা হচ্ছে যে, কাম্য-কর্ম বা সকাম-কর্ম সম্পূর্ণরূপেই পরিত্যাগ ক'রে শাস্ত্রোচিত ও বর্ণাশ্রমধর্মোচিত সকল কর্ম সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে সম্পাদিত করলে তদ্দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। তারপরে সেই শুদ্ধচিত্ত দ্বারা পরমশিবের উপাসনা যথাযথভাবে করলে পরমশিবরূপ ব্রহ্মকে লাভ করা যায়।

১।৪।২২ সূত্র-ভাষ্যেও শ্রীপতি মোক্ষে কর্মের স্থান সম্বন্ধে বিশদ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে—'শ্রুতি-শতেষু ধ্যান-ধারণাদি-দ্বৈত-কর্মানুষ্ঠান-দ্বারা পরমাদ্বৈত-শিবত্ব-প্রাপ্তি-ফলদর্শনাৎ।' (১।৪।২২)

'শত শত শ্রুতিতে ধ্যান-ধারণাপ্রমুখ দ্বৈত-কর্মানুষ্ঠান দ্বারা যে পরমাদ্বৈত পরম শিব লাভ হয় —এ কথা বলা আছে।'

এই প্রসঙ্গে শ্রীপতি নিজেই একটি সম্ভাব্য আপত্তি উত্থাপন ক'রে নিজেই তা খণ্ডন করেছেন এই ভাবে (১।৪।২২):

যদি বলা হয় যে, দ্বৈত উপাসনাদি দ্বারা অদ্বৈত ব্রহ্ম লাভ হয়, তাহলে প্রশ্ন এই যে, সেক্ষেত্রে বেদোপনিষৎ-রূপ শাস্ত্রবিচার দ্বারা যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়, তার প্রয়োজনই বা কি?

এই পূর্বপক্ষীয় আপত্তির উত্তরে শ্রীপতি বলছেন যে, প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান-উপাসনাদিই মুক্তির সাক্ষাৎ সাধক, কর্ম নয়। তাহলেও 'স্থূলারুন্ধতী-ন্যায়' অথবা 'অরুন্ধতী-প্রদর্শন-ন্যায়' অনুসারে কর্মকেই, শাস্ত্রোপদিষ্ট বর্ণাশ্রমোচিত নিষ্কাম কর্মকেই প্রথমে মুক্তির সাধনরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। 'স্থূলারুন্ধতী-

ন্যায়' অথবা 'অরুন্ধতী-প্রদর্শন-ন্যায়ে'র অর্থ হল এই : প্রথানুসারে, বিবাহের পরে বর নববধূকে অরুন্ধতী নক্ষত্র দর্শন করান। কিন্তু অতি ক্ষুদ্র অরুন্ধতী নক্ষত্রকে প্রথমেই দর্শন করা সুকঠিন ব'লে বর প্রথমে নববধূকে নিকটস্থ অন্য একটি বৃহত্তর নক্ষত্র দেখান এবং পরে এইভাবে নববধূর চক্ষু নক্ষত্র দর্শনে অভ্যস্ত হ'লে বর তাঁকে প্রকৃত অতি ক্ষুদ্র অরুন্ধতী নক্ষত্রটিকে দর্শন করান।

এই 'স্থূলারুন্ধতী-ন্যায়'টি 'শাখা-চন্দ্র-ন্যায়ে'র সমতুল। এক্ষেত্রেও মাতা শিশুকে আকাশস্থ চন্দ্রটিকে দর্শন করাতে ইচ্ছুক। কিন্তু হঠাৎ সেই অতি দূরস্থ, অজ্ঞাত চন্দ্রটি দর্শন করা শিশুর পক্ষে কষ্টকর ব'লে স্নেহময়ী মাতা প্রথমে পুত্রকে অতি নিকটস্থ এবং জ্ঞাত বৃক্ষশাখা দেখান এবং তার পরে তাকে প্রকৃত চন্দ্রটিকে দেখান হয়।

এক্ষেত্রেও প্রথমে সহজবোধ্য কর্মকে মুক্তির উপায়রূপে নির্দেশ ক'রে পরে জ্ঞান-ধ্যানপ্রমুখ প্রকৃত সাধনের নির্দেশ দেওয়া হয়। বস্তুতঃ, এরূপ সাময়িক নির্দেশও সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত বা অসম্ভব নয়, যেহেতু, পূর্বেই যা বলা হ'ল —নিষ্কাম কর্ম দ্বারাই মলত্রয় বিদূরিত হতে পারে। সেজন্য, নিষ্কাম-কর্মানুষ্ঠান না করলে, চিত্তমল বিদূরিত হবে না ; চিত্তমল বিদূরিত না হলে জ্ঞান-ধ্যানের স্ফুরণ হবে না ; এবং এরূপ স্ফুরণ না হলে, মোক্ষলাভও হবে না।

সেইদিক থেকে, নিষ্কাম কর্ম মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধন না হলেও, পরম্পরাগত সাধন অতি নিশ্চয়ই, যার অভাবে সাক্ষাৎ সাধনেরও অভাব ঘটবে নিঃসন্দেহে।

সমন্বয়বাদী উদারহৃদয় স্থিরপ্রজ্ঞাসম্পন্ন শ্রীপতি নিষ্কাম কর্মের পরে জ্ঞানের অত্যাবশ্যকতার কথাও বারংবার বিশেষ জোরের সঙ্গেই বলেছেন।

যেমন ১।১।৩ সূত্রভাষ্যে তিনি সুস্পষ্ট ভাবেই বলেছেন :

'শ্রবণ-মনন-বিশিষ্ট-জ্ঞানানুগত-নিদিধ্যাসনং ষট্স্থলপরম-শিব-সাক্ষাৎকারে তাদাত্ম্যে পরমকারণং নির্দিশ্যতে।' (১।১।৩)

'শ্রবণ-মনন-বিশিষ্ট, জ্ঞানরূপ নিদিধ্যাসনকেই ষট্স্থল-পরম-শিবের সাক্ষাৎকার, এবং তাঁর সঙ্গে অভিন্নতার পরমকারণরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।' (১।১।৩)

কিন্তু ভক্তিবাদী শ্রীপতি এই সঙ্গে এ কথাও সমান জোরের সঙ্গে বারংবার বলতে ভোলেন নি যে, পরিশেষে নিষ্কাম কর্ম ত নয়ই, এমন কি, জ্ঞানও মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ নয়—সেই দুরূহ কারণ হ'ল 'ধ্যান', একমাত্র ধ্যান।

অবশ্য এ কথা পূর্ণ সত্য যে, যা পূর্বেই বলা হয়েছে, জ্ঞান ও ধ্যানের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই একেবারেই। হয়ত অনেকেই মনে করতে পারেন যে, জ্ঞান ও ধ্যান কেবল পরস্পরবিভিন্ন নয়, সেই সঙ্গে পরস্পর-বিরুদ্ধও সমভাবে—যেহেতু জ্ঞান হ'ল জীব ও ঈশ্বরের অভিন্নতামূলক ; ভক্তি ঠিক তার বিপরীত, অর্থাৎ ভক্তি দ্বৈতমূলক—উপাস্য-উপাসকের মধ্যে শাশ্বত ভেদমূলক। কিন্তু শ্রীপতি তা সত্ত্বেও বলেছেন যে, জ্ঞান ও ধ্যান পরস্পরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, যেহেতু জ্ঞানের শেষ ধ্যান, ধ্যানের আরম্ভ জ্ঞান—অর্থাৎ, ধ্যান জ্ঞানমূলক। যেমন তিনি বলছেন :

'ভেদাভেদ-বিধায়ক-বেদান্ত-বাক্যানাং সর্ব-জগদুদ্ভবকারণ-ষট্স্থল-পরশিব-ব্রহ্মপরত্বং, তদুপাসনাৎ ব্রহ্মসিদ্ধিরিতি।' (১।১।৩)

'ভেদাভেদ-বিধায়ক বেদান্তবাক্যসমূহ সমগ্র

জগতের উভয়কারণ (নিমিত্ত ও উপাদান কারণ), ষট্‌স্থল পরমশিবরূপী ব্রহ্মবিষয়ক; এবং এরূপ ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারাই ব্রহ্মলাভ হয়।' (১।১।৩)

'ব্রহ্মণঃ পৃথগ্‌ভূতস্য জীবস্য তদুপাসনাদ্বারা তদাত্মকত্বদর্শনাৎ।' (১।৪।২২)

'ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন জীব, তাঁর উপাসনা দ্বারাই তাঁর সঙ্গে অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়।'

(১।৪।২২)

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মের সমসত্য ও সমনিত্য দুটি রূপ—অমূর্ত ও মূর্ত। সেই অনুসারে, ব্রহ্মোপাসনাও দ্বিবিধ—অমূর্তো-পাসনা ও মূর্তোপাসনা। শ্রীপতি ৪।৪।৭-১২ সূত্রভাষ্যে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন।

শ্রীপতির মতে যাঁরা অমূর্তোপাসনা করেন, তাঁরা ব্রহ্মের চিন্ময় রূপ প্রাপ্ত হয়ে সাক্ষাৎ-ভাবে ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নতালাভে ধন্যাতিধন্য হন। কিন্তু যাঁরা কেবল মূর্তোপাসনায় রত থাকেন, তাঁরা সাক্ষাৎভাবে ব্রহ্মকে লাভ ক'রে তাঁর সঙ্গে অভিন্নতা প্রাপ্ত হন না। তাঁরা প্রথমে কেবল সত্যসংকল্পত্ব লাভ ক'রে নিরতিশয় আনন্দভাগী হন। অর্থাৎ তাঁরা ছান্দোগ্যোপনিষদে (৮।৭।১) বর্ণিত পরমাত্মার আটটি গুণ প্রাপ্ত হয়ে তাঁরই ন্যায় 'অপহত-পাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽ-পিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ' হন। অর্থাৎ তাঁরা পরমাত্মারই ন্যায় পাপরহিত জরারহিত মৃত্যুরহিত শোকরহিত ক্ষুধারহিত তৃষ্ণারহিত সত্যকাম ও সত্যসংকল্প হন—তাঁদের সমস্ত কামনাই সত্য হয় বা পূর্ণ হয়, তাঁদের সমস্ত সংকল্পও সত্য হয় বা সার্থক হয়। অতএব তাঁদের আনন্দেরও সীমা-পরিসীমা থাকে না। তাহলেও প্রারম্ভেই তাঁরা ব্রহ্ম হন না, ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নতা প্রাপ্ত হন না। পরে অবশ্য সাবয়ব-ব্রহ্মোপাসকগণ সর্বসুখ ভোগ ক'রে নিরবয়ব-ব্রহ্ম লাভ করেন:

'এতেন সাবয়ব-ব্রহ্মোপাসকানাং বিদুষাং সর্বকামাবাপ্তিদ্বারা নিরবয়ব-ব্রহ্মপ্রাপকত্বং সূচিতম্‌।' (৪।৪।১৩)

'এর থেকে এ কথাই সূচিত হচ্ছে যে, সাবয়ব-ব্রহ্মোপাসক জ্ঞানিগণ সমস্ত কামনা পূর্ণ ক'রে নিরবয়ব-ব্রহ্মপ্রাপক হন।' (৪।৪।১৩)

'শিবভক্তানামীশ্বর- নিরবয়ব- প্রাপ্তানাং বিগতরূপত্বং, মূর্তপরশিব-স্বরূপোপাসকানাং বিশ্বরূপ-শব্দেন বহুরূপত্বং চ দর্শিতম্‌।' (৪।৪।২২)

'শিবভক্ত, যাঁরা নিরবয়ব ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হন, তাঁরাও "বিগতরূপ" বা "নিরবয়ব" হন। যাঁরা সাবয়ব-শিব-স্বরূপোপাসক, তাঁরাও বিশ্বরূপ বা বহুরূপ প্রাপ্ত হন।' (৪।৪।২২)

এই দু'প্রকারের ভক্ত, সাধক বা উপাসকের মধ্যে এরূপ প্রভেদ থাকলেও তাঁরা উভয়ে একদিক থেকে সমতুল। অর্থাৎ উভয়েই সংসারচক্র থেকে চিরতরে মুক্তি লাভ করেন।

' "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" ইত্যত্র মূর্তোঽমূর্তোভয়-বিধোপাসক-ভক্তপরত্বমিতি নিশ্চীয়তে।'

(৪।৪।২২)

' "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"—"প্রত্যাবর্তন নেই—শাস্ত্রবাক্যানুসারে" (৪।৪।২২), এই সূত্রটি মূর্ত ও অমূর্ত উভয়বিধ উপাসক ও ভক্তের ক্ষেত্রেই যে প্রযোজ্য, তা সুনিশ্চিত।'

(৪।৪।২২)

শ্রীপতির মতে প্রকারভেদে উপাসনা ত্রিবিধ:

'উপাসনানি ত্রিবিধানি: অহংগ্রহোপাস-নানি, প্রতীকোপাসনানি, অঙ্গাববদ্ধো-পাসনানি চ।' (৪।১।৩)

'উপাসনা ত্রিবিধঃ অহংগ্রহোপাসনা, প্রতীকোপাসনা এবং অঙ্গাববদ্ধোপাসনা।'

(৪।১।৩)

জীব ও ব্রহ্মের অভেদোপাসনার নাম 'অহংগ্রহোপাসনা'।

প্রস্তরনির্মিত বিগ্রহাদি জড়পদার্থকে এবং নাম প্রভৃতিকে ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনার নাম 'প্রতীকোপাসনা'।

উদ্গীথাদি ও যজ্ঞাদিকে ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনার নাম 'অঙ্গাববদ্ধোপাসনা'।

শ্রীপতির মতে প্রথমটিই কেবল সাক্ষাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির হেতু, অন্য দুটি নয়।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—যাঁরা সৌধে আরোহণ করতে চান, তাঁদের উচ্চ থেকে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করতেই হয়। একই ভাবে, যাঁরা অল্পবুদ্ধি ও অল্পশক্তি, তাঁদের আরম্ভ করতে হয় প্রতীকোপাসনাদির ন্যায় নিম্নতর উপাসনার দ্বারা; এবং এই ভাবে, ক্রমশঃ উচ্চতম 'অহংগ্রহোপাসনা' তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর হয়।

সুন্দর উপমা দিয়ে শ্রীপতি বলছেন:

'লোকে ভৃত্যাদিষু প্রভুভাবনয়া সম্মানাদিকস্য প্রভুকটাক্ষহেতুত্বম্। রাজ্ঞি ভৃত্যভাবস্য দণ্ডনহেতুত্বং দৃষ্টম্।' (৪।১।৪)

'পৃথিবীতে দেখা যায় যে, প্রভুর অনুগ্রহ হ'লে ভৃত্যকেও রাজা ব'লে গ্রহণ ক'রে সম্মান করা যায় (সাময়িক ভাবে)। কিন্তু রাজাকে ভৃত্য ব'লে গ্রহণ করলে (মুহূর্তের জন্যও), তা দণ্ডার্হ হয়।' (৪।১।৪)

এরূপে প্রতীককে সাময়িকভাবে ব্রহ্ম ব'লে গ্রহণ করা চলে; কিন্তু ব্রহ্মকে প্রতীক ব'লে নয়।

অন্যান্য একেশ্বরবাদী ও ত্রিতত্ত্ববাদী বৈদান্তিকের ন্যায় শ্রীপতিও ঈশ্বরানুগ্রহকেই মুক্তির পরম ও চরম সাধক ব'লে গ্রহণ করেছেন:

'পরশিবানুগ্রহেণ প্রধ্বস্ত-পাশ-পটলা প্রাত্যক্ষিক-নিরতিশয়ানন্দস্বরূপা, তৎসমানগুণসারা কৈবল্যলক্ষ্মী-প্রাপ্তিরেব মুক্তিঃ।'

(১।৩।৪)

'পরমশিবের অনুগ্রহের মাধ্যমে সকল-পাশ-বিধ্বস্তা প্রত্যক্ষীভূত-নিরতিশয়-আনন্দ-স্বরূপা শিবতুল্যগুণসম্পন্না কৈবল্যলক্ষ্মী-প্রাপ্তিই মুক্তি।' (১।৩।৪)

আমরা দেখেছি যে শ্রীপতি ষট্স্থল-শিবের বারংবার উল্লেখ করেছেন বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে। সেই অনুসারে সাধনাবলীর দিক থেকেও ছয়টি বিশেষ সাধনের তিনি উল্লেখ করেছেন—শ্রবণ মনন জ্ঞান নিধি ধ্যান ও আসন। এই ষট্স্থল ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে একটি অচ্ছেদ্য মিলনসূত্র রচনা করে।

আমরা উপরে দেখেছি যে, স্বভাবসুলভ ঔদার্যের সঙ্গে শ্রীপতি ধ্যানকেই পরম ও চরম সাধনরূপে শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করলেও নিষ্কাম কর্ম ও জ্ঞানের অত্যাবশ্যকতার বিষয়ও তিনি বারংবার বিশেষ জোরের সঙ্গেই বলেছেন। এমন কি, তাঁর নিজের মতবাদের সার্বজনীনত্ব প্রমাণের জন্য, তিনি একস্থলে উৎসাহের প্রাবল্যে 'জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদে'র কথাও যেন বলে ফেলেছেন, যদিও আমরা জানি যে, তাঁর মতবাদ প্রকৃতকল্পে 'জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ' একেবারেই নয়।

শ্রুতিষু জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়োপপত্তিনির্দেশাচ্চ ভেদাভেদশ্রুতীনাং সর্বাসামবিরোধেন ব্রহ্মণি উপপত্তির্যুক্তা।' (৩।২।৩৪)

'শ্রুতিসমূহে জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ নির্দিষ্ট হয়েছে; সেজন্য—সমস্ত ভেদাভেদবাক্যই অবিরুদ্ধভাবে ব্রহ্মকেই নির্দেশ করে।' (৩।২।৩৪)

অন্ত একস্থলে তিনি সগৌরবে ঘোষণা করছেন যে, একমাত্র তাঁর মতবাদেই জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম সমান কেন্দ্রীভূত স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে। (১।৪।২২)

তিনি এস্থলে বলছেন যে, অদ্বৈতবেদান্তে জ্ঞান-ভক্তি-কর্মাদির উল্লেখ থাকলেও মিথ্যা ঈশ্বরে কারই বা ভক্তি-প্রীতি-শ্রদ্ধা-বিশ্বাস হবে?

[ক্রমশঃ]

বিবেকানন্দ-সাহিত্যে হাস্যরস

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

[চৈত্র ১৩৮৪ সংখ্যার পর]

বিবেকানন্দ-সাহিত্যে হাস্যরসের নিদর্শন-রূপে 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বই দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য'-গ্রন্থে এ বই দুটি সম্বন্ধে আলোচনাকালে এ বিষয়ে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। আলোচ্য প্রবন্ধে আর একটু বিশদভাবে আমরা এ দুটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তির হাস্যরসের দিকটি অনুধাবন করবো।

'পরিব্রাজক' ভ্রমণকাহিনী, রম্যরচনা এবং পত্রসাহিত্য—এই তিনদিক থেকেই হাস্যরসের বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ভ্রমণকাহিনী হিসাবে এ গ্রন্থের আদ্যন্ত স্বামীজীর বুদ্ধিসমুজ্জ্বল দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর সমুদ্রযাত্রা থেকে আরম্ভ করে দেশ-দেশান্তর পরিভ্রমণে নিত্য নব নব কৌতুক অন্বেষণরত। ভ্রমণকাহিনীর তথ্যকেন্দ্রিকতা পরিহার করে স্বামীজী তাঁর দূরবিস্তৃত জীবনানুভব নিয়ে যখন পাঠকমনের একান্ত অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন, তখন এ গ্রন্থে রম্যরচনার স্বাদ। আর 'উদ্বোধন' সম্পাদককে এবং বেলুড় মঠের অন্যান্য গুরুভাইদের উদ্দেশে নানা সময়ের কিস্তিতে লেখা 'পত্র' হিসাবেই এ ভ্রমণকাহিনী ধীরে ধীরে পূর্ণরূপ লাভ করেছে। এ দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র' এবং 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী' উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ এ রচনা-গুলিতে চিঠিপত্রের মেজাজই বজায় রেখেছেন। পরবর্তী কালে এগুলি গ্রন্থাকারে দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে 'পরিব্রাজক' পত্রসাহিত্য থেকে ধীরে ধীরে ভ্রমণসাহিত্যের পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করেছে, যদিচ গ্রন্থের পরি-সমাপ্তি তাঁর আকস্মিক ভ্রমণ-পরিসমাপ্তির মতোই অসম্পূর্ণ। কিন্তু এ অপূর্ণতা মূল গ্রন্থের ভ্রমণরসকে ব্যাহত করে নি।

ভ্রমণকাহিনীতে সাধারণতঃ ভ্রমণকারীই নায়ক। কচিৎ কখনো লেখককে অতিক্রম করে কোনো ব্যক্তি বা বিশেষ পরিবেশ হয়তো প্রাধান্য লাভ করে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভ্রমণকারীর ব্যক্তিত্বই তাঁর ভ্রমণকাহিনীকে গড়ে তোলে। স্বামীজীর আনন্দময় সতীর্থ-বৎসল চরিত্রটি তাই 'পরিব্রাজকে'র প্রথম পঙ্‌ক্তি থেকেই দেখা দিয়েছে। 'নমো নারায়ণায়' বলে সম্বোধন শেষ করে স্বামীজী লেখা পাঠাতে দেরী হওয়ার কারণ ব্যাখ্যায় লিখছেন,—"আজ সাত দিন হ'ল আমাদের জাহাজ চলেছে, রোজই তোমায় কি হচ্চে, না হচ্চে, খবরটা লিখবো মনে করি, খাতা পত্র কাগজ কলমও যথেষ্ট দিয়েছ, কিন্তু—ঐ

বাঙালী 'কিন্তু' বড়ই গোল বাধায়। একের নম্বর—কুড়েমি। ডায়েরি, না কি তোমরা বলো, রোজ লিখবো মনে করি, তারপর নানা কাজে সেটা অনন্ত 'কাল' নামক সময়েতেই থাকে; এক পা-ও এগুতে পারে না। দুয়ের নম্বর—তারিখ প্রভৃতি মনেই থাকে না। সেগুলো সব তোমরা নিজগুণে পূর্ণ ক'রে নিও। আর যদি বিশেষ দয়া কর তো, মনে ক'রো যে, মহাবীরের মতো বার তিথি মাস মনে থাকতেই পারে না—রাম হৃদয়ে ব'লে।"[১]

স্মিতহাস্যে গৌরবান্বিত এই অংশটুকুর মধ্যে দার্শনিক ও ভক্ত সন্ন্যাসীর পরিচয়টি কতো অল্প কথায় পাঠকচিত্তকে সমুদ্ভাসিত করে, সেকথা ভেবে দেখার মতো। কাল থেকে অনন্ত কাল এবং কালাকালের বিচার থেকে কালাতীত ভক্ত মহাবীরের আদর্শ—এই মানসপ্রয়াণটুকু বিদগ্ধ হাস্যরসের সৃজনকৌশলে স্বামীজীর হাস্যরসসিদ্ধির সূচনা করেছে মাত্র। তারপর সমস্ত গ্রন্থটি জুড়ে স্বামীজী তাঁর এই বিশেষ ভঙ্গীটি সমান নৈপুণ্যে বজায় রেখেছেন। এ যে কত বড়ো গুণপনা—তা যাঁরা জাত-লেখক তাঁরাই কিছুটা অনুধাবন করতে পারবেন।

জাহাজে চড়ে সমুদ্র পার হওয়ার সঙ্গে স্বামীজী হনুমানের সমুদ্রলঙ্ঘনের তুলনা তাঁর চিঠিপত্রেও করেছেন। তবে 'পরিব্রাজকে'র সূচনা-অনুচ্ছেদে এ উপমাটিকে ভক্তিরসে, বাস্তববর্ণনায় এবং হাস্যরসের বিচিত্র মিশ্রণে যে রূপটি দিয়েছেন, সাহিত্যসৃষ্টির বিচারে সে উপমায় গভীরতম রসদৃষ্টি পাঠকচিত্তকে আত্মীয়োপম আন্তরিকতায় ভরে দেয়।

মহাবীরের উল্লেখপ্রসঙ্গে উপমাটি শুরু হচ্ছে এই ভাবে—"'ক সূর্যপ্রভবো বংশঃ'—থুড়ি, হ'ল না 'ক সূর্যপ্রভববংশচূড়ামণিরামৈকশরণো বানরেন্দ্রঃ' আর কোথা আমি দীন অতি দীন।" মহাবীরের আদর্শে বীরভক্ত স্বামীজীর এই ভক্তিজনিত দৈন্যবোধের নম্রতা যেমন পাঠককে মুগ্ধ করে, তেমনি পরমুহূর্তেই মহাবীরের সমুদ্র-লঙ্ঘনের সঙ্গে এযুগে স্বামীজীর সমুদ্র-লঙ্ঘনের বাস্তব পার্থক্যটুকু লক্ষণীয়—"তবে তিনি শতযোজন সমুদ্র পার এক লাফে হয়েছিলেন, আর আমরা কাঠের বাড়ীর মধ্যে বদ্ধ হয়ে ওছল-পাছল ক'রে খোঁটাখুটি ধ'রে চলৎশক্তি বজায় রেখে, সমুদ্র পার হচ্চি।" তারপরেই উপমাটি রামায়ণের বিষয়বস্তু অবলম্বনে কৌতুকরসের বিচিত্রকল্পনার জগতে যাত্রা করেছে—"একটা বাহাদুরি আছে—তিনি লঙ্কায় পৌঁছে রাক্ষস-রাক্ষুসীর চাঁদমুখ দেখেছিলেন, আর আমরা রাক্ষস-রাক্ষুসীর দলের সঙ্গে যাচ্চি।" রাক্ষস-রাক্ষুসী এক্ষেত্রে জাহাজের শ্বেতাঙ্গ সহযাত্রীদল!

রাক্ষস-রাক্ষুসী উপমাটির আর একটি সূত্র—"খাবার সময় সে শত ছোরার চকচকানি আর শত কাঁটার ঠকঠকানি দেখে তু-ভায়ার তো আক্কেল গুড়ুম। ভায়া থেকে থেকে সিঁটকে ওঠেন, পাছে পার্শ্ববর্তী রাঙাচুলো বিড়ালাক্ষ ভুলক্রমে ঘ্যাঁচ করে ছুরিখানা তাঁরই গায়ে বা বসায়—ভায়া একটু নধরও আছেন কিনা।"

সহযাত্রী সতীর্থ স্বামী তুরীয়ানন্দজীকে

---

১ "হনুমানকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আজ কি তিথি, হনুমান বলেছিল—'আমি তিথি নক্ষত্র জানি না, কেবল এক রাম চিন্তা করি।'"—শ্রীরামকৃষ্ণ। (কথামৃত, ৩য় ভাগ, ২২শে অক্টোবর, ১৮৮২ তারিখের দিনলিপি।)

নিয়ে এই রঙ্গরসটুকু স্বামীজীর আনন্দময় ব্যক্তিত্বকে পাঠকচিত্তের একান্ত কাছাকাছি এনে দেয়। সমগ্র বর্ণনাটির মূলে রাক্ষসদের মাংসপ্রীতি বিশেষ করে 'নরমাংস'প্রীতির ইঙ্গিত।

সমুদ্রলঙ্ঘনের উপমা এর পরে জাহাজে-চড়ার আনুষঙ্গিক সমুদ্রপীড়াকে নিয়ে দেখা দিয়েছে—"বলি হ্যাঁগা, সমুদ্র পার হ'তে হনুমানের সী-সিকনেস্[২] হয়েছিল কিনা, সে বিষয় পুঁথিতে কিছু পেয়েছ? তোমরা পোড়ো-পণ্ডিত মানুষ, বাল্মীকি-আল্মীকি কত জান; আমাদের 'গোঁসাইজী' তো কিছুই বলছেন না। বোধ হয়—হয় নি; তবে ঐ যে, কার মুখে প্রবেশ করেছিলেন, সেইখানটায় একটু সন্দেহ হয়। তু-ভায়া বলছেন, জাহাজের গোড়াটা যখন হুস্ করে স্বর্গের দিকে উঠে ইন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করে, আবার তৎক্ষণাৎ ভুস্ করে পাতালমুখো হয়ে বলিরাজাকে বেঁধবার চেষ্টা করে, সেই সময়টা তাঁরও বোধ হয় যেন কার মহা বিকট বিস্তৃত মুখের মধ্যে প্রবেশ করছেন।" রামায়ণের সিংহিকা-রাক্ষসীর কাহিনীটিকে অবলম্বন করে সমুদ্র-পীড়ার এই অভিনব ব্যাখ্যাটির কৌতুককল্পনা ও পুরাণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাদানের রসিকতাটুকু একই সঙ্গে পরম উপভোগ্য। সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্বামীজীর বুদ্ধিদীপ্ত ভাষা-ভঙ্গী—যে ভাষা আর কারো দ্বারা অনুকৃত হওয়া অসম্ভব।

হাস্যরসের অন্যতম উপাদান খেয়ালী কল্পনা। সুকুমার রায় তাঁর 'আবোল তাবোল'কে বলেছেন খেয়ালরসের কাব্য। স্বামীজীর রচনায় মাঝে মাঝে এ-জাতীয় খেয়ালীকল্পনা দেখা দিয়ে তাঁর হাস্যরসকে আরও বৈচিত্র্যমণ্ডিত করে তুলেছে। সী-সিকনেসের ব্যাখ্যাটি কিছুটা ঐ-জাতীয়। এ বইয়ের হাঙ্গর শিকারের বর্ণনায় এ-জাতীয় কল্পনার আর এক নিদর্শন।

বাচনভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য হাস্যরসকে কীভাবে ফুটিয়ে তোলে তার উদাহরণরূপে স্বামীজীর দুটি বাক্যে দুটি হিন্দী বাক্‌পদ্ধতির প্রয়োগ দ্রষ্টব্য: "মাফ্ ফরমাইয়ে ভাই—ভালা লোককে কাজের ভার দিয়েছ। রাম কহো! কোথায় তোমায় সাতদিন সমুদ্রযাত্রার বর্ণনা দেবো, তাতে কত রঙচঙ মসলা বার্নিশ থাকবে, কত কাব্যরস ইত্যাদি, আর কিনা আবল-তাবল বকছি!" পরিব্রাজক-জীবনে স্বামীজীর পশ্চিম-ভারত-পরিক্রমা তাঁর এই ভাষাভঙ্গীকে প্রভাবিত করেছে নিশ্চয়। তবে সাধারণভাবে স্বামীজীর বাংলা গদ্যে হিন্দী ও উর্দু শব্দের সুপ্রয়োগ ও সুরসিকপ্রয়োগ দুইই লক্ষণীয়।

ভ্রমণবৃত্তান্ত যাঁরা লেখেন, তাঁদের একদল অবশ্য যা চাক্ষুষ দেখেছেন, তাই নিয়েই লিখে থাকেন। কিন্তু আর একদল ভ্রমণসাহিত্য-প্রণেতা আছেন, যাঁরা কোথাও না গিয়ে শুদ্ধ-মাত্র কল্পনা থেকেই বই লিখে থাকেন। স্বামীজী এ-জাতীয় একজন ভ্রমণবিশারদ লেখকের কাল্পনিক নাম দিয়েছেন 'শ্যামা-চরণ'। এই শ্যামাচরণকে উপলক্ষ্য করে স্বামীজীর ব্যঙ্গ ও আনন্দদৃষ্টির (হিউমারের) মিলিত সৃষ্টি—"কাঁহা কাশী, কাঁহা কাশ্মীর, কাঁহা খোরাশান গুজরাত' আজন্ম ঘুরছি। কত পাহাড়, নদ, নদী, গিরি, নির্ঝর, উপত্যকা, অধিত্যকা, চিরনীহারমণ্ডিত

২ Sea-sickness (   )

মেঘমেখলিত পর্বতশিখর, উত্তুঙ্গতরঙ্গভঙ্গ-কল্লোলশালী কত বারিনিধি দেখলুম, শুনলুম, ডিঙুলুম, পার হলুম। কিন্তু কেরাঞ্চি ও ট্রামঘড়ঘড়ায়িত ধূলিধূসরিত কলকাতার বড় রাস্তার ধারে—কিংবা পানের পিক-বিচিত্রিত গ্যালে, টিকটিকি-ইঁদুর-ছুঁচো-মুখরিত একতলা ঘরের মধ্যে দিনের বেলায় প্রদীপ জ্বেলে আঁব-কাঠের তক্তায় ব'সে, থেলো হুঁকো টানতে টানতে কবি শ্যামাচরণ হিমাচল, সমুদ্র, প্রান্তর, মরুভূমি প্রভৃতি যে—হুবহু ছবিগুলি—চিত্রিত ক'রে বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন, সে দিকে লক্ষ্য করাই আমাদের দুরাশা।"

এর পরে শ্যামাচরণের ভ্রমণসীমা উল্লেখ করে স্বামীজী কাল্পনিক ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখকদের ওপর মোক্ষম এক হাত নিয়েছেন—"শ্যামাচরণ ছেলেবেলায় পশ্চিমে বেড়াতে গিয়েছিলেন, সেথায় আকণ্ঠ আহার ক'রে এক ঘটি জল খেলেই বস্—সব হজম, আবার খিদে, সেখানে শ্যামাচরণের প্রাতিভদৃষ্টি এই সকল প্রাকৃতিক বিরাট ও সুন্দর ভাব উপলব্ধি করেছে। তবে একটু গোল যে, ঐ পশ্চিম—বর্ধমান পর্যন্ত নাকি শুনতে পাই।"

ভাষাভঙ্গীর দিক থেকে স্বামীজীর শব্দ-নির্বাচন ও নব নব শব্দ-সংযোজন এ রচনার হাস্যরসসৃষ্টিকে কীভাবে ধ্বনিবৈচিত্র্যে ও ব্যঙ্গ-চিত্রে পূর্ণ করেছে, তা লক্ষণীয়। হিন্দী দোঁহা থেকে আরম্ভ করে একে একে স্বামীজীর দেশদেশান্তর ভ্রমণের স্মৃতিবহ সংস্কৃত সমাসবদ্ধ-পদের মন্ত্রঝঙ্কারে রূপায়িত 'চিরনীহারমণ্ডিত মেঘমেখলিত' অথবা 'উত্তুঙ্গতরঙ্গভঙ্গ-কল্লোলশালী' রূপমাধুর্য যেমন একদিকে, তেমনি আর একদিকে নিতান্ত ঘরোয়া ক্রিয়া-পদে 'দেখলুম, শুনলুম, ডিঙুলুম' ব্যবহারে লঘু গুরুর অভাবিত সংযোগে হাস্যরসের সহজাত উৎসারণ। তারপরের পঙ্‌ক্তিটিতেই সমাসবদ্ধ পদের অভিনব উপস্থাপনা—'কেরাঞ্চি ও ট্রাম-ঘড়ঘড়ায়িত, পানের পিক-বিচিত্রিত গ্যাল, টিকটিকি-ইঁদুর-ছুঁচো-মুখরিত'—সে যুগের কলকাতার এই বিশেষণমালায় আপাত-গাম্ভীর্যের আবরণে কলকাতার ক্লিন্নতা যেমন পরিস্ফুট, তেমনি ঘরে সূর্যের আলো পৌঁছয় না বলে যাকে দিনের বেলায় বাতি জ্বেলে লিখতে হয় সেই শ্যামাচরণের পরিবেশটিও ব্যঙ্গচিত্রশিল্পীর দক্ষতায় উপস্থাপিত। এ হেন শ্যামাচরণ ঐ অন্ধকার ঘরে বসেই কল্পনায় বিশ্বভ্রমণ সেরে ফেলেন, যদিচ তাঁর আসল ভ্রমণের অভিজ্ঞতা পশ্চিমে বর্ধমান পর্যন্ত! এই শেষ মন্তব্যটি আপাতনিরীহ হ'লেও এর বিদ্ধ করার এবং অট্টহাসমুখরিত করার ক্ষমতা অসাধারণ! হিমালয়, সমুদ্র, প্রান্তর, মরুভূমির পরেই একেবারে 'বর্ধমান পর্যন্ত' সীমানির্দেশে কল্পনার উড্ডীয়মান বিমান মুখ থুবড়ি খেয়ে পড়ে শ্যামাচরণের ভ্রমণবৃত্তান্তের আসল স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছে

[ক্রমশঃ]

শ্রীশ্রীমা

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

তখন দিগন্তহীন অন্ধকারে আলোর প্লাবন
বহমান বঙ্গভূমে শ্রীরামকৃষ্ণের তপস্যায়,
সে আলোর উৎসরূপা তুমি মাগো অমল প্রভায়
তপোময়ী, এনেছিলে তমসায় দিব্য উজ্জীবন।

মূর্তিমতী ভগবতী, বিশ্বমাতা শাশ্বতস্মরণ
তোমার পবিত্র সত্তা অপ্রমত্তা আত্মমহিমায়
মহাসাধকের সহধর্মিণী অপার করুণায়
নারায়ণী শক্তিমন্ত্রে করেছ সত্যের উদ্বোধন।

বহু জন্ম জন্মান্তের পুণ্যবলে সপ্তম বৎসরে
দেখেছি তোমাকে মাতঃ পেয়েছি তোমার আশীর্বাদ
দেখেছি কী অপার্থিব মাতৃরূপ, অমৃতনির্ঝরে
স্বস্তিমন্ত্র উচ্চারণ শুনেছি অভয় শঙ্খনাদ।

পরমহংসের আত্মজ্যোতিরূপা হে সারদামণি,
তুমি বাঙালীর নও, তুমি মাগো অখিলজননী।

করুণাময়ী

স্বামী জীবানন্দ

জগতের দুখে ব্যথিতা জননী কৃপা বরষিতে এলে
তাইতো করুণামূরতি তোমার আকুল করিয়া তোলে।
মলিনতা যেথা হয়েছে গভীর
করুণা তোমার সেথা রয় থির
পরমপাবনী রয়েছ জননী করুণানয়ন মেলে।
অভয়া বরদা যাদের জননী
তারা নির্ভয় দিবস রজনী
সব বেদনার চির অবসান শরণে আগত হ'লে।

মমতাময়ী

শ্রীশান্তশীল দাশ

সাধারণ ঘরে এসেছিলে মাগো,
অতি সাধারণ রূপটি ধ'রে,
মায়ের প্রতিমা কেবা দেখেছিল
সেদিনের সেই মাটির ঘরে ?
দিন কেটে গেছে হেলায় ফেলায়—
ক'জন সেদিন চিনেছে তোমায় ?
মনে মনে বুঝি হেসেছিলে মাগো,
অজ্ঞানীদের স্মরণ ক'রে।

কুটির দুয়ার খুলে এলে মাগো
মহাবিশ্বের আঙিনাতে,
কী মমতাময়ী রূপটি তোমার
প্রসন্ন হাসি নয়নপাতে।
জ্ঞানী অজ্ঞান, ধনী নির্ধন,
ও চরণে নিল সবাই শরণ
সকল জনের জননী হলে মা,
তোমার কৃপা যে সবার পরে

'করুণাতরঙ্গিতাক্ষী'

শ্রীমতী জয়ন্তী সেন

এসেছিলে, যখনই অতীতে
আর্ত ক্ষুব্ধ ক্লান্ত শিশু ক্রন্দনে মুখর—
অসুরদলনীরূপে, অগ্নিবর্ণা, সহস্রবাহুতে
সংখ্যাতীত আয়ুধের তীক্ষ্ণ তেজ
ত্রিনয়নে চিরজ্বলন্ত পাবকশিখা
চিত্তে কৃপা, সমরে নিষ্ঠুর !

কথা ছিলো আসবেই যুগে যুগে—
শত শতাব্দীর
অন্তহীন আর্তনাদে কতদিন
বিচ্ছেদ ঘটিয়ে
অন্তরালে তৃপ্ত তুমি হতে পারো
জননী আমার !
এবারে তোমার স্নিগ্ধ প্রস্ফুটিত
কমলিনী মুখে
সূর্য আর ভালবাসা একই সত্তা
প্রদীপ্ত প্রকাশ—
যতবার চেয়ে দেখি অমৃতক্ষরণ—
মধুময় করুণার তরঙ্গিত

অপার নির্ঝর
আয়ত নিবিড় চোখে ! অন্য কোন
চিহ্ন রাখো নাই—
ঐশ্বর্য মহিমা মুছে দুটি বাহু
মেলেছ কাতর
সন্তানের পথ চেয়ে—মাতৃরূপে
ধূলির জগতে !

তোমাকে চিনেছি মাগো লজ্জাপটাবৃতা
শ্রীমুখের অঙ্গীকারে, হৃদয়ের ভাবে,
নয়নের উচ্ছ্বসিত, বাঁধভাঙ্গা
করুণার স্রোতে—
সব প্রশ্ন গেছে ভেসে, সব দ্বিধা
সব মলিনতা !
নিখিল জগৎ মাতৃসম্বোধনে
অবুঝ শিশুর মত—
পিপাসায়, নির্ভয় উল্লাসে
তোমার কোলের কাছে অনায়াসে
বেদনা বিস্মৃত !

জননী সারদামণি

শ্রীমতী মানসী বরাট

'দাও বন্ধন খুলে'—
অবোলা পশুর মূক ক্রন্দন
বিঁধেছে মর্মমূলে।
'ওরে যাই' ব'লে কে দিয়েছে সাড়া
খুলিয়াছে বন্ধনী ?
(সে যে) মুক্তিদায়িনী করুণারূপিণী
জননী সারদামণি !

জঠরে জ্বলিছে ক্ষুধার অনল—
অন্নে দহন-জ্বালা,
করিছে ব্যজন জুড়াতে সে দাহ—
সরলা পল্লীবালা।
অকাতরে কে সে বিলায়েছে সেবা
ভেদাভেদ নাহি গণি ?
(সে যে) চির-আরাধ্যা অন্নপূর্ণা
জননী সারদামণি !

ফল্গুর মত করুণা কাহার
নীরবে প্রবহমানা !
অবারিত কার হৃদয়-দুয়ার
প্রবেশিতে নাহি মানা,
(যেথা) শরণাগতের মিলেছে প্রসাদ
দীন-হীন কিবা ধনী !
(সে যে) অভয়দাত্রী রক্ষাকর্ত্রী
জননী সারদামণি !

মায়ের কৃপা বিশ্বে ভরা

সেখ সদরউদ্দীন

মাকে পেতে কোথায় ছুটিস
কোথায় খুঁজে পাবি ভাই ?
মায়ের কৃপা বিশ্বে ভরা,
দু' চোখ ভ'রে দেখ্‌না তাই !

সকাল বেলার সোনা রোদে
দেখ্‌না মায়ের মধুর হাসি,
মায়ের গায়ের গন্ধ মেখে
ফুট্‌ছে অযুত ফুলের রাশি।

মায়ের কথা বলছে বাতাস
বিহঙ্গেরা গাইছে গান,
সকল জীবে মিশে আছে
আমার মায়ের কোমল প্রাণ

মায়ের ধৈর্য স্থৈর্য নিয়ে
দাঁড়িয়ে ঐ বনস্পতি,
মায়ের প্রাণের চঞ্চলতায়
নাচ্‌ছে অলি-প্রজাপতি।

মায়ের অশেষ আশিস্ নিয়ে
সবুজ ক্ষেতে ফসল দোলে,
মায়ের স্নেহ-কৃপা নিয়ে
মেঘ হ'তে জল পড়ছে গ'লে।

মায়ের খবর বুকে নিয়ে
ছুট্‌ছে নদী ঝরনা ওই
আকাশ-ভাঙা নীল সাগরে
মায়ের রূপে স্নাত হই।

শ্রীশ্রীসারদাদেবীর জীবন ও বাণী

শ্রীমতী বিজয়া মুখোপাধ্যায়*

শ্রীশ্রীসারদাদেবীর জীবন ও বাণীর যথার্থ তাৎপর্য অনুধাবন করা আমার সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় অসম্ভবই মনে করি। তথাপি যথাসাধ্য তার চেষ্টা করতে আমি প্রস্তুত হয়েছি এই ভেবে যে, এই চেষ্টার মধ্য দিয়েও আমার জীবনযাপন পবিত্রতামণ্ডিত হবে, আমার চিত্তশুদ্ধি হবে।

সারদাদেবী ৬৭ বৎসরকাল মানবদেহে জীবিত ছিলেন। তাঁর এই জীবনকালকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করে দেখা চলে। জন্ম ১৮৫৩ সালে; ৬ বছর বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ওই সময়ে বেশির ভাগ জয়রামবাটীতে পিতৃগৃহেই তিনি থাকতেন, ১৩-১৪ বছর বয়সে কামারপুকুরে ঠাকুরের সান্নিধ্যে তাঁর যে প্রথম দিব্য আনন্দানুভূতি হয়, সেকথা আজীবন তাঁর বিশেষ স্মরণে ছিল। ১৮ বছর পর্যন্ত জয়রামবাটী ও কামারপুকুরে তাঁর জীবনের এই প্রথম ভাগ একটি সরলা পল্লী-বালিকার মানবিকতার ধর্মে সুসঙ্গত। তাঁর জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়টি ১৮ বছর বয়সে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আসা থেকে শুরু করে তাঁর ৩৩ বছর বয়সে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ঠাকুরের দেহ-ত্যাগ পর্যন্ত ১৫ বছর ধরে বিস্তৃত। এই ১৫ বছরকাল তাঁর জীবন অধ্যাত্মসাধনা, পাতিব্রত্য, ঐশীশক্তির বিকাশ, ভক্তসেবা ও তারই মাধ্যমে মাতৃত্বের পরিস্ফুটনে মহিমান্বিত। প্রকৃতপক্ষে এই ১৫ বছর তাঁর জীবনের পরবর্তী ৩৪ বছরের নীরব ও বিশাল কর্মকাণ্ডের প্রস্তুতি-কাল। এই পরবর্তী ৩৪ বৎসরই—১৯২০ সালে দেহত্যাগ পর্যন্ত—তাঁর জীবনের সমুজ্জ্বল তৃতীয় অধ্যায়,—রামকৃষ্ণসঙ্ঘজননীরূপে এবং অগণিত ভক্ত ও তাপিতজনের একাক্ষরী মহা-মন্ত্র 'মা'-রূপে।

পুঁথিগত শিক্ষায় প্রায়-অশিক্ষিত এই মায়ের জীবন থেকে কী শিক্ষা আমরা পাই—আমরা এই আধুনিক যুগের বিভ্রান্ত, মূল্যবোধ-হীন, স্বার্থকেন্দ্রিক মানুষেরা? কম করে বললেও বলতেই হবে, তাঁর জীবন থেকে আমরা শিখে নিতে পারি কয়েকটি অসামান্য গুণ; সেগুলি হল—সরলতা ও পবিত্রতা, সহনশীলতা, সেবা ও নিরলসকর্ম, বিদ্যোৎসাহ, নিঃস্পৃহতা, মৃদুতা সত্ত্বেও দৃঢ়তা, সম্পূর্ণ আত্ম-বিলোপ এবং বিশ্বমাতৃত্ব ও ভালবাসা। তাঁর এই কয়েকটি চরিত্রবৈশিষ্ট্যের পরিচয় অল্প কথায় আমি এখানে উল্লেখ করব। তাঁর সরলতা এমনই ছিল, শুধু অল্পবয়সেই নয়, পরিণত বয়সেও যে, যে তাঁকে যা বলত, তিনি তাতেই বিশ্বাস করতেন। আর পবিত্রতার সংজ্ঞা কী, বলতে গেলে বলতে হয় পবিত্রতা ও শ্রীশ্রীমা সমার্থক। ভগিনী নিবেদিতা মায়ের এই পবিত্র স্বরূপ বিশেষভাবে অনুভব করেছেন, ব্যক্ত করেছেন নানা প্রসঙ্গে ও তাঁর চিঠিতে। মায়ের সহনশীলতা, মনে হয়, সীমাহীন। ঠাকুরের সেবার জন্য নহবতের একতলার ছোট্ট ঘরে তিনি থেকেছেন, সিঁড়ির নিচে রান্না করেছেন। শৌচাগার, স্নানের ঘর কিছুই নেই, তাই রাত তিনটের সময় উঠে তিনি প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে নিতেন, যাতে লোক-

---

*প্রাক্তন অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন, দমদম।

সমক্ষে লজ্জায় না পড়তে হয়। সারাদিনে প্রয়োজন হলেও আর বেরোবার উপায় ছিল না। সব অসুবিধে বিনা অভিযোগে সহ্য করেছেন তো বটেই, উপরন্তু বলেছেন—(চোদ্দ বছর বয়স থেকেই ঠাকুরের দিব্য সঙ্গে) অনুভব করতাম হৃদয়ে যেন আনন্দের পূর্ণঘট বসানো রয়েছে। বলেছেন—'ঠাকুর বলতেন, শ, ষ, স। যে সয় সে রয়, যে না সয় সে নাশ হয়।' পরবর্তী জীবনে জ্ঞাতি ও ভক্তকুলের আবদারের অত্যাচার যে কতভাবে সহ্য করেছেন, তার হিসেব দেওয়া মুশকিল। স্বামী প্রেমানন্দের প্রাসঙ্গিক উক্তিটি এখানে স্মরণ করি—'তোমরা তো দেখে এলে, রাজ-রাজেশ্বরী সাধ করে কাঙ্গালিনী সেজে ঘর নিকুচ্ছেন, বাসন মাজচেন, চাল ঝাড়চেন, এমন কি, ভক্ত ছেলেদের এঁটো পর্যন্ত পরিষ্কার করচেন। মা জয়রামবাটীতে থেকে অত কষ্ট করচেন গৃহীদের গার্হস্থ্যধর্ম শেখাবার জন্য। অসীম ধৈর্য, অপরিসীম করুণা, সর্বোপরি সম্পূর্ণ অভিমানরাহিত্য!' আর সেবার পরিচয় তাঁর জীবনে প্রথমাবধি। বাল্যে বুকজলে নেমে গরুর জন্য দলঘাস কাটাতেও যেমন সেবা ও নিরলসকর্মের পরিচয়, তেমনি বার্ধক্যে জাতিকুলনির্বিশেষে ভক্তসেবার জন্য রান্না করা থেকে শুরু করে যাবতীয় দৈহিক শ্রমস্বীকারেও ঠিক তাই। নিয়মপালনের ব্যত্যয় তিনি কখনও করতে পারতেন না। ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি সারাজীবন করে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন—'কাজ করা চাই বই কি; কর্ম করতে করতে কর্মের বন্ধন কেটে যায়, তবে নিষ্কাম ভাব আসে…কাজ করলে মনে বাজে চিন্তা আসে না।' নিজে তথাকথিত শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও সর্বদা শিক্ষাবিষয়ে উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁর ভাইপো-ভাইঝি, বিশেষত মাকু ও রাধুকে তিনিই স্কুলে যেতে উৎসাহিত করতেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন—'মেয়েমানুষেরও লেখাপড়া শেখা দরকার।' নিবেদিতার স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনিই, এখন থেকে ৮০ বছর আগে বাগবাজারের এক ভাড়াবাড়িতে।

তাঁকে ভক্তরা দেখতে পেত খুব সাধারণ-রূপে, ভেতরের ঐশীশক্তিকে তিনি অলৌকিকতা বা সিদ্ধাই দিয়ে কখনও প্রমাণ করে দেখান নি। জন্মসূত্রে যারা আত্মীয়, তাদের ও ভক্তদের নিয়ে তিনি এমনভাবে জীবন কাটিয়েছেন যেন মনে হয় তিনি মায়ার অধীন সাধারণ মানুষ। কিন্তু অন্তরে তিনি যে সম্পূর্ণ নিঃস্পৃহ, নিতান্ত বন্ধনমুক্ত ছিলেন, তার পরিচয় তাঁর মুখেই শেষ জীবনে আমরা শুনতে পাই; 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' নামক স্মৃতিকথায় এর একাধিক পরিচয় পাওয়া যায়।

মৃদুতা ও কোমলতা মায়ের স্বাভাবিক বৃত্তি ছিল, কিন্তু প্রয়োজনে তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয়ও আমরা একাধিকবার পাই। শুধু একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ এখানে করব। রামকৃষ্ণ মিশন তখন পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত। স্বামীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ যুবকেরা মিশনে যোগ দিয়ে সন্ন্যাসী হচ্ছেন। এঁদের মধ্যে দেবব্রত, শচীন, প্রিয়নাথ ও সতীশ পূর্বজীবনে আলিপুর বোমার মামলায় জড়িত ছিলেন। এই সময়ে গভর্নর লর্ড কারমাইকেল এক বক্তৃতায় বলেন—'রামকৃষ্ণ মিশন সেবাধর্মের আবরণে বিপ্লবীদের প্রশ্রয় দিচ্ছে।' এতে মিশনের একদল ভক্ত ও হিতৈষী ভয় পেয়ে সংশ্লিষ্ট সন্ন্যাসীদের মিশন থেকে সরিয়ে দিতে চাইলেন। সংবাদ শুনে মা দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—'ঠাকুরের ইচ্ছের মঠ-মিশন হয়েছে, রাজ-রোষে নিয়মলঙ্ঘন করা অধর্ম। ঠাকুরের

নামে যারা সন্ন্যাসী, তারা মঠে থাকবে, নয় তো কেউ থাকবে না। আমার ছেলেরা গাছতলায় আশ্রয় নেবে, তবু সত্যভঙ্গ করবে না।' মার কথা শুনে বাবুরাম মহারাজ হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। পরে স্বামীজীর ভক্ত মিস্ ম্যাকলাউডের মধ্যস্থতায় স্বামী সারদানন্দ গভর্নরের সঙ্গে দেখা করে সব বুঝিয়ে বলাতে মিশনের প্রতি সরকারের মিথ্যা সন্দেহ অনেকটা ঘুচেছিল।

মা যখন সঙ্ঘজননী এবং গৃহী ও সন্ন্যাসীদের সর্বময় অধিকর্ত্রী, তখনও তাঁর অহংপ্রকাশ ছিল না। 'আমি করছি' বা 'করে দেব'—একথা কদাচিৎ বলতে শুনি; সর্বদাই বলতেন 'ঠাকুর করবেন', 'ঠাকুর দেখবেন' বা 'ঠাকুরকে আমি বলব।' এই সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ, ক্ষমতা সত্ত্বেও অভিমান-রাহিত্য তুলনাহীন। আর তাঁর বিশ্বমাতৃত্ব ও সর্বজীবে ভালবাসা তারও কি তুলনা আছে? নিবেদিতা মাকে চিঠিতে লিখছেন—'Dear Mother! you are full of love! And it is not a flushed and violent love, like ours, and like the world's, but a gentle peace that brings good to everyone and wishes ill to none.' [আদরিণী মা! 'ভালবাসায় ভরা তুমি! তোমার ভালবাসায় আমাদের মতো উচ্ছ্বাস বা উগ্রতা নেই; তা পৃথিবীর ভালবাসা নয়, স্নিগ্ধ শান্তি তা, সকলের কল্যাণ আনে, অমঙ্গল করে না কারো।'] স্বামীজী দ্বিধাহীনকণ্ঠে বলেছেন—'রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন যা হয় বল দাদা, কিন্তু যার মায়ের উপর ভক্তি নাই, তাকে ধিক্কার দিও।' বলেছেন—'মা-ঠাকরুণ কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেহই পার না,—ক্রমে পারবে।'

প্রারম্ভিক প্রশ্নে ফিরে এসে বলি—মায়ের জীবন পর্যালোচনা করে এ যুগে আমরা তাহলে কী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি? যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করলাম—আমরা নিজেদের প্রশ্ন করতে পারি—এগুলি কি আমাদের আছে? এগুলির বিকাশের জন্য আমরা কি তেমন যত্ন ও প্রচেষ্টা করেছি? যখন দুর্বিপাকে পড়ি, ঈশ্বরকে ডাকি; সুদিনে তাঁকে ভুলে থাকি। এমনভাবে নিজেদের অন্তরজগৎ কেন নির্মাণ করি না, যা সুদিনে-দুর্দিনে সমানভাবে আমাদের আনন্দ ও সমাধানশক্তি যোগাবে? আমরা যে যে-বৃত্তেই জীবনযাপন করি না কেন, মায়ের সমগ্র জীবনশিক্ষা থেকে যে-কোন একটিও যদি নিজের জীবনে গ্রহণ করতে পারি, আমাদের বিভ্রান্তির নিশ্চিত অবসান হবে, আমরা প্রত্যেকে স্বকীয় পতাকাবহনের শক্তি অর্জন করব, আমাদের জীবনযাপন সার্থক হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও পরমপবিত্রা শ্রীশ্রীমায়ের কথা অনুধ্যান করিলে আমাদের চিন্তা অন্ততঃ অল্প সময়ের জন্যও অগণিত পার্থিব ব্যাপৃতি হইতে দূরে সরিয়া যায়। তখন আমরা অনুভব করি, মানুষ কেবলমাত্র পৃথিবীর চিরাভ্যস্ত কাজ করিয়াই যাইবে না, উর্ধ্বতর লোকের কথাও তাহাদের ভাবিতে হইবে। ইহাই জীবনের পরম সান্ত্বনা, পরম আশ্বাস।

—ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন

দেবী শ্রীশ্রীসারদা মা

শ্রীদেবনাথ ভট্টাচার্য

জীবন দ্বন্দ্বসংঘাতময়। সংসারের পথ বড় দুর্যোগপূর্ণ। মোহান্ধ মানুষ পথ চলতে চলতে অনেক সময় দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে। সত্য পথ তাদের থেকে দূরে, বহু দূরে সরে যায়। বড় অসহায়, বড় করুণ হয়ে ওঠে তাদের জীবন। সন্তানের এই অবস্থা দেখে করুণাময় ভগবান স্থির থাকতে পারেন না। ছুটে আসেন সন্তানকে ঘোর তমিস্রাময় পথ থেকে আলো-কোজ্জ্বল পথে নিয়ে যাবার জন্যে। তারপর তাকে সুস্থ ও শুদ্ধসত্ত্ব করে বুঝিয়ে দেন সংসারের মায়ায় আচ্ছন্ন হওয়াই জীবনের চরম লক্ষ্য নয়, জীবনের চরম লক্ষ্য আত্মানুভূতি। এই বোধ হয়তো একদিনে হয় না; এমনকি এক জীবনেও হয় না। আর হলেও আত্মানু-ভূতির জন্যে প্রয়োজন নিবিড় সাধনার, প্রয়োজন চৈতন্য হওয়ার।

জড়বাদপূর্ণ উনবিংশ শতকে দলে দলে লোক যখন ভ্রান্ত পথে চলে যাচ্ছে সেই সময় এই চরম সত্যকে বোঝানোর জন্যেই রাম ও কৃষ্ণ এলেন রামকৃষ্ণরূপে। সঙ্গে এলেন আদ্যাশক্তি শ্রীমা সারদাদেবী। সারদা সমস্ত ব্রহ্মলোকের প্রেম মাধুর্য ও পবিত্রতা নিয়ে এলেন—যেমন এসেছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সীতাদেবী, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধিকা, বুদ্ধের সঙ্গে যশোধরা, শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়া। ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়ন না করেও তিনি ছিলেন ব্রহ্ম-বাদিনী, প্রজ্ঞার আলোয় প্রদীপ্তা। দ্বৈত জগৎ সম্পর্কে আসক্তিশূন্য করার জন্যে তিনি আপন শক্তিপ্রভাবে তাঁর কোন কোন সন্তানকে অতীন্দ্রিয় সমাধিভূমিতে তুলে দিয়েছেন। তারা বুঝেছে এই বিশ্বপ্রপঞ্চ মায়া ছাড়া আর কিছুই নয়। যারাই তাঁর কাছে স্থিরভাবে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছে তারাই দেখতে পেয়েছে তাদের ভোগতৃষ্ণা কত কমে গেছে, ইন্দ্রিয়সুখ কত বিস্বাদ মনে হয়েছে। নিদ্রায় অচেতন মন তাদের যেন নতুন করে জেগে উঠেছে। ব্যাকুল হয়ে উঠেছে সাধনাদ্বারা ইষ্টলাভের জন্যে। তাদের জাগতিক প্রেম সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ হয়ে প্রগাঢ় অধ্যাত্মপ্রেমে রূপান্তরিত হয়েছে। তাঁর কৃপায় কত লোক যে কতভাবে উপকৃত হয়েছে তার সংখ্যা নেই। তিনি তো সাধারণ মানবী ছিলেন না; তিনি ছিলেন শক্তিরূপিণী, চৈতন্যরূপিণী—অসামান্যা, অনন্যা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং জগজ্জননী আনন্দময়ী ভব-তারিণী ও সারদামা'র মধ্যে কোন ভেদজ্ঞান করতেন না। সারদামা'র অদোষদর্শিতা ক্ষমা দয়া ত্যাগ তপস্যা কোমলতা পবিত্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সমগ্র নারী জাতির আদর্শ। আদর্শ মানবীত্ব আর দেবীত্বের পরমাশ্চর্য সং-মিশ্রণে গড়ে উঠেছিল তাঁর চিরধ্যেয় চরিত্র। ত্রিতাপতপ্ত নরনারী তাঁর শ্রীপদতলে এলেই লাভ করত অনাবিল আনন্দ আর গভীর প্রশান্তি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্তানেরা' বার বার বলেছেন তাঁর দেবীমূর্তি দর্শনে, তাঁর শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শে লাভ হত সাত্ত্বিকভাব, দেবভাব।

তিনি কখনো পাপীদের ঘৃণার চোখে দেখেননি, দেখেছেন ক্ষমাসুন্দর চোখে। পতিতকে দূরে সরিয়ে দেননি, করুণাকিরণে সরিয়ে দিয়েছেন তাদের সমস্ত কলুষতাকে। কেউ মা বোলে ডাকলে—সে সৎই হোক আর অসৎই হোক—তার সঙ্গে কথা না

বোলে পারতেন না তিনি।

একদিন রাতে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীমা খাবার করে আনছেন। ঠাকুরের ঘরের সিঁড়ি পার হয়ে সবে ঘরের সামনের বারাণ্ডায় পা দিয়েছেন এমন সময় একজন মহিলা ভক্ত এসে শ্রীসারদামা'র কাছ থেকে 'দিন মা, আমায় দিন' বোলে খাবারের থালাটা নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সামনে রেখে আবার তখনই চলে যান। এর পর নররূপী নারায়ণ শ্রীরামকৃষ্ণ বসেন আহারে। পাশে বসেন তাঁর লীলাসঙ্গিনী সারদা—জগতের সারদায়িনী জগজ্জননী দুর্গা। কিন্তু ঠাকুর অন্ন স্পর্শ করতে পারছেন না। তিনি মাকে বললেন, 'তুমি একি করলে ? ওর হাতে দিলে কেন ? ওকে কি জান না ? আমি ওর ছোঁয়া খাই কি করে ?' শ্রীমা বললেন, 'তা জানি, আজ খাও।' কিন্তু ঠাকুর তখনও অন্ন ছুঁতে পারছেন না। মা মিনতি করে ঠাকুরকে ঐ অন্ন গ্রহণের অনুরোধ করলে ঠাকুর বললেন, 'আর কোন দিন কারও হাতে দেবে না বল।' উত্তরে শ্রীমা হাত জোড় করে বললেন, 'তা তো আমি পারবো না, ঠাকুর ! তোমার খাবার আমি নিজেই নিয়ে আসব ; কিন্তু আমায় মা বলে চাইলে আমি তো থাকতে পারবো না। আর তুমি তো শুধু আমার ঠাকুর নও—তুমি সকলের।' মার এই কথায় ঠাকুর সন্তুষ্ট হয়ে অন্ন গ্রহণ করলেন। 'আর কোনদিন কারও হাতে দেবে না বল' মাকে একথা বলা সত্ত্বেও মা কিন্তু বলতে পারলেন না যে মা বোলে এসে চাইলে তিনি কাউকে তা দিতে পারবেন না। তিনি পারবেন কি করে ? তিনি যে জগতের মা, আদ্যাশক্তি মহামায়া। জীবের উদ্ধারের জন্যেই তো তাঁর এই জগতে আসা

এইরূপ আরো দুটি ঘটনা তাঁর দেবীত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। গিরিশের পুত্রের বয়স তিন। কিন্তু এই অল্প বয়সেই সে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে গেছে। বাক্‌পতি গিরিশ আজ বাক্যহারা। তাঁর জীবনবীণায় আজ বিষাদের করুণ রাগিণী বেজে চলেছে। কোন কাজে মন বসছে না। অথচ এই গিরিশের কি গভীর বিশ্বাস! এক কালী-পূজোর রাতে তিনিই প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কালীরূপে দেখে তাঁর পায়ে ফুল দিয়ে পূজো করেছিলেন। আজ সেই গিরিশ শোকের নির্মম আঘাতে জর্জরিত। স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী জয়রামবাটী যাচ্ছিলেন। তিনি গিরিশের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে তাঁকে তাঁর সঙ্গে জয়রামবাটী গিয়ে কয়েকমাস কাটিয়ে আসার কথা বললেন। গিরিশ মহারাজের কথায় রাজী হলেন। তিনি স্বামী নিরঞ্জনানন্দজীর সঙ্গে জয়রাম-বাটী চললেন। তিনি চললেন ত্রিতাপ-দুঃখহারী সারদামা'র কাছে। মাকে দর্শনের শ্রেষ্ঠফল লাভ করতে হলে শরীর ও মন দুটোই পবিত্র হওয়া চাই। তাই মা'র বাড়ি পৌছে তিনি স্নান সারলেন। তারপর ভিজে কাপড়েই মাকে দর্শন করতে গেলেন। ভাবে তাঁর সমস্ত শরীর তখন কাঁপছে। পা সমান-ভাবে পড়ছে না। প্রথমে মায়ের শ্রীপাদপদ্মে মাথা রেখে তাঁকে প্রণাম করলেন। তারপর তাকালেন তাঁর সেই জ্যোর্তিময় শ্রীমুখের দিকে। দেখলেন অলোকসুন্দর এক দেবী-মূর্তিকে। দেখলেন তাঁর করুণাভরা স্নিগ্ধ চাহনিকে। গিরিশের দুচোখ দিয়ে তখন পবিত্র অশ্রু ঝরে পড়ছে। অবাক বিস্ময়ে ভরে গেছে মনটা। মনে পড়ে যাচ্ছে জীবনের ফেলে-আসা এক অধ্যায়ের কথা। যুবক গিরিশ তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীমা'র নামও

শোনেননি। বিসূচিকার প্রবল আক্রমণে শয্যাগত তিনি। বাঁচার কোন আশা নেই। তন্দ্রাচ্ছন্ন। হঠাৎ এক দেবীমূর্তি তাঁকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন। তাঁর মুখে মহাপ্রসাদ দিয়ে অপার অপার্থিব স্নেহভরে বললেন, 'খাও'। কি সুস্বাদ সে প্রসাদ! তা খেতে খেতেই তাঁর স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। কিন্তু তখনো তাঁর জিবে মহাপ্রসাদের সেই মধুর স্বাদ লেগে রয়েছে। দেবীমূর্তিও তাঁর চোখের সামনে ভাসছে। ক্রমে তাঁর রোগও সেরে গেল। সেদিনের সেই দেবীমূর্তি আর আজকের দেখা মাতৃমূর্ত গিরিশ দেখলেন এক। এর আগে গিরিশ-চন্দ্র কখনো শ্রীসারদামা'র মুখ দর্শন করেননি। আজই প্রথম তাঁর শ্রীমুখ দর্শন করে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন। বুঝলেন এই দেবীই তাঁকে সব সময় রক্ষা করে আসছেন। ইনি সাধারণ মানবী নন। ইনি সাক্ষাৎ জগদম্বা—জগদ্ধাত্রী।

কয়েক জন স্ত্রীলোক কোন পর্ব উপলক্ষে কলকাতায় গঙ্গাস্নান করতে চলেছেন। মা'র কানে কথাটা পৌঁছল। তিনি তাঁদের সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁরা সম্মত হলেন। মা লক্ষ্মীদিদি ও শিবুদাদাকে নিয়ে তাঁদের সঙ্গে যাত্রা করলেন। এই দীর্ঘপথ তাঁরা পায়ে হেঁটেই চললেন। তখনকার দিনে ওপথে বর্তমান কালের মত যানবাহনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। কামারপুকুর থেকে চার ক্রোশ দূরে আরামবাগ। সেখানে পৌঁছে তাঁরা সেই দিনটা সেখানেই থাকবেন। পরদিন আবার সেখান থেকে যাত্রা করবেন। আরামবাগ থেকেই শুরু হয়েছে তেলো-ভেলোর মাঠ। মাঠটা পাঁচক্রোশব্যাপী। রাতের অন্ধকার পৃথিবীর বুকের ওপর নামার সঙ্গে সঙ্গেই মাঠের রূপ যেত বদলে। অতি ভয়াবহ হয়ে উঠত এর চেহারা। ডাকাতির ভয়ে দলহীন হয়ে কেউ এই মাঠ পার হত না। শ্রীমায়ের সঙ্গীরা আরামবাগে উপস্থিত হয়ে দেখল সন্ধ্যার যথেষ্ট বিলম্ব রয়েছে। একটু তাড়াতাড়ি চললেই সন্ধ্যার পূর্বেই তারকেশ্বরে পৌঁছতে পারবেন। তাঁরা তাড়াতাড়ি চলতে শুরু করলেন। কিন্তু শ্রীমা তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে সমবেগে চলতে পারছিলেন না। তাঁর জন্যে সঙ্গীদের চলতে অসুবিধা হচ্ছে এবং এইভাবে চললে সন্ধ্যার পূর্বে মাঠটা পার হতে পারবেন না বুঝতে পেরে সঙ্গীদের এগিয়ে যেতে বললেন। তিনি বললেন তাঁর জন্যে চিন্তা করবার কোন দরকার নেই। দেখতে দেখতে সঙ্গীরা তাঁকে ফেলে চলে গেলেন। সন্ধ্যার ঘন অন্ধকারও নেমে এল সমস্ত মাঠের ওপর। মা'র পক্ষে আর চলা সম্ভব হল না। থমকে দাঁড়ালেন এক জায়গায়। সেই বিশাল প্রান্তরের মধ্যে তিনি একা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। হঠাৎ দূরে দীর্ঘাকৃতি এক মূর্তিকে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে দেখলেন। তার রঙ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। দুই হাতে রূপোর বালা। চুলগুলো কোঁকড়ানো। মা বুঝতে পারলেন সে ডাকাত। লোকটা তাঁকে রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'কে গা এসময় এখানে দাঁড়িয়ে আছ? কোথা যাবে?' শ্রীমা বললেন, 'পূবে'। লোকটা পূর্বের মতই রুক্ষস্বরে বলল, 'সে এপথ নয়, ঐ পথে যেতে হবে।' ঘোর অন্ধকারে ডাকাতটা দূর থেকে মাকে ঠিক দেখতে পাচ্ছিল না। কাছে এসে মাকে দেখে ওর মনে এল কি এক পরিবর্তন। কোমল স্বরে মাকে বলল, 'ভয় নেই, আমার সঙ্গে মেয়েলোক আছে, সে পেছিয়ে পড়েছে।' একটু পরেই মা দেখলেন সত্যিই একজন স্ত্রীলোক সে দিকে আসছে।

মা ডাকাতটাকে জানালেন তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে ফেলে গেছে। তিনি বোধ হয় পথ ভুল করেছেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরে তাঁর স্বামীর কাছে যেতে চান। সেখানে তাঁর স্বামী রানী রাসমণির কালীবাড়িতে থাকেন। এর মধ্যে স্ত্রীলোকটাও সেখানে এসে উপস্থিত হল। মা তার হাতদুটো ধরে বললেন, 'মা আমি তোমার মেয়ে সারদা, সঙ্গীরা ফেলে যাওয়ায় বিষম বিপদে পড়েছিলুম ; ভাগ্যে বাবা ও তুমি এসে পড়লে, নইলে কি করতুম বলতে পারিনে।' সারদামা'র সরলসুন্দর ব্যবহারে ডাকাতদম্পতি খুবই সন্তুষ্ট হল। পথশ্রমে ক্লান্ত সারদামাকে তারা নিকটবর্তী এক গ্রামের দোকানে নিয়ে এল। তারা বুঝতে পারল সারদামা'র পথ চলতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। দোকান থেকে মুড়িমুড়কি কিনে তাঁকে পেট ভরে খাওয়ানো হল। তারপর কাপড় বিছিয়ে ডাকাতের স্ত্রী তাঁকে ঘুম পাড়াল। আর ডাকাত সারারাত লাঠি হাতে দরজার সামনে পাহারা দিল।

ভাবতেও শিহরণ লাগে যে জগজ্জননী স্বয়ং সন্তানকে সেবা করার সুযোগ দিয়ে তার কলুষতাকে কেমন করে দূরে সরিয়ে দিলেন, শুদ্ধ পবিত্র করে দিলেন তার অন্তরকে। তিনি যে পরম কৃপাময়ী। কৃপা-মাহাত্ম্য বোঝানোর জন্যেই তো তাঁর নারীদেহ ধারণ করে জগতে আসা। ভক্ত যখন তাঁর লীলা-মাহাত্ম্য বুঝতে পারে তখন পরমানন্দে অভিভূত হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে দস্যুদম্পতি তাঁর বিচিত্র লীলা কতখানি অনুভব করেছিল তা জানি না, তবে শ্রীমায়ের ডাকাত বাবা ও মা এবং তাঁর সঙ্গের লোকজন যে এক পরিবারভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মতো সেদিন তারকেশ্বরের শিবমন্দিরের কাছে পরমানন্দে রন্ধন ও আহারাদি করেছিলেন তা আমরা জানি। পরবর্তী কালে এই দস্যুদম্পতি যখন মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীমার কাছে আসত সেই সময় শ্রীমা একদিন তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তোমরা আমায় এত স্নেহ কর কেন?' দস্যুদম্পতি বলেছিল, 'তুমি তো সাধারণ মানুষ নও। আমরা তোমায় কালীরূপে দেখেছি।' কালের ভয় থেকে মানুষকে রক্ষা করেন বলেই তো তিনি কালী। নরঘাতক দস্যু শ্রীশ্রীমাকে কালীরূপে দেখে নবজন্ম লাভ করে, ধন্য ক'রে তোলে তার অধম জীবনকে। চৈতন্যরূপিণী মহামায়া ওকে উদ্ধার করবেন বলেই তো অমন করে ওকে ঐ মাঠের মধ্যে দর্শন দিলেন।

কোন এক শিষ্যা একদিন তাঁকে বলেছিলেন, 'মা আপনাকে দর্শন করার পর লোকে বিভিন্ন দেবীকে আর শ্রদ্ধা করবে না।' উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'কেন করবে না? তাঁরা সকলেই যে আমারই অংশ।' সাধারণ মানুষ যারা সাংসারিক ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত, ষড়রিপুর প্রবল আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত তাদের পক্ষে দিব্যপ্রেমে সর্বদা বিভোর থাকা সম্ভব নয়। তারা সন্দেহ ও উদ্বেগের দোলায় দুলছে, অনিত্যের প্রলোভনে ছুটে চলছে। কিন্তু সারদামা'র মানসলোক সর্বদা পরিপূর্ণ থাকত দিব্যপ্রেমে। তাঁর দিব্য প্রেম পার্বত্য নির্ঝরের মত ঝরে পড়ত হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ জৈন খ্রীষ্টান প্রভৃতি আপামর সকলের ওপর, তাদের তৃষিত তপ্ত জীবনকে জুড়োবার জন্যে। যে ঠাকুর শ্রীশ্রীভবতারিণী মাকে তাঁর সমস্ত কিছু অর্পণ করলেও সত্য তাঁকে দিতে পারেন নি সেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ দিয়েও বেরিয়েছিল, 'ও (অর্থাৎ শ্রীশ্রীসারদা মা) সারদা—

সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে,' 'আমার শক্তি' ইত্যাদি। এক ফলহারিণী কালীপুজোর রাতে ষোড়শীরূপে ঠাকুর সারদা মাকে ষোড়শোপচারে পুজো করেন এবং পূজাশেষে তাঁর সাধনার ফল, জপমালা প্রভৃতি তাঁর চরণে অর্পণ করে প্রণাম করেন। বিশ্ববন্দিত আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ মাকে বলেছিলেন 'জ্যান্ত দুর্গা'। স্বয়ং ঠাকুর যাঁকে দেবীর আসনে বসিয়ে পূজা করেছেন, স্বামীজী প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে বহুবার বহুভাবে যাঁর দৈবী শক্তির প্রশস্তি করেছেন তাঁর দেবীত্ব সংশয়াতীত।

শ্রীমায়ের কয়েকটি কথা

শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

'যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয়, মা, জগৎ তোমার।'

শ্রীশ্রীমায়ের লীলাবসানের কয়েকদিন পূর্বেকার এই শেষ বাণী—এটি শুধু একটিমাত্র ভক্তিমতী মহিলার প্রতি নীতিসংগত নির্দেশ নয়, ব্যবহারিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেও এটি এক সর্বজনীন অমোঘ অমূল্য উপদেশ।

শ্রীশ্রীমা'র জীবনী থেকে জানা যায়, তিনি বাল্যকালে সংসারের কাজে সহায়তা করতে দলঘাস কাটতেন। দরিদ্র অবস্থায় দিনাতিপাত করেও নিজগুণে ভাইদের সংসারকে আপন করে নিয়েছিলেন। আবার পরবর্তী কালে সকলকে এক দিব্য আকর্ষণে কাছে টেনে নিয়েছেন। একদিকে তিনি গ্রামের সকলের অতি আপনার জন, সকলের সুখে-দুঃখে মমতায়-ভরা মানবী মূর্তি; অন্যদিকে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী, আধ্যাত্মিক শক্তির আধার—অবতাররূপে প্রকাশে ঠাকুরের সহায়িকা লীলাসঙ্গিনী। আবার শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পরে তাঁর আশ্রিত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী সন্তানগণের সংঘজননী এবং অসংখ্য নারী ও পুরুষ ভক্তের কাছে তিনি আশ্রয়-স্বরূপিণী জ্ঞানদায়িনী সাক্ষাৎ জগজ্জননী। তাঁর শান্তিশীতল আশ্রয়ে এসে ধন্য হয়েছে, মনের জ্বালা জুড়িয়েছে এমন বহু জ্ঞানীগুণী ভক্ত ছিলেন ও আছেন; আবার সাধারণ জনগণও তাঁর করুণায়, তাঁর স্নেহমাখা ব্যবহারে পরম তৃপ্তি লাভ করেছেন ও করছেন। তিনি সকলকে আপনার করে নিয়েছেন। মা তিনি—তাই ধুলোকাদামাখা সন্তানকেও স্নেহ-মমতায় কাছে টেনেছেন। স্বামী অভেদানন্দ তাই স্তবের মধ্যে বলেছেন, 'দোষান্ অশেষান্ সগুণীকরোষি।' যে মা গ্রামবাসী অসংখ্য জনসাধারণের কাছে সাধারণ পল্লীরমণী, সেই মা-ই আবার দেখা যায়, স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ ঠাকুরের সন্তানগণকে তাঁদের নানান সমস্যার বিষয়ে সঠিক নির্দেশ দিচ্ছেন। মাতৃরূপা মহামায়ার এই বিরাট ব্যাপ্তি তাই সহজে উপলব্ধি করার বিষয় নয়।

মা বললেন, 'যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো না।' গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ শান্তি-লাভের কথা এবং সেই শান্তিলাভের উপায়ের কথা বলেছেন। এ যেন সেই একই কথা,

আরও সহজ করে বলা। শান্তিলাভের পথ—সাধনার পথ, আত্মসংযমের পথ, নিবৃত্তির পথ। শ্রীশ্রীমা'র নির্দেশ : শান্তিলাভের পথে প্রথম পদক্ষেপ অপরের দোষ দেখার প্রবৃত্তির নিরসন। 'দোষ যদি দেখতে হয় নিজের দোষ দেখবে।' অপরকে আপনার করে নেওয়ার জন্যে জাগতিক ক্ষেত্রে যতরকম আত্ম-সংযমের, আত্মশোধনের প্রয়োজন তা স্বেচ্ছায় মেনে নিতে হবে।

'কেউ পর নয় মা—জগৎ তোমার।' গোটা জগতে এক ব্রহ্ম লীলায়িত। তাই জগজ্জননী তাঁর শেষ উপদেশে জগৎকে স্বীকৃতি দিলেন। 'কেউ পর নয় মা—জগৎ তোমার।' অপরকে আপনার করে নিতে নিতে স্বার্থত্যাগের যে অভ্যাস গড়ে উঠবে—ব্যষ্টিকে সমষ্টির স্বার্থে বিলীন করার মধ্যে যে আত্মবিকাশের সন্ধান পাওয়া যাবে, তারই মাধ্যমে জীবনের চরম প্রাপ্তি। সেই শান্তি-লাভের নিশ্চিত আশ্বাস দিয়েছেন শ্রীশ্রীমা।

ব্যক্তিচরিত্রে দোষগুণ আছেই। মানুষের পারস্পরিক আচরণের মধ্যে নানা বিকৃতি ও বিরোধ বর্তমান থাকাই স্বাভাবিক; কিন্তু সমাজ-জীবনের সামগ্রিক সত্তাটি সমষ্টির স্বার্থে ব্যষ্টির স্বার্থত্যাগের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকে। জগজ্জননী জগতের মঙ্গল চান, তাঁর লীলাক্ষেত্র এই জগৎকে পারস্পরিক প্রেমের বন্ধনে বেঁধে রাখতে চান। তাই অদোষদর্শিতা ও আত্ম-সমীক্ষার দ্বারা নিজেকে পবিত্রতর করে গড়ে তুলে আত্মোপলব্ধির পথে এগিয়ে চলার আদর্শই যেন ধ্বনিত হচ্ছে শ্রীশ্রীমা'র এই উক্তির মধ্যে। 'জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ'। নিজের মধ্যে যে শক্তি নিহিত আছে তার উপলব্ধি চাই—এই আপনার করে নিতে শেখাই হয়ত সেই চরম উপলব্ধির সাধনা। 'জগৎ তোমার'—অপরের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বার্থত্যাগের মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে পরার্থে জীবনযাপনের অভ্যাস। ক্ষুদ্র গণ্ডী ছাড়িয়ে নিজেকে প্রসারিত করতে হবে। শ্রীশ্রীমা তাই বললেন, এই পথই শান্তিলাভের পথ।

*   *   *

'আমার শরৎ যেমন ছেলে, এই আমজদও তেমন ছেলে।'

শ্রীশ্রীমায়ের ছবির সামনে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করার সময় ভক্তমনে করুণাময়ী মায়ের এই আরেকটি কথা যেন এক পরম আশ্রয়ের আশ্বাস জাগায়। জয়রামবাটীতে কোন একদিন শ্রীশ্রীমায়ের ভাইঝি পরিবেশন করার সময়ে কুণ্ঠাসহকারে যখন দূর থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে আমজদকে তরকারি দিচ্ছিলেন, মা তখন স্বয়ং তাঁর জগজ্জননী-ভাব প্রকাশ করে ঐ কথা বলেন। কোন ছেলেই মা'র কাছে তুচ্ছ নয় : তিনি যে মা, সকলের মা।

জয়রামবাটীর সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র মুসলমান-অধ্যুষিত গ্রাম শিরোমণিপুর। আমজদ ছিল এই গ্রামেরই অধিবাসী এক ডাকাত। মা করুণায় বিগলিত হয়ে আমজদকে প্রাচীর-নির্মাণের কাজে লাগালেন। অপার স্নেহের স্পর্শে ধন্য হোল সে। আর শরৎ—তিনি সর্ব-ত্যাগী সন্ন্যাসীপ্রবর, শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদ; স্বামী বিবেকানন্দের আদেশ শিরোধার্য করে পাশ্চাত্যে বেদান্তের বাণী প্রচার করে এসেছেন—'লীলাপ্রসঙ্গ'কার, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদক, শ্রীশ্রীমায়ের দ্বারী ও ভারী। জননীর কাছে দুজনেই সমান! ভাবা যায়!! সকলকে শুনিয়ে মায়ের এই সমদর্শী বাণী ধ্বনিত হোল, 'আমার শরৎ যেমন ছেলে, এই আমজদও তেমন ছেলে।' মা জানতেন আমজদ ডাকাত। এমন ভয়ঙ্কর মানুষেরও

হৃদয় তিনি জয় করেছিলেন তাঁর সীমাহীন স্নেহ দিয়ে। আর এক মুসলমান চোরের আনা জিনিস ঠাকুরকে দেওয়া নিয়ে জনৈক স্ত্রীভক্ত আপত্তি করায় মা তাঁর অমত অগ্রাহ্য করে বলেছিলেন, 'দোষ তো মানুষের লেগেই আছে। কি ক'রে যে তাকে ভাল করতে হবে, তা জানে ক'জনে।' মদ্যপ পদ্মবিনোদকেও তিনি কৃপা করেছিলেন। এমনি ছিল মা'র ক্ষমাসুন্দর মমতাময় অদোষদর্শী সমদৃষ্টি। ভক্তজননী তো বলেছেনই যে তিনি সতেরও মা, আবার অসতেরও মা।

অল্প কিছুকাল পূর্বে প্রয়াত স্বামী পরমেশ্বরানন্দ (কিশোরী মহারাজ) ছিলেন শ্রীশ্রীমা'র কৃপাধন্য সন্ন্যাসী। জয়রামবাটীতে মা'র বাড়িতে একদিন ছোট্ট একটি ঘটনা বলেছিলেন।···শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটীতে আছেন। ভক্তপ্রবর গিরিশ ঘোষ মা'র বাড়ির পাশের বৈঠকখানায় শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করবার জন্য বসে আছেন। এমন সময়ে এক বাউল ভিখারী এসে আগমনী গান গাইল। মা দুর্গা, দক্ষনন্দিনী, দেবী ভগবতী—এইসব বলে প্রাণ ভরে গান গেয়ে শ্রীশ্রীমা'র দরজায় মা'র স্তুতি-বন্দনা করল। ভক্ত গিরিশের দুচোখে জল। কাঁদতে কাঁদতে ভিখিরী বাউলকে একটু বেশি টাকাই ভিক্ষে দিলেন, আর 'জয় জগজ্জননী, জয় জগজ্জননী' বলে মা'র উদ্দেশে বার বার প্রণাম করতে লাগলেন। ঘরের ভিতরে শ্রীশ্রীমা উদাসমনে অন্যমনস্ক হয়ে চালের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। মা বললেন, 'ও কি বলে গো, "দেবী ভগবতী, হিমালয়ের কন্যে", আমাকে এসব কি বলে গো?—তা হবও বা।' এই বলেই মা নিজের ভাব বদলে নিলেন। ভক্ত গিরিশ এসে মা'র চরণে লুটিয়ে প্রণাম করল।

যাঁরা তাঁর সাক্ষাৎ দর্শন ও কৃপা লাভ করে ধন্য হয়েছেন, নির্ভয় হয়েছেন, কৃতার্থ হয়েছেন তাঁদের মত ভাগ্যবান না হলেও, পরবর্তী কালে যাঁরা জন্ম নিয়ে শ্রীশ্রীমা'র ছবির সামনে ভক্তি-ভরে প্রণাম জানান, যাঁরা এই ছবির অন্তর্নিহিত অক্ষয় মাতৃসত্তাটির কোলে আশ্রয় লাভ করার শরণাগতি প্রার্থনা করেন, তাঁরাও ধন্য। তাঁরাও পরম সৌভাগ্যবান। শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের কথা উদ্ধৃত করে আশ্বাস দিয়েছেন: 'ছায়া, কায়া, ঘট, পট সমান।' আজকের এবং অনাগত কালের সব সন্তানের জন্যই ঐ অভয়বাণী। এওতো মায়েরই কথা, 'সব সময় মনে রেখো—তোমাদের পেছনে একজন মা আছেন।' মা আছেন—বিপদে সম্পদে, সুখে দুঃখে, উত্থানে পতনে—সকল অবস্থাতেই কল্যাণময়ী মা'র করুণা আমাদের ঘিরে আছে। তাঁর ছবি তাই কেবল ছবি নয়, অগণিত সন্তানের কাছে পরম স্নেহশীতল আশ্রয়।

জয়রামবাটী ঃ শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা-শতবার্ষিকী

শ্রীমতী হীরাবতী দত্তগুপ্তা

'দয়ারূপে দয়াদৃষ্টে দয়ার্দ্রে দুঃখমোচনি।
সর্বাপত্তারিকে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে॥'

—হে দয়ারূপিণী দয়াদৃষ্টিযুক্তা দয়ার্দ্রা দুঃখনাশিনী সর্ববিপত্তিতারিণী জগদ্ধাত্রী দুর্গা, তোমাকে নমস্কার।

*

১৯৭৭-এর সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ। জয়রামবাটীর শ্রীশ্রীমাতৃ-মন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী গৌরীশ্বরানন্দজীর কাছ থেকে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা ও শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজার মুদ্রিত আমন্ত্রণ-লিপি

পেলাম। মনটা আনন্দে ভরে গেল, যখন পড়লাম, 'ওরা অগ্রহায়ণ, ইং ১৯শে নভেম্বর, শনিবার শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সঙ্কল্পিত প্রথম শতবার্ষিক "শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা" সম্পন্ন হইবে।' একে তো আমি জয়রামবাটীর মাতৃমন্দিরে ৺জগদ্ধাত্রীপূজা কোন দিন দেখিই নি, তার ওপর এবার সেই পূজার শতবার্ষিকী! তখনই খুব ইচ্ছা হলো শতবর্ষ-পূর্তি-উৎসবে যোগদান করতে। কিন্তু মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলিনি, কারণ তিন মাস আগে থেকেই আমরা ঠিক করেছিলাম যে, পূজার সময়ে বম্বে আশ্রমে পূজা দেখবো এবং কয়েকদিন সেখানে থাকবো।

'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'য় পড়েছি, ৺জগদ্ধাত্রী-পূজার মাহাত্ম্য। মা নিজমুখেই ব'লেছেন: একবার জয়রামবাটী গ্রামের কালীপূজায় মায়ের মা শ্যামাসুন্দরী দেবীর সংরক্ষিত ঐ পূজার জন্য চাল গ্রামের এক কর্তাব্যক্তি নিলেন না। মায়ের মা সারা রাত কাঁদলেন। তারপর রাতেই দেখেন কি, লাল-রঙ এক দেবী দুয়ারের ধারে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসেছেন। তিনি বললেন, 'তুমি কাঁদছ কেন? কালীর চাল আমি খাব। তোমার ভাবনা কি?' মায়ের মা বললেন, 'কে তুমি!' দেবী বললেন, 'আমি জগদম্বা, জগদ্ধাত্রীরূপে তোমার পূজা গ্রহণ করবো।' তখন থেকে 'জগদ্ধাত্রী পূজো করবো', 'জগদ্ধাত্রী পূজো করবো'—তাঁর একটা বাই হয়ে গেল। মায়ের এক ভাই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে খবর দিতে গেলেন। ঠাকুর শুনে বললেন, 'মা আসবেন, মা আসবেন, বেশ বেশ। তোদের অবস্থা বড় খারাপ ছিল রে।... বেশ, বেশ, তোদের ভাল হবে।' জগদ্ধাত্রী পূজা হলো। দেশসুদ্ধ লোক প্রসাদ পেলেন। পরের বছরও মায়ের মা পূজার আয়োজন করাতে মা প্রথমে রাজী হননি। কারণ, অভাবের সংসার—বাসন মাজা থেকে শুরু করে প্রায় সব কাজ মাকেই করতে হতো। অনেক ল্যাঠা! রাত্রে কিন্তু মা স্বপ্নে দেখলেন জগদ্ধাত্রী ও তাঁর দুই সখী জয়া ও বিজয়াকে। তাঁরা বললেন, 'আমরা তবে যাবো?' মা বললেন, 'না, না, তোমরা কোথা যাবে? তোমরা থাকো।' সেই থেকে মা বরাবর জগদ্ধাত্রীপূজার অনুষ্ঠান করেছেন জয়রাম-বাটীতে। মা প্রচলিত একদিনের জায়গায় দেবীকে তিন দিন ধরে রেখে সমারোহে পূজা করতেন। এবং তাঁর অবর্তমানে যাতে পূজাটি প্রতিবৎসর নিয়মিতভাবে চলে, তার ব্যবস্থাও ক'রে গিয়েছিলেন। সেই পূজার এবার শতবার্ষিকী! কার না প্রাণ চায় তাতে যোগদান করতে!!

কিন্তু বম্বে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী নিরাময়ানন্দজীর সঙ্গে পত্রবিনিময় করার ফলে সেখানকার শ্রীশ্রীদুর্গাপূজায় যোগদান করতে যেতে হলো। সেখানেই শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা ও শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজার আনন্দ উপভোগ করলাম। ১৫ই অক্টোবর কলকাতা থেকে যাত্রা ক'রে ১৯ দিন বম্বে নাসিক ও গোয়ায় কাটিয়ে ৪ঠা নভেম্বর রওনা হয়ে ৬ই নভেম্বর কলকাতায় ফিরলাম আমরা। ফিরে এসেই জানাশোনা কয়েকজন ও সারদা সংঘের অনেকের কাছে খোঁজ করে দেখলাম, কে কবে কীভাবে জয়রামবাটী যাবে। কিন্তু কেউ কিছু সঠিক বলতে পারল না।

তখন একাই যাব ঠিক করলাম। অবশ্য আমার একজন গুরুভগ্নী একা যাওয়ার সাহস দিয়ে সাহায্য করল। সে বলল, 'এসপ্ল্যানেডে গিয়ে বাসে উঠে একেবারে জয়রামবাটীতে মায়ের ঘাটে বাস থেকে নামবে। তুমি চলে যাও, কিছু অসুবিধা হবে না। তুমি ত একা, মায়ের বাড়ীতে জায়গা পেয়ে যাবে।' দু দিন

আগে একাই এসপ্ল্যানেডে এসে বিষ্ণুপুরের একটা টিকিট কাটলাম, কারণ জয়রামবাটীর টিকিট পেলাম না। আমার কোন জ্ঞান নেই, সঙ্গী-সাথী কেউ নেই, থাকার ব্যবস্থা নেই—ইত্যাদি জেনেও জয়রামবাটী যাওয়ার জন্ম আমার মন ব্যাকুল। কোন বাধাই আমাকে বিচলিত করতে পারল না। অবশ্য, আমার স্বামীই আমাকে বাসে তুলে দিয়ে এবং বাসের কণ্ডাক্টারকে ও অন্ম যাত্রীদের বলে গেলেন, 'এই মহিলাটিকে জয়রাম-বাটীতে নামিয়ে দেবেন।' আমি ত মনের আনন্দে বাসে উঠে বসে পড়লাম। সেদিন ১৮ই নভেম্বর, ১৯৭৭।

সাত বছর পর এবার মায়ের বাড়ী যাচ্ছি। যাহোক, শ্রীগুরুর কৃপায় ও শ্রীশ্রীমায়ের আশী-র্বাদে বেশ ভালভাবেই বেলা সাড়ে এগারটায় মায়ের বাড়ী পৌঁছে গেলাম। রিকশা থেকে নেমে মায়ের নতুন বাড়ীর দাওয়ায় সুটকেস ও বিছানা রেখে মার মন্দিরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে মহারাজদের প্রণাম করে, পঙ্‌ক্তিতে বসে প্রসাদ পেলাম। তারপর মায়ের নতুন বাড়ী এসে দেখি মায়ের ভাইঝি রাধুদির মেয়ে নির্মলা ও আমার পরিচিত এক ভক্ত মহিলা তাঁদের ঘরে আমার বিছানা সুটকেস রেখে বিছানা পেতে শোবার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আমি ত মায়ের করুণা দেখছি। আমার শোবার ব্যবস্থা মা-ই করে দিলেন। আমার আর কিছু ভাববার রইলো না।

অনেক দিন পরে এসেছি। মায়ের বাড়ীর অনেক কিছু পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। পুণ্যধাম শ্রীশ্রীমায়ের জন্মভূমি জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা! হাট-বাজার দোকান-পসার—চারিদিক জমজমাট। গাঁয়ের লোক দূরদূরান্তর থেকে দলে দলে আসছে। লোকে লোকারণ্য। ভীষণ ভিড়। আনন্দ-কলরবে জয়রামবাটী মুখরিত। ঘুরে ঘুরে দেখছি। সন্ধ্যা-আরতি দেখে ভজন-গান শুনে রাত্রে প্রসাদ পেয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুম কি আসে! আগামীকাল ১৯শে নভেম্বর, ১৯৭৭, শনিবার শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা।

রাত তিনটের ঘুম থেকে উঠে স্নান ইত্যাদি সেরে, গরদের শাড়িখানা পরে শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজীর হাতের দেওয়া জপের মালা বুকের মধ্যে করে, হাতে একখানা আসন নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মায়ের পূজা আরতি ভোগরাগ অঞ্জলি হোম ইত্যাদি প্রাণ ভরে দেখলাম। আর যখন যেখানে সুযোগ-সুবিধা পেতাম বসে পড়তাম। আপ্রাণ চেষ্টা করতাম ধ্যান ও জপের মাধ্যমে মাকে পেতে। প্রথম অঞ্জলি দিয়ে সেই দিনই সিংহবাহিনী মায়ের বাড়ী একাই চলে গেলাম। সিংহবাহিনী মায়ের বাড়ীতেও ভীষণ ভিড়। সিংহবাহিনী মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে পূজা দিয়ে ফিরে আসছি শ্রীমায়ের মন্দিরে। সবখানেই ভিড়ে ভিড়। হাঁটাও যায় না। হাঁটার পথে চেনা মুখ পড়ে যাওয়ায় অনেকে জিজ্ঞাসা করছে, কবে এসেছ, কার সঙ্গে এলে, কোথায় আছ ইত্যাদি। মাতৃ-মন্দিরে তিলার্ধ জায়গা নেই। আমি একেবারে আনন্দ-সাগরে ডুবে গেলাম। ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছু নেই। এভাবে সপ্তমী অষ্টমী তিথির পূজা শেষ হয়ে গেল।

নবমী পূজার আয়োজন শুরু হচ্ছে। মায়ের নতুন বাড়ী এসে দেখি, আমাদের সারদা সংঘের কয়েকজন বোন আমাদের সংঘের জয়রামবাটীর শিশুবিহার স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের একটু মিষ্টিমুখ করাবার কথা আলোচনা করছে। সকলেই সারাদিন

ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত। খাওয়া-দাওয়াও তেমন হয় নি। তখন বেলা চারটে। 'কে যাবে?' বলায় আমি এক কথায় রাজী হয়ে গেলাম। আমার সঙ্গে আরেকটি বোনও গেল। রাজভোগ ও গরম সিঙ্গাড়া নিয়ে রিকশায় উঠে স্কুলবাড়ীতে চলে এলাম। স্কুলবাড়ী এসে দেখি সংঘের কয়েকজন বোন বসে আছে। আর শিশুবিহারের শিশুরা চাঁদের হাটের মত লাইন করে বসে আছে। শিক্ষিকা মেয়েটি তাদের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কী পরিবেশে গিয়ে যে আমি পড়লাম তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। কি সুন্দর তাদের আবৃত্তি, তাদের নাম বলার ভঙ্গি—দেখে অবাক হয়ে গেলাম। পাড়াগাঁয়ের শিশু এরা। কি সহজ সরল মন, যেন সব প্রকৃতির দুলাল। শিক্ষিকা মেয়েটিকেও ভাল লাগল। মনে হল তাদের আদরযত্ন করেই তৈরীর চেষ্টা করছে। আমি আনন্দে বিভোর হয়ে গেলাম। সারাদিন এত যে পরিশ্রান্ত, তা একটুও বুঝতেই পারলাম না। অল্প বয়সের মেয়ের মত কোমরে কাপড় বেঁধে তাদের খাবার পরিবেশন করলাম। শিক্ষিকা মেয়েটি আমাকে সাহায্য করল। স্কুলবাড়ীটি আমি আর কোন দিন দেখি নি। দেখে খুব ভাল লাগলো। একেবারে বাস-চলার রাস্তার ওপর। পাশেই একটি ব্যাঙ্কের বাড়ী। মায়ের বাড়ীর থেকেও কাছেই। ভবিষ্যতে যদি পরিকল্পনা অনুযায়ী বাড়ী তৈরী হয়, তখন আমাদের সারদা সংঘের আনন্দের সীমা থাকবে না। শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদই আমাদের একমাত্র সম্বল।

স্কুলবাড়ীর আনন্দের পরিবেশ থেকে মায়ের মন্দিরে এসে দেখি নবমী তিথির পূজা শেষ। হোমের শিখার টিপ কপালে পরে বসে পড়লাম। আরতি শুরু হল। দুই দিকের দুই পূজারী মহারাজ—শ্রীশ্রীমায়ের পূজারী নিঃস্পৃহানন্দজী আর শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীর পূজারী অম্বিকানন্দজী প্রাণ ঢেলে শ্রীশ্রীমায়ের ও শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী মায়ের আরতি করছেন। এত সুন্দর আরতি ও ঢাক কাঁসরের বাজনার পরিবেশের মধ্যে দুই মায়ের দিকে তাকাতে তাকাতে শেষে দেখতে পেলাম দুই মায়ের মূর্তি এক মায়ের মধ্যেই মিশে গেল! কি অপূর্ব দৃশ্য! এসব লেখা যায় না। ভাষা এখানে মূক। আরতি শেষ হয়ে গেল। তারপর 'রাজা হরিশচন্দ্র' যাত্রাভিনয় হলো। তাও দেখলাম। ক্লান্তি নেই। কেবল আনন্দ। যাত্রার পর প্রসাদ পেয়ে এসে শুয়ে পড়লাম।

আজ রবিবার ২০শে নভেম্বর। অনেকে কামারপুকুর যাচ্ছেন। আবার অনেকে বাড়ীও চলে যাচ্ছেন। কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের আমল থেকেই তিন দিন ধরে জগদ্ধাত্রীপূজা চলে আসছে, তাই আমিও স্থির করেছি তিন দিন থেকে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজার সব অনুষ্ঠান দেখব। আজও ভোগরাগ পূজা আরতি সব দেখলাম। শ্রীশ্রীমাকে ও শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী মাকে হৃদয়ভরে অঞ্জলি দিলাম। কাল থেকে আজ ভিড় অনেক কমে গেছে। দুপুরবেলা খুব পরিতৃপ্তি করে প্রসাদ পেলাম। আজ এক ভক্ত ভাণ্ডারা দিয়েছেন। এইভাবে আনন্দে দিন কাটালাম। সন্ধ্যাবেলা আরতি দেখলাম। আরতির পর অনেক বাজি পোড়ানো হলো। শিশুদের মত খুব আনন্দ করে দেখলাম। রাত্রে প্রসাদ পেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

আজ সোমবার ২১শে নভেম্বর একাদশী তিথি। ভোরে উঠে মঙ্গলারতি দেখে স্নান

ইত্যাদি সেরে মন্দিরে চলে গেলাম। আজও মায়ের ভোগরাগ পূজা আরতি খুব সুন্দরভাবে হলো। প্রাণভরে দেখলাম। পূজা শেষ হওয়ার পর জল-ভরা বড় একটি পিতলের গামলায় শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী মায়ের নিরঞ্জন মূর্তি দর্শন করলাম। তারপরই মনটা যেন দমে গেল। কিছুক্ষণ পরে আমাদের পরমশ্রদ্ধেয় বড় মহারাজ অর্থাৎ কিশোরী মহারাজজীকে প্রণাম করতে তাঁর ঘরে গেলাম। প্রণাম করতেই নানা কথাবার্তা বলে অনেক খোঁজ-খবর নিলেন। বয়স ৯১ বছর। মায়ের অনেক কথা বলতেন। তাঁর কাছে দু'বেলাই যেতাম। ভাল লাগত মায়ের কথা শুনতে। আজ আমাকে মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের এক-খানা প্রসাদী শাড়ি হাতে দিয়ে বললেন, 'এই প্রসাদী কাপড়খানি পরে তুমি জপধ্যান করো, মা।' তখন আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে মাথায় তুলে নিলাম প্রসাদী শাড়িখানি। শ্রদ্ধেয় মহারাজজীকে আবার প্রণাম করতেই আশীর্বাদ করলেন। আমার মনে হলো মা যেন নিজ হাতে আমায় তাঁর প্রসাদী শাড়িখানি দিলেন। মহারাজজীকে মায়েরই প্রতীক মনে হলো। আনন্দে মনপ্রাণ ভরে গেল। মা আমার হৃদয় পূর্ণ করে দিলেন। দুপুরে প্রসাদ পেয়ে একটু বিশ্রাম করেই তিনটে নাগাদ মন্দিরে চলে এলাম।

বিকেল সাড়ে তিনটেয় রামনাম সংকীর্তন আরম্ভ হলো। শ্রীরামনাম শুনলাম। সন্ধ্যায় যথারীতি শ্রীশ্রীমায়ের আরতির পর শ্রীশ্রীজগ-দ্ধাত্রী মাকে বরণ করা হলো। খুব সুন্দর করে ব্রহ্মচারী মহারাজজীরাই বরণ করলেন। পরে আমরা প্রণাম করলাম। তারপর কর্মীরা মাকে কাঁধে করে বাদ্যসহকারে শ্রীমায়ের ঘাটে বিসর্জন দিয়ে পিতলের কলসী ভরে শান্তির জল নিয়ে এলেন। শ্রীমায়ের নাটমন্দিরে পূজারী মহারাজজী সাধু ব্রহ্মচারী ভক্তবৃন্দ সকলের মাথায় শান্তিবারি সিঞ্চন করলেন। শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী মায়ের তিন দিনের পূজা পরমানন্দে প্রাণভরে দেখে তৃপ্ত হলাম।

আজ ২২শে নভেম্বর ১৯৭৭, মঙ্গলবার। স্বামী সুবোধানন্দ মহারাজজীর আবির্ভাব-তিথি। সকালে মায়ের নাটমন্দিরে তাঁর প্রতিকৃতি সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। আমি ভোরে উঠেই মঙ্গলারতি দেখে তাঁর পদমূলে প্রণাম করি। তারপর শ্রদ্ধেয় মহারাজ-জীদের প্রণাম করে কামারপুকুর যাওয়ার কথা বলি। তখন মহারাজজীরা বলেছিলেন— শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন ও প্রণামাদি করে চলে আসবেন এবং এখানেই প্রসাদ পাবেন।

কামারপুকুরে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বাল্য-ভোগে জিলিপি ও বোঁদে ভোগ দেবার জন্য আগেই ময়রার দোকানে দৌড়ে যাই। গিয়ে দেখি সবেমাত্র উনুনে কড়া চাপিয়ে জিলিপি ছাড়া হচ্ছে। গরম জিলিপি ও বোঁদে নিয়ে আসতে আসতে মন্দিরে গিয়ে দেখি বাল্য-ভোগ দিয়ে দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। মনটা দমে গেল। পূজারী মহারাজ বললেন— রঘুবীরের মন্দিরে নিবেদন করে প্রসাদ নিয়ে যান, নতুবা ১১টায় শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগ হবে তখন দেওয়া হবে, ততক্ষণ আপনাকে থাকতে হবে। আমি তাতেই রাজী হয়ে গেলাম।

ইত্যবসরে মন্দিরের দরজার বাইরে বসে জপধ্যান করি। যোগী শিবের মন্দির, 'ধনী' মায়ের বাড়ী, শ্রীশ্রীঠাকুরের পাঠশালা ইত্যাদি ঘুরে ঘুরে দেখে স্বামী নির্জরানন্দজীর কাছে গিয়ে কথাপ্রসঙ্গে বলি, আমাকে ঠাকুরের ভোগ ওঠার পর যেতে হবে। উনি খুব আপত্তি করে বললেন, আপনাকে এখানেই

প্রসাদ পেয়ে যেতে হবে। তাই শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ পেয়েই আমাকে আসতে হলো।

জয়রামবাটী এসে দেখি, আমি যে ঘরে থাকতাম, সেটা তালা-দেওয়া। নির্মলারা সব প্রসাদ পেতে চলে গেছে। আজ মায়ের বিশেষ পূজা হয়েছে। স্বামী সুবোধানন্দ মহারাজজীর জন্মতিথি উপলক্ষে ভাণ্ডারার আয়োজনও খুব ভাল। ভক্তদের সেদিন প্রসাদ পেতে দেরীও হয়েছে। আমি ঘরের চাবি আনতে গিয়ে দেখি তখনও সবাই খাচ্ছে। আমি আর বসে খেতে পারলাম না। গ্লাসে করে পায়েস, একটু মাছ ও অন্ন নিয়ে খেয়েছিলাম।

এরপর রওনা হবার পালা। সব গুছিয়ে মন্দিরে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে শ্রদ্ধেয় বড় মহারাজজীকে প্রণাম করতেই বললেন, 'আবার এসো মা

'আবার এসো মা'—এ যেন মায়েরই মুখের কথা শুনলাম। পরিপূর্ণ হৃদয়ে আনন্দের পসরা মাথায় নিয়ে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা-শতবার্ষিকীর অক্ষয় স্মৃতি-সম্পদ বুকে জড়িয়ে পবিত্র ধাম জয়রামবাটী থেকে রওনা হলাম।

বিকেল পাঁচটায় বাসে উঠে রাত প্রায় সাড়ে আটটায় এসপ্ল্যানেডে পৌঁছি। সেখান থেকে ট্যাক্সি করে যোধপুর পার্কে আমাদের বাসায় রাত নটা নাগাদ নির্বিঘ্নে পৌঁছে যাই। শ্রীশ্রীমায়ের অপার করুণা! আমার এই বৃদ্ধ বয়সে একার পক্ষে কোনরূপ কষ্ট বা অসুবিধা হতে দিলেন না মা। জয় মা!

জয়রামবাটীতে এ ক'দিন আমাকে সবচেয়ে আকর্ষণ করতো মঙ্গলারতির শঙ্খধ্বনি ও সানাই-এর সুর। মন ব্যাকুল হয়ে উঠতো। মনে হতো যেন অন্ধকারে দুর্যোগের রাতে বৃষ্টিতে ভিজে ছুটে চলেছি মায়ের ডাকে। যেন শুনতে পেতাম মা ডাকছেন, 'ওরে তোরা আয় আমার কাছে, আমি যে তোদের জন্ম পঞ্চপ্রদীপের শিখা নিয়ে বসে আছি।'

'জননীং সারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্‌গুরুম্‌।
পাদপদ্মে তয়োঃ শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ॥'

সমালোচনা

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ : শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক : মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। (১৯৭৮), পৃঃ ২৯২, মূল্য কুড়ি টাকা।

বাংলা সাহিত্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়েছে; কিন্তু এতদিন ঠাকুরের নাট্যপ্রীতি ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে তাঁর প্রভাবের দিকটা একেবারেই অনুদ্‌ঘাটিত ছিল। তিনি সাক্ষাৎ ভগবান বা ভগবানের অবতাররূপে এই মর্ত্যে আবির্ভূত হয়েছেন—এই সত্যই আমাদের জানা ছিল। কিন্তু তিনি যে রঙ্গজগৎকে কতখানি ভালবাসতেন—তা আমাদের অজানা ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বঙ্গ নাট্যসমাজে কিভাবে অনুভূত হয়েছে এবং কিভাবে এই রঙ্গজগৎকে উজ্জীবিত করেছে—তারই ইতিহাস বিবৃত হয়েছে এই গ্রন্থে। এদিক থেকে এই বই এই বিষয়ের পথিকৃৎ এবং নাট্যীয় আলোচনার ক্ষেত্রে দিকচিহ্ন-বিশেষ। লেখক অসম্ভব পরিশ্রম করে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন, সেগুলি গ্রন্থটির যেমন ঐতিহাসিক মূল্যবৃদ্ধি করেছে, তেমনি বাঙালীর সামাজিক, জীবনের, বিশেষ করে,

রঙ্গজগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত আমাদের যে সমাজ-জীবন—তার এক অপরিহার্য দলিল হয়ে উঠেছে।

এই গ্রন্থে ঠাকুরের সস্নেহ সান্নিধ্য বঙ্গ রঙ্গমঞ্চকে কেমন করে প্রভাবিত করেছে—তার অতিবিস্তার আলোচনা আছে; প্রসঙ্গ-ক্রমে এসেছে রঙ্গজগতের সংশ্লিষ্ট তাবৎ নটনটী, নাট্যকার, কলাকুশলী কেমন করে এবং কি গভীর দাক্ষিণ্যের সঙ্গে ঠাকুরের আশীর্বাদ লাভ করে ধন্য হয়েছেন, এবং ঠাকুরের আশীর্বাদে আধ্যাত্মিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। গোড়ায় রঙ্গজগতের সঙ্গে সামাজিক জীবনের মেলবন্ধন ততটা শ্রদ্ধেয় ছিল না, পতিতার দ্বারা নারীচরিত্রের ভূমিকা অভিনীত হতো বলে তথাকথিত উচ্চশিক্ষিতের মধ্যে নাক-উঁচু ভাব ছিল, কিন্তু যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ কিভাবে এই সব অভিনেতা-অভিনেত্রীকে স্নেহ ও করুণা দান করে ধন্য করেছেন—তার বিস্তৃত বিবরণ গ্রন্থকার অপরিসীম শ্রম সহকারে সংগ্রহ করেছেন।

শুধু ঠাকুর নন, শ্রীমা, ঠাকুরের শিষ্যবৃন্দ, মঠের সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী মহারাজেরাও বঙ্গের রঙ্গালয়-জগতের প্রতি কতদূর স্নেহশীল ছিলেন—তারও পরিচয় গ্রন্থকার নিপুণতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন।

এই গ্রন্থে এক অনাদৃত সমাজের প্রতি ঠাকুরের স্নেহ ও দয়া বিতরণের পূর্ণ বিবরণ গ্রথিত হয়েছে। সেই সঙ্গে তাঁর জীবন ও বাণী কিভাবে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে, তারও বিস্তৃত বিবরণ ঘটনাসহ বর্ণিত হয়েছে। লেখকের বর্ণনাগুণে সেই সব ঘটনার ছবি পাঠকের চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে ফুটে ওঠে। গিরিশচন্দ্রের নাটকাবলীতে ঠাকুরের কৃপা এবং নির্দেশের কথা যেমন আছে, তেমনি স্বামী বিবেকানন্দের জীবনচর্যা এবং ধর্মাদর্শও নাট্যকারকে কতদূর প্রভাবিত করেছে—তার হদিসও রয়েছে গ্রন্থে।

ঠাকুরের প্রভাবে নাট্যকার যেমন নাটক লিখেছেন, ঠাকুর এবং বিবেকানন্দের জীবনা-দর্শকে প্রচার করার জন্যে নাটকে চরিত্রসৃষ্টি করেছেন, তেমনই শিল্পী অভিনয়ের প্রাক্কালে ঠাকুরের চরণে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে মঞ্চে বা আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে যে গ্রন্থই লেখা হোক না কেন, তা অমৃতকথা হয়ে ওঠে। অধ্যাপক নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের আর কোনো গ্রন্থ আমরা আগে দেখিনি; মনে হয়—এটি তাঁর প্রথম দীর্ঘকায় বই। এই প্রথম গ্রন্থেই তিনি বাজীমাৎ করেছেন। ভাষা সুললিত, ঘটনা-সংস্থাপন নাটকীয় এবং প্রায় তিনশো পাতার বইতে প্রতি পৃষ্ঠাতে সর্বদাই ঠাকুরের প্রসঙ্গ এনেছেন—নতুন তথ্যের আলোকে, এইখানেই লেখকের আর এক মুন্সিয়ানার পরিচয়। আর ঠাকুরের উপস্থিতি মানেই অমৃত এবং সৌরভের বন্যা। তাই এই বই একবার পড়তে শুরু করলে মুহূর্তের জন্যেও থামা যায় না—শেষ না হওয়া পর্যন্ত।

গ্রন্থটির সামাজিক প্রয়োজনের দিকটির প্রতিও লেখকের দৃষ্টি এড়ায় নি। আজকের রঙ্গলোক সর্বজনস্বীকৃত এবং মর্যাদাবিভূষিত; এবং এই জগতের আদি বাসিন্দারা কিন্তু আত্মত্যাগের মাধ্যমে এই রঙ্গলোকের সেবা ব্রতসাধনার নিষ্ঠা নিয়েই করে গেছেন, তাঁদের জীবনের একমাত্র সান্ত্বনাস্থল যে ঠাকুরের আশীর্বাদ, এই পরম সত্যটি উদ্ঘাটনের জন্যে রঙ্গজগতের সকলেই যেমন গ্রন্থকারের কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করবেন, তেমনি থিয়েটার জগতের সামাজিক জীবনের মূল্যবোধ নিয়ে যাঁরা

গবেষণা করবেন—তাঁরাও গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারবেন না।

এই বইয়ের আর এক অমূল্য সম্পদের কথা উচ্চকণ্ঠে না বললে অন্যায় হবে, সে হলো এই গ্রন্থের কিছু দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র। সেকালের হারিয়ে যাওয়া বহু মূল্যবান দলিল এবং ঘটনার আলোকচিত্র এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। এতে গ্রন্থের অঙ্গসৌষ্ঠবের শুধু শ্রীবৃদ্ধি হয় নি, বহু ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতিচ্ছবি পাঠকের কাছে চাক্ষুষ উপলব্ধির বস্তু হয়েছে। এ জন্যেও লেখক ও প্রকাশক—উভয়েই আমাদের ধন্যবাদভাজন।

ডক্টর শুদ্ধসত্ত্ব বসু

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ১৯৭৭-৭৮ সালের প্রকাশিত কার্যবিবরণীর সারসংক্ষেপ :

হাসপাতালের অন্তর্বিভাগে ১২১টি শয্যা আছে। ৫, ৪১৭ জন রোগী ভর্তি হন। তন্মধ্যে সম্পূর্ণ ও অংশতঃ আরোগ্যলাভকারী রোগীর সংখ্যা ৪,৭৬১ ; ৪০৩ জনকে চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয় ; ১৭৪ জন মারা যান ; বছরের শেষে ৭৯ জন চিকিৎসাধীন থাকিয়া যান। মোট অস্ত্রোপচারের সংখ্যা ২,১৬৩। গড়ে দৈনিক ১০৩টি শয্যা ভর্তি ছিল।

বহির্বিভাগে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ৩,১৩,৪৩৯। তন্মধ্যে নূতন ৬২,৬৬১ জন। অস্ত্রোপচারের সংখ্যা ১,৩৮৪। রোগীর দৈনিক গড় ৮৫৯।

মলমূত্রাদি পরীক্ষার সংখ্যা ৩৩,৯৪০। ৪,২২০টি এক্সরে ফটো তোলা হয়। ফিজিও-থেরাপি ও ই. সি. জি-র সংখ্যা যথাক্রমে ১৫৭ ও ৩৫০।

নন্দবাবা চক্ষু বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা—অন্তর্বিভাগে ৫১৯ এবং বহির্বিভাগে ৮,৬১২। অস্ত্রোপচারের সংখ্যা ৯৩২। বৃন্দাবন হইতে ৩৮ কিঃ মিঃ দূরে কোশী-কালানে পাক্ষিক চক্ষুচিকিৎসা ক্লিনিকে গড়ে ১৩৫ জন গ্রামবাসী চিকিৎসিত হন। অনেকগুলি অস্ত্রোপচারও করা হয়।

শেঠ শ্রীমানেকলাল চিনাই ক্যানসার বিভাগে মোট ৮টি শয্যা ছিল। অন্তর্বিভাগে ৭৯ এবং বহির্বিভাগে ৮৪ জন রোগী চিকিৎসিত হন।

হোমিওপ্যাথি বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা—নূতন ৫,৪৯৬ এবং পুরাতন ২৮,৩৮৭।

চিকিৎসা ব্যতীত দুঃস্থ, দরিদ্র ছাত্র ও হরিজনদের নগদ ও দ্রব্যে মোট ৩,৯০৩.১১ টাকা সাহায্য করা হয়।

হাসপাতালের বর্তমান ঋণের পরিমাণ ৬৬,১২৮.৫৬ টাকা। এই ঋণ-পরিশোধ ও নানা উন্নয়নমূলক প্রকল্পের রূপায়ণে কর্তৃপক্ষ সহৃদয় জনসাধারণের নিকট মোট ১৪, ২৫, ৪৬৬. ৫৬ টাকার সাহায্যের জন্য আবেদন জানাইয়াছেন।

চণ্ডীগড় রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৭৭-৭৮ সালের প্রকাশিত কার্যবিবরণীর সারসংক্ষেপ :

প্রার্থনা-গৃহে নিয়মিত ধ্যান ও প্রার্থনা, পাক্ষিক রামনাম-সংকীর্তন, শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবুদ্ধ যীশুখৃষ্ট গুরুনানক প্রমুখ মহাপুরুষগণের আবির্ভাব-তিথি, শিবরাত্রি, দুর্গোৎসব প্রভৃতি পালিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-তিথিতে বিশেষ

পূজা এবং তাঁহাদের বাৎসরিক জন্মোৎসবে বক্তৃতা, 'রামচরিত-মানস' আলোচনা, ভজন, প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে ফল, মিষ্টান্ন ও ক্রীড়াসামগ্রী বিতরণ প্রভৃতি হয়; অধিকন্তু শিশু ও যুবকদের জন্য একটি বিশেষ দিনে বেদমন্ত্র-আবৃত্তি, ভজন, শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর কথিত কাহিনীর অভিনয়াদিও হয়।

প্রতি শনিবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত আলোচিত হয়। প্রতি রবিবার রামচরিত-মানস গানের মাধ্যমে ব্যাখ্যাত হয়। শিশু ও যুবকদের চরিত্রগঠন ও আগ্রহীদের ধর্মজীবন যাপনের সাহায্যকল্পে সাপ্তাহিক অধিবেশন হয়; আশ্রমাধ্যক্ষ শহরের মধ্যে ও বাহিরের নানা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আহূত হইয়া ধর্মীয় আলোচনা ও বক্তৃতাদি করেন।

বিবেকানন্দ ছাত্রাবাসে (কলেজের ছাত্রদের জন্য) ৪০ জন ছাত্র রাখার ব্যবস্থা আছে। গ্রন্থাগারে ১৬৩৪ খানি বই ছিল; ব্যবহৃত হয় ৩৪১ খানি। 'প্রার্থনা' ও 'ভজনমালিকা' নামে দুইখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়।

অন্ধ্র ও তামিলনাড়ুর ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত জনগণের ত্রাণের জন্য সংগৃহীত ১৫,১২০ টাকা বেলুড় মঠে মিশনের মূল কেন্দ্রে প্রেরিত হয়।

উৎসব

এলাহাবাদ রামকৃষ্ণ মঠে গত ১৩ই নভেম্বর শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের ১১২তম জন্মোৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী নবসংস্কৃত পূজাকক্ষে ঠাকুর মা স্বামীজী ও বিজ্ঞান মহারাজের নূতন চিত্র স্থাপন করেন। এই অনুষ্ঠানের পূর্বে ঠাকুর মা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ মঠপ্রাঙ্গণে শোভা-যাত্রা এবং পরে বিশেষ পূজা হোম ও 'অবতারবরিষ্ঠ রামকৃষ্ণ' প্রসঙ্গে স্বামী শ্রীধরানন্দের ভাষণ হয়। প্রায় ১,০০০ ব্যক্তিকে প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় স্বামী বীরেশ্বরা-নন্দজী প্রায় ৪০০ ভক্তের সমাবেশে অভিভাষণ দেন। ২৫ জন সাধু অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এতদুপলক্ষে আয়োজিত অন্যান্য অনুষ্ঠা-নাদির মধ্যে ছিল: ১১ই নভেম্বর শ্রীবিশ্বনাথ বিশ্বাস ও তাঁহার সহশিল্পীবৃন্দ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের লীলাকীর্তন, ১২ই নভেম্বর স্বামী সত্যানন্দ প্রমুখ কর্তৃক কালীকীর্তন, ১৪ই নভেম্বর স্বামী অপূর্বানন্দ প্রমুখ কর্তৃক শ্যামনাম-সংকীর্তন ও বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের কণ্ঠসংগীত বিভাগের প্রধান শ্রীএম. আর. গৌতম কর্তৃক ভক্তিমূলক গান, এবং ১৫ই নভেম্বর 'যুগাবতার রামকৃষ্ণ' সম্বন্ধে স্বামী স্মরণানন্দের ভাষণ এবং বিজ্ঞানানন্দ বালক সংঘ কর্তৃক 'বিজ্ঞানানন্দের জীবন ও বাণী' এবং 'সর্বমঙ্গলা' নাট্যাভিনয়।

বিবিধ সংবাদ

অজ্ঞতার জ্ঞানকোষ

প্লাতাত্তর শ্রীপ্লিনি রচিত 'হিস্টোরিয়া নেচারেলিস' (Historia naturalis) হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান যুগের 'এনসাইক্লো-পিডিয়া ব্রিটানিকা' (Encyclopaedia Britannica)-তে মানুষের জ্ঞানরাশির সার বিধৃত। সম্প্রতি তেষট্টিবৎসর-বয়স্ক নাট্যকার রোনাল্ড ডানক্যান এবং একুশবৎসর-বয়স্ক মিরাণ্ডা ওয়েস্টন-স্মিথ ব্যাপারটিকে একটি ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। তাঁহাদের সম্পাদিত সদ্য-প্রকাশিত ৪৫০ পৃষ্ঠার 'অজ্ঞতার জ্ঞানকোষ'

(The Encyclopaedia of Ignorance) নামক পুস্তকে তাঁহারা মানুষ আজ পর্যন্ত কি কি জানে না, তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। সম্পাদকদ্বয়ের মন্তব্য: 'আমাদের জানা তথ্যগুলি যদি পুষ্করিণীর সমান হয়, অজানা তথ্য হইবে সে তুলনায় এ্যাটলান্টিক মহাসাগর।'

ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহারা ৫৮ জন বৈজ্ঞানিকের সাহায্য গ্রহণ করেন। সম্পাদকেরা অচিরেই লক্ষ্য করিলেন যে, যে সকল বৈজ্ঞানিক যত বেশী প্রসিদ্ধ, তাঁহারাই তত বেশী নিজেদের অজ্ঞতা প্রকাশ করিতে প্রস্তুত। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে অনেকেই বিশ্ববিখ্যাত: ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন নোবেল পুরস্কারবিজয়ী অণু-জীববিদ্যাবিশারদ ফ্রান্সিস ক্রিক ও স্যার জন কেন্‌ড্রু এবং রসায়নশাস্ত্রজ্ঞ লাইনাস পলিং। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন নৃতত্ত্ববিশারদ ডোনাল্ড জনসন, জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্যার হারমেন বণ্ডি ও টমাস গোল্ড, এবং পদার্থবিজ্ঞানী জন হুইলার। তাঁহারা যে সব প্রশ্ন তুলিয়া ধরিয়াছেন সেগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কিভাবে সৃষ্ট হইল? আমরা নিদ্রা যাই কেন? নক্ষত্রপুঞ্জ দ্বারা ছায়াপথ কি করিয়া হইয়াছে? আমাদের সচেতন অবস্থাটি কি? কোন কোন প্রাণী-জাতির বিলুপ্তির কারণ কি? বিশেষজ্ঞগণের প্রশ্নগুলিকে সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছেন সি. জে. এস. ক্লার্ক: আমরা যে কি জানি না, তাই জানি না।

কিন্তু অবস্থা এরূপ হইলেও তাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন। ক্রিক, যিনি ওয়াটসনের সঙ্গে প্রাণশক্তির কেন্দ্রবিন্দু ডি. এন. এ.'র গঠন-শৈলীর উপর নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন, লিখিয়াছেন: মলিকিউল বা অণু কিভাবে সৃষ্ট হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি, কিন্তু সেই মলিকিউল কিভাবে ফুল, হাত বা চোখ তৈয়ারি করে, তাহা আমরা জানি না। তিনি আরও বলিয়াছেন, প্রাণীর স্নায়ুমণ্ডলী কিভাবে তৈয়ারি হয়, সে সম্বন্ধে আমরা আরও অজ্ঞ।

শারীরবৃত্তবিশারদ হেনরি বুচেল ও জিও-ভ্যানি বারলুচি বলেন, পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্ব-বিভাগে ১৯৫০ সালে যে একটি প্রশ্ন তুলিয়া ধরা হইয়াছিল—'মস্তিষ্কের কোন্ অংশে এবং কিভাবে আমাদের স্মৃতি রক্ষিত থাকে?' তাহার সমাধান আজও হয় নাই। মনস্তত্ত্ব-বিশারদ উইলসে ওয়েব দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করেন, নিদ্রার উদ্দেশ্য যে কি, তাহা তিনি এখনও জানেন না।

বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রেও অজানা তথ্য প্রচুর। জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডগ্‌লাস গাফ্ বলেন, সূর্যের ভিতরের গঠন এবং সূর্য কিভাবে কাজ করে, তাহা এখন পর্যন্ত প্রহেলিকা। সুদূরবর্তী নক্ষত্র সম্বন্ধে তো কথাই নাই। প্রাচীন চীনারা সূর্যের মধ্যে যে কালো কালো দাগের উল্লেখ করিয়াছিলেন, সেগুলি যে কি তাহা, এখনও জানা যায় নাই। পদার্থবিদ্যার তাত্ত্বিক বিজ্ঞানী আবদুস্ সালাম স্বীকার করেন যে, বস্তুর আদি-উপাদান এখনও অজ্ঞাত এবং বস্তুর গঠন সম্বন্ধে আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান চালাইলে একের পর আর মৌল কণার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

বিজ্ঞানীরা এরূপ খোলাখুলি মত প্রকাশ করিলেও বইখানির সর্বত্রই আশার কথা আছে। সম্পাদকদ্বয় বিশ্বাস করেন যে এক দশক পরে পুস্তকে উল্লেখিত অনেক প্রশ্নের উত্তর মিলিবে। প্রাণীতত্ত্ববিদ্ এইচ্. এস্. মিক্লেম বলেন যে, শরীরের রোগ-প্রতিরোধ-ক্ষমতা সম্বন্ধে জ্ঞানের অনেক ফাঁকই

পূরণ হইবে। অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণও কোলরিজের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন যে, 'জ্ঞানকোষসমূহ ভাবী প্রগতিতে মানুষের আস্থার প্রতীকমাত্র।'

[Time, January 9,1978, p. 44]

কার্যবিবরণী

কলিকাতা রামকৃষ্ণ সারদা মিশন মাতৃভবনের ১৯৭৬-৭৮ সালের প্রকাশিত কার্যবিবরণীর সারসংক্ষেপ :

মাতৃভবন একটি দাতব্য প্রসূতিসদন। ইহার অন্তর্বিভাগে ৫৪টি শয্যা আছে। ২৬টি নিঃশুল্ক শয্যার মধ্যে ৮টি বাস্তুহারাদের জন্য। পরিবার-পরিকল্পনার জন্য ২টি পৃথক্ শয্যা আছে।

আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে বহির্বিভাগে যথাক্রমে ১৬,৪৫৯ ও ১৬,৫২৯ জনের প্রাক্প্রসব এবং ২,২৫৪ ও ২,৭৫৭ জনের প্রসবোত্তর ও গর্ভপ্রারম্ভান্তরের চিকিৎসা করা হয়। অন্তর্বিভাগে প্রসবের সংখ্যা যথাক্রমে ২,৯৩০ ও ২,৬৬৪; নিঃশুল্ক চিকিৎসার সংখ্যা যথাক্রমে ২,২২০ ও ২,০৪৬। শিশুচিকিৎসা-বিভাগে চিকিৎসিত শিশুর সংখ্যা যথাক্রমে ৫,০৬৫ ও ৬,৭২৩।

অন্যান্য কল্যাণমূলক কার্য : ১৯৭৬-৭৮এ বস্তি-অঞ্চলের ২০০ শিশু ও ৫৭ জন গর্ভিণীকে প্রত্যহ ১০০-১৫০ গ্রাম পুষ্টিকর পাঁউরুটি দেওয়া হয়। বস্তির ৬০টি শিশুর জন্য প্রত্যহ বিনা-পয়সায় কোচিং ও টিফিনের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৭৭ সালে ২০০ শিশুকে খাদ্য পোশাক ঔষধ স্কুলের বেতন বইপত্র ইত্যাদি বিনামূল্যে দেওয়া হয়। ইহাতে মোট ৩,২৬৩৮৬ টাকা খরচ হয়। স্থানীয় শিশু ও মহিলাদের জন্য ১৮০টি ধর্মীয় আলোচনা হয়। মাতৃভবনের গ্রন্থাগারে ১৪০৬টি পুস্তক ছিল; ১৯৭৭ সালে প্রসূতি ও স্থানীয় মহিলাগণ ৭৩৮টি পুস্তক পাঠ করেন।

বারাসত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমের ১৯৭৬-৭৭ সালের প্রকাশিত কার্যবিবরণীর সারসংক্ষেপ :

আশ্রমে প্রত্যহ ভজন প্রার্থনা এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী আলোচনা করা হয়; স্বামী বিবেকানন্দের ব্যাখ্যানুগত বেদান্তের আলোচনাও করা হয়। প্রধান প্রধান ধর্মীয় উৎসব ও আচার্যদের জন্মদিন পালন ছাড়াও শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীশ্রীমা স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ মহারাজের বাৎসরিক জন্মোৎসব বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ভক্তিমূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে পালিত হয়।

জনসেবামূলক কাজ: একটি দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে ৯,০৬৭ (১,০১৬ নূতন) জন রোগী চিকিৎসিত হন। দরিদ্রদের মধ্যে ১৫০ খানি কম্বল ও ৩১৭ খানি কাপড় বিতরণ করা হয়। অধিকন্তু শ্রীমৎ স্বামী কৈলাসানন্দ কর্তৃক প্রদত্ত ৫০ খানি ধুতিও বিতরণ করা হয়। পাঠাগারে ১০ খানি সাময়িক ও দৈনিক পত্রিকা ছিল।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের (শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী—উদ্বোধন) অধ্যক্ষ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ গত ১৩ই অগস্ট যে কথামৃতপ্রসঙ্গ করেন, তাহার পূর্বাংশ গত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমান সংখ্যায় ঐ দিনের আলোচনার শেষাংশ এবং ১৭ই অগস্টের গীতাপ্রসঙ্গের সারসংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

কথামৃত—

পূজ্যপাদ মাষ্টার মশায় (প্রথম ভাগের প্রথম খণ্ডের) পঞ্চম পরিচ্ছেদের প্রথমেই

বলছেন, 'সংসারার্ণবঘোরে যঃ কর্ণধারস্বরূপকঃ।' এই দুস্তর সংসারসমুদ্র পার করবার কাণ্ডারী তিনি পেয়ে গেছেন। তিনি হচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে পেয়েছেন গুরুরূপে, শিক্ষকরূপে। শিক্ষক পেলেই জ্ঞানলাভ হয়। যেমন তুলসীদাসজী বলেছেন, 'সদ্‌গুরু পাওয়ে, ভেদ বতাওয়ে, জ্ঞান করে উপদেশ। তব্ কয়লাকা ময়লা ছোড়ে, জব আগ্ করে পরবেশ॥' সদ্‌গুরু লাভ হলে উপযুক্ত শিষ্যের কাছে গুরুকৃপায় জগতের রহস্য পরিষ্কার হয়ে যায়। সৎ-অসতের, নিত্য-অনিত্যের ভেদ তিনি দেখিয়ে দেন। মানুষের তখন জ্ঞান হয়। শ্রীম সদ্‌গুরু পেয়েছেন, গুরুকৃপায় তাঁর অহঙ্কাররূপ মনের মালিন্য দূর হয়ে তত্ত্বজিজ্ঞাসা জেগেছে, তাই তিনি আন্তরিকভাবে প্রশ্ন করেছেন, 'ঈশ্বরে কি করে মন হয়?'

পরম কারুণিক শ্রীরামকৃষ্ণ তার উত্তরে বলেছেন, ভগবানের নামগুণকীর্তন করতে হয়। কিভাবে? না, একাগ্রচিত্তে, তন্ময় হয়ে। এ বিষয়ে ভক্তির শ্রেষ্ঠ সাধক নারদ বলছেন ভক্তিলাভের উপায়—'ভগবদ্‌গুণশ্রবণকীর্তনাৎ', 'অব্যাবৃতভজনাৎ'। ভগবানের নাম নিরন্তর শ্রবণ-কীর্তনের দ্বারা তাঁতে তন্ময়তা আসবে। স্বামীজী বলছেন, সংগীত মানুষের মনকে খুব সহজে একাগ্র করে দেয় আর তাতে সহজেই আধ্যাত্মিক উন্নতি হতে পারে। শাস্ত্র বলছেন, 'আবৃত্তিরসকৃৎ'। বার বার তাঁর নাম করতে হবে। তদ্বিষয়ক আলোচনা করতে হবে, তার দ্বারা মনের ওপর একটা ছাপ পড়ে যাবে। তাই বার বার শুনতে হবে তাঁর লীলাকথা

এই প্রসঙ্গে ঠাকুর আরো বলছেন, সাধুসঙ্গের কথা। 'মহৎকৃপয়ৈব'—মহতের অর্থাৎ সাধু-সজ্জনব্যক্তির করুণাতেই ভগবানে ভক্তিলাভ সম্ভব। তাঁদের উপদেশ, জীবনচর্যা ভগবানের ভাবের উদ্দীপক। তবে এই সাধুসঙ্গও দুর্লভ। কারণ প্রকৃত সাধু চিনতে পারাও কঠিন। 'লভ্যতেঽপি তৎকৃপয়ৈব'—ঈশ্বরকৃপাতেই যথার্থ সাধুর দর্শন ও সঙ্গ মেলে। আর সাধুসঙ্গের ফল 'অমোঘ'—অব্যর্থ। ঠিক ঠিক সাধুসঙ্গের ফলে ভক্তের জীবনের মোড় ফিরে যায়। তাই ঠাকুর বলছেন, সাধুসঙ্গ করতে।

সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর আবার বলছেন, মাঝে মাঝে নির্জনে বাস করবার জন্য। সংসারের জ্বালাযন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেতে, নিজের মনকে তলিয়ে দেখতে এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। একজন পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক বলেছেন, 'What is religion? It is what you do with your leisure.'—নির্জনতা নিয়ে তুমি যা করো তাই হচ্ছে ধর্ম। সংসারে দিনরাত মগ্ন হয়ে থাকলে মন মলিন হয়ই। 'কাজলকে ঘরমেঁ জিতনা সেয়ান্ হোয়ে, থোড়া বুঁদ লাগে পর্ লাগে।' সুতরাং বিষয়কাজ থেকে সরে গিয়ে মাঝে মাঝে নির্জনে আত্মচিন্তা একান্ত প্রয়োজন। এবং সেটা হবে অত্যন্ত গোপনে, মনে-বনে-কোণে। লোক দেখিয়ে নয়, নিজের ধর্মভাব জাহির করবার জন্য নয়।

এ ছাড়া আবার বলছেন ঠাকুর, আরো চাই—বস্তুবিচার। অর্থাৎ সদসদ্‌বিচার চাই। স্বামীজীর ভাষায়, পেল্লাদের ভক্তি হলে হবে না, 'ক'দেখেই কেঁদে অস্থির হলে চলবে না। ভগবানই সত্য আর সব মিথ্যা এটা বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে। এ জগতের প্রতিটি বস্তুর প্রকৃত পরিচয় ঠিক ঠিক বুঝে না নিলে অন্য কোন বুদ্ধিমানের কথায় আমার ভক্তির ভিত্তি টলে যেতে পারে। সেই জন্যই বিচার। অবশ্য মনে রাখতে হবে শুধু তর্ক

করবার জন্য এ বিচার নয়। শাস্ত্র বলছেন, 'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া।' শুধু তর্কের দ্বারা ভগবানে ভক্তি-বিশ্বাস হবে না, ঠিক কথা। কিন্তু কোন্ ভগবানকে ডাকবো, কেন ডাকবো, এটা বিচারের দ্বারাই বুঝে নিতে হবে। তাই ঠাকুর বলছেন, বস্তুবিচার চাই, মিথ্যা সংসার বিষয় থেকে বিচার করে করে ধীরে ধীরে মন উঠিয়ে নিয়ে ঈশ্বরে মন দিতে হবে।

গীতা—

শ্রীভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জুনকে জ্ঞানের উপদেশ করেছেন, তবে এই জ্ঞান লাভ করবার জন্য নিষ্কাম কর্মের প্রয়োজন। তাই ধর্মযুদ্ধরূপ নিষ্কাম কর্তব্য কর্মের উপদেশ তিনি করছেন। ভগবান শংকরাচার্য এই অধ্যায়ের ভাষ্যে বলেছেন, কর্মের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হলে সেই শুদ্ধচিত্তে জ্ঞান উদ্ভাসিত হবে। আর আচার্য রামানুজ এ প্রসঙ্গে জ্ঞানকর্ম-সমুচ্চয়ের কথা বলেছেন। স্বামীজীও এই ভাবেই বলেছেন, আরণ্যক যে আত্মতত্ত্ব, তাকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে কাজে লাগাতে হবে। বোধির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হলেই কর্ম যথার্থ নিষ্কাম হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও তাই প্রিয় সখা পার্থকে প্রথমেই সাংখ্যতত্ত্ব অর্থাৎ জ্ঞানদান করে সেই জ্ঞানকে অবলম্বন করে কর্মে নিয়োজিত হতে উদ্বুদ্ধ করছেন।

বিষাদের দ্বারাই অর্জুনের মনে জিজ্ঞাসা জেগেছে, দুঃখের অভিঘাতেই মানুষের মনে বৈরাগ্য আসে, যেমন মহাকবি গিরিশচন্দ্রের বুদ্ধচরিত্রে সিদ্ধার্থ বলছেন, 'অম্বুবিম্বপ্রায় নর ওঠে, অম্বুবিম্বপ্রায় পুনঃ টোটে।' এই নশ্বর জীবনের জন্য কেন এতো আয়োজন, কিসের প্রয়োজন? ভগবানও অর্জুনের এই রকম মানসিক অবস্থার অবকাশে তাঁকে সেই পরমতত্ত্ব শোনাচ্ছেন। অদ্বৈত ভিত্তির উপর তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছেন। একই কথা বার বার নানাভাবে বোঝাচ্ছেন—সেটি হল, এই জীবনের মূলতত্ত্ব হচ্ছে এক সৎবস্তু। তিনি অবিনাশী, তিনি অপ্রমেয়, বাক্যদ্বারা তাঁকে নির্ণয় করা যায় না। শুধু তাঁর যে শরীর, সেটিই বিনাশধর্মী, 'অন্তবন্ত'। শরীরের রূপান্তর হয়, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেটি বিকৃত হতে হতে বিনষ্ট হয়। কিন্তু তার অন্তরশায়ী যে 'পুরুষ' তিনি নিত্য শাশ্বত সনাতন 'অবিকৃত' থাকেন। বাহ্য ইন্দ্রিয়াদি রূপরসাদি বিষয়ের সঙ্গে সংযোগহেতু সুখদুঃখ ইত্যাদি ভোগ করে, কিন্তু এর আরম্ভ ও শেষ আছে। সেইজন্য এগুলি মিথ্যা—অনিত্য। কিন্তু আত্মার সুখদুঃখ নেই, আত্মজ্ঞ পুরুষের সুখ-দুঃখবোধও নেই। ঠাকুরের গলায় তখন খুব অসুখ, কাশীপুরে আছেন, একদিন বলছেন, তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছে। সামনে তখন ছিলেন তাঁর একজন যুবক ভক্ত। ঠাকুরকে কয়েকবার ঐ কষ্টের কথা বলতে শুনে তিনি বললেন, না মশায়, আপনার কোন কষ্ট নেই। একথা শুনেই ঠাকুর হেসে বলে উঠলেন, 'শালা ঠিক ধরে ফেলেছে রে।' এই হচ্ছে আত্ম-জ্ঞানীর স্বরূপ। তবে তাঁরা যে শরীরের বিষয়ে কথা মাঝে মাঝে বলেন, সেটা তাঁদের 'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্'। লীলায় শরীর ধারণ করেছেন আর সেইজন্য সাধারণ মানুষের মত ব্যবহার। সেটি শুধু বাহ্য আবরণমাত্র। এই যে আত্মতত্ত্বের শাশ্বতী বাণী যা উপনিষদ্-গুলিতে অভিব্যক্ত তাই গীতাতেও একটু ঘুরিয়ে বলা হচ্ছে 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ···হন্যমানে শরীরে।' (২।২০) এই যে নিত্যমুক্ত আত্মা ইনি জন্মমরণবন্ধনে কখনও বাঁধা পড়েন না। ইনি ক্ষয়বৃদ্ধিরহিত, শরীরের বিনাশের সঙ্গে সম্বন্ধহীন। ইনি যেমন ছিলেন তেমনি আছেন, তেমনি চিরকাল থাকবেন। সুতরাং যিনি এই আত্মাকে অবিনাশী, নিত্য, জন্মরহিত, ক্ষয়শূন্য বলে জানেন, তিনি কাকেই বা হত্যা করবেন, আর কার দ্বারাই বা নিহত হবেন?

উদার ভাব এখন সাধারণে বিশেষ উপলব্ধি করিতেছেন। বেদান্ত সমিতি এইরূপ, চিরন্তন বিরোধ দূর করিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণদেব কথিত 'যত মত তত পথ' প্রচার করিয়া জগৎকে ধর্ম্ম-সমন্বয়ের দিকে অগ্রসর করিয়া দিতেছেন। তাঁহাদের এই সৎ উদ্যম সফল হউক।

নিবেদিতা।

ব্রহ্মচারিণী নিবেদিতার (মিস্ এম্, ই, নোবল্) পরিচয় কলিকাতার জনসাধারণকে আর অধিক দিতে হইবে না। কলিকাতায় অবস্থানকালে গত মহামারীর সময়ে তাঁহার প্রশংসনীয় উদ্যম, বাগবাজারের বালিকা বিদ্যালয় এবং কালীসম্বন্ধিনী বক্তৃতা প্রভৃতি, তাঁহাকে আমাদের বিশেষরূপে মনে জাগরূক রাখিয়াছে। ইনি আমেরিকার চিকাগো সহরে ভারতবর্ষের ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার ইত্যাদি সম্বন্ধে বক্তৃতাদি দিয়া সম্প্রতি Michigan মিচিগান সহরে প্রচার-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন।

বেদান্তপ্রচারের ফল।

হারবার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ দার্শনিক প্রফেসর রয়িস্ বিগত শীতকালে স্কটলণ্ডের এবার্ডিন সহরে গিফর্ড লেকচারর রূপে মনোনীত হন। তাঁহার বক্তৃতাগুলি সম্প্রতি "The World and the Individual" জগৎ এবং মানবগত ব্যক্তিত্ব নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। অধ্যাপক তাঁহার পুস্তকের একাংশে ভারতের বেদান্ত-দর্শনের সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং Mysticism "রহস্য" শীর্ষক অধ্যায়গুলিতে উপনিষৎ হইতে ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধীয় অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন দেখিয়া সুখী হইলাম। বিবেকানন্দ প্রমুখ স্বামীগণের আমেরিকায় কেম্ব্রিজ সহরে বেদান্ত প্রচারের ফলেই যে তত্রস্থ অধ্যাপক ছাত্র এবং জনসাধারণের মধ্যে ভারতীয়দর্শন এবং ধর্ম্ম উচ্চস্থান পাইতেছে এ বিষয়ে সংশয় নাই।

মিসেস্ মেল্‌টন্।

আমেরিকা আজকাল সভ্যতা, শিল্প, বাণিজ্যাদিতে, যেরূপ উন্নত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, কালে সেইরূপ ধর্ম্ম এবং যোগাভ্যাসাদিতেও উন্নতি করিতে পারে। এ বিষয়ের পরিচয় অনেক ঘটনায় পাওয়া যায়: চিকাগোর ধর্ম্মসভা জগতে এক নূতন ব্যাপার। যোগশক্তিতে শারীরিক-রোগ বিনা ঔষধে আরোগ্য হইতে পারে। এ সম্বন্ধে কত নরনারী তথায় অনুসন্ধান এবং ফল লাভ করিতেছেন। এ বিষয়ে এক মহান সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছে। এবং কত ধর্ম্মালয় না প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি Mrs. Melton মিসেস্ মেল্‌টন্ নামক জনৈকা রমণীর অদ্ভুত শক্তির কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। ইনি ক্যালিফর্ণিয়ার লেস্ এঞ্জেলিস্ নামক সহরে বাস করেন। রোগ নির্ণয় এবং আরোগ্য করিবার ইঁহার বিশেষ দৈবশক্তি। ইনি বলেন রোগীর শরীরমধ্যে কোথায় কি রোগ হইয়াছে, তাহা তিনি দেখিতে পান এবং কে যেন তাঁহাকে বলিয়া দেয়। এবং শরীরের যে স্থানে রোগ হইয়াছে, সেই স্থানে হস্তঘর্ষণমাত্র উহা সারাইয়া দেন। সম্প্রতি এক বন্ধু লিখিয়াছেন যে, তাঁহার এক আত্মীয়ার পায়ে একস্থানে ক্ষত হয়; ইউরোপ এবং আমেরিকার যত বিখ্যাত ডাক্তার দ্বারা ১৮ মাস চিকিৎসা করাইয়াও কোন ফল হয় নাই।

(পৌষ, ১৩৮৫, পৃঃ ৬৮৫)

মিসেস্ মেল্‌টন্‌কে ৩০০০ মাইল দূরে নিউইয়র্ক সহর হইতে চিঠি লিখিয়া রোগের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। মিসেস্ মেল্‌টন্ উত্তরে লিখেন যে, তাঁহার পায়ের ঐস্থানে একটী সূচী বিদ্ধ হইয়াছে এবং নিকটে আসিলে তিনি উহা সারাইয়া দিবেন। রোগী তাঁহার কথামত লেস্ এঞ্জেলিস্ সহরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং ক্ষতস্থানে ৪।৫ দিন হস্তঘর্ষণ করিবার পর একটী সরু সূচ নির্গত হইয়া আসিল। ক্ষতটীও এক মাস বাদে আরাম হইয়া গেল। মানুষের ভিতর যে কত অদ্ভুত শক্তি আছে তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে? এই জন্যই বোধ হয় শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, কোন বিষয়ে 'ইতি' করা হীনবুদ্ধির কাজ।

রামকৃষ্ণ জন্মোৎসব।

গঙ্গাবিধৌত দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর বায়ুকোণস্থ ক্ষুদ্রগৃহে বসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন বলিয়াছিলেন "ওহে ভগবানের বিশেষ লীলা—গাছ পাথর জল আকাশ লইয়া নয়, মনুষ্য হৃদয় বিশেষতঃ সাধু ভক্তের হৃদয় লইয়া।" বাস্তবিক এই বাক্যের সার্থকতা তাঁহার স্বীয় জীবনে কি অদ্ভুত ভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে। কোথায় সেই দরিদ্র নগণ্য পূজারী ব্রাহ্মণ—গদাধর, এবং কোথায় এই উনবিংশ শতাব্দীর নবীন জ্ঞানালোকে উন্নতশীর্ষ গর্ব্বিতপাদক্ষেপী ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি জাতিসকলের—জেমস্, মুলার, হিবার, নিউটন প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের—সম্মুখে দণ্ডায়মান বীর ধর্ম্মাচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণ।— আকাশ পাতালের ব্যবধান। কিন্তু অঘটন-ঘটন-পটীয়ান্ ভগবানের বিশেষ লীলার স্রোতে ইহাও দেখিলাম। গুটিপোকার প্রজাপতিত্বে পরিণত হওয়া দেখিয়াছি—কতই আশ্চর্য্য; কিন্তু এই সর্ব্বতোনিরুদ্ধশক্তিক জড়ভাবাপন্ন পূজারীমনের দ্বাদশবর্ষব্যাপী অভূতপূর্ব্ব সংযম তপস্যার, জগতের যাবতীয় শক্তিমানের শীর্ষস্থানে উপনীত হওয়া দেখিয়া বিস্মিত স্তম্ভিত ও মোহিত হই।

'ভগবানের বিশেষ লীলা—মানুষের ভিতর দিয়া'; এই জন্যই কি বিশেষ বিশেষ মনুষ্য-হৃদয় আমাদের গর্ব্বিত মস্তক অবনত করাইয়া শ্রদ্ধা ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া থাকেন? এই জন্যই কি জগতে বীরপুরুষ এবং বীররমণীর পূজা আবহমান প্রচলিত আছে ও থাকিবে? এই জন্যই কি বৈদিক, বৈজ্ঞানিক ঋষিরা প্রতি মনুষ্যে তাঁহার লীলা দেখিয়া 'আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি' বাক্যের উপদেশ করিয়া সকলকে তন্মূর্ত্তিজ্ঞানে পূজার উপদেশ করিয়াছেন?

'পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষু' মানব-মন (Hero worship) বীরপূজায় স্বতঃই আকৃষ্ট হয়। ইহাতে যে তাহার কামকাঞ্চন-মোহিত মন ধীরে ধীরে প্রবুদ্ধ উন্নত ও আলোকিত হইবে এবিষয় আর তাহাকে যুক্তি সাহায্যে বুঝাইতে হয় না। বসন্তাগমে বৃক্ষবল্লীর ন্যায় বিজ্ঞানবীর, কাব্যবীর, যুদ্ধবীর, বিশেষতঃ ধর্ম্মবীরের শুভাগমনে এবং তৎপূজায় তাহার মনে নূতন প্রাণ, নূতন আশা, নূতন আলোকের সঞ্চার হয়। দুইটি, দশটিতে যথার্থ প্রাণসঞ্চারের সহিত ক্রমে সংসারজ্বালা হইতে মুমুক্ষুর জনতা দুইশত, দশশত হইয়া উঠে এবং কালে ঐ স্রোত সমগ্র দেশ এবং কখন কখন সমগ্র পৃথিবী অধিকার করিয়া বসে। পাঁচ জন মাত্র

প্রথমে বুদ্ধবীরের শরণাপন্ন হন ; দ্বাদশ জন ধীবরমাত্র বীর ঈশার পশ্চাদনুসরণ করিয়াছিলেন। কালে ঐ দুই বীরের পশ্চাতে কি দেশ মহাদেশ ব্যাপী জন স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা সকলের বিদিত আছে।

আমাদের চক্ষের সমক্ষে যে ধর্ম্মবীরের মধ্য দিয়া ভগবানের বিশেষ লীলার অভিনয় হইতেছে, ইঁহার শক্তি যে শেষে কতদূর অধিকার করিবে তাহার নির্ণয় সুকঠিন। বিংশাধিক বৎসর পূর্ব্বে যখন দুই চারিটী মাত্র মানব-হৃদয় দক্ষিণেশ্বরদেবালয়-প্রাঙ্গণে এই ধর্ম্মবীরের পূজায় সম্মিলিত হইতেন তখন তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই ঐ পূজায় একদিন সহস্র সহস্র নরনারী দেশে বিদেশে শ্রদ্ধাসহকারে যোগদান করিবেন। কল্পনার সুখারোহণ-উন্নতশৃঙ্গে উঠিয়াও তাঁহারা দেখিতে পান নাই যে, কালের বৎসরব্যাপী বিশটি তরঙ্গের গতায়াতে মান্দ্রাজ হিমালয় এবং সুদূর পাতালপ্রদেশ-আমেরিকায় জন্মোৎসবে এই বীরপূজার তরঙ্গ এককালে এত ক্রীড়া করিবে। কে ভাবিয়াছিল এই ধর্ম্মবিশ্বাসনাশকারী কিঞ্চিদর্থকরী পাশ্চাত্য বিদ্যার ক্রীড়াভূমি কলিকাতার পার্শ্বে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবে পঞ্চবিংশতিসহস্র লোকের সমাগম হইবে? বিগত ১১ই মার্চ্চ রবিবার আমরা মনুষ্য মধ্য দিয়া ভগবানের এই বিশেষ লীলাভিনয় দেখিলাম।

কলিকাতার অপর পারে ভাগীরথীতটস্থ বেলুড় মঠে ভগবান রামকৃষ্ণদেবের সপ্তষষ্ঠিতম জন্মতিথিদিবস উপলক্ষে গত ২০শে ফাল্গুনে, বেলা ৯টা হইতে রাত্রি ৪টা পর্য্যন্ত যাবতীয় দেবদেবী ও অবতারের পূজা হইয়াছিল। পূজান্তে অনেকক্ষণ ব্যাপিয়া হোম হইয়াছিল। এই জন্মতিথিপূজা উপলক্ষে, পরবর্ত্তী সপ্তাহে ২৮শে ফাল্গুন ইং ১১ই মার্চ্চ রবিবারে উক্ত মঠে সাধারণের জন্য মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। এই মহোৎসব ব্যাপারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায়ই জনসাধারণের উৎসাহ দেখা গিয়াছিল। সেই সৌম্যদর্শন ধর্ম্মবীরের সিংহাসনস্থ পত্রপুষ্পশোভিত অহেতুকদয়াসিন্ধুমূর্ত্তি, সেই অসংখ্য মানবের কণ্ঠোচ্চারিত গগনভেদী হরিনাম, সেই জটাজুটসিন্দুরগৈরিকধারী গায়কবৃন্দের মধুর শক্তিবিধায়িনী সঙ্গীত, সেই আপামর সাধারণে বিতরিত সুখসেব্য প্রসাদ ও শীতল পানীয় প্রভৃতি সকলই পূর্ব্ববৎ হইয়াছিল। বেণেটোলা, আহিরীটোলা, দর্ম্মাহাটা, বহুবাজার, শালকিয়া, খিদিরপুর, চেতলা, বরাহনগর, আলমবাজার, বৈদ্যবাটী প্রভৃতি স্থানীয় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ উচ্চশ্রেণীর সঙ্কীর্ত্তন সম্প্রদায়সকল অতিশয় আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। প্রায় দেড়শত সঙ্কীর্ত্তন সম্প্রদায় আসিয়াছিলেন। কয়েকটী সম্প্রদায় নিজেরা পৃথক্ পৃথক্ ষ্টীমার ভাড়া করিয়া অতি জাঁকজমকের সহিত আসিয়াছিলেন। কমবেশ ২৫ হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল। সময়োপযোগী দুই একটি বক্তৃতাও হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণমূর্ত্তির পুষ্পসাজ এবং মেলার সকল বিষয় নির্ব্বিরোধে সুসম্পন্ন হওয়া বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় ছিল।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম মান্দ্রাজে ক্যাসল্ কর্ণান্ (Castle Kernon) নামক

(পৌষ, ১৩৮৫, পৃঃ ৬৮৭)

সুপ্রসিদ্ধ প্রাসাদে ঐ দিন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ এবং তত্রস্থ বন্ধুবর্গ একত্র সমাগত হইয়া সমস্ত দিবস, ভজন কথকতা পূজা ও বক্তৃতা প্রভৃতির পরে, পাঁচ সহস্র লোককে প্রসাদ দানে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। কার্য্যের তালিকা এইরূপ ছিল:—বেলা ৭টা হইতে ১০টা—পূজা ও ভজন ; ১০টা হইতে ৩টা—নিমন্ত্রিতদিগের অভ্যর্থনা, সেবা ও পঙ্গত ; ৩টা হইতে ৫টা—হরিকথা ; ৫টা হইতে ৭টা—"শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁহার মিশন"এর উপর বক্তৃতা ; ৭টা হইতে ১০টা—আরাত্রিক এবং প্রসাদবিতরণ।

মুর্শিদাবাদ অনাথ আশ্রমেও জন্মতিথিদিবসে পূজা পাঠ হোম ভজন প্রভৃতি অতি সুচারুরূপে হইয়াছিল।

ভাগলপুরেও কয়েকটী শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত একত্রিত হইয়া পূজা পাঠ ও শতাধিক দরিদ্রকে ভোজন করাইয়াছিলেন।

যশোহরস্থ রেন্দটীয়া ধর্ম্মাশ্রম হইতে সংবাদ পাইলাম,—সেখানে রামকৃষ্ণজন্মোৎসব উপলক্ষে খুব ধুম সঙ্কীর্ত্তনাদি হইয়াছিল।

রাজপুতানস্থ কিসেনগড়ে রামকৃষ্ণ মিশনের দুর্ভিক্ষমোচনালয়ে স্বামী কল্যাণানন্দ উক্ত দিবসে পূজা এবং ১৫০০ দরিদ্রকে ভোজন-দান করিয়াছিলেন।

হিমালয়স্থ অদ্বৈতাশ্রমেও সেদিন ঐরূপ উৎসব হইয়া গিয়াছে।

বোম্বাই প্রভৃতি অন্যান্য দেশেও ঐরূপ কিছু কিছু হইয়াছিল।

পরিশেষে ঈশ্বর সমীপে এই প্রার্থনা যেন এই জন্মোৎসবের তরঙ্গে আবাল-বৃদ্ধনরনারীর হৃদয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই মধুরোদার "যত মত তত পথ" বাণী, এবং সেই জ্ঞানভক্তিযোগকর্ম্মের সমানৈক ক্রীড়ার ভূমি জীবনাদর্শ চিরপ্রবিষ্ট হইয়া শুভফল প্রদান করুক।

মহাভাষ্য ২ আহ্নিক।

(পণ্ডিত রজনীকান্ত বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনূদিত।—বর্তমান সঃ)

[২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যার পর।—বর্তমান সঃ]

ভাষ্য-মূল।—কঃ পুনরত্র বিশেষঃ বিবৃতস্যোপদিশ্যমানস্য প্রয়োজনমাখ্যায়েত সংবৃতস্যোপদিশ্যমানস্য বিবৃতোপদেশশ্চোদ্যেতেতি। ন খলু কশ্চিদ্বিশেষঃ। আহোপুরুষিকামাত্রং তু ভবানাহ সংবৃতস্যোপদিশ্যমানস্য বিবৃতোপদেশশ্চোদ্যত ইতি। বয়ং তু ব্রূমো বিবৃতস্যোপদিশ্যমানস্য প্রয়োজনমন্বাখ্যায়ত ইতি।

বঙ্গানুবাদ।—"বিবৃত উপদেশ করা হইতেছে তাহারই প্রয়োজন বলা হইতেছে।" এবং "সংবৃত উপদেশ করা হইতেছে তাহারই বিবৃত উপদেশ বলা হইতেছে।" এতদুভয়ে বিশেষ অর্থাৎ প্রভেদ কি? কোন প্রকার প্রভেদই নাই। আপনি কেবলমাত্র আহো-

পুরুষিকা(১) অর্থাৎ অহঙ্কার প্রকাশ করিতেছেন যে, বলিতেছেন, "সংবৃত উপদেশ করা হইতেছে, তাহারই বিবৃত উপদেশ বলা হইতেছে।" কিন্তু আমরা বলিতেছি,—"বিবৃত উপদেশ করা হইতেছে, তাহারই প্রয়োজন বলা হইতেছে।"

ভাষ্য-মূল।—তস্য বিবৃতোপদেশাদন্যত্রাপি বিবৃতোপদেশঃ সবর্ণগ্রহণার্থঃ*।

তস্যৈতস্যাক্ষরসমাম্নায়িকস্য বিবৃতস্যোপদেশাদন্যত্রাপি বিবৃতোপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ। কান্যত্র। ধাতুপ্রাতিপদিকপ্রত্যয়নিপাতস্থস্য। কিং প্রয়োজনম্। সবর্ণগ্রহণার্থঃ। আক্ষরসমাম্নায়িকেনাস্যগ্রহণং যথা স্যাৎ। কিং চ কারণং ন স্যাৎ। বিবারভেদাদেব।

বঙ্গানুবাদ।—এই অক্ষরসমূহের বিবৃত উপদেশ করা ব্যতিরেকে অন্যত্র অর্থাৎ অপরস্থলেও বিবৃত উপদেশ করা উচিত। অপর কোন্ স্থলে? ধাতু প্রাতিপদিক, প্রত্যয় এবং নিপাতে স্থিত স্বরেরও বিবৃত উপদেশ করা উচিত। তাহাতে প্রয়োজন কি? সবর্ণ-গ্রহণের নিমিত্ত। যাহাতে অক্ষরসমূহের দ্বারা ইহার গ্রহণ হইতে পারিবে। কি কারণেই বা অক্ষরসমূহের দ্বারা ইহার অর্থাৎ ধাতু, প্রাতিপদিক, প্রত্যয় এবং নিপাতে স্থিত স্বরের গ্রহণ না হইবে? বিবার এই প্রযত্নের প্রভেদবশতই গ্রহণ হইতে পারে না।

ভাষ্য-মূল।—আচার্য্যপ্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি। ভবত্যাক্ষরসমাম্নায়িকেন ধাত্বাদিস্থস্য গ্রহণ-মিতি। যদয়মকঃ সবর্ণে দীর্ঘ ইতি প্রত্যাহারে অকোগ্রহণং করোতি। কথং কৃত্বা জ্ঞাপকম্। নহিদ্বয়োরাক্ষরসমাম্নায়িকয়োর্যুগপৎ সমবস্থানমস্তি। নৈতদস্তি জ্ঞাপকম্। অস্তি হ্যন্যদেতস্য বচনে প্রয়োজনম্। কিম্। যস্যাক্ষরসমাম্নায়িকেন গ্রহণমস্তি তদর্থমেতৎ স্যাৎ। খট্বাঢ়কং মালাঢ়কমিতি।

বঙ্গানুবাদ।—আচার্য্যের প্রবৃত্তি অক্ষরসমূহের দ্বারা ধাত্বাদিস্থের অর্থাৎ ধাতু, প্রাতিপদিক, প্রত্যয় এবং নিপাতে স্থিত স্বরের গ্রহণ ইহা জ্ঞাপন করিতেছে। যেহেতু "অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ।" এই সূত্রে প্রত্যাহারে (২) অকের গ্রহণ করিতেছেন (৩)। কি প্রকারে ইহা জ্ঞাপক। দুই প্রকার অক্ষরসমূহের একেবারে সমবস্থান অর্থাৎ বিদ্যমানতা নাই। ইহা জ্ঞাপক নহে। ইহা বলিবার প্রয়োজনও আছে। কি? অক্ষরসমূহের দ্বারা যাহার

(১) আহোপুরুষিকা শব্দের অর্থ অহঙ্কার। এই কৈয়ট ব্যাখ্যা করিতেছেন,—অহো অহং পুরুষ ইত্যহঙ্কারবান্ অহোপুরুষস্তস্য ভাব ইতি মনোজ্ঞাদিত্বাদ্বুঞ্। অহঙ্কার-বত্ত্বমিত্যর্থঃ।

(২) "অ ই উ ণ্।" প্রভৃতি চৌদ্দটি সূত্রকে প্রত্যাহার সূত্র কহে। ঐ প্রত্যাহার সূত্রের অনুসারে যে, অক্, ইক্, এচ্, হশ্ প্রভৃতি সংজ্ঞা নিষ্পন্ন হয়, তাহাদিগকে প্রত্যাহার কহে।

(৩) এই স্থলে কৈয়ট বলেন।—"অত্র হি ককারেণ চিহ্নেন প্রত্যাহারস্থো বিবৃতো নির্দ্দিষ্টস্তেন চ সংবৃতস্যাগ্রহণে ইকঃ সবর্ণ ইতি বক্তব্যম্।" অর্থাৎ "অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ।" এই স্থলে ক কারের দ্বারা যদি প্রত্যাহারে স্থিত বিবৃত বর্ণেরই নির্দ্দেশ থাকিত এবং তদনুসারে সংবৃতের গ্রহণ না করা হইলে "অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ" না বলিয়া 'ইকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ' ইহাই বলা উচিত ছিল।

(পৌষ, ১৩০৫, পৃঃ ৬৯)

গ্রহণ আছে, তাহার নিমিত্তই এই প্রকার হইবে (অর্থাৎ ধাত্বাদিদ্বের গ্রহণ হইবে।) যেমন,—"খট্টাঢ়কম্।" "মালাঢ়কম্।"

ভাষ্য-মূল।—সতি প্রয়োজনে ন জ্ঞাপকং ভবতি তস্মাদ্বিবৃতোপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ। ক এষ যত্নশ্চোদ্যতে বিবৃতোপদেশো নাম। বিবৃতো বোপদিশ্যেত সংবৃতো বা কোঽত্র বিশেষঃ। স এষ সর্ব্ব এবমর্থো যত্নঃ ক্রিয়তে। যান্যেতানি প্রাতিপদিকান্যগ্রহণানি তেষামেতে-নাভ্যুপায়েনোপদেশশ্চোদ্যতে, তদ্ গুরু ভবতি। তস্মান্ন বক্তব্যং ধাত্বাদিস্থশ্চ বিবৃত ইতি।

বঙ্গানুবাদ।—প্রয়োজন থাকিলে জ্ঞাপক হয় না, অতএব বিবৃতের উপদেশ করা কর্ত্তব্য। বিবৃতের উপদেশে এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন কেন? বিবৃতই উপদিষ্ট হউক, অথবা সংবৃতই উপদিষ্ট হউক, ইহাতে আর প্রভেদ কি? এই নিমিত্তই এই সকল প্রকার যত্ন নিরূপণ করা হইতেছে যে সকল প্রাতিপদিক অগ্রহণ, তাহাদিগের এই প্রকার উপায়ে উপদেশ বলা হইলে, তাহা বিস্তীর্ণ হয়। (অর্থাৎ প্রত্যেক পদানুসারে পাঠ করিতে পারা যায় না, তাহা করিতে গেলে গ্রন্থ গৌরব হয়।) অতএব, ধাতু প্রভৃতি স্থিত স্বর বিবৃত এই প্রকার বলা উচিত।

ভাষ্য-মূল।—দীর্ঘপ্লুতবচনে চ সংবৃতনিবৃত্ত্যর্থঃ *।

দীর্ঘপ্লুতবচনে চ সংবৃতনিবৃত্ত্যর্থো বিবৃতোপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ। দীর্ঘপ্লুতৌ সংবৃতৌ মাভূতামিতি। বৃক্ষাভ্যাং দেবদত্তা ৩ ইতি। নৈব লোকে ন চ বেদে দীর্ঘপ্লুতৌ সংবৃতৌ স্তঃ। কৌ তর্হি। বিবৃতৌ। যৌ স্তস্তৌ ভবিষ্যতঃ।

বঙ্গানুবাদ।—দীর্ঘপ্লুত বাক্যেও সংবৃতের নিবৃত্তির নিমিত্ত বিবৃতের উপদেশ করা কর্ত্তব্য। সংবৃত স্বর দীর্ঘ বা প্লুত না হয়, এই নিমিত্ত বিবৃতের উপদেশ করা কর্ত্তব্য। "বৃক্ষাভ্যাং দেবদত্তা ৩" এই স্থলে "দেবদত্তা ৩" এই আকারটি প্লুত; অতএব ইহা বিবৃত। লৌকিক ভাষায় বা বৈদিক ভাষায় কোথায়ও দীর্ঘ বা প্লুত সংবৃত নাই। তবে কি আছে? বিবৃত আছে। যাহা আছে, তাহাই হইবে অর্থাৎ লৌকিক ভাষায় অথবা বৈদিক ভাষায় সর্বত্রই দীর্ঘস্বর-প্লুত স্বর বিবৃতই আছে; অতএব দীর্ঘস্বর বা প্লুতস্বর বিবৃতই হইবে।

ভাষ্য-মূল।—"স্থানী প্রকল্পয়েদেতাবনুস্বারো যথাযণম্।" সংবৃতঃ স্থানী সংবৃতৌ দীর্ঘপ্লুতৌ প্রকল্পয়েদ্ অনুস্বারো যথাযণম্। তদ্যথা সঁয্যন্তা, সঁব্বৎসরঃ, যঁল্লোকং, তঁল্লোকমিতি। অনুস্বারস্থানী যণমনুনাসিকং প্রকল্পয়তি। বিষম উপন্যাসঃ। যুক্তং যৎসতস্তত্র প্রক্লৃপ্তির্ভবতি। সন্তি হি যণঃ সানুনাসিকা নিরনুনাসিকাশ্চ। দীর্ঘপ্লুতৌ পুনর্নৈব লোকে ন চ বেদে সংবৃতৌ স্তঃ। কৌ তর্হি। বিবৃতৌ। যৌ স্তস্তৌ ভবিষ্যতঃ।

বঙ্গানুবাদ।—যেমন অনুস্বার যণকে অর্থাৎ য ব ল কে অনুনাসিক করে অর্থাৎ যেমন অনুস্বারের স্থানে যণ্ হইলে তাহা অনুনাসিক হয়; তদ্রূপ স্থানী অর্থাৎ সংবৃত ইহাদিগকে অর্থাৎ দীর্ঘ ও প্লুতকে সংবৃত করিবে। যেমন,—সংযন্তা এইরূপ স্থলে সন্ধি হইয়া সঁয্যন্তা এইরূপ প্রয়োগ হয়। সংবৎসরঃ এইরূপ স্থলে সন্ধি করিয়া সঁব্বৎসরঃ এইরূপ প্রয়োগ হয়। যং লোকম্ এইরূপ স্থলে সন্ধি করিয়া যঁল্লোকম্ এইরূপ প্রয়োগ হয়। তং লোকম্ এইরূপ সন্ধি করিয়া তঁল্লোকম্ এইরূপ প্রয়োগ হয়। স্থানী

অনুস্বার যণকে অনুনাসিক করে। ইহা বিষম কথা। ইহাই উচিত, যে, যাহা থাকে, তাহারই সেই স্থানে সম্ভাবনা হইতে পারে। যণ্ অর্থাৎ য ব ল ইহারা সানুনাসিক ও নিরনুনাসিক দুই প্রকারই আছে, কিন্তু, দীর্ঘ ও প্লুত ইহারা লৌকিক ভাষায় অথবা বৈদিক ভাষায় কোথায়ও সংবৃত নাই। তবে দীর্ঘ ও প্লুত কি প্রকার আছে? দীর্ঘ ও প্লুত বিবৃত আছে। যাহা আছে তাহাই হইবে অর্থাৎ লৌকিক ভাষায় অথবা বৈদিক ভাষায় দীর্ঘ ও প্লুত বিবৃতই আছে; অতএব দীর্ঘ ও প্লুত বিবৃতই হইবে।

ভাষ্য-মূল।—এবমপি কুত এতত্তুল্যস্থানৌ প্রযত্নভিন্নৌ ভবিষ্যতঃ। ন পুনস্তুল্যপ্রযত্নৌ স্থানভিন্নৌ স্যাতাম্। ইকার উকারো বেতি। বক্ষ্যতি স্থানেঽন্তরতম ইত্যত্র স্থানে ইত্যনুবর্ত্তমানে পুনঃ স্থানগ্রহণস্য প্রয়োজনং যত্রানেকবিধমান্তর্য্যং তত্র স্থানত আন্তর্য্যং বলীয়ো ভবতীতি।

বঙ্গানুবাদ।—এই প্রকার হইলে অর্থাৎ অকার ভিন্ন স্বরের বিবৃতত্ব স্বীকার না করিলে তুল্য স্থান হইলেও প্রযত্ন ভিন্ন হইবে ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে! কেবলমাত্র তুল্য প্রযত্ন নহে; ঈকার বা উকার এই প্রকার স্থান ভিন্নও হইতে পারে অর্থাৎ অকার ভিন্ন স্বরের বিবৃতত্ব স্বীকার না করিলে "তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্।" যাহার উচ্চারণস্থান এবং প্রযত্ন তুল্য তাহারা সবর্ণ হয়। এই সূত্রানুসারে সংবৃত অকারের স্থানে সংবৃত ঈকার অথবা সংবৃত উকার হইতে পারে। "স্থানেঽন্তরতমঃ।" এই সূত্রে স্থানে এই পদটির পূর্ব্ব হইতে অনুবৃত্তি আসিলেও পুনর্ব্বার স্থানে গ্রহণের প্রয়োজন বলিবেন,—যে স্থলে অনেক প্রকার অন্তরতা অর্থাৎ সাদৃশ্য থাকে, সেই স্থলে স্থানানুসারে আন্তর্য্যই বলবৎ হয়।

ভাষ্য-মূল।—তত্রানুবৃত্তিনির্দ্দেশে সবর্ণাগ্রহণমনণ্ত্বাৎ*।

তত্রানুবৃত্তিনির্দ্দেশে সবর্ণানাং গ্রহণং ন প্রাপ্নোতি। অস্য চ্বৌ। যস্যেতি চ। কিং কারণম্। অনণ্ত্বাৎ। নহ্যেতে অণঃ যে অনুবৃত্তৌ। কে তর্হি। যে অক্ষরসমাম্নায়ে উপদিশ্যন্তে।

একত্বাদকারস্য সিদ্ধম্*।

একোঽয়মকারো যশ্চাক্ষরসমাম্নায়ে যশ্চানুবৃত্তৌ যশ্চ ধাত্বাদিস্থঃ।

অনুবন্ধসংকরস্তু*।

অনুবন্ধসংকরস্তু প্রাপ্নোতি। কর্ম্মণ্যণ্। আতোঽনুপসর্গে ক ইতি। কে অপি ণিৎকৃতং প্রাপ্নোতি।

বঙ্গানুবাদ।—সেই অনুবৃত্তিনির্দ্দেশে সবর্ণ সকলের গ্রহণ হয় না। (অস্য চ্বৌ। ৭।৪।৩২।) চ্বি প্রত্যয় পরে থাকিলে অবর্ণের স্থানে ঈকার হয়। (যস্যেতি চ। ৬।৪।১৪৮।) ঈকার এবং তদ্ধিত প্রত্যয় পরে থাকিলে ভসংজ্ঞক(১) ইবর্ণ ও অবর্ণের লোপ হয় (অস্য চ্বৌ) এই সূত্রে অবর্ণের স্থানে ঈকার হয় এই কথা বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা সবর্ণানুসারে ইকার প্রভৃতি

(১) যচি ভম্।১।৪।১৮। যকারাদি ও স্বরবর্ণাদি কপ্রত্যয় পর্য্যন্ত সর্ব্বনামস্থানসংজ্ঞক ব্যতীত সুপ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে তাহার পূর্ব্বভাগের ভসংজ্ঞা হয়। সুড়নপুংসকস্য। ১।১।৪৩। সু, ঔ, জস্, অম্, ঔট্, ইহাদিগের সর্ব্বনামস্থান সংজ্ঞা হয়; কিন্তু ক্লীবলিঙ্গে সু, ঔ, জস্, অম্,

(পৌষ, ১৩০৫, পৃঃ ৬৯১)

হইতে পারে না। কি কারণে অনুবৃত্তিতে সবর্ণ সকলের গ্রহণ হয় না? অণ্ নহে বলিয়া গ্রহণ হয় না। যাহারা অনুবৃত্তিতে থাকে, তাহারা অণ্ নহে। তবে অণ্ কাহারা? যাহারা অক্ষরসমাম্নায়ে উপদিষ্ট হয়। অকারের একত্ববশত সিদ্ধ হয়(১)। এই অকার একমাত্রই যাহা অক্ষর সমাম্নায়ে আছে, ও যাহা অনুবৃত্তিতে আছে এবং যাহা ধাতু প্রভৃতিতে আছে। তাহা হইলে অনুবন্ধ সঙ্করও উপস্থিত হয়। কর্ম্মণ্যণ্। ৩।২।১ (কর্ম্ম উপপদে থাকিলে ধাতুর উত্তর অণ্ প্রত্যয় হয়।) আতোঽনুসর্গে কঃ ।৩।২।৩। (কর্ম্ম উপপদে থাকিলে উপসর্গবিহীন আকারান্ত ধাতুর উত্তর কপ্রত্যয় হয়।) এই সকল স্থলে কপ্রত্যয় পরেও অণ্ প্রত্যয়ের ন্যায় ণিৎ প্রত্যয়ের কার্য্য হইতে পারে (অর্থাৎ অণ্ প্রত্যয়েও অকারমাত্র অবশিষ্ট থাকে এবং কপ্রত্যয়েও অকারমাত্র অবশিষ্ট থাকে, যদি সকল অকারই এক হয়, তাহা হইলে, যেমন, অণ্প্রত্যয়নিষ্পন্ন "কুম্ভকার" প্রভৃতি স্থলে কৃধাতুর ঋকারে বৃদ্ধিরূপ ণিৎপ্রত্যয়ের কার্য্য প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, কপ্রত্যয়নিষ্পন্ন গোদ প্রভৃতি স্থলেও "গোসন্দায়" প্রভৃতি অণ্-প্রত্যয়ান্তের ন্যায় ণিৎপ্রত্যয়ের কার্য্য হইতে পারিত।)

ভাষ্য-মূল।—একাজনেকাজ্‌গ্রহণেষু চানুপপত্তিঃ*।

একাজনেকাজ্‌গ্রহণেষু চানুপপত্তির্ভবতি। তত্র কো দোষঃ। কিরিণা গিরিণেত্যে-কাজ্‌লক্ষণমন্তোদাত্তত্বং প্রাপ্নোতি। ইহ চ ঘটেন তরতি ঘটিক ইতি দ্ব্যজ্‌লক্ষণঃ ঠন্ ন প্রাপ্নোতি।

বঙ্গানুবাদ।—একাচ্ ও অনেকাচ্ গ্রহণবিষয়েও অনুপপত্তি ঘটে। তাহাতে দোষ কি? "কিরিণা" "গিরিণা" এইসকল স্থলে একস্বরনিমিত্তক অন্তোদাত্তত্ব উপস্থিত হইতে পারে এবং "ঘটেন তরতি" এই বাক্যে "ঘটিক" এইরূপ প্রয়োগস্থলে দ্বিস্বরনিমিত্তক ঠন্ প্রত্যয় হইতে পারে না। (অর্থাৎ স্বরপ্রকরণের নিয়মানুসারে "কিরিণা" "গিরিণা" এই সকল অন্তোদাত্ত নহে। কিন্তু, সকল ইকারেরই একত্ব স্বীকার করিতে গেলে এইসকল স্থলে একস্বর-নিমিত্তক অন্তোদাত্তত্ব হইতে পারে এবং সকল অকারেরই একত্ব স্বীকার করিলে তদ্ধিত প্রত্যয়ের "নৌদ্ব্যচষ্ঠন্ ।৪।৪।৭।" নৌ শব্দ ও দ্বিস্বরবিশিষ্ট শব্দের উত্তর ঠন্ প্রত্যয় হয়। এই নিয়মানুসারে ঠন্ প্রত্যয় হইয়া "ঘটিক" এই প্রকার প্রয়োগ হইতে পারে না; কারণ, ঘকারে স্থিত অকার এবং টকারে স্থিত অকার এই উভয় অকারই এক হইলে এই স্থলে কোন প্রকারেই দ্বিস্বরত্ব সম্ভবপর হয় না।)

ঔট্, ইহাদিগের সর্ব্বনামস্থান সংজ্ঞা হয় না। শি সর্ব্বনামস্থানম্ ।১।১।৪২। 'শি'র সর্ব্বনামস্থান সংজ্ঞা হয়। জস্‌শসোঃ শি ।৭।১।২০। ক্লীবলিঙ্গ শব্দের পরস্থিত জস্‌শসের স্থানে শি হয়।

(১) এই স্থলে কৈয়ট বলেন,—"একৈবাকারব্যক্তিঃ। উদাত্তাদিভেদপ্রতিভাসস্তু ব্যঞ্জকধ্বনিকৃতঃ খড়্গাতৈলাদর্শাদিভেদে প্রতিবিম্বপ্রতিভাসভেদবৎ। অকারস্য নিদর্শনার্থত্বা-দিকারাদীনামপ্যৈক্যং বোদ্ধব্যম্।" ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই,—অকার একইমাত্র, উদাত্ত প্রভৃতির অনুভব, উচ্চারকের ধ্বনিজনিত। অকারের নিদর্শনে ইকার প্রভৃতিরও একত্ব বুঝিতে হইবে।

(৮০তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৃঃ ৬২৫)

উদ্বোধন

বর্ষসূচী

৮০তম বর্ষ

(মাঘ, ১৩৮৪ হইতে পৌষ, ১৩৮৫ ; ইংরেজী : ১৯৭৮)



'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত'

সম্পাদক

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ (মাঘ, ১৩৮৪)
স্বামী আত্মস্থানন্দ (ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩৮৪)
স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ (বৈশাখ-পৌষ, ১৩৮৫)

সংযুক্ত সম্পাদক

স্বামী ধ্যানানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০০০৩

বার্ষিক মূল্য ১২.০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১.২০ টাকা

৮০/৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা ৬-স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে
বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে
স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত এবং
১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩ হইতে প্রকাশিত।

উদ্বোধন—বর্ষসূচী

৮০তম বর্ষ

(মাঘ, ১৩৮৪ হইতে পৌষ, ১৩৮৫)

সমালোচনা

চিত্রসূচী

আমি কি আর উপদেশ দেব! ঠাকুরের কথা সব বইয়ে বেরিয়ে গেছে। তাঁর একটা কথা ধারণা করে যদি চলতে পার তো সব হয়ে যাবে।

সারদাদেবী

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

অন্যান্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা — স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য ১৩'০০, ২য় ভাগ পৃঃ ৫২৪, মূল্য ৮'০০

ভারতে শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ। মূল্য ৩'০০

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৯১, মূল্য ৫'০০

স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ। পৃঃ ৩১০, মূল্য ৪'০০

গোপালের মা — স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৪৪, মূল্য ১'৫০

আচার্য শঙ্কর—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৪৬, মূল্য ৬'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র—মূল্য ৭'৮০

শিবানন্দ-বাণী— স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত। ২য় ভাগ ২'৫০

স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ। মূল্য ৪'০০

দিব্যপ্রসঙ্গে — স্বামী দিব্যাত্মানন্দ। পৃঃ ১৯৪, মূল্য ৬'৩৫

স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী—(ছাপা নাই)

আরতি-স্তব—মূল্য ০'৭০

পুণ্যস্মৃতি— স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ। পৃঃ ১১৬, মূল্য ৩'০০

মহাভারতের গল্প—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, সাধারণ ২'৫০, বোর্ড বাঁধাই ৩'০০ ৬ষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য সংক্ষেপিত "স্কুলপাঠ্য" সংস্করণ—পৃঃ ৭২, মূল্য ২'০০

শঙ্কর-চরিত — শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। ৭ম সংস্করণ মূল্য ২'৫০

দশাবতার-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য পৃঃ ১০৮, মূল্য ২'৫০

সাধক রামপ্রসাদ—স্বামী বামদেবানন্দ। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৫'২০

সাধু নাগমহাশয়—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। পৃঃ ১৪৪, মূল্য ৩'৫০

ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী তেজসানন্দ। পৃঃ ১২৪, মূল্য ১'৫০

শিব ও বুদ্ধ—ভগিনী নিবেদিতা। পৃঃ ৬৩, মূল্য ০'৬৫

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৫'০০

পত্রমালা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২, মূল্য ৪'০০

গীতাতত্ত্ব—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৭৬, মূল্য ৫'০০

লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৪২০, মূল্য ১০'০০

পরমার্থ-প্রসঙ্গ— স্বামী বিরজানন্দ। পৃঃ ১৩৭, মূল্য ৪'০০

ভগবানলাভের পথ—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। মূল্য ১'০০

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী — স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৩২, মূল্য ০'৬০

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-সঞ্চয়ন—পৃঃ ৩১৬, মূল্য ৭'০০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

বেদান্তের আলোকে খৃষ্টের শৈলোপদেশ—স্বামী প্রভবানন্দ। মূল্য সাধারণ ৪'০০

অতীতের স্মৃতি—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। পৃঃ ৪৬৪, মূল্য ১০'০০

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ১৪২, মূল্য ৩'৫০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। পাঁচশতাধিক সঙ্গীত। মূল্য ৬'০০

ঠাকুরের নরেন, নরেনের ঠাকুর—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ২৯, মূল্য ১'২০

সংস্কৃত

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত

১ম ভাগ পৃঃ ৪৫৪, মূল্য ১১'০০

২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ১১'০০

৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মূল্য ১১'০০

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত, স্বামী জগদানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪১৫, মূল্য ৭'৮০

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৬'৪০

স্তবকুসুমাঞ্জলি—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪০৮, মূল্য ৭'০০

বৈরাগ্যশতকম্—স্বামী ধীরেশানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ১'৫০

নারদীয় ভক্তিসূত্র—স্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ১৬৩, মূল্য সাধারণ ৫'০০, শোভন ৭'৫০

বেদান্তদর্শন—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য: ১ম অধ্যায় (চারখণ্ডে) ১৭'০০, ২য় অঃ ১৩'০০; ৩য় অঃ ১৩'০০; ৪র্থ অঃ ৯'০০

গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা—স্বামী রঘুবরানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য ১'৮০

শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজাপদ্ধতি—পৃঃ ৬৪, মূল্য ১'৫০

অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—সুরেশ দত্ত। মূল্য ৫'৫০

পরমহংসদেব—স্বামী প্রেমেশানন্দ। পৃঃ ২৪, মূল্য ০'৭৫

জননী সারদাদেবী—স্বামী নির্বেদানন্দ। (অনুবাদক: স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। মূল্য ২'৮০

শ্রীশ্রীমা সারদা—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৯০, মূল্য ২'০০

গল্পে বেদান্ত—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, মূল্য সাধারণ ৩'০০, বোর্ড বাঁধাই ৩'৫০

বীরবাণী—স্বামী বিবেকানন্দ। পৃঃ ১১৪, মূল্য ২'০০ (যন্ত্রস্থ)

বিবেকানন্দের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। পৃঃ ১৫৪, মূল্য ৩'৫০

প্রাপ্তিস্থান: উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩

Udbodhan—Phone : 55-2447 DECEMBER 1978 Regd. No. WB/NC-19

৮০।৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত।

